CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY
7563
.004

আষাঢ়—১৩৫৬

প্রথম খণ্ড | সপ্তত্রিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

ইউরোপের অভিজ্ঞতা

ডক্টর শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস

জার্মানি ও সুইজারল্যাণ্ডের কারখানার কথা

বিদ্যাং বিত্তং শিল্পং তাবৎ নাপ্নোতি মানবঃ সম্যক্
যাবৎ ব্রজতি ন ভূমৌ দেশাৎ দেশান্তরং হৃষ্টঃ।

অর্থাৎ হৃষ্টচিত্তে দেশ বিদেশ না ঘুরলে বিদ্যা, বিত্ত কিংবা শিল্প লাভ করা যায় না। অবশ্য দেশভ্রমণ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। ইচ্ছা থাকলেও উহা হয়ে ওঠে না। এবার বেঙ্গল কেমিক্যালের কর্তৃপক্ষের সহৃদয়তা এবং দূরদৃষ্টির ফলে পাশ্চাত্যের শিল্পপ্রধান কয়েকটি দেশ দেখার আমি সুযোগ পেয়েছি। ঋষিবাক্য মিথ্যা হবার নয়। সুতরাং উল্লিখিত শ্লোকের সার্থকতা লাভ সম্বন্ধে আমার কোনও সন্দেহ নেই।

যদিও ভারত সরকারের অনুমোদনে আমার যাত্রা, তবু কারখানা দেখার ব্যাপারে তাঁদের কোনও সাহায্যই আমি পাই নি। লণ্ডন থেকে ব্রিটিশ ও মার্কিন-অধিকৃত জার্মানির ছাড়পত্র কেবল ভারত-সরকারের সাহায্যে পাওয়া গিয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক আমার পরম শুভানুধ্যায়ী ডক্টর এফ, ডব্লিউ, লেভির চিঠিতে তাঁর আত্মীয়া ডক্টর মায়ার লণ্ডন থেকে জার্মানির মার্কিন ও ফরাসী অঞ্চলের I. G. Farbenindustrie-র দুটি প্রধান কারখানার ২জন বিখ্যাত কেমিষ্টের নিকট আমার জন্য বিশেষ ক'রে লেখেন এবং সেই দু'জন সদাশয় কেমিষ্টের সহায়তা বলেই আমি জার্মানির অত বড় দুটি কারখানা ভাল ক'রে দেখবার সুযোগ পাই। আমার জার্মান ভাষার কিঞ্চিৎ অধিকার এবং প্রকাশিত বইগুলি দেখে খুসী হয়ে অনেক কারখানার কর্তৃপক্ষ আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের নোবেল-প্রাইজ-প্রাপ্ত অধ্যাপক পল-

কারারের সনির্বন্ধ ব্যক্তিগত চিঠির সাহায্যে ঐ দেশের বড় বড় কারখানা দেখবার পূর্ণ সুযোগ আমি পেয়েছি।

কোনও দেশের অধিবাসীদের নৈতিক ও মানসিক গুণাবলীর উপর সেই দেশের শিল্প তথা সেই দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি নির্ভর করে। সুতরাং প্রথমে সাধারণভাবে আমার অভিজ্ঞতার কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজনীয় বলে মনে করি।

ওদেশের লোকেরা পথেঘাটে কথাবার্তা প্রায়ই বলে না। লণ্ডনেই এটি সব চেয়ে বেশী দেখা যায়। টিউবে, বাসে, ট্রেনে বা রাস্তায় কোনও হট্টগোল নেই। জার্মানিতে অবশ্য এতটা নয়। একদিন সন্ধ্যার ট্রেণে মার্কের কারখানা দেখে ডার্মষ্টাট থেকে যখন ফ্রাঙ্কফুর্টে আসছিলাম তখন ডেলি প্যাসেঞ্জারদের ঠিক আমাদের দেশের মত গল্পগুজব করতে করতে যেতে দেখলাম। নিজেরা চুপচাপ থাকলেও কোনও কথা জিজ্ঞাসা করলে তারা আবশ্যক জবাব দেয় এবং সাধ্যমত সাহায্য করে। পথ দেখিয়ে দেওয়া প্রভৃতি ব্যাপারে ইহা সর্বদাই লক্ষ্য করেছি। ও দেশের ট্যাক্সি-চালকদেরও ভদ্রতা অসাধারণ। একদিন লণ্ডনে টমাস-কুকের অফিস থেকে ইণ্ডিয়া হাউসে যাবার জন্য ট্যাক্সিতে চড়ি। সেদিন লর্ড মেয়রের মিছিল বেরিয়েছিল। ইণ্ডিয়া হাউসের কিছু দূরে থাকতেই ট্যাক্সি-চালক আমাকে বলল—ঘুরে গেলে অনেক বেশী খরচ পড়বে, এখান থেকে হেঁটেই যান। এই বলে সে আমাকে ভাল করে পথ দেখিয়ে দিল। অপর একদিন ট্যাক্সি ডেকে গন্তব্য স্থানের নাম করতেই ট্যাক্সিওয়ালা বলল জায়গাটি নিকটেই —ট্যাক্সির দরকার হবে না—এই বলে সে পথের নির্দেশ দিল। ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে দেড়শত মাইল দূরে লেভারকুজেনে কারখানা দেখতে সেদিন যাই সেদিন এত কুয়াশা যে—১০ হাত দূরে কিছু দেখা যায় না। ট্যাক্সির সামনের কাঁচে বরফ জমে যাচ্ছিল। চালক বার বার নেমে পেট্রল দিয়ে ও শুকনো কাপড় দিয়ে তা মুছে দিচ্ছিল, কিন্তু তাকে বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখিনি। গাড়ী থামিয়ে বসেওনি সে—পাছে আমার সময়ের ক্ষতি হয়।

লণ্ডনের রাস্তায় ফুটপাথের মোড়ে হকারেরা খবরের কাগজ রেখে দেয়—লোকে পয়সা ফেলে কাগজ তুলে নিয়ে যায়। সুইজারল্যাণ্ডে ১২টা থেকে দুটো পর্য্যন্ত দুপুরের আহারের জন্য দোকানপাট বন্ধ—ঐ সময় লোকে আঙুর আপেল প্রভৃতি ফল দোকানের সামনে খোলা জায়গায় ঝুড়িসমেত রেখে যেতে যায়—কিন্তু কোনও দিন এক পয়সার জিনিষও খোয়া যায় বলে শুনি নি।

ছেঁড়া কাগজ, ট্রামের টিকিট প্রভৃতি ফেলবার জন্য রাস্তার মোড়ে, ষ্টেসনে এবং ট্রামের মধ্যে পাত্র রাখা আছে। লোকে কদাচ ছেঁড়া কাগজ ওর বাইরে ফেলে না। ট্রেণে ও ট্রামে 'ধূমপান নিষেধ' বলে কামরা আছে—এরূপ কামরায় কদাচ কাউকে ধূমপান করতে দেখিনি। সুইজারল্যাণ্ডে কারখানা দেখার ব্যাপারে ১৫।২০ দিন আমি বিভিন্ন স্থানে রেলে গিয়েছি—ট্রামে ত যে দেড় মাস ছিলাম রোজই দু' একবার চড়তে হয়েছে—কিন্তু এই সময় ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম কদাচ আমার চোখে পড়ে নি।

সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা ও হাতের কাজে আনন্দ পাওয়া ও দেশের লোকের মজ্জাগত। সুইজারল্যাণ্ডে সব বাড়িতে যতটা ফাঁকা জায়গা আছে তাতে সুদৃশ্য বাগান করা। নোবেল-লরিয়েট প্রফেসর কারারও প্রত্যহ নিজ হাতে বাগানে কাজ করেন বলে তাঁর সহকারী ডক্টর সোয়াইট-জারের কাছে শুনলাম। I. G-র Hoechst কারখানায় পেনিসিলিন বিভাগের অধ্যক্ষ Dr. Oeppingerকে ত আমি নিজেই তাঁর বাগানে কাজ করতে দেখেছি। হোফহাইমে তাঁর বাড়ির খোঁজে গিয়ে বাগানে ছেঁড়া প্যাণ্ট ও ছেঁড়া জুতো পরা একটি লোককে মাটি কোপাতে দেখে কুলিভ্রমে তাকে ডক্টর ওয়েপিঙ্গার বাড়ি আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় যে উত্তর পেলাম তাতে নিজেকে অতিশয় লজ্জিত ও বিস্মিত হতে হ'ল। ওদেশে জমি অকেজো ফেলে রাখে না। টিলবেরি জাহাজ ঘাট থেকে ট্রেণে লণ্ডন যাবার পথে রেল লাইনের পাশে ঢালু জায়গাটুকুতে অবধি আলু, কপি ও বিবিধফুলের চাষ হয়েছে দেখলাম।

জার্মানির অবস্থা

লণ্ডনে রাস্তায় হাঁটতে ভাঙা বাড়ির ফাঁকা জায়গা ৫।৭ মিনিট বা ১০।১২ মিনিট হাঁটার পরে চোখে পড়ে; কিন্তু রাবিশ এখন কোথাও প'ড়ে আছে দেখিনি। বাড়ি অনেক জায়গাতেই উঠেছে বা তুলছে। জার্মানিতে বাড়ী তোলার কথা দূরে থাক, রাবিশ বা ধ্বংসাবশেষ সরানোরও এখন

পর্য্যন্ত তেমন চেষ্টা দেখলাম না। ফ্রাঙ্কফুর্ট, বাডহোমবুর্গ, ডারমষ্টাট, মানহাইম, লুডভিগসহাফেন, হোয়েস্ট কোলন, হামবুর্গ, ব্রেমেন প্রভৃতি যে সব জায়গায় আমি গিয়েছি সর্বত্রই এইরূপ। সহরের মধ্যস্থলে দু' একটি বাড়ি সারানোর চেষ্টা হচ্ছে। কারখানাতে বাড়ি তোলার তোড়জোড় যেন বেশী। রেলষ্টেসন সর্বত্রই বিধ্বস্ত দেখলাম। হামবুর্গে সহরের মাঝখানটির ক্ষতি কম, কিন্তু ডক ও শিল্পাঞ্চল একেবারে ধ্বংসস্তূপে পরিণত। ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে পর পর কয়েক দিন বোমাতে ঐগুলি ধ্বংস হয় এবং তাতে নাকি ৪১ হাজারেরও অধিক লোক মারা পড়ে। অনেক হতভাগ্যের কঙ্কাল এখনও এই সব ধ্বংস স্তূপের মধ্যেই পড়ে আছে। সহরতলীর কারখানা দেখতে যাওয়ার সময় মাইলের পর মাইল ধ্বংসস্তূপ দেখেছি। লোকের দারিদ্র্য নিদারুণ। ব্যাঙ্কের টাকা প্রায় সব মারা গেছে। কাজেই লাখপতি লোকও আজ দিন আনে দিন খায়। অধিকাংশ সহরবাসীরই মাথা গোঁজার জায়গা নেই। খাদ্যাভাবও ভীষণ। সবই রেশন। মাসিক মাথা পিছু এক পাউণ্ড মাত্র মাংস বরাদ্দ। সহরবাসী মধ্যবিত্তের অবস্থাই সবচেয়ে শোচনীয়। গ্রামের কৃষকদের অবস্থা নাকি অপেক্ষাকৃত ভাল। দেশে উচ্চ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা বা গবেষণা চালানো বন্ধ। পিস্তল বন্দুকের ব্যবহারও নিষিদ্ধ। অনেক কারখানা এবং কোন কোনও কারখানার অংশ বিশেষ dismantle করা বা খুলে ফেলা হয়েছে। সম্প্রতি জার্মানরা আন্দোলন সুরু করায় এ কাজ কিছু ঢিল পড়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। এত কষ্টের মধ্যেও কিন্তু এরা ততটা মুশড়ে পড়েনি—কাজে ওদের কুত্রাপি শৈথিল্য দেখিনি।

যুদ্ধ সম্বন্ধে জার্মানদের ধারণা

যুদ্ধের নামে এরা তিক্ত বিরক্ত হয়ে গেছে। হিটলারকে এখন devil বা দানব আখ্যা দিচ্ছে। DES TEUFELS GENERAL বা দানবের সেনাপতি নামক জার্মান ভাষায় অভিনয় খাস জার্মানরাই আগ্রহের সঙ্গে দেখছে। ভাঙা বাড়িতে অতি সাধারণ রকমের একটি ষ্টেজে এই অভিনয় দেখতে আমিও গিয়েছিলাম। যে দুই একটি ভাল ষ্টেজ আছে সেগুলি মিলিটারী ব্যবহার করছে। অনেক সেনাপতিই হিটলারের বিপক্ষে ছিলেন এবং বিমানপোত নির্মাতা প্রধান ইঞ্জিনিয়র ইচ্ছা করেই ইঞ্জিনের একটি অংশ খারাপ রাখতেন যাতে সৈন্যেরা আকাশে উঠতেই পড়ে মরে—ইহাই এই অভিনয়ের প্রতিপাদ্য বিষয়। এখন ব্রিটিশ ও মার্কিণ সৈন্যেরা সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে এবং সহরের বাড়িঘর সারানোর চেয়ে বড় রাস্তা ও ব্রিজ মেরামতের দিকেই এদের বেশী নজর, ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে দেড়শত মাইল উত্তরে লিভারকুজেনে এবং ফ্রাঙ্কফুর্টের কয়েক মাইল দক্ষিণে হাইডেলবার্গে ট্যাক্সিতে যাবার সময় আমি নিজেই ইহা লক্ষ্য করেছি।

যাতায়াত জার্মানরা করে ভাঙাচোরা পুরাণো তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে, আর মিলিটারী যায় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীযুক্ত সুদৃশ্য বগিজোড়া ট্রেনে।

যাবার পথে লণ্ডনে যে কয়েক দিন ছিলাম সে সময় ব্রিটিশ ও মার্কিণ মিলিটারি অফিস ঘুরে আবশ্যকীয় ছাড়পত্র চেক প্রভৃতি সংগ্রহেই কেটে যায়। লণ্ডনে সাউথ কেনসিংটনের সায়েন্স মিউজিয়ম ভিন্ন আর কিছু তখন দেখার সময় পাইনি। আমি জার্মানির ব্রিটিশ এলাকায় ১৫ দিন এবং মার্কিণ এলাকায় ১৫ দিন থাকার অনুমতি পাই। মার্কিণ এলাকার প্রধান সহর ফ্রাঙ্কফুর্টে প্রথমে যাবার ওঁরা নির্দেশ দেন।

ট্রেণে গেলে সময় লাগবে—তারপর ফ্রান্স ও বেলজিয়মের ভিসা বা ছাড়পত্র সংগ্রহেও কয়েক দিন অপেক্ষা করতে হবে ভেবে ১৭ই নবেম্বর প্যান আমেরিকান বিমানযোগে লণ্ডন থেকে ১টায় রওনা হয়ে সন্ধ্যা ৪½টায় ফ্রাঙ্কফুর্ট পৌছি। টাউনে স্থানাভাববশতঃ মিলিটারী কর্তৃপক্ষ ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে ১০।১২ মাইল দূরে বাডহামবুর্গের মিলিটারী ব্যারাকে আমার থাকা খাওয়ার জায়গা স্থির করে দেন। মিলিটারির নির্দেশে ভাড়া করা ট্যাক্সিতে টাউনে ও অন্যত্র যাতায়াত করতে হত।

১৮ই নবেম্বর ফ্রাঙ্কফুর্ট J E A (Joint Export Import Agency U. S. U. K.) জায়া অফিসে গেলাম। জার্মানির সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য এখন এই অফিসের মারফৎ হয়ে থাকে। Export বিভাগ. apparatus and chemical manufacturerদের অনেক দিন আগে ছাপানো তালিকা আমাকে দিলেন। কারখানার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া বা কারখানা দেখানোর ব্যাপারে এঁরা কোনও সাহায্য করতে পারবেন না বললেন।

আপাততঃ জার্মানির কেহই কোনও মাল সরবরাহ করতে পারবে না জানায় জায়া অফিসে দ্বিতায়বার যাওয়ার আমার দরকার হয় নি।

১৯শে নবেম্বর ট্যাক্সিতে ফ্রাঙ্কফুর্ট এসে ১১টার লোকাল ট্রেণ ধরেই, মার্কের কারখানা দেখতে Darmstadt রওনা হলাম। জার্মান গাড়ীতে সবই তৃতীয় শ্রেণী, কাঠের বেঞ্চ—গাড়ীতে আলোও নাই। ষ্টেশনের নিকটেই মাইন নদী পেরিয়ে ফ্রাঙ্কফুর্টের বোমাবিধ্বস্ত উপকণ্ঠ ছাড়িয়ে গাড়া চলল। দুধারে সবল উঁচু গাছের বন আর তার ধারে স্থানে স্থানে বোমায় ভাঙা অসংখ্য ইঞ্জিনও গাড়ী পড়ে আছে। প্রায় ২ ঘণ্টা পরে ডারমষ্টাট পৌছল। ষ্টেশনের মাইল দুই দূর থেকেই E. Merckএর প্রকাণ্ড Sign Boardযুক্ত কারখানা চোখে পড়ল। ষ্টেশন থেকে ট্যাক্সিতে প্রায় দু মাইল গিয়ে কারখানা। এখানকার ট্যাক্সিতে জার্মান মার্কে ভাড়া দিতে হ'ল। কথাও জার্মানেই বলতে হল। ফ্রাঙ্কফুর্টে মিলিটারী ট্যাক্সিতে ডলারে ভাড়া দিতে হয়। ওরা কেহ কেহ ভাঙা ইংরেজীও বলতে পারে। সামনে ট্রামের রাস্তা—রাস্তার অপর পারে মাঠে গমের ক্ষেতে সবুজ চারা ৩।৪ ইঞ্চি উঁচু হয়েছে—দূরে পাহাড়ের গায়ে বনশ্রেণী। রাস্তার ধারেই গেট অফিস। এঁদের গেট অফিস পরে যে সব কারখানা দেখেছি তাদের তুলনায় কম জমকালো। গেট অফিস জার্মান ভাষায় ছাপানো কাগজ দিল। তার যথাস্থানে নামধাম উদ্দেশ্য লিখে পাঁঠাতেই অল্পক্ষণের মধ্যে আমাকে অফিসের একটি সুসজ্জিত ঘরে নিয়ে বসাল। গেট থেকে সেই অফিসে যেতে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা। তাতে কয়েক সারি গাছ ও এক জায়গায় বাঁধাকপি এবং পেঁয়াজ গাছের মত অথচ শক্ত ও বড় লিক গাছের ছোট্ট ক্ষেত। কারখানাটি প্রায় ১ বর্গমাইল জায়গার উপর। বহু বাড়ি ভাঙা—প্রায় এক চতুর্থাংশ হবে—তবে শুনলাম এঁদের পাওয়ার হাউসের কোনও ক্ষতি হয় নি। কিছুক্ষণ পরে মিষ্টার ফিচে এলেন। ইনি ভাল ইংরেজী জানেন। যুদ্ধের আগে কলকাতায় ছিলেন। আমাদের স্বর্গীয় ম্যানেজার জগদিন্দ্র বাবুর কথা, বর্তমান ম্যানেজার-বাবুর কুশল ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করলেন। ব্যবসাবাণিজ্য-মাল পাঠানো ইত্যাদি শীঘ্র সম্ভব নয় বললেন। বাড়িঘর তোলা ও মেরামত হচ্ছে, অনেক অভিজ্ঞ কর্মী মারা গেছেন, তারপর দেশ ভাগ হওয়ার দরুণ শিশি বোতল পাওয়া যাচ্ছে না—যেহেতু জেনা অঞ্চলে শিশি বোতল প্রধানতঃ তৈরী হত—সেটি এখন রুশীয় এলাকায়—কাজেই মাল তৈরী করতে পারলেও সরবরাহের অনেক অসুবিধা। আমি ক্রমে আমার আসল অভিপ্রায় ব্যক্ত করলাম। ফিচে চমকে উঠে বললেন—"কারখানা ত দেশী বা বিদেশী কাউকে দেখাই না আমরা।" তখন আমি কথার মোড় ফিরালাম। যুদ্ধে জার্মানদের ক্ষয়ক্ষতি—তারপর তাদের উপর বিদেশীর প্রভাব—আমরা এতে কিরূপ ভুগেছি ইত্যাদি বললাম। মহাকবি গ্যেটের জন্ম এই অঞ্চলে সুতরাং ফ্রাঙ্কফুর্ট অঞ্চলের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য পৃথিবীবিদিত। আর কেমিষ্ট্রির বিশেষ করে organic chemistryর জন্মদাতা লিবিগ ও কেকুলের জন্মস্থান এই ডারমস্টাট সহরে সুতরাং ইহা সারা পৃথিবীর কেমিষ্টদের তীর্থক্ষেত্র। পৃথিবীর সুখশান্তিবিধানে এবং রিসার্চের প্রগতিতে মার্কের কারখানার এবং মার্ক পরিবারের ঔষধ সংক্রান্ত গবেষণার দান অতি প্রাচীন কাল থেকেই অতি উচ্চস্তরের ও অতুলনীয়। এর মধ্যে দু' একটি জার্মান কথা এবং গ্যেটের বাণীও উচ্চারণ করেছি—সুতরাং দেখে শুনে মিষ্টার ফিচে যেন একটু নরম হলেন। তিনি তখন প্রচার বিভাগের জোনস নামে জনৈক যুবককে ডেকে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে কি যেন পরামর্শ করে এসে উভয়ে আমাকে সঙ্গে করে কারখানা দেখাতে বেরুলেন। কারখানার ভিতরে বহু ফাঁকা জায়গা, সুদৃশ্য গাছের সারি, বাগানে বেঞ্চ পাতা। এত সুন্দর পরিবেশ যে কারখানা বলে প্রথমে মনেই হয় না। ফিচে বললেন—কারখানার পরিবেশ মনোরম হলে লোকদের ক্লান্তি কম হয়, তারা আনন্দের সঙ্গে বেশী খাটতে পারে। Tablet তৈরী, filling, sealing, Biological dept, analytical & Research Laboratory, Library, Vitamin তৈরীর বাড়ি প্রভৃতির মধ্যে নিয়ে গেলেন। এক একটি tablet ও preparationএর জন্য পৃথক কাচের ঘর Bioiogical Sectionএ কতক্ষণ ও কত ডিগ্রীতে autoclave করা হচ্ছে তার automatic record দেখালেন। Analytical laboratory তকতকে ঝকঝকে সাদা এনামেলের টালির দেয়ালের পাশে বুরেট বসানো—

Regentগুলিতে pH লেখা। হন্দরখানেক ভিটামিন সি centrifuge হচ্ছে দেখলাম। Biological oxidation দ্বারা Sorbitol থেকে Sorbose তৈরীর প্রকাণ্ড tower। এঁদের এই plant continentএর মধ্যে সবচেয়ে বড় বললেন। মাসে কয়েক টন ভিটামিন সি তৈরী হয়। ভিটামিন সি'র Cর লজেঞ্জের মত বড় Tablet খেতে দিলেন। অনেকটা চিনি থাকার দরুণ বেশ অম্ল মধুর, খেতে খারাপ লাগে না। রিসার্চ ল্যাবরেটরিটি প্রকাণ্ড বড়। লম্বা করিডরের এক পাশে কেমিষ্টদের নিজ নিজ বসবার ঘর, তার ঠিক সামনেই ল্যাবরেটরিতে সহকারীরা কাজ করছেন। ল্যাবরেটরীতে vacuum, steam, gas, distilled এবং ordinary water প্রভৃতির pipe line এবং অনেকগুলি hydrogenation apparatus চোখে পড়ল। Molecular distillation apparatusটি সবে এসেছে, বসান হয়নি। Dark roomএ spectrophotometer, refractometer প্রভৃতি যন্ত্র এবং এক পাশে প্রকাণ্ড ultraviolet lamp সাহায্যে ভিটামিন ডি তৈরীর ব্যবস্থা দেখালেন। কেমিষ্টরা ইংরাজী জানেন না। জার্মান ভাষাতেই তাঁদের কাজের কথা বলছিলেন। প্যাকিং ও ডেস্‌প্যাচ বিভাগের এর নিচেই নিজেদের রেললাইন। Despatchএ বেশী মাল দেখলাম না। ফিচে বললেন যুদ্ধের আগের সময়ের তুলনায় এখন মাল তৈরী এবং সরবরাহ খুবই কম। দেখতে দেখতে ৪টায় ছুটির সিটি বেজে গেল। ফিচে তাঁর অফিসে ফিরে তাঁদের কারখানার সচিত্র বই দিয়ে আমার সঙ্গে গেট পর্য্যন্ত এলেন। একখানি গাড়ীতে বড় অফিসার একজন যাচ্ছেন দেখে সেই গাড়ীতে আমাকে তুলে দিয়ে বিদায় নিলেন। আমি ষ্টেশনে এসে সন্ধ্যার ট্রেণ ধ'রে ফ্রাঙ্কফুর্ট ও সেখান থেকে ট্যাক্সিতে ৮টায় বাডহোমবুর্গের পার্ক স্যানাটরিয়ম হোটেলে ফিরলাম।

মার্কের কারখানায় শুনেছিলাম জার্মানিতে শনিবার ও রবিবার দুদিন কারখানা বন্ধ। ডক্টর মায়ার, ডক্টর ওয়েপিঙ্গারের বাড়ির ঠিকানা আমাকে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে তাঁর বাড়িতে মার্কিন মিলিটারী অফিসর থাকেন, তবে সেখানে গেলেই তাঁর নূতন বাসার খোঁজ পাওয়া যাবে। তাই পরদিন শনিবার বেলা ১১টায় ফ্রাঙ্কফুর্টে গিয়ে সেখান থেকে পুনরায় ট্যাক্সি করে ২০।২৫ মাইল দূরে হোফহাইমে গিয়ে অনেক কষ্টে ডক্টর ওয়েপিঙ্গারের সাক্ষাৎ পাই তাঁর বাগানে। তিনি তখন বাসার ঠিকানা দিলেন এবং বাসায় গিয়ে চা খেয়ে যেতে বললেন এবং সোমবার ১০টায় তাঁর কারখানা হোয়েক্‌স্টে পৌছতে বলে দিলেন। বলা বাহুল্য Mrs Oeppinger তাঁদের বাগানের আপেল ও চা প্রভৃতি দিয়ে আপ্যায়িত করলেন। তাঁর ভাঁড়ারে বাগানের নিজ হাতে তৈরী প্রচুর আপেল, পিচ, গোল আলু ও ভুট্টা দেখালেন। অত বড় কেমিষ্ট অথচ নিজ হাতেই এই সব উৎপন্ন করেন। তারপর লাইব্রেরী দেখালেন। জার্মান ভাষায় গীতাঞ্জলি, উপনিষদ, শকুন্তলা প্রভৃতি পুস্তকের পাশে নূতন নূতন বিজ্ঞানের বইএর সমাবেশ দেখে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সোমবার দশটায় হোয়েক্‌স্ট কারখানায় হাজির হলাম। মাইন নদীর ধার দিয়ে লম্বায় মাইল দুই, প্রস্থে ১ মাইল হবে—বিরাট সব বাড়ি। কারখানার ভিতর দিয়ে টাউনের একটি বড় রাস্তা চলে গেছে। বোমায় ক্ষতি হয় নি বিশেষ। গেট অফিসের ঝামেলা চুকিয়ে ডক্টর ওয়েপিঙ্গারের ল্যাবরেটরিতে গেলাম। তিনি ডিরেক্টরদের ঘরে থাকাতে অনেকক্ষণ পরে এলেন। ইতিমধ্যে তাঁর সহকারীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে ল্যাবরেটরি মোটামুটি দেখে নিলাম। ডক্টর ওয়েপিঙ্গার এসে দুএকটা ফোন করে আমাকে বিক্রয় বিভাগে প্রথমে পাঠালেন। তাঁদের শীঘ্র কোনও মাল সরবরাহ করার অবস্থা নাই জানালেন। Dye-এর Sales Deptও গিয়ে কথাবার্তা বললাম—সেখানেও এই একই জবাব। ঘুরে আসতে লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে তখন ডক্টর ওয়েপিঙ্গার আমাকে তাঁদের ক্যান্‌টিনে খেতে নিয়ে গেলেন। ওদেশে দুপুরে সবাই কারখানায় খায়। হোটেলের চেয়ে সস্তাতে খাবার দেওয়া হয়। খাওয়ার পর তিনি তাঁর রুমে না ফিরে সেখান থেকেই তাঁর এক কেমিষ্ট বন্ধুর গাড়ীতে করে আমাকে কারখানা দেখাতে সুরু করলেন। শেষোক্ত ডক্টর ভাগুনার inorganic heavy chemical বিভাগের অধ্যক্ষ। প্রথমে ammonia oxdize করে Nitric acid-এর plant দেখালেন। দৈনিক ১০ টন ammonia oxidize করা হয় বললেন। তারপর $Ca(NO_3)$ তৈরীর বিরাট plant! Powdered $CaCO_3$

একটি কক্ষের মধ্যে নাইট্রিক অ্যাসিডের ধারার সংস্পর্শে এসে নাইট্রেট হচ্ছে, আর সেই কক্ষের মধ্যে মস্ত একটি shaft ঘুরছে। তারপর chain systemএ অন্য ঘরে গিয়ে dry ও graunlated হওয়ার পর storage roomএ যেয়ে জমা হচ্ছে। গুদামটিতে ৫০,০০০ টন ধরে বললেন। এ Buildingটি ১৮০ ফিট উঁচু, Liftএ করে আমাকে সব তলাতেই নিয়ে দেখালেন। একটি অংশে বোমা পড়ে খানিকটা নষ্ট হয়ে গেছে। এঁদের sulphuric acid plantও বিরাট। প্রকাণ্ড rotary kiln-এ Pyrites পোড়ান হচ্ছে। দৈনিক ৬০ টন SO_3 তৈরী হয় বললেন। দু'একটি dyestuff, Pyrimidon প্রভৃতি তৈরীর ঘরেও নিয়ে গেলেন। অ্যাসিটিলিন থেকে organic solvent তৈরীর বিরাট cylindrical stills, automatic recorder! Vinylacetate plastlcizer তৈরীর বাড়িতেও নিয়ে গেলেন। এ বাড়িতে দেয়াল নাই explosionএর ভয়ে শুধু steel frameএর উপর রয়েছে। Acetylene থেকে Butylalcohol তৈরীরও বিরাট plant! Acetic auhydride প্রভৃতির storage নদীর ধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড wagonএ। নদীর ধারে জেঠি এবং রেল লাইন। কারখানার ভিতরেও অগুন্তি রেল লাইন। রাশি রাশি অ্যাটিপাইরিন তৈরী ও শুকানো হচ্ছে দেখা গেল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড still, autoclave, condenser, filterpress, অসংখ্য মোটা মোটা নল। Dye Deptএ বড় বড় Vatএ ভর্ত্তি dye এবং intermediates, তারপর sealing filling departmentএ নিয়ে গেলেন। এক building থেকে অন্যটাতে যাচ্ছি মোটরে। একটি মেশিনের সাহায্যে সমান পরিমাণ পাউডার মাল ampoule-এর ভিতর এসে পড়ছে। যে সব powder বাতাসের সংস্পর্শে খারাপ হতে পারে সেগুলি ভর্ত্তির পর vacuum করে seal করা হচ্ছে। সম্পূর্ণ Vacuum হল কিনা তা দেখা হচ্ছে Geissler tubeএর সাহায্যে। আমি এর rough stetop নিয়ে এসেচি। আমাদের Thiarsin, stibaramin প্রভৃতির বেলায় এরূপ sealing চালু করা যেতে পারে। এঁদের sterie subatance বা solution যে-ঘরে seal করে সেই কাচের ঘরের ভিতরের চাপ বাইরের চেয়ে ঈষৎ বেশী; যাতে বাইরের বাতাসের সঙ্গে কোনও জীবাণু ঐ ঘরে না ঢুকতে পারে। আরো যে সব মাল নষ্ট বা খারাপ হয় সেগুলির কাজ হচ্ছে রাশি কাচের কামরার মধ্যে। Automatic filling sealing machineএ কাজ হচ্ছে দেখলাম। এতে দৈনিক ১ হাজার ampoule fill seal করা হয়ে থাকে বললেন বোতল শুকানো হচ্ছে pressure steamএ ১৬০° উত্তপ্ত কুঠরীতে। এই ঘরে suction থাকাতে শিশির ভিতরের জলীয় বাষ্পও সম্পূর্ণরূপে বেরিয়ে যেতে পারে। বোতল প্যাক করা লেবেল লাগানো ইত্যাদি মেয়েরা হাতে করছে। যদিও মোটরে করে ঘুরা তবু আড়াই ঘণ্টায় সবটা দেখা হল না। শুনলাম ক্লোরোফরম এরা করেন Coal gasএর methane chlorinate করে। coal gasএ শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ methane থাকে। এঁদের alkali তৈরীর বিভাগও আছে। সুতরাং ক্লোরিন, হাইড্রোজেন বা সোডিয়ম কিছুরই এঁদের অভাব নেই।

I. Gর এই হোয়েক্‌সট কারখানায় ১০ হাজার জন কর্মী, ২৭০জন কেমিষ্ট ও কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়র এবং প্রায় ১০০জন রিসার্চ কেমিষ্ট আছেন। সাড়ে চারটায় ডক্টর ওয়েপিঙ্গারকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিলাম।

পরদিন ফ্রাঙ্কফুর্টে Deutsche Commerz নামক chemical dealerএর Mr Fahleএর সঙ্গে দেখা করি। ইনি Dechma অফিসের Dr Bretschneiderএর কাছে আমাকে পাঠান। এরা chemical engineering corporation; এখান থেকে জার্মাণির সমুদয় apparatus এবং chemical plant makerদের নাম ধাম সংবলিত ছাপান বই কিনে নেই। কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত অপর একখানি বইও ক্রয় করি। Dr Bretschneider Dr Thiene নামক একজন Veteran glass manufacturer এবং Hannoverএর একজন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়রের চাকুরির জন্য আমাকে ধরেন। I. Gর Leverkusenএর Bayer কারখানা দেখার জন্য সেখানকার একজন Sales manএর নিকট তিনি একখানি চিঠিও আমাকে দেন।

এর পর একদিন ফরাসী এলাকায় রাইন নদীর ধারে Ludwigshafenএ I. Gর বিখ্যাত কারখানা দেখতে যাই। Dye Deptএর Dr. Schusterএর বাড়ির

—নায় চিঠি ছিল। বাড়িতে গিয়ে কারখানার ঠিকানা Re এলাম। গেট অফিস এবং ফরাসী মিলিটারী ি ফসরের ছাড় পেতে অনেক সময় কেটে গেল। গেট ফিস প্রকাণ্ড একখানি ছাপানো বই দেখে ডক্টর ষ্টারের নাম বের করে ফোনে তাঁকে সংবাদ দিল। চিঠি দেখে কারখানা দেখাই যে আমার প্রধান উদ্দেশ্য নয় তা প্রমাণ করার জন্য তিনি আমাকে প্রথমে বিক্রয় বিভাগে পাঠালেন। এখানকার Mr. Fritz Sinn যুদ্ধের মধ্যে বরাহুনে আটক্ ছিলেন। অনেক কথাবার্ত্তা বলার পর তিনি এখন কোনও মাল সরবরাহ করতে পারবেন না—তারপর ওঁদের dyestuff ইত্যাদি French Dyes and Chemicals (India) Ltd, Bombay—তাদের মারফৎ ভারতে যায় বললেন।

ইতিমধ্যে ডক্টর শুষ্টার এই ঘরে এসে তাঁদের ক্যানটিনে লাঞ্চ খাওয়াতে আমাকে নিয়ে গেলেন। সবই প্রকাণ্ড বাড়ি। শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন সেন ও আমার যুক্তনামে প্রকাশিত একখানি প্রামাণ্য জার্মান গ্রন্থের অনুবাদ, Devolepment of Coaltar Colour Industry বইখানি তাঁকে দেওয়াতে উনি খুব উল্লসিত হলেন। কারণ হাইনরিখ কারো এই Badische Anilin und Sodafabrikএ কাজ করতেন। "আমাদের কারখানা প্রাচ্যের আপনাদের কারখানার কাছে নিতান্ত কৃতজ্ঞ ; কারণ কারোর Life and Work আপনারা এত ভালভাবে আবার লোক চক্ষে তুলে ধরেছেন" এই কথা বলে Dr. Schuster বইখানি নিলেন। পরে তিনি এই বইএর খুব উচ্চ প্রশংসাও পাঠিয়েছেন। লাঞ্চের পর তিনি তাঁর ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গেলেন। সব ভাঙা-চোরা। গত জুলাই মাসে dimethylatherএর একটি wagon explode করে এঁদের ৫ কোটি টাকার মত বাড়ি এবং যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে গেছে—লোকও মারা গেছে ২২০ জন এবং ৩ হাজার লোক জখম হয়েছে বললেন। Naphthalene থেকে phthalic anhydride তৈরী বিশেষ ভাবে দেখতে চাওয়ায় তিনি সেই বাড়িতে নিয়ে সেখানকার কেমিষ্টের সঙ্গে করে আমাকে তন্ন তন্ন করে দেখালেন—Temp. of reaction, catalyst প্রভৃতিও বলে দিলেন। আমি মোটামুটি sketch এনেছি। Phthalic anhydride থেকে Benzoic acid তৈরীর বাড়িটি ভেঙে গেছে তবে catalyst এবং Temp of reaction বলে দিলেন। এই কারখানা রাইন নদীর ধার দিয়ে কয়েক মাইল বিস্তৃত সঙ্গে লাগা Oppauএর Ammonia, Nitric acid, Alkali প্রভৃতির কারখানা অনেকই ভেঙে গেছে। দূর বলে এবং সময় বেশী না থাকাতে ডক্টর শুষ্টার সেদিকে আমাকে নিতে পারলেন না। এঁদের সম্মিলিত কারখানায় ২২ হাজার লোক, তার মধ্যে ৬০০ রিসার্চ কেমিষ্ট ও ২০০ জন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়র আছেন। ৬৫ বৎসর অবধি কার্য্যকাল। উপযুক্ত সময়ে অবসর গ্রহণ করলে যাঁর ১ হাজার মার্ক বেতন তিনি ২০০ মার্ক পেনসন পান শুনলাম। মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিজিক্যাল কেমিষ্ট্রিতে ডক্টরেট পেয়ে শুষ্টার এখানে রঞ্জন পদার্থের একটি বিভাগে কাজ করছেন। গত যুদ্ধের সময় কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে এঁর স্ত্রী মারা যাওয়ায় ভদ্রলোক খুব মনমরা হয়ে আছেন, দেখলাম। এঁর নিকট সাড়ে তিনটায় বিদায় নিয়ে ওখান থেকে ২০ মাইল দূরে জার্মানির অতি প্রাচীন বিদ্যাপীঠ এবং এই যুদ্ধেও সম্পূর্ণ অক্ষত সুপ্রসিদ্ধ হাইডেলবার্গ সহরে নোবেল লরিয়েট অধ্যাপক রিশার্ড কুনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। পথে রাইনের ধারে মানহাইম সহরের ধ্বংসলীলা চোখে পড়ল। অধ্যাপক কুন প্রথমে ছানার জল থেকে ল্যাকটোফ্ল্যাভিন (ভিটামিন বি$_২$) তৈরী করেন ও পরে উহা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করেন। জার্মান ভাষায় প্রকাশিত এঁর প্রক্রিয়া অবলম্বনে আমি আমাদের ল্যাবরেটরিতে ১৯৩৪ সালে Ox-kidney থেকে Renoflavin isolate করেছিলাম। অধ্যাপক কুন অতিশয় হৃদ্যতার সঙ্গে ভারতের শিল্প-বিজ্ঞান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন এবং তাঁর কাছে কোনও ভারতীয় ছাত্র গবেষণা করতে যায় না বলে—আর জার্মানিরও সেদিন নেই বলে আক্ষেপ করলেন। একটি বৃক্ষশোভিত পাহাড়ের পাদদেশে আপেল ও বাঁধাকপির বিস্তৃত মাঠের মধ্যে নেকার নদীর অনতিদূরে এই Kaiser Wilhelm Institut. ওঁর কাজের অনেকগুলি Reprint নিয়ে করমর্দনপূর্বক ওঁর কাছ থেকে ৫½টায় বিদায় নিলাম। পথে নেকার নদীর অপর পারে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে অপর একটি পাহাড়ের পাদদেশে প্রথিতযশা রাসায়নিক বুনসেনের

দণ্ডায়মান প্রকাণ্ড প্রস্তর মূর্তি চোখে পড়ল। বর্তমানে হাইডেলবার্গে মার্কিন মিলিটারি গবর্ণমেণ্টের হেড-কোয়ারটারস। জার্মান Auto Bahn বা মোটর চলা সড়ক ধরে ৬০ মাইল পথ দু' ঘণ্টায় অতিক্রম করে রাত্রে হোটেলে ফিরলাম। অটোবানের উপর যে সব দুর্ভেদ্য overbridge ছিল সবই বোমায় ভেঙে গেছে দেখলাম। যেখানে সড়ক বন-বেষ্টিত পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে গেছে সেখানে অটোবানের উপর দিয়ে overbridge ছিল। সম্ভবতঃ পদাতিক সৈন্যেরা এক বন থেকে অপর বনের মধ্যে যেত—তাদের রসদপত্র কামান বন্দুক নিয়ে। পরদিন ফ্রাঙ্কফুর্টের উপকণ্ঠে লুরগি নামক Chemical Plant & Machine-makerদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের ক্যাটালগ প্রভৃতি নিয়ে আমি মালসরবরাহ সম্বন্ধে কথাবার্তা বলি।

অপরদিন F. K. F. Work-এ গিয়ে বোতল ভর্তির মেশিন দেখলাম। ঘণ্টায় ১৪০০ বোতল ভর্তি করা যায়। ছোট বড় যে কোনও সাইজের বোতল চলে। মেশিনটীর দাম তিন হাজার টাকা। এঁরা ক্যাটালগ আমাকে দিলেন।

Vacuum Pumpএর ঠিকানা দেখে Dr. Viethএর সঙ্গে দেখা করি। মাইন নদী পেরিয়ে ট্রামে বহুদূর গিয়ে তাঁর বাড়ি। সেদিন সারা সহর, গাছপালা বরফে সাদা হয়ে গিয়েছিল। এদেশে অধিকাংশ গাছেরই শীতকালে পাতা থাকে না। সরু ডালগুলি সাদা বরফে মণ্ডিত হয়ে রজনীগন্ধার ছড়ার মত শোভা পায়—একপ্রকার পাইন গাছ (থান গাছ) এরা Christmas Tree বলে। বড়দিনের সময় রাস্তায় রাস্তায় ছোট থান গাছ বা ডাল বিক্রী হয়। কেবল এই গাছেরই সরু কাঁটার মত লম্বা সবুজ পাতা দেখা যায়। Dr. Vieth বললেন—তাঁদের কারখানা কোলনে। কলকাতায় এঁদের এজেণ্ট Adair দত্ত এণ্ড কোং। তিনি একখানি সচিত্র ক্যাটালগ আমাকে দিলেন। তিনি বহুদিন ভারতে ছিলেন। অজন্তা গুহা থেকে আরম্ভ করে তাজমহল পর্য্যন্ত ভারতের, সিংহলের ও প্রাচ্যের বহু জায়গার অসংখ্য ছবি নিজে তুলে সেগুলির বিবরণ ও নিজের ভ্রমণ কাহিনীসহ প্রকাণ্ড একখানি 'ভারত ভ্রমণ' লিখেছেন জার্মান ভাষায়। সুন্দর টাইপ করা ততোধিক সুন্দর বাঁধাই বই আমাকে দেখালেন। লাইব্রেরী ও তাঁর বেশ বড়।

(আগামী বারে সমাপ্য)

মেনকা মালিনী

শ্রীঅমরেন্দ্র ঘোষ

ফুল—এত ফুল তার চারদিকে!

গোলাপ, টগর, যূঁই, মল্লিকা, বকুল। আরও কত রকম দেশী বিদেশী ফুল। গন্ধে একেবারে মসগুল করে দিয়েছে রাস্তাটা। আধ-ফোটা ভুঁই চাঁপারই বা অন্ত কী!

মেনকা প্রথম দেখেছে বসে, বসে। তারপর শুয়ে। বাতাসের সংগে তার জড়িয়ে যাচ্ছে সমস্ত ফুলের গন্ধ। নানান কলির সুবাস।

মেনকা এক গৃহস্থ ভুঁইমালীর মেয়ে। দেশ বাঁটোয়ারার বিপর্যয়ে সে এসে পড়েছে এই সহরে। অনেক রকম রোগে ভুগে ভর্তি হয় এক হাসপাতালে।

অল্পতেই তার রোগ সারে। হাসপাতালে পায় রাজসিক চিকিৎসা।

খালাস পেয়ে যখন পথে এসে দাঁড়াল তখন সে ভিখারীর চাইতেও অধম। ভিখারীরও কিছু অভিজ্ঞতা থাকে, থাকে সামর্থ্য।

আত্মীয় বন্ধুবান্ধব যারা ছিল তারা যেন বানের জলে ভেসে গেছে। যে ফুটপাথ থেকে বিদায় নিয়েছিল, সে জায়গাটা খালি। শুধু পড়ে আছে দুখানা কালি-মাখা ইট। অস্থায়ী উনানের চিহ্ন।

ঘুরতে ঘুরতে মেনকা এসে বসল এক ফুলের বাজারের

সুমুখে। বড়ই পছন্দসই জায়গাটি। চারদিকে অফুরন্ত ফুল—এত ফুল তো সে দেশেও দেখেনি।

এখানে বসে বসে সে ভিক্ষা করবে। কত বিচিত্র লোক এখানে আসে। হয়ত তাদের মন ঐ ফুলের মতই নরম। প্রজাপতির মত রঙিণ তাদের বেশ। ব্যাগভরা পয়সা। মেনকার তো মাত্র একটা পেট।

একটু শক্তি সঞ্চয় করতে পারলেই, ব্যস। মেনকা ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে দেবে। গাঁথবে ফুলের তোড়া, রজনী-গন্ধার মালা। মাঝে মাঝে তার বসিয়ে দেবে রক্ত মালতী। ওদেশে বসে চৌধুরী বাড়ির রাধা-গোবিন্দজীর জন্য নিত্য মালা জুগিয়েছে। কালো পাথরের দেবতা শাদা ফুলে অপূর্ব হয়ে উঠেছে। সময় সময় একান্তে ও গিয়ে দেখেছে, দেবতা দম্পতি হাসছে যেন। রাধা গোবিন্দজী তো শুধু ঐ চৌধুরী বাড়ির দেবতা নয়—ওর অন্তরের ধন।

ও চোখ বুজে ক্ষণিকের জন্য চৌধুরী বাড়ি চলে যায়। আ—কি-না ও দেখছে, কি-না ও শুনল! শংখ ঘণ্টা কাঁসর ধ্বনি।

দোকানীরা বড় অযত্ন করে—ঐ তো অপবিত্র হাতে ধরছে ফুল। পুরুষ মানুষ কি করে জানবে এ জিনিষের যত্ন। ওরা মালাও তো গাঁথতে জানে না—ধরতেও পারে না আলগা হাতে একটিও গুচ্ছ! কোনটির পর কোনটি বসালে, কেমন করে আর একটু ঘন করে টেনে দিলে দেখতে চমৎকার হয় তা মেনকা জানে।

ওরা পুরুষানুক্রমিক ভূঁইমালী। পেশার সংগে রক্তে যেন নেশা মিশে গেছে। দোকানীরা কি ওকে দিয়ে মালা গাঁথাবে না?

মেনকার দেখতে ইচ্ছা করে এখানে কোথায় আছে রাধা-গোবিন্দজী!

ঐ যারা ফুল কেনে তাদের সংগে ও একদিন যাবে। ওর মনের দেবতার সংগে মিলিয়ে দেখবে রূপ। মেনকা আবার চোখ বোজে।

অনেক কথা ভাবে মেনকা—আর হাত দুখানা সুমুখের দিকে এগিয়ে দেয়। 'একটি পয়সা বাবু…'

কিন্তু দুর্বল হাত দুখানা বেতস পাতার মত কাঁপতে থাকে।

একশ জনের কাছে হাত পাতলে হয়তো একজন একটি পয়সা দেয়।

দিনান্তে মেনকা হিসেব করে দেখে পেয়েছে মাত্র চার আনা। এ দিয়ে এমন কিছু খরিদ করে খাওয়া যায় না, যাতে হাঁড়ি না চড়িয়ে চলে।

সে উঠে দাঁড়ায়। তাকে বাঁচতে হবে। ফিরে পেতে হবে পূর্বের সামর্থ্য। যৌবন তার আছে, শুধু হাত দুখানা একটু সুস্থ হলেই সে ঠিক।

হাসপাতাল থেকে বলে দিয়েছে, নিজের দায়িত্বে শুধু একটু সুখে যত্নে থাকবে, ভালভাবে চলবে।

মেনকা একটা হাঁড়ি কেনে। একটা রেশনের দোকানের সুমুখে গিয়ে দাঁড়ায়। সময়টা নিতান্ত অসময়ই বটে। সন্ধ্যাকাল!

'কার্ড?'

'নেই তো। সবে কাল হাসপাতাল থেকে…'

'বেরিয়েছ। হবে না, হবে না, যাও এখান থেকে।'

'তা হলে যে মরে যাব!'

দোকানী একটু কাষ্ঠ হাসি হাসে। চেহারটা মন্দ নয়—বেশ সুপুষ্ঠ।

'হাসছেন! আমার জীবন মরণ সমস্যা, আর আপনি কিনা হাসছেন!'

'হাসছি উদ্বেগে—আইন নেই, এখান থেকে সরে পড়ো।'

একজন দর্শক বলে, 'অত হৃদয়হীন হবেন না। আইন থাকলেও সব সময় কি আপনারা আইন মেনে চলেন?'

'কে বটেন আপনি? এলেন আবার ওকালতি করতে! একজনকে আস্কারা দিলে যে এসে দাঁড়াবে দশজন—তখন?'

'যতটুকু যা সম্ভব তাই করবেন। সে তো পরের কথা।'

মেনকার হৃদয় অশ্রুবিগলিত হয়ে ওঠে। এখনও দুনিয়া উজাড় হয়ে যায় নি, মানুষ আছে?

'আচ্ছা তোমরা মরতে পার না, যত অকেজো অভিশাপ! শুনেছি কোন দেশে নাকি ভিখেরী দেখলে গুলি করে।—যাক্, ক পয়সা আছে?'

'দশটা।'

'দে তো হীরা একপো চাল মেপে। কম দিস নে।' বলে সে এক হাতে পয়সা নেয়, অপর হাতে ছত্তি

বাটখারাটা মেনকার চোখের সুমুখ দিয়েই হীরার হাতে গুঁজে দেয়।

মেনকা চাল নিয়ে ফেরে।

তখনও আঁধার ঘনায় নি। কিন্তু দোকানে দোকানে বাতি জ্বলেছে। ফুলের রূপ যেন আরও অপরূপ হয়ে উঠেছে; গন্ধে ভরপুর হাওয়া। কত সুন্দর পুরুষ ও রমণী যে আসছে যাচ্ছে দোকানে। কত পরিপাটি বেশ-বাস! দামী অলংকার ঝলমল করছে।

মেনকা একটা থামের আড়ালে একটু লুকিয়ে থাকে। পাছে ওকে দেখলে কেউ ঘৃণা করে! কারুর পূজার ফুল না অপবিত্র হয় ওকে ছুঁয়ে! এপথে মেনকা নতুন। তাই হঠাৎ তার মনটা অমনি করে ওঠে।

পরক্ষণেই তা কিন্তু মুছে যায়। সারাদিন দেখল সকলে, এখন যত লজ্জা!

সে বেরিয়ে পড়ে। ছিন্ন বাসে, ফুলের হাটে তাকে একটা কি যে দেখায়!

একটি সুবেশা তরুণী এগিয়ে গিয়ে যেন দ্রুত মোটরে উঠল।

সংগের তরুণ জিজ্ঞাসা করল, 'ও কি?'

'দেখ, ফুল বাগিচায় ওটা পেত্নী নাকি।'

'ছিঃ ও কথা বলতে নেই। কখন যে কার ভাগ্যে কি ঘটে।'

'সত্যিই হারবাবু, আমার অন্যায় হয়েছে। ওকে ডাকো, দুটো পয়সা দেব। ও একজন রিফিউজিও হতে পারে।'

তরুণের ডাকে মেনকা কিন্তু এগিয়ে এলো না।

ওরা মোটর হাঁকিয়ে চলে গেল।

ফুলের বাজারে নিয়মিত বেচা-কেনা চলছে। কত দেশের কত না রকম ফুল আসছে, আবার চালান হয়ে যাচ্ছে নানা লোকের হাতে—বাঙালি ইহুদী ভাটিয়া মাড়োয়ারী ইংরেজ। কিন্তু তাদের শ্রেণী একটা—তারা শুধু ভাগ্যবান নয়, ঐশ্বর্যবান। বিলাসীও সবাই।

মেনকা ভাবে এত জাতের ভক্ত এরা পূজা করে কোন দেবতাকে? সে দেবমন্দিরই বা কোথায়? কৌতূহলে তার মন আকুল হয়ে ওঠে। আবার মনে পড়ে তার রাধা গোবিন্দের যুগল রূপ। এখানেও কি তেমনি কোন বিগ্রহ আছে?

কার কাছে সে শুধাবে? একটা তীব্র জ্বালা অনুভব করে সে।

আবার ক্ষুধা তৃষ্ণায় তাকে অস্থির করে তোলে। সে একজন অন্ধকে ডেকে নেয়। অন্ধের সামর্থ্য এবং মেনকার দৃষ্টিশক্তি একত্র হয়ে কাজ করবে। অন্ধ রাজি হয়। ফুটপাথের একপাশে ভাটিখানার আড়ালে হাঁড়ি চড়ে। কিছু বাজার কুড়ান মূলা-শাক ওরা কুচি কুচি করে কাটে। তেলের আজ আর সংস্থান নেই, নুন দিয়েই সেদ্ধ করে। নামে ভাত। একটু নুন তাতেও দিয়ে দেয় মেনকা। ক্যানটা ঝাড়ে না।

'বেশ লাগছে খেতে মেনকা—স্ত্রীলোক নইলে রান্না। আজ থেকে তাই রোজ কিন্তু একসাথে রান্না হবে।'

'আমার তো কোন আপত্তি নেই। দেও তো জলের ভাঁড়টা।'

মেনকার মুখের কাছে অন্ধ আন্দাজে তুলে ধরে পাত্রটা। মেনকা প্রাণভরে জল খায়। 'আঃ! এতক্ষণে বুকটা ঠাণ্ডা হলো।'

গভীর হয়েছে রাত।

মেনকা বলে, 'আর কদিন বা—দেখতে দেখতে ভাল হবে আমার হাত। ডাক্তারেরা বলেছে কোন ভয় নেই।'

'কিন্তু আমি তো জন্মান্ধ, আমার তো কোন আশা নেই মেনকা।'

'কেন থাকবে না? আমি মালা গাঁথতে জানি, তোমাকেও শিখিয়ে নেব।'

'কেমন, কেমন?'

'তা পরে বলব। সময় মত শুনো। এখন ঘুমোও। মোট কথা আমাদের আর ভিক্ষা করতে হবে না।'

'তাই না কি? সত্যি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—এখন চুপ করো।' অন্ধের চটখানার একপাশে শুয়ে পড়ে মেনকা।

পথের যানবাহন বন্ধ হয়েছে। ওরাও চোখ বোজে।

কিন্তু মেনকা ঘুমাতে পারে না। সে জিজ্ঞাসা করে, 'কতদিন এখানে আছ?'

'কতদিন! প্রায় সারাটা জীবন কাটাচ্ছ এই ফুটপাথে।'

'বলতে পার, এত ফুল যায় কোথায়? এখানে কি কোন দেব মন্দির আছে?'

'এই পাড়ায়!' একটু হাসে অন্ধ। 'সবে দেশ ছেড়ে সহরে এসেছ—এখন ঘুমাও কালে বুঝবে—এখানে রাধা-মন্দিরের অভাব কি!'

বিষয়টা কি জানার জন্য অনেক অনুনয় করে এরপর মেনকা, কিন্তু অন্ধ কেবলই হাসে। 'এ বাজারের বার-আনী ফুল যায় ঐ রাধা মন্দিরের গলিতে, দুআনী সাহেব-সুবার পার্টিতে। বাকি দুআনী খরচ হয় বাবু ভাইয়াদের নাগরালিতে। তবে মাঝে-সাঝে একটা দুটো ফুল যে মায়ের মন্দিরে পর্যন্ত যায় না তা বলি কি করে!'

মেনকা ঠিকঠাক সব বুঝতে পারে না। কিন্তু অন্ধকেও আর বিরক্ত করতে সাহস পায় না। রাত অনেক হয়েছে। ও আবার কিসে কি বলে ফেলে। একটা দারুণ অস্বস্তিতে মেনকার রাতটা গত হয়।

ঘুম ভাঙতে মেনকার একটু দেরি হয়। সে অন্ধকে আর দেখতে পায় না। সারাদিন খোঁজ করে এক খদ্দের কাছে জানল—সে যেন কোন বিয়ে-বাড়ি গেছে ভিক্ষুকের ভিড়ের সংগে।

সন্ধ্যাবেলা মেনকার আর হাঁড়ি চড়ে না। থাক, না চড়ুক, ও একবার রাধা মন্দিরের খোঁজ নেবে। দেবতাও দেখবে, হয়ত কিছু প্রসাদও পাবে। মেনকা তার মনের রাধাগোবিন্দজীকে একবার প্রত্যক্ষ করবে বলেই হেঁটে চলে। খানিক গিয়ে সে থামে—ফিরে আসে। সারা-দিনমান যে কাপড় তার পরণে ছিল তা বদলায়। অনেকটা শুচিবোধ করে অন্ধের আনা ভাঁড়ের গংগা জল স্পর্শে।

মেনকা তার সারাদিনের আয়ের পয়সা দিয়ে কিছু ফুল, কিছু ফল কেনে। কাপড়ের একটু সুতো তুলে নিজেই বহুকষ্টে দুটি মালা গাঁথে। সাদা থাকের ভিতর অপূর্ব নৈপুণ্যে সন্নিবেশ করে লাল ফুল। অনেকদিন পরে সে তার রাধাগোবিন্দজীর মন্দিরেই তো চলছে। ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা সে ভুলে যায়। সে মনে মনে মীরা হয়েছে।

একটা চায়ের দোকান।

'এখানে রাধা মন্দিরের গলি কোনটা?'

'রাধা মন্দিরের গলি?' একবার অপাংগে দৃষ্টি বুলিয়ে নেয় উত্তর-দায়ক। 'এই তো এই গলি।' তারপর চোখ বুজে ঝিমাতে থাকে। সুমুখের চা-টা তার বুঝি জল হয়ে যাবে।

মেনকা সোজা ভিতরে ঢুকে পড়ে। অনেকটা এগিয়ে যায়। কোথায় রাধাগোবিন্দজীর মন্দির? আর কতদূর? সে ব্যাকুল হয়ে ছুটে চলে। 'রাধাগোবিন্দজী, কই তুমি? দেখা দাও!'

বাতায়নে উচ্ছৃঙ্খল হাসি শোনা যায়।

একটা উৎকট গন্ধ। মেনকার নাকের ভিতরটা ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে। কে যেন বলে, 'কোথায় চলেছ ধনি?' তারপর এসে হাত চেপে ধরে তার।

'ছাড়ুন, ছাড়ুন—আমি রাধাগোবিন্দজীর মন্দিরে যাব।'

'গোবিন্দ যে আমারই নাম, তবে রাধা আপাতত মান করেছে। দেখছ না আমার গলায় কত মালা। তুমি মাইরি রাধা হওনা আজ রাতের তরে?'

কম্পিত হাত আড়ষ্ট হয়ে আসে। মেনকার হাতের মালা মাতালের পদতলে লুটিয়ে পড়ে।

সমস্ত বাজারের রঙিন ফুল মেনকার চোখের সুমুখে সরষে ফুল হয়ে নাচতে থাকে।

অনেক কষ্টে মেনকা ফিরে এসেছে—এসেই সেই ধূলি শয্যা গ্রহণ করেছে। সেদিন তার আর খাওয়া হলো না। কে চড়াবে হাঁড়ি? কোথায় যেন অন্ধকারে পড়ে রইল তার হাতে-গাঁথা মালা।

নর্দমার একটা বদ গন্ধ তার নাকে এসে ঠেকল।...

কোথায় রাধাগোবিন্দজী?

এমনি ভাবেই এখন দিন কাটে। অনাহারে, অনিদ্রায়। সময় সময় সে যা কিনে খায়, তা স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে নগণ্য। মাঝে মাঝে অন্ধের জন্য তার মন কেমন করে। সে কি সত্যই আর ফিরবে না?

কিছুদিন যেতে না যেতেই তার দুর্বলতা যেন বেড়ে উঠল। সে বারবার চেয়ে দেখল যে অন্ধের পরিচিত পরিত্যক্ত স্থানটা এসে দখল করল একদল ভ্রমণকারী সামর্থ্যবান মেয়ে-পুরুষ বালক-বালিকা।

অন্ধের চটখানা এবং ফুটপাথের জায়গাটুকু আবার না বেদখল হয়। মেনকা সন্ধ্যা হতে না হতেই তাড়াতাড়ি ফিরে শুয়ে পড়ে। সযত্নে গুছিয়ে রাখে ছেঁড়া চটখানা। ফিরে এসে চাইলে তাকে তো বুঝিয়ে দিতে হবে।

বিদেশীরা একজনে তার মুখের কাপড়টা টেনে দেখল—মুর্গা না কি?

মরা হলে ভাল ছিল, সরিয়ে দখল করে নিত স্থানটা।

আহার্যের অভাবে দিন দিন ক্ষীণ হয়ে এলো মেনকা। বস্ত্রাভাবও তার যথেষ্ট ঘটেছে। ছেঁড়া কাপড় আর কত সামলে পরা যায়। নবাগত লোকগুলোর চোখের সুমুখে সে যেন একটুখানি হয়ে থাকে। ওরা এখন আর কাছে আসে না বটে, কিন্তু দূর থেকে হিংসা করে ওর ঐ একান্ত আপনা ভাল জায়গাটুকুর জন্য।

মেনকা এখনও ফুলের দোকানগুলোর দিকে চেয়ে থাকে। দেখে সহরের বিলাসী নর-নারীর গতিভংগি। আর মাঝে মাঝে গোলাপ যুঁইর বদলে দেখে সরষে ফুল। এ সময় অন্ধ থাকলে চরণ এগিয়ে দিত তাকে জলের ভাঁড়টা।

ক্রমে নিস্তেজ হয়ে আসে তার দৃষ্টি, নিঃশ্রাণ হয়ে আসে দেহ।

একদিন মেনকা আর উপায়ান্তর না দেখে একটি বিদেশী মেয়েকে ডেকে জল খেতে চাইল। মেয়েটি শান্ত ধরণের। অনেকটা বাঙালি পল্লী বালিকার মত।

প্রতিদানে মেনকা তার এই অল্প পরিসর ভিক্ষু জীবনে যা যা জুড়েছিল তা সব দান করে। মেটে হাঁড়িটা, গোটা-কয়েক কৌটা, আর কি কি যেন!

'একি বহিন?'

'ইনাম।' অবশ্য বাঙলায় বলে মেনকা।

মেয়েটি খুশির চাইতে দুঃখিত হয় যেন বেশী।

এখন ফুলের সুবাস তার ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত পৌঁছায় না। তবু সে চোখ বুজে ফুলের কারিগরী করে। যেন হেসে হেসে গাঁথতে চায় মালা। সাজাবে তার প্রেমানন্দজীকে। কিন্তু চোখে দেখে শুধু সরষে ফুল। রাশি রাশি হলদে বর্ণ ছোট ছোট ফুল।

হঠাৎ ফিরে আসে অন্ধ। মেনকাকে এসে কোলে তুলে নেয়।

'মেনকা তোমার জন্য একখানা শাড়ি এনেছি, খেয়ে দেখ এই মিষ্টি কটা।'

চোখ মেলে মেনকা অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। এই কি তার রাধাগোবিন্দজী নাকি? তেমনি কালো, তেমনি নিশ্চল সকরুণ দুটি আঁখি-গোলক!

কিন্তু তার হাতে তো ফুলের মালা নেই। সে শুধু চোখের জল ফেলতে থাকে।

জাহানারার আত্মকাহিনী

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী শাস্ত্রী

(পূর্বানুবৃত্তি)

অস্তায়মান সূর্যের রক্তিমাভা দিকচক্রবাল রেখায় ছড়িয়ে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল যেন আমরা সূর্যোদয়ের পথ অতিক্রম করে চ'লেছি। চতুর্দিকের বিলীয়মান মুক্তমণ্ডলের রেখায় আকাশ আবরণের অন্তরালে শুক্তি-মুক্তার মত প্রতিভাত হচ্ছিল। অদূরে মেঘগুলি অগ্নিশিখার মত বর্ণাভ নীললোহিত বর্ণে অনুরঞ্জিত। দূর প্রান্তর থেকে উত্থিত ধানমান ধূমরাশি অরুণরাগে অধিগর্ভ হয়ে উঠেছিল। সত্যিই আমরা সেই রক্ত আলোর মধ্য দিয়ে মন্থন কাননের পথে পরিভ্রমণ করছি।

তরুণী ও প্রবাল বীথির মধ্য দিয়ে একটী পথ শুভ্র সরোবরের দিকে চলে গেছে। এইখানে সম্রাট বাবর জলকেলী করতেন, কিম্বা কখনও মধ্যস্থলে উচ্চাসনে বসে বিশ্রাম করতেন। পূর্বে এই স্থানটী ছিল একটী সামান্য গ্রাম। এর নাম ছিল শিকরী। আমি সরোবরের পার্শ্বে গিয়ে সেই উচ্চাসনে বসলাম। "রাও" উচ্চাসনের প্রান্তে সোপানে উপবেশন করলেন।

যে সমস্ত সৈন্যাধ্যক্ষ মনে মনে ঔরঙ্গজেবের পক্ষপাতী ছিলেন কিম্বা খারজুমলা ও অন্যান্যদের মত যারা পূর্বেই তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের কথা বলাম। হঠাৎ "রাও" অত্যন্ত সন্তর্পণে করে কি যেন দূরের জিনিষ দেখতে পেলেন। আমি দেখলাম, তাঁর উত্তীয় অন্তরালে লুকাবার

সংসর দু'টী অপূর্ব্ব মুক্তাখণ্ড। আমি আমার আনন্দের উচ্ছ্বাস সংবরণ করলাম। এতো আমারই প্রাপ্য উপহার।

এক নূতন সুরে তিনি বলেন—"বেগম সাহেবা, ঐ যেখানে সেই প্রান্তর,—যেখানে একদা পাষণ্ড বাবর ও রাণা সংগ্রামসিংহ যুদ্ধ করেছিলেন…।"

আমি আর সেই রক্ত প্লাবনের কাহিনী শুনতে পারলাম না। আমারই সহধর্ম্মীগণ ভারতের ওপর গিয়ে কি রক্ত বন্যাই বইয়েছিল!

আমি বলাম, "যদি এই যুদ্ধই সাম্রাজ্যের জন্য শেষ যুদ্ধ হ'ত, আর আমার ভ্রাতা যদি ফতেপুরে প্রবেশ ক'রে শান্তির উৎসব সমাপন করতে পারতেন…।"

তাম্বিলোর সঙ্গে "রাও" বলেন, "এই নগরটী চিতোরের শেষ যুদ্ধের যুগে নির্ম্মাণ করা হয়েছিল। রক্তের মধ্যে দিয়েই এই সাম্রাজ্যের বন্ধন রচনা করেছিলেন এবং রক্ত দিয়েই সাম্রাজ্যের ঐক্য রক্ষা করতে হবে। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে এক নূতন বিশ্বাস দিয়ে সেই ঐক্য রক্ষা করা যেতে পারে। কিন্তু তৈমুর বেগের দুর্দ্দমনীয় রক্তের বিশালতার জন্যই সাম্রাজ্য দ্রুত ধ্বংস হয়ে গেল। সম্রাট আকবরের স্বপ্নও এত বিরাট ছিল যে, লক্ষ কোটী ক্ষুদ্র মানব সেই স্বপ্ন সফল করতে পারেনি। তবু আমরা আজও সেই স্বপ্নের ধ্বংসাবশেষের ভিত্তিতে বেঁচে আছি…।"

আমি অবশ্যি বোধ করলাম। মনে হল—আমার জন্য একটী সুদৃঢ় ভিত্তির প্রয়োজন আছে,—যেখানে আমরা উভয়ে দণ্ডায়মান হতে পারি। আমি বলাম, "সম্রাট আকবর ভারতবাসীকে ভালবাসতেন এবং তিনি রাজস্থানের নারীদের বিবাহ করেছিলেন…।"

"রাও একটু তীক্ষ্ণ স্বরে উত্তর দিলেন, "তিনি সব সময়ই হিন্দুদের সম্মান করেন নি। রাজস্থানে এখনও কিম্বদন্তী আছে যে, সম্রাট পৃথ্বীরাজের স্ত্রীকে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছিলেন। এই পৃথ্বীরাজই প্রতাপকে লিখেছিলেন—"হিন্দুই হিন্দুর ভরসা।" সম্রাট আকবর নওরোজ উৎসবে পৃথ্বীরাজ-জায়াকে তাঁর স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসী করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং সেই রাণী তরবারির আঘাতে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন।" আমার বংশের রক্ত আমার শিরার ভিতরে চঞ্চল হয়ে উঠল। আমি বলাম, "যদি এমন কোন মানব থাকে যার রক্ত আমি চিরন্তন শান্তি স্থিনিময় করতে পারি, তবে সেই মহামানব ভারত সম্রাট আকবর।" আমার রক্ত উষ্ণ হ'য়ে উঠল। আবার বলাম, "তার স্মরণের একটু সস্মিত দৃষ্টির জন্য আমার ভূমিকা নিক্ষেপ করতে পারি।" রাওয়ের মুখমণ্ডল অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। তাঁর দৃষ্টি অবনমিত হ'ল। আমার ভাষা তাঁকে তীব্রভাবে দংশন করেছিল। আমার হৃদয় বিপলিত হয়ে গেল,—আমি বলাম, "পৃথ্বীরাজ-জায়ার মত আমি যদি ভারতীয় রাজপুতকে বিবাহ করতাম…।"

সূর্য্যরশ্মি মেঘের কোলে অবলুপ্ত হয়ে গেল। অতি ক্ষীণ শুভ্র কুজ্ঝটিকা সূর্য্যকে আবৃত করে দিল। অস্তের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে সূর্য্য মুহূর্ত্তের জন্য দিক্‌চক্রবালে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো—যেন এক খণ্ড বিরাট হীরক আলোক শিখার মধ্য দিয়ে বিচ্ছুরিত হয়ে গেল। আমরা দু'জনে সেই সূর্য্য রশ্মির আলোকে মহিমান্বিত হয়ে গেলাম। "রাও" আমার দিকে চেয়ে রইলেন,—সস্মিত দৃষ্টি। বোধ হয় আমার অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন আমার হাস্যময় মুখমণ্ডল।

"রাও" বলেন—"শাহাজাদী, আমায় মার্জ্জনা করো—আমার ভিতরের যুদ্ধ সৈনিক জেগে উঠেছিল। আমি তোমার অনুগত, আমি সম্রাট আকবরের সামন্ত মাত্র।" আমার মণিবন্ধের নূতন বন্ধন "রাও" তাঁর অধরপুটে স্পর্শ করলেন।

আগামী প্রভাত পর্য্যন্ত আমি ফতেপুরে বিশ্রাম করব,—এই সিদ্ধান্ত রাওয়ের মনঃপুত হয়নি, কারণ পারিপার্শ্বিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন ছিল। তিনি স্থির করেছিলেন যে, প্রভাতের পূর্ব্বে তিনিও সেইস্থান ত্যাগ করবেন না। তাঁর সৈন্যগণ আমার ক্ষুদ্র প্রাসাদের নিম্নতলে রাত্রিযাপন করবে এবং তিনি স্বয়ং উপরের তলে পদুমের নিম্নে একটী প্রকোষ্ঠে অবস্থান করবেন।

প্রাসাদের অভ্যন্তরেই আমাদের পরবর্ত্তী সাক্ষাৎ হয়েছে। খোজা ফ্রীতবাস আমাদের সম্মানিত অতিথির জন্য নিম্নতলের সুখকরতম কক্ষে অতি অনাড়ম্বর ভোজের আয়োজন করেছিল। কিন্তু আজকের দিনে আমি স্নান, কাল এবং দুর দুরান্তর অনুসৃত সমাজ-নিয়ম অতিক্রম করে ফিরেছিলাম। আমার ইচ্ছা হচ্ছিল যেন আমি বহুদিন আমার রাণীকে ভাইকে কিছু বলা পরিবেশন করি। আমার প্রকোষ্ঠের বহির্ভাগে দিকোণে প্রাচীরের পার্শ্বে আমার কোরেল একটী মৃৎপাত্রে কয়েক পুষ্প এবং একখানি সবুজ কুঁশাঘ রেখেছিল। কস্তুরীগন্ধ নিঃসৃত বৃহৎ প্রদীপাধারে দুটী মোমবাতি রক্ষিত ছিল। প্রদীপাধারের দুই পার্শ্বে দু'টী প্রদীপ জ্বলছিল। একটি ক্ষুদ্র টেবিলে তরমুজ এবং সোনালী আঙ্গুর রক্ষিত ছিল। সেগুলি বাবরের কাবুল উদ্যান থেকে আমদানী করা হয়েছিল। পেস্তারা, আম, পীচ, শুষ্ক খেজুর, খুবানী এবং বাদাম বদখ্‌শা ইরাণ থেকে আমদানী করা হয়েছিল। স্বর্ণ পাত্রে মূল্যবান সুরা রক্ষিত ছিল—সিরাজের সেই সুরা ছিল সিরাজের রক্ত অশ্রু।" প্রথম রাত্রির বাসরযামিনী নববধূর মত সলজ্জ হস্তে আমি কয়েকটী পুষ্প চয়ন করে আমার কবরী অলঙ্কৃত করলাম। আমার নিজেকে অলঙ্কার বিভূষিত করে তুলাম! এই ত একটু পূর্ব্বে আমি সেই অলঙ্কার দান করতে চেয়েছিলাম।

"রাও" আমার কক্ষ দ্বারে উপস্থিত। তাঁর মুখমণ্ডল আমার কাছে নিতাই নূতন। তাঁর আকৃতিতে ভাবের সংঘাত ও অদম্য ইচ্ছা শক্তির আভাস। কোন মুহূর্ত্তে তাঁর মুখমণ্ডল হাস্যদীপ্ত হয়ে উঠত, আবার অন্য মুহূর্ত্তে তাঁর দৃষ্টি এত গম্ভীর আকার ধারণ করত যে আমি ভীত হয়ে উঠতাম।

তিনি আমায় নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করলেন—তাঁর দৃষ্টি অবনমিত। আমরা অলিন্দের কোণে পরস্পর বিপরীত দিকে চতুষ্কোণ আসনে উপবেশন করলাম। আমাদের মস্তকের উপরিভাগে একটী ক্ষুদ্র অর্দ্ধ-গোলাকৃতি প্রাচীর,—যতদিন যাবৎ সূর্য্যবংশের সন্তানগণ বর্ষা শীতাত

দুর্যোগকে উপেক্ষিত ; অপরিবর্ত্তনীয় আলোর গম্ভীর রেখা এই বংশের সন্তানদের মুখমণ্ডলে চিরকাল অঙ্কিত রয়েছে। সেই বীরপুরুষ আমার সম্মুখে ঐশ্বর্য্যদণ্ডের মূর্ত্তিরূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন।

আমরা পরস্পরের অতি নিকটে বসেছিলাম, তবু মনে হচ্ছিল যেন—এক অদৃশ্য অন্তরালবর্ত্তী পরাধীনতা আমাদের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল। আমাদের চারিদিকে জীবন, আমাদের পশ্চাতে সমুদ্রসংঘর্ষ…

আমাকে কে যেন অকস্মাৎ প্রশ্ন করতে বাধ্য করল—"তোমরা যখন নতুন হও কর, তোমাদের মনের অনুভূতি কি রকম হয়?" আমি আমার পাত্রখচিত পানপাত্র তাঁর হাতে তুলে দিলাম। তিনি পানপাত্র গ্রহণ না করে দূরের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তিনি উত্তর দিলেন —"আমরা রাজপুত যদি অন্তরালের অক্ষম ঠাঁয় হয়ে রাজস্থানের অধিপতি থাকতে না পারি, তবে বাঁচবোনা! যে হস্ত এবং যে শিরায় উষ্ণরক্তই এক স্রোতে বয়ে চলে—আমরা তাকেই বলি জীবন। নদী, সমুদ্রের সন্ধান করে। মানুষের জীবন সমস্ত সীমা অতিক্রম করে স্রষ্টা ও সৃষ্টির রহস্যদিকে অসীমের সন্ধানে ছুটে চলে। আমি যখন সম্রাটের জন্য যুদ্ধ করেছি, রক্তপাত করেছি—মনুষ্যত্বের বাণীই আমাকে প্রেরণা দিয়েছে। যেদিন আমি যুদ্ধে বিরত হব আমি মনে করব আমার ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পালন করেছি।"

আমি আবার নবপ্রকাশে অভিভূত হয়ে পড়লাম। আমার ভয় হল —আমি বোধ হয় আমার বীর ভ্রাতাকে হারাব। আমি প্রাণ পণে শক্তি করলাম—"আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে চিরন্তন পরিবর্ত্তন আকাঙ্ক্ষা করে?" আমি আমার অদৃষ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলাম—এই অদৃষ্টই ত মানুষকে স্রোতের মধ্যে ভাসিয়ে দেয়। "রাও"এর মুখমণ্ডল অত্যন্ত গম্ভীর ভাব ধারণ করে, তিনি বলেন "নারোদের এক প্রস্তর গাত্রে উৎকীর্ণ ছিল ইবরাহুকুমার আলাদেবের কাহিনী—সিংহাসন আরোহণের দিনে আলাদেব বুঝেছিলেন যে এই জগৎ অনিত্য, অর্থাৎ পদ্মপত্রে শিশির-বিন্দুর মত অল্প ক্ষণের পূর্ব্বে মুহূর্ত্তের জন্য মুক্তার রূপ ধারণ করে। শাহজাদী আলানারা! এই যে ক্ষণীক আনন্দের শিশিরকণা আমাদের জন্য নির্দ্ধারিত হয়েছে, তারা কি প্রমাণ করে না যে জীবনস্রোত আনন্দ-সমুদ্রের দিকে ছুটে চলেছে? মানুষ কি চিরন্তনের আকাঙ্ক্ষা করে না… ?"

তিনি সেই পানপাত্রটীর উপর তার করপল্লব সঞ্চালন করে আমায় বলছিলেন। আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে গেল, আমি কোন উত্তর দিতে পারিনি। তারপর আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করেই আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিলেন—"বহুকাল পূর্ব্বে ভারতে একজন সম্রাট ছিলেন, তিনি জীব হত্যা নিষেধ করলেন। তাঁর নাম ছিল অশোক— তিনি ইহজগতে যা' কিছু করতেন—সমস্তই পরজগতের উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হত। মৃত্যুর কাঠদণ্ডের মত ছিল তাঁর অন্তরের প্রশান্তি। যেন নিজের মনে নিজেই "রাও" কথা বলছিলেন—"তিনি ছিলেন অহিংসাবাদী, তিনি আশ্রাকর্ত্তের দ্বার রেখে গেলেন উন্মুক্ত। উত্তর দিকে পঞ্জর অভিযান আরম্ভ হল—সেই সঙ্গে ছিল হত্যাকারী…।

আমি তাঁর প্রত্যেকটী কথা অত্যন্ত মনঃসংযোগ দিয়ে শুনছিলাম। কিন্তু অনেক দিন পরে তাঁর সেই কথার মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করেছিলাম। সেই পরম শুভক্ষণে একমাত্র তাঁর চিন্তাই আমাকে অপরিসীম আনন্দ দিচ্ছিল। তিনি আমার সম্মুখে বসেছিলেন—তাঁর উষ্ণীষ শুভ্র, তাঁর রাজ ভূষণ শুভ্র, তাঁর বর্ণ শুভ্র, তাঁর কটিদেশে শুভ্র কিংখাবের কোষের বন্ধ, তাঁর চরণতলে সুবর্ণ রেখাঙ্কিত কমল দল—সুন্দর, সুন্দরতর।

আকাশে তারার মেলা বসেছে—একটী তারাও আমাদের মাথার উপর আলোক সম্পাত করতে কার্পণ্য করেনি। যে তারাটী আমাদের নিকটতম ও উজ্জ্বলতম ছিল—সেটী অন্তঃপুর উদ্যানের পার্শ্বে দুইটী বৃক্ষের অন্তরালে বিলীন হয়ে গেল—তারার প্রতি, যদি আমি গুরু করে দিতে পারতাম! কারণ তারাটী আমাদের সময় পরিমাপ করছিল, রক্তধারা বক্ষের মধ্যে দ্রুতগতি চলেছে, আমার কত কথা বলবার ছিল; আমি স্বর্গের দ্বার প্রান্তে বসে আছি, কিন্তু বন্ধন দ্বার সুদৃঢ়াবদ্ধ, একটী পদক্ষেপ করেও স্বর্গে প্রবেশ কর্ত্তে পাচ্ছি না।

আবার আমরা আলোচনা আরম্ভ করলাম—সম্রাটের কথা, শাহজাদা দারার কথা। তারাটী দূরে বিটপী অন্তরালে অন্তর্হিত হয়ে গেল, আমি উঠে পড়লাম; কারণ তাঁর খাবার সময় হয়ে এসেছে। সম্রাট আকবরের নিয়মানুকরণে তিনি আমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। তিনি ভূমিস্পর্শ করে আকবরের অনুকরণে সিজদা (১) করলেন। সে সম্ভাষণ কি সহজ সুন্দর, কি অপরূপ আভিজাত্য; মনে হল যেন তিনি এই প্রকার বিদায় সম্ভাষণে অভ্যস্ত, তারপর তিনি মস্তক উত্তোলন করে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হলেন।

তিনি সম্ভাষণ করলেন 'শাহজাদি,' সে স্বর আজও আমার কর্ণে ধ্বনিত হচ্ছে,—"শাহাজাদি, আপনার কোন সংবাদ না পেয়ে আমি ভেবেছিলাম আপনি আমাকে বিস্মৃত হয়ে গেছেন, স্বপ্নদিনে আপনার যে রূপ কল্পনা করেছিলাম—সেই আমি স্মরণ করি, অবশ্য আমি সে মূর্ত্তি কখনো দেখিনি। তবু আমার অন্তরে সেই কল্পনার মূর্ত্তিকে শ্রদ্ধা করতাম, আজ যখন আপনাকে অবলোকন করলাম"—মুহূর্ত্ত নীরবতাকে আবার বলেন "আজ যখন তোমার বাণী শুনলাম, অদৃষ্ট ভিন্ন আর কেহই জয়সিংহকে প্রতিরোধ কর্ত্তে পারে না।"

তিনি তাঁর বাহুদ্বয় বক্ষসংলগ্ন করে দ্রুত পদে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন। আমি গম্বুজের নীচে সমুদ্র কূলানের কাছে গেলাম।

সেখানে শুভ্র আসনের পার্শ্বে প্রদীপটী ঈষৎ বায়ু সঞ্চালিত হচ্ছিল।

---

(১) মুসলমানগণ আল্লাহ ভিন্ন কাহাকেও প্রণতি জানায় না—কিন্তু আকবর রাজপুত সম্রাটকে অভিবাদন সিজদা করতে আদেশ করেছিলেন —নাম দিলেন "জমিন বুস"—ভূমি চুম্বন। এই প্রথা নিয়ে আকবরকে অনেক কটূক্তি সহ্য কর্ত্তে হয়েছিল, পরিশেষে সম্রাট পরিবারের লোক ও সিজদা দাবী করতেন। রাও ভাইসাবাদকে সিজদা করলেন।

আমি পুষ্পাধার থেকে কয়েকটী চম্পক তুলে নিলাম, আমার অবগুণ্ঠন থেকে রূপোলী সুতো দিয়ে মালা গাঁথলাম—হিরীর প্রাসাদে সেই রজনীতেও এমনি আমি মালা গেঁথেছিলাম। কিন্তু আজ মনে হল আকাশ আরো দূরে সরে গেছে, আজ আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলীর বর্ণচ্ছটা অস্পষ্ট নীল সমুদ্রে মিশে গেছে।

কিন্তু আমার গোলাপের কি হবে? সেই গোলাপের জন্য যে সহস্র কণ্টকাঘাত আমি সহ্য করেছিলাম! আমি যেন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে এক অভিনব অদ্ভুত জগতে পরিভ্রমণ করছিলাম। সেখানে সকল জিনিষ পরিবর্ত্তিত হয়ে পারতর হয়ে উঠছিল। আমাদের সত্তা সেখানে যেন গভীর দুঃখের মত এক রহস্যময় উৎস খুঁজে এসে মিশেছে।

অবগুণ্ঠন-অপসৃত বধূর মুখমণ্ডলের মত উজ্জ্বল শশধর ঐ প্রান্তরের অপর পার্শ্বে কুজ্ঝটিকা ভেদ করে চলেছে। রজনী দিবসের মত সমুজ্জ্বল। দুঃখের অবশিষ্ট অংশ বর্ণাঢ্য সেতুর মত পুণ্যতীর্থ ভূমির দিকে চলে গেছে। আমি অর্দ্ধ সমাপ্ত মালিকাহস্তে প্রাচীরের পাশে চলে গেলাম, কুজ্ঝটিকা যেন স্রোতের আকারে পরিণত হয়ে কাশ্মীরের দিকে চলেছে, তারপর তারা সে কুজ্ঝটিকা তৈমুর খুঁজে নিহত রাজপুত বাহিনীতে রূপান্তরিত হল, সেই রাজপুত বাহিনী এসেছিল, সম্রাট আকবরের ও জাহাঙ্গীরের সমর প্রাঙ্গণ থেকে, রক্ত থেকে, উজ্জয়িনী থেকে। তাদের দেহে রক্ত চিহ্ন নাই, তাদের দেহে ছিন্নভিন্ন পরিচ্ছদ নাই; তাদের যেন পরিচ্ছদ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল যেন তারা কোন গোপন যাত্রা বহন করে এনেছে……আজ রজনীতে চন্দ্র যেন তাদের আকাশ প্রদীপ হয়ে উঠেছে।

আমার অজ্ঞাতে আমি পূর্ব্ব দিকে দৃষ্টিপাত করলাম, আমার মুক্ত নয়নপথের অদূরে রাওয়ের ক্ষুদ্র প্রাসাদের ছাদ দেখতে পেলাম। তার নিম্নে দাঁড়িয়েছিলেন "রাও"। আমি নতজানু হয়ে পাষাণ প্রাচীরের পার্শ্বে আত্মগোপন করলাম, আমি নিঃশ্বাস নিতেও সাহস করিনি—কারণ হয়ত "রাও" আমার উপস্থিতি জানতে পারবেন। আমার দেহের প্রতি পরমাণু এক আকুল আকাঙ্ক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে উঠছিল—"রাও" যেন আমার দিকে দৃষ্টি ক্ষেপ করেন!

কিন্তু তিনি দাঁড়িয়েছিলেন নিশ্চল, তাঁর দৃষ্টি বহুদূরে অসীমের পানে যেন কোন বার্ত্তার সন্ধান করে ফিরছিলেন। আমি দেখেছিলাম তাঁর নয়নে এক প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা। তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে আসছিল সৈন্যবাহিনী, আসন্ন সংগ্রামে এই সৈন্যদল তাঁর পাশে দাঁড়াবে, তারা আমাদের সাহায্য করবে।

তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন, বাতাসে একটী দীপ নিভে গেল। দুঃখ আমায় আমার অভিভূত করে তুলল, আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কম্পিত হল। আমি অকস্মাৎ সকলকে দেখতে পেলাম—উদ্ধত, অধৈর্য্য যারা—বিদায়ী, ধৈর্য্যহীন যুবা—কূটবুদ্ধি, অধমবীর ঔরঙ্গজেব—দীর্ঘবাহু ঘুনবুদ্ধি যুবরাজ—আর আমার রুগ্ন পিতা। সেখানে আমি একমাত্র নারী।

আমি আমার কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করলাম। কোরেল আমার কক্ষের সম্মুখে দরজার পার্শ্বে শয়ন করেছিল। অন্য দরজার মধ্য দিয়ে "রাও" এর কক্ষে প্রবেশের পথ। আমি কি জীবনে আর তাঁর দর্শন পাব না? মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রত্যেক যোদ্ধা কি নিজের সময় নির্ব্বাচন করে নেবে—আমার জন্য কি একটী মুহূর্ত্তও ব্যয় করবে না? আমাদের মধ্যে কোন কথা হয়নি; না, কোন কথাই হয়নি। আমি ফিরে দরজার পার্শ্বে দাঁড়ালাম—অতি মৃদু অঙ্গুলি সঞ্চালনে অর্গলকে আঘাত করতে লাগলাম।

আমি জানি না—আজও আমি জানি না, কি করে দুয়ার খুলে গেল। আমি নিদ্রা ভ্রমণকারীর মত কক্ষান্তরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি……

'রাও' ঘরপ্রান্তে একটী ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপরে নিদ্রিত, তাঁর মস্তিষ্ক উষ্ণীষ বিহীন—তাঁর মুখমণ্ডল চন্দ্রকিরণ-সমুদ্ভাসিত, আমি ওঁকে কখনো এত সুন্দর দেখিনি। তাঁর অধর প্রান্তে হাসির চঞ্চলতা না দেখলে আমি মনে করতাম, হয়ত তিনি অনন্তনিদ্রায় শায়িত। আমার বাহু বেষ্টিত মালার পুষ্পগন্ধে যেন সমস্ত কক্ষটী আমোদিত হয়ে উঠেছিল……

চন্দ্রালোকে যেমন প্রকৃতি তার পট পরিবর্ত্তন করে, আমি তেমনি আমার ঘর প্রান্ত থেকে, দিবসের আশ্রিত পৃথিবী থেকে, রাত্রির রহস্যময় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলাম। অতি ধীরে আমি অবসন্ন হয়ে তাঁর পার্শ্বে শুয়ে পড়লাম—আমার সর্ব্ব শরীর পাষাণ তলের উপর এলিয়ে পড়ল। আমার মস্তক "রাও" এর বসনাঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত। আমার মনে হল আমি যেন ডুবে যাচ্ছি,—ডুবেই যাচ্ছি,—যেমন সেই দিন চন্দ্রালোকে আমার অবস্থা হয়েছিল, কিন্তু আজ আমি যেন শান্তির সাগরে ডুবে গেলাম। আমি এক অদ্ভুত তৃপ্তিতে পূর্ণ হয়ে গেলাম। আমার জীবনের একটী মুহূর্ত্ত যেন সহস্র রজনীর পরিপূর্ণতায় ভরে গেল। আমি আমার কক্ষ প্রাচীরের পার্শ্বে ইতস্তত পদধ্বনি শুনতে পেলাম, আমি উঠে বসলাম। "রাও" তাঁর মস্তক সঞ্চালন করলেন এবং নিদ্রার মধ্যে এক গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

দ্রুত অথচ শান্ত ভাবে আমি উঠে পড়লাম, আমি স্বর্গ থেকে এত শীঘ্র বিতাড়িত হলাম! কম্পিত কপোল, ভীত হৃদয়ে আমি আমার কক্ষে ফিরে এলাম; কিন্তু দেখলাম, আমার অর্দ্ধসমাপ্ত সেই মালাখানি পশ্চাতে ফেলে এসেছি।

আমার কক্ষের প্রাচীর অতিক্রম করে একটী 'বাদুড়' পাখী চলে গেল? এ কার পদধ্বনি?……আমার সমস্ত শক্তি লুপ্ত হয়ে গেল। আনন্দ, দুঃখ, ভয়—কিছুই যেন আমার আর সহ্য করবার শক্তি নেই। আমি সতরঞ্চের উপর কুশানে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লাম—গভীর নিদ্রা আমায় কোলে তুলে নিল।

প্রভাতে আকাশ-ভেদী এক তীব্র চীৎকারের শব্দে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হয়ে গেল। কোরেল আমাকে সংবাদ দিল যে রাত্রির প্রহরীরা একজন নিশাচরাগত লোককে প্রাসাদে প্রবেশ করতে চেষ্টা করছিল ভেবে হত্যা করেছে।

আমি কিছু শুনতে পাইনি, কোন দুঃখই আমার হল না। এইটুকু মনে হল যে গত রাত্রিতে এই ব্যক্তিরই চীৎকারে আমার ভীতিসঞ্চার

হয়েছিল, কিন্তু তার মৃত্যু যন্ত্রণায় তীব্র চীৎকার তখনও আমার কর্ণে বাজছিল, আমি জিজ্ঞাসা করলাম "রাও কোথায়"?

প্রত্যুত্তরে তিনি সশব্দে শ্বাস ত্যাগ করে গেলেন। আমি আমার শয়নকক্ষে যাওয়ার পূর্বে কক্ষে গিয়ে দেখতে পেলাম যে, আমার মালাবারি সেখানে নেই। এই মালাবি আবার আমাদের মধ্যে নূতন ষড়যন্ত্র রচনা করবে? আমি আমার তার সঙ্গে কি করে সাক্ষাৎ করব?

আমরা নরবৎখাদা অতিক্রম করে এসেছি, পথে দেখলাম একটী শবযাত্রা। আমি বুঝলাম একটী দরিদ্র হিন্দুর মৃত দেহ নদীতীরে দাহ করবার জন্য নিয়ে চলেছে, আমি হাজীকে জিজ্ঞাসা করলাম "মৃত লোকটী কে?" সে উত্তর দিল "গত রাত্রির নিহত ব্যক্তি।" এই লোকটী ছিল অল্পবুদ্ধি কিন্তু তার দর ছিল খুসিই। বেগম সাহেবাকে রাত্রি প্রভাতে সঙ্গীত শোনাতে চেয়েছিল—এই তার অপরাধ। তার বুকের মধ্যে লুকায়িত ছিল একখানি ছুরিকা বহন। অঙ্গের ধারণা ছিল সে নিশ্চয়—চুরি করেছিল। কিন্তু তার মৃত্যু বল, "আমার পুত্র জীবনে কখনো চুরি করেনি; সে কেবল দানই করেছে।" আমি তার মৃত্তিকার সমাধি লিখতে বলাম। আমি মৃত ব্যক্তিকে যে কফন দিয়েছিলাম তার মাতাই সে কফনের অধিকারিণী। তারপর আর একখানি কফন তাকে উপহার দিলাম। এই ব্যক্তির মৃত্যু আমার মনের উপর ভীষণ অবসাদের ছায়াপাত করে দিল।

গ্রীষ্ম তাপদগ্ধ দিনে যেমন সমস্ত পৃথিবী—নিঃশ্বাসের জন্য কাতর হয়ে উঠে, আমি দেখলাম, সমস্ত আগ্রানগরী উত্তেজনায় তেমনি চঞ্চল হয়ে উঠছে। কেউ আনন্দে ভবিষ্যতের আকাশকুসুম রচনা করে চলেছে, আবার কেহ ধারণা করছে বিষম অবস্থাবী.....

গুজবাদের মত সত্য মিথ্যা নানাপ্রকার জনশ্রুতি আগ্রা সহরকে বিব্রত করে তুলেছে। আমি শুনলাম,—ঔরংজেব এবং মুরাদ নিজেদের অপরাজেয় মনে করছেন, তাদের সৈন্যগণ উজ্জয়িনীর যুদ্ধ জয়ের ফলে গর্বিত। তারা ঘোষণা করেছে যে দারাকে জয় করে তারা পারস্য ও তুরাণের বিরুদ্ধে অভিযান করবে। বিদ্যাসম্রাটকের বল ভিন্ন আর কারো অস্তিত্ব ছিল না। ঔরংজেব বলেছেন যে আমার পিতার সৈন্যবলে সহস্র সহস্র বিশ্বাসঘাতক সৈন্য রয়েছে।

আমি আমার আজ্ঞা দারার সঙ্গে দেখা করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। এমন সময় একখানি পত্র পেলাম—রাজা জয়সিংহের পত্র। কয়েকটী ছত্র ছন্দে লিখিত পত্রে তিনি বলেছেন যে, যদি দারাকে সৈন্যদলের একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত না করা হয় তবে তিনি সম্রাটের সম্মুখে আত্মহত্যা করবেন। আমার মনে হল, সম্রাটের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের আশা নেই এবং দারার সঙ্গে তিনি সমর্থন করবেন না। পত্রের শেষে এক অনুরোধ তিনি জানিয়েছেন যেন আমি আমার হস্তাক্ষরযুক্ত একখানি স্মৃতিচিহ্ন তাঁকে উপহার দিই। তিনি তা আমরণ নিজের কাছে রেখে দেবেন। সমুদ্রে আলোড়িত অর্ণবপোত ডুবুরীদর্শনে যেমন আনন্দিত হয়ে ওঠে, আমিও তেমনি তাঁর শেষ কথাগুলিতে এক অপূর্ব আনন্দের আভাস পেলাম;—কিন্তু তার পর?

আমি আমার প্রাসাদশিখরে একটী কক্ষে বসেছিলাম, সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের 'লালকেল্লা' অতিক্রম করে আমার পিতার গৌরবর্ণিনীর অন্তঃপুরিকা (১) তকমের তোরণ অতিক্রম করে আমি সম্রাটের কাছে উপস্থিত হলাম। এই অন্তঃপুর তোরণ বিলাস হীরকখিচী দ্বারা নির্মিত। এখানে প্রত্যেকটি জিনিষ অতি সুন্দর, অতি উজ্জ্বল, অতি সহজ।—আমি ফতেপুর-সিকরীর বরসুরী স্মরণ করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলাম। যমুনার উপরিভাগে একটী ক্ষুদ্রকক্ষে ঝুলানো দোল বিস্তৃত করে আমার পিতা বিশ্রাম করছিলেন।

সম্রাটের মুখমণ্ডলে যেন একটা নিঃসঙ্গ ভাব। সাধারণ মানুষ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। এভাব আমি তাঁর যৌবনেও লক্ষ্য করেছিলাম। আমার সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্রই আমি ফতেপুর-সিকরীর একটী ফুল তাকে উপহার দিলাম। কৃতজ্ঞতায় তাঁর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। অতি সামান্য উপহারেও তিনি উল্লাস অনুভব করতেন। আমি ভাবলাম, এই কি সেই সম্রাট। প্রজাবর্গ কি তাঁকে মানুষরূপে ভালবাসতে পারেনি?

তিনি আমাকে বলেন, "আমি শাহজাদা দারার হস্তে সম্পূর্ণ শাসনভার অর্পণ করেছি। কারণ পরিপূর্ণ ক্ষমতায় অধিকারী হয়ে দারা তার পিতার মান রক্ষা করতে পারবে এবং তার পিতাকে ঔরংজেবের কারাগার থেকে উদ্ধার করতে পারবে।" এই আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর শীর্ণ মুখমণ্ডল রক্তোচ্ছ্বাসে স্ফীত হয়ে উঠেছিল। সুশিক্ষিত সৈন্যবলসহ সুলেমান শুকোর অনুপস্থিতি সম্রাটকে আতঙ্কিত করেছিল। রাজা জয়সিংহের উপদেশে সৈন্যবলসহ আগ্রার উপস্থিত না হয়ে সুলেমান কেন পাহ সুজার পশ্চাদ্ধাবন করেছিল।

আমি উত্তর দিই নি—শুধু চিন্তা করলাম। অম্বরাধিপতি রাজা জয়সিংহ একজন বিশ্বাসী সামন্ত। কিন্তু একদিন যারা তাঁকে 'শুজয়' গায়ক বলে উপহাস করেছিলেন। জয়সিংহ কি পাহ সুজাকে পলায়নের সুযোগ দিয়ে এই অপমানের প্রতিশোধ নেবে না? আমি আমার করপুটে আমার ললাট স্থাপন করলাম। কিন্তু আমার মনে হল যেন তার হস্তে আপেলের আস্বাদ গন্ধ নেই। দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে আমি সেই স্থান ত্যাগ করলাম।

প্রাসাদের উচ্চ শৃঙ্গ থেকে আমি বিশাল সৈন্যদলের একাংশ দেখতে পেলাম। এই সৈন্যদলটী অত্যন্ত দ্রুত সমবেত হয়েছে। অশ্বারোহীগণ বর্ম এবং পরিচ্ছদে সুসজ্জিত।

দলের পর দল সৈন্য চলেছে। সেই মুহূর্তে আমি কল্পনা করেছিলাম, জয় আমাদের সুনিশ্চিত। পরের দিন সন্ধ্যায় প্রত্যুষে চন্দ্রোদয়ে আমার রাখীবন্ধ ভাইয়ের সাথে তাজমহলের পাশে সাক্ষাৎ করতে যাব। পরের দিন আমি সংবাদ পেলাম যে ঔরংজেব ও মুরাদের সম্মিলিত

(১) মোগলদের মধ্যে ইউরোপীয় নারী অন্তঃপুরে রাখার প্রথা ছিল, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান এমন কি ঔরংজেবেরও ইউরোপীয় অন্তঃপুরিকা ছিল। সেই মহলের নাম ছিল ফিরিঙ্গী মহল।

সৈন্য অগ্রসর হয়ে আসছে। সম্রাটের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা সত্ত্বেও শাহজাদা স্বয়ং তাঁর পুত্র সুলেমানের আগমনের জন্য অপেক্ষা করেন নি। সর্বত্রই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

মিলনের সময় আগতপ্রায়। আমি আদেশ দিলাম যেন কয়েকজন দশস্ত্র প্রহরী উজিয়ের প্রবেশ পথ রক্ষা করে। বাদীর ও কোরেশ প্রাসাদের দাসুবেশে প্রহরীর কাজ করবে। তারপর আমি ধীরপদে সাইপ্রাস বীথির মধ্য দিয়ে বস্ত্রপরিসর পরিখার পার্শ্ব অতিক্রম করে সমাধির দিকে অগ্রসর হলাম। পলিত তাম্রাভপূর্ণ গভীর কূপের অন্তরালে অস্তায়মান সূর্যের শেষরশ্মি আগ্রার উত্তপ্ত বাতাসের মধ্য দিয়ে তার শেষ বিষাদে গ্রহণ করছিলেন। এই রক্তিমাভা কি কোন আসন্ন খাণ্ডবদাহের সূচনা করছে? সন্ধ্যার আকাশ এক অবর্ণনীয় প্রভাবে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর অপর তীরে ক্ষীণ নভোমণ্ডলে চন্দ্র উদিত হয়েছে। এর পূর্বে সাইপ্রাস বীথি কখনও এমন গভীর প্রেমাবদ্ধভাব ধারণ করেনি। এর পূর্বে তাজমহল কখনও সাইপ্রাস বীথির অন্তরালে এমন গভীর তীব্র শুভ্র রূপ পরিগ্রহ করে নি—এ যেন অপ্সরাপুরীর প্রাসাদ। পৃথিবীর কোথাও বাতাস এমন সুমিষ্ট গোলাপ ও পুষ্পগন্ধে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি, কোথাও পাখী এমন সুমিষ্ট স্বরে সঙ্গীত রচনা করে নি। বিহঙ্গকুল ইতস্ততঃ তাদের জীবনের সঙ্গীত বিভিন্ন বৃক্ষ-পত্রে লিখিত করে তুলছে।

আমি নিশ্চল, নিস্পন্দ, বিমুগ্ধ হয়ে উঠলাম। আমার মনে হল, আমার মাতা তাঁর অপূর্ব সৌন্দর্য-সুষমা নিয়ে অতীত দিনের চেয়েও আমার অত্যন্ত সন্নিকটে উপস্থিত।

সহসা পত্রপল্লবে ধ্বনিত হল—মোতিঝিলীর জলতরঙ্গের অন্তরালে পত্রনিয়ে কলবাদ্য ধ্বনিত হ'ল—"আমার সন্তান তোমরা, এই বিলম্বের কেন?" আগ্রার প্রাসাদের পশ্চাতে অতি ক্ষীণ জ্যোতিঃ বিকীরণ করে চন্দ্রিমা এলিয়ে প'ড়েছে। জননী, বিধাতা কি তোমাকে চাঁদতারা বংশের রাজমুকুটের চারিপার্শ্বে তেজোময় জ্যোতিষ্করূপে সৃষ্টি করেছিলেন শুধু ভারতবর্ষে এসে নিষ্প্রভ হ'য়ে যাওয়ার জন্য? তুমি যেদিন অন্তর্হিত হয়েছিলে, তোমার পশ্চাতে এসেছিল পাষাণের পর পাষাণ, মর্মরখণ্ড, মণিমুক্তা, শ্যামহরিতের অরণ্যখণ্ড—তাই সংযুক্ত করে প্রস্তরবদ্ধ রচিত হল তাজমহল। সম্রাট এই প্রস্তরখণ্ড সংযুক্ত করে রচনা করলেন, তাঁর নিজের সমাধি।(১) তুমিই একমাত্র তাঁকে সম্ভাষ দিয়েছিলে শক্তির। তারপর এসেছিল বহু নারী। তারা করল সম্রাটের শক্তির অপচয়।

আমি শুনতে পেলাম বিরাট অশ্বের খুর কখনও উচ্চগ্রাম, কখনও মন্দলয়ে। শুনতে পেলাম আমার পশ্চাতে মর্মর পথের উপর মৃদু পদধ্বনি—সেই চকিত পদক্ষেপের ভাষা আমি চিনি। আমি বাস্তবের সম্মুখে উপস্থিত হলাম—যেন একটী সঙ্গীত আমাকে বর্তমানের সম্মুখে টেনে এনেছে। আজকের সন্ধ্যার ছত্রপাল সম্পূর্ণ শ্বেতবসন পরিহিত। তাঁর বাহুতে হরিদ্রাভ বাজুবন্ধ। আমাকে অভিবাদনের সময় দেখতে পেলাম তাঁর উষ্ণীষনিবদ্ধ রয়েছে সম্পূর্ণ মুক্তাহার—যেন আমাকে দেখবার জন্যই এই আয়োজন।

আমরা পরিখার পার্শ্বে ক্ষুদ্র সরোবরের নিকটে উচ্চ আসনে উপবেশন করলাম। আসন্ন যুদ্ধের ব্যাপারে মনঃসংযোগ করা আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ছিল। রাও কখনও কোন হিন্দু সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশ পালন করেন নি। দারার সেনাপতিরূপে শাহজাদা দারার ক্ষমতা বিষয়ে তাঁর ধারণা অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। তিনি জানতেন, ত্রিশ সহস্র মোগল অশ্বারোহী সেন্য শত্রুর প্রতি প্রবল। অন্যান্য সৈন্যদলে ছিল—পাঠক, তুর্কী, চণ্ডাল, বরকন্দাজ—তারা কখনও যুদ্ধের স্পর্শ করে নি। তারা যুদ্ধবরণে অনভ্যস্ত—কিন্তু আগামী কাল প্রভাতে যুদ্ধযাত্রা অবধারিত। এই সিদ্ধান্তের অন্যথা নাই।

চম্বল নদী ছিল আমাদের গন্তব্যস্থল। এইখানেই বিরোধী সৈন্যদলের যুদ্ধক্ষেত্র স্থির হয়েছে। নদীর সমস্ত সেতু সুরক্ষিত। একমাত্র রাজা চম্পৎ রাওএর রাজ্যপ্রান্তে অবস্থিত সেতু অরক্ষিত। কারণ, রাজা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তাঁর রাজ্যের মধ্য দিয়ে শত্রু সৈন্য অতিক্রম করবার অনুমতি দেবেন না। ছত্রপাল মৃদুকণ্ঠে বলেছিলেন "অবশ্য যদি রাজা চম্পৎ রাও তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন।"

খলিলুল্লাখাঁর অপেক্ষা দুষ্ট শত্রু আর কেহ নাই। "রাও"এর স্থির বিশ্বাস ছিল যে খলিলুল্লা সত্যই অপকৌশলী। এই খলিলুল্লা খাঁর অধীনে ত্রিশ সহস্র অশ্বারোহী ন্যস্ত হয়েছে। "রাও" ক্ষুব্ধ বিরক্তির সুরে বলেন, "যদি শাহজাদা আজ মিষ্ট কথায় না ভোলেন, তবে ঔরঙ্গজেবের কামানের সম্মুখে অগ্রসর হওয়া কঠিন হবে না। তারপর তিনি আমাকে রাত্রির দ্বিতীয় যামের পূর্বে অনুরোধ করলেন—"শাহজাদী, আপনার ভ্রাতাকে আর একবার সতর্ক করে দিন।"

আমরা কিছুক্ষণ নীরব চিন্তায় অতিবাহিত করলাম। তারপর আমি বলে উঠলাম, "রাজপুত কি করবে? রাও রাজা,—আপনার বিখ্যাত অশ্বারোহীবাহিনী রাজা রামসিংহের সৈন্য, তারা কি করবে?" প্রত্যুত্তরে রাও কোন উত্তর দেন নি। (ক্রমশঃ)

(১) তাজমহলের বিপরীত দিকে যমুনার অপর তীরে শাহজাহান আরম্ভ করেছিলেন নিজের সমাধি রক্তপ্রস্তর দিয়ে। সেই রক্তবর্ণ সমাধি হবে সম্রাটের শৌর্য, বীর্য ও ঐশ্বর্যের প্রতীক। আর তাজবিবির সমাধি হবে শ্বেত শুভ্র মর্মরের—শুচি, শক্তি ও সৌন্দর্যের প্রতীক। দুইটী সমাধিকে সংযুক্ত করে যেবে একটী স্বল্পকৃষ্ণ মর্মরের সেতু। কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর হবে মৃত্যুর প্রতীক। শাহজাহানের সমাধি সম্পূর্ণ হয় নি, কারণ তার পূর্বেই শাহজাহান হলেন বন্দী, ঔরঙ্গজেব হলেন—বন্দী শাহজাহানের আবার বিলাস কেন? তবু মৃত্যুর পরে ঔরঙ্গজেব কৃপা করে শাহজাহানের মৃতদেহ তাজবিবির পার্শ্বে সমাধিস্থ করবার অনুমতি দিয়েছিলেন। অনুগ্রহ বৈকি।

মর‍্যাল আর্মামেণ্ট

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্র বর্ম-চর্ম মায় এ্যাটম বম, এ সকল ত আছেই, উপরন্তু নৈতিক বর্ম-চর্ম ও অস্ত্র-শস্ত্রেরও বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতা সহরে আলোচনা—অস্ত্রশালা প্রতিষ্ঠা করিয়া নৈতিক যুদ্ধাস্ত্র সমূহ প্রস্তুত, পরীক্ষা ও প্রয়োগ সম্পর্কে গবেষণা চলিতেছে বলিয়া শুনিতেছি। ধরিয়াম ঘাটী হইতে পাকিতে হয়। যুদ্ধ-বিশারদগণও সেই জন্যই ছাত্র সমাজকে যুদ্ধ সাজে সাজাইবার সঙ্কল্প করিতেছেন। ছাত্র সমাজের একাংশে নৈতিক অধঃপতন যে শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে এবং কলেরা, প্লেগ, বসন্ত প্রভৃতি মহামারীর মত শনৈঃ শনৈঃ বিস্তার লাভ করিতেছে, অজ লোকেও তাহা বুঝিতে এবং অন্ধেও তাহা চাক্ষুষ করিতে পারিতেছে। ছাত্র সমাজের যে অংশ পতিত, সেই অংশটি সত্য সত্যই সমাজের উৎকট শিরোবেদনার কারণ হইয়া পড়িয়াছে এবং যখন অথবা শোধন করিতে না পারিলে সমগ্র সমাজ-জীবন পঙ্গিল হইতে বাধ্য, তাহাতেও সংশয় নাস্তি। সমাজের যাঁহারা শিরোমণি, সমাজের যাঁহারা হিতকামী, দেশের শ্রী ও শ্রী সাধনে যাঁহারা বদ্ধপরিকর, তাঁহারা যে নিশ্চেষ্ট, নিরুদ্যম ও নিরুপায় জনসাধারণের ন্যায় নিশ্চল বসিয়া থাকিতে পারেন না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারি। তরুণ তুরুণে পতিত, পঙ্কিল সমাধি অবিবাহ্য বিবেচনায় দায়িক নিরুদ্যম থাকে না। সমাজপতিগণের শুভ প্রচেষ্টায় সাফল্য কামনা করিবে না, এমন লোক বোধ করি ভূমণ্ডলে নাই ; তাঁহাদিগকে বরণাদ্য না করিবে, এমন অর্বাচীন কেহ আছে কি ? মনে ত হয় না।

ছাত্র সমাজের অধঃপতিত অংশটি যদিও ক্ষুদ্র বা নগণ্য হইত, তাহা হইলে চিন্তার ও উৎকণ্ঠার এমন জ্বালাময়রূপে উৎকট হইত না। প্রেসক্রাফ রোগীদের মত সেগ্রিগেট্—বিচ্ছিন্ন করিবার উপায় থাকিলে এতখানি আতঙ্কিত না হইলেও চলিতে পারিত। ঘনকৃষ্ণাবৃত অম্বর বরণীতেও আকাশের নক্ষত্ররাজি বিরাজিত দেখিলে আশা থাকে যে, নিশাবসানে দিবালোক ফুটিবে কিন্তু অমানা দুর্যোগ এমনই ভীষণ যে, নক্ষত্রলোকের দেখাসাক্ষাৎও দুর্লভীক্ষ্য। বায়ুমণ্ডল স্তব্ধ। মানুষের চিন্তাগত প্রলয়-প্রভঞ্জনের প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহারই মাঝে পৈশাচিক অট্টহাসি। বিপ্লবের আভাস অনেককাল আগেই লক্ষিত হইয়াছিল ; শৃঙ্খলাহীনতাও নূতন নহে ; অন্যায়ের আগুন প্রহণও একটা বহু পুরাতন ব্যাধি ; কাজলাইয়া ব্যাধীর কাণ কাটিতে স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও শতাব্দী পূর্বে দেখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু, ছাত্র সমাজ আজ যেমনটাকে বেসামাল্লা অরাজকতা করিয়া তুলিয়াছে। শিব সতীর দেহ স্কন্ধে তাণ্ডব নৃত্য করিয়াছিলেন, কথন। রুদ্রের নৃত্যে তাল লয় ছন্দ লীলায়িত হয়, হোক ; কিন্তু অশিবরূপের নৈরাজ্যে ধরিত্রী যে উৎসন্ন—ছারখার যায়। যজ্ঞের পুরোহিতের শিখা কাটা পড়িল, দক্ষের কথা কি বলিব, কটীর কৌষিক বস্ত্র কটীচ্যুত হয়, নৈবেদ্যের চাল কলা ছোলা দাড়ি, ম দেবার ম বর্ষার মা ধনুস্তার ম গরদাগরদার, বালাময়, ছত্রাকার—ছড়াছড়ি হইতে লাগিল, নিরপরাধ বর্শকদল প্রাণ বোর খাইয়া ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে ছাড়িতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিল। বেচারা দক্ষরাজ ! স্ত্রীলোকে নিরীহ অজ-জনবীর মত ভ্যা ভ্যা করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর সমাজ আজ দক্ষযজ্ঞের দশা প্রাপ্ত হইয়াছে।

মন্দ লোকে মন্দ কথা বলিবেই। তাহারা বলে, কথাত বলিলে ডুবিয়া মরার কথাটা অলীক অথবা আলঙ্কারিক আখ্যা নহে। বিষ কৃষ্ণ আজ কল জন্মে না। পাহাড় যা চাপা থাকিতে পারে, কিন্তু সারে না। আজ মনে পড়ে, কেসী সাহেব তখন গভর্ণর। কোন্ রাজ সম্ভ্রম কোন্ রাজন বিজয়ের আশায় অকাল বোধনে বসিয়াছিল, লাল মাটি হইতে লাল (অথবা নীল) কমল না তুলিয়া আনিলে পূজার অঙ্গহানি হয়। মধ্যপথে —ধর্মতলায় কেন্দ্রীয় পুলিশী বীরচক্র বিচরণ প্রকট করিয়া পথ আগুলায়। সেদিন এমন লোক কি বঙ্গদেশে—কলিকাতায় একজনও ছিলেন না, যিনি এই সংবাদটি পরিবেশন করিতে পারেন যে, লালমাটিতে পদ্ম ফুটে না : বাহানি, বৃথা অভিযান ! ধর্মতলার কাল রাস্তা সেদিন রাঙ্গা হইয়াছিল। আর আজ ? আজ কেবল কলিকাতায় নহে, সারা দেশে, দূরে, প্রান্ত, গ্রামস্থ পল্লীগ্রামেও নরশোণিতস্নাত ধর্মতলা দেখিতে হইতেছে। সেদিন একে একে দুয়ে দুয়ে চারে চারে পাঁচে পাঁচে যা জনবীরা, যিনি বহিনেরা শুদ্ধান্তঃপুর পরিহরি ফুলে ফুলে পুষ্পে পুষ্পে চলদলো রঞ্জিনী করিয়াছিলেন, সেদিন আকাশে দুন্দুভি নিনাদিত হইয়াছিল, দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন, মানব ও দানবগণ নূতনত্বের আশায় তা ধিয়া তা ধিয়া নৃত্য করিয়াছিল। আজ যে কলিকাতার রাজপথে পুলিশ গুড়ুম গুড়ুম শব্দে বন্দুক চালাইয়াও "রাবণ বধের মর্ম, মেঘনাদ বধী—আমি কি তাহাই বলি, 'ক্যাডাল্যারাস্' রাজের ?" এ্যাক্টিং বাধাইতে অক্ষম হইতেছে, অভিনেত্রীকুলকে খেদাইতে পারিতেছে না, চিরকাল ভাল-মন্দ খাইতে অভ্যস্ত প্রমীলা-কুলও আজ বাড়িয়া আজ গুলি খাইয়া বিগত জীবন ধিক্ বরণীয়ন পড়িয়া থাকিতেছেন, ইহারও সূচনা কি সেই দিনই হয় নাই ? আজ, রাজনা দেশের বুকভরা বহু পল্লীর বহু মা'লবাটি হস্তে রণচণ্ডী মূর্তিতে আবির্ভূতা হইতেছে, ইহাও কি সেই পূর্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত নহে ? "যে যাবি সে যাবি তোরা, গিরিরাজ যায় রে।"—সেদিনের সেই গান কে শুনিয়াছিল কে ?

ছাত্র সমাজের বিরুদ্ধে প্রধান ও গুরুতর অভিযোগ, শৃঙ্খলাহীনতা। উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিতে দেখিতে চোখে সোকা পড়িয়া গেল ; নালিশ শুনিতে শুনিতে কাণ ঝালিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইতেছে ; অবিরত যে

মনীষীর, তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইতেছে না। সমাজপতিগণ যে বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাতেই বা বিস্মিত হইবার কি আছে? শিরোমণিগণ ছাত্র সমাজের জন্য নৈতিক বর্ম্ম-চর্ম্মের ব্যবস্থা দিয়াছেন, ভালই করিয়াছেন। ভগবান তাঁহাদের মঙ্গল করুন। ছাত্র সমাজের গায়ে না হয় মর্য্যাল অ্যাসিমেণ্টের লাট পাঞ্জাবী ফ্রক পেশি পরানো হইল, কিন্তু ছেলেদের বাবাদের জন্য কি ব্যবস্থা হইবে? প্রবেশে প্রবেশে এই যে মিলিট্রি মেকিং ও ব্রেকিংয়ের মিথ্যা নৈমিত্তিক লীলা খেলা চলিতেছে; এক সেট প্রাজ্ঞ ও প্রবীণ ব্যক্তি মসনদে বসিতে না বসিতে আর এক সেট বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি সাবধানে কোমর পোক্ত করিয়া লইয়া শনৈঃ শনৈঃ যে অগ্রসর হইতেছে, চরিত্র বলে যাহারা জনে জনে গান্ধীজী, ত্যাগ মাহাত্ম্যে যাহারা প্রত্যেকে হরিশ্চন্দ্র, কষ্ট-সহিষ্ণুতায় যাহারা এক-একটি স্থিরমে দণ্ডায়ন, যাহাদের যুদ্ধের বাপাটে ইংরাজ তেলা পোকা হইয়া ভারত মহাসমুদ্রে পথে ও পলায়তি করিয়াছে, তাহাদের দৃষ্টান্তগুলা পুখানুপুখ বিচারে কতখানি সহায়তা করিতেছে, তাহা কি ভাবিয়া দেখিবার অবসর কাহারও হইবে না? মর্য্যাল অ্যাসিমেণ্ট বড় ভাল জিনিষ। স্বার্থপরতন্ত্রতা অত্যন্ত নিন্দনীয়। সম্প্রতি জেনেরাল রাজাজী মহারাজ যখন আপনার বেলা আঁটি সাঁটি করিয়া মাহিনাটাকে আয়কর বিমুক্ত করিয়া লইলেন, জনসাধারণের মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়া সম্ভব, তাহা কি কিঞ্চিৎমা করিবার ফুর্সৎ মিলিয়াছিল? মন্ত্রী মহোদয়গণের পুরুষকারের সৌরভে কি কেন্দ্র, কি প্রদেশ সর্ব্বত্র সুরভিত, আমোদিত হইতেছে; আকর্ষণীয়তা, স্বজনপ্রিয়তা, আত্মীয়-পোষকতা ইত্যাদি এবং ইত্যাদির আলোচনায় রাস্তা ঘাট ট্রাম বাস হাট বাজারে কাণ পাতা দায় হইয়া পড়িয়াছে; আইন সভার ভিতরে বাহিরে ছি ছি ধ্বনি যেন বিদ্যুতচালিত সম্মার্জ্জনী করে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, ছাত্রসমাজ অঙ্গে মর্য্যাল অ্যাসিমেণ্ট ধারণ করিলে এগুলা বোধ করি আর শুনিতে পাইবে না। ইহাই কি আমরা আশা করিতে থাকিব?

মহাত্মা গান্ধী শিশু প্রশিক্ষণার্থীকে শুদ্ধ খাদি পরাইয়া, কারানলে (অর্থাৎ চেলের অলন্ত উনানে) পুড়াইয়া লইয়া ভাবিয়াছিলেন, মর্য্যাল অ্যাসিমেণ্ট গাত্র চর্ম্মের সহিত সহজাত বর্ম্ম হইয়া গিয়াছে। দোনা খাঁটি, আর ভয় নাই, পদস্খলন অসম্ভব। ভরসালোক ধরিয়া বাঁচিয়াছেন, তাই রক্ষা। যদি মানভূম জেলার সত্যাগ্রহে তাঁহার মত শিশুগণের কার্য্য কলাপ দেখিতে, তিনি নিজেই মাথুরাজকে সাদর আমন্ত্রণ দিয়া আনিতে চাহিতেন। ঘোষ বাবুজী রাজেন্দ্রপ্রসাদ হইতে মুরলীমনোহর প্রজাপতি মিশ্র সকলের অন্তরেই মর্য্যাল অ্যাসিমেণ্ট খক্ খক্ করিতেছে। বিহারের কংগ্রেস ও গভর্ণমেণ্ট প্রতিবিধানের আশা উচ্ছেদ করিয়াছে, ইহা সকলেই জ্ঞাত আছে, সত্যাগ্রহীদের ঠেকাইবার সময় লাথা ঘোষ হাজা করিবার জন্য প্রতিবিধান সাদরেও করিবার ব্যবস্থা করিতেও দেখা গিয়াছে। বিহারের স্বার্থ রক্ষার্থে এই যে কুৎসিত প্রেত লুতা, এই যে আশা-পাশ-জাল—ঘিনী হইতে পাটনা অজস্রতার ভাগ, ভাকাশী ও হুলস্থা, মর্য্যাল অ্যাসিমেণ্টের বর্ম্ম চর্ম্মগুলাকে বোধ হয় গণ্ডারের চর্ম্মের মতই দুর্ভেদ্য ও দুর্ভিত্রক্ষ্য করিবে।

সত্য সত্যই সে একটা কাল ছিল। তখন একদিন একটা ছেলে স্কুলের ক্লাস রুমের ভিতরে অথবা বাহিরে ঘাসেরও তলেও মা-কালোয়ার বাড়ু গোপাল মূর্ত্তিধারণ করিলে, স্কুলশুদ্ধ ছেলের অন্তর খাবি খাইত। যে আসামী, সে'ও বোধ করি কলস কলস চোখের জল ফেলিয়া বসুমতীর চরণ ধৌত করিতে করিতে এই কামনাই করিত, মা গো, ভূমিকম্পে একটু ফাঁক হও মা, এ পোড়ামুখ লইয়া আমি সেইখানে প্রবেশ করি। আর আজ হইলে, গোটা স্কুল বাড়ীটাই রাবণ রাজার লঙ্কা-পোড়া হইয়া যাইত।

প্রহসন মন্দ নহে। পৃথিবীময় যুদ্ধের সাজ সাজ রব উঠিতেছে। বিষময়, মায় ভারতবর্ষ-পাকিস্তান, ডিফেন্স বাজেট স্ফীত হইতেছে, এ্যাটম্ বম কেন ছাড়িয়াছিলাম, প্রয়োজন হইলে পুনরায় কেন না ছাড়িব এই ধর্ম্ম কথাও কথিত হইতেছে অথচ সকলেরই শান্তি—শান্তি—শান্তির সন্ধানে পৃথিবী চষিয়া ফেলিবার উপক্রম। এই যে কলিকাতা নগরে মর্য্যাল অ্যাসিমেণ্টের রাস্তা-খুরা উঠিতেছে, ইহাই কি একটা কম কাণ্ড? বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলেজে, স্কুলে, যেখানে যাইবে, যে দিকে চাহিবে, দেখিবে, এক দল অন্য দলকে ঘোল ঠাসা করিবার জন্য অহর্নিশ পাঁয়তাড়া কষিতেছেন; অধ্যক্ষে অধ্যাপকে বা কুষ্ঠকা সম্পর্ক স্থাপিত। কমিটিতে কমিটিতে তাল ঠোকাঠুকি, মাষ্টারে মাষ্টারে সাপে বেউলে। একদল মাষ্টার জো করিয়া একটা হরতাল ডাকিয়া ফেলিল; অন্য দল খড়াৎ করিয়া একটা হাজার-ষ্ট্রাইক প্রায়োপবেশনে বসিয়া যাইবে। আর যিনি সর্ব্বাধ্যক্ষ, তিনি কতবার বিষ জরণ করিয়া বিষবাণীর শিক্ষা দীক্ষার সম্প্রসারণ করিতে পারেন, উদরান্ত তাহার তদ্বির করিতেই গলঘর্ম্ম।

আমরাই চোখে দেখিয়াছি, সেকালে একজন ডেপুটীর সামে পাশ খাওয়ার খবরটা কাণাঘুষায় বাহির হইয়া পড়ায়, লোকটা কিছুদিন শরীর অসুখ, স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভঙ্গ, ছেলেমেয়ের বাতশ্লেষ্মা-বিকার, ক্যাজুয়াল লিভ; সিক্ লিভ, লিভ অন্ এ্যাপোয়েন্টমেণ্ট লে, উইথাউট লে করিয়াও, চাপা হাসি ও ঠারে ঠোরে কথা বন্ধ করিতে পারিল না, তখন চাকরীতে ইস্তফা দিয়া অজ্ঞাতবাস সুরু করিয়া দিল। আর, আজ? আজ "চোরের মা'র বড় গলা।" "যায়ারও কলায়"—"আমারও কলায়।" আজ চাপা হাসি কে হাসিবে? ঠারে ঠোরে কথা কে বলিবে? আর, বনবাস, অজ্ঞাতবাসই বা কে যাইবে? কাহার দায়?

মর্য্যাল অ্যাসিমেণ্ট যখনি করিতেই হয়, সর্ব্বাগ্রে উপর-তলাতেই করিতে হইবে। কিন্তু তাহার পথেও বিষম বিঘ্ন। বেরালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবে কে? সদুপদেশ বিতরণের, বাণী ও বিবৃতি প্রদানের সর্ব্বস্বত্ব ও তাঁহাদের দ্বারা সংরক্ষিত; কথকতা করিবার ভার তাঁহারা কয়জনই তাগাতাগি করিয়া লইয়াছেন, কথা শুনিবার দায় ও তাঁহাদের নহে। তাঁহাধিপকে কথা বলিবে হেন সাধ্য কাহার? বলিলেও, তাঁহারা শুনিবেন কেন? মুস্কিল হইয়াছে এই যে, তাঁহারা আপিসের মুখ দেখেন না, সকলোকুলও যাঁর অঙ্গে পরশন আঘ্রাণ করেনা। বুড়া গান্ধী বুঝাই চেঁচাইয়া গিয়াছেন ৮৮ নাইটের আলোটা আপনার ভিতরে

দেখিতে। যাহারা আর্ল, তাহারাই যে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে গড়াগড়ি যাইতেছেন, ছাত্রসমাজ কাহার পানে চাহিয়া যাত্রা বিরতি ও পুনর্যাত্রা করিবে? যত ঘটা-পটা করিয়াই মন্ত্রাল আমামেণ্ট প্রস্তুত ও বিতরিত হৌক, কি জানি কেন, ভরসা করিবার কোনও ভরসাই ত পাই না। শেষ কোথায়, তাই বা কে জানে!

এক কালে, অবৈজ্ঞানিক চিন্তা করিতাম, মানুষ বুঝি দু-বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাইলে, জীবন যাত্রার অভাবের তাড়না না থাকিলে, চুরী করিবার, খুন খাইবার, প্রতারণা করিবার দুষ্প্রবৃত্তি না হইতেও পারে। এই ধারণা যে কত অসার, তাহা ত এক্ষণে প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতে পারিতেছি। আজ, ধনবান ও বিত্তবান চোর ডাকাতই ত মাথার মণি; পাপ যত বড় ও যত ভারী, তুলের দুয়োর তত বেশী; চালের বেসন দোকান হইতে সিভিলিয়ন যাজ, প্রতারণা যেন ললিত কলা শিল্প সাধনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সভ্যজগৎ তাহার বিপুল ঠাট বজায় রাখিতে, তাহার শোভা ও সৌষ্ঠব রক্ষণে তৎপর; ক্ষয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে তাহা সতত ধ্রুব, স্বতঃসিদ্ধভাবেই ঘর বাড়িয়া চলিয়াছে। ঘরের চাপে কত লোক পিষ্ট, কত বা উৎসন্ন, কত বা মৃত, সে ভাবনা তাহার নহে। তাহার ব্যবস্থাপনায় ত্রুটী যা ছিদ্র না থাকে, সেই দুশ্চিন্তাই প্রবল। বিশ্ববিদ্যালয়েও সেই কথা। স্কুল কলেজেও তাহাই। আর্ট ফর আর্টস সেক্। হার্টের অস্তিত্ব অবলুপ্ত। হার্ট যদি না থাকিল, মন্ত্রাল আমামেণ্ট ধারণ করিবে কোথায়? মানুষের অন্তর স্পর্শ করিবার মন্ত্র আজ কে জানে? কে-ই বা সে মন্ত্রে দীক্ষা দিতে পারে?

স্যাড্ সঙ্

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

যে-কাজ করিয়া মানুষ নিজে আনন্দ পায় এবং অন্যকে আনন্দ দিতে পারে, সে-কাজের একটা বিচিত্র নেশা আছে। উপরন্তু সেই কাজে যদি স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ হয় তাহা হইলে তো সোনায় সোহাগা। এরূপ কাজ করিবার সৌভাগ্য সকলের ঘটে না।

সোমনাথ নিজের কাজে মন হইয়া গিয়াছিল। সিনেমা জগৎ একান্তভাবে তাহার নিজের জগৎ হইয়া পড়িয়াছিল। বাহিরের চিন্তা তাহার মনে বড় একটা আসিত না। কদাচিৎ বন্ধুর কথা মনে আসিলেও সে তাহা জোর করিয়া দূরে সরাইয়া দিত। বন্ধু প্রায়শঃই ফল, তাহার চিন্তায় উদাস হইয়া থাকিলে সাহেব ফল মাটিতে পড়িবে না, কেবল মন খারাপ হইয়া যাবে। তার চেয়ে বরং যে-ফল ভাগ্যদেবী তাহার হাতে তুলিয়া দিয়াছেন তাহাই প্রসন্নমনে বহুমানে গ্রহণ করাই তাহার জীবনের চরম সার্থকতা।

সোমনাথের পরিচালনায় প্রথম ছবি বাহির হইবার পর বৎসরের ঢাকা ঘুরিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় ছবি বাহির হইল প্রথমটির মতোই জনপ্রিয় হইয়াছে। সোমনাথ এখন তৃতীয় ছবির শুটিং লইয়া ব্যস্ত।

মাঘ মাসের আরম্ভ।

পৌষ মাঘ মাসে শীত পড়িবার কথা। কিন্তু বোম্বাই প্রদেশে সহ্যাদ্রির পশ্চিম দিকে শীত বলিয়া কিছু পড়ে না; আমাদের দেশে আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে যেরূপ ঠাণ্ডা পড়ে, সেইরূপ একটু মোলায়েম ঠাণ্ডা বোধ হয় মাত্র। কিন্তু এ দেশের লোক, বোধ করি শীত বস্তুর মর্য্যাদা রক্ষার জন্যই, এই সময় মোটা মোটা গরম জামা পরিয়া বেড়ায় এবং রাত্রে লেপ গায়ে দেয়।

ছবির শুটিং করার পক্ষে এই সময়টি অতি মনোরম, অথচ শনিবারে কোনও কাজ হয় না। শনিবারে মহালক্ষ্মীর মাঠে ঘোড়দৌড়; সেদিন সিনেমা সম্পর্কিত নরনারীর মন এবং পবনের অজ্ঞাতসারেই মাঠের অভিমুখে ধাবিত হয় এবং সিনেমার ষ্টুডিওগুলি অধিকাংশই শনিবারে কাজ বন্ধ রাখিয়া রবিবারে কাজ করে।

এইরূপ একটী শনিবারে সোমনাথ ও পাণ্ডুরঙ ষ্টুডিওর অফিস ঘরে বসিয়া অলসভাবে গল্প করিতেছিল। শুটিংএর কাজ সাতটা বাজার মতো নিরবধির যন্ত্রদলের সহিত চলিতেছে। আজ তাহাদের ষ্টুডিওতে আসার কোনও প্রয়োজন ছিল না, শুধু অভ্যাসের টানে তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং অলস বাক্যালাপে দিনটা কাটাইয়া দিতেছে। ঘোড়-দৌড়ের প্রতি তাহাদের আসক্তি ছিল না।

অপরাহ্ণের দিকে একটি লোক দেখা করিতে আসিল। লোকটির নাম কৃষ্ণবিহারী লাল। ভারী গড়ন, মাঝারি মুখ, বয়স পঁয়ত্রিশের বেশী নয়, কিন্তু মাথার চুল অর্দ্ধেক পাকিয়া গিয়াছে। লোকটিকে দেখিয়া খুব বুদ্ধিমান মনে হয় না; বড় বড় চোখে যেন একটা অসহায় হারাইয়া-যাওয়া ভাব। তাহার পোষাক দেখিয়া তাহার আর্থিক অবস্থাও সমৃদ্ধ বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ ঘটে না।

কৃষ্ণবিহারী আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইতেই পাণ্ডুরঙ বলিয়া উঠিল,—'আরে কৃষ্ণ বিহারী! কি খবর তোমার?'

কৃষ্ণবিহারী হাসিয়া বলিল,—'এই আপনাদের কাছে এলাম, যদি কোনও কাজ-টাজ থাকে—'

পাণ্ডুরঙ বলিল,—'কিন্তু শুনেছিলাম তুমি সিনেমার কাজ ছেড়ে দিয়ে মুদির দোকান খুলেছ!'

কৃষ্ণবিহারী একটু লজ্জিতভাবে বলিল,—'মুদির দোকান খুলেছিলাম

সত্যি। কিন্তু বন্ধুমহলে সবাই যারে ভিলিন নিতে লাগল, তারপর টাকা দিলে না। দোকান উঠে গেল। তাই এখন আবার সিনেমায় ফিরে এসেছি। পেট তো চালাতে হবে, বোঝোনি।' তারপর সোমনাথকে বলিল,—'আপনি নতুন ছবি আরম্ভ করেছেন, ভাবলাম খোঁজ নিয়ে আসি আমার জন্যে ছোট খাটো পার্ট যদি কিছু থাকে।'

সোমনাথ পাণ্ডুরঙের পানে তাকাইল, উত্তরে পাণ্ডুরঙ একটু ঘাড় নাড়িয়া সঙ্কেত করিল সে কুঞ্জবিহারীকে লওয়া যাইতে পারে।

সোমনাথ তখন বলিল,—'সব পার্টই প্রায় বিলি হয়ে গেছে। আপনি কাল আসবেন, দেখি যদি কিছু দিতে পারি।'

কুঞ্জবিহারী প্রস্থান করিলে সোমনাথ বলিল,—কি বল পাণ্ডুরঙ? দু'টি পার্টের এখনও লোক দেওয়া হয়নি, এক পাগলের পার্ট, আর এক পুলিস ইন্সপেক্টর। তোমার কুঞ্জবিহারী অভিনয় করে কেমন?'

পাণ্ডুরঙ বলিল,—'চলসই।'

'তাহলে পাগলের পার্ট ছোট হলেও শক্ত; ভাল লোক চাই। ও ইন্সপেক্টরই করুক তাহলে।'

'হ্যাঁ, ইন্সপেক্টর কোনও রকমে চালিয়ে দেবে। কুঞ্জবিহারী অভিনয়ের বড় কিছু বোঝে না, কিন্তু লোকটা ভাল। এখন অনেক বদলে গেছে; সাত বছর আগে প্রথম যখন সিনেমায় ঢুকেছিল তখন ওর চরিত্র অন্য রকম ছিল—আরও উৎসাহ ছিল, উচ্চাশা ছিল—এখন যেন একেবারে নিভে গেছে।' কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পাণ্ডুরঙ বলিল,—'ওর জীবনের যতটুকু জানি তাতে বেশ একটি মজার ট্রাজি-কমেডি হয়, কমেডির ভাগই বেশী। কে জানে, হয় তো সব মানুষের জীবনই তাই, আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই না—'

গল্প আরও বুঝিয়া সোমনাথ দুই পেয়ালা চায়ের ফরমাস দিল।

অতঃপর চা পান করিতে করিতে পাণ্ডুরঙ কুঞ্জবিহারীর জীবনের যে কাহিনী বলিল তাহা এই—

কুঞ্জবিহারী হায়দ্রাবাদের লোক। পাড়াগাঁয়ে মানুষ হয়েছে, লেখা-পড়া বেশী শেখেনি। প্রথম যখন বোম্বাই এসেছিল তখন সহরে আদব কায়দাও ভাল জানতো না। কিন্তু কী তার আগ্রহ, কী তার উৎসাহ! তার দেহাতি ভাব দেখে হাসি পেলেও তার আগ্রহ আর উত্তেজনাকে এড়াবার উপায় ছিলনা। সিনেমায় হিরোর পার্ট করবে বলে সে বোম্বাই এসেছিল, হিরোর পার্ট না ক'রে সে ছাড়বে না।

তখন কুঞ্জবিহারীর বয়স কম ছিল। মাথায় চুল পাকেনি, চেহারাও ওরই মধ্যে ছিমছাম। কোনও রকম যত্ন খেয়াল ছিল না; একটা চৌলে ঘর ভাড়া ক'রে থাকত, আর ইডিওতে ইডিওতে হিরো হবার উমেদারি ক'রে বেড়াতো।

কিন্তু হিরো সাজতে গেলে গুণ চাই, নয় তো মুরুব্বি চাই। কুঞ্জ-বিহারীর কোনটাই ছিল না। তাই তাকে হিরোর পার্ট দিতে কেউ রাজি হলনা। বাধ্য হয়ে কুঞ্জবিহারী ছোটখাট পার্ট করতে লাগল। কিন্তু সে আশা ছাড়ল না; হিরো সাজবার অক্ষিলিত লক্ষ্য নিয়ে লোকের মতো লেগে রইল।

আমি তখনও সিনেমার ইডিওতে ঢুকিনি; কোথাও বাঁধা কাজ করিনা। সব ইডিওতেই যাতায়াত ছিল। সেখানেই যেতাম, দেখতাম ডিরেক্টরের কাছে কুঞ্জবিহারী পক্ষীর মতো বসে আছে। সব ডিরেক্টরই মনে মনে উত্যক্ত হয়ে উঠেছিল; কিন্তু আমাদের ডিরেক্টরদের আর যে দোষই থাক না কেন, মোসাহেবকে পষ্ট কথা বলে বিদেয় করে রেখে এমন লোক তারা নয়। কুঞ্জবিহারীও অস্পষ্ট আশ্বাসের মিথ্যে কুহকে ভুলে তাদের পিছনে লেগে রইল।

এই ভাবে বছর তিনেক কেটে গেল।

সিনেমা সমাজের সবাই খোলাখুলি ভাবে কুঞ্জবিহারীকে টিটকিরি দিত; কিন্তু সে গায়ে মাখত না। আমার সঙ্গে তার খুব বেশী ঘনিষ্ঠতা ছিল না; কিন্তু আমি কোনও দিন তাকে টিটকিরি দিইনি বলেই বোধ হয় সে মাঝে মাঝে আমার কাছে তার মনের কথা বলত। কখনও বলত,—'বোঝলি, এবার সব ঠিক ঘরে গেছে; অমুক ডিরেক্টর পরের ছবিতে আমাকে হিরোর পার্ট দেবেন বলেছেন। তার মেয়ের বিয়েতে আপনি তো গিয়েছিলেন; দেখেছিলেন তো আমার হাতেই তিনি সব কাজের ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমার ওপর খুব খুশি হয়েছেন। এবার আর কথাবে না।' আবার কখনও বলত,—'অমুক ডিরেক্টর বলেছেন, পরের ছবিতে ঠিক আমার মতো চেহারার হিরো তাঁর চাই। এ ছবিতে তাই তাঁর শালিহরে ছোট পার্ট ক'রে দিচ্ছি।'

তার কথা শুনে হাসিও পেতো, আবার সবাই মিলে তাকে খানার বানাচ্ছে দেখে রাগও হত। একদিন আর থাকতে না পেরে আমি বললাম,—'ভাগো কুঞ্জবিহারী, একটি কাজ যদি করো তা হলেই তুমি হিরো হতে পারবে, নইলে কোনও আশা নেই।'

আগ্রহভরে কুঞ্জবিহারী বলল,—'কি কাজ?'

বললাম,—'মেথেওনে একটি সুন্দরী তরুণীকে বিয়ে করে ফ্যালো। তবে তোমার বরাত ফিরবে।'

কুঞ্জবিহারী ভৎর্সনার সুরে বলল,—'বোঝলি, আপনিও আমাকে ঠাট্টা করছেন?'

বললাম,—'ঠাট্টা করিনি, সত্যি কথা বলছি।' দুটান্ত হাতের কাছেই ছিল, দু' তিনটে দৃষ্টান্ত দিয়ে বললাম,—'এরা কী করে বড় হল? স্রেফ বৌয়ের জোরে। তুমিও যদি ত্রিভুবন-বিজয়ী হতে চাও, তাহলে লজ্জা ত্যাগ করতে হবে।'

কথাটা যে কুঞ্জবিহারীর মনে ধরেছিল তার প্রমাণ পেলাম মাস ছয়েক পরে। মাঝে কয়েক মাস তার দেখা পাইনি, ভেবেছিলাম সে বুঝি হতাশ হয়ে সিনেমার কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। হঠাৎ একদিন একটা ইডিওতে গিয়ে দেখি, কুঞ্জবিহারী বসে আছে, তার সঙ্গে একটি তরুণী।

কুঞ্জবিহারীর মুখে গালভরা হাসি। আমাকে দেখে সগর্বে পরিচয় করিয়ে দিল—'ইনি আমার স্ত্রী—রোহিণী দেবী।'

রোহিণী দেবীর চেহারায় চটক আছে; চোখে চটুল চাউনি, বয়স

উল্লিখিত। তাকে সিনেমা ক্ষেত্রে আগে কখনও দেখিনি ; অবাক হয়ে গেলাম।

কুঁজবিহারীকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করলাম—'এটিকে কোথেকে যোগাড় করলে ?'

কুঁজবিহারী তখন তার স্ত্রী সংগ্রহের ইতিহাস বলল।

রোহিণী কুঁজবিহারীর গাঁয়ের মেয়ে—বিধবা। গাঁয়ের মেয়ে হলেও একটা তার ছিল সহরে—প্রতিপত্তি। তার মামার বাড়ী সহরে, সেই সে মামার বাড়ী যেত, সহরের আবহাওয়াতে আধুনিক দুনিয়ার পরিচয় পেয়েছিল—ঘুরিয়ে কাপড় পরতে পারতো, পান খাইতে শিখেছিল—

রোহিণীর গানের কথায় কুঁজবিহারী উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল,—'ওর স্যাড্ সঙ্, যদি একবার শোনেন, বোম্বাই, মনে যাবেন। অমন স্যাড্ সঙ্, সিনেমায় আর কেউ গাইতে পারেনা।'

গাঁয়ের রসিক ছোকরারা রোহিণীর স্যাড সঙ্ শুনেছিল, সকলেরই তার ওপর নজর ছিল। কিন্তু বিধবাকে বিয়ে করতে কেউ রাজি ছিলনা। তাই রোহিণীর যৌবন স্যাড সঙ্ সত্ত্বেও গাঁয়ের আবহাওয়াতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

এমন সময় কুঁজবিহারী গাঁয়ে ফিরে গেল। রোহিণীর সঙ্গে তার দেখা হল, স্যাড সঙ্ শুনে সে মনে মনে ! আমি কুঁজবিহারীর বন্ধুকে যে বীজ বপন করেছিলাম তা অঙ্কুরিত হয়ে উঠল।

কিন্তু গাঁয়ে কুঁজবিহারীর খুড়ো আছেন, তিনি বিধবা বিবাহের প্রস্তাবে মার—মার করে উঠলেন। গাঁয়ের মোড়ল তিনি, এমন অনাচার কখনই ঘটতে দেবেন না। রোহিণীর বাপের মনে যদি বা একটু ইচ্ছে ছিল, বেগতিক দেখে তিনিও রুখে দাঁড়ালেন, মেয়েকে দু'এক ঘা শাসন করলেন।

কুঁজবিহারী কিন্তু নাছোড়বান্দা। তাকে সিনেমার হিরো সাজতে হবে, রোহিণীর মতো একটি বৌ তার চাইই। লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের দেখা শোনা হতে লাগল। রোহিণীও সিনেমার নামে পাগল। বিএ-টিবি রাজি, কাজেই জাতীরা আর কী করবেন ? একদিন গভীর রাত্রে কুঁজবিহারী রোহিণীকে নিয়ে গাঁ ছেড়ে পালিয়ে এল।

তারপর সহরে এসে আর্য সমাজী মতে তাদের বিয়ে হয়েছে।

আমি কুঁজবিহারীর পিঠ চাপড়ে বললাম—'শাবাস্, এবার আর কেউ তোমাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।'

তারপর কুঁজবিহারী মহা উৎসাহে স্ত্রীকে নিয়ে ষ্টুডিওতে ষ্টুডিওতে ঘুরে বেড়াতে লাগল। যেখানে যাই, দেখি সস্ত্রীক কুঁজবিহারী উপস্থিত, কখনও ওজবিনী ভাষায় ডিরেক্টরকে স্যাড সঙের মহিমা বোঝাচ্ছে, কখনও বা প্রডিউসারকে রোহিণী দেবীর গান শোনাতে গিয়ে নিজেই ঔরঙ্গজেব আওরঙ্গাবাদী হয়ে পড়ছে। রোহিণীর গলাটি অবশ্য মন্দ নয়। তবে অশিক্ষিত গলা ; বাজনে বসলে ভালই দাঁড়াতো।

যেখানায় ডিরেক্টরেরা বেশ্ বয়স হয়েছেন ; রোহিণীকে হিরোইনের ভূমিকায় নিতে অনেকেরই আপত্তি নেই। কিন্তু এদিকে কুঁজবিহারী বদ্ধপরিকর ; নিজে হিরোর পার্ট না পেলে সে রোহিণীকে হিরোইনের পার্ট করতে দেবে না। ডিরেক্টরেরা কাজেই পিছিয়ে যাচ্ছেন। কুঁজবিহারীকে হিরো করার মতো বুকের পাটা কারুর নেই।

কয়েক মাস এই ভাবে কাটল। কুঁজবিহারীর সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়। একদিন সে পান-তরা হাসি নিয়ে বলল,—'সব ঠিক করে ফেলেছি, বোম্বাই। আসতে বুধবার আমার ছবির মহরত।'

বললাম,—'বল কি ! কার ঘাড় মটকালে ?'

কুঁজবিহারী বলল,—'একজন ফিনান্সিয়ার পাকড়েছি।'

'বেশ বেশ। শেষ পর্যন্ত হিরো হয়ে তবে ছাড়লে !'

সে একটু অপ্রস্তুত ভাবে বলল,—'একটু গোলমাল হয়েছে, এ ছবিতে আমি হিরো হবনা। আমি ছবি ডিরেক্ট করব।'

'সে তো আরও ভাল। রোহিণী দেবী হিরোইন সাজবেন তো ?'

'হ্যাঁ।'

'আর হিরো ?'

'ফিনান্সিয়ারের ছেলেকে এবার হিরোর পার্ট দিতে হবে। তার বাবা টাকা দিচ্ছে—তাই—বুঝতেই তো পারছেন। এই একটা ছবি হয়ে যাক না, কিছু টাকা কামিয়ে নিই, তারপর নতুন কোম্পানী খুলব। কোম্পানীর নাম রেখে কুঁজরোহিণী চিত্রশালা। তখন—'

সিনেমার নেশায় ধনির ঘরে ঘরের বাস, সোনালি স্বপ্ন দেখা তাদের অভ্যাস। কিন্তু বোকা কুঁজবিহারীর জন্যে দুঃখ হল। তার ভবিষ্যৎ কোন পথে চলেছে স্পষ্ট দেখতে পেলাম—কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারলাম না। আহা বেচারা, জীবনে একটা সুযোগ পেয়েছে, কিছুদিন ভোগ করে নিক। কুঁজবিহারীর পরিচালনায় ছবি যে কেমন হবে তা তো বোঝাই যায়।

ক্রমে দু'চারটে গুজব কানে আসতে লাগল। কুঁজবিহারী ডিরেক্টর হয়েছে বটে কিন্তু আসলে সে সাক্ষীগোপাল ; ফিনান্সিয়ারের ছেলেই সব কিছু করে। ছোঁড়া ভারি ফুর্তিবাজ—নাম দীপচাঁদ। রোহিণী দেবীকে সে হাতের মুঠোয় রাখে এনে ফেলেছে ; তাদের ঘনিষ্ঠতা নাকি তোমাদের বীতিশাস্ত্রের সীমানা পেরিয়ে গেছে।

সিনেমার ক্ষেত্রে এটা কিছু নতুন কথা নয়। চারিদিকে ঝাঁচা-পেকো দেবতারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, নতুন মেয়ে দেখলে আর রক্ষে নেই। দীপচাঁদ যদি বা সাধু ব্যক্তি হত, অন্য কেউ না কেউ জুটে যেতই। তাছাড়া রোহিণীকে এক নজর দেখেই বুঝেছিলাম, চিরজীবন কুঁজবিহারীর ঘর করবে এমন মেয়ে সে নয়। পাড়াগাঁয়ের গণ্ডী ছাড়িয়ে সহরের উঁচু ধাপে ওঠবার জন্যে সে কুঁজবিহারীর সাহায্য নিয়েছিল, আবার কুঁজবিহারীর গণ্ডী ছাড়িয়ে আরও উঁচু ধাপে ওঠবার জন্যে সে অন্যলোকের সাহায্য নিতে পারে। যাদিনী এখন মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়েছে—

কুঁজবিহারী কিন্তু রোহিণীকে ভালবাসতো। কত ভালবাসতো তার পরিচয় একদিন পেলাম। তখনও রোহিণী আর দীপচাঁদের ব্যাপার কানাঘুষোয় মধ্যেই আছে, গোপনে টাই একেবারে ভেঙে

পড়েনি। সেদিন আমার কোনও কাজ ছিল না, ভাবলাম—যাই দেখে আসি কুঁজবিহারী কেমন শুটিং করছে। ষ্টুডিওর ভেতর ঢুকে, দেখি, সেটের ওপর গঙ্গা-কচ্ছপের যুদ্ধ বেধে গেছে। প্রথমটা ভেবেছিলাম বুঝি কুস্তির যুদ্ধ অভিনয় হচ্ছে; তারপর দেখলাম, না, সত্যিকার লড়াই চলেছে। ষ্টুডিওশুদ্ধ লোক ঘিরে দাঁড়িয়ে দেখছে।'

দাঁড়িয়ে দু'জনের মধ্যে একজন আমাদের কুঁজবিহারী, অন্য লোকটাকে চিনিনা। পরে জানতে পেরেছিলাম, একজন অভিনেতা। দু'জনে মরীয়া হয়ে লড়াই করছে; রক্তারক্তি কাণ্ড। যাহোক, আমি গিয়ে যুদ্ধ থামালাম, কুঁজবিহারীকে অতি কষ্টে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এলাম।

'কী হয়েছিল?'

কুঁজবিহারী তখনও গজরাচ্ছে; বলল,—'পাজি বজ্জাৎ সব! আমার বৌয়ের নিয়ে করছিল—রোহিণী দেবীর নামে কুৎসিত অপবাদ দিচ্ছিল—'

বললাম—'ঠাণ্ডা হও।' লোকের সঙ্গে মারপিট করলে বদনাম কমবে না, বাড়বে।'

সে হঠাৎ কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল,—'কী অন্যায় দেখুন তো, বৌদিকি। রোহিণী পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, ভাল মানুষ, এখনও সহরত দেখেনি; পুরুষের সঙ্গে কি ভাবে মেলামেশা করতে হয় ভাল জানেনা, তাই একটু বেশী ঘনিষ্ঠতা ক'রে ফ্যালে। তাই ব'লে তার নামে এতবড় মিথ্যে অপবাদ দেবে?'

বললাম,—'তারি অন্যায়। তুমি গায়ে মেখোনা।'

সে বলল,—'সত্যি বলছি আপনাকে রোহিণী ভারি ভাল মেয়ে। আমি ওর বেতাল দেখিনি। তবু কেন বাইরের লোক ওর দুর্নাম দেবে? কেন বলবে যে দীপচাঁদের সঙ্গে ওর—'

কুঁজবিহারী আবার ক্ষেপিয়া হয়ে উঠল।

সেদিন কোনও রকমে তাকে ঠাণ্ডাটুণ্ডি করলাম, কিন্তু ভবিতব্য কোথায়? কয়েকদিন পরে শুনলাম, দীপচাঁদ তাকে ছবির ডিরেক্টরের পদ থেকে বরখাস্ত করেছে, আর রোহিণীকে নিয়ে গিয়ে নিজের বাসায় তুলেছে।

তারপর কত রকম গুজব কানে আসতে লাগল। কুঁজবিহারী নাকি জোর ক'রে দীপচাঁদের বাড়ীতে ঢুকতে গিয়েছিল, দীপচাঁদের দরোয়ানেরা তাকে ঠেঙে তাড়িয়ে দিয়েছে। কুঁজবিহারী পুলিসে এত্তালা করেছে, এবার মোকদ্দমা করবে, ইত্যাদি। তারপর যা হয়ে থাকে—আস্তে আস্তে সব চাপাচুপি পড়ে গেল। কুঁজবিহারীর বৌ-চুরি এমন কিছু মহাভারী ব্যাপার নয় যে তাই নিয়ে লোকে চিরকাল মশগুল থাকবে।

অনেকদিন পরে আবার কুঁজবিহারীর সঙ্গে দেখা হল। ছোঁড়া কাকের মতো চেহারা, চোখে আধা-পাগল চাউনি। সেদিন প্রথম লক্ষ্য করলাম তার চুলে পাক ধরেছে।

তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম,—'কী আর করবে কুঁজবিহারী, দুনিয়ার এমন কত হয়। পুরুষের ভাগ্য আর স্ত্রীজাতির চরিত্র—'

সে বলল,—'রোহিণীর কোনও দোষ নেই। সে গাঁয়ের মেয়ে, তার কতটুকু বুদ্ধি? ঐ হতভাগা বজ্জাৎ দীপচাঁদ তাকে ভুলিয়ে—'

অতটা চন্দুখান করা আমার কাজ নয়; আমি সে-চেষ্টা করলাম না।

তারপর যথাসময় রোহিণীর ছবি বার হ'ল। এই ছবিই রোহিণী দেবীর একমাত্র কীর্তি, আর দ্বিতীয় ছবিতে নামবার অবকাশ তার ঘটেনি। বলা বাহুল্য ছবিটি বোম্বাইয়ে হপ্তাখানেক চলবার পর বন্ধ হয়ে গেল। বেশীদিন চলবার শক্তি তার ছিল না। তবে সিনেমা মহলে নবাগত রোহিণীর বেশ নাম হল।

এরপর একটা অলিখিত ঘটনা ঘটল। লোকে নানা কথা বলে; কেউ বলে দীপচাঁদ রোহিণীকে বিষ খাইয়েছিল, কেউ বলে রোহিণী আত্মহত্যা করেছিল। মোট কথা একদিন শোনা গেল রোহিণী মরেছে। উদীয়মানা অভিনেত্রীর অকালে মৃত্যুতে কাগজপত্রে একটু লেখালেখি হল।

ভাবলাম কুঁজবিহারীর দিক থেকে ঘটনাটা এখন কিছু মন্দ হল না; ভগবান যা করেন ভালর জন্যেই। রোহিণী যতদিন বেঁচে থাকতো কুঁজবিহারীর বুকের কাঁটা খচখচ করত। এ বরং ভালই হল।

মাস ছয় সাত পরে বাস ষ্টেশনে কুঁজবিহারীর সঙ্গে দেখা হল। তেমনি উস্কখুস্ক ভাব, মাথার চুল অর্ধেক পেকে গেছে। বললে সিনেমা ছেড়ে দিয়ে মুদির দোকান খুলেছে।

রোহিনীর কথা আর তুললাম না; কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে লাভ কি? একথা সেকথার পর জিগ্যেস করলাম—

'কোথাও যাচ্ছ নাকি?'

সে বলল,—'হ্যাঁ, একবার বোম্বিওলি যাচ্ছি।'

'হঠাৎ বোম্বিওলি? সেখানে কেউ আছে নাকি?'

কুঁজবিহারী একটু ইতস্তত করে বলল,—'না, সিনেমা দেখতে যাচ্ছি।'

আমি আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে আছি দেখে সে অপ্রস্তুত ভাবে বলল,—'রোহিণী দেবীর ছবিটা সেখানে দেখানো হচ্ছে—' বড় বড় সহরে তো ও ছবি আর দেখানো হয় না···রোহিণীকে অনেকদিন দেখিনি···তার স্যাড সঙ ও শুনিনি—'বলতে বলতে কুঁজবিহারীর গলা বুজে এল।

এই সময় লোকাল ট্রেন এসে দাঁড়াল। কুঁজবিহারী একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠে বসল।

পাণ্ডুরঙের গল্প শেষ হইবার পর সোমনাথ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর হঠাৎ বলিল,—'কুঁজবিহারীকে পাণ্ডুলের পার্টই দেওয়া যাক।'

পাণ্ডুরঙ বলিল,—'ও কিন্তু পারবে না।'

সোমনাথ বলিল,—'কেন পারবে না? আমরা ফেজ ঘষে ঠিক তৈরি করে নেব।'

পাণ্ডুরঙ বন্ধুর মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিল।

আয়ুর্ব্বেদীয় মানসিক চিকিৎসা

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এসসি
ও কবিরাজ শ্রীসতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য ভিষগরত্ন

একটি রোগীর গৃহে সকলে বিষণ্ণ ভাবে বসিয়া আছে। পাড়ার এক বিজ্ঞ লোক আসিলেন। তাঁহার মুখ প্রফুল্ল। সকলে একটু বিরক্ত হইল। তিনি দুটী একটী বন্ধার কথা—হাসির কথা তুলিয়া আসরটাকে হাস্যময় করিয়া তুলিলেন। লোকেরা চেষ্টা করিয়াও গুরু গম্ভীর মুখ ভাব রাখিতে পারিল না। এই সংক্রামক ভাব রোগীর মুখেও প্রকট হইল। যন্ত্রণা সত্ত্বেও তাহার মুখ ঈষৎ প্রফুল্ল হইল। বিজ্ঞ লোকটি যাইবার সময় বাটীর কর্ত্রীকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, রোগীর কাছে বাড়ি মুখ করিয়া থাকিতে নাই; আজকে, তাহার রোগ আরও বাড়িয়া যায়। কষ্ট করিয়াও প্রফুল্ল ভাব দেখাইতে হইবে।

পরীরের উপর মনের প্রভাবের একটি দৃষ্টান্ত :—ঘোষ মশায় বৈঠক খানার আরামে চেয়ারে বসিয়া সিগার খাইতেছেন। পাড়ার চাংড়া ছোকরা—বহু প্রার্থনার পাশ দিয়া বলিয়া গেল—শুনিয়াছেন আপনার কাবুল ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে—কাল থেকে পেয়েই বন্ধ করিয়াছে। নন্দবাবু পাশে বসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন ও-চাংড়া ছোঁড়াটা যা তা বলিয়া বেড়ায়। ডকের বিশেষজ্ঞ আজ্ঞায় মন দিলেন। এমন সময় সেন মহাশয় আসিয়া প্রায় আধাড় খাইয়া পড়িলেন। সর্ব্বনাশ! কাবুল ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে। আমার সর্ব্বস্ব গেল। এই শুনিয়া ঘোষ মশায় ও নন্দবাবুর পায়ীয়া বিলুপ্ত হইল। তাহাদেরও বহু টাকা ঐ ব্যাঙ্কে ছিল। নন্দবাবু মূর্চ্ছা গেলেন। ঘোষ মশায় কাঁদিতে লাগিলেন, চুল ছিঁড়িলেন; তাহার হৃদয়ের ধন ধন স্পন্দন হইতে লাগিল, চোখ ঘোলা অবিরল অশ্রু পড়িতে লাগিল। দেখা যাইতেছে, একই ঘটনা যখন বিষয় হইল না তখন এক রকম কাজ করিল। আর সেই ঘটনাই যখন বিষয় হইল তখন নানা শারীরিক ও মানসিক বিক্রিয়া প্রবর্ত্তিত করিল।

ইউরোপের এক খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে উপাসনা দ্বারা রোগ আরোগ্য করিবার প্রথা আছে।

মহাত্মা গান্ধীর উপাসনা দ্বারা রোগ আরোগ্য করিবার একটি গল্প প্রচারিত আছে। এক অসুখের সময় ডাক্তাররা মহাত্মার মূত্রে অম্ল জাতীয় পদার্থের আধিক্য দেখিয়া তাঁহার রক্ত মূলে ব্লুকোজ ইঞ্জেকসন করিতে প্রস্তুত হইলেন। মহাত্মা তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া বলিলেন, আজ আমাকে উপাসনা করিতে দাও—কাল যদি ভাল না হয় তখন প্রয়োগ করিও। গান্ধিজি মহাত্মা উপাসনা করিতে লাগিলেন। পরদিন ডাক্তাররা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে মূত্রের অম্লাধিক্য ভাব দূর হইয়াছে।

পাশ্চাত্য দেশে আজকাল মানসিক চিকিৎসার উপযোগীতার কথা স্বীকৃত হইয়াছে।

উপরে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের কথা বলা হইয়াছে। ফ্রান্সের লর্ডে নামক স্থানের পীঠস্থায় লোকে তারকেশ্বরে "হত্যা দেওয়া" প্রথায় উপাসনা করিয়া আরোগ্য লাভ করে। বেলমার প্রবর্ত্তিত বেলমেরিজিম চিকিৎসা বর্ত্তমানে হিপনটিজিম নামে রোগ আরোগ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। কুইয়ে প্রবর্ত্তিত অটোসাজেশন চিকিৎসার আজকাল চলিতেছে। ফ্রয়েড প্রবর্ত্তিত সাইকো অ্যানালিসিস চিকিৎসাও পাশ্চাত্য দেশে এবং এদেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এ সকল চিকিৎসার বিশদ বিবরণ লিখিতে গেলে ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধের প্রয়োজন।

আমাদের দেশেও বহুকাল হইতে নানাবিধ মানসিক চিকিৎসা প্রচলিত আছে। মাদুলি চিকিৎসা। ঝাড়ফুক চিকিৎসা। জল-পড়া চিকিৎসা। তারকেশ্বর ও বৈদ্যনাথে হত্যা দিয়া চিকিৎসা। দেবতার নিকট মানসিক করিয়া চিকিৎসা। বিবিধ স্বস্ত্যয়ন ও শান্তি পাঠ চিকিৎসা। সূর্য্যার্ঘ চিকিৎসা। চড়কে সন্ন্যাসী হইয়া চিকিৎসা। ইত্যাদি ইত্যাদি।

একটি বালকের উৎকট কাশি হইয়াছিল। কিছুতেই সারিতেছিল না। ডাক্তারী, কবিরাজী, হোমিওপ্যাথি ও বায়োকেমি সকল চিকিৎসাই হইয়াছিল। যখন উহাতে কোনও ফল হইল না তখন সমস্ত চিকিৎসা বন্ধ করিয়া "হরিরলুট" চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল। সন্ধ্যাবেলা বালকের মাতা বাটীর ছেলেদেরে ডাকিয়া একত্র করিয়া একখানা বাতাসা তুলসী তলায় নারায়ণকে নিবেদন করিয়া ছেলেদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতেন। মিষ্ট ও উৎসবপ্রিয় ছেলেদের আনন্দ কোলাহলে বাটী মুখরিত হইয়া উঠিত। আশ্চর্য্যের বিষয় ছেলেটি কয়েক দিনের মধ্যেই রোগমুক্ত হইল। বৈজ্ঞানিক ভাবে ইহার ব্যাখ্যা দিতে হইলে এইরূপ বলিতে হইবে :—

ছেলেটিকে রাত দিন ঔষধ খাওয়াইয়া ও অতিরিক্ত সাবধান রাখায় তাহার যে একটা গুরুতর রোগ হইয়াছে এরূপ ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহার আত্মশক্তিতে রোগ দূর করিবার ক্ষমতা লুপ্ত হইয়াছিল। ঔষধ বন্ধ হওয়ায় তাহার সেই শক্তি জাগ্রত হইবার সুযোগ পাইল। হরির লুটের আস্বাদনায় রোগীর ও বাড়ির লোকের মনে শান্তি ও আশার ভাব আসিল। শান্ত ও আনন্দময় ভাবে হৃদয় যন্ত্রের ক্রিয়া সুষ্ঠু ও দৃঢ় ভাবে হইতে থাকে—রক্তসঞ্চালন ভাল হয় রোগ-স্থানে উপযুক্ত মাত্রায় রক্ত ও উৎসাহ পুষ্টিকর ও শরীর রক্ষী বিবিধ কোষ (cellular) ও রাসায়নিক পদার্থ পায়। এবং রোগ আরোগ্যের

দিকে অগ্রসর হয়। একজন বড় ডাক্তারকে দেখিয়াছি, তিনি বাটীতে আসিলেই রোগী ও তাহার আত্মীয়স্বজনের মুখ আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। লোকের এই মানসিক ভাব ডাক্তারের কৃতকার্য্যতার একটি প্রধান অঙ্গ ছিল।

খুব ছোট ছেলের কি মানসিক চিকিৎসার ফল হয়? ছোট ছেলে তাহার মাতার ভাব পরিবর্ত্তন বেশ বুঝে ও লক্ষ্য করে। উদ্বিগ্ন ও বিষণ্ণ মাতা ছেলেটির মনের উপর নিজ ভাব সংক্রামিত করিতে পারে। তা ছাড়া উদ্বিগ্ন ও বিষণ্ণ ভাব মাতার দুধেরও এরূপ রাসায়নিক পরিবর্ত্তন করে যাহা শিশুর পক্ষে হানিকর। এমন কি যে গরুর দুধ শিশুকে খাওয়ান যায় তাহাকে যদি নিষ্ঠুর ভাবে রাখা হয় তাহা হইলে তাহার দুধেরও হানিকর রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে। প্রাচীন ঋষি-দিগের যে গো সেবার পদ্ধতি ছিল তাহা খুব ভালই ছিল।

হিন্দুদিগের বিবিধ স্বস্ত্যয়ন ক্রিয়া মানসিক চিকিৎসা হিসাবে উপকার করিয়া থাকে। স্বস্তি অর্থ—মঙ্গল অয়ন আশ্রয়। পূজা বা শাস্ত্র পাঠ দ্বারা লোকে যে রোগ বা অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অশান্তি দূর করিবার প্রয়াস পায় তাহাই স্বস্ত্যয়ন। যথা—দান, হরিঘট, নারায়ণকে তুলসীদান, দেবী পূজা করিয়া বিল্বপত্র দ্বারা হোম করণ, সত্যনারায়ণ পূজা, তারকেশ্বরে ও বৈদ্যনাথে হত্যা দেওয়া, কালিঘাটে মানসিক করা, চৈত্র মাসে গাজনের সন্ন্যাসী হওয়া এ সকলই স্বস্ত্যয়নের প্রকার ভেদ। নাগোজী ভট্ট কৃত চণ্ডি-টীকায় দ্বারাহীতপ্রবিহিত নিম্নস্থ স্তোত্রগুলি স্বস্ত্যয়ন কার্য্যে ব্যবহৃত হইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ভীষ্মপর্ব্বণি যা গীতা সা প্রশস্তা কলৌ যুগে।
বিষ্ণোঃ সহস্রনামাখ্যং স্তোত্রং পাপ প্রণাশনম্।
গজেন্দ্র মোক্ষণং চৈব তথা কারুণ্যকস্তবঃ।
নারসিংহং তথা স্তোত্রং স্তোত্রং শ্রীরাম সংজ্ঞকম্।
দেব্যা সপ্তশতী স্তোত্রং তথা নাম সহস্রকং। ইত্যাদি

স্বস্ত্যয়ন কার্য্যে এই সকল স্তোত্র প্রশস্ত:—গীতা, চণ্ডী, গজেন্দ্র মোক্ষণ স্তোত্র (ভাগবত) বিষ্ণু সহস্র নাম (মহাভারত) নারসিংহ স্তোত্র, রাম স্তোত্র, দেবীর সহস্র নাম স্তোত্র ইত্যাদি।

দীর্ঘকাল স্থায়ী জ্বরে যখন কোনও চিকিৎসায় ফল হয় নাই, তখন আতুর রোগীর জন্য চরক নিম্নস্থ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বিষ্ণুং সহস্রমূর্দ্ধানং চরাচরপতিং বিভুম্।
স্তবন্ নাম সহস্রেন ভয়াদ্ সর্ব্বান্নমোঽস্তুতে।

চরাচরপতি সহস্র মস্তক (গীতার বিশ্বরূপ) বিভু বিষ্ণুকে সহস্র নাম স্তোত্র দ্বারা পূজা করিলে সকল ভয় নষ্ট হয়।

পুনশ্চ:—

তস্মাৎ মাতাপিতৃণাঞ্চ গুরূণাং পূজনেন চ।
ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা দানেন নিয়মেন চ।
জপ হোম প্রণামেন চ বেদানাং শ্রবণেন চ।
জ্বরাদিমুচ্যতে শীঘ্রং সাধনাং ধর্ম্মস্য চ।

ব্যাখ্যা সহজ।

চরক যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসার্থে নিম্নস্থ মানসিক প্রয়োগগুলির ব্যবস্থা করিয়াছেন:—

সুহৃদাং স্বজনীয়ানাং প্রিয়বাদাক্ষ দর্শনৈঃ।
গীত বাদিত্র শব্দৈশ্চ শ্রোত্রতৃপ্তিকরৈশ্চ।
হর্ষণাশ্বাসনৈর্নিত্যং গুরুণাং সম্পূজনৈঃ।
ব্রহ্মচর্য্যেণ দানেন তপসা দেবার্চ্চনৈঃ।
শ্রুতাচারোপযোগেন মঙ্গলৈরবিহিংসয়া।
বৈদ্যবিপ্রার্চ্চনাচ্চৈব রোগ রাজো বিবর্দ্ধতে।

সুহৃদ ও স্বজনীয় স্ত্রী দর্শন, শ্রুতিসুখকর গীত বাদিত্র, হর্ষণ ও আশ্বাসন ক্রিয়া দ্বারা, গুরুগণের পূজা দ্বারা, ব্রহ্মচর্য্য তপস্যা ও দেবার্চ্চন দ্বারা, দান, আচার, অহিংসা ও জনমঙ্গল কার্য্য দ্বারা, বৈদ্য ও বিপ্র পূজা দ্বারা রোগ রাজ যক্ষ্মা বিবর্দ্ধিত হয়।

ছায়া-পথ

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

মনের আকাশে বিরাজ করিছে শাশ্বত ছায়া পথ,
ঐ পথ দিয়া নামে প্রতিনিশি দেবতার মায়ারথ।
ঐ পথ দিয়া কবি কল্পনা ধায় অনন্তধামে
ঐ পথ দিয়া বাণী বীণা হ'তে অমৃতের ধারা নামে।

ঐ ছায়া পথে দেবতা-নরের মধুর মিলন ঘটে,
সে মিলন বাণী তারায় তারায় রটে গগনের পটে।
সে মিলন বাণী ধ্বনিত বিশ্বে কাব্যে কথায় গানে
এই সুগোপন স্বপন বারতা কবিরাই শুধু জানে।

অভিনেতা

শ্রীমতিলাল দাশ

একাঙ্ক নাটক

শচীন্দ্র ভট্টাচার্য্য	প্রতিভাবান নাট্যকার
নরহরি সহকার	দুঃস্থ বেকার যুবা
মধুগোপাল বসু	শচীন্দ্রের বন্ধু, কবি ও লেখক

[পাটনার গঙ্গাতীরে মধুচক্র নামক সুরম্য পাষাণপুরীর একটী সুসজ্জিত কক্ষ—কোণে একটী সুন্দর পালঙ্ক—তাহার উপর কাগজপত্র ইতস্তঃ বিক্ষিপ্ত—দক্ষিণে একটী জানালা—জানালার মধ্য দিয়া গঙ্গা দেখা যাইতেছে। জানালা ছাড়াইয়া বারান্দার যাইবার বড় দরজা, তাহিনে কল-ঘর, মাঝে একটী চতুষ্কোণ টেবিল। তাহার দক্ষিণে টেলিফোন। যখন যবনিকা উঠিল তখন দেখা গেল—শচীন্দ্র বসিয়া তাহার নূতন রঙ্গনাট্য জয়যাত্রা লিখিতে ব্যস্ত—তাহার তাহিনে একটী খোলা টেলিগ্রাম পাখর চাপা দেওয়া রহিয়াছে—দূরে একটী খোলা তোরঙ্গ দেখা যাইতেছে—তাহার আশেপাশে নানা বিনিবস্ত্র ছড়ানো রহিয়াছে—সেগুলি সাজাইয়া গোছাইয়া তোরঙ্গ ভর্ত্তি করিতে হইবে। শচীন্দ্র ব্যস্ত মনে লিখিয়া চলিয়াছে—শচীন্দ্রের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, তবে জীবনযুদ্ধে তিক্ততার রস পান করিয়া সে বিরক্ত ও উদাসীন। এই-বিরক্তি তাহার অন্তরের সৌন্দর্য্যকে ঢাকিয়া তাহাকে রুক্ষতাপী কঠোর করিয়া তোলে—চোখে তার পাঁহুটে চশমা—হাতে পার্কারের কলম—আর লিখিবার লঘু-সংবদ্ধ কাগজগুলি নীলাভ—সুন্দর একটী গোলাপ-গন্ধ টেবিলের কোণে ঝুলের পড়িয়া রহিয়াছে]

শচীন্দ্র। (লিখিতে লিখিতে পড়িতেছে) নিভা—"উপেন, আমাদের বিবাহের রজ্জু ছিন্ন হয়েছে—আজ—।

উপেন। হাঁ, তা সত্যি, যা অবশ্যম্ভাবী তাকে মানাই ভালো—

নিভা। কি হলে তুমি চলে যাবে?

[এমন সময় টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। শচীন্দ্র রিসিভার তুলিয়া লইল] হালো, কে ম্যানেজার বাবু? হাঁ নমস্কার, ভাল—কি বলছিলেন? কে দেখা করতে চায়? গোপাল? কই এমন কোনও বন্ধু ত আমার নেই—ও: মধুগোপাল বসু—হাঁ তাকে পাঠিয়ে দিন।

[শচীন্দ্র রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া লেখা পড়িতে লাগিল]

উপেন। যাব—সত্যই ভেঙে যাবে এই মিলন-বাসর—এই আলো-হাসি, এই প্রেম-কৌতুক—নিভা, প্রাণের নিভা—

নিভা। আ, ও সব ভাকামি রাখ, কত টাকা চাই তোমার—

উপেন। কেন, তবে লাখ টাকা দেবে।

নিভা। লাখ, পাগল হয়েছ?

উপেন। হাঁ তোমার নূতন বন্ধুরা নিশ্চয়ই দিতে পারবে—

নিভা। উপেন!

উপেন। নিভা।

এমন সময় দরজায় টোকার শব্দ হইল। শচীন্দ্র মুখ না তুলিয়া বলিল—এস ভাই।

[মধুগোপাল ভিতরে প্রবেশ করিল—কবি, বয়স পঞ্চাশের নিকট তথাপি রসিকতা পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। হাসে, গানে, গল্পে সর্ব্বত্র সে আসর মাতায়]

মধুগোপাল। কেন ভাই, তারপর কেমন আছ—একযুগ পরে দেখা—তোমায় দেখা পেতে দেরে কিনা আসতে হল পাটনায়—হরি! হরি!

শচীন্দ্র। কলকাতায় ভাই বড় ব্যস্ত থাকতে হয়, শুধু নাটক লিখলে ত হয় না, চালু করতে যে কাঁড় খড় পোড়াতে হয়, তা তোরা বাইরে থেকে বুঝতে পারবে না দাদা। সে কথা থাক, আমার এই নির্জ্জনবাসের খবর পেলে কেমন করে?

মধুগোপাল। সে এক ভুলের কলম, তবু তারই মূল্য দেই—তাগ্যে আমি পথ হারালের অকূলে, নইলে এমন দেখা মিলত না হায় কোনও কালে—

শচীন্দ্র। "আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু পেখনু প্রিয়ামুখচন্দা—"

মধুগোপাল। পূজার ছুটির গোড়াটা কাটিয়ে এলাম দেরাদুনে—কালই এখানে এসেছি। পালিতদের ছেলে কি—ঐ যে বড় বাড়ী কয়লকুঁয়ায়—

শচীন্দ্র। না ভাই, আমি কাউকে এখানে চিনি না, কেউ আমায় চেনে না—তাই এসেছি এখানে—জয়যাত্রার যাত্রা হবে অবাধ।

মধুগোপাল। পালিতের বৌটি খুব সুন্দরী কিন্তু একেবারে বাঁদা—আমায় যে আসতে লিখেছে তা একদম ভুলে গেছে—আমার যে ঘর দেবে সে ঘর এখন জুড়ে রেছে তার খোকা ও খোকাপাটে—সেই ভিড়ে বাঁপিয়ে উঠতে হয়, কারেই আজ ভোরে এলাম মধুচক্রে মধু-আহরণে। ওরা বলল স্থান নেই—তাই নেই নাই নেই ছোট এ তরী, সুরমে তাই ফিরছি—এমন সময় ম্যানেজার বললেন—টেলিগ্রাম পেয়ে এক ভদ্রলোক বিকালের গাড়ীতে যাবেন—শচীন্দ্র ভট্টাচার্য্য—তাদেই ঘরটা পাবেন। নামটি শুনে স্মৃতির দুয়ার গেল খুলে—ফিরে এল হারানো বসন্তের সৌরভ—উৎসাহে গ্রহণ করলাম—কোন শচীন্দ্র—যিনি নাট্যকার—ম্যানেজার বললেন—হাঁ—তাই না শুনে তোমায় বিরক্ত করতে এলাম—দৈবের কি বিচিত্র যোগাযোগ—

শচীন্দ্র। খুসি হয়েছি দাদা। সত্যই খুব খুসি হয়েছি।

মধুগোপাল। কিন্তু দুটির মাঝখানেই তুমি কেন ফিরবে কলকাতায়—এস দুজনে এখানে বসে আড্ডা জমানো যাবে, আর যা নরঘরটীর সেবাও করা হবে—

শচীন্দ্র। না, দাদা, আমায় যেতে হবে। নাট্যভারতীতে আমার বইয়ের রিহার্সাল আরম্ভ হবে কাল। আমি না গেলে ওরা তালগোল পাকিয়ে ফেলবে—এই দেখ দাদা তার—লিখছে ভূপেশ রায়কে ওরা দেবে উপেনের পার্ট—ভূপেশের অভিনয় কি দেখেছ দাদা—ওকে দিয়ে লোকে অমন কেন ক্ষেপে যুখতে পারিনে—না আছে ওর অভিনয়কলা—না আছে তরী—কেবল গলার জোরেই বাজিমাত হয় না—

মধুগোপাল। ভূপেশ প্রাণবীন অভিনেতা—

শচীন্দ্র। ঠিক বলেছ দাদা, উপেন একান্ত আধুনিক—তাকে ফোটাতে পারে সে—যার আছে দুর্জ্জয় ব্যক্তিত্ব অথচ আছে কারুণ্যরসবোধ। এমন একজন অভিনেতা নির্ব্বাচন আমায় ছাড়া চলবে না। নাট্যভারতীর কর্ত্তা এদিকে ঘাদু লোক—কক্ষির মত নোয়ায় ত আবার ভাঙে না—কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা—যদি জয়যাত্রায় অভিনেতা আমার নির্ব্বাচন মত হবে—নয় আমি বই দেব না—এ যে কি একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড—তা তুমি আদৌ বুঝবে না—ব্যবসায় নটরূপৎ ও নাট্যলোক থেকে দাদা দূরে আছ তাদাই আছ ভালো—তুমি কবি, মনের আনন্দে খেয়ে বেড়াও—তুমি সুখী দাদা—

মধুগোপাল। অস্মোবয়ি কৃতার্থোঽস্মি।

শচীন্দ্র। কেন?

মধুগোপাল। কবিগুরুর পদই মনে পড়ছে—

নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস
ওপারে সকল সুখ আমার বিশ্বাস।

তোমাদের কাব্যনাটক্য আনে কীর্ত্তি, তার চেয়ে মধুরতর জিনিষ আনে অর্থ—আর আমরা ভাবুক বাঙ্গালীর মনে জাগাই মুক্তির ভাবের দোলনা, কিন্তু তার বদলে পাই লাঞ্ছনা ও হতাদর—

শচীন্দ্র। কিন্তু তোমার মত প্রসন্নতা নেই আমার—

মধুগোপাল। হাঁ তা বলতে পার—তবে সংসারে মানসিক যন্ত্র—মনে করলেই তুমি সুখী হতে পার—আমি কারও তোয়াক্কা রাখিনে, খাই দাই আর গান গাই—

শচীন্দ্র। তোকা আরামে আছ দাদা—

মধুগোপাল। যা বলেছ অতঃকিম; আর চাইনে কিছু—তাই দুঃখও আমায় বঞ্চনা করে না। কিন্তু এতদিন পরে দেখা—আয় আমাই চলে যাচ্ছ—এইটাই এই পূর্ণ মিলনের বর্ণাত্মিক ট্রাজেডি।

শচীন্দ্র। উপায় নেই দাদা—

মধুগোপাল। তুমি বুঝি লিখছিলে—

শচীন্দ্র। হাঁ, তৃতীয় অঙ্কটাকে নূতন করে বদলাচ্ছি—

মধুগোপাল। তাহলে ত ভারি অন্যায় করেছি—এমন করে বিরক্ত করা—যাও যেওয়া—

শচীন্দ্র। না তাতে আর কি হয়েছে—যাদের একটু বাধ হয়েছে তাদের পিছনে লোকের উৎপাত লেগেই আছে—ছায়া-ভারার রিপোর্টার এসেছিল—নটরাগ কোম্পানীর লোক চায় একটা নূতন রীতি নাটা—কিন্তু গান ত আমার আসে না—

মধুগোপাল। এখানে তোমায় সমবেদিতা করতে পারি তারা—(গুণ গুণ করিয়া গাহিল)

আমার মনের গোপন গুহায়
ফুটেছিল একটা কমল

না: তোমার কাজের ক্ষতি করব না—বিকালে যখন আসব, তখন তোমায় পাব কি—

শচীন্দ্র। হাঁ, আমি তিনটায় বেরিয়ে পড়ব—

মধুগোপাল। ঘরটা মন্দ নয়, কি বল? বাথ-রুম আছে ত—

শচীন্দ্র। (দেখাইয়া দিয়া) হাঁ ঐত, ঘরটা সত্যই সুন্দর—জানালা দিয়ে দেখবে গঙ্গার জলতরঙ্গ, দেখবে ঢেউয়ের লুকোচুরি খেলা—

মধুগোপাল। তাহলে আসি তারা—কলকাতায় দেখা হবে—তোমার ঠিকানা?

[শচীন্দ্র আপন কার্ড দিল—মধুগোপাল নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল] [শচীন্দ্র টেবিলে বসিয়া পুনরায় লিখিতে আরম্ভ করিল এবং লিখিতে লিখিতে আপন মনে কথা বলিয়া চলিল]

শচীন্দ্র। হাঁ কি লিখছিলাম—নিজার কথাগুলি বলাতে হবে—প্রেমের বেদীতলে যে নারী আপনাকে বিলিয়ে দিয়েছে—সে ঘর কথাকবি করবে এটা ঠিক হবে না—

নিজা। লাখ টাকা চাও উপেন? বেশ আমি দেব তুলাখ—

উপেন। (বিস্ময়াহত কণ্ঠে) দু লাখ, সে যে অনেক টাকা!—

এখন এমন কিছু একটা দিতে হবে যাতে দর্শকের মন জাগবে রহস্য, কৌতূহল ও আবেগ—যবনিকা পড়বার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তার মুখর ভরে উঠবে বেদনায় ও বিস্ময়ে—(পাদি ভাষিয়া)

নিজা। অর্থ দিয়ে প্রেমের মূল্য হয় না উপেন—যে নদী মরুপথে হারাল ধারা, তা হয়ার না—সেই প্রেমের মূল্য যে একান্তই অসীম—

ঠিক হয়েছে—এইখানেই পড়বে যবনিকা—(স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া শচীন্দ্র কাগজ গোছাইতে লাগিল—এমন সময় টেলিফোন ঝাজিয়া উঠিল)

হালো—কে? নরহরি সরকার—না তাকে ত আদৌ জানিনা! কি বলছে—কাগজের রিপোর্টার—আসতে পরিচয় দিন—

(টেলিফোন রিসিভারে রাখিয়া) শচীন্দ্র বলিল—নাঃ চুলটা ব্রাস করে নিতে হবে—পাঞ্জাবীটা কুঁচকে গেছে—এটাও একটু ঠিক করতে হবে—জয়যাত্রায় যাত্রা হবে দুর্জ্জয়—(এমন সময় দরজায় কড়া পড়িল) আসুন

নরহরি সরকার (প্রৌঢ় শীর্ণ ত্রিশ বৎসরের যুবা—পোষাকগুলি একান্ত সাধারণ, তবে বেশ পুরন্ত—হাতে একটা ছোট চামড়ার ব্যাগ)—ক্ষমা করবেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আপনাকে ডাক করছি—

শচীন্দ্র। (সম্মুখের চেয়ার দেখাইয়া দিয়া) নাঃ বসুন—কোন্ কাগজের রিপোর্টার আপনি—

নরহরি। (কুটিল ভাবে) আপনাকে সত্যি কথাই বলব—আমি কোনও কাগজের সংবাদদাতা নই—আপনার মত ধরায়া এখানে আছেন জেনে আমি মিথ্যা ভান করে এসেছি—ক্ষমা করবেন—আপনি একাস্তই মহাপ্রাণ। (মুখ অন্ধকার ভাবোদ্বেলিত করে) আমি যে দুরবস্থায় পড়েছি তাতেই এই ছলনার আশ্রয় নিয়েছি—তোক না কিছোর ছলনা অন্যুক্ত এটা ছলনা। কিন্তু সেটি যখন ধরা পড়েছে, তখনও সত্য মিথ্যার চুল চেরা বিচার সম্ভব নয়। আমার কাহিনী দুঃখের কিন্তু বাস্তব—আপনাকে তা শুনতে হবে—

শচীন্দ্র। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) কথায় বাধা দিয়া) আপনার কথা শুনতে পারছি না তার জন্য একান্ত দুঃখিত, কিন্তু আমার আদৌ সময় নেই—আমায় আজই যেতে হবে—আমার সব কাজ বাকি—আমাকে এখনই যেতে হবে

নরহরি সরকার। (হিংস্র উগ্রতায়) না, না আপনাকে যেতেই—

শচীন্দ্র। কিন্তু—

নরহরি। কিন্তু না, আপনাকে শুনতেই হবে—

শচীন্দ্র। আমি সত্যিই বড় ব্যস্ত—

নরহরি। প্রথমতঃ বসে পড়ুন—পড়ুন বলছি

শচীন্দ্র। কিন্তু দেখুন—

নরহরি। (টেবিলের বিরোধের অভিনয় করিয়া) বসুন, দয়া করে বসুন—

শচীন্দ্র। (ত্রস্ত বিস্ময়ে) অ্যাঁ—

নরহরি। শুনুন আমার ইতিহাস—(নরহরি চেয়ারে বসিয়া তাহার ব্যাগ টেবিলের উপর রাখিল)—রতনপুরের সরকারদের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই! ব্যবসায়ী কালের আভিজাত্য অর্জন করেছে আমাদের বংশ! কিন্তু আমাদের বংশের কেউ কেউ যোগ দিয়েছিলেন স্বদেশী আন্দোলনে। পলাবাজি তারা করেন নি, তাই বংশের কেউ তাদের খবর রাখে না—কিন্তু তারাই দুর্দিনের রবির—

শচীন্দ্র। দেখুন, আমি একান্ত ব্যস্ত—

নরহরি। বলতে দিন। বাড়ীর লোক চেয়েছিল আমি উকিল হই—কিন্তু আমি এই ব্যবসাকে একান্ত ঘৃণা করি—আমি চেয়েছিলাম সাহিত্যিক হিসাবে—ভেবেছিলাম হব একজন রবীন্দ্রনাথ কিংবা অন্ততঃ একজন শরৎচন্দ্র, কিন্তু সে আশা সফল হয় নি—সে হয়েছে আমার ঘর—আমার কল্পনায়—

শচীন্দ্র। কিন্তু—(উঠিয়া দাঁড়াইল)

নরহরি। চুপ করে বসুন বলছি (উন্মাদের উগ্রতা তাহার কণ্ঠস্বরে)—হাঁ তারপর চলল জীবন-সংগ্রাম—আমার লেখা নেয়না কাগজে, যারাও বা নেয় তারা নেয়না গল্পও—নাটক লিখলাম কিন্তু নটিদের পছন্দ হয়নি বা অন্য কেউ দেখল না সে রচনা—(টেবিল চাপড়াইয়া) আমি জানি আমার লেখার দাম আছে—নিরবধি কালের অপেক্ষা আমার পক্ষে সম্ভব নয়—শুনবেন দুএকটা আবৃত্তি?

শচীন্দ্র। ক্ষমা করবেন—কিন্তু আমার আদৌ সময় নেই—

নরহরি। বেশ তাই শুনলেন আবৃত্তি—আমার অতুলনীয় মৌলিক অসাধারণ শিল্পির তাড়নাও আজকাল পুরানো মনে হচ্ছেন—আজ চাই নূতন আঙ্গিক নূতন ভঙ্গী—কিন্তু আমাদের দেশে চলে গতানুগতিকার প্রবাহ—কি করব। নিরুপায় হয়ে গাইবার বাসনা হলাম—এখানে আছেন আমার ভগ্নীপতির মামাশ্বশুরের নাত-জামাই—টাকা নেই তাই পঞ্চ ভেড়ার মত এসেছি ১১১ নম্বর বাড়ীতে। অদৃষ্টের দুর্ভোগ আর কাকে বলে। এসে দেখলাম সেই আত্মীয়ের ঘরে—কিন্তু তিনি আমায় চিনলেন না একেবারে—মুখের উপর দরজা দিলেন বন্ধ করে—তিনি যদি বলেন এক কথা—তাঁর বৌ বলেন অন্য-কথা। কি করব? পকেটে নেই একটী পয়সা—কাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি—বলুন আমি কি করব? আমার কি হবে? (শচীন্দ্র পকেট হইতে একটী টাকা বাহির করিতেছে দেখিয়া) অ্যাঁ করেন কি আপনি?

শচীন্দ্র। (টাকাটি হাতে ধরিয়া) দেখুন আপনি যখন এতদূর বিপন্ন—

নরহরি। (তিক্ত পরিহাসে) বুঝতে পেরেছি—আমায় আপনি একটী টাকা ভিক্ষা দিতে চাচ্ছেন—

শচীন্দ্র। (লজ্জিত সঙ্কোচে) কিন্তু—

নরহরি। একটী টাকা—মাত্র যোল আনা—আমি রতনপুরের সরকার—আপনি কি আমায় ভিক্ষুক পেয়েছেন?

শচীন্দ্র। ক্ষমা করবেন, আপনাকে ব্যথা দেওয়ার ইচ্ছে নেই আদৌ—

নরহরি। বেশ, ভদ্রতা জানেন দেখছি—একজন সহকর্মী সাহিত্যিক—তরুণ সন্তানকে এমন ভাবেই অভ্যর্থনা কি আধুনিক ভদ্রতা? আমার দুঃখের কাহিনী বলেছি বলেই কি আপনি দেবেন আমায় ভিক্ষা? (উগ্রতর আক্রোশে) না, না এ অপমানের আমি শেষ করব—রতনপুরের সরকার আজ শেষ নিঃশ্বাস ফেলে—(নরহরি ব্যাগ হইতে রিভলভার বাহির করিল)

শচীন্দ্র। (ভীত হইয়া) কি করতে যাচ্ছেন আপনি—

(শচীন্দ্র টেলিফোনের রিসিভার তুলিতে হাত বাড়াইল)

নরহরি। সাবধান, নড়বেন না বলছি—

শচীন্দ্র। (স্তম্ভিত নিরুপায় হতাশায়) কিন্তু দেখুন সরকার মশাই।

নরহরি। সতর্ক করছি—যদি হাত আর একটু এগিয়েছেন, কিংবা ঘণ্টা বাজিয়েছেন—কিংবা চীৎকার করেছেন, তাহলে তৎক্ষণাৎ আমি গুলি করব—বুঝতে পেরেছেন—আমি বেপরোয়া—

শচীন্দ্র। কিন্তু কেন?

নরহরি। এক মিনিট সবুর করুন (নরহরি রিভলভার শচীন্দ্রের দিকে রাখিয়া ধীরে ধীরে দরজার নিকট গিয়া খিল বন্ধ করিল) হাঁ এখন আমরা মিরিবিলি কথা কইতে পারব—(দাম্ভিকতার সুরে) ভয় পাবেন না, শচীন বাবু, আপনার আতঙ্কের কোনই কারণ নেই, আমি ডাকাতও নই খুনেও নই—আমি শুধু আমাকে নিঃশেষ করব। জগৎ হতে মুছে যাবে শেষ রতনপুরের সরকার—একজনের আত্মাহুতি দিয়ে রতনপুরের অপমানের তর্পণ করব আমি—

শচীন্দ্র। (ভয় পাইয়া) আপনি আত্মহত্যা করবেন ?

নরহরি। হাঁ, এখনই।

শচীন্দ্র। (টেলিফোনের দিকে আগাইয়া) না তা কখনই হবে না, তা কখনই হবে না, হতে পারে না, আমি হতে দেব না—

নরহরি। (রিভলভার তাক করিয়া) নড়বেন না বলছি—নড়েছেন কি মরেছেন—(শচীন্দ্র প্রতিহীন জড়তায় মুহ্যমাণ পড়িল) আপনাকে কি বলেছি, মনে রাখবেন—আমার মনের যে অবস্থা তাতে আমি কিছুতেই নিরস্ত হবো না, একটু নড়েছেন কি গুলি খেয়েছেন—

শচীন্দ্র। আমার সামনে আত্মহত্যা করবেন বলে কি আমার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেছিলেন ?

নরহরি। ঠিক ধরেছেন—

শচীন্দ্র। আপনি নিশ্চয়ই পাগল !

নরহরি। না, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। আমি ভেবেছিলাম এই পৃথিবীতে রেখে যাব অবিনশ্বর গৌরব—তার জন্য করেছি প্রাণপণ—কলিকাতার গলিতে গলিতে মান অপমান ভুলে ঘুরেছি শতেক চেষ্টায়—কিন্তু পাইনি মান—পাইনি যশ। এই তার সুবর্ণ সুযোগ—আপনার মত যশস্বী নাট্যকারের সম্মুখে যদি আমি মরি, তাহলে কালই বাংলাদেশের সকল কাগজে যার হবে আমার বিবরণ—সবাই জানবে রতনপুর, তার ছবি যার হবে কাগজে কাগজে—সরকার বশ জনতার মাঝেই পাবে পূর্ণজন্ম, আমার লেখা তখন ছাপা হবে মাসিকে মাসিকে—মৃত্যু এনে দেবে আমার আমার বাঞ্ছিত অমরত্ব—

শচীন্দ্র। কিন্তু কি বৃহৎ বিপুল মূল্যে !

নরহরি। মহিমা অমূল্য—তার জন্য যে কোনও মূল্য দেওয়া চলে, আমি আড়াল রেখে জানব জনগণের হৃদয়-মন্দিরে—

শচীন্দ্র। কিন্তু মিছে কেবল ভস্মে পরিণত—

নরহরি। মৃত্যুর পূর্বের এই কয়টি মুহূর্ত তাই আমার অপরিমেয় সাধনা—তাই আমার অমৃতের সন্ধান। এখন থেকেই অনুভব করছি, আমার এই আত্মদান অনর্থক নয়, আজ রাত্রে ছেপিয়ে যাইবে আমার যশোগাথা—কাল কাগজে বার হবে আমার লেখা—আমি জানি আমার প্রতিভার কথা—মৃত্যুর পর সমালোচকেরা আমার লেখায় দেখবে শাশ্বত-কালের বাণী—আমায় করবে দেবতা।

শচীন্দ্র। কিন্তু সে ত আশা—সফল হবেই যে কে তা বলবে ?

নরহরি। আর ত রয়েছে কয়টি নিমেষ—তার মধ্যেই আমার আশা হবে পূর্ণ, আমি মরব—কিন্তু মরব কবির মত—সুন্দরের পূজা তো এই বলিদান—(সে কপালে রিভলভার ঠেকাইল) না, এতে আপনি ঘাবড়াবেন না—

শচীন্দ্র। (সাহস সঞ্চয় করিয়া) না, মারুন—

নরহরি। কেন ?

শচীন্দ্র। আত্মহত্যায় আপনার কোনই অধিকার নেই—

নরহরি। কেন নেই ?

শচীন্দ্র। তাদের কথা ভাবুন—যারা তোমার সুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে—

নরহরি। কাদের কথা ভাবব ? আমার মেই, প্রিয়া, সেই পুত্রকন্যা ও আমার জন্য এক বুড়ী পিসি আর এক বোন। আমার মৃত্যুতে তারা কাঁদবে কিন্তু তাদের ক্ষতি হবে না কোনই ; কাজেই আমি আমার প্রাণ দিয়ে যা খুসি করতে পারি—

শচীন্দ্র। না, তোমার রয়েছে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ—তোমার বয়স ত পঁচিশের অধিক নয়—

নরহরি। যৌবনেই বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি আমি, হতাশায় আমি ভরপুর—নিরাশায় আমি ক্লীবসদৃশ—

শচীন্দ্র। এসব কেবল বোনা বুলি—বুলি আওড়াবেন না—আপনি তরুণ, আপনি সুস্থ—বলিষ্ঠ এবং কর্মঠ—কোনও ব্যাধিতে আপনি ভুগছেন না—

নরহরি। (বিষণ্ণ সুরে) আমি দুঃখগ্রস্ত—

শচীন্দ্র। দুঃখ পুরুষের ধর্ম।

নরহরি। এ ধারণারই শেষ নেই—এ জগতে রাবণের চিতার মত অনির্বাণ।

শচীন্দ্র। আপনারা কেবল বুলি কপচাতে শিখেছেন—ধৈর্য ধরুন, মনের শক্তিতে লাগাম সবই ঠিক করা যায়—স্থিরসংকল্প হোন—ইচ্ছা-শক্তির অমোঘ বীর্য আপনাকে দেবে শক্তি এবং শান্তি—

নরহরি। হায়, সে ধৈর্যবান্ সে বলতে পারে—তার কাছে আছে কল্পনার দান—সে স্বপ্ন দেখতে পারে—ভাব-বিলাস করতে পারে—

শচীন্দ্র। বিপদ জয় করবেন আজ এই প্রার্থনাই করুন—সংগ্রামে বিজয়ঃ নেহি, ধনং নেহি সমরশিরে—চণ্ডীর এই মন্ত্র জপ করুন ধ্যানগভীর চিত্তে—

নরহরি। মিথ্যা সান্ত্বনা আপনার ? তোরা-কারবারীরা লালবাতি জ্বালাবে না—উপদেশীর চশমাটের অবসান হবে না—রণের বৃন্দ ভেরে নূতন পাবে না বসবার ঠাঁই—প্রতিভা পাবে না সম্মান—চলবে সেই পুরাতনের পুনরাবৃত্তি—যার আছে খুঁটির জোর সেই পাবে সমাদর—ভিক্ষা, বৃদ্ধি, ধন তারই—

শচীন্দ্র। না না, আপনার রয়েছে ভাবীকালের গৌরব-পিপাসা—ভবিষ্যৎ আপনাকে প্রতারিত করবে না—

নরহরি। (হাসিয়া) ভবিষ্যৎ ! আমি জানিনা কোথায় পাব আজ একমুঠা অন্ন, কোন চালের তলে পাব রাতের আশ্রয়—আমার আবার ভবিষ্যৎ।

শচীন্দ্র। আপনি সাহায্য নেবেন না ?

নরহরি। (পরিশ্রান্ত ক্লান্ত স্বরে) আমি ভিখারী নই। না, আমি মন ঠিক করে ফেলেছি (সে রিভলভার নামাইতে লাগিল) এই গুলি আমার মুক্তিমন্ত্র—আমার সব জ্বালা জুড়াবে—(করতলে রাখিয়া সে রিভলভারের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া রহিল) দেখুন, কি মজার কথা ! এই ছোট একটু খেলনা—নির্দোষ বিস্ময়ে ভরে আছে আমার মুখের পানে, এটা পকেটে লুকিয়ে রাখতে পারেন, রাতের আঁধারেও কেউ দেখতে পাবে না—কত অল্প স্থান জুড়ে থাকে ; কিন্তু একে যখন

CALCUTTA

ও চাও তখনই সে এসে যেন বন্ধুর মত দুহাতুবন—ঘোড়াই টেপ—খট করে একটু শব্দ—আর পৃথিবীর মানবসমষ্টির একজনের অর্থধান—তার ছিল দুহাত, ছিল অনন্ত আকৃতি—কত ধনত, কত কিছুত—তবে ছিল বাঁচার আনন্দে একটু আবেগ—আর এখন শব্দহীন মাংসের পিণ্ডমাত্র—লড়াই বিশ্রীরকম নয় কি ?

শচীন্দ্র। আপনি যদি তাই ভাবেন—

নরহরি। বেশুন কি সুন্দর কারুকার্য—চেয়ে দেখুন না—

শচীন্দ্রকে ভাল করিয়া দেখাইতে লাগিল

শচীন্দ্র। (চেয়ার হইতে খানিকটা উঠিয়া রিভলভারের দিকে হাত বাড়াইয়া) আমার হাতে দিন না একটু।

নরহরি। (তাড়াতাড়ি রিভলভার শচীন্দ্রের দিকে হাত করিয়া) বাস্ত হবেন না, অনুগ্রহ করে বসে পড়ুন (শচীন্দ্র বসিয়া পড়িল)—হাঁ এই দূরত্ব থেকে কথাবার্তা বলা সুবিধাজনক—(পুনরায় রিভলভার শচীন্দ্রের উপর রিভলভার বাগাইতে লাগিল) এর চেয়ে কত খারাপ রিভলভার আছে—সেই মুহূর্তে হাতে তাক হয় না—হত মরচে ধরা, নয় রিকট শব্দ করে শত্রু—কিন্তু এটা একেবারে আধুনিক আমেরিকান রিভলভার, মানুষের প্রজ্ঞাত কৌশলের চরম অবদান—সাতটা করে গুলি করে, কল-কব্জা অতি সূক্ষ্ম, ঘোড়ার হাত পড়েছে কি গুলি চলেছে—শব্দ নেই, আড়ম্বর নেই—ঠিক যেন তরুণীর পেলব হস্ত স্পর্শ ! দেখুন কেমন চমৎকার দেখাচ্ছে ! হয়ত ভাবছেন আমি এটা কি করে পেলাম। বলছি—সেবার একখানা ইংরেজী মৈমিকে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখে ১০ টাকা পেলাম—তাই দিয়ে এটা একজন আমেরিকান সৈনিকের কাছ থেকে কিনেছি—না, তার জন্য আমি অনুতপ্ত নই : হয়ত আপনার মত মনীষাব্যক্তির এটা কেনা উচিত ছিল—মনের আতঙ্কে যার রাত্রে সুনিদ্রার ব্যাঘাত হয়, তার আত্মরক্ষার জন্য এমনই একটা সহায়তার প্রয়োজন। আপনি কিসলে আপনাকে উপকার দিতে বারংবার, আমায় দেখে মাত্র একবার, কিন্তু কেন এ বৃথা ছলনা ? তাগাই জানে আমায় কোথায় নিয়ে যাবে (নরহরি রিভলভার তুলিয়া লইল) না আর তর্ক যুদ্ধ নিষ্ফল—(সে ললাটের দিকে রিভলভার তুলিল)

শচীন্দ্র। (সবেগে) দাঁড়ান।

নরহরি। কি হল ?

শচীন্দ্র। আপনি আমার ভাল একটা মতলব দিয়েছেন—আমার কথা শুনুন—অপরাধ নেবেন না—আপনার অতিপ্রাত কৃষ্ঠার মর্যাদা দেই আমি—ভিক্ষা আপনার পক্ষে মৃত্যু কঠোর। আপনার ধর্ম ও আভিজাত্য প্রশংসনীয়। কিন্তু আপনার কথায় আমার মনে পড়ল—আমি যেমন অধিবেচকের মত চলি। যে কোনও রাত্রে আমার রিভলভারের প্রয়োজন হতে পারে। আমার পক্ষে ত কম নয় ! তা ছাড়া লক্ষ্মীর কৃপায় কিছু লক্ষও করেছি। আপনার রিভলভারটী আমায় দিন না। আপনাকে লাভে বিক্রয় করতে বলব না—কারণ তাহলে আপনি ভাববেন আপনাকে পরোক্ষভাবে হত্যা করছি। এ আপনার কৃপাভিক্ষা নয়—এ আপনার নিজের জিনিষ বিক্রয়—আপনার কোনও রকম লজ্জা বা অপমানের কারণ নেই—

নরহরি। (ইতস্তঃ করিয়া) হাঁ টাকাটা পেলে নিষ্কণ্টক চলত বটে—

শচীন্দ্র। তাই নয় কি ?

নরহরি। কিন্তু সেই দিনকয়েকের পর ?

শচীন্দ্র। কিন্তু এইটুকু শুধু চাই—মাত্র কয়েকটী দিনের সুযোগ—তারপর আপনার প্রতিজ্ঞা আপনি পথ দেখে নেবে। জীবনে আমার একটী স্থির মতবাদ আছে—অনেকবার দেখেছি তা ঠিক ঠিক ফলেছেও। —সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের একটী ক্রমগতি আছে। দুদিনে বা দুএক দিন পরে সে তার শেষ পরিণতিতে এসে পৌঁছয়। জীবনে এমন ঘটনা ঘটছে, তাকি আপনি জানেন না ?

নরহরি। জানি বইকি ?

শচীন্দ্র। জীবনে হামেশা এটা ঘটছে—যে লক্ষপতি—যা যেঁয়ে তাই লোপা হয়ে দাঁড়ায়—হঠাৎ একদিন দেখে এক নিমেষে তার যথিনর আলাপ তাসের ঘরের মত ধূলায় লুটিয়ে। আমার যে পড়েছে চরম অধঃপতনের তলায়, সে হঠাৎ উঠে গেল এক বৈধচক্রে। আমার জীবনের কথাই বলতে পারি—যখন অভাব ও লাঞ্ছনার চরম সীমায় এসেছি, তখনই আমার প্রথম নাটক লেখার সুযোগ—আপনি ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের জীবনের ঘটনা জানেন ত—

নরহরি। কি বলছেন ?

শচীন্দ্র। বেশুনে অখ্যাত কেরাণীর জীবনে হঠাৎ একদিন এল সুযোগ তিনি চলে এলেন বাংলায়—সুযোগ এল আর একে একে তার উপন্যাস বাংলা ভাষা ছেয়ে ফেলল—সঙ্গে সঙ্গে এল অর্থ, কীর্তি, আরাম ও আনন্দ—

নরহরি। সাধে একজনের এমন হয়।

শচীন্দ্র। না, আপনার সময় ফিরেছে—আমি বলছি, শুনুন, বিপদের চরমসীমায় আপনি পৌঁছেছেন, এইবার চক্র পরিবর্তন হবে—চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুখানি চ সুখানি চ।

নরহরি। সত্যি বলছেন ?

শচীন্দ্র। হাঁ—এটা গণিতের সত্যের মত ধ্রুব। যে মুহূর্তে আপনি আমাকে দিতে আসবে সম্পদ ও গৌরব, সেই মুহূর্তে আত্মহত্যা করে আপনি নিশ্চয়ই অন্যায় করছেন। আমি একান্ত নিশ্চয়তার সঙ্গে বলছি—আজই বিকালে হয়ত আজ রাত্রে, কিম্বা হয়ত আপনি যে মুহূর্তে পথে বের হবেন—চকলা কমলা আপনাকে হাত তুলে দেবে বিজয়মালা—একবার আমার অনুরোধ পালন করেই দেখুন না—

নরহরি। (বহুকাল স্তব্ধ রহিয়া ক্লান্তিত কণ্ঠে বলিল)—কি দুর্বল মানুষের চিত্ত ! আমি আত্মহত্যা করবে এই সংকল্প নিয়েই এসেছিলাম—ভেবেছিলাম এ প্রতিজ্ঞা অন্যথা হবে না—কিন্তু আপনি যেখানের আমার আলোক আর ধীরে ধীরে আমার দৃঢ়তা শিথিল হয়ে আসছে—

শচীন্দ্র। লজ্জার হেতু নেই—টাকাটার আগ্রহ প্রকাশ করায় বিব্রত—

মরহরি। কিন্তু হুজুর যদি কমলার প্রসাদ না পাই, যদি ভাগ্য বিরূপ হয়—তখন মৃত্যুর আলিঙ্গন আসবে না এত সহজে—

শচীন্দ্র। যদি মরতেই চাও, তবে অন্য পিস্তল কিনতে পারবেন—কম দামেই পাবেন—(খামিয়া পকেট হইতে একশ টাকার পাঁচখানি নোট গণিয়া মরহরির হাতে দিলেন, এটা দিতেই হবে আপনাকে—আপনার না কিছুতেই শুনব না আমি।—একে কি বলব।—লটারি খেলায় আপনার জিত হয়েছে।

মরহরি। (গণিয়া গণিয়া টাকা লইল, রিভলভার শচীন্দ্রকে দিল—তারপর দাঁড়াইয়া নমস্কার করিয়া বলিল)—আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে আর ছোট করব না।

শচীন্দ্র। (রিভলভারটি আপনার দীর্ঘ কোটের মাঝে তাড়াতাড়ি ভরিয়া ফেলিয়া) না, এতে ধন্যবাদের কিছু নেই—এ শুধু—

মরহরি। (আপন ব্যাগ তুলিয়া লইয়া) আমি এত বড় ভীরু কাপুরুষ আগে তা জানতাম না—(দরজার দিকে অগ্রসর হইয়া) আমি সত্যই মৃণার পাত্র—(দরজা খুলিয়া) এর চেয়ে আবার মরণ ভাল ছিল—

মরহরি চলিয়া গেল

(আগামী সংখ্যায় শেষ)

[গাব্রিয়েল চৈমরি রচিত ফরাসী নাট্যকারের Un Desespere নামক নাটক অবলম্বনে লিখিত]

বিশ্বের চা শিল্পের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষ

শ্রীদন্তোষকুমার রায়চৌধুরী

একদা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র যে চা পানকে বিষপানের সহিত তুলনা করিয়া দেশের যুব সমাজকে চা পান হইতে বিরত হইতে আহ্বান জানাইয়াছিলেন, বর্ত্তমানে সেই চাই বিশ্বের মধ্যে অন্যতম সর্ব্বাধিক প্রচলিত পানীয়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের দূরদৃষ্টি ছিল, তাই তিনি বৃটীশ বণিকের প্রচার নৈপুণ্যের অন্তরালে চা পানের বিস্তৃতির রূপ দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়াছিলেন, কিন্তু বিভ্রান্ত হন নাই। আমরা আতঙ্কিত হই নাই কিন্তু বিব্রত হইয়াছিলাম। 'ফলে ১৯১৪ সালে ভারতবর্ষে ব্যবহৃত চায়ের পরিমাণ যেখানে ছিল ৩০৫ লক্ষ পাউণ্ড, সেখানে ১৯৩০ সালে ঐ পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৩০ লক্ষ পাউণ্ড ও ১৯৪০-৪১ সালে দাঁড়ায় ১৪০২ লক্ষ পাউণ্ডে।'(১) মাত্র ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যে পরিমাণ চা ব্যবহৃত হইত ত্রিশ বৎসর পরে ব্যবহৃত হয় উহার পাঁচ গুণ। প্রচার নৈপুণ্যের দিক হইতে ইহা একটা মহৎ দৃষ্টান্ত, ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহা ছাড়া মূল্যের সুলভতাও ইহার বিস্তৃতির অন্যতম কারণ। যাহা হউক, কি ভাবে প্রতি বৎসরে চা ব্যবহারের পরিমাণ এদেশে বাড়িয়া চলিয়াছিল তাহারই হিসাব দিয়ে দিলাম। পূর্ব্বোক্ত তিনটী বৎসরের হিসাব এখানে না দিয়া কেবলমাত্র ১৯৩৩-৩৪ হইতে ১৯৪২-৪৩ সালের এই দশ বৎসরের হিসাব সন্নিবেশিত হইল।

ভারতবর্ষে ব্যবহৃত চায়ের পরিমাণ (২)

বৎসর	পরিমাণ (কোটী পাউণ্ড)	মন্তব্য
১৯৩৩-৩৪	৬·৬	ব্রহ্মদেশ সহ
১৯৩৪-৩৫	৭·০	"
১৯৩৫-৩৬	৭·৩	"
১৯৩৬-৩৭	৮·১	ব্রহ্মদেশ বাদে
১৯৩৭-৩৮	৯·১	"
১৯৩৮-৩৯	৯·৬	"
১৯৩৯-৪০	৮·২	"
১৯৪০-৪১	১০·৬	"
১৯৪১-৪২	১১·২	"
১৯৪২-৪৩	১২·৯	"

ভারতবর্ষে মোট ব্যবহৃত চায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় এদেশের মাথা পিছু ব্যবহৃত চায়ের পরিমাণ কিন্তু অত্যন্ত কম। অবশ্য মোট চা ব্যবহারের দিক হইতে ভারতবর্ষের স্থান হইতেছে যুক্তরাষ্ট্রের পরেই, কিন্তু লোক সংখ্যার আধিক্য হেতু ভারতবর্ষের মাথা পিছু চা ব্যবহারের পরিমাণ নগণ্য, অথচ যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা চা ব্যবহার করেন গড়ে বৎসরে মাথা পিছু নয় পাউণ্ড। এক পাউণ্ড পাতা চায়ে পানার প্রস্তুত হয় ১৮০ হইতে ২০০ কাপের মত ; অর্থাৎ মাথা পিছু প্রতিদিন পাঁচ কাপ চা তাঁহারা পান করেন। আয়ার্লণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিলাণ্ডে গড় চা ব্যবহারের দিক হইতে যুক্তরাষ্ট্রের কাছাকাছি যায়। পাশ্চাত্যের চায়ের বাজারে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্থান হইতেছে যুক্তরাষ্ট্রের পরেই কিন্তু সেখানে মাথা পিছু চা ব্যবহৃত হয় মাত্র পৌনে এক পাউণ্ডের মত।"(৩)

---

(১) Data collected from Indian Tea Market Expansion Board

(২) Indian Tea Statistics 1941 and 1942.

(৩) Tea under International—Regulation Wickizer.

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পর্যন্ত চীন দেশই ছিল সমগ্র পৃথিবীতে চা সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র। ওলন্দাজেরাই প্রথমে চায়ের ব্যবহার প্রবর্তন করেন ইউরোপে সপ্তদশ শতাব্দীতে। ধীরে ধীরে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে চা পানের ব্যবহার বিস্তৃতি লাভ করে। বিশেষ করিয়া ইংরাজের এই অভ্যাসটাকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করেন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে চা পানও প্রসার লাভ করে। এদিকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে (১৮১৩ খৃষ্টাব্দে) ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্ট ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকার কিছুটা খর্ব করেন এবং সেই সঙ্গে চা ব্যবসায়ে চীনদেশের একচেটিয়া অধিকারকে ১৮৩৩ সালের মধ্যে খর্ব করিবার সংকল্প লইয়া এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন। ফলতঃ লেফটেনেন্ট গর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ভারতে চায়ের প্রবর্তন ও উন্নতি সম্পর্কীয় তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য এক কমিটি নিয়োগ করেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মিঃ সি. এস. কলভিন অধিনায়কত্বে আসামে চায়ের চাষের প্রবর্তন করা হয় এবং ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে আটটী বাক্সে মোট ৩১০ পাউণ্ড ভারতীয় চা সর্বপ্রথম বিলাতে রপ্তানী করা হয়। ঐ রপ্তানীকৃত চা বিলাতের মাইন্‌সিং লেনএ (Mincing Lane) ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রথম নীলামে বিক্রীত হয়।(৪) উৎসুক্যে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে প্রথম ভারতীয় চায়ের নমুনা বিলাতে প্রেরিত হইয়াছিল এবং ভারতে প্রথম চা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে। সেই সময় ধুরন্ধরের মতে পিছু বাৎসরিক চা ব্যবহারের পরিমাণ ১২ পাউণ্ড। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ঐ পরিমাণ হয় ছিগুণ, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে হয় প্রায় ৬ পাউণ্ডের মত এবং বর্তমানে বৎসরে দাঁড়াইয়াছে ১ পাউণ্ড।"(৫)

১৮৩৮ সালে ভারতে প্রথম চা প্রস্তুত হয়। তখন চীন ও জাপান ছিল পৃথিবীর চায়ের বাজারে একচ্ছত্র বিক্রেতা। কিন্তু ধীরে ধীরে ভারতের চা শিল্প গড়িয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের একচেটিয়া অধিকার ক্ষুণ্ণ হইতে লাগিল। মাত্র একশত বৎসরের প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষের চা শিল্প হইয়া দাঁড়াইল সকলের বিস্ময়ের বস্তু। যদিও এখনও সমগ্র বিশ্বে উৎপন্ন চায়ের প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণ চা উৎপন্ন হয় চীনদেশে, তবুও চায়ের বাজারে তাহাদের অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত প্রায়। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩২ সালের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীতে উৎপন্ন চায়ের শতকরা ৯০১ ভাগ উৎপন্ন হইয়াছিল চীনদেশে, শতকরা ২২·০ ভাগ উৎপন্ন হইয়াছিল ভারতবর্ষে, আর যথাক্রমে ১৩·৯,৯·২,৪·৭,১·২ ও ·৩ ভাগ উৎপন্ন হইয়াছিল যথাক্রমে সিংহল, নেদারল্যাণ্ড, জাপান, জভযাভা এবং অন্যান্য অঞ্চলে।"(৬)

ভারতবর্ষে প্রথম চা উৎপন্ন হইবার মাত্র একশত বৎসর পরে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে চা চাষের জমির পরিমাণ হয় ৮৩৩০০০ একর, মোট উৎপন্ন চায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৪ কোটী পাউণ্ড আর রপ্তানী হয়—১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে ৩১ কোটী পাউণ্ড। সমগ্র পৃথিবীতে গড়ে প্রতি বৎসর চা চাষ হয়—৮৫ লক্ষ একর জমিতে ও উৎপন্ন হয় ২০০ কোটী পাউণ্ড। অর্থাৎ ভারতে চা চাষের জমির পরিমাণ ও উৎপন্ন চায়ের পরিমাণ সমগ্র পৃথিবীর উৎপন্ন চায়ের জমির পরিমাণ প্রায় ২০ হইতে ২২ ভাগের মত। নিম্নে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীতে কোন দেশে কত চা উৎপন্ন, কত জমিতে চা চাষ ও কত চা রপ্তানি হইয়াছিল তাহার হিসাব দিলাম। নিম্নের হিসাবটীতে চীনদেশের চা চাষের জমি ও উৎপন্ন চায়ের পরিমাণ দেওয়া হইল গড় হিসাবের উপর ভিত্তি করিয়া। অন্যান্য দেশের হিসাবগুলি বিভিন্ন হিসাব হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

পৃথিবীর কোন দেশে কত চা চাষ হয়, কত চা উৎপন্ন হয় ও রপ্তানী হয় তাহার হিসাব। (৭)

দেশের নাম	১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে জমির পরিমাণ (হাজার একরে)	১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দের উৎপাদন (কোটি পাউণ্ডে)	১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দের গড় রপ্তানি। (কোটী পাউণ্ডে)
ভারতবর্ষ	৮৩৩	৪৪·২	৩১·০
সিংহল	৫৪৬	২৩·৬	২২·২
নেদারল্যাণ্ডস	৫০৪	১৭·৮	১৪·৩
জভযোসা	১০১	২·৭	২·৩
জাপান	৯২	১২·১	৪·৩
ব্রিটিশ পূর্ব্ব আফ্রিকা	৩২	২·৪	১·৭
চীন দেশ	২৩০০	৯০·০	৮·০
সোভিয়েট রাশিয়া	১২১	১·৯	—
অন্যান্য দেশ	৭২	২·৮	০·৪
সমগ্র পৃথিবী	৪৫৯৮	১৯৮·৩	৮৭·০

উপরোক্ত হিসাবটী হইতে দেখা যায় যে সমগ্র পৃথিবীতে মোট যে চা রপ্তানী হয় তাহার মধ্যে ভারতবর্ষের অংশ হইতেছে শতকরা ৩৫ ভাগ ও সিংহলের অংশ হইতেছে শতকরা ২৫ ভাগ। অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর চায়ের বাজারে ভারতবর্ষ ও সিংহল এক বিপুল অংশ অধিকার করিয়া আছে।

১৯৩৮ সালের পর ভারতবর্ষের চা শিল্প আরও অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে। গত ১৯৪০-৪১, ১৯৪১-৪২ ও ১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে মোট চা রপ্তানী হইয়াছে যথাক্রমে ৩১৩৯২৮৬৯২ পাউণ্ড ৩১৭০১৯৯৭২ পাউণ্ড ও ৩৮৩৯৫৪৬১০ পাউণ্ড। এমন কি বর্ত্তমান বৎসরে অর্থাৎ ১৯৪৩ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪৪ সালের ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে যে চা রপ্তানি হইয়াছে তাহার পরিমাণ হইতেছে ৩১৭৩২৭১২৪ পাউণ্ড এবং ইহার মূল্য হইতেছে ৪০ কোটী টাকা। ভারতীয় চা যে যে দেশে সবচেয়ে ব্যবহৃত হয় তাহাদের

(৪) Development of Tea Industry in India and Pakistan—by Sir Arnold Whitaker C.S.I, C.I.E.

(৫) Tea under International Regulation.

(৬) (do)

(৭) Tea under International Regulation.

কথা বলিতে গেলে প্রথমেই বলিতে হয় যুক্তরাষ্ট্রের কথা। ১৯৩৭-৩৮ সালের মোট রপ্তানীকৃত ভারতীয় চায়ের পরিমাণ ছিল ৩৮ কোটী পাউণ্ড। তন্মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত হয় ২৪ কোটী, সোভিয়েট রাশিয়ায় ১ কোটী, কানাডায় ১ কোটী, অষ্ট্রেলিয়ায় ১ কোটী ও আমেরিকা যুক্ত-সাম্রাজ্যে ৩ কোটী পাউণ্ড। বাকী ৮ কোটী পাউণ্ড চা ব্যবহৃত হয় তুরস্ক, ইরাক, ইরাণ, আরব, মিউজিল্যাণ্ড, চিলি, সুদান প্রভৃতি দেশে। উপরোক্ত ৩৮ কোটী পাউণ্ড চায়ের মধ্যে 'কালো চা' (Black Tea) এর পরিমাণই হইতেছে সর্বাধিক। 'সবুজ চা' এর (Green Tea) পরিমাণ হইতেছে নগণ্য।" (৮)

এই যে বিপুল পরিমাণ চা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীর চায়ের বাজারে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে ভারতবর্ষকে, তাহারই সামান্য পরিচয় দিলাম নীচে। পর পর দুইটী হিসাবে যথাক্রমে আসাম, উত্তর ভারত (আসাম ছাড়া), দক্ষিণ ভারত ও সমগ্র ভারতের ১৯৩০ হইতে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের পাঁচ বৎসরের মোট চা চাষের জমির পরিমাণ ও মোট উৎপন্ন চায়ের পরিমাণ দেওয়া হইল।

সমগ্র ভারতে চায়ের জমির পরিমাণ। (৯)

(হাজার একরে)

বৎসর	আসাম	উত্তর ভারত	দক্ষিণ ভারত	সমগ্র ভারত
১৯৩০	৪৩১	২৩১	১৪২	৮৩৩
১৯৩১	৪৪০	২৩১	১৪৩	৮৩৪
১৯৩২	৪৪২	২৩২	১৪৪	৮৩৯
১৯৩৩	৪৪২	২৩২	১৪৬	৮৪০
১৯৩৪	৪৪১	২৩১	১৪৪	৮৩৮

সমগ্র ভারতে উৎপন্ন চায়ের পরিমাণ। (১০)

(হাজার পাউণ্ডে)

বৎসর	আসাম	উত্তর ভারত	দক্ষিণ ভারত	সমগ্র ভারত
১৯৩০	২৮০	১২৪	৭৮	২৮০
১৯৩১	২৮৯	১৩১	৮১	৪০১
১৯৩২	৩০১	১৬০	১৫	৪৩৪
১৯৩৩	২১১	১৭১	১০৪	৪৭৪
১৯৩৪	২৭১	১০৯	১০২	৪১২

উপরোক্ত হিসাব ছাড়াও "ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানসন বোর্ডের" একটী হিসাবে দেখা যায় যে ১৯৩৪ সালে ভারতবর্ষে চা চাষের জমির পরিমাণ ছিল ৮৪১ হাজার একর এবং ১৯৪৬ সালে উৎপন্ন চায়ের পরিমাণ ছিল ৪ কোটী ৮৩ লক্ষ পাউণ্ড। ভারতবর্ষ বিভক্ত হইবার পর চা চাষের জমির পরিমাণ কমিয়া গিয়া বর্তমানে দাঁড়াইয়াছে ৬৪১ হাজার একরের মত এবং এই শিল্পে বর্তমানে নিয়োজিত আছে ১৫।১০ লক্ষের মত লোক।

"চা কে মোটামুটী তিনটী শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যথা—কালো চা (Black Tea), সবুজ চা (Green Tea), ও ওলং চা (oolong Tea). এই তিন প্রকার চায়ের মধ্যে ভারতবর্ষে এখন একমাত্র কালো চায়ের চাষই হয়। 'সবুজ চা' উৎপন্ন হয় নামমাত্র। 'কালো চা' প্রধানত উৎপন্ন হয় ভারতবর্ষ, সিংহল, নেদারল্যাণ্ডস, পূর্ব আফ্রিকা প্রভৃতি অঞ্চলে। 'সবুজ চা' এক সময়ে ভারতবর্ষ ও সিংহলে উৎপন্ন হইত, এখন প্রচলন করিয়া দিয়াছে। বর্তমানে প্রধানতঃ চীন ও জাপানেই ইহা উৎপন্ন হয়। আর 'ওলং চা' উৎপন্ন হয় চীন ও ফরমোসা অঞ্চলে। উপরোক্ত চা উৎপাদনী অঞ্চল হইতেই চা রপ্তানি হইয়া বিশ্বের বাজারে ছড়াইয়া পড়ে।" (১১)

পূর্বেই বলিয়াছি যে মাত্র একশত বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের চা শিল্পের মধ্যে আসিয়াছে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন। কিন্তু যেদিন এই শিল্পের অভ্যুত্থানের মূলে ছিল না কোন দরিদ্রা, ছিল না ভারতবর্ষের কোন উন্নতির অভিপ্রায়, ছিল ব্রিটিশ বণিকের অসম্য লোভ লিপ্সা, আর চীন দেশের চা ব্যবসায়ের অপ্রতিহত প্রভাবকে বিনষ্ট করিয়া সমগ্র জগতে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার দুরভিসন্ধি। আর এই দুরভিসন্ধিকে কার্যকরী করিতে তাহারা অবলম্বন করিয়াছিলেন যত কিছু অনাচার, আর অত্যাচারে জর্জরিত করিয়া দিয়াছিলেন লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের জীবন। যে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের আত্মদানে ভারতবর্ষের চা শিল্প আজ একটী সুগঠিত শিল্প, তাহাদেরই আত্মত্যাগের সকরুণ কাহিনী বক্ষে লইয়া মুলুকরাজ আনন্দের দুইটী পাতা ও একটী কুঁড়ি পুস্তকখানি আজ বিশ্ব সাহিত্যে অমর হইয়া রহিয়াছে।

বৃটিশ বণিকগণই এ দেশে চা-শিল্প প্রবর্তন করিয়াছেন সত্য, এই শিল্পের মূলেও তাহাদেরই কার্যকারিতাই ছিল ইহা সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও চরমতম সত্য যে নামমাত্র অথবা বিনা মূল্যে ভূমি সংগ্রহ করিয়া, শ্রমিক ও অন্যান্য দেশীয় লোকদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার সুযোগে তাহাদিগকে নানা ভাবে লাঞ্ছিত করিয়া, আর মাত্র রপ্তানী শুল্কে ভারত হইতে চা রপ্তানী করিয়া বিলাতের মাইন্‌সিলেন যারফত সমগ্র পৃথিবীতে চা রপ্তানি করিয়া যার যার তাহারা অপমানিত করিয়াছে ভারতের তৃণি সম্পদকে, ভারতের অপরিমীম ঐশ্বর্যকে।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার চা মালিকদেরই প্রস্তাবক্রমে পাশ করেন ভারতীয় চা-কর আইন ও গঠিত হয় ভারতীয় চা-কর সমিতি। ভারত সরকার শুধু মাত্র কর আদায়ের যন্ত্র হিসাবে কাজ করিতেন ঐ চা-কর সমিতির পক্ষ হইতে। চা-কর সমিতি ঐ কর হইতে সংগৃহীত অর্থ প্রচার কার্যে ব্যয় করিতেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক টী এক্সপ্যানসন বোর্ড স্থাপিত হওয়ার প্রায় কাছাকাছি সময়ে ঐ চা কর সমিতি ইণ্ডিয়ান

(৮) Compiled from 'Sea borne trade and navigation of India for March 1948 and January 1949.

(৯) ও (১০) Review of the Trade of India in 1944 and 1945.

(১১) Compiled from Tea—its production and marketing.—by. E. D. Morrison.

টী এক্সপ্যানসন বোর্ডে পরিণত হয়। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রপ্তানীকৃত চায়ের উপর প্রতি চার পাউণ্ডে ১ পাই করিয়া রপ্তানী কর আদায় হইত। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে এই কর দাঁড়ায় প্রতি ১০০ পাউণ্ডে ১৷৵০—বর্ত্তমানে উহা ১৲ করা হইয়াছে। ১৯৪০-৪১, ১৯৪১-৪২, ও ১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে ৫১ লক্ষ, ৫২ লক্ষ ও ৪০ লক্ষ টাকা রপ্তানী কর আদায় হয়।

যাহা হউক, বর্ত্তমানে ভারত সরকার "ভারতীয় টী মার্কেট এক্সপ্যানসন বোর্ডকে বাতিল করিয়া দিয়া তৎস্থলে ভারতীয় চা কমিটি নামক একটী প্রতিষ্ঠান গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। সরকারের মতে প্রচার কার্য্যই যথেষ্ট নহে। প্রচার কার্য্য ব্যতীত চায়ের উৎপাদন সম্পর্কে বাগানের মালিকদের উপদেশ দান, চা প্রস্তুত সম্পর্কে উন্নততর ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য উৎসাহ প্রদর্শন, চা সম্পর্কে গবেষণা ও চা শিল্প সম্পর্কে বিস্তৃত তালিকা সংগ্রহেরও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে বলিয়া সরকারের অভিমত।"(১২) চা-শিল্পে বর্ত্তমান ভারত সরকারের হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা যখন সব চাইতে বেশী অনুভূত হইয়াছিল তখনই এই পরিকল্পনা সত্যিই গঠনমূলক পরিকল্পনা লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে ইহা অত্যন্ত আশার কথা। আন্তর্জাতিক চায়ের বাজারে ভারতবর্ষের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়াইয়াছে সিংহল ও অষ্ট্রেলিয়া। এ সম্বন্ধে সময়োপযোগী যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা আজ প্রয়োজন। ব্রিটিশের কূটনীতিতে ভারতীয় চায়ের বিক্রয়ের কেন্দ্র আজ বিলাতের মাইলিং লেন। চায়ের উপলব্ধ আজও ব্রিটিশের মুষ্টীগত। এই অব্যবস্থা দূরীভূত হওয়া প্রয়োজন। ১৯৪৭ সাল হইতে কলিকাতায় কিছু কিছু চা নীলাম হইতেছে বা কিছু চা সরাসরি বিদেশে রপ্তানী হইতেছে, কিন্তু এখনও এই কেন্দ্র সম্যকরূপে গড়িয়া উঠে নাই। এদিকে সরকারের মনোযোগ দেওয়া সব চাইতে আগে প্রয়োজন। আর সব চাইতে অবহেলিত যারা সেই চা কুলীদের বৃটিশ মালিকদের হাত হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদের জীবনযাত্রাকে উন্নততর করিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। কিন্তু এই সমস্ত ব্যবস্থা শুধু মাত্র পরিকল্পনার মধ্যেই আবদ্ধ রাখিলে কোন ফলই লাভ হইবে না। শুধু পরিকল্পনাই যথেষ্ট নয়, বিশ্বের চায়ের বাজারে ভারতীয় চায়ের সুনাম ও ঐতিহ্যকে রক্ষা করিতে ভারত সরকারের আন্তরিকতাই আজ আমাদের কাম্য।

(১২) আর্থিক জগৎ—৪০ সংখ্যা ১৯৪৯।

তুমি

শ্রীআশা দেবী

তুমি যাও কাজে
কর্ম্মশ্রান্ত একা অবসরে
শুধু ভেবে চলি।
ক্লান্ত অবসাদ এসে
মাধুরে আচ্ছন্ন করে—চেতনারে অবশ বিভল্।
মনে হয় চাই মুক্তি :
তোমারে ছাড়িয়ে দূরে, ছাড়িয়ে এ জীবন বন্ধন—
কত দূর নেই তার শেষ।

চোখের সম্মুখে থাকো যবে
কখনও হয় না মনে
কিংবা ভুল ক্রমে
ভাবিনি তো কোনো দিন
হৃদয়ের প্রতি কণা রক্তের সঙ্গীতে
তোমার বঙ্কার,
মনে তো পড়ে না কভু
তোমার গানের সুরে মোর পায়ে চলায় পুলক।

মনে হয় কত কাছে : কত সাধারণ
তুমি যে শুধুই তুমি, তার বেশি আর কিছু নয়।

তার পরে কোনো এক রাতে
শিথিল ঘুমের মায়া নয়নে যখন :
মনে হয় এতো কাছে—তবু কত দূরে—
হঠাৎ ছাড়ায়ে গেছ আমার সীমানা।

সহসা অজানা ভয়ে থেমে যায় বুকের স্পন্দন—
আমি ছবি দেখি :
কালো মাঠ কালো ট্রেণ সোঁ সোঁ ঘোড়ো হাওয়া
আর কালো রাত্রির দোয়ার
তার মাঝে আলোকিত কোন্ জানালায়
তুমি ছুটে চলে যাও উল্কার মতন।
স্মৃতির নক্ষত্র আলা আমার আকাশে
এঁকে যাও—হেনে যাও—
কক্ষচ্যুত দিগভ্রষ্ট অগ্নিময় তীরের ফলক।

তথাগতের পথে

নরেন্দ্র দেব

"—ওঁ নমো তস্দ্ ভগবতো অর্হতো সম্মা সম্বুদ্ধস্স!"

'মহাপরিনির্বাণ সূত্রে' ৫ম অধ্যায় ৮ম সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে প্রত্যেক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের পক্ষে এই চারটি স্থান প্রধান তীর্থ-রূপে গণ্য হওয়া উচিত।

লুম্বিণী—যেখানে তথাগত জন্মগ্রহণ করেন।

বোধগয়া—যেখানে তিনি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন।

তথাগত

ঋষিপাতন—যেখানে তিনি প্রথম সত্যধর্ম প্রচার করেন।

কুশীনগর—যেখানে তিনি পরিনির্বাণ লাভ করেন।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা অনেকেই একান্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে এই স্থানগুলি পরিদর্শন করেন।

আমরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী নই। কিন্তু আমরা জানি শ্রীভগবান গৌতমবুদ্ধ হিন্দুর দশ-অবতারের অন্যতম।

কবি জয়দেবকৃত দশাবতার স্তোত্রে পাই।

"নিন্দসি যজ্ঞ বিধেরহহ শ্রুতি জাতং
সদয়-হৃদয়-দর্শিত পশুঘাতম্
কেশব ধৃত বুদ্ধ শরীর জয় জগদীশ হরে।"

সুতরাং বৌদ্ধ তীর্থস্থান আমাদেরও তীর্থস্থান। তেত্রিশ কোটী দেবতা নিয়ে যারা ঘর করে তাদের অন্তরে তথাগতেরও স্থান আছে। "কেশব ধৃত বুদ্ধ শরীর জয় জগদীশ হরে।" জৈনতীর্থংকর মহাবীরজী, শিখ গুরু নানকশাহ, খৃষ্ট ধর্মবীর পরমপিতা যীশু, বৈষ্ণব অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এঁদের সকলকেই আমরা সমান শ্রদ্ধা ভক্তির অর্ঘ্য দিই। এই যে নির্মুক্ত মনের বিপুল উদারতা, এ কেবল এই বিরাট হিন্দু ধর্মের মধ্যেই আছে।

শ্রীভগবান তথাগত বুদ্ধদেব বিশেষ ভাবে সারা ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাইরের নানাস্থানেও বহুসমাদরে পূজিত। দেশদেশান্তর থেকে বৌদ্ধ সংঘের কত তীর্থযাত্রী বেড়াতে আসেন এই বুদ্ধপীঠ ভারতবর্ষে—শুধু বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলি পরিদর্শনের সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে। হিয়ুয়েন-সাঙ্ ও ফা-হীয়ান তাঁদের প্রথম পথ-প্রদর্শক। আমরা হিন্দুরা স্বভাবতই এইসব পুণ্যস্থানগুলির অনুরাগী। ছুটীর সুবিধা পেলেই ছুটি এগুলির পরিক্রমায়। হয়—মথুরা-বৃন্দাবন, নয়ত হৃষিকেশ-হরিদ্বার, নয়ত পুরীভুবনেশ্বর, অথবা রামেশ্বর-কন্যাকুমারী, দ্বারকা-সোমনাথ, নয়ত' কাশী-গয়াও অন্ততঃ ঘুরে বেড়াই আমরা!

ইং ১৯৪৮ সালে অক্টোবর মাসের পনেরো তারিখে সপরিবারে এবার 'রাজগির' রওনা হই। ই-আই-আর লাইনে বক্তিয়ারপুর হ'য়ে সেখান থেকে মটিনের ছোট গাড়ীতে 'রাজগির' যেতে হয়। 'রাজগির' বা 'রাজগৃহ' একটি বহু প্রাচীন জনপদ। ভগবান তথাগত এখানে তাঁর জীবনের প্রায় তিরিশটি বছর কাটিয়েছিলেন। নানা পুরাণে এ স্থানের নাম পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে রাজগৃহের অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল। যেমন 'বসুমতী' 'বার্হদ্রথপুর' 'গিরিব্রজ' 'কুশাগ্রপুর' এবং সকলের শেষ এর নাম হয়েছিল 'রাজগৃহ'।

রাজগৃহের 'বসুমতী' নামটি 'রামায়ণে' দেখতে পাওয়া যায়। কথিত আছে ব্রহ্মার পুত্র 'বসু'ই এই নগর স্থাপন করেছিলেন। 'মহাভারত' এবং অন্যান্য পুরাণে এর নাম দেখি 'বার্হদ্রথপুর'। মহারাজ বৃহদ্রথ মহাভারতপ্রসিদ্ধ জরাসন্ধ রাজার একজন পূর্বপুরুষ। বার্হদ্রথ বংশের

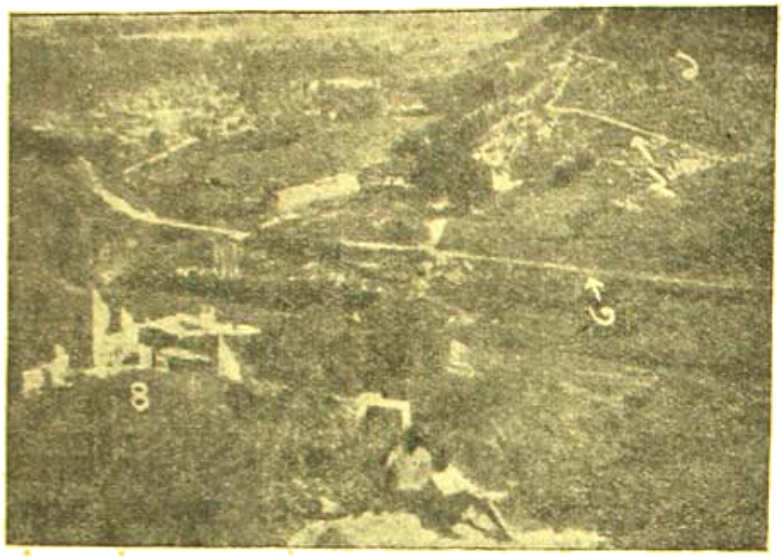

গিরিব্রজ

১। বিপুল পাহাড়, ২। বিপুল পাহাড়ে উঠিবার সিঁড়ি, ৩। বৈভার ও বিপুল পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী রাস্তা, ৪। বৈভার পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত মন্দির সমূহ

প্রতিষ্ঠাতা ইনি এবং 'বসুমতী' নাম পরিবর্তন করে ইনিই নিজনামে এস্থানের নামকরণ করেছিলেন। আবার এঁরই বংশধর মহারাজ কুশাগ্রনাথের রাজত্বকালে এস্থান 'কুশাগ্রপুর' নামে খ্যাত হয়। হিয়ুয়েন-সাঙের বর্ণনায় কুশাগ্রপুরের নাম পাওয়া যায়। তা'ছাড়া একাধিক জৈন, বৌদ্ধ এবং হিন্দু পুরাণ ও ধর্মগ্রন্থেও কুশাগ্রপুরের উল্লেখ আছে। আবার অনেকে বলেন—এই নগর পরিবেষ্টন ক'রে প্রচুর কুশ তৃণের বন ছিল বলেই এর নাম হয়েছিল 'কুশাগ্রপুর'। অবশ্য, 'কুশবন' না হোক, অন্তত কুশ ঘাস এখানে এখনও প্রচুর জন্মাতে দেখা যায়।

এইবার 'গিরিব্রজ' নামে আসা যাক। এ নামটি সম্ভবতঃ পুরাকালে এস্থানের তৎকালীন প্রতিবেশী-জনসাধারণই রেখেছিলেন, কারণ রাজগৃহের চারিদিক গিরিশ্রেণী বা পর্বতমালায় পরিবেষ্টিত। কাজেই গিরিপথ উত্তীর্ণ হয়ে যে পুরে প্রবেশ করতে হয় তার 'গিরিব্রজ' নাম হওয়া খুবই স্বাভাবিক। 'রাজগৃহ' এস্থানের সর্বশেষ নামকরণ। 'রাজগৃহ' মানে রাজার আবাস। হিয়ুয়েন-সাঙ বলেন 'গিরিব্রজ' ও 'রাজগৃহ' একই জনপদ নয়। পঞ্চপর্বত পরিবেষ্টিত যে স্থান, তারই প্রাচীন নাম 'গিরিব্রজ'। কিন্তু 'রাজগৃহ' একটি নূতন নগর, যা প্রাচীন 'গিরিব্রজ'পুরের উত্তর সীমান্তে মগধের মহারাজা বিম্বিসার স্থাপন করেছিলেন। 'পাটলিপুত্রের' পর রাজগৃহই সুদীর্ঘকাল মগধসাম্রাজ্যের রাজধানীরূপে পরিচিত ছিল। অতএব করেক শতাব্দী ধরেই রাজার পর রাজা এখানে বসবাস করেছিলেন। সুতরাং 'রাজগৃহ' নামের সার্থকতা পাওয়া যায় এই সূত্রে। কিন্তু, মহাভারতে 'রাজগৃহের' উল্লেখ থাকায় এ মীমাংসায় এসে পৌঁছানো যায় না।

যে পাঁচটি পর্বত এই স্থানটিকে পরিবেষ্টন ক'রে একে একটি দুর্ভেদ্য নগরে পরিণত করেছে সেগুলির নামও বিভিন্ন যুগে পরিবর্ত্তিত হয়েছিল দেখা যায়। মহাভারতে গিরিব্রজপুরের বর্ণনায় এগুলির নাম পাই-বৈহার, বিপুল,

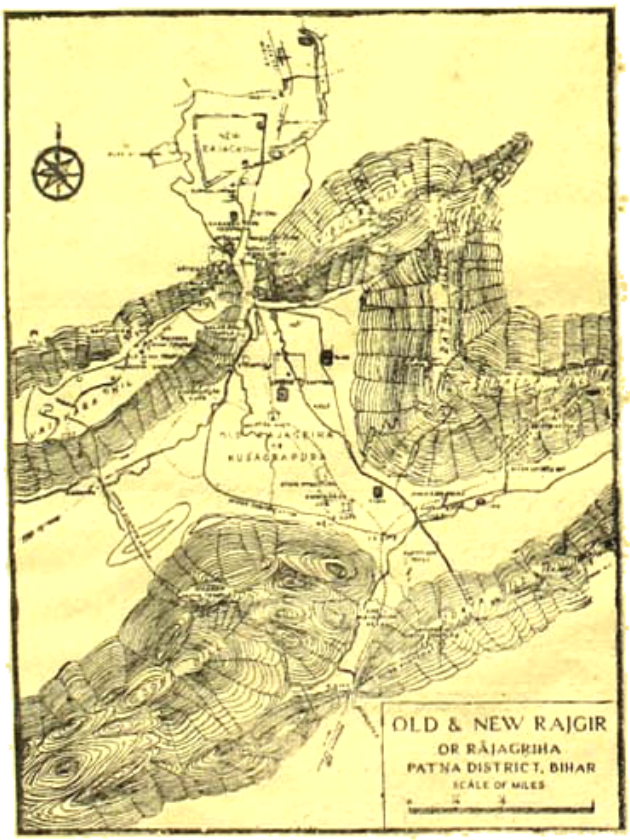

প্রাচীন ও নূতন রাজগৃহের মানচিত্র

বরাহ, বৃষভ ও চৈত্যক। আবার ঐ মহাভারতেরই আর এক অংশে এই পঞ্চগিরির নাম দেওয়া হয়েছে দেখি—পান্ডব, বিপুল, বারাহক, চৈত্যক ও মাতঙ্গ। আমরা

ইং ১৯৪৮ সালে অক্টোবরমাসে গিয়ে শুনলুম সেই পাঁচ পাহাড়ের সাতটি চূড়ার সাতটা নাম হয়েছে এখন—বৈভার, বিপুল, রত্না, ছটা, শৈল, উদয় ও সোনা। আবার এও শোনা গেল যে জৈন সম্প্রদায়ের ভক্তরাই এই সপ্ত নামকরণ করেছেন। সুতরাং, পাহাড়গুলির এই বর্তমান নামের জটিলতা ভেদ করে পুরাকালে কোনটির কি নাম ছিল তা' নিরূপণ ও তাদের সনাক্ত করা আজ খুবই কঠিন। এ ব্যাপারটিকে আরও জটিলতর করে দিয়ে গেছেন প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হিয়ুয়েন-সাঙ নিজে। কারণ, যে পর্বতটি আজ 'বৈভার' নামে পরিচিত এবং পালি গ্রন্থাদিতেও যে পর্বতটি 'বেবার' বলেই বর্ণিত হয়েছে, চীনাপরিব্রাজক হিয়ুয়েন-সাঙ্ সে পর্বতটির নাম 'বিপুল' (পি-পু-লো) বলে উল্লেখ করে গেছেন। পালি গ্রন্থে এই পঞ্চ গিরির নাম এইভাবে দেখতে পাওয়া যায়—বেবার, পান্দব, বেপুল্ল, গিজ্ঝকুট ও ইসিগিলি (ঋষিগিরি)।

রামায়ণে পাওয়া যায় কুশ নামে একজন মহাতপস্বী ব্রহ্মতনয়ের চতুর্থ পুত্র বসু এই 'গিরিব্রজ' বা 'বসুমতী' নগর প্রতিষ্ঠা করেন। 'রাজগৃহেরই' প্রাচীন নাম 'গিরিব্রজ' একথা পূর্বেই বলেছি। 'রাজগৃহ' নাম নিয়েও মতভেদ দেখা যায়। কেউ বলেন ওটি 'রাজগৃহ' নয় 'রাজগিরি', যা থেকে এর বর্তমান নাম দাঁড়িয়েছে 'রাজগির'। কিন্তু এটি সমর্থনযোগ্য নয়, কারণ এখানকার একটি পর্বতও এত উঁচু নয় বা এমন প্রাকৃতিক সম্পদেও পূর্ণ নয় যাতে এর কোনোটিকে 'রাজগিরি' বা গিরিশ্রেষ্ঠ বলা চলে। এই পঞ্চ পর্বত পরিবেষ্টিত দুর্ভেদ্য জনপদ 'গিরিব্রজ' বহুকাল মগধের রাজধানী ছিল। রামায়ণে আছে—

চক্রে পুরবরং রাজা বসুর্নাম গিরিব্রজম্ ॥
এষা বসুমতী নাম বসোস্তস্য মহাত্মনঃ।
এতে শৈলবরাঃ পঞ্চ প্রকাশন্তে সমন্ততঃ ॥
সুমাগধী নদী রম্যা মগধান্ বিশ্রুতা যযৌ।
পঞ্চানাং শৈলমুখ্যানাং মধ্যে মালেব শোভতে ॥

(রামায়ণ, আদি কাণ্ড, ৩২ সর্গ)

অর্থাৎ, "বসুরাজা গিরিব্রজ নামে উত্তম নগর নির্মাণ করলেন, হে রাম, সেই মহাত্মা বসু কর্তৃক রচিত হয়েছিল বলে এর অপর নাম 'বসুমতী'। রাম! এই যে চতুর্দিকে পাঁচটি পর্বত দেখা যাচ্ছে, এই 'শোনা' নদী এই পাঁচটি পর্বতের ভিতর দিয়ে মালার মতো শোভায় মগধ দেশের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে।"

মহর্ষি বিশ্বামিত্র যখন রামকে সঙ্গে নিয়ে মিথিলায় যাচ্ছিলেন হরধনু ভঙ্গ করতে, তখন রামচন্দ্রকে তিনি এইভাবে এদেশের পরিচয় দিয়েছিলেন। এর পর সুদীর্ঘকাল আর এ নগরের কোনও উল্লেখ কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। পঞ্চ পর্বতের আড়ালে গা' ঢাকা দিয়ে এ জনপদ যে কী অবস্থায় ছিল কিছুই

'বার্হদ্রথপুরের' ধ্বংসাবশেষ

জানবার উপায় নেই। এর পর একেবারে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে মহাভারতে এ স্থানের উল্লেখ পাই যে, মহারাজ বৃহদ্রথ এখানে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর পরবর্তী বার্হদ্রথ বংশীয়েরা দীর্ঘকাল এখানে রাজত্ব করেন। এই বংশেরই প্রসিদ্ধ বীর জরাসন্ধ মহারাজ এককালে প্রবল পরাক্রমশালী নৃপতিরূপে খ্যাত হয়েছিলেন। মহাভারতের পাঠক মাত্রেই জানেন তিনি মথুরাধিপতি মহারাজ কংসের কুটুম্ব ছিলেন। কংস মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের মাতুল হ'লেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত দুরাচারী নৃপতি, এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে হত্যা করে মথুরার রাজসিংহাসন নিজেই অধিকার করেছিলেন। জরাসন্ধ মহারাজ এ সংবাদ পেয়ে সসৈন্যে মথুরা অবরোধ

করতে আসেন কিন্তু ব্যর্থ ও পরাস্ত হয়ে ফিরে যান। এর কিছুকাল পরে শ্রীকৃষ্ণ মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন ও তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনকে সঙ্গে নিয়ে গিরিব্রজপুরে অভিযান করেন। এইখানে শ্রীকৃষ্ণের চক্রান্তে ভীমসেন বাহুযুদ্ধে জরাসন্ধ মহারাজকে হত্যা করেন। কিন্তু, গিরিব্রজপুরে জরাসন্ধ মহারাজের বংশধরেরা পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হ'য়ে আরও বহুদিন এখানে রাজত্ব করেছিলেন।

এই জরাসন্ধ বধ উপলক্ষে মহাভারতের সভাপর্বে গিরিব্রজের উল্লেখ আছে—

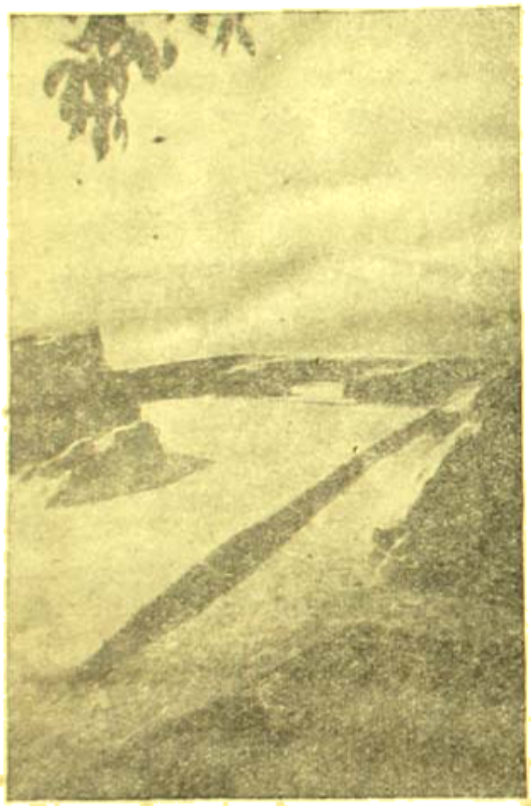

গৃধ্রকূট ('গৃধ্রকূটের' ধ্বংসাবশেষ)

"তেন রুদ্ধাহি রাজানঃ সর্ব্বে জিত্বা গিরিব্রজে।
কন্দরে পর্ব্বতেন্দ্রস্য সিংহেনেব মহাদ্বিপাঃ ॥"

(মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ১৪শ অধ্যায়, ৬১ শ্লোক)

জরাসন্ধ ভারতের অন্যান্য রাজাদের যুদ্ধে পরাস্ত করে তাদের বন্দী করে এনে এই পর্ব্বতের গুহায় আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন ভীম ও অর্জ্জুনকে নিয়ে গিরিব্রজে উপস্থিত হন তখন অর্জ্জুনের কৌতূহল নিবারণের জন্য তিনি গিরিব্রজের এইভাবে বর্ণনা দিয়েছিলেন—

এষ পার্থ মহান্ ভাতি পশুমাদ্যমনুমান।
বিরামঃ সুরেশাত্মো নিবেশো মাগধঃ শুভঃ ॥
বৈহারো বিপুলঃ শৈলো বরাহ বৃষভস্তথা।
তথৈব গিরয়শ্চৈব শুভাশ্চৈত্যক পঞ্চমাঃ ॥
এতে পক্ষ মহাপুণ্যাঃ পর্ব্বতাঃ শীতলাদ্রুমাঃ।
রক্ষন্তী বা ভিসংহত্য সংহতাস্তা গিরিব্রজম ॥
পুষ্প বেষ্টিত শাখাগ্রৈর্গন্ধবদ্ভির্মনোহরৈঃ।
নিগূঢ়াইব লোধ্রাণাং বনৈঃ কামিজনপ্রিয়ৈঃ ॥

(মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ২০ অধ্যায়)

"হে অর্জ্জুন, এই মঙ্গলময় বিশাল মগধরাজধানী শোভা পাচ্ছে; এখানে পশু আছে প্রচুর, সর্বদা জল পাওয়া যায় এবং সুন্দর সব গৃহ বা অট্টালিকা রয়েছে। এখানে কারুর কোনো রোগ নেই, পীড়া নেই। বৈহার, বিপুল, বরাহ, বৃষভ ও চৈত্যক নামে পাঁচটি কল্যাণগিরি ঐ দেখা যাচ্ছে। ঐ পর্ব্বতগুলিতে বৃহৎ বৃক্ষ ও বহু শীতল বৃক্ষ আছে। পর্ব্বতগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গিরিব্রজ নগর রক্ষা করছে। ফুলে ভরা, সুগন্ধে মধুর এবং কামিজনের প্রিয় মনোহর লোধ্রবন এই পর্ব্বতগুলিকে যেন গভীর গহনে গোপন করে রেখেছে।"

মহাভারতের সভাপর্বে 'গিরিব্রজ' নামটি পাওয়া যাচ্ছে, আবার বনপর্বে আমরা একেবারে 'রাজগৃহ' এই নামটিরই উল্লেখ পাই।

ততো রাজগৃহং গচ্ছেত্তীর্থসেবী নরাধিপ ॥
উপস্পৃশ্য ততস্তত্র কাক্ষীবানিব মোদতে।
দক্ষিণা নৈত্যকং তত্র প্রাপ্নোত পুরুষঃ শুচিঃ ॥

(মহাভারত, বনপর্ব্ব, ৮৯ অধ্যায়)

এখানে ব্রহ্মর্ষি নারদ স্বয়ং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে নানা তীর্থের বর্ণনা প্রসঙ্গে রাজগৃহেরও নামোল্লেখ করেছেন। যথা—"রাজা, তারপর তীর্থযাত্রীরা রাজগৃহ তীর্থে গমন করবে। সেখানে স্নান করে কাক্ষীবান মুনির মতো আনন্দ অনুভব করবে। তারপর, মানুষ পবিত্র হ'য়ে সেখানকার 'দক্ষিণীর' নৈবেদ্য ভক্ষণ করবে।"

দুঃখের বিষয় রাজগৃহের এই পুরাণোক্ত শোভা ও সৌন্দর্য্য আজ আর নেই। পাহাড়গুলির অধিকাংশই প্রায় হতশ্রী হ'য়ে পড়েছে—পাথর কাটা ও গাছ কাটার অত্যাচারে। মহাভারতের এই নারদোল্লিখিত 'দক্ষিণী'র কোনও চিহ্নই আজ নেই সেখানে। সুতরাং 'নৈবেদ্য-ভক্ষণ' আর সম্ভব হবে না। তবে, বাংলায় যে কথা আছে—'মরা হাতী লাখ টাকা'। 'রাজগির' সম্বন্ধেও এ উক্তি খাটে। কারণ এখনও এর যা রূপ অবশিষ্ট রয়েছে তা অনেক জনপদেরই নেই। (ক্রমশঃ)

সতীর দেশ

শ্রীঅজিতচন্দ্র সরকার

গঙ্গার ধারে একখানি সামান্য কুঁড়ে ঘর—পাশে ভগ্ন, জীর্ণ শিব মন্দির। ঘরখানিতে আবছায়া অন্ধকার।

ঘরের এক কোণে জ্বলছে একটি প্রদীপ। ও-ধারের জানলার ধারে শয্যার ওপর শায়িত রয়েছে একটি মুমূর্ষু ব্যক্তি। মাথার কাছে দু'টি ডাগর চোখে তাকিয়ে রয়েছে একটি অষ্টাদশবর্ষীয়া বধূ।

চারিদিক্ নিঝুম, কেমন একটা থম্‌থমে ভাব।

—শোনো—রুগ্নব্যক্তি ধীরে ধীরে ডাকে।

বধূটি ঝুঁকে প'ড়ে বলে—বলো।

—দেখো, আমি আর বেশীক্ষণ বাঁচ্‌বো না।

—এ সব কথা আমাকে শুনতে নেই।

—সত্যিই আমি তোমাদের বড় অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে যাচ্ছি। আমায় ক্ষমা করো।

বধূটি স্বামীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ধীরে ধীরে বলে—আমার আগে তুমি যেতে পারো না। আমি প্রতিদিন শুদ্ধ মনে মা জাহ্নবীতে স্নান কোরে, দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে নিয়ত যে প্রার্থনা ক'রি, তা কখনো ব্যর্থ হ'তে পারে না। তাছাড়া আজ যখন আমি আমার ঠাকুরের কাছে আমার প্রার্থনা জানিয়ে বোলেছিলাম—ওগো, দেবতা! তুমি শুধু বোলে দাও যে, আমি কখনো বিধবা হবো কি না? বার বার ঠাকুরের কাছে আমি শুধু এই প্রশ্নই কোরতে লাগলাম। তারপর—

—তারপর? রুগ্নব্যক্তি আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করে।

—আমি শুনতে পেলাম—ঠাকুর বোল্‌লেন—ওরে, না রে না।

—সত্যি…? চক্ষু উজ্জ্বল হোয়ে ওঠে স্বামীর।

—হ্যাঁ—বধূটি বলে।—এ আমার মনের ভ্রম নয়। আমি বিশ্বাস করি, বিধবা আমাকে কোনোদিন হোতে হবে না। তুমি ভালো হোয়ে যাবে। আমার ঠাকুরের কথা কখনো মিথ্যা হোতে পারে না।

মুমূর্ষু ধীরে ধীরে বলে—এই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এসে তোমার মতো ভক্তিমতী স্ত্রী পেয়ে আজ আমারও আশা হোচ্ছে, হয়তো আমি বেঁচে উঠ্‌বো। জান্‌লাটা খোলা আছে না?

—হ্যাঁ।

—আমায় একটু জান্‌লার দিকে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দাও না। বধূটি রুগ্ন স্বামীকে অতি যত্নের সঙ্গে নিপুণভাবে জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে শুইয়ে দেয়।

রুগ্ন স্বামী বলে—বাইরে বড় অন্ধকার; তবু এই অন্ধকারেও আমি বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি—সামনে ঐ গঙ্গা, তার তীরে ঐ বটগাছ—ঘাটের ওপরে ঐ আমাদের শিবমন্দির।…আচ্ছা, নদীতে এখন জোয়ার না ভাঁটা?

—এখন তরা জোয়ার।

—ও। অনেক মহাজনী নৌকা চলেছে পণ্য নিয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে। ওকি! বাঁশী বাজাচ্ছে কে?

—কোন নৌকার মাঝি।

রোগী কেমন চঞ্চল হ'য়ে উঠে বলে—না—না—ওকে বাঁশী বাজাতে বারণ করো।—ওকে থাম্‌তে বলো—ওকে থাম্‌তে বলো। উত্তেজনায় সে হাঁপাতে থাকে।

—ওকে আমি কি কোরে বারণ করি বলো?

—আঃ—তুমি বুঝতে পারছো না। ওরে—বাঁশী তুই থাম।—রুগ্নস্বামী চীৎকার কোরে বলে—বাঁশী থামাও—বাঁশী থামাও—কে আছো! বাঁশী থামাও…

পাশের ঘর থেকে অশীতিপর বৃদ্ধ মদনমোহন সরকার রোগীর ঘরে ব্যস্তভাবে ঢোকেন।

—কি হ'য়েছে, রামবল্লভ, কি হ'য়েছে?—

—বাবা—

রামবল্লভ বলে—ওই বাঁশীকে আপনি থাম্‌তে বলুন… থাম্‌তে বলুন…বাবা…বাবা…

মৃত্যুপথযাত্রী বিছানার উপর ঢ'লে পড়ে—জীবন-প্রদীপ নিবে যায়!

—রামবল্লভ…রামবল্লভ—বৃদ্ধ চীৎকার কোরে ওঠেন।

বধূটি নির্বাক্, নিস্পন্দ—যেন একখানি প্রতিমা।

ভারি গলায় মদনমোহন বোল্‌লেন—বৌমা! আজ তুমি আমায় কি বোলেছিলে?—বোলেছিলে, বিধবা তুমি কখনো হবে না। কিন্তু···

—হ্যাঁ বাবা—বধূটি আধ-ঘোমটার ভেতর থেকে নিরকণ্ঠে বলে—ঠাকুরের কথা মিথ্যা হ'বার নয়, বাবা। বিধবা আমি কিছুতেই হবো না।

—এ কেমন কথা মা? এদিকে আমার রাম যে···

শ্বশুরের কথায় বাধা দিয়ে বধূ ব'লে ওঠে—আমি সহমৃতা হবো, বাবা।

—বৌমা!

—আপনি সব বন্দোবস্ত ক'রে দিন, বাবা।

—তোমার ঐ একরত্তি ছেলে?

—আপনার আশীর্বাদ।

ক্রমে প্রভাত হয়।

প্রতিবেশীরা বধূকে সহমৃতা হোতে নিরস্ত হবার জন্যে কত অনুরোধ করে; হাজার রকম ভয় দেখায়। পঞ্চম-বর্ষীয় পুত্র গঙ্গাচরণ কিছু বুঝতে না পেরে মাকে জড়িয়ে ধ'রে ঝুলে ঝুলে কাঁদতে থাকে। না কিন্তু সংকল্পে অটল!

কুলপুরোহিত চক্রবর্তী মশাই এসে বধূকে শাস্ত্রের নানা-প্রকার ব্যাখ্যা কোরে বোঝান যে, সহমরণ অবশ্য-প্রতিপাল্য বিধি নয়—বিধবার ব্রহ্মচর্য্যই শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। কিন্তু বধূ সোণামণিকে কিছুতেই বুঝিয়ে উঠ্‌তে না পেরে শেষে তিনি ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেন।—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেন—আর, দেখো মা। গিন্নীর কাছে শুন্‌লাম—তুমি মা, কাল থেকে অশুচি—কোনো কাম্য বা নৈমিত্তিক ক্রিয়া ত এ অবস্থায় তোমার দ্বারা হ'তে পারে না।

বধূটি লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গিয়ে বলে—চারদিনের দিন মা-গঙ্গায় ডুব দিয়ে শুদ্ধ হ'লেই হ'বে ঠাকুর মশাই।

বৃদ্ধ মদনমোহন ঘরের একধারে দু'হাত মাথার দু'পাশে রেখে চুপ্‌চাপ ব'সে ছিলেন। সহসা দাঁড়িয়ে উঠেই তিনি চীৎকার ক'রে ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌লেন,—বল্‌লেন—তুমি, মা! আমার এই মরা ছেলে কোলে ক'রে দু'-তিন-দিন গঙ্গাবাস ক'র্‌বে! তা হয় না, সে হ'তে পারে না, মা! এ অসম্ভব।

—সরকার মশাই ঠিকই ব'লেছেন—মৃতদেহ এতদিন রাখার বিধি নেই—পুরোহিত ব'ল্‌লেন।

বধূটি মাথার কাপড় আর সরিয়ে দিয়ে পুরোহিতের দিকে কটমট ক'রে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে—

—রাজা দশরথের শব কদ্দিন রেখে দেওয়া হয়েছিল? তারপর হাতজোড় ক'রে একটু কঠোর কণ্ঠে ব'ল্‌লে—

—আপনারা আমায় একটু একলা থাকতে দিন।

স্বামীর মাথা কোলে তুলে নিয়ে সাবিত্রীর মত সোণামণি গুম্ হ'য়ে ব'সে রইল।

মৃত রামবল্লভকে আনা হ'ল গঙ্গার তীরে বটবৃক্ষের ছায়ায়—অনুগামী হ'ল সেই সতীশিরোমণি বধূটি—যে স্বামী ছাড়া আর কিছুই জানে না। সতীকে তিন দিনের বদলে, মরা স্বামীকে কোলে ক'রে কাটাতে হ'ল সাত দিন—সাত রাত্রি।

দিনের পর দিন কাটতে থাকে। লোকের মুখে মুখে চলে যায় এই খবর—দেশ-দেশান্তরে। বধূটির মা-বাপ এসে হাজির হলেন সর্সা থেকে। ওপারের ভাটপাড়া ঝেঁটিয়ে লোক এল এপারের চুঁচুড়ার ক্যাকশিয়ালীর বটতলার ঘাটে। আসে মূলাজোড়, নৈহাটী, রাণাঘাট, শ্যামনগর, ত্রিবেণী, শ্রীরামপুর হোতে রথ-দোলের মত, গোয়ারামাটির মত—কাতারে কাতারে হিন্দু-মুসলমান—স্ত্রী-পুরুষ—বালক-বালিকা। একদল নৌকায়, একদল—গোরুর গাড়ীতে, আবার একদল বা পদব্রজে। চুঁচুড়ার ক্যাকশিয়ালীর বটতলার ঘাট হোয়ে ওঠে পূত তীর্থস্থান।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে কেটে যায় সাত দিন। অষ্টম দিনে সাধ্বী বধূ গঙ্গায় স্নানান্তে ইহলোকে ভগবানের শেষ আরাধনা কোরে নেয়।

হঠাৎ অশ্বপৃষ্ঠে মহামান্য ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর ও পুলিশ সাহেবের আগমন। জনতা সসম্ভ্রমে পথ কোরে দেয়। মাথার হাট নামিয়ে, অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় তাঁরা বধূটিকে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, এসব অন্যায়—ঘোরতর কুসংস্কার। বধূটি কোনো কথার উত্তর দেয় না। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তবুও বলেন—আগুনের উত্তাপ সহ্য ক'র্‌তে না পেরে নিশ্চয়ই তুমি চিতা থেকে আধপোড়া হ'য়ে উঠে আস্‌বে।

বধূটি নির্ব্বিকার ভাবে সামনের প্রদীপের শিখার ওপর

তার ডান হাতের ক'ড়ে আঙুলটি ধরে। পট্‌পট্ শব্দ ক'রে আঙুলটি পুড়ে যায়।

সেই চলচল মুখখানিতে কষ্টের কুঞ্চন নাই—সেই টানা-টানা চোখে ভীতির চিহ্ন নাই।—সে দেবীপ্রতিমা 'অচলদম —অটল-স্থির'।

—Oh! My God! Mark the girl's wonderful strength of mind!

সেই অপূর্ব তেজসম্পন্না সতীরাণীর কাছে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমস্ত যুক্তি তর্ক পরাজিত হ'ল। এমন কি শেষ পর্যন্ত তিনি পুলিস সাহেবসহ স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থেকেও কোনরূপ বাধা দিতে পারলেন না সতীর সদ্য-মৃত্যুতে।

সোনামণির মাতা কাঁদতে কাঁদতে ব'ললেন—

—এই ক্ষুদ-কুঁড়োটিকে—দুধের বাছাকে ফেলে যেতে তোর কষ্ট হ'বে না, সোনা? তোর কি মায়া-মমতা একটুও নেই, মা?

মায়ের প্রশ্নের উত্তর না-দিয়ে, শিশুপুত্রের মাথায় হাত রেখে সতী হাসিমুখে বলে,

—আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি, গঙ্গা! তোকে এই দারুণ দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হবে না—তুই রাজা হ'বি। তুই বিদ্বান হ'বি, ধার্মিক হ'বি—দেশজোড়া হ'বে তোর নাম—আর তোর থেকেই সুরু হ'বে সরকার বাড়ীর সুনাম।

শিশু গঙ্গাচরণ মাকে প্রণাম করে, মরা বাপের পায়ের ধুলো নেয়—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

তারপর, সেই পরম পবিত্র মুহূর্ত এসে উপস্থিত হয়। মৃত স্বামীর পার্শ্বে গৌরীরূপা বধূসতী শয়ন করেন। চিতায় অগ্নিসংযোগ হয়। সমবেত জনতা তুমুল ধ্বনি ক'রে ওঠে —হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

শিশু গঙ্গাচরণ ঠাকুরদাদার কোলে চ'ড়ে কাঁদতে থাকে—শোকে, না ভয়ে—তা সে বুঝ্‌তে পারে না।

চড়্‌চড়্ শব্দে লেলিহান অগ্নিশিখা দীপ্ত হোয়ে ওঠে। বটবৃক্ষের জটে জটে জড়িয়ে জড়িয়ে ধূমকুণ্ডলী ক্রমে উর্দ্ধে উঠে মহাশূন্যে বিলীন হ'য়ে যায়!

সতীসাধ্বী সোনামণির ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিল।

ছাপান্ন বৎসর পরে, তখন সরকার বাড়ীর যশোভাতি সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছে। এই কাঁকশিয়ালী ঘাটের বটবৃক্ষকে সম্বোধন ক'রে সাধু জন গঙ্গাচরণ তাঁর একমাত্র সন্তান অক্ষয়চন্দ্রের 'সাধারণী' পত্রিকায় লিখ্‌লেন—

'তরু তব জানা আছে, তবু তাজে তব কাছে,
পতিসঙ্গে যে সব রমণী।
তা'র মাঝে এক সতী পতিব্রতা গুণবতী
এ দীনের ছিলেন জননী॥

• • •

'হেথা হ'য়ে ভক্তিমতী সাত পাক ফিরি সতী
লয়েছেন চিতায় আসন।
রক্তচেলি পরিহিতা সিন্দূরে শোভিছে সীঁথা
মুক্তকেশী অপূর্ব্ব দর্শন॥

গলে দোলে পুষ্পমালা, প্রেতভূমি করি আলা,
শবপাশে শোভিছে সুন্দরী।
শ্মশানে শঙ্কর যেন, ঘোর ঘুমে অচেতন—
বামে ব'সে আছেন শঙ্করী॥

নয়ন প্রফুল্ল অতি ভাতিছে ভক্তির জ্যোতি,
মুখোপরি হর্ষের উচ্ছ্বাস;
বিশ্বাস মনে, লভিবে পতির সনে
অবিলম্বে স্বর্গে চিরবাস।

পরে সতী এ জগতে, ঐহিক বান্ধব হতে,
একে একে লইয়া বিদায়,
পুত্রে আশীর্ব্বাদ করি, পতি-শব বক্ষে ধরি,
প্রেমানলে ত্যজেন চিতায়।'

১১৭ বৎসর চ'লে গেছে, কিন্তু আজও পল্লীনারীরা স্নানান্তে ঘটী ক'রে এই বটগাছের গোড়ায় গঙ্গাজল ঢেলে দেয়—সেই স্বামিভক্তিপরায়ণা, গৌরীরূপা, সতীশিরোমণি বধূটির অমর আত্মার উদ্দেশে।

নূতন দিল্লীর ভারতীয় কলা প্রদর্শনী

শ্রীস্বপনকুমার সেন

নূতন দিল্লীর ন্যাশনাল আর্কাইভ্‌স ভবনে যে কলা প্রদর্শনী কয়েক মাস ধরে জনসাধারণের জন্য খোলা রয়েছে। সেটি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

প্রদর্শনীর জন্য ভারতীয় শিল্প বিভাগের কর্তৃপক্ষের ধন্যবাদ জানাই। এই ভাবে জনসাধারণের মনে ভারতীয় সংস্কৃতির ছাপ কিছুটা প্রতিফলিত করতে চেষ্টা করেছেন তাঁরা। যদিও সাধারণ দর্শকের কলা প্রদর্শনী দেখার আগ্রহ অপেক্ষা লাইভলস দেখার আগ্রহ বেশি। তবু বলব এ ধরণের প্রদর্শনীর যথেষ্ট সার্থকতা আছে। আজ না হোক, আজ

১নং চিত্র

আজ এই গুলোই আমাদের অচেতন মনে চেতনার সঞ্চার করবেই।

প্রদর্শনী কক্ষের বাঁ দিককার অলিন্দ থেকে আমরা শুরু করলাম দেখতে। প্রাচীন ভারতের ধারাবাহিক ইতিহাস অনুযায়ী সাজাতে চেষ্টা করেছেন কর্তৃপক্ষ।

ভারতের সভ্যতা কত প্রাচীন ও মহান তার প্রত্যক্ষ নিদর্শন হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়ো থেকে শুরু করে ইলোরা, অজন্তা, আবুপাহাড়, কোনারক, ভুবনেশ্বরের মন্দির আর বিগত যুগের সৃষ্টি কলা পর্যন্ত দেখে বিস্ময় বিহ্বল হতে হয়।

একটির পর একটি প্রস্তর মূর্তি দেখে ভারতের প্রাচীন মূর্তি শিল্পের একটা ধারাবাহিকতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে শুরু হয় মূর্তি শিল্পের ক্রমোন্নতিকারী সাধনা। হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেব দেবী থেকে আরম্ভ করে, নানা ভূষণপাঠায় সজ্জা, যক্ষ, যক্ষীর যুগল মূর্তি অন্তরস্পর্শী রূপ, রস পূর্ণ ভাবভঙ্গী আর অপূর্ব্ব অঙ্গ সৌষ্ঠব। দেহ ও মনের সৌন্দর্য্য নিখুঁত ভাবে ফুটে উঠেছে মূর্ত্তিগুলির প্রত্যেক ভঙ্গিতে। এগুলি থেকে অনুমান করা কঠিন হয় না—তখনকার শিল্পীদের সৌন্দর্য্য-বোধ-শক্তি কত প্রখর ছিল, তাদের অনুভূতি ছিল কত সূক্ষ্ম।

বৌদ্ধ যুগের বহু প্রকারের শিল্প নিদর্শন কিছু না কিছু আনা হয়েছে এই প্রদর্শনীতে। মূর্ত্তি, নক্সা, অশোকস্তম্ভ, গুহা-প্রাচীর খোদাই-করা কারু শিল্প। ছোট, বড়, ভাঙ্গা চোরা নানান আকারের।

বৌদ্ধ যুগের অন্তকাল পরেই, মৌর্য্য যুগ ; প্রথম খৃষ্টাব্দ। ভারতীয় শিল্পকলা তখন ক্রমবিকাশের পথে, তাই পরবর্ত্তী কালের মথুরার মূর্ত্তি-গুলি আরও প্রাণবন্ত বলে মনে হয়। দুটি যুগের দুটি মূর্ত্তি পাশাপাশি রাখলেই পূর্ব্বের স্তরে পরবর্ত্তী যুগের কলা নৈপুণ্যের তারতম্য উপলব্ধি করা যায়। লাল বালির পাথরে মথুরার প্রাচ্য দণ্ডায়মান বুদ্ধ মূর্ত্তি (প্রতিলিপি নং ১) পিছনে হবির সূক্ষ্ম কারুকার্য্য অপূর্ব্ব। কি সৌম্য ও শান্তির স্নিগ্ধ ভাবটি শিল্পী ধরে রেখেছেন শিল্প-পাষাণে। অবশ্য কেটেছে আমাদের এই ভগ্ন বুদ্ধ মূর্ত্তিটির পাশে এসে, পাশের প্রদর্শিত মূর্ত্তিগুলি দেখতে দেখতে কত বার বুদ্ধ মূর্ত্তিটির পাশে আসতে হয়েছে তার হিসাব নাই।

থাম ও রেলিংএর নারী মূর্ত্তি গুলিও নিছক নয়, নারী সুলভ কমনীয়তা ফুটে উঠেছে প্রত্যেক ভঙ্গিতে (প্রতিলিপি নং ২ ও ৩) একটি একটি নারী মূর্ত্তি, যাদের উপর একটি পাখি, টিয়া বলেই মনে হয় যেন। এক হাত তার বাম কটিদেশে, অপর হাতে একটি পাখির খাঁচা। প্রতিটি ভঙ্গিমার জন্য প্রত্যেক নারী। ভঙ্গিমায় নারীসুলভ কমনীয়তার অভাব। শিল্পী তার ব্যঞ্জনায় বাস্তবতার মাপকাঠি যেন চলেছেন—তাই এগুলো সাধারণের পক্ষেও সমান ভাবে রস পরিবেশন করতে পেরেছে। ভারতের এই ঐতিহ্য সারা বিশ্বের শিল্পী সমাজকে অনুপ্রাণিত করেছে সন্দেহ নাই। আজও তার প্রমাণ পাওয়া যায় মধ্য এশিয়া, চীন, জাভা, বর্মিও, সুমাত্রা প্রভৃতির শিল্প কলার মধ্যে। ভারত সম্রাট অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারের সঙ্গে সংস্কৃতির আদান প্রদান ঘটেছিল বিভিন্ন বৈদেশিকদের মধ্য দিয়ে।

আধুনিক জাপান বুদ্ধ মূর্তির কলা নৈপুণ্যে ভারতীয় বৌদ্ধ যুগের ছাপ বহন করে চলেছে। এই আদান প্রদান ঘটেছে যুগে যুগে, শুধু

২নং চিত্র

৩নং চিত্র

ভারত-জাপানই নয়, বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গেও এই আদান প্রদান ঘটেছে ভারতের। আলেকজাণ্ডার কর্তৃক ভারত আক্রমণের ফলে হয়েছে ভারত ও গ্রীসের মধ্যে সংস্কৃতির আদান প্রদান। ভারতে মুসলমান রাজত্বকালে ঘটেছে পারস্যের সংস্কৃতির ছাপ; আর ইংরাজ দেশে রেখে গেছে ইয়োরোপের মিশ্র সংস্কৃতি কিছু কিছু।

তাই তো খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে হিন্দু সংস্কৃতির সুস্পষ্ট ছাপ পড়ে ইতিহাসের পাতায়। আমরা যখন বিভিন্ন দেব দেবীর মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়; আরও সূক্ষ্ম ও সুনিপুণ কারিগরির দিকে ঝুঁকে পড়েন শিল্পী গোষ্ঠী। মধ্য যুগের মূর্তিগুলিতে তাই অলঙ্কার বাহুল্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। একথা সহজেই অনুমেয়, ভারতে তখন হিন্দু আধিপত্য বিস্তার লাভ করেছে।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মৃৎমূর্তি 'সারস্বতী' (প্রতিলিপি নং ১)। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর বিহারে প্রাপ্ত শুক্লযুগের নারী মূর্তি—মোবাই কন্যা। পাখি নাচাচ্ছে অঙ্গুলি হেলনে। কবির কথায় "তবন শিখিরে নাচাও পুলিনা পখিরা।" খৃষ্টীয় ষষ্ঠ কিম্বা সপ্তমের। প্রতিলিপি নং ৪) একটী নারী দেহের বিন্যাস। এটির সম্বন্ধে বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়। তবু এই দুটুই বললে যথেষ্ট হবে, অপূর্ব রীতিনীতি ভরা ছন্দোময়

৪নং চিত্র

গ্রীস সভ্যতার দান—যেমন "ভেনাস"। যা কিছু পৃথিবীতে হে মাতামাতি—গুপ্ত যুগের এই মেয়ে ভাস্কর্যটি তা থেকে কোনও অংশে কিছুই তো নয়ই, বরং অনেক ক্ষেত্রে উৎকৃষ্টতর।

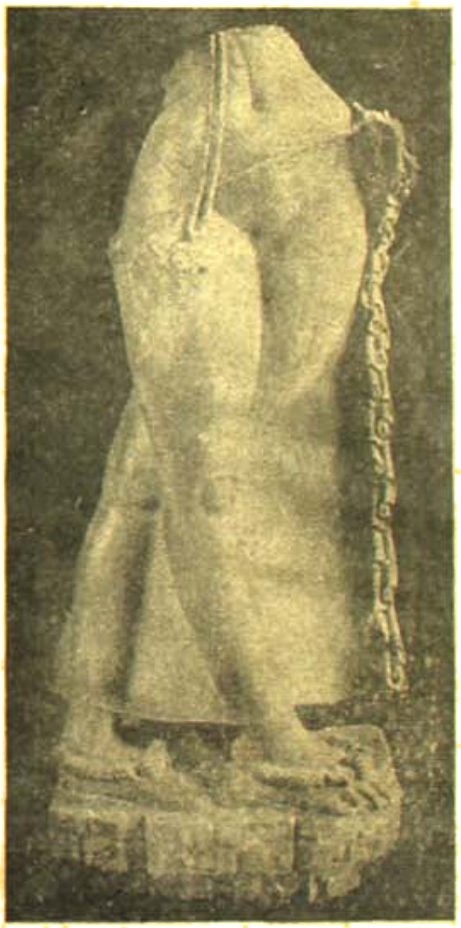

৫নং চিত্র

এলিফেন্টা গুহার ত্রিমূর্ত্তি শিব, উড়িষ্যার বহুপাণি, ভুবনেশ্বরের হরিহর। নারীমূর্ত্তি—এগুলি গুপ্ত যুগের অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগের বলেই অনুমান করা যায়। এই সময় ইলোরা এলিফেন্টার সৃষ্টি হয়, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আবুপাহাড়ের মন্দির, ভুবনেশ্বরের মন্দির, কোনারকের সূর্য্য মন্দির প্রভৃতি ভারতের কলাকুশলীদের দেই দান।

নবম ও দশম শতাব্দীর কোনও মূর্ত্তি এখানে ছিল না। এই সময় ভারতে ছোট ছোট চিত্র কলার প্রচলন হয়েছিল বড় বড় গুহা-চিত্রের বদলে। বাংলার পট-শিল্পেরও সুরু হয় সেই যুগে। তারপর দশম একাদশ শতাব্দীর "মা ও শিশু" দর্শন হয়ে দীনস্বিমী" একখানি দান পাথরে। ভুবনেশ্বর ও কোনারকের কারুকার্য্যের

৩নং চিত্র

মধ্যে এগুলিকে কিছুটা পাওয়া যায়। সে সময় শুধু যে ভারতের এক একটি বিশেষ স্থানে এই কলা-কুশলীদের নিপুণতা প্রকাশ পেয়েছিল তা নয়। তখনকার ভারতে, কি আর্য্যাবর্ত্তে অথবা দাক্ষিণাত্যে, শিল্পকলার উৎকর্ষতা দিন দিন ক্রমবিকাশের পথেই চলেছিল।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মহিষুরেপ্রাপ্ত বক্রবেণি নারীর পত্র পরীক্ষা (প্রতিলিপি নং ৬) এবং বিকানিরের প্রাপ্ত "সরস্বতী" (প্রতিলিপি নং ৭) একই সময় বিভিন্ন শিল্পীর তৈয়ারী ভারতের দুইটি বিভিন্ন অংশের কাজ। প্রথমটি দাক্ষিণাত্যের লোকালয়ের বাহিরে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার আংশিক

ছবি। ভঙ্গিটির মধ্যে সহজ স্বচ্ছতার বর্ত্তমান। মুখ ও চোখের কোনটিতে একাগ্রতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আবার আর্য্যাবর্ত্তের রাজপুতানার প্রগাঢ় হিন্দু সংস্কৃতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত "সরস্বতী" জ্ঞান ও সাধনের অপূর্ব্ব মহিমামণ্ডিত দেবী মূর্ত্তি। মহিষুরের তুলনায় আরও সূক্ষ্ম কলা নৈপুণ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায় বিকানিরের সমসাময়িক কাজের মধ্যে। অনেকানেক স্থলে সূক্ষ্মতার ছাপ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী

৪নং চিত্র

যুগকে ছাপিয়ে গিয়েছিল এবং বিকানির ও জয়পুরের শিল্পীরা সেই সম্মান লাভ করেছিলেন সে যুগে।

ধাতু শিল্প সম্প্রদায়ের মধ্যেও সমধিক প্রসার লাভ করে। অজন্তার প্রাচীনতম বর্ত্তমান মূর্ত্তিটি ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ। খৃষ্ট পূর্ব্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে সিন্ধু উপকূলে ধাতু শিল্পের বিশেষ উন্নতি দেখা যায়। পাল যুগেও ধাতু শিল্পের উৎকর্ষতা দেখা যায়। এগুলি মূর্ত্তিগুলি ভাবব্যঞ্জনায় অনেক অংশে দক্ষিণ ভারতের ধাতু শিল্পের অনুরূপ। আর্য্যাবর্ত্তে যখন প্রস্তর শিল্প উৎকর্ষতার চরম-কাষ্ঠিতে ঈর্ষণীয় অধিকার করেছে তখন খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বাদশ শতাব্দী। দাক্ষিণাত্যে তখন ঢোল যুগ। ধাতু শিল্প সে সময় ক্রমবিকাশের পথে। "পঞ্চরাজ" "ঢোল মহারাণী"র সহজ, সুন্দর, সাবলীল ভঙ্গি

সাধারণ দর্শকের কাছে সহজ-বোধ্য হয়েছে। বাঙলার দেশের "জননী" ও "পার্ব্বতী" মূর্ত্তিগুলিও সূক্ষ্ম শিল্পের নিদর্শন।

এরপর এগিয়ে এলাম চারুকলা প্রদর্শনীর অলিন্দে। ভারতের প্রাচীন চিত্রাবলীর সংগ্রহ প্রশংসনীয় নিঃসন্দেহ। অজন্তা গুহাচিত্রের কতকগুলি প্রতিলিপি এখানে দেখান হয়েছে। প্রতিলিপিগুলি, শিল্পী এস-আমেদের অঙ্কিত। অজন্তা গুহাচিত্রের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় নাই। আলোকচিত্রে অজন্তার গুহাচিত্রগুলির যে নমুনা পাই শিল্পাচার্য্য নন্দলালের ছাত্রাবস্থায় অঙ্কিত কয়েকখানি প্রতিলিপিতে সে বৈশিষ্ট্যের ছাপ দেখেছি, এগুলিতে আর পূর্বাভাস আছে বলে মনে হয় না। ও বিষয়ে এর বেশী মন্তব্য করা আমার অধিকারের বাহিরে। সম্ভবত খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পর বিরাট গুহাচিত্র ও প্রাচীর চিত্রের স্থানে ছোট ছোট চিত্রাবলীর প্রচলন আমরা দেখতে পাই। নানা বর্ণ বৈচিত্র্যে পাণ্ডুলিপির প্রচলন সুরু হয়, সেই সময় আরও কয়েকখানি চিত্রাকর্ষক নিদর্শন প্রদর্শিত হয়েছে। খৃষ্টীয় নবম হতে দ্বাদশ শতাব্দীর বাংলার পাল রাজ্যকালীন চিত্রী শিল্পগুলি, অতি সূক্ষ্ম রসজ্ঞানের পরিচয় দেয়। এধরণের ছবির বৈশিষ্ট্য এক কথায় বলা যায় না। নিপুণ রেখা, বর্ণবিন্যাসে বৈচিত্র্য, তদুপরি বহুল বিষয়বস্তু নির্ম্মাণ শিল্পীর পক্ষে কম কৃতিত্ব নয়। কথায় আছে—

"কালি কলম মন
লেখে তিন জন"

উক্ত শিল্পীর আত্মনিবেদনের ভাবটি ফুটে উঠেছে এই পটশিল্পে। এই গুলিই বাঙলার আদি পট শিল্প।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত গুজরাটের চিত্র কলার বিশেষ উন্নতির আভাস পাই আমরা। ছোট ছোট ছবি গুলিতে রেখার সাহায্যে, জটিল অলঙ্কারের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য প্রকাশের চেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে মনে করি। ছবিগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে; সম্মুখের জমিতে ঘন উজ্জ্বল রং ব্যবহার করেছেন শিল্পী এবং তার চেয়ে উপরের অংশে অপেক্ষাকৃত হালকা রং—অর্থাৎ দূরত্ব বজায় রেখেছেন। শেষ ভাগে অর্থাৎ আকাশের নীলচ্ছ অসীমের বুকে শুধু সূর্য্য রশ্মির বর্ণচ্ছটা।

রাজপুত চিত্রে নারীর কোমলাঙ্গের বর্ণ বিন্যাস ও গঠন লৌষ্ঠব শান্ত সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি সত্যই চমৎকার। যদিও মুঘল আমলের চিত্রগুলি অভিজাত শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ জীবন যাত্রার কোনও ইঙ্গিতই নাই এগুলিতে কিন্তু কাংড়া, রাজপুত বা পাহাড়ী চিত্র সেই যুগের লোকসমাজের বহু ইঙ্গিত ধরে রেখেছে। এছাড়া রাজপুত, কাংড়া ও পাহাড়ী চিত্রগুলির বর্ণ সম্ভারের বৈচিত্র্য দর্শককে মুগ্ধ করে। উজ্জ্বল বর্ণবিন্যাস সত্ত্বেও এত দুটু লবণয় যে দর্শকের চক্ষুকে কোথাও পীড়ন করে না। বিভিন্ন রাগ, রাগিনী, সুরের মূর্চ্ছনাকে রং ও রেখার সাহায্যে পটে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে এই রাজপুত ও পাহাড়ী চিত্রে। মিলন ও বিরহ প্রকাশের জন্য নর নারীর অপরূপ ভাব চিত্রিত করা হয়েছে। হাতে করে বিভিন্ন দেশের রাগ রাগিনী, সেই দেশের বিভিন্ন ঋতু, দিবস ও রাত্রির বিভিন্ন প্রহরের সঠিক বর্ণনার সূক্ষ্ম পরিবেশ তাতে পাওয়া যায়।

মুঘল চিত্রকলার আলোচনা করতে গিয়ে আগেই বলব পড়ে আকবর বাদশার রাজত্ব কালে সংস্কৃত ও পার্শিভাষায় লিখিত কয়েক খানি পাণ্ডুলিপির প্রতি। মুঘল যুগের চিত্রাঙ্কনের নিদর্শন পাওয়া যায় প্রত্যেক পৃষ্ঠায়। আকবর বাদশার অতিপ্রিয় আকবর নামা হামজানামা রজম নামা, ইয়ার-এ-বাদিশ—এগুলির প্রতি পৃষ্ঠায় রসজ্ঞ দর্শক যথেষ্ট আনন্দ পাবেন। মুঘল চিত্রে পারস্যের সংস্কৃতির ছাপ পাই। যদিও স্থাপত্য শিল্পে তার বিকাশ আরও ব্যাপক। তার নিদর্শন আগ্রা,

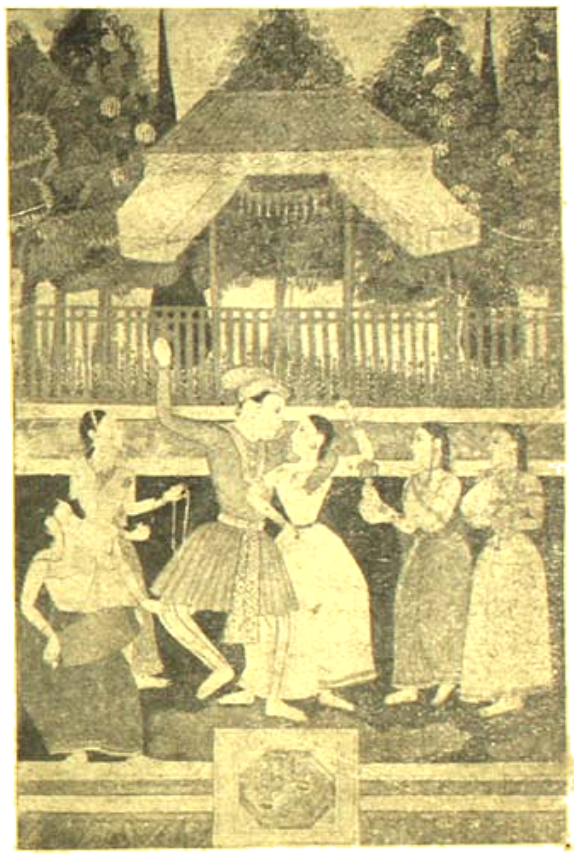

৮নং চিত্র

দিল্লী, ফতেপুর। ফতিমাবাদের স্থাপত্য শিল্পেও বহুল পরিমাণে সে নিদর্শন দেখতে পাই। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জাহাঙ্গীরের সময়ের একখানি ছবি "দৈত্য যুদ্ধ" (প্রতিলিপি নং ৮)

পাহাড়ী চিত্রে পশু, পক্ষী, উট, অশ্বের, ছবিগুলির তুলনা হয় না। বেগবদের ছবি—শিকার ও পোলো খেলার দৃশ্য দেখে মনে হয়, মুঘল যুগে রাজপুত ও পাহাড়ী চিত্রকলা উৎকর্ষতার চরম শিখরে উন্নত হয়েছিল।

মুঘল যুগোপযোগী শিল্প, চিত্রশিল্প, রেশম ও জরির কারুকার্য্য— পালিচার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণীয় বস্তু বলা যেতে পারে। মুঘল বাদশাহের দরবারের জন্য জয়পুর রাজের উপহার দেওয়া

গালিচা অতি মনোরম। এত বিরাট গালিচা আমি ইতিপূর্বে দেখিনি। তবিও আবিকল্পে কোনও কোনও যায়গা নষ্ট হয়ে গিয়েছে কালের বিবর্তনে, তবু এর বিশাল আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর তানজোরের ছাপা শাড়ীর রঙের মনোহারিত্ব আমাদের মুগ্ধ করেছে। ঢাকার মসলিন ও বালুচরের কাঁথা শিল্পের কয়েকখানি নমুনা দেখবার প্রবন্ধটিতে।

বঙ্গিন ভারতের হস্তিদন্তের উপর কারুশিল্পগুলি অপূর্ব। অজস্র হস্তীদন্তের ভাস্কর্যের জন্য বিখ্যাত। একজোড়া হস্তীদন্তের মধ্যেকার কারুকার্য দেখলে সত্যই বিস্মিত হতে হয়—শিল্পী এত সূক্ষ্ম ও সুনিপুণ ভাবে খোদাই করেছেন। ছুরাশিটি ক্ষুদ্র মনুষ্যমূর্তিগুলি তীক্ষ্ণ যন্ত্রে যেখানে যেমনই প্রয়োজন চাপ দিয়ে বসানো খোদাই করেছেন। অদ্ভুত তাদের সংযম—একটু চঞ্চলতা হাতের সামান্য একটু কাঁপুনিতে সমস্ত কারুটি পণ্ড হয়ে যেতে পারত যে কোনও মুহূর্তে।

সর্বশেষে দেখলাম পণ্ডিতজীর সংগ্রহ। আভার পুতুল নাচের একটি নমুনা এখানে রাখা হয়েছে। সত্যই পণ্ডিতজীর রুচির তারিফ না করে পারলাম না। পাতলা কাঠ কিম্বা পিচ্ বোর্ডে (পরীক্ষা করতে পারিনি) নানান রঙে আঁকা ; কেটে ছেঁটে লম্বা সুতো বেঁধে পুতুল-গুলি ইচ্ছামত নাচানর ব্যবস্থা করে নেওয়া হয়েছে। আর কথায় বোঝান যাবে না। দেখতে এগুলি যেমন অদ্ভুত, আর তেমনই আনন্দদায়ক। নাচ আরম্ভ করলে যা জানি কত উপভোগ্য হবে।

পরিশেষে মন্তব্য করতে হলে এই কথাই বলব এধরণের প্রদর্শনী সাধারণের গোচরার্থে এই প্রথম।

নিমডির সত্যাগ্রহ

অধ্যাপক শ্রীসনৎ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২১শে এপ্রিল, ১৯৪৯

সত্যাগ্রহের দ্বিতীয় পর্যায়ে আর চারিজন যাবার অন্তর্গত নিমডি গ্রাম এবং ধরাবাজারের আরো দুই জায়গা মনোনীত হয়েছে। বিভূতিবাবুরা[১] বললেন, আমাদের পক্ষে নিমডি যাওয়াই সুবিধে হবে, কারণ ও সাবডিভিশনই অপেক্ষাকৃত কাছে।

সত্যাগ্রহ শুরু হবার কথা বেলা দশটায়। কলকাতা থেকে সকাল সাড়ে ছটায় যে ট্রেনটা আসে সেটাতে আমরা চড়ে বসলাম। শ্রীযুতবাবু[২] অরুণবাবু[৩], বিভূতিবাবুর বোন ও সুবোধবাবুর[৪] স্ত্রী বাসন্তী দেবী, ভলান্টিয়ার পথে নাগপুর থেকে আর বেঙ্গল স্টুডেন্টস কনফ্রেন্সের তরফে যিনি এসেছেন সেই ধীরেন ভৌমিক এবং আরো অনেকে তওনা হলাম।

নিমডি পুরুলিয়া থেকে ২৮ মাইল দূর। এখানে অধিবাসীর সংখ্যা বেশি নয়। শ পাঁচেক হবে ঘরোয়া জোর। অধিবাসীদের মধ্যে আছে ভূমিজ সর্দার এবং বেশির ভাগই বাগতো কুর্মী। লোক বেশি নেই, কিন্তু গাঁটার আয়তন ছোট্ট। ঘিঞ্জি নেই, ফুলোপানা চকর।

স্টেশনে নেমে শুনলুম আজকে পাশের গাঁ ঝালদিতে হাট আছে। সুতরাং সভায় আশানুরূপ লোক জড়ো হবার সম্ভাবনা কম। লোকেরা সব হাটে যাবার যোগাড়ে ব্যস্ত। এমন ভাবে কিসে সেই সন্ধ্যায়, আলো জ্বলে যাবার পর।

চারধিকে প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোহর। অল্প দূরে, গাঁটাকে ঘিরে, মলমা কাঁটকি প্রভৃতি ছোটখাটো পাহাড়ের সারি চলে গেছে। শ্রীযুতবাবু বললেন এই পাহাড় রাঁচী থেকে আরম্ভ করে বিন্ধ্য অবধি প্রায় বিস্তৃত—এক হিসেবে বিন্ধ্যেরই অংশ বলা যায়। এখানে মাটি চীনেমাটির আকর আছে। সোনা রুপো এবং আরো অনেক খনিজদ্রব্যও মেলে। শ্রীযুতবাবু এসব বিষয় খুব চর্চা করেছেন। তিনি নানান ইতিহাস ফুসোন করতে লাগলেন এই অঞ্চলটার।

এতাবৎ এখানে কংগ্রেসের কাজ বিশেষ কিছু হয়নি। মানভূমের সর্বত্রই কংগ্রেসের বাণী বহন করে গঠনকর্মীরা বিপুল প্রচেষ্টায় জনগণকে আলোক-বর্তিকা দেখিয়েছেন, কিন্তু এই অঞ্চলটি যে কোনো কারণেই হোক খানিকটা অনাবৃত রয়েছিল। তাই, গান্ধীজীর মৃত্যুর পর, সুবোধবাবু ওয়ার্ধা থেকে ফিরে এসে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে এখানে বসবাসের স্থির করেছেন এবং কেতুডাঙাতে একটি সাময়িক আশ্রম গড়েছেন আর মান আষ্টেক হল। আশ্রমের জন্যে স্থায়ী গৃহ এবং বুনিয়াদী শিক্ষাশিবির ও একটি নারীকল্যাণ কেন্দ্রের নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়েছে নিমডি স্টেশনের ঠিক পাশেই। ঘর তৈরী হচ্ছে মাটি আর পাথর দিয়ে।

আবহাওয়া ভালো। স্বাস্থ্য ভালো। জলে প্রচুর লোহা আছে। চারধিকে শাল পলাশের বন, ঘুরে পাহাড়, মাটি গেরুয়া রঙের পাথুরে আর বালি মেশানো, সালফ্রাশ প্রান্তিকেরা—কাজ করার আনন্দ আছে এখানে—যে আনন্দ আমরা শহরের লোকেরা চট করে বুঝে উঠতে পারবো না। কিন্তু পারবেন সুবোধবাবু, পারবেন ওঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবী—যাঁদের চোখে ভারতবর্ষ তার সাত লক্ষ গ্রামের মধ্যে রূপ পেয়েছে—পারবে সেই জন্যই যারা মেট্রোপলিটান, চাকা থেকে সব ছেড়ে-ছুড়ে যে এসেছে এখানে, এই অপরিচিত পরিবেশে, শুধু কি এক দুর্বার আকর্ষণে।

চামলা, কাঁটাডি, মরাডুমুর, আশাবতি প্রভৃতি ছাড়িয়ে নিমডি স্টেশনে ট্রেন এসে পৌঁছলো প্রায় পৌনে নটায়। আমরা প্ল্যাটফর্মে

মাসকেই স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে দু'একজন লোক আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে চললো গ্রামের দিকে। নিমতিতা গ্রাম স্টেশন থেকে প্রায় আধ মাইল। হাঁটাপথে মিনিট পনেরোর রাস্তা।

আমরা এগোতে লাগলুম ধূলিধূসর, লম্বা, সর্পিল পথ বেয়ে। দু'পাশে খোলার আর খড়ের ঘর। কোথাও বা গরু চরছে শুকনো মাঠে, ছাগল ঘুরছে বাঁধা খুঁটিয়ের আড়িয়াল, কোথাও শেঁয়াকুল আর কঞ্চীমনসার ঝোপ।

আমরা এগোতে লাগলুম। গাঁয়ের লোকেরা আমাদের দেখলো, কেউ বা নমস্কার করলো। কিন্তু যে লোকটি আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে এসেছিল সে বললে—আজ হাটবার বটে। সবাই ওই নিয়ে ব্যস্ত আছে। বিকালে হলে যা কথা ছিল। এই সকালে সবাই ব্যস্তচিত্তে হাটে যাচ্ছেযাবে। হংসবাবু কেন যে আজ এই সময়ে সত্যাগ্রহ ঠিক করলেক।

হংসবাবু হচ্ছেন হংসেশ্বর নন্দী। বাড়ী দু মাইল দূরবর্তী চেলিয়ামা গ্রামে। চাঙিস থানারই অন্তর্ভুক্ত। সেখানে ইতিপূর্বে একদফা সত্যাগ্রহ হয়ে গেছে। আজ যাঁরা এখানে সত্যাগ্রহ করবেন তাঁদের মধ্যে হংসবাবু একজন এবং শুধু একজনই নন, ইনি আজকের সত্যাগ্রহের কার্যপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপক। ইনি মানভূম জেলাবোর্ডের সভ্য। কিন্তু ঐ পদের আনুষঙ্গিক মর্যাদায় মোহ কাটিয়ে বেচ্ছায় বরণ করেছেন কৃচ্ছ্রসাধনের তপশ্চর্যা। আরো দুজন আছেন আজকের কার্যক্রমে। তাঁরা হলেন স্বামী প্রজ্ঞানন্দ আর দুর্লভচন্দ্র গোস্বামী।

হংসবাবু সত্যিই একটু ভুল করেছেন বোঝা গেল। অরুণবাবু, বীরুবাবু, সুবোধবাবুরাও তাই বললেন। হংসবাবু অতটা আর ভেবে করেননি আর কি। খানিকটা অপ্রস্তুত হয়েই বোধহয় তিনি বললেন আমরা পৌঁছবার আগেই গ্রামের ঘরে ঘরে সত্যাগ্রহ ও আজকের জরুরতার খবর দিতে বেরিয়েছেন। আশা করা যায় কিছু লোক হবে। তাছাড়া বেশি লোকেরই বা প্রয়োজন কি। এ তো আর ভোটের মিটিং বা কনফারেন্স নয়, এ হল স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ও অনুভূতিকে রূপায়িত করবার একটা প্রচেষ্টা মাত্র। যারা আসবে তারা সকলে সত্যাগ্রহের মর্ম উপলব্ধি করলেই আজকের অনুষ্ঠানের সার্থকতা। বিরাট উপস্থিতি নয়, উপলব্ধিরই প্রয়োজন।

নিমতিতা নিরক্ষরপ্রধান ও সহজ মানুষদের মধ্যে এই প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে মনে হল আমার। তাদের মুখে অনির্বচনীয় এক উজ্জ্বল আলো। কি এক বরমাল্যের সম্মান যেন তাদের কর্মমুখর করে তুলেছে।

স্থানীয় কালীমেলার বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে আজ সত্যাগ্রহ হবার কথা। আঁকাবাঁকা পথে আমরা সেখানে পৌঁছতেই লোকেরা সব নিজেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কাছাকাছি বাড়ী থেকে মোটা তিনতক্তপোষ, দুটো লম্বা হাতলওলা বেঞ্চি আর একটা টেবিল নিয়ে এল। আমরা সব বসলুম। দেখতে দেখতে ছেলে বুড়োয় লোকও জমে গেল বিস্তর। সেই সেই করেও এই কলকিষ্কিন্ধ্যা গ্রামের একশো বেড়েশোজন। কালো কালো চেহারা, মাঝারি গঠন, এলো গা, কারো মাথায় লতানো বাবরি চুল। তারা সব এসে বসলো তক্তপোষে, হাতলওলা বেঞ্চিতে, কেউ বা রইলো দাঁড়িয়ে।

ক্রমে ক্রমে অনেকে এলেন। হংসবাবু এলেন, এলেন দুর্লভ গোঁসাই আর স্বামী প্রজ্ঞানন্দ। অনেক অখ্যাত সত্যাগ্রহীও এলেন। স্বামীজীর হাতে একটা লম্বা সরু বাঁশের ওপর কংগ্রেস পতাকা—কৃষি-রাজতের আশা আকাঙ্খার মূর্ত প্রতীক ত্রিবর্ণরঞ্জিত চরখাশোভিত পতাকা। তিনি পতাকা হাতে করে সামনে এসে দাঁড়ালেন।

আয়োজন প্রস্তুত। ঘণ্টাও বেজে গেছে। এমন সময় অনতিদূরে রামধুন সঙ্গীতের রেশ ভেসে এল সমবেত কণ্ঠে। ভাবলুম বুঝি বা গ্রামের লোকেরাই কোনো দল সভায় যোগ দিতে আসছে। কিন্তু ভুল ভেঙে গেল খানিক পরেই—যখন কালীমেলার পেছন থেকে, খোড়ো চাল আর বট অশথের ছায়ার ফাঁকে, ঝোড়ো-ঝোড়া মেঠো পথের প্রান্ত বেয়ে, এক এক করে চোখে পড়লো তাদের সবাইকে।

মুখে রামধুন, কাঁধে বড়ো বড়ো লাঠি, চলে এল কালাপাহাড়ের দল—সত্যাগ্রহের তথাকথিত বিরোধীরা। সংখ্যায় অল্প, বড়ো জোর বিশ-পঁচিশ জন হবে। কতকগুলো ছোট ছোট ছেলেও আছে সঙ্গে। কারো হাতে কালোনিশান। অশুদ্ধ উচ্চারণে তারা মুহুর্মুহু ধ্বনি দিতে লাগলো—মহাত্মা গান্ধী কি জয়, হামলোককা দেশ হায় বিহার, বিহারকা দুশমন বাঙালী, কংগ্রেসকা চমন্, ইত্যাদি।

রামধুন গান যে এইভাবে সবাই ধরতে পারে তা আমার ধারণার অতীত ছিল। সত্য ও অহিংসার সাধক গান্ধীজীর মনের কোনে যে কল্পনা ছিল, যে আশা একদিন যারা দেখেছিল, তাকে এত বড়ো রূঢ় আঘাত দিতে বোধহয় কেউই পারেনি। মোটাখানির গুণ্ডারা আর বাই করুক, মুখে গান্ধীনাম নিতে না এবং রামধুনও গাইতো না নিশ্চয়। মনে হল গান্ধীজী মরে যেতেছেন।

তারা এসে কালীমেলার পেছনে অল্প দূরে একটা বড়ো গাছের তলায় দাঁড়ালো। আমাদের লোকের মনে এতে শঙ্কা বা ক্ষোভ উৎসাহ যেন বাড়লো বরং। তারা সবাই সভা শুরু করে দিতে চাইলে। আমি কিন্তু এই ভেবে একটু চিন্তিত হয়ে পড়লুম যে আমাদের পক্ষে যারা আছে তারা মৈথিক শক্তির পরীক্ষায় ঐ দুষ্টিয়ের কালোনিশানধারীদের পর্যুদস্ত করে দিতে পারে; অথচ আমাদের মধ্যে বাদশাহী বেগী প্রমুখ মেয়েরাও আছেন, কাজেই অন্যান্য জায়গার মতো কিরোধীরা যদি এসে হামলা শুরু করে এবং মেয়েদের ওপরেও অত্যাচার হয়—যেমন হয়েছে শুনেছি মাটিবিড়া বা পিটাবিটির সত্যাগ্রহে—তাহলে তারা কতটা শান্ত থাকবে চিন্তার বিষয়—এবং শান্ত না থাকলে বিহার সরকার যা চাইছে তাই হবে, অর্থাৎ একটা প্রতিবাদ মেরে যাবে—শুধু এখানেই নয়, এরই অনুসরণে সর্বত্র—এবং লালা থামাবার নামে গুলি করে ও অন্যান্য নিষ্পেষণমূলক উপায়ে সরকার জনমতের এই সকল কার্যক্রমকে একেবারে ধ্বংস করে দেবার জন্য ফরেঙ্গীয় ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করবে।

তাই অরবিন্দবাবু সত্যাগ্রহের পূর্বে সমবেত সকলকে সাবধান করে দিলেন—আপনারা দেখেছেন যে কতিপয় গুণ্ডাপ্রকৃতির লোক আমাদের সত্যাগ্রহকে পণ্ড করে দেবার জন্যে হাজির হয়েছে। সভা চলাকালে তারা আমাদের ওপর অত্যাচার করতে পারে। সেই অত্যাচার যিনি সহ্য করতে পারবেন না বা যিনি তাতে উত্তেজিত হয়ে পড়বেন, তিনি যেন এই সভায় না থাকেন।

এতে কে একজন একটু হেসে যেন বললে—ওরকম কেলে ঘত অত্যাচার। আমরা মাথা পেতে নিব। মার খাবে আমরা উল্টোদের মার বেশ করে দিব। তার কি, আমাদের মনকে তো উল্টোরা মার দিতে পারবে।

কি অদ্ভুত সত্যের দার্শনিক টীকা! শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এল। এর আগে চিত্তবাবুর মুখে একদিন সত্যাগ্রহের আদর্শ বর্ণনাকালে শুনেছিলুম তাঁকে বলতে—যে স্বাধীনতার পরেও এই যে সত্যাগ্রহ চালাতে হচ্ছে এর মূলে আছে সবলের অহিংসা। ইতিপূর্বে প্রাক্-স্বাধীনতা-যুগে বৃটিশরাজ উৎখাত করবার জন্যে যেসব আন্দোলন হয়েছিল তাতে কাজ করেছিল দুর্বলের অহিংসা, তখন ইংরেজদের সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো অস্ত্র কোনো ভারতীয়ের ছিল না বলেই আমরা কতকটা যেন বাধ্য হয়ে অহিংসার আশ্রয় নিয়েছিলাম। গান্ধীজীও তাই সেদিন ঘোষণা করে গেছেন যে এ অহিংসা অস্ত্রের অভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ভিন্ন কিছু নয়। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর এই যে নবতর সংগ্রাম, এ হল সবলের অহিংসা। গান্ধীজীর কথায় বলতে গেলে, যে শক্তিমান সে শত্রুকে ভয় দেখিয়ে বশে আনবার পরিবর্তে অন্তরযোগের দ্বারা নিজের ওপরে আঘাত আহ্বান করে এবং শত্রুর হৃদয়ের মধ্যে ভয়ের পরিবর্তে প্রতিপক্ষের প্রতি সম্মান জাগিয়ে তোলে। হৃদয়ের এই পরিবর্তন ঘটলে তখন উভয়ে মিলে নতুন সমাজ রচনায় ব্রতী হয়।'

ফলকথা হল এই পরাধীন অবস্থায় ভারতবাসী ছিল দুর্বল, প্রতিহীন। কিন্তু স্বাধীনতালাভের পর তো আর সে দুর্বল নয়, এখন সে প্রভূত শক্তির অধিকারী। কাজেই চিত্তবাবুর কথাগুলো খুবই খাঁটি এবং এইভাবে যে একদল অশিক্ষিত গ্রাম্যলোকের কাছ থেকেই তার যাদব প্রয়োগ দেখতে পাবো তা আমার আশার অতিরিক্ত। তাছাড়া জনপথটা বর্তমান ক্ষেত্রে, নিমডিহির এই সত্যাগ্রহের ক্ষেত্রে, কিভাবে খাপ খাচ্ছে সেটাও খুঁজবার জিনিষ। এই যে লোকটি আজ মার খেলেও পাল্টা দেয় নি, এতে তার দুর্বলতা প্রমাণিত হচ্ছে না। কেননা হিরোশীমার চেয়ে আজ এখানে সত্যাগ্রহের বলক্ষেই লোক আছে বেশি এবং নিঃসন্দেহে তাদের মৈথিক শক্তিও আছে বেশি। সুতরাং এ হল সবলের অহিংসা এবং প্রতিপক্ষ কর্তৃক উত্তেজনার কারণ ঘটালেও এই নীতিতে অবিচলিত থাকা খুবই শক্ত ব্যাপার। মানভূমের জনগণ—যাদের প্রতিভূ মাঝিহিড়া নিমডিহির সিউরিমি ভাণ্ডাটড়াসপুরের সত্যাগ্রহীরা, যাদের প্রতিভূ নিমডির এই বনপথ অধিবাসী—তারা তা পেরেছে।

পরে জানলুম লোকটির নাম হরেকৃষ্ণ মাহাতো। সে এই নিমডি গ্রামেরই একজন বনবিভাগী। সে এসে যেন গ্রামের লোকদেরই হয়ে তিনটে দরিখার দাবী পাঠিয়ে দিলে সত্যাগ্রহী তিনজনের সকাশে। নিমডি ষ্টেশনের কর্মচারীরা সকলেও এসেছিলেন। তাঁরা সবাই বাঙালী। সংখ্যায় জনদশেক। তাঁদের মধ্যেও একজন উঠে সত্যাগ্রহীদের গলায় পরালেন বকুল ফুলের মালা। সকলে যেন হরতে চাইলে—'কে আগে, সুখে ওঠার স্বপ্ন নিয়ে কে আগে?'

উত্তর পেলে সত্যাগ্রহীদের দৃঢ়ত্বিত মুখে—সকলরকম অসত্য ও অবিচারের বিরুদ্ধে সত্যের অভিযানে যাঁরা অটলপ্রতিজ্ঞ তাঁদের বিনয়নম্র প্রত্যভিবাদনে—নীরব ভাষায় তাঁরা যেন ঘোষণা করছেন—'আমরা আজি নতুন যুগের ভোর হল, দুঃস্বপ্নঘোড়া রজনীশালায় ঘোর খোল।'

শুরু হল সভার কাজ। গোঁসাইজী বক্তৃতা দিলেন অকম্প কণ্ঠে—কংগ্রেসতন্ত্র, মহাত্মা গান্ধীর জন্ম, ধনি নিমডিগড়ের জন্ম, অবিচারের বিচার চাই, মাতৃভাষার রক্ষা চাই, জনবর্বীতির ছাড়ান চাই, জনপথের মুক্তি চাই।

মুহু মাঠে ধুলি ছাওয়া দিচ্ছে—বৈশাখী তাপে তপ্ত, রেড়া অশথের বিরলপত্র শাখা নড়িয়ে আওয়াজ উঠছে সাঁই সাঁই—প্রতিধ্বনি তুলছে বেন, চাই চাই, জনপথের মুক্তি চাই।

হরদাবাবু এরপর সত্যাগ্রহীদের দাবী পাঠ করলেন। জনমুক্তি আন্দোলনের দীর্ঘ দারো দফা দাবী। দাবীগুলি সংক্ষেপে এই:

মানভূমের ভাষা অধিকার হরণ করবার জন্যে প্রাদেশিক সরকার, মানভূমের সরকারী কর্মচারীবৃন্দ এবং প্রাদেশিক ও স্থানীয় জেলা কংগ্রেস কমিটির পরিচালকবৃন্দের মধ্যে যারা যে দুর্নীতি ও অসাধুপায় অবলম্বন করেছেন তা রোধ করা হোক।

বর্তমানে মানভূমের শাসনকার্যে জেলার জনসাধারণকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে যে স্বৈরশাসন চলছে তার সমাপ্তি ঘটিয়ে শাসনযন্ত্রে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে জনশক্তির অধিকার স্বীকার করা হোক।

মানভূমে বিহার নিরাপত্তা আইন প্রয়োগ করার মতো আদৌ কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব না ঘটলেও জেলার সরকারী কর্মচারীগণ জনগণের ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার হরণ করে জনমতকে দাবাবার জন্যে অসাধু নিরাপত্তা আইনের যে অপপ্রয়োগ করে যাচ্ছেন তার নিবৃত্তি ঘটানো হোক।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগঠনের কংগ্রেস-প্রতিশ্রুতি প্রত্যাখ্যান করবার জন্যে বিহার সরকার মানভূম জেলার বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল ছলেও একে হিন্দিভাষী হিসেবে প্রতিপন্ন করবার জন্যে, এই জেলার গরিষ্ঠসংখ্যক অধিবাসীর ভাষা শিক্ষা ও সংস্কৃতির ওপর পীড়ন করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে যে হিন্দি অভিযান চালিয়েছেন এবং তার আনুষঙ্গিক যে সব দুর্নীতি ও অসদ্‌নীতির আশ্রয় নিয়েছেন—সেই সাম্রাজ্যবাদী নীতির অবসান ঘটানো হোক।

জনসাধারণের অবমাননাকারী, সমাজবিরোধী এবং কংগ্রেসবিরোধী

শক্তির দ্বারা বর্তমানে অন্যায়ভাবে সরকারের কাছ থেকে জনসাধারণের দুয়ো প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবার ক্ষমতা পাচ্ছে, তাদের অন্তত কবল হতে জনসাধারণকে রক্ষা করা হোক।

জলল প্রভৃতি ব্যাপারে এবং প্রাণধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর সরবরাহ ও বণ্টনের ক্ষেত্রে যে ব্যাপক দুর্নীতি এবং অব্যবস্থা দেখা দিয়েছে তা দূরীভূত করা হোক।

এবম্প্রকার সরকারী দুর্নীতি ও দমননীতির ফলে যাদের ওপর অবিচার বা সামাজিক দিয়ে যাদের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে, তাদের যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণ করা হোক।

গত দেড় বছর যাবৎ মানভূমে অনুষ্ঠিত সর্ববিধ অন্যায় এবং অবিচারের পূর্ণ তদন্ত, উপযুক্ত বিচার ও যোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোক এবং জেলার জীবনক্ষেত্রকে সর্বাঙ্গীণ গঠনমূলক কর্ম ও পঞ্চায়েৎশক্তির প্রসারক্ষেত্ররূপে পরিণত এবং পরিচালিত করার ব্যবস্থা করা হোক।

দাবী পাঠের পর হরপ্রসাদবাবু আর দুর্গত গোঁসাই সত্যাগ্রহের মর্ম ও তাদের দাবীগুলির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করলেন। স্বামী প্রজ্ঞানন্দ ছিলেন বরাবর চুপচাপ। তিনি কেবল আরব সৈনিকের মতো ঘৃণ্ণ দৃষ্টিতে ধরেছিলেন কংগ্রেসনিশান, যেন ছাঁমলাবাজেরা সেটা তাঁর হস্তচ্যুত করতে না পারে কোনোক্রমে।

হরপ্রসাদবাবু মাত্র মিনিট দুয়েক করে বক্তৃতা দিলেন। উচ্ছ্বাসপ্রবণ বক্তৃতা নয়, যেন মনের কথা ব্যক্ত করলেন তাঁরা। বললেন—সমাগত ভাইসব, মানভূমের ওপর বিহার সরকারের নানাবিধ অবিচার ও নির্যাতনের কথা আপনারা অবগত আছেন। এই সমস্ত অন্যায়ের প্রতিবিধান করবার জন্যে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আপোষের চেষ্টা ব্যর্থ হবার পরই আমরা চরম অস্ত্র হিসেবে গান্ধীজীর দেওয়া অহিংস অসহযোগ তথা সত্যাগ্রহের আশ্রয় নিয়েছি। আমরা জানি, আমরা জয়লাভ করবোই—কারণ আমরা জনরূপের বৃহত্তর কল্যাণের জন্যই লড়াই করছি। এ কংগ্রেস-বিরোধিতা নয়। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে ও কংগ্রেস সরকার আমাদের খুবই আদরের জিনিষ—আমাদের বুকের রক্ত দিয়ে গড়া। আদরের জিনিষ বলেই তার অন্যায় আচরণ আমাদের অন্তরে আঘাত দিয়েছে এবং আমাদের এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন তার শোধনেরই আন্দোলন, ধ্বংসের নয়। এই আন্দোলনের মধ্যে এমন একটা কিছুও নেই যা গান্ধীজী বা কংগ্রেসের নীতি ও নির্দেশের বিরোধী।

এর পর আবার ধ্বনি—প্রতিধ্বনি—জোড়ো হাওয়া—জনসাধারণ। সভা ভঙ্গ হল আনুষ্ঠানিকভাবে। বুধনীর হাটে যাবার জন্য গ্রামবাসীরা আজ সবাই আসতে পারেনি বলে হরপ্রসাদবাবু অরুণবাবুদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঘোষণা করলেন—আগেকার যথারীতি জানান দিয়ে এখানে ফের বৃহত্তর আকারে সত্যাগ্রহ করা হবে। আজ যা হল তা প্রতীক সত্যাগ্রহের মতো।

উপস্থিত গাঁয়ের লোকেরা খুশি হল এতে। হাঙ্গামাকারীরাও এই সময়ে পূর্বোক্ত নানান ধ্বনি দিতে দিতে এবং মাদল বাজাতে বাজাতে ফিরে গেল। সুখের বিষয় তারা আর সোলমাল করেনি সভার মাঝে। তাদের মধ্যে এ গাঁয়ের লোক একজনও ছিল না বলেই হয়তো সাহস করেনি ভিড়গাঁয়ে আচমকা ঢুকে পড়তে।

খবর পেলাম তারা সবাই এসেছে চাণ্ডিল থেকে। চাণ্ডিল থেকে লরি করে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয় এখানে—হাঙ্গামে সৈন্যবিন্যাসের মতো। এর তাৎপর্য প্রথমটা মেলে—যখন আমরা পুরুলিয়ার ফেরবার জন্য বাসের রাস্তায় অপেক্ষা করি। এক লরি লোক আমাদের সামনে দিয়ে হুহু শব্দে চলে যায় চাণ্ডিলের দিকে। আমাদের ওপর নজর পড়তে অনেকে লরির ওপর দাঁড়িয়ে আমাদের উদ্দেশে বিশ্রী অঙ্গভঙ্গি সহকারে কটূক্তি করতে থাকে। লরি অবশ্য না থেমে চলে যাওয়ায় গালাগালি বেশি শুনতে হয় না আমাদের।

সিমড়ি গ্রামের একটা কাকপক্ষীকেও বলে টানতে পারেনি তারা। তাদের নেতা হলেন সত্যনারায়ণ সিং নামে চাণ্ডিলের এক অবাঙালী ব্যবসাদার। আর ছিলেন বামনিয়ার এক ঘাটোয়াল। কিসের কারণে নাম বলবো না। এঁরও উপাধি সিং। এঁকে তরফ সর্দার বলা হয়। উপজাতিতে ইনি মুণ্ডারি। জাতিতে, ভাষায় আর পরিচ্ছদে ইনি বাঙালী। ঘাটোয়ালি অর্থে এ অঞ্চলের জমিদার জাতীয়। অন্য গাঁয়ে যেখানে সরকারী পুলিশ আর চৌকিদারের ব্যবস্থা কিছু নেই, সেখানে এঁরা সরকারের তরফে শান্তিরক্ষায় দায়িত্বও পালন করেন। কাজেই এক হিসেবে এঁদের সরকারী লোক বলা যায়। ভালো হোক, মন্দ হোক, সরকারের বিরুদ্ধে যাবার উপায় নেই এঁদের। তাহলেই এঁরা পদচ্যুত হবেন। নাম জানানোর অপ্রস্তুতিতে থাকায় অগত্যা এঁকে সিং বাবু বলে উল্লেখ করবো।

এঁদের মধ্যে একজন গেরুয়াধারীকেও চোখে পড়লো। শুনলুম তিনি চাণ্ডিলের এক হিন্দি স্কুলের মাস্টার। নাম কি এক শর্মা। জাতিতে বিহারী। ছেলের ছোট ছোট ছেলেছোকরারা এঁরই ছাত্র। হিন্দি শেখানোর বদলে তিনি এঁদের তাড়িয়ে নিয়ে এসেছেন এখানে, সত্যাগ্রহীদের বিরোধিতা করবার জন্য। ছেলেগুলোর মধ্যে অবাঙালীদের সংখ্যাই বেশি। হিন্দি শেখানোর নামে অপরিণতবুদ্ধি অল্পবয়স্ক বালকদের মধ্যেও কি ভাবে প্রাদেশিকতার বিষ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তার একটা নজির পেলুম। সরকারের অন্তরঙ্গ সহযোগ পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে তিনি এটা করতে সাহসী হতেন না সম্ভবত।

এই হল বিহার সরকার এবং বিহারী সংবাদপত্র বর্ণিত সত্যাগ্রহের বিরুদ্ধে 'বিক্ষোভকারী জনগণ'। এই তথাকথিত বিক্ষোভকারীদের ভূমিকা সহজেই অনুমেয়। মানভূমের যেসব লোক যে কেউ তাদের মধ্যে থাকে না তা বলছিনে। নানা সরকারী সুখসুবিধে এবং অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে ভূমিজ কুর্মী সাঁওতাল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কোনো কোনো লোককে বশে আনা হয়েছে। সিমড়ির এই বিক্ষোভকারীদের মধ্যে যেমন একজনের নাম শুনলুম ভ্রমর সর্দার। নামটা তার বেশ রোমান্টিক, কিন্তু কাজে সে নিজেকে এ্যান্টিরোমান্টিক হিসেবে প্রতিপন্ন করেছে।

হংসবাবুর মুখ আরো শুকনো যে এই একই দল মাকি ইতিপূর্বে ছলিয়ায় সত্যাগ্রহেরও বিরোধিতা করতে গিয়েছিল। গোটা চাউল থানার মধ্যে যেখানেই সত্যাগ্রহ হোক না কেন, এই একই দল যাবে বিরোধিতা করতে। এই ভাবে মানভূমের সমস্ত মহকুমার মধ্যে যে যে থানায় সত্যাগ্রহ হচ্ছে সেই সেই থানায় বিরোধিতা করবার জন্য একটি করে ভাড়াটে দল প্রতিক্রিয়াশীল পক্ষ কর্তৃক খাড়া করে রাখা হয়েছে। তারা সেই বিশেষ থানার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি গ্রামেই যেখানে সত্যাগ্রহ হচ্ছে যেখানে গিয়ে হাজির হচ্ছে, আর সেনাধ্যক্ষদের অনুযায়ী যারা দলের জীবের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বিরোধীরা ক্রমে গ্রামের বহির্সীমানা ছাড়ালো। এই সময় তাদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাইকেলধারী, মালকোঁচামারা, হাফপ্যাণ্ট পরা এক ভদ্রলোককে এদিকপানে আসতে দেখলুম। ইনিই থানার অ্যাটোরাল ওয়ারদার সিং বাবু। জীবুতবাবুদের সঙ্গে পূর্বপরিচয় আছে এঁর। ইনি বীকার করলেন সব। বললেন—কি করবো, আমাদিগের এভাবে না এসে উপায় নাই। বুঝি সব—কিন্তু সরকারী লোক, সরকার যা চায় তা করতে হবেক।

জীবুতবাবু বললেন—কিন্তু ভাই, বুঝছো তো সরকারের নীতি কেমন জনসাধারণের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। এ দেশ, এ জেলা কার—তোমার আমার সকলের। এখানে শাসন চলবে আমাদেরই ভালোর জন্যে। কিন্তু কি যে ভালো হচ্ছে তা তো দেখতেই পাই। তোমরাও এসো, আমাদের সঙ্গে যোগ দাও। আমরা কি বলতে চাইছি তা তো তোমরা জানো। কিন্তু কি অন্যায় বলছি—বলো যে?

ব্রাস ফেলে কুণ্ঠার সঙ্গে সিং বাবু উত্তর দেন—আমি তো বলেইছি সব আগে—

ফেরে যান তিনি। তাঁর অবস্থা দেখে সত্যি দুঃখ হল আমার। মুখলায় অত্যালোক মনে প্রাণে সত্যাগ্রহীদের ওপর সহানুভূতিশীল। কিন্তু মুখ ফুটে সত্যি কথা বলবার উপায় নেই তাঁর। এ কি কম কষ্ট! জীবুতবাবুদের আর পীড়াপীড়ি করতে নিষেধ করলাম ইঙ্গিতে।

সিংবাবু কুশল প্রশ্নাদি শুধিয়ে সমস্কার করে বিদায় নিলেন। আমাদেরও অতঃপর পুরুলিয়ার প্রত্যাবর্তনের পালা। আসবার সময় যারা ছিলাম তারা দু ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলাম। জীবুতবাবু, অরুণবাবু, আমার মামাতো ভাই লালবেরা আর আমরা যাব বরবার জন্য তপ্তভূমি রওনা হবার জন্য। রয়ে গেলেন বাসন্তী দেবী, সুবোধবাবু, অরুণী, স্টুডেন্টস কংগ্রেসের বীরেন ভৌমিক, হংসবাবুরা। বীরেনবাবু কিকেলের ট্রেণে এখান থেকেই কলকাতা ফিরবেন। সুবোধবাবু ও বাসন্তীদেবীরা তো প্রায় এখানকারই বাসিন্দা। হংসবাবুরা রয়ে গেলেন গ্রামে ঘোরবার জন্য। অন্তত সত্যাগ্রহীদের বাড়ী ফেরবার ভিসা নেই। এই গাঁয়েরই এক বাড়ীতে সকলের আহারাদির অন্যবস্ত হয়েছে। গৃহস্বামী গতজন্মে হয়েই থাকবেন তাঁর নিজেরই।

তাঁরা সকলে আমাদের খেয়ে দেয়ে একেবারে কিকেলের গাড়ীতে পুরুলিয়া ফিরতে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু আমরা রাজি হলুম না। মনে করলুম বারোটার বাসে বাড়ী ফিরতে বেড়টা কি ছটা বাজবে—সেটা এমন কিছু বেলা নয় এবং বাড়ীতে ফিরেই স্নানাহার করা যাবে। চান না করে এই গরমে খাওয়া দাওয়া সারার ব্যবস্থা মনঃপুত হল না। কাজেই আমরা বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হলুম। কিন্তু পরে বুঝলুম ভুল করেছি। কেননা বাস বারোটায় না এসে এল প্রায় একটায় এবং পুরুলিয়ার পৌঁছলুম কিসটায়। আকণ্ঠ হয়েছিল না খেয়ে বেরোনোর জন্য।

ইতিমধ্যে বাসন্তীদেবী কখন যে একগাদা ফল কিনে এনে হাজির করেছেন তা লক্ষ্য করিনি। মেয়েরা যতই রাজনীতি করুক, অন্তর্নিহিত মেয়েলি স্বভাব, তার স্নেহপ্রবণতা যাবে কোথায়। আমরা ভাত খেয়ে নেলুম না, রোদেও পায় কষ্ট, তাই তিনি মনের কথা বুঝে কাছে পিঠে কোথা থেকে যেন জোগাড় করে নিয়ে এসেছেন কতকগুলো কমলালেবু আর কলা। ভালোই হল। বেঁচে গিলুম কুমালে।

আমরা চললুম স্টেশনের দিকে। স্টেশন পেরিয়ে ওপারে যেতে হবে মাইল দেড়েক। সেখানে আছে দুমদুমা গ্রাম। দুমদুমার বুক চিরে চলে গেছে বাসের রাস্তা। আসানবাদ থেকে পুরুলিয়া।

আমরা চললুম। সঙ্গে এলেন নিমতি স্টেশনের কর্মচারীরা। তাঁরা স্টেশন সংলগ্ন বাসায় ফিরবেন। পেছনে রইলো নিমতি গ্রাম আর তার বাসিন্দারা, রইলেন বাসন্তী দেবীরা, হংসবাবুরা, স্থানীয় নেতাদের দল। পায়ের নীচে তাপ উঠছে, উঠছে ধুলোয় ঝড়। 'যথা দিবে তব গান বন্ধ করে পাখি'—শুকনো ঘাস আর গাছপালা কালবৈশাখীর অপরাহ্নের প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে ঊর্ধ্বমুখে। ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে গ্রামটার পরিচিত রূপ, কিন্তু তার স্মৃতি জড়িয়ে থাকছে আমার মনের মণিকোঠায়—চেতনার বেদন জড়িয়ে যায় মানভূমের মধুক্ষরা মিষ্টি গন্ধ। এই একদিনের সঞ্চয় আমার কাছে অক্ষয় হয়ে রইবে, অক্ষয় হয়ে রইবে নিটু গ্রামের অসংখ্য অজ্ঞাতনাম—তারাই মানুষ রূপ পাচ্ছে মানভূমে, এই নিমতিতে, আরো অনেক জায়গায়, পৃথিবীতে, মানুষের মনে—

'মানুষের মনে তোর হল আজ অরূপ গমনতল
আলোকের শিশু ছুটে এসে ফলে আলোকতীর্থে চল।'

---

১ বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত। ৺নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্তের ছেলে। মানভূম লোকসেবক সঙ্ঘের সম্পাদক।

২ জীবুতবাবদেব সেন। বিহার সরকারের ভূতপূর্ব পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি।

৩ অরুণচন্দ্র ঘোষ। মানভূম লোকসেবক সঙ্ঘের পরিচালক অতুলচন্দ্র ঘোষের ছেলে।

৪ সুবোধকুমার রায়। ওয়ার্ধার শিক্ষাশ্রমে একজন গঠনকর্মী। বিভূতিবাবুর ভগ্নিপতি।

৫ চিত্তভূষণ দাশগুপ্ত। বিভূতিবাবুর ছোট ভাই।

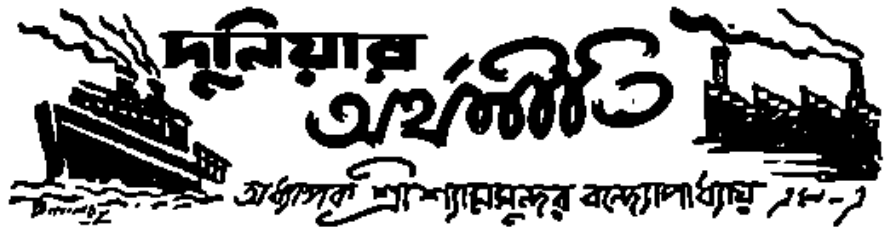

ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থা

বর্তমানে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ১২শত কোটি টাকার নূতন নোট চালু হইয়াছে এবং ইহাকেই বলা হইতেছে তীব্র মুদ্রাস্ফীতি। অবশ্য এই কথা বলার সময় ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের, অর্থাৎ যুদ্ধ বাঁধিবার অব্যবহিত পূর্বেকার ১৭৮ কোটি টাকার (তখন ভারতবর্ষ খণ্ডিত হয় নাই) প্রচলিত নোটের কথাই স্মরণ রাখা হইতেছে। তাছাড়া এদেশে টাকা বাড়ার সঙ্গে পণ্যাদির মূল্য সমান হারে বাড়িত, তাহা হইলেও এই মুদ্রাবৃদ্ধিকে মুদ্রাস্ফীতি বলা চলিত না।

যাহা হউক, ভারতের জনসাধারণ এবং সমগ্রভাবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে যথেষ্ট আর্থিক অসুবিধা ভোগ করিতেছে। ইংরেজ আমলেও ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় ছিল, কিন্তু পরাধীনতার আনুষঙ্গিক অনিবার্য্য লক্ষণ ধরিয়া লইয়া সেই অভাবের দারিদ্র্যও আমাদের সহিয়া গিয়াছিল। স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাভাবিক হিসাবে ভারতবাসীর পক্ষে এত অর্থনৈতিক দুর্গতি ভোগ করা নিঃসন্দেহে মর্মান্তিক। দেশবাসীর আর্থিক অবস্থা ভাল নয় বলিয়া রাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হইতেছে না এবং যুদ্ধোত্তর জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনাসমূহ সরকার অর্থাভাবে কার্য্যকরী করিতে সমর্থ হইতেছেন না। ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিতে অর্থ সাহায্য দানের যে সংকল্প ঘোষণা করিয়াছিলেন, অর্থাভাবের এবং মুদ্রাস্ফীতি রোধের অজুহাতে এখন তাহা অনেকটা সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিয়াছেন। জনগণের অর্থনৈতিক এবং মানসিক সমৃদ্ধির পরিপোষক বলিয়া কংগ্রেস চিরকাল মজুতদার-বিরোধ নীতি-হিসাবে স্বীকার করিয়া আসিয়াছে, বর্তমান কংগ্রেসী সরকারও গদী পাইয়া এই নীতি কার্য্যকরী করিতে আগ্রহই দেখাইয়াছেন, কিন্তু ইহার সহিত বিপুল আর্থিক ক্ষতির প্রশ্ন বিজড়িত বলিয়া উপস্থিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ইহা ব্যাপকভাবে কার্য্যকরী করা সম্ভব হইতেছে না। জমিদারী প্রথা বিলোপ সম্পর্কেও একই কথা। ভারত সরকারের মোট ঋণের পরিমাণ ২২২৩ কোটি টাকা, ইহার মধ্যে কিঞ্চিদধিক ১ হাজার ৩শত কোটি টাকার ঋণের বিপরীত দিকে সরকারের আয়যোগ্য সম্পত্তি আছে, কিন্তু বাকী ৯০০ কোটি টাকা ঋণের বিপরীতে কোনরূপ আয়যোগ্য সম্পত্তি নাই। তাহাই যত শীঘ্র সম্ভব এই আয়হীন ৯০০ কোটি টাকার দেনা শোধ হইয়া যাওয়া দরকার। ইহাতে ভারতসরকারের বৎসরে সুদের বাবদ অন্ততঃ ২০ কোটি টাকা বাঁচিয়া যাইবে। বলা বাহুল্য, এই ঋণ পরিশোধের জন্য ভারতসরকারের আর্থিক স্বাচ্ছল্যের প্রয়োজন। ১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দের বাজেট হইতে সরকারের ব্যয় অপেক্ষা আয় বাড়িবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে, অদূর ভবিষ্যতে ইহা স্পষ্টতর হইলে তবেই উপরিউক্ত দেনা শোধের আশা করা চলে। ভারতসরকারের বর্তমান আয় বৎসরে গড়ে ২৮০ কোটি টাকার মত, ইহার জন্য সামরিক বিভাগের জন্য বৎসরে ১২৫ কোটি টাকা, ঋণের সুদের জন্য ৪০ কোটি টাকা, শাসন বিভাগের জন্য ৩৫ কোটি টাকা এবং অপরাপর খাতে ৯০ কোটি টাকা ব্যয়িত হইতেছে। আয় বাড়াইবার চেষ্টার সহিত সরকারকে এখন ব্যয় কমাইবার চেষ্টাও অবশ্যই করিতে হইবে। অনেকেই অভিযোগ করেন, ভারতসরকার বর্তমান শাসনযন্ত্র পরিচালনায় যে খরচ করিতেছেন, তাহা যেন কিছুটা কমাইয়াও সমান যোগ্যতার সহিত কাজ চালান সম্ভব।* কংগ্রেস যখন সংগ্রামরত প্রতিষ্ঠান ছিল, তখন পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের বেতন বাহুল্য সম্পর্কে অনেক কঠোর মন্তব্য করা হইয়াছে। এখন কংগ্রেস-সরকারের আমলে সেই বাহুল্য অপব্যয়েরই সামিল। ইয়োরোপীয় কর্মচারীরা মাসে অবাঞ্ছিত সুযোগ সুবিধা ভোগ করিতেন, শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের পর তাঁহারা যখন বিদায় লইয়াছেন বা লইতেছেন, তখন পরাধীন দেশের স্বেতবর্ণী পুষিবার ব্যয়ভার স্বাধীন ভারতে ভারতীয় কর্মচারী পুষিবার জন্য বহন করা সঙ্গত নয়। এই অসঙ্গত ব্যবস্থার জন্য সাতশত টাকা বেতনের ভারতীয় কর্মচারীর রাতারাতি পঞ্চাশগুণ লাভ হইয়া তিনহাজার টাকা বেতন হইলে তাহা এই দরিদ্র দেশের স্বার্থের অনুকূল হইতে পারে না। পদস্থ কর্মচারী ভারতীয় বলিয়াই কম বেতন পাইবেন, আমাদের একথা বলাই উদ্দেশ্য নয়। আমাদের বক্তব্য হইতেছে ইংরেজ আমলে সাদা চামড়ার দক্ষিণার দরুণ দরিদ্র ভারতবাসীর মাথার ঘাম পায়ে ফেলা টাকার যে দরিদ্র লুট চলিত, স্বাধীন ভারতে তাহা বন্ধ না করা কর্তৃপক্ষের দিক হইতে অগৌরবের বিষয়। একথা কেন্দ্রীয় সরকার সম্পর্কেও যেমন, প্রাদেশিক সরকার সম্পর্কেও ঠিক সেইরূপ প্রযোজ্য।

বিশেষ করিয়া এখন ক্রমেই যুদ্ধোত্তর মন্দাভাব এদেশে সঞ্চারিত হইতেছে। কেহ কেহ আশঙ্কা করেন, প্রথম মহাযুদ্ধের ফলস্বরূপ ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে যে জগদ্ব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়াছিল, এবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইতিমধ্যেই সেইরূপ একটি মন্দাভাবের লক্ষণ সূচিত হইতেছে। সমগ্রভাবে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা লক্ষ্য করিলে এই আশঙ্কার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। যুদ্ধ শেষ হইবার

---

* শ্রীকস্তুরলাই লালভাইয়ের নেতৃত্বে গঠিত ব্যয়সঙ্কোচ কমিটির যে রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও সরকারের শাসন-পরিচালনার ব্যয়বাহুল্য সম্পর্কে কটাক্ষ করিয়া খরচ কমাইবার সুপারিশ করা হইয়াছে।

পর প্রথম কিছুদিন এদেশে ভারতবাসীর যাতায়াত বেশী ছিল. কিন্তু এখন ক্রমেই টাকার বাজারে তেজীভাবের স্থলে মন্দীভাবের সঞ্চারিত হইতেছে। যুদ্ধের সময়কার কথা ছাড়িয়া দিলেও ১৯৪৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এদেশে মূলধন যৌথ কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় সহজ ছিল. বর্ত্তমানে এইরূপ মূলধন সংগ্রহ অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। শেয়ার বাজারের কারকর্দ্দ হইতে দেশবাসীর হাতের সঞ্চয় টাকার যাচ্ছলা উপলব্ধি করা যায়। এখন সকলেই শেয়ার বাজারের নিষ্ক্রিয় ভাব লক্ষ্য করিতে পারিবেন।* দেশের সর্ব্বত্রই বর্ত্তমানে একটা অনিশ্চিতার অবস্থা দেখা যাইতেছে এবং এখনকার আর্থিক পরিস্থিতি যেন একটা অনিশ্চিতভাবে বিরাজমান। মুদ্রাস্ফীতি, পণ্যাভাব ও চোরাকারবারের জুলুম এখনও কমিতেছে না। কাজেই এ অবস্থায় সরকারের আর্থিক স্বাবলম্বিতার প্রতিষ্ঠা খুবই কঠিন ব্যাপার। তবু বর্ত্তমান শোচনীয় পরিস্থিতিতেও সরকারকে আত্মরক্ষার এবং সমগ্রভাবে দেশের পুনর্গঠনের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। এই চেষ্টার দ্বারাই দেশবাসীর মনে বিশ্বাস, নির্ভরশীলতা ও আশার সঞ্চার করিতে হইবে। কংগ্রেসী সরকার আন্তর্জ্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের যে মর্য্যাদার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁহাদের সাফল্য কোনক্রমেই তাহার সহিত তুলনীয় নয়। ইহার উপর আর্থিক দুর্দ্দিন আরও ঘনাইয়া আসিল। কাজেই এখন সরকারকে সাবধান হইতে হইবে। জনমত যদি কংগ্রেসী সরকারের বিরুদ্ধে যায়, তাহা হইলে তাহা সমগ্র দেশের পক্ষে বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়। বর্ত্তমান সরকারী কর্তৃপক্ষ কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন. ইহা তাঁহাদের ব্যক্তিগত অসাধারণতা ও কলঙ্কেরই কথা হইবে। প্রকৃতপক্ষে ভারতবাসীর কাছে কংগ্রেস শুধু একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয়, ইহা তাহাদের পূর্ণ আত্মবিকাশানুভূতির একটা উজ্জ্বল বহিঃপ্রকাশ।

কলিকাতার সরকারী বাস

যুদ্ধের সময় কলিকাতা ছিল প্রাচ্য যুদ্ধের অন্যতম প্রধান ঘাঁটি. কাজেই বিবিধ সামরিক প্রয়োজনে কলিকাতার জনসংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। নানা কারণে যুদ্ধান্তরে লোক হাঁটাই সম্ভব হয় নাই বলিয়া এখনও এই বাড়তি লোকসংখ্যার অধিকাংশই কলিকাতায় বসবাস করিতেছে। কলিকাতার রেশনিং ব্যবস্থা ভাল চলিতেছে বলিয়াও নিশ্চিন্তভাবে খাদ্য পাইবার আশায় অনেকে প্রয়োজন না থাকিলেও কলিকাতায় বাস করিতেছে। সমর উপরে যখ বিভাগের পর পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যে ১৮।২০ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে, তাহাদের একটি বড় অংশ কলিকাতা বা সহরতলী অঞ্চলে ভিড় বাড়াইয়াছে। এই ভাবে কলিকাতায় যে জন-বাহুল্য হইয়াছে, যুদ্ধের আগে তাহা কল্পনাও করা যাইত না।

কলিকাতার মত সহরে যানবাহনের প্রাচুর্য্য অত্যাবশ্যক। দুঃখের বিষয়, লোক বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় যানবাহন ব্যবস্থা রীতিমত একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে এশিয়ার এই শ্রেষ্ঠতম সহরের মর্য্যাদা খুব হইতেছে সন্দেহ নাই। ট্যাক্সি, ঘোড়ার গাড়ী, এমন কি রিক্সাও জনসাধারণের সুলভ যানবাহন নয়, তাহাদের পক্ষে সহজে ব্যবহার করা সম্ভব ট্রাম ও বাস। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ট্রাম এবং বাস সমধারে বাড়িতেছে না বলিয়া লোকের কষ্টের আর শেষ নাই। ট্রাম তো বাড়িতেছেই না, অধিকন্তু বিদেশী কোম্পানীর উপর প্রতিশোধ গ্রহণের নামে সহরে অনেকে যে ভাবে ট্রাম পোড়ান আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে কলিকাতায় ট্রাম চলাচল অদূর ভবিষ্যতে বন্ধ হইয়া যাওয়াও বিচিত্র নয়।

এই প্রকার দুঃসময়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতার রাস্তায় সরকারী বাস চালু করিয়াছেন। ইহাতে লোকের সুবিধা হইয়াছে বিস্তর। গাড়ীগুলি আরামদায়ক ও দ্রুতগামী, কর্ম্মচারীরা ভদ্র বাঙ্গালী, দু-চারজন রাজনৈতিক স্বার্থবাদী ছাড়া সরকারী বাস সকলকেই সন্তুষ্ট করিয়াছে। কেহ কেহ গাড়ীগুলির মালমসলা ভাল নয় বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করেন, এ সম্বন্ধে অবশ্য এখনও কিছু মন্তব্য করিবার সময় আসে নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনেক কাজই জনপ্রিয় নয়, কিন্তু কলিকাতার রাস্তায় সরকারী বাস চালাইয়া তাঁহারা সুনাম হইয়াছে। ইহাতে সরকারের আর্থিক ক্ষতিও নাই। ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দের বাজেটে সরকারী বাস খাতে অর্থ সচিব ৩ লক্ষ টাকা মুনাফা ধরিয়াছেন, তা ছাড়া এই ব্যবস্থায় অনেকগুলি অল্প ও মধ্যশিক্ষিত বাঙ্গালী ভদ্র সন্তানের কর্ম্ম সংস্থান হইয়াছে। সরকারী বাসের কর্ম্মচারীরা যাত্রীদের সহিত ভাল ব্যবহার করিতেছেন বলিয়া কলিকাতার বেসরকারী বাসের কর্ম্মচারীরাও যে রাতারাতি ভদ্র হইবার জন্য প্রাণপাত করিতেছেন, ইহা সহরবাসী মাত্রেই কৌতুকের সহিত লক্ষ্য করিবেন।

বর্ত্তমানে কলিকাতার বিভিন্ন রাস্তায় একতলা সরকারী বাস চলিতেছে ১০০ খানি এবং দোতলা সরকারী বাস মাত্র একখানি চলিতেছে। এই ব্যবস্থার সাফল্য লক্ষ্য করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখন আরও একশত খানি একতলা সরকারী বাস কলিকাতার বিভিন্ন রাজপথে চালু করিবার সংকল্প করিয়াছেন। এ ছাড়া এখন যে দোতলা বাসখানি চলিতেছে এবং আরামপ্রদ সুলভ যানবাহন হিসাবে যাহার তুলনা নাই, রাজ্য সরকার এইরূপ আরও ২০খানি বাস চালু করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। প্রকাশ, কলিকাতায় এইরূপ দোতলা বাসের সংখ্যা ক্রমে বাড়াইয়া একশত করাই নাকি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্দেশ্য। তবে বাহুল্য কলিকাতায় সরকারী বাস বৃদ্ধির এই সংবাদে ভিড়ের চাপে অর্দ্ধমৃত দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত সহরবাসী শুধু কিছুটা আশ্বস্ত হইবেন।

---

* বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করিয়া বিলাতের বিখ্যাত অর্থনৈতিক পত্রিকা 'ইকনমিষ্ট' মতপ্রকাশ করিয়াছেন যে, ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই সাত বৎসরের হিসাবে প্রত্যেক বৎসর গড়ে ভারতে যত বস্ত্রবস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে, ভারতবাসী সমষ্টিগতভাবে সঞ্চয় করিয়াছে তাহার ১১'৩ ভাগ। কিন্তু ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে যাহা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার কিছুই সঞ্চিত হয় নাই, পরন্তু এই দুই বৎসরের হিসাবে বৎসরে গড়ে সঞ্চিত সম্পদ হইতে ১২ কোটি টাকার মত খরচ হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের তান্ত্রিকতা

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের উপর তন্ত্রের প্রভাব—এ রকম একটা কথা শুনিলে চমকিয়া ওঠা অস্বাভাবিক নয়; কারণ উপনিষদের রসধারায় পুষ্ট রবীন্দ্রনাথের ভাবসাধনার ঊর্ধ্বতন রূপ ও রসে বিকশিত হইয়া অপূর্ব্ব রসাস্বাদে পরিণত হইয়াছে এরূপ মতবাদ হয়ত বিচারসহ হইলেও একটু অতিসরলের দাবী করে। বাংলা সাহিত্যের এক অতি সুপ্রসিদ্ধ সমালোচকের লেখায় সেই কথাই পড়িতেছিলাম। তিনি বলিতেছেন "বাঙালীর সেই রক্তগত ভোগবাদ অতি সূক্ষ্ম আকারে উপনিষদের আনন্দবাদের ছদ্মবেশে তাঁহার কবি জীবন অধিকার করিয়াছিল। তাই তাঁহার কাব্যে ভাব ও বস্তুর মিলনাত্মক সৃষ্টি কর্ম্ম তেমন সাফল্যমণ্ডিত না হইলেও ভাবই এখন রূপময় হইয়া উঠিয়াছে। এই রূপ-পিপাসাই তাঁহার তান্ত্রিকতা।" ইহার উদাহরণের স্বরূপ তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের সেই বহুজন সমালোচিত 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়···অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ!' দ্বিতীয়তঃ তিনি কবির জীবনদেবতাতত্ত্বকে তান্ত্রিক সাধন তত্ত্বের একটি প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং তৃতীয়তঃ কবির এই লেখাটির সাহায্য নিয়াছেন—

'এ আমার শিরায় শিরায়
যে প্রাণ তরঙ্গ-মালা রাত্রি দিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব বিজয়ে
করিতেছি অনুভব সে অনন্ত প্রাণ
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করিয়াছে মহীয়ান্
সেই যুগ যুগান্তরের বিরাট স্পন্দন
আমার নাড়ীতে আজ করিছে নর্ত্তন্

এই লেখার সঙ্গে Arthur Avalon (Sir John Woodroffe)এর The serpent power পুস্তক হইতে তিনি সমর্থন খুঁজিয়াছেন। ইহা মনে করিলে অসঙ্গত হইবে না যে তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় (১) রূপ পিপাসাই তান্ত্রিকতা। (২) এই রূপ-পিপাসা বা ভোগবাদ বা তান্ত্রিকতা বাঙালীর রক্তগত। (৩) রবীন্দ্রনাথও বাঙালীর রক্তগত তন্ত্রবাদের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। এই মতের সঙ্গে এক মত না হইলেও এর ভিতর যে সত্য আছে তা অস্বীকার করা যায় না। এ ছাড়া তিনি আরও বলিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ভাব ও বস্তুর মিলনাত্মক সৃষ্টি কর্ম্ম তেমন সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। এটা শুধু ব্যক্তিগত মত বলিয়াই এর আলোচনা না করিলেও চলে। মনে পড়ে কবি এক খ্যাতনামা অধ্যাপককে শাজাহানের এক দুর্বোধ্য অংশ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—কে বোঝে কে না বোঝে সে কথার বিচার আমি করতে যাব কেন—তোমার মত অধ্যাপকদের আছেন যাতের চব্য পদার্থ না রেখে গেলে ছাত্রগুলিকে বাঁধা দাগাবে কি উপায়ে।

সে কথা যাক্, তান্ত্রিকতা বলিতে আমরা কি বুঝি সেটা স্পষ্ট না করা হইলে বক্তব্যটা অস্পষ্টই থাকিয়া যায়। খুব ব্যাপকভাবে ও রূপকল্পনে যদি ধরা যায় যে যা অসংযম, যা আত্ম-বিস্মৃতি, যা অকল্যাণ তা মৃত্যুরই প্রতীক্, অমৃতের সাধনা—মৃত্যুর বীজ তাতে নিহিত—সেই সত্যকে সাধনার দ্বারা পরিণত করিতে হইবে। সাধনার প্রাথমিক স্তরে অতিক্রম করিতে হইবে যত কিছু ভীতসেবা, নীচতা, মুহ্যমান ক্লৈব্য গ্লানি, দ্বিধাদ্বিকা, লোভ ভয়, ঘুষে পালিয়ে যায়—তাদের তিতি করেই—শুধু ছোট ছোট অহঙ্কার রক্ত-মাংসের লোভ নয়—অশিবাদি অষ্টসিদ্ধির ঐশ্বর্য্যের লোভ, ছোট ছোট বাধন উপাটন মনস্তত্ত্বতার ভয় নয়—আত্ম-অবিশ্বাস আত্ম-প্রবঞ্চনার ভয়ও। এই সব কিছুর ভেদ করে এদের বাধা দিয়েও যিনি অতিক্রম করে যেতে পারেন তিনিই বীর সাধক, তিনিই পঞ্চমকার তত্ত্বজ্ঞ। তিনিই আত্মারাম—ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে সুধা ক্ষরণে পুনঃ পুনঃ পান করেও তিনি আত্মস্থ। তখনই সহস্রারে কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত, পরাবিজ্ঞানময়ী মহাচেতনা যিনি একাধারে, আধার চৈতন্যে শক্তি, প্রজ্ঞা ও পারমিতা, মহালক্ষ্মী মহেশ্বরী মহাসরস্বতী। তখনই ব্রহ্মবিদ্যায় সম্বোধি লাভ হয়। ইহাই তন্ত্রের শেষ উল্লাস। মোক্ষাতে হি সংসারঃ, ভুক্তি দ্বারা মুক্তি, অন্নব্রহ্ম বিদ্যার সেবায় যার বিদ্যাই ভোগবতী পার হইয়া নিবৃত্তি মার্গের অগ্রগণ্য শুদ্ধতায় উত্তীর্ণ হওয়ার যে দুষ্কর প্রয়াস, আগম নিগম তাবলের দুর্গম দুর্লঙ্ঘ্য যে পথ সেই তন্ত্রসাধনতত্ত্বের মূল-সূত্র হইতে রূপ পিপাসাকে রূপান্তর করিবার ত্রিয়ন্ত্রণী সাধনা। ভোগ করা মানে হইতেছে ভোগের সম্পর্কে প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া, প্রকৃতিকে চেনা, সম্যকপূর্ণ জ্ঞান, আনন্দ ও রস, পাশমুক্ত হওয়া।

তারপর আর একটা প্রশ্ন আসে বাংলার নিজস্ব তন্ত্র তবুই কি? কুলার্ণব তন্ত্রে বলা হইয়াছে "তন্ত্রাণেষ্বখিলং শাস্ত্রং বিদ্ধি কৌলাত্মকং প্রিয়ে" কুলাচার, কৌল, কুল চক্রের নানা মার্গমিক ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু শুধু কুলাচার নিয়েই তন্ত্রসব, নানা মার্গের মধ্যে একটি।

অন্যদের কৈবল্যদানী, উমা, হৈমবতী ব্রহ্ম, সাংখ্যে পুরুষ ও প্রকৃতি, উপনিষদে মায়া ও মায়িন্, সংহিতায় অম্বা অম্বালিকা, ন্যূনক কৃত্তিবাস প্রভৃতির উল্লেখ থাকিলেও, যোগের নূতন প্রণালী হিসাবে তন্ত্র প্রাচীনত্বের দাবী করিতে পারে না। কিছু ঋগ্বেদের প্রকৃতিবাদ, কিছু উপনিষদের ব্রহ্মবাদ, কপিলকণাদের প্রকৃতি ও পুরুষতত্ত্ব, পৌরাণিক রূপকথা (বৃন্দাবনিকেশ্বর, কালিকা, দেবীপুরাণ ইত্যাদি) পঞ্চমকার, যোগসাধিষ্ঠ, রাসপঞ্চাধ্যায়ের রসধারের ঘুরপাক, কামসঙ্কীর্ত্তনের নীতিসার, ওড্ডীয় দেবী-এর সঙ্গে বৌদ্ধ মহাযান হীনযান সর্বাস্তিবাদ সূত্রযান, সহস্রপত্রী মাধ্যপন্থীদের নানা লোকাচার ও অভিচার ক্রিয়া—এমন কি বিকৃত যৌনবাদ পর্য্যন্ত মিশিয়া শক্তি ও শাক্তের, শিবের ও শিবের, ভুক্তি ও মুক্তির এক

রসঘন রসাবেশে পরিণত হইয়াছে। বড় জোর বলা যাইতে পারে রূপ-কারী বাঙালী বৈষ্ণবের পরমগ্রাহিতা ও মাধুকরী বৃত্তির পরিচয় দিয়াছে এবং একটা সমীকরণের, সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছে—অন্তঃকে অধিকে Sublimation করিয়া। বাঙালী রবীন্দ্রনাথে তান্ত্রিকতার যে ছায়া দেখা যায় সে ছায়া তন্ত্রের নিজস্ব নয়, সেও উপনিষদের ছায়া, বৈদান্তিক চেতনার রঙ। বাঙলার তন্ত্রসাধনা কতটা পরিমাণে উপনিষদের দ্বারা প্রভাবিত তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মহানির্বাণতন্ত্র। তন্ত্রকে প্রাচীন সাধনধারার এক অপূর্ব সঙ্কলন বলিয়া ধরা যাইতে পারে। প্রাচীন তন্ত্রগুলি শুধু আগম নিগম থাকলেই বিতর্ক নয়, বেদভেদে বিষ্ণুক্রান্তা অশ্বক্রান্তা নামে প্রসিদ্ধ। মহানির্বাণকে বলা হইয়াছে সর্বতন্ত্রো-ত্তোমোত্তম, সর্বধর্মনির্ণয়সার, জীবনিস্তারের উপায় নির্দেশক বিশ্ববাণী। ইহাতে শুধু পরতত্ত্বোপাসনাই নেই, পরাপ্রকৃতি সাধনের প্রক্রিয়াই বলা হয় নাই, ব্যবহারিক শাস্ত্র, সংস্কার, আচারধর্ম, শ্রেয়ঃ কবচ, কুল লক্ষণ পর্যন্ত রীতিনীতিরও সমাধান করা হইয়াছে। তান্ত্রিকতা বলিতে শুধু কোনটুকু বুঝিব—তার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী টুকু, না তথাকথিত সাধনার আচার বিচার বাহ্যানুষ্ঠানগুলি। যখন তন্ত্র 'নমস্তে সতে সর্বলোকাশ্রয়ে, নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মিকায়ে' সেই সর্বলোকাশ্রয়, মুক্তিপ্রদ, অদ্বৈতত্ত্ব, নির্গুণ, জগৎকারণ বিশ্বরূপকে বর্ণনা করে, 'সজল জলদ বীজং ব্রহ্ম চৈতন্যরূপং' তখন সেটা গীতা বেদান্তের অনুভূতির পুনরাবৃত্তিই কি নয়। গীতা বলিতেছে অপরা প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইয়া দিব্যপ্রকৃতির মধ্যে মুক্তির চেতনা লাভ করাই সাধনার শেষ কথা, কারণ আমাদের চরমতম সম্ভাবনা সাংসারিক সুখদুঃখকে অতিক্রম করিয়া। সাংখ্যও বেদান্তে জ্ঞানের বিশ্লিষ্টতার দিকটাই দেখিল, তাদের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা সেই বিঘাত-বিকল্পকে লইয়া। তন্ত্র বেদ বলেন—জল স্থির থাকলেও জল, ফেনে ঘুরেও জল—ব্রহ্ম আর জগৎ বিকাশ যে চিচ্ছক্তি দুইই অভিন্ন। "মহাকালের কালনাট্যসাক্ষী কালিকা পরা।" প্রক্রিয়া হিসাবে তন্ত্র জোর দিলেন গীতার সেই সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকের উপর 'প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি' তাই আত্মশুদ্ধি করিয়া জগদম্বপ্রকৃতির নিকট আত্মসমর্পণ ছাড়া অন্য পন্থা নাই। ঐ প্রকৃতিই আনন্দময়ী, কখনও 'কলা' কখনও 'নাদ' কখনও ঘনীভূত 'বিন্দু' "অব্যক্তরূপ," 'সোহং ধারা' সেই ধারা আনন্দেই সৃষ্ট, আনন্দে বিধৃত—সীমাবদ্ধ জীব সেই আনন্দকে আধারের মধ্যে রূপের মধ্যে পাইতে যায়, রূপাতীতকে অরূপীকে পাইবে বলিয়া। রূপসাধনে যেখি দেবীকে বলা হইয়াছে রূপাতীতা, রূপশূন্যা, বিশ্বরূপা আবার রূপমোহিনী।

এই যে রূপপিপাসা—এই যে অভিব্যক্তির দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা, এটা কোন জাতি, কোন ব্যক্তি-বিশেষ বা কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ নয়। যুগে যুগে দেশে দেশে মানুষের মনে এই চিরন্তন প্রশ্ন উঠিয়াছে—কেন যেন্দ্রায়। সে চোখ মেলিয়াছে এই জগতে, প্রকৃতির অমর রূপ, তার প্রকাশের ধারা অভিভূত করিয়াছে

'বিশ্বে তাই জাগে মোর গান'
'প্রথম দিনের সূর্য এসে করেছিল

সত্তার নূতন আবির্ভাবে
কে তুমি মেলেনি উত্তর
যুগের যুগের চলে মেলা
বিশ্বের শেষ সূর্য
শেষ এসে উচ্চারিল পশ্চিম সাগর তীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়
কে তুমি পেলনা উত্তর।'

যে সাধক উত্তর পায়, সে ত মুক্ত। যে প্রশ্ন করেও উত্তর পায়না সেও কিন্তু অপাংক্তেয় নয়, সেও উপাসক 'জিজ্ঞাসু' উন্মুখী। এই যে বিপুলা পৃথ্বী, এই যে বর্ষীয়ান তামসমায়োহ, আকাশে যাতাসে বিরাট আবেষ্টন, মানুষের লীলা, এত রং, এত গন্ধ, এত সুষমা এর রূপে মুগ্ধ হওয়া, কৌতূহলী হওয়া এবং আরো একটু অগ্রসর হইলে এর ভিতরে যে অন্তর্নিহিত শক্তির ও সৌন্দর্যের লীলা চলিতেছে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা এতো স্বাভাবিক। বাস্তবীর বুকতলে যিকে যিকে যন্ত্রণার ধারা বইছে—তার অজন্ম যখন চোখে লাগে তখনই সৃষ্টি করে দৃষ্টির উন্মেষ, হয় 'ধূপ ছায়ায় চপল মায়ায়, লীলালিখন আলিম্পনায় 'নটরাজের জটায় রেখার অঙ্কিত ছন্দ ছন্দ'।

সুধী যখন বলেন 'আমার আমায় আকাশের উপর দেবের রাজার পর্দায় ঘেরা থাকেন না, তিনি সুধীর অন্তরেই বিরাজ করিতেছেন, সকলের ভিতরেই সেই পরমসত্তা স্বয়ম্ বিদ্যেছে'। তখন সেটা বেদান্তের অনুকরণ নয়, সেটা পরম সত্যের প্রকাশ—যা সকল কালের, সকল দেশের, সকল সম্প্রদায়ের ও কর্মের অতীত এবং যেটা প্রত্যেক দেশের চিন্তাশীল ও মননশীল ব্যক্তি কোন না কোন সময়ে প্রকাশ করিয়া থাকেন শুধু প্রকাশের ধারাটা ভিন্ন দেশকালপাত্রভেদে। Christian Mystics যখন Dolce Amoreকে কল্পনা করেন বা Holy Grail এর সন্ধানে চলিয়াছেন বা Bridegroomএর জন্য বসিয়া থাকেন প্রোথিতর্তৃকা হইয়া 'Wedding of the Soul' করে হবে তখন তাকে মধুর মধুর বলে বৈষ্ণব রসবাদে অনুপ্রাণিত করে তার ঠিক প্রকৃষ্ট পরিচয় দেওয়া হইল না। পুরুষবাদী (Doctrine of Self and Determinism) কবি ইকবালও মরমী কবি রেজেবৌদী হাফেজ রুমীর মত বলছেন "আমরা তখনও থেকে ঘুরে চলে গেছি, তিনি আছেন আমাদের খোঁজে প্রোথিতর্তৃকার মত"। "এই বিশ্বজগতের প্রতি রূপটি তিনি রেখা করছেন, তার বাণী আমরা পাচ্ছি তরুলতার প্রতি পত্রে পত্রে, তাঁর কণ্ঠ আমরা শুনছি পাখীর প্রতি কাকলীতে"। এও ত একরকমের তান্ত্রিকতা।

বৈদিক ঋষি কবিদের কথা ছাড়িয়াই দিলাম, ইতিহাসের অতীতে যদি চলে যাই প্রাচীন মিশরের কবিসম্রাট ইখনাটোনের অপূর্ব সৌরগাথা (Hymn to Aten-Re Bronsted, Dawn of Consciousness উদ্ধৃত) তাহি দেখি সেই, রূপপিপাসা

তোমার হিরণ্ময় দ্যুতি সৃষ্টিকে করেছে দৃষ্টিমান্
তোমার বিপুলমহিমা যুগে যুগে মানবচিত্তে

অমৃতের বীজ বপন করেছে।
হে বিধাতা, তুমি নিজেই নিজের সৃষ্টি
সমস্ত দেশ সমস্ত জীব তোমারি প্রকাশ,
তোমার অন্তঃপুরে তোমার আঁখি দিয়েই তুবন
আপনার মোহন রূপ দেখতে পায়
হে ম্যাটন্, হে চিরন্তীন সৃষ্টির আদিযুগে যখন
তুমি ছিলে একক ও বন্ধনহীন
তখন পলে পলে যে ধরিত্রীকে তুমি গড়ে তুলেছিলে
তাকে চিরকালকরে দেখবার লোভ তুমি আজও ভুলতে পারলি
তাই তুমি ঐ সুদূর নভোমণ্ডলে উদিত হয়ে
তোমার সৃষ্টির দিকে উন্মুখ নয়নে চেয়ে আছ।

এত শুধু ভক্তের রূপ-পিপাসা নয়, ভগবানেরও।

ঋগ্বেদের কবি মধুচ্ছন্দা বলেন—"যা নো সর্ত্তা অতিদ্রুহন্ তনূনামিন্দ্র গির্বণঃ ঈশানো যবয়া বধং—মৃত্যুর শক্তি যেন আমাদের রূপায়ণের উপর আঘাত না করে, হে শ্রেষ্ঠ সত্যের প্রকাশেই তোমার আনন্দ, বাহত কর সকল আক্রমণ।

তখনই আকুল প্রার্থনা উঠিল।

অন্তর্নীতে পুনরস্মাসু চক্ষুঃ
পুনঃ প্রাণমিহনো ধেহি ভোগম্
জ্যোক্ পশ্যেম সূর্যমুচ্চরন্তম্,
অনুমতে মৃড়য়ঃ ন স্বস্তি

প্রাণের দেবতা আমাকে আবার চক্ষু দিয়ো, আবার দিয়ো প্রাণ, দিয়ো ভোগ, উচ্চরণ সূর্যকে আমি সর্ব্বদা দেখব, আমাকে অস্তি দিয়ো। চোখ চেয়ে দেখব—এত রূপপিপাসা নয় এ হচ্ছে আকুল মনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম প্রার্থনা—"নয়ন ন তিরপিত ভেল"—দেখে দেখে যে আশ মেটে না—আরো গভীর স্তরের প্রার্থনা তাই জাগে 'তত্ত্বং তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি'—যে পূর্ণ সত্যের মুখ আচ্ছন্ন করে রেখেছো, অপাবৃত কর তোমার কল্যাণতম রূপ, প্রকাশিত হোক্ আমার নিরাবিল দৃষ্টিতে সেই অন্তরতম সত্য। তাই কবির সুরে সুরে দিলে।

'রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন্ পাব বলে—'
ঐ ও তিনি দাঁড়িয়ে
'সিংহাসনের আসন হতে দেবতা এলেন নেমে'
তখনি ও
'ধন্য আমার জন্ম নিল মাটির মায়ের কোলে'
"আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতের
পাকে পাকে ফেরে ফেরে
আমার জীবন ঘিরে জড়ায়েছি এরে
প্রভাত সন্ধ্যার
আলো অন্ধকার
মোর চেতনায় গেছে মেশে
অকপটে
এক হয়ে গেছে আজ আমার জীবন
আর আমার ভুবন"

এই যে অনুভব—এর পেছনে রয়েছে সেই চিরন্তনী রূপপিপাসা, ধরিত্রীর প্রিয় পরশের জন্য আকুলতা—

'বিরহী তোমার লাগি আমি জাগি'

চক্রবাকের বিস্ফারীয়ব বিজন্ সন্ধ্যাতীরে, সূর্য্যাস্তের বিলীয়মান্ আভায় আকাশ থেকে যে রূপ নির্ম্মালাটি নামে তাতে

"চিরকালের ধনটি তোমার ক্ষণকালে
দাও যে নূতন করি"

প্রাচীনকালের কবি দার্শনিক আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য বলেন যে কবিদের রস শাস্ত্রের রীতিই এই (ধ্বন্যালোক্—তৃতীয় উদ্যোত)

'যা ব্যাপারবতী রসান্ রসয়িতুঃ দৃষ্টিঃ কবীনাং নবা দৃষ্টী
যা পরমার্থী বিষয়োন্মেষা বা বৈপঞ্চিতী-তে যে অপ্যালক্ষ্য
বিশ্বমখিলং নিবর্ণয়ন্তো বয়ম প্রায়ুম'

রসাস্বাদন্ করিবার ও করাইবার নতুন কবি দৃষ্টি ও পরমার্থবস্তু প্রকাশন সমর্থ যে দার্শনিক দৃষ্টি—এই দুইএরের সাহায্যে আমরা অখিল বিশ্বকে বুঝিয়াছি ও তাহার রূপ বর্ণনা করিয়া প্রান্ত হইয়াছি।

এই রূপপিপাসা বা সূক্ষ্ম ভোগবাদ প্রত্যেক কবির কাব্যে, প্রত্যেক শিল্পীর শিল্পে, প্রত্যেক সাধকের সাধনায় থাকিতে বাধ্য। লীলার ছাপ এইখানে—সে লীলাকে ভক্ত ও ভগবানের খেলাই বলুন, শক্তির স্ফুরণই বলুন। শুধু যাঁরা আরো গভীরে ডুব দিয়েছেন তাঁরা রূপকে ছাড়িয়ে, সীমাকে পেরিয়ে অরূপকে অসীমকে অন্তরকে বাহিরে চেষ্টা করেছেন, যুগে যুগে তাকে অপরূপরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন্। একে তান্ত্রিকতাই বলুন, বা যা নির্দ্দেশই দিন। প্রতিভূবনের বৈরাগ্যবারিধির চৌপদীর নয়া সংস্করণই হচ্ছে এই। রবীন্দ্রনাথের অধ্যায় চেতনায় রূপপিপাসা এই রূপই নিতে চেয়েছিল, হয়ত সে রূপ আরো গাঢ় ঘনীভূত আনন্দময় হয় সাধকের অনুভূতিতে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিতেন—আমি ত সাধক নই, আমি কবি। তাঁর অনুভব ছন্দে "উন্মুখী সর্ত্তা মানুষের"—তিনি ধরণীর অতি কাছাকাছি থাকেন—তিনি বিচিত্রের দূত—যে আদিঃ বিশ্বপ্রকাশের অহেতুক আনন্দে অধীর তাঁরি দূত—বিচিত্রের পায়ে একের সর্ব্বস্বাঘ্য নিবেদন করছেন তিনি—তাকে অন্তরে গ্রহণ করে বাইরে লীলায়িত করাই তাঁর কাজ। সমুদ্রের ঐশ্বর্য্য, ধরিত্রীর শ্যামলিমার সমারোহ, বিশ্বচক্রবালে বনান্তের মৌন-চেতনা তাঁকে নটরাজের রঙ্গশালার রূপোদ্বোধন প্রতিষ্ঠানে আহ্বান করে, তিনি নটরাজের কবিশিষ্য। উপনিষদে কথিত আছে যিনি এক্ তিনি বলেন—আমি বহু হব

একোঽহং বহু স্যাম প্রজায়েয়

সব সব সৃষ্টির মূল শক্তির এই আত্মসম্প্রসারণের ইচ্ছা। 'রূপং রূপং

প্রতিষ্ঠিপো বহুধা—এই উপলব্ধির আর এক রূপ। এই উপলব্ধিতে জগৎ আর মায় নয়—মায়া নয়, মতিভ্রম নয়

"রূপনারানের কূলে জুড় বিলাম
দেখিলাম জগৎ স্বপ্ন নয়'
চৈতন্যের পুণ্যপ্রাতে আমার হয়েছে অভিষেক
ললাটে দিয়েছে জ্ঞানলেখ
জানালোকে অমৃতের আমি অধিকারী
পরম আত্মির সাথে যুক্ত হতে পারি
বিচিত্র জগতে
প্রবেশ লভিতে পারি আনন্দের পথে'

কবি নিজেই বলিতেছেন—জগতের সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া, প্রিয়জনের মাধুর্য্যের মধ্য দিয়া ভগবান আমাদিগকে টানিতেছেন—পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই কৃমানন্দের পরিচয়। এই রূপের মধ্যেই সেই অপরূপকে প্রত্যক্ষ করা—ইহাকেই তো আমি মুক্তির সাধনা বলি।"

নারদ যখন জিজ্ঞাসা করিলেন ছান্দোগ্যের সপ্তম প্রপাঠকে,—স্বয়ং ভগবান বিজিজ্ঞাসেন—ঋষি সনৎকুমার। তার উত্তর দিয়েছিলেন—যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং ভূমানের বিজিজ্ঞাসিতব্য—ভূমা কি—

যত্র নান্যৎ পশ্যতি, নান্যৎ শৃণোতি নান্যৎ
বিজানাতি সভূমা.—যো বৈ ভূমা তদমৃতং

'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়'—এ শুধু রবীন্দ্রনাথের ভোগবাদ নয়, রবিন্দ্রনাথের দুঃখতত্ত্ববাদ 'কেবলমাত্রিবাদনে' র জন্য নয়—এ হচ্ছে ভূমার অনুভূতি—রূপব্যাপ্তি। বিশ্বপ্রাণের সঙ্গে যুক্ত হবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা

'কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ'

তিনি এসেছেন ভুবনে, রব উঠেছে তখনে—এখন কি মৃত্যুত্যাগ করা যায়। এই মুক্তি বৈরাগ্যের মুক্তি না হলেও "প্রেমের মুক্তি, যোগের মুক্তি, প্রকাশের মুক্তি"। এই পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি কিছুটা মেলে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ চেতনা আরো এগিয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের অন্তশ্চেতনায় কিছুই অন্তত নয়, অশিব নয়, অসুন্দর নয়—"দুঃখ তাঁর কাছে ঘনীভূত আনন্দ" মৃত্যু যেমন আনন্দমূর্ত্তি জীবন্। দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তি তার কাম্য নয়, দুঃখের ঐকান্তিক অনিবার্য্যতা। (নলিনীকান্ত গুপ্তের মতে) তাঁর যে প্রিয় তা প্রিয় থেকে দূরে নয়, প্রিয়ই দেবতা, দেবতাই প্রিয়, তরী থেকে তাঁরে ওপারটাই তার কাছে সত্য, সিদ্ধি অপেক্ষা সাধনা—স্থিতির চেয়ে গতি—চরৈবেতি

'সবারে দিয়েছ বর, আমারে দিয়েছ শুধু পথ'
'পথিক যা দিনক্ষণ, করিব না বিচার কিছায়'

উদ্দাম পথিক তিনি চলেছেন।

আমার এই চলা এই লীলাবেগ সব দেহিমাত্রের নয়, বৈষ্ণবের লীলাবাদও নয়, দুইয়ের মিশ্রণের সঙ্গে প্রকৃতিবাদ (paganism)এর মিলন। কারণ সেখানে

আমার অনাগত
আমার অনাহত

থাকিলেও Deity is always becoming (Alexander)। রূপে রসে বিচিত্র হয়ে ফুটে ওঠাই তার স্বভাব। তিনি Eternal urge অথচ Rockets to a firework display—তার জীবনদেবতা তাই Ever-evolving personality—খেয়া তরীর মাঝি—সমস্ত সত্তাকে পূর্ণ করে ছোট তরীখানি নিয়ে চলেছে। মায়া মুক্ত, স্বপ্নের এখনও ঢোকেনি।

রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিতে তাই দেখিতে পাই যা ছিল সেই তেজবৃত্ত রূপ, যা সাধনার চরম জ্যোতির্ময় প্রকাশ—যা বলছে আমি এই শেষ—আমি জেনেছি, বেদেছি তাকে যিনি

লেলিহসে গ্রসমান সমন্তাৎ লোকান সমগ্রান্
.....ভাসস্তবোগ্রা প্রতিপদ্তি ভিক্ষো

রবীন্দ্রনাথ শুধু দেখছেন অনন্ত প্রাণের তরঙ্গমালা দিকে দিগন্তে ছুটে চলেছে—অনাহতবান্। উপনিষদের অনুভূতি সেখানে স্পষ্ট হলেও ব্রাহ্মী স্থিতির শেষ স্তরে পৌঁছায়নি,

'প্রাণে হ ভূতং ভব্যং চ'

যা চলে গেছে তা প্রাণেই আছে, যা ভবিষ্যতে আসবে তা প্রাণের মধ্যেই রয়েছে—'যোগের মধ্যে বিয়োগ নেই

যদিদং কিঞ্চ প্রাণ এজতি নিঃসৃতং

তাই তিনি মৃত্যুকেও বিচ্ছেদরূপে স্বীকার করেন নি—

যস্য ছায়া মৃতং যস্য মৃত্যুঃ

...প্রাণো মৃত্যু, প্রাণ তৎপুরা, প্রাণই দেবতা...এই বলে তিনি অভিভূত হয়ে বলেছেন 'নমস্তে অস্তু আয়তে নমো অস্তু পরায়তে। যে প্রাণ আসছে তাকে নমস্কার, যে প্রাণ চলে যাচ্ছে তাকে নমস্কার। এই দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসরণ করেই ঋষিরা বলেছিলেন যেন অক্ষোন জুড়িল যা পৃথঃ।

রবীন্দ্রনাথের কথায়—

"সবই প্রাণময়—কোথাও তার রন্ধ্র নেই, কোথাও অন্ত নেই—নিঃসংশয় প্রত্যয়ের সহিত ঋষিরা বলেছিলেন—কেই বা জীবনধারণ করত যদি এই আকাশে আনন্দ না থাকতেন, তোমার অমৃতময় অনুভূতি দ্বারা আমরা আকাশে এবং আমাদের অন্তরে বাহিরে পরিবেষ্টিত। এই অনুভূতি আমাদের দিনে দিনে জাগ্রত হয়ে উঠুক। তাহলে আমাদের ত্যাগই ভোগ হবে, অভাবও ঐশ্বর্য্যময় হবে, দিন পূর্ণ হবে, নিকট পূর্ণ হবে, দূর পূর্ণ হবে, পৃথিবীর ধূলি পূর্ণ হবে, আকাশের নক্ষত্রলোক পূর্ণ হবে। এই পূর্ণবিষয় পূর্ণদয়ঃ পরিপূর্ণতার রসোপলব্ধি হলেই রিক্ততার প্রার্থনা আপনি আসিবে। রিক্ততার প্রার্থনাই চরম প্রার্থনা। আমার সবই নাও, সবই ঘুচিয়ে দাও তাহলে তোমায় সবই পাব। মানব-জীবনের সকলের এই শেষ কথাটি, এই চরম সত্যটি উচ্চকণ্ঠে বলবার

মানুষ হবে না যতক্ষণ অন্তরের ভিতর থেকে বলতে না পারব—যদো বৈ সঃ, রসংহ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি ! তিনিই রস, যা কিছু আনন্দ সেই রসকে পেয়ে। তখনই শিবং অদ্বৈতং, তখনই উদ্ভাসিত উৎসারিত সেই আলো, যা আলো তমসঃ পারাৎ

যদাহিতমস্তত্র দিবা ন রাত্রির্ন সন্ন চাসচ্ছিবঃ—

যখন তোমার সেই অন্তকার আবির্ভূত হয় তখন কোথায় দিবা, কোথায় রাত্রি, কোথায় সৎ—কোথায় অসৎ। শিব এব কেবলং—তখন কেবল শিব কেবল অদ্বৈত, তখনই প্রণতির ছন্দে জেগে ওঠে

নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায়
নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ
নমঃ শিবায় শিবতরায় চ

কবিচিত্তের আর একটি দিক্ আছে সেটির উল্লেখ না করে থাকা যায় না। তাঁর রূপবাদ ভোগবাদ শুভ্রবাদ সব এসে যেন মানবিকতার মন্দিরে প্রবেশ করে বন্ধ হয়েছে। সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপর নাই। এও উপনিষদের সেই সর্বগত শিবেরই অনুভূতি—সর্বব্যাপী স ভগবান তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ। প্রণাম জানিয়েছেন তিনি তাঁকে—যিনি মানুষে মানুষে মিলিয়ে মহাদেবতা, যিনি দূরের নক্ষত্র-লোকের রাজাধিরাজ নন্ 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'। সাধু কর্মের মধ্যে আত্মত্যাগে যাঁকে দেখতে পাওয়া যায় মানবতার পরিপ্রেক্ষণিকায়।

'মানব তপস্বী বেশে, চিতাভস্ম শয্যাতলে এসে
স্নান লবে নিরাসক্ত মনে
ধ্যানের আসনে'

কারণ জীব শিবেরই অংশ, মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ। সভ্যতার সঙ্কটের দিনে যখন হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, তখন বিশ্বমানুষকে এই পত্রনির্দেশ।

আর হোক্ মানুষের ঐ সব জাতকের
ঐ চিরজীবিতের।

কবি নিজেই বলেছেন—

I am sure it was this idea of the devine Humanity unconsciously working in my mind, which compelled me to come out of the seclusion of my literary career and take my part in the world of practical activities. The solitary enjoyment of the infinite in meditation no longer satisfied me and the texts which I used for my silent worship lost their inspiration without my knowing it. I am sure, I vaguely felt that my need was spiritual self realisation in the life of man through some disinterested service. (Religion of man Hibbert Lectures p. 115-16)

বিশ্বজনের পায়ের তলায় ধূলিময় যে তুমি
সেই ত স্বর্গভূমি
সবার নিচে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেই ত আমার তুমি।

তুমি তো এসেছো রাজ-পথ ব'য়ে গর্বিত বিধাতার !

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

তুমি পাও নাই বেদনা ক্ষরিত অভিশাপ জীবনের,
তুমি দেখ নাই উদ্বেল-অশ্রু রিক্ত সে হৃদয়ের।
তুমি শোন নাই ক্রন্দন-রোল বুক ভাঙা হাহাকার ;
তুমি তো এসেছো রাজ-পথ ব'য়ে গর্বিত বিধাতার !

কত জ্বালা আর কত দাহ ল'য়ে চলেছে ধরা,
তুমি কি জানিবে এ কোন প্রদাহ পাষাণ-করা !
বিলাসী তোমার খেয়ালী মনের রসদ চাহি,
তুমি কি বুঝিবে কিসের বেদনা কি গান গাহি।

এই যে বিশাল নীল নভতল এই যে মাটী,
রাত্রি দিনের এই যে মরণ জীবন-কাটী,
সকলারই মাঝে রয়ে গেছে দেখি চরম ফাঁকি,—
এ ধরা-ছোঁয়ায় তুমি আসিলে না রহিলে বাকি।

• • •

তোমার জীবনে শুধু আলো এলো শুভ্রতর ;
নামিল হেথায় অন্ধ-কালো সে ভয়ঙ্কর।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বিপ্লবীদের অনেকেই একে একে দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন—অথবা বিনা বিচারে কারাগারে আবদ্ধ হইয়া রহিলেন সুদীর্ঘকালের জন্য। প্রায় বৎসর দুই আত্মগোপন করিয়া থাকিতে সক্ষম হইলেও সূর্য্য সেনও কিন্তু বেশি দিন আর নিরুদ্বিগ্ন অবস্থায় থাকিতে পারিলেন না। কলিকাতাতেই তিনিও একদিন ধৃত হইলেন। অবশেষে ১৯২৮ সালে বহু রাজনৈতিক বন্দীকে যখন মুক্তি দেওয়া হয়—তখন তিনিও মুক্তিলাভ করেন।

ঐ বৎসরই পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন বসে কলিকাতায় এবং ভারতের নানা স্থান হইতে প্রসিদ্ধ বিপ্লবীগণ তদুপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া সমবেত হন। সূর্য্য সেনও কংগ্রেসের ঐ অধিবেশনে যোগদান করেন। কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনের সমাপ্তির পর রাত্রিকালে কংগ্রেসের মণ্ডপেই বিপ্লবীদিগের এক গুপ্ত আলোচনা-সভার অধিবেশন হয়। বিপ্লবীদিগের একযোগে কার্য্যপরিচালন সম্পর্কে সেই বৈঠকে নানা বিষয় আলোচিত হয় এবং বিভিন্ন পরিকল্পনা লইয়াও আলোচনা চলে। বাংলার নেতৃবৃন্দের পক্ষে কিন্তু মতবৈধতা দূরীভূত করিয়া একযোগে কার্য্য করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হইল না। একতাবদ্ধ হইবার এই বিফলতায় সূর্য্য সেন গভীর অন্তরে ব্যথিত হইলেন। আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠার অপেক্ষা দেশ-সেবার বাসনাই তাঁহার মনে প্রবল; সুতরাং তিনি যখন দেখিলেন যে সকলের সম্মিলিতভাবে কার্য্য চালাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই—তখন অগত্যা আপন সহকর্মী ও অনুবর্তীদিগকে লইয়া অন্য দলের সাহায্য ব্যতিরেকে স্বতন্ত্রভাবেই চট্টগ্রাম-অঞ্চলে ইংরাজের সহিত শক্তি-পরীক্ষার অবতীর্ণ হইতে সঙ্কল্প স্থির করিলেন।

সঙ্গীদিগকে লইয়া সূর্য্য সেন আবার ফিরিয়া গেলেন চট্টগ্রামে। সঙ্গে রহিলেন নির্ম্মল সেন, লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ। সেখানে তাঁহারা আবার নূতনভাবে দল ও কর্ম্মী-গঠনে মনোনিবেশ করিলেন। অম্বিকা চক্রবর্ত্তী রহিয়া গেলেন কলিকাতাতেই। সেখানে থাকিয়া তিনি "যুগান্তর" দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সহিত চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের যোগাযোগ রক্ষা করিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে আবার অস্ত্র-শস্ত্রও সংগৃহীত হইতে লাগিল। এই ব্যাপারে বিপ্লবীরা শশাঙ্ক চৌধুরী, অমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও আব্দুল রেজাক খান-এর নিকট হইতে প্রভূত সহায়তা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।

চট্টগ্রাম সহরে ও সহরের আশে-পাশে অল্পদিনের মধ্যেই অনেকগুলি ব্যায়াম-কেন্দ্র স্থাপিত হইল। এই সকল ব্যায়ামাগারের পরিচালক নিযুক্ত হইলেন তরুণ কর্ম্মী অনন্ত সিংহ। এই কার্য্যের জন্য চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটি হইতে তাঁহার জন্য মাসিক ৫০৲ টাকা হিসাবে দুই মাসের জন্য এক বৃত্তিরও ব্যবস্থা হইল। অপূর্ব্ব ব্যায়াম-কৌশল ও শক্তিমত্তার জন্য অনন্ত সিংহ ও লোকনাথ বলের নাম চট্টগ্রামবাসীদের নিকট অচিরেই অতি পরিচিত হইয়া উঠিল। এই সকল ব্যায়ামকেন্দ্র-সমূহ হইতেই সূর্য্য সেন ও নির্ম্মল সেন উপযুক্ত কর্ম্মীদের বাছিয়া বাছিয়া দলে গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

১৯২৮ সালের শেষাশেষি পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ গাণ্ডার্সের নিহত হওয়া এবং তদুপলক্ষে তরুণ সিং, ঘটীন ঘোষ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের ধৃত হওয়ার বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাঁহাদিগকে অভিযুক্ত করিয়া যে লাহোর ষড়্‌যন্ত্র মামলার সূত্রপাত হয়, তাহা চলিতে থাকাকালেই ১৯২৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর বিপ্লবী ঘটীন দাস দীর্ঘদিন অনশন অবলম্বন করিয়া মৃত্যু বরণ করেন। ইহাতে সমগ্র ভারতব্যাপী যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ উপস্থিত হয়—সেই বিক্ষোভের ঢেউ গিয়া চট্টগ্রামেও পৌঁছায়। ছাত্র ও যুবকগণের মন ইহার ফলে অতিমাত্র চঞ্চল হইয়া উঠে। লোকনাথ বলের পরিচালনায় এক বিরাট শোকযাত্রা ঘটীন্দ্রনাথের চিত্রসহ সহরের রাস্তা প্রদক্ষিণ করে এবং এই মর্ম্মন্তুদ ঘটনার বিরুদ্ধে তাহাদের প্রবল প্রতিবাদ জানায়।

চট্টগ্রাম সহরের জে, এম, সেন হল প্রাঙ্গণে ১৯২৯ সালের মে মাসে সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে এক রাজনৈতিক সম্মেলনের অধিবেশন হয়। এতদুপলক্ষেও চট্টগ্রামে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা চলিতে থাকে। গণেশ ঘোষ এক বৃহৎ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী লইয়া সভাপতিকে অভ্যর্থনা করিয়া হল-প্রাঙ্গণে লইয়া যান। সুভাষচন্দ্র তাঁহার মৃদু অভিভাষণে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীই ব্যক্ত করিলেন। চট্টগ্রামের এই সকল আন্দোলন ও অনুষ্ঠানের পশ্চাতে থাকিয়া কুশলী নেতা সূর্য্য সেন তাঁহার বৈপ্লবিক প্রস্তুতিকে দ্রুত সমাপ্তির পথে লইয়া যাইতেছিলেন। কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী গৃহীত হইবার পর সূর্য্য সেন তাঁহার প্রস্তুতিকার্য্যকে আরও দ্রুত করিয়া তুলিলেন। ডাকাতির দ্বারা অর্থ-সংগ্রহের প্রচেষ্টা ত্যাগ করিয়া তিনি দলের সকল সদস্যকে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী দলের অর্থ-ভাণ্ডারে অর্থ-সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান জানাইলেন। কর্ম্মীরাও সেই আহ্বানে সাড়া দিলেন আশাতিরিক্তভাবে। চট্টগ্রামের মহিলাগণ বিনা দ্বিধায় তাঁহাদের স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতি এই দলের সাহায্যে দান করিতে লাগিলেন।

১৯৩০ সালের প্রথম দুই-এক মাসের মধ্যেই সকল আয়োজন প্রায় সমাপ্ত হইয়া আসিল। এই সময় সূর্য্য সেনের অধীন দলটির সদস্যগণ আপনাদিগকে Indian Republican Army-র চট্টগ্রাম শাখার সদস্য বলিয়া পরিচিত করিতেছিলেন। সমগ্র চট্টগ্রামে ব্যাপক বিদ্রোহ ঘটাইবার জন্য বিপুল নিষ্ঠাসহ কর্ম্মী সংগৃহীত হইল—অর্থ, অস্ত্র-শস্ত্র ও গুলি-বারুদও যতদূর সম্ভব যোগাড় হইল। দলের যত বিপ্লবী আপন আপন আত্মীয়-স্বজনের লাইসেন্স-প্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্রও গোপনে চুরি করিয়া আনিয়া দলের অস্ত্রসম্ভার বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। গোপনে গোপনে চলিতে লাগিল বোমা-প্রস্তুতির কার্য্য ও আগ্নেয়াস্ত্র চালনা শিক্ষা। সরকারপক্ষ যেমন প্রসিদ্ধ বিপ্লবীগণের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য এবং তাঁহাদের কার্য্যকলাপের সংবাদ সংগ্রহের জন্য বহু গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন, বিপ্লবীরাও তাহার পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে আপনাদের দলেও এক গোয়েন্দা-বিভাগ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই দলের কর্ম্মিগণ পুলিশ ও সরকারী মহলের নানা সংবাদ সংগ্রহ করিতেন এবং বিপদের সম্ভাবনা জানিতে পারিলেই গুপ্ত-কেন্দ্রে আসিয়া পূর্ব্বাহ্নেই সকলকে সতর্ক করিয়া দিতেন। এই ব্যবস্থায় খুবই সুবিধা হইয়াছিল। পুলিশ বহু চেষ্টা করিয়াও বিপ্লবীদিগের বিশেষ কিছুই করিতে পারিতেছিল না।

দলের জন্য বোমা প্রস্তুতের কার্য্যে লিপ্ত থাকাকালে একদিন এক দুর্ঘটনা ঘটিল। আকস্মিক বিস্ফোরণের ফলে, তারকেশ্বর দস্তিদার ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাস সাংঘাতিকভাবে আহত হইলেন। কি করিয়া গোপনে তাঁহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়—তাহা ভাবিয়া দলের সকলেই অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। যাহা হউক, শেষ পর্য্যন্ত সকল ব্যবস্থাই হইল। অতিশয় গোপনীয়তা অবলম্বন করা সত্ত্বেও পুলিশ কিন্তু একদিন রামকৃষ্ণের আহত হওয়ার বিষয় জানিয়া ফেলিল এবং তিনি যেখানে ছিলেন, সেখানে হানা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইল। দলের গুপ্ত-সংবাদ-সংগ্রহকারী বিভাগের কর্ম্মীরা পুলিশের এই সিদ্ধান্তের বিষয় জানিতে পারিয়া পূর্ব্বেই আসিয়া সতর্ক করিয়া দেওয়ায় রামকৃষ্ণ বিশ্বাসকে পুলিশের আক্রমণের আগেই সরাইয়া দেওয়া হয় এবং পুলিশ গিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসে।

আহত হইয়া তারকেশ্বর ও রামকৃষ্ণকে বহুদিন শয্যাশায়ী হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময়ও তাঁহারা আরোগ্যলাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া ঐদিনের ঘটনায় কোনও অংশই তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অর্দ্ধেন্দু দস্তিদার নামক দলের আর একজন বিপ্লবীও ঐ একই ভাবে আর একদিন আহত হইলেন; তিনি কিন্তু অল্পদিনেই আরোগ্যলাভ করেন এবং অস্ত্রাগার লুণ্ঠনেও যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন।

উদ্যোগ পর্ব্বের চরম পর্য্যায়ে দক্ষ কর্ম্মীরা সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ও অস্ত্রাগার প্রভৃতির অবস্থান, মজুত অস্ত্রশস্ত্র ও উহাতে প্রহরীর সংখ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে গোপন-সংবাদ-সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন, কারণ ঐ বিষয়গুলি সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান এবং তদনুযায়ী প্রস্তুতির উপর বিপ্লবীদের কার্য্যের সাফল্য-অসাফল্য বহুপরিমাণে নির্ভর করিতেছিল।

গান্ধীজীর আইন-অমান্য আন্দোলন সুরু হইবার পর ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে চট্টগ্রাম জেলার কেন্দ্রীয় কংগ্রেস কার্য্যালয়ে বিপ্লবীদলের এক সভার অধিবেশন হয়। সূর্য্য সেন সেই সময় চট্টগ্রাম জিলা কংগ্রেসের সেক্রেটারীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কংগ্রেসী আন্দোলনের চরম পর্য্যায়েই বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ সুরু করিবার অনুকূলে উক্ত সভায় এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইহার পর দলের বিশিষ্ট নেতাগণ তাঁহাদের আত্মীয়জন ও বন্ধু ব্যক্তিদের নামের কয়েকটি তালিকা সূর্য্য সেনের নিকট পেশ করিলেন এবং সূর্য্য সেন ও নির্ম্মল সেন সেই সকল তালিকা হইতে নিজেদের মনোমত ও সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য কর্ম্মীদের নাম বাছিয়া বাহির করিয়া প্রায় জন আটেক বিপ্লবীর এক

রামকৃষ্ণ বিশ্বাস

চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করিলেন। কার্য্যের যে পরিকল্পনা অনুমোদিত হইল, তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হইল—পুলিশ ও রেলওয়ে অক্সিলিয়ারি বাহিনীর অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত করিয়া দেওয়া, সরকারী ট্রেজারি আক্রমণ, জেলখানা ভাঙ্গিয়া কয়েদীদের মুক্তিদান, ইউরোপীয়দের ক্লাব আক্রমণ করিয়া সম্ভব হইলে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে জীবন্ত অবস্থায় গ্রেপ্তার করা প্রভৃতি। এইরূপে Indian Republican Army-র চট্টগ্রাম শাখার বিপ্লবী নায়কগণ এক অসমসাহসিক যুদ্ধ-পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। উপস্থিত সকলেই তাঁহাদের প্রিয় মাষ্টারদা'কেই তাঁহাদের সর্ব্বাধিনায়ক পদে বরণ করিলেন।

সর্ব্বাধিনায়ক সূর্য্য সেন তখন তাঁহাকে বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য এক নেতৃ-মণ্ডলী গঠন করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন। এই ভাবে তাঁহার দ্বারা যে নেতৃ-মণ্ডলী গঠিত হইল, তাহাতে রহিলেন

এই দলের বিপ্লবীরা—নির্মল সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ ও উপেন্দ্র ভট্টাচার্য।

গুড-ফ্রাইডের দিনে আইরিশ প্রজাতন্ত্র-বাহিনী ইংরাজ-শাসনের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করিয়াছিল, তাহাই ইতিহাসে ঈষ্টার বিদ্রোহ নামে প্রসিদ্ধ। চট্টগ্রামের বিপ্লবীরাও ঐ দিনকেই তাঁহাদের বিদ্রোহের দিন ধার্য করিলেন। স্থির হইল যে ১৮ই এপ্রিল শুক্রবার রাত্রি দশ ঘটিকার সময় চট্টগ্রামে ইংরাজের শক্তি-কেন্দ্রগুলিতে যুগপৎ আক্রমণ চালান হইবে। সূর্য্য সেন নেতাধিনায়ক হইয়া সমর পরিচালনার ভার লইলেন। পাহাড়তলীতে রেলওয়ে অস্ত্রাগারি কোর্সের যে প্রধান কেন্দ্র ও অস্ত্রাগার ছিল—তাহা আক্রমণ ও দখল করিবার ভার দেওয়া হইল নির্মল সেন ও লোকনাথ বলের উপর। বিমান পটনস্থ অস্ত্রাগার ও রিজার্ভ পুলিশ লাইন আক্রমণ ও অধিকার করিবার ভার পাইলেন অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ। চট্টগ্রামে ইংরাজগণের সর্ব্বপ্রধান দুইটি শক্তিকেন্দ্র দক্ষতার সহিত আক্রমণ ও বিফল করিবার ভার এইভাবে দলের যোগ্যতম নায়ক-গণের উপরই অর্পিত হইল। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন কার্য্যালয়ের দায়িত্ব নিয়া উহা ধ্বংস করিবার ভার অম্বিকা চক্রবর্তী প্রাপ্ত হইলেন; আর রেল-পথের কতি সাধন করিয়া সংযোগ-ব্যবস্থা নষ্ট করিয়া দিবার ভার উপেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের উপর ন্যস্ত হইল। চারিটি দলের গঠিত হইল মোট বিপ্লবী-বাহিনী।

যে দলটি রেলপথ ধ্বংস করিবে—সেই দলটিকে দুই-একদিন পূর্ব্বেই অধিকতর উপযোগাদি দান করিয়া পাঠাইয়া দেওয়া হইল। অবশিষ্ট তিনটি দলের নায়ক ও কর্ম্মীরা স্ব স্ব দলে বিভক্ত হইয়া ১৮ই এপ্রিল সকালের দিকে চট্টগ্রামের কংগ্রেস কার্য্যালয়ে নেতা সূর্য্য সেনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাহাদের সকলকেই যথাযোগ্য উপদেশ দান করিলেন। অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষের নেতৃত্বাধীন দলটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে গণেশ ঘোষের গৃহ হইতে যাত্রা করিবে বলিয়া স্থির হইল। লোকনাথ বল ও নির্মল সেনের অধীন দল সেইরূপ লোকনাথের বাটী হইতে রওয়ানা হইবে; আর অম্বিকা চক্রবর্তী তাঁহার দল লইয়া যাত্রা করিবেন কংগ্রেস কার্য্যালয় হইতে। স্থির হইল যে প্রায় দশ মিনিট বিপ্লবীরা একটি বজ্র দল রিজার্ভ পুলিশ লাইনের অল্প দূরে একটি জঙ্গলের মধ্যে অপেক্ষা করিবে—তাহাদের কাছ হইতে সঙ্কেত পাইবা-মাত্র পুলিশ আর্ম্মারি আক্রমণকারী দলকে গিয়া সাহায্য করা। উপযুক্ত সময়ে সর্ব্বাধিনায়ক সূর্য্য সেনও তাঁহার রক্ষীবাহিনী লইয়া পুলিশ আর্ম্মারিতে গিয়া উপস্থিত হইবেন। স্ব স্ব কর্ম্ম সমাপনান্তে সকল দলকেই পুলিশ অস্ত্রাগারে গিয়া সমবেত হইতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইল; কারণ সর্ব্বাধিনায়কের প্রধান প্রধান কেন্দ্র সেইখানেই সাময়িকভাবে স্থাপিত হইবে।

একখানি ট্যাক্সিতে করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্ব্বে লোকনাথের গৃহ হইতে লোকনাথ ও তাঁহার অপর অনুচর দুজন রাত্রির অন্ধকারে বাহির হইয়া পড়িলেন। লোকনাথের পরণে রহিল সামরিক অফিসারের পোষাক এবং অপর সকলের সাধারণ সৈনিকের পোষাক। তাঁহাদের নির্দ্দেশমত গাড়ীটি পাহাড়তলীর পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল। পাহাড়তলী ষ্টেশন চট্টগ্রাম সহরের প্রায় পাঁচ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। যাইবার সময় তাঁহারা পথিমধ্যে রেলওয়ে অস্ত্রাগার অতিক্রম করিয়া গেলেন এবং দেখিলেন যে সবই শান্ত আছে। পাহাড়তলী ষ্টেশনের খানিকটা দূরে নির্জ্জন গ্রামা পথে ড্রাইভারকে গাড়ী থামাইতে বলা হইল। চালক গাড়ী থামাইলে তাহাকে রিভলবার দেখাইয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিতে আদেশ দেওয়া হইল। বিনাবাক্যে চালক তাহাই করিল। বিপ্লবীরা তখন তাহাকে সঙ্গে করিয়া পথিপার্শ্বস্থ বিস্তীর্ণ প্রান্তর অতিক্রম করিয়া চলিলেন। মাঠের মধ্যে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ড্রাইভারের হাত-পা দড়ি দিয়া বাঁধা হইল এবং তাহার পর ক্লোরোফর্ম্ম প্রয়োগে তাহাকে অজ্ঞান করিয়া দেওয়া হইল। তাহাকে সেই অবস্থাতেই ফেলিয়া রাখিয়া বিপ্লবীরা গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন। গাড়ী চালাইয়া লইয়া গেলেন জীবন ঘোষাল।

গণেশ ঘোষের গৃহেও এক আক্রমণকারী বাহিনী সামরিক পোষাকে সজ্জিত হইল। সন্ধ্যার পর একখানি ট্যাক্সি ডাকিয়া ভাড়া স্থির করিবার অছিলায় উহার ড্রাইভারকে গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া যাওয়া হইল। ভাড়ার টাকা তাহাকে অগ্রিমই দেওয়া হইল বটে, কিন্তু তৎপরেই তাহার সম্মুখে রিভলবার উঁচাইয়া একেবারে নিঃশব্দ থাকিবার জন্য আদেশ দান করা হইল। তাহাকেও হস্ত-পদ বদ্ধ অবস্থায় সেই কক্ষে ফেলিয়া রাখিয়া বিপ্লবীরা তাহার গাড়ীখানি লইয়া বহির্গত হইয়া পড়িলেন। দলের একজন বিপ্লবীকে সেইখানেই রাখিয়া যাওয়া হইল ট্যাক্সির ড্রাইভারটিকে পাহারা দিবার জন্য।

বিপ্লবীদলের দ্বিতীয় গাড়ীতে অম্বিকা চক্রবর্তীও তাঁহার অধীন বাহিনী লইয়া টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন কার্য্যালয়ের দিকে ঐ একই সময়ে বাহির হইয়া পড়িল। বোমা ও অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আর একদল বিপ্লবী পুলিশ অস্ত্রাগারের নিকটবর্তী একটি গুপ্তস্থানে পূর্ব্ব-পরিকল্পনা মত গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। রক্ষীবাহিনী সহ সর্ব্বাধিনায়ক সূর্য্য সেন দলের অপর একখানি গাড়ীতে করিয়া ঠিক সময়ে আসিয়া ঐ দলটিরই সহিত যোগদান করিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছিল।

রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকার সময় চট্টগ্রামের তিনটি শক্তি-কেন্দ্রে বিপ্লবীরা একই সময়ে আক্রমণ আরম্ভ করিলেন। পুলিশ অস্ত্রাগার আক্রমণের ভারপ্রাপ্ত অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষের দল মোটরে করিয়া তীব্র গতিতে লোকালয় অতিক্রম করিয়া সহরের একেবারে শেষ সীমান্তের তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে গিয়া উপনীত হইলেন। পাশাপাশি দুইটি ছোট ছোট পাহাড়—একটিতে পুলিশ বাহিনীর অস্ত্রাগার ও অপরটিতে রিজার্ভ পুলিশের ব্যারাক। তাঁহাদের মোটরখানি গিয়া পাহাড়ের পাদদেশে থামিল—তাঁহারাও গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। তাঁহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ ও চাল-চলন দেখিয়া তাঁহাদিগকে সামরিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই ধারণা জন্মে। সিঁড়ি বাহিয়া সকলের অগ্রে অমরলাল এবং আর সকলে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপরে উঠিতে লাগিলেন। উপরে উঠিতেই জনৈক প্রহরারত সিপাহী অমরলালকে কোনও উচ্চপদস্থ

কর্ম্মচারী ভাবিয়া সামরিক প্রথায় তাঁহাকে অভিবাদন জানাইতে গেল। অমনি সেই মুহূর্ত্তেই তাহাকে গুলি করিলেন এবং দলের অন্যান্য সকলকেও গুলি বর্ষণের আদেশ দিলেন। আদেশমাত্রেই প্রবল গুলি-বর্ষণ সুরু হইয়া গেল এবং অস্ত্রাগার আক্রমণ আরম্ভ হইল। এই অপ্রত্যাশিত আকস্মিক আক্রমণে অস্ত্রাগারের প্রহরীরা ভীত ও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া হতভম্ব হইয়া পড়িল। আক্রমণের সুবিধার জন্য বিপ্লবীরা আলোগুলি নিভাইয়া দিলেন। প্রাথমিক দাঙ্গা শান্ত করিয়া বিপ্লবীরা ভয়ধ্বনি তুলিয়া সঙ্কেত করিতেই অনতিদূরে অপেক্ষারত সাহায্যকারী বাহিনী ও সর্ব্বাধিনায়ক সূর্য্য সেনের বাহিনী অবিলম্বে পুলিশ অস্ত্রাগারে আসিয়া উপস্থিত হইয়া দলের শক্তি আরও বর্দ্ধিত করিলেন। ইহাই অস্ত্রাগারটি সম্পূর্ণভাবে অধিকৃত হইল এবং সেইখানেই পূর্ব্বপরিকল্পনামত স্থাপিত হইল সর্ব্বাধিনায়কের প্রধান কেন্দ্র। মৃত ও পলায়িত প্রহরী-দিগের পরিত্যক্ত অস্ত্র-শস্ত্র ও গুলি-বারুদ বিপ্লবীরা সংগ্রহ করিয়া লইলেন। আর্ম্মারির ম্যাগাজিন ভাঙিয়া ফেলিয়া প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র ও গুলি-বারুদও বাহির করিয়া লওয়া হইল। ইহার পর অস্ত্রাগারটিকে একটি সুদৃঢ় ও শক্তিশালী ঘাঁটিতে পরিণত করিবার জন্য বিপ্লবীদিগকে প্রয়োজন মত নানা স্থানে পাহারায় বসানো হইল।

পাহাড়তলীর রেলওয়ে অস্ত্রাগারের নিকটও নির্দ্দিষ্ট সময়ে লোকনাথের দলের গাড়ীটি আসিয়া উপস্থিত হইল। জন ছয়েক বিপ্লবী পূর্ব্ব হইতেই গেটের নিকট অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং গাড়ীখানি আসিয়া উপস্থিত হইতেই side gate এর দরজা খোলা দিয়া খুলিয়া দিলেন। গাড়ীখানি অবাধে ভিতরে চলিয়া গিয়া সিঁড়ির মুখে থামিল। প্রহরীরত সান্ত্রী চীৎকার করিয়া উঠিল,—"Halt! Who comes there?" লোকনাথ গম্ভীরকণ্ঠে উত্তর দিলেন,—"Friends." ইহার পর সিঁড়ি বাহিয়া তিনি উচ্চ বারান্দার নিকট উঠিয়া গেলেন। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী-জ্ঞানে সান্ত্রী তাঁহাকে অভিবাদন করিবার জন্য রাইফেলের কুঁদার হাত দিতেই লোকনাথ বাদহাতে রাইফেল সমেত তাহার হাতখানি চাপিয়া ধরিলেন এবং ডান হাতে তাহার বক্ষের উপর রাইফেল উঁচাইয়া ধরিয়া জানাইলেন যে, তাঁহারা বিপ্লবী দলের লোক এবং অস্ত্রাগার দখল করিবার জন্যই তাঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন, সুতরাং সে পলাইয়া যাক। প্রহরীটি কিন্তু তাঁহার কথায় হঠাৎ সচকিত হইয়া বলপ্রকাশে তাহার হাতখানি মুক্ত করিয়া লইল। লোকনাথ তখন বাধ্য হইয়া তাহাকে গুলি করিলেন এবং তাহার দেহ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। ইহার পরই তিনি দলের অন্যান্য বিপ্লবীদিগকেও গুলি চালাইতে নির্দ্দেশ দিয়া আক্রমণের সূচনা করিলেন।

রেলওয়ে অস্ত্রাগার এইভাবে আক্রান্ত হইল। প্রহরীদের কে কোথায় পলাইতে লাগিল তাহার ঠিক রহিল না। নিকটস্থ সৈন্য-নিবাস ও ইউরোপীয়ান অফিসারের কোয়ার্টার হইতে যাহাতে অস্ত্রাগারের দিকে কেহ না আসিতে পারে, তজ্জন্য জনৈক বিপ্লবী অস্ত্রাগার ছাড়িয়া সেই দিকে পাহারায় রত রহিলেন। সার্জ্জেন্ট মেজর ফেরেল তখন নৈশ আহার গ্রহণ করিতেছিলেন। সহসা গোলাগুলি ও আর্ত্তনাদের শব্দে বারান্দায় বাহির হইয়া আসিয়া তিনি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকনাথ তাঁহাকে সকল ব্যাপারই জানাইলেন এবং চুপচাপ ভিতরে গিয়া বসিয়া থাকিতে বলিলেন। সার্জ্জেন্ট ফেরেল তাহা শুনিলেন না। তিনি তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়া আপনার রিভলবারটি লইয়া আবার বাহির হইয়া আসিলেন বিপ্লবীদিগকে বাধা দিবার জন্য। নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া লোকনাথ তাঁহাকে গুলি করিতে আদেশ দিলেন এবং সেই আদেশ তদ্দণ্ডেই পালিত হইল। সেই দিকে প্রহরারত রজত সেনের গুলিতে সার্জ্জেন্ট ফেরেল ভূতলশায়ী হইলেন। তাঁহার স্ত্রী সেই সময় বাহির হইয়া আসিয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা

অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনের প্রধান সেনাপতি লোকনাথ বল

করিলে ফেরেল শুধু বলিলেন,—"All right, Darling! I am gone."

সকল ব্যাপার দেখিয়া-শুনিয়া ফেরেল সাহেবের পত্নী আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কাতর-কণ্ঠে তিনি লোকনাথের নিকট তাঁহার নিজের ও শিশু সন্তানের জীবন-ভিক্ষা চাহিলেন। নির্ভয়ে গৃহাভ্যন্তরে থাকিবার জন্য লোকনাথ তাঁহাকে অভয় দিলেন।

প্রহরীদের পরিত্যক্ত অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া এবং দলের বিপ্লবীদের উপযুক্ত স্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া ইহার পর অস্ত্রাগারটি নিরাপদ করার চেষ্টা হইল; কিন্তু বিপদ শীঘ্রই ঘনাইল। অল্পক্ষণপরেই ক্যাপ্টেন ষ্টেইট জন

জনৈক সেতোর সহকর্মীকে লইয়া বোটযোগে করিয়া পাহাড়তলীর দিক হইতে বিপ্লবীদিগকে আক্রমণ করিতে আসিলেন। অস্ত্রাগার তখনও তাঁহারা যান নাই, সুতরাং বিপ্লবীদিগের নিকট অস্ত্র-শস্ত্রও তখন বিশেষ কিছুই ছিল না; বরং এতক্ষণ ধরিয়া সংগ্রাম চালাইয়া নিজেদের সঙ্গের রিভলবারেরও অনেকগুলি কার্যের অযোগ্য হইয়া গিয়াছিল। লোকনাথ কিন্তু তাহাতেও দমিলেন না। এই আকস্মিক পাল্টা আক্রমণেও তিনি অবিচলিতই রহিলেন। বোমা ও রিভলবার লইয়া এই আক্রমণকে প্রতিরোধ করিতে তিনি তাঁহার বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন। ইংরাজিতে তাঁহাকে ঐরূপ আদেশ দিতে শুনিয়াই গাড়ী ফেলিয়া রাখিয়া সদলবলে সহ ক্যাপ্টেন টেইট পলায়ন করিলেন।

এদিকে বহু চেষ্টা করিয়াও কিন্তু অস্ত্রাগারের দ্বার খোলা যায় নাই। নির্মল সেন তখন এক চমৎকার পরামর্শ দিলেন। তাঁহার কথামত বিপ্লবীদিগের মোটর গাড়ীতে শিকল বাঁধা হইল এবং সেই শিকলের এক প্রান্ত অস্ত্রাগারের সদরের রেলিং সহিত লাগাইয়া দেওয়া হইল। ইহার পর গাড়ীটি বিপরীত দিকে চালাইতেই প্রবল টানে রেলিং খুলিয়া গেল এবং অস্ত্রাগারের সদরদ্বার বিপ্লবীদিগের নিকট উন্মুক্ত হইল।

কিন্তু বিপদ তাহাতেই কাটিয়া গেল না। সার্জেন্ট রেকবার্থ কয়েকজন সঙ্গীসহ অপর একখানি গাড়ীতে করিয়া আসিয়া হাজির হইলেন। বিপ্লবীরা তাঁহাদের উপর উপর্যুপরি গুলিবর্ষণ সুরু করিলে প্রাণভয়ে তাঁহারাও পলায়ন করিলেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টেইলর-সনও (ইংরেজ) এক সময় আপনার গাড়ীতে করিয়া ঘোড়ার সাথে আসিলেন এবং লোকনাথকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে কোনও ইউরোপীয় অফিসার ভ্রমে আসিয়া জানাইলেন যে, তিনিই জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই বাঁকের পর বাঁক গুলি আসিয়া তাঁহার গাড়ীতে বিদ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহার রক্ষী জনৈক কনষ্টেবল ইহার ফলে নিহত হইল এবং ড্রাইভারটি হইল আহত। ম্যাজিষ্ট্রেট নিজে বিদ্যুৎগতিতে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়া গাড়ীখানির তলায় আশ্রয় গ্রহণ করায় কোনও মতে প্রাণে রক্ষা পাইলেন। বিপ্লবীরা প্রস্থান করার পর তবে তিনি বাহির হইয়া পলাইয়া যান।

রেলওয়ে অস্ত্রাগারেই বিপ্লবীদিগকে সর্বাপেক্ষা অধিক বাধার সম্মুখীন হইতে হয়। হতাহতের সংখ্যাও এই জন্য এইখানেই অধিক। বোট জনৈক তাহাতীয় ও ঘোড়ায় উক্ত ঘটনা উপলক্ষে ঐ দিন রেলওয়ে অস্ত্রাগারে নিহত হয়। কার্য শেষ করিয়া প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র ও গুলি-বারুদ সংগ্রহ করিয়া বিপ্লবীরা পুলিশ অস্ত্রাগারে তাঁহাদের নব-স্থাপিত প্রধান কেন্দ্র অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ঘন্টাখানেক রেলওয়ে অস্ত্রাগারটিতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইল। দুইটি অস্ত্রাগার একই সময়ে আক্রান্ত হওয়ার ফলে পুলিশ অস্ত্রাগার রক্ষাকল্পে অক্সিলিয়ারি ফোর্সের সাহায্য গ্রহণ করা সরকার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

কার্য শেষ করিয়া লোকনাথের বাহিনীর ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া এদিকে সূর্য সেন যথেষ্ট চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। অনন্ত সিংহের অধীনে এক সাহায্য বাহিনীকে তিনি রেলওয়ে অস্ত্রাগারের দিকে প্রেরণ করিলেন। অনন্ত সিংহ গিয়া দেখিলেন যে কার্য ইতিমধ্যেই সমাধা হইয়া গিয়াছে এবং প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্রও গাড়ীতে বোঝাই করা হইয়াছে। সকলেই তখন একই সঙ্গে হেড কোয়ার্টারে ফিরিলেন।

অম্বিকা চক্রবর্তীও ঐ একই সময়ে তাঁহার বাহিনী লইয়া টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অফিসে হানা দিলেন। টেলিফোন অপারেটার আহমদুল্লাকে আক্রমণ করিয়া ক্লোরোফর্ম প্রয়োগে অজ্ঞান করিয়া দেওয়া হইল। তাহার পর দুইবোর্ড ভাঙিয়া যন্ত্রপাতি চূর্ণ করিয়া পেট্রোল সহযোগে অগ্নিসংযোগ করা হইল। টেলিফোন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সংবাদ পাইয়া তাঁহার বন্দুক লইয়া বিপ্লবীদের বাধা দিতে আসিলেন, কিন্তু বিপ্লবীদের গুলিবর্ষণে শীঘ্রই তাঁহাকে পলাইতে হইল। কার্য শেষে অম্বিকা চক্রবর্তীও তাঁহার বাহিনীসহ তাঁহাদের প্রধান কেন্দ্রে গিয়া সমবেত হইলেন। পুলিশ আর্মারির বৃটিশ পতাকা ফেলিয়া দিয়া মহোল্লাসে বিপ্লবীরা সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিলেন।

রেলপথ-ধ্বংসকারী দলটিও ঐ নির্দিষ্ট সময়েই চট্টগ্রাম সহর হইতে প্রায় ৩১-৩০ মাইল দূরবর্তী ফুল এবং লাঙ্গলকোট ষ্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানে লাইনের ফিস্‌প্লেট অপসারিত করিয়া একখানি মাল গাড়ীকে লাইনচ্যুত করে। টেলিগ্রাফের তারও কাটিয়া দেওয়া হয় এবং রেলপথ নষ্ট করিয়া পতিরোধ করা হয় চট্টগ্রামগামী কলিকাতা মেলের।

বিপ্লবীদের অপূর্ব রণকৌশলে অল্পক্ষণের মধ্যেই চট্টগ্রামে বৃটিশ-শাসন ভাঙিয়া পড়িল। ইউরোপীয় নর-নারীগণ সহর ছাড়িয়া গিয়া প্রাণ ভয়ে আশ্রয় লইল সমুদ্রের জাহাজে।

লোকনাথ ছিলেন সেদিনের সম্মিলিত বাহিনীর প্রধান সেনাপতি। তাঁহার আদেশে সেই দিন রাত্রিকালে তাঁহার অধীন বিপ্লবী-বাহিনী পুলিশ আর্মারির প্রধান কেন্দ্রে সারি দিয়া দাঁড়াইল এবং আন্তরিক শ্রদ্ধায় সামরিক কায়দায় তাহাদের প্রিয় সর্বাধিনায়ক মাষ্টারদা'কে প্রদর্শন করিল সামরিক সম্মান। (ক্রমশঃ)

পাললমাঠ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

—কথামুখ—

চৈত্রের বাতাসে ধুলো ওড়ে—বাতাসে লাল ধুলো। তালবীথি আর শালবন কাঁপানো দমকা হাওয়া যেন হোলি খেলার উল্লাসে উড়িয়ে দেয় ফাগের গুঁড়ো। বর্ষায় তাই রক্তচন্দন; ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া অশথ-বটের একশো বছরের পুরোণো ডাল-পালায় বৃষ্টির ঝাপ্‌টা লাগে—'বরিন্দে'র এই নিঃসীম মাঠকে মনে হয় কোনো কাপালিকের নৃতি—'ডাঁড়া' বা নালার মুখ দিয়ে তীরবেগে ছুটে চলা জলধারা একখানা বাঁকা খড়্গের মতো ঝিলিক মারে বিদ্যুতের উজ্জ্বলতায়।

কোনো মরা নদীর শুকনো গর্ভের মতো বিলুপ্ত সভ্যতার অস্থিচূর্ণবাহী 'বরেন্দ্রভূমি'র মরা মাটি। হঠাৎ কখনো কখনো মনে হয় একদিন একটা রক্তসমুদ্র ঢেউ তুলে তুলে দুলত এইখানে। যেন সৃষ্টির আদিতে ছুটন্ত সোরা-পঙ্কক-লাভা-তরঙ্গের মতো। তার পর আস্তে আস্তে থেমে গেল তার উৎক্ষেপ, নিবে গেল তার উত্তাপ। রক্ততরঙ্গ রূপায়িত হল উঁচু ডাঙা, আর নিচু ঢালের খামখেয়ালিতে। পালতোলা সভ্যতার জাহাজ থমকে গেল সেই সঙ্গে, জরাজীর্ণ হতে লাগল ক্ষমাহীন সূর্যের আলোয়—তার পর তার ভাঙা হাড়-পাঁজরা রেণু রেণু হয়ে ছড়িয়ে গেল দিকে দিকে।

আজ 'বরিন্দে'র মাঠ প্রত্নবিদের কৌতূহল। এর মৃদা দীঘির ধারে ধারে আকুল হয়ে খুঁজে বেড়ায় তার সন্ধানী দৃষ্টি। এর সিঁদুর মাখানো থানে থানে মূক অতীত হঠাৎ ওঠে মুখরিত হয়ে। পুরোণো বটের কোটর যেখানে ফোপ্‌রা হয়ে গিয়ে একটা কাটা পেটের মতো হাঁ করেছে—তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা আধখানা শিলাফলক ইতিহাসের অন্ধকারে ফেলে ম্লান মশালের আলো।

লাঙলের ফালে ফালে ওঠে শিলামূর্তি—কেউ সম্পূর্ণ, কেউ খণ্ড খণ্ড। কুয়ো খুঁড়তে গিয়ে অচল ধর্মচক্র আলোর দিকে চোখ মেলে হাজার বছরের ওপরে থেকে। ভরা বর্ষায় দীঘির উঁচু পাড়ি কেটে কেটে বৃষ্টির ধারা যখন নামে—তখন তার সঙ্গে হঠাৎ গড়িয়ে আসে একটুকরো স্বর্ণমুদ্রা: "শ্রীশ্রীধর্মপালস্য"। পাঁচু মিস্ত্রার মুরগীর খোঁয়াড়ের তলায় একদিন কুড়িয়ে পাওয়া যায় একখণ্ড উৎকীর্ণ তাম্রপট্ট: "দেবাচল গ্রামনিবাসী ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব সোমদত্তকে দেবী সিংহবাহিনীর মন্দির প্রতিষ্ঠাকল্পে এই ভূখণ্ড দান করলেন চণ্ডিকাদ্বারগৃহীত ক্ষত্রিয়কুলগৌরব ভূষামী বসুবন্ধু"।

শুধু তাই নয়। কাঠবাদাম আর পুরোণো নিম গাছের ছায়ার নিচে, স্বর্ণলতার ছাওয়া লাটাবন আর মনসা কাঁটার আঁবেষ্টনে ভাঙা দরগা তাকিয়ে থাকে প্রেতপাণ্ডুর দৃষ্টিতে। পুরু ন্যাওলার আস্তর পড়া মসৃহেদের গম্বুজের ফাটলে ফাটলে নাগপাশের মতো অশথের শিকড় নামে। আলাদ-গোখুরের ফোকরভরা ভাঙাচুরো উঁচু জাঙাল "শাহী সড়ক" নাম নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে মুখ ভ্যাংচায়।

সভ্যতার শ্মশান এই বরিন্দের মাঠ।

একদা গৌরবান্বিত ছিল জনপদে আর লোকালয়ে; বিদ্যায় আর সংস্কৃতিতে; শিল্পে আর বাণিজ্যে। সেদিনের সেই উজ্জ্বল প্রজ্ঞার নিদর্শনের মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রুকনপুরের অতিকায় শিলাগঠিত দীপস্তম্ভ। একমণ ঘী আর একখান কাপড় দিয়ে আজ আর সেই দীপস্তম্ভে প্রদীপ জেলে দেয়না কেউ। কবে একদিন সে প্রদীপ নিবে গেছে কেউ বলতে পারে না—আর সেই সঙ্গে গৌড়ের প্রাসাদে প্রাসাদেও ঘটেছে দীপনির্বাণ—বরেন্দ্রভূমির বুকে ছড়িয়ে গেছে বিস্মৃতির তমসা।

আর ডাকে বান। বছরের পর বছর লক্ষ লক্ষ

কিংবদন্তীর জল নামে বরিন্দের ঢালু মাঠের ওপর। ঘনাসাগরের রূপ ধরে। দেশ গাড়োয়ানের গোরুর গাড়ির 'লিক' তলিয়ে থাকে তিরিশ হাতের জলের নিচে। এলোমেলো বাতাসে বাদাম তুলে পশ্চিমা মাঝিদের নৌকো।

একদিন এই নদীগুলি ছিল বরিন্দের বাণিজ্যপথ—তার জীবনসরণি। কিন্তু শুকিয়ে আসছে দিনের পর দিন। পলিমাটি পড়ে গর্ভ যতই ভরাট হয়ে উঠছে—ততই বন্যার উচ্ছ্বসিত জলধারাকে ছড়িয়ে দিচ্ছে দিকে দিকে। অভিশপ্ত 'বরিন্দের মাঠ' যেন আত্মবিস্তার করতে না পেরে আত্মহত্যা করে চলেছে।

বাংলা দেশের প্রাচীনতম মৃত্তিকা। রাঢ় বঙ্গ যখন অবগুণ্ঠিত জলায় আর বাদাবনে—সেদিন সভ্যতার আলোয় উদ্ভাসিত এই লাল মাটি—'বরেন্দ্রভূমি'। একদিকে যখন কর্ণাট-জয়সেনের মাঝখানে অনন্ত বাঘের চোখে আর জোগলার চড়ায় কুমীরের লেজ-ঝাপটানিতে প্রাগৈতিহাসিক সংগ্রাম, তখন এরই রাজপথ দিয়ে 'গৌড়াবনীবাসবের' চতুরঙ্গ গৌরবে রণযাত্রা।

জৈন-তীর্থঙ্করদের পদচ্ছায়ায় ভিক্ষু করুণাশ্রীর ধ্যান-বিলীন সৌম্যমূর্তি; সংঘ স্থবির মণিভদ্রের উদার কণ্ঠে মুখরিত 'ত্রিপিটকের' পবিত্র বাণী; একলাখা আর সোনা মসজেদের উচ্চশীর্ষ থেকে 'আজানের' প্রভাতী ঘোষণা—একসঙ্গে মানুষের সমবেত নমাজের একটা আশ্চর্য অপরূপ ছবি।

শুধু কি ক্ষয় আর মৃত্যুর ইতিহাস? না।

বরিন্দের রাঙা-মাটির মাঝখানে বিশাল বিস্তীর্ণ একটি দীঘি—"দীব্যোর দীঘি" তার নাম; একটি বিচূর্ণ বিধ্বস্ত প্রাচীন প্রাকার: তার নাম "ভীমের জাঙ্গাল"।

নিঃশব্দ ইতিহাস অকস্মাৎ মুখর হয়ে ওঠে।

রাজা দ্বিতীয় মহীপাল। মহারাজচক্রবর্তী ধর্মপাল-দেবপালের বংশে মূর্তিমান কুল-কলঙ্ক। মদ্যপ, লম্পট, অত্যাচারী। নারীমাংস-লোলুপতায় তার তুলনা নেই। একদিকে যেমন একজন সমৃদ্ধ প্রজা একটি মুহূর্ত শান্তিতে কাটাতে পারে না, অন্যদিকে একটি সুন্দরী নারী নিশ্চিন্ত ঘুমুতে পারে না একটি রাত্রিতেও।

তার পর একদিন আগুন জ্বলল। অহল্যা মাটির পাষাণ বুকের ভেতর থেকে বিদীর্ণ হল আগ্নেয় গিরি। বাংলার মাটিতে প্রথম সার্থক গণ-বিপ্লব—শূদ্র শক্তির উদ্বোধন।

ইতিহাসের পাতায় তার নাম 'কৈবর্ত-বিদ্রোহ'। দিব্যোকের নেতৃত্বে বিক্ষুব্ধ কৈবর্ত-শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলে রাজা দ্বিতীয় মহীপালের রাজপ্রতাপ—নিজের রক্ত দিয়ে এতদিনের সঞ্চিত সমস্ত ঋণ শোধ করতে হল মহীপালকে। প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতিনিধি দিব্যোক স্বয়ং আয়ত্ত করলেন গৌড়ের সিংহাসন—পুত্র ভীমের ভীমভুজ রক্ষা করতে লাগল এই নতুন রাষ্ট্রকে।

দীর্ঘস্থায়ী হয়নি সে কৈবর্ত-রাষ্ট্র। কিন্তু শত শত বছর পরে আগামী পৃথিবীর সূচনা এঁকে দিয়ে গেছে কাল-পুরুষের অক্ষয় পাণ্ডুলিপিতে। স্বাক্ষর রেখে দিয়ে গেছে গণ-মানবতার—ওই মজেআসা "দীব্যোর দীঘিতে", তার শিলাখণ্ডিত জয়স্তম্ভে, দিগ্‌বিস্তীর্ণ ভীমের জাঙ্গালে। ভবিষ্যতের মানুষের কাছে পূর্বগামীদের প্রেরণা।

সেই প্রেরণাই কি পেয়েছিল তারও কয়েকশো বছর পরে আদিনার সাঁওতালেরা? অনার্য শক্তি কি নতুন করে খুঁজেছিল আত্মপ্রকাশের পথ? সিদ্ধু-সাঁওতালের ভেতর দিয়ে আত্মঘোষণা করতে চেয়েছিল দিব্যোকের বিদ্রোহী প্রেতসত্তা?

না—লাল মাটি শুধু তো মৃত-কালের একটা স্তব্ধ সমুদ্রই নয়! বরিন্দের মাঠে মাঠে শুধুই তো আকীর্ণ নেই মৃত-সংস্কৃতির পঞ্জরাস্থি। নদীর বাঁধভাঙা বন্যার বন্যায় শুধুই তো সূচিত হয় না নতুন কোনো আত্মহত্যার ইতিহাস।

লাল মাটি। রক্তচন্দনের তিলকপরা ললাটশোভিত কাপালিক। 'ভাঁড়ার' জল ধারায় উচ্ছকিত তার খর-খড়্গের দীপ্তি। একটা নতুন সত্যের—নতুন পৃথিবীর সাধনাই সে করে চলেছে। মৃত-কালের শবদেহে তার তন্ত্রাসন—নিশি রাত্রির আলেয়ায় আলেয়ায় তার চোখ সংস্কৃতির এই বিপুল শ্মশানে অস্থি-অঙ্গ সন্ধান করে ফেরে।

আর অন্ধকারে চোখ মেলে রাখে রুকনপুরের দীপ-স্তম্ভ। তাকিয়ে থাকে দীব্যোর দীঘির জয়স্তম্ভের দিকে। প্রদীপ আর পতাকা। তারা কতদূরে থাকা নতুন করে আবার দীপ জেলে দেবে, কোথায় ঘুমিয়ে আছে তারা—যারা নতুন জন্মের ঔদ্ধত্যে স্পর্ধা করবে আকাশকে?

ঝোড়ো হাওয়ায় পুরোনো অশথ-বটের ডালে-পালায় রুদ্র-তান্ত্রিকের জটা দুলে ওঠে। মেঘের ডাকে শোনা যায় তার গুরু গুরু স্বর : তারা আসছে!

উগ্র ভয়ঙ্কর আলোয় চারদিক জ্বালিয়ে দিয়ে তাল গাছের মাথায় বজ্র পড়ে। চড়্‌চড়্‌ করে ফেটে যায় খানিকটা মাটি—তীব্র পোড়া গন্ধ ছড়িয়ে যায় দিকে দিকে। আর বাঁকা খড়্গের মতো 'ডাঁড়া'র জলটা ঝিকিয়ে ওঠে আর একবার, লাল মাটির একটা বড় হু হু করে ছুটে যায় দীর্ঘশ্বাসের মতো!

• • •

—শন্‌-শন্‌-শন্‌—

একটার পর একটা তীর ছুটে যাচ্ছে। ঘাসের বন ভেঙে-চুরে জানোয়ারটা যতই পালাতে চেষ্টা করুক, আজ আর রক্ষা নেই ওর। সাঁওতালেরা নিখুঁত ব্যূহ-রচনা করেছে চারদিকে। যেন শব্দভেদী বাণ ছুঁড়ছে তারা—প্রত্যেকটি তীর গিয়ে লাগছে লক্ষ্যস্থলে।

বুনো শুয়োরটা দেখল আর আত্মগোপনের চেষ্টা করা বৃথা। এদিকের ঘাস-বন তোলপাড় করে সে লাফিয়ে পড়ল বাইরের ফাঁকা মাঠের ভেতরে। ততক্ষণে তার নোঙ্গা বিশাল শরীরটায় গোটা তিনেক তীর কাঁপছে থর্‌ থর্‌ করে—ঘন রক্ত সারা গায়ে তার জমে আছে রক্তজবার একটা মালার মতো।

নিতান্তই দুর্বুদ্ধি তাই এই তল্লাটে একটা বুনো ওলের গোড়া খুঁড়তে এসেছিল সে। তাতেও যথেষ্ট হয়নি—একটা রাখাল ছেলেকে একটু দূরেই দেখতে পেয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে তাড়া করেছিল তাকে। গায়ে বেশি চর্বি থাকার জন্যই হোক কিংবা রোদের তাপটা একটু বেশি প্রখরই হোক, তার মাথাটা অত্যন্ত গরম হয়ে উঠেছিল তখন। ছোকরাকে আয়ত্তের মধ্যে পেলে দুটো ধারালো দাঁতে তার পেটটাকে সে সমস্ত কোঁবারে ছিন্নভিন্ন করে ফেলত সে।

কিন্তু কাছাকাছি একটা বাবলা গাছ ছিল, তাই রক্ষা। ছোকরা একলাফে তাইতেই উঠে বসল। শুধু উঠে বসল তাই নয়—প্রাণপণে চিৎকার শুরু করলে সেখান থেকে।

দূরে কাঁদড়ের পাশ দিয়ে মহুয়া বনে হরিয়ালের খোঁজে চলেছিল জোয়ান মদ্দি একদল। চিৎকারটা কানে গেল তাদের। হৈ হৈ করে দৌড়ে এলো তারা।

ততক্ষণে নিজের ভুল বুঝেছে বুনো শুয়োর। ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাবার চেষ্টা করতে গিয়ে ঢুকে পড়েছে ঘাসবনের এই ফালিটুকুর মধ্যে। তার পর থেকেই চলছে এই চক্রব্যূহের আক্রমণ।

নিরুপায় হয়ে মাঠের মধ্যেই সে লাফিয়ে পড়ল তার পর। জবার মালার মতো থক্‌-থকে রক্ত তার সারা গায়ে। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে আওয়াজটা যন্ত্রণার গোঙানিতে পর্যবসিত হয়েছে এতক্ষণে।

শাঁ করে আর একটা তীর এসে বিঁধল তার চোখের ওপর। অন্ধের মতো শেষ-আক্রোশে সম্মুখের লোকটার ওপর সে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে গেল—দীর্ণ-বিদীর্ণ করে দেবে তাকে—নেবে মর্মান্তিক প্রতিহিংসা। কিন্তু সে চেষ্টা করবার আগেই চক্ষের পলকে আর একটা তীক্ষ্ণ ফলক এসে তার ফুস্‌ফুস্‌টাকে ভেদ করে দিলে—হাঁটু ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে—থর্‌ থর্‌ করে কাঁপতে লাগল সারা শরীর।

তীর ছুটে এল শন্‌ শন্‌ করে—একটার পর একটা। কখন যে নিজের সঙ্কুচিত দেহটাকে প্রসারিত করে দিয়ে চিরদিনের মতো স্থির হয়ে গেল নিজেই জানে না সে। সমস্বরে জয়ধ্বনি তুলল সাঁওতালেরা।

আর ঠিক সেই সময়ে, মেঠো পথ দিয়ে যেতে যেতে সকৌতূহলে সেখানে সাইকেলটা থামালো রঞ্জন—কর্মী রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। আগ্রহভরে জানতে চাইল : কিরে, কী শিকার পেলি তোরা?

—বরা, বাবু—একমুখ হেসে জবাব দিলে একজন।

—বেশ বড় তো।—রঞ্জন ভীতি-মেশানো চোখে তাকিয়ে রইল শুয়োরটার দিকে।

—হাঁ বাবু, খুব বড়।—আর একজন আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে : দাঁতাল্‌। আমরা সময় মতো এসে না পড়লে ই শালা উ ছোকরাকে মেরে ফেলত একদম।

রাখাল ছোকরা তখন কাছাকাছিই দাঁড়িয়েছিল। সামনের দিকে একটা শাদা কাপড়ের ফালি ঝুলছে, তা ছাড়া আর কোনো পরিধেয়ই নেই তার। দুকানে দুটো তামার বীরবৌলি—তার একেবারে আদিম বেশ-বাসের

সঙ্গে ও ছুটোকে কেমন বেখাপ্পা বলে মনে হয়। হাতে তার একটা পাচনবাড়ি—উত্তেজিতভাবে তখনো ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছিল সে।

ওদের কথাবার্তা শুনে সে এগিয়ে এল। অত্যন্ত বীরের মতো সজোরে গোটা দুই লাথি মারল শূয়োরটার পেটের ওপর। ঘুলিমলিন কালো পায়ে জড়িয়ে গেল একরাশ জমে-আসা ঘন রক্ত।

বললে, আমাকে মারবি? মার্ শালা, মার্ ইবারে।

রঞ্জন হাসল: খুব জোয়ান দেখছি যে। এই, কী নাম তোর?

পায়ে শূয়োরের রক্ত মেখে ছেলেটা তখনো বীররসে উদ্দীপ্ত। সগর্বে বললে, ধীরুয়া।

একজন জানিয়ে দিল।

—উ টুলকু মাঝির ব্যাটা। উর বাপের কথা জানো না। সেই যে মাঝিটা—কতে শা পাঠানের পাইককে খুন করে পালিয়ে গেছল?

মনে পড়ল ঘটনাটা। মাত্র বছর দুয়েক আগে। এ অঞ্চলের নাম-করা অত্যাচারী জমিদার কতে শা পাঠান। সোনা দীঘির ঘাটের পথে নিজের লোক লাগিয়ে বাপকে খুন করায় সে, তারপর জমিদারী দখল করে। পিতৃহত্যার রক্ত হাতে মেখে নিঃসংকোচে সে তার রাজ্যপাট চালিয়ে যাচ্ছে।

এমন লোকের সঙ্গে প্রজাদের সম্পর্ক যে খুব মধুর থাকবে না, সে বলাই বাহুল্য। কিন্তু সাঁওতালেরা মোটের ওপর জমিদারের সান্নিধ্য থেকে দূরেই ছিল অনেককাল। কুঁজিকাঁটা আর ইকড় ঘাসে ভরা পতিত জমিতে বাস বেঁধে বাস করতে অভ্যস্ত এই যাযাবরের দল। সামান্য ক্ষেত খামার আর শিকার করেই এদের দিন কাটে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জমিদার এদের কাছে প্রত্যাশা রাখে না—এরা খুশি মতো একসের তামাক কিংবা দুটো একটা তিতির নজর দিয়ে আসে কখনো কখনো।

কিন্তু কতে শা পাঠানের জমিদারী মেজাজ হঠাৎ দিল্লীর সাহেনশা বাদশাহের মতো চড়ে উঠল। গোরুর গাড়ি করে আসতে আসতে সে দেখল, মাঠের একটা অংশে মটর-কলাই একটি ঘন-সবুজের ছবি এঁকে রেখেছে।

কতে শা জানতে চাইল: ও জমি কার?

বরকন্দাজ বললে, হুজুরেরই!

—আহাম্মক!—কতে শা খানিক থুথু ছিটিয়ে বললে, জমি যে আমার, সে আমি জানি। কিন্তু রায়ত কে?

—আজ্ঞে সাঁওতাল।

—সাঁওতাল?—একবার চোখ তুলে তাকালো কতে শা: খাজনা দেয় কত?

—কিছুই না—।

—কিছুই না? কেন?—চোখ পাকিয়ে জানতে চাইল কতে শা: আমার প্রজা, অথচ খাজনা দেয় না?

—জী, ওটা পতিত জমি।

—পতিত জমি?—কতে শা গর্জন করল: জমি আমার। পতিত হোক খাই হোক—চাষ দিতে কে বলেছিল ওদের? খাজনা চাই আমার।

—সাঁওতালেরা চটে যাবে হুজুর—

—ভয়পোক কুত্তার দল—চেঁচিয়ে উঠল কতে শা: নেমকহারামের বাচ্চা! সাঁওতালের ভয়ে ল্যাজ গুটিয়ে আছিস! খাজনা চাই আমার—কালই যেন পাইক যায়।

পাইক এল পরের দিন।

ভদ্র ভাষায় কথাবার্তা বললে হয়তো রফা একটা হতে পারত, কিন্তু কতে শা পাঠানের পাইক-বরকন্দাজদের শিক্ষা দীক্ষা অন্য রকম। ফলে শেষ পর্যন্ত একটা তীর এসে মহুয়ার পাইকের গলা এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে দিলে। পুলিশ এসে চালান দিলে টুলকুকে—দশ বছর হাজত হয়ে গেল আর।

সেই টুলকুর ব্যাটা এই ধীরুয়া! রঞ্জন একবার অন্যমনস্কভাবে তাকালো ধীরুয়ার দিকে। কেউটের বাচ্চা কেউটে? বিষ সঞ্চয় করে প্রস্তুত হচ্ছে দিনের পর দিন—বরিন্দের প্রান্তে প্রান্তে, লাল মাটির টিলার আড়ালে আবডালে গড়ে উঠছে উদ্যত ফণা নাগ বাহিনী, বিষের জ্বালায় একদিন শেষ করে দেবে কতে শা পাঠানের দলবলকে।

চমক ভেঙে গেল।

সাঁওতালদের একজন বললে, বাবু, আজ রাতে আমাদের পাড়ায় তুর নিমন্তন।

—ওই শূয়োর খাওয়াবি বুঝি?

—হাঁ, আর পচাই।

—দুটোর একটাও আমার চলবে না মোড়ল—রঞ্জন হাসল: কিন্তু নেমন্তন্ন আমি নিলাম। নাচ দেখাবি তো?

—হাঁ বাবু, নিশ্চয়।

—আচ্ছা—মৃদু হাসল রঞ্জন, শেষবার তাকালো টুলকুর ছেলে ধীরুয়ার দিকে। তার পর আবার সাইকেল হাঁকিয়ে ধরল মাণিকপুরার পথ—হাতে তার অনেক কাজ এখন।

(ক্রমশঃ)

আকাশ পথের যাত্রী

শ্রীসুষমা মিত্র

২৮শে জুন। আজ বেলা দুটোয় শিকাগোর Planetariumএ গেলাম। একটি গোল ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখলাম বৈদ্যুতিক শক্তি চালিত সৌরমণ্ডলীর সূর্যাদিমান গ্রহ উপগ্রহের গতিবিধি দেখানো হচ্ছে। সেখানে কিছুক্ষণ থেকে আমরা আরেকটি উঁচু গোলছাদওলা ঘরে গিয়ে বসলাম; দরজা বন্ধ করে ঘরটি অন্ধকার করা হল। অসংখ্য নক্ষত্রমালা আকাশের ঘন অন্ধকারের মাঝে ফুটে উঠল; ধীরে ধীরে চাঁদ উঠল। মনে হচ্ছে—আমরা যেন আকাশের রহস্যময়ী জ্যোতিষ্কমণ্ডলী আমাদের চ'খের সামনেই দেখতে পাচ্ছি: আজকের বক্তব্য ও দ্রষ্টব্য বিষয় হল চন্দ্রগ্রহণ। একজন বক্তা বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে ও দেখিয়ে দিচ্ছিলেন। ঘণ্টা দেড়েক পরে এই Illuminated Lecture শেষ হ'লে আমরা বেরিয়ে এসে লনের খোলা মাঠে বসলাম। খুকু কাছেই একটি Aquarium দেখতে গেল।

বিকেলে স্থানীয় এক জনস্তত্ত্ববিদ ডাক্তারের বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণ রাখতে গেলাম। প্রথমেই আমাদের খারাপ লাগল এই জনস্তত্ত্ববিদের মনোভাবটা; তাঁর কথাবার্ত্তা কেমন যেন খেলো ধরণের। দুএকদিন মানুষের মন বিশ্লেষণ করে করে জনস্তত্ত্ববিদ্ নিজের জীবনের স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারার স্বচ্ছন্দ-রূপটি হারিয়ে কেমন এক বিকৃত মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। ডাক্তারপত্নী কিন্তু অতি স্বাভাবিক, সরল ও সাদাসিধা মানুষ। স্বদেশে তাঁরা দুজনে এশিয়া ও ইউরোপের বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন। ডাক্তারের সূক্ষ্ম বিচারে সকল দেশের ও সকল জাতির নরনারীর কেবল বিকৃত বিশ্লেষণই চলতে লাগল; ক্রমে কথাবার্ত্তা তর্কে পরিণত হল। ডাক্তারের স্ত্রী স্বামীকে কাবু করতে চেষ্টা করে ২।৩ বার ধমক ও চোখ রাঙানি পেলেন। শেষবারে ডাক্তার তাঁর স্ত্রীকে এমন এক ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—"You shut up, Darling" যে স্ত্রী বেচারা লজ্জায় ও অপমানে মুখখানি রাঙা হ'য়ে উঠলো।

আমার ভারি খারাপ লাগল। রাত্রেরোপ খাবার সময় হয়েছে বলে আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম, তারপর ডাক্তার-পত্নীকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

আমার বার বার মনে হতে লাগল যে আমেরিকার মত স্বাধীন ও প্রগতিশীল দেশেও স্ত্রী এখানে রক্ষণশীল স্বামীর এইরকম কদর্য্য ও রূঢ় ব্যবহার সহ্য করেও ঘর করেন তাহ'লে!

আজ সন্ধ্যার অভিজ্ঞতাটা বেদনাদায়ক হ'লেও যেন একটু নূতন ধরণের হল।

২৯শে জুন। আজ ফোর্টুরেট খাবার দিন। সকালেই গেলাম রামকৃষ্ণ আশ্রমে স্বামীজীর সাথে দেখা করতে। তিনি এক শিকের গাড়ীতে তুলে সহর বেড়াতে নিয়ে গেলেন। শিকাগোর শেষ সীমান্ত দূরে North Western University দেখে আমরা Museum of Science and Industryর বাড়ীর কাছে নামলাম। স্বামীজী দেখে সামনের মাঠটি দেখিয়ে বললেন যে বিশ্ববিশ্রুত Parliament of Religionsএর অধিবেশন একদিন সেই জায়গাটিতেই হয়েছিল; সেদিন স্বামী শ্রীমদ্ বিবেকানন্দ ভিক্ষুকের বেশে এসে কত ক্লেশ সহ্য করে আমেরিকার এই মাটিতে ভারতের ধর্ম্ম-পতাকা প্রোথিত করে গেছেন; যুবক সন্ন্যাসী বিশ্বের ধর্মসভায় শুনিয়েছিলেন ভারতবাসীর ধর্ম্ম কি এবং ভারতের গৌরব কোথায়?

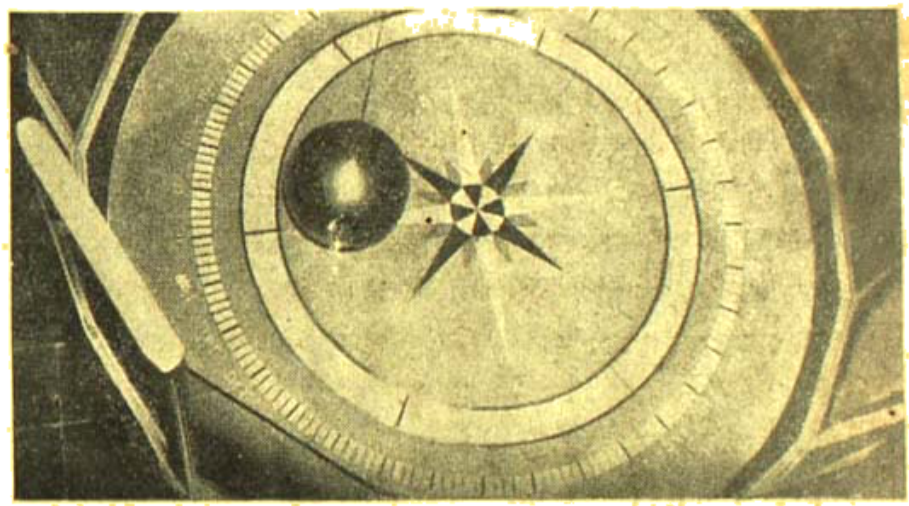

ফোকাল্ট পেণ্ডুলাম

আমরা হোটেলে ফিরে আহারাদি সেরে আবার এলাম Museum of Science and Industry দেখতে। বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের সাথে সাথে শিল্পের উন্নতি সাধন কিভাবে হচ্ছে এবং মানুষ তদ্দ্বারা কত উপকৃত হচ্ছে সেই সকল নিদর্শনই এখানে সাজিয়ে রেখেছে। বাড়ীর একধারে একটি প্রকাণ্ড পেণ্ডুলাম বিশতলা পরিমাণ উঁচু ছাদ হতে ঝোলানো রয়েছে দেখলাম, পেণ্ডুলামের দুদিকে দাগকাটা

বড় একটি বোর্ডে ব্লক পাতা। পেণ্ডুলামটি মিনারেতে একবার গোল হয়ে ঘুরে আসে এবং পৃথিবী যে ঘুরছে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় মেলে

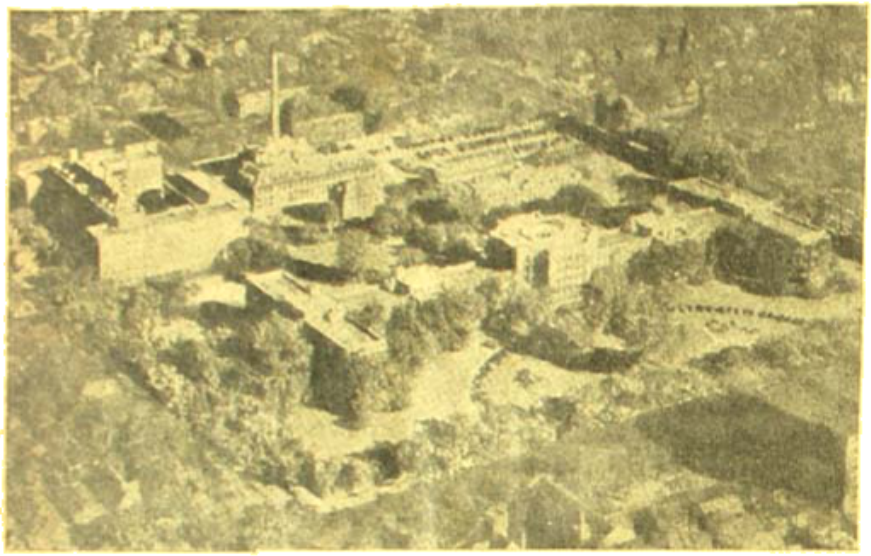

ডেট্রয়েটে হেনরী ফোর্ডের হাসপাতাল

Museumএর বড় হলের মাঝে একটি ছোট কয়লার খনি তৈরী করা আছে। আমরা টিকিট কেটে সেই কয়লার খনির ভিতরে lift-এ করে নামলাম। খনির ভিতরে ছোট একটি ট্রেনের মত ট্রেনে চড়ে এর যার হতে আরেক প্রান্তে গিয়ে দেখতে লাগলাম। খনির ভিতরে কয়লা সংগ্রহে আজ কয়লার মধ্যে প্রচুর ধরণা কাটা হচ্ছে,

কয়লার খনির ভিতর ট্রেণ

(কয়লা ও খনির কুলি মজুরদের বহন করে)

আমার অস্ত্রের সাহায্যেই গাড়ী বোঝাই হয়ে যাচ্ছে এবং সোজা উপরে উঠছে। আমাদের দেখা শেষ হলে ট্রেন থেকে নেমে একটু হাঁটতেই দেখি আমরা basementএর একটি ঘরে এসে পড়েছি। পাশের ঘরটি একটি Cafeteria. লোকেরা সব ঢুকল সেখানে চা-টাপরম পানীয় খেতে।

আমরা Museum থেকে বেরিয়ে যাব চড়ে হোটেলের দিকে রওনা হলাম। বাস মিশ্রোপল্লীর ভিতর দিয়ে চলল, দেখতে দেখতে নিগ্রো দেশে পুরুষে যায় ভরে গেল। শিকাগোর মিশ্রোপল্লীটি খুব বড়; এখানে নিগ্রোসংখ্যা খুব বেশী। মাইলের পর মাইল আমরা নিগ্রোপল্লী পেরিয়ে চলেছি; ছোট ছোট একতলার সাজানো গোছানো বাড়ীগুলি বেশ দেখতে।

নিগ্রো মহলাকী বৈচিত্র্য প্রায় যেন সমান। একে বিরাটকায়, তার উপর আবার এরা সারা আমেরিকাদেশের বেশভূষা হবহু নকল করে রং চড়িয়ে সেজে গুজে চমক লাগিয়ে চলেছে।

আমরা হোটেলে পৌঁছে যার যার ঘরে

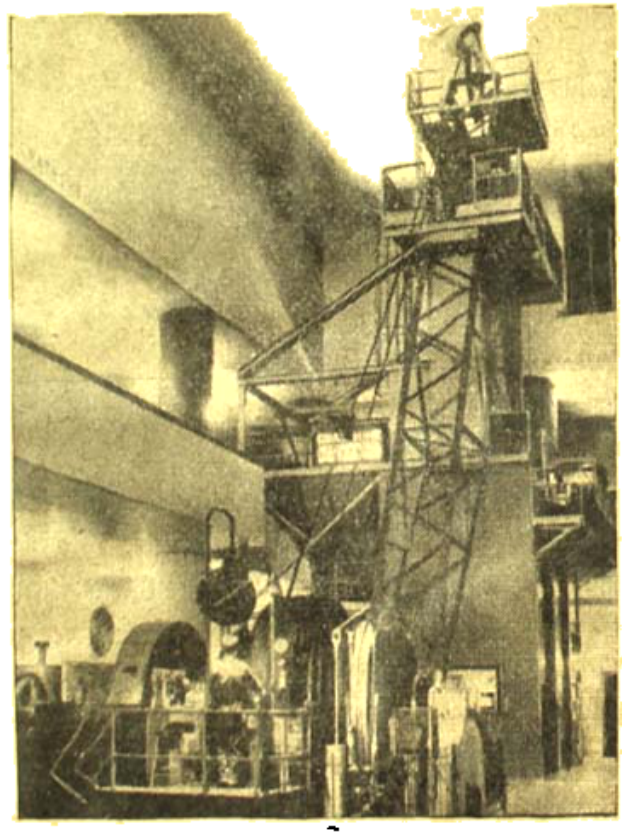

মিচিগানের ভিতর সকল কয়লার খনি

ডেট্রয়েটের ট্রেণ ধরতে ষ্টেশনে গেলাম। সারা রাত ট্রেণে যাবার, সকাল ৮টায় আমরা ডেট্রয়েটে নামলাম। ষ্টেশনে নেমে

দেখি Dr. Pralt আমাদের নিতে এসেছেন; তাঁর বাড়ীতে গেছে তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হলাম। Mrs. Pralt আমাদের দেখে ভারি খুসী। তিনি খুকুকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে গেলেন একটি ছোট সাজানো ঘরে; ঘরের সাজানো খেলনাগুলি দেখিয়ে বলেন যে এ ঘরে যতগুলি খেলনা আছে সবই তার, সেই ঘরখানিও তার দখলে। Mrs. Pralt-এর বৃদ্ধা মা ও একমাত্র বিবাহিতা কন্যা—Patraciaও বাড়ীতে ছিলেন। বাড়ীতে দাসদাসী তিন চারজন রয়েছে। Mrs. Pralt আমাকে দোতলায় নিয়ে গিয়ে বাড়ীর সব দেখালেন। তাঁদের family drawing roomএ গিয়ে একটি লম্বা আরাম-চেয়ার টেনে নিয়ে সুন্দর একটি খাট তৈরী করে জিজ্ঞাসা করলেন যে রাতের বিশ্রামের ব্যবস্থা তার উপর করে দিলে আমার কষ্ট হবে কিনা।

Mrs. Pralt-এর বয়স অনুমান ৫০-এর উর্দ্ধে; এই বয়সে তাঁর এই অদম্য উৎসাহ ও পরিশ্রমের ক্ষমতা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। খুকুকে তার Cycleএর সামনে বসিয়ে সহর দেখাতে নিয়ে গেল. আমরা সবাই চললাম বাগানে। বাগানের সামনে খোলা সবুজ Golf-এর মাঠ, চারিদিকে সাজানো বাগান, মাঝে বাড়ীটি—যেন তুলি দিয়ে আঁকা ছবি।

Mrs. Pralt-এর রান্না ঘরে একটি নূতন জিনিষ দেখে আবার ভারি ভালো লাগল—রান্নাঘরের দেয়ালটীর আবর্জ্জনা একটি টানা দেয়ালের ভিতর পুরে বন্ধ করে দিলেই সে সব ইলেকট্রীকে পুড়ে ছাই হয়ে নীচের basementএর একটি ঘরের কোণায় গিয়ে পড়ে।

দুপুরে সবাই গিয়ে বাড়ীতে লাঞ্চ খাওয়া গেল। Mrs. Pralt আবার আজ রাতে বাড়ীতে একটি বড় প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করেছেন; স্থানীয় ডাক্তারদের ও তাঁদের স্ত্রীদের সাথে আমাদের আলাপ পরিচয়ের সুযোগ ঘটবে। রাত বারোটা অবধি সকলের সাথে আলাপে ও গল্পে বেশ কাটল।

ডেট্রয়েটে ডাক্তার প্রাটের বাড়ী

আমরা সবাই গিয়ে তাঁর বাগান দেখতে গেলাম। বাগানে লাল গোলাপ অনেক ফুটেছে; কাদা মাটির পাশে লাল মাটিতে গোলাপ গাছের সারি অসংখ্য পোঁতা আছে দেখে বেশ আশ্চর্য্য লাগল। Mrs. Pralt তাঁর এই সখের বাগান দেখিয়ে আমায় বলেন যে আমেরিকাতে কতকগুলি কোম্পানী আছে যারা বাড়ীর বাগান সুন্দর সাজিয়ে তৈরী করে দিয়ে যায়; যে গাছের জন্য যে ধরণের মাটী ও সার প্রয়োজন সমস্ত কিছু সরবরাহ করে তারা এমনি একটি সখের বাগান তৈরী করে দিতে পারে। আমেরিকার অন্য সহরের মত ডেট্রয়েটও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাজানো বড় সহর। Ford Co-র মোটর কারখানার জন্যই সহর এত বড় হয়ে গড়ে উঠেছে।

Dr. Pralt ওঁকে হাসপাতাল দেখাতে নিয়ে গেলেন। Patracia পরদিন সকালে Ford গাড়ীর কারখানা দেখতে গেলাম; Patracia তার বড় মোটর হাঁকিয়ে আমাদের সহর দেখাতে নিয়ে গেল। এত বড় বিরাট কারখানা আমি আগে দেখিনি,—যেন অনেকগুলো সহর জুড়ে এই কারখানাটী গড়েছে। আমরা ঘিরে এসে বাক্স গুছিয়ে তৈরী হলাম; আজই আমাদের Buffalo যেতে হবে। Dr. Pralt ষ্টেশনে তুলে দিয়ে গেলেন; আমরা রাত প্রায় ৯টায় Buffalo ষ্টেশনে নামলাম। আবার সেই skyscraperএর তলায় ওঠা। Hotel statler একটি বিরাট বাড়ী; ঘরগুলি অদ্ভুতভাবে সাজানো; প্রত্যেক ঘরে Radio sett রয়েছে; জাঁকজমকের চূড়ান্ত।

একটু পরে General Electric থেকে একজন অফিসার ও তার স্ত্রী—Mr ও Mrs. Nelson—আমাদের খোঁজে Hotelএ উপস্থিত

হলেন ; আমাদের সাথে আলাপ হল. কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর স্থির হল তারা আমাদের Niagara জলপ্রপাত দেখাতে নিয়ে যাবেন।

২রা জুলাই। সকালে ওঁর সেই মধ্যবর্ত্তি হাসপাতাল পরিদর্শন করা শেষ হলে আমরা সবাই, Mr ও Mrs. Nelsonএর গাড়ীতে করে Niagara Fallsএর দিকে রওনা হলাম। ওনেলাম এখান থেকে ২২ মাইল দূরে এই প্রপাতটি। Buffalo সহর Erie হ্রদের পাড়ে। এই Erie হ্রদ ও Ontario হ্রদকে যুক্ত করে সুদীর্ঘ Niagara নদী প্রবাহিত। নদী এই পথে যেতে যেতে মাঝে এক গভীর খাদের গর্ভে ঝাঁপ দিয়েছে—এবং সেখানে এক বিরাট জল প্রপাতের আকার ধারণ করেছে।

(ক্রমশঃ)

মহাভারতের হে মহামানব

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মহাভারতের হে মহামানব তোমারে প্রণাম করি,
তব সাধনার পুণ্য বিভায় পোহায়েছে বিভাবরী।
জীবন দিয়েছ মৃত শিল্পের সমাধি-পাষাণ তুলি
শ্মশান ভস্ম কুড়ায়ে তাহারে করেছ স্বর্ণধূলি।
দিয়েছ ধরার চিত্ত-মরুতে শান্তির নির্ঝর
তোমার মন্ত্রে দীক্ষিত ধরা—বহু-যুগের নর।
প্রাচীন ভারত সভ্যতা জাগে তোমার দৃষ্টিপাতে,
যন্ত্র-দানব করেছ দলন উটজ শিল্পাঘাতে।
একেলা পথের যাত্রী তোমার হিংসা নাশের পণ,
বুদ্ধের মত ব্রতচারী তুমি, পশ্চাতে জনগণ।
হিংসা যখন গৃধ্র বৃকের বেশ ধরি এলো দেশে
রামধুন গানে প্রেমের মন্ত্রে হারায়েছ তারে হেসে।
অহিংসার জ্যোতি দেখায়েছ তুমি হিংসা যে পরাজিত,
এই ধরণীর পথে প্রান্তরে রামধুন মুখরিত।
বৌদ্ধ যুগের যে বাণী একদা ছিল এশিয়ার কূলে,
তোমার প্রভাবে সে বাণী মন্ত্রে বিশ্ব উঠিছে দুলে।
শান্তি মৈত্রী সঙ্গীত জাগে নিখিলের ঘাটে ঘাটে
ভারতের সেই অশোক-চক্র বসেছে রাজাপাটে।
সারা দুনিয়ার মানব আজিকে লভিল মন্ত্র নব
হিংসা দূষিত নর-সভ্যতা পেয়েছে পাথেয় তব।
রুদ্র হিংসা বহ্নি শিখায় আপনারে করি দান
এই ভারতের চির দিবসের করেছ পীঠস্থান।

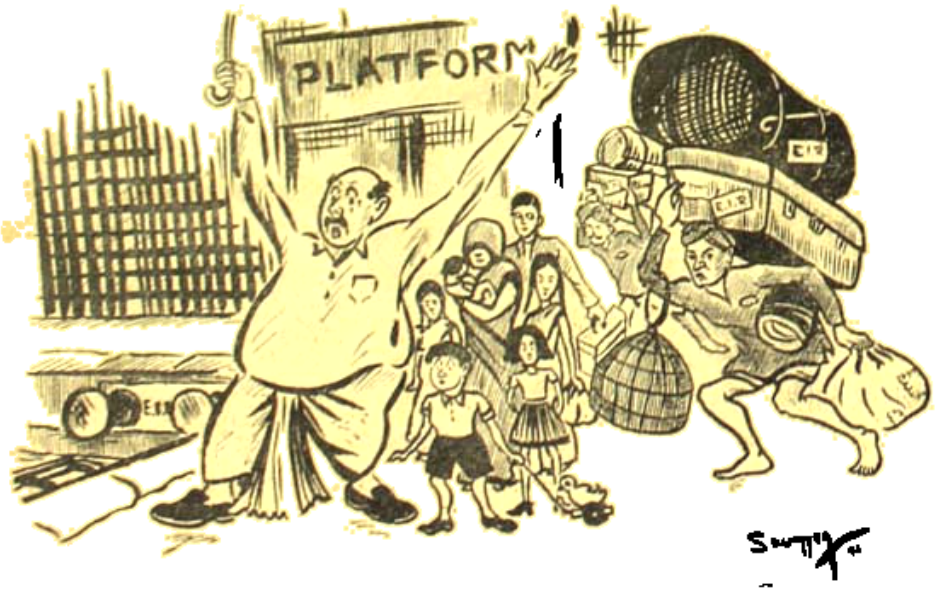

বায়ু পরিবর্ত্তনে বাঙালী পরিবার

শিল্পী—শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

কলিকাতার দুরবস্থা—

ইংরাজ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রধান সহর বলিয়া কলিকাতার খ্যাতি ছিল। ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইবার পর কলিকাতার প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তা অনেকটা হ্রাস পাইলেও কলিকাতার গর্ব্ব প্রায় অটুট ছিল। স্বাধীনতা পাইবার পর এত বড় বিরাট সহরের উন্নতি আশা করিয়া লোকে বসিয়াছিল; কিন্তু কলিকাতা বাসের "সুখ" দিন দিন যেভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে ইহা পল্লী অঞ্চল হইতেও হীন হইয়া পড়িবে বলিয়া সকল লক্ষণ বর্ত্তমান। সহরে লোক বেশী সংখ্যায় যানবাহন

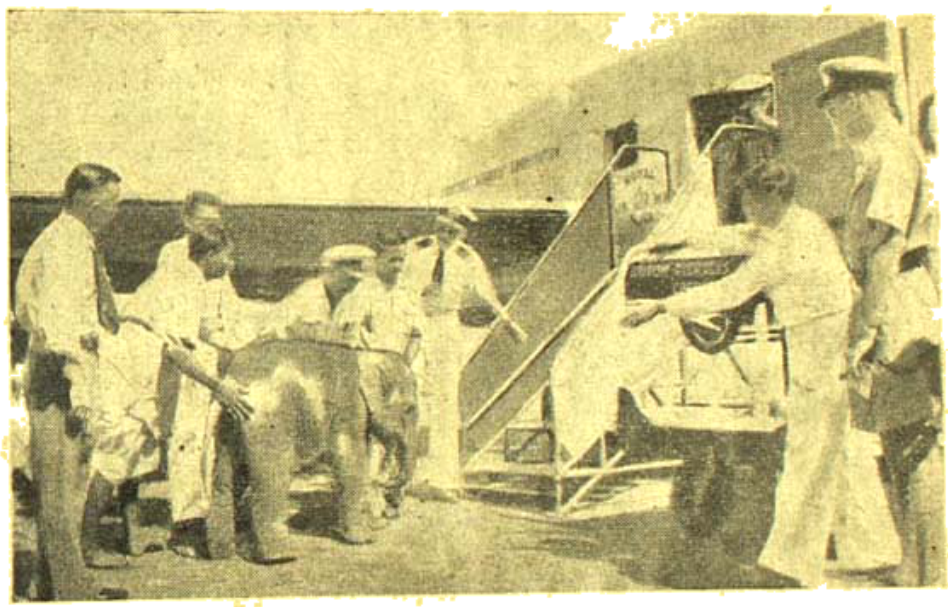

দমদম বিমান ঘাঁটিতে নাবিকীয় (হস্তী শাবক) বিমান আরোহণ

কর্ত্তৃক হতাহত হইয়া থাকে, এখানে সে বিষয়ে ত্রুটি নাই। কিন্তু সহরের যে নিরাপত্তা তাহা এখানে নাই। মাসিক দরবারে আহুত সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণের সমক্ষে বিবৃতি দেওয়া ছাড়া পুলিসের কর্ম্মতৎপরতার বিশেষ পরিচয় নাই। প্রকাশ্য দিবালোকে সহরের সর্ব্বাপেক্ষা ঘনবসতিপূর্ণ স্থানে লোমহর্ষণ ডাকাতি ও রাহাজানি হইতেছে; এ পর্য্যন্ত কোনওটীর সুরাহা হইবার সংবাদ নাই। শিশু-কিশোর-হরণের যে সংবাদ পাওয়া যায় তাহা সমস্ত সত্য না হইলেও, প্রতি মাসে কয়েকটী করিয়া ঘটনা হইতেছে, কর্ম্মকর্ত্তার সহধর্ম্মিণীরা প্রসবের ও চিকিৎসার ব্যয় কর্পোরেশনকে যোগাইতে হইতেছে। "সুখের উপর সতরকি" একটী প্রবাদ বাক্য; তাহা কলিকাতায় ফলিতেছে। মান্ধাতা যুগের চুঙ্গি ব্যবস্থা এখানে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। একেই জিনিষ দুর্ম্মূল্য, তাহার উপর চুঙ্গি এবং চুঙ্গির দাম বাড়িলে তাহার উপর বিক্রয় কর বৃদ্ধি পাইবে। তাজা ফলের উপর বিক্রয়-কর বসাইয়া গৃহস্থের ঘরে রোগীকে যে এক আধটা কমলালেবু দেওয়া যাইত, তাহার সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়াছে; রোগে আঙ্গুর বেদানা

দেওয়া এখন গল্পকথায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। সরকারী নূতন ট্যাক্সের ঘুঘায় পড়িয়া নিত্য ব্যবহার্য্য খাদ্যদ্রব্যের

হিমালয় পরিভ্রমণকারিগণ ফটো—শ্রীপান্থ সেন

মূল্য অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে। লোকের পা রাখিবার স্থান নাই, অথচ নূতন লোক সমাগম হইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গে যতই অশান্তি বৃদ্ধি পাইবে, এখানে ভিড় ততই বাড়িবে। সুতরাং এই আহার্য্য যানবাহন সকল বস্তুর উপর চাপ পড়িতে বাধ্য। লোক বাড়িলে জঞ্জাল বাড়ে, সেখানে কোনও ত্রুটী নাই। মানুষের মনে স্বাধীনতার হাওয়া লাগিয়াছে এখন যে যাহার ইচ্ছামত কাজকর্ম্মে আপন আপন অভিরুচি প্রকাশ করিতে ব্যস্ত। কথায় কথায় মারা লাগিয়া আছে, পথে লোক জমাট হইয়া চলা-ফেরার অসুবিধা বৃদ্ধি করিয়াছে। এই সকল যন্ত্রণা এত বড় সহরের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়; সুতরাং এখানে কাঁকড়া বিছা নয়, মানুষ বিচ্ছুর কথাও ছাড়িয়া দিলে, আসল বিচ্ছু কলিকাতায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রায় শতাধিক বিচ্ছুদংশিত রোগী হাসপাতালে আসিয়াছে, দুইটী শিশু এ পর্য্যন্ত বিচ্ছুর কামড়ে মারা পড়িয়াছে, আর কত হাসপাতালে আসে নাই, তাহার হিসাব পাওয়া যায় নাই। এখন গ্রীষ্মের উপর বিস্ফোটক সন্তাপ। প্রকাশ্য দিবালোকে কলিকাতা সহরে শিয়ালদহ বহুবাজার মোড়ের উপর অন্যান্য শ্বাপদ নয়, একেবারে ব্যাঘ্র (শিশু) অকুতোভয়ে বিচরণ করিতেছে। কলিকাতাবাসীর নিকট ইহা "বোঝার উপর শাকের আঁটী" বলিয়া প্রতিভাত হইবে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। আরও রহিয়াছে ছাত্র, মজুর, কৃষক বিক্ষোভ, বোমা, কাঁদুনে গ্যাস, বন্দুকের গুলি, ট্রাম বাসে অগ্নিসংযোগ এবং নিরীহ লোকের জীবননাশ। এত সুখ কলিকাতা ছাড়া কোথাও একসঙ্গে পাইবার সম্ভাবনা নাই।

রেশনিং আইনে অপরাধ—

সম্প্রতি কলিকাতা সহরে রেশনিং আইনে দণ্ডনীয় দুই ব্যক্তির বিচারে ম্যাজিষ্ট্রেটদ্বয় যে রায় দিয়াছেন তাহা

পাকিস্থানের ভারতীয় হাই-কমিশনার পূর্ব্ববঙ্গ যাত্রার পথে একখণ্ড বিমান ঘাঁটিতে

ফটো—শ্রীপান্থ সেন

প্রণিধানযোগ্য। প্রথম ক্ষেত্রে অপরাধী একজন বৃদ্ধ মুসলমান —সের দশেক চাউল বিক্রয় করিতে আসিয়া সে পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া বিচারালয়ে আসে। হাকিম বলিয়াছেন যে রেশনিং প্রথায় যে চাউল পাওয়া যায় তাহাতে সপ্তাহে কাহারও চারদিনের বেশী চলে না। প্রকৃতপক্ষে আসামীর

মত লোকেরা আইনের বিপদ উপেক্ষা করিয়াও লোকের দরজায় প্রাণরক্ষাকারী অন্ন উপস্থিত করে। দেশের আইন এমনই যে ইহারাই দণ্ডনীয়। হাকিম এক টাকা জরিমানা করিয়া চাউলগুলি আসামীকে ফেরত দিবার আদেশ দেন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আসামী প্রভুর আদেশে যাদবপুর হইতে আধ মণ চাউল আনে। বাড়ীতে স্থায়ী অধিবাসীর খোরাকের চাউল নাই, আবার পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে নিরাশ্রয় সাত আট জন আত্মীয় আসিয়া উপস্থিত। সতর্ক পুলিশ আসামীকে ধরিয়া কাঠগড়ায় তুলিয়াছে। অনুসন্ধানে যে সত্য প্রকাশ পাইল তাহাতে সুবিবেচক হাকিম নামমাত্র জরিমানা করিয়া আসামীকে মুক্তি দেন। পুলিশের এই তৎপরতাকে অশেষ ধন্যবাদ দিতে হয়। দিন দুপুরে বড় বড় ডাকাতি ধরা পড়ে না, রাহাজানি সর্ব্বত্র চলিতেছে, কোটী কোটী টাকা ঘুষের সংবাদ বাজারে চলিতেছে, সিভিল সাপ্লাই অফিস অর্থাৎ রেশনিং আইনের জন্মদাতা সরকারী বিভাগের অনাচারের সংবাদে কলিকাতা মুখর হইয়া রহিয়াছে। সরকারী পয়সার অপব্যয়, আত্মীয়-পোষণ, তেলা মাথায় তেল ঢালার নানা সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এই সকল অনাচার বন্ধ হইলে সকলে সুখী হয়; তাহা না করিয়া মশা মারিতে কামান দাগার গল্প শুনিয়া হাসি পায়।

ট্রামে চলাচল—

ট্রামে বাসে চলাচল যে কি কষ্টদায়ক তাহা সকলেরই অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারেন। তাহার উপর লোকে ইচ্ছা করিয়া যে অসুবিধা করে, তাহার মধ্যে গাড়ীর ভিতর ধূমপান ও উঠানামার রাস্তা বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা প্রধান। ধূমপান সম্বন্ধে আলোচনা হয়, কিন্তু রাস্তা বন্ধ করিয়া থাকার বিষয় তত আলোচিত হয় না। কিন্তু ইহাতে যে যাত্রীর অসুবিধা বেশী, কেহ তাহা অস্বীকার করিবে না।

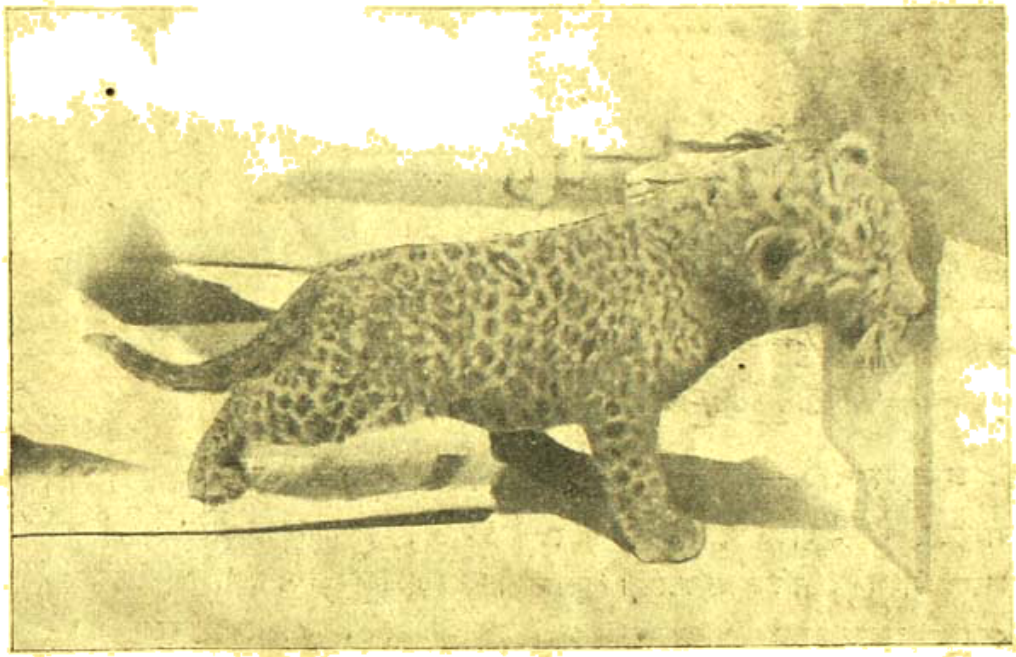

কলিকাতার রাজপথে চিতা বাঘের বাচ্চা।—কিছুদিন পূর্বে এই বাঘের বাচ্চাটিকে কলিকাতার পুলিশ শিয়ালদহ ষ্টেশনের নিকট হইতে উদ্ধার করে এবং কলিকাতার চিড়িয়াখানায় উপহার দেওয়া হয়; কিন্তু তাহার অল্প কয়েকদিন পরেই বাঘের-শাবকটি চিড়িয়াখানায় মারা যায়।

ফটো—পান্না সেন

যাহারা দাঁড়াইয়া থাকে তাহাদের অধিকাংশই ইচ্ছা করিলে ভিতরে স্থান পায়—এমন কি বসিবার স্থানও অনেক সময় খালি থাকে। আরামে হাওয়া সেবন করিবার লোভে অনেকে গাড়ীর দরজায় দাঁড়ায়। ইহারা দারুণ স্বার্থপর। অপরের সহিত বসিলে মানের হানি হয়, ইচ্ছা করিলে ভাড়া না দিয়া সরিয়া পড়া যায়, পকেট-মারার সুবিধা হয় এবং ওঠা-নামার ভিড়ে মহিলাদের ধাক্কা দিবার সুযোগ পাওয়া যায়, এই সকল লোভনীয় কারণেই অপরের অসুবিধা করিতে ইহাদের আপত্তি নাই। প্রতিদিন কেবল এই

কারণেই বহু দুর্ঘটনা ঘটে, এমন কি পথে পড়িয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে। এইরূপ যাত্রীদের অধিকাংশকে পথ ছাড়িতে বলিলে ভীষণ চটিয়া যায়। ইহা স্বাভাবিক—কারণ তাহাদের উদ্দেশ্য বড়ই "সাধু"; সুতরাং সৎকার্য্যে বাধা পাইলে চটিবারই ত কথা।

প্রথের ব্যবস্থোপযোগী করা হয় নাই। কলিকাতার বক্ষে অত বড় সম্পত্তি কাহারও কাজে লাগে না, তাহার জঞ্জাল দূর করিয়া বাগিচাকে পূর্ব্বাবস্থায় আনিতে লক্ষাধিক টাকার প্রয়োজন। সে টাকা কে দিবে? যাঁহারা কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের কি এ সম্বন্ধে কোনও দায়িত্ব নাই? যেখানে

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বাৎসরিক সভায় সমবেত সদস্যগণ ফটো—পান্না সেন

অখিল ভারত প্রদর্শনী—

যতই দিন যাইতেছে অখিল ভারত প্রদর্শনীর ব্যাপারে নানারূপ গণ্ডগোলের সংবাদ প্রচারিত হইতেছে। আজ পর্য্যন্ত ইহার কোনও সুচারু হিসাব পাওয়া গেল না। তদানীন্তন প্রদেশপাল শ্রীরাজগোপালাচারী প্রদর্শনীর লাভের শতকরা পঁচাত্তর টাকা জনহিতকর কাজের জন্য পাওয়া যাইবে বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। সে কথা আজ লোকে ভুলিতে বসিয়াছে। মনে হয় তিনি যখন লাভের অংশ গ্রহণে লোভী হইয়াছিলেন, তখন ত লোকসানের অংশভাগী হওয়ার কথাও নিশ্চয় ভাবিয়াছিলেন। কর্তৃপক্ষকে নীরব থাকিতে দেখিয়া নানা প্রশ্ন মনে উদয় হইতেছে। সে যাহাই হউক, বর্ত্তমানের বড়লাট বাহাদুর, ভারতের প্রধান মন্ত্রী, পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ও অর্থসচিব প্রভৃতি ভারতের বহু নামজাদা লোক কর্ম্মকর্ত্তাদের সদস্য তালিকা অলঙ্কৃত করিয়া সাধারণ দেশবাসীকে ধন্য করিয়াছিলেন। যুদ্ধ শেষের পর আজ তিন বৎসর হইতে চলিল, ইডেন গার্ডেনকে সাধা-

দায়িত্ব লইবার ক্ষমতা নাই সেখানে নাম জাহির করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ-সমিতিতে নাম দেওয়া অশোভন। সম্প্রতি এক সংবাদে প্রকাশ, যাঁহারা চিত্র প্রদর্শনীর অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পারিতোষিক পাইবার উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন তাঁহারা কেহ পুরস্কার পান নাই। অথচ শোনা যায়, যাঁহারা পারিতোষিক দান করিয়াছেন, তাঁহারা সকলে টাকা জমা দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বিশেষ তদন্ত হওয়া দরকার। সংবাদটী মিথ্যা প্রমাণিত হউক, নচেৎ বাঙ্গালার পক্ষে ইহা অত্যন্ত হীন কলঙ্ক বলিয়া মনে হইবে।

জমিদারী বিলোপ ব্যবস্থা—

ভারতবর্ষে জমিদারী বিলোপ করিবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে দেখা যাইতেছে, গভর্ণমেণ্টের কোনও সুপরিকল্পিত কার্য্য-ধারা নাই। রাজ্যশাসনভার হাতে পাইবার পূর্ব্বে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে একটী তদন্ত কমিটী নিযুক্ত ছিল,

পণ্ডিত জওহরলাল তাহার এক সভ্য ছিলেন। সেই কমিটীর সুপারিশের কি হইল, তাহা জানা যায় নাই। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন আইন গঠিত হইতেছে, একের সহিত অপরের সামঞ্জস্য নাই এবং প্রয়োজনবোধে একই আইনের পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জ্জন সাধিত হইতেছে। এই সকল কথা বিচার করিলে বলিতে হয়—কলমের এক খোঁচায় সমস্ত জমিদারী বিলোপের চেষ্টা হয় ত শেষ পর্য্যন্ত দেশের স্বার্থের হানিকর হইতে পারে। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া কাজে নামিলে জমিদারী-বিলোপ ব্যবস্থা যে কেবল বিভিন্ন আকার ধারণ করিবে তাহা নয়, সর্ব্বাপেক্ষা যাহা প্রয়োজন অর্থাৎ দেশের খাদ্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি চেষ্টা,

পূর্ব আফ্রিকায় ভারতীয় হাই-কমিশনার মিঃ পণ্ডের সহিত ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামী অখণ্ডানন্দজী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিও ফিজিক্স্ ও ইলেক্‌ট্রোন সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান শাখার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনরত পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

ফটো—পাল্ল সেন

প্রয়োজন। তখন গভর্ণমেণ্ট, জমিদার ও প্রজা এই তিনটী স্বার্থ থাকিবে এবং গভর্ণমেণ্ট প্রজার সহযোগে নিজে গ্রহণ প্রয়োজন বোধ করিলে জমিদারের স্বত্ব স্বীকার করিতে পারে বা প্রজার উপর ন্যস্ত করিতে পারে। মোট কথা একটী কমিটী করিয়া সমগ্র ভারতে একটী নিয়ম পালিত হওয়া প্রয়োজন।

পরলোকে আর-বি-দাস—

কলিকাতার প্রাচীনতম বাদ্যযন্ত্রব্যবসায়ী রাধা-বল্লভ দাস মহাশয় বিগত ২৮শে বৈশাখ বুধবার রাত্রি সাড়ে তিন ঘটিকায় তাঁহার পটলডাঙ্গাস্থিত দাস ভিলায়

আর-বি-দাস

৭৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। প্রথম জীবন দারিদ্র্যে অতিবাহিত করিয়া সামান্য একটি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবসা দ্বারা তিনি উক্ত ব্যবসায়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠার্জ্জন করেন। তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের উন্নতিকল্পে বহু শ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছেন। সঙ্গীত-বিজ্ঞান-প্রবেশিকা নামক মাসিক পত্রিকা ও অন্যান্য বহু সঙ্গীতবিষয়ক পুস্তকাদির প্রকাশক হিসাবে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তিনি অত্যন্ত সদালাপী, ন্যায়পরায়ণ ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য তিন পুত্র, দুই কন্যা ও বহু আত্মীয়স্বজন বিদ্যমান।

শ্রীসতীন্দ্রজীবন দাশগুপ্ত—

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেডের স্যার প্রফুল্লচন্দ্র গবেষণাগারের রাসায়নিক শ্রীসতীন্দ্রজীবন দাশগুপ্ত এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জৈব রসায়ন শাস্ত্রে ডক্টর অব ফিলসফি (ডি-ফিল্) উপাধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল—অ্যাক্রিডিন জাতীয় ভেষজগুণসম্পন্ন যৌগিক পদার্থ। অধ্যাপক জে-সি-বর্দ্ধন, অধ্যাপক বি-বি-দে এবং অধ্যাপক টি-আর-শেষাদ্রি তাঁহার গবেষণা কাজের উচ্চ প্রশংসা

শ্রীসতীন্দ্রজীবন দাশগুপ্ত

করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত উক্ত গবেষণাগারে গত কয়েক বৎসর যাবৎ সংশ্লেষিত ভেষজ, বিশেষতঃ অ্যাক্রিডিন, কুইনোলিন, সালফোন অ্যাসাইড এবং আরসেনিক এটিনি সংক্রান্ত ভেষজবিজ্ঞান সম্পর্কে মূল্যবান গবেষণা চালাইতেছেন।

বাঙ্গালায় নূতন কৃষি-ব্যবস্থা—

বাঙ্গালার রাজস্ব-মন্ত্রী বলিয়াছেন জমিদারী বিলোপ-ব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে খাসমহল জমিতে সমবায় ও সমভোগ প্রথায় চাষ দ্বারা কোন্ ব্যবস্থা শ্রেষ্ঠ তাহা পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করিতে চান। ইহা যে খুব সমীচীন প্রস্তাব তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। যে ব্যবস্থায় খাদ্যশস্যবৃদ্ধির কোনও সম্ভাবনা আছে কি না তাহার দ্বিরুক্তি নাই, যাহাতে বহু লোকের বেকার হইবার সম্ভাবনা, যাহা দ্বারা বিনা অপরাধে যে কোনও মূল্যে লোকে সম্পত্তি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া দেশের মধ্যে ঘোরতর

অশান্তির সৃষ্টি করিতে পারে, সেরূপ কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী পথ কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ দ্বারা স্থির করিয়া লওয়া উচিত। বাঙ্গালা সরকারের কর্ম্মপন্থা বিশেষ রূপে সমর্থনযোগ্য।

দুই ঘোষ, প্রফুল্ল ও সুরেন্দ্র মিলিয়াছেন। আমরা আবার প্রফুল্ল (সেন) ও সুরেন্দ্রের মিলন দেখিবার জন্য উদগ্রীব রহিলাম। বীজগণিতে আছে ab, bc, ca, সুতরাং সেই শাস্ত্রমতে শেষ মিলন ঘটিলে বাঙ্গালায় আর একদফা

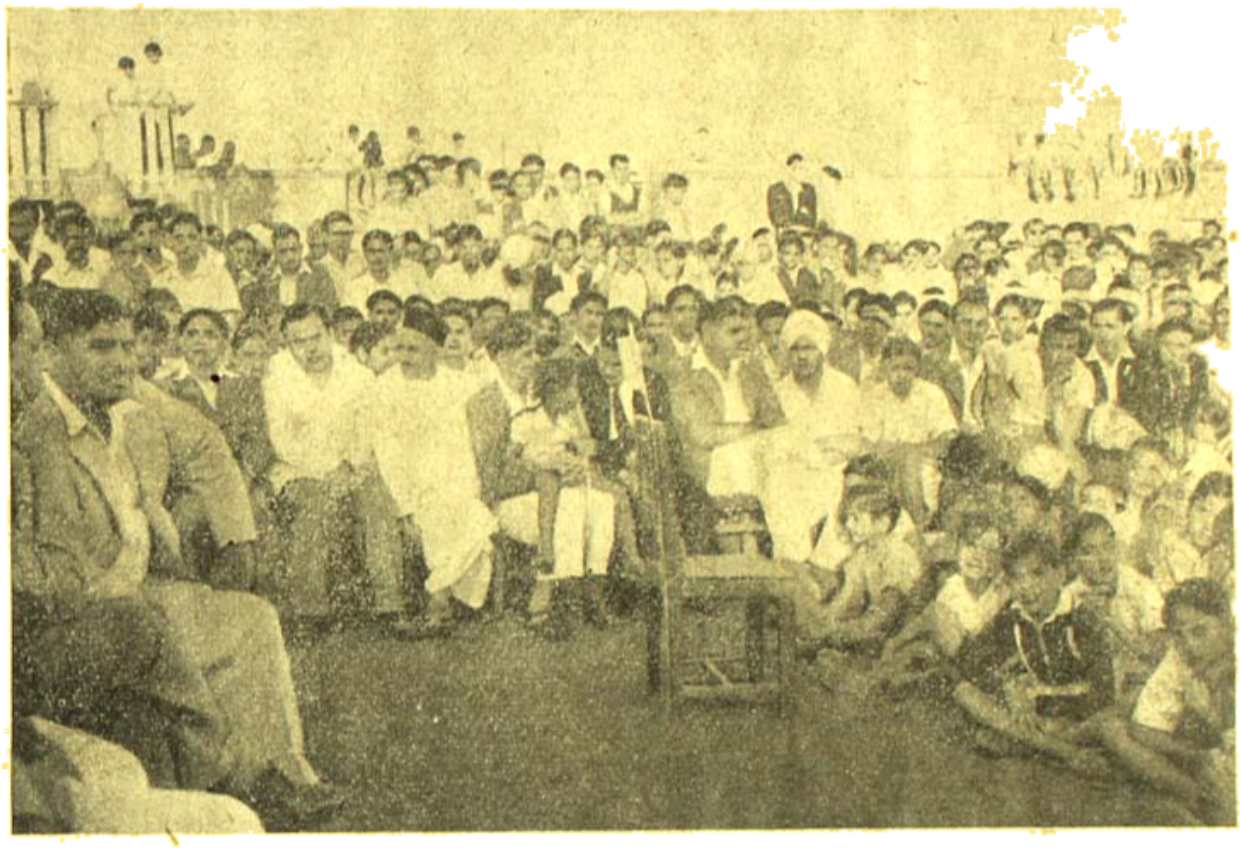

ভারত সেবাশ্রম সংঘের লাইব্রেরীতে ভারতীয় সাংস্কৃতিক মিলনের পরিচালিত শিক্ষা-সম্মেলনের একাংশ

পশ্চিম-বঙ্গ কংগ্রেস—

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে আবার রণদামামা বাজিয়াছে। একদল অপরদলের উপর অনাস্থা প্রস্তাব আনিয়া বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষদের অপসারিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। কংগ্রেস অ-কংগ্রেস্ বা কংগ্রেস-বিরোধীদলের বিবাদের কারণ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু একই প্রতিষ্ঠানের ভিতর যে লড়াই তাহা "গোলা" লোকে হঠাৎ বুঝিয়া উঠিতে পারে না। মাদ্রাজ, পূর্ব্ব-পাঞ্জাব, পশ্চিম-বাঙ্গলায় ইহা বেশ রূপপরিগ্রহ করিয়া রহিয়াছে এবং মীমাংসার সম্ভাবনা কম। বাঙ্গালায় এই কলহ বৃত্তচক্রে ঘুরিতেছে। ইহার পশ্চাতে যে রাজশক্তি লাভ করিবার লোভ রহিয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। প্রথমে দুই প্রফুল্ল, ঘোষ ও সেন মিলিয়া মন্ত্রী পরিষদ হইলেন। দল ভাঙ্গিল, এবার প্রাদেশিক কংগ্রেস ও মন্ত্রিমণ্ডলীতে পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইব। কিন্তু ইংরাজের সহিত লড়াই শেষ হইবার পর ইঁহাদের অপরাপর কার্য্যের তালিকা খুঁজিতে গেলে দমফাঁর পড়িতে হয়।

বিষতসার অগ্নিকাণ্ড—গগনস্পর্শী আগুনের লেলিহান শিখা

ফটো—শান্তি সেন

নিমতলায় অগ্নিকাণ্ড—অগ্নিকাণ্ডে বিধ্বস্ত ঘর বাড়ি ফটো—পান্না সেন

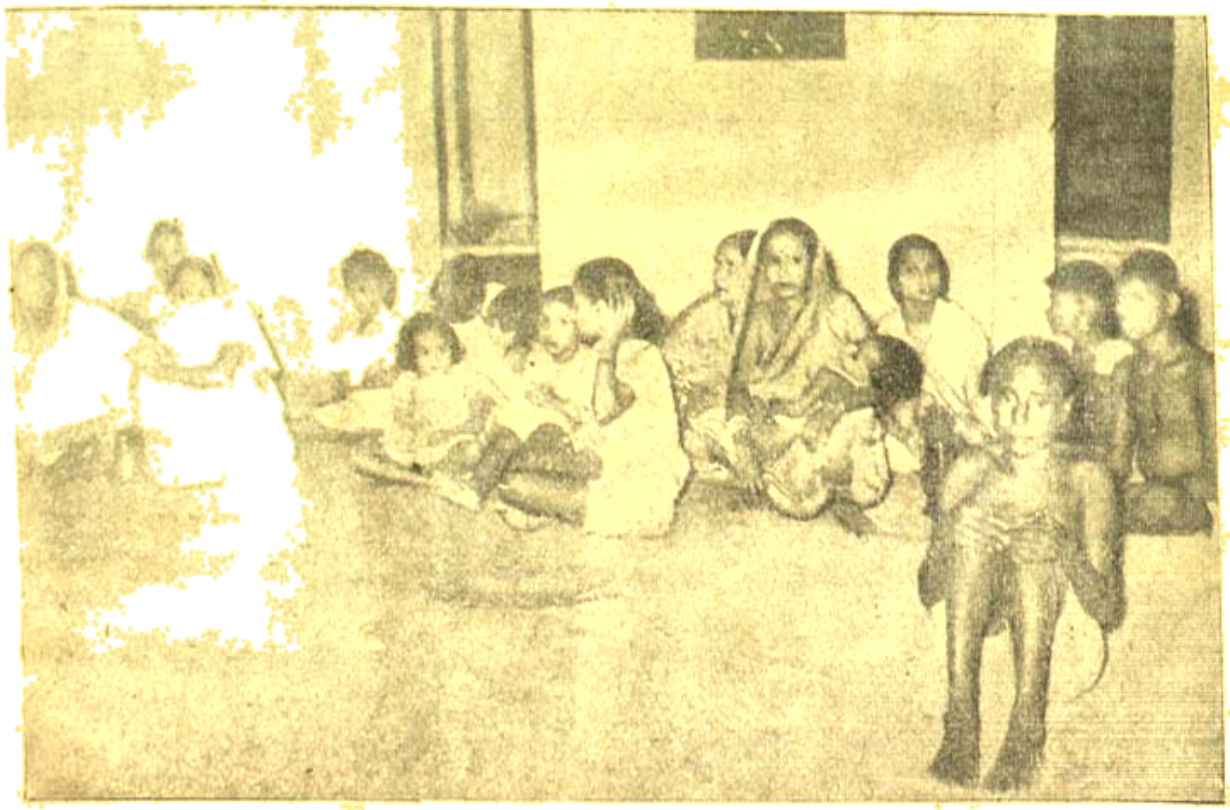

নিমতলায় অগ্নিকাণ্ড—অগ্নিকাণ্ডে গৃহহারা পরিবার—রাস্তার ফুটপাতে ফটো—পান্না সেন

লাইব্রেরীয়ানশিপ্ ট্রেনিং স্কুল—

গত ৯ই মে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নবম গ্রীষ্মকালীন লাইব্রেরীয়ানসিপ ট্রেনিং স্কুলের প্রথমানুষ্ঠানিক উৎসব শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের একটী অধিবেশন হয়। পরিষদের

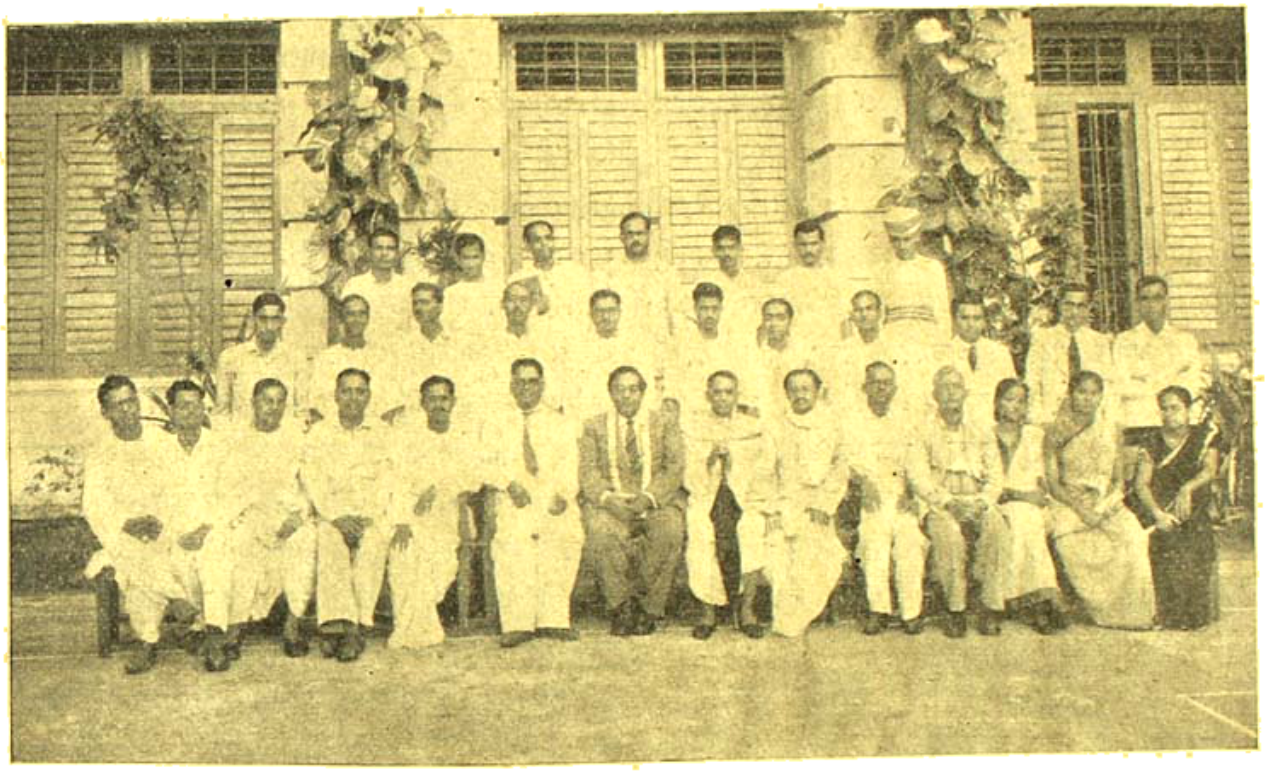

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের লাইব্রেরীয়ানশিপ ট্রেনিং স্কুলের প্রথমানুষ্ঠানিক উৎসবে সমবেত ব্যক্তিগণ ও সভাপতি শ্রীযুক্ত অপূর্বকুমার চন্দ

সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সমবেত শিক্ষক, ছাত্র ও কাউন্সিলের সদস্যগণকে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া ট্রেনিং স্কুলের উদ্দেশ্য ও কার্যতালিকা বুঝাইয়া দেন। শ্রীযুক্ত চন্দ মহাশয় গ্রন্থাগারিক-বিজ্ঞান বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেক কথা বলেন।

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফলাফল—

এবার আই-এ ও আই-এস্-সি পরীক্ষায় যথাক্রমে শতকরা ৩১·২ ও ৩৭·৮ জন ছাত্র পাশ করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। সার আশুতোষের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিপূর্বে আর এরূপ ঘটনা ঘটে নাই বলিয়া প্রকাশ; তৎপূর্বে হইত বলিয়া জানা আছে। ওয়াকেফ-হাল মহল হইতে কথা উঠিয়াছে এবার কম্পার্টমেণ্টাল ও সাপ্লিমেণ্টারী দুই পরীক্ষাই হইবে, অর্থাৎ যথাক্রমে যাহারা এক বা দুই বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়াছে তাহাদের নিকট নূতন করিয়া 'ফি' লইয়া পরীক্ষা হইবে এবং পাশের হার যাহাতে পরীক্ষার্থীর সংখ্যার শতকরা ৫০ হয় তাহার ব্যবস্থা হইবে। যদি এরূপ না হয় তাহা হইলে ছাত্রসংখ্যা কমিয়া গেলে কলেজ ব্যবস্থা চলিবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমিলে সমূহ বিপদ। আমরা বলি, আর নূতন পরীক্ষার কাজ নাই। যাহারা এক বিষয়ে অকৃতকার্য্য তাহাদের নিকট একটা 'ফি' এবং যাহারা দুই বিষয়ে অকৃতকার্য্য তাহাদের নিকট দুইটি "ফি" লইয়া যাহারা পাশ করিয়াছে তাহাদের পরে আই-এস্-সিতে ৩২·২%এর পর এবং আই-এ-তে ৩৭·৮%এর পর ৫০% পর্য্যন্ত পরীক্ষার্থী ধরিয়া বেশী নম্বর পাইয়াছে তাহাদের পাশ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হউক। ইহাতে সকল উদ্দেশ্যই সাধিত হইবে। মনে হয়, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র করিবার সময় এ দিকে দৃষ্টি রাখিলে ভাল হইত। তাহা অপেক্ষা ভাল হইত, যদি কলেজে সমস্ত বিষয় ভাল করিয়া পড়াইবার ব্যবস্থা থাকে এবং ছাত্ররা যথানিয়মে পাশ

করিত; তাহা হইলে আর লোক হাসাহাসি'র সুযোগ ঘটিত না।

শাসনতন্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা—

নূতন রাষ্ট্র স্থাপন করিতে হইলে বিজ্ঞ, কর্মিতকর্ম্মা, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, অনলস, সৎ লোকের প্রয়োজন। ভারতের শাসনতন্ত্র গঠন করিবার জন্য ভারতবর্ষের বাছাই করা লোক সভ্যপদে সমাসীন আছেন; যাঁহাদের মধ্যে প্রায় সবই কংগ্রেস সভ্য, জাতির জনক মহাত্মাজীর নাম লইয়া ইঁহারা দেশ ও দশের সেবা করিয়া থাকেন। সুচারুরূপে কাজ চালাইবার জন্য কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট ইঁহাদের দৈনিক ৩৫৲ টাকা ভাতা দেন এবং নামমাত্র ভাড়ায় সভ্যদের বাসবাটীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় মিউনিসিপ্যালিটীর যৎকিঞ্চিৎ ট্যাক্স ও বিজলীর খরচাটা গভর্ণমেণ্ট দেন না। দেখা যাইতেছে বহু সভ্যের এই বাবদ টাকা বাকী পড়িয়াছে এবং গভর্ণমেণ্টকে এই সম্বন্ধে পত্র দেওয়া হইয়াছে। নিরুপায় গভর্ণমেণ্ট নিঃশব্দে ইঁহাদের ভাতা হইতে পাওনা টাকা কাটিয়া লইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। আরও একটী সংবাদে প্রকাশ, নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সভ্য উপস্থিত না থাকায় পরিষদের কার্য্যারম্ভে বিলম্ব ঘটিয়াছে। সকলেই মনে করিতেছেন, অপরে উপস্থিত হইবেন। তিনি না গেলেও চলিবে, একবার অবসরমত গিয়া নাম সহি করিলেই টাকাটা উসুল হইবে। শোনা যায়, অনেক সভ্য নিজ বসিবার স্থানে ব্যাগ বা অপর কোনও নিশানা রাখিয়া নানা উপায়ে টাকা উপার্জ্জনের জন্য সহরে আয়ের ক্ষেত্রে ঘোরাঘুরি করেন এবং সময়মত 'রোজসই' করিয়া যান। ভারতবর্ষ অভাগা দেশ। তাহা না হইলে শাসনতন্ত্র গঠনের সময় সভ্যরা, অন্ততঃ অধিকাংশ সভ্য নিজ স্বার্থে ঘুরিয়া বেড়াইয়া পরিষদকে হাস্যাস্পদ করিতেছেন। ট্যাক্স ও ইলেকট্রিকের বিল দিবার কথা ইঁহাদের স্মরণে থাকে না। জগতের সামনে যখন এই সংবাদ প্রচারিত হইবে, তখন লোকে কি ভাবিবে, তাহা হয় ত ইঁহারা উপেক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু নিজের বিবেক বলিয়া বস্তুকে কি ইঁহারা জলাঞ্জলি দিয়াছেন?

বিদেশে দূতাবাস—

বিদেশে ভারতীয় দূতাবাস সম্বন্ধে বহুদিন আমরা নানা বিরুদ্ধ সমালোচনা শুনিতেছিলাম, কিন্তু ভারতীয় পার্লামেণ্টে প্রকাশিত ঐ সংক্রান্ত ব্যয়ের পরিমাণ জানিয়া সত্য সত্যই বিস্মিত হইয়াছি। লণ্ডনের হাই-কমিশনার অফিসের ব্যয় ১৯৪৮-৪৯ সালে ৭৪ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা! ওয়াসিংটনের ২৩ লক্ষ এবং এই অনুপাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক গুরুত্ব হিসাবে নানা হারে ব্যয়ের বরাদ্দ ছিল। এই খাতে আমাদের অন্ততঃ দুই কোটী টাকা খরচ হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্ট আচার্য্য কৃপালানী গত বাজেট আলোচনা প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি খেদ করিয়া বলিয়াছেন, আন্তর্জ্জাতিক সম্পর্কে ভারতের সম্মান হয়ত খুব উচ্চে। আমাদের দেশ যে ব্যয়ভার বহন করিতে পারে, আমাদের প্রতিনিধিরা তদপেক্ষা বেশী ব্যয় করে। আমরা মনে করি যে আমরা বুঝি জগতে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যূহ রচনা করিতেছি। আমরা দেশে যে স্বরাজ লাভ করিয়াছি, মনে হয় বিদেশে তাহা অপেক্ষা অনেক স্বরাজ পাইয়াছি। যদি এখন আমরা কেবল নিজেদের দেশের মঙ্গলের জন্য লিপ্ত থাকি, তাহা হইলে লোকে আমাদের জগতের মঙ্গলকামী বলিবে না। সুতরাং সেই অপবাদ দূর করিবার জন্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র আমাদের প্রতিনিধি পাঠাইয়া যোগাযোগ রক্ষা করিতে চাই এবং তাহার জন্য চীন হইতে পেরু এবং উত্তর মেরু হইতে টিম্বক্টু সকল স্থানই পূর্ণ করিতেছি। আচার্য্যের খেদের যথার্থই কারণ বর্ত্তমান।

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

বাংলার ফুটবল

কলিকাতার ফুটবল মরশুম সুরু হয়ে গেছে। প্রথম বিভাগীয় লীগের খেলা বেশ জোরের সঙ্গেই চলেছে। লীগ বিজয়ী হওয়ার জন্য তিন চারটি দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও বেশ ঘোরাল হয়ে উঠ্‌ছে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও লীগ জয়ের তোড়জোড় যে ভাবে বেড়ে চলেছে সেই অনুপাতে খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড কিছুমাত্র বাড়ে নি। বরঞ্চ সবদিক বিবেচনা করে দেখলে দেখা যায় বাংলাদেশের ফুটবল খেলার মান যথেষ্ট নিম্নগামী হয়েছে এবং যে স্তরে এসে আজ দাঁড়িয়েছে সেখান থেকে তাকে টেনে তুলতে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে। তবে আমাদের মনে হয় অন্য খেলার তুলনায় ফুটবল খেলার উন্নতিবিধান করা তত কষ্টসাধ্য হবে না; কারণ এই খেলাটির পিছনে জনসাধারণের বিপুল সমর্থন ও উৎসাহ আছে বলে এর উন্নতিমূলক কার্য্যগুলির বাধাপ্রাপ্ত হবার কোন আশঙ্কা নেই।

বাংলাদেশের ফুটবল খেলা যে কেন এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তার সঠিক কারণ কি তা' বলা যায় না। তবে ফুটবল যে বাঙালীর সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা তাতে কোন সন্দেহই নেই। স্মরণীয় ১৯১১ সালে বাঙালীর অতিপ্রিয় মোহনবাগান ক্লাব আই, এফ, এ শীল্ড বিজয় করবার পর থেকেই যে ফুটবল খেলা ক্রমশঃ বাঙালীর মনে স্থায়ী আসন পাততে আরম্ভ করে তা' ফুটবল ক্রীড়ানুরাগী দর্শক ও খেলোয়াড় মাত্রেই জানেন। তারপর ক্রমশঃ ফুটবল খেলার জনপ্রিয়তা বাড়তে বাড়তে শেষে এই খেলা এক রকম বাঙালীর জাতীয় ক্রীড়ায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে ফুটবল খেলার উৎকর্ষতা তেমন বাড়েনি, উল্টে উন্নতি যেটুকু হয়েছিল তাও বুঝি লুপ্ত হতে বসেছে। এখন দেখা যাচ্ছে খেলার মান নীচুর দিকেই দ্রুতগতিতে নেমে চলেছে। এই নিম্নগতি এত দুর্ব্বার হয়ে উঠছে যে একে রোধ করবার শক্তি আমাদের ক্রমশঃই কমে আসছে। এখনও যদি বাংলার ফুটবল কর্তৃপক্ষগণ তৎপর না হন তাহলে অচিরেই যে ভারতীয় ফুটবল মহল থেকে বাঙালীর প্রাধান্য চিরতরে লুপ্ত হয়ে যাবে তাতে কোনও সন্দেহই নেই। এখন আর অতীতের দিকে চেয়ে 'আমাদের কি ছিল' বলে হা হুতাশ করবার সময় নয়—যা আছে তাকেই বাঁচিয়ে রাখতে হবে, তাকেই বাড়িয়ে তুলতে হবে অক্লান্ত পরিশ্রমে।

বর্ত্তমানে বাঙলার ফুটবল মহলে যে সমস্যাটি সবচেয়ে প্রবল হয়ে উঠেছে তা হচ্ছে বাংলার বাহির থেকে অবাঙালী খেলোয়াড় আমদানি। যদিও এই অবাঙালী খেলোয়াড় আমদানির প্রথা আজকার নয়, তবুও এটা বলা অযৌক্তিক হবে না যে বর্ত্তমানে এই প্রথা অত্যন্ত বেড়ে উঠেছে। অনেক আগে থেকেই মহমেডান স্পোর্টিং, ইষ্টবেঙ্গল, কালিঘাট, ভবানীপুর প্রভৃতি কয়েকটি স্থানীয় ক্লাব বাঙলার বাইরে থেকে খেলোয়াড় আমদানি করে আসছেন। এখন মোহনবাগান প্রভৃতি আরও কয়েকটি ক্লাব এই খেলোয়াড় আমদানি ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগী হয়েছেন। এর থেকে স্বভাবতই মনে হয় যে অদূর ভবিষ্যতে প্রথম বিভাগীয় সব কয়টি ক্লাবই অল্পবিস্তর এই খেলোয়াড় আমদানি প্রথা অনুসরণ করতে চেষ্টা করবেন। এখন ভেবে দেখতে হবে এই আমদানি প্রথা বাঙলার ফুটবল ভবিষ্যতের পক্ষে ভাল কি মন্দ।

ভাল মন্দ বিচার করে দেখতে গেলে মনে হয় এই খেলোয়াড় আমদানি বাঙলার ফুটবলের পক্ষে সাময়িক ভাবে ভাল মনে হলেও ভবিষ্যতে অত্যন্ত হানিকর হয়ে দাঁড়াবে। বহিরাগত খেলোয়াড়দের খেলা যদি স্থানীয় খেলোয়াড়দের চেয়ে খুবই উচুস্তরের হত তাহলে তাঁদের খেলা থেকে

এখানকার খেলোয়াড়রা অনেক কিছু শিখে লাভবান হতে পারতেন বলে এই খেলোয়াড় আমদানি করাকে সমর্থন করা যেত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বহিরাগত খেলোয়াড়দের খেলা স্থানীয় খেলোয়াড়দের চেয়ে এমন কিছু উঁচুস্তরের নয় যে তাঁদের কাছ থেকে এখানকার খেলোয়াড়রা বিশেষ কিছু শিখতে পারবেন। তাছাড়া দেখা যাচ্ছে এই খেলোয়াড় আমদানির মাত্রা যথেষ্ট বাড়িয়ে দিয়েও স্থানীয় খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড আগের চেয়ে কিছুমাত্র বাড়েনি। সুতরাং এই খেলোয়াড় আমদানি প্রথাকে উৎসাহ দিয়ে বাড়িয়ে দিয়ে বাঙলার ফুটবলের কিছুমাত্র উন্নতি হবে না। বরঞ্চ উঠতি খেলোয়াড়রা এই সব বহিরাগত খেলোয়াড়দের জন্য অনেক ক্ষেত্রে সুযোগের অভাবে তাঁদের কৃতিত্ব দেখাতে পারছেন না। এঁদের মধ্যে অনেকেই হয়ত অঙ্কুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হবেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এই খেলোয়াড় আমদানি প্রথা সাময়িক ভাবে ভাল মনে হলেও বা ভাল কিছু করলেও বাঙলার ফুটবল ভবিষ্যতের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে।

ফুটবল খেলায় বাঙলা দেশ এখনও সারা ভারতের মধ্যে অগ্রণী। বিগত বিশ্ব-অলিম্পিকে যে ভারতীয় দল যোগ দিয়েছিল তাতে তাই বাঙালী খেলোয়াড়ের সংখ্যাই ছিল সব চেয়ে বেশি। কিন্তু যে ভাবে আমরা চলেছি তাতে মনে হয় যে আগামী বিশ্ব-অলিম্পিকে যোগদানকারী ভারতীয় ফুটবল দলে বাঙালী খেলোয়াড়দের প্রাধান্য আর থাকবে না। দক্ষিণ ভারতীয় খেলোয়াড়দের প্রাধান্য লাভের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে, তার উপর বোম্বাইকেও উপেক্ষা করা যায় না। সুতরাং সব দিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে বাঙলা দেশের ফুটবল খেলার আশু উন্নতি একান্ত দরকার এবং তা বাঙালী খেলোয়াড়দের সাহায্যেই করতে হবে—বহিরাগত অবাঙালী খেলোয়াড়দের দ্বারা নয়। এই কথাটাই মনে রাখতে হবে কলিকাতা ফুটবলের প্রথম বিভাগীয় দলগুলির কর্ণধারগণকে ও আই, এফ, এ-র পরিচালকমণ্ডলীকে। বাইরের থেকে খেলোয়াড় এনে লীগ বা শীল্ড বিজয় করা বা লীগে ভাল স্থান অধিকার করাটাই বড় কথা নয়, বাঙলার ফুটবলের উন্নতি করাটাই হচ্ছে আসল দরকার এবং সেইটার উপরই লক্ষ্য রাখতে হবে সবচেয়ে বেশি করে। এই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে বাঙলার ফুটবলের উন্নতির উপরই নির্ভর করছে ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ।

বাঙলার ফুটবলের উন্নতি করতে হলে বিশেষ করে লক্ষ্য রাখতে হবে তরুণ ও উঠতি খেলোয়াড়দের উপর। এই সব খেলোয়াড়দের বাছাই করে নিয়ে তাদের ট্রেনিং দেবার সুব্যবস্থা করতে হবে। ভাল ট্রেনিং দিতে পারলে সাধারণ স্তরের খেলোয়াড়ও উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখাতে পারেন। কিন্তু যেখানে ট্রেনিংএর সুব্যবস্থা নেই সেখানে সাধারণ স্তরের খেলোয়াড়রা নিজেদের খেলার বিশেষ উন্নতি করতে পারেন না উন্নতধরণের ট্রেনিংএর অভাবে। অবশ্য প্রতিভাশালী খেলোয়াড়রা ভাল ট্রেনিং না পেলেও খেলায় কৃতিত্ব দেখাতে পারেন তাঁদের নিজস্ব প্রতিভার বলে। কিন্তু শুধু প্রতিভাশালী খেলোয়াড়দের উপর নির্ভর করলেই আমাদের চলবে না কারণ প্রতিভাসম্পন্ন খেলোয়াড়দের সংখ্যা মুষ্টিমেয় অথচ আমাদের দরকার অসংখ্য উন্নতধরণের ক্রীড়াকৌশলী খেলোয়াড় যাঁরা আমাদের দেশের খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড বাড়িয়ে পাশ্চাত্যের তুল্য করে তুলবেন।

ট্রেনিংএর সুব্যবস্থা করতে হলে আই, এফ, এ কে একটি ট্রেনিং সেণ্টার খুলতে হবে উপযুক্ত শিক্ষানবিশদের উন্নত ধরণের ট্রেনিং দেবার জন্য এবং এই ট্রেনিং সেণ্টারের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হবে ইংলণ্ড বা অন্য কোন দেশ থেকে সুদক্ষ ট্রেনার আমদানি করা। এর জন্য খরচ কিছুটা হলেও ভবিষ্যতে ফল যে ভালই হবে তাতে কোনও সন্দেহই নেই। ট্রেনিং দেবার জন্য এমন সব খেলোয়াড় বাছাই করে নিতে হবে যাদের মধ্যে অন্ততঃ কিছুটা পরিমাণেও খেলার নৈপুণ্য বা knack আছে। এই খেলোয়াড় বাছাই করাটাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এরই উপর নির্ভর করছে অনেক কিছু। এই বাছাই করার সময় স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের উপরেই বিশেষ করে লক্ষ্য দিতে হবে। এই স্কুল কলেজের বালক ও তরুণ খেলোয়াড়দের মধ্যে থেকে বাছাই করে নিতে হবে উপযুক্ত শিক্ষানবিশদের উন্নততর ট্রেনিং দেবার জন্য এবং এই বাছাই আই, এস, এস, এ (বেঙ্গল) ও ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি ফুটবল ক্লাবের সাহায্যে করতে হবে আই, এফ, এ কে। তারপর এই সব শিক্ষানবিশদের উপযুক্ত ট্রেনিংএর সুব্যবস্থা করবার জন্য আই, এফ, এ-র উচিত এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত ব্যক্তিদের সাহায্যে একটি সাবকমিটী গঠন করে তাঁদের উপর ট্রেনিং সেণ্টার চালাবার ভার অর্পণ করা। অবশ্য বাংলার স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষগণের সাহায্যও নিতে হবে। আশা করি আই, এফ, এ, কর্তৃপক্ষ, আই, এস, এস, এ (বেঙ্গল) ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল ক্লাব এই সব বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য দেবেন।

আই, এফ, এ ও স্থানীয় নামকরা ক্লাবের কর্তৃপক্ষগণকে আমাদের অনুরোধ তাঁরা যেন স্থানীয় খেলোয়াড়দের খেলার উন্নতির দিকেই বেশি নজর দেন এবং যথোচিত অর্থব্যয় করতেও যেন সঙ্কুচিত না হন। বাইরে থেকে খেলোয়াড় আমদানি করে সাময়িক ভাবে খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড বাড়ান সম্ভব হলেও দূর ভবিষ্যতে এর ফল কখনও ভাল হবে না। বাংলার ফুটবল কর্তৃপক্ষগণের মনে রাখা উচিত যে তাঁদের পারদর্শিতার উপরেই নির্ভর করছে বাংলার তথা ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ এবং সে ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় না হয়ে আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠুক এইটাই যেন হয় তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য।

খেলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

হকি লীগ ঃ

১৯৪৯ সালের প্রথম বিভাগের ক্যালকাটা হকি লীগ প্রতিযোগিতায় পোর্ট কমিশনার দল মোট ১৯টা খেলায় ৩৮ পয়েন্ট পেয়ে হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে এবং মোহনবাগান ৩৪ পয়েন্ট পেয়ে রাণার্স আপ হয়েছে। গত বছরের খেলাতেও পোর্ট কমিশনার লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং মোহনবাগান রাণার্স আপ হয়। এ বছর প্রথম ড্র করেনি। এই অবস্থায় মোহনবাগান ক্লাব দলের সমর্থকেরা মোহনবাগানের জয় আশা করেছিলেন। এ আশা যে মোটেই দুরাশা হয়নি তা ঐ দিনের খেলায় মোহনবাগান পরিচয় দিয়েছিলো। ভাগ্যদোষে শেষ পর্য্যন্ত মোহনবাগান ১—০ গোলে হার স্বীকার করে, অপর দিকে পোর্ট দল ভাগ্যের জোরে কোনক্রমে রক্ষা পায়। মোহনবাগান ৭টি সর্ট কর্ণার পেয়েও তার একটিরও

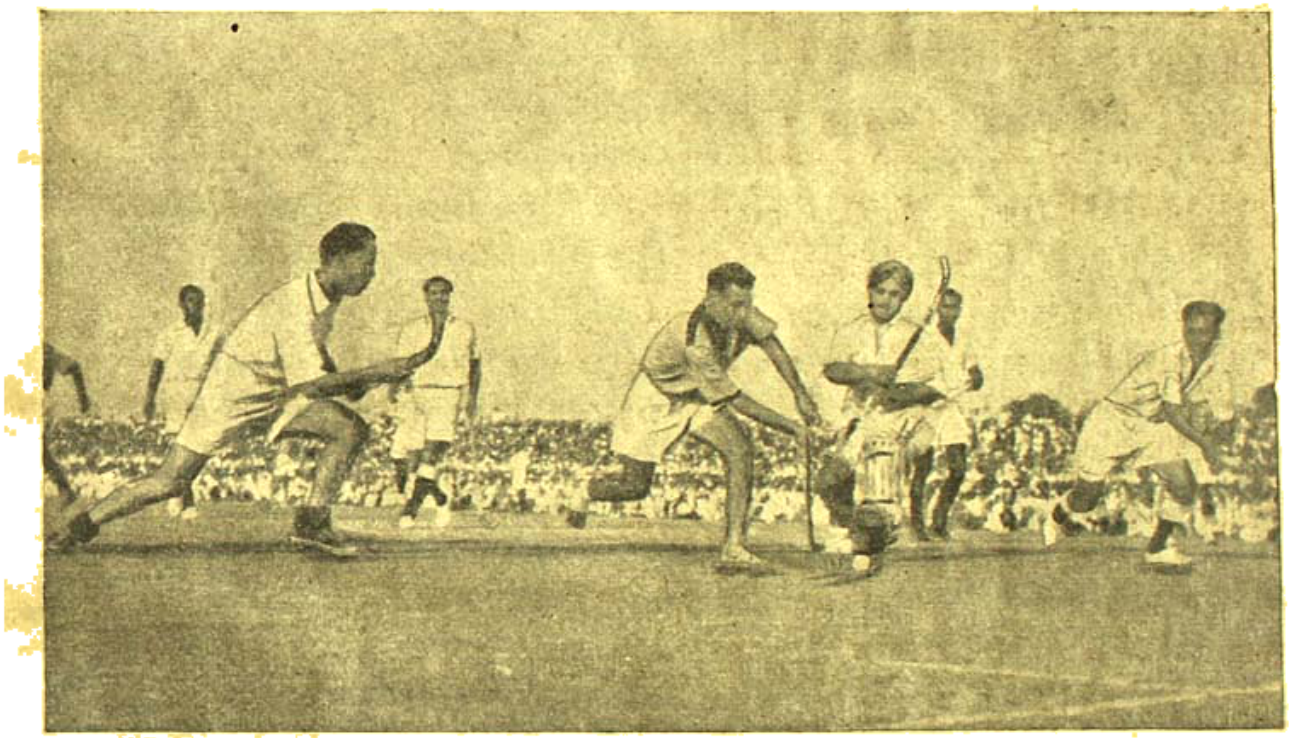

কলিকাতায় অনুষ্ঠিত বিশ্বজয়ী ভারতীয় অলিম্পিকদল বনাম অবশিষ্ট দলের হকি খেলায় ভারতীয় অলিম্পিক দলের অধিনায়ক কিষণলাল গোল দিতে যাচ্ছেন ফটো : কে.কে.সন্যাল

বিভাগের হকি লীগের শেষ খেলা হয় ১৫ই এপ্রিল পোর্ট এবং মোহনবাগান দলের মধ্যে এবং ঐদিনই লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যায়। ঐ দিনের খেলার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উভয় দলেরই সমান ৩৪ পয়েন্ট ছিল। মোহনবাগান অপরাজেয় ছিল, ২টো খেলা ড্র, ডালহৌসী এবং ইষ্টবেঙ্গল দলের সঙ্গে। অপর দিকে পোর্ট দলের ১টা খেলা হার, পুলিশদলের কাছে। কোন খেলাই তারা সদ্ব্যবহার করতে পারে নি। গোল দেওয়ার এতগুলি সুযোগ পেয়ে যে দল গোল দিতে ব্যর্থ হয় তাদের অক্ষমতার দোষে দোষী না ক'রে বরং ভাগ্যের দোষে অভিযুক্ত করাই ঠিক হবে। অপরদিকে পোর্টদলের গোলরক্ষকের একাধিক অব্যর্থ গোল রক্ষার জন্য প্রশংসা নিশ্চয় করতে হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, উভয় দলে যে তিনজন বিগত অলিম্পিকগামী হকি খেলোয়াড় লীগের খেলায়

যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের নাম যথাক্রমে পোর্ট দলের লেফট হাফ এল ব্রাউডিস এবং সেণ্টার হাফ কেশবদত্ত এবং মোহনবাগানের লেফটহাফ যশবন্ত সিংহ।

লীগ তালিকায় প্রথম দুই দল

	খেলা	জয়	ড্র	হা	পক্ষে	বিঃ	পয়েণ্ট
পোর্টকমিশনার	১৯	১৮	০	১	৬২	৫	৩৬
মোহনবাগান	১৯	১৬	২	১	৫০	৬	৩৪

লীগের খেলায় অধিক গোলে জয়ী: (১) মোহনবাগান —৭: মহমেডান স্পোর্টিং—০ (২) পোর্টকমিশনার— ৬: রেল স্পোর্টস—০।

বাইটন কাপ ঃ

১৯৪৯ সালের বাইটন কাপ ফাইনালে টাটা এ সি ২-১ গোলে স্থানীয় পাঞ্জাব স্পোর্টসদলকে হারিয়ে কাপ বিজয়ী হয়েছে। টাটাদলের এ বিজয় খুবই যুক্তি সঙ্গত হয়েছে। টাটা এ সি ৩-০ গোলে এবছরের প্রথম বিভাগের চ্যাম্পিয়ান পোর্টকমিশনার দলকে হারিয়ে ফাইনালে উঠে। অপর দিকে পাঞ্জাব স্পোর্টস ফাইনালে উঠেছিল এ বছরের লীগের রাণার্স আপ মোহনবাগানদলকে ১-০ গোলে হারিয়ে। বাইটন কাপের সেমি-ফাইনালে মোহনবাগানের সমর্থকদের পুনরায় দলের ভাগ্যবিপর্য্যয় প্রত্যক্ষ করতে হয়; মোহনবাগান এই খেলাতে ৯টি দুঁই কর্ণার পায় এবং শেষ পর্য্যন্ত একটিরও সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য লীগের খেলায় মোহনবাগান ২-০ গোলে পাঞ্জাব স্পোর্টসকে পরাজিত করেছিল। অপরদিকে প্রতিযোগিতার তৃতীয় রাউণ্ডে পাঞ্জাব স্পোর্টস প্রতিদ্বন্দ্বী বোম্বাইয়ের লীগ চ্যাম্পিয়ান সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ দলকে ১-০ গোলে হারিয়ে ক্রীড়ামহলে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। এর পর চতুর্থ রাউণ্ডে পাঞ্জাব স্পোর্টস ১-০ গোলে ইউ পি রিলেক্টেড একাদশ দলকে পরাজিত ক'রে সেমিফাইনালে মোহনবাগানদলের সঙ্গে মিলিত হয়। এই ইউ পি সিলেক্টেড একাদশ দল এবং পোর্টকমিশনার দল যুক্তভাবে গতবছর বাইটন কাপ বিজয়ী হয়েছিলো।

এ বছর ৩৯টি দল বাইটন কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিল। স্থানীয় দলের সংখ্যা ২১, এবং আগন্তুকদলের সংখ্যা ১৮।

ফুটবল অলম্পিক ঃ

১৯৪৯ সালের ফুটবল অলম্পিক সরকারীভাবে ২রা মে থেকে সুরু হয়েছে। ঐ দিনের খেলার তালিকায় স্থান পায় ২য় ও ৪র্থ বিভাগ, পাওয়ার এবং অফিস লীগের খেলাগুলি। ৪ঠা মে থেকে প্রথম বিভাগের খেলা আরম্ভ হয়েছে। পূর্ব্বাপর বৎসরের মত এ বৎসরও একাধিক নতুন ফুটবল খেলোয়াড় প্রথম বিভাগের বিশিষ্ট দলের পক্ষ নিয়ে খেলছেন, তাঁদের বেশীর ভাগই হচ্ছেন অবাঙ্গালী খেলোয়াড়। অনেক নামকরা খেলোয়াড় পুরাতন ক্লাবের মায়া ত্যাগ ক'রে এবছরও নতুন ক্লাবে খেলবার ছাড়পত্র নিয়েছেন। প্রথম বিভাগের বিশিষ্ট ক্লাবগুলি কোন্ কোন্ নামকরা নতুন খেলোয়াড় নিয়ে, বর্ত্তমানে দল ভারী করেছে নীচে তার তালিকা দেওয়া হ'ল। খেলোয়াড়রা গত বৎসর কোন্ দলে ছিলেন তার উল্লেখ বন্ধনীর মধ্যে রইলো।

মোহনবাগান ক্লাব: গোলে পি মুস্তাফী (ইষ্টবেঙ্গল) ফরওয়ার্ডে আর গুহ ঠাকুরতা (জর্জ্জটেলিগ্রাফ), সাম্পাণী (মহীশূর) এবং বরদেলু (মহীশূর)।

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব: গোলে বি ঘটক, ব্যাকে তাজমহম্মদ (ভবানীপুর), ফরওয়ার্ডে ধনরাজ, আমেদ, ভেঙ্কেটাস (মহীশূর) এবং আবিদ (মহঃ স্পোর্টিং)।

মহমেডান স্পোর্টিং: ফরওয়ার্ডে সাত্তার, লেফট আউট এণ্টনী (বাঙ্গালোর মুসলীম), গোলে কাদেরভেলু।

রাজস্থান: সেণ্টার হাফ ওয়রদন, (দিল্লী), সাবু (মহঃ স্পোর্টিং)। রতন (বোম্বে), মাইত্র সিং (দিল্লী)।

প্রথম বিভাগের লীগের প্রথমার্দ্ধের খেলা শেষ হ'তে দেরী নেই। প্রথম দিকে লীগের তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকার করে ছিল ভবানীপুর ক্লাব। ৮টা খেলায় তাদের ১৩ পয়েণ্ট। ড্র একটা, হার ১টা। উল্লেখযোগ্য জয় যেমন মোহনবাগানের সঙ্গে ১-০ গোলে, তেমনি হার কালীঘাটের কাছে ৩-০ গোলে। এরপর দারুণ ভাঙ্গন সুরু হয়েছে ভবানীপুরের। ই আই রেলদলের সঙ্গে ৩-০ এবং ইষ্ট বেঙ্গলের সঙ্গে ৩-০ গোলে হেরে গিয়ে ভবানীপুর ৪র্থ স্থানে নেমেছে। ১২টা খেলায় ১৪ পয়েণ্ট।

মহমেডান স্পোর্টিং অপ্রত্যাশিত ভাবে রেঞ্জার্স দলের কাছে ১-০ গোলে হেরেছে। ১০টা খেলায় তাদের ১৬

পয়েন্ট উঠেছে। দলের খেলায় পূর্বের জৌলুস নেই বটে, কিন্তু জয়লাভের অদম্য আকাঙ্ক্ষা আছে।

ইষ্টবেঙ্গলের পয়েন্ট উঠেছে ১০টা খেলায় ২০ পয়েন্ট। হার হয়েছে মোহনবাগানের সঙ্গে ১-০ গোলে। এ পর্য্যন্ত মাত্র ৩টা গোল খেয়েছে। লীগের খেলায় মোহনবাগানের খেলার ফলাফলই সবচেয়ে শোচনীয় হয়েছে। ইতিমধ্যে ২টো খেলায় হার, ভবানীপুর এবং এরিয়ান্সের সঙ্গে যথাক্রমে ১-০ গোলে। গত বৎসরের শীল্ড বিজয়ী এবং লীগের রাণার্স-আপ মোহনবাগান দলের এ শোচনীয় পরিণামে দলের সমর্থকেরা হতাশ এবং অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছিলেন। গত বছর লীগের মাত্র একটা খেলায় মোহনবাগান দলের পরাজয় হয় তাও শেষ খেলা মহমেডানস্পোর্টিং দলের সঙ্গে। লীগের খেলার সুরুতেই ২টো হার মোহনবাগানের খেলার ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে আছে কিনা কেউ নাকি স্মরণ করতে পারেন নি। মোহনবাগানের ১২টা খেলায় ১৮ পয়েন্ট উঠেছে; ১টা বেশী খেলে ইষ্টবেঙ্গলের থেকে ২ পয়েন্ট কম। লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপ নিয়ে মহমেডান স্পোর্টিং, মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল এবং ভবানীপুর দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে অনেকে মনে করছেন। লীগের প্রথমার্দ্ধের খেলায় প্রথম তিনটি দলের পারস্পরিক খেলার ফলাফলের উপরই কিছুটা আন্দাজ করা যেতে পারে। কারণ এখনও অনেক খেলা বাকি; খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড এমন এক অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে বিরাজ করছে যে, লীগের তালিকার উপরিভাগের কোন একটি দলের পক্ষে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল দলের কাছে হার স্বীকার কিম্বা খেলা ড্র করাটা কোন অপ্রত্যাশিত ব্যাপার হবে না। এ বছর থেকে এরিয়ান্স ক্লাব মহমেডান স্পোর্টিং মাঠের অংশীদার হিসাবে ঐ মাঠটি ব্যবহার করছে। এরিয়ান্সের তাঁবু মহঃমেডান স্পোর্টিং মাঠের পাশেই পড়েছে। এরিয়ান্স অনেক দিনের পুরাতন ক্লাব। বাংলাদেশের ফুটবল এবং ক্রিকেট খেলার ক্রমোন্নতির ইতিহাসে এরিয়ান্স ক্লাবের যথেষ্ট দান আছে; সেই দানের যথার্থভাবে মর্য্যাদা দান করা হবে যদি ক্রীড়ামোদিরা ক্লাবের সভ্য হয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগে ইউরোপীয় সৈন্য দলের শূন্য স্থান এ বছর ক্যালকাটা গ্যারিসন নামে ভারতীয় সৈন্যদল পূরণ করেছে। প্রথম বিভাগ লীগের ইতিহাসে ভারতীয় সৈন্যদলের যোগদান এই প্রথম, সুতরাং ইহা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

অমরনাথ প্রসঙ্গ ঃ

ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি মিঃ এ এস ডি' মেলো অদমাচরণ এবং শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় লালা অমরনাথকে শাস্তিদান করেছেন। অমরনাথের বিরুদ্ধে ২৩ দফায় তিনি এক চার্জ্জসীট গঠন করেছেন। এই শাস্তিদানের ফলে লালা অমরনাথ সর্ব্বপ্রকার প্রাদেশিক এবং প্রতিনিধিমূলক ক্রিকেট খেলায় যোগদান করতে পারবেন না। ইতিমধ্যে সংবাদ পত্রাদিতে বোর্ডের সভাপতির এই বিচার সম্পর্কে বহুপ্রকারের বিরুদ্ধ সমালোচনা বের হয়েছে। এমন কি পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এবং সর্দ্দার প্যাটেলকে পর্য্যন্ত এই রায় দানের উপর হস্তক্ষেপ করতে আপীল জানিয়েছেন খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় অধ্যাপক দেওধর।

সম্প্রতি ক'লকাতায় অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক বৈঠকে লালা অমরনাথ তাঁর বিরুদ্ধে ক্রিকেটবোর্ডের সভাপতি মিঃ এ এস ডি মেলো কর্তৃক উপস্থাপিত ২৩ দফা অভিযোগের উত্তর দিয়েছেন। ফুলস্কেপ কাগজের পূর্ণ ৩৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে অমরনাথের ভাষণ এবং বোর্ডের অভিযোগসহ অমরনাথের উত্তর ক্রিকেট জগতে নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য প্রামাণ্য দলিল হিসাবে সংরক্ষিত থাকবে। সভাপতির ২৩ দফা অভিযোগের উত্তরে লালা অমরনাথ বিবিধ যুক্তি এবং নথিপত্রের অবতারণা ক'রে প্রায় সকল অভিযোগই ভিত্তিহীন এবং অসত্য বলে অস্বীকার করেছেন এবং তাঁকে লোকচক্ষে হীন প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যেই অভিযোগগুলি সযত্নে রচিত হয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। কে প্রকৃত অপরাধী তার বিচার ভার তিনি জনসাধারণের হাতে সমর্পণ করেছেন এবং এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি নিরপেক্ষ অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগে সম্মতি প্রকাশ করেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, খুনী আসামীরও আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ সুবিধা থাকে। কিন্তু ক্রিকেট জগতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন খেলোয়াড় অমরনাথকে তাঁর

বিরুদ্ধে বোর্ডের সভাপতি কর্তৃক উপস্থাপিত অভিযোগের বিপক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগই দেওয়া হয়নি, সরাসরি বোর্ডের সভাপতি শৃঙ্খলাভঙ্গ, অসদাচরণ এবং অর্থগ্রহণের অভিযোগে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। স্বাধীন ভারতবর্ষে বিচারের এরূপ প্রহসন যেমন কেহই আশা করেননি তেমনি নিরপেক্ষ অনুসন্ধান কমিটি দ্বারা বিচার না হলে কেহই এ বিচার গ্রহণ করবেন না।

প্রকাশ, বোর্ডের যে জরুরী সভায় অমরনাথের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, সেই সভার অনুষ্ঠান সূচীতে অমরনাথ সম্পর্কিত ব্যাপারটি পূর্ব্বাহ্নে বিজ্ঞাপিত হয়নি।

১৯৫৮ সালে ১৬ই অক্টোবর তারিখে বোর্ডের এক সভায় মিঃ ডি মেলোর সভাপতিত্বে সর্ব্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, ভবিষ্যতে শৃঙ্খলাভঙ্গের সকল অভিযোগ এবং মামলা বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত একটি নিরপেক্ষ কমিটি দ্বারা বিচার করা হবে। অমরনাথের ব্যাপারে এই প্রস্তাবের কোন মর্য্যাদা দেওয়া হয়নি। গণতন্ত্র উপায়ে এবং আইনসঙ্গতভাবে অমরনাথের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের কোন উপায় ছিল না বলেই অমরনাথ সম্পর্কিত অভিযোগগুলি ১৯৫৮ সালের ১৬ই অক্টোবর তারিখে বোর্ডের সভায় গৃহীত প্রস্তাব মত 'Indipendent Committee'র নিকট উপস্থাপিত করা হয়নি, এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা জনসাধারণের পক্ষে কি খুব অন্যায় হবে? খুব লজ্জার বিষয় যে, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের মত প্রতিষ্ঠাবান প্রতিষ্ঠানকে একথা বলতে হচ্ছে, 'Law makers should not be law breakers. বোর্ডের সভায় অমরনাথের বিরুদ্ধে যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, ১৩ই এপ্রিল তারিখের এক চিঠি দ্বারা সভাপতি মশায় অমরনাথকে জানিয়ে দেন। এ চিঠি অমরনাথ পাননি। অমরনাথের অভিযোগ, পূর্ব্বে অতি সাধারণ চিঠিপত্র তাঁকে পাঠানো হ'ত 'Registered Acknowledgement due' করে অথচ ১৩ই তারিখের জরুরী চিঠিখানি তা করা হয়নি, বোর্ডের দিক থেকে ইহা গুরুতর ত্রুটি। অমরনাথ দেখিয়েছেন, ১০ই এপ্রিল তারিখের পর তাঁর বিরুদ্ধে চার্জ্জ সীট গঠন করা হয়েছে, ক'লকাতার মিঃ পি কে মুখার্জি নামক যে ব্যক্তির চিঠির উপর একমাত্র নির্ভর ক'রে অমরনাথের বিরুদ্ধে ক'লকাতায় গোপনে টাকা লওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে সেই চিঠির তারিখ ক'লকাতা ১২ই এপ্রিল। সুতরাং বোর্ডের সভায় এই চিঠির কোন অস্তিত্বই ছিল না। সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে অমরনাথের পঠিত বিবৃতি এবং বোর্ডের উদ্দেশ্যে লিখিত ক্রিকেট বোর্ডের প্রাক্তন সভাপতি নবনগরের জামসাহেব, অধ্যাপক দেওধর, বিজয় মার্চ্চেন্ট এবং দলীপ সিংজীর চিঠিপত্র থেকে জানা যায় বর্ত্তমান সভাপতি মিঃ ডি মেলো উল্লিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সঙ্গে অন্যায়ভাবে বিরুদ্ধাচরণ ক'রেছিলেন। প্রাক্তন সভাপতি নবনগরের জামসাহেব, বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় অধ্যাপক দেওধর এবং বিজয় মার্চ্চেন্টের চিঠিপত্র থেকেই মিঃ ডি মেলোর স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে এবং তাঁর ব্যবহারে জামসাহেব এবং অধ্যাপক দেওধর পদত্যাগ করাই সম্মানজনক মনে করেছিলেন। মার্চ্চেন্টের কড়া জবাবে এবং চ্যালেঞ্জে শেষ পর্য্যন্ত মিঃ ডি মেলো নরম হয়ে পড়েছিলেন।

ব্যায়ামের গুণাগুণ

মুষ্টিযোদ্ধা রবীন সরকার

(সিরাকিউস বিশ্ববিদ্যালয়, নিউ ইয়র্ক)

রবীন সরকার

[বাংলার অ্যাথলেটা মুষ্টিযোদ্ধা শ্রীরবীন সরকার উচ্চ শারীরিক শিক্ষা গ্রহণার্থে বিউফ্যালোর সিরাকিউস ইউনিভার্সিটিতে যোগদান করেছেন। তিনি আমেরিকার পেশাদারী মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায়ও যোগদান করবার ইচ্ছা রাখেন।

এখানে শ্রীযুত সরকার ব্যায়ামের গুণাগুণ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। মেঃ যুঃ সঃ]

আমরা ব্যায়াম করি দেহ ও মন ভাল করবার জন্য ; কিন্তু ব্যায়াম করলে কি ভাবে শরীর ভাল হয় তার বিষয়ে আমরা খুব কমই জানি। তবে এটা ঠিক যে ব্যায়াম করার সঙ্গে সঙ্গে শরীর ভাল হয় না, কতকগুলি ব্যায়াম আছে যাতে সঙ্গে সঙ্গে ফল পাওয়া যায়। আবার এমন কতকগুলি ব্যায়াম আছে যাতে ফল পেতে একটু দেরী হয়। কিন্তু এমনও দেখা গেছে যে কতকগুলি ব্যায়ামের জন্য দেহের ক্ষতি হয় ; সেইজন্য ব্যায়াম এমন ভাবে বেছে নিতে হবে যাতে সকলের উপকার হয়—ক্ষতি না হয়।

যখন আমরা প্রথম ব্যায়াম আরম্ভ করি তখন লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে দেহের উত্তাপ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। উত্তাপ বর্দ্ধিত হবার কারণ হচ্ছে যে পেশীসমূহের

ভিতর রাসায়নিক ক্রিয়া চল্‌ছে বলে। যে শক্তি লুকানো ছিল—যে তেজ আমরা আছে কি না জানতাম না—সেই শক্তি তেজ প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ মুক্তি পায় এবং মনে একটা আনন্দ আসে, এমন কি দেহে শক্তি পর্য্যন্ত অনুভব করা যায়। ব্যায়ামকালীন পেশীসমূহ থেকে রক্ত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে উত্তাপও বাড়তে থাকে। কিন্তু উত্তাপ সকলের মধ্যে সমানভাবে আসে না। দেহের গঠনের অনুপাতে উত্তাপ এসে থাকে, যারা দুর্ব্বল বা যারা অসুস্থ তাদের দেহের ভিতর দিয়ে অনেক শক্তি উত্তাপের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। আর যারা রীতিমত কাজ করে তাদের শরীর থেকে কম উত্তাপ নির্গত হয় এবং তাতেই শক্তি সঞ্চিত হয়ে থাকে।

পেশীসমূহ ঠিক মত ভারপ্রাপ্ত হয়ে যখন কাজ করে তখন উত্তাপের ভিতর দিয়ে শক্তি সঞ্চয় হয়। উত্তাপের একটা মাপ আছে, মাপের কম হলে শক্তি লাভ করা যায় না। উত্তাপের দ্বারা শক্তি আসে এবং ঐ শক্তি দ্বারা পেশীসমূহের সঙ্কোচন ও স্নায়ুমণ্ডলীর উপর একটা উন্নত ভাব আসে। দেখা গেছে যে কোন একটা বালক জোরে দৌড়াতে গিয়ে দৌড়াতে পারলো না, তার কারণ উত্তাপের অভাব হেতু সে দৌড়াতে পারল না। উত্তাপের দ্বারা পেশীসমূহ কার্য্যকরী হয়, দৌড়াবার সময় উত্তাপের অভাব ছিল বলে সে কৃতকার্য্য হতে পারলে না। সেইজন্য দৌড়াবার আগে থেকে পেশী গরম করে নিলে—এই ভাবে তাকে বিফল মনোরথ হতে হত না। আবার যদি উত্তাপ বাড়াতে গিয়ে—বেশী উত্তাপ উঠে যেত, তবে কোন কাজই হত না। উত্তাপের একটা মাপ আছে। সেই মাপ অনুযায়ী থাকলে কোন বাধা পেতে হয় না।

এই শক্তি আসে ল্যাকটিক্ এ্যাসিড, পোটাসিয়ম ফস্‌ফেট্ ও কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে—এই সব পেশীসমূহ উত্তাপের দ্বারা জেগে ওঠে এবং ফলে শক্তি পাই। সেইজন্য পেশীসমূহের ভিতর উত্তাপ আনবার আগে শরীরটা আমরা একবার পরখ করে নি। এই পরখ করে নেওয়ার ফলে শরীরের ভিতর উত্তাপের কাজ হতে আরম্ভ করে। তখন আমরা ব্যায়াম করতে বা দৌড়ঝাপ করতে একটা আনন্দ পাই। তা না হলে পেশীতে হয়ত কিছু টান পড়তো—বা এমন কি ছিঁড়েও যেতে পারতো। উত্তাপের জন্য একরকম তেলা পদার্থ বা রস নির্গত হয় এবং তাতে পেশীসমূহ চলাফেরা করবার জন্য পথ পিছল করে দেয় বলে মনে হয়।

তারপর লক্ষ্য করে দেখলে বোঝা যাবে যে যদি একটা কাজ অনবরত হতে থাকে বা খুব জোরে হতে থাকে—তখন শরীরের শক্তি ক্রমশঃ হীন হয়ে আসতে থাকে। পেশী ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কাজ করবার ইচ্ছা দূর হয়, হাঁপাতে হয়, তারপর আস্তে আস্তে শক্তি কমে যেতে থাকে এবং শেষকালে অবসাদ এসে জড়িয়ে ধরে।

কাজ করতে করতে অবসাদ বা ক্লান্ত হই কেন? যখন পেশীসমূহ কাজ করতে থাকে তখন তার ভিতর আবর্জ্জনা জমতে থাকে। তারপর পেশীসমূহের এমন অবস্থা হয়ে দাঁড়ায় যে কোনরূপ সঙ্কোচন করবার ক্ষমতা থাকে না। যে স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারায় আবেগ সঞ্চিত হয় এবং পেশী-সমূহের সঙ্কোচন প্রসারণ কার্য্য সম্পাদিত হয়—সেই স্নায়ু-তন্ত্রগুলি পঙ্গু হয়ে থাকে এবং তার ফলেই আমরা ক্লান্ত হই।

যারা উন্মুক্ত বাতাসে ব্যায়াম করে তাদের হৃদয় ও ফুসফুস ভাল থাকে। আস্তে আস্তে ব্যায়াম দ্বারা শক্ত করে তুলতে হয় হৃদয় ও ফুসফুসকে, পরে আর তাতে ক্লান্তি ভাব আসবে না। লাফাবার আগে যদি একটু মালিশ করে নেওয়া যায় তবে তা থেকে আবর্জ্জনা দূর হয়ে যাবে এবং হৃদয় থেকে এমন একটা আবেগ আসবে যার জন্য লাফানো সম্ভবপর হবে। সঙ্কোচনের ফলে পেশী-সমূহ গতিশূন্য হয়ে পড়ে। তাতে পেশী সমূহ চেপে থাকে এবং রক্ত ভাল করে প্রবাহিত হতে পারে না। এই রক্তের অভাবে শক্তি আসে না, ফলে লাফাতে ইচ্ছা যায় না—ক্লান্তি ভাব আসে।

মালিশ করে দিলে বা দাঁড়িয়ে একটু আস্তে আস্তে দৌড়ে গেলে—এতে গতিশূন্য স্থানে গতি হবে—তার ফলে রক্ত চালু হবে, আবর্জ্জনা বেরিয়ে যাবে—ফলে কাজ করা যাবে।

রক্তসঞ্চালন ও নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র ঠিক থাকা সত্ত্বেও কেন ক্লান্তি আসে? অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে খাদ্যাভাবে অনেক সময় ক্লান্তি আসে। খাদ্য যেটুকু যায় তা হজম হয়ে যায়—আবার ব্যায়াম করার ফলে আরও খিদে বাড়ে। ফলে কাজকর্ম করতে মন যায় না। যারা খাদ্যের ভিতর বিশেষ করে শর্করা বা চিনিজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে—সেইগুলি তাড়াতাড়ি হজম হয়ে যায়—পেশী সমূহের ভিতর ঐ খাদ্যগুণ যদি জমা হয়, তখন তাড়াতাড়ি আর ক্লান্তি ভাব আসে না।

দ্রুত ব্যায়াম করলেও ক্লান্তি ভাব আসে। তখন অক্সিজেনের অভাব ঘটে। ফলে হাঁপাতে হয়। যদি অক্সিজেন প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করবার ক্ষমতা থাকে তখন আর হাঁপাতে হয় না। অক্সিজেন-পূর্ণ স্থানে দাঁড়িয়ে ব্যায়াম করলে কি হবে—অক্সিজেন গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকা দরকার। তা না হলে হাঁপাতে হয় কিছুক্ষণ দ্রুত ব্যায়ামের পর।

টক্সিন বিষের জন্য দেহ ক্লান্তি অনুভব করে। এই বিষ দেহের ভিতর সঞ্চয় হতে থাকে—তখন কোনরূপ কাজকর্ম করা হয় না। কিন্তু ব্যায়াম বা খেলাধূলা করলে এই বিষ জমতে পারে না—ফলে আর ক্লান্তি আসবে না।

স্নায়ুমণ্ডলীতে যেমন ক্লান্তি আসে, পেশী সমূহেও ক্লান্তি

আসে। এটা অনেকে বিশ্বাস করে যে যখন ক্লান্তি আসে, পেশীসমূহের ভিতর তখন উত্তেজনা বা তেজ প্রয়োজন হয়। কারণ যন্ত্রাদির ভিতর আবর্জনা থাকে বলে পেশীর চালে বা টিস্থতে প্রেরণা আসতে পারে না : এর জন্যই স্নায়ু ক্লান্ত হয়ে পড়ে। উত্তেজনা প্রেরণার অভাবে স্নায়ু ক্লান্তি অনুভব করে। পেশীসমূহ ততটা ক্লান্ত হয় না।

যন্ত্রসমূহের ক্লান্তি যেমন আসে—জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের ক্লান্তি তেমনই আসে। যখন একটা অবসন্ন ভাব আসে তখন জ্ঞানেন্দ্রিয় ক্লান্তি অনুভব করে। এই অবসন্ন হয়ে পড়বার কারণ হচ্ছে মস্তিষ্কের ভিতর আবর্জনা প্রবেশ করে বলে। কাজের দ্বারা যেমন ক্লান্তি আসে তেমন অতি-ভোজন, অম্ল বায়ু, অর বা অবসাদের জন্যও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্লান্তি আসে। তখন কাজ করতে পারা যায় না। ফলে দুর্বল হয়ে পড়তে হয়। কিন্তু শক্তিলাভ করতে পারলে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্লান্তি বা জড়তা ভাব খুবই কম আসে।

পেশীসমূহকে যখন কাজ করানো হল—ফলে হয়ত শক্ত হয়ে গেল বা যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠলো। পেশী সমূহ যখন শক্ত হয়ে অকেজো হতে থাকে তখন মানসিক ক্লান্তি আসে এবং ব্যথা হয়ে যখন অকেজো হয় তখন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্লান্তি আসে। মস্তিষ্কের ক্লান্তিকে জ্ঞানেন্দ্রিয় ক্লান্তি বলা হয়—একথা আর একবার উল্লেখ করা হল মাত্র।

বিশেষ বিশেষ ব্যায়াম দ্বারা স্নায়ুমণ্ডলীর উপকার পাওয়া যায়। সেই সব ব্যায়ামের একটা নির্দ্ধারিত গতি আছে। সেই গতির বাইরে গেলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়—নতুবা একটা শান্ত ভাব ধারণ করে। তাড়াতাড়ি ব্যায়ামে পেশীসঞ্চালন বা টিস্থতে একটা উত্তীপনার সঞ্চার হয় এবং তাতে উত্তেজনা বেড়ে যায়। ধীর গতিতে ব্যায়াম করলে একটা ভাব বজায় থাকে—এবং পেশীসমূহ উগ্রভাব ধারণ করে না।

ব্যায়ামের দ্বারা বা কাজের দ্বারা দেহের যে ক্ষতি হয়ে থাকে তা বিশ্রামকালীন পূরণ হয়ে থাকে, যখন পূরণ হয় তখন আকারের বৃদ্ধি পায়, শক্তি তেজ, ধৈর্য্যশক্তি, গতি প্রভৃতিও বৃদ্ধি পায়। কারণ ব্যায়ামে রক্ত বৃদ্ধি হয় এবং খাদ্য হজম হয়। খাদ্যদ্রব্য প্রোটোপ্লাজম বলে একরকম তেজা পদার্থ দ্বারা হজম হয়ে থাকে। তাতে টিস্থ বা পেশীর জাল নূতন করে গড়ে ওঠে, শক্তি বাড়াতে হলে শক্তি বাড়ানো যায় এবং গতি দ্রুত করতে হলে তাও করা যায়। ধৈর্য্য শক্তি এবং অন্যান্যগুণও বাড়ানো যেতে পারে যদি প্রয়োজন মনে হয়।

পেশীর একটা মাপ আছে তার অধিক পেশী করতে পারে না। যত কাজ করবে পেশী তত বাড়বে। কিন্তু বেশী বড় করা ভাল নয়। সেই সম্বন্ধে যৌগিক পন্থায় যারা বিশ্বাসী তারা আপত্তি তোলেন। কারণ বড় পেশীর শক্তি ও তেজ বাড়বে সত্যি—কিন্তু একবার যদি কোন রোগ হয় তা সুস্থ করা সময় সাপেক্ষ।

ব্যায়াম যারা করতে চায়—তাদের দেহের অনুপাতে ব্যায়াম করতে হবে। বেশী হয়ে গেলে দেহের ক্ষতিসাধন আবার কম হলেও দেহের বৃদ্ধি বা উন্নতি হবে না। সেই জন্য মাঝামাঝি ব্যায়াম করতে হবে। যাতে ক্লান্ত না হয়ে পড়। শিশুদের লেখাপড়া করতে হয়—সেই জন্য তাদের বেশী ব্যায়াম করলে চলবে না। তাদের ঘুম প্রয়োজন। বিশ্রাম দরকার। তবে আবার দেহ ও মন তাজা হয়ে উঠবে। মনে আনন্দ পাবে এবং শরীর সুস্থ থাকবে।

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রণীত কাব্য গ্রন্থ "স্বর্গসন্ধ্যা"—১৲
শ্রীযুগলকান্তি বসু প্রণীত "স্মৃতিকথা"—৩৲
শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য প্রণীত চিত্তাকর্ষক উপন্যাস "বর্ষার বাদলী"—১৲
শ্রীসুধীর গুপ্ত প্রণীত কাব্য গ্রন্থ "মায়ুকরী"—২৲
শ্রীহরিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "সামবেদী সন্ধ্যা-বন্দনা"—১৲
"ন্যাসেদো ও দে পেলায়েস"—৪৲
শচীন্দ্র প্রসাদ প্রণীত "Women Marriage & Morals"—৯৲
শ্রীরাধাবিলাস সেন প্রণীত "সুধা"—১৲
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন প্রণীত "ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত"—৪৲
শ্রীরাইচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "অশ্রুরাগ"—১৲
স্বর্গত মন্মথকুমার বসু রচিত "স্মৃতিকথা"—৩৲
শিবধন দত্ত প্রণীত চিত্তাকর্ষক উপন্যাস "কর্মক্ষেত্রে মহাদেবী"—২৲
"রক্ষাকবচ মোহন"—২৲, "স্বর্গীয় মোহন"—২৲
দীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত চিত্তাকর্ষক উপন্যাস "মৃত্যু-কবলে"—২৷৹
শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "সত্যাশ্রয়ী যাদুকরী"—২৲
শ্রীসুরেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "গাইনেকা অভাইয়ালজ"—১৲
শ্রীধীরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত "বিয়ারী ট্রাজিডি"—১৲
অনাথবন্ধু দত্ত প্রণীত "মায়ের কথা"—৫৲
শ্রীমনীন্দ্রগোপাল ঘোষালী প্রণীত জীবনী-গ্রন্থ "বৈজ্ঞানাচার্য্য বিদ্যানিধি"—৷৹
শ্রীবিনোদমোহন ঘোষ প্রণীত "আরকার পথে"—১৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রাবণ—১৩৫৬

প্রথম খণ্ড | সপ্তত্রিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

সুগন্ধির ক্রমবিকাশ—দেশে ও বিদেশে

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

সুন্দর ও সৌন্দর্য্যের সাধনা মানুষের বুভুক্ষু অন্তরের সহজাত কামনা; মনে হয়, রাঙা রবির নয়ন-মনোহর বর্ণপ্রবাহ মানুষের মনে এই অনবদ্য অনুরাগের সৃষ্টি করিয়াছে। সহস্রকিরণপ্লাবিত অরুণোদয়ে রংএর বর্ণঝারায় স্নাত হইয়া শিশু মানুষ ভাবুক হইয়া উঠিল, নয়নে নয়নে রূপের এই অনুপম হোলীখেলায় তাহার হৃদ্‌কমলে শতদল বাউলের সৃষ্টি হইল, প্রশ্ন জাগিল বাহিরের এই রূপরহস্য, আলোর বন্যা কি কেবল প্রাকৃতিক, ভূস্বর্গীয় লীলা? না, অন্তরের অন্তরতম গোপনহিয়া ইহার উৎপত্তি স্থল? সুন্দরের এই রহস্যময় অনুভূতির সহস্রমুখী অনুরণনই হইল সত্যকার গোড়ার কথা, কিন্তু সত্যশিবসুন্দরের স্বর্ণরথচক্র কখনও ঋজুপথে পদক্ষেপ করে নাই, উত্থান পতন ও বন্ধুর পথেই তাহার বিচিত্র গতি; ঝড়বাদলের চিহ্ন তাই তাহার দোলায়মান পথরেখায় পরিস্ফুট। সৌন্দর্য্য সাধনার ইতিহাসও ঠিক অনুরূপ।

সূর্য্য চন্দ্র গ্রহনিচয়ের উদয় অস্তের সহিত বিশ্বজগতের বর্ণাঢ্য সুকুমার পরিবর্ত্তন, পূর্ণচন্দ্রের বিমলভাতি, প্রকৃতির অঙ্কুরন্ত পত্রপুষ্পের অনন্ত সুষমা ও বনানীর রমনীয়তা মানুষের মনকে অনন্ত সৌন্দর্য্যের প্রতি উন্মুখ করিয়া তোলে, সৌন্দর্য্যের এই কলাশালায় বিভিন্ন যুগের বিপুল ঝঙ্কারে বিবিধ পণ্যদ্রব্য সুন্দরের সেবায় সমারোহ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। "তোমার সাজাব যতনে কুসুম রতনে কেউর কুণ্ডলে সাজাব" এই কামনা কেবল এই যুগের কবি-কল্পনা নহে।

যাহাদের মনের গহনে সভ্যতা-সূর্য্যের আলো তখনও প্রবেশ করে নাই তাহাদেরও সৌন্দর্য্যচর্চ্চার বিরাম নাই

দেখা যায়। কোল, ভীল, সাঁওতাল, নাগা প্রভৃতি অরণ্যবাসী জাতির মধ্যে প্রকৃতির বিবিধ দান, পত্রপুষ্পই, তাহাদের সৌন্দর্য্য তৃপ্তির বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়া থাকে। সুন্দর সাজিবার জন্য মানুষ যে কত ব্যাকুল 'উল্কি' পরিধান প্রথা হইতে তাহা অনুভূত হয়। দেহযন্ত্রণাকে যন্ত্রণা দিয়া বিকৃত চিত্রে বিভূষিত করাই হইল 'উল্কি'। নারীদের কর্ণাভরণ কিম্বা নাসিকাভরণও কম উৎকট নহে। কৌলীন্যের পরিচায়ক আধুনিক বহুমূল্য জড়োয়া কর্ণাভরণ অতীতের বীভৎস কর্ণলম্বের সুসংস্কৃত অভিনব সংস্করণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। নাগা, কুকি কিম্বা হাওয়াই দেশের বুনোদের কথা আরও বিচিত্র। বীর হস্তে নিহত জীবের মুণ্ডমালা কিম্বা শূন্যভূষণ পরিহিত যুবক সেখানে বিবাহার্থী নারীর বেশী কাম্য। এই মুণ্ডমালা যদি পশুর না হইয়া নরমুণ্ডমালা হয় তবে পাণিপ্রার্থীর বীর্য্যবত্তা ও কৌলীন্য সম্পর্কে সন্দেহ মাত্র অবশিষ্ট থাকে না। কাজেই দেখা যায় সভ্যতার ক্রমবিকাশের সহিত সৌন্দর্য্য সাধনার আনন্দও বিজড়িত রহিয়াছে।

ভারতের সভ্যতা অত্যন্ত প্রাচীন। কাজেই এদেশের সুগন্ধির ক্রমবিকাশের ইতিহাস ও অভিনব। কিন্তু অন্যান্য দেশের সহিত ভারতভূমির একজায়গায় স্পষ্ট পার্থক্য আছে। গ্রীসের প্লেটো, হেরোডোটাস, আরিষ্টটল, কিম্বা পিথাগোরাসের জন্মকাল অথবা বাস্তুভূমির কিছু সন্ধান হয়তো বা মিলিতে পারে, কিন্তু ভারতের কপিল, পাতঞ্জলি, কনাদ, জৈমিনী, ব্যাৎসায়ন কিম্বা সেদিনের মহাকবি কালিদাসের জীবনবৃত্ত জানা যায় না। সন্ন্যাসী, ঋষি কিম্বা ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যাস, বশিষ্ঠগণের ত কথাই নাই। ভারতের আদর্শ হইল নিঃশেষে বিলাইয়া দেওয়া—"ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে"। ফুলের মতন নিঃশব্দে করিয়া যাওয়া—যেখানে আদর্শ সেখানে পাখির সুগন্ধির ধারাবাহিক তথ্য বর্ণনা অসম্ভব। তবুও প্রাচীনকাল হইতেই 'যা কিছু সুন্দর, যা কিছু প্রিয় দিব তাহা উপচার চরণে তোমার' সত্য সুন্দরের প্রতি অর্ঘ্য নিবেদন, দেবদেবী পূজা, কিম্বা রাজা রাজড়াদের আড়ম্বরপূর্ণ জাকজমকের বিবরণী হইতে কিছু কিছু তথ্য উদ্ধার করা যাইতে পারে, প্রাচীন চিত্র, ভাস্কর্য্য, ধর্ম্মগ্রন্থ কিম্বা সাহিত্যের নানা উপকরণের সূত্র ধরিয়া একটী চিত্র খাড়া করা যাইতে পারে।

বৈদিক যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ডে সুন্দর রেখাচিত্র ও আল্পনা অঙ্কন করিবার নিয়ম আছে। এই সকল রেখাচিত্র অঙ্কনে নানাবিধ সুগন্ধি ঔষধিচূর্ণ ব্যবহৃত হয়। ধূপধুনা ও ওগ্‌গুল ধূমের পরিবেশে ক্ষৌমবস্ত্রপরিহিত চন্দনচূয়াচর্চ্চিত পুরোহিত যজ্ঞকার্য্য সমাধা করেন। বিবিধ সুগন্ধ-বিতারী দ্রব্য পদার্থে আরত্রিক সম্পন্ন হয়। পুষ্প, পুষ্পরস, মধু ও সুগন্ধ পায়সের অর্ঘ্য ও নৈবেদ্য দেওয়ার রীতি আছে। যজ্ঞকর্ত্তা ও চন্দনচূয়াচর্চ্চিত, ক্ষৌমবস্ত্র, বহুমূল্য রত্নাভরণ ও কর্পূর মাল্য পরিধান করেন। যজ্ঞস্থলে পুষ্পরস, মধু, মৃগনাভি ও কস্তুরী বিতরণ করা হয়। স্বর্গত পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে অবস্থানুযায়ী বিবিধ উপচারে রত্নাভরণ, সুগন্ধি দ্রব্য, তৈজসপত্র এবং খাদ্যদ্রব্য উৎসর্গ করা হয় এবং যাজ্ঞিক পুরোহিতদের ক্ষৌমবস্ত্র উপহার দেওয়া হয়। মিশর দেশে স্বর্গত পিতৃপুরুষদের দেহাবশেষ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যে পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছিল তাহাকে 'মামি' করা বলে। সম্প্রতি 'মামি' আবিষ্কৃত হওয়ায় দেখা যাইতেছে যে পিরামিডের তলদেশে 'মামি'র সহিত তাহাদের নিত্য প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র, খাদ্যদ্রব্য, স্বর্ণাভরণ, সুগন্ধ দ্রব্য দেওয়া হইয়াছে। ধারণা এই যে মৃত্যুর পরপারে ঐ সকল দ্রব্য মৃতব্যক্তির সহিত যাইবে। দুর্গন্ধ হইতে রক্ষার জন্য বিশেষ সুগন্ধি ও ঔষধের আবিষ্কার এই সূত্রে সম্ভব হইয়াছিল।

ঐতিহাসিক যুগে আসিয়া পুরাতন সাহিত্যের সাহায্যে আমরা সুগন্ধির অনেকটা ধারাবাহিক 'ইতিবৃত্তের' পরিচয় পাই। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, কাদম্বরী প্রভৃতি কাব্যে মহাকবি কালিদাস ও বাণভট্ট প্রসাধনের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থপাঠে জানা যায়, উচ্চবংশীয়া সুন্দরী ও বিলাসী পুরুষদের প্রসাধনের জন্য শিক্ষিত কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইত। রাজপ্রাসাদে স্ত্রীলোক-প্রসাধিকা ব্যতীত কুব্জদেহ পুরুষকর্মীও নিযুক্ত হইত দেখা যায়। প্রসাধনের তালিকা ও বিন্যাস দেখিয়া স্তম্ভিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িতে হয়। সুন্দরী সাজিবার জন্য কি অসাধারণ সাধনা ও কষ্ট তাঁহারা স্বীকার করিতেন। বিজ্ঞানের উন্নতিতে অঙ্গরাগ আজ কত সুলভ ও সহজসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

প্রথমেই কবরীবন্ধনের পালা। স্নানান্তে মৃগনাভি-সুরভিত ধূপের গন্ধে কেশদাম সুগন্ধে ভরপুর করা হইত;

তারপরে বিবিধ প্রণালীর কবরীবন্ধন, কুরুবক ও লোধ্র-কুলের গুচ্ছ কবরীর শ্রী ও শ্রী বর্দ্ধন করিত। মুখমণ্ডলের কমনীয়তা ও শোভা বাড়াইবার জন্য নানারূপ অনুলেপন ও তৈল এই কাজে ব্যবহৃত হইত। কালীয়ক, মনঃশিলা, হরিচন্দন, হিঙ্গুল, বকুল, প্রিয়ঙ্গু, মৃগনাভিচূর্ণ, কুঙ্কুম, চন্দন নির্য্যাস ও চূর্ণক এবং নানাবিধ ঔষধি রস ও তৈল সাহায্যে এই অনুলেপন প্রস্তুত হইত। গুপ্তযুগে সাধারণ-ভাবে এই সকল অঙ্গরাগকে 'মুখ প্রসাধন' বলা হইত এবং প্রসাধন কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মীকে 'প্রসাধক' ও 'প্রসাধিকা' বলা হইত। চক্ষুদ্বয়কে সুন্দর দেখাইবার জন্য শলাকা সাহায্যে অঞ্জন ব্যবহার, ভ্রূযুগলকে বেশ লম্বা ও ধনু দেখাইতে পারিলে অক্ষিযুগলকে যে ভাসা-ভাসা পটলচেরা দেখা যায় এই জ্ঞান তখন অজ্ঞাত ছিল না এবং এই সকল বৈশিষ্ট্যের (টেক্‌নিকের) জন্য নানাবিধ মলম ও কজ্জলী ব্যবহৃত হইত, গণ্ডদ্বয় মাংসল ও রঙ্গীণ দেখাইবার জন্য যে অঙ্গরাগ ব্যবহৃত হইত তাহাকে 'বিশেষক' বলা হইত। গণ্ডদেশে ও ললাটে নানাবিধ পত্রের অনুলেখন পরিচিহ্নিত করিবার রীতি জানা ছিল এবং ওষ্ঠদ্বয় অলক্তকে রঙ্গীণ করা হইত। জাফরাণ, গুরুগুরু, গোরচনা ও লোধ্ররেণু সাহায্যে মুখমণ্ডলের জন্য মুখ-প্রসাধন, লেপনী, তৈয়ার হইত। সুন্দরী নারীর শুভ্র বক্ষদেশে যে লেপনী ব্যবহৃত হইত তাহা চন্দন নির্য্যাসে সুরভিত ও জাফরাণ রংএ রঞ্জিত হইত। লেপনী ব্যতীত চন্দনচূর্ণও ব্যবহৃত হইত। প্রিয়জনের মনোযোগ আকৃষ্ট করিবার জন্য সুকোমল নিটোল বাহুদ্বয় চন্দন লেপনীতে সুশোভিত ও সুরভিত করা হইত। পদদ্বয় লাক্ষারসে লাল টুক্‌টুকে দেখাইত।

মহাকবি বাণভট্ট মহারাজ হর্ষের ভগ্নী রাজ্যশ্রীর পরিণয়োপলক্ষে যে সকল অঙ্গরাগের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা তৎকালীন রাজরাজড়াদের যুগে যে প্রশস্ত পদ্ধতি ছিল—তাহার উল্লেখ অসঙ্গত মনে হয় না। রাজ্যশ্রীর বিবাহোৎসবে অঙ্গরাগ তৈয়ারী হইতে বাসরসজ্জা ও প্রসাধন ক্রিয়া পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যের সামন্ত রাজবধূদের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হইয়াছিল, এই উপলক্ষে জাফরাণী গন্ধে ভরপুর ঘনীকৃত বলাসনাঘৃতে মুখ লেপনী প্রস্তুত হইয়াছিল। কোকুল ফুল ও লবঙ্গ কুঁড়ির মালিকায় শুভ্র কর্পূর স্ফটিক রাজকুমারীর গলদেশ বিভূষিত করিয়াছিল। ললাট ও গণ্ডদেশ চন্দনপত্র লেপনী ও তালে মৃগনাভিচূর্ণক সুবাসিত তিলকবিন্দু ও পদযুগল লাক্ষারসে রঞ্জিত হইয়াছিল।

জন্মোৎসবের সময় যে সকল প্রসাধন ও অঙ্গরাগ ব্যবহৃত হইত মহাকবি বাণের লেখনীতে তাহাও অমরত্বলাভ করিয়াছে। শ্রীহর্ষের জন্মোৎসব বিবরণীতে বলা হইয়াছে মাঙ্গলিক বস্ত্রে রাজললনা ও সম্ভ্রান্ত বধূরা সম্রাট প্রভাকর-বর্দ্ধনের প্রাসাদে যাইতেছেন—তাঁহাদের পশ্চাতে ভৃত্যের হস্তে চামর, ঝাল্লা ও ঘানীয় সম্ভারপূর্ণ পেটিকা, পুষ্পডালায় কর্পূরঘনক, গজদন্ত নির্ম্মিত রত্নাস্তরণের বাক্স, পারিজাতক সুগন্ধি, শঙ্খকপোলক পরিপূর্ণ আম্রতৈল রজত পাত্রে চলিয়াছে। ইহার পশ্চাতে আছে গুবাকসহ সুপারীবৃক্ষের শোভাযাত্রা, আম্রশাখাবৃন্দে চতুর্দ্দিক সুসজ্জিত। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেও এইরূপ উৎসবমুখর গৃহ এবং সাজ-সজ্জা আজও শ্লাঘ্য।

কালিদাস ও বাণের যুগে লাক্ষারসের প্রচুর ব্যবহার ছিল। অঙ্গরাগ ব্যতীত রূপসৃষ্টিতে ও সাজসজ্জায় দক্ষতা দেখাইতে তুলিকাকার সর্ব্বদা লাক্ষা, জাফরাণ ও কুমকুম হাতের কাছে রাখিতেন।

মহারাজ হর্ষ রাজসম্মান হিসাবে বৈদেশিক কিম্বা সামন্ত দূতদিগকে শুভ্র বস্ত্রবেষ্টিত নারিকেল পাত্রে চন্দনচূর্ণক উপহার দিতেন। রাজন্যদিগকে জাফরাণ মিশ্রিত পান সুপারী দিয়া অভ্যর্থনা করা হইত। রাজা হর্ষ পানের রঙ্গে ঠোঁট রাঙ্গা রাখিতেন। পানবহনকারী ভৃত্যকে সরকারী আখ্যায় 'পাটলধরা' বলা হইত। অতিরিক্ত পান খাওয়ায় দাঁত রঙ্গীণ হইয়া যাইত বলিয়া সুজান শিরোমণি রাজা-রাজড়াদের দাঁত রঙ্গীণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

অজন্তা গুহায় সখী-পরিবৃতা প্রসাধনে-ব্যাপৃতা বহু চিত্র আছে। দক্ষিণহস্তে গণ্ডদেশ ও কপোলে লেপনী দেওয়ার কালে বামহস্তের আরসীতে মুখ দেখিতেছে এইরূপ চিত্রও অজন্তা গুহায় আছে। হয়তো ওষ্ঠ, করকমল এবং পদদ্বয়ের গোড়ালী অলক্তক রঞ্জিত ছিল—কালের অমোঘ বিধানে রং বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। কালিদাসের কাব্যে বর্ণিত প্রসাধনরতা সম্ভ্রান্ত মহিলার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা পেটিকা হস্তে পরিচারিকা, কিম্বা ব্যজনরতা কুব্জদেহ ভৃত্য দণ্ডায়মান, সকলের চোখেই অঞ্জন দেওয়া, কজ্জলীতে ভ্রূযুগল বেশ টানা টানা, চুড়ি পরিধান করিতেছেন এইরূপ

চিত্রও অনেক আছে। গুপ্তযুগের সাহিত্য হইতে আরও জানা যায় যে প্রাসাদের অন্তঃপুরে বোবা, বিকৃতদেহ, নপুংসক পুরুষ ও কুব্জের দল প্রসাধকের কার্য্যে নিযুক্ত হইত। বহু রাজবংশের উত্থান পতনের কাহিনীর সহিত এইরূপ দুই একজন কুব্জ কিম্বা নপুংসকের নাম প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

মহিলাদের ন্যায় পুরুষেরাও প্রসাধন-প্রিয় ছিলেন। বাৎস্যায়ন তাঁহার সমসাময়িক পুরুষদের প্রসাধন সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন। এখনকার ন্যায় সাবান তখন সুলভ ছিল না, হয়তো বর্ত্তমান অর্থে ব্যবহৃত সাবানের ব্যবহার তখন অপ্রচলিত ছিল ; কিন্তু বাৎস্যায়নে "ফেনক" কথার উল্লেখ আছে। আরও জানা যায় যে ক্ষৌরকার্য্যের পূর্ব্বে 'ফেনকা' ব্যবহার তখন প্রচলিত ছিল। ক্ষৌরকার্য্যের পরেই স্নান করা বিধি ছিল এবং স্নানান্তে মহিলাদের ন্যায় বাহুদ্বয় চন্দনচর্চ্চিত করা হইত, তদন্তর ক্ষৌমবস্ত্র ও অগুরু গন্ধে সুরভিত মাল্য পরিধান করিতেন। মাল্য মস্তকে কিম্বা গলদেশে আপন মুখীমত ব্যবহৃত হইত। চোখে সুরমা ও কজ্জলী এবং ওষ্ঠে অলক্তক দেওয়া হইত। সৌগন্ধ পেটিকায় পছন্দ মত সুগন্ধি কাছেই থাকিত। সুগন্ধি তাম্বূল ও তাম্রকূট সেবন প্রচলিত ছিল। মুখ-গহ্বরের বায়ু সুরভিত রাখিবার জন্য সুগন্ধি মসলা ও তাম্বূল 'মুখবাস' হিসাবে ব্যবহৃত হইত।

গুপ্তযুগের পরে ভারতীয় প্রসাধনের অগ্রগতি সম্ভবতঃ স্তব্ধ হইয়া পড়ে। ভারতীয় সংস্কৃতির বন্ধ্যাত্ব ইহার পরে প্রতীয়মান হয়। বৈদেশিক শাসন ও অন্তর্দ্দেশীয় মাৎস্য-ন্যায় উভয় কারণেই ভারতীয় সভ্যতায় কূর্ম্মবৃত্তি প্রসার লাভ করে। এমন কি ইসলাম বিজয়ের দুইশত বৎসরের মধ্যে ভারত ভূখণ্ডে উল্লেখযোগ্য মনীষার উদ্ভব হয় নাই। জেতা ও বিজেতাদের মধ্যে ধীরে ধীরে মন জানাজানি আরম্ভ হয়। এই সমঝৌতার পরিণতিতে এক মিশ্র সংস্কৃতির জন্ম হয়। সমন্বয়ের মৃদুকর স্পর্শে মূক ও স্তব্ধ সংস্কৃতি পুনরায় ভারত গগন মুখরিত করিয়া তোলে। সঙ্গে সঙ্গে ভাল টুকিয়া প্রসাধন ও অঙ্গরাগ শিল্পের বৈচিত্র্য সুরু হয়। আরব, ইরাণ ও হিন্দের ত্রিমুখী ধারায় স্নাত হইয়া শিল্প সম্ভারে বিবিধ কলার জয়যাত্রা আগাইয়া চলে।

আধুনিক প্রসাধনের জন্মলাভ প্রায় এই সময়। ভারতীয় পূর্ব্বগগনে এই নবীন রবির উদয় নিছক ভারতের আকাশেই নিবদ্ধ থাকে নাই, পঞ্চনদের সীমানা ছাড়াইয়া ইরাণের শুষ্কবাগ ধরিয়া মরুভূমির তপ্ত ধূলি শান্ত করিয়া গ্রীসের খার্শপলির অপর পারে রোমক সাম্রাজ্যও রবিকর-স্পর্শ লাভ করে। ভারতীয় জ্ঞান ও দর্শনের সহিত ভারতীয় গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের ঢেউ সে দেশে আসিয়া পৌঁছায়। নূতন দেশে নূতনের সংস্পর্শে আসিয়া জ্ঞান নির্ঝরের স্বপ্ন টুটিয়া গিয়া অঝোর ঝোরা প্রবহমান হয়, ভারতীয় 'এলকেমীর' জীয়ন্ত কাঠির সংস্পর্শে আসিয়া আরবীয় 'এলকেমী'র ঘুমন্ত পুরীতে সাড়া পড়িয়া যায়। বিভিন্ন সভ্যতার সংঘাতের ফলে বীজগণিত, অঙ্কশাস্ত্র, জ্যামিতি, কিমিতি এবং জ্যোতির্বশাস্ত্রে অপূর্ব্ব উন্নতি আরম্ভ হয়। সুকুমার-শিল্প ও কলাবিভাগে প্রভূত উন্নতি হয়, নানাবিধ পুষ্পের আতর, ফুলেল তৈল, ঔষধি চূর্ণক ও ক্বাথ এবং সাবান শিল্পের প্রসার লাভ ঘটে। দেশ বিদেশের এই কাহিনীই এখন বলা যাউক।

আধুনিক প্রসাধনের মধ্যে সাবান ও সাবান জাতীয় শিল্পই প্রধান অংশ দখল করিয়াছে। সাবান কথাটী কিন্তু বিদেশী, সম্ভবতঃ পর্ত্তুগীজ 'সাভন (Savon) শব্দ হইতে ইহার উৎপত্তি। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ভারতে ও ভারত সমুদ্রের দুইধারে স্পেনীয় ও পর্ত্তুগীজ বণিকদের ব্যবসার ও সমৃদ্ধির কথা সকলেই জানেন ; ব্যবসায় আদান-প্রদানের সূত্র ধরিয়া সংস্কৃতির আদানপ্রদান হয়। এই সমঝৌতার পথেই বহু বিচিত্র আচার-ব্যবহার ও শব্দ সম্ভার উভয় ভাষার সম্পদ বাড়ায়। সাবান জাতীয় দ্রব্য আমাদের একেবারে অজ্ঞাত ছিল না, পূর্ব্বেই বাৎস্যায়নের গ্রন্থে 'ফেনকা' ব্যবহার উল্লেখ করা হইয়াছে। আধুনিক 'রিঠা' জাতীয় দ্রব্যের ন্যায় নানা রকম উদ্ভিজ্জ ফলের রস, বিবিধ ক্ষারজ মৃত্তিকা ও উদ্ভিজ্জক্ষার বস্ত্রপ্রক্ষালনে ব্যবহৃত হইত। আজকাল যেমন গায়ে মাখা সাবান সর্ব্বত্র অজস্র পাওয়া যায় সেরূপ কিছু ছিল বলিয়া জানা যায় না। বড় বড় পরিবারে দুগ্ধ নবনীত ও ব্যসনের সাহায্যে গাত্র মার্জ্জনা করা হইত। সাজি মাটীর ন্যায় ক্ষারজ মৃত্তিকা, তিলক প্রভৃতি ও গাত্র পরিষ্কারে ব্যবহৃত হইত। কাপড় কাচা সাবান তৈয়ার সম্ভবতঃ মুস্লিম আগমনের পরেই আরম্ভ

হয়। ভারতের বাহিরেও সাবান তৈয়ারী ঠিক কবে আরম্ভ হয় সঠিক বলা মুস্কিল, তবে আব্বাসীয় সুলতানের সময় দামাস্কস নগরী সাবান তৈয়ারীর প্রধান কেন্দ্র ছিল। পারস্য দেশীয় চিকিৎসক আবু মনসুর (৯৭০ খৃঃ) তাঁহার পুস্তকে সাবানের প্রয়োগ উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারই পুস্তকে নাকি লিখিত আছে যে ঐ সময়ে ভারতের ভেরা বন্দরে প্রচুর সাবান পাওয়া যাইত।

বিশর-দেশীয় ফিনিসিয়ান বণিকদের সহায়তায় য়ুরোপে সাবান প্রথম প্রবেশ করে, অথচ আধুনিক যুগের গায়ে-মাখা সাবান উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপের দান। এখন জানা যায়, যীশুখ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে য়ুরোপে সাবান তৈয়ারী হইত। চর্ব্বি ও উদ্ভিজ্জ ছাই একসঙ্গে সিদ্ধ করিয়া এই সাবান তৈয়ারী হইত। প্লিনির 'Historia Naturalis' এ চর্বি ও বার্চকাঠের ছাই দিয়ে 'Sapo' তৈয়ারীর বিধি লিখিত আছে, নিশ্চয়ই কাপড় কাচা কিম্বা গায়ে মাখার জন্য ঐ 'সাপো' ব্যবহৃত হইত না, কতকটা পমেড ও ক্রীম হিসাবে কিম্বা ঔষধের সহিত মিশাইয়া মলম তৈয়ারীর জন্য 'সাপো' ব্যবহৃত হইত। ধীরে ধীরে ঔষধের নির্দ্দিষ্ট সীমানা ও তালিকা হইতে মানুষের ব্যবহারিক জীবনে ও ইহার যে চাহিদা আছে তাহা ক্রমে অনুভূত হয়। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে য়ুরোপের বহু জায়গায় সাবান তৈয়ারী হইতেছে দেখা যায়। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সেভিল, ভেনিস ও মার্সাইলস্ নগরী সাবান তৈয়ারীর কেন্দ্রে পরিণত হয়। কিন্তু এই সময় সাবান শিল্পের নূতন বিপদ ঘনাইয়া আসে।

খ্রীষ্টীয়ান পাদরীরা অনেকেই ধর্ম্মোপদেশ দেওয়ার সময় সাবানের উল্লেখ করিয়া বলেন, সাবান যেমন বাহিরের ময়লা পরিষ্কার করিয়া দেহ নির্ম্মল রাখে তেমনই প্রায়শ্চিত্ত, স্বীকার ও অনুশোচনা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। এই তুলনামূলক ইঙ্গিতের অনুসরণ করিতে গিয়া ইতালী দেশে সপ্তদশ শতাব্দীতে সাবানশিল্প ধর্ম্মমণ্ডলীর অনুশাসনে পরিচালিত হইতে আরম্ভ হয়। রোমক সাম্রাজ্য ও রোমের ধর্ম্মাচার্য্য তখন য়ুরোপের ধর্ম্মগুরু, কাজেই য়ুরোপের সর্ব্বত্র সাবানশিল্প ধর্ম্মীয় দলগত শিল্পে পরিণত হয়। নৃথায়ের অভ্যুত্থানের সহিত য়ুরোপ আত্মার স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে সাবান শিল্প যে নিছক দৈহিক পরিশুদ্ধির জন্য প্রয়োজন এই স্বীকৃতি সাধারণ্যে গৃহীত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে রাজকীয় স্বেচ্ছাচারতন্ত্র এবং উচ্চহারে শুল্ক-গ্রহণ প্রথা এই সময়ে উঠিয়া যায়। ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শাসন-বিধি অমান্য করিবার অপরাধে একমাত্র ইংলণ্ডেই ১৬ জন সাবানশিল্পীর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হইয়াছিল, বহু আন্দোলনের ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রাজঅনুকম্পায় ব্যক্তিগত স্বাধীন ব্যবসায়ের অনুজ্ঞা প্রদত্ত হয় এবং আবগারী শুল্ক হ্রাস করা হয়। হলাণ্ডের আইন ছিল আরও অদ্ভুত। অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট তৈল কিম্বা চর্বি দ্বারা সাবান প্রস্তুত নিষিদ্ধ ছিল, সরকারের ধারণা ছিল অবিশুদ্ধ চর্বিতে চর্ম্মরোগ হয়। এই সময় য়ুরোপের অনেক স্থানে তুর্কী দেশীয় স্নানাগার আন্দোলন আরম্ভ হয়। শৈত্যপ্রধান দেশে আমাদের মত প্রতিদিন স্নানের রেওয়াজ ছিল না, কিন্তু চর্ম্মরোগ নিবারণের জন্য সে দেশের মনীষিরা স্নানের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করেন এবং স্নানাগার আন্দোলন সাধারণ্যে প্রাবল্য লাভ করে। সঙ্গে সঙ্গে সাবান শিল্পের উন্নতিও আরম্ভ হয়। সাবান ব্যবহার যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিমাপক এই তথ্যও প্রসার লাভ করে। জার্মান রাসায়নিক জুষ্টুস্ ফন্ লাইবিগ (Justice Von Liebig) ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পুস্তকে 'Chemiche Brief' এ লিখেন যে দুই দেশের সমসংখ্যক অধিবাসীর মধ্যে যে দেশে সাবানের খরচ বেশী সেই দেশই বেশী অগ্রগামী এবং সভ্যতা হিসাবে বেশী অগ্রসর। এই কারণে আমেরিকা আজ সবচেয়ে সভ্য। যেখানে প্রত্যেক আমেরিকান গড়ে প্রতিবৎসরে ২৪ পাঃ সাবান খরচ করে সেখানে ইংরাজ করে ১৪ পাঃ এবং ভারতীয় করে ১ পাঃ এর কম মাত্র। ভারত এমনই অনগ্রসর ও দরিদ্র! তবে ভারতের পক্ষে এইটুকু বলিবার আছে যে দৈনিক স্নান এখানে বিলাস নহে, পরন্তু ভারতের মতন গ্রীষ্মপ্রধান দেশে স্বাস্থ্যের জন্য দৈনিক স্নান একান্ত প্রয়োজনীয়। ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ-শ্রেণীর মধ্যে স্নানাদি আচমন শাস্ত্রীয় বিধির অন্তর্গত এবং একান্ত করণীয়।

শিল্প হিসাবে সাবান ও সুগন্ধি আজ অতুলনীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। দৈহিক পরিশুদ্ধি ও মানসিক পরিতৃপ্তির জন্য সুগন্ধি দ্রব্যের স্থান সমাজের সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। শিল্প হিসাবে সাবানের এই অগ্রগতির

পশ্চাতে বিজ্ঞানের অবদান অবশ্য স্বীকার্য্য। মূল উদ্ভিজ্জ সুগন্ধি সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে ছিল বলিয়া পূর্ব্বকালে একমাত্র বিলাসী ধনিকদের মনোবিকলনেই ইহা ব্যবহৃত হইত। পরিবর্ত্ত রাসায়নিক সুগন্ধির আবিষ্কার এবং সংশ্লেষণ জ্ঞানের উন্নতি আজ শিল্প হিসাবে সুলভ এবং প্রত্যেক শ্রেণীর নরনারীর রুচিবিলের অনুকূল হওয়ার সাবান ও সুগন্ধি আজ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যে পরিণত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মানুষ সৌন্দর্য্যব্যাকুল। দৈনন্দিন আচার ব্যবহার এবং খাদ্যতালিকার দিকে একটু নজর দিলেই আমরা বুঝিতে পারিব সাধারণের অলক্ষিতে দেশ, কাল, রুচি বিভেদে এই সৌন্দর্য্যবোধ মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জীবনধারায় কতটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। আমাদের বাংলা দেশের নগরবাসীর জীবনযাত্রা প্রণালীই ধরুন; দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত মধ্যবিত্ত জনসাধারণের রুচি ও নীতির মধ্যে সৌন্দর্য্যবোধ তাহার কাজ করিয়া যাইতেছে। সহরে স্থানাভাব, উপযুক্ত সুবিমল বাতাসেরও অভাব, তাই মানুষ প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়াই সম্ভব হইলে খোলা মাঠে অথবা বাড়ীর খোলা ছাদে, কিম্বা ঘরের দাওয়ায় বসিয়া গত রজনীর অবসাদগ্রস্ত তন্ত্রীর উপরে প্রকৃতির মৃদু প্রলেপ পাওয়ার আশায় অপেক্ষা করে। হয়তো দন্ত মঞ্জনের সাথে সাথে তাহার এই প্রাতঃক্রিয়া সমাপ্ত হয়। তারপরে অবস্থা ও রুচি অনুযায়ী 'চা' কিম্বা এক পেয়ালা কফি পানের সহিত দৈনিক সংবাদপত্র পাঠ, তদন্তর সুগন্ধি সাবানের সাহায্যে ক্ষৌর ক্রিয়া সমাপন, সুবাসিত তৈল অভাবে সরিষার তৈলের মৃদু গন্ধে গাত্র মর্দন করিয়া সাবান সহযোগে স্নান সমাপন। সকল সাবানই গাত্র পরিশুদ্ধ করে—ইহা জানা থাকা সত্ত্বেও সুরভিত সাবানই লোকে কামনা করে। স্নানান্তে রুচি অনুযায়ী দেহবিন্যাস করাই প্রথা। নিতান্ত দরিদ্র এবং গ্রামবাসী হইলেও উখু মাখার স্নান অপরিহার্য্য। অন্ততঃপক্ষে এক পলা সরিষা তৈল সকলে আশা করে এবং স্নানান্তে তিলক ভূষিত হওয়া গ্রামদেশেও বিলাসিতা নহে বরং বৈষ্ণবের ঘরে ইহা করণীয়। আহারের সময় দেখুন—ব্যঞ্জন প্রস্তুতে কাঁচা লঙ্কা, হরিদ্রা, তেজপত্র, মসলা ও ঘৃত এই সকল সামান্য হইলেও প্রয়োজন। ঘৃতের মধ্যে গব্যঘৃত হইলে বাঙ্গালীর ছেলে মেয়ে খুবই আরাম ও আনন্দবোধ করে। এই সকলের পশ্চাতে অলক্ষিতে কি সুগন্ধির হস্ত কৌশল নাই? তণ্ডুল যদি সুগন্ধ হয় তবে নিশ্চয়ই তাহার স্বাদুতা কত বাড়িয়া যায়, ব্যঞ্জন না বাড়িলেও তৃপ্তির সহিত আহার সমাপ্তি হয়, পাকস্থলীর ক্রিয়াও নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়। কণ্ট্রোলের দিনে 'কাঁকরমনি' চাউল খাইয়া একথা নিশ্চয়ই সকলে হাড়ে হাড়ে স্বীকার করিবেন। খারাপ, আঁকাড়া ও দুর্গন্ধ চাউলের খাদ্যগুণ যতই থাকুক, সংস্করণ অমাত্য যতই কেন এই আঁকাড়া চাউলের মহিমা ব্যাখ্যা করুন, প্রতিমূহে চিকিৎসক ও বৈদ্যের গতায়াতের যদি কোনও হিসাব সংখ্যাবিদ্‌রা রাখিতেন তবেই বলিতে পারিতেন প্রয়োজনের তাগিদ থাকিলেও মানুষের মনের উপরে স্বেচ্ছাচার চালান যায় না। মানসিক তৃপ্তির উপরে হজম ক্রিয়া কত নির্ভরশীল! গ্রামের চাষী দিনান্তে পরিশ্রমের পরে সুসিদ্ধ ভাত, কাঁচা লঙ্কা ও পাতলা মসুর ডাল পাইয়া কত তৃপ্ত, তাহার মাংসপেশী কোন আখড়ায় মহড়া দিয়া বাড়ে নাই। কাঁচা মুগ ডালের আস্বাদ স্বাদু ও স্বাস্থ্যকর—কিন্তু ভাজিলে সুরভি বাড়ে, স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কিম্বা হিতকর তাহা কেহ বিবেচনা করে না। এই সুরভিই আসল কথা এবং সাধারণ রাঁধুনী ইহা জানে। আমরা বাংলা দেশের লোক সরিষার তৈলে প্রস্তুত ব্যঞ্জন পছন্দ করি, গব্যঘৃতের প্রক্ষেপ পড়িলে রসনা যে আরও বেশী তৃপ্তি পায় তাহাও সকলের জানা। আবার দেখুন হিং এর গন্ধ যিনি সহ্য করিতে পারেন না তিনি চা' এর সময় হিং এর কচুরী বেশ সাগ্রহেই হাত বাড়াইয়া লইয়া থাকেন। পিঁয়াজ পলাণ্ডু না হইলে যাঁহার আহারে তৃপ্তি হয় না, হিং এর গন্ধ তাঁহার নিকটে অপাংক্তেয়, উল্টোটীও ঠিক তেমনই সত্য। বৈজ্ঞানিকেরা জানেন অনেক গন্ধসার আছে যাহার গন্ধ বমন উদ্রেক করে, কিন্তু সুরাসার সহযোগে পাতলা করিলে সুগন্ধের কারণ হয়, খাদ্য প্রস্তুতেও তেমনি এই কথা খাটে। আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, পেপে, শশা, ফুটি, তরমুজ, তাল, বাতাপী নেবু প্রভৃতি বস্তু বিশেষে, প্রয়োজন বোধে কত তৃপ্তির কারণ হয় এবং আমাদের অসীম সৌভাগ্যে সামান্য আয়াসে প্রচুর পরিমাণে এই সকল ফলমূল হাতের কাছে পাইয়া থাকি। এই তৃপ্তি কি কেবলমাত্র খাদ্যগুণের উপর নির্ভরশীল—নিশ্চয়ই নহে? বস্তু বিশেষে বিভিন্ন ঘ্রাণ রসনাতৃপ্তিকর। প্রভাতে, সন্ধ্যায়—বেল, চামেলী, গন্ধরাজ, বনফুল, হেনা, কিম্বা ধূপের গন্ধে বিমোহিত হই, বিশ্রাম কক্ষ সুরভিত হয়। এইভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে অলক্ষিতে সুগন্ধি আমাদের জীবনে কতটা স্থান অধিকার করিয়া আছে। আমাদের পক্ষে যাহা সত্য, সর্ব্বকালে, সর্ব্বযুগে, সকল দেশেই মানুষের নিকটে কি তাহাই চরম সত্য নহে?

হিরোইন

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

১

অনেকগুলি নবীনা অভিনেত্রী সোমনাথকে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল। নব-বসন্তে যেমন প্রজাপতির ঝাঁক আসিয়া প্রস্ফুটিত গোলাপকে কেন্দ্র করিয়া মৃত্যোৎসব সুরু করিয়া দেয়, গন্ধে বিভোর হইয়া কেবল উড়িয়া উড়িয়া ফুলকে প্রদক্ষিণ করে, তেমনি এই তরুণীগুলি সোমনাথকে কেন্দ্র করিয়া বসন্তোৎসবের সমারোহ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল।

অন্যায় করে নাই, কারণ আজ বসন্তোৎসব—হোলি। এই মেয়েগুলির মেহে যেমন যৌবনের মদিরা, মনেও তেমনি অফুরন্ত রঙ্গরস। সকলে সুন্দরী নয়, কিন্তু সকলেরই অন্তরে রসোল্লাসের মাদকতা তাহাদের কমনীয় করিয়া তুলিয়াছে। আজ তাহারা একজোট হইয়া, রঙ ও আবীরের হাতিয়ারে সজ্জিত হইয়া সোমনাথের অফিস আক্রমণ করিয়াছিল এবং সোমনাথকে একাকী পাইয়া তাহাকে সম্পূর্ণ পরাভূত করিয়া দিয়াছিল। হাসির লহর, পিচকারির তরল বর্ণ-ফুলঝুরি, আবীর গুলালের চূর্ণোচ্ছ্বাসে চারিদিকের বায়ুমণ্ডল রঙীন তরঙ্গ তুলিয়াছিল।

সোমনাথ এখন সিনেমা রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট; সকলেই তাহাকে চেনে, সকলেই তাহাকে সম্ভ্রম করে। এই মেয়েগুলির সহিত কর্মসূত্রে সোমনাথের পরিচয় আছে; প্রত্যেকটি মনে মনে তাহার প্রতি প্রীতিমতী। তাই আজ হোলির সুযোগ লইয়া তাহারা তাহার সর্বাঙ্গে প্রীতির আবীর উজাড় করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

অন্যের প্রীতি নিজের মনেও প্রীতির সঞ্চার করে। মেয়েরা চলিয়া গেলে সোমনাথ ভিজা কাপড়চোপড় পরিয়াই বসিয়া রহিল এবং স্মিত-মুখে তাহাদের কথা ভাবিতে লাগিল। ইহারা কেহ শ্যামলী কেহ গৌরী; কেহ প্রগল্‌ভা, কেহ বা ঈষৎ লজ্জিতা। সোমনাথ শুধু ইহাদের চেনেই না, ইহাদের জীবনের গূঢ় কথাগুলিও তাহার জানা আছে। সিনেমা সমাজে কাহারও কোনও কথা গোপন থাকে না, সকলেই কাঁচের ঘরে বাস করে। ইহাদের জীবনে নিন্দার কথা অনেক আছে। কেহই বিকলঙ্ক নয়, কেহই সতীলক্ষ্মী নয়। তবু—

ইহাদের নারীত্ব অবহেলার বস্তু নয়; সোমনাথ ইহাদের ঘৃণা করিতে পারে না। সত্য ইহারা নারীত্বের ব্যবসা করে; কিন্তু পণ্য মাত্রেই কি হেয়? ফুলও তো বাজারে বিক্রয় হয়; ফুল কি হেয়?

সোমনাথের মনের চিত্রপটে মেয়েগুলি একটি একটি করিয়া আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। তাহাদের হাসি, চাহনি, দেহভঙ্গিমা—তাহাদের চেক-চমক—

সোমনাথ মনের মধ্যে ঘর হইয়া গেল।

'ছি ছোড়, একেবারে ওস্তাদ হয়ে গেছ যে!'

সোমনাথ চমকিয়া চাহিল। পাণ্ডুরঙ বাহির হইতে আসে নাই, অলিন্দেই ছিল। তরুণীদলের আকস্মিক আক্রমণে সে আত্মরক্ষার্থে পাশের ঘরে লুকাইয়াছিল, তরুণীরাও সোমনাথকে পাইয়া আর কাহারও খোঁজ লয় নাই। এখন বিপদ কাটিয়াছে দেখিয়া পাণ্ডুরঙ একটি একটি পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে।

সোমনাথের সম্মুখে বসিয়া পাণ্ডুরঙ দুষ্টহাসিভরা হাসিল;—'যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা খ্যামের সাক্ষী বটে। তা—কোন্‌টির ধ্যান হচ্ছিল?'

সোমনাথ অপ্রস্তুত ভাবে বলিল,—'আরে না না—'

'সীতের কাছে রামুদোষাদি চলে না, সে চেষ্টা কোরো না। আর এতে লজ্জারই বা আছে কি? এতদিনে যদি তোমার প্রাণে রঙ ধ'রে থাকে—'

'কী পাগলের মতো বকছ।'

'ভাই সোমনাথ, তোমাকে আমার জীবনের কিলজফি বলি শোনো। তোমাদের ঐ সঙ্কীর্ণ অনুদার যৌন-নীতি আমি মানি না। এ বিষয়ে বরং শ্রীকৃষ্ণ আমার আদর্শ; অর্জুন আমার আদর্শ। আরও অনেক বড় বড় আদর্শ আছে। আমি আমার স্ত্রীকে ভালবাসি; সে আমার গৃহদেবতা। কিন্তু তাই বলে আমি অন্য মেয়ের পানে চোখ তুলে চাইব না, এত অধম আমি নই। তুমি এতদিন নিজের পথে চলেছ, আমি কোনও দিন তোমাকে বিপথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করিনি। কিন্তু আজ যদি তোমার ভিন্ন পথে চলবার ইচ্ছে হয়ে থাকে, আমি বাধাও দেবনা। এসব তুচ্ছ জিনিস, এদের বড় ক'রে দেখতে নেই। আসল কথা হচ্ছে, দিল খাঁটি হওয়া চাই, ইমান দুরস্ত থাকা চাই। তবেই মানুষের মনুষ্যত্ব। তোমার যদি কারুর ওপর মন পড়ে থাকে তাতে লজ্জার কিছু নেই। ওটা বয়সের ধর্ম, প্রকৃতির লীলা—'

'চুপ কর পাণ্ডুরঙ, ওসব কথা আমার ভাল লাগে না।'

'তুমি মনকে চোখ ঠারছ সোমনাথ। একদিন ঘাড় মুচড়ে পড়বেই, তার চেয়ে চোখ খুলে পড়া ভাল। ঐ যে মেয়েগুলো আজ এসেছিল ওদের প্রত্যেকের মনের কথা আমি জানি। তোমার জন্যে ওরা পাগল। ওরা যখন পরের বাহুতে বাঁধা থাকে তখনও ওরা তোমার কথা ভাবে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ওরা তোমার স্বপ্ন দেখে—'

'ছি পাণ্ডুরঙ—সোমনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল, তুমি আমাকে লোভ দেখাবার চেষ্টা করছ।'

পাণ্ডুরঙ নিশ্বাস ফেলিল।

'লোভ দেখাইনি ভাই, অদৃষ্টের কথা ভাবছি। কেউ চেয়ে পায় না, আবার কেউ পেয়েও চায়না—এই দুনিয়া। কিন্তু যৌবনকে বঞ্চনা করলে আখেরে ভাল হয় না সোমনাথ; অন্তরের সুপ্ত ভগবান একদিন প্রতিশোধ নেবে—'

সোমনাথ আর দাঁড়াইল না, বাড়ী চলিয়া গেল। যাইবার সময় শাশুড়ীকে খুব কড়া কথা শুনাইয়া গেল, 'তুমি একটা রাক্ষুসী বুড়ী।'

কিন্তু মুখে যত তর্জনগর্জনই করুক মনের কাছে তো লুকোচুরি চলে না। সোমনাথ মনে মনে এই ক্ষেত্রগুলির রূপযৌবনের চিন্তা করিতেছিল ইহা সে কিসে কি করিয়া অস্বীকার করিবে? নিজের কাছে ধরা পড়িয়া ফিকা তাহার মরমরাজা যেন আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। ছি ছি ছি! সে এ কী করিতেছে! তাহার একান্ত অজ্ঞাতসারে এ কোন্ আতাকুড়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে

তাহার মন তো এমন ছিল না। তিন বছর আগে যখন সে এই দিঘেমা ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখন তাহার মন শুচি ছিল, নির্মল ছিল; পত্নীর প্রতি শুভেচ্ছা তাহার ছিল না। মন লইয়া সে সব করিতে পারিত. কিন্তু আজ এ কি হইয়াছে! কোন শিথিলতার ছিদ্রপথে এই দৌর্বল্য তাহার মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে? সব চেয়ে আশ্চর্য, তাহার মনে যে এমন ঘুণ ধরিয়াছে তাহা সে নিজেই এতদিন টানিতে পারে নাই।

লম্পট! কথাটা মনে আসিতেই তাহার শরীর সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। লোকে তাহাকে আড়ালে লম্পট বলিবে, প্রকাশ্যে চোখ টিপিয়া হাসিবে। ভদ্রলোকেরা তাহাকে দেখিয়া স্ত্রী-কন্যা সামলাইবে। আর রত্না—সে কি ভাবিবে? ছি ছি ছি!

বাড়ী ফিরিয়া সোমনাথ জিজা কাপড় ছোপড় ছাড়িয়া স্নান করিতে গেল। অপার ক্লিষ্ট পীড়িত মন, অন্ত বাড়ীতে কথা কহিবার একটি লোক নাই। বিধি ও জামাইবাবু এখনও পূণায় আছেন।

স্নান করিতে করিতে তাহার ইন্দুবাবুর কথা মনে পড়িল। ইন্দুবাবু একদিন তাহাকে ললিত ও লতার কাহিনী শুনাইয়াছিলেন। ললিতও ভাল ছেলে ছিল—

বৈকাল বেলা সোমনাথ আবার মোটর লইয়া বাহির হইল; ইন্দুবাবুর বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল।

ইন্দুবাবু তক্তপোষের উপর পদ্মাসনে বসিয়া একটি মোটা-চৌড়া পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন, সোমনাথকে দেখিয়া বই নামাইয়া রাখিলেন।

সোমনাথ জিজ্ঞাসা করিল,—'কি বই পড়ছেন?

ইন্দুবাবু একটু অপ্রতিভ ভাবে হাসিয়া বলিলেন,—'গীতা। একটা বন্ধু এতদিন ফেলিয়েছে—বেশ ভাল। তাই ফেড়ে ফেড়ে দেখছিলাম।' কপালের আবার টানিয়া লইয়া পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিতে লাগিলেন,—'বঙ্কিম চার অধ্যায়ের বেশী টীকা লিখে যেতে পারেন নি, বাঙালীর দুর্ভাগ্য। যদি শেষ করতে পারতেন, অমর গ্রন্থ হত।'

গীতা সম্বন্ধে সোমনাথের কোনও জ্ঞানই ছিল না। গীতা ভগবদ্ বাক্য, তাহা সাধারণের বুদ্ধির অগম্য; আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব ছাত্র দর্শন পড়ে তাহারা পাশ্চাত্য দর্শন মুখস্থ করে কিন্তু ষড়দর্শনের খোঁজ রাখে না। সোমনাথেরও মনের ও দিকটা অন্ধকারই ছিল। ইন্দুবাবু কথাপ্রসঙ্গে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের যে আলোচনা করিতে লাগিলেন সে তাহা বিশেষ কিছু বুঝিল না, কেবল শুনিয়া গেল।

ইন্দুবাবু এক সময় বলিলেন,—'আমাদের দর্শন শাস্ত্র পড়বার সময় একটা বড় অসুবিধা হয়—পরিভাষা নিয়ে। কখন কোন পারিভাষিক শব্দ কী অর্থে ব্যবহার হয়েছে তা বোঝা শক্ত। টীকাকারেরাও সবাই নিজের কোলে ঝোল টেনেছেন, নানা মুনির নানা মত। এই দেখো না, গীতার এক যায়গায় বলা হয়েছে—'বিষয় বস্তুর ধ্যান করতে করতে পুরুষের সেই বিষয় আসক্তি জন্মায়; আসক্তি থেকে কাম হয়; কাম থেকে ক্রোধ, ক্রোধ থেকে সম্মোহ, সম্মোহ থেকে স্মৃতিবিভ্রম; স্মৃতিবিভ্রম থেকে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশের ফলে মানুষ বিনাশ পায়।' এই শ্লোকগুলিতে সব কথারই মানে বোঝা যায়, কেবল স্মৃতিবিভ্রম ছাড়া। এই স্মৃতিবিভ্রম বলতে ঠিক কি বোঝায় তুমি বলতে পার?'

সোমনাথ বলিল,—'স্মৃতিবিভ্রম কথার সাধারণ মানে তো—'

ইন্দুবাবু বলিলেন,—'সাধারণ মানে এখানে চলবে না, এটা পারিভাষিক শব্দ।' আমার কি মনে হয় জানো? ইংরেজিতে যাকে Loss of values বলে সেই মূল্যবোধ হারানোর নামই স্মৃতি বিভ্রম। মানুষ যখন এই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে তখন তাকে রক্ষা করা শিবের অসাধ্য। তোমার কি মনে হয়?'

সোমনাথ উঠিয়া পড়িল;—'আমি এসব কিছু বুঝি না। আচ্ছা, আর একদিন আসব। আপনি শাস্ত্রচর্চা করুন।' বলিয়া সে বিদায় লইল।

আজ সোমনাথ ইন্দুবাবুর কাছে বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য লইয়া আসে নাই; তাহার অস্থির মন তাহাকে টানিয়া আনিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল ইন্দুবাবুর সঙ্গে সাধারণ ভাবে কথাবার্তা বলিলেই তাহার মনটা সুস্থ হইবে। কিন্তু ইন্দুবাবুকে গীতার মণ্ডল দেখিয়া সে নিরাশ হইল। তাহার যে মনের অবস্থা তাহাতে এই জাতীয় সূক্ষ্ম আলোচনা তাহার অপ্রাসঙ্গিক মনে হইল। সোমনাথের মনে কোন সজ্ঞান দ্বন্দ্ববোধ ছিল না, এ বয়সে তাহা থাকে না। যাহা ছিল তাহা রক্তগত শুচিতার সংস্কার। এই সংস্কারই তাহাকে অনেক বিপদে আপদে এতদিন রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে দীর্ঘকাল থাকিলে জন্মগত সংস্কারও পঙ্গু হইয়া পড়ে—মূল্যবোধ বিকৃত হয়। সোমনাথ যদি মন দিয়া গীতাখানা শুনিত তাহা হইলে হয়তো তাহার বর্তমান সঙ্কটও অনেকটা সরল হইয়া যাইত। কিন্তু সে যন্ত্রচালিতের ন্যায় নিষ্ক্রিয় ভাবে চলিয়া গিয়াছিল। তাহার ভাগ্যদেবী তাহাকে লইয়া আবার নূতন খেলা খেলিবার উপক্রম করিতেছিলেন।

মোটরে লক্ষ্যহীন ভাবে এদিক ওদিক ঘুরিয়া সে আবার ফ্ল্যাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। ফ্ল্যাটে আজ ছুটি, কাজকর্ম কিছু নাই। শুধু এই ফ্ল্যাট তাহার মনের চারিপাশে এমন শিকড় বিস্তার করিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছে যে কাজে অকাজে এ স্থানটি ছাড়িয়া থাকা

তাহার পক্ষে অসম্ভব। হানা বাড়ীর মতো ইহার একটি অনির্বাণ মোহ আছে। কিন্তু ষ্টুডিওতে পৌঁছিয়াই একটা সংবাদ বোমা-বিস্ফোরণের মতো তাহাকে প্রায় মূর্ছাহত করিয়া দিল। পঞ্চানন মহাপাত্র হঠাৎ কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া বলিলেন,—'সোমনাথবাবু, আমার কি হবে? রত্নময়ি মারা গেছেন!'

'কী?'

'হাঁ—এই ঘণ্টাখানেক হল। আজ হোলি; বন্ধু বান্ধব নিয়ে খুব মদ খেয়েছিলেন, হঠাৎ হার্ট ফেল করে গেছে।'

সোমনাথ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

* * *

রত্নময়ির মৃত্যু যেন চোখে আঙুল দিয়া সোমনাথকে পথ দেখাইয়া দিল।

তারপর একহপ্তা কাটিয়াছে। রত্নময়ি উইল করিয়া যাইতে পারেন নাই, কিন্তু অনেক সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাই ইতিমধ্যেই সম্পত্তির উত্তরাধিকার লইয়া তাঁহার জ্ঞাতি গোষ্ঠীর মধ্যে মামলা সুরু হইয়া গিয়াছে। ষ্টুডিও আদালতের হেফাজতে রাখিবার কথা হইতেছে।

সোমনাথ অন্ত অনেক চিত্র-প্রযোজকের নিকট হইতে সাদর আমন্ত্রণ পাইতেছে; সকলেই তাহার হাতে চিত্র রচনার ভার তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে প্রস্তুত। কিন্তু সোমনাথ এই সাত দিনে নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের ছক কাটিয়া যাত্রাপথ স্থির করিয়া ফেলিয়াছে; কোনও প্রলোভনই আর তাহাকে পথভ্রষ্ট করিতে পারিবে না।

এই কয় বৎসরে সে যাহা উপার্জন করিয়াছে তাহার মধ্যে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা তাহার সঞ্চয় হইয়াছে। একটা মানুষের স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার পক্ষে ইহাই কি যথেষ্ট নয়? উপরন্তু, তাহার কর্মজীবন এখনই তো শেষ হইয়া যাইতেছে না।

জামাইবাবুকে একটি দীর্ঘ পত্র লিখিয়া সে ডাকে দিল। তারপর বন্ধু ও সহকর্মীদের কাছে বিদায় লইল। পাণ্ডুরঙ্গকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল,—'কলকাতায় চললাম। আমার মোটরটা তুমি ব্যবহার কোরো।'

পাণ্ডুরঙ্গ ভারী গলায় বলিল,—'তুমি যেখানেই যাও, আমার ভালবাসা তোমার সঙ্গে থাকবে।'

৭

কলিকাতায় পৌঁছিয়া সোমনাথ হ্যারিসন রোডের একটি ভাল হোটেলে উঠিল। তাহার চেহারা দেখিয়া হোটেলের ম্যানেজার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন, কিন্তু সোমনাথ আত্মপরিচয় দিয়া একটা হৈ চৈ বাধাইয়া তুলিতে রাজি নয়। বিখ্যাত অভিনেতা সোমনাথ চৌধুরী কলিকাতায় আসিয়াছে একথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িলে তাহার আর প্রাণে শান্তি থাকিবে না, সময়ে অসময়ে লোক দেখা করিতে আসিবে; কাগজে লেখালেখি হইবে। সে হোটেলের খাতায় ছদ্মনাম লিখাইল।

তারপর তাহার কাজ আরম্ভ হইল। বসিয়া থাকার কাজ নয়, অনেক ছুটাছুটির কাজ। উকিলের সহিত পরামর্শ, সরকারী দপ্তরে ধাঁটাধাঁটি, বড় বড় বিলাতী সওদাগরী অফিসে যাতায়াত, কলকব্জা পরিদ। তিন চার বার তাহাকে কলিকাতার বাহিরেও যাইতে হইল।

এই ভাবে মাস দেড়েক কাটিল। তারপর একদিন হোটেলের সম্মুখেই একটি পুরাতন বন্ধুর সহিত তাহার দেখা হইয়া গেল।

'সোমনাথ! তুমি হেথায়?'

ইনি সেই শিক্ষক-বন্ধু, যিনি সোমনাথের প্রথম ছবি বাহির হইবার পর অভিনন্দন জানাইয়া চিঠি লিখিয়াছিলেন এবং প্রদর্শনীতে মিষ্টান্ন দাবী করিয়াছিলেন। ইনি জামাইবাবুর দূর সম্পর্কের আত্মীয়, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে।

সোমনাথ বন্ধুকে হোটেলে নিজের ঘরে আনিয়া বসাইল। অনেক দিন পরে সাক্ষাৎ; দুই বন্ধুতে অনেক মনের প্রাণের কথা হইল। কিন্তু সোমনাথ নিজের বর্তমান বৈষয়িক ভাবান্তরের কথা কিছু ভাঙিল না।

বন্ধু এক সময় জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হঠাৎ এ সময় এলে যে! রত্নাকে দেখতে?'

'রত্নাকে দেখতে! কেন, কি হয়েছে রত্নার?'

'সে কি, তুমি কিছু জানো না? আমি ভেবেছিলাম—'

'না, আমি কিছু জানি না।'

বন্ধু বিস্মিত হইলেন; 'রত্না প্রায় এক বছর হল ভুগছে।'

'কী হয়েছে?'

'সত্যি কিছু জানো না? আমি ভেবেছিলাম রত্না আর তোমার মধ্যে একটা বোঝাপড়া—'

'না, তুমি ভুল বুঝেছ। রত্নার সঙ্গে আমার কোনও বোঝাপড়া নেই। সে মাঝে বার দুই বোম্বাই গিয়েছিল; দেখা হয়েছিল এই পর্যন্ত।—কিন্তু তার অসুখটা কী?'

বন্ধু সাবধানে বলিলেন,—'তা ভাই আমি ঠিক জানি না। তবে শরীর ভাঙ্গ নয়। তুমি তো জানো আমি ওদের ঘরোয়া আত্মীয়, বেশী খোঁজখবর নেই। শুনেছি রত্নাকে মধুপুর না শিরিডিতে নিয়ে গিয়ে রাখবার কথা হয়েছিল, কিন্তু রত্না রাজি হয় নি।—তোমার বোধহয় দেখা করা উচিত।'

বন্ধু চলিয়া যাইবার পর সোমনাথ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

সেই যে বছর দেড়েক আগে একটি ঝড়ো রাত্রে রত্না তাহার বাসায় রাত কাটাইয়াছিল, তারপর হইতে রত্নার কোনও খবরই সে রাখে না। তাহার এখনও বিবাহ হয় নাই; বিবাহ হইলে সোমনাথ নিশ্চয় খবর পাইত। হয়তো অসুখের জন্যই বিবাহ হয় নাই; নচেৎ বিবাহ না হইবার অন্য কোনও কারণ নাই। অসুখটা কী? বন্ধু কেন গুরুতর অসুখের ইসারা দিয়া গেলেন। তাহাকে দেখিতে যাওয়া কি সোমনাথের উচিত হইবে? রত্না সোমনাথের উপর বিরক্ত; হয় তো দেখা করিতে গেলে আরও উত্যক্ত হইবে—

তবু সন্ধ্যায় প্রত্যূষকালে সোমনাথ রত্নাদের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল।

জামাইবাবুর সদা কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার। বালীগঞ্জে তাঁহার সুদৃশ্য দ্বিতল উদ্যানসমন্বিত বাড়ীটি তাঁহার শ্রীসমৃদ্ধির সাক্ষী।

গৃহস্বামী বাড়ী ছিলেন না; দিদির মা মনোরমা দেবী সমাদর করিয়া তাহাকে বসাইলেন। তিনি স্থূলকায়া ও বহুভাষিণী; বয়স লোক ভাল।

'এস ভাই। অনেক দিন তোমায় দেখিনি; অবিশ্যি ছবিতে অনেকবার দেখেছি। কী সুন্দর ছবিই করেছ! কে জেবেছিল তোমার পেটে এত আছে! হাঁ—কবে এলে?'

সোমনাথ ভাসা-ভাসা উত্তর দিল। দু'চার কথার পর সে জিজ্ঞাসা করিল,—'রত্না কেমন আছে?'

মনোরমা দেবী বলিলেন,—'রত্নার শরীর ভাল যাচ্ছে না ভাই। সেই যে ও-বছর বর্ষার সময় বোম্বাই গিছল, সেখান থেকে ফিরে অবধি ওর শরীর খারাপ যাচ্ছে। বোম্বাইয়ের বোম্বাই ভাল যায়গা নয়, ভাই বল। কী রোগ যে নিয়ে এল, দিন দিন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা। অথচ বাড়ীতেই ডাক্তার; ওষুধ-বিষুধ সবই খাওয়ানো হচ্ছে; কিন্তু কিছুতেই ওর শরীর সারছে না।'

সোমনাথ জিজ্ঞাসা করিল,—'রোগটা কি?'

মনোরমা গলা খাটো করিয়া বলিলেন,—'উনি তো এককে সন্দেহ করেছিলেন বুকি টিবি। কিন্তু এক্সরে করে কিছু পাওয়া যায় নি। ভগবানের দয়া। তবু খুব সাবধানে রেখেছি, বাড়ী থেকে বেরুনো বারণ—বেশী চলাফেরা বারণ—'

'এখন সে বাড়ীতে আছে তো?'

'ওমা, বাড়ীতে আছে বৈকি। ওপরে আছে—ওর দাদা বেশী ওপর মীড়ে কয়া বানা করে দিয়েছেন। তা ও কি শোবে? মাঝে মাঝে নেমে আসে। তুমি এসেছ সাড়া পেলে হয়তো এখনি নেমে আসবে। তা তুমি ওপরেই যাও না ভাই। তুমি তো বাড়ীর ছেলে। এখন না হয় বড় লোক হয়েছ, তাক-ডোকিসে নাম জাদে। যাও, ওপরে যাও, আমি তোমার চা জলখাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

ঝিকে দিয়া সোমনাথ একটি বড় দরজায় টোকা দিল। ভিতর হইতে রত্নার গলা আসিল,—'কে? ভেতরে এস।'

সোমনাথ দ্বার ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। মেঝেতে দু'ধে পরিপাটি ভাবে সাজানো একটি ঘর; আধা লাইব্রেরী, আধা বিশ্রাম কক্ষ। এটি রত্নার নিজস্ব ঘর।

পশ্চিম দিকের জানালার সম্মুখে বসিয়া সন্ধ্যার পড়ন্ত আলোয় রত্না একখানা বই পড়িতেছিল। সোমনাথকে দেখিয়া সে সম্মোহিতের ন্যায় চাহিয়া রহিল। তাহার শীর্ণ মুখ হইতে রক্ত সরিয়া গিয়া মুখখানা যেন আরও পাণ্ডু দেখাইল।

সোমনাথ তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—'আমাকে কি চিনতে পারছ না?'

'না, পারছি না। এস—বোসো।' কথাগুলি ব্যঞ্জোক্তি হইলেও রত্নার স্বর এত ক্ষীণ ও দুর্বল শুনাইল যে সোমনাথের বুকে তাহা শূল শলাকার মতো বিঁধিল।

দু'জনে একটি সোফায় বসিল। রত্না আরও কিছুক্ষণ সোমনাথের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—'কি আশ্চি যে এলে! একেবারে ভুলে যাওনি তাহলে?'

সোমনাথ একথার উত্তর অনেক ভাবে দিতে পারিত, কিন্তু সে আবেগভরে বলিয়া উঠিল,—'তুমি যে বড্ড রোগা হয়ে গেছ রত্না।'

রত্না হাসিল। তাহার শীর্ণ মুখে হাসি ভাল মানাইল না। কপাল হইতে একগুচ্ছ রুক্ষ চুল সরাইয়া সে বলিল, 'ও কিছু নয়। তুমি কেমন আছ বল। হঠাৎ এ সময়ে কলকাতায় এলে যে। কাজকর্ম কি রকম?'

সোমনাথ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—'সিনেমার কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি।'

রত্না উচ্চকিত ভাবে চাহিল।

'সিনেমা ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছ? ও—এবার কলকাতায় বাংলা ছবি করবে!'

সোমনাথ মাথা নাড়িল।

'না। সিনেমা করাই ছেড়ে দিয়েছি।'

রত্না নিশ্বাস রোধ করিয়া চাহিয়া রহিল।

এই সময় একটি দাসী সোমনাথের জন্য চা ও জলখাবার লইয়া আসিল। ঘরে সন্ধ্যার ছায়া নামিয়াছিল, রত্না উঠিয়া সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিল। বলিল,—'ঝি, আমার জন্যেও এক পেয়ালা চা নিয়ে এস।'

ঝি বলিল,—'তোমার যে এখন ডাক্তারী দুধ খাবার সময় দিদিমণি।'

রত্না বিরক্ত হইয়া বলিল,—'যা, চা দিয়ে এস।'

ঝি চলিয়া গেল।

রত্না আবার গিয়া বসিল। সোমনাথ লক্ষ্য করিল রত্নার গালে ঈষৎ রক্ত সঞ্চার হইয়াছে, চক্ষু দুটিও যেন চাপা উত্তেজনায় উজ্জ্বল দেখাইতেছে। সে জলখাবারের রেকাবি টানিয়া আহারে মন দিল।

রত্না বলিল,—'এর মানে? সিনেমায় তো বেশ টাকা পাচ্ছিলে।'

সোমনাথ বলিল,—'ছেড়ে দেবার ওটাও একটা কারণ। এই তিন বছরে যা পেয়েছি তাতে বাকি জীবনটা চলে যাবে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর রত্না বলিল,—'সিনেমার এত শিগগির তোমার অরুচি ধ'রে যাবে তা ভাবিনি। ও পথে যে যায় তাকে ফিরতে দেখা যায় না। তোমার এই বৈরাগ্যের জন্য কোনও কারণ আছে বাকি?'

সোমনাথ শান্তভাবে বলিল,—'আছে। রুদ্রমণি মারা গেলেন, সেটাও একটা কারণ। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া?'

ঝি আসিয়া রত্নাকে চা দিয়া গেল। সোমনাথ নিজের চায়ের বাটি তুলিয়া লইয়া একটু হাসিল।

'আর একদিনের চা পাওয়ার কথা মনে পড়ে? বাইরে ঝড়ের মাতন, সমুদ্রের আক্রোশ, তার মধ্যে টর্চের আলো জেলে চা তৈরি করে খাওয়া?'

রত্নার মুখখানা ক্ষণকালের জন্ত কেমন যেন একরকম হইয়া গেল; তারপর সে সামলাইয়া লইল। বলিল,—'আসল কথাটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছ যে! বল না—তা ছাড়া কী?'

সোমনাথ ঈষৎ ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল,—'কি হবে ব'লে? তুমি বিশ্বাস করবে না।'

'তবু বলই না শুনি।'

নিঃশেষিত চায়ের পেয়ালা ধীরে ধীরে নামাইয়া রাখিয়া সোমনাথ বলিল,—'ইদানীং জ্বর হয়েছিল বুঝি তোমার কথাই বলে যায়—'

'আমার কথা?'

'হাঁ। তুমি দিদিকে একবার লিখেছিলে, আমি যখন সিমেমায় ঢুকেছি তখন আমার পতন অনিবার্য। ইদানীং আমারও সেই ভয় হয়েছিল। তাই—পালিয়ে এলাম।'

রত্নার পানে অসঙ্কোচে চোখ তুলিয়া সোমনাথ দেখিল, রত্নার করতলে চায়ের পেয়ালা থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, এখনি পড়িয়া যাইবে। সে তাড়াতাড়ি পেয়ালা লইয়া সরাইয়া রাখিল। রত্নার মুখ আবার পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করিয়াছে—ঠোঁট দুটি অসম্ভব রকম কাঁপিতেছে।

'কি হল রত্না?'

রত্না প্রবল চেষ্টায় নিজেকে সম্বরণ করিল।

'কিছু না। আমার শরীরটা একটু—। মাঝে মাঝে অমন হয়। তুমি আজ এস কিন্তু।'

সোমনাথ ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। মানসিক উত্তেজনা দুর্বল শরীরের পক্ষে ভাল নয়। সে বলিল,—'আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। বড়দিদিকে পাঠিয়ে দেব?'

'না না, তার দরকার নেই। আমি আপনিই ঠিক হয়ে যাব।'

'আচ্ছা।'

সোমনাথ দ্বার পর্যন্ত গিয়াছে, পিছন হইতে রত্না ডাকিল,—'শোনো।'

সোমনাথ ফিরিয়া দাঁড়াইল।

'আবার আসবে তো?'

'আসব। কিন্তু—'

'কবে আসবে?'

সোমনাথ একটু চিন্তা করিয়া বলিল,—'কাল আমাকে বাইরে যেতে হবে। দুতিনদিন পরে ফিরব। তারপর আসব।'

নমস্কারে হাতদুটা জোড়াইয়া ফিরা সে চলিয়া গেল।

৩

কলিকাতায় আসিয়া সোমনাথ একটি মোটর-লরি কিনিয়াছিল। পরদিন সকালবেলা সে অনেকজন লোক সঙ্গে লইয়া লরি চড়িল। ভাগীরথীর আঁকা বাঁকা পথে মোটর দক্ষিণ দিকে চলিয়া গেল।

এক হপ্তার মধ্যে ফিরিবার কথা, কিন্তু ফিরিতে সোমনাথের এগারো দিন লাগিল। যা হোক, কাজকর্ম সব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

কলিকাতায় ফিরিয়াই সোমনাথ রত্নাদের বাড়ী গেল। আজ রত্নার দাদা বাড়ীতে ছিলেন। বয়স গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, জামাইবাবুর সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা বেশী করেন না। কিন্তু ভিতরে রস আছে; বর্ণচোরা আম।

ধেবেশবাবু বলিলেন,—'সেদিন এসেছিলে, দেখা হয়নি। এস তোমার সঙ্গে গল্প করি।' বলিয়া নিজের বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন।

দুজনে উপবিষ্ট হইলে ধেবেশবাবু বলিলেন,—'শুনলাম তুমি সিমেমা ছেড়ে দিয়েছ?'

'আজ্ঞে হাঁ।'

'টাকা তো বেশ পাচ্ছিলে; নামও যথেষ্ট হয়েছে, হঠাৎ ছেড়ে দিলে যে! আর কি ভাল লাগল না?'

'আজ্ঞে না। সময় থাকতে ছাড়াই ভাল।'

ধেবেশবাবু একটু হাসিলেন,—'বেশ বেশ। কোনও জিনিসেই মোহ থাকা ভাল নয়।'

সোমনাথ নীরব রহিল। ধেবেশবাবু তখন বলিলেন,—'রত্না অনেক দিন ধ'রে ভুগছে, ও আমাদের বড় আদরের বোন; তারি জ্বর হয়েছিল। রোগটা কিছুতেই ধরতে পারছিলাম না। এখন মনে হয় ধরেছি।'

সোমনাথ সপ্রশ্ন নেত্রে চাহিল। ধেবেশবাবু উঠিয়া পায়চারি করিতে লাগিলেন, তারপর বলিলেন,—'দেহের রোগ নয় মনের রোগ। সেদিন তুমি তাকে দেখে গিয়েছিলে তো, আজ আবার দেখলেই বুঝতে পারবে। আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল, বোম্বাই থেকে ফিরে আসবার পরই তার রোগের সূত্রপাত হয়। মনের মধ্যে অনেকগুলো ঘুঁটি পাকিয়েছিল। যাহোক, এখন বোধহয় সেগুলো পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে।'

সোমনাথ নিরুত্তর রহিল। ধেবেশবাবু আবার আসিয়া বসিলেন; বলিলেন—'সোমনাথ, তুমি যদি রত্নাকে বিয়ে করতে চাও আমাদের কোনও আপত্তিই হবে না; বরং আমরা খুব খুশী হব।'

সোমনাথ কিছুক্ষণ হেঁট মুখে বসিয়া রহিল, তারপর আস্তে আস্তে বলিল,—'আপনি বোধ হয় জানেন না, আগে একবার এ প্রস্তাব হয়েছিল; কিন্তু রত্না—'

ধেবেশবাবু বলিলেন,—'রত্না বড় অভিমানী মেয়ে। সে সময় হয়তো ওর মনে ক্ষোভের কোনও কারণ হয়েছিল। যা হোক, সে সব কেটে গেছে।' একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—'ওর স্বভাব, যে জিনিস ও মনে মনে চায় প্রাণ গেলেও তা মুখ ফুটে চাইবে না। আমি জানতে পেরেছি, তোমাকেই ও বিয়ে করতে চায়। এখন তোমার হাত।'

সোমনাথ আরক্ত মুখ উঠিয়া দাঁড়াইল।

ধেবেশবাবু বলিলেন,—'হাঁ, যাও। রত্না ওপরেই আছে। মনে

রেখো, রোদ্দুরে অনেক সময় ঘোরা করে ওকে খাওয়াতে হয়।' বলিয়া একটু হাসিলেন।

সোমনাথ উপরে গেল।

রত্নাকে দেখিয়া সে চমৎকৃত হইয়া গেল। এই কয় দিনে তাহার কী অপূর্ব পরিবর্তন হইয়াছে! দেহের দেবে পাতা ঝরিয়া নগ্ন শুষ্ক শীর্ণ আকার ধারণ করে, আবার নব-কিশলয়ে তাহার সর্বাঙ্গ ভরিয়া যায়। রত্নার মুখের সেই রুচ় অথচ সুকুমার ভৌল ফিরিয়া আসিয়াছে; গাল দুটিতে নব পল্লবের কোমল অরুণিমা।

রত্না নত হইয়া সোমনাথের পদধূলি লইল; একটু ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল,—'সেদিন তোমাকে পেন্নাম করতে ভুলে গিয়েছিলাম।'

সোমনাথের সংবর্ধনা মুসুরির মতো পথ করিতেছে; প্রথম যেদিন সে ভ্যাম্পেয়ার ও মাইকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল সেদিনও এত ভয় হয় নাই। কিন্তু সে সংযত ভাবে একটি গদি মোড়া চেয়ারে গিয়া বসিল; গম্ভীর মুখে বলিল,—'ভুল সকলেই করে। কিন্তু সময়ে শুধরে নেওয়া চাই।'

রত্না তাহার প্রতি একটি চকিত দৃষ্টিপাত করিল; পরে সোফার এক কোণে বসিয়া বলিল,—'এই বুঝি তোমার এক হপ্তা পরে আসা? কোথায় যাওয়া হয়েছিল?'

সোমনাথ বলিল,—'সেঁদির বনে।'

রত্না চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিল।

'সে কি! শিকারে গিয়েছিলে?'

'উঁ।'

'তবে?'

সোমনাথের স্নায়ুমণ্ডলী এতক্ষণে কিছু শান্ত হইয়াছে, কণ্ঠস্বরও বেশী গদ্গদ করিতেছে না। সে উঠিয়া গিয়া সোফায় রত্নার পাশে বসিল।

'রত্না, তোমাকে একটা খবর দিই। আমি সুন্দরবনে পাঁচশো বিঘে জমি কিনেছি। খুব ভাল ধান জমি। আর কী সুন্দর বাগান! চারদিকে নদী আর জঙ্গল। কলকাতা থেকে জলপথে চার ঘণ্টার রাস্তা। এবার সেইখানে বসে চাষবাস করব।'

রত্না যেন বুদ্ধিভ্রষ্টের মতো চাহিয়া রহিল। শেষে ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল,—'চাষবাস করবে? কিন্তু—চাষবাসের তুমি কী জানো?'

কিছু জানিনা। যখন সিনেমা করতে গিয়েছিলাম তখন সিনেমার কিছুই জানতাম না। শিখেছি। এও শিখব। আমি ট্র্যাক্টর কিনেছি, বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাস করব। একটা মোটর-লঞ্চ কিনেছি, যখন ইচ্ছে হবে কলকাতায় চলে আসব।'

কিন্তু চাষবাস কেন? অন্য কোনও কাজ কি করতে পারতে না?'

'আমি সৃষ্টি-ধর্মী কাজ করতে চাই। যাঁরা প্রতিভাশালী তাঁরা অনেক বড় বড় সৃষ্টি করেন, তাঁদের সৃষ্টি দেশের সম্পদ। আমার প্রতিভা নেই, কিন্তু শস্য উৎপাদন তো করতে পারব। আমার পাঁচশো বিঘা জমিতে বছরে অন্তত পাঁচ হাজার মণ ধান হবে। সব ধান আমি একলা খেতে পারব না, বেশীর ভাগই দেশের লোকের পেটে যাবে। দেশের অন্ন-সম্পদ বাড়বে। সেটাই কি কম কথা?'

রত্না অনেকক্ষণ নতমুখে চুপ করিয়া রহিল। সোমনাথ দেখিল তাহার মুখে ফেতাভা ও রক্তাভা পর্যায়ক্রমে যাতায়াত করিতেছে। সে চঞ্চল হইয়া বলিল,—'আমি যা করতে যাচ্ছি তা কি তোমার ভাল লাগছে না?'

রত্না একটি নিশ্বাস ফেলিয়া ম্লান হাসিল; বলিল,—'খুব ভাল লাগছে—'

উৎসাহিত হইয়া সোমনাথ বলিল,—'আমি সেখানে একটি ছোট বাড়ী করাচ্ছি রত্না। মাত্র দুটি ঘর; তারের বিয়ে রান্নাঘর। আর বাড়ী ঘিরে বাগান। কেমন, সুন্দর হবে না?'

'তা হবে। কিন্তু—'

'কিন্তু কি?'

রত্না নিজের চুড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল,—'তুমি সারা জীবন সহরে কাটিয়েছ, গত তিন বছর হাজার লোকের মধ্যে কাজ করেছ। দেশ-জোড়া তোমার সুখ্যাতি। এখন সব ছেড়ে ঘিরে ঐ বনে জঙ্গলে কি তোমার মন লাগবে?'

সোমনাথ রত্নার একটি হাত নিজের হাতে তুলিয়া লইল, গাঢ়স্বরে বলিল,—'লাগবে, যদি একটি মেয়ে আমার সঙ্গে থাকে।'

রত্না সোমনাথের মুঠি হইতে নিজের হাত টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সোমনাথ হাত ছাড়িল না। তখন রত্না ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সোমনাথ বলিল,—'কান্নাকাটি কিছু শুনব না। আমাকে বিয়ে করতে হবে; ঐ জঙ্গলে গিয়ে থাকতে হবে। যদি রাজি না হও জোর করে ধরে নিয়ে যাব। তোমার বাবা কিছুই বলবেন না।'

রত্না দুই হাতে চোখ মুছিবার চেষ্টা করিয়া ভাঙা গলায় বলিল,—'তুমি জানো না, আমার টীবি হয়েছে। বাবা মুখে বলেন না, কিন্তু আমি জানি।'

সোমনাথ তাহাকে আরও কাছে টানিয়া আনিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল,—'তুমি কিছু জানো না। তোমার যা হয়েছে তা বাবা আমাকে বলেছেন। দেহের রোগ নয়, মনের রোগ। মনে মনে প্রেম, আর মুখে ঝগড়া করলে ঐ রোগ হয়। বুঝলে?—যাহোক, ঠিক সময়ে ওষুধ পড়েছে, এবার আর রোগ থাকবে না। ওষুধ যে ধরেছে তার লক্ষণও এরি মধ্যে দেখা যাচ্ছে—' বলিয়া তাহার গালে আঙুলের মৃদু টোকা দিল।

মেয়েরা সময় বিশেষে কাঁদিয়া বড় আরাম পায়। রত্না প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে সোমনাথ যেন কতকটা আত্মগতভাবেই বলিল,—'কাল সকালেই বিবিকে 'তার' করতে হবে। বিবি আর আগাইবাবু যতক্ষণ না আসছেন ততক্ষণ কিছুই হবে না।'

৪

ফুলশয্যার রাত্রে ঘর অন্ধকার করিয়া দু'জনে শুইয়াছিল। মধ্যরাত্রির পর বাড়ী নিস্তব্ধ হইয়াছে; ফুলের গন্ধে রুদ্ধশ্বাস বাতাস নিঃশব্দ সঞ্চারে জানালা দিয়া যাতায়াত করিতেছে। আকাশের খণ্ডচন্দ্র অনেকক্ষণ অস্ত গিয়াছে।

অন্ধকারে রত্নার একটা হাত সোমনাথের বুকে আসিয়া পড়িল। রত্না মৃদুস্বরে বলিল,—'তুমি আমাকে ধন্য করিয়েছ।'

সোমনাথ তাহার হাত মুঠিতে লইয়া বলিল,—'আমি জানিয়েছি; তা তো বটেই।—আচ্ছা রত্না, কবে তোমার এই দুর্বুদ্ধি হল, মানে কবে তুমি আমাকে ভালবাসলে ঠিক করে বলো তো।'

'দশ বছর বয়সে।'

'উঃ, কী পাকা মেয়ে!'

'মেজদার বিয়ের ফুলশয্যার দিন তোমাকে প্রথম দেখি, তুমি বৌদির সঙ্গে এসেছিলে। সেই দিনই মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না।'

'প্রথম দর্শনেই এত! তারপর?'

'তারপর আট বছর অপেক্ষা করলাম। ঠিক করেছিলাম আই এ পর্যন্ত পড়ব, তারপর বিয়ে। যখন বিয়ের সময় হল তখন দেখি তুমি বিলেতে ডুবে পড়েছ।'

'তাতেই বুঝি মেজাজ বিগড়ে গেল?'

'মোটাই মেজাজ নিজের চোখে দেখতে। যা দেখলাম তাতে মন আরও বিষিয়ে গেল। তারপর এই তিন বছর যে আমার কি করে কেটেছে তা আমিই জানি।'

সোমনাথ বলিল,—'আমার ওপর যদি তোমার মন বিষিয়েই গিয়েছিল তবে লুকিয়ে লুকিয়ে আমার ছবি দেখতে কেন?'

'তোমাকে না দেখে থাকতে পারতাম না। ছবিতে তোমাকে দেখতাম আর ভাবতাম—তুমি কি ভাল আছ? নষ্ট হয়ে যাওনি?—সেবার সেই ঝড়ের রাত্রে গিয়ে পৌঁছলাম; সে রাতটা ভুলব না—'

সোমনাথ বলিল,—'আমিও না।'

রত্না বলিতে লাগিল,—'সে রাত্রে যদি তুমি আমাকে চাইতে, আমি বোধহয় না বলতে পারতাম না? কিন্তু তুমি ও দিক দিয়ে গেলেনা। আমি কি করব? আমি কি বলব ওগো তুমি আমায় বিয়ে কর?'

তাহলে সে রাত্রে আর তোমার সন্দেহ ছিল না?'

'সন্দেহ যায়নি। কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম, ভাল হও মন্দ হও তুমি ছাড়া আমার গতি নেই।'

সোমনাথ তাহাকে কাছে টানিয়া আনিল।

'এখন সন্দেহ গেছে তো?'

রত্না তাহার বুকে মুখ রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সোমনাথ বলিল,—'রত্না, আমি হয়তো শেষ পর্যন্ত নষ্ট হয়েই যেতাম, যদি তুমি আমার মনের মধ্যে না থাকতে। তুমিই আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছ।'

তারপর দীর্ঘকাল আর কোনও কথা হইল না। স্বামীর বলিষ্ঠ বাহুবন্ধনের মধ্যে চোখ বুজিয়া রত্না ভাবিতে লাগিল, পূর্ব জন্মে কোন্ পুণ্য করিলে মানুষ এত সুখ অনুভব করে?

* * *

একটি মোটর লঞ্চ নদীর রবিকরোজ্জ্বল বুক চিরিয়া বক্ষিণ মুখে চলিয়াছে! বক্ষক্ষ ফেণে ছুটিতেছে; যেন উড়িয়া চলিয়াছে।

দুই তীরের দৃশ্য পিছনে পড়িয়া রহিল; গ্রামগুলি কিছু দূর আসিয়া থামিয়া গেল। কেবল রহিল উপরে নিঃসীম নীল আকাশ, আর নীচে সুজলা শ্যামলা বঙ্গভূমি।

নদী ক্রমে সঙ্কীর্ণা হইল; আঁকিয়া বাঁকিয়া শাখা বিস্তার করিয়া খোলক-খাঁড়ার সৃষ্টি করিল। কিন্নরবেগা তরুণী তাহারই বুকে বুকে পথ চিনিয়া চলিয়াছে; যেন বন-কপোত নিজ নীড়ের সন্ধানে উড়িয়া যাইতেছে। অতি নির্জনে লোকচক্ষুর অন্তরালে ক্ষুদ্র একটি নীড় সেই নীড়ে সে ফিরিবে—তাহাতে কেবল দুইটি পাখীর স্থান—

চারিদিকে আলো ও ছায়ার লুকোচুরি। কোথাও আলো বেশী, ছায়া কম; কোথাও আলো কম, ছায়া বেশী। আলোতে ছায়াতে মিলিয়া বিচিত্র চঞ্চল ছবি আঁকিয়া চলিয়াছে।

অনন্তকাল ধরিয়া আঁকিতেছে, অনন্তকাল ধরিয়া আঁকিবে।

শেষ

অক্ষরাণাং অকারোঽস্মি

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

গীতার বিভূতিযোগ অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন "অক্ষরাণাং অকারোঽস্মি."—আমি অক্ষরবিশের মধ্যে অকার। আচার্য শংকর স্বকীয় ভাষ্যে ইহাকে বিশদীকৃত করেন নাই। শ্রীধর স্বামীর ভাষ্যে আছে, "বর্ণানাং মধ্যে অকারোঽস্মি, তস্য সর্ব্ব-বাঙ্ময়রূপত্ব প্রেক্ষয়া। তথাহি শ্রুতিঃ—অকারো বৈ সর্ব্বাবাক্, তৈষ স্পর্শোষ্মভিঃ ব্যজ্যমানা বহ্বী নানারূপা ভবতী পুরুষস্য ইতি প্রেক্ষয়া।" অর্থাৎ "বর্ণবিশের মধ্যে আমি অকার। অকার সমস্ত বাঙ্ময় বলিয়া শ্রেষ্ঠ, সেই জন্য। শ্রুতি বলিয়াছেন, অকারই সর্ব্ববাক্। অকারই স্পর্শ ও উষ্ম প্রভৃতি দ্বারা প্রকাশিত হইয়া বহুসংখ্যক ও বহুরূপ হইয়া থাকে। সেই জন্যই ইহার শ্রেষ্ঠত্ব।" বিভূতি যোগ অধ্যায়ে ভগবান যাবতীয় শ্রেষ্ঠ পদার্থকেই স্বকীয় রূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণবিশের মধ্যে অকারই শ্রেষ্ঠ বর্ণ বলিয়া আপনাকে অকারও বলিয়াছেন। এই ভাবে দেখিলে শ্রীধরস্বামীর অর্থ সঙ্গত মনে হয়। কিন্তু একটা সূক্ষ্মতর অর্থও সম্ভবপর।

বাক্-যন্ত্র হইতে যত প্রকার ধ্বনি নির্গত হয়, তাহার বিশ্লেষণ করিয়া বৈয়াকরণিকগণ কতকগুলি মৌলিক ধ্বনির আবিষ্কার করিয়াছেন। বর্ণমালার বর্ণগুলিই সেই মৌলিক ধ্বনি। এই মৌলিক ধ্বনিগুলিকে বুঝাইবার জন্য তাঁহারা প্রত্যেক ধ্বনির চক্ষুগ্রাহ্য চিহ্নেরও নির্দেশ করিয়াছেন। মানসিক ভাব নিজের নিকট স্পষ্টীকৃত ও অন্যের নিকট প্রকাশিত করিবার জন্য ধ্বনি ব্যবহৃত হয়। সেই ধ্বনি লিখিত অক্ষর দ্বারা রূপায়িত হয়। মানসিক ভাবের সহিত তৎপ্রকাশক ধ্বনির সম্বন্ধ, এবং ধ্বনির সহিত তৎপ্রকাশক অক্ষরের সম্বন্ধ আমরা যদৃচ্ছাকৃত—মানুষের সুবিধার জন্য মানুষেরই সৃষ্ট বলিয়া মনে করিয়া থাকি। একই পদার্থ বুঝাইতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে, বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়, এবং একই ধ্বনি প্রকাশ করিতে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন লিপি ব্যবহৃত হয়, দেখিয়া মানসিক ভাব ও তৎপ্রকাশিত ধ্বনি, এবং ধ্বনি ও লিপির সম্বন্ধ মনুষ্যকৃত (Conventional) মনে করাই স্বাভাবিক। কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন বাক্য ও অর্থের মধ্যে সম্বন্ধ, এবং বাক্য ও লিপির মধ্যে সম্বন্ধ নিত্য। জাগতিক যাবতীয় দ্রব্য রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত, এবং ইহাদের প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের অন্যান্যের এক একটি রূপ আছে। বর্ণ (রং) চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, কিন্তু প্রত্যেক মৌলিক বর্ণের একটি শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য রূপও আছে, যাহা ধ্বনি মাত্র। প্রত্যেক চক্ষুগ্রাহ্য আকারেরই (form) একটি শ্রবণ-গ্রাহ্য রূপ আছে, যাহা ধ্বনি মাত্র। ধ্বনি দ্বারা সেইরূপ শ্রবণ-গ্রাহ্য হয়। যৌগিক দ্রব্য সকলের অন্যান্যরূপ যৌগিক ধ্বনির সমবায়ে গঠিত হয়। গীতার বক্তা স্বয়ং ভগবান্। ভগবান বলিতে যাহা বুঝায় "অকার" তাহার অন্যান্যরূপ। তাই ভগবান্ আপনাকে অকার বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন।

George Russel প্রথিত-নামা সাহিত্যিক। তিনি কবি ও কলাকৌশলী চিত্রকর। A. E এই ছদ্ম নামে তিনি পরিচিত। তিনি বলেন "The true roots of language are vowels and consonants, each with affinity to idea, form, colour and form, the variest abstractions of these, but by their union into words, expressing more complex notions as atoms and molecules by their union form the compounds of the chemist.....The roots of human speech are the sound correspondences of powers, which in their combination and interaction, make up the universe. The mind of man is made in the image of the Deity, and the elements of speech are related to the powers in his mind, and through it, to the being of the Overmind (Candle of Vision 1920 Edition, p p. 120-121)। অর্থাৎ স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলিই মানুষের ভাষার প্রকৃত মূল। প্রত্যয় (idea) শক্তি, বর্ণ ও আকারের (form) সহিত,—ইহাদের বিশুদ্ধতম রূপের সহিত—স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলির সাদৃশ্য আছে। পরস্পরের সংযোগ দ্বারা শব্দ গঠিত করিয়া তাহারা জটিলতর ভাব প্রকাশিত করে, যেমন অণু ও পরমাণুর সংযোগে রাসায়নিক যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয়।...যে সমস্ত শক্তির সংযোগ ও পরস্পরের উপর ক্রিয়া দ্বারা এই বিশ্ব গঠিত, মানবীয় ভাষার যৌগিক ধ্বনিগুলি তাহাদের প্রতিরূপ। মানবের মন ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট। মানবের মনে যে সকল শক্তি আছে, ভাষার মূলগুলি তাহাদের সহিত, এবং সেই সূত্রে পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধ।"

George Russel আরও বলেন "The first root (of language) is A—the sound symbol for the self in man, and the Deity in the cosmos—ভাষার যৌগিক ধ্বনি সকলের প্রথমটি "অ"—মানবাত্মার, ও ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরের প্রতীক।

কিন্তু ইহার প্রমাণ কি? Russel বলেন তিনি পরীক্ষা করিয়া এই মতের সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছেন। বর্ণমালার এক একটি বর্ণ লইয়া শব্দীর মনঃসংযোগ (পাতঞ্জল দর্শনের "সংযম") সহ তাহার চিন্তা করিতে করিতে মনের মধ্যে তাহার ফল লক্ষ্য করিয়াছিলেন।" সংযমের সময় তিনি এক একটি ধ্বনি রূপ করিয়াছিলেন, এবং তাহার ফলে যে অনুভূতি, যে বর্ণ, যে আকার অথবা প্রত্যয় তাঁহারা মনে উদিত হইয়াছিল, তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় গূঢ়শাস্ত্রের (mystical literature) উল্লেখ করিয়া Russel বলিয়াছেন, যে

তিনি পরীক্ষা দ্বারা রূপ, বর্ণ ও শক্তির সহিত বিভিন্ন ধ্বনির যে সাদৃশ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার সহিত ভারতীয় শাস্ত্রের সম্পূর্ণ মিল না থাকিলেও, অনেক স্থলে মিল আছে। উদাহরণ স্বরূপ তিনি গীতায় "অক্ষরাণাং অকারোঽস্মি"—উক্তির উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, ইহার সহিত তাঁহার পরীক্ষালব্ধ ফলের মিল আছে। "শিবাগম" গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, ইহার সহিত তাঁহার পরীক্ষালব্ধ ফলের আংশিক মিল আছে। শিবাগমে 'র' বর্ণকে অগ্নির প্রতীক, এবং ত্রিকোণ বলা হইয়াছে। Russel ধ্বনিও 'র' ধ্বনিকে রক্তবর্ণ ও অগ্নির প্রতীক রূপে পাইয়াছিলেন, উহার আকার ত্রিকোণাকারে প্রাপ্ত হন নাই।

প্রকৃতি পরমাত্মার ব্যক্ত মূর্ত্তি। স্বরূপে জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন। প্রকৃতি ও জীবাত্মার মধ্যে এই সাদৃশ্য আছে বলিয়াই প্রকৃতি মানবের জ্ঞানগম্য এবং মানবপ্রকৃতির মধ্যে স্বাজাত্য উপলব্ধি করে। মানবসৃষ্টির প্রথমাবস্থায় আর্য্য ঋষিগণ এই স্বাজাত্য অনুভব করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইতেন। তাঁহাদের আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত্ত মূর্ত্তি বেদ ও উপনিষদে প্রতিফলিত। প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ ও স্পর্শ তাঁহারা সর্ব্বাঙ্গ দিয়া উপভোগ করিয়াছিলেন, সেই উপভোগের আনন্দ তাঁহাদের কণ্ঠ হইতে ভাষারূপে স্বতঃ নির্গত হইয়াছিল। তখন ভাষা যে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা সেই ভাষায় বর্ণিত পদার্থের স্বাংসিদ্ধ রূপ, প্রত্যেকেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ধ্বনিরূপ। বিশ্বকর্ম্মা কবি, বিশ্ব তাঁহার কণ্ঠের বাণী! বিশ্বের প্রত্যেক মৌলিক পদার্থ—প্রত্যেক মৌলিক বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ, শব্দ ও স্পর্শ—তাঁহার বাণীর এক একটি অক্ষর, সেই সকল অক্ষরের সমবায়ে বিশ্বকাব্য রচিত। সেই কাব্যের বর্ণমালা কোনও কোনও দেশে মানুষ অভিজ্ঞা (intuition) দ্বারা লাভ করিয়াছিল। আর্য্য ভাষাগুলির মূল ধাতু ও প্রকৃতির গবেষণা দ্বারা George Russel এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। জগতের কোনও কোনও জাতি অন্তর্মুখী, কোনও কোনও জাতি বহির্মুখী। অন্তর্মুখী জাতির কেহ কেহ আপনাদের অন্তরে আলোকের সন্ধান করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে ধ্বনি ও পদার্থের মধ্যে সম্বন্ধ তাহাদের মনে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু সকল জাতির ভাষাই অভিজ্ঞা-প্রসূত (Intuitional) নহে। কোথাও কোথাও বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে বুদ্ধির দ্বারা ভাষা সৃষ্ট হইয়াছিল। সেই সকল ভাষার বাক্য ও অর্থের সম্বন্ধ নিত্য নহে। অভিজ্ঞা-জাত ভাষাতে যেখানে শব্দের রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, সেখানেও সে সম্বন্ধ রক্ষিত হয় নাই।

কলম

শ্রীসমরেশচন্দ্র রুদ্র এম-এ

সেদিন এক ব্যাঙ্কার বন্ধুর চেম্বারে বসেছিলুম। বাইরে জাপ গাড়ী থামিয়ে এক আমেরিক্যান মিলিটারী ঢুকল। চেহারাটা সুশ্রী, হয়তো সেখানকার কোন ভাল বাড়ীরই ছেলে। আভিজাত্য রক্ষার জন্যে নিউইয়র্কের একটা ব্যাঙ্কের চেকবই বার করে জানতে চাইলে, যদি একটা চেক কেটে দেওয়া হয়, এখনি তার বদলে টাকা দেওয়া যায় কিনা। তা দেওয়া সম্ভব নয় শুনে অল্প দু চারটে সাধারণ কথা কয়ে উঠে পড়ল। যাবার জন্যে এক পা বাড়িয়ে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে পকেট থেকে একটা কলম বার করে বললে, এই দেখ, কলমটা নেবে, একেবারে নতুন, ভাল কলম।

কলমটা কেনা হল। আমি অনেক দিন থেকে একটা ভাল কলম খুঁজছিলুম বলে বন্ধু আমাকেই দিলেন। যুদ্ধের সময় একান্ত দুষ্প্রাপ্য জিনিসটি এমনভাবে পেয়ে আমার বড় আনন্দ হল।

সত্যি কলমটা সুন্দর এবং নতুন। সময় সময় কলমটার দিকে চেয়ে আমার মন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। তার ফিকে নীল রঙের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আমার মন নীলাকাশ বেয়ে উড়তে উড়তে সুদূর আমেরিকার এক পল্লীপ্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হয়। তরুণী তার প্রবাসীর কথা চিন্তা করছে, কদিন চিঠি না পেয়ে মন বড় ব্যাকুল হয়েছে। রোজ একখানা করে দেবার কথা ছিল, কয়েক মাস যাবার পর সেটা সাত দিনে একখানা করে দাঁড়ায়, এখন একেবারে এক মাস কোন খবরই নেই। দূরে গিয়ে মিলিটারী জীবনের কোলাহলে পাছে তাকে চিঠি লিখতে সব সময় মনে না থাকে, সেইজন্যে এই কলমটি কিনে প্রেমাস্পদের পকেটে লাগিয়ে দিয়ে বলেছিল, এই কলমটা দেখলেই আমার কথা তোমার মনে পড়বে, এই কলমটা দিয়েই আমাকে চিঠি লিখো।

হেসে বলেছিল প্রবীর, কলম তো দিলে, যদি কালি

ফুরিয়ে যায়? উত্তর করেছিল চম্পকবরণী, যেখানেই যাও, ভর পাবে তো, সেই জলে ডুবিয়ে নিবে লিখো, আমি ঠিক পড়ে নেব।

যদি তাও না মেলে, তাহলে কিসে লিখব? চোখের জলে? বল।

আমার এত ভাগ্য—বলে হেসে কণ্ঠলগ্ন হতে গেছল শ্রীমতী, মাথায় হঠাৎ প্রেমাস্পদের পেনটাই লেগেছিল আগে। উঃ, কেমন বাধা দিচ্ছে দেখ!

তাইতো, এমন ভালবাসার স্মারকচিহ্নকে হয়তো মাত্র এক বোতল সুরার জন্যে এমনভাবে ছেড়ে দিয়ে গেল! এখনও যেন তার স্নেহকোমল করস্পর্শ আমি কলমটিতে পাচ্ছি।

কিন্তু কলমটাতে কেমন যেন বারুদের গন্ধ মনে হচ্ছে। তা আশ্চর্য নয়, কত যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটেছে পকেটে, কত কামানের গোলার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়েছে, কত সেনের প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মধ্যে শঙ্কিত চিত্তে কেঁপেছে। কত সময় রিভলবারের পাশাপাশি থেকে প্রহর গুণেছে।

কোথা থেকে যেন সুরার গন্ধ আসছে। বোধ হয় নিবটা থেকে। তা হতে পারে। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, হয়তো ট্রেঞ্চে কেটেছে, বেরোবার উপায় নেই। এমন সময় হয়তো প্রিয়াকে মনে পড়েছে; চিঠি লিখতে গিয়ে দেখে, কালি ফুরিয়েছে। উপায়ান্তর না পেয়ে হয়তো পানপাত্রেই নিবটা ভিজিয়ে লিখতে গেছে।

সত্যি, কি বিকৃত এই কলমটির অভিজ্ঞতা! কত উর্মিময় সমুদ্রের কলোচ্ছ্বাস এটি হাতে নিলে আমি শুনতে পাই। এর ফিকে নীল রঙের দিকে চাইলে আমার মনে পড়ে নীলাকাশ ভেদ করে এরোপ্লেনের তীব্র গতি। স্বর্ণাভ নিবটির দিকে চোখ পড়লে মনে ভাসে দিকচিহ্নহীন মরুভূমি।

সত্যি, আজকালকার অত্যন্ত ব্যস্ত জীবনের সত্যকার লেখনী হচ্ছে ফাউনটেনপেন। কলম মসীপাত্রে রাখবার সময় নেই, চিন্তার সময় নেই, দ্রুতগতিতে দিতে হবে কালির আঁচড়। অস্থির প্রতীচি-জীবনের সঙ্গে ফাউনটেন-পেন ষোল আনা খাপ খায়, আমাদের স্বভাবত ধীর ভারতীয় জীবনের সঙ্গে এখনও তার পুরোপুরি মিল হয়নি।

লিখি আর না লিখি, কলমটা টেবিলে সাজান আছে দেখতে আমার ভাল লাগে। আমার সাধারণ লেখার সময় আমি আর একটি কলম ব্যবহার করি, সেটিও মসীবাহন, তবে কিছুদিন আগে কেনা এবং এতটা মূল্যবান নয়। সময় সময় আমি পড়তে পড়তে থেমে গিয়ে একটা লেখার প্লট চিন্তা করতে থাকি এবং মাঝে মাঝে আমার সুন্দর কলমটির দিকে চাইতে থাকি। কলমটি যেন আমাকে অভয় দিতে থাকে, যত শক্ত ও জটিল সমস্যাই রচনা করা না কেন, সে সাবমেরিন-সঙ্কুল সমুদ্র যেমন সহজভাবে পার হয়ে এসেছে, তেমনি স্বাবলীলভাবে সেই সব সমস্যা অতিক্রম করে যাবে।

অনেক লেখকেরই তাঁদের কোন একটি কলমের উপর অত্যন্ত প্রীতি থাকে। বিশেষ কিছু লেখার সময় তাঁরা তাঁদের বেশী প্রিয়টিকেই বেছে নেন, সেটি যেন অনেক সেঞ্চুরি-করা ব্যাটসম্যানের পছন্দসই ব্যাট, না নিয়ে খেললে হারবার ভয়। পাছে কোন ক্ষতি করে বসে কলমটির, এই ভয়ে সেটি তাঁরা অতি নিকট-আত্মীয় বা পরম বন্ধুকেও দিতে চান না কিছু সময়ের ব্যবহারের জন্যে।

আমার এ কলমটি আমি সর্বদা সাবধানে রাখবার চেষ্টা করি। কিন্তু চেষ্টা করলে কি হবে, সব সময় পুত্রকন্যার তীক্ষ্ণ চক্ষু এড়াতে পারি না। টেবিলে আমার অন্য কলমটা পড়ে থাকলে ততটা তাদের লক্ষ্য হয় না, এমন কি তাদের মায়ের কলমটাও তাদের তেমন আগ্রহ সঞ্চার করে না, যত ব্যাকুলতা সৃষ্টি করে এই কলমটি। একবার ছেড়ে গেলেই হল! কেউ না কেউ নিশ্চয়ই নিয়ে বসেছে।

সব চেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার, আমার স্ত্রী তাঁর নিজের একটি সুদৃশ্য কলম থাকতেও এই কলমটিতে বাজারের হিসেব লিখতে ভালবাসেন। তাঁর বান্ধবীদের এক আধটা চিঠি যেন এতে, বা সাময়িক পত্রিকা ইত্যাদি থেকে কোন কিছু দরকারী কথা লিখে রাখেন, তাতে তত ক্ষতি হয় না, কিন্তু বাজারের বা ধোপার হিসেব লেখা এই কলমে—এ যে এরোপ্লেন দিয়ে বাবিশ বওয়ান! তাঁর কাছে এ নিয়ে কথা তুললে তিনি বলেন, তোমার রোমান্টিক যুদ্ধফেরৎ লেখনীকে সংসারী করেছি।

তা হবে। হয়তো তা অনুচিতও নয়, কারণ সেই

সৈনিক হয়তো এতদিন একেবারে সংসারী হয়ে গেছে; তার কলম একটু সংসারী হবে, তাতে আর ক্ষতি কি! প্রিয়ার কাছে তার দেওয়া সেই কলমটি যুদ্ধক্ষেত্রে কোথায় হারিয়ে গেছে বলে দুঃখ প্রকাশ করে আবার একটা কলম কিনেছে; হয়তো এইটারই মত সম্পূর্ণ দেখতে। আশ্চর্যের বিষয় কিছুমাত্র নয়, সেই সৈনিক, অবশ্য এখন আর সৈনিক নয়, এখন এক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, তার অফিসে বসে অত্যন্ত সাধারণ চিঠিপত্র সেই কলমে লিখছে।

কিন্তু এক আধ সময় এখনও কি আকস্মিক অন্যমনস্কতায় সৈনিকটি কলমটা সুরাপাত্রে ডুবোতে যায় না? হয়তো যায়, কিন্তু চকিতে চোখের সামনে ভেসে উঠে প্রিয়ার বদলে গৃহিণী! মানুষের জীবনে নিত্য পরিবর্তন। কিন্তু কোথা থেকে সুরার গন্ধ আসছে না?

রাষ্ট্রভাষা ও পরিভাষা

অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

বাংলা রাষ্ট্রভাষা হবে এ স্বপ্ন একদিন আমরা বাঙালিরা দেখেছিলাম, কিন্তু যখন আমরা উপলব্ধি করলাম যে ঘটনা স্রোত আমাদের সম্পূর্ণ প্রতিকূল, তখন আমরা আধার হেলায় সম্পূর্ণ হাল ছেড়ে দিয়েছি। ভারতের সংবিধান পরিষদে ভারতের রাষ্ট্রভাষা নির্বাচনের কাল আসন্ন—রাষ্ট্র ভাষা সম্বন্ধে বাঙালির এখন এতটা নিরুদ্বিগ্ন থাকা অনুচিত।

প্রবল যুক্তিতর্কের অবতারণা করেও বাঙালি একটি মাত্র কারণে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি সংরক্ষণ করেছেন। তাঁরা অনুভব করেছেন, হিন্দী বা হিন্দুস্থানী বহু পূর্বেই কেমন ক'রে ভারতের সর্বত্র তার আসন বিস্তার ক'রে নিয়েছে। উত্তর ভারতে পাঞ্জাবী, মারোয়াড়ী, গাড়োয়ালী, আউধী, ছত্রিশগড়ী, ভোজপুরী, মৈথিলী, মালবী, রাজস্থানী প্রভৃতি ভাষার যাঁরা ঘরে কথা বলেন, পোষাকি ভাষা হিসাবে সভা-সমিতিতে, বিদ্যালয়ে, সাহিত্যে তাঁরা হিন্দী ভাষা ব্যবহার করেন,—এই ভাবে বিহার থেকে রাজস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের ভাষা হয়ে পড়েছে হিন্দী বা হিন্দুস্থানী। এখন এই ভাষা যাঁরা ব্যবহার করছেন, তাঁদের সংখ্যা হবে মোটামুটি ১০ কোটি। এ ছাড়া ইংরাজী না জানলে ভিন্ন প্রদেশের ভিন্নভাষাভাষী জনসাধারণ ভাঙা হিন্দীতেই ভাব বিনিময় করেন। বহু স্থানে বাংলা দেশের গ্রামেও কুলি-মজুর হিন্দুস্থানী হ'লে তার সঙ্গে ভাঙা হিন্দীতেই কথা বলা হয়। যেন বিভাগের আগে শোয়ালন্দ ঘাটের হিন্দুস্থানী কুলি বাংলা ভাষা না জেনে অবাধে বাঙালি যাত্রীর সঙ্গে তাদের কাজ চালিয়ে গেছে। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম—ভারতের প্রায় সর্বত্র ভাঙা হিন্দী ছড়িয়ে পড়েছে—এ কথা অস্বীকার করা যায় না। মাত্র এই একটি বিষয় অনুভব করেই বাঙালি এই প্রসারশীল ভাষাটির পক্ষে নিজেদের দাবি ত্যাগ করেছেন।

এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে যে বহু প্রসার ও প্রচারকার্যের ফলে হিন্দী বা হিন্দুস্থানী ভাষাই আমাদের রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা লাভ করতে চলেছে, আর আমরা অধিকাংশ বাঙালিই এ বিষয়ে আমাদের মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করছি। কিন্তু বাঙালি একটা কথা বিশেষভাবে চিন্তা করেনি। হিন্দী ভাষার কয়েকটি রূপ ভেদ আছে—এই ভেদের ব্যবধানও বড় কম নয়: আমরা যাঁরা হিন্দীভাষী নই, তাঁরা হিন্দীর কোন্ রূপটিকে সহজে বরণ করতে পারি? শুধু বাঙালির নয়, সমস্ত ভারতবাসীরই বর্তমানে ভাববার এটি চিন্তা ও উদ্বেগের বিষয়।

হিন্দুস্থানের ভাষা হিন্দুস্থানী এবং হিন্দী বরাবরই একার্থক ছিল, রাজনৈতিক কারণে বর্তমানে হিন্দুস্থানী হিন্দী থেকে পৃথক হয়ে পড়েছে—এ কথায় পরে আসছি। উর্দু এবং 'খড়ীবোলী' হিন্দী এক না হলেও দুটিকে সম্পূর্ণ পৃথক ভাষা বলা চলে না—দুটি ভাষাই ভারতীয়, দুটিই সংযুক্ত প্রদেশে জাত এবং প্রধানতঃ রচিত, দুটিরই ব্যাকরণ এক, পার্থক্য মাত্র শব্দ সম্ভারে। হিন্দীতে সংস্কৃত এবং সংস্কৃতজ শব্দের প্রাচুর্য এবং উর্দুতে আরবী ফারসীর। বিহার থেকে রাজস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের পোষাকি ভাষা, লেখার ভাষা হওয়ায় হিন্দীর বিভিন্ন রচনাশৈলী আছে—অঞ্চল বিশেষে আরবী ফারসী শব্দের প্রয়োগের হারে কম বেশী আছে—এটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যে কোন অঞ্চলের হিন্দু মুসলমানে প্রায় একই ভাষায় কথা বলেন। এই ভাষাই ফারসী লিপিতে লেখা হ'লে আর আরবী ফারসী শব্দের অধিক প্রয়োগ থাকলে উর্দু নামে অভিহিত হয়। হিন্দী সাহিত্যিকদের অভিযোগ হচ্ছে—মুসলমান লেখকেরা তাঁদের রচনা-শৈলীতে হিন্দু মুসলমান জনসাধারণের ব্যবহৃত ভাষাকে ছাড়িয়ে আরবী ফারসী শব্দের প্রয়োগ এত অধিক পরিমাণে ক'রে এসেছেন যে বিশেষ শিক্ষা না থাকলে হিন্দু মুসলমান জনসাধারণের বোধের বাইরে চলে গেছে তাঁদের সে রচনা—এইভাবে লিপিভেদের সঙ্গে রচনাভেদও প্রচুর হয়ে গেছে। তাছাড়া লক্ষ্যে বিষয় ভেদও রাখা হয়ে এসেছে। দেবতাত্মা নগাধিরাজ ভারতের হিমালয়ের বর্ণনা সে সাহিত্যে দুর্লভ, আছে তার স্থানে কাল্পনিক কোহকাফের বর্ণনা, বসন্তাগমে পুষ্পে কোকিলের

ফুরফুরানির চেয়ে বাঙ্গিচার বুলবুলির সেখানে অনেক বেশী সমাদর, যাঁদের নাম করতে হলে আমরা সেখানে রামকে একবারও পাই না—পাই রহমতকে, রাগ উদারতার কথায় বসীচির বা শিবির নাম কখনও শুনি না, শুনি হাতিমের, মুশায়রা ব'লতে ও সাহিত্যে পাব দাদা, সিকন্দর, খুসরু, জমশেদ আর আদর্শ প্রেমিক বলতে পাব লৈলা-মজনু আর শিরিফরহাদ প্রভৃতিকে। হিন্দী সাহিত্যিকদের অভিযোগ, এইভাবে উর্দু যাবৎ ভারতবর্ষের মুসলমানদের একটা পৃথক সংস্কৃতি রক্ষা করা হয়ে এসেছে—যা আমরা চীন, ব্রহ্ম, শ্যাম, সুমাত্রা, রুশ প্রভৃতি দেশের ইতিহাসে দেখি না এবং এরই ফলে হয়েছে দেশবিভাগ। জনসুমির কোন সাধনার সঙ্গেই এ সাহিত্যের শিকার অন্তরের যোগ খুঁজে ওরে না।

"হিন্দুস্থানী কোই ভাষা হৈ হী নহীঁ। উসকা না কোই ব্যাকরণ হৈ, না সাহিত্য।"—হিন্দুস্থানী ব'লে কোন ভাষাই নেই, না আছে তার ব্যাকরণ, না সাহিত্য—বলছেন হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের বর্তমান সভাপতি শেঠ গোবিন্দদাস। একথা যে শেঠ গোবিন্দদাসই বলেছেন তা নয়, আরও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই একই কথা বলেছেন। এ হিন্দুস্থানী হিন্দীর নামান্তর নয়। এ হচ্ছে ভারত-বিভাগের পূর্বে দেশের মহামুভূতি লাভের উদ্দেশ্যে মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ রাষ্ট্রনৈতিক নেতাদের কল্পিত এক ভাষা—এ ভাষায় সত্যই কোন সাহিত্য নেই, এর কোন পূর্ব-ইতিহাস নেই। এর কথারূপ আছে, তা হচ্ছে কথ্য উর্দু। এ ভাষায় লিখতে গেলে লেখার উর্দু ঘেঁষা দুর্বোধ্য আরবী-ফারসী শব্দ বাদ দিতে হবে, আর হিন্দীতে আরবী-ফারসীর হার বাড়াতে হবে। বেশ বিভ্রাট না হ'লে সম্মিলিত হাই গ'ড়ে তুলতে নানা অসুবিধা সত্ত্ব ক'রেও এ ভাষাই হয়ত ভারতবাসীকে স্বীকার করতে হ'ত, কিন্তু বর্তমান রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতিতে পণ্ডিত নেহরু, শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদ, শিক্ষাবিভাগের ডাঃ তারাচাঁদ, কাকা কালেলকর প্রভৃতি ইচ্ছা করলেও ভারতের অধিকাংশ জনগণ এ ভাষাকে অস্বীকার করবে—অবশ্য তা সাম্প্রদায়িক কারণে নয়।

রাষ্ট্রনৈতিক নেতাদের কল্পনার ছাড়া হিন্দুস্থানী ব'লে একেবারেই কোন ভাষা নেই বলে একটু অত্যুক্তি করা হয়। পূর্বেই বলেছি, বিশেষ সাহিত্য না থাকলেও বাজারের বুলি হিসাবে এরকম একটা ভাষা যুক্তপ্রদেশের অঞ্চল বিশেষে চলিত আছে। এখন কথা হ'চ্ছে, এই সাধারণ আলাপ আলোচনার ভাষা বাজারের বুলি রাষ্ট্রভাষা হ'তে পারে কিনা? আমাদের রাষ্ট্রভাষাতে প্রথমত আমাদের নবরচিত শাসনতন্ত্রটুকু লিপিবদ্ধ করতেই হয়। বাজারের বুলিতে পারিভাষিক শব্দগুলি কোথা থেকে আসবে? এই রাষ্ট্রভাষা যদি আইন-আদালত, শিক্ষা, বিজ্ঞানচর্চার ভাষা হয়, তাহলে অনতিবিলম্বে অন্তত ৫০ হাজার পারিভাষিক শব্দের প্রয়োজন হবে, সে শব্দ জনসাধারণের ভাষায় কোথায়? এ ক্ষেত্রে ইংরাজী শব্দগুলি সবই অম্লান বদনে গ্রহণ করার অনুকূলে আমাদের অভিরুচি থাকলে তার চেয়ে ইংরাজী ভাষাই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করলেই সব ঝঞ্ঝাট মিটে যায়। আর যদি আরবী ফারসী এবং সংস্কৃত-সংস্কৃতম শব্দসম্ভারপূর্ণ রাজনৈতিক "হিন্দুস্থানী" রাষ্ট্রভাষাতে পরিভাষা তৈরী ক'রে নিতে হয়, সে পরিভাষা আরবী-ফারসী, না সংস্কৃত থেকে তৈরী ক'রে নেওয়া হবে? গ্রীক, ল্যাটিন, সংস্কৃত, আরবী প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার সহায়তা ছাড়া এ কাজ হবার নয়। Vice President-এর হিন্দুস্থানী কি হবে, 'সাহব প্রেসিডেন্ট', না 'উপরাষ্ট্রপতি'; Council of Ministers—'মন্ত্রীর মণ্ডল', না 'মন্ত্রি-পরিষৎ'; Chief Minister—'বড়া মন্ত্রী', না 'মহামন্ত্রী', 'প্রধান মন্ত্রী'; Ex-officio—'ওহদেকে নাতে', না 'পদাধিকারিক'; Sinking fund—'খাঁইখাতা', না 'ঋণশোধকোষ'; Tribe—'কবীলা', না 'উপজাতি'; Writ of Habeas Corpus—'পরবানা হাজরী মুলজিম', না 'বন্দীউপস্থাপন লেখ'; Writ of Quo-warranto—'পরবানা ইজহার হক', না 'অধিকার প্রশ্ন লেখ'?

যাঁরা হিন্দুস্থানী ভাষার সমর্থক তাঁরা প্রথম প্রস্তুত শব্দগুলির পক্ষপাতী, অন্য শব্দগুলি তাঁদের নিকট দুর্বোধ্য ও কৃত্রিম। এই হিন্দুস্থানী সমর্থকদের সংখ্যা খুব কম হলেও রাষ্ট্রীয় ঘাটে তাঁদের ঘর খুব চড়া—তাঁরা অঘটনও ঘটাতে পারেন। এই দলের পণ্ডিত নেহরু বলেছেন—ফারসী বা সংস্কৃত পণ্ডিতের ভাষা নয়, জনসাধারণের ভাষাই (language of the people) রাষ্ট্রভাষা হওয়ার উপযোগী। তিনি বলেন—হিন্দুস্থানী এই জনসাধারণের ভাষা। তিনি আরও বলেছেন—সমৃদ্ধিশালী ইংরাজী ভাষা এখনও প্রতি বৎসর বহু বিদেশী শব্দ তার শব্দভাণ্ডারে গ্রহণ ক'রে আরও অধিক শক্তিশালী হচ্ছে। তাঁর মতে জীবিত উন্নতিশীল ভাষা হিসাবে হিন্দুস্থানে প্রচলিত ইংরাজী শব্দগুলি হিন্দুস্থানীতে গ্রহণ করা উচিত।

ভারতের রাষ্ট্রভাষা নির্ণয়, জাতীয় সংগীত নির্বাচন প্রভৃতি ব্যাপারে সংবিধান পরিষদে অনেকখানি উত্তাপ সঞ্চারিত হওয়ায় আশঙ্কায় এই সব অনলবর্ষী বিষয়গুলি পরিষদের শেষের পর্যায়ের জন্য মুলতবি রাখা হয়েছে। কিন্তু হিন্দী এবং হিন্দুস্থানীর সমর্থকদল নীরবে বসে নেই, সকলেই পূর্ণোদ্যমে প্রস্তুত হচ্ছেন। সংবিধান পরিষদের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের আদেশে মধ্যপ্রদেশ ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি শ্রীবিশ্বনাথসিংহ গুপ্তের অধিনায়কতায় "ভারতীয় সংবিধানকা এরূপ" (অর্থাৎ পূর্বরূপ) বাদ দিয়ে খসড়া শাসনতন্ত্রের একটা হিন্দী অনুবাদ তৈরী হয়েছে। তাঁরই আদেশে হিন্দুস্থানীতে এই খসড়ার আর একটি অনুবাদ অল ইণ্ডিয়া রেডিওর শ্রীসুন্দরলাল প্রভৃতির দ্বারা প্রস্তুত করান হয়েছে। এই দ্বিতীয় অনুবাদটিতে মহাত্মাজীর বিশ্বস্ত অনুচর কাকা কালেলকর, ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদের শিক্ষা বিভাগের ডাঃ তারাচাঁদ প্রভৃতির হাত আছে। এই অনুবাদটি পাশাপাশি নাগরী এবং ফারসী বিবিধ লিপিতে ছাপা হয়েছে—বইটির নাম "হিন্দকে বিধানকে মসৌদে কা হিন্দুস্থানী অনুবাদ"। প্রথম অনুবাদটিতে সন্তুষ্ট না হতে পেরে হিন্দীর সমর্থক প্রয়াগের হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের পক্ষ থেকে শ্রীবালকৃষ্ণ সাকৃত্যায়ন ও শ্রীবিশ্বনিবাস মিশ্র আর একটি হিন্দী অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। এই অনুবাদ তিনটি পাশাপাশি লক্ষ্য করলে হিন্দী আর

হিন্দুস্থানীর মধ্যে থেকে আমাদের উপযোগী রাষ্ট্রভাষা চিনে নিতে মোটেই কষ্ট হয় না। আমাদের আলাদা আর উদ্যোগ আমরা না সত্ত্বেই চিনে নিতে পারি, রাষ্ট্রনৈতিক পূর্বাকাশে পড়ে সেটাই না তলিয়ে যায়।

Part I

The Union and its territory and jurisdiction.

(1) India shall be a Union of States.

(2) The states shall mean the states for the time being specified in parts I, II and III of the First Schedule.

হিন্দুস্থানী অনুবাদ— হিস্সা এক

য়ুনিয়ন ঔর উসকা ইলাকা ঔর অমলদারী

(১) হিন্দ রিয়াসতোঁ কা এক য়ুনিয়ন হোগা।

(২) রিয়াসতোঁ সে মতলব উস রিয়াসতোঁ সে হোগা জিনকে নাম উস সময় পহলী পট্টীকে পহলে, দুসরে ঔর তীসরে হিস্সোঁ মেঁ দর্জ হোঁ।

হিন্দী দুইটি অনুবাদই প্রায় একরূপ,—

ভাগ এক

সংঘ ঔর উসকা রাজ্যক্ষেত্র তথা অধিকারক্ষেত্র

(১) ভারত রাজ্যোঁ কা সংঘ হোগা

(২) রাজ্যোঁ সে প্রথম অনুসূচীকে ভাগ ১, ২ ঔর ৩ মেঁ উস সময় উল্লিখিত রহে রাজ্য অভিপ্রেত হোংগে।

প্রথম হিন্দুস্থানী অনুবাদটি সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যে বিন্ধ্য পর্বতের এধিককার বহুস্থলে সাধারণ জনসাধারণ এ ভাষাটি বোঝে, আর তাই এর নামও দেওয়া হয়েছে হিন্দুস্থানের ভাষা হিন্দুস্থানী। আমরা কিন্তু হিন্দী হিন্দুস্থানীতে অনভিজ্ঞ বাঙালিরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথমটি অর্থাৎ হিন্দুস্থানীর তুলনায় দ্বিতীয়টিতে অর্থাৎ হিন্দীতে আমাদের পরিচিত শব্দ অনেক বেশি রয়েছে। এর কারণ আরবী-ফারসী হিস্সা, অমলদারী, রিয়াসৎ প্রভৃতির ঠেলে সংস্কৃত ভাগ, অধিকার-ক্ষেত্র, রাজ্য প্রভৃতি আমরা অনেক ভাল বুঝি। হিন্দীর মত বাংলাভাষা, সংস্কৃতভাষা থেকে উৎপন্ন বলেই এ রকমটি হ'ল। বিন্ধ্য পর্বতের এইদিকে কেন উক্ত ভাষেরই ভারতবর্ষের প্রধান ভাষাগুলি অসমীয়া, উড়িয়া, মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী, অন্ধ্র ও তেলেগু, কেরলের মলয়ালম, কর্ণাটকের কানাড়ী প্রভৃতি বাংলার মত সংস্কৃত থেকে জাত অথবা সংস্কৃতের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। এগুলির তুলনায় কম হলেও দক্ষিণ ভারতের অপর একটি গৌরবময় ভাষা তামিলনাদের তামিলের মধ্যেও বহু সংস্কৃত শব্দ আছে। ভারতবর্ষের প্রত্যেক অঞ্চলের অধিবাসীর পক্ষে মোটের উপর আরবী ফারসী শব্দবহুল ভাষা অপেক্ষা সংস্কৃত শব্দ-বহুল ভাষা আপন আপন অঞ্চলের ভাষার অধিক বিকটবর্তী হবে। এ অবস্থায় আমাদের আবেদন এই যে হিন্দুস্থানী অনুবাদের ভূমিকায় নিম্নে প্রদত্ত আবেদনটি যেন সংবিধান পরিষদের সভ্যদের বিবেচনা না করে।

"Now that the real power of the State is in the hands of the people, it is the people who prepare the constitution. * * * * Therefore it is natural and even necessary that this constitution should be prepared in the language of the people, and it is quite clear that if there is any language which will be understood by the largest number of the members of the Constituent Assembly, it is this language." "This language" এখানে হিন্দুস্থানীকে বুঝিয়েছে।

এ আবেদনটুকুর পরের অংশটি থেকে প্রকৃত তথ্যটুকু লেখক নিজেই প্রকাশ ক'রে ফেলেছেন—দেখা যাচ্ছে একমাত্র প্রথমত সংযুক্ত-প্রদেশের সভ্যরা—হিন্দু মুসলমানের হিন্দী উর্দু ভাষা বলের সময়য় চেষ্টায় বোঝা সমস্ত ভারতবাসীর স্কন্ধে আরোপ করা হয়েছে।'

"Hindi Knowing persons will find very few Persian or Arabic words which they cannot understand * * * * Similarly Urdu knowing people will find only a few words of Sanskrit origin which they may not easily understand. যার সংযুক্ত প্রদেশের অধিবাসীর পক্ষে, এ কথাগুলি বহুলাংশে সত্য। কিন্তু উপরি উক্ত উপায়ের দ্বারা সর্বনির্দিষ্ট ভাষাটি অন্য প্রদেশবাসীদের ভাষার নিকটবর্তী হ'ল কি? একটি প্রদেশ সমগ্র দেশ নয়।

এই সংবিধানের হিন্দুস্থানী দেবনাগরী, নাগরী এবং ফারসী উভয় লিপিতে প্রদত্ত হয়েছে। ভারত রাষ্ট্র অধিসংখ্যক উর্দু-শিক্ষিতের জন্য নাগরীর সঙ্গে ফারসী বরদাস্তও রাষ্ট্রভাষার লিপিরূপে যদি স্বীকার করেন, তাহলে অন্যান্য প্রাদেশিক লিপি-গুলিরই বা অপরাধ কি? এ বিষয়ে অধিক লেখাই বাহুল্য। এরূপ বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা আশা করি, আমাদের সংবিধান পরিষদে কিছুতেই গৃহীত হবে না। এখানে আর একটা কথা উল্লেখ করা দরকার। রাজনৈতিক চাল হিসাবে আমাদের শাসন তন্ত্রের একটা পৃথক সম্পূর্ণ উর্দু অনুবাদও সরকারী অর্থে প্রকাশ করা হয়েছে,—হিন্দী আর উর্দু'র প্রান্তের দুটি অনুবাদের প্রান্ত অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে দিলিপিক মধ্যবর্তী হিন্দুস্থানী অনুবাদটি সংবিধান পরিষদের সভ্যদের দিয়ে সমর্থন করানোই কি এর উদ্দেশ্য নয়?

বর্তমান সময়ের একটা বড় সমস্যা পরিভাষা বিচার। দুঃখের বিষয় বাংলার সুধীমণ্ডলী এবিষয়ে এখনও কৃতনিশ্চয় হন নি। আমাদের এ আলোচনাতেও পরিভাষার কথা প্রধানভাবে এসে পড়ে।

হিন্দুস্থানী অনুবাদক বলছেন জনসাধারণের ভাষায় অনুবাদ করার জন্য তিনি যতদূর সম্ভব পারিভাষিক শব্দ বাদ দিয়ে চলেছেন। তবে কিছু কিছু পরিভাষা তিনি যা রচনা করেছেন আমাদের দৃষ্টিতে তার মধ্যে পরিচয় আছে রচয়িতার রাজনৈতিক বুদ্ধির। Census-এর প্রতিশব্দ 'জনগণনা' অথবা 'মরদুম শুমারী' এর কোন পক্ষই তিনি

গ্রহণ না ক'রে অপূর্ব শব্দ সৃষ্টি ক'রেছেন—'গিনাথা'। unit হচ্ছে 'ইকাই', তারপর unity হচ্ছে 'একা,' unify—'ইকানা,' unite—'ইকিয়ানা', union—'ইকাবা', unionism—ইকাবাবাদ,' uniform—'একরূপ', uniformity—'ইকরূপতা', এর মধ্যে একরূপ, একরূপতা আমাদের পরিচিত। Retired—'রেযাযুক্ত'—এটা হিন্দী, Scheduled—'পট্ট বর্ষ' হ'ল উর্দু, তারমধ্যে বজায় রইল। এই রকম Administration—শাসন; Administrative—ইন্তজামী।

হিন্দী আর হিন্দুস্থানী আরও কয়েকটি লাইন পাশাপাশি দেওয়া হচ্ছে।

হিন্দুস্থানী :—গবর্নরকো মদদ ঔর সলাহ দেনে কে লিয়ে বজীর মণ্ডল

হিন্দী :—শাসক কো সহায়তা ঔর মন্ত্রণা দেনেকে লিয়ে মন্ত্রি-পরিষদ

হিন্দুস্থানী :—আমদনে কা পাঁকর ঔর ডিউটী পাঁকার কা ওহদা খালি হোনা, উনকা ইস্তিফা দেনা ঔর ওহদেসে হটায়া জানা।

হিন্দী :—বিধেয়কাকা অবরোধ আর উপাধাক্ষ কী পদনিবৃত্তি, পদত্যাগ তথা পদনিষ্কাসন।

হিন্দুস্থানী :—খাসগবর্নকা চেয়রমেন ঔর ডিপ্টী চেয়রমেন ইত্যাদি

হিন্দী :—কার্যকারিকা পরিষদকে সভাপতি ঔর উপসভাপতি ইত্যাদি

আরগোয়েন্স, অডিটার, চীফ জাস্টীস, কলচর (culture), ইন্টেলিজেন্সি, গবর্নর, হাইকোর্ট, মশীন (Machine), পাসপোর্ট, প্রেসিডেন্ট অব, প্রেসিডেন্সী, সুপ্রীমকোর্ট প্রভৃতি ইংরাজী শব্দগুলি ভাষার শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য হিন্দুস্থানী অনুবাদটিতে কোথাও গ্রহণ করা হয়েছে। পণ্ডিত নেহরুর কথাও পূর্বে উল্লেখ করেছি, তিনিও এইভাবে হিন্দুস্থানী ভাষার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেছেন। তাঁদের বিবেচনায় এবং বাংলাদেশেরও বহু পণ্ডিত ব্যক্তির বিবেচনায়—ভাষার পুষ্টিবৃদ্ধি করার উপায়স্বরূপ এই হচ্ছে "healthy assimilation of words of extraneous origin"

হিন্দুস্থানে এইসব ইংরাজী শব্দগুলির কিন্তু ইংরাজী শিক্ষিতমহলে কিছুমাত্র সর্বত্রই প্রচলিত। কালচার (সংস্কৃতি) ইঞ্জিনিয়ারিং (নির্মাণবিদ্যা), পাসপোর্ট (বিদেশপত্র, ছাড়পত্র), প্রেসিডেন্ট (সভাপতি), মশীন (যন্ত্র), গবর্নর (প্রদেশপাল, শাসক), হাইকোর্ট (উচ্চন্যায়ালয়, মহাধর্মাধিকরণ), প্রেসিডেন্স কলেজ (সংস্থান কোষ), চীফ জাস্টীস্ (মুখ্য ন্যায়াধীশ), অডিটর (নিরীক্ষক, অবেক্ষক) প্রভৃতি ইংরাজীশব্দ হিন্দী ভাষায় গ্রহণ করলে কি তার দ্বারা আমাদের ভাষা সমৃদ্ধতর শ্রেণীতে বৃদ্ধি পাবে, না আমাদের ভবিষ্যতের গৌরবময় স্বাধীনতার সৌভাগ্যের মধ্যে আমাদের অতীত দাসত্বের কলঙ্কে কাহিনীর স্মৃতি ভারতেতিহাসের পৃষ্ঠায় বাইরেও আমাদের ভাষাতত্ত্বের গ্রন্থের পৃষ্ঠায় কাল অক্ষরে চির অঙ্কিত হয়ে থাকবে? ভুল আর পাপ মিশে থাকলে একই রকম দেখায়, কালের দুরাতাস লাগলে ভুল উড়ে যায়—পাপ পড়ে থাকে তার নিজের ওজনের ভারে। হিন্দুস্থানের অধিকাংশ ইংরাজী শব্দই আমাদের বেতনভোগী মহলের মাতব্বরদের জন্য। নব প্রভাতেও রাত্রির দুঃস্বপ্ন আমাদের স্মৃতিকে পীড়িত করে, কিন্তু দীপ মধ্যাহ্নে তার কোন চিহ্নই থাকে না; ভারতে মুসলমান রাজত্বের অবসানে এই তো কিছুদিন পূর্বে আর একবার এই একই রকম ঘটনা ঘটে গেল। কিছুদিন পূর্বেও হিন্দুর বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র হিন্দীতে না হয়ে অধিক গৌরবজনক জ্ঞানে ক'রে উর্দুতে ছাপান হত। পত্র ব্যবহার বিশেষভাবে উর্দুতেই হত। হিসাবের খাতায় মিঠাইকে শীরনী, ছোলাকে নখুদ, ঘীকে রোগনজর্দ, ধোপাকে শাজুরে ইত্যাদি ইত্যাদি লেখা হত। এই শব্দগুলি এখন গেল কোথায়? এ শব্দগুলিকে তখন ছাপমেরে ভাষার শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়নি, আর এখন বহিষ্কৃত করার জন্যও কোন রাজাদেশ পত্র ঘোষিত হয়নি। ভারতের দক্ষিণের বাতাস মৃদু গতিতে সকলের অজ্ঞাতসারে কখন হালকা জিনিসগুলি সরিয়ে নিয়ে গেছে। সংযুক্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত সম্পূর্ণানন্দ তাঁর বাল্যকালের কথা স্মরণ ক'রে লিখছেন :—

"বহুতসে জমীন্দারোঁকে যহাঁ কুছ বাঁধ পহলে তক উর্দূমেঁহী হিসাব লিখা জাতা রহা হৈ। মুঝে আপনে বচপন কী যাদ হৈ কি হিন্দীকে শব্দ হোতে হুয়ে ভী কায়স্থ লোগ ফারসী শব্দোঁ কা প্রয়োগ সভ্যতাকা দ্যোতক সমঝা জাতা থা। হিসাব কিতাব মেঁ যেহ্ কো 'নখুদ', চনেকো কো "নখুদ", ঘীকো "রোগনজর্দ," তিলকো "কুঞ্জদ," মিঠাইকো "শীরনী", ধোবীকো "শাজুরে", মাঁঝিকো "হক্ মাল্লাহ," ঘোড়ীকো "অস্পমাদা," কপড়ে কো "পারচা," আমেজানেকো "আমেদরফ্ত," নহানে কো "গুসল," লবণ কো "নমক" আদি লিখা জাতাথা। কারণ ইসকা শুদ্ধ থা। হমারে উপর পুরানী সভ্যতাকা প্রভাব অধিক থা। তব বিবাহকে নিমন্ত্রণ-পত্র উর্দূমেঁ লিখে জাতে থে। পত্র ব্যবহার বিশেষতঃ উর্দূমেঁ হোতা থা। মেরা বিচারক সন ১৮৮৯ মেঁ উর্দূ, হিন্দী ব অংগ্রেজী মেঁ একসাথ বিকা গয়া থা ঔর সংবাদ করানেবালে মে পণ্ডিত গৌরী দত্তজী ঔর মৌলবী অব্দুর রহমান।"

এখন সংক্ষেপে আমাদের দাবি হচ্ছে—তাহলে তৎসম শব্দবহুল হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার আর নাগরীকে রাষ্ট্র লিপি করার,—খিলিপিক রাষ্ট্র ভাষার বোঝা আমরা বহন করতে অক্ষম। কিন্তু হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা স্বীকার করার সঙ্গে একটা গুরুতর প্রশ্ন আসে। আমাদের এ স্বাধীনতা যদি ভারতের প্রতি প্রান্তের অধিবাসীদের জন্য খাঁটি জিনিস হয়, তাহলে হিন্দীভাষার এ প্রাধান্য আমরা কি শর্তে মেনে নিতে রাজী হব? এবারকার প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি যে ভরসা দিয়েছিলেন, হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হলেও বাংলা ভাষা এর জন্য পেছিয়ে যাবে না, তাতে প্রকৃত ভরসা পাওয়া যাচ্ছে না। বিহারের মত অন্য ভাষার শ্বাসরোধকারী হিন্দী প্রচার যদি প্রদার লাভ

করে, তাহলে তার কার্যকরী প্রতিকার কোথায়—শাসন-তন্ত্রে বড় বড় অধিকার লেখা থাকলেই তো আমরা সান্ত্বনা পাব না।

তারপর হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হলে সমস্ত ভারতবাসীকে হিন্দী শিক্ষা করতে হবে। অন্য প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোক যে এর ফলে ভাল ক'রে হিন্দীভাষার সেবা করবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর হিন্দীভাষী এবং অহিন্দীভাষীদের সম্মিলিত সহযোগিতায় হিন্দীভাষা ও সাহিত্য যে দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হবে, এতেও আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এতদিন একটা বিদেশী ভাষা ছিল আমাদের রাষ্ট্রভাষা, আজ হিন্দী সেই স্থান অধিকার করতে চলেছে। হিন্দীর এই শুভোদয়ে আমাদের ঈর্ষা নেই, তবে স্বাধীনতার অধিকার সকলেরই জন্য যখন সমান, তখন আমাদের অহিন্দীভাষীদের সম্মিলিত দাবি হ'বে—মাতৃভাষা ছাড়া আমাদের যেমন শিক্ষায়তনগুলিতে আবশ্যিকভাবে হিন্দী শিক্ষা করতে হবে, সেরূপ হিন্দীভাষীদেরও যেন মাতৃভাষা ভিন্ন অপর একটি দ্বিতীয় ভারতীয় ভাষা আবশ্যিকভাবে পাঠ ও শিক্ষা করতে হয়। আর সমস্ত প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারের শিক্ষাবিভাগের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত একটি সভার উপর যেন ভার থাকে—যাতে হিন্দীভাষীদের এই অপর একটি ভারতীয় ভাষা শিক্ষা লোক-দেখান ব্যাপারে পর্যবসিত না হতে পারে। মাতৃভাষা ভিন্ন হিন্দী বা অন্য ভারতীয় ভাষা শিক্ষা ও পরীক্ষার মান যাতে সকলের জন্য সমান উন্নত হয়, এই সভার ক্ষমতা থাকবে তার যথাযথ ব্যবস্থা করার। আমাদের সংবিধান পরিষদে রাষ্ট্রভাষা নির্বাচনকালে এ জাতীয় ব্যবস্থাগুলি যাতে আমাদের শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়, তার জন্য বাঙালি এবং অন্য ভারতবাসীর উদ্যোগ থাকা খুবই উচিত।

অভিনেতা

শ্রীমতিলাল দাশ

(নাটিকা)

পূর্বানুবৃত্তি

শচীন্দ্র। (কপোল হইতে ঘর্ম মুছিয়া) কি মস্ত বড় নাটক একটা ঘটে গেল—এখানে এমন ঘটবে স্বপ্নেও তা ভাবিনি [টেবিল হইতে পাণ্ডুলিপির কাগজ গোছাইতে গোছাইতে] লোকটা কি সত্যই দেখে—(জানালার দিকে গিয়া বাহিরে চাহিয়া) হাঁ ঐ যে গঙ্গার ধার দিয়ে যাচ্ছে—লোকটা মেহাৎ পাগল—হয়ত মাথার যদি ভাগ্য-খেলার ঘোলার কথা না জাগত—তাহলে এতক্ষণ শুধামে পড়ে থাকত রবিরাজ মেরে। [স্মরণ করিতেও তাহার গায়ে কাঁটা দিল] যাক্, এখন যদি আর কোনও দিন দেখা করতে চাও—তুমি হতনসুরার সরকারই হও আর যেই হও, আমি আর কিছুতেই দেখা করব না—[জানালা হইতে ফিরিয়া) মা মাথাটা যেন ঘুরছে—শিরঃপীড়ার ওষুধটা কোথায় রেখেছি—(খুঁজিয়া তোরঙ্গ খুঁজিতে লাগিল) মা কোথায় কি যে ফেলি কিছুই ঠিক থাকে না—

মধুগোপাল। [ছোট সুটকেশ হাতে প্রবেশ করিয়া] আমি এই বেলাই চলে এলাম—কেউ এসে যখন করে বসুক—তারপর অমন হয়ে কি খুঁজছ।

শচীন্দ্র। মাথাটা ছিঁড়ে পড়ছে—

মধুগোপাল। আমার সুটকেসে এসপিরিণ ট্যাবলেট আছে—এক গ্লাস জল নিয়ে এস ভায়া।

[শচীন্দ্র জল আনিয়া এসপিরিণ ট্যাবলেট পরিবেশন করিল]

মধুগোপাল। খুব মাথা ধরেছে?

শচীন্দ্র। মাথা ধরার আর অপরাধ কি—সামনে যে ট্রাজেডির অভিনয় হল—জীবনে এর চেয়ে কঠোরতর ঘটনা আমার সম্মুখে ঘটেনি।

মধুগোপাল। কখন ঘটল।

শচীন্দ্র। এইমাত্র, তুমি যখন চলে গেলে তারপরই—তোমার সেই রক্ষিত মধুরাজা বা খাইয়েই ছেড়ে দিল।

মধুগোপাল। রক্ষিত নয়, পালিত।

শচীন্দ্র। কি যে বলছি আমার কিছুই ঠিক নেই—আমার মাথা ঘুরছে।

মধুগোপাল। সত্যিই তোমার একার ধৈর্য ও সাহসের দেখাচ্ছে—(কাছে গিয়া) তুমি যে ভায়া থর থর করে কাঁপছ—কপালে ঘাম জমছে, ব্যাপার কি? কি হয়েছিল?

শচীন্দ্র। সত্যকার ট্রাজেডি—

মধুগোপাল। তুমি কি উপহাস করছ?

শচীন্দ্র। গরীব বেচারী এক এসেছিল—সে সাহিত্যিক, বলছিল লিখে সে কিছু করতে পারেনি—সে আমার সামনেই গুলি করে আত্মহত্যা করছিল। আমি সাহায্য করতে চাইলাম—সে সাহায্য নেবেনা। কিছুতেই তাকে বোঝাতে পারিনি—তখন আমার মাথায় হঠাৎ খেয়াল হল—

মধুগোপাল। (বাধা দিয়া) তার রিভালভারটি কিনে নেবে।

শচীন্দ্র। কেমন করে জানলে দাদা?

মধুগোপাল। সেবার ঔপন্যাসিক মুখার্জি যখন রাঁচি যান তখন এই ধরণের একটা ঘটনা ঘটেছিল—তিনিই আমায় বলেছিলেন—যে একজন ভদ্রলোকের অভিশপ্ত জীবন ভিক্ষা দিতে চায়নি—মুখার্জি তাকে আত্মহত্যা করা থেকে বাঁচান, লোকটির নাম ছিল—মাঁ—কি যেন—

শচীন্দ্র। মাখন হরি সরকার।

মধুগোপাল। ঠিক তাই।

শচীন্দ্র। (স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া) বাক্ বাঁচা গেল।

মধুগোপাল। তার রিভলবার নিয়েছ?

শচীন্দ্র। (বন্ধুকে দিয়া) এই ত।

মধুগোপাল। (পরীক্ষা করিতে করিতে) কত দাম দিলে ভায়া?

শচীন্দ্র। পাঁচশত টাকা।

মধুগোপাল। হুঁ, বড় জোর এর দাম এক'শ, কিন্তু এমন একটা চমৎকার অভিনয়ের খুবই দাম আছে—কি বল ভায়া? (রিভলভার ফিরাইয়া দিয়া) এই নাও তোমার পাটনার সুবসুতি—

শচীন্দ্র। ব্যাটার নামে পুলিস কেস করছি—

মধুগোপাল। কোন্ অপরাধে? সে তোমায় ভিক্ষা নেয়নি বলে—সে ত রিভালভার বেচে তোমায় ঠকাতে যায়নি—তুমিই তাকে বেচতে বাধ্য করিয়েছ। আর আত্মহত্যা করতে চেয়ে সে করেছে, তার ত কোনও অপরাধ হয় না—কাজেই পিনাল কোডের কোনও ধারাই এর বিরুদ্ধে চলতে পারে না—

শচীন্দ্র। দেখা যাবে, কোন ধারা খাটে—এত দিয়ে ঠকালি। এর চেয়ে ঠকানি আর কি হতে পারে?

মধুগোপাল। ব্যাপারটিকে তুমি এত ঘোরালো করে দেখছ কেন?

শচীন্দ্র। তোমার যদি এমন করে ঠকতে হত।

মধুগোপাল। আমি একে অদ্ভুত কৌতুক বলে মনে করতাম—

শচীন্দ্র। সত্যি দাদা!

মধুগোপাল। এতদূর বিশ্বাস হবার কি আছে ভায়া? যজমানেরা কত সময় কত ভাবে কলকাতায় টাকা ঠকিয়ে নেয়, কই তা নিয়ে ত কখনও এতদূর ক্ষেপতে না। ঘুরাঘুরি চলছে না কোথায়? যেদিকে পাও সেই দিকেই কলে আছে মানুষ-ঘোরালের কল। কল ঠক খাচ্ছিতে পা ওজোড়, বাংলা দেশে জোচ্চোর নয় কে বলতে পার ভায়া?

শচীন্দ্র। অন্যায়কে কিছুতেই মানা উচিত নয় দাদা।

মধুগোপাল। অন্যায় চলছে মানুষের সর্ব ক্ষেত্রেই—দেশ আজ পুতিগন্ধময়, মানুষ সব পশু হয়ে দাঁড়িয়েছে—আমরা বোধ হয় সভ্যতা থেকে বেরিয়ে আদিমযুগে চলেছি—এই পাশবিকতার গ্লানির মাঝে মরহরি একজন রসিকস্রষ্টা, তাকে সমাদরই করা উচিত।

শচীন্দ্র। সমাদর?

মধুগোপাল। সমাদর বই কি—সে জেলে জিনিষ বেচেনি, জিনিষ আটকে রেখে ঘুষো ঘুষাল করেনি—তবে যাং ভেবে নিয়েছে এক মূতন পন্থা—তার নাটকীয় রূপায়ন একেবারে নিখুঁত—কি বল ভায়া—

শচীন্দ্র। নিখুঁতই বটে।

মধুগোপাল। তবেই বল—সংসারে সরলতা কি উপেক্ষণীয়? উদ্ভাবনী প্রতিভা কি আদরণীয় নয়?

শচীন্দ্র। আপনাকে ঠকায়নি, তাই এসব মহত্ত্বের বর্ণ করছেন—

মধুগোপাল। সত্যিই লোকটার প্রশংসা পাঠ কর্তব্য—বরং দিয়ে প্রতিভাকে বুঝতে হয় ভায়া—রবীন্দ্রনাথকেও আমাদের দেশের লোক প্রথম প্রথম গালি দিয়েছে—

শচীন্দ্র। এসব ভাবালুতা আমার বোধগম্য নয়—আমি যদি তাকে কোনও দিন ধরতে পারি—তাহলে দেখিয়ে দেব—আমি এখানে এক মিনিটও অপেক্ষা করব না—আধ ঘণ্টার মধ্যে একটা গাড়ী আছে—সেটাতেই রওনা হব—

(টেলিফোন রিং রিং করিয়া বাজিয়া উঠিল)

মধুগোপাল। প্রতিহিংসায় বিচলিত হয়ো না—আমিই ফোন ধরব কি? (ফোন ধরিয়া) হালো,, আমি যোল কথা কইছি—কে কথা কইতে চায়? বাবু মরহরি সরকার—

শচীন্দ্র। (টেবিল চাপড়াইয়া) রাস্কেল কোথাকার—দেখাচ্ছি মজা—

মধুগোপাল। (রিসিভার নীচে রাখিয়া হাসিতে হাসিতে) এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই—সে জেনেছে তুমি চলে গেছ—আর থাকার আমার নামও করেছে—সে হয়ত ভাবছে পলিতবের ওখানে আমি উঠব (মাথা দোলাইয়া) তোমার কাছ থেকে সে পলিতবের ওখানে গিয়ে জেনেছে যে আমি এসেছি মধুমন্ত্রে এবং হয়ত শুনেছে যে আমি তোমার করেই আছি। তার ধৈর্য ও কর্মশক্তির প্রশংসা না করে পারি না—সত্যই চমৎকার প্রতিভাবান যুবা (শচীন্দ্রকে দরজার দিকে যাইতে দেখিয়া) কোথায় চলছ ভায়া?

শচীন্দ্র। ব্যাটাকে পাকড়াও করে পুলিশে দেব—

মধুগোপাল। না, না—ওর মত একজন রসিক রূপশিল্পীকে দুঃখ করা হবে আর্টের অপমান—না ভায়া এমন অবিচার হতে দেব না—ওকে সমাদর করা কর্তব্য—(রিসিভার তুলিয়া) আল্লা সরকারকে পাঠিয়ে দিন—মিনিট পাঁচেক পরে।

শচীন্দ্র। কি করবে বাবা?

মধুগোপাল। তোমার জিনিষপত্র সব বাথ-রুমে সরিয়ে ফেলা থাক—তারপর তুমি ওখানে লুকিয়ে থেকে ব্যাপারটি দেখ।

শচীন্দ্র। কিন্তু তাহলে এ গাড়ীটা আর ধরা হবে না—

মধুগোপাল। নাই বা হল—বিকালের গাড়ীটা এক্সপ্রেস—সেটায় যাবে—আও তাড়াতাড়ি কর ভায়া—

[উভয়ে ধরাধরি করিয়া শচীন্দ্রের জিনিষপত্র বাথরুমে নিয়া গেল, তারপর আসিয়া গম্ভীর ভাবে চৌকিতে বসিল—দরজায় শব্দ হইল] আসুন (নরহরি সরকার প্রবেশ করিল) কি চান বলুন?

নরহরি সরকার। আপনি পাটনায় এসেছেন শুনে দেখা করতে এলাম—আপনি মহদ্ওঃকরণ—[দৃঢ় অথচ কম্পিত সুরে] আমি এখন বিপদে পড়েছি যে প্রায় অন্যায় বিচারের আমার সময় নেই। আমার কাহিনী এত মর্ম্মস্পর্শী।

মধুগোপাল। বলুন।

নরহরি। (বসিয়া) বন্ধুবর—আমি রতনপুরের অভিজাত সরকার বংশের সন্তান—স্বদেশী আন্দোলনে আমাদের যথাসর্ব্বস্ব গেছে। ছোট কাল থেকে—

[নরহরি প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশায় চুপ করিল]

মধুগোপাল। বলুন, আমি স্থিরচিত্তে শুনছি।

নরহরি। আমার লোকেরা ভেবেছিল যে আমি উকিল হয়ে একজন দ্বিতীয় রাসবিহারী ঘোষ হব—কিন্তু তা আমার রুচিসঙ্গত হয় নি—আমি শান্তিবাদী—আমি কবি—কল্পনাবিলাসী।

মধুগোপাল। আমিও তাই।

নরহরি। আমি চেয়েছিলাম কীর্ত্তি—সাহিত্যিক বলে আপন দেশের হৃদয় জয় করব—এই ছিল আমার স্বপ্ন—কিন্তু জীবনের ধূলিধূসর পথে কণ্টকবিদ্ধত হয়েছে আমার যাত্রা—আমি পাইনি অর্থ—আমার প্রতিভা হয়েছে ব্যর্থ।

মধুগোপাল। আর বলতে হবে না—বুঝেছি আপনি অর্থকৃচ্ছ্রতায় ক্লিষ্ট—

নরহরি। কাল থেকে আমার খাওয়া হয় নি (মধুগোপাল পকেট হইতে নোট বাহির করিতেছে দেখিয়া) আপনি কি করতে যাচ্ছেন মশায়।

মধুগোপাল। আপনি যখন ক্ষুধাকাতর।

নরহরি। (তিক্ত পরিহাসে) আপনি আমায় একশত টাকার নোট ভিক্ষা দিচ্ছেন—

মধুগোপাল। একশত নয়—দশ টাকা

নরহরি। বলেন কি—রতনপুরার সরকার আমি—আমায় কি হীন ভিখারী পেয়েছেন। একজন ভাগ্যহত সাহিত্যিক বন্ধুকে এমন ভাবেই অভ্যর্থনা করতে শিখেছেন। আমার বেদনার কাহিনী শুনে এই আপনার মনে হল (উত্তেজিতভাবে)। না, না এই অপমানের আমি প্রতিশোধ নেব—সাহস্র অনেক হয়েছে—

ব্যাগ হইতে রিভলভার বাহির করিল

মধুগোপাল। কি করছেন আপনি

নরহরি। আপনার সামনেই আমি আত্মহত্যা করব—করবই করব।

মধুগোপাল। (সহাস্যমিয়া দেখাইয়া) আপনি কি দৃঢ়-সংকল্প করেছেন—

নরহরি। হাঁ—এ আমার অবিচল প্রতিজ্ঞা

মধুগোপাল। (গম্ভীরভাবে) ভালই করেছেন—তাহলে আত্ম-হত্যাই করুন—আজ পর্য্যন্ত কিন্তু মরবার—

নরহরি। (বিস্মিত কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়তায়) তাহলে আপনি আত্মহত্যা সমর্থন করছেন?

মধুগোপাল। করছি—সত্যই আপনি বীর—প্রশংসাভাজন। অনেক দিন পরে একজন পুরুষের মত পুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি—আপনি ভিক্ষা চান না—এ মর্য্যাদা-বোধ দুর্লভ—সাধারণ বন্ধু সাধারণ। টাকায় কি হত—দশ টাকা নেই, দশ হাজার নেই—তাতে আর কি হত তোমার রক্ষার উপায় হয় না। সাহিত্যও হল আমাদের দেশের অগণ অবসর-বিনোদন—সাহিত্যিক কীর্ত্তি জেনো কখনও পরিপূর্ণ হয়ে—আজ তাবত পেয়েছ দেশের মন—কাল দেখব দেশের চিত্ত পাওনি। আমার কথাই ধরণী ভাই—তোমার এবার তুমি বলব—

নরহরি। তাই বলুন।

মধুগোপাল। আমায় তুমি শ্রদ্ধা কর, ভক্তি কর—তাহলে আমি উঠেছি কলের উচ্চ-শিখরে—তাহলে আমি পরম সুখী—কিন্তু আসলে নিয়তির চূড়ান্ত পরিহাস্ ভোগ করছি—মৈনিক কাগজের সহকারী সম্পাদক এ আমার বন্দীর জীবন—প্রতিদিন ঘানি টানছি—এর চেয়ে মৃত্যু নয়ক—সে শতগুণে সহস্রগুণে ভাল—কাতরে কবিতা কুতঃ? কালিদাসের সেকথা একান্ত সত্য। দেশে আজ এই যে দুঃসহ অন্ন-চিন্তা—এর থেকে মৃত্যু ভালে—ধন্যবাদ ভাই, তুমি মেঘদূতের মত এসেছ আমার জীবনে—তুমি দেখাবে মুক্তির পথ—তোমায় অসংখ্য ধন্যবাদ।

নরহরি। (বিস্মিত হইয়া) আমায় ধন্যবাদ!

মধুগোপাল। (জোরে মাথা দোলাইতে দোলাইতে) তোমায়, বন্ধু তোমায়। আমিও মরতে চেয়েছি কিন্তু পারিনি—এখন আর তা পারব না। তুমিই আমায় দেখাবে জীবনের যাত্রাপথে মৃত্যু এক অধ্যায়—যা এনে দেয় নিঃশেষ নির্ব্বাণ—যার পরে থাকে না ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা। বলে কি হয়—এ দুঃস্বপ্ন আর দেখতে হয় না—ধন্যবাদ ভাই—তুমি আগে মর—আমি তোমার পরে মরব (নরহরি হতবুদ্ধি হইয়া এক পা পিছাইয়া গেল) পিছিয়ে যেও না বন্ধু, তাহলে পড়ে যাবে।

নরহরি। কিন্তু

মধুগোপাল। তুমি কি আমায় ভেবেছ ভাই। বলে বলেই গুলি করবে? কোথায় করবে—বুকে না মাথায়?

নরহরি। সত্যি বলতে কি—

মধুগোপাল। বুকে করাই ভাল—তাহলে মৃত্যু ধ্রুব—

নরহরি। যা বলছেন—

মধুগোপাল। না ভায়া, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কিছুই বলব না—তুমি যদি পৃথিবীর শেষ বিদায় মুহূর্তের প্রেরণায় কিছু করতে চাও আমি তাতে বাধা দেব না—তুমি যে ভাবেই মরতে চাও সেই ভাবেই মর—তোমার দেহ যখন রক্তাক্ত দেহে ধূলায় গড়াবে—তখন আমিও আর দেরি করব না—আমিও তোমার পশ্চাদনুসরণ করে মৃত্যু আলিঙ্গন করব—

সত্যিই কি আনন্দ। প্রতিশোধ—সুরম্য প্রতিশোধ নেব আমরা—যখন ওরা দেখবে তোমার আর আমার শবদেহ—তখন পৃথিবীর বোকা লোকেরা কি হতবুদ্ধিই না হবে.—আমরা যে তাদের আনন্দ দূর করেছি তখনই তারা বুঝবে—না বন্ধু আর দেরী না—আমার আর তর সইছে না বুঝি—চির মুক্তি—তাড়াতাড়ি কর বন্ধু—গুলি কর—বল এক দুই দুইতে মানিনা কর—

নরহরি। (বিব্রত হইয়া) না, আমি আর মরতে পারব না দাদা!

মধুগোপাল। কেন পারবে না ভাই—

নরহরি। আমি নিজে মরতে পারি, কিন্তু আপনাকে সহযাত্রী করতে পারি না, তাহলে আমি সে হত্যার পাপে দায়ী।

মধুগোপাল। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) তাহলে রিভলভার আমায় দেও—আমি প্রথমে তোমাকেই গুলি করব—

নরহরি। ক্ষমা করবেন

মধুগোপাল। এত ভয় করছ?

নরহরি। না।

মধুগোপাল। সত্যি

নরহরি। আপনাকে মৃত্যুর দৃষ্টান্তে দেখিয়ে এই ভাবে মরতে দিলে আমার অপরাধ কম হবে না দাদা—সে আমি করতে পারব না—

মধুগোপাল। এই মাত্রই না বলেছিলে যে ছোটখাট ক্ষয় ক্ষতির ভিতর তোমার নেই—এখন কেন এত চুল-চেরা তর্ক তুলছ ভাই?

নরহরি। আবার এই দ্বিধা—সত্যকার দ্বিধা

মধুগোপাল। বেশ, তাহলে আর কি করব—তুমি নিজেই মর—আমি কথা দিচ্ছি তোমার জন্যই আমি ব্যর্থ জীবন বহন করেই চলব।

নরহরি। একি আপনার সত্য প্রতিজ্ঞা?

মধুগোপাল। হাঁ আমি শপথ করছি—সত্যই ভাই তুমি একান্ত ভাগ্যবান, তুমি প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার অমৃত-আনন্দের অধিকারী হতে চলেছ—আমি তোমায় হিংসে করি—বিদায় বন্ধু বিদায়।

[সে বসিয়া পড়িল—নরহরি কি করিবে, কি বলিবে ভাবিয়া পায় না] কি? তুমি এখন বেঁচে আছে?

নরহরি। (রিভলভারের দিকে তাকাইয়া] কারণ—

মধুগোপাল। না ভাই সময় নষ্ট করো না—গুলি কর।

নরহরি। (হঠাৎ যেন হরিষ পাইয়া) আমার রিভলভার ঠিক নাই—

মধুগোপাল। কি জানা!

নরহরি। কি করব বলুন

মধুগোপাল। যেন এতে ভাববার কিছু নেই—এই নাও আমার রিভলভার

[পকেট হইতে রিভলভার বাহির করিয়া দিল]

শচীন্দ্র। (বাক্সের ঢাকনা খুলিয়া নবকলেবর রিভলভার হাতে তুলিয়া, কিংবা এই নাও আমারটি

[মাথা বাহির করিল]

নরহরি। (তাহাকে দেখিয়া) কে? ভট্টাচার্য্য মহাশয়?

মধুগোপাল। রিভলভারের অভাব বন্ধু (নিজের রিভলভার বাক্সের সঙ্গে নরহরির হাতে দিয়া) এটা দিয়েই কাজ শেষ কর ভাই।

শচীন্দ্র। (বাহিরে আসিয়া নিজেরটা দিয়া) এটা দিয়েও চলবে।

নরহরি। (ভীত লজ্জিত কণ্ঠে) হায়। হায়! ধরা পড়ে গেছি এবার—আর আমার চাকরি থাকবে না দেখছি—

মধুগোপাল। চাকরি—

নরহরি। হাঁ এইভাবে রিভলভার বেচে আমার সংসার চলে—আমার কর্ত্রী এবার আমায় তাড়াবে—

শচীন্দ্র। ওঃ বুঝতে পেরেছি তোমার স্ত্রী তোমায় এমন করে রিভলভার বেচতে পাঠায়—তুমি নিজেকে হত্যা করতে চেয়ে রিভলভার বেচ।

নরহরি। ঠিক ধরেছেন।

শচীন্দ্র। তোমার কর্ত্রীটি ত খুব চালাক—কে তিনি—মাদ্রাজী না বিহারী?

নরহরি। বুদ্ধিটি আমার কর্ত্রীর নয়।

শচীন্দ্র। তোমার? খুব বাহাদুর ছেলে দেখছি

মধুগোপাল। (উচ্চহাস্যে) কি চমৎকার ভিক্ষেরা ভায়া—

নরহরি। ক্ষমা করবেন—আমি আসলে একজন অভিনেতা—

মধুগোপাল। অভিনেতা—? কোন থিয়েটারে কর অভিনয়—

নরহরি। আমার কাজ নেই—আমি ভাল কমিক পার্ট করতে পারি—বাংলাদেশে হাসাতে পারে এমন এইর কজন আছে বলুন ত? অথচ আমি পাইনে কাজ—তাই এই ব্যবসা ধরেছি—এতে চলে যাচ্ছিল একরকম করে—

শচীন্দ্র। তোমাকে নূতন ব্যবসা করতে হবে—

মধুগোপাল। থিয়েটারেই যোগ যাওনা ভাই

নরহরি। কোন থিয়েটার?

মধুগোপাল। যে কোনটায় ঢোক ঢুকে পড়। ভট্টাচার্য্য তোমার সুপারিশ হলে সর্ব্বত্র হবে তোমার অবাধ গতি

শচীন্দ্র। না, তা কখনও হতে পারে না—

মধুগোপাল। কেন? দেখছ না ভাগ্য তোমায় এনে দিয়েছে সেই অভিনেতা যার জন্য তুমি এত উদ্বিগ্ন। জন্মজন্মান্তরে নায়কের পার্ট করতে চাই যাকিছু—চাই কঙ্কণ রব। সে তার কনেটি দিয়ে তোমার বোকা বানিয়েছে—যে তোমার স্ত্রীকে করেছে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর—

শচীন্দ্র। (ইতস্তত: করিয়া) বেশ, আমি ওকে আমার বইটা আবৃত্তি করতে দেব—কিন্তু আমি কোনও কথা দিচ্ছি না—

নরহরি। (প্রবল হাস্যে) শচীনবাবু, আমি একান্ত কৃতজ্ঞ থাকব, আপনার নাটক রূপায়নে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব—আর যদি না পারি

মধুগোপাল। তাহলে গুলি দিয়ে মাথার খুলি ওড়াবে।

নরহরি। (দ্বিগুণ দৃঢ়তায়) হাঁ নিশ্চয়ই করব

মধুগোপাল। না, একজন বদ্ধ পাগল—ওকে শোধরানো চলবে না

শচীন্দ্র। (হাসিতে হাসিতে) আমারও তাই মনে হচ্ছে—ও সারা জীবন এই ভাবেই আত্মহত্যা করে চলছে।

সমাপ্ত

ইউরোপে কয়েক দিন

শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়

বার্জ হোটেল, জেনিভা, ২রা নভেম্বর ১৯৪৮

ভারতের সংবাদ এখানে এসে আদৌ পৌঁছায় না—একখানিও ভারতীয় সংবাদপত্র দিনা সুইজারল্যাণ্ডে আসে না। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক আজগুবি ধারণা এরা অম্লানবদনে পোষণ করে।

যে জায়গায় আমরা আছি তা অতি অপরূপ। চার পাশে আল্‌প্‌স্ পর্বতমালা, তার কোলে সারি সারি সাজানো ফুলের বাগান ও সুন্দর সুন্দর বাড়ী, মাঝে বিরাট ৯০ মাইল লম্বা হ্রদ—তাতে হাজার হাজার বড়ো বড়ো জাহাজ, আর লক্ষ লক্ষ রঙের পাখী দাঁতার দিচ্ছে। সুইজারল্যাণ্ডের বড়ো বড়ো শহরগুলি এই হ্রদের চারধারে গড়ে উঠেছে।

দূর থেকে ঠিক ছবির মতন সুন্দর দেখায় এই জেনিভা শহরটিকে। এদেশের রাস্তাঘাট ঘরদোর অতি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন, কারণ অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় দেশ হলে ধুলোবালির বালাই নেই—সব কিছুতে পরিষ্কার—মানুষগুলোরও স্বভাব ও সংস্কার সেইদিকে নিয়ে চলেছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দিয়া দেশটিকে ধনধান্যে ভরপুর করে গড়ে তুলেছে। পাহাড়ের বুক চিরে এরা প্রাকৃতিক শিল্পসম্পদ সৃষ্টি করেছে। আল্‌পসের ঝরণাগুলা জলপ্রপাত ও হ্রদগুলি থেকে Hydro Electric System-এ সারা দেশে এরা বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে এবং তা থেকে শিল্পসম্পদ গড়ে উঠছে। আশ্চর্য পরিশ্রমী এই জাতটা। গোটা দেশটা বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে সামান্যভাবে সমৃদ্ধ। এখানে এমন কোনো গ্রামই নেই যেখানে বিদ্যুতের ব্যাপার নেই—এমন কি পাহাড়ের ওপরের (summit) অনেক বৈদ্যুতিক বাতি ও লিফ্‌টের (lift) ব্যবস্থা আছে।

এ দেশের সাধারণ লোকেরা খায় দায় ও আনন্দ করে, রাজনীতির ধার বড়ো একটা ধারে না। ফলে একটু ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে এরা। ছোট দেশ, তার ওপর তিনটি ভাষাভাষী লোকের সমাবেশে সুইস্ সভ্যতা গড়ে উঠেছে। এই তিন ভাষা হল ফরাসী, জার্মান এবং ইতালিয়ান। ইংরেজির সঙ্গে এদের সম্পর্ক নেই—কাজেই আমাদের মতন লোকের একটু অসুবিধায় পড়তে হয়। এমন কি সরকারী দপ্তরে যাবতীয় নথিপত্রও এই তিনটি ভাষায় রাখা হয়। সেইজন্য এখানকার Federal Court ও League of Nations

বৃটিশ পার্লামেন্ট ও ওয়েষ্টমিনিষ্টার ব্রীজ—লণ্ডন

(বর্তমানে United Nations Organisation এবং) I. L. O অর্থাৎ International Labour Office-এর বক্তৃতাখানায় খুব ভালো অভিজ্ঞ দোভাষী বা Interpretors আছে। কারণ বেশির ভাগ লোকই, এমন কি অনেক বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরাও, ফরাসী ভাষাতেই বক্তৃতা দেন। কেবল United Kingdom, United States এবং ভারতীয় প্রতিনিধিরা ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিকে ফরাসী ভাষায় তর্জমা করা হয়।

ছোট দেশ হলেও এখানে খুব বড়ো বড়ো কাপড়ের কল ও কারখানা আছে। তাছাড়া কলকব্জা এবং অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নির্মাণ বিষয়ে—যাকে বলে Precision Instruments—এরা বিশ্ববিখ্যাত। আমি সুইটজারল্যাণ্ডে এসে পর্যন্ত নানা শিল্পকেন্দ্র ও অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান ঘুরে দেখেছি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের ভারতীয় দূতাবাস থেকেই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বের্ণ (Berne), জুরিখ (Zurich), উইণ্টারথুর (Winterthur), লুসাঁ (Lausanne), ইণ্টারলোকেন (Interlaken) প্রভৃতি বড়ো বড়ো শহরগুলি ঘুরে এসেছি দুটির দিনে।

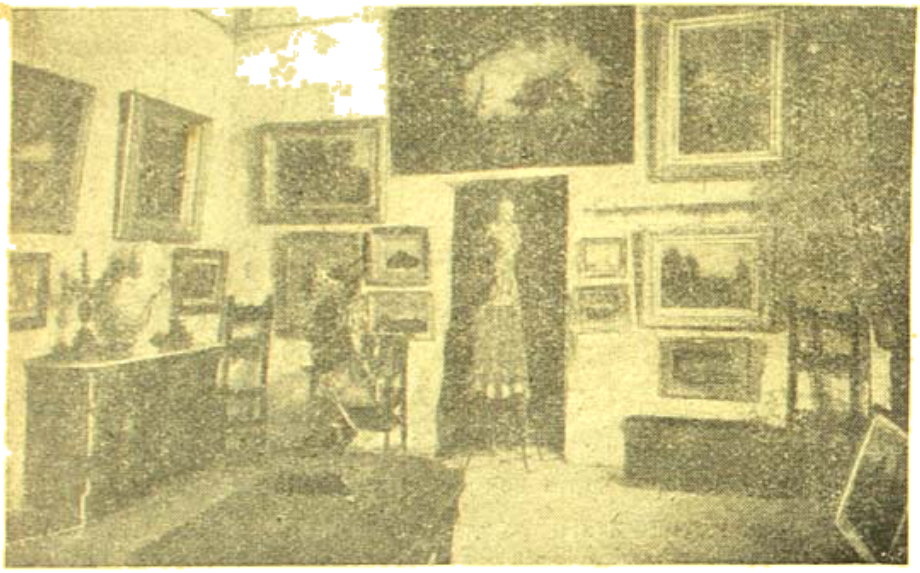

বিখ্যাত চিত্রশিল্পী মিলের ষ্টুডিও ও বাসভবন

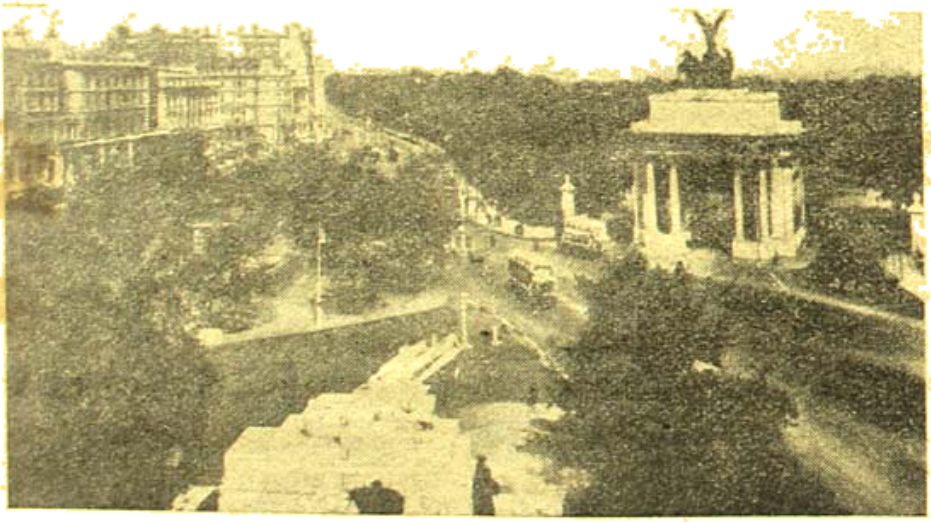

হাইড্ পার্কের একাংশ—লণ্ডন

এখানে সকল ট্রেণই বিদ্যুতের সাহায্যে চলে। দেবার বোম্বাই থেকে ফেরার বোম্বের ইম্পিরিয়াল স্টেশনে ইলেকট্রিক ট্রেণের কথা মনে আছে। এখানকার এক্সপ্রেস ট্রেণগুলি ঘণ্টায় ৭০।৭৫ মাইল পর্যন্ত যায়। ট্রেণগুলি অতিশয় সুন্দর এবং আরামদায়ক। সেকেণ্ড ক্লাস কামরাগুলি আমাদের ইণ্টারক্লাস শ্রেণীর গাড়ীর মতন। কিন্তু শোবার ব্যবস্থা নেই কোনো ক্লাসেই, সবই কেবল বসবার জায়গা, তবে শীতের দেশ বলেই বোধহয় কামরাগুলিকে গরম করে রাখা হয়। আর একটা কথা। এখানে কোনো স্টেশনেই কুলির ব্যবস্থা নেই—নিজের মালপত্র নিজেকেই বহন করে নিয়ে যাওয়া এখানকার রীতি।

গত শনি ও রবিবার ছুটি থাকায় আমরা ইয়ংফ্রো (Yungfrauch) বেড়াতে গিয়েছিলাম। ইয়ংফ্রো আল্পসের অন্যতম চিরতুষারময় গিরিশৃঙ্গ—১২৭০০ ফুট উঁচু। এখান থেকে প্রায় দুশো মাইল দূর হবে। সারা পৃথিবী থেকে ভ্রমণবিলাসীরা এসে জোটে এর অপরূপ সৌন্দর্য দেখবার জন্যে।

ইণ্টারলোকেনে রাত কাটিয়ে ভোর আটটার গাড়ীতে রওনা হতে হল। ভোর আটটা কথাটা শুনতে বেখাপ্পা লাগে। কিন্তু সত্যিই তাই। শীতের দেশ—ভোর হতে না হতেই আটটা বেজে যায়। ৬ হাজার ফুট পর্যন্ত পাহাড়ের গা বেয়ে, পাইন বনের মধ্য দিয়ে সর্পিল গতিতে ট্রেণখানি উঠতে লাগলো। সেখান থেকে সুইস উপত্যকার কি অপরূপ দৃশ্য।

গ্রোণ্ডেলওয়াল্ড স্টেশনে গাড়ী বদলাতে হল। ছোট পার্বত্য ট্রেণ—মাত্র দুটো কামরা—বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে এক বিরাট সুড়ঙ্গ পথের মধ্য দিয়ে গিরিশৃঙ্গে উঠতে লাগলো। শীতের দেশ বলেই ৬ হাজার ফুটেই তুষারমালা (snowline) দেখা যায়। এখান থেকেই চির-তুষারের রাজ্য শুরু হল। মানুষের বসতির সঙ্গে সঙ্গে গাছপালাও শেষ হল। চারিদিকে কেবল তুষার-ধবল গিরিশৃঙ্গ। তাপমানে দেখা গেল প্রায় জিরো (Zero) ছুঁয়েছে।

এখান থেকে শুরু হল টানেল ট্রেণ। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে সুড়ঙ্গ পথ ধরে আল্পসের মাথায় এসে পৌঁছতে হয়। আশ্চর্য বিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা—বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রকৃতির সমন্বয়ে

অসাধ্যসাধন। সুড়ঙ্গ পথটি বিরাট, প্রায় ২০ মাইল বিস্তৃত। মাঝে মাঝে সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে আবার ছোট Halt Station আছে। সেখান থেকে হিমানীক্ষেত্র (Glacier) ও তুষারমণ্ডিত উপত্যকাগুলি বড়ো সুন্দর দেখায়। এইভাবে বেলা বারোটা নাগাদ আমরা ইয়ংফ্রো এসে পৌঁছাই। সেই সুড়ঙ্গপথের মধ্যেই আছে সুন্দর ইউরোপীয় হোটেল ও তার পাকঘর সাজসরঞ্জাম।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হোটেল বন্ধ। অতি কষ্টে একটু গরম কফির ব্যবস্থা হল। বরফঘরের মত দালানে, পালঙ্কের ধবধবে বিছানা পাতা, সেই তুষারপুরীতেও বাথরুম এবং আমাদের অন্যান্য সাজসরঞ্জাম। তবে লোকজন নেই, সব খালি। আবার নাকি Winter Sportsএর সময়, ডিসেম্বরের শেষ থেকে লোক আসতে শুরু হবে।

মাঝখানের প্রতিকৃতি, একটি বরফের মোটর প্রভৃতি নানা জিনিষ দর্শকের বিস্ময় সৃষ্টি করে। ইংরেজিতে একে বলে Ice Palace।

এখান থেকে সেই সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে আবার একটি বৈদ্যুতিক লিফটের সাহায্যে ৩১০ ফুট উঠলে তবে পর্বত শিখরে পৌঁছানো যায়। সেখানে একটি বীক্ষণাগার (Observatory) আছে। কিন্তু অসময় বলে সেটিও বন্ধ ছিল। কিছুক্ষণ সেই চিরতুষারময় পর্বতশিখরে ঘুরে বেড়ালাম। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা, তবে বরফে বরফে ঘষলে একটু গরম পাওয়া যায়। সে দৃশ্য চমৎকার। চোখ ঝলসে যায় বরফের শুভ্রতায়। তলায় মেঘ আর চতুর্দিকে সেই অনন্তধবল তুষাররাশি।

বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারা গেল না। ঝুপ ঝুপ করে বরফ পড়ছে। আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ একেবারে সাদা হয়ে গেল। লিফ্‌ট ঘরে

অষ্ট্রেলিয়ার ডেপুটি হাই-কমিশনার ও বেলজিয়ামের ভারতীয় রাষ্ট্রদূত—মধ্যভাগে লেখক

সেপ্টেম্বর থেকে মধ্যের পর্বত সব বন্ধ থাকে, কারণ এই সময় তুষার-ঝটিকা (Blizzard) শুরু হয়। তুষার-ঝটিকা বড়ো বিপজ্জনক।

অনুসন্ধানে জানা গেল ১৮০০ থেকে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় বারো বছর ধরে অজস্র পরিশ্রম ও বহু অর্থব্যয়ে Swiss Federal Government এই ট্যানেল ট্রেণের ব্যবস্থা করেছেন। প্রকৃতির ওপর বিজ্ঞান তথা মানুষের আধিপত্যবিস্তার আর কি। ফলে এই ট্রেণের ভাড়া এবং আনুষঙ্গিক খরচা অত্যন্ত বেশি।

এই পর্বতের এক অংশের সঙ্গে একটি glacier অবিচ্ছিন্নভাবে লেগে আছে। তার মধ্য দিয়ে বরফ কেটে একটি রাস্তা তৈরী হয়েছে। সেখানে এক বিরাট বরফের Hall, বরফ কেটে খোদাই করা জন্তু

নেমে দেখলাম তাপ জিরোরও নীচে বহু ডিগ্রি। এ ঠাণ্ডা আমরা সমতলভূমির মানুষেরা কল্পনাও করতে পারবো না। যাক, আমাদের তেমন কষ্ট অবশ্য হয়নি। এক অভিনব অভিজ্ঞতার সঙ্গে আনন্দও পেয়েছিলাম প্রচুর। বেলা আড়াইটে নাগাদ সেই তুষাররাজ্য থেকে বেরিয়ে রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ আবার আমরা জেনিভার সেই হোটেল ঘরে এসে পৌঁছলাম।

বার্ণ হোটেল, জেনিভা, ৩রা নভেম্বর ১৯৪৮

এখানকার ছেলেমেয়েরা কত পরিশ্রম করে, তাই তারা জীবনে সুখী হয় ও আনন্দ উপভোগ করতে পারে। এদেশে ভিক্ষুক নেই। সকলে আট ঘণ্টা পরিশ্রম করে এবং ফলে জীবনে উন্নতি করে প্রচুর। শ্রমের

মর্যাদাবোধ এসে আছে। ছোট বড়ো ভেদবিচার নেই। এই বয়সের বাচ্চাও এরা কি ভাবে শিল্পসম্পদ গড়ে তুলেছে তা ভাবলে অবাক হতে হয়।

সময় বড় অল্প। আজ সকাল দশটা থেকে রাত দশটা অবধি মিটিং করে সীতে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে এলাম। আগামী ৮ই এখান থেকে রওনা হব মহানগরী প্যারীর উদ্দেশে।

রয়্যাল মন্‌সু হোটেল, প্যারী, ১৩ই নভেম্বর ১৯৬৮

সহর তখন ঘিরে ধুয়াশার চাদর। ট্রেণের প্রকোপে মানুষগুলো যেন একটু জড়ভরতের মতন ঠেকলো। আমাকে নিতে আমাদের দূতাবাস থেকে একজন ইংরেজি-জানা ফরাসী ভদ্রলোক এসেছিলেন। কাজেই অজানা শহরেও কোনো অসুবিধেয় পড়তে হয়নি।

সোজা এসে আমার জন্যে নির্দিষ্ট হোটেলে উঠলাম। আগে থাকতেই এক ইংরেজি-জানা ফরাসী মহিলা। পরে শুনলাম যে ফরাসী সরকারের সাহায্যে ও সৌজন্যে একটি প্রতিষ্ঠান এদেশে গড়ে উঠেছে—যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারত ও এশিয়ার সঙ্গে এদেশের সৌহার্দ্য এবং বাণিজ্য বিষয়ে পারস্পরিক সাহায্য বিধান করা। বলা বাহুল্য এঁদের অজস্রতা ও আতিথ্যে অভিভূত হতে হয়। এঁদের সাহায্যে আমি প্যারী সহর এবং ফরাসী দেশের শিল্পপ্রধান অঞ্চলগুলি যেমন—রুঁয়ে (Rouen), আমিয়া (Amiens), সাঁক্লা (Saint Frerse), লিল্ (Lille), রুবে (Roubaux) প্রভৃতি বস্ত্র, কয়লা ও লৌহ শিল্পকেন্দ্রগুলি দেখে এসেছি এবং যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েছি। অবশ্য শহরে থাকা, খাওয়াদাওয়া ও যানবাহনের সমস্ত ব্যবস্থা করা বা তার খরচাদি বহন করা সব এঁরাই করেছেন।

সত্যই প্যারী পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহানগর। ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার ঐশ্বর্য এবং সম্পদ হরণ করে করেক শতাব্দী ধরে ফরাসী দেশের শ্রেষ্ঠ সময় প্যারী এবং বুরবোঁ সম্রাটদের (Bourbon Dynasty) রাজধানী ভার্সাই (Vermilles) সহর গড়ে উঠেছে। অল্প কয়েক দিনের মধ্যে সহর দেখে শেষ করা যায় না। তার পর এর বুকের ওপর দিয়ে এত বড়ো বড়ো বিপ্লব ঘটে গেছে যে প্রতিটি রাস্তাঘাটে ইতিহাসের ছাপ পড়েছে। এ সম্পর্কে আমি অনেক ছবি সংগ্রহ করেছি। তোমাদের জন্যে এই প্যারী সহরই কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস রচনা করেছে—জাতির উত্থান পতনের ছাপ বহন করেছে। বর্তমানে আবার এক বিপ্লবের ধূম্রায়মান বহ্নির সম্মুখে জাতি এসে দাঁড়িয়েছে—জানিনে এর শেষ কোথায়। কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে যোঝাপড়া চলেছে। ধর্মঘটের ফলে কয়লার খনিগুলো বন্ধ, রেল চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে, খবরের কাগজগুলো মাঝে মাঝে বন্ধ হচ্ছে—সামাজিক দিয়ে জাতির সুমুখে নানা সমস্যা এসে দেখা দিয়েছে। সরকার ঐতিহাসিক মর্যাদাসম্পন্ন রাজপ্রাসাদগুলো দখল করে নিয়ে সরকারী অফিসরূপে ব্যবহার করছে—বড়ো বড়ো উদ্যান-বাটিকাগুলো এখন হাসপাতাল বা মিউজিয়ামে রূপান্তরিত হয়েছে।

ফরাসী জাতির অন্তরটা বিপ্লবমুখী, কিন্তু শিল্প ও ললিতকলার ধারাবাহিক অনুশীলনের ফলে এবং বারম্বার যুদ্ধবিগ্রহ ও বিপ্লবের মধ্য দিয়ে গাওয়ার ধরণ এরা কতকটা যেন আত্মরক্ষির এবং রক্ষণশীল হয়ে পড়েছে। তার ওপর অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও ফরাসী ফ্রাঙ্কের মান দফু হওয়ায়

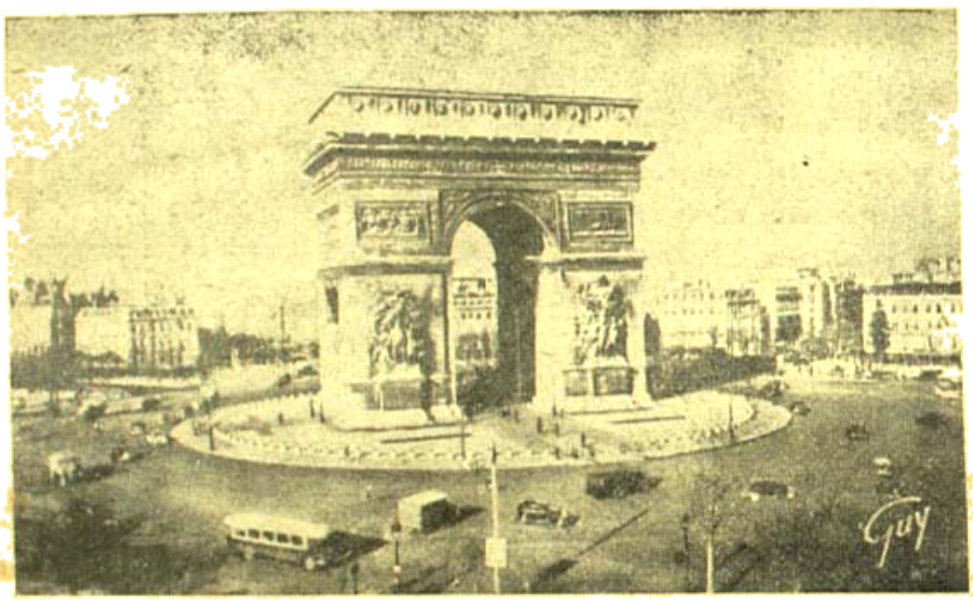

নেপোলিঁর জয়স্তম্ভ

সব ব্যবস্থা ছিল। নেপোলিঁর জয়স্তম্ভের (Arc De Triomphe) কাছেই Avenue Hoche রাস্তার ওপর গাড়তলা এক বিরাট হোটেল। পরে জানলাম অনেক ভারতবাসী যাঁরা U. N. O. সম্বন্ধে এসেছেন তাঁরা অধিকাংশই এখানে থাকেন। এই প্রাসাদোপম হোটেলের একাংশে ভারতীয় পতাকাও দেখা গেল। কিন্তু হোটেলটির প্রণালী এবং আনুষঙ্গিক খরচ প্রচুর।

বেলা এগারোটা নাগাদ ভারতীয় বাণিজ্য প্রতিনিধি (Trade Commissioner) কয়েকজন ফরাসী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও ভদ্রমহিলাকে সঙ্গে নিয়ে হোটেলে এসে দেখা করলেন এবং আমার ফরাসী দেশের ভ্রমণ তালিকা ও যাতায়াত শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শনের সমস্ত ব্যবস্থা করার ভার তাঁরা নিলেন এবং সঙ্গে একজন দোভাষী রাখার বন্দোবস্ত করলেন। দোভাষীটি

(Depreciation of Currency) গরীব লোকেদের কষ্টের আর সীমা নেই। অস্বাভাবিক মুদ্রানীতির শোচনীয় অবস্থায় আজ দয়ালী জাতি এসে পৌঁছেছে। একে সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত করতে না পারলে জাতি বাঁচতে পারবে না। শুনে আশ্চর্য হবে যে বর্তমান অবস্থায় এক Swiss franc-এর বিনিময়ে ১১০ French franc পাওয়া যায়, ফলে সকলেরই বিশেষত মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তের সর্বনাশ উপস্থিত হয়েছে। করাসীরা বিদেশ থেকেও কিছু আমদানি করতে পারছে না, কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে তাদের মুদ্রার মর্যাদা আজ আর নেই।

হাতে সময় কম। কালই আমি এখান থেকে বেলজিয়ামের রাজধানী Brussels (ব্রুসেলস্) অভিমুখে রওনা হবার স্থির করেছি। সেখানকার কলকব্জা ও কাপড়ের কারখানাগুলি দেখে আঁতোয়ার্প (Antwerp) এবং ঘেন্ট (Ghent) হয়ে লণ্ডন যাব।

ক্লারিজ হোটেল, লণ্ডন, ২০শে নভেম্বর ১৯৩৮

জনযুদ্ধের পরের সারা পশ্চিম ইউরোপের শিল্পপ্রধান দেশগুলি ও সেখানকার বড়ো বড়ো শহর ও প্রাচীন ঐতিহাসিক ক্ষেত্রগুলি দেখে এবং সেখানকার সমাজজীবনের গতি ও ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় লাভ করে জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারছি। প্রায় সব দেশেই আমাদের দূতাবাস থাকার ফলে স্বাধীন জাতির মর্যাদা লাভ করতে পারা গেছে এবং তাতে আমার এই স্বল্পকালীন প্রবাসে খুব সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে।

বেলজিয়াম। বেলজিয়ামের Charge de Affairs মিঃ তারেবজী আমার অন্যতম সহকর্মী হিসাবে জেনিভার আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। কাজেই তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ই ছিল, যার জন্যে আমার বেলজিয়াম ভ্রমণের অনেক সুবিধা হয়েছিল।

দূতাবাসের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী গাড়ীসহ ব্রুসেলস্ স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন এবং আগে থেকেই সেখানকার বৃহত্তম হোটেলে আমার থাকবার অন্যবস্ত, সুতরাং কোনো কষ্ট হয়নি।

ব্রুসেলস্ এক পরিষ্কার পাহাড়ী শহর—প্যারী মহানগরীর অনুকরণেই গড়া। রাস্তা-ঘাট সুপ্রশস্ত এবং চারিদিক ফুলে ফুলে সুশোভিত। মাঝে মাঝে খুব বড়ো বড়ো শহীদ বেদী ও বিরাট স্তম্ভ (Unknown martyrs' tomb) আছে। লোকেরা রোজ সকালে সেখানে ফুলের বালা উপহার দেয় এবং দিন-রাত সেখানে আলো জ্বলে শ্রদ্ধার চিহ্ন-স্বরূপ। কারণ সারা দেশের ওপর দিয়ে দুটো বৃহত্তম লড়াইয়ের তাণ্ডব-লীলা ঘটে গেছে—এমন বাড়ী নেই যেখানে দু' একজন লোকও না হতাহত হয়েছিল। কিন্তু অদ্ভুত মানুষ এরা—এত অল্প সময়ের মধ্যেই দেশকে আবার নতুন করে গড়ে তুলেছে। অতিশয় পরিশ্রমী জাতি, তার ওপর ছোট জমিও ব্যবসা বাণিজ্যে বিশেষজ্ঞ পনির দিয়ে অতিশয় সমৃদ্ধ। সুইজারল্যাণ্ড এবং বেলজিয়ামের Currency Exchange বা অর্থমানকে Hard Currency বলে।

ঘেন্ট এবং আঁতোয়ার্পও দুটি বড়ো বড়ো শিল্পপ্রধান শহর। এখানকার একজন বিশিষ্ট শিল্পপতি মিঃ ভেন্ডার কারুকেন নিজে আমাকে সঙ্গে নিয়ে দু'দিন ধরে এদব অঞ্চল ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনেন। ইউরোপের সর্বত্রই আমি সম্মিষ্ট সরকার এবং বড়ো বড়ো শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্য, সহৃদয়তা এবং আতিথ্য পাচ্ছি। আমার আসা উপলক্ষে ভারতীয় দূতাবাস থেকে একটা পার্টি দেয়। তাতে এখানকার সরকারী ও বেসরকারী অনেক উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা সব উপস্থিত ছিলেন। এর ফলে এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটে।

ব্রুসেলস্ থেকে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ঐতিহাসিক যুদ্ধক্ষেত্র ওয়াটার্লু (Waterloo) দেখতে যাই। এই যুদ্ধের ফলে ইউরোপের ইতিহাসের গতি বদলে যায়। যেখানে যুদ্ধ ঘটেছিল সে জায়গাটা দেখতে আজও দারা পৃথিবী থেকে লোক আসে। যুদ্ধের দু'দিন পূর্বে এক চাষীর ঘর দখল করে নেপোলিয়ঁ তার প্রধান সামরিক দপ্তর স্থাপন করেন। আজ

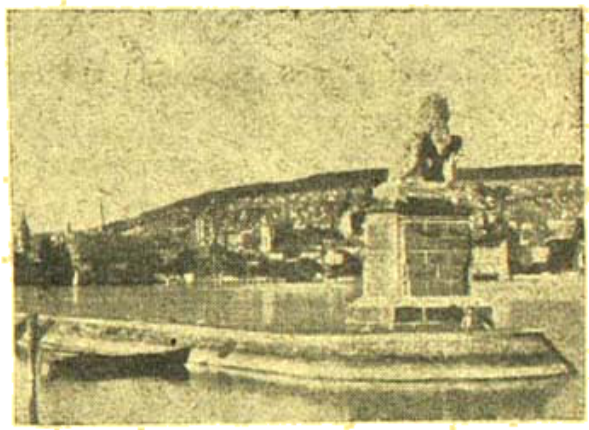

ওয়াটার্লুর একাংশ

সে ঘরটি জাতীয় মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রের এক অত্যাশ্চর্য Panoramic view রেখে দেওয়া হয়েছে সেখানে—দেখলে মনে হবে যেন সত্যই যুদ্ধ হচ্ছে। আমি তার কতকগুলি ছবি সংগ্রহ করেছি।

আঁতোয়ার্প ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ বন্দর। গত যুদ্ধের সময় জার্মানরা এটা প্রথমেই দখল করে নেয়। কিন্তু তাদের ভাগ্যবিপর্যয়ের পর পলায়ন করবার সময় তারা সেতু ভেঙে দিয়ে যায় এবং এই সুন্দর সুসজ্জিত শহরটিকেও একেবারে ধ্বংস করে যেত। ফলে দুঃখিত হবে যে এই শহরে কেবল বোমাবর্ষণের ফলেই প্রায় দশ হাজার লোক মারা যায়। কিন্তু আশ্চর্য জাতি এরা। যুদ্ধ থামার পর দু'বছরের মধ্যেই আবার নতুন করে গড়ে তুলেছে শহরটিকে। এদের মনে কোথাও ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, আছে কেবল একটানা চলার বেগ ও আনন্দ। বন্দর নদী (North Sea) থেকে বহু দূরে। এ সব জায়গায় শীত একটু বেশি, কাজেই আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই অত্যন্ত কাজের লোক হয়ে পড়েছে। শীতে কাজ করার সুবিধা আছে। এখানে সূক্ষ্ম কারুকার্য খচিত একটি প্রাচীন গির্জা আছে। গির্জাটি ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের এবং ষোড়শ শতাব্দীতে স্থাপিত। গির্জাটির জগৎ-বিখ্যাত চিত্রকরের অঙ্কিত অনেক

ছবি ও মেয়ালচিত্র সাজানো আছে। আমার জানাশোনা এগুলিকে স্পর্শ করতে পারেনি—এটা দুঃখের কথা। ইউরোপের প্রায় সকল ফরাসী অধ্যুষিত স্থানেই ক্যাথলিকপ্রধান।

লণ্ডন। কাল দুপুরে আমি Continent ছেড়ে বিমানযোগে লণ্ডনে এসে পৌঁছেছি। এখানকার হাই কমিশনারের প্রতিনিধি গাড়ীসহ বিমান ঘাঁটিতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা আমাকে ক্লারিজ হোটেলে নিয়ে এলেন। এই হোটেলটি ইউরোপের বৃহত্তম ও সর্বাপেক্ষা ব্যয়সাধ্য হোটেল। গুরুদেব পণ্ডিতজীও যখন লণ্ডনে এসেছিলেন এই হোটেলেই ছিলেন। ভারতবর্ষের মর্যাদা রক্ষার জন্য আমি আমারও এখানেই থাকবার ব্যবস্থা করেছি।

কাল ও আজ দু'দিনে আমি লণ্ডনের দ্রষ্টব্য বিষয়বস্তুগুলি দেখে নিয়েছি। কাল এখান থেকে ম্যানচেষ্টার রওনা হব। সেখানকার শিল্পাঞ্চলগুলি দেখানোর ভার বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বোর্ড অব ট্রেড ও রেলওয়ে নিয়েছেন এবং দু' তিন দিনের মধ্যে লণ্ডনে ফিরেই আমার ২৫ তারিখ নিকেলে "ষ্ট্রাথেয়ার্ড" (SS. Strathaird) নামে বেলবাহী জাহাজযোগে ভারত অভিমুখে রওনা হব।

জাহাজে জায়গা পাওয়া এখন এক রকম অসম্ভব ব্যাপার। ছয় মাস আগে থেকে টাকা জমা দিলেও সীট পাওয়া যায় না। তবে আমার ক্ষেত্রে High Commissioner-এর "highest priority"র ফলে প্রথম শ্রেণীর কেবিন একটি সংগ্রহ হয়েছে। কিন্তু ভাড়া খুবই বেশি। এরোপ্লেনের চেয়ে সাত পাউণ্ড বেশি দিতে হচ্ছে। তবে শুনলাম যে জাহাজটি নাকি অত্যন্ত আরামদায়ক।

সহযাত্রী কার্ডতালিকা অনুসারে আমি বোম্বাই পৌঁছাব ১১ই ডিসেম্বর। সেখান থেকে আকাশপথে কলকাতা।

ক্লারিজ হোটেল, লণ্ডন, ২৪শে নভেম্বর ১৯৪৮

প্রথমে চোখের ওপর পশ্চিমের নতুন জীবনের ঝলক কতকটা মানুষকে বিমূঢ়াবিষ্ট করে তোলে—তাদের সব কিছুই ভালো বলে মনে হয়। কিন্তু কিছুদিন পরেই চমক যায় ভেঙে, দেখা পড়ে ধরা। এদের জীবনে গতি আছে, ফলে শ্রদ্ধা আসে, আসক্তিও আসে, পড়বার আগ্রহে এগিয়েও যাই বটে, কিন্তু আমাদের জীবনের সঙ্গে যেন খাপ খায় না—কেমনধারা যেন অন্তরে আধিপত্যের মাঝখানে এরা আছে।

সুইজারল্যাণ্ডের যে শোভা ও সৌন্দর্যের কথা লিখেছিলাম, সেরকম প্রাকৃতিক শোভা বা সৌন্দর্য আর কোথাও কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় না। ফরাসী দেশটাও খুব সুন্দর। দু' দুটো লড়াইয়ের ধাক্কায় ফরাসীদের মনের বল প্রায় ভেঙে পড়েছে এবং আমাদের দেশের মতন কিছুদিনের জন্য দলাদলি ও কম্যুনিস্টদের সঙ্গে আঁতাঁত জন্য, দর্ষবট প্রভৃতি এত বড়ো আভিজাত্য ও শৌর্যসম্পদ জাতটাকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দিচ্ছে না। কিন্তু আমি সারা ইউরোপে যে আতিথেয়তা ও সহৃদয়তা পেয়েছি তা ভুলবার নয়।

আপাতত লণ্ডনে থাকলেও সেদিন ইংলণ্ডের অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রগুলি বিশেষত আন্দ্রিয়ুগুলির কেন্দ্র পরিদর্শন করতে গিয়েছিলাম। ম্যানচেষ্টার ও স্যাল্ফোর্ডারই আন্দ্রিয়ের প্রধান কেন্দ্র। লণ্ডন থেকে প্রায় দুশো মাইল রেলে যেতে হয়। সেখানে যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন রাত সাড়ে দশটা। কুয়াশায় সব ঢাকা—এমন কি পাশের লোককেও দেখা যায় না। অতি কষ্টে এক কুলিকে পাকড়ে সেখানকার একটি পরিচ্ছন্ন হোটেলে গিয়ে উঠি।

দু'তিনদিন ঐ সব অঞ্চল ঘুরে আজ সকালে আবার এখানে ফিরেছি। সর্বত্র আমাদের দূতাবাস থাকাতে আমাদের পক্ষে কাজের খুব সুবিধা হয়। সব জায়গায় এরা টেলিফোন করে আগে থাকতেই সমুদয় বন্দোবস্ত করে রাখে, কাজেই কোথাও অসুবিধের মধ্যে পড়তে হয় না এবং বর্তমানে ইংরেজ সরকার ও বিলেতি কল-মালিকরাও দেখছি আমাদের সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে ভালো ব্যবহার করছে।

আজ দুপুরে ভারতীয় হাই কমিশনার আমার লণ্ডন আসা উপলক্ষে ইণ্ডিয়া হাউসে একটি ভোজ দেন। অনেক ভারতীয়ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বিদেশে স্বজনের লোক দেখলে আনন্দ হয়। ম্যানচেষ্টারে ইংরেজ বণিকেরাও এক ভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন। কাল সকালে আবার এখানকার খবরের কাগজওয়ালাদের প্রতিনিধিরা দেখা করতে আসবেন বেলা দশটার সময়। একটা প্রেস কনফারেন্সের মতো হবে এখানে আমারই বলবার ঘরে।

কাল বেলা বারোটা নাগাদ আবার আমার ভারতের অভিমুখে রওনা হবার কথা। টিলবেরি বন্দর থেকে "ষ্ট্রাথেয়ার্ড" জাহাজটি বিকেল নাগাদ ছাড়বে। টিলবেরি লণ্ডন থেকে ৩০ মাইল রেলের পথ। কিন্তু আমার বোধহয় রেলে আর যেতে হবে না, সোজা মোটরে চলে যাব, কারণ লণ্ডনে থাকাকালীন এখানকার হাই কমিশনার আমার ব্যবহারের জন্য একখানি মোটরের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

স্ট্রাথেয়ার্ড জাহাজ, সমুদ্রবক্ষ, ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৪৮

বর্তমানে লোহিত সাগরের বুকে পাড়ি দিচ্ছি। ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ নাবিক ঘাঁটি মাল্টা পার হবার পর প্রায় দু'দিন ধরে সাগরবক্ষে ঝড় ও তুফান দেখা দেয়। উত্তাল তরঙ্গমালার সংঘাতে জাহাজকে দোলানো শুরু করে, ফলে আরোহীদের অনেক লোককেই শয্যায় আশ্রয় নিতে হয়। অতিকায় সুরক্ষিত জাহাজ, তাই ঢেউগুলো অতি ভয়ানক বা বিশাল হয়নি। শুনলাম যাত্রি যেখানে আটলান্টিক সাগর এসে ভূমধ্যসাগরে মিশেছে সেখানে সর্বদাই ঝড় তুফান লেগে থাকে। সেজন্যে নাবিকেরাও সতর্কতার সঙ্গে সেখানে জাহাজ চালিয়ে থাকেন। তারপর আবার একঘেয়ে দৃশ্য। সেই সীমাহীন অনন্ত জলরাশি। মাঝে মাঝে দূরে দু'একখানা অন্য জাহাজ দেখা যায় মাত্র। ভূমধ্যসাগরে বেশ শীত ছিল। মাঝে মাঝে হুহু করা ঠাণ্ডা বাতাস এসে হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিত।

বৃহস্পতিবার বেলা তিনটে নাগাদ আমরা সুয়েজ খালের মুখে ইজিপ্টের প্রধান বন্দর পোর্ট সৈয়দে (Port Said) এসে

পৌঁছাই। দূর থেকেই দেখা যায় উপকূলের ওপর বিরাট এক প্রস্তরমূর্তি। প্রস্তরমূর্তিটি হচ্ছে বিখ্যাত ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার ও শিল্পী Ferdinand De Lesseps-এর। ইনিই সুয়েজখালের পরিকল্পনা করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন। উত্তমাশা অন্তরীপ বা Cape of Goodhope ঘিরে আসতে গেলে আরো দশ হাজার মাইল ঘুরতে হত। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে খালের খননকার্য শেষ হয়—লোহিতসাগর ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষিত হয়। খালটি প্রায় ১০০ মাইল লম্বা, ১৫০ ফুট চওড়া ও ৩৭ ফুট গভীর। বিশ্বের মরুপ্রান্ত ভেদ করে এই খালকে টেনে আনা হয়েছে।

আট দিন একটানা জলের মধ্যে থেকে লোকের প্রাণ যেন হাঁফিয়ে ওঠে। কূলের সন্ধান পেয়েই আমরা কয়েকজন ভারতীয় বন্ধু তীরে গিয়ে বন্দর ও শহর দেখতে বেরোলাম। সেখানে গিয়ে দেখি জাহাজ প্রায় খালি করে সকলেই শহর দেখতে ও প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনতে বেরিয়েছে। বন্দরটি আধুনিক ইউরোপীয় ছাঁচেই গড়ে উঠেছে। কিন্তু শ্রেণী থেকে এগিয়ে আসাই যায়—সেখানে সারা বিশ্বের চোর, জুয়াচোর ও ঠগের আড়ৎ—বিশেষ কাজকর্ম নেই, লোক ঠকিয়ে খাওয়াই তাদের ব্যবসা—নানা রকম সৌখীন জিনিষ ও চামড়ার ব্যাগ নিয়ে এসে রাস্তা ভিড় করে দাঁড়াবে এবং জোর করে কিছু না কিছু গছাবেই।

শহরটি কিন্তু বেশ সুন্দর। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। সাগর আমার যেন মরুভূমি মিলিয়ে দেছে এবং এই সুয়েজ খালকে অবলম্বন করে নানা ইউরোপীয় ব্যবসাবাণিজ্য গড়ে উঠেছে। এখান থেকেই প্যালেস্টাইনের রেলপথ শুরু হল।

মিশরীয়েরা অত্যন্ত ইংরেজ-বিদ্বেষী বলে মনে হল। গোঁড়া fanatic আরবীয় মুসলমান। খালটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আজও দেখলাম বৃটিশ এবং মার্কিণ নৌবহর ও টহলদারি জলপুলিশ মোতায়েন। খালটির দুপাশে কেবল অনন্ত বালুরাশি এবং মাঝে মাঝে তারবাহী টটের দল। মাঝে মাঝে আবার শ্যামল মরুদ্যানগুলি এই শুষ্ক বালুকাময় মরু প্রান্তরে সত্যই এক অপরূপ শোভা ও সৌন্দর্য বহন করেছে।

খালের শেষে সুয়েজ বন্দর। সেখানে বড় বড় পনির তৈলের কারখানা ও ব্যবসাকেন্দ্র আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সবই বিদেশীর হাতে। এখান থেকে ১৮০ মাইল Gulf of Suez-এর মধ্য দিয়ে গিয়ে লোহিতসাগরে পড়তে হয়। এর চারপাশে ছোট ছোট প্রবাল দ্বীপ আছে। জলটা আর তেমন ঠাণ্ডা নয়। এখন আবহাওয়া প্রায় আমাদের দেশেরই মত। আর হাঙরের ভয় নেই।

সোমবার বেলা এগারোটা নাগাদ আমরা এডেনে গিয়ে পৌঁছাব। সেখান থেকে সোজা ১৭৫০ মাইল গিয়ে ১০ তারিখ শুক্রবার বেলা দশটা নাগাদ বোম্বাই বন্দরে এসে জাহাজ ভিড়বার কথা। আমার ইচ্ছা ১১ তারিখেই ভোরে বিমানযোগে কলকাতা রওনা হওয়া। এবার ঘরের দিকে মন ছুটেছে।

[পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় গত নভেম্বর মাসে জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম-সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন। ঐ সময়ে তিনি ইউরোপের আরও কয়েকটি স্থান পরিদর্শন করেন। এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তটি তাঁহার আত্মীয়-স্বজনকে লেখা পত্রাবলী হইতে সংকলিত হইয়াছে। ভাঃ সঃ]

সন্ধ্যা

অধ্যাপক শ্রীবিভূরঞ্জন গুহ

দিবসের অবসানে নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায়,
আঁধারের যবনিকা দিগন্তে ঘনায়।
সুগম্ভীর শুব্ধতার ছায়া, ভয়ে ভয়ে করি পরিহার,
ঘুরে সরে যাই বারবার।
আশ্রয় খুঁজি দীপজ্বালা গৃহকোণে,
নিজেরে লুকাই কথার গহন বনে।

অন্ধকার ভয়াল রূপেরে ব্যঙ্গ করি যে আমি,
মুখর প্রমোদে নামি।
কিন্তু যবে শান্ত হয় জীবনের উত্তাল প্রবাহ
শান্ত হয় কামনার উগ্রদাবদাহ
সেদিন নিস্তব্ধ সন্ধ্যা মৌনতার শান্ত আলিঙ্গনে,
বন্ধুর মত বুকের মাঝারে টানে।

বিদেশী কবিতার অনুবাদ।

সত্যের সন্ধান

শ্রীচাঁদমোহন চক্রবর্তী

স্বাস্থ্য-উদ্ধারের জন্য চুণীলাল মুখোপাধ্যায় এসেছেন দেওঘরে। প্রত্যহ প্রত্যূষে উঠে হাওয়া খেতে যান তিনি রোহিণী রোডে—বেশ খোলা জায়গা। শীতের দিনে কনকনে হাওয়া হাড়ের ভেতর পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে দেয় যেন। সেদিন চুণীবাবু প্রত্যূষে উঠে গরম জামাকাপড় গায়ে চড়াচ্ছিলেন এমন সময় বাইরে থেকে কে ডাকল "বাবা!" চুণীবাবু মুখ বাড়িয়ে দেখলেন, এক গেরুয়াধারী আধা-বয়সী লোক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে, তার চোখে মুখে ভয়ের চিহ্ন। চুণীলাল প্রশ্ন করলেন: কি চাই?

আগন্তুক বিনতিভরা কণ্ঠে বলল: আমি চুণীলাল মুখোপাধ্যায়কে চাই। চুণীলাল আগন্তুকের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে বিরক্তিসূচক কণ্ঠে বললেন: বল, কি দরকার?

আগন্তুক বিনা বাক্যব্যয়ে ঘরে ঢুকে চুণীবাবুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল, দুই হাতে দু'খানি পা জড়িয়ে ধরল। চুণীলালের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, তিক্ত কণ্ঠে বললেন: ভনিতা রেখে—আসল মতলবটি খুলে বল—কে তুমি?

—এঁজে আমার নাম ছিদাম—জাতে কৈবর্ত্ত, নিবাস ভামচক। আমার ইস্তিরির ভারী ব্যামো—আমি বাবা বৈদ্যিনাথের কাছে হত্যে দিছিলাম—আজ শেষ রাত্রে বাবা আদেশ দেছেন, যা বেটা চলে যা রোহিণী রোডে—চুণী মুখোপাধ্যে মশাইর কাছে। সাতদিন তার পাদোদক খাবি আর তার সেবাপূজা করবি, তা হলেই তোর ইস্তিরি সেরে উঠবেন।

চুণীলাল সন্দিগ্ধ ভাবে একবার ছিদামের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অবজ্ঞার সুরে বললেন: অসুখ হল তোমার স্ত্রীর, আর পাদোদক খাবে তুমি—তাতেই অসুখ সেরে যাবে তার?

ছিদাম সলজ্জ ভাবে বলল: এঁজে, ইস্তিরি হলেন আমার অর্দ্ধাংগিনী কি না!

অপর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন চুণীলালের বৃদ্ধা জ্যেঠাই-মা রাইমণি দেবী এদের কথাবার্তা শুনে। রাইমণি চুণীলালকে জিজ্ঞাসা করলেন: কার সংগে কথা বলছ চুণী? আজ যে বড় বেড়াতে যাও নি, এখনো?

চুণীলাল অবিশ্বাসের ভাষায় ছিদামের আগমন কাহিনী রাইমণি দেবীকে জানালেন। ছিদাম কাঁদ কাঁদ ভাবে রাইমণির চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বলল: দেখুন তো মা, বাবু আমার কথায় পেত্যয় কত্তিছেন না। আমারে বাবা আদেশ দিলেন যাও, চলে যাও চুনীবাবুর বাড়ী, বাবু ধার্মিক লোক—তার চরামেত্তর খালি আমার ইস্তিরি ভাল হবে; কিন্তুক বাবু আমারে ঠাট্টা কত্তিছেন খালি।

বাবা বৈদ্যনাথের নামে জ্যেঠাই-মা মাথায় হাত ঠেকিয়ে গদগদ ভাবে বললেন: বাবা চুণী, বাবা বৈদ্যনাথের আদেশ অমান্য করতে পারবে না—বাবা তোমার ওপর সদয় হয়েছেন বলেই ওকে পাঠিয়েছেন। যাও বাবা, তুমি বেড়িয়ে এস, আমি সব ঠিক করে নেব।

চুণীলাল কি বলতে যাচ্ছিলেন জ্যেঠাই-মা তাঁকে বাধা দিলেন। চুণীলাল অপ্রসন্ন মুখে গৃহত্যাগ করলেন। এই অসামান্যা ধর্মপরায়ণা নারীর কথা অমান্য করবার ক্ষমতা চুণীলালের ছিল না।

ছিদাম জ্যেঠাই-মা'র সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়ে নিল ক্রমে। বৃদ্ধা ছিদামের কাছে তার বাবা বৈদ্যনাথের দোরে হত্যে দেবার কথা জিজ্ঞাসা করতেই, ছিদাম এমনি ভনিতা করে বর্ণনা শুরু করলে যে তিনি একবারে গলে গেলেন।

চুণীলাল ফিরে এসে দেখলেন ছিদাম সকলের সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিয়েছে—ছোট ছেলেমেয়েরা তার চারদিকে ভীড় করে বসেছে এবং ছিদাম গল্প জুড়ে দিয়েছে তাদের সঙ্গে। চুণীলালকে দেখে ছিদাম তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলে।

তারপর একটি গ্লাশে জল নিয়ে এসে চুণীলালের সামনে হাটুগেড়ে বসল। হাতযোড় করে ভক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলল: বাবু, একটু পায়ের ধুলো?—চুণীলাল কিছু বলবার পূর্বেই ছিদাম তাঁর ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটি গ্লাশের

ভিতর ডুবিয়ে নিয়ে প্রণাম করে নিঃশব্দে চলে গেল। নন্দরাণী সামনেই ছিলেন, তাঁর পানে চেয়ে চুণীলাল একটু বিরক্তির সঙ্গেই বললেন: আচ্ছা পাপ! এসব আবার কি?

নন্দরাণী বললেন: আহা বাধা দাও কেন। ঠাকুরের আদেশ—

চুণীলালের কাছে ঠাকুরের আদেশের চেয়ে নন্দরাণীর আদেশটাই বড়; সুতরাং আর কোন কথা বললেন না কিম্বা বাধাও দিলেন না। খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বললেন: কিন্তু এদিকে যে মহা মুস্কিল। এ মুলুকে চাকর পাওয়া তো দায়। সারা শহর তোলপাড় কোরেও কোথাও পেলুম না একটা চাকর।

—উপস্থিত চাকরের জন্যে বেশী মাথা ঘামাতে হবে না তোমার।—বলে নন্দরাণী অদূরে দণ্ডায়মান আনত-মস্তক ছিদামের পানে তাকিয়ে স্বামীর উদ্দেশে সহাস্যে বললেন: ছিদাম নিজের হাতে তোমার সেবা করবে, ঠাকুরের আদেশ, কাজেই উপস্থিত চাকরের অভাব মিটিয়ে দিয়েছে ও।

চুণীলাল বোকার মতো তাঁর পানে তাকালেন, কিছু তেমন বুঝলেন বলে মনে হল না। কিন্তু স্নান করবার সময় তিনি দেখলেন—বাড়ীর কয়লার ঘরটাকে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল—সেইটি ছিদামের শোবার ঘর হয়েছে। সে একমাস নাকি বাড়ীর বাইরে যাবে না, লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকবে যাবার আদেশক্রমে। চুণীলাল বাথরুমে ঢুকে দেখেন, জলের চৌবাচ্চা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে জল ভর্তি করা হ'য়েছে—বাথরুমের চেহারা বদলে গেছে পরিচ্ছন্নতায়। স্নান শেষ করে দেখেন, ছিদাম বস্ত্রাদি নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে। আহারের সময়ও ছিদাম পাখার বাতাস করলে। বিশ্রামের সময় পদসেবা করলে। চুণীলাল ছিদামকে কোন কিছু করতে বলেন না, আবার করতে নিষেধও করেন না। ছিদামের সঙ্গে বাক্যালাপ পর্যন্ত করেন না। শুধু ছিদামের হাবভাব গতিবিধি লক্ষ্য করেন মাত্র।

জ্যেঠাইমা বৃদ্ধা। সন্ধ্যা হলে বাতের ব্যথায় ছটফট করেন, ছিদাম সযত্নে কবরেজী তেল মালিশ করে তাঁকে ঘুম পাড়ায়। তিনি কায়মনোবাক্যে আশীর্বাদ করেন ছিদামকে। জিজ্ঞাসা করেন তার দেশের কথা। জিজ্ঞাসা করেন বউয়ের কথা। জ্যেঠাইমা ধর্মপরায়ণা স্ত্রীলোক। ধর্মকর্ম নিয়েই থাকেন রাতদিন। মানুষকে ধর্মবিষয় উপদেশ দিতেও ভালোবাসেন তিনি খুব। প্রত্যহ দুপুরে রামায়ণ পাঠ তাঁর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে।

একদিন দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর ছিদাম তাঁর পায়ে যথারীতি তেল মালিশ করে দিচ্ছে এমন সময় তিনি প্রশ্ন করলেন: হ্যাঁ রে ছিদাম, রামায়ণ, মহাভারত পাঠ শুনেছিস কখনো।

বোকার মত তাঁর পানে চেয়ে ঘাড় নাড়ে ছিদাম। জানায়, শোনেনি সে ওসব কোনদিন।

—সে কি রে! তুই যে অবাক করলি! সবিস্ময়ে তার পানে চেয়ে জ্যেঠাইমা বললেন: বাঙালীর ছেলে রামায়ণ, মহাভারত শুনিসনি কি বল্?

—আমি কি লেকাপড়া জানি।—মাথা নিচু করে বলে ছিদাম।

—ওমা, তাতে কি? তোদের গাঁয়ে ঘরে বুঝি ওসব পাঠ হয় না কোথাও?

—হয়, আমি শুনতে যাই না।

—শুনতে যাস না? কেন?

—ওসব ধম্মকথা আমি বুঝতে পারি না, ভালোও লাগে না।—বলেই জোরে জোরে মালিশ করতে লাগলো ছিদাম মাথা নিচু করে। জ্যেঠাইমা গালে হাত দিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করলেন: ভালো লাগে না কি রে হতচ্ছাড়া! আচ্ছা রোজ দুপুরে আমার কাছে বসে বসে রামায়ণ শুনিস দিকি, দেখবো ভালো লাগে কিনা।

পরদিন থেকে আহারাদির পর দুপুরে প্রথমে জ্যেঠাইমার বাতপঙ্গু পায়ে কবরেজী তেল মালিশ, তারপর জ্যেঠাইমার মুখে রামায়ণ পাঠ শোনা নিয়মিত চলতে লাগলো ছিদামের।

এক একটি অধ্যায় পড়েন জ্যেঠাইমা আর ব্যাখ্যা ক'রে ক'রে বোঝাতে থাকেন। অবাক হ'য়ে শোনে ছিদাম। শুনতে শুনতে চোখ দুটো বড় বড় হ'য়ে ওঠে বিস্ময়ে। মনের মধ্যে তোলপাড় হ'য়ে ওঠে তর্ক। এও কি সম্ভব! চোর কি কখনো সাধু হয়।

জীবনে কোনদিন ধর্মকথা শোনেনি ছিদাম। শোনে নি কারো মুখে উপদেশ। অন্যায়কে জীবনের সঙ্গী করে অধর্মের রথ চালিয়েছিল সে এতদিন। কারো ভালো কথায় কোনদিন কান দেয়নি সে ভয়ে, পাছে ধর্মের পাগলামি মাথায় ঢুকে পড়ে—পাছে তার উপায়ের রাস্তা বন্ধ হ'য়ে যায় ধর্মের পাহারায়। তা ছাড়া ওসবে বিশ্বাসও নেই তার। তার ধারণা চোর বাটপাড় কখনো সাধু হতে পারে না, সাধুও কখনো চোর হয় না! চোর সেকথা শুনলে বা ধর্ম করতে গেলে শুধু কষ্টই হবে, আর কিছু হবে না। চোর চিরকাল চোরই থাকে, সাধু সাধুই। কিন্তু আজ এ কি কথা শুনছে সে, জোঠাইমা একি শোনাচ্ছেন তাকে! এমন কথা জীবনে তো শোনেনি সে। রামায়ণের রত্নাকর—দস্যু রত্নাকর—সে কিনা হ'ল সাধু বাল্মীকি! বুকখানার ভেতর তোলপাড় ক'রে উঠল তার। আরো মোচড় দিয়ে উঠলো বুকখানা যখন শুনলে —রত্নাকর যাদের ভরণপোষণ করবার জন্যে চুরি করতো, তারা কেউ পাপের ভাগি হতে চাইলো না তার। তাহলে, তাহলে ছিদামের কি হবে অবস্থা! সারা জীবন ধরে যে পাপ সে সঞ্চয় করেছে কি হবে তার পরিণাম!—কিন্তু—আবার একটা সন্দেহ দোলা খেয়ে গেল মনে—কেতাবের কথা কি সত্যি!

মালিশ করতে করতে হাত কখন থেমে গেছে ছিদামের জানতে পারেনি। দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে তার জোঠাইমার মুখের দিকে। অবাক হয়ে শুনছে তাঁর কথা।

জোঠাইমা বোঝাচ্ছেন তখন রত্নাকরের পাপ জীবনের অবসান সম্বন্ধে। কেমন ক'রে রত্নাকরের পরিবর্তন সম্ভব হ'ল! অকস্মাৎ প্রশ্ন করে উঠলো ছিদাম: এও কি হয় মা? ডাকাত সে কখনো—

—কেন হবে না?—জোঠাইমা বললেন: ডাকাত হলেও রত্নাকর তো মানুষ ছিল। সমস্ত জীবেই ভগবান বিরাজ করেন। সুমতি কুমতি সব মানুষের ভেতর আছে। কুমতিকে এড়িয়ে যে সুমতির আশ্রয় নেয় সেই সাধু হ'তে পারে। ভগবান তাকেই আশীর্বাদ করেন। কুমতির প্রভাব কাটিয়ে যেমন উঠলো রত্নাকর—যেমন সে বুঝলে পাপের পথে শান্তি নেই—অমনি সে সাধু হ'য়ে গেল। রাম নামে বিভোর হ'য়ে গেল।

রাম নামে!—ছিদাম কি যেন ভাবতে লাগলো উদাস হয়ে। বুকের ভেতর থেকে একটা কান্না যেন ঠেলে বেরিয়ে আসার উপক্রম করতে লাগলো। কতক্ষণ মনে নেই এই-ভাবে কেটে গেল। জোঠাইমার সব কথা তার কানে গেল না। তারপর হঠাৎ সে এক সময় ছেলে মানুষের মত কেঁদে উঠলো। মাথাটা তার নিচু হ'য়ে লুটিয়ে পড়লো জোঠাইমার পায়ের ওপর।

আশ্চর্য হয়ে জোঠাইমা বললেন: এ কি রে ছিদাম? কি হ'ল? অমন করছিস কেন?

ছিদাম আত্মসংবরণ করে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল: মা—তুমি আমাকে নূতন আলো দেখালে, নূতন আলো দেখালে। —আজ আমার পুনর্জন্ম হল।—একটা দম নিয়ে আবার বললে: মা, আমি মহাপাপী। আমি মিথ্যাবাদী, চোর —আমায়, আমায় বলে দাও—শিখিয়ে দাও—কি করে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে? আর কথা বলতে পারলে না সে।

রাইমণি স্নেহভরে ছিদামের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন: অনুশোচনা তোমার এসেছে—এবার ভগবান তোমাকে দয়া করবেন—মনে মনে রামনাম স্মরণ করো খালি। যে নাম নিয়ে দস্যু রত্নাকর বাল্মীকি হয়েছিলেন।

কিছুক্ষণ মৌনভাবে থেকে ছিদাম বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল: তুমি জান না মা, আমি কি মহাপাপী—আমি তোমাদের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছি। বাবু ঠিকই অনুমান করেছেন, আমি ভণ্ড, আমি পাষণ্ড। আমি কতো লোকের সর্বনাশ করেছি তার ঠিক নেই। লুঠতরাজ করেই জীবনের এতদিন কাটিয়েছি। শেষে একটা খুনের মামলায় জেল হয়েছিল। জেল ভেঙে পালিয়ে এসে মিথ্যে কথা বলে —ঠাকুর দেবতার নাম নিয়ে তোমাদের সঙ্গেও প্রবঞ্চনা করেছি।—বল মা আমার প্রায়শ্চিত্ত কী? আমার মত পাপীকে কি দয়া করবেন ভগবান?

তার স্বীকারোক্তি শুনে জোঠাইমা শিউরে উঠলেন —মন তাঁর বিষিয়ে উঠল এই প্রবঞ্চকের কাহিনী শুনে। অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলেন না তিনি, তারপর বললেন: ছিদাম তুমি তোমার পাপ স্বীকার করেছ, অনুতপ্ত হয়েছ এই কারণে আমিও তোমাকে ক্ষমা করলুম! তুমি যদি সত্যি সত্যিই

অনুতপ্ত হয়ে থাক তবে ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ কর—তাঁর ভজন পূজন কর।—তারপর আরো কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর আস্তে আস্তে তিনি বললেন: একটা গল্প শোনো। বেশী দিনের কথা নয়, একজন মহাপুরুষ জন্মেছিলেন নবদ্বীপে। নাম তাঁর নিমাই—তিনি বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচার কর্তে গিয়ে দুই ভীষণ গুণ্ডা মহাপাপী জগাই মাধাইএর সঙ্গে দেখা করে তাদের উদ্ধার করেছিলেন কেবল নাম বিলিয়ে!

ধীরে ধীরে জ্যেঠাইমা বলতে লাগলেন অতীতের সেই পুণ্য কাহিনী। কেমন করে সেই পাষণ্ড জগাই মাধাই উদ্ধার পেলো—কলসীর কাণা মেরেও ভগবানের দয়া হতে বঞ্চিত হয়নি তারা। নামের গুণে পাপী জগাই-মাধাই পর্যন্ত তরে গেল। শেষে বললেন: ছিদাম তুমি যদি সত্যই অনুতপ্ত হ'য়ে থাকো তাহলে একান্ত মনে রাম নাম করো, সব পাপ ধুয়ে যাবে।

ছিদাম একাগ্রচিত্তে শুনে যেতে লাগলো জ্যেঠাইমার কথা। বুকটার মধ্যে কেমন যেন একটা যন্ত্রণা—কেমন যেন একটা জ্বালা অনুভব করতে লাগলো ছিদাম। ইচ্ছে হতে লাগলো কি যেন একটা করতে, কিন্তু সে ইচ্ছাটা কি সে বুঝতে পারলে না।

পরদিন সকালে ছিদামকে আর দেখা গেল না চুণী-বাবুর বাড়িতে। চুণীবাবু ঘন্ন হেসে বললেন: এ রকম হবে আমি জানতুম। আমি তো আগেই বলেছিলুম ও ব্যাটা একনম্বরের জোচ্চোর। দেখ এখন কিছু নিয়ে-টিয়ে সরল কিনা। কত রকমের বদমাশই যে আছে দুনিয়ায়! ব্যাটা বলে কিনা বাবা বিশ্বনাথের আদেশ—সামনে দণ্ডায়মানা নন্দরাণীকে লক্ষ্য করে বললেন: নাও বোঝ এবার, ঠাকুরের আদেশ কেমন!

অধোবদন হলেন নন্দরাণী। জ্যেঠাইমা কাছে ছিলেন তিনিও লজ্জিত হলেন।

যাই হোক পরে অনুসন্ধান করে দেখা গেল বাড়ির কিছুই খোয়া যায় নি। ছিদাম শুধু হাতেই চলে গেছে। চুণীবাবু বললেন: সুবিধে করতে পারেনি হয়ত। কিম্বা ভেবে দেখলে সুবিধে তেমন হবেও না এখানে, তাই সরে পড়লো।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে অকস্মাৎ দৈনিক পত্রিকার একটি বিশেষ সংবাদের ওপর দৃষ্টি পড়লো চুণীবাবুর। সংবাদের মর্ম এইরূপ:

একটি দাগী আসামী বহুদিন যাবৎ আত্মগোপন করে থাকার পর হঠাৎ কয়েকদিন পূর্বে নিজে এসে পুলিসের হাতে ধরা দিয়েছে। আসামীর নামে নানা অভিযোগ—রাহাজানী, চুরি থেকে আরম্ভ করে খুন পর্যন্ত। মাস কয়েক পূর্বে হাজত থেকে আসামী উধাও হয়েছিল। ছদ্মবেশ ধারণে আসামী সিদ্ধহস্ত। আসামীর নাম—শ্রীনিবাস তালুকদার।

চুণীবাবু সংবাদটি নিজেও পড়লেন এবং নন্দরাণী ও জ্যেঠাইমাকেও শোনালেন। জ্যেঠাইমার মনটা কেমন ছাৎ করে উঠলো শুনে। ছিদাম নাকি! কিন্তু মনের কথা কাউকে জানতে দিলেন না তিনি। চুণীবাবুর মনেও সে সংশয় দেখা দিলে।

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। ভাঙা গড়ার ভেতর দিয়ে দশ বছর কালের কোলে হারিয়ে গেছে। এবারও চুণীলাল দেওঘরে বেড়াতে এসেছেন পরিবারবর্গ নিয়ে। এবারে এসে উঠেছেন স্থানীয় এক ধনী মক্কেলের বাড়িতে। মক্কেলটি ধনীও বটে, ধার্মিকও বটে। সাধু সজ্জন করে বেড়ান খুব।

সেদিন সান্ধ্য বৈঠকে ওই সম্বন্ধে আলোচনাই হচ্ছিল। মক্কেল লছমীনারায়ণকে চুণীলাল জিজ্ঞাসা করলেন: তারপর লছমীনারায়ণবাবু, সাধুসঙ্গ কেমন করছেন বলুন? নতুন সাধু-টাধুর কোন সন্ধান পেলেন?

—নিশ্চয়ই।—খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন লছমী নারায়ণ।—বছর তিন থেকে এক পাগলা সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয়েছে এখানে। সে এক বদ্ধ পাগল মশাই! তার সঙ্গে মিশতে পারলে সে বেশ ভালো ভাবেই আলাপ করে। অনেক চেষ্টার পর আজ কদিন হ'ল আমার সঙ্গে ভালো ভাবে কথাবার্তা বলছেন। একটু থেমে লছমী নারায়ণজী বললেন: আমার কাছে তাঁর অতীত জীবনের যে ইতিহাস বলেছেন তা সত্যিই অদ্ভুত। তিনি নাকি পূর্বে ঠিক রত্নাকরের মতই একজন ভয়ঙ্কর দস্যু ছিলেন, একটি মহিলার উপদেশে তিনি সে-পথ পরিত্যাগ করে

সৎ হবার চেষ্টা করছেন। বলেন নাকি রামায়ণ শুনতে শুনতেই তাঁর পরিবর্তন আসে।

চুণীলালের ললাট কুঞ্চিত হল। খানিকক্ষণ কী যেন ভেবে বললেন: রামায়ণ শুনতে শুনতেই।—অনেক দিন আগেকার একটা ক্ষীণ স্মৃতি যেন মনে পড়লো।

লছমীনারায়ণ বললেন: লোকটার নাকি খুনের দায়ে জেল হয়েছিল। তারপর জেল থেকে পালিয়ে এক ভদ্রলোকের বাড়ি আত্মগোপন করেছিল। সেইখান থেকেই তার জ্ঞানোদয় হয় এবং হঠাৎ আবার একদিন নিজেই গিয়ে পুলিশে ধরা দেয়। সাত বছর বুঝি তাঁর জেল হয়েছিল। কিন্তু—

—কোথায় থাকেন সে সন্ন্যাসী?—অন্যমনস্কভাবে প্রশ্ন করলেন চুণীলাল।

—রোহিনী রোডে। একটা পোড়ো বাড়ির সামনে একখানা কুঁড়ে বেঁধে থাকেন। তাঁর মুখে শুনেছি—সেইখান থেকেই নাকি তিনি জ্ঞানের আলো দেখতে পেয়েছেন!

—সাধুজীর কোন অলৌকিক ক্ষমতা টমতা—

—না না, সে সব কিছু দেখা যায় নি। কিন্তু তাঁর মুখের রামায়ণ গান অপূর্ব মধুর। তাঁর মুখে একবার রাম নাম শুনলে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত স্মরণ থাকবে।

—বলেন কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। যে পোড়ো বাড়িটার সামনে তিনি আশ্রম বেঁধে আছেন, দশ বছর আগে সেই বাড়িতে এক স্বাস্থ্যান্বেষী পরিবার এসেছিলেন। সেই পরিবারের একটি বর্ষীয়সী ধর্মপ্রাণ মহিলা নাকি তাঁর মনে জ্ঞানের প্রদীপ জেলে দিয়েছিলেন।

ভীষণ ভাবে চমকে উঠলেন চুণীবাবু।—সেই মহিলাটির নাম জিগ্যেস করেছিলেন কি?

—নাম? না, তা জিগ্যেস করিনি। তবে সাধুজী বলেন—গুরুমা। কিন্তু কেন বলুন তো?

—না, এমনি।—অন্যমনস্ক হ'য়ে গেলেন চুণীবাবু। কি যেন ভাবতে লাগলেন। গভীরতম চিন্তা রেখান্বিত হ'য়ে উঠলো তাঁর মুখে, তাঁর কুঞ্চিত ললাটে, তাঁর প্রদীপ্ত চক্ষে।

বহুক্ষণ নীরবতার কেটে যাবার পর আস্তে আস্তে চুণীবাবু বললেন: কাল যাব আপনার সঙ্গে সাধুজীকে দেখতে।

—বেশ, বেশ, নিয়ে যাবো আমি। বাড়ির মেয়েদেরও—

ঠিক এই মুহূর্তে চুণীবাবুর বড় ছেলে হঠাৎ উপস্থিত হ'ল। চুণীবাবুর ছেলের নাম হীরালাল—গত বৎসর এম-এ আর শ' পাশ করে বাপের কাছে তালিম নিচ্ছে। সে ব্যস্তভাবে বললে: বাবা, শিগগির আসুন, এক মহা মুশকিলে পড়া গেছে।

—কেন, কি হ'ল?—চুণীলাল ও লছমী নারায়ণজী সমস্বরে প্রশ্ন করলেন।

—না ভয়ের কিছু নয়।—একটু হেসে হীরালাল বললে: ঠাকুমা এক ফ্যাসাদ বাঁধিয়ে বসেছেন।

—ঠাকুমা? মানে জোঠাইমা?

—হ্যাঁ। লছমীবাবুর স্ত্রীর মুখে এক সাধুর খবর পেয়ে তিনি সকাল থেকে আমায় তাড়া দিচ্ছিলেন সেখানে নিয়ে যাবার জন্যে। বিকাল বেলা মাকে আর তাঁকে নিয়ে সেই সাধুর আশ্রমে গেলুম।

—কোথায় সে সাধুর আশ্রম?—লছমীনারায়ণজী প্রশ্ন করলেন।

—রোহিণী রোডে। ঠাকুমা সেখানে গিয়ে আর কিছুতে আসতে চাইছেন না। সাধুজীও ঠাকুমাকে ছাড়তে চাচ্ছেন না। সাধুজী বলে, ঠাকুমা নাকি তাঁর গুরুমা। ঠাকুমাকে দেখার অপেক্ষাতেই তিনি ঐখানে পড়ে আছেন আজ তিন বছর। দশ বছর আগে সেইখানের পোড়ো বাড়িটাতে নাকি আপনারা ভাড়া ছিলেন কিছুদিন? সেই সময় তাঁর নাকি পরিচয় হয় আপনাদের সঙ্গে এবং ঠাকুমার সঙ্গে।

বিস্ময়ের ঘোর খানিকটা কেটে গেল চুণীবাবুর।

—ঠিকই হ'য়েছে। যা ভেবেছি—এ নিশ্চয়ই সেই ছিদাম!—কতকটা আত্মগতভাবে বললেন: কিন্তু, কিন্তু আজকের দিনেও এমন সম্ভব? আজকের রত্নাকরও বাল্মীকি হ'তে পারে!—উঃ, কি আশ্চর্য পরিবর্তন।

—ছিদাম! ছিদামটা কে?—লছমীনারায়ণ প্রশ্ন করলেন।

—সে এক মজার গল্প। পরে বলবো। চলুন এখন রোহিণী রোডে একবার ঘুরে আসি।

তাঁরা ব্যস্ততার সঙ্গে যাত্রা করলেন রোহিণী রোডের দিকে।

আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ হাসছে। ঝির ঝির করে দক্ষিণা বাতাস বইছে। রাত প্রায় এগারোটা।

লছমীনারায়ণের মোটর চুন্নীবাবু, হীরালাল প্রভৃতিকে নিয়ে তীর বেগে ছুটেছে বক্সিনাথের কাঁকর বিছানো রাঙা পথের বুকের ওপর দিয়ে। পথ নির্জন। আশে পাশে বসতি নেই। একটা বাঁকের মুখে গাড়ির গতি মন্থর হ'ল। শোনা গেল অনেক দূরে যেন একটি কান্নাভাঙা পরিচিত কণ্ঠে রামায়ণ গান হ'চ্ছে।—

"জয় রঘুপতি রাঘব রাজারাম—
পতিত পাবন সীতারাম
রাজারাম—রাজারাম···"

রাঢ়ের প্রাচীন ইতিহাস

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল প্রত্নতত্ত্ববিদ্

সুপ্রাচীনকালে রাঢ়দেশ পুণ্যতীর্থে, সৌর্য্যবীর্য্যে, ধনধান্যে ও শিল্প-বাণিজ্যে এক সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। আজিও রাঢ়দেশের বিভিন্নাঞ্চলে বহু প্রাচীন কীর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। বর্ত্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত মহানাদ প্রাচীন রাঢ়দেশের পুণ্যতীর্থ ও অন্যতম রাজধানী।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে মহানাদ এক পুণ্যতীর্থ। মহামুনি বশিষ্ঠ তাম্রাপীঠ হইতে মহানাদে আসিয়া আশ্রম স্থাপনপূর্ব্বক শেষ জীবনযাপন করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ গঙ্গাবারিতে অবগাহন করিবার আশায় ভাগীরথী হইতে আশ্রম পর্য্যন্ত একটি শাখা নদীর সৃষ্টি করেন। বর্ত্তমানে আশ্রম সংলগ্ন অংশ "বশিষ্ঠগঙ্গা" নামে এক বৃহৎ পুষ্করিণীর আকার ধারণ করিয়াছে। তৎকালীন আশ্রমটি জিয়ৎকুণ্ড, মুক্তকুণ্ড, সিদ্ধকুণ্ড, যজ্ঞকুণ্ড, অগ্নিকুণ্ড, গোদকুণ্ড, ক্ষীরকুণ্ড, দুন্দুরকুণ্ড, যোগিনীকুণ্ড, দুর্গাকুণ্ড, গৌরীকুণ্ড এবং রাধাকুণ্ড নামক দ্বাদশ কুণ্ড দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। মহামুনি বশিষ্ঠ ব্যতীত অন্যান্য বহু ঋষি-মুনি এই আশ্রমে তপস্যা করিতেন তাহা বলা বাহুল্য।

আদি তীর্থঙ্কর শ্রীশ্রীগোরক্ষনাথ স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচারকালে মহানাদে শুভাগমন করেন। তাঁহারই সময় হইতে এই আশ্রমটি "নাথমঠ" নামে অভিহিত হইয়াছে। জিয়ৎকুণ্ডের দক্ষিণতীরে যোগিগণের সমাধি রহিয়াছে; তন্মধ্যে একটি "জীবন্ত সমাধি" নামে বিদিত। কোন হঠযোগী জীবন্ত অবস্থায় সমাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই প্রকার নামকরণ হইয়াছে। রাজপুতানায় এই প্রকার জীবন্ত সমাধি পরিদৃষ্ট হয়।

সুপ্রাচীনকাল হইতে মঠটি নাথ সম্প্রদায় মহান্তগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। মহান্তগণের সঠিক ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে যে সকল মহান্ত কর্ত্তৃক মঠের মন্দিরাদির সংস্কার হইয়াছে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

খৃষ্টীয় ১৮০৮ অব্দে মহান্ত মহারাজ অচলনাথ যোগীরাজ ৺জটেশ্বর নাথ মহাদেবের মন্দিরটির সংস্কার করেন।

খৃষ্টীয় ১৮১৩ অব্দে ভগবন্ত নাথ যোগেশ্বর যোগীরাজ জোড়বাংলা মন্দিরে অন্নপূর্ণা দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যোগিনীকুণ্ডের

শ্রীশ্রীজটেশ্বরনাথ মহাদেবের মন্দির এবং পার্শ্বে "জোড়বাংলা" শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা দেবীর মন্দির

পঙ্কোদ্ধার করেন। কুণ্ড হইতে আবিষ্কৃত দুইটি প্রস্তরময় বুদ্ধমূর্ত্তি এই মন্দিরাভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ১৮৯৮ অব্দে মহান্ত মহারাজ নন্দনাথ যোগীরাজ ৺জটেশ্বর নাথ মহাদেবের মন্দির সংলগ্ন নাটমন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং

মন্দির প্রাঙ্গণটি একটি ইষ্টক নির্ম্মিত উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করেন।

খৃষ্টীয় ১৯০৫ অব্দে মহারাজ মহারাজ মণীন্দ্রনাথ যোগেশ্বর বৈদ্যরাজ ৺কটেশ্বর নাথ মহাদেবের মন্দিরটি সংস্কার করেন এবং মন্দিরের চতুর্দ্দিকে বারান্দাটি নির্ম্মাণ করেন।

খৃষ্টীয় ১৯১৩ অব্দে মহারাজ মহারাজের সময় নাথ যোগেশ্বর বৈদ্যরাজ মন্দিরের ভিতর-বাটীর ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীরটি নির্ম্মাণ করেন ও একটি একটি ইন্দারা খনন করাইয়া দেন।

খৃষ্টীয় ১৯২৫ হইতে ১৯৩৩ অব্দ পর্য্যন্ত মহারাজ মহারাজ লক্ষ্মী নাথ যোগেশ্বর বৈদ্যরাজ কর্ত্তৃক বশিষ্টগঙ্গার ইষ্টক নির্ম্মিত ঘাট প্রস্তুত, ক্ষিরকুণ্ড ও ক্ষীরকুণ্ডের পাষোদ্ধার, শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা, সমাধি সংস্কার, কলকুণ্ড প্রতিষ্ঠা ও উদ্যান রচনাদির কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

ভারতের রাজধানী দিল্লী নগরীতে প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের সন্নিকটস্থ রক্ষিত লৌহস্তম্ভে খোদিত লিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে—চন্দ্র নামে কোন পরাক্রমশালী নৃপতি গঙ্গার মোহনা হইতে আরম্ভ করিয়া

শ্রীধরাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির। (৩০০ বৎসরের এক পুরাকীর্ত্তি)

সিন্ধুদেশ পর্য্যন্ত ভূভাগ জয় করিয়া এক সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। আনুমানিক খৃষ্টীয় চতুর্থ অব্দে তিনি ভারতভূমিতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই মহারাজ চন্দ্রের রাজত্বকালে সমৃদ্ধ ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ত্তমান মরানাদের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে চন্দ্র বীথি নামে এক সুবৃহৎ বীথি বা জলাশয় তাহার স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। এতদ্ভিন্ন তিনি মহানাদ নাথ-মঠে অনেক ভূমি ও জলাশয় দান করিয়াছিলেন। সেই প্রাচীন কাল হইতে আজিও সরকারী জরীপের সময় তাঁহার দানের কথা লিপিবদ্ধ করা হয়। মহানাদ হইতে সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণী যাতায়াতের জন্য যে প্রশস্ত পথটি রহিয়াছে ইহাও তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি। রাজের রাজা চন্দ্রের উপাধি ছিল 'কেতু'। সেইজন্য তিনি চন্দ্রকেতু নামে পরিচিত।

চন্দ্রকেতুর পরবর্ত্তীকালে গুপ্তবংশীয় নৃপতিগণের রাজত্বকালে রত্নাদি যে সমৃদ্ধ হইয়াছিল তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। সুপ্রাচীন মহানাদ বহু ভগ্ন পুরাকীর্ত্তি অরণ্যাবৃত ছিল। খনন কার্য্য ও গবেষণার অভাবে গুপ্তগুলির বিবরণ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পায় নাই।

গত ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে নাথমঠের সন্নিকটে জেলাবোর্ডের রাস্তার ঠিক পার্শ্বেই একটি প্রাচীন স্তূপ খনন করিয়া আমি এক প্রাচীন অট্টালিকার প্রাচীর আবিষ্কার করি। রাস্তার পার্শ্ব খনন করিবার অনুমতি প্রাপ্তির আশায় জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট পত্র দিয়াছিলাম। চেয়ারম্যান আমার আন্তরিক ইচ্ছা সাফল্যমণ্ডিত করিবার ইচ্ছায় জেলাবোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার মিঃ সি, সি মুখার্জ্জীকে নির্দ্দেশ করেন।

জেলাবোর্ডের অনুমতি পত্রখানি পাইয়া পুনরায় খনন কার্য্য আরম্ভ করিবার ফলে কতিপয় বৃহদাকার ইষ্টক ও দুইটি বুদ্ধমূর্ত্তি কোষিত ধূসর ছাঁচ (Terracotta Matrix) আবিষ্কার করি। একখানি ইষ্টক ও ছাঁচ দুইটি কলিকাতার ভারতীয় সংগ্রহাগারের (Indian Museum, Archaeological Department) তদানীন্তন

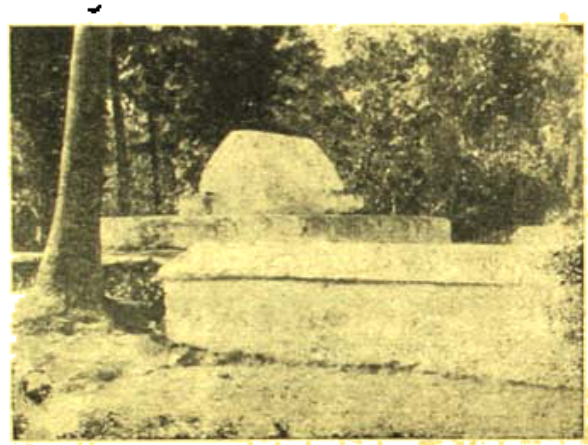

কাজীমন দাহেবের সমাধি। (১০০ বৎসরের প্রাচীন নিদর্শন)

সুপারিটেন্ডেন্ট নলীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করি। মজুমদার মহাশয় দ্রব্যগুলির প্রাচীনত্ব উপলব্ধি করিয়া সংগ্রহাগারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। তিনি কয়েক দিন পরেই মহানাদে যাইয়া আমার আবিষ্কৃত স্থান পরিদর্শন করেন। তিনি মহানাদ নাথমঠের প্রাচীন মন্দির, মূর্ত্তি এবং স্তূপাদি পরীক্ষা করিয়া গুপ্ত ও পালবংশীয় নৃপতিগণের রাজত্বকালীন নিদর্শন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। অতঃপর তিনি এই প্রাচীন স্তূপটি খনন করিবার জন্য সচেষ্ট হন।

খৃষ্টীয় ১৯৩৭ অব্দে নলীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্ত্তৃক আমার নির্দ্দিষ্ট স্তূপে খনন কার্য্য আরম্ভ হয়। কয়েক দিন খননের ফলে প্রাচীন ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ, বৃহৎ পাট নির্ম্মিত একটি কূপ, বেওয়ারিস পাথরের মনুষ্যের মস্তক (Buccohead) এবং বহুবিধ মৃৎ-পাত্র-খণ্ড আবিষ্কৃত হয়। মনুষ্যের মস্তকটি এবং কতিপয় মৃৎ-পাত্র-খণ্ড ভারতীয় সংগ্রহাগারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়। মহানাদের খনন কার্য্যের বিষয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উর্দ্ধতনগণ নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

The Annual Report of the Archaeological Survey of India for the year 1934-35.

"At a third Site in Bengal named Mahanad in Hooghly district an exploratory trench revealed the existence of interesting Structures. All the three sites are attributed to the period from the 5th to the 7th Century A. D., when Bengal appears to have had particularly prosperous times."

গত ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ পুনরায় এই স্তূপে খনন করেন এবং সমগ্র স্তূপটি "সংরক্ষিত অঞ্চল" বলিয়া ঘোষণা করেন।

নাথমঠের মধ্যস্থলে লিঙ্গরাজ জটেশ্বর নাথ মহাদেবের প্রস্তরময় মন্দির বিরাজিত। এই মন্দিরের তলদেশস্থ ইষ্টকাদি পরীক্ষা করিয়া গুপ্ত যুগের নিদর্শন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। মঠে এক প্রকার স্বয়ম্ভূমূর্ত্তি শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হয়। এই প্রকার শিবলিঙ্গ রাজাধিরাজ কুমারগুপ্তের সমকালীন প্রকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া স্থির হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন একপাদ ভৈরব মূর্ত্তি গুপ্তযুগের এক বিশিষ্ট অবদান। মঠে একটি একপাদ ভৈরব মূর্ত্তির নিয়মিতভাবে পূজা হইতেছে। আর একটি এই প্রকার ভৈরব মূর্ত্তি বশিষ্ঠগঙ্গার তীর খননকালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মে সংরক্ষিত হইয়াছে।

শিলা ভৈরবনাথের মন্দির গাত্রে একটি প্রস্তরময় "গণকীর্ত্তি" মূর্ত্তি প্রোথিত আছে। এই প্রকার গণকীর্ত্তি মূর্ত্তি গুপ্তযুগের একটি বিশেষ অবদান। মহানাদের ডাঃ অবনীমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই প্রকার মূর্ত্তি ক্ষোদিত একটি প্রস্তরফলক মহানাদ বাগান পাড়া (বা কাপড়ীপাড়া) মহল্লা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন।

মঠে সংরক্ষিত প্রস্তরময় কারুকার্য্যখচিত মকরাকৃতি জলনিকাশের প্রণালী দৃষ্ট হয়। এই প্রকার প্রণালী গুপ্তযুগের মন্দিরে ব্যবহৃত হইত।

খৃষ্টীয় ১৮৮২ অব্দে রেঃ জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় মহানাদ হইতে কুমারগুপ্তের একটি স্বর্ণ মুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। মুদ্রাটির এক পৃষ্ঠায় ধনুর্ব্বাণ হস্তে রাজমূর্ত্তি এবং অপর পৃষ্ঠায় লক্ষ্মী মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে(১)।

একই সময়ে রেঃ ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্কন্দগুপ্তের একটি স্বর্ণ মুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিলেন(২)। প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কানিংহাম পরেতে এই প্রকার স্কন্দগুপ্তের একটি স্বর্ণ মুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিলেন(৩)।

(১) Proceeding of the Asiatic Society of Bengal, 1882, P. 91; Journal of the Royal Asiatic Society, 1883, P. 116; Catalogue of Coins in the Indian Museum, vol. I, P. 115, No 33 and note 1.)

(২) Proceeding of the Asiatic Society of Bengal, 1882, P. 91; Journal of the Royal Asiatic Society, 1882, P. 119.

(৩) Ibid.

গত ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে মহানাদ নিবাসী ৺অন্নদাপ্রসাদের সহধর্ম্মিণী মহানাদ হইতে শশাঙ্কের একটি স্বর্ণ মুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই প্রকার মুদ্রার এক পার্শ্বে নন্দীর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট মহাদেবের মূর্ত্তি এবং অপর পৃষ্ঠে পদ্মাসনে সমাসীনা লক্ষ্মীর মূর্ত্তি আছে। মুদ্রাটি কলিকাতার ভারতীয় সংগ্রহাগারে সংরক্ষিত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন মহানাদে গুপ্তযুগের কতিপয় তাম্রমুদ্রা, বিভিন্ন প্রকার তাম্রময় ওজন ইত্যাদি আবিষ্কার করিয়াছি। এইগুলি হুগলী বৈদ্যবাটীর সারদাচরণ মিউজিয়মে সংরক্ষিত হইয়াছে।

গুপ্তযুগের পর পালবংশীয় নৃপতিগণের রাজত্বকালীন কতিপয় নিদর্শন নাথমঠে দৃষ্ট হয়।

খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর সুন্দর কারুকার্য্যখচিত এক প্রস্তরময় হর-পার্ব্বতী মূর্ত্তি নাথমঠে ছিল। গত ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তাহা ভারতীয় সংগ্রহাগারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে। মঠে একটি বিশাল গৌরীপট্ট রহিয়াছে। এই প্রকার গৌরীপট্ট রাঢ়দেশের অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। মঠের এক ক্ষুদ্র মন্দিরে খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর একটি বিষ্ণুমূর্ত্তির পূজা

গুপ্তযুগের একপাদ ভৈরব মূর্ত্তি এবং তৎপার্শ্বে মকরমূর্ত্তিবিশিষ্ট জলপ্রণালী

হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে গৌরকুণ্ড হইতে একটি প্রস্তরীভূত কূর্ম্মের অস্থিলতার মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মূর্ত্তিটি খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর একটি উৎকৃষ্ট অবদান বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় ভারতীয় সংগ্রহাগারে সংরক্ষিত হইয়াছে। মহানাদের গড়ের বাগান নামক স্থানে দুইপ্রকার পাল যুগের বিষ্ণু মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছি। মূর্ত্তি দুইটী সারদাচরণ মিউজিয়মে সংরক্ষিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন উক্ত অঞ্চলে একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছি। মন্দিরের বহির্ব্বাস একখানি ইষ্টক এই মিউজিয়মে সংরক্ষিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান মহানাদের উত্তরদিকে পাইকপাড়া নামে একটি পল্লী আছে। বৌদ্ধযুগে এই স্থানে "পাইকগণের" বাসস্থান ছিল।

বর্ত্তমান মহানাদের দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগে কোটালিপাড়া নামে একটি পল্লী আছে। এই স্থানে "কোটালগণ" বাস করিত।

বর্ত্তমান মহানাদের পশ্চিম প্রান্তে গড়ের ঘাট নামে এক প্রকাণ্ড সমতল ক্ষেত্র আছে। এই ক্ষেত্রের পার্শ্ব দিয়া বশিষ্ঠ-গঙ্গা নদী

প্রবাহিত হইতেছে। এই নদীর মাঝে মেরুপথকে এককোশল দিকা দিকা দেওয়া হইত।

এই স্থান হইতে প্রায় ৩ মাইল পশ্চিমে উত্তরপুরের পথা নামে একটি প্রকাণ্ড পরা বা পতিত ভূভাগ দৃষ্ট হয়। এই প্রকার উচ্চ অনুর্বর ও সুবিস্তৃত ভূভাগ এতদঞ্চলে দৃষ্ট হয় না। এই স্থান প্রাচীনকালে যুদ্ধক্ষেত্র ছিল বলিয়া আমার অনুমান হয়।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পাণ্ডু বা পাণ্ডব নামে জনৈক নৃপতি মহানাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। খৃষ্টীয় ১৩১০ অব্দে পাণ্ডুরাজ দীর সাহসুকী সুলতান বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে মহানাদ আক্রমণ করেন। ফলে উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। পাণ্ডু রাজা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সপরিবারে প্রাণ বিসর্জন করিলেন। অদ্যাপি এতদঞ্চলে পাণ্ডু রাজার প্রতিষ্ঠিত "পাণ্ডুই" নামক এক বৃহৎ দীঘি এবং তাঁহার অগ্নিদাহের প্রতিষ্ঠিত "ঘো হতীন" নামক অপর এক দীঘি বিদ্যমান রহিয়াছে।

কুমার গুপ্তের সমকালীন প্রতিষ্ঠিত শিবমূর্ত্তি

সুলতান সাহসুকীর জয়লাভের পর হইতেই মহানাদ এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মুসলমানগণের বসতি বিস্তার আরম্ভ হইল। কাজিমন সাহেব নামক একজন ফকীরের প্রচেষ্টায় সুলতান জয়লাভ করিয়াছিলেন। কাজিমন সাহেবের মৃত্যু হইলে সুলতান মহানাদ মধ্যে তাঁহাকে সমারোহের সহিত সমাহিত করিয়াছিলেন এবং একটি সমাধি স্থাপন করিয়াছিলেন। অদ্যাপি সেই সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে। সমাধিটি ফকির সম্প্রদায়ভুক্ত কতিপয় পরিবার কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। এতদঞ্চলের হি মুসলমান হি হিন্দু সকলেই ভক্তিভরে তথায় সিন্নি দেয়। প্রতি বৎসর উরুসের উপলক্ষে এখানে একটি মেলা বসে।

সম্রাট জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বকালে বিজয়ন নৃপতির অনুমতি ক্রমে পাটনানিবাসী যশোমোহন পণ্ডিত রায় মহাশয় এই মহানাদ নগর পরিদর্শন করেন। তাঁহার রচিত মেদাবলী বিবৃতি নামক গ্রন্থে "অথ মাদাত দেশ বিবরণম্" বলিয়া নগরের উল্লেখ আছে—

যোগি জাতি গৃহে জাতো ভাগ্যবান্ সর্বলক্ষণঃ।
মহেন্দ্র নারায়ণ নৃপে মাদাত নগরে পুরা॥
মৃত্তিকায়া দুর্গস্য মধ্যমাণ্ডঃ সমন্বিতম্।
স্থাপিতা বেণু বৃক্ষাস্ত দুর্গমধ্যে সুরারূপেঃ॥
প্রাচীনা রাজবাটীয় বর্ত্ততে তত্র বাটীকা।
রাজবাটাঃ পার্শ্ববর্ত্তী বহবঃ যোগিজাতয়॥

অথ মাদাত বিদ্যাত রাজেন্দ্রেণ—

(পুঁথিখানি সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরিতে)

এই পুঁথি ব্যতীত সাহেবের চক্রবর্ত্তীর "ধর্মমঙ্গল" গ্রন্থে অবগত হওয়া যায়—মীননাথ নামে জনৈক যোগী মহানাদের রাজা ছিলেন। উক্ত পুঁথি হইতে বেশ প্রমাণিত হয় যে তৎকালে মহানাদে যোগী জাতির বসতি বিস্তার ও আধিপত্য ছিল।

মুসলমান রাজত্বে মহানাদের অন্তর্গত কতিপয় মহল্লার নাম উল্লেখযোগ্য।

মহানাদে কাজীর বিচারালয় ছিল। এখনও কাজীপাড়া নামে একটি মহল্লা আছে এবং তথায় কাজী বংশধরগণ বাস করিতেছেন। কাজী-গণের প্রতিষ্ঠিত ভগ্ন মসজিদাদির নিদর্শন এবং বড় পীর নামে একটি পবিত্র সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে।

পীরাপাড়া নামক একটি মহল্লা আছে। এই স্থানে বহু ধনী মুসলমান পরিবারের বাস ছিল।

কাগজীপাড়া নামক একটি মহল্লা আছে। এই স্থানে বহু মুসলমান কাগজীর বাস ছিল। মহানাদের হাতে-গড়া কাগজ প্রসিদ্ধ ছিল। অদ্যাপি তৎকালীন কাগজের বড় ভূগর্ভ খনন কালে বহির্গত হয়।

হাড়মালা নামক আর একটি মহল্লা আছে। অদ্যাপি তথায় বহু মুসলমান পরিবার বাস করিতেছেন।

মহানাদ বক্ষে মুসলমান রাজত্বের বহু রঙ্গীন মৃৎপাত্র-খণ্ড আবিষ্কার করিয়াছি। এইগুলি দারুণাচরণ মিউজিয়মে সংরক্ষিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে এই প্রকার মৃৎপাত্র সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত সাহেবগঞ্জের পার্শ্ববর্তী মনুপড় নামক স্থানে আবিষ্কার করিয়াছিলাম। তৎসমুদয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের প্রতিষ্ঠিত সাহেবগঞ্জ উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের সংগ্রহাগারে সংরক্ষণ করিয়াছি।

ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম উনবিংশ শতাব্দীতে মহানাদের অনেক বিষয়ের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ১৮৫৮ অব্দে স্কটলণ্ডের মিশনারিগণ (Free Church of Scotland Mission) মহানাদে আসিয়া একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে বিদ্যালয়টি নব্য ইংরাজি বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে এবং ইহা স্থানীয় অধিবাসিগণের সাহায্যে পরিচালিত হইতেছে। গত ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে স্থানীয় অধিবাসিগণ

ফটিল্যাণ্ড মিসনের বাংলা বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ ডব্লু. এস. সোমেলির (Mr. W. S. Bomelle) নিকট বিক্রয় করিয়াছেন। পৃষ্টি ১৮৪৯ এবং ১৮৬০ অব্দে নীলকর আন্দোলনের অব্যবহিত পরেই মিসনারিগণের চেষ্টায় মহানাদে নীলের চাষ আরম্ভ হয়। তৎকালে মহানাদের তিনটি অঞ্চলে নীলকুঠি স্থাপিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে নীলকুঠিগুলির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

ভারতে ডাক বিভাগ প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগ হইতে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহানাদে "সাব পোষ্টাফিস" ছিল। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে উহা "ব্রাঞ্চ পোষ্টাফিসে" পরিণত হয় এবং ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। তৎপরে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহা ই. ডি. পোষ্টাফিসে পরিণত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে মহানাদে কয় ঘরীয় জমিদারগণের প্রভাব খুব বেশী ছিল। তাহাদের চেষ্টায় মহানাদ সুরম্য অট্টালিকা, মন্দির, চাঁদনী প্রভৃতিতে সুশোভিত ছিল এবং হাট-বাজার ও ব্যবসা বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে তাহাদিগের অট্টালিকা, মন্দির ও গোলমক বিদ্যমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে ১৭৭৩ শকাব্দে ৺সহজরাম করের পুত্র অর্জ্জুন দাস কর এবং ৺রামসুন্দরীর দাস করের পত্নী ভবময়ী দাসীর অর্থে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীলালজিউ প্রভুর এক চূড়া বিশিষ্ট অত্যুচ্চ মন্দিরটি বাস্তবিক দিকে এক মূতন অবদান।

মহানাদ অধর পাড়ায় প্রতিষ্ঠিত অভিধর মহাদেব এবং বিশালাক্ষী দেবীর পীঠস্থান সুপ্রাচীন।

মহানাদ দক্ষিণ পাড়ায় প্রতিষ্ঠিত খোটেশ্বরনাথ মহাদেব সুপ্রাচীন। মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে জনৈক ভবিষ্যার ভুজঙ্গভূষণ নিয়োগী মহাশয় এক নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। দক্ষিণ পাড়ার পঞ্চের বাগানে ১৭০৮ শকাব্দে প্রতিষ্ঠিত একটি কারুকার্য্য বিশিষ্ট ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দির এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী একটি গোলমক বিদ্যমান রহিয়াছে। ১৭৫৩ শকাব্দে নিয়োগী বংশকুলতিলক পক্ষি উপাসক ৺শম্ভুনাথ নিয়োগী মহাশয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরক্ষময়ী দেবীর অবয়ব মন্দিরটি বর্ত্তমান মহানাদের গৌরবের জিনিস।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে মহানাদের অবনতি ঘটিয়াছে।

পরিশেষে আমার বক্তব্য রাঢ় দেশের প্রাচীন ইতিহাস রচনা করিতে হইলে মহানাদের ন্যায় প্রাচীন রাঢ়ের অন্যান্য অঞ্চলগুলির তথ্য সংগ্রহ করা একান্ত আবশ্যক। এ বিষয়ে রাঢ় দেশবাসিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ভারতবর্ষ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

(১)

অতীত যাহার আছে—আছে তার দীপ্ত ভবিষ্যৎ।
যে সভ্যতা দেখা দিল বিচিত্র নগরমালা ঘিরে
ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে একদিন সিন্ধুনদ-তীরে,
তারি ধারা বহে আজো, সে সভ্যতা সুন্দর মহৎ।
জীবনের অভিযাত্রী অতিবাহি অতি দীর্ঘ-পথ
আসিয়াছি হেথা মোরা, মাঝে মাঝে চাহি ফিরে ফিরে
হয়ত পিছন পানে, এক করি' স্মৃতি-বিস্মৃতিরে
সুদূরের সে-মহিমা অন্তরে যে জাগে স্বপ্নবৎ।

স্বপ্নবিলাসীর নহে সে অতীত শুধুই কল্পনা,
সত্য তাহা। বক্ষে বহি' জীবনের অনির্ব্বাণ আলো
মূর্চ্ছিত মহত্বে পুন জাগাবে কে, আনিবে প্রেরণা
দেশমাতৃকার পদে নিবেদিতে জীবনের ডালা?
আমরা ছিলাম, আছি,—আছে সত্য, আছে সম্ভাবনা।
পূজার মন্দিরে চল নিয়ে অর্ঘ্য, নিয়ে পুষ্পমালা।

(২)

প্রণমি অতীতে আমি, দুঃখভরা নমি বর্ত্তমানে।
অপূরন্ত যার ধারা, উচ্ছ্বসিত বেগ যার, জানি
সে প্রাণ-উচ্ছল স্রোতে ধুয়ে যাবে এ-দিনের গ্লানি,
মাতিয়াছে চিত্ত তাই ভাবীযুগ-বন্দনার গানে।
কোন্ সে সুদূর তীর্থ? চলিয়াছি কাহার সন্ধানে?
নিত্য বেদনার মাঝে শুনি কার আশ্বাসের বাণী?
হৃদয়ে জাগ্রত কার সুন্দর কল্যাণ-মূর্ত্তিখানি?
কে করে নির্দ্দেশ পথ অপরূপ ভবিষ্যের পানে?

সে যাত্রা দিগন্তগামী, সে পথের অনন্ত প্রসার,
অসীম ঐশ্বর্য্যে ভরা ঐতিহ্যে সে জীবন মহান।
সঞ্জীবনী মন্ত্রে যার ভাঙিয়াছে মূর্চ্ছা বারম্বার,
শাশ্বত ভারতবর্ষ—শোন, শোন তাহার আহ্বান!
অন্তরের নেত্রে হেরি সে মহামহিম রূপ তার,
নমি নব-ভবিষ্যতে, প্রণমি তোমারে বর্ত্তমান।

ক্ষুদিরাম স্মরণে

(গান)

রক্ত তোমার ব্যর্থ হয়নি বিপ্লবী ক্ষুদিরাম—
বহ্নিকণায় ছেয়ে দিয়ে গেছ দেশের সহর গ্রাম।
ধনী জাগিয়াছে জেগেছে কিষাণ
উঠেছে বাজিয়া প্রলয়-বিষাণ
বিদেশীর কাছে আবেদন নয়,
শুধু চির-সংগ্রাম।

মুক্তির শ্বাস ফেলে মোরা বাঁচি স্বদেশের কারাগারে,
হাসিছে স্বরাজ-সূর্য এবার দুঃখের পারাবারে।
অগ্নিযুগের প্রথম সেনানী
রক্তাক্ষরে রেখে গেছ বাণী
তোমার স্মরণে জনগণ রাখে প্রথম প্রণাম—
মুক্তি পথের অভিযাত্রীর পূরিল মনস্কাম।

কথা : গোপাল ভৌমিক

সুর ও স্বরলিপি : বুদ্ধদেব রায়

II	সা	সা	সা	গা	গা	মা	পা	পা	পা	নি	ধা	নি		
	র	ক্	ত	তো	মা	র	ব্য	•	র্থ	হ	য়	নি		
	র্সা	র্সা	নি	রে	র্সা	নি	ণপা	-া	-া	-া	-া	-া		
	বি	প্	ল	বি	ক্ষু	দি	রা	•	ম	•	•	•		
	পা	পা	ধা	নি	ধা	ধা	পা	ধা	পা	মা	গা	গা		
	ব	ণ্	হি	ক	গা	র	ছে	রে	খি	রে	গে	ছ		
	পা	পা	পা	গা	গা	গা	সা	-া	-া	-া	-া	-া	II	
	দে	শে	র	শ	হ	র	গ্রা	•	ম	•	•	•		
II	পা	পা	গা	পা	নি	নি	পা	পা	গা	পা	র্সা	র্সা		
	ধ	নী	জা	গি	য়া	ছে	জে	গে	ছে	কি	ষা	ণ		
	পা	র্সা	র্সা	র্সা	নি	নি	ধা	ধা	রে	র্সা	নি	নি		
	উ	ঠে	ছে	বা	জি	য়া	প্র	ল	য়	বি	ষা	ণ		
	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	পা	ধা	ধা	ধা	ধা	গা	গা		
	বি	দে	শী	র	কা	ছে	আ	বে	দ	ন	ন	য়		
	পা	পা	পা	গা	গা	গা	সা	-া	-া	-া	-া	-া	II	
	শু	ধু	চি	র	স	ং	গ্রা	•	ম	•	•	•		
II	সা	সা	সা	সা	সা	নিধা	ধা	ধা	রে	রে	রে	রে		
	মু	•	ক্তি	র	শ্বা	স	ফে	লে	মো	রা	বাঁ	চি		

নি্ সা রে | গা গা মা | রে মা গা | -া -া -া
ঘ নে শে র কা রা গা • রে • • •

গা মা পা | ধা ধা পি | পা র্সা পি | ধা পা পা
ছা সি ছে ঘ রা অ হ ঘ্ র্ধ এ বা য়

পা ধা পা | মা গা সারে | গা রে সা | -া -া -া II
ছ • নে র পা রা বা • রে • • •

II পা পা গা | পা নি নি | পা পা গা | পা র্সা র্সা
অ গ্ নি ঘ্ গে ঘ প্র থ ম সে না নী

পা র্সা র্সা | র্সা নি নি | ধা ধা র্রে | র্সা নি নি
র • ক্তা • ক্ষ রে রে খে গে ছ বা নী

র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা পা | ধা ধা ধা | ধা গা গা
ক্তো মা র ক্ষ য় গে জ ন প ম রা খে

পা পা পা | গা গা গা | সা -া -া | -া -া -া
প্র থ • ম • প্র ণা • ম • • •

ক্ষা -া -া | -া গা গা | মা ধা নি | র্সা র্সা র্সা
মু • ক্তি প খে র অ ন্তি মা • ত্রী য়

র্গা র্গা র্গা | র্রে র্রে র্রে | র্সা -া -া | -া -া -া
পু রি ল ম ন ম্ কা • ম • • •

র্গা র্গা র্গা | র্গা র্গা জ্ঞা | র্গা -া -া | -া -া -া
বি প্ ল বি ক্ষু দি রা • ম • • •

র্গা র্গা র্গা | র্গা র্রে র্সা | র্রে পা পা | র্রে -া -া
বি প্ ল বি ক্ষু দি রা • ম •

র্রে র্রে র্রে | র্ঋ র্রে র্গা | র্গা -া র্সা | -া -া -া II
বি প্ ল বি ক্ষু দি রা • ম • • • •

* এই গানটি গ্রামোফোন রেকর্ডে গৃহীত হইয়াছে।

ইউরোপের অভিজ্ঞতা

ডক্টর শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস

(২)

২৯শে নবেম্বর ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে সকাল ৭টায় ট্যাক্সি করে ব্রিটিশ এলাকার লেভারকুসেনে I. G Farbenindustrie-র অন্যতম বিরাট কীর্তি—রায়নের কারখানা দেখতে রওনা হই। রওনার 'অটোবানে' গেলে বেশী সময় লাগবে বলে ট্যাক্সি-চালক বাড়হোমবুর্গ থেকে ঘুরিয়ে বনবহুল পাহাড়ের মধ্য দিয়ে চলল। অনেক স্থলে ৮।১০ মাইলের মধ্যে কোনও মানুষের মুখ চোখে পড়েনি—দুধারে নিবিড় সরল সুউচ্চ ওক, বীচ, পাইন প্রভৃতির বন—কোথাও ট্যাক্সি উপরে উঠছে, কোথাও বা দুই পাহাড়ের মধ্যে উপত্যকার মাঝে। অনেকস্থলে এই উপত্যকাগুলির চাষযুক্ত চাষের জমি এবং নীচে অনেকটা সমতলের উপর গ্রাম। স্থানে স্থানে বা ছোট সহর। দূর থেকে গির্জার উঁচু চূড়া চোখে পড়ছিল। ঘণ্টা দুই যাবার পরে হীরক বুদ্বুদাগার মধ্যে দিয়ে গাড়ী পড়ল। বন ছাড়া কিছু দেখা যায় না। বরফ জমে আছে ট্যাক্সির কাঁচে। চালক মাঝে মাঝে বেশ শুকনো কাপড় দিয়ে বরফ মুছে ফেলছে। আমার পায়ের উপর সে দিয়েছে একটি লাল কম্বল। অসম্ভব শীত। মাঝে মাঝে সূর্য দেখা যাচ্ছিল। অনেক জায়গায় পাহাড়ের ঢালুতে বরফ জমে গেছে—সাদা কাপড়ের মত বিস্তৃত। এইরূপে ক্রমে গাড়ী অটোবানে গিয়ে উঠল। মাঝে মাঝে দুর্ঘটনার চিহ্ন—ভাঙা ট্রাক। ভাঙা গাড়ী আর লাইন পথ ছেড়ে নীচে নেমে প্রায় ৪ মাইল ঘুরে অপর পারে যাচ্ছি। ভিড় বেড়েই চলছে। ফ্রাঙ্কফুর্টের ৩০।৪০ মাইল পশ্চিমে রাইন নদীর ধারে এই জায়গায় কেলকোব্লাজিয়া থেকে আরম্ভ আগ্নেয়গ্রাফিসের চালাঘর দেখা গেল। কোনও কোনও স্থানে সামরিক ভিড় করা হয়েছে—কারণ। তার একদিক দিয়ে যায় নদী, অন্যদিক দিয়ে ট্যাক্সি প্রভৃতি। এ সব জায়গায় প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। ক্রমে ব্রিটিশ এলাকার সীমান্তে গাড়ী এল। পুলিশ পাশপোর্ট দেখে নমস্কার করে ছেড়ে দিল। রাস্তার প্রত্যেক মোড়ে মাইলবোর্ডে কোন্ সহর কত কিলোমিটার দূরে ইত্যাদি লেখা রয়েছে। ক্রমে কোলন সহরের গির্জার চূড়া দেখা গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কোলন পেরিয়ে অটোবান থেকে নেমে ছোট রাস্তা ধরে বায়রের কারখানার চিমনি লক্ষ্য করে ট্যাক্সি চলল। ২০০ মাইল পথ ৪ ঘণ্টায় লেগেছে। কারখানা এত অন্ধকারে হতে পারে আগে ভাবতে পারি নি। সামনে অনেকটা ফাঁকা জায়গায় বাগানের মধ্যে পাথরের বিরাটকায় সিংহের গর্জনোন্মুখ শান্তির মূর্তি। ভাবটা যেন সমগ্র পৃথিবীর কারখানাকে এ গ্রাস করতে চায়। তারপর ফাঁকা জায়গার উপর সাততলা বাড়ীতে অফিস। ডাইনে নদীর ধারে বহু প্রস্তরমূর্তি শোভিত বাগানের মধ্যে প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর ডুইসবার্গের মনোরম বাসভবন। তিনি মারা গেছেন। এখন এ বাড়ীতে একজন ব্রিটিশ মিলিটারী অফিসার আছেন শুনলাম। বর্তমান ম্যানেজার ডক্টর হাবেরলাণ্ড অন্যত্র থাকেন। প্রকাণ্ড কাঁচের দরজাযুক্ত সুদৃশ্য সেট অফিস। মহাকবি মধুসূদন দত্ত বলাননের ছবিখানার যেরূপ চিত্র দিয়েছেন—এই সেট অফিসেরও সেইরূপ অন্ধকারে সাজ। সেট অফিসের কাজ সেরে মোটরগাড়ী বাড়ীর পিছনে গেলাম। এত সমৃদ্ধি ও এত সৌন্দর্য্যের সমাবেশ ইতিপূর্বে দেখিনি। Mr. Boshdar নামে sales এর একজন ভদ্রলোক এলেন। তিনি শীঘ্রই কলকাতায় গিয়ে আমাদের ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন জানালেন। কারখানা দেখতে চাওয়ায় তিনি বললেন—কারখানা দেখাবার নিয়ম নেই। এতদূর পথ ২৩ ঘণ্টার খরচ করে এসে বিজ্ঞাবিহি ফিরে যাব ভেবে দুঃখ হল। অন্ততঃ কারখানার ভিতরটা—কোনও ঘরে না ঢুকে ঘুরে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে তিনি রাজী হলেন। প্রায় ২।৩ মাইল তাঁর সঙ্গে ঘুরলাম। অধিকাংশই dyestuffএর বাড়ী। এক লাইন বাড়ী, আর লাইন থেকে অনেকটা দূরে দূরে। মাঝে অনেকটা ফাঁকা—রেল লাইন, লরিও মানুষ চলার রাস্তা। দু'একটি বাড়ীর একতলাতে উঁকি দিয়ে still, autoclave, filterpress, vats প্রভৃতি দেখলাম। এঁদের Pharmaceuticals তৈরী হয় কয়েক মাইল দূরে—Elberfeld-এ। কয়লার কয়লা খনি বেশী দূরে নয়। লরীযোগে কয়লা এক ঘণ্টায় কারখানায় আসে। নদীর ধারে বরাবর যতদূর দৃষ্টি যায়—ক্রেন প্রভৃতি দেখা গেল। নদীযোগে মাল রাইনের মোহনায় রটারডম বন্দরে এবং I. G.-র বাড়িতে আমিলিন ও সোডাফাকিকে ছেড়ে থাকে। নদীর ধারের প্রাচীর কামানের দাগ দেখে জিজ্ঞাসা করায় জানলাম—মার্কিন সৈন্যেরা নদীর ওপার থেকে গোলা ছোঁড়ার এই ক্ষতি হয়েছে। বাড়ীঘর ভেঙেছে অতি অল্পই। যদিও কোলন সহর প্রভৃতি খুব বিধ্বস্ত হয়েছে। Hoechst এবং Leverkusen-এর I. G.-র কারখানা অক্ষত এবং পাশেই চাউনগুলি বিধ্বস্ত দেখে মনে সন্দেহ আসে। জানি না এর মধ্যে কোনও রহস্য লুক্কায়িত ছিল কিনা। কারখানার মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গায় গোলাপ বাগান। এ অঞ্চলে শীত অপেক্ষাকৃত কম বলে তখনও গাছে ফুল দেখা গেল। এঁদের ক্যান্টীন প্রকাণ্ড সুন্দর বাড়ীতে। লাইড লাঞ্চ খেয়ে ফেরতে বললেন। কারখানা না দেখতে পাওয়ায় মন ভাল ছিল না, কাজেই ওঁর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করলাম। এখানেও লোকে ৬০ বৎসরে অবসর গ্রহণ করে এবং পেনসন আছে শুনলাম। পরদিন বাড়হোমবুর্গে Dr. E. Fresenius-এর ছোট একটি কেমিক্যাল অ্যাণ্ড বায়োলজিক্যাল কারখানা দেখলাম। কয়েকটি বিশেষ ঔষধ, মলম, বটিকা, biological preparation এঁরা করেন। Tablet mass এখানে হাত দিয়েই

দেখান হচ্ছে দেখলাম। Filling-sealing সাধারণ রকমেরই তবে একটি নূতন কায়দাও আছে। Tablet গুলি machine থেকে বেরিয়ে একটি তারের জালের আস্তে আস্তে দোল খাওয়া ট্রাফুলির উপর পড়ায় dust-free হচ্ছে দেখলাম।

তারপর ২রা ডিসেম্বর রাত্রি ১০টায়—International train করে ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে ব্রিটিশ এলাকায় হামবুর্গে পৌঁছি। এখানে chemical, apparatus dealer, chemical plant manufacturer এবং কেমিক্যাল কারখানা যেগুলি দেখেছি তাদের নাম নিম্নে দিলাম। প্রধান দু' একটি কারখানা পরিদর্শনের কথা পরে উল্লেখ করব।

Otto Brueckner and Sohn—chemical dealer
T. Kottemann—apparatus dealer
Albert Dargatz—Stocklist of laboratory equipment
Max Decor—chemical dealer
A. D. Krauth—Medical apparatus dealer
Anker Nachf-Marigofabrik—labelling machine makers
Hermann Busch—exporter of chemicals
Chemische Fabrik Biereschorf—Plasters manufacturers
Carlowitz & Cie—Chemicals & apparatus dealers
Chemische Fabrik Marienfeld
A. Wohlgast—Chemical dealer
A. Schmidt und Sohn—Chemical plant makers
C. H. Boehringer u. Sohn—Chemical factory
Chemische Fabrik Promonta
.. .. Billwarder
Nordmark chemische Fabrik
Berthel u. Luders—apparatus makers
H. Messars schmidt— ..
H. Dresler—Chemical dealer at Bremen
Walter Buehner—Chemical factory at ..

হামবুর্গ অঞ্চলে বড় কেমিক্যাল কারখানা আছে। প্রোমোন্টা কারখানায় গিয়ে দেখলাম—বোমাতে তাঁদের বিশেষ কিছুই দেখাবার মত নেই। ফিলেতরমার কারখানায় মাসিক ২০০ টন কার্বন ডাইসালফাইড ও মাসিক ৩০টন ক্লোরোইউরিয়া তৈরী হয়। মিলিটারী অনুমতি ব্যতিরেকে কারখানা দেখাতে এঁরা অক্ষম বললেন। এদের কর্মীর সংখ্যা পাঁচশত—কেমিষ্ট একজন মাত্র। গবেষণা বিভাগ এঁদের নেই।

Boeringer & Soehne এ অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য কারখানা। এঁরা ম্যরফিন, প্যাপাভেরিন, codein, synthetic caffeine, ফিনোবোমিন ইত্যাদি প্রস্তুত করেন। জার্মাণিতে উৎপন্ন poppy capsule এঁরা ব্যবহার করেন। এঁরা মোটামুটি কারখানা দেখালেন। সহর থেকে দূরে এবং ছোট ছোট shed-এর কারখানা বলে যুদ্ধে এঁদের ক্ষতি হয় নি। কেবল চিমনিটির উপর বোমা পড়েছিল। ওটি ইতিমধ্যে সারিয়ে নিয়েছেন। এঁদের অপর কারখানা Engelheim-এ—মার্কিন এলাকায়। সেখানে আধুনিক প্রক্রিয়ায় সাইট্রিক অ্যাসিড তৈরী হয়। অন্যান্য Pharmaceuticals-ও সেই কারখানাতেই প্রস্তুত হয় বললেন। বোয়েরিঙ্গারে কর্মী ৫০০ ও কেমিষ্ট আছেন পাঁচজন।

এই অঞ্চলের কারখানার মধ্যে Nordmark বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারখানাটি হামবুর্গের ২০ মাইল দূরে বড় বড় গাছ সংযুক্ত মাঠের মধ্যে চলে গেছে। প্রতিষ্ঠাতা Dr Wolf (জোলক—বেকড়েবাখ) ৬০ বছরের উপর বয়স, কিন্তু এখনও খুব শক্তিমান, উৎসাহ উদ্যম তাঁর অসাধারণ। তিনি নিজেই আমাকে কারখানা দেখালেন। এঁদের প্রচার বিভাগের Mr Blass রাইখসহোফ হোটেল থেকে সকালে আমাকে তাঁর মোটর করে নিয়ে যান। ইনি আগে কন্স ছিলেন—এবং যুদ্ধের মধ্যে বেরাড়বে আটক ছিলেন। ভাল ইংরাজী জানেন। কিন্তু Dr. Wolf আদৌ ইংরেজি বলতে পারেন না। তিনি জার্মান ভাষাতেই আমার সঙ্গে কথা বললেন। কেমিষ্টরাও জার্মান ভিন্ন বলেন না। এঁরা প্রচুর sulphonamide তৈরী করেন। বড় বড় still, auto-clave ইত্যাদিতে reaction হচ্ছে দেখলাম। সমস্ত বাড়ীটির জন্য দুটি বড় Vacuum Pump নীচের তলায় বসান আছে। একটি বিকল হলে অপরটি চালানো হয়—কাজেই কাজ কামাই যেতে পারে না। sulphonamide তৈরীতে যে chlorosulphonic acid ও aniline লাগে তা তাঁরা অন্য কারখানা থেকে সংগ্রহ করেন বললেন। Organo therapeutics এঁদের বিশেষত্ব যদিও এখন synthetics-এর প্রতি লক্ষ্য বেশী। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে frozen liver এসেছে। হাতুড়ী দিয়ে সেগুলি ভাঙতে দেখলাম। ইতালী এবং কানাডা থেকে এঁরা শুয়োরের পাকস্থলী নিয়ে আসেন—তা থেকে পেপসিন প্রভৃতি তৈরী হয়। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড extraction apparatus vac. concentrators অনেক। বৃড়ি ঘন মিটার একটি vacuum drier-এ পেপসিনের solution শুকানো হচ্ছে। Molecular distillation যন্ত্রে একটি ভোরমোন তৈরি কাজ হচ্ছে দেখলাম। Microanalysis-এর ঘরটি এঁদের নিজেদের কারখানাতেই তৈরী করেছে বললেন। Filling sealing বিভাগ ও পরে Biological section-এ নিয়ে গেলেন। Aspergillus Niger-এর culture দেখালেন এবং তার সাহায্যে Pilot plant-এ তৈরী করেক পাউণ্ড ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেটও দেখলাম। দর্শকদিগকে ব্যাক্টেরিয়ার উপর ঔষধের ক্রিয়া দেখাবার এঁরা সুন্দর একটি উপায় করেছেন। Dr. Wolf আমাকে পুরো দু'ঘণ্টা কারখানা দেখালেন। কারখানাটি একটি ছোট খালের মত নদীর দু'পারে এবং রেল ষ্টেসনও এখান থেকে ১০ মিনিটের মধ্যে। এখানে কর্মীর সংখ্যা ৫০০ এবং রিসার্চ কেমিষ্ট আছেন ১৫জন। কর্মীরা যোগ্যতা এবং কার্যকাল অনুসারে ১০০ থেকে ২৮০ মার্ক পর্যন্ত বেতন এবং কেমিষ্টরা ৮শত থেকে ১হাজার মার্ক সাধারণতঃ পেয়ে থাকেন। বিশেষ দক্ষতা বা পারদর্শিতার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। এঁদের কারখানা নূতন বলে পেনসন প্রবর্তিত হয় নি এখনও। ডক্টর জোলকের সঙ্গে ও অপর একজন

ডিরেক্টরের সঙ্গে বসে ব্যবসা বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করার পর ঐ আত্মবিশ্বাসী প্রবীণ কর্মবীরের সঙ্গে কোলাকুলি করে বিদায় নিলাম।

হামবুর্গ থেকে ১০০ মাইল দূরে ট্রেন বেলেন স্থিয়ে সেখানকার chemical dealer H. Dressler-এর সঙ্গে আলাপ করি এবং তাঁরই সাহায্যে ঐ সহরের উপকণ্ঠে প্রায় ১০ মাইল দূরে Walter Buchner নামে ছোট একটি কারখানা দেখি। ট্রেশন থেকে Dresslerএর ঠিকানায় যাবার জন্য যখন ট্রাম লাইনের কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করছিলাম তখন আমার কথা শুনে এক ভদ্রলোক তাঁর মোটর থেকে নেমে আমাকে বললেন, তিনিও ঐ পথেই যাচ্ছেন আমার আপত্তি আছে কিনা। বলা বাহুল্য এই অযাচিত সাহায্যে এই অপরিচিত জনগায় বড়ই মুগ্ধ বোধ করলাম। নেমেন মার্কিন এলাকায়। ইয়াঙ্কের কাছে কয়েক চাটনের নিকটে ২।৩টি Wind mill দেখা গেল। গত যুদ্ধের শেষের দিকে এখানে খুব যুদ্ধ হয়েছিল শুনলাম। অধিকাংশ বাড়ীই এখানে ভেঙে গেছে। সামান্য পরিচিত বাহিনীর যে সব আশ্রয় টাঙ্কের বাইরে ছিল সেগুলি ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। একটা মোটা কংক্রিটের দেয়ালের ভগ্নাবশেষ পড়ে আছে দেখলাম। সহরতলীতে বহু ঘর বাড়ী আগের মত ও পরিষ্কার। সকালে কিছু না খেয়েই হামবুর্গ থেকে রওনা হই—পথেও কিছু পাইনি। কারখানা দেখে আড়াইটায় ট্রেশনে ফিরে লোকানে গিয়ে দেখি কুপন ভিন্ন খাবার মেলে না। অগত্যা চা ও সেখানি কেক খেয়ে ৪টায় ইন্টারন্যাশনাল ট্রেন ধরে সন্ধ্যা ৬টায় হামবুর্গে ফিরে এসে ডিনার খেলাম। বলা বাহুল্য, এ বেলাও Reichshof হোটেলে পুরো চার্জই (বৈদিক ১৬ শিলিং) দিই।

হামবুর্গের উপকণ্ঠে, বিশেষ করে হারবার অঞ্চলে অনেকগুলি বড় বড় কেমিক্যাল Plant এবং মেশিনারী তৈরীর কারখানা দেখি। ডক অঞ্চলে সুলিলকে পাশাপাশি মেশিয়ে নদীর নীচের সুড়ঙ্গপথে ট্যাক্সিতে অন্য পারে মেশিন কারখানায় গেলাম। এঁরা আগে submarine ও যুদ্ধের জাহাজ তৈরী করতেন। এখন autoclave, vacuum concentrator ইত্যাদি তৈরীতে মন দিয়েছেন। আমাদের দেশের 'জাল ভেঙে মড়াল করতাল' কথাটির সঙ্গে অনেকটা মিল আছে। এরা করতালে পরম শান্তির কথা সূচিত হয় কিন্তু—chemical plants এবং chemical industryর মধ্যে যুদ্ধের বীজটি থেকেই যায়—মরাকবি গোটেও যুদ্ধ এবং বাণিজ্যকে অভিন্ন বলেই করেছেন।

হামবুর্গ থেকে ১৭ই ডিসেম্বর রাত্রে রওনা হয়ে ১৮ই রাত্রি ৯টায় সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখে পৌঁছি। বাজেলে ৭টায় পৌঁছল। সেখানে কাষ্টম করাসী সুইস customs চেকের পর ৯টায় বিদ্যুৎ-চালিত সুইজারল্যাণ্ডের ট্রেনে উঠি। বাজেলের নিকট রাইন নদী বেশ প্রশস্ত। পথে লুসুরের পর থেকেই রেলগাড়ীর ডানধারে দূরে পর্বতের গায়ে বরফ দেখা যাচ্ছিল। বিকালে Siegfried lines দেখা গেল। বহুদূর পর্যন্ত খাড়া পাহাড়ের পাশ দিয়ে ট্রেন চলল। পাহাড়ের গায়ে আঁকুবাঁকে ক্ষেতের সিঁড়ি—কাঠি পোঁতা রয়েছে দেখলাম। পথে লুসুর ট্রেনের মধ্যে খাওয়ার সময় ঘুমিয়ে পড়লাম—আমার কাছে সুইস মুদ্রা ছিল না। জিমারলি নামক ওলকার্ট ব্রাদার্সের জনৈক অফিসর আমায় সুইস মুদ্রা ধার দেন। পরদিন জুরিখ ট্রেশন থেকে চেক ভাঙিয়ে এঁর প্রদত্ত ফ্রাঙ্কগুলি ওঁর বাসায় গিয়ে ফেরৎ দিয়ে আসি। রবিবার ৯টায় ওলটা ষ্ট্রীটে ওঁর বাসায় গেলে উনি চা-পানে আপ্যায়িত করলেন; পরে নিজের মোটরে করে জুরিখ লেকের ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির অনেকগুলি স্থানগুলি ঘুরিয়ে নিয়ে আমাকে ট্রেশনের নিকটবর্তী সেন্ট গটহার্ড হোটেলে রেখে গেলেন। এঁর অমায়িকতায় আমি খুব উপকৃত ও মুগ্ধ হয়েছি।

সুইজারল্যাণ্ডে তিনটি apparatus & chemical plants maker এর কারখানা দেখি। জুরিখের উপকণ্ঠে সুলা—এঁরা spray drier,, autoclave ইত্যাদি এবং Huggenberger company vacuum pump এবং automatic sealing filling machine তৈরী করেন। এঁরা ইতিমধ্যে আমাদের কারখানায় filling, sealing machineএর quotation পাঠিয়েছেন। Engineer °H. Wismer এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। Semiautomatic machine কম দামি, ঘণ্টায় এর বেশী নয়। একজন লোক ঘণ্টায় ৫০০।৬০০ ampoule ভর্তি করতে পারে। ১ সি, সি থেকে ২০ সি, সি পর্যন্ত ampoule এবং ৫০ সি, সি পর্যন্ত শিশি ভর্তি করা চলে। Ampouleগুলির দৈর্ঘ্য বা ব্যেরের পার্থক্যের জন্য কোনও অসুবিধা হয় না। বাজেলের উপকণ্ঠে Bum A. G. & Coতে গিয়ে kneading and Mixing machineএর কথা বলি। এঁরা কলিকাতায় quotation পাঠাবেন বলেছেন। Autoclaves, spray drier ইত্যাদিও এঁরা তৈরি করেন।

অধ্যাপক কারারের চিঠির সাহায্যে সুইজারল্যাণ্ডের সব কটি বড় কারখানাই ভাল করে দেখবার সুযোগ পেয়েছি। বাজেলের ইউনাম লাক্রোস, গারগি, সিবা, শাফহাউসে সিলাগ, জেনেভাতে কারমেরিল ও জিগোয়ী এবং জুরিখ লেকের ধারে ইউটিকন। সুইজারল্যাণ্ডে, বিশেষ করে বাজেলে কারখানাগুলি অতি বৃহৎ ও অতি সমৃদ্ধ। এঁরা Dye stuff ছাড়া অন্য সব বিভাগই দেখিয়েছেন। এঁদের রিসার্চ ডিপার্টমেণ্ট খুব উন্নত, বিশেষ করে Bio-assay এবং testing বিভাগগুলি নাম করা এবং, ডি ডিগ্রিধারী চিকিৎসকগণ wholetime কাজ করে নূতন নূতন ঔষধ আবিষ্কারপূর্বক নূতন নূতন ঔষধের পরীক্ষা করছেন।

অনেক রকমের প্রাণী যায় বিভিন্ন রকমের মাছ এবং আফ্রিকা থেকে সংগৃহীত এক প্রকার ব্যাঙের উপরেও এই সব পরীক্ষা কার্য্য চালানো হচ্ছে। গাইগিতে ও মশামাছি, আরশুলা, উকুন, আঠালু প্রভৃতির চাষের জন্যই প্রকাণ্ড একটা তেতলা বাড়ী নিয়োজিত করা হয়েছে। এ বাড়ীটি গরম রাখা হয়েছে আমাদের দেশের মত তাপে, যাতে করে মশামাছি অনের সুখে বংশ বৃদ্ধি করতে পারে। কীটনাশক ঔষধ আবিষ্কারের জন্য এবার গাইগির ডেরিক্ট Dr. Mueller নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। কীট নাশক বিবিধ কেমিক্যাল তৈরী করা ব্যতীত কীটের উপর এই সব পদার্থের ক্রিয়া দেখবার বহুবিধ পদ্ধতিও তিনি আবিষ্কার করেছেন।

দুটি আলমারি ভর্তি কীটনাশক কেমিক্যাল দেখলাম। দেখে রবীন্দ্রনাথের—"ক্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ পাথর" কথাটি মনে পড়ল। এ ক্যাপা কিন্তু পাথর গুলি ছুড়েই ফেলে দেননি—সবই লক্ষ্যে আলমারিতে রেখে দিয়েছেন। এঁর সহকারী একজন মেয়ে ডাক্তার বললেন—এক সময় পরীক্ষার জন্য দৈনিক ১০ হাজার মাছির ডিমের দরকার হত। ধান ঘুন প্রভৃতি খাদ্যশস্যের কীট বিনাশের গবেষণায় এখন ডাঃ মুলার ব্যাপৃত আছেন। একজন সহকারী প্রত্যেকটি ফলের বীজ অণুবীক্ষণের নীচে রেখে রেখে উপর মাখানো কাচ পাত্রে রাখছে। একটি ঘরে শিমের চারা দেখলাম—তার কতকগুলিতে পোকা বসিয়ে তার বিনাশের চেষ্টা চলছে। যাতে চারার ক্ষতি না হয় অথচ পোকা নির্মূল হয় তার চেষ্টা। আপেলের ডাল আমাদের দাঁতনের মত কেটে সেগুলির কি পোকা মারবার যেন চেষ্টা চলেছে। গাইগির ডি ডিটির নূতন কারখানা বাজেল ষ্টেশন থেকে কিছু পূর্বে রেল লাইনের ধারে,—অনেক চাষের জমিও সেখানে আছে পরীক্ষা চালানোর সুবিধার জন্য। মাটির মানুষ এই ডক্টর মুলার ! গাইড আমাকে তাঁর বসবার ঘরে নিয়ে গেলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। যতক্ষণ আমি ছিলাম দাঁড়িয়ে রইলেন এবং আন্তরিকতার সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। এঁকে অনেকবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি থেকে নিয়মিত লেকচার দেবার জন্য আহ্বান এসেছে কিন্তু কাজের প্রতি এঁর এতই টান যে কখনো রিসার্চের কাজ ফেলে নামের জন্য বাইরে যান নি। আমি এঁর কাছ থেকে এসে পূর্ববঙ্গের উড়ুক্কু আমের পোকার প্রতিবিধানের জন্য এঁকে পত্র দিয়েছিলাম। তিনি সাদরে উহার চেষ্টা করবেন বলে আমার হোটেল রিসিপ্টিক. জুরিখ ঠিকানায় চিঠি দিয়েছিলেন। গাইগির Dyestuff বিভাগ খুব বড়। এখানে পূর্বে বিখ্যাত Dr. Sandmeyer কাজ করতেন। তাঁর নামে একটি বাড়ীর নামকরণ করা হয়েছে দেখলাম।

বাজেলের সিবা, গাইগি, গ্রাসডোফ, হফমানলারোশ (রচি) প্রভৃতির প্রায় সব কারখানাই রাইন নদীর ধারে। গ্রাসডোফ ও সিবা অতি কাছাকাছি. নদীর এপার ওপারে। হফমানলারোশও নদীর ওপরেই। কারখানার মত এঁদের সকলেরই অফিস গৃহগুলিও রাজপ্রাসাদের মত জাঁকালো ও মনোরম। রচির অফিস গৃহের সিঁড়ির দেয়াল ও সুদীর্ঘ করিডরের দেয়াল বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণের এবং ঔষধের গাছ. ফুল ও ফলের প্রকৃষ্ট রঙিন ছবি টাঙানো। রচির ভিটামিন সি তৈয়ারীর কারখানা খুব বড়। সম্প্রতি এঁদের রিসার্চ কেমিষ্ট Dr. Isler বিশুদ্ধ সাদা ক্রীস্টালার ভিটামিন এ প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারীর উপায় আবিষ্কার করেছেন। একটি বোতলে পাউণ্ড খানেক এই অতি অভিনব ও অতি মূল্যবান পদার্থ তিনি আমাকে দেখালেন এবং Helvetica chemica Acta পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর কাজের প্রবন্ধের ১খানি প্রতিলিপি আমাকে দিলেন। সিবাতে হোয়েমোন সম্বন্ধে বেশী গবেষণা হচ্ছে। অবশ্য এঁদের dyestuff বিভাগও সমৃদ্ধ। ঔষধ পত্র তৈরী ভিন্ন Sandozএরও dyestuff বিভাগ আছে। বাজেলে ৩।৪টি বড় বড় কারখানা থাকা সত্ত্বেও পরস্পরের মধ্যে অবশ্য রেষারেষি নাই। কারণ, প্রত্যেকেরই লাইনের বৈশিষ্ট্য আছে। এঁদের সবারই গবেষণা বিভাগে কারখানার হাতার মধ্যেই—এবং কারখানার চিরতিক্তেই প্রধানতঃ এরা গবেষণা চালান। বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নাম কিনবার চেষ্টা এঁদের যেন কম বলে মনে হল।

জুরিখ থেকে প্রায় ৫০ মাইল দূরে শান্ত হাউসে অবস্থিত সিলপ কোং বয়স বিশ বছরের বেশী নয়। প্রফেসর কারারের একজন প্রাক্তন ছাত্র এর প্রতিষ্ঠাতা। বিশজন কেমিষ্ট্রির ডক্টরেট এখানে কাজ করছেন। কর্মীর সংখ্যা কিন্তু তিনশতের বেশী নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম রাসায়নিক জ্ঞানের দ্বারা যে প্রচুর টাকা পয়সা পাওয়া যেতে পারে ইতিমধ্যে এঁরা তার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। কেমিষ্টরা মাইনেও বেশ ভাল পান। ১২।১৩ ঘন্টা ড্রাইভেট (কর্মচারীদের) মোটর কারখানার আঙিনায় দাঁড়িয়ে আছে দেখেই ওঁদের সচ্ছলতা বুঝা গেল। কাজের সঙ্গে আনন্দ পরিবেশনের জন্য এঁরা প্যাকিং ঘরে রেডিও রেখেছেন দেখলাম।

জেনেভাতে হারমেনিস এবং জিজোগী দুটি বড় কারখানা। এরা প্রধানতঃ গন্ধদ্রব্যাদি রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত করেন। সঙ্গে সঙ্গে soaps প্রভৃতিরও এদের বিভাগ আছে। হারমেনিসের সঙ্গে বোর্ডো লরিয়েট অধ্যাপক রুজিকা সাক্ষাৎ ভাবে সংশ্লিষ্ট। ইনি অনেক সময় এখানে কাজ করেছেন ; এখনও অবকাশকালে এখানকার কাজ দেখাশুনা করেন। বর্তমানে ইনি জুরিখের টেকনিশে হোকশুলের অধ্যাপক। এদের বসবার ঘরে অধ্যাপক রুজিকার নোবেল মেডাল (original) এবং নোবেল ডিপ্লোমার প্রতিলিপি ঝুলান আছে। তিনটি লোক ঘোড়ার পালা দিচ্ছে—ব্রোঞ্জের তৈরী এরূপ একটি প্রতীকও সেই ঘরে রেখেছে। সিভেটোন, একজালটোন প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের synthetics প্রস্তুতের জন্য এদের তিনজন কর্মীর সঙ্গে একত্র করে কেমিষ্ট নিযুক্ত আছেন। ব্যবস্থাপনা খুব ধনী এবং অতি আধুনিক। ১০০ জন কর্মী ও ৫০ জন কেমিষ্ট এখানে কাজ করেন। হারমেনিস কোং স্থাপিত হয় একজন বড় কেমিষ্ট দ্বারা—এখনও সেই বংশের উপযুক্ত আধুনিক শিক্ষিত লোকেরাই উহার কর্মকর্তা।

জিজোগীতে ভ্যানিলিন, অ্যাসিটোফেনোন, বাসুক আইসোল প্রভৃতি তৈরী হয়। soaps প্রভৃতিরও এদের পৃথক বিভাগ আছে। রোন নদীর তীরে একটি বড় পাহাড়ের পাদদেশে এই কারখানা। চীফ কেমিষ্ট খুব যত্নের সঙ্গে আমাকে প্রত্যেক বিভাগই দেখালেন। Blending বিভাগে ১৯ বৎসরের একজন বৃদ্ধ কাজ করছেন। কিন্তু বেশ শক্তিমান ও উদ্যমশীল। আমাকে অনেক কৃত্রিম ফুল-গন্ধের ঘ্রাণ নিতে দিলেন। এর এই বয়সেও ঘ্রাণ শক্তি এবং ঘ্রাণ বিশ্লেষণের ক্ষমতা অসাধারণ ফলে ইনি অবসর লন নাই—যদিও অবসর গ্রহণের বয়স এদের ৬৫ বৎসর। জেনেভা অঞ্চলের লোকেরা সাধারণতঃ ফরাসী বলেন। শাফহাউসেন, বাজেল, জুরিখ প্রভৃতি অঞ্চলে জার্মান প্রধান ভাষা—যদিও সুইজারল্যাণ্ডের কথ্য ভাষাও একটি আছে। এখানে ৩০০ জন কর্মী এবং ৫০জন কেমিষ্ট কাজ করেন। চীফ কেমিষ্ট ২০

বৎসর এ কারখানায় আছেন। ধাতবীয় ঔষধি ও লবণসাধনের মূলে তিনিই—ইনি ম্যানহিমার হেগেৎস—একজন ডিরেক্টর আমাকে বললেন: Chief chemist সুবিখ্যাত অধ্যাপক Arno Piotti-এর সঙ্গে কাজ করে doctorate পেয়েছিলেন বললেন। ১৯০৩ সালে নিকোটিন synthesis করেন বলে পিকটেট রাসায়নিকদের নিকট সুপরিচিত।

জুরিখ থেকে রেলে জুরিখ নহর থেকে ১৫ মাইল দূরে ইউরিকন কারখানা। Sulphuric acid, Hydrochloric acid, Sodium Sulphate, Sodium phosphate, জুঁতে ও ইথারাদি এদের প্রধান রাসায়নিক দ্রব্য। Pyrites থেকে চেম্বার process-এ দৈনিক ৮০ টন এবং পরে থেকে contact process-এ দৈনিক ১০ টন সালফিউরিক অ্যাসিড এরা তৈরী করেন। লবণ থেকে দৈনিক ১০ টন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডও তৈরী হয়। উল্লিখিত অন্যান্য দ্রব্যও প্রচুর পরিমাণে এরা প্রস্তুত করেন। প্রতিষ্ঠাতার পক্ষ থেকে একজন ডিরেক্টর নিজেই আমাকে কারখানা দেখালেন। কারখানায় এরা তিনশত কর্মী, তাদের জন্য হাসপাতাল এদের নেই। অংশগত প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠানের প্রতি এদের দরদ বেশী এবং এর উন্নতিকল্পে এরা সর্বপ্রকার নূতন process প্রবর্তিত করেন এবং কর্মীদেরও সর্বপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করেন—যাতে প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাদেরও দরদ বজায় থাকে।

সুইজারল্যাণ্ডে কারখানা দেখার পর যে কয়দিন সময় পাই সে ক'দিন অধ্যাপক কায়ারের ল্যাবরেটরিতে কাজ ও গল্পাদি করা, ঔরলিকন হোকহুলের অধ্যাপক জুরিকার সঙ্গে দেখা করে তাঁর ল্যাবরেটরি দেখা, জেকসনে থেকে অধ্যাপক কায়ারের সেক্রেটারীর সাহায্যে আমার আবশ্যকীয় জার্মান পেটেন্টগুলি নকল করে নেওয়া প্রভৃতি কাজে ব্যাপৃত ছিলাম। প্রফেসর কায়ারের university লাইব্রেরী থেকে Enzyklopadeie der technischen Chemie নামক বই থেকে ও আমাদের কাজের উপযোগী কতকগুলি বিষয় নকল করে এনেছি।

এখানের অধ্যাপকেরা জ্ঞান রাজ্যে যেমন অসাধারণত্ব দেখিয়েছেন—চরিত্রবল এবং চরিত্র মাধুর্য্যও এঁদের তেমনি অসাধারণ। নোবেল লরিয়েট অধ্যাপক কুরিকা প্রথম দিনের সাক্ষাতেই যেরূপ আন্তরিকতার সঙ্গে কথাবার্তা ও কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন—তাতে সত্যই আমি মুগ্ধ হয়েছি। অধ্যাপক কায়ার ত আগে থেকেই পরিচিত। হোটেলে আমার কোনও অসুবিধা হচ্ছে কিনা, খাওয়া ভাল মিলছে কিনা—শরীর কেমন আছে ইত্যাদি প্রায়শঃ জিজ্ঞাসা করতেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই সুইস কারখানাগুলির কাছে আমার পরিচয় পত্র দিয়ে দেন। তাঁর সহকারী ডক্টর সোয়াইটজারকে ডেকে প্রথম দিনই বললেন—যাতে তিনি ইনষ্টিটিউটের সর্ববিভাগ আমাকে দেখান ও আমার সময় হলে কাজ করতেও দেন। সহকারীও মানুষের মত মানুষ। রসায়নশাস্ত্রের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে তাঁর চরিত্র মাধুর্য্য অতুলনীয়। প্রায় ৪০জন ছেলে ডক্টরেটের জন্য কাজ করছে। অধ্যাপক দিনে তিনবার প্রত্যেকের কাছে গিয়ে তাদের কাজের খোঁজখবর লন—আর তাড়া পেলেই তাদের কোন সহকারী সোয়াইটজারের কাছে তারা আসে। ইনি নিজে উচ্চাঙ্গের গবেষণায় ব্যাপৃত থাকলেও ছাত্রদের কাজ সর্বাগ্রে ও আগ্রহ চেষ্টায় করেন। আমি প্রায় ১ সপ্তাহ তাঁর সঙ্গে ল্যাবরেটরিতে ছিলাম। এঁর পাণ্ডিত্যের সঙ্গে হাতের কাজেরও অসাধারণ দক্ষতা। অথচ বেয়ারা বা assistant প্রায় নাই। আবশ্যকীয় apparatus ধুয়ে নেওয়া থেকে—মেজেতে জল পড়লে তাও তিনি নিজ হাতেই পরিষ্কার করছেন দেখলাম। অথচ মুখে বিরক্তির লেশমাত্র নাই। এদিকে খেলোয়াড় হিসাবেও তাঁর খুব নাম আছে। এঁর বাসাতে একদিন নিমন্ত্রণ করেছিলেন—সুন্দর সাজানো লাইব্রেরী—নানা বিষয়ের বই। এঁর স্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিতা না হলেও চারুশিল্পে তাঁর খুব অনুরাগ—সাধারণ culture-ও খুব উচ্চ শ্রেণীর। আমাদের দেশের গৃহবিশিষ্টদের মতই নম্রতা এবং পাণ্ডিত্যে বিভূষিতা।

জুরিখের শেষ কয় ঘণ্টা বিশেষভাবে স্মরণীয়। ২৮শে জানুয়ারী সকাল ৯টায় অধ্যাপক কায়ারের বসবার ঘরে গেলাম। তিনি সংক্ষেপে তাঁর জীবন-ইতিহাস বললেন। প্রথম জীবনে ফ্রাঙ্কফুর্টে বসবাসত এরলিখের সঙ্গে কাজ করতেন। অবশ্য doctorate তিনি পেয়েছিলেন জুরিখ থেকেই। তারপর ১৯১৮ সালে এখানে আসেন এবং ১৯১৯ সালে নোবেল লরিয়েট অধ্যাপক ভারনার (Werner) পরলোকগমন করলে উনি তাঁর জায়গায় অধ্যাপকের পদ পান। ঘরে ভারনার, লিবিগ, বুনসেন ও অন্যান্য খ্যাতনামা কেমিষ্টদের ছবি এবং ঐ Institute-এর প্রাক্তন অধ্যাপকদের ছবিও দেখিয়ে ওঁদের পরিচয় দিলেন। তারপর সেক্রেটারীকে ডেকে তাঁর গত ১ বৎসরের কাজের reprint দিলেন এবং Development of Coaltar Colour Industry নামক অনেকের লক্ষ-প্রকাশিত পুস্তকের টাইপ-করা প্রশংসা লিপি দিলেন। আমি ওঁকে একবার ভারতবর্ষে আসতে বলায় বললেন—"এত ছাত্রের দায়িত্ব—সময় কই আমার—আরপর বয়সও হয়েছে, অত দূরে যেতে ইচ্ছে হয় না!" আমি ওখানে কিছুদিন কাজ করলে সুখী হতেম এবং যদি কখনও আবার সময় হয় ওঁর কাছে যেতে বলে করমর্দন পূর্বক বিদায় নিলাম। তারপর Dr. সোয়াইটজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে হোটেলে এলাম। কিছুক্ষণ পরে তিনি তাঁর মোটর নিয়ে হোটেলে এলেন। সঙ্গে শ্রীমান প্রমোদ ব্যানার্জি। এ ছেলেটি এক সময় আমার কাছে জার্মান শিখত। এখন ওখানে doctorate-এর জন্য তৈরী হচ্ছে। ভারতীয় বিশেষ করে বাঙালী ছেলেরা পড়াশুনায় ওখানে খুব সুখ্যাতি অর্জন করেছে। ডক্টর সোয়াইটজার নিজেই আমার সুটকেস ঘর থেকে নিয়ে গাড়ীতে তুললেন এবং ষ্টেশনেও কুলি না করে নিজেই সেই ভারী সুটকেস নিয়ে ট্রেণে তুলে দিলেন। ট্রেণ যতক্ষণ না ছাড়ল দাঁড়িয়ে রইলেন। ট্রেণ ছাড়ার আগে ইনি একখানি চিঠি দিলেন। তার মধ্যে তাঁর ও অধ্যাপক কায়ারের ছবি ছিল। করমর্দন এবং নমস্কারান্তে গাড়ী ছাড়ার সময় বিদায় নিলেন। জুরিখে সত্যই সেদিন আত্মীয়বিয়োগ ব্যথা অনুভব করলাম। জানি না আর

কখনও এঁদের সঙ্গে দেখা হবে কিনা—কিন্তু এঁদের স্মৃতি আজীবন পাথেয়ের উৎস হয়ে রইল আমার কাছে।

জুরিখ থেকে বেলা ১২টায় ছেড়ে প্যারিসে রাত্রি ১১টায় ট্রেণ পৌঁছল। যতক্ষণ আলো ছিল দুপাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে এলাম। প্রায় সব সহরেই ঘোমার-জাতা বাড়ি চোখে পড়ল। জুরিখেও ছেঁ খেলাধো। অনেক স্থলেই বনবেষ্টিত পাহাড়ে। মাঝে মাঝে কৃষকপল্লী ও শস্যক্ষেত। প্যারিসে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মালাকারের হোটেলে উঠলাম। ইনি ফারমেনটেশন শিখতে গেছেন! পরদিন সুবিখ্যাত লুভ মিউজিয়ম দেখলাম। রাত্রে জার্মান নামে একটি মারাঠী যুবকের সঙ্গে একেল টাওয়ার দেখতে গেলাম। মালাকার ঐ সময় লণ্ডনে ছিলেন। পরদিন জার্মান ষ্টেসনে সঙ্গে এল। বারটায় গাড়ী ছাড়ল। ক্যালেডোনার হয়ে রাত্রি ৮টায় ভিক্টোরিয়া ষ্টেসনে পৌঁছি। পথে ছোট বিলাত অনেক ছোট সহর দেখা গেল। অবশ্য প্যারিসের কথা বলা করিনি। ভিক্টোরিয়া ষ্টেসনে উপস্থিত ছিলেন শ্রীযুক্ত মনোমোহন মুখার্জি। আমরা একসঙ্গে জাহাজে গিয়ে লণ্ডনে একত্রে ছিলাম। আইন পড়তেন ইনি। এঁর মেধা, চরিত্রমাধুর্য্য ও তেজস্বিতা দেখে—ন প্রভা তরণং জ্যোতিরেতি বয়স্তাতাব—এই কথাটি সত্যই মনে হয়। লণ্ডনে এঁর সাহচর্য্য বড়ই মূল্যবান্ ছিল। জার্মানি যাবার দিনও বিমান অফিসে গিয়ে বিমানঘাঁটির বাসে তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। এঁর কথা কখনও ভুলতে পারব না।

ইংলণ্ডে যে দুদিন সময় পাই তাতে লণ্ডন থেকে ১২০ মাইল দূরে বোর্নমাউথের নিকট পুলে অবস্থিত B. D. H. Beegent chemical কারখানা, ডেভনের ডেকেনহামে অবস্থিত Burrows Wellcomeএর Biological বিভাগ এবং লণ্ডনে Richter & Co নামক Biological ঔষধ তৈরীর ছোট একটি কারখানা দেখি। ইংলণ্ডে এঁরা সবাই খুব খাতির করেছেন। B. D. H.এর স্থানীয় ম্যানেজার নিজেই ট্রেণের কাছে বোর্নমাউথে ওঁর মোটর নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। বোর্নমাউথের বড় হোটেলে খাওয়ালেন ও পরে কারখানা দেখানর পর আবার মোটরে করে ষ্টেসনে রেখে গেলেন। Burrows Wellcomeও অনুরূপ ভাবে আপ্যায়িত করেছেন।

জার্মানি, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি সর্বত্রই যানবাহনের কষ্ট সুবিধা—daily passengerদের জন্যও বাসরদাই কম; কাজেই কারখানার নিকটে কোয়ার্টারদের তেমন দরকার হয় না। অধিকাংশ লোকই সহরগুলীর নিজ নিজ বাড়ি থেকে কাজে আসেন। অনেক ক্ষেত্রে এঁদের বাড়ি তৈরীর জন্য কোম্পানী থেকে বিনা সুদে টাকা ধার দেওয়া—বা কোম্পানির পরিত্যক্ত জমি খুব কমে বিলি করবার ব্যবস্থা আছে, শুনলাম।

ওদেশে সকলেই জীবনযাপনের জন্য উপযুক্ত বেতন পান। অবশ্য কাজও সবাই সাধ্যমত করেন। কর্তব্যজ্ঞান ওদের কাছে অসাধারণ। নোটিশ না দিয়ে আমি গাইডের সঙ্গে বহু কারখানার বিভিন্ন বিভাগে গিয়েছি কিন্তু কোথাও কর্মীদের ছটলা করতে বা বসে থাকতে দেখিনি। ওদের বেতনের মধ্যেও আকাশ পাতাল তফাৎ নেই। সুইজারল্যাণ্ডে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত প্রফেসর যেখানে মেড় থেকে দুহাজার টাকা পাচ্ছেন সেখানে তাঁর সহকারী অধ্যাপকরাও হাজার বারশ এবং বেয়ারাও চার পাঁচশত পেয়ে থাকেন। কাজেই সেখানে অট্টালিকার পাশে বস্তী উঠতে পারে না। ফলতঃ জুরিখে কোথাও ছোট বাড়ি বা বস্তী আমার চোখে পড়েনি। টাউনের বাইরে কৃষকদের বাড়িও সুদৃশ্য মোটরা। জার্মানিতেও এইরূপ। তারপর কারখানা, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী চাকুরী—সর্বত্রই সমান গুণসম্পন্ন ব্যক্তির বেতনের তারতম্য না থাকায় এক চাকুরী ছেড়ে অন্য চাকুরী গ্রহণের আগ্রহ বস্তুতই কম! কাজেই সবাই সন্তুষ্ট চিত্তে, অনন্যমনে আপন আপন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারেন। যোগ্য বেতনে যোগ্য লোক কারখানাতে কাজ করার সমাজে ওঁদের কেউ হীন ভাবতে পারেন না। আমি সামান্য লোক—কারখানায় কাজ করি—কিন্তু তা জানা সত্ত্বেও বিশ্ববিশ্রুত অধ্যাপকগণ পর্যন্ত আমাকে আদৌ কোনও অবহেলা দেখান নাই, বরং পরম প্রীতি ও ভদ্রতার সঙ্গেই ব্যবহার করেছেন।

ওদেশের অধিকাংশ সহরেই উপযুক্ত কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়রদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত কেমিক্যাল plants এবং কেমিক্যাল equipment প্রস্তুতের কারখানা আছে। ওদের কেমিক্যাল কারখানার অনেকগুলিই স্থাপিত হয়েছে একশত বৎসর বা তারও আগে; বহু কারখানারই বয়স ৫০।৬০ বৎসর—এবং তাদের প্রতিষ্ঠাতাও, বহু ক্ষেত্রেই বিখ্যাত কোনও কেমিষ্ট—তারপর পরিচালিতও হয়ে এসেছে এবং আসছে বরাবর নামকরা বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা। এদিকে মূলধনও, কর্মীদের পাওনা, শিক্ষা, প্রমশিল্পতা, কর্তব্যজ্ঞান, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতিও অতি উচ্চস্তরের ফলে এবং কর্তৃপক্ষের কাছ থেকেও শুভেচ্ছাপূর্ণ, সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যবহার পাওয়ায় ওঁরা নিজের কাজ ভেবে প্রাণ দিয়ে খেটে কারখানাকে দিন দিন উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যান।

আমরাও সেই পথে চললে ওদের নাগাল ধরতে না পারলেও শীঘ্রই যে অনেকটা কাছাকাছি যেতে পারব—সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পরবর্তী কর্মধারা নির্ধারণের জন্য প্রধান কেন্দ্রে সকলে যখন যুক্তি-পরামর্শ করিতেছেন, তখন পুনরায় শত্রুপক্ষ আক্রমণ আরম্ভ করিল। রাত্রি তখন আন্দাজ দুই ঘটিকা হইবে। পুলিশ অস্ত্রাগারের অদূরেই ছিল ওয়াটার-ওয়ার্কস। পুলিশ কর্তৃপক্ষ প্রস্তুত হইয়া আসিয়া সেই ওয়াটার-ওয়ার্কস হইতে নূতনভাবে গুলিবর্ষণ সুরু করিলেন। বিদ্রোহীরাও গুলি চালাইতেই ছিলেন তাঁহার প্রত্যুত্তর। উভয় পক্ষের গুলিবর্ষণে নিস্তব্ধ রাত্রি আবার মুখর ও চকিত হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে উক্ত স্থান তাগ করিবার উদ্দেশ্যে পুলিশ আর্মারিতে আগুন ধরাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইতেছিল। আগুনও দেওয়া হইয়াছে। ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। এই সময় কিন্তু সহসা আর এক দুর্ঘটনা ঘটিয়া বসিল। হিমাংশু সেন নামে দলের একজন যুবক আগুন ধরাইয়া দিবার কাজে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার পরিচ্ছদে আগুন ধরিয়া যাওয়ায় তিনি চীৎকার করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিলেন। দলের কয়েকজন তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া তাঁহার পরিচ্ছদের আগুন নিভাইয়া দিলেন বটে, কিন্তু তৎপূর্বেই তাঁহার শরীরের নানা স্থান অগ্নিদগ্ধ হইল। অসহ্য জ্বালায় তিনি কাতর হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে লইয়া কি করা যায়—তাহা লইয়া বিপ্লবীরা অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অবিলম্বেই হিমাংশুর চিকিৎসা প্রয়োজন এবং তদুদ্দেশ্যে আবশ্যক নিরাপদ আশ্রয়ের। সেই ব্যবস্থাই করিবার জন্য অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, আনন্দ গুপ্ত এবং জীবন ঘোষাল তৎক্ষণাৎ হিমাংশুকে লইয়া মোটর যোগে প্রস্থান করিলেন।

ওয়াটার ওয়ার্কস হইতে এদিকে শত্রুপক্ষের গুলি অবিরামভাবেই পুলিশ আর্মারির উপর আসিয়া পড়িতেছিল। গণেশ ঘোষ প্রভৃতি ফিরিয়া না আসায় জন্য বিপ্লবীদেরও স্থানত্যাগে বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। বহুক্ষণ পর্যন্ত তাঁহাদের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করিয়াও তাঁহারা যখন আর ফিরিলেন না, তখন বাধ্য হইয়া সেই রাত্রেই চট্টগ্রাম সহর আক্রমণের পরিকল্পনাও বিপ্লবীগণকে ত্যাগ করিতে হইল। পাহাড়ে গিয়া আশ্রয় গ্রহণই সমীচীন বলিয়া নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। তদনুযায়ী বিপ্লবীরা যাত্রা সুরু করিলেন পাহাড়ের দিকে। সকলেই সাধ্যমত অস্ত্র-শস্ত্র ও গুলি বারুদের বোঝা বহন করিয়া চলিলেন। পথ সম্বন্ধে দলটিকে নির্দেশদান করিতে লাগিলেন অম্বিকা চক্রবর্তী।

বহু চেষ্টা করিয়াও কিন্তু বিপ্লবীগণের পক্ষে রাত্রির অন্ধকারে অধিক দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইল না। পুলিশ আর্মারি হইতে খানিকটা দূরে সুলুকবহর পাহাড়ের নিকট যাইতেই রাত্রি প্রভাত হইল; সুতরাং সেই পাহাড়েই তাঁহারা আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সকাল বেলা-ই দলের জনৈক যুবককে গণেশ ঘোষ প্রভৃতির এবং সহরের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হইল। দল ছাড়িয়া সহরে আসার পর তাহার কিন্তু আর ফিরিয়া যাওয়ার ইচ্ছা হইল না। অপর সকলে বৃথাই তাহার প্রত্যাবর্তনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন। সারাদিন শুধু প্রতীক্ষাতেই কাটিয়া গেল। সঙ্গে কোনও খাদ্য-দ্রব্য না থাকায় ক্ষুধার তাড়নাতেও তাঁহারা কাতর হইয়া পড়িলেন। পাহাড়ে আম গাছের কচি কচি আম খাইয়া তাঁহারা যতদূর সম্ভব ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অপরাহ্ণের দিকে পুনরায় প্রীতিলেখা চৌধুরী ও অমরেন্দ্র বক্সীকে অস্ত্র-শস্ত্র সহ দিয়া পাঠাইয়া দেওয়া হইল সহরের দিকে। সহরে গিয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, সহরটি সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত—পুলিশী কর্মতৎপরতার কোথাও নাম-গন্ধও নাই। কি একটা গভীর আতঙ্কে যেন সমগ্র সহরটা থম্‌থম্ করিতেছে। সকল কিছু দেখিয়া শুনিয়া রাত্রির অন্ধকারে তাঁহারা আবার পাহাড়ের পথ ধরিলেন। পথ তো ধরিলেন, কিন্তু কোন্ দিকে কোথায় যে যাইতে হইবে, তাহা আর তাঁহারা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। পথ ভুল করিয়া সেই রাত্রির অন্ধকারে নানা স্থানেই তাঁহারা ঘুরিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু নির্দিষ্ট পাহাড়টির আর হদিস্ মিলিল না। অগত্যা বাধ্য হইয়াই ভোর বেলা পুনরায় তাঁহাদিগকে সহরে ফিরিয়া আসিতে হইল; কিন্তু সহরে অবস্থানেও তো বিপদ আছে; সুতরাং দুইজনেই চলিয়া গেলেন প্রীতি-লেখার গ্রামের বাটীতে। এদিকে ২০শে এপ্রিল সকাল বেলা হইতেই চট্টগ্রাম সহরে নূতন নূতন সৈন্যবাহিনীর আগমন সুরু হইল।

১৯শে এপ্রিল গভীর রাত্রি পর্যন্ত প্রেরিত যুবক তিনজনের একজনও ফিরিয়া না আসায় বিপ্লবীগণ অনুমান করিলেন যে, সহরের অবস্থা নিশ্চয়ই খারাপ, প্রেরিত যুবক তিনজন মৃত হইয়া থাকিলেও থাকিতে পারেন। সুলুকবহর পাহাড়েও আর অপেক্ষা করা চলে না—কারণ পাহাড়টি পুলিশ আর্মারি হইতে অধিক দূরে নহে এবং বৃক্ষ-বিরল বলিয়া তথায় এতজন বিপ্লবীরও আত্মগোপন করিয়া থাকার বিশেষ সুবিধা নাই। সুতরাং রাত্রিতেই পাহাড়টি ত্যাগ করিয়া তাঁহারা আবার যাত্রা সুরু করিলেন। ফতেয়াবাদ পাহাড়ের নিকট দিয়া রাত্রি প্রভাত হইল এবং দিবালোকে পথ অতিক্রম করায় বিপদ থাকায় জন্য সেই পাহাড়েই তাঁহারা আশ্রয় লইলেন। ২০শে ও ২১শে এপ্রিল ঐ পাহাড়টিতেই কাটিয়া গেল। খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে সকলেই বিশেষ কাতর হইয়া পড়িলেন। অদূরবর্তী ফতেয়াবাদ গ্রামে অম্বিকা চক্রবর্তীর একটি পরিচিত গৃহ ছিল। দলের যুবকগণের জন্য কিঞ্চিৎ খাদ্য সংগ্রহের আশায় ২১শে তারিখে তিনি সেই গ্রামের দিকে যাত্রা করিলেন এবং

অপরাহ্নে ফিরিয়া আসিলেন খাদ্য লইয়া। কয়দিনের পর খাদ্য হয় কিন্তু খাইতে পাইয়া বিপ্লবীগণ অনেকটা তৃপ্তিলাভ করিলেন।

কিন্তু খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ না করিয়া কতদিনই বা এইভাবে লুকাইয়া থাকা চলিবে? ইহার অপেক্ষা সহসা আক্রমণের দায়িত্ব লওয়াও শ্রেয়ঃ। শেষ পর্য্যন্ত তাই সহসা আক্রমণের সিদ্ধান্তই গৃহীত হইল। তদনুযায়ী ২১শে তারিখে রাত্রিকালেই সকলে আবার যাত্রা আরম্ভ করিলেন সহরের দিকে। জালালাবাদ পাহাড় চট্টগ্রাম সহর হইতে প্রায় মাইল তিনেক দূরে অবস্থিত। ২২শে এপ্রিল অতি প্রত্যুষেই

জালালাবাদ পাহাড়ের পশ্চাদ্দিক দিয়া রেল লাইন চলিয়া গিয়াছে। অপরাহ্নকালে ইষ্টার্ণ রাইফেলস্ ও মুর্শাক্যাদি বাহিনী ক্যাপ্টেন টেইটের পরিচালনায় ট্রেণযোগে পাহাড়টির উদ্দেশে রওনা হইল। ট্রেণখানি প্রায় অপরাহ্ন পাঁচটার সময় পাহাড়টির নিকট গিয়া থামিল এবং সৈন্য-বাহিনী তাহা হইতে অবতরণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল জালালাবাদ পাহাড়ের দিকে।

বিপ্লবীরাও পাহাড়ের উপর হইতে সকল ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাঁহাদের দুর্ব্বল, ক্ষুধাক্লান্ত, পিপাসা-কাতর ও ক্লান্ত দেহে মুহূর্ত্তে যেন

জালালাবাদ-যুদ্ধে নিহত শহীদবৃন্দ

অরেশ রায় ত্রিপুরা সেন বিধু ভট্টাচার্য্য

প্রভাস বল নির্ম্মল লালা শশাঙ্ক দত্ত

হিমেন দাস মধু দত্ত পুলিন ঘোষ

টেগ্‌রা মতি কানুনগো

বিপ্লবীগণ ঐ পাহাড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তখনকার মত ঐ পাহাড়েই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

বিপ্লবীদের ধরিয়া বা ধরাইয়া দিতে পারিলে পুরস্কার ঘোষণার বিষয় ইতিমধ্যেই চারিদিকে প্রচার করা হইয়াছিল। সূর্য্য সেন প্রভৃতি নেতৃ-স্থানীয় ছয় ব্যক্তির প্রত্যেকের জন্য ঘোষিত হইয়াছিল ৫০০০৲ টাকা হিসাবে পুরস্কার। জালালাবাদ পাহাড়ে বিদ্রোহীদের অবস্থানের বিষয় জ্ঞাত হইতে কর্তৃপক্ষের অধিক সময় লাগিল না। পুলিশ ও মিলিটারি কর্তৃপক্ষ তখন তৎপর হইয়া উঠিলেন।

নব বলের সঞ্চার হইল এবং শত্রুপক্ষের সহিত সম্মুখ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার জন্য তৎক্ষণাৎ তাঁহারা তৎপর হইয়া উঠিলেন। প্রধান সেনাপতি হিসাবে লোকনাথ বল তাঁহার অধীন বাহিনীকে যথাযোগ্য স্থানে অতি দ্রুত সন্নিবিষ্ট করিতে লাগিলেন। মারণাস্ত্র হাতে লইয়া সকলে শত্রুর আগমনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

সৈন্যবাহিনী পাহাড় ঘিরিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। রাইফেলের পাল্লার মধ্যে তাহারা যখন আগমন করিল, তখন লোকনাথ বন্দুককে তাহাদিগকে আসিবার জন্য সতর্ক করিয়া দিলেন এবং বিপ্লবীদিগকে

আবেশ বিনের গুলি চালাইবার জন্য। আদেশমাত্র বৃষ্টির মতো ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি সৈন্যবাহিনীর উপর বর্ষিত হইতে লাগিল। সে আক্রমণ এমনই তীব্র হইল যে, তাহার বেগ প্রতিহত করা অস্ত্র-সজ্জিত, সুশিক্ষিত সেনা-বাহিনীর পক্ষেও সম্ভব হইল না, কাজেই আর অগ্রসর না হইয়া তাহারা বাধ্য হইল পশ্চাদপসরণ করিতে।

ত্রিধা বিভক্ত হইয়া সৈন্যগণ তখন বিদ্রোহীদিগের সহিত পাল্লা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। জালালাবাদের পাহাড়ে যে তীব্র রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম সেদিন আরম্ভ হইল, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে তাহা অভূতপূর্ব্ব এবং রোমাঞ্চকর! "বন্দেমাতরম্" এবং "ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ" ধ্বনির সহিত চট্টগ্রামের বীর বিপ্লবীগণ স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে সেদিন প্রচণ্ড বিক্রমে এক রক্ত-রাঙা অধ্যায়ের যোজনা করিতে লাগিলেন। ইংরাজের সৈন্যবাহিনী সেদিন মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিল যে কি প্রবল বাধারই সম্মুখীন না তাহাদিগকে হইতে হইয়াছে! বিপ্লবীদের মধ্যে অধিকাংশই তরুণ ছাত্র। তাঁহাদের অপূর্ব্ব দক্ষতার উচ্চ স্তরে সমানে সমানেই লড়াই চলিল। কর্ণেল ফিথের অধীন আর একটি নূতন সুসংবদ্ধ বাহিনী এই সময় আবার আসিয়া পৌঁছাইল। হাইকেল, লুইসগান প্রভৃতি লইয়া তাহারা জালালাবাদের পার্শ্ববর্ত্তী অপর একটি পাহাড় হইতে বিপ্লবীদের উপর মুহুর্মুহু গুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বিদ্রোহীরা একই সঙ্গে কয়েক দিক হইতে আক্রান্ত হইলেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহাদের মনোবল বিন্দুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হইল না। কিঞ্চিৎ সেনাপতির মত সুদৃঢ় ব্যূহ রচনা করিয়া লোকনাথ যুদ্ধ পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

লুইস গানের গুলিতে কিন্তু বড়ই অসুবিধা হইতে লাগিল। উহার গুলিতে তাঁহারা অধিক সংখ্যায় আহত বা নিহত হইতে লাগিলেন। শত্রুপক্ষের বিক্ষিপ্ত একটি গুলিতে লোকনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা টেগ্‌রা গুরুতররূপে আহত হইয়া ছিটকাইয়া পড়িল। তাহার বয়স তখন আঠার কোন-জোর বৎসর হইবে। সেই অবস্থাতেও টেগ্‌রা কিন্তু যে অমানুষিক মনোভাবের পরিচয় দিল—তাহা বিস্মৃত হইবার নহে। লোকনাথকে সে তাহার অন্তিম অনুরোধ জানাইল যে, সে মরিতেছে বটে, কিন্তু যুদ্ধ যেন থামান না হয়।

টেগ্‌রা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। দেখিতে দেখিতে আরও অনেকেই গুলিবিদ্ধ হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িতে লাগিলেন। এইভাবে একে একে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিলেন—ত্রিপুরা সেন, নরেন রায়, বিধু ভট্টাচার্য্য, প্রভাস বল, মধু দত্ত, নির্ম্মল লালা, জিতেন দাশগুপ্ত, পুলিন ঘোষ, শশাঙ্ক সেন, মতি কানুনগো, অর্দ্ধেন্দু দস্তিদার আর অম্বিকা চক্রবর্ত্তী। তাঁহাদের রক্তে জালালাবাদ পাহাড়ের মাটি রঞ্জিত হইয়া গেল। যুদ্ধ কিন্তু তথাপি চলিতেই লাগিল। সন্ধ্যা প্রায় সাতটা নাগাদ একটি সুদীর্ঘ বন্দুকধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল—উহা যুদ্ধ-বিরতির ইঙ্গিত। সৈন্যবাহিনী সেদিনের মত যুদ্ধ বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিল। বিপ্লবীরা বিজয়োল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"বন্দে-মাতরম্, ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ।"

২২শে এপ্রিল তারিখের জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধ সমাপ্ত হইল। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন বেশ জমাট বাঁধিয়াছে। রণক্লান্ত জীবিত বিপ্লবীগণ মৃত সঙ্গীদিগের দেহ পর্ব্বতগাত্রে অনুসন্ধান করিয়া সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। সব কয়টি দেহই সংগ্রহ করিয়া পাশাপাশি সাজান হইল। তারপর লোকনাথের আদেশে সকলে আবার সারি দিয়া দাঁড়াইলেন এবং সামরিক কায়দায় মৃত কর্ম্মীদের উদ্দেশে শেষ অভিবাদন প্রদান করিলেন।

সৈন্যবাহিনী প্রস্থান করিয়াছিল বটে, কিন্তু অল্পসংখ্যক সৈন্যকে পাহারায় রাখিয়া গিয়াছিল। বিপ্লবীদিগকে যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখার উদ্দেশ্যে তাহারা পুনরায় গুলিবর্ষণ সুরু করিল। সূর্য্য সেন এবং অপরাপর সকলেই ইহা উপলব্ধি করিলেন যে, অবিলম্বেই জালালাবাদ পাহাড় ত্যাগ করিয়া যাওয়া দরকার। সুতরাং ক্লান্ত শরীরেই আবার সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন—অস্ত্র-শস্ত্রের বোঝা পৃষ্ঠে লইয়া দুর্গম পথে আবার তাঁহারা যাত্রা সুরু করিলেন। একসঙ্গে সকলের অবতরণ করা সম্ভব হইল না বলিয়া কয়েকটি ক্ষুদ্র দলে তাঁহারা বিভক্ত হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু কয়েকটি দলে বিভক্ত হইয়া পড়ায় আর এক বিপদ বাধিল। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সূর্য্য সেন লক্ষ্য করিলেন যে, লোকনাথ এবং তাঁহার সঙ্গের দলটিকে দেখা যাইতেছে না। আশ-পাশে যতদূর সম্ভব খুঁজিয়া দেখা হইল—কিন্তু কোথায় গেলেন তাঁহারা? উচ্চৈঃস্বরে ডাক-হাঁক করিয়া বা সঙ্কেতধ্বনি করিয়াও কোনও সাড়া পাইবার উপায় নাই। নিকটে অবস্থানকারী শত্রুপক্ষ তাহা হইলে তাঁহাদের গতি-বিধির বিষয় জানিয়া ফেলিবে। সূর্য্য সেন ও নির্ম্মল সেন বহু চেষ্টা করিতে লাগিলেন লোকনাথের দলটির সহিত মিলিত হইবার জন্য, কিন্তু তাহাতে কোন ফলই হইল না। তখন হইতে দুইটি দলে ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল।

রাত্রি প্রভাত হইল। অস্পষ্ট আলোকে দেখা গেল যে সূর্য্য সেন এবং তাঁহার দলটি জালালাবাদ পাহাড় হইতে অধিক দূরে আসিতে পারেন নাই। সারা রাত্রি পথ চলিয়া তাঁহারা মাত্র অর্দ্ধ মাইল পথ অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছেন! যাহা হউক, সেইখানের একটি পাহাড়ের গুহাতেই তাঁহারা আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সকলের পক্ষেই তখন বিশ্রাম গ্রহণ একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল।

এদিকে জালালাবাদ পাহাড়ের উপর গভীর রাত্রিতে আহত অম্বিকা চক্রবর্ত্তীর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। আশে-পাশে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে, কতকগুলি মৃতদেহের সহিত তিনিও পড়িয়া আছেন। জীবিত আর কাহাকেও সেখানে দেখা গেল না। অনুমানেই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে অবশিষ্ট সহকর্ম্মীরা স্থানত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তিনিও তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং অতি কষ্টে পাহাড় হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন। কতেয়াবাদ গ্রামে তাঁহার যে পরিচিত ব্যক্তির গৃহ ছিল, তখনকার মত সেখানে গিয়া আশ্রয় লওয়াই তাঁহার ভাল বোধ হইল। ইতিপূর্ব্বে তিনি সেখান হইতেই

বিপ্লবীদের জন্য খাদ্য আনিয়াছিলেন। রাত্রির অন্ধকারে তিনি আবার সেইখানেই ফিরিয়া গেলেন।

২৩শে এপ্রিল সকালের দিকেই পুনরায় পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী ঘেরাও করিয়া লালালাবাদ পাহাড়ের নিকট উপস্থিত হইল। তোড়-জোড় করিয়া প্রথমে তাহারা করিল আশে-পাশে সৈন্য সমাবেশ, তারপর সতর্কতার সহিত একদল উঠিতে লাগিল পাহাড়ের উপর। পূর্ব্বদিনের অভিজ্ঞতার ফলে প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহারা প্রবল বাধার আশঙ্কা করিতে লাগিল—কিন্তু সেদিন আর কোন বাধাই আসিল না, একজন বিপ্লবীরও রাইফেল তাহাদের বিরুদ্ধে গর্জ্জিয়া উঠিল না। নিঃশব্দে পাহাড়ে উঠিয়া তাহারা দেখিতে পাইল শুধু তিনখানেক মৃতদেহ। মতি কানুনগো এবং অর্দ্ধেন্দু দস্তিদারের তখনও মৃত্যু হয় নাই, গুরুতররূপে আহত হইয়া তাঁহারা মৃতের মতই পড়িয়াছিলেন। অবশিষ্ট দশজনের মৃত্যু হইয়াছিল বহু পূর্ব্বেই। মতি কানুনগো অল্পক্ষণ পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং অর্দ্ধেন্দুকে তৎক্ষণাৎ সমরক্ষেত্র হইতে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সেইখানেই পরে তাঁহারও মৃত্যু হয়।

ক্যাপ্টেন চেইট ও কর্ণেল ক্রিফোর্ডের প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, লালালাবাদের যুদ্ধের সময় বিপ্লবীরাই সর্ব্বপ্রথম আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। যুদ্ধ চলিতে থাকাকালেই তাঁহারা নাকি এইরূপ একটা গুজব শুনিতে পান যে, সেইদিন রাত্রিতেই চট্টগ্রাম সহরের ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক লুঠ করা হইবে। তাহা শুনিয়া তাঁহারা সেদিনের মত যুদ্ধ বন্ধ করিয়া সহরে ফিরিয়া গিয়া রাত্রিকালে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক পাহারা দিতে এবং পরদিন ২৩শে তারিখে প্রাতঃকালেই পুনরায় লালালাবাদ পাহাড়ে গিয়া বিপ্লবীদিগকে আক্রমণ করিতে সিদ্ধান্ত করেন।

যাহা হউক, মৃতদেহগুলি সনাক্তকরণ প্রভৃতির পালা সাঙ্গ হইতেই প্রায় অপরাহ্ণ হইয়া গেল। তারপর সুরু হইল শব-সৎকারের ব্যবস্থা। পাহাড়ের উপরই এই উদ্দেশ্যে পাশাপাশি গুটি চারেক চিতা সজ্জিত করা হইল এবং তাহার উপর সব কয়টি মৃতদেহ স্থাপন করিয়া—করা হইল অগ্নি-সংযোগ। চিতা-ধূমে লালালাবাদের আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। চট্টগ্রামের বীর বিপ্লবীরা ভীষণ বিদায় এক অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গেলেন। (ক্রমশঃ)

জাহানারার আত্মকাহিনী

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্ত্রী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে রইলেন আমার রাখি-বন্ধন ভাই, তারপর বললেন—"ঐ দেখুন তাজমহলের দীপ জ্বলছে অনির্ব্বাণ, প্রেমমুগ্ধ চিত্তের শ্রদ্ধা অর্ঘ্য।" তারপর আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। উত্তেজনায় তাঁর মুখ রক্তিমাভা ধারণ ক'রেছিল। তিনি বল্লেন, "রাজকুমারী জানেন যে আপনার পিতার সম্মানার্থে উদয়-পুরের দেবমন্দিরে একটি অনির্ব্বাণ দীপ জ্বলে। রাজস্থানের সৈন্যদল পরিপূর্ণ আগ্রহে সম্রাটের পতাকাতলে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে।"

আমরা তাজমহলের দিকে অগ্রসর হ'লাম। রাও সমাধি পরিদর্শন ক'রলেন, আর আমি তাঁকে পরিদর্শন করলাম। মৃদুকণ্ঠে তিনি বল্লেন, "পুরুষ এই পৃথিবী শাসন করে। একটি পুরুষের শক্তি সৃষ্টি করে, আবার হ্রাস করে—নিজের সৃষ্টি নিজেই হ্রাস করে। পুরুষ শক্তির ইঙ্গিতেই আমাদের চিন্তা ও কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হয়। আমরা বুঝি না যে এই শক্তির পশ্চাতে আরও শক্তিময়ী শক্তি আছে, সে শক্তি নারীর। যখন সে নারীর শক্তি অন্তর্বিহীন বেদনার পদধ্বনির তালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলে, তখন স্বর্গ মর্ত্ত রসাপ্লাবিত হ'য়ে যায়।"

"রাও" কি চন্দ্রকান্তমালিকা দেখেছিলেন? সুমিষ্ট পুষ্পগন্ধের তীব্রতায় বাতাস ভ'রে গেল। এই গন্ধ কি সমাধি মন্দিরের পত্রদল উদ্যান থেকে এসেছে? এক অব্যক্ত কমনীয় ভাব ও অবশ চিন্তা শক্তি আমাকে আমার বহু উর্দ্ধে টেনে নিয়ে গেল। প্রাসাদ প্রাচীরের সুগভীর গম্বুজ তাহার আশ্রয় বিহীন প্রেমিককে আশ্রয় দেয়; রাও তাঁর হরিদ্রাভ বসন সমুদ্র তলে বিছিয়ে দিলেন। আমি তার উপরে উপবেশন ক'রলাম। আমারও বসন তাঁরই বসনের মত শুভ্র। আমার শুভ্র শাড়ীর অঞ্চল স্বর্ণখচিত। আমি তাঁর সঙ্গে কথা ব'লব—হয় এখনি, নয়তো আর জীবনে নয়। আমার ভয় হলো আমি আমার সাহস হারিয়ে ফেলব। হঠাৎ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। নজরৎ খান নাকে আমি কখনও চিন্তা করিনি। সহসা আমার মনে উদিত হ'ল—ক্রুদ্ধ দৃষ্টি, অশুভ ইঙ্গিত—তাঁর নয়নে পরিস্ফুট; আমি কথা বলবার পূর্ব্বেই নিজের চিন্তা অনুসরণ করে 'রাও' অবজ্ঞার হাসি হেসে বল্লেন, "আওরঙ্গজেবের সেনাবাহিনীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম আমি নজরৎ খানের অপসরণ চাই।"

আমি আমার বাহুতে শুভ্র দিয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন?" "রাও" সম্মুখে অগ্রসর হলেন, নিমিলিত-নয়ন শুষ্ক কণ্ঠে উত্তর দিলেন। "আমি তাকে ঘৃণা করি।" আমি অবাক হয়ে রইলাম।

তিনি কি শুনেছেন? তারপর মনে পড়ল আমি যখন কতেপুরে নজরৎ খানের নাম উচ্চারণ ক'রেছিলাম, "রাও" তখন চঞ্চল হয়ে উঠে ছিলেন। তিনি যে আর কি শুনেছিলেন—তা' আমি জানি না। আমি স্থির করলাম আমাদের দুজনের মধ্যে নজরৎ খানের ছায়াও পড়ে না হ'বে না। আমি আমার অবগুণ্ঠন অপসরণ করলাম। তিনি আমার

সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল বিকীর্ণ করল। তিনি মানুষ যে নরবপু ধারণের মত মানুষকে আমি বরণ করতে পারি না।

আমি দৃঢ়কণ্ঠে প্রশ্ন ক'রলাম, "আপনার কি সেই পত্রের কথা স্মরণ আছে? সে পত্র আমি সকলে আমার হাতে করে পেয়েছি। সেই পত্রে লেখা হয়েছিল—যদি আমি মহাত্মা হ'তাম—" আমি এখানে থামলাম। ছত্রপালের মুখমণ্ডল মেঘবর্ষণের প্রাক্কালীন কৃষ্ণ গাম্ভীর্য ধারণ ক'রল। আবার আমি বল্লাম, "মনে পড়ে সেই শ্লোক…?" কিন্তু আমার সহস্র শক্তি আমি হারিয়ে ফেলাম। আমি প্রাচীর গাত্রে মস্তক বেদনার এলিয়ে দিলাম।

তিনি যেন বহু দূর থেকে উত্তর দিলেন, "আমার মনে পড়ে বন্ধু, বহু বৎসর পূর্ব্বে আমি একটী স্বপ্ন দেখেছিলাম।" তিনি চক্ষু উন্মেলন ক'রলেন। তাঁর সে দৃষ্টি আমি কখনও ভুলব না—যখন ঈশ্বরের জ্যোতিঃ মানুষের মধ্যে বিকশিত হয়, তখন আর যেন আবরণ অবশিষ্ট থাকে না।

তিনি দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, "হাঁ আমি একবার স্বপ্ন দেখেছিলাম—আমি তখন তরুণ ছিলাম ও স্বপ্নে বিশ্বাস করতাম। ভাবীকালে যেমন, ভারতবর্ষের সকলই কুমারী, আমার খোপন রাণের রাণী, জাহানারা বেগম! আগ্রাতে আমার সমাধি হয়েছে, আমি জেনেছি যে বিশ্বের তীব্র আলোর সম্মুখে স্বপ্নরঙের পর্দ্দাও মলিন হয়ে যায়: স্বপ্ন শুধু চন্দ্রালোকেই ক্ষণিকের অতিথি। দুঃখ আমার ললাটে কত চিহ্ন দিয়ে গেছে গভীর। কিন্তু কবির অন্তরে কত চিহ্ন দিয়ে গেছে গভীরতর। স্বপ্ন বাস্তবকে চাঁছে যত দূরে সরে যায় ততই আরও সুন্দর প্রতিভাত হয়। সেখানে কোন ভয়ের আশঙ্কা নাই……"

জীবনটা আবার কাছে এগিয়ে এল। আমরা নীরবে ব'সে ছিলাম। আমার মনে হ'ল অকস্মাৎ যেন আকাশের সব আমাদের মাথার উপর থেকে উল্কালোকে সরে যাচ্ছে। আমি অনুভব ক'রলাম আত্মত্যাগই মনুষ্যত্বের পথ খুলে দেয়। আমি অনুভব ক'রলাম আমাদের মধ্যে দূর দৃষ্টিতে পার্থক্য বৃহত্তর হয়ে উঠেছে। কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে আমাদের আত্মা নিকট থেকে নিকটতর হয়ে উঠেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—অতি শান্তভাবে—"আমরা কি তাজমহলে প্রবেশ করব?"

বন্ধুত্বের গতি কে প্রতিরোধ করতে পারে? প্রাসাদের প্রবেশপথে মোঘা কোরাণ আবৃত্তি করছিল। হাজীর মোসাহেব ভেকে নিকটবর্ত্তী "লাল মসজিদে" নিয়ে এল। সমাধি মন্দিরে তখন আলো জ্বলছিল। সে দিন ছিল শুক্রবার।

প্রতি শুক্রবার রাত্রিতে আমার মাতার সমাধি গুম্বের উপরে মূল্যবান মুক্তাখচিত এক খণ্ড বস্ত্র আবৃত করা হয়। আমি মসীজককে বল্লাম, "আপনি আপনার একটি প্রিয় পদ উচ্চারণ করুন, যেন তাজমহলের প্রতিধ্বনি আপনার সুরের উত্তর দেয়।"

আমি শুনলাম—আমার মার তাজের অন্তরতম সহস্র দেবদূতের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, "এমনি ক'রে যেন আমার মাতৃ পৃথিবীর অন্তর প্রেমে অভিষিক্ত হয়।"

আমার লেখনী অধিক অগ্রসর হতে পরাঙ্মুখ হ'য়ে উঠেছে। আমি অনেক বিষয়ে অনেক কথাই লিখতে পারি, কিন্তু সেই শুক্লের দিনে আমাদের কথা বিনিময়ের বিষয়ে আর লিখতে পারছি না …

কোন বিবাহ অনুষ্ঠান আমাদের হৃদয়কে নিকটতর ক'রতে পারতো না।

যদি দারা যুদ্ধজয়ী হন, আর ছত্রপাল জীবিত থাকেন তবে তিনি হিমালয়ের প্রান্তদেশে এক পার্ব্বত্য মন্দিরে তীর্থ যাত্রা করবেন। তিনি স্থির করেছেন—চঞ্চল নদীর দুটী তীর যেমনের শেষ দুঃখ।

আমরা দাইগ্রাস বীথির মধ্য দিয়ে সেই বিরাট প্রবেশ তোরণের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করছি…সমাধির দিকে যাত্রার সূচনা থেকে আমরা বহু বৎসর অতিক্রান্ত করে এসেছি। আমার মনে হল যেন আমরা এক পরম রহস্যালোকে বহু উচ্চতর স্তরে উন্নীত হলাম।

বিদায় সম্ভাষণের সময় আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"আমি কি সেই পবিত্র পর্ব্বতে তীর্থ যাত্রা করতে পারব?"

তাঁর নয়নে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ। তিনি উত্তর দিলেন—"আমি আপনার জন্য পর্ব্বতের পাদদেশে অপেক্ষা করব। জাহানারা, যদি সেখানে না পারি তবে সূর্য্যালোকে আপনার জন্য অপেক্ষা করব।"

সেই তাঁর শেষ বাণী আমার উদ্দেশে।

* * *

……!

অস্ত্রের ঝনঝনায় হিন্দুস্থানে মর্ম্ম উচাটে ঘুম ছুটেছিল,
সেখানে মানুষের অস্থি ছিল শুভ্রমুখি, আর রক্ত ছিল কমল।

(আনন্দময়ী)

…… ……!

বায়ুমণ্ডল শুধু তরবারী ঘিরে বিশঙ্কিত হয়েছিল,
সেই তরবারী তৈরী হয়েছিল যম পয়জারমণি ঘিরে।

(চাঁদবরদাই)

…… ……!

হাতীর বিকট চিৎকার অশ্বের হ্রেষারব,
ঐ শোন সৈন্যের আর্ত্তনাদ ……ঐ ঐ ঐ। (মকুন্দী)

* * * *

পরের দিন প্রত্যূষে আমরা প্রাসাদশিবির হতে দেখলাম এক বিরাট সেনাবাহিনী চলেছে আগ্রার অভিক্রম করে। যুবরাজ মহাম্মদ রাজপুত অশ্ববাহিনী-সহ পর্ব্বতের মত উচ্চশির। সে এক অপরূপ দৃশ্য!

যুবরাজের অশ্বারোহীদল চলেছে—বাহিনীর পশ্চাতে বাহিনী-সৈন্যদলের বৃদ্ধুদসমাগম পরিলক্ষ্য করে মনে হচ্ছিল তারা অনন্তকাল না করে প্রত্যাবর্ত্তন করবে না। আমার শরীরে এক বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেল।

আমার যতদূর দৃষ্টি যায় আমি কেবল ছত্রপালের হস্তী অবলোকন করলাম। আমি জানতাম তাঁর পশ্চাতে ছিল তাঁর অশ্ব—নাম "অবধীপ।" মৌহাম্মদের প্রতিজ্ঞায় গর্ব্বার অশ্বের আসন ছিল "অবধীপ।" অশ্বের

ললাটে বিলম্বিত ছিল একটী বৃহৎ রক্তাভ ওপেল প্রস্তর। আমিই সেই প্রস্তরখণ্ড তাঁকে আমার স্মৃতিস্বরূপ পাঠিয়েছিলাম।

সামান্য ক্ষণি বিস্তৃত হয়ে গেল, সঙ্গীত দূরে মিলিয়ে গেল; শেষে উষ্ণীষ চক্ষুর অন্তরালে হারিয়ে গেল। আমি আমার পিতার নিকট উপস্থিত হলাম। তাঁকে শান্ত করা খুব সহজ ব্যাপার নয়, সম্ভাব্য সকল অস্ত্রই বিফলে তাঁর দুরদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল, তাঁর মন থেকে দুশ্চিন্তা দূর করবার জন্য আমি সম্রাট বাবরের পুত্রদুষ্টান্ত—হুমায়ুন, কামরাণ, আস্‌কারি, হিন্দালের মধ্যে যুদ্ধের ইতিহাসে বিবৃত করলাম। কামরাণ আওরঙ্গজেবের মত লক্ষকে বিশ্বাস করিয়েছিলেন যে তিনি স্বয়ং হরবেশ ও হুমায়ুনকে সিংহাসনচ্যুত করতে চেষ্টা করেছিলেন, অথচ বাবর হুমায়ুনকেই সিংহাসনের জন্য মনোনীত করেছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত কামরাণ সফল হন নি।

পিতার চক্ষুকোটর হতে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত দৃষ্টি যেন কোন বিশেষ ক্ষেত্রের সন্ধান করে বেড়াচ্ছিল, অকস্মাৎ আমার প্রতি তিনি দৃষ্টিক্ষেপ করলেন। সেই দৃষ্টি আমাকে তীরের মত বিদ্ধ করল, তিনি উত্তর দিলেন :—

"সম্রাট হুমায়ুন কামরাণের চক্ষু উৎপাটন করেছিলেন কারণ কামরাণ বহু চাতুরীই সম্রাটের প্রাণনাশ করেছিলেন। মির্জ্জা আস্‌কারী যদিও শিশু আকবরকে অপহরণ করেছিলেন, তবু তিনি সজ্জন ছিলেন, আকবরের প্রতি সুব্যবহার করেছিলেন, মির্জ্জা হিন্দাল সম্রাট হুমায়ুনের জন্য প্রাণ দান করেছিলেন। তৈমুর বংশ কি জেনেছে যে তাদের বংশ নিঃশেষ হয়ে গেছে?

* * * *

আমি আমার অপরাধ চিন্তা করলাম। আমার অপরাধের শাস্তি হ'চ্ছে। সেই অপরাধে সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত শিথিল হয়ে গেছে। আমি লজ্জায় নীরবে মাথা নত করলাম। শায়েস্তাখানের স্ত্রীকে আমিই সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হতে সাহায্য করেছিলাম—আজ আর তার জীবনের কোন আশা নাই। শায়েস্তাখানের প্রতিশোধ স্পৃহা·····উঃ।

তারপর কয়েকদিন পর্য্যন্ত দেখলাম একটী নক্ষত্র আমাদের মাথার উপরে আপন-নির্দ্দিষ্ট পথে চলেছে এবং প্রতিটী ঘটনাই সে নক্ষত্রের পানে ছুটেছে।

আমার পিতা শাহজাদা দারাকে সুলেমান শুকোর জন্য অপেক্ষা করতে বলেছিলেন, কিন্তু সেই তরুণ সেনাপতি শাহসুজাকে অনুসরণ করে ক্রমশ: দূরে সরে যাচ্ছিল। অন্যদিকে আমাদের শত্রু ক্রমশ: নিকটতর হচ্ছিল। যদি সুলেমান শুকো যথাসময়ে এসে সৈন্যসহ উপস্থিত হ'ত, তবে খালিলুল্লা খান ও তাঁর অশিক্ষিত সৈন্যের প্রয়োজন হত না।

প্রতিদিন গ্রামের উত্তাপ বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

শেষে বিরাট সৈন্যদল অভিযান আরম্ভ করল। কিছুদিনের মধ্যেই সংবাদবাহক শিবিরের সংবাদ নিয়ে এল। বিভিন্ন রকমের সংবাদ আসছিল, সত্য মিথ্যা নির্দ্ধারণ করা খুব সহজ ছিল না।

কিন্তু আজ আমি অনেক ঘটনাই বলতে পারি, কারণ আমি পরে সে সংবাদ জেনেছিলাম।

শাহজাদা দারা চম্বলনদীর তীরে শিবির সন্নিবেশ করেছিলেন। মনে হ'ল যেন অল্পের মেলে এক বিরাট নগর—অগণিত শিবির, বহুবর্ণরঞ্জিত পতাকা, প্রবহমান জনস্রোত। দুদিন পরে শত্রু দৃষ্টিগোচর হল। শত্রুর প্রতি আক্রমণের জন্য দারার সেনাপতি অনুমতি প্রার্থনা করলেন, কিন্তু দারা তখনও তাঁর পুত্র সুলেমানের জন্য অপেক্ষা করছেন। কিন্তু সুলেমান তখনও আসেনি·····।

চম্বল নদীর উপরে সমস্ত সেতুপথ সুরক্ষিত করা হয়েছিল। একমাত্র রাজা চম্পতরাওয়ের জন্য মধ্যে অবস্থিত সেতু অরক্ষিত ছিল। রাজা চম্পতরাও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে শত্রুবিদলকে সেতু অতিক্রম করতে অনুমতি দেওয়া হবে না। দারার শিবিরের কয়েক ক্রোশ দূরে একটী পথ আছে, সে সংবাদ আওরঙ্গজেব জানতে পারলেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই সংবাদও জানা গেল যে রাজা চম্পতরাওকে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করা যায়। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দ্রুতপদক্ষেপে আওরঙ্গজেব আট সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে সুরক্ষিত নদীর অপর তীরে উপস্থিত হ'ল।

এবার দারার শত্রু আক্রমণের সুযোগ। পরিশ্রান্ত পথশ্রান্ত নদীতীরে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত আওরঙ্গজেবের সৈন্যদল। তার সৈন্যদলের প্রধান অংশ তখনও এসে উপস্থিত হয় নি। সৈন্যাধ্যক্ষ ইব্রাহিম বলেন,—যদিও সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করা হউক। কিন্তু খালিলুল্লাহখান বলেন—যদি দারা তাঁর সৈন্যদল এখুনি প্রেরণ করেন তবে বিজয়ের গৌরব হবে সেনাপতিদের, দারার তাতে অসম্মান হবে, সুতরাং তাঁদের অপেক্ষা করা উচিত·····।

আমি কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি যে সেই মুহূর্ত্তেই নিয়তির অপরিবর্ত্তনীয় ভাগ্যদেবতা তার নির্দ্দিষ্ট পথে সরে গেল।

তখন মহরম মাসের(১) প্রারম্ভ, পরের দিন দারা শত্রু-সৈন্যের বিরুদ্ধে সামুগড়ের দিকে যাত্রা করলেন, কিন্তু তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে, সেই রাত্রিতে ও প্রত্যুষে সৈন্যের বহুলাংশ ক্রমান্বয়ে এসে পৌঁচাচ্ছিল। খাদ্যসংগ্রহকারী উট বায়ু চারদিক বিস্রাব করেছিল, বিরাট প্রান্তরে জলাভাবে সৈন্যগণ অস্থির। দারার অভিপ্রায় ছিল খানিকা দিনমধ্যে আক্রমণের আদেশ দিবেন, কারণ তখন আওরঙ্গজেব ও তাঁর গোলন্দাজ সৈন্যের জন্য অপেক্ষা করছিলেন এবং তখনও বহু সৈন্য পরিশ্রান্ত, কিন্তু দারার বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিগণ জ্যোতিষশাস্ত্রের আশ্রয় নিল। তারা বলল,—আকাশে জ্যোতিষমণ্ডল দারার ভাগ্যের প্রতিকূল, অপেক্ষা করাই শ্রেয়:। দারার অপরাহ্নের সৈন্যবাহিনীর তুলনায় আওরঙ্গজেবের সৈন্যদল সমুদ্রে গোষ্পদ মাত্র··· তারপর দিন দারা সম্রাটের নিকট থেকে পত্র পেলেন যে তাকে আগ্রা প্রত্যাবর্ত্তন করে সুলেমানের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। দারা উত্তর

(১) মুসলমানের নিকট মহরম মাস পবিত্র, এই মাসে রক্তপাত নিষিদ্ধ।

দিবেন, আওরঙ্গজেব ও মুরাদকে সম্রাটের নিকট তিন দিনের মধ্যে উপস্থিত করা হবে।

পরের দিন শনিবার গাজোলা দারার আক্রমণ করা হউক। আবার বিশ্বাসঘাতকদল বলল—অন্তত সময়, কারণ সেখবর্ণ মুখর। তার পরের দিন রবিবার—এই দিনে ঈশ্বর আলোক সৃষ্টি করেছিলেন—আবার অপেক্ষা করা হউক। এই তৃতীয় বার। পর পর তিনবার।

এবার সকলে তার কক্ষে উপনীত—···। শনিবার মধ্যরাত্রির দিকে আওরঙ্গজেব তিনবার কামান ধ্বনি করলেন। উদ্যত বিশ্বাসঘাতকদের জাগ্রতে বেওয়া তিনি আক্রমণের জন্য প্রস্তুত; বিরাট কামান শ্রেণী প্রস্তুত। সৈন্যদল ও গজবৃন্দ বিশ্রাম নিচ্ছিল। দারাও তিনবার কামান ধ্বনি করে প্রত্যুত্তর দিলেন, কিন্তু পরের দিন প্রত্যুষের পূর্বে দুই সৈন্যদলের সাক্ষাৎ হয় নি।

দারার কামান অবিরাম গোলা বর্ষণ করছিল। বারুদের ধূম্রজালে আকাশের নেবমণ্ডল ঘনকৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করল। কিন্তু এই সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করেই আওরঙ্গজেবের কামানের গোলার বহু দূরে সৈন্য শিবির স্থাপন করেছিলেন।

আওরঙ্গজেব সামান্য কয়েকবার গোলা নিক্ষেপ করলেন। তারপর আবার তিনটী কামান ধ্বনি অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতকের প্রতি দ্বিতীয়বার সঙ্কেত·····।

খলিলুল্লাহ খান আর একবার উপদেশ দিল; "যুবরাজ যখন শত্রুর অধিকাংশ কামান দিয়ে ধ্বংস করেছেন; এবার সময় হয়েছে, আপনি অগ্রসর হন, আপনার বিজয় সম্পূর্ণ হউক।" দারার বিশ্বস্ত সেনাপতি কুয়র খান বলেন—"শত্রুকে আক্রমণ করতে দেওয়া হউক। তখন যুবরাজের উপযুক্ত সৈন্য দিয়ে অভ্যর্থনা করা হবে। আমাদের সৈন্যবল বেশী এবং সুযোগ আমাদের দিকেই বেশী।"

কিন্তু খলিলুল্লাহ খানের পরামর্শ গ্রহণ করা হল। কুয়র খানকে তাঁর কাপুরুষ বলে বিদায় করা হল। বিজয়ের সন্ধান যুবরাজের প্রাপ্য, তা বিজয়ের সন্ধান···আর অপেক্ষা করা অসহনীয়।

দারা সোলেমান বাহিনীকে শৃঙ্খলমুক্ত ক'রে অশ্বারোহী বাহিনীর সহিত শত্রুকে আক্রমণের আদেশ দিলেন। এই অকস্মাৎ অগ্রসর হওয়ার আদেশে অশিক্ষিত সৈন্যদল সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। লৌহকায়, কসাই, নরমুণ্ডর প্রভৃতি অশিক্ষিত সৈন্যদল শত্রুর পলায়নপর রণশিবিরে ধর্ব, লোপাট জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করল। শত্রুবল না ক'রে পলায়ন হত্যায় ব্যাপৃত হ'ল।

দারা কিন্তু বীরের মত সম্মুখে অগ্রসর হয়ে গেলেন এবং হস্তদ্বারা প্রত্যেক সৈন্যকে অনুসরণ ক'রবার জন্য ইঙ্গিত করলেন। কামান ধ্বনি শান্ত হয়ে গেল, দামামার শব্দ শুনতে আরম্ভ হ'ল। শত্রুর পক্ষ থেকে দু' একটী কামানের গোলা এসে পড়তে লাগল। হঠাৎ কামান গর্জন এবং সোলেমান বাহিনীর আক্রমণে দারার সৈন্যগণ বিপর্যস্ত হয়ে প'ড়লো। তবু দারা হস্ত উত্তোলন ক'রে আদেশ দিতে লাগলেন।

ইন্দ্রপাল এবং ছত্রশাল খান দারাকে রক্ষা করবার জন্য ঔরঙ্গজেবের সোলেমান বাহিনীর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'লেন এবং শত্রুর পলাতিক ও উটবাহিনীকে পলায়ন ক'রতে বাধ্য করলেন।

আওরঙ্গজেবের এই আশু বিপদ ধারণা ক'রতে পারেন নি। তিনি সেনাধীনের অধীনে আরও সৈন্যদল প্রেরণ করলেন। এই সেনানীই তাঁকে যুদ্ধ বন্ধি না ক'রে সৈন্যসংগ্রহের উপদেশ দিয়েছিল। যুদ্ধ চলতে লাগল। শত্রুবল পরস্পর সম্মুখ যুদ্ধে ব্যাপৃত হ'ল। অশ্বের ঝঞ্ঝনা, শিরস্ত্রাণ নিনাদ, তীরবর্ষণ সমানতে চলল। রাজোচিত ঔদার্য্যের সহিত সমস্ত শক্তি নিয়োজিত ক'রে দারা হস্তীপৃষ্ঠে সমাসীন হ'য়ে সৈন্যদের বীরোচিত কার্য্যের জন্য উৎসাহিত ক'রতে লাগলেন। শত্রুবল প্রায় বিপর্যস্ত হ'য়ে প'ড়ল।

আগ্রা সহরে উত্তেজনা চরমে উঠেছিল। প্রত্যুষের সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেক লোক জেনে গেল যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। বেলা দেখে একজন ফিরিঙ্গী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এলো। তার অশ্ব নিজের পুচ্ছের পার্শ্বে ই মৃত্যুমুখে পতিত হ'য়েছিল। এই ফিরিঙ্গী দারার রণশিবির লুণ্ঠন ক'রেছিল। সে চারিদিকে প্রচার করে দিল যে সম্রাটের সৈন্য যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে। তারপর আমার মনে হ'ল যেন সমস্ত জিনিষ অন্ধকারময় হ'য়ে এসেছে। ঘড়ির গতি স্তব্ধ হ'য়ে গেছে। কিছুকাল পর সংবাদবাহক ছুটে এসে আমার বর্ণিত ঘটনাগুলির একটী অসম্পূর্ণ বিবরণ দিয়ে গেল। সামুগড়ের যুদ্ধের চরম মুহূর্তে এই লোকটী যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে এসেছিল। তার আশা ছিল যে সে স্বয়ং সম্রাটকে পাবে বুলন্দ একবালের(১) ঘরের সংবাদ দেবে।

আমি কিন্তু কোন অবস্থাতেই বিশ্বাস করিনি। গত কয়েক দিনের জন্য আমার পিতার বয়স কয়েক বৎসর বেড়ে গেছে। আমি আমার পিতাকে সান্ত্বনা বা উৎসাহ দেবার মত কোন ভাষা খুঁজে পেলাম না। আমি প্রাসাদ শিখরে উঠে দিনের আলোয় সমস্ত প্রান্তর নিরীক্ষণ ক'রতে লাগলাম। তখন সূর্য্যের উত্তাপ অত্যন্ত প্রখর। একটী অমঙ্গলের ছায়ার মত রাত্রির শীতল বাতাস মরুভূমির দিকে একটী কালো ঘন ধূলির মেঘ উড়িয়ে দিল।

অন্ধকারে আমি বিশেষ কিছু দেখতে পাই নি। কিন্তু সবই শুনতে পেয়েছিলাম। আমি শুনলাম, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অশ্ব পদধ্বনি ক্রমশঃ ক্ষীণ হ'য়ে গেল। প্রাসাদের দিকে কোন শব্দ শুনতে পেলাম না। কোন লোক এদিকে কেন আসে না?

রাত্রি গভীর হ'তে লাগল। এক প্রহর শেষ হ'য়ে গেছে। আমি শুনতে পেলাম—দূরের প্রান্তরে প্রভঞ্জনের মত এক অশ্বারোহীবাহিনী অগ্রসর হ'য়ে আসছে।

ক্রমে শব্দ নিকটতর হ'লে আমি বুঝতে পারলাম অশ্বখুরের শব্দ কত অসংখ্য। এই সমস্ত অশ্ব কি আহত হ'য়েছিল? আরোহী নেই কেন? কিন্তু এইবার মনে হ'ল অনেক অশ্বারোহী দুর্গদ্বারে এসে থেমেছে।

দারা এসেছে, কিন্তু একেলা তোরণ অতিক্রম করেন নি। পরিশ্রান্ত জাহাঁহত দারা দুর্গে একেলা করেন নি। তাঁর ভয় হ'ল যদি শত্রু এসে তাঁকে দুর্গে আবদ্ধ ক'রে রাখে। সে দুর্গের মধ্যে পিতার কিংবা আমার সম্মুখে সেই অবস্থায় আসতে সাহস করছিল না। কিন্তু নিজের প্রাসাদে একেলা করার পূর্বে আমার কাছে একটী সংবাদ পাঠিয়েছিল।

(ক্রমশঃ)

(১) "বুলন্দ একবাল" জগদ্বান, দারার উপাধি, কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস দারার মত দুর্ভাগ্য।

তথাগতের পথে

নরেন্দ্র দেব

পূর্বেই বলেছি রাজগৃহে তথাগত তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের প্রায় তিরিশটি বৎসর অতিবাহিত করেছিলেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আবেষ্টনে রমণীয় এই পার্বত্য প্রদেশটি তাঁর অত্যন্ত ভাল লেগেছিল। তিনি রাজগৃহকে অন্তরের সঙ্গে ভালবেসে ফেলেছিলেন। এর গিরি, নদী, উপত্যকা, প্রান্তর, শস্যক্ষেত্র, অরণ্যানী ও স্বচ্ছ সলিলা হ্রদ, এর ফুলফল আম্রকুঞ্জ, বেণুবন সবই বুদ্ধদেবের একান্ত প্রিয় ছিল। মহাপরিনির্বাণসূত্রে দেখা যায় বুদ্ধদেব তাঁর প্রধান শিষ্য আনন্দকে বলছেন—"মধুময় এই রাজগৃহ, মধুময় গৃধ্রকূট, মধুময় গৌতম ন্যগ্রোধ, মধুময় চৈত্যপ্রপাত, বেভার পর্বত বক্ষে সপ্তপর্ণী গুহা, মধুময় সেই সপ্তপর্ণী, মধুময় এই রাজগৃহের ঋষিগিরি অঞ্চলের কলশিলা, মধুময় এর ঋষিবনের মর্ম-শৌত্তিক প্রাগভার, মধু-তপোদারাম, মধুময় এর বেণুবনের করণ্ডকনয় নিবাপ, মধুময় ক্ষেমা জীবকের আম্রকুঞ্জ, মধুময় এখানে মর্দকুক্ষীস্থ মৃগদাব, এর সব কিছুই মধুময়!

এইখানেই তাই ভগবান বুদ্ধদেবের জীবনের বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনাও ঘটেছিল, বহু উপদেশ ও বাণী তাঁর শ্রীমুখ থেকে বিনির্গত হয়েছিল এইখানেই। তিনি যদিও দীর্ঘদিন একস্থানে বন্দী হয়ে থাকাটা একেবারেই পছন্দ করতেন না, তবু রাজগৃহ ছেড়েও যেতে পারতেন না। রাজগৃহেরই আশে পাশে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে তিনি নব নব পরিবেশের মধ্যে বাস করে নিজ অবস্থানের বৈচিত্র্য সাধন করতেন। রাজগৃহে তাঁকে ধরে রাখার কৃতিত্ব যদি কেউ দাবী করতে পারেন তবে সে পারবেন একমাত্র তদানীন্তন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মগধের মহারাজ বিম্বিসার!

"—নৃপতি বিম্বিসার,
নমিয়া বুদ্ধে
মাগিয়া লইল
পাদনখরেখা তাঁর!"

খৃঃ পূর্ব ৫৪৩-৪৯৩ শতকে তিনি মগধের সিংহাসন অলংকৃত করেছিলেন। সেকালের 'মগধ' বলতে বর্তমান পাটনা ও গয়া জেলার অন্তর্গত বিস্তীর্ণ ভূভাগ বোঝায়। এই সময়ে উত্তর ভারতে আরও তিনজন প্রসিদ্ধ নৃপতি রাজত্ব করতেন। তাঁরা হলেন ধনাঢ্যতম কোশলনৃপতি প্রসেনজিৎ, বৎসরাজ উদয়ন এবং অবন্তীপতি মহারাজ প্রদ্যোৎ। বিম্বিসারের স্থান এঁরাও তিনজনে একের কাব্যে ও ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। ফলে শৌর্য-বীর্যে, ধন-গৌরবে এদের চেয়ে প্রধান না হলেও শক্তি-সামর্থ্যে, বীর্যে ও পরাক্রমে বিম্বিসার যে এঁদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন তার পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন তাঁর উপর্যুপরি দিগ্বিজয় ও মগধ সাম্রাজ্যের ক্রমবিস্তারের দ্বারা। এই জয়যাত্রা যা বিম্বিসার শুরু করেছিলেন তা সম্পূর্ণ করেছিলেন তাঁর পৌত্র সম্রাট অশোক! উত্তরকালে বিম্বিসারের বংশধর এই সম্রাট অশোকই সমগ্র ভারতবর্ষে ও ভারতের বাহিরেও তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'রে জগতের ইতিহাসে অমরত্ব অর্জন করে গেছেন। বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মের যে প্রচার ভারতে ও ভারতের বাইরে দেখতে পাই, তা এই সম্রাট অশোকের কীর্তি। অবশ্য রাজগৃহের যা কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির ঐক্য সে ঐ

গৃধ্রকূট পর্বত শৃঙ্গ

নৃপতি বিম্বিসার ও তৎপুত্র অজাতশত্রুর রাজ। অজাতশত্রু প্রথমটা বৌদ্ধ-বিদ্বেষী দেবদত্তের কুটীল প্রভাবে পড়ে পিতাকে বন্দী করে নিজে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং সর্বাগ্রে রাজপ্রাসাদে থেকে বৌদ্ধ ধর্মানুষ্ঠান নিষিদ্ধ করে দিয়ে ক্রমে রাজধানী ও রাজ্যের সর্বত্র বৌদ্ধ ধর্মাচরণের প্রচণ্ড বিরোধিতা ক'রেছিলেন। কিন্তু, পরে ইনিও বুদ্ধদেবের একজন অনুরক্ত ভক্ত হ'য়ে ওঠেন। বুদ্ধদেবের দেহরক্ষার পর তাঁর ভস্মাবশেষের কতকাংশ যা তাঁর ভাগে পেয়েছিলেন সংগ্রহ করে রাজগৃহে নিয়ে এসেছিলেন এই মহারাজ অজাতশত্রু এবং একটি বৃহৎ স্তূপ নির্মাণ করিয়ে তার মধ্যে সেই ভস্মাবশেষ স্থাপন করেছিলেন। বুদ্ধদেবের স্বর্গারোহণের কিছুদিন পরেই তাঁর প্রথম শিষ্যগণ একটি সম্মেলনের আয়োজন করেন। এই

সংস্কারে তারা বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী প্রাপ্ত করে ধারাবাহিক ভাবে সাজিয়ে লিপিবদ্ধ করেন। এইভাবেই 'বৌদ্ধ ত্রিপিটক' গ্রন্থ রচিত হ'য়েছিল। এই বৌদ্ধ শ্রমণদের প্রচারস্থানের এক মহারাজ অশোক-ই প্রস্তরের গুহার সম্মুখে একটি বিশাল স্তম্ভ নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন। অজাতশত্রু মৃত হবার পর তাঁর পুত্র উদয়ন রাজগৃহ পরিত্যাগ ক'রে পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই সময় থেকেই রাজগৃহের প্রাধান্য কমে যেতে শুরু হয়। অবশ্য মধ্যে একবার মগধের মহারাজ শিশুনাগ খৃঃ পূঃ ৪১১-৩৯৩ খৃঃ অব্দে পুনরায় রাজগৃহে

গৃধ্রকূট পর্বতের উপর যে বেদীতে বুদ্ধদেব বসতেন

গৃধ্রকূট পর্বতের যে গুহায় 'আনন্দ' তপস্যা করতেন

তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন কিন্তু তা' স্থায়ী হয়নি। সম্ভবতঃ পাটলিপুত্রে নদীপথের সুবিধা থাকায় পরবর্তী রাজারা আবার রাজগৃহ ছেড়ে পাটলিপুত্রে চলে যান। ফলে, রাজগৃহ ক্রমে পরিত্যক্ত ও জঙ্গলে পরিণত হয়। অবশ্য খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকেও অর্থাৎ মহারাজ অশোকের রাজত্বকালেও রাজগৃহের যোলকোলাও কিছু কমেনি। কেন না মহারাজ অশোক এখানে একটি বৌদ্ধ স্তূপ ও তাঁর হস্তীসম অশোক স্তম্ভ নির্মাণ করিয়েছিলেন।

আমরা রাজগৃহে এখন বিংশ শতাব্দীর আওতাতে! এসে কিছু কিছু ভগ্নাবশেষ দেখতে পাচ্ছি শুধু লর্ড কর্জনের Ancient monument Preservation Actএর কৃপায়। নচেৎ যেমন বহু বিলীন ইতিপূর্বে কালে হ'তে নিশ্চিহ্ন হয়ে বিস্মৃতির অতলগর্ভে তলিয়ে গেছে, তেমনি এসবও কেতো, যদি না ভারতের প্রত্নতত্ত্ববিভাগ সজ্ঞের প্রায় আগলে রাখতো এই সব আড়া-চোরা ভারতীয় স্থাপত্য—যা আমাদের অতীত সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাক্ষ্য বহন করছে। আমাদের এখানে আসবার দেড়হাজার বছর আগে চীনের পরিব্রাজক ফা-হিয়ান রাজগৃহ পরিদর্শন করে যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, ভারতবর্ষের পাঠক পাঠিকাদের কৌতূহল-নিবারণের জন্য এখানে সে অংশটুকু উদ্ধৃত করা হচ্ছে; মনে রাখতে হবে যে ফা-হিয়েন আসবার সময় মগধে রাজত্ব করছিলেন গুপ্ত বংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত।

কিন্তু তিনি এগুলি রক্ষার কোনও ব্যবস্থাই করেন নি বা করা প্রয়োজনও মনে করেন নি।

ফা-হিয়ান লিখে রেখে গেছেন :—'অজাতশত্রু এই নগর অর্থাৎ 'রাজগৃহ' নির্মাণ করেন। এখানে এক ছোট্ট সঙ্ঘারাম আছে। নগরের পশ্চিম দ্বার থেকে তিনশো' পা গেলেই একটি বিশাল 'স্তূপ' দেখতে পাওয়া যায়। (কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে রাজা অজাতশত্রু নিজ অংশে বুদ্ধদেবের যে সমস্ত স্মৃতি-চিহ্ন পেয়েছিলেন সেগুলি সংরক্ষণের জন্য এই স্তূপ নির্মাণ করিয়েছিলেন। এটি ছিল কাঁচা ইঁটে) নগরের দক্ষিণ দিকে ৪ লী গিয়ে পর্ণশিরি পরিবেষ্টিত উপত্যকায় উপস্থিত হলাম। পাহাড়গুলি নগর-প্রাচীরের মতো স্থানটিকে ঘিরে আছে। এইটি বিম্বিসারের গড়া পুরাতন নগর। পূর্ব ও পশ্চিমে এটি ৭।৮ লী বিস্তৃত এবং উত্তর দক্ষিণে ৩।৪ লী হবে। এইখানেই সারিপুত্র ও, মৌদ্গল্যায়ন প্রথমে অশ্বজিতের সাক্ষাৎ পান। এখানে ভিক্ষুরা এক অগ্নিকুণ্ড করে এবং বুদ্ধদেবকে বিষাক্ত খাদ্যখেতে দেয়।

এইখানেই মহারাজা অজাতশত্রু নানা হাতীকে সুরাপানে মাতাল করে বুদ্ধদেবকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করেন। (মৎপ্রণীত 'গৌতমের শত জন্ম' বইখানি দেখুন) নগরের উত্তর পশ্চিমের এক বহু উপত্যকায় 'জীবক আম্রবেষ্ট' জীবক অম্বপালির (বৌদ্ধযুগের শ্রেষ্ঠ নর্তকী) উদ্যানে এক 'বিহার' নির্মাণ করিয়ে সশিষ্য বুদ্ধদেবকে সেই বর্ষপ্রাপ্তা নারীর ভক্তি-অর্ঘ্য গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান। এখনও এখানে তার ভগ্নাবশেষ আছে, কিন্তু নগরের ভিতর সবই চূর্ণ বিচূর্ণ ও ছিন্ন ভিন্ন—অধিবাসীরা কেউ নেই। আমি

এই উপত্যকার দক্ষিণ পূর্ব পর্বতে ১৫ লী পথান্ত উঠেই গৃধ্রকূটে উপস্থিত হলুম। গৃধ্রকূটের চূড়া থেকে মাত্র ৩ লী দূরে একটি দক্ষিণমুখী পর্বত গুহা রয়েছে। এখানে ভগবান তথাগত সাধনা করতেন। এরই ৩০ পা উত্তর পশ্চিমে আর একটি গুহায় আনন্দ সাধনা করতেন। ধর্মের শত্রু ও মানবের শত্রু 'মার' দৃষ্টরূপ ধারণ করে মাকি এই গুহার মুখে দাঁড়িয়ে আনন্দকে ভয় দেখিয়েছিল। ভগবান বুদ্ধদেব আনন্দের সেই বিপদের সময় নীয় অলৌকিক ক্ষমতাবলে পাহাড় ভেদ করে আপন হস্ত প্রসারিত করে দিয়ে আনন্দকে স্পর্শ করেন এবং তার কাঁধ চাপড়ে তাকে সান্ত্বনা দেন। পঞ্জীর এবং হস্তের প্রসারীভূত চিহ্ন এখনও এ পর্বতে দেখতে পাওয়া যায়। এই জন্যই এই পর্বতটির গৃধ্রকূট নাম হয়েছে। এখানে শতাধিক পরিত্যক্ত গুহা রয়েছে—একদা যেখানে বৌদ্ধ অর্হত্‌গণ ধ্যানমগ্ন থাকতেন। এইখানেই একদিন শ্রীবুদ্ধদেব যখন আপন গুহার সম্মুখে পদচারণা করছিলেন, সেই সময় দেবদত্ত তাঁকে হত্যা করবার উদ্দেশ্যে উত্তর দিকের উচ্চ স্থান থেকে একখানি প্রকাণ্ড পাথর গড়িয়ে নীচের তাঁর উপর নিক্ষেপ করে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় বুদ্ধদেবের প্রাণ রক্ষা পায়, কিন্তু রামপথের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে তিনি অত্যন্ত আঘাত পান। (মৎ প্রণীত গৌতমের, গত জন্ম' বইখানি দেখুন)

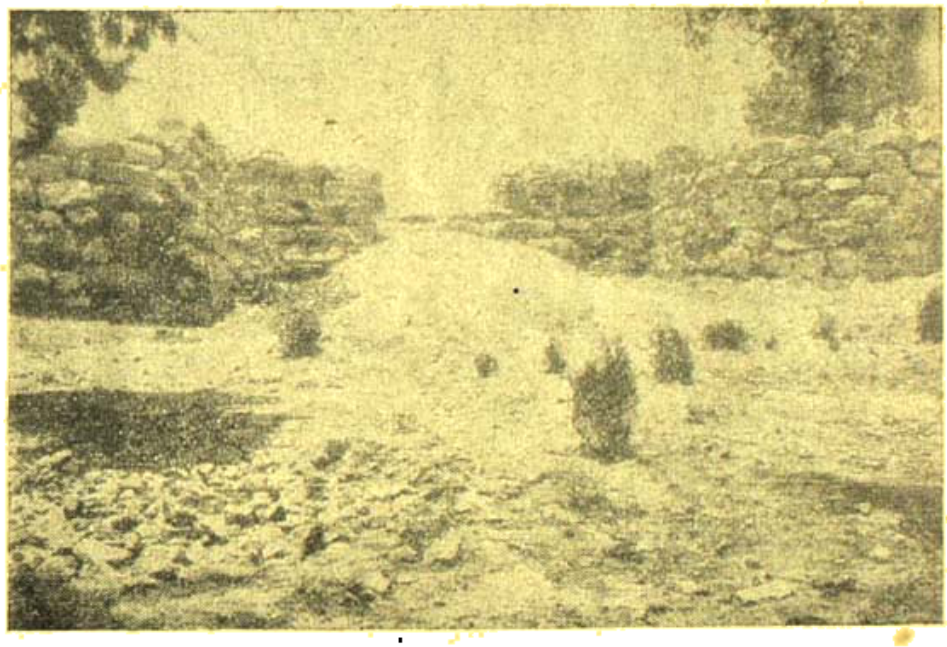

নূতন রাজগৃহের অংশাবশিষ্ট অজাতশত্রুগড়ের দক্ষিণ তোরণদ্বার

প্রাচীন নগরীর উত্তরে ৩০০ পা গেলে রাস্তার পশ্চিমে ছিল কালন্দ বেণুবনবিহার। এটির অস্তিত্ব এখনও আছে দেখলুম। শ্রমণগণ এখানে বাস করছেন। তাঁরাই এস্থান পরিষ্কার রেখেছেন। পুষ্পতরু ও ফলফুলের গাছগুলিতে জল দিচ্ছেন। এই স্থানের ২।৩ লী উত্তরে প্রস্রাবভূমি। দক্ষিণের পাহাড়ের পাশে ৩০০ পা পশ্চিম মুখে গেলে একটি প্রস্তর গুহা দেখা যাবে। এইটিই সেই প্রসিদ্ধ 'পিপ্পল গুহা' যেখানে বুদ্ধদেব প্রতিদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ধ্যানসমাহিত হ'তেন। পাহাড়ের আরও উত্তরে গিয়ে, সেখান থেকে ৫।৬ লী পশ্চিমে আর একটি প্রশস্ত প্রস্তর গুহা আছে। বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের পর প্রায় পাঁচশত অর্হৎ এখানে সমবেত হয়ে বহু পরিশ্রমে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র সংকলন করেছিলেন।"

ফা-হিয়ানের দেড় হাজার বছর পরে আমরা এখানে এসে যে আরও অনেক কিছুই দেখতে পাইনি একথা বলাই বাহুল্য। কারণ, ফা-হিয়ানের পরিক্রমার মাত্র একশ-দেড়শ বৎসর পরে প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হিয়ুয়েন সাঙ ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তখন সম্রাট হর্ষবর্ধন ভারত শাসন করতেন। (খৃঃ অব্দ ৬০৪-৬৪৬, অর্থাৎ, সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে) হিয়ুয়েন সাঙের বর্ণনায় পাই তিনি রাজগৃহকে 'কুশাগ্রপুর' বলেছেন। 'চতুর্দিক-গিরি-বেষ্টিত কুশের নগর!' তাঁর মতে এই নগর ছিল তখন পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত, কিন্তু উত্তর দক্ষিণে খর্ব। তিনি বর্ণনা দিয়ে গেছেন—"এই নগরের বেষ্টনী প্রায় ১৮০ লী। এর মধ্যস্থ প্রাচীন নগরের ভগ্ন প্রাকারের বেষ্টনী প্রায় ৩০ লী। পূর্বের দুয়ারে সারি সারি দৃঢ়গঠিত কলকে ফুলের বৃক্ষরাজি ফলভারে স্থানটিকে পূর্বাহ্ণ সূর্যে আলো ক'রে তোলে। নগর দ্বারের বাহিরে একটি স্তূপ রয়েছে। এইখানে দেবদত্ত অজাতশত্রুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে তথাগতকে মারবার জন্য পথে মত্ত হস্তী ছেড়ে দিয়েছিল। এইস্থানের উত্তর পূর্বে আরও একটি স্তূপ আছে যেখানে সারিপুত্র ভিক্ষু অশ্বজিতের নিকট ধর্মোপদেশ লাভ করে অর্হৎ হয়েছিলেন। এরই কিছু দূরে 'ঐশুণ্ড' গর্তের মধ্যে আগুন রেখে আর বিষ মেশানো খাদ্য দিয়ে বুদ্ধদেবকে হত্যা করবার চেষ্টা করেন। কালন্দ বেণুবন ও করণ্ডক নিবাসের কথাও হিয়ুয়েন সাঙ বলেছেন। তাঁর বর্ণনায় আছে—"বেণুবন থেকে আরও ৫।৬ লী দক্ষিণ পশ্চিমে এক প্রকাণ্ড গুহা ছিল, সেখানে মহাকাশ্যপাদি সহস্র অর্হৎ বুদ্ধদেবের লোকান্তরের পর একত্র সমবেত হ'য়ে "মহাসঙ্গিতীনিকায়" নামে বৌদ্ধশাস্ত্র লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

নূতন রাজগৃহ সম্বন্ধে হিয়ুয়েন সাঙ বলেছেন "নগরের বহির্প্রাকার নষ্ট হয়ে গেছে। ভিতরের প্রকাণ্ড প্রাকারের ভিত্তিমূল আজও স্পষ্ট বর্তমান। এর বেষ্টনী প্রায় ২০ লী হবে।" অর্থাৎ প্রায় ৪ মাইল। (প্রত্যেক ৩ লীতে প্রায় একমাইল হয়।)

হিয়ুয়েন সাঙের রাজগৃহ পরিক্রমার ১৩০০ বছর পরে আমরা এখানে এসে পুরাতন বা নূতন কোনও নগরের কোনও অস্তিত্বই দেখতে পেলুম না, দেখতে পেলুম শুধু 'অজাতশত্রুগড়ের' ভিত্তিমূলের

বিরাট ধ্বংসাবশেষ। আরও একটা জিনিস আমাদের কাছে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে এখন যে স্থানটি 'রাজগীর' নামে খ্যাত, রাজগৃহের সঙ্গে তার কোনও সাদৃশ্য নেই। এটি প্রাচীন 'রাজগৃহ' ত' নয়ই, তবে অজাতশত্রুর প্রতিষ্ঠিত নব-রাজগৃহ বা তার উপকণ্ঠের জনপদ হতে পারে, কারণ বর্তমান রাজগীর ষ্টেশনের একেবারে ধার থেকেই প্রায় অজাতশত্রুগড়ের প্রস্তর ভিত্তিমূল আরম্ভ হয়েছে। অর্থাৎ, পঞ্চ পর্বতের দুর্ভেদ্য আবেষ্টনের মধ্যে কোনটি হাঁকিয়ে উঠে অজাতশত্রু পাহাড় সীমানার বাইরে বেরিয়ে এসে সমতল ভূমির উপর তাঁর নূতন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন।

আমরা উঠেছিলুম ঠিক রাজগীর ষ্টেশনের পূর্বদিকে 'সপ্তপর্ণী' নামে একটি বাংলোয়। থাকবার মতো ভাল বাড়ী ওখানে বেশী নেই। মোটে ৭।৮ খানি আছে। তার মধ্যে 'সপ্তপর্ণীর' খ্যাতি শুনলুম সব চেয়ে ভাল। ১৯শ কৈলাস বসু ষ্ট্রীটের স্বীযুক্তা নিরুপমা দেবীর বাড়ী এই "সপ্তপর্ণী"। নামটি এখানকার এক ঐতিহাসিক পবিত্র স্মৃতির সঙ্গে বিজড়িত।

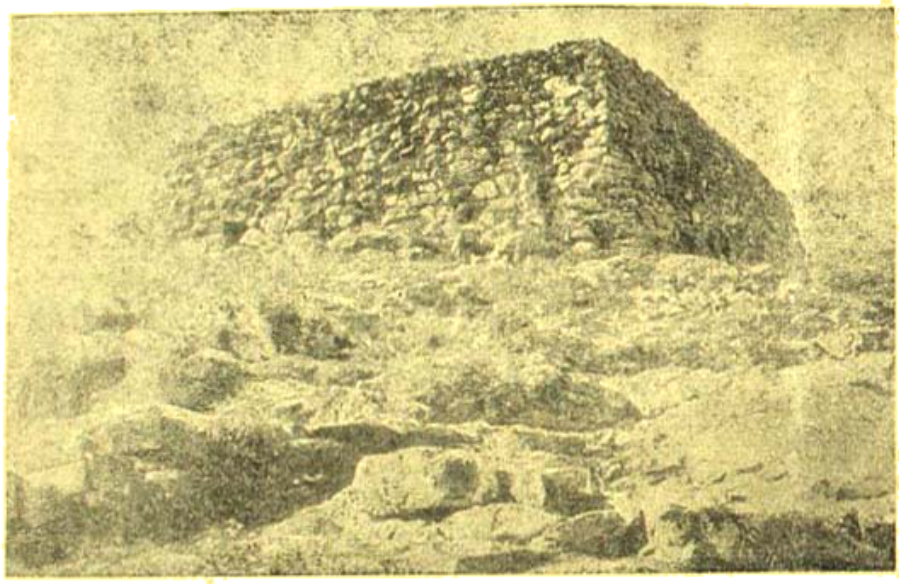

পিপ্পল পর্বতের পাষাণ সৌধ

সপরিবারে রাজগীরে এসেছি আমরা। সঙ্গে স্ত্রী, কন্যা, জ্যেষ্ঠা ভগ্নী, 'রাম' নামে একটি কথাইও-হ্যান্ড, অর্থাৎ একাধারে ঠাকুর-চাকর এবং দিদির পুরাতন ঝী 'বিনি'—বিনি বর্তমান যুগের পরিচারিকা মহলে একটি মহাঘ রত্ন কিন্তু, কারণ আজকের এই সাম্যবাদের দিনে এ ধরণের ঝী দ্রুত লোপ পেয়ে আসছে। আরও একটি প্রাণী আমাদের সঙ্গে গিয়েছিল, সে হ'ল নবনীতার কক্কার-স্প্যানিয়েল—'ঘুষু!'

হাওড়া থেকে বক্তিয়ারপুর ৩১০ মাইল পথ। রাত্রি ৯টার পর দিল্লী একস্‌প্রেস ছেড়ে পরদিন ভোর সাড়ে ৪টায় বক্তিয়ারপুরে গিয়ে নামলুম। বক্তিয়ারপুরে রাজগীর যাবার গাড়ী যাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করছিল। মার্টিন কোম্পানীর বক্তিয়ারপুর বিহার লাইট রেলওয়ের ছোট গাড়ী। বক্তিয়ারপুর থেকে রাজগীর মাত্র ৩০ মাইল পথ। শুনলুম মোটর যানেও যাওয়া যায়। আগের দিনে যখন এই ছোট রেল হয়নি তখন যাত্রীরা এখান থেকে গরুর গাড়ী চড়েই রওনা হ'তেন। আমাদের রাজগীর পর্যন্ত রেলের টিকিট কেনা ছিল। কাজেই একখানি খালি সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্ট বেছে নিয়ে চড়ে পড়া গেল। আর সমস্ত লাগেজ বিনি ও রামের জিম্মায় পাশের এক থার্ড ক্লাসে ঠেসে দেওয়া গেল। কাঁকা গাড়ী পেয়ে বেশ আরামে ছড়িয়ে বসেছি। এমন সময় দুই ফুলের মতো ফুটফুটে সুন্দর তিনটি শিশু নিয়ে একটি গৌরবর্ণ প্রিয় দর্শন যুবক দুটি তরুণী বধূকে নিয়ে আমাদের গাড়ীতে এসে উঠলেন। দেখে বেশ ভয় ও লজ্জাই হ'ল মনে হ'ল।

গাড়ী ছাড়বে শুনলুম বেলা আটটায়। কারণ, রাজগীর থেকে সকাল ৬টায় যে গাড়ী ছেড়েছে সে এসে না পৌঁছলে এ গাড়ী ছাড়বে না, যে হেতু—পথের মাঝে নাকি সিংগল লাইনের হাঙ্গামা আছে। প্রিয়দর্শন যুবকটির সঙ্গে আলাপ শুরু করা গেল। তাঁর নাম কেদারবাবু। গ্রেটইষ্টার্ণ হোটেলের একজন পরিচালক ইনি। রাজগীর চলেছেন। সেখানকার 'সর্ব রোগ-হর' উষ্ণ প্রস্রবণের জলপান করিয়ে ভগ্নীর ডিস্‌পেপসিয়া আরোগ্য করবার চেষ্টায় মাসখানেক সেখানে থাকবেন। দুটি যাত্রিণী বধূর মধ্যে একজন তাঁর ভগ্নী এবং অন্যজন তাঁর পত্নী! আমাদের পরিচয় পেয়ে তিনি ভগ্নী ও পত্নীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এঁরা খুব মিশুক। গল্প করতে লাগলেন আমাদের সঙ্গে।

কেদারবাবুর ভগ্নীপতি কালিবাবু খাবার জল, দুধ পাঁওরুটি চা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করে নিয়ে গাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন। এঁর রং গৌরবর্ণ নয় কটা, কিন্তু মজবুত একেবারে সাদা। কুস্তিবাজ মানুষ। চোখে মুখে একটা সহজ অকপটতার লাবণ্য ভাসছে। ভাল লেগে গেল এঁদের শালাভগ্নীপতি দুটিকেই। আমরা ষ্টেশনের পূবে লাইনের ধারেই 'সপ্তপর্ণী' বাড়ীতে থাকবো জেনে ওঁরা বললেন যে ষ্টেশনের পশ্চিম ধারে পোষ্ট অফিসের পিছনে রেখাবাবুর যে বেওলা লাল বাংলো আছে ওঁরা সেখানে উঠবেন। 'সপ্তপর্ণী' বা 'লাল বাংলো' কোনটাই আমরা কেউ চিনিনি, তবে অনুমানে বুঝতে পারলুম ভাগ্যদেবতা উভয় পরিবারকে হয়ত কাছাকাছি রাখতে দিয়েছেন।

(ক্রমশঃ)

ভারতীয় ব্যাঙ্কিংয়ের উন্নতিসাধন

আধুনিক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ভারতে এখনও প্রসার লাভ করে নাই এবং করে নাই বলিয়াই ভারতের গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী শতকরা ৮৫ জন এখনও মিহাজনের হইয়া গ্রাম্য মহাজনদের কবলে গিয়া পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৩,০০০, ব্রিটেনে ৫,০০০ এবং জাপানে ৯,৫০০ অধিবাসীর হিসাবে যখন একটি করিয়া ব্যাঙ্ক আছে, তখন ভারতে আছে ১,৩৩,০০০ জন পিছু একটি করিয়া ব্যাঙ্ক। এই ব্যাঙ্কের মধ্যে আবার ছোট বড় সর্বশ্রেণীর ব্যাঙ্কই আছে। অবশ্য ভারতে যে গুলিকে আমরা বৃহদাকার ব্যাঙ্ক বলি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বা ব্রিটেনের বৃহদাকার ব্যাঙ্কের সহিত তাহাদের তুলনাই চলে না। ব্রিটেন আমেরিকার হিসাবে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে পিছাইয়া পড়িয়াছে, তবু ব্রিটেনের পাঁচটি প্রধান ব্যাঙ্কের মধ্যে ক্ষুদ্রতম ন্যাশনাল প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্কের যে আমানত, তাহা ভারতের বৃহত্তম ব্যাঙ্ক ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের আমানতের (১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষে ২৮০ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা) ত্রিগুণের মত।

যাহা হউক, স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের আর্থিক পুনর্গঠনের প্রশ্ন যখন বড় হইয়া দেখা দিয়াছে, তখন এই বিপুল সম্ভাবনাময় দেশের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের অগ্রগতির ভিত্তি স্বরূপ ব্যাঙ্ক ব্যবস্থারও উন্নতি সাধন করিতে হইবে। ভারতে এখন যেটুকু জাতীয় ব্যাঙ্কিং কারবার চলিতেছে, তাহার সবটাই চলিতেছে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে, অর্থাৎ ব্যাঙ্ক জনসাধারণের টাকা জমা রাখে সামান্য সুদের প্রতিশ্রুতিতে এবং সেই টাকা আর একটু বেশী সুদের হিসাবে সরকারী ঋণ পত্রে বা নির্ভরযোগ্য স্বল্প মেয়াদী ঋণের হিসাবে লগ্নী করে; মোটের উপর আমানতের টাকা সময় বা সময়ে সময়ে পরিবর্তন যোগ্য অবস্থায় থাকিবে না, এমন কোন দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনায় (ইহার বাস্তব মূল্য যাহাই হউক) ব্যাঙ্ক সহজে যাইতে চায় না। অবশ্য ব্যাঙ্কের এই রক্ষণশীলতা এ দেশের আমানতকারীদের ভাব-প্রবণ জনোবৃত্তিরই একটা অনিবার্য ফল। এখানে আমানতকারীরা বাজে গুজবে হঠাৎ 'রাশ' ঘটাইয়া অনেক ভাল এবং বড় ব্যাঙ্কেরও পতন ঘটায়।

কিন্তু এই প্রকার ব্যাঙ্ক কারবারে সত্যকার শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি করা যায় না। ভারতের মত পশ্চাৎপদ দেশে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য জাতীয় শিল্প-ব্যাঙ্ক বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক এবং এক্সচেঞ্জ বা বৈদেশিক বিনিময় সংক্রান্ত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। জনসাধারণের মধ্যে ভালভাবে প্রচারকার্য চালানো হইলে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সিকিউরিটির মর্যাদা অনুধাবন করিয়া উদারভাবে ঋণদানে প্রস্তুত থাকিলে ভারতের বৃহদাকার ব্যাঙ্কগুলিই এইরূপ কাজ আরম্ভ করিতে পারে। বাস্তবিক সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ন্যায় প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় ব্যাঙ্ক ১২ কোটি টাকার বেশী আমানত (১৯৪৮) লইয়া শিল্প-ব্যাঙ্ক হিসাবে যদি জাতীয় আর্থিক সমৃদ্ধি সাধনে অগ্রসর না হয়, তাহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?

ভারতীয় ব্যাঙ্কিং সমগ্রভাবে এতদিন অত্যন্ত বিশৃঙ্খল অবস্থায় চলিতেছিল। আগেকার সিমলা ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, এলায়েন্স ব্যাঙ্ক অব সিমলা, ত্রিবাঙ্কুর ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক প্রভৃতি বড় বড় ব্যাঙ্কের পতনের কথা ছাড়িয়া দিলেও ১৯৪৬-৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলায় যে উপর্যুপরি ব্যাঙ্ক সঙ্কট ঘটিয়া গেল, তজ্জন্য আনাড়ী বা দুর্নীতিমূলক ব্যাঙ্ক পরিচালনা এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের জনস্বার্থ উপেক্ষার দুঃসাহস, দুই-ই তুল্যাংশে দায়ী। ব্যাঙ্ক জনসাধারণের টাকা জমা রাখে, এই টাকার মূল্য শুধু টাকার হিসাবেই হয় না। যাঁহারা ব্যাঙ্ক পরিচালনা করেন সাধারণের অর্থ নাড়াচাড়া করিবার দায়িত্ব গ্রহণের সময় নিজেদের অধিকার সম্পর্কেও তাঁহাদের সচেতন হওয়া উচিত। এই সঙ্গে সরকারী কর্তৃপক্ষের বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উচিত ব্যাঙ্কগুলি ন্যায়সঙ্গতভাবে কাজ কারবার চালাইতেছে কি না, সে সম্বন্ধে সজাগ দৃষ্টি রাখা। বাঙ্গলার ব্যাঙ্ক সঙ্কটে উক্ত দিক দুইটিতেই কর্তব্যত্রুটি দেখা গিয়াছে বলিয়া অসহায় দেশবাসীর কষ্টার্জিত বহু টাকা জলে গিয়াছে। উল্লিখিত ব্যাঙ্ক সঙ্কটে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত যে ছয়টি ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছে, শুধু তাহাদেরই আমানতের পরিমাণ ছিল ৮ কোটি ২ লক্ষ টাকা।

আশার কথা, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বর্তমানে তাহার কার্যধারা সংস্কারিত করিয়াছে এবং যে সব ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত নয়, সে গুলির পরিচালনা ব্যবস্থার প্রতিও লক্ষ্য রাখিতেছে। তার চেয়ে বড় কথা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এখন অধিকতর সহানুভূতি ও দ্রুততার সহিত বিপন্ন ব্যাঙ্ককে সাহায্য করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। এ ছাড়া সমগ্র ভাবে ভারতীয় ব্যাঙ্কিংয়ের উন্নতির জন্য দীর্ঘকাল হইতে একটি বলিষ্ঠ ব্যাঙ্ক আইন প্রবর্তনের জন্য সরকারের উপর যে চাপ দেওয়া হইতেছিল, তাহা এতদিনে কার্যকরী হইয়াছে এবং গত ১৬ই মার্চ হইতে একটি ব্যাপক ব্যাঙ্ক আইন ভারতে চালু হইয়াছে। এই ব্যাঙ্ক আইনে ব্যাঙ্ক ব্যবসা চালাইতে হইলে কত টাকা নিয়তম মূলধন লইয়া কাজে নামা যাইবে তাহা পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে (২৭ ধারা) এবং ব্যাঙ্কের পরিচালকবর্গ যাহাতে নিজ স্বার্থে বা খেয়ালে ও খুসীমত জনসাধারণের আমানতী টাকা লইয়া ছিনিমিনি না খেলিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা (১৯ ও ২০নং ধারা) করা হইয়াছে। যাহাতে প্রত্যেক ব্যাঙ্কের কার্যাদির

উপর নজর রাখার সুবিধা থাকে. উক্তরূপ ব্যাঙ্ক আইনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে লাইসেন্স না লইয়া কোন ব্যাঙ্ককে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাঙ্কিং কারবার চালাইতে দেওয়া হইবে না বলা হইয়াছে (২২নং ধারা)।

এ দেশে ব্যাপক একটি ব্যাঙ্ক আইনের সত্যই প্রয়োজন ছিল এবং সেই প্রয়োজনের বিবেচনায় একটু অসম্পূর্ণ হইলেও আলোচ্য ব্যাঙ্ক আইন ভারতীয় ব্যাঙ্কিংয়ের উন্নতির অনুরূপ হইবে বলিয়া মনে হয়। আমানতের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ব্যাঙ্ক আইনে কিছুটা ব্যবস্থা হইয়াছে। অবশ্য দেশের জনসাধারণের মনে যতদিন ব্যাঙ্কের উপর নির্ভরশীলতা আর একটু না বাড়িবে, ততদিন ভারতীয় ব্যাঙ্কের বিপদ একেবারে কাটিবে না। এরূপ অবস্থা আসিতে এখনও কিছু বিলম্ব আছে বলিয়াই মনে হয়। অবশ্য ইচ্ছিনকে কর্তৃপক্ষ ব্যাঙ্ক আমানতের নিরাপত্তার জন্য ভারতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে আমানত বীমা করিবার প্রতিষ্ঠান বা ডিপজিট ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন গঠনের চেষ্টা করিলে অবশ্য সুফল আশা করা যায়।

এই সব ব্যবস্থা ছাড়াও ভারতীয় ব্যাঙ্কিংয়ের উন্নতি আর একটি জিনিসের উপর নির্ভর করে এবং তাহা হইতেছে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি। এদিক হইতে ভারতে কারবার বিদেশী ব্যাঙ্ক গুলির সহিত ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির তুলনা করিলে হতাশ হইতে হয়। কি চেক ক্যাশ করার ব্যাপারে, কি টাকা জমা দেওয়ার ব্যাপারে, কি ঋণ মঞ্জুরি ও ঋণ লাভের সময়, প্রায় ক্ষেত্রেই বাহিরের লোককে ব্যাঙ্ক ঘরে ঢুকিতে দেখা যায়। এই সব বাহিরের লোকই অফ ব্যাঙ্কের প্রাণ এবং ইহাদের সন্তুষ্ট রাখার উপর ব্যাঙ্কের আত্মরক্ষা নির্ভর করে। এইরূপ অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি ঘটিবার প্রধান কারণ ভারতীয় ব্যাঙ্কে যেসব কর্মচারী থাকেন, আপন আপন কঠিন কর্তব্য পালনের উপযোগী শিক্ষা না লইয়াই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহারা ব্যাঙ্কের চেয়ারে আসিয়া বসেন। একবার বসিতে পাইলে তো কথাই নাই, এখন ট্রেড ইউনিয়নের যুগ, প্রতিষ্ঠানের উন্নতির সহিত নিজেদের উন্নতির অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কটুকু বেমালুম ভুলিয়া গিয়া তাঁহারা নিজেদের ব্যাঙ্ক কর্মচারী হইবার নিয়তম যোগ্যতাটুকু অর্জন করিবার প্রয়োজন আর অনুভব করেন না; তাঁহাদের সমস্ত চিন্তা এবং চেষ্টা চলিয়া যায় ইউনিয়নের শক্তিবৃদ্ধি বা নিজেদের আর্থিক উন্নতিসাধনের দিকে। এই অভিযোগ নূতন কর্মচারীদের সম্পর্কেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ভারতীয় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে আমাদের বন্ধু শ্রী কে সি ঠাকুর ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কিং জার্নালের জুন সংখ্যায় একটি চমৎকার প্রবন্ধ (Service Efficiency in Indian Banks—Indian Banking Journal, June, 1949) লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটি ভারতীয় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পড়িয়া দেখা উচিত। শ্রীযুক্ত ঠাকুর এই প্রবন্ধে বিলাতের মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক, বার্ক অফ স্কটল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক বা লয়েডস্ ব্যাঙ্ক ষ্টাফ ট্রেনিং কলেজের মত ভারতীয় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয় খোলার কথা বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য এভাবে চেয়ারে বসিবার আগে কর্মচারীরা উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে কাজ-কারবারের অনেক সুবিধা হইবে।*

ভারতের জনস্বাস্থ্য

ভারতবর্ষের জনস্বাস্থ্য অত্যন্ত শোচনীয় এবং স্বাস্থ্যের এই শোচনীয়তার সহিত ভারতবাসীর আর্থিক দুরবস্থাও বিজড়িত। পরাধীনতার যুগে ব্যাপক জনস্বাস্থ্যের অবনতিকে আর্থিক অবস্থা হইতে পৃথক করিয়া দেখা হইয়াছে, এখন এই সমস্যা যুক্তভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। শুধু অর্থাভাব বা পুষ্টিহীনতার জন্যই ভারতবাসী রুগ্নকায় নয়। শিক্ষার অভাবও তাহাদের স্বাস্থ্যবোধের বিকাশ হইতে দেয় নাই। দেহ সুস্থ থাকিলে তবেই মন সুস্থ থাকে এবং মন সুস্থ থাকিলে কর্মোৎসাহ জন্মায়। ভারতবর্ষের দারিদ্র্য হইতে যেমন অস্বাস্থ্যের উৎপত্তি তেমনি অস্বাস্থ্য হইতে দারিদ্র্যের উদ্ভব।

ভারতে কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, জ্বর, আমাশয় ও উদরাময়, ম্যালেরিয়া রোগ ইত্যাদি নানাপ্রকার রোগে বৎসরে ৯২ লক্ষের মত লোক মারা যায়। ইহার মধ্যে কলেরা, উদরাময় ইত্যাদি পেটের রোগে মারা যায় ৪ লক্ষের বেশী লোক। এই সব রোগ কিছুটা অপুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ার জন্য হয় সন্দেহ নাই, তবে কিছুটা অসাবধানতার জন্য সামান্য কারণে হয়। আর রোগ যে কারণেই ঘটুক, এই সব রোগের আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা খুব কম ক্ষেত্রেই আছে। দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষে এই আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা সহর অঞ্চল ছাড়িয়া গ্রামে প্রবেশের পথ পায় নাই। এই সব রোগ কিন্তু গ্রামেই বেশী হয়, কাজেই চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রামে না পৌঁছাইবার অর্থ ভারতবর্ষের এই চিকিৎসাব্যবস্থার সুবিধা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হওয়া। প্রতি হাজার ভারতবাসীর হিসাবে হাসপাতালে বেডের সংখ্যা মাত্র ০·২৪ (ইংলণ্ড ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এই সংখ্যা যথাক্রমে ৭·১৪ ও ১০·৪৮); ইহা হইতেই ভারতের গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসাব্যবস্থার অপ্রাচুর্য্য উপলব্ধি করা যাইবে। গত বৎসর গ্রীষ্মকালে লণ্ডনে এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ভারতের স্বাস্থ্যসচিব রাজকুমারী অমৃত কাউর বলেন যে ভারতে যখন প্রয়োজন ২০ লক্ষ

---

* আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এইরূপ একটি নিজস্ব ষ্টাফ ট্রেনিং কলেজ খুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং এই কলেজে উপস্থিত ২০জন করিয়া এক একবারে শিক্ষা পাইবে। শিক্ষার সময় হইবে তিন হইতে ছয় মাস। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল অপেক্ষাকৃত নূতন ব্যাঙ্ক হইলেও বৃহদাকার প্রথম শ্রেণীর ব্যাঙ্ক হিসাবে ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। ষ্টাফ ট্রেনিং কলেজ স্থাপনের এই প্রথম প্রয়াস ব্যাঙ্কটিকে নিঃসন্দেহে আরও মর্যাদায় করিয়া তুলিবে। আমরা আশা করি ভারতের ছোট বড় সব ব্যাঙ্কই সম্মিলিতভাবে অথবা একক ভাবে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের এই প্রচেষ্টাকে অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিবেন।

চিকিৎসকের—তখন এদেশে সবশুদ্ধ মাত্র ১০,০০০ চিকিৎসক আছেন। সহরে উপার্জনের সুযোগ বেশী, রুচি ও শিক্ষাসংস্কৃতির দিক হইতে সহরের জীবন অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক, কাজেই উপরিউক্ত চিকিৎসকদের অধিকাংশই যে সহরে থাকেন, তাহা বলা বাহুল্য।

সুতরাং ভারতের আর্থিক পুনর্গঠনের যে কোন পরিকল্পনায় জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনের প্রশ্নটিকে অবশ্যই বড় করিয়া দেখিতে হইবে। বোম্বাই পরিকল্পনায় মোট ১০,০০০ কোটি টাকার মধ্যে স্বাস্থ্যখাতে ৩০০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছিল। চিকিৎসকরা যাহাতে গ্রামে যাইতে উৎসাহবোধ করেন, তজ্জন্য আন্দোলনতো দরকারই, তাহাড়া তাঁহাদের আর্থিক সুবিধা-অসুবিধা দিকটিও দেখিতে হইবে। গ্রামাঞ্চলে সরকারী চিকিৎসাব্যবস্থা যতই প্রসারিত হইবে, ততই এদিক হইতে কাজ হইবার আশা থাকে। গ্রামবাসীদের আর্থিক অবস্থার ও শিল্প-ব্যবস্থার উন্নতির সহিত তাহাদের স্বাস্থ্যোন্নতির সম্পর্কের কথা আগেই বলা হইয়াছে। সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে গ্রামাঞ্চলে প্রচারকার্য্য চালাইলেও উপস্থিত কিছুটা ফল পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। ভারতের জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সম্পর্কে আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ভিত্তিতে পরামর্শদানের জন্য ভারতসরকার স্যার জোসেফ ভোরের নেতৃত্বে যে কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই কমিটি তাহাদের রিপোর্টে ৪০ বৎসর প্রসারী এক ব্যাপক পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাদের অভিমতানুসারে কাজ হইলে প্রথম দশবৎসরে ১,০০০ কোটি টাকা খরচ হইবে। বলা বাহুল্য, ভোর পরিকল্পনাটি মূল্যবান হইলেও ইহার আর্থিক দায়িত্ব বর্ত্তমান অবস্থায় সরকারের পক্ষে বহন করা কঠিন। ভারতের শতকরা ৮০ জন অধিবাসী এখনও দেশীয় চিকিৎসা-ব্যবস্থায় চিকিৎসিত হইয়া থাকে। এই চিকিৎসা ব্যবস্থা সুলভ ও কার্য্যকরী। ভারতসরকার ইহার উন্নতি সম্পর্কে পরামর্শ দিবার জন্য স্যার রামনাথ চোপরার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। কমিটি গত ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত রিপোর্টে চরকোরী, কবিরাজী ও ইউনানী এই তিনপ্রকার প্রথার সমন্বয় সাধন করিয়া একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ চিকিৎসাব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সুপারিশ করিয়াছেন এবং আশা করিয়াছেন যে এই চিকিৎসাব্যবস্থা খরচের দিক হইতে দেশের সাধারণ লোকের আয়ত্তের মধ্যে থাকিবে এবং ইহার উপকারও পাইবে সকলে। চোপরা কমিটির সুপারিশে এই নূতন ব্যবস্থায় শিক্ষাদানের জন্য মূলধন খাতে ২০ হইতে ৫০ লক্ষ টাকা এবং পৌনঃপুনিক খাতে বার্ষিক ১০ হইতে ১৫ লক্ষ টাকা খরচ অনুমান করা হইয়াছে। কমিটি আরও অনুমান করিয়াছেন যে, প্রত্যেক প্রদেশে ৫০০ শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়ার হিসাবে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা এবং গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার জন্য মূলধন খাতে ৫ লক্ষ টাকা ও পৌনঃপুনিক খাতে বৎসরে ২২ লক্ষ টাকার বেশী খরচ হইবে না।

যাহা হউক, মোটের উপর ভারতের জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ব্যাপক একটি পরিকল্পনা লইয়া ভারতসরকারকে সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হইতে হইবে। ভারতের জনস্বাস্থ্যের শোচনীয়তা সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, এসময় ভারতসরকারের দিক হইতে অন্তের মত উদাসীনতা লজ্জার কথা হইবে। বিশ্বস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান (World Health Organisation) ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের যে কার্য্যতালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে বাঙ্গলাদেশ হইতে কলেরার প্রকোপ কমাইবার জন্য আন্তর্জ্জাতিক বিশেষজ্ঞের দুইটি দল পাঠান হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এজন্য ব্যয়বরাদ্দ হইয়াছে ৬ লক্ষ টাকা।

পাতকী

শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস

যে কুলে যদুক পাতকী আমারে
আমি যে পাতকী নহে গো,
চিরসুন্দর মাঝারে যে আমি,
পাতকী কেমনে হবো গো ?

(আমি) করেছি আমারে পাতকী আপন,
তুমি হবে ব'লে পাতকীতারণ,
তা না হ'লে যে গো সদা নিমগন,
তুমিই থাকিতে তোমাতে।

পাপ পুণ্য আদি আছে যতগুণ
তোমাতে নাহি যে, তুমি যে নির্গুণ
সত্ত্ব, রজ, তম, মায়ার আগুন
জ্বালায় এ মন মাঝেতে।

আকাশ পথের যাত্রী

শ্রীসুষমা মিত্র

(পূর্বানুবৃত্তি)

২রা জুলাই—আমাদের গাড়ী Niagara নদীর ধারে ধারে চলেছে। শান্তশিলা নদী ক্রমশঃ স্রোতসঙ্কুল হয়ে ছুটে চলেছে; কানে এল অদূরে নদীর স্রোত ঝর ঝর শব্দে পাথরে আছড়ে পড়ছে; দেখতে দেখতে নদী যেন সর্প সঙ্কুলের মত ফণা তুলে গর্জ্জমান হ'ল; সেযে এক বিরাট গহ্বরোদ্ভব ফাঁপ দিয়ে লাফ দেবার মত তুলে উঠল। জলপ্রপাতের সামনে কুয়াশার মত জলকণা উর্দ্ধে উত্থিত হয়ে স্থানটিকে অন্ধকার করে রেখে দিয়েছে। প্রায় ··· ফিট উঁচু হতে জলধারাগুলি পাথরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

এই জলপ্রপাতের একধার আমেরিকার সীমানার এক শেষপ্রান্ত এবং অপর পাশে Canadaর সীমানা আরম্ভ। পাশাপাশি দুটি বৃহৎ জলধারার একটির নাম American জলপ্রপাত এবং অন্যটি Canadian জলপ্রপাত। আমরা চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে দেখলাম এক পাহাড়ের লেখা আছে "Wind Cave"; সেখান দিয়ে লোকেরা দলে দলে জলপ্রপাতের পাদদেশে যাচ্ছে। স্থানটি ভীষণ বিপজ্জনক জেনেও আমাদের যাবার কৌতূহল হল। এখানে যাবার জন্যে নিজেদের কাপড়চোপড় বদল করে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা একপ্রকার রবারের পোষাক (নাম Monkey dress) পরতে হয়। আমরা সেই পোষাক পরে lift এ করে ১৭০ ফিট নীচে নেমে —সেই ভীষণ জলপ্রপাতের সামনে এলাম। সামনেই দেখলাম কাঠের সেতু-গুলি জলের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে: উপরে দাঁড়ালে জলপ্রপাতের আরো নিকটবর্ত্তী হওয়া যায়। মাঝে মাঝে ঝড়ের ঝাপটা এসে জলকণা ছিটিয়ে স্থানটি ভিজিয়ে অন্ধকার করে রেখে দিচ্ছে। আবার সে কুয়াশা সরে গিয়ে একটু পরিষ্কার

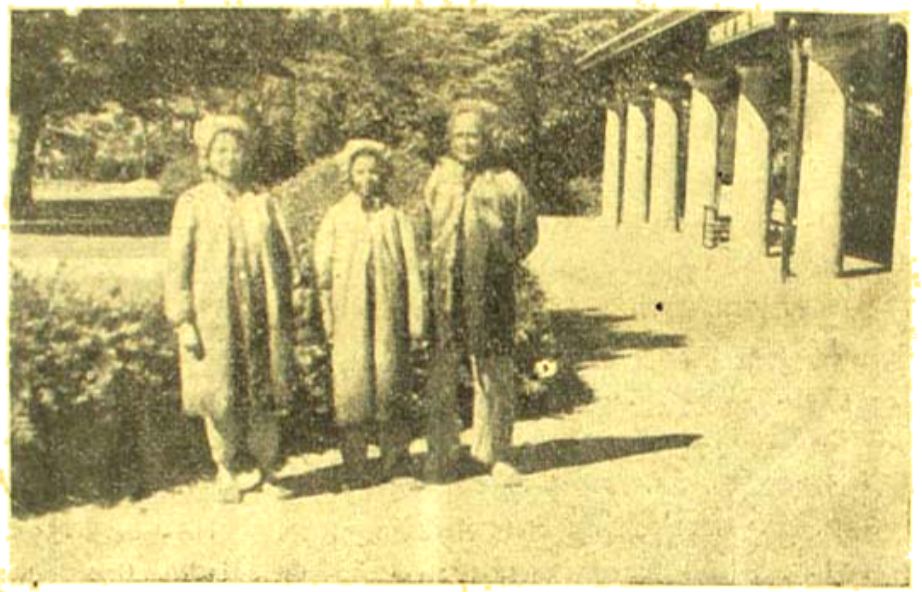

নায়াগ্রা জলপ্রপাতের উপরদেশে 'উইণ্ডকেভ' এর মধ্যে। 'মনকী ড্রেস্' পরে আমরা।

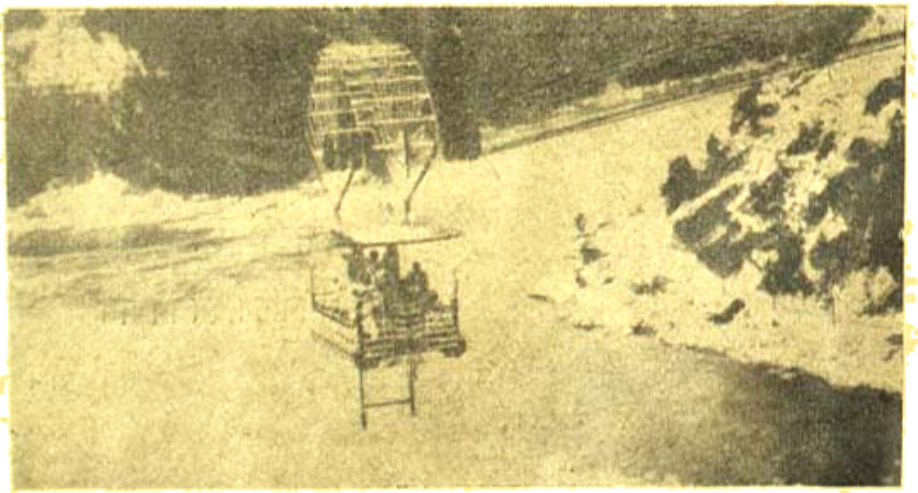

তারে ঝোলানো দোলনা গাড়ী—(নায়াগ্রা নদীর জল এখানে ফোল হ'য়ে ঘুরছে। এই ঘূর্ণী জলের উপর এপার—ওপার যাতায়াতের জন্য এই তারে ঝোলানো দোলনা গাড়ী চড়তে হয়।)

হতে শুরু করে লাগল বরং দাঁড়িয়ে থাকি, আবার একটু এগোনো হয়। তার এই দুঃসাহসিকতার উন্মাদনায় যেন এক নূতন অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল। আমরা উপরে উঠে এসে Niagara নদীর উপর বড়

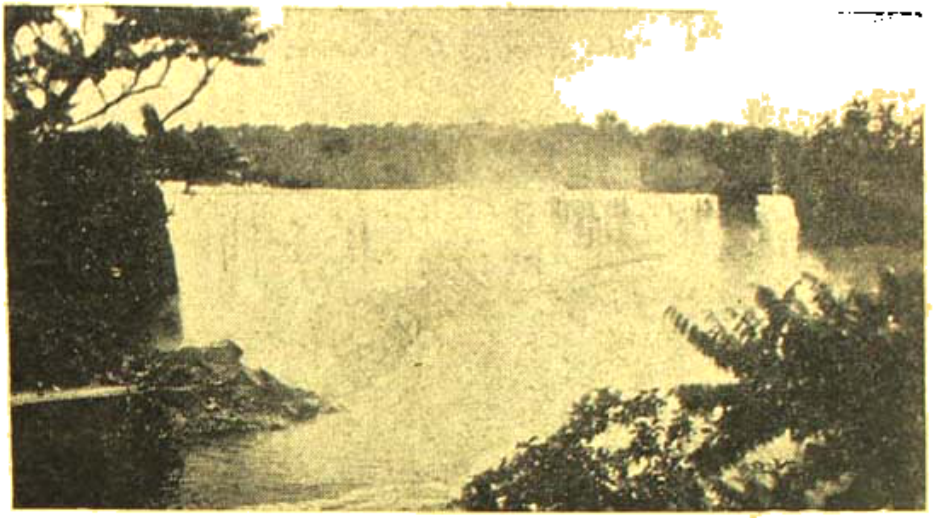

আমেরিকার দিকের নায়াগ্রা জলপ্রপাত।

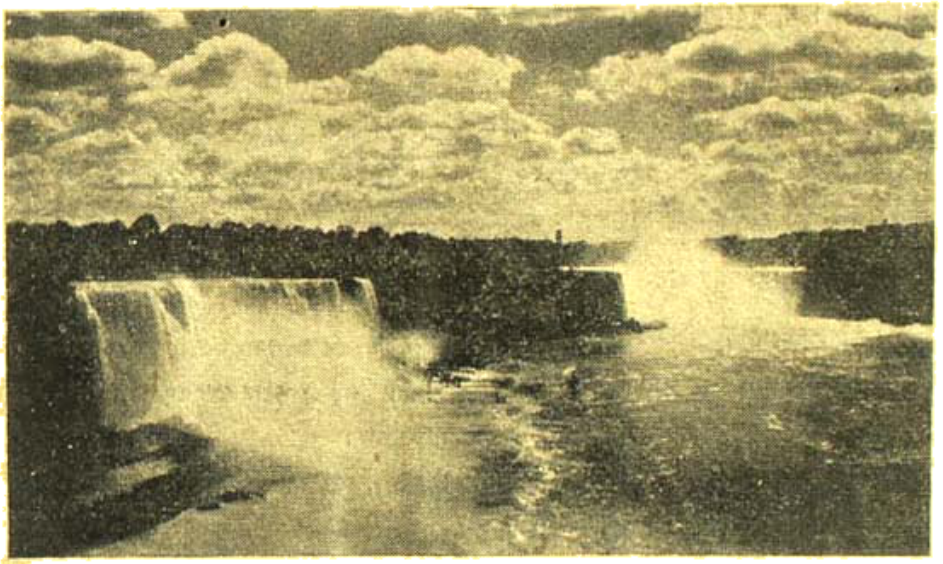

জ্যোৎস্না রাতে নায়াগ্রা (ডানদিকেরটি আমেরিকান, বাঁ দিকেরটি ক্যানেডিয়ান)।

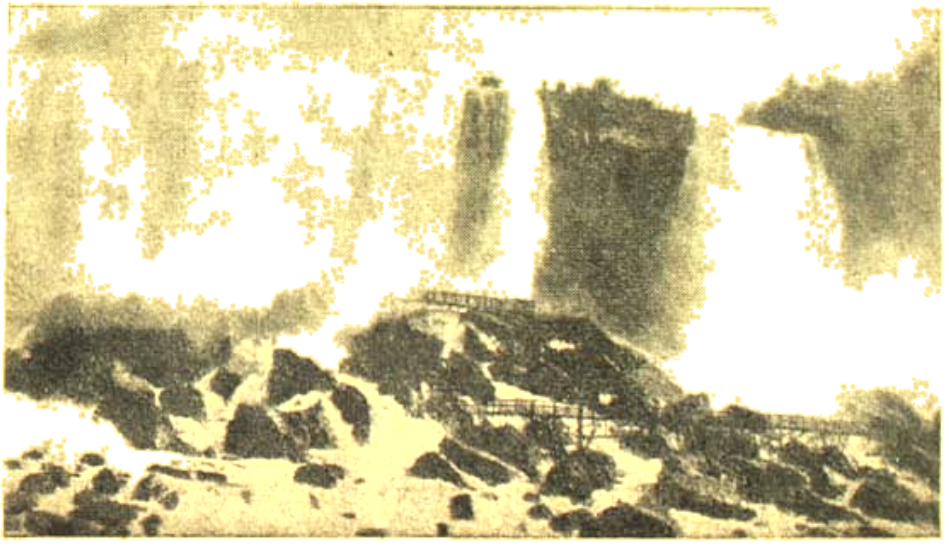

জলপ্রপাতের নীচের এই কাঠের সেতুগুলির উপর 'মন্‌কী ট্রেল' পরে যাওয়া যায়।

ছোট্ট ষ্টেটে পার হয়ে Canada-র মধ্যে আসলাম। এই ব্রীজ পার হবার সময় প্রত্যেকের Passport দেখাতে হল। Canada

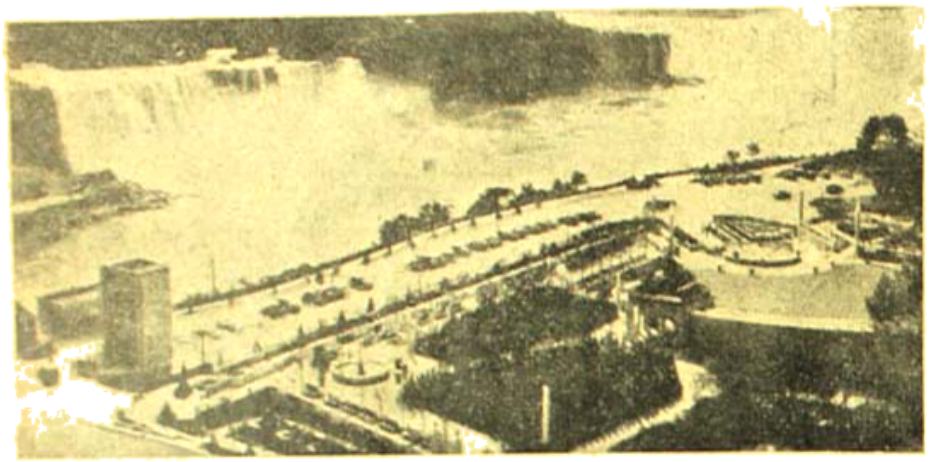

কানাডার দিকের নায়াগ্রা জলপ্রপাত।

দৃশ্যটি এখান থেকে জলপ্রপাতের সব চাইতে অপূর্ব। জলধারাগুলির ভিতর [illegible] সূর্যের আলো পড়ে যে সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমরা

নায়াগ্রা জলপ্রপাতের এই অংশকে বলে—'অশ্বখুর প্রপাত'

সামনের একটি রেষ্টুরেন্টের ছাদে বসে আহারাদি করলাম, তারপর জলপ্রপাতের অপরদিকে বেড়াতে বেড়াতে Niagara নদীর ধারে এসে পড়লাম। দেখলাম একস্থানে গভীর খাদের ভিতর দিয়ে জলতরঙ্গ উন্মাদের মত ঘূর্ণিপাক দিয়ে ছুটেছে। আবার তার উপর, এক পাহাড় হ'তে অপর পাহাড় অবধি তারে-ঝোলানো এক রকম ঝোলনার গাড়ী (Aerial Cage) এ-পার ও-পার করে যাত্রী নিয়ে বেড়িয়ে আসছে। দুঃসাহসিকতার চূড়ান্ত ব্যবস্থা দেখে আমরা আবার জলপ্রপাতের ধারে ফিরে এলাম। তখন আকাশ সূর্যের ম্লান আলোয় ঝেকে গেছে, ধীরে ধীরে পূর্ণিমার চাঁদ জলপ্রপাতের উপরে উঠে দাঁড়াল; অন্ধকারের মধ্যে চাঁদের আলোয় জলধারা রূপোর মত ঝক ঝক করে উঠল।

আমরা অভিভূত হয়ে চাঁদের আলোয় জলপ্রপাতের অপূর্ব্ব শোভা দেখছি এমন সময় পিছন দিক থেকে বড় বড় ফ্লাড লাইটে ভগবগে গায় রঙ জলের উপর ফেলে জল-প্রপাতটিকেই কৃত্রিম আলোয় রঙীণ করে তোলা হল। অপূর্ব্ব-অপরূপ-চমৎকার সে দৃশ্য!

২রা জুলাই। আমরা Buffalo সহর থেকে লিচ্‌ইয়র্কে এলাম। হোটেল ব্রাজাতে এসে দেখি চারিদিক জনশূন্য, কোথাও একটি লোকের দেখা মেলে না। অফিসের সামনে অপেক্ষা করে করে খানেক পরে একটি ঘর তো পাওয়া গেল। লিফ্‌টে ওঠার সময় দেখি মফঃস্বলী লিফ্‌ট-ম্যানটি দাঁড়িয়ে চুলছে করছেন।

আগামী কাল ৪ঠা জুলাই শুক্রবার আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস। সহরশুদ্ধ লোক এই তিনদিনের ছুটিতে সহর ছেড়ে চলে গেছে—সমুদ্রের ধারে, নদীর তীরে, পল্লীবাসে, বাগানে ও খোলা মাঠে তাঁবু ফেলে থাকতে। সেখানে তারা হৈ হৈ করে মহানন্দে দিন কাটাবে। আজই অর্দ্ধেক সহর খালি হয়ে গেছে। এদেশে আবার শনি ও রবি দুদিনই পুরো ছুটী থাকে।

আজকের দিনটি বাদে অফিস ও দোকানপাট খোলা থাকে দেখে আমরা তাড়াতাড়ি কাজ সারতে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমেই Pan American Air office-এ যাওয়া গেল; আমাদের Dublin যাত্রার জন্য বিমানের যথাযথ বন্দোবস্ত হয়েছে কিনা জেনে নিশ্চিন্ত মনে সহর ঘুরতে বেরোলাম। Dr Taylor-এর সঙ্গে দেখা করার জন্য আমরা তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হলাম। আমাদের পেয়ে ডাক্তার ও তাঁর স্ত্রী ভারি খুশী। আমাদের আমেরিকা ভ্রমণ শেষ হল শুনে তখনই আবার নিমন্ত্রণ করে বসলেন পরের বারে আসার জন্য এবং তাঁর গৃহে অতিথি হবার জন্য। আমরা কিছুক্ষণ বসে গল্প করলাম। কথা প্রসঙ্গে তাঁকে একবার Dr Taylorকে জানান যে আজকের এই বৈজ্ঞানিক যুগে আমেরিকা সত্যই চিরস্মরণীয় নাম করেছে এবং আমাদের এই বাস্তব-

জগতের এক অভাবনীয় উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এটা তো সমগ্র মানবজীবনের একটা দিক মাত্র ; জীবনের আরেকটি দিকে—যেখানে মানুষ তার জগতের ঊর্দ্ধে সেই অধ্যাত্মিক জ্ঞান বা আত্ম-জ্ঞানের চিন্তা ক'রে, এক বিস্ময়কর আনন্দ আস্বাদ করে গেছেন তার সন্ধান আজও আমেরিকা পায়নি। হয় তো একদিন এই ভোগ উপকরণের শেষে এ দেশেও তার অনুসন্ধিৎসা জাগবে। Dr Taylor গভীরভাবে সমস্ত কথা শুনে বল্লেন "তুমি যে বলছ ভোগ পরিতৃপ্তির পর আমেরিকায় বিতৃষ্ণা আসবে, তা আমার মনে হয় না। তা যদি হত তা' হ'লে Christ প্যালেষ্টাইনের একটি ছোট অখ্যাত গ্রামে জন্মগ্রহণ না করে বিশ্বের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ নগর Romeতেই জন্মাতেন।" কথাগুলি শুনে বড় ভালো লাগল। ভগবান কোথায় আবির্ভাব হবেন কে তা বলতে পারে?—Dr Taylor শুধু বিশ্ববিখ্যাত ধাত্রী-বিজ্ঞানবিদ্ নন্ তিনি একজন চিন্তা জগতেরও মনিষী ও বিশিষ্ট অন্তর্মুখী দার্শনিকও।

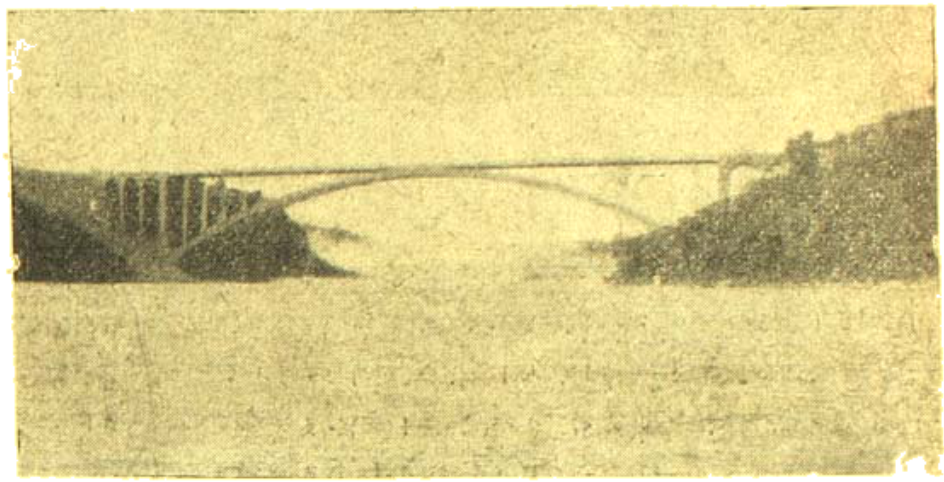

নায়াগ্রা জলপ্রপাতের সামনে বিখ্যাত "ব্রেন্ বো ব্রীজ"

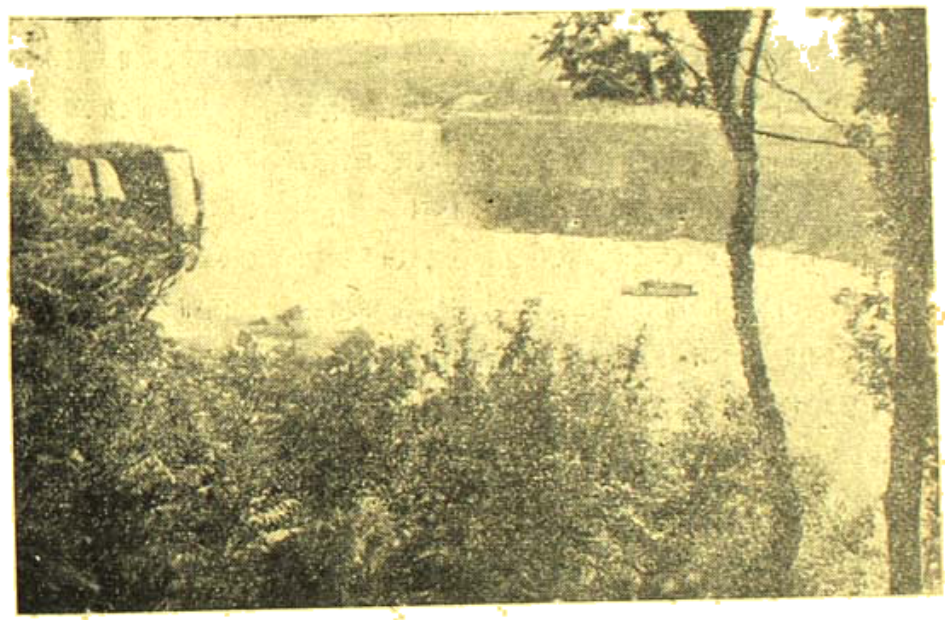

কুয়াশাচ্ছন্ন নায়াগ্রা

৪ঠা জুলাই আজ আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস। সকালে উঠে মাথার মুখ বাড়িয়ে দেখি রাস্তা জনমানবহীন ;—ট্রাম নেই, বাস নেই. Skyscraperএর ফাঁকা ঘরগুলি যেন মহাশূন্যে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। কি ক'রে কোথায় আহারাদি করা যাবে ভেবে ঠিক করতে না পেরে পথে নামলাম। খুঁজতে খুঁজতে একটি ছোট রেষ্টুরেণ্ট খোলা দেখে—ভিতরে গেলাম, সেখানে অল্প কিছু আহার করে বেড়াতে বেরোলাম। Empire State Building দেখতে যাওয়া গেল। এই সুবৃহৎ অট্টালিকাটির ভিতরে Express Elevatorএ করে আমরা একসঙ্গে ৭৪ তলায় উপস্থিত হলাম। এই Express Elevatorএর নিয়ম হচ্ছে কোনো তলায় না থেমে একেবারে একসঙ্গে ৭৪ তলায় গিয়ে দাঁড়াবে।

৭৪ তলার খোলা ছাদে আমরা গিয়ে দেখি তখন অনেক উঁচুতে রয়েছি, চারিদিক কুয়াশাচ্ছন্ন ; কোথাও কোথাও কুয়াশার ফাঁকে ফাঁকে skyscraperএর বাড়ীগুলি একটু উঁকি মারছে। আমরা নিজেদেরই খানকয়েক ছবি তুলে ঘরের ভিতরে Cafeteriaতে গিয়ে আইসক্রীম খেতে বসলাম। তারপর আরেকটি Elevatorএ করে আরো ২৮ তলা উপরে উঠে ১০২ তলায় ঘরে এলাম। এখান থেকে সহরের দৃশ্য দেখে এমন কিছুই নূতন লাগল না। কারণ আমরা বিমান হতে বেশ দেশান্তরের ও সহরগুলির যে অপূর্ব্ব ছবি দেখেছি তার তুলনা নাই।

(ক্রমশঃ)

পেললেখা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

—দুই—

ধানসিঁড়ির দেশ এই বরিন্দ্।

দূর থেকে মনে হয় যেন অতি বিশাল একটা বৌদ্ধ পাষাণের। ঢেউ-তোলা মাটি চলেছে দিক থেকে দিগন্তে—যতদূর চোখ চলে উঁচু নীচুর খেলা। ঢেউ-তোলা এই মাটের বুকে লক্ষ্মীর আঁচল-ঝাড়া ধানের সমারোহ। আলের রেখাগুলো দিয়ে বাঁধা ধানক্ষেতগুলি এক একটা সিঁড়ির মতো নেমে এসেছে। ফসল যখন বাড়-বাড়ন্ত হয়ে ওঠে—শরতের রোদ মেখে হিরণ-শীষগুলি নুয়ে নুয়ে পড়ে আলের ওপর, তখন মনে হয় বরিন্দের মাঠ জুড়ে কে যেন একটার পর একটা সোনার স্তূপ সাজিয়ে গেছে। আকাশ থেকে এক এক ঝাঁক পাখার মালা কে ছড়িয়ে দিচ্ছে তাদের ওপর। উড়ে পড়ছে পাড়-সবুজ নল-টিয়ার ঝাঁক।

ধানসিঁড়ির ভেতর দিয়ে পাক খেয়ে খেয়ে নেমেছে একটা কাঁচা পথ। মানুষের পায়ে পায়ে মসৃণ—পথের আলোয় উদ্ভাসিত। কোথাও কোথাও পুরু লাল ধুলোর স্তর পড়ে আছে, তার ওপর সরু সরু সর্পিল রেখা জড়িয়ে আছে পরস্পরের সঙ্গে। ওর অর্থ বুঝতে গেলে আসতে হবে সন্ধ্যার পরে—যখন তালবনের মাথার ওপর চাঁদটা ভালো করে উঠে আসবে—যখন অল্প অল্প স্নিগ্ধ বাতাসে ভেসে বেড়াবে বহু দূরে কোটা কোনো ফুলের গন্ধ; সেই সময় ছড়িয়ে যাবে দিনের দাবদাহ—মাটির কোটরের ভেতর থেকে একটি একটি করে মুখ বার করবে গোখরো আর কেউটের শিশুরা, বায়ু সেবন করবে, খেলে বেড়াবে খোলা পথটুকুর ওপরে। আর তখন যদি মাটিতে টের পায় কোনো দূরাগত পদশব্দের স্পন্দন, তাহলে আত্মগোপন করবে ধানক্ষেতের আড়ালে।

সাইকেলের ব্রেকটা চেপে ধরে এই ঢালু পথ দিয়ে নামছিল রঞ্জন। লক্ষ্মীর আঁচল-ঝাড়া ক্ষেত দুধারে বিস্তীর্ণ; কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ধান এবারে ন্যুব্জ। অসময়ে কয়েক পশলা বৃষ্টি পড়ে পোকা লেগেছে ধানে। শুক্তির বুকে আঁকড়ে রাখা মুক্তোর মতো ধানের স্নেহ-কোষে রক্ষিত শস্যকণাটি কেটে খেয়েছে কীটেরা—এলো মেলো বাতাসে যেন তুঁষ উড়ে যাচ্ছে। ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে রঞ্জন চিন্তিত হয়ে উঠল। গত বছর বন্যায় ফসল গেছে, এবারে যদি পোকায় সর্বনাশ করে তাহলে মানুষের দুর্গতির কিছু আর বাকী থাকবে না। গেল বার আগাগোড়াই আধিয়ারদের কর্জের ওপর চালাতে হয়েছে; এবারে যদি শোধ না করতে পারে তা হলে না খেয়ে মরতে হবে দেশশুদ্ধ লোককে।

ধানের ক্ষেতে সবটাই সোনা নেই—তাতে কলঙ্কের দাগ পড়েছে। অথবা কোনো দিনই সোনা ছিল না—ওর ভেতরে সবখানিই খাদ, সবটুকুই কলঙ্ক। দূর থেকে দেখেছে বলেই সেটা বুঝতে পারেনি। মনে হয়েছিল, রৌদ্রপীত স্বর্ণাঞ্চল বুকে টেনে নিয়ে ঘুমিয়ে আছেন বঙ্গলক্ষ্মী। অনেক কবিতা লেখা হয়েছে তা নিয়ে—অনেক উচ্ছ্বাসে মুখর হয়েছে শরতের বক্তৃতামঞ্চ। কিন্তু ক্রমাগত বর্ষা আর ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটায় ফিকে হতে শুরু করেছে সিলটির রং; একটা দুর্ভিক্ষে-মরা মানুষের বিশীর্ণ পাণ্ডুটে দেহ আত্মপ্রকাশ করছে···বাইরে উঠে আসছে কবিতার সোনালি কাপড়ে মোড়া কবরের ভেতর থেকে।

কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কেমন সন্দেহ হয় একটা আকাল নামছে। আকাশের ওই দিকটাতে মেঘ জমে উঠছে—হয়তো ফাঁকা, হয়তো শেষ রাতের দিকে খানিক বৃষ্টি হতেও পারে। কিন্তু মনে হল ওটা যেন একটা বিশাল গিদ্ধী শকুন;—সামনের দিকে মেঘের যে অংশটুকুর ওপর রোদ জ্বলছে তা ওরই শানানো ঠোঁট। শবদেহের মতো পৃথিবী পড়ে আছে দিকে দিকে—শুকনো কুঞ্চিত চামড়ায় বলিচিহ্নের মতো সাপের রেখা।

এখনই তো তার কাজ। জমি তৈরী হচ্ছে—সময়

আসছে এগিয়ে। খাটুনিও বড় বেশি পড়েছে কিছুদিন যাবৎ। কুমার ভৈরবনারায়ণের ওখান থেকে বাস এবার তুলতে হল। গীতা পাঠের অভিনয়টা আর চলছে না। কুমার বাহাদুরও এর মধ্যে সন্দেহ করেছেন বলে মনে হয়।

সেদিন সবে যখন কুমার বাহাদুরের আফিঙের মৌজটা বেশ জমে উঠেছে, ডেক চেয়ারটায় লম্বা হয়ে গড়গড়ার নল নিয়ে তিনি চোখ বুজেছেন—আর বালাখানা তামাকের আমেজে ভারী হয়ে গেছে ঘর, তখন রঞ্জন খুব দরদ দিয়ে তাঁকে গীতা বোঝাচ্ছিল।

কুমার বাহাদুরের ডায়বেটিজ আছে। শরীরের কোথাও ইলসে গুঁড়ির কৌটার মতো একটা ফুস্কুড়ি দেখলে আতঙ্কে লাফিয়ে ওঠেন তিনি—চেঁচিয়ে ওঠেন: ডাক্তারকো বোলাও। মৃত্যুভয় তাঁর নিত্য সঙ্গী। সেই জন্য রঞ্জন তাঁকে কিছুটা আশ্বাস দেবার প্রয়োজন বোধ করেছিল।

গলার স্বরে যথাসাধ্য আধ্যাত্মিকতা সঞ্চার করেই সে পড়ে যাচ্ছিল:

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোপরাণি—
শরীরাণি তথা বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।···
অর্থাৎ কিনা, যে কৌন্তেয়, জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে মানুষ যেমন নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে থাকে, তেমনি জীর্ণ শরীরকেও ত্যাগ করে মানুষ—ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্লোকটা কুমার ভৈরবনারায়ণের অত্যন্ত প্রিয়, কারণ মৃত্যুর দুর্ভাবনা এতে অনেকটা যেন লাঘব হয়ে আসে। আত্মা অজরামর—এই সত্যটা অধিগত হলে সঙ্গে সঙ্গে এ বিশ্বাসও আসে যে মরে তিনি পত্রপাঠ ফুরিয়ে যাবেন না; তাঁর জমিদারীর স্বত্ব স্বামীত্ব ভোগ করবার জন্য আবার দিব্যি দেহধারণ করে মর্ত্যে ফিরে আসবেন।

কিন্তু ডায়বেটিজ্ তীব্র কৌন্তেয়—অর্থাৎ কুমারবাহাদুর আজ এমন মনোরম আলোচনাতেও গদ গদ হয়ে পড়লেন না। ফরসীতে একটা টান দিয়ে কেমন মিটি মিটি চোখে তাকালেন। যেন চুরি করবার আগে হুঁশিয়ার দৃষ্টিতে দেখে নিলেন—আশে-পাশে গৃহস্থ সজাগ কিংবা সচেতন হয়ে আছে কিনা।

বললেন, আচ্ছা ঠাকুরবাবু!

একদিকে বাবু, অন্যদিকে ঠাকুরমশাই—এই দুই মিলিয়ে ত্রিজগদ্ধনীর রাজবাড়িতে এই বিচিত্র নামকরণ হয়েছে রঞ্জনের—ঠাকুর বাবু! কুমারবাহাদুর যেদিন রাত্রে একটু বেশি কারণ করেন সেদিন কখনো কখনো ঠাকুর বাবাও বলে থাকেন। রঞ্জনও পিতৃস্নেহে তাঁকে মোহ-মুদ্গর শোনাতে আরম্ভ করে। আজ কিন্তু আফিঙের এমন জমাট নেশার পরেও ঠাকুরবাবু সম্ভাষণের মধ্যে কেমন একটা দূরত্ব ঘনিয়ে রইল।

—বলুন।

ভৈরবনারায়ণ গড়গড়ায় মৃদুমন্দ চুমন করলেন। তারপর:

—কাল বুঝি জয়গড় মহলে গিয়েছিলেন আপনি?

রঞ্জন চমকে উঠল। ওর চোখে তাকালো ভৈরবনারায়ণের দিকে।

কিন্তু তাঁর চোখ তো তৎক্ষণে আবার নেশার আবেগে অর্ধনিমীলন হয়ে এসেছে। মুখে একটা নির্মল নির্লিপ্ততা—গীতাপাঠের নগদ নগদ ফল কিনা কে জানে। শিথিল ভঙ্গিতে পুনরাবৃত্তি করলেন: বেরিয়ে এলেন বুঝি জয়গড় থেকে?

রঞ্জন অত্যন্ত সাবধানে উত্তর দিলে। আত্মপ্রকাশ করলে সংক্ষিপ্ততম শব্দে: হুঁ।—আরো কিছু বলবার আগে কুমারবাহাদুরের মনোগত অভিপ্রায়টা জেনে নিতে চায়।

কুমারবাহাদুর কিন্তু বেশি কিছু ভাঙলেন না। তেমনি নির্মল নির্লিপ্তভাবে বললেন, তাই শুনলাম। তা জয়গড় বেশ ভালো জায়গাই বটে। যেমন ওর মহুয়া বনটি, তেমনি ওর নদীর ধার। খাসা জায়গা!

—ও।

কুমারবাহাদুর যেন ঘুমিয়ে পড়তে চাইছেন, এইভাবে বললেন, নিন, শুরু করুন তা হলে আবার।—হ্যাঁ—কী যেন পড়ছিলেন? বাসাংসি জীর্ণানি—মানে পুরোনো বাসা ত্যাগ করে—

—বাসা নয়, বাস। মানে শরীর।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—শরীর।—গড়গড়ার নলটি আবার চুম্বন করেই ছেড়ে দিলেন কুমারবাহাদুর: তবে জয়গড়ে কয়েকটা বেয়াড়া প্রজা আছে—ব্যাটাদের উচ্ছেদ করব এইবার। সে যাক, আপনি পড়ুন। মানে পুরোনো শরীর ত্যাগ করে—

মন্ত্রের মতো পড়েছে রঞ্জন, মন্ত্রের মতোই ব্যাখ্যা করে গেছে। শুনতে শুনতে ফরাসীর দল মুখে কবেই ঘুমিয়ে গেছেন ভৈরবনারায়ণ। কিন্তু ঘরের মধ্যে স্বস্তি পায়নি রঞ্জন। কুমারবাহাদুরকে সে যতটা চালাক ভেবেছিল, তিনি তার চাইতে ঢের বেশি চালাক। যা বলবার মাত্র একটি কথাতেই পরিষ্কার বলে দিয়েছেন। রঞ্জনের উদ্দেশ্যও যে অনেকখানিই অনুমান করে নিয়েছেন সেটাও তাঁর ইঙ্গিতে স্পষ্ট হয়ে গেল।

অতএব বেশিদিন থাকা চলবে না আর। বাঘের ঘরে ঘোঘের ধান চালাবারও একটা সময় আছে। এখন থেকে চম্পট দিতে না পারলে নিজেই জালে পড়ে যাবে। তবু দেখা যাক—!

চিন্তাটা থমকে গেল হঠাৎ। বেশ রূঢ়ভাবেই। ভাবতে ভাবতে রঞ্জন অন্যমনস্ক হয়ে গেছে—ধানসিঁড়ির ভেতর দিয়ে যাঁকা-বাঁকা পথটা সম্পর্কে যে আরো একটু সচেতন থাকা উচিত সে কথা তার মনে ছিল না। অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে সাইকেলটা একটা মাটির চাঙাড়ে টক্কর খেলো, তার-পর সোজা ওকে নিয়ে পাশের ধানক্ষেতে কাত হয়ে পড়ল।

ধানসিঁড়ি সাজানো সোনার 'পালার' মতো রবিদের সারা শস্য-সুরভিত হয়ে উঠল। আধপাকা ভরা কলসীর রঙের মতো আওয়াজ তুলে হেসে উঠল একটি মেয়ে। তীক্ষ্ণ তীব্র শব্দে আর্ত কর্কশধ্বনি তুলে গোটাকয়েক বলটিয়া ডানা মেলল আকাশে।

হাসছিল কালোশশী।

প্রথম বর্ষার প্রাণ পেয়ে ওঠা নতুন লতার মতো চেহারা। উজ্জ্বল—পল্লবিত। রবিদের রোদ-বাতাস আর বৃষ্টিতে সঞ্জীবিত, রসান্বিত মেয়েটি।

রঞ্জন সাইকেল টেনে লজ্জিত মুখে উঠে দাঁড়াতে কালোশশী এগিয়ে এল।

—পড়ে গেলি?

—গেলাম তো। তার জন্যে হাসবি তুই?

কালোশশীর মুখ আবার আলো হয়ে উঠল হাসিতে: অমন করে পড়ে যাবি তুই—হাসব না?

—আচ্ছা, আচ্ছা—মনে থাকবে।—রঞ্জন গম্ভীর হয়ে উঠল: যাবি তো রাজবাড়িতে—দেখা যাবে তখন। বলে দেব কুমারবাহাদুরকে—টের পাবি।

হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল কালোশশী। কুমারবাহাদুরের নাম শুনেই যেন তার মুখের আলোটা ফিকে হয়ে এল। উজ্জ্বল দৃষ্টির ওপর নামল আশঙ্কার স্তিমিত ছায়াভাস।

—আর আমি হাসবনা বাবু।

ব্যথিত বোধ করল রঞ্জন। খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা শিশুকে একটা ভূতুড়ে মুখোস পরে ভয় দেখানোর অপরাধ বোধটা স্পর্শ করল মনকে। সঙ্গে সঙ্গে কুমার ভৈরবনারায়ণের মুখখানা স্মৃতির ওপরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল একবার। সাধারণ মানুষের মুখের চাইতে প্রায় দেড়গুণ বড়—টকটকে রাঙা তার রঙ; পুরু একজোড়া ঠোঁটের ভেতর থেকে দাঁতগুলো এমন ভঙ্গিতে বেরিয়ে থাকে যে অকারণ পুলকে সে মুখে এক আঁটি বিচালি গুঁজে দিতে ইচ্ছে করে। হাসির বালাই সেখানে নেই—শুধু খামোকা মনে হয় লোকটা বুঝি মাথার ওপর থেকে এক জোড়া শিং বের করে এখুনি কাউকে গুঁতিয়ে দেবে। সুতরাং কালোশশীর দোষ নেই।

সদয় কণ্ঠে রঞ্জন বললে, আচ্ছা—এ যাত্রা ক্ষমা করা গেল। কিন্তু কী নিয়ে যাচ্ছিস তুই? ঝাঁপিতে কী ও?

—একটা মজার জিনিস আছে—দেখবি? কালোশশীর মুখে আবার প্রাণের ছায়া পড়ল।

—মজার জিনিস? দেখি—

কিন্তু 'দেখি'—বলে দু-পা এগিয়ে গিয়েই 'বাপ্‌রে' বলে দশ পা পেছনে লাফিয়ে পড়ল সে। ঝাঁপির ঢাকা খুলতেই ভেতর থেকে তীব্র গর্জন উঠল একটা। পরক্ষণেই চাপ-সরে-যাওয়া স্প্রীঙের মতো অসহ্য ক্রোধে ফণা দোলাতে লাগল নীলকৃষ্ণ রঙের বিশাল একটি গোখ্‌রো সাপ—তার ফণার ওপরে পদচিহ্নটা রোদে ঝলমল করে উঠল।

—কী সর্বনাশ! সাপ।

কালোশশী ততক্ষণে ক্ষিপ্র হাতে ঝাঁপি বন্ধ করে দিয়েছে। বললে, এখুনি ধরলাম কিনা—তাই এত তেজ। কামিয়ে দিতে পারলে আর অত মেজাজ থাকবে না।

—সেকি! এরো ওর বিষদাঁত আছে তা হলে!—সভয়ে রঞ্জন বললে, যদি কামড়াতো?

—কামড়াবে কেমন করে?—সগর্বে কালোশশী বললে, আমি আছি না? বেদের কাছে কি সাপের চালাকি চলে বাবু? ওর মতন গণ্ডা গণ্ডা সাপ নিয়ে আমার

কারবার।—কালোশশী মৃদু হাসল : চারটে পয়সা দিবি বাবু? তা হলে এখনি ওকে নিয়ে খেলা দেখাতে পারি।

—দরকার নেই, যথেষ্ট হয়েছে।—তেমনি আতঙ্কে রঞ্জন বললে, তোকে চার পয়সা দিতে যাব কেন? আমাকে কেউ চারশো টাকা দিলেও আমি ওর খেলা দেখতে রাজী নই!

কালোশশী তেম্‌নি হাসতে লাগল : কিন্তু মরা সাপ নিয়ে খেলা করে কি সুখ আছে বাবু? এম্‌নি তাজা সাপ নিয়ে খেলতেই তো আরাম। হাতের তালে তালে নাচবে—ছোবল মারতে চাইলেও পারবে না, তারপর মাটি ঠুকরে ঠুকরে নিজেই কাহিল হয়ে পড়বে!

হঠাৎ একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে কালোশশী তাকালো রঞ্জনের দিকে। ছিলে-টেনেবরা ধনুকের মতো তার ভ্রূ রেখা চকিতে প্রসারিত হয়ে গেল; নিস্তরঙ্গ দীঘির কালো জলে হঠাৎ একটা পাতা উড়ে পড়ার মতো আলো-ভাঙা হাল্‌কা ঢেউ যেন খেলে গেল দৃষ্টিতে। আর তখনি কালোশশীর জীবনের যতটুকু ওর জানা, তা মনে পড়ে গেল।

আলোচনাটা তখনি থামিয়ে দিল রঞ্জন। সাইকেলে ওঠবার উপক্রম করে বললে, যে পথ ছাড়, আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।

—কিন্তু আমি কাল একবার তোর কাছে যাব বাবু।

—আমার কাছে? কেন?—রঞ্জনের স্বরে বিস্ময় প্রকাশ পেল।

—ভারী বিপদে পড়ে গেছি বাবু—কালোশশী বিশীর্ণ হয়ে গেল : পরশুরাম ফিরে এসেছে।

—পরশুরাম? তোর আগের স্বামী?

কালোশশী লজ্জিতভাবে মাথা নামাল : হাঁ। আর বলছে, আমাকে খুন করবে।

—খুন করা মুখের কথা কিনা! আইন আছে না? তুই ভাবিস্‌নি—রঞ্জন আশ্বাস দিতে চেষ্টা করল ওকে : আচ্ছা, যাস তা হলে কাল।

পথ ছেড়ে দিয়ে ধানক্ষেতে নেমে দাঁড়িয়েছে কালোশশী, রঞ্জন সাইকেলে প্যাডল করল। উজ্জ্বল মহাপথ দিয়ে সাইকেলটা আবার সবেগে এগিয়ে চলল। পেছনে তাকিয়ে দেখল রৌদ্রভরা মাঠের ভেতরে তরুণী সাপুড়ে মেয়ে একা দাঁড়িয়ে আছে—তার গলার রূপোর হাঁসুলীতে একখানা বাঁকা তলোয়ারের মতো রোদ ঝলকাচ্ছে।

অদ্ভুত এই মেয়েটা! এ মেয়ে নয়—বাড়ি ওর বাংলা-বিহারের কোনো সীমান্তে। অথবা আসলে ওর কোনো দেশই আছে কিনা সন্দেহ। একটা বেদের দলের সঙ্গে ঘুরত, সেখান থেকে একজনের সঙ্গে পালিয়ে আসে লোকালয়ের জীবনে। হয়তো কোনো ঘুরযাত্রী বনহংসীর মতো সীমানাহীন চলার অবসরে নীড় বাঁধতে চেয়েছিল পথপ্রান্তের কোনো আরণ্য-নীড়ে। কিন্তু দুদিন পরেই সে নীড়াশ্রয় ক্লান্ত করে তুলেছে ওকে। তাই একটির পর একটি মানুষের সঞ্চার হচ্ছে ওর জীবনে। কিন্তু ওর সঙ্গে সমানগতিতে পা ফেলে তারা কেউই চলতে পারছে না—একটা বিশাল দৌড়ের প্রতিযোগিতায় যেন একের পর এক পিছিয়ে পড়ছে তারা। বেদের মেয়ের মতো অত প্রাণ—অত প্রাচুর্য তারা পাবে কোথায়?

দয়াল দাস, পরশুরাম, লক্ষ্মণ সর্দার। আরো কত আসবে কত যাবে, কে জানে। এ হাঁসের পাখায় ক্লান্তি নেই—এক দিগন্ত ছাড়িয়ে আর এক চক্রবাল তাকে ডাক দেয়; এক অরণ্য থেকে আর এক অরণ্য—এক সীমান্ত থেকে আর এক সীমান্ত।

এত কথা রঞ্জনও কি জানত? একটা চুরির ব্যাপারে সন্দেহ করে পরশুরামকে ধরে আনা হয়েছিল কুমার ভৈরবনারায়ণের কাছারীতে—সেই সঙ্গে বিলাপ করতে করতে এসেছিল কালোশশী। বুনো লতার পল্লবিত আরণ্য-সৌন্দর্য চমক লাগিয়েছিল তার চোখে—ভারী অদ্ভুত মনে হয়েছিল।

কালোশশী তার মনের ওপর নেপথ্য-প্রভাব বুলিয়েছিল কিনা আজ সে কথা সে বলতে পারে না। কিন্তু এটা ঠিক যে অনেকটা তারই চেষ্টায় সে যাত্রা অল্পের ওপর দিয়ে বেঁচে যায় পরশুরাম। মাত্র দরোয়ানের কড়া হাতে গোটাকয়েক থাপ্পড় খেয়েই নিষ্কৃতি পায়—হাজত পর্যন্ত আর যেতে হয়নি। সেই থেকেই তার ওপর কৃতজ্ঞ কালোশশী। পরশুরামের সঙ্গে তার সম্পর্ক অবশ্য চুকে বুকে গেছে অনেককাল—এখন বরং পরশুরাম কালোশশীকেই খুন করবার জন্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে—কিন্তু রঞ্জনের ওপর শ্রদ্ধাটা অবিচল আছে কালোশশীর।

জেলাবোর্ডের বড় রাস্তার ধার থেকে লাফ ঝুড়িয়ে নেবার সময় প্রায়ই ভেট দিয়ে যায় রঞ্জনকে।

বাস্তবিক, অদ্ভুত মেয়েটা। কেমন যেন প্রক্ষিপ্ত মনে হয়।

চলতে চলতে কানের কাছে কথাটা বাজতে লাগল: তাজা সাপ নিয়ে খেলতেই তো আরাম।—তাই বটে! প্রতি মুহূর্তেই টাটকা গোখরো সাপ খুঁজে ফিরছে কালোশশী। পরশুরামের মতো বিষধরেরা এলে ছুটবে তার কাঁপিতে—ফণা দুলিয়ে দুলিয়ে খেলা করবে তার রূপোর কাঁকণ পরা হাতের তালে তালে, ছোবল মারবার ব্যর্থ চেষ্টায় আহত হয়ে হয়ে শেষকালে আত্মসমর্পণ করবে নিজীব পরাজয়ে। আর তখনি সে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে তাকে—আবার শুরু হবে নতুন ক'রে সাপ খোঁজার পালা। নিষ্পাপ সাপ নিয়ে খেলতে ভালো লাগে না কালোশশীর।

ধান-সিঁড়ি পার হয়ে সাইকেলটা এতক্ষণে নেমেছে সমতলে। পেছনে টিলার ওপরে কালোশশী কোথায় গেছে মিশিয়ে। সাঁওতালদের মেয়েদের কথাটাও মনে পড়ল। সন্ধ্যায় ওদের নাচের আসরে শুয়োরের মাংস আর পচাইয়ের আয়োজন।

কিন্তু ফেলে-আসা-পেছনের পৃথিবীটাকে হঠাৎ যেন ঠেকে দিলে সামনে হিজলবনীর জমিদার বাড়িটা। সুদূর মাঠের মধ্য দিয়ে মালিনী নদীর ছোট আঁকাবাঁকা রেখাটি থেকে থেকে ঝলক দিয়ে উঠছে। তারই একটা বাঁকের মুখে একপারে হিজলবন, অন্যপারে কুমার ভৈরবনারায়ণের মৌলতখানা।

ফাঁকা মাঠের ভেতর লাল-সাদা ওই বাড়ীটাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন কোনো অদ্ভুত একটা রক্তাক্ত পাজর পড়ে আছে ওখানে। আশেপাশের দশখানা গ্রামের মালিক —বহু মানুষের দণ্ডমুণ্ডের সর্বময় অধিপতি কুমার ভৈরব-নারায়ণ বাস করেন ওই বাড়ীতে। ধানসিঁড়ির মেশে, খোলা আকাশ আর অবারিত মাঠের মাঝখানে যারা মাটি কাটে আর ফসল ফলায়—ওই বাড়িটা তাদের হৃৎপিণ্ডের ওপর একটা ছোরার মতোই বিঁধে আছে সব সময়।

আর আপাতত ওই বাড়িতেই রঞ্জনের আশ্রয়।

চাকরিটা জুটে গেছে বিচিত্র উপায়ে। জেল থেকে বেরিয়ে বেকারের মতো ঘুরছিল এদিক ওদিক, এমন সময় কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত ছেড়ে দিয়েছিল —পেয়ে গেল এটা। নামে প্রাইভেট সেক্রেটারী, কিন্তু কাজ হল গীতাপাঠ করে শোনানো। আফিং খেয়ে ঝিমুবার সময় গীতার শ্লোক না হলে কুমার বাহাদুরের নেশা জমেনা। আহা—গীতার মতো কি আর জিনিস আছে! মৃত্যুঞ্জয় ভুলিয়ে দেয়—আশা হয় বাহাল-তবিয়তে আবার এই পৈত্রিক জমিদারীতে আসীন হওয়া যাবে। কেননা আত্মার বিনাশ নেই:

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবক:"—

অর্থাৎ কিনা—হে কৌন্তেয়, আত্মা অবিনশ্বর। অস্ত্র দ্বারা এ ছিন্ন হয়না, অগ্নিতে এ দগ্ধ হয়না—

আকুল হয়ে পড়ে রঞ্জন, বিভোর হয়ে শোনেন কৌন্তেয়। শুধু মধ্যে মধ্যে নাকের ডগায় দু একটা মাছি এসে বসাতে যখন তন্ময়তার কিঞ্চিৎ বিঘ্ন ঘটে কুমার বাহাদুরের।

খোঁৎ করে গলায় একটা আওয়াজ বের করে বলেন: জ্যাঁ—কী বলছিলেন? অগ্নি? কোথায় আবার আগুন লাগল?

মুখে আসে: তোমার মাথায়—কিন্তু প্রকাশ্যে বললে চাকরী থাকে না। সুতরাং বেশ ভদ্র ভাষায় জানাতে হয়: আজ্ঞে না, না, আগুন কোথাও লাগেনি। ওই গীতায় বলছে আর কি—মানে আত্মা কখনো দগ্ধ হয়না—

—থাক্, বাঁচালেন—সাধারণ মানুষের দেড়া মুখখানায় নিশ্চিন্ত একটা স্বস্তি ছড়িয়ে আবার ঝিমুতে থাকেন ভৈরব-নারায়ণ। তোতাপাখির মতো রঞ্জন শুরু করে: হে পাণ্ডুপুত্র—

কিন্তু এতদিন ধরে সে বোধ হয় অবিচার করছিল খানিকটা। যতটা ঘুমন্ত ভেবেছিল ভদ্রলোককে তিনি তা নন্। নেশার ঘোরেও চোখ মেলে রাখতে জানেন।

হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখল: পাঁচটা। সর্বনাশ—এখনি চায়ের টেবিলে তার ডাক পড়বে। রঞ্জন দ্রুত সাইকেলটাকে চালিয়ে দিল। (ক্রমশঃ)

কলিকাতায় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—

কেন্দ্রীয় ভারত গভর্ণমেণ্টের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গত ২৫শে জুন ৪ দিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি ২৬শে জুন হাওড়ায় আরতী কটন মিলের উদ্বোধনে ও ২৬শে ভারতীয় সাংবাদিক সমিতির সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা নানাকারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—পৃথিবীর সকল দেশের উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িতেছে ও দ্রব্যমূল্য কমিয়া যাইতেছে। এ অবস্থায় ভারতে কারখানার মালিক, শ্রমিক ও গভর্ণমেণ্টকে একত্র সমবেত হইয়া এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে ভারতের কারখানাসমূহে অধিকতর পরিমাণে ভাল জিনিষ সুলভে উৎপন্ন হয়। তাহা না হইলে পৃথিবীর সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতকে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হইবে। ভারতে সহসা দ্রব্যমূল্য বাড়িয়া যাওয়ায় কারখানারও সকল ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে—অথচ লোকের ক্রয় শক্তি কমিয়া যাওয়ায় বেশী দাম দিয়া লোকের জিনিষ কিনিবার ক্ষমতা নাই, সে কারণে কারখানার উৎপন্ন জিনিষের বিক্রয় কমিয়া গিয়াছে। নিত্য ব্যবহার্য্য কাপড়ও লোক দাম বেশী বলিয়া কিনিতে পারে না—দোকানে কাপড় জমিয়া গিয়াছে—ক্রেতা নাই। যে পরিমাণে কারখানায় জিনিষ উৎপন্ন হইতেছে, সে পরিমাণ কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা না হওয়ায় বর্ত্তমানে আমাদের দেশে এই বিষম অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। যে ভাবে ১৯৩৭ সালের পর ১৯৯৮ সালে এবং ১৯৪৮এর পর ১৯৪৯ সালে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে—খাদ্য দ্রব্যের দাম এইভাবে বাড়িয়া চলিলে, সকলের উপার্জ্জনের সকল টাকা শুধু খাদ্য ক্রয় ব্যাপারেই শেষ হইয়া যাইবে, অন্য প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনিবার টাকা থাকিবে না—ফলে একদিকে ভারতের কারখানাগুলি অচল হইয়া পড়িবে, দেশে বেকার-সমস্যা বাড়িবে ও সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী জিনিষে বাজার পূর্ণ হইয়া যাইবে। কলকারখানা ও শিল্পাগারগুলি বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে তাহার মালিকগণকে সমবেত ভাবে খাদ্য-উৎপাদনে মনোযোগী হইয়া শ্রমিক ও কর্ম্মীদিগকে সুলভে খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় অবহিত হইতে হইবে। যুদ্ধের সময় সরকারী তাগিদে কারখানার মালিকরাও খাদ্য-উৎপাদনে মনোযোগী হইয়াছিলেন, দেখা গিয়াছিল। এখন শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রীর চেষ্টায় যদি আবার তাহা আরম্ভ হয় ও সে বিষয়ে ধনী কারখানা-মালিকরা অবহিত হন, তবেই সুলভে খাদ্য পাইয়া দেশবাসী উপকৃত হইবে এবং সুলভে খাদ্য পাইলেই উদ্বৃত্ত অর্থে তাহারা কারখানায় উৎপন্ন অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনিতে সমর্থ হইবে। আমরা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে এ বিষয়ে সচেষ্ট দেখিলে সত্যই আনন্দিত হইব।

চারিদিকে বিশৃঙ্খলা—

প্রতিদিন সংবাদপত্র খুলিলে দেখা যায় যে কম্যুনিষ্টরা প্রত্যহ বহু স্থানে ডাকাতি বা হাঙ্গামা করিয়া লুঠতরাজ করিতেছে। কলিকাতা সহরের মধ্যেও প্রত্যহ ঐরূপ ঘটনা ঘটিতেছে এবং এমন সহসা ঘটে যে পুলিসের পক্ষে তাহাতে বাধাদান করা সম্ভব হয় না। সরকারের পক্ষে ইহা বন্ধ করা সম্ভব নহে; কারণ দেশের এত অধিকসংখ্যক লোক বর্ত্তমান শাসকদের কার্য্যে অসন্তুষ্ট যে তাহাদের বলপ্রয়োগ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা এখন আর সম্ভবপর নহে। কয়েকজন কম্যুনিষ্ট কর্ম্মী একত্রিত হইয়া অতি সহজে লুণ্ঠনকারী দল তৈয়ার করে—সে দলে লোক জুটিতে বিলম্ব হয় না। দেশে খাদ্যাভাব সকল মানুষকে এত অধিক বিব্রত করিতেছে যে দেশের জনসাধারণ যে কোন উপায়ে বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ কামনা করে। বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের পরিচালকগণ যে এখন আর দেশবাসীর আস্থাভাজন নাই তাহা বহু

ঘটনায় দেখা গিয়াছে ও যাইতেছে। এ অবস্থায় কি গ্রামে কি সহরে কম্যুনিষ্ট-কর্ম্মীরা সামান্য চেষ্টার ফলেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়। তাহা এত আকস্মিক ও অতর্কিত ভাবে ঘটে যে, তাহা রোধ করা বা নিবারণ করা কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় না। এই অবস্থার প্রতীকারের জন্য সরকারকে এখনও পর্য্যন্ত আদৌ অবহিত হইতে দেখা যায় না। দেশের এই সকল শত্রু যে অচিরে ভারতের অবস্থা চীন বা ব্রহ্মের মত করিয়া ফেলিতে পারে, সরকারী কর্ত্তারা যে কেন তাহা মনে করেন না, তাহা বুঝা যায় না। সত্য কথা, দেশে খাদ্যাভাব ও বস্ত্রাভাব খুব বেশী—জিনিষ থাকিলেও কিনিবার টাকা লোকের হাতে নাই। সে দিক দিয়া কোন ব্যবস্থা করা এখনই গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু এই অসন্তোষকে সম্ভব করিতে পারিলে দেশের লোকের মনে গভর্ণমেণ্টের উপর বিশ্বাস বৃদ্ধির উপায় অতি সহজেই অবলম্বন করা যায়। গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে অল্প চেষ্টাতেই সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারেন। দেশে গণ-সংযোগের কোন ব্যবস্থা নাই। বর্ত্তমান শাসকগণও ইংরেজ বিদেশী শাসকগণের মত নিজেদের সাধারণ লোক হইতে পৃথক শ্রেণির জীব মনে করেন। শাসন-ব্যবস্থার সকল পর্য্যায়ের কর্ম্মীর মধ্য হইতে যাহাতে সে মনোভাব চলিয়া যায়, এখন তাহার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। শাসক-সম্প্রদায় যদি দেশবাসীর সহিত মিশিয়া তাহাদের অভাব-অভিযোগে সহানুভূতি প্রদর্শন করেন, তাহা হইলেই একদল লোকের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইবে। দেশবাসীর সহযোগিতা ও সাহায্য ছাড়া যে গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান অবস্থায় কিছু করা সম্ভব নহে—শুধু এইটুকু বুঝাইয়া দিতে পারিলেই দেশের ব্যাপক অশান্তি কমিয়া যাইবে।

শ্রীশরৎচন্দ্র বসু—

গত ১১ই জুন দক্ষিণ কলিকাতা কেন্দ্র হইতে ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচনে শ্রীশরৎচন্দ্র বসু ১৯ হাজার ৩০ ভোট পাইয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীসুরেশচন্দ্র দাসকে পরাজিত করিয়াছেন। সুরেশবাবু মাত্র ৫ হাজার ৭ শত ৮০ ভোট পাইয়াছেন। শরৎবাবুর অগ্রজ সতীশচন্দ্র বসুর মৃত্যুতে ঐ সদস্যপদ খালি হইয়াছিল। অন্যান্য ৩ জন প্রার্থী মাত্র কয়টি করিয়া ভোট পাইয়াছিলেন। এই নির্ব্বাচনের ফল নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। সুরেশবাবুর সমর্থনে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল, রাষ্ট্রপতি ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া প্রভৃতি হইতে সকল কংগ্রেস-নেতা চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহা সত্ত্বেও কংগ্রেস কেন ঐ নির্ব্বাচনে পরাজিত হইয়াছে, তাহা আজ সকল নেতার চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। শরৎবাবু খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার, এককালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য ছিলেন, তাঁহার দেশসেবা ও স্বার্থত্যাগ অসাধারণ। তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অগ্রজ—সবই সত্য কথা। কিন্তু তিনি কংগ্রেস পক্ষ গ্রহণ করেন নাই। তথাপি তিনি কেন এত অধিক ভোট পাইলেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে দেশবাসী আজ নানা কারণে কংগ্রেসের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা হারাইতেছে। তাহারা যে কংগ্রেসকে আর বিশ্বাস করে না, তাহা জানাইয়া দিবার জন্যই গত নির্ব্বাচনে সকলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দিয়া আসিয়াছে। কংগ্রেস দেশের শাসন কর্ত্তৃত্ব পাইয়া গান্ধীজির আদর্শ হইতে বিপথে গিয়াছে। মুখে কংগ্রেসের নেতারা গান্ধীজীর নাম যতই করুন না কেন, কাজের বেলায় দেখা যায় যে নেতারা জনসাধারণের স্বার্থরক্ষায় আর অবহিত নাই। জনগণ অন্নবস্ত্রের অভাবে দারুণ ক্লিষ্ট হইলেও তাহাদের মুখে অন্নবস্ত্র জোগাইবার কোন ব্যবস্থা হয় নাই—পক্ষান্তরে ধনীরা কংগ্রেস-নেতাদের সকল প্রকার সাহায্য, সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করিতেছেন। দেশে চোরাবাজার চলিতেছে, বলা বাহুল্য দেশের ধনীরাই সেই চোরাবাজারের সহিত সংশ্লিষ্ট—কিন্তু সেই চোরাবাজার বন্ধ করিবার জন্য কংগ্রেস-নেতারা হাতে ক্ষমতা পাইয়াও কোন চেষ্টা করেন না। ফলে দেশে চোরাবাজার বন্ধ না হইয়া তাহা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। সেজন্য লোকের দুরবস্থাও বাড়িয়াছে। কংগ্রেস-নেতারা হাতে ক্ষমতা পাইয়া সব সময়ে গুণের আদর করেন না—আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অধিক অনুরাগ দেখাইতেও কার্পণ্য করেন না। দেশের লোক ভাত-কাপড়ের অভাবে কষ্ট পায়, অথচ বিদেশে দূতাবাস রক্ষা করিতে, বিদেশে ভারতীয় প্রতিনিধি প্রেরণ ব্যাপারে ও ঐরূপ নানা কার্য্যে কংগ্রেস-চালিত গভর্ণমেণ্টকেও প্রয়োজনের অধিক অর্থ ব্যয় করিতে

দেখা যায়। গভর্ণর-জেনারেল, গভর্ণর প্রভৃতি রক্ষার ব্যাপারে দরিদ্র ভারতবর্ষে যে অত্যধিক ব্যয় করা হইতেছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিতেছেন, অথচ সে ব্যয় কমাইবার কোন ব্যবস্থা দেখা যায় না। এই সকল কারণে জনসাধারণ কংগ্রেসের প্রতি বিরক্ত হইয়াই কংগ্রেস-প্রার্থীর বিরুদ্ধে দক্ষিণ কলিকাতা নির্ব্বাচনে ভোট দিয়াছে। কংগ্রেস-নেতারা তথা গভর্ণমেণ্ট যদি এখনও সচেতন না হন, তবে দেশে অরাজকতা দেখা দিবে ও কংগ্রেস দেশবাসীর বিশ্বাস হারাইবে।

কংগ্রেসে নির্ব্বাচন—

গত বৎসর আগষ্ট মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর নির্ব্বাচনে ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি ও শ্রীঅতুল্য ঘোষ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। গত ১৪ই জুন কংগ্রেসের বর্ত্তমান পরিচালকদের বিরুদ্ধে এক অনাস্থা-জ্ঞাপক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং শ্রীযুত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ও শ্রীযুত চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি ও সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সেই নির্ব্বাচন সভায় কে সভাপতি হইবেন, তাহা লইয়াও ভোট হয় এবং মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়কে পরাজিত করিয়া শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী (ভূতপূর্ব্ব মেয়র) ঐ সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সাধারণ সম্পাদক শ্রীকালা ভেঙ্কট রাও উভয় পক্ষে আপোষের চেষ্টা করিয়াও সফল হন নাই—তিনি ঐদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই দলাদলিকে একদল লোক পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের দলাদলি বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। পূর্ব্বে সভাপতি ছিলেন পূর্ব্ববঙ্গের লোক, সম্পাদক ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের। এখন সভাপতি পূর্ব্ববঙ্গের লোক ও সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গের লোক হইলেন। ভোটের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল—

প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর মোট সদস্য	৩১৬
তন্মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের লোক	১৪৯
পশ্চিমবঙ্গের লোক	১৬৫
সেদিন সভায় বিরোধী দল	১৭২
পূর্ব্ব কর্ম্মকর্ত্তাদের সমর্থক দল	১২১
নিরপেক্ষ	১৩

বিরোধী দলে ছিলেন—	
শ্রীসুরেন্দ্র ঘোষের দল	৯০
ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের দল	৫৫
স্বতন্ত্র	২৭
	১৭২

বিরোধী দলে পশ্চিম বঙ্গের লোক ৭৯

সমর্থক দলের নেতা ছিলেন মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়—উভয় দলে মিলিয়া ১২১ জন। ঐ দলে পশ্চিম বঙ্গে লোক ছিলেন ৮৬ জন। বিরোধী দলে নিম্নলিখিত পশ্চিম বঙ্গীয় নেতারা ছিলেন—শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী, শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী, শ্রীমিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅমরকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীহুপতি মজুমদার, শ্রীসুধীর রায়চৌধুরী, শ্রীবিজয় ভট্টাচার্য্য, ডাঃ নৃপেন্দ্র বসু। কাজেই এই বিবাদকে পূর্ব্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের বিবাদ বলা যায় না। মন্ত্রিত্ব-লোভীর দলের বিবাদ বলাই সঙ্গত হইবে। শ্রীকালা ভেঙ্কটরাওএর মত লোকও এ বিষয়ে ভুল বুঝিয়াছেন দেখিয়া আমরা সত্যই দুঃখিত। পশ্চিমবঙ্গ অতি ক্ষুদ্র প্রদেশ, ইহার মধ্যে ঐরূপ দলাদলি আদিলে দেশ ধ্বংস হওয়া অনিবার্য্য।

গান্ধী হত্যা মামলা—

পূর্ব্বে দিল্লীর লালকেল্লার বিশেষ আদালতের বিচারে মহাত্মা গান্ধী হত্যার মামলায় নাথুরাম গডসে ও নারায়ণ আপ্তের প্রাণদণ্ড এবং মদনলাল, করকরে, গোপাল গডসে, ডাঃ পারচুরে ও শঙ্কর কৃষ্ণায়ার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হইয়াছিল। বীর সাভারকর ও দিগম্বর বাগসে বিচারে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। ঐ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল হয়। পূর্ব্ব পাঞ্জাব হাইকোর্টে ৩ জন বিচারপতি লইয়া গঠিত ফুল বেঞ্চে বিচার হয়—গত ২১শে জুন তাহার রায় প্রকাশিত হইয়াছে। রায়ে নাথুরাম গডসে ও নারায়ণ আপ্তের প্রাণদণ্ডাদেশ বহাল আছে এবং মদনলাল ও করকরের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বহাল আছে। ডাঃ পারচুরে ও শঙ্কর কৃষ্ণায়া মুক্তিলাভ করিয়াছে। গোপাল গডসের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হ্রাসের জন্য গভর্ণরের নিকট সুপারিশ করা হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারীদের প্রাণদণ্ডাদেশ কেহই সমর্থন করিবেন না—তাহার উপর

নাথুরাম গডসে যেরূপ নির্ভীক ভাবে সত্য কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তিনি যত বড় অপরাধই করিয়া থাকুক না কেন, তাঁহার বিশ্বাস ও সাহসের প্রশংসা করিতে হয়।

শ্রীমাণিকলাল দত্ত—

কলিকাতার বিখ্যাত কাগজ ব্যবসায়ী মেসার্স রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্সের শ্রীমাণিকলাল দত্ত গত ১৫ই জুন বিমান-যোগে জাপান যাত্রা করিয়াছেন। গত ১৯৪৬ সালে ভারত গভর্ণমেণ্টের আহ্বানে তিনি অষ্ট্রেলিয়াতে কাগজের

শ্রীমাণিকলাল দত্ত

কল ও ব্যবসা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে গিয়াছিলেন। সেবার তিনি ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ভারতে কাগজ আমদানী সম্পর্কে এবার তিনি জাপানস্থ কর্তৃপক্ষের সহিত ব্যবস্থা করিবেন। আমরা তাঁহার সাফল্যময় দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

কুটীর—

মিঃ এ-এম্-ম্যাক্সিউনী নামে এক ভদ্রলোক সান্-ফ্রানসিস্কো সহরে একটী "কুটীর" নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই আবাসে একসঙ্গে ৪ লক্ষ লোক বাস করিতে পারিবে। বাড়ীতে ৮০০ লিফ্‌ট, ২০টী গির্জ্জা, ৫০টী নৈশ ক্লাব, ১০টী হাসপাতাল, ১০০০ দোকান এবং একসঙ্গে ৮০,০০০ মোটরগাড়ী রাখিবার ব্যবস্থা থাকিবে। দুঃখের বিষয় জীবনান্ত হইলে বাড়ীর মধ্যে দাহ বা কবরস্থ করিবার ব্যবস্থা থাকিবে না। বাঁচিয়া থাকিতে বাহির হইতে হইবে, মরিলে গৃহত্যাগ করিতে হইবে। কুড়েখানির নাম "ম্যাক্সিউনী কুটীর" রাখা সমীচীন।

রাজগীর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম—

রাজগীর বিহারের পাটনা জেলায় স্বাস্থ্যকর ও মনোরম স্থান। সেখানকার উষ্ণ প্রস্রবণ বহু গুণের আকর। ভগবান বুদ্ধের জীবনের সহিত জড়িত বলিয়া ঐ স্থান পবিত্র। প্রতি বৎসর বহু বাঙ্গালী রাজগীরে স্বাস্থ্যান্বেষণে যান বটে, কিন্তু স্থানাভাবে তাঁহাদের অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। সে জন্য স্বামী কৃপানন্দ মহারাজ তথায় ২ বিঘা জমী ক্রয় করিয়া

স্বামী কৃপানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা দ্বারা জনসেবা কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। সম্প্রতি দেড় লক্ষ ইট প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা দ্বারা আশ্রমে মন্দির, ধর্ম্মশালা প্রভৃতি নির্ম্মিত হইবে। সব কাজ শেষ করিতে লক্ষাধিক টাকা প্রয়োজন। স্বামীজি অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। সহৃদয় ব্যক্তিগণের দানে শীঘ্রই স্বামীজির পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। স্বামীজির ঠিকানা—রাজগীর পোঃ, জেলা পাটনা, বিহার।

পাকিস্তানে শিক্ষা-ব্যবস্থা—

পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী জনাব ফজলুর রহমান সাহেব বলিয়াছেন ইসলামের ভিত্তিতে পাকিস্তানের শিক্ষাসৌধ গড়িতে হইবে। এতাবত হিন্দু ও ক্রীশ্চান শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় ইসলাম সংস্কৃতির ক্ষতি হইয়াছে। এখন স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান সর্ব্বতোভাবে মুসলিম ভাষা, সাহিত্য, মনোভাব, আবহাওয়া গড়িয়া তুলিবে। পাকিস্তানের ভাষা উর্দ্দু বা উর্দ্দু বাঙ্গালা খিচুড়ি না করিলে পাকিস্তানের একত্ব গঠন সম্ভব হইতেছে না। এই সকল উক্তি শুনিয়া মনে হয়—অমুসলমান পাকিস্তানীর প্রতি কিরূপ ন্যায্য সদয় ও সহৃদয় আচরণ পালিত হইবে। বাঙ্গালার অধিবাসী বাঙ্গালী ; পূর্ব্বই হউক, আর পশ্চিমই হউক। তাহাদের ভাষা বাঙ্গালা। যদি বাঙ্গালী মুসলমান উর্দ্দু না শিখিলে তাহার ধর্ম্মরক্ষা বা রাষ্ট্রচেতনা লাভ করিতে অসমর্থ হয়, তাহাদের জন্য উর্দ্দু শিক্ষা ভাল! কিন্তু অমুসলমান যে দুই কোটীর অধিক অধিবাসী আছে তাহাদের জন্য যদি জবরদস্তি উর্দ্দু চালাইবার চেষ্টা হয়, তাহা হইলে তাহা অত্যাচারের নামান্তর বলিয়া পরিচিত হইবার কথা। জনাব ফজলুর রহমান নিজে বাঙ্গালী, সুতরাং তাঁহার পক্ষেই এই 'কালাপাহাড়ী' মনোবৃত্তি শোভন।

"চাচা আপন প্রাণ বাঁচা"—

পাকিস্তান, বিশেষতঃ পূর্ব্ব পাকিস্তানের নানা অংশে দারুণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। চাউল দুষ্প্রাপ্য, কোথাও কোথাও প্রতি মণ ৫০৲।৬০৲। অন্নাভাবে দেশত্যাগ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু হইলে কি হয়? পাকিস্তানের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী মহোদয় জনাব লিয়াকৎ আলি সাহেব নাকি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছেন যে কাশ্মীরের ভারতীয় ইউনিয়ন কর্ত্তৃক অধিকৃত অঞ্চলে তথাকার অধিবাসীদের মধ্যে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। জনাব লিয়াকৎ আলি সাহেবের সদয় হৃদয় ইহাতে বিগলিত হইয়া পড়িয়াছে এবং কাহারও আপত্তি না থাকিলে তিনি পাকিস্তান হইতে সেখানে চাউল পাঠাইতে পারেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সাধারণ বুদ্ধিতে বলে যে ভারতীয় ইউনিয়ন অধিকৃত অঞ্চলে অন্নাভাববশতঃ অশান্তি হইলে পাকিস্তানের সুবিধা ; সেক্ষেত্রে জনাব সাহেব যেন স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সাহায্য করিতে চাহিতেছেন। প্রকাশ থাকা ভাল, কাশ্মীরীদের মত তাহাদের অন্নকষ্ট নাই এবং তাহাদের মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থা দ্রুত ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু আলি সাহেব প্রমাণ করিতে চান নিছক "প্রপাগাণ্ডা", ভারতীয় ইউনিয়ন অধিকৃত অঞ্চলের অন্নকষ্ট দূর করে না এবং পাকিস্তান রাজ্য এত দয়ালু যে অপরের দুঃখে তাহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। যাহারাই পাকিস্তানের সংস্পর্শে আসিবে, তাহারাই অভাবমুক্ত হইবে এবং অপরকে সাহায্য করিয়া "খোদার খোরার" অধিকারী হইবে। "চাচা, পাকিস্তানের অভাব দূর কর"—ইহাই পূর্ব্ব পাকিস্তানীদের নিবেদন।

শিক্ষায় মহিলার সাফল্য—

কলিকাতা শ্যামপুকুর নিবাসী শ্রীসূর্য্যপ্রকাশ চৌধুরীর কন্যা শ্রীমতী গৌরী চৌধুরী এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের আই-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া

শ্রীগৌরী চৌধুরী

শিক্ষায় মহিলাদের মধ্যে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীঅরবিন্দ—

সম্প্রতি কলিকাতা আলিপুরে ২৪ পরগণার জেলা জজের আদালত গৃহে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের একখানি চিত্র প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে মানিকতলা বোমার মামলায় অব্যাহতি লাভের পর শ্রীঅরবিন্দের ঐ চিত্র গৃহীত হইয়াছিল (আমরা এখানে সেই চিত্রখানি প্রকাশ করিলাম)।

শ্রীঅরবিন্দ

যে দিনের যুগস্রষ্টা অরবিন্দ আজ পণ্ডিচেরীর ঋষি শ্রীঅরবিন্দ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ঐ মামলায় আসামী পক্ষ সমর্থন কালে শ্রীঅরবিন্দকে 'ঋষি' আখ্যায় ভূষিত করিয়াছিলেন। আজ সেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হইয়াছে। শ্রীঅরবিন্দের সাধনা—মানুষকে দেবতায় পরিণত করার সাধনা—তাহা সাফল্য মণ্ডিত হউক।

নূতন গৃহহারা—

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে সম্প্রতি দলে দলে মুসলমান সপরিবারে ও মালপত্রসহ পশ্চিম বঙ্গে আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাদের সকলেই যে পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ নাই; যেমন হিন্দু আসিয়াছিল, সেইভাবে ইহারাও আসিতেছে। উপার্জ্জনের পথ নাই, খাদ্যদ্রব্যের দারুণ অভাব ও অত্যধিক দাম, অপরাপর দ্রব্যাদির দুষ্প্রাপ্যতা প্রভৃতি ভিটাত্যাগের কারণ বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। যাহারা রক্তের স্রোতের মধ্য দিয়া বাঙ্গালাকে ভাগ করিয়া নূতন রাজ্যলাভের আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন, এই নূতন গৃহহারাদের অবস্থা তাঁহাদের মনে কোনও বিশেষ চিন্তাধারা সৃষ্টি করিবে কিনা জানি না। অন্নবস্ত্র স্বাস্থ্য প্রভৃতি প্রত্যেক লোকের প্রয়োজন, যেখানে তাহা মিলে না তাহা স্বধর্ম্মীর রাজ্য হইলেও লোকে পরিত্যাগ করে। কারণ, মানুষে মানুষে আসল প্রয়োজনে কোনও পার্থক্য নাই। যাহা লইয়া ভাইকে ভায়ের গলায় ছুরি দিতে উদ্বুদ্ধ করে, তাহা স্বার্থপর নেতৃস্থানীয় লোকের স্বার্থপ্রণোদিত ঈর্ষ্যা বা লোভ। আমরা মনে করি বাঙ্গালী বাঙ্গালী, হিন্দুও নয় মুসলমানও নয়। পরস্পরের মধ্যে যে কাল্পনিক ব্যবধান সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহা দূর হইলে প্রাণরক্ষার জন্য ভিন্ন রাষ্ট্রে যাওয়ার প্রয়োজন থাকিবে না।

পরলোকে শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ—

খ্যাতনামা চিত্র-শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ সরকার গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ৬৬ বৎসর বয়সে লেক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি রাজসাহী জিলার

সুরেন্দ্রনাথ সরকার

অধিবাসী ছিলেন—মানুষের তৈল-চিত্র অঙ্কনে তিনি বিশেষ যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। গত প্রায় ৩০ বৎসরকাল ভারতবর্ষে তাঁহার অঙ্কিত বহু চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

বাঙ্গালায় কৃষি কলেজ—

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে একটি কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইয়াছে। সে জন্য ঝাড়গ্রামের বদান্য জমীদার রাজা নরসিংহ মল্লদেব ৪৩০ বিঘা জমী ও নগদ ১ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। বারাকপুরে একটি কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইয়াছিল—কিন্তু ঠিক সেই সময়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় তাহা সফল হয় নাই। বাঙ্গালা কৃষিপ্রধান দেশ—তথায় কৃষিকলেজের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। কিন্তু যে সকল ছাত্র তথায় শিক্ষালাভ করিবে, তাহারা যাহাতে কৃষি কার্য্যকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালার ধ্বংসোন্মুখ কৃষি ব্যবস্থাকে পুনর্জ্জীবিত করার চেষ্টা করে, প্রথম হইতে সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া উচিত।

বাঙ্গালার শিক্ষা-ব্যবস্থা—

বাঙ্গালার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা খিচুড়ি পর্য্যায়ে উঠিবার উপক্রম হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট না কি বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতিতে শিশুশিক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা বুনিয়াদী শিক্ষা বা শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা নয়, প্রচলিত শিক্ষার সহিত একটী শিল্পের শিক্ষাদান ব্যবস্থা হইতেছে। যাহা হইতেছে, তাহার তোড়জোড়ও বিশেষ উৎসাহব্যঞ্জক নয়। কোথায়, কাহাদের লইয়া আরম্ভ হইবে, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে না। গভর্ণমেণ্টের নিজের শিক্ষার পরীক্ষামূলক কারখানায় দুই শ্রেণীর শিক্ষাপদ্ধতির গবেষণা চলিতেছে; আজ পর্য্যন্ত কোন্ নীতি গৃহীত হইবে তাহা স্থির হয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টকে অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সর্ত্ত অনুযায়ী বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করিতে হইবে। পঃ বাঙ্গালা সরকার তাহাতে সম্মত নহেন, অথচ অর্থের লোভ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই; সুতরাং 'বুনিয়াদী' কথাটী তাঁহারা তাঁহাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে বজায় রাখিতেছেন। অকৃত্রিম বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের কোনও পক্ষপাত নাই। বাঙ্গালীর ছেলে যাহাতে যথার্থ শিক্ষালাভ করে, তাহার ব্যবস্থা হওয়াই একান্ত কাম্য। কিন্তু হালচাল দেখিয়া মনে হইতেছে পঃ বাঙ্গালা সরকার আজও মন স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই আর সেই কারণে শিক্ষার্থীরও বিশেষ অসুবিধা হইবে।

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল জন্মোৎসব—

কলিকাতা সাহিত্য সমিতির উদ্যোগে ৪১, বৈলাস বসু ষ্ট্রীটে কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মোৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীযুক্ত মেঘেন্দ্রলাল রায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। শ্রীযুক্ত শান্তশীল দাশ ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস চক্রবর্ত্তী স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন এবং শিল্পী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাহা, শ্রীযুক্ত রাণা বসু প্রমুখ অনেকে কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানাইয়া বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় জানান যে "দ্বিজেন্দ্রলাল সমিতি" গঠিত হইয়াছে এবং এই সমিতি দ্বিজেন্দ্রলালের ভাবধারা প্রচার উদ্দেশে মিউজিয়ম তৈয়ারী করিবেন। এ বিষয়ে জনসাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্য বাঞ্ছনীয়।

আরিয়াদহ অনাথ ভাণ্ডার—

গত ১০ই এপ্রিল আরিয়াদহ (২৭ পরগণা) অনাথ ভাণ্ডারের অন্তর্গত শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃ-মন্দির প্রতিষ্ঠানের নবনির্ম্মিত হলে এক প্রীতি সম্মেলনে বারাকপুরের মহকুমা-

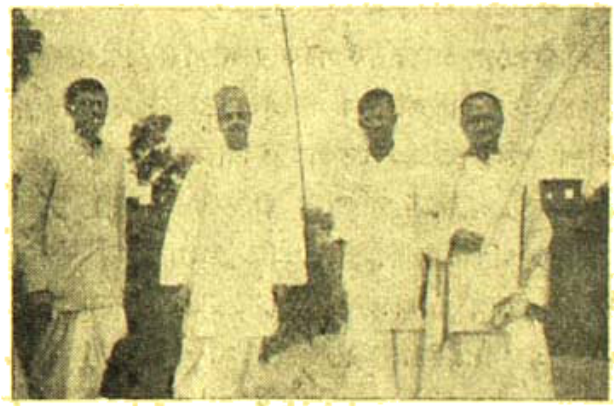

আরিয়াদহ অনাথ ভাণ্ডারে মেটা সম্বর্দ্ধনা ফটো—রবীন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শাসক শ্রীরঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সভাপতিত্ব করেন এবং মহকুমার নানা স্থান হইতে মহকুমা সমিতির বহু সদস্য সম্মেলনে যোগদান করেন। ৫ই জুন রবিবার সকালে মেসার্স জার্ডিন হেণ্ডারসনের ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীগিরিধারিলাল

মেটা পণ্ডিত শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া অনাথ ভাণ্ডার পরিদর্শন করেন। সে দিনও তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য ভাণ্ডারে বহু লোক সমাগম হইয়াছিল ও সভায় ৮ হাজার টাকা দানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক কালীন দান ২৭ হাজার টাকা

মন্ত্রণা গৃহের সম্মুখে কবি—শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়

ছাড়াও মাতৃ-মন্দির প্রতিষ্ঠানের জন্য বহু অর্থ সংগৃহীত হওয়ায় এখন আশা করা যায় সত্বর তথায় মাতৃমন্দির কার্য্য আরম্ভ করা যাইবে। কর্ম্মী শ্রীসন্তুনাথ মুখোপাধ্যায়ের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে এ অঞ্চলের একটি প্রয়োজনীয় অভাব দূরীভূত হইবে।

হিন্দী প্রতিশব্দ—

যুক্তপ্রদেশ প্রাদেশিক সরকার আগামী সেপ্টেম্বর মাস হইতে সরকারী কাগজপত্রে হিন্দী ব্যবহার করিতে মনস্থ করিয়াছেন। কিন্তু এতকাল ইংরাজিতে কাজ চালাইয়া হঠাৎ হিন্দী প্রতিশব্দ অধিকার বা সৃষ্টি করিতে অসুবিধা হইবার কথা। গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি অধ্যাপক বরমভীরের উপর "আদেশ" দিয়াছেন যে সেপ্টেম্বরের মধ্যে শাসন, আইন এবং শিল্পকলা সংক্রান্ত অন্ততঃ বিশ হাজার প্রতিশব্দ সংগ্রহ করিয়া দিবেন। অধ্যাপক বরমভীর, বারজনটী ভাষাবিদ্ সহকারী লইয়া এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন; এ পর্য্যন্ত পাঁচ সহস্রাধিক শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁহারা সংস্কৃত ভাষা মন্থন করিয়া এই কার্য্যে যথেষ্ট সফলতা লাভ করিবেন বলিয়া আশা করেন। কৌটিল্য প্রণীত "অর্থ-শাস্ত্র", মনুস্মৃতি ও যাজ্ঞবল্ক স্মৃতি হইতে রাজশাস্ত্র সংক্রান্ত অন্ততঃ ছয় সহস্র শব্দ সংগ্রহ করিতে পারা যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। যাঁহারা স্বর্গীয় অশোক শাস্ত্রী লিখিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাজ্যশাসন সংক্রান্ত শব্দের আলোচনা "ভারতবর্ষ"এর পৃষ্ঠায় পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন রাজ্যশাসন সংক্রান্ত শব্দে পুস্তকখানি কত সমৃদ্ধ। সেইরূপ অপরাপর সংস্কৃত গ্রন্থ সম্বন্ধে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। উহাই শব্দ-রচনা করা অপেক্ষা সংস্কৃতমূলক শব্দ উদ্ধার করিয়া প্রচলনের চেষ্টা সমর্থনযোগ্য। আশা করি অধ্যাপক বরমভীর ও তাঁহার সহকর্ম্মীদের চেষ্টায় যে প্রতিশব্দমালা সৃষ্টি হইবে, তাহা সর্ব্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে। পঃ বাঙ্গালায় একবার চেষ্টা হইয়াছে, তাহার অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা হইলেও তাহার পরিবর্ত্তে যে শব্দ গ্রহণযোগ্য তাহা বিশেষ পাওয়া যায় নাই। অপরের লেখা সম্মুখে থাকিলে ত্রুটী ধরা খুব সহজ। সেই হিসাবে আমরা পঃ বাঙ্গালা সরকারের পরিভাষা পুস্তিকা বা অধ্যাপক বরমভীরের আগামী পুস্তক জনসাধারণ ও সরকারের কাজে লাগিবে বলিয়া আশা করি।

অখণ্ড পৃথিবী—

'অখণ্ড-পৃথিবী'—কবির কল্পনা-বিলাস বলিয়া লোকে ধরিয়া রাখিয়াছিল; মাঝে মাঝে কথাটা উঠিত, আবার চাপা পড়িয়া যাইত। এত বিরাট পৃথিবী 'সাত সমুদ্র, তেরো নদী,' সমুদ্র পারাপারে, দূরদূরান্তরে লোকের বাস। বিবিধ জাতি, বিবিধ ভাষা, সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে মানুষের অবস্থান, মানুষে মানুষে দেহের বর্ণ, বুদ্ধির প্রখরতার কত বিভেদ। লোকাচারে, জীবনযাপনের ধারায়, জীবনের আদর্শে এমন কি নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যবহারের তারতম্যে এক দেশের লোক হইতে অপর দেশের লোক বিভিন্ন। ঘটনার আবর্ত্তে একজাতি একশ্রেণী যেন অপরের উপর প্রভুত্ব করিতে জন্মিয়াছে। প্রভু ভৃত্যে, বিজেতা ও বিজিতে আবার সামঞ্জস্য কোথায়? বিভিন্নতার দিক দিয়া যতই ভাবা গিয়াছে, বিচ্ছিন্ন পৃথিবীর রূপ ততই স্বাভাবিক চিত্র বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। যাঁহারা অখণ্ড পৃথিবীর কথা বলিয়াছেন, তাঁহারা উন্মাদ আখ্যা লাভ করিয়াছেন। যতই দিন যাইতেছে, ততই মনে হয়, পৃথিবীর একত্ব সম্বন্ধে লোকমত গড়িয়া উঠিতেছে। দেশে দেশে মনীষীরা একথা ভাবিয়াছেন, কিন্তু খেতকায় জাতি

কৃষ্ণজাতি সকলের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া থাকায় কাজ বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের পর আমেরিকার রাজনীতিবিদ্ ওয়েণ্ডেল উইল্‌কি একবার পৃথিবী ভ্রমণে বহির্গত হন। আকাশপথে যাতায়াত দ্বারা দেখা গেল অখণ্ড পৃথিবীর যে প্রধান অন্তরায় তাহা দূর হইয়াছে ব্যোমযানের কৃপায়। আজ সদাগরা ধরা নাতি বৃহৎ ভূখণ্ডে পরিণত হইয়াছে। যাতায়াত সহজ হওয়ায় দেশে দেশে ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে। লোকের আধুনিক প্রয়োজন মিটাইতে পরস্পরের উপর দেশে দেশে নির্ভরতা বৃদ্ধি পাইতেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রমাণিত হইয়া গেল, শ্বেতকৃষ্ণ বলিয়া জাতির কোনও প্রভেদ নাই, শত্রুর কবল হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, শ্বেতের কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের শ্বেত জাতি একান্ত প্রয়োজন। অন্ন বস্ত্রর কথার আলোচনায় কাজ নাই—একের অন্ন, একের বস্ত্র অপরে না যোগাইলে আর চলে না। একের প্রাণরক্ষা করিতে অপরে না আসিলে উপায় নাই। একের সেবা না পাইলে অপরে অস্বস্তি ভোগ করে; চাষী মজুর কাজ না করিলে ধনিক বুদ্ধিজীবী প্রভৃতির দিন অচল। মানুষে মানুষে বিভেদ কমিতেছে; যে সকল কারণে এক অপর হইতে নিজেকে প্রধান মনে করিত, তাহা দূর হইয়া যাইতেছে। আজ আবার জোর করিয়া অখণ্ড পৃথিবীর আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিতেছে। সকল জাতির সকল শ্রেণীর মধ্যে মানুষসত্তা আজ নিজরূপে প্রকাশ লাভ করিতেছে। আজ সারা পৃথিবীতে এক অখণ্ড রাষ্ট্রতন্ত্রের জন্য ছুটাছুটী পড়িয়াছে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সভ্য মিঃ অসবোর্ণ পৃথিবীর নানা অংশে ভ্রমণ করিয়া ইহার স্বপক্ষে মত সৃষ্টি করিতেছেন। বিভিন্ন দেশের নাগরিক নয়। সারা পৃথিবীর এক নাগরিকত্ব প্রমাণ করিবার জন্য ছাড়পত্র (passport) উঠাইয়া দিবার জন্য আন্দোলন সুরু হইয়াছে। যে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের আবিষ্কার চলিতেছে, তাহাতে পৃথিবী যদি অখণ্ড বলিয়া গৃহীত না হয়, তাহা হইলে যে কোনও মুহূর্তে এক দেশ অপর দেশকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে পারে। আজ সেই কারণে, অপর কারণ না থাকিলেও, পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানবের পৃথিবীর সকল সুযোগ সুবিধার সমান অধিকার মানিয়া লইতে হইবে। আমরা এই আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন করি এবং ইহার সাফল্য কামনা করি।

বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতি—

চিরন্তনকালের অখণ্ড বাংলা ভৌগলিক ছুরিকাঘাতে আজ শুধু জীবনের দিক হইতেই নয়, সাংস্কৃতিক দিক হইতেও নিশ্চিহ্নতার দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। কিন্তু রামমোহন, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের বাংলা যে কোন দিনই অন্তরের দিক হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না সেই কথা স্মরণ করাইবার জন্য বাংলার বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক শিল্পী ও সাংবাদিকদের লইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতি গঠন করা হইয়াছে। গত ৫ই আষাঢ় রবিবার কলিকাতার ২৩ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে বিশিষ্ট সুধী, সাহিত্যিক ও শিল্পীবৃন্দের উপস্থিতিতে ইহার কার্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে। ডক্টর কালিদাস নাগ এই সমিতির স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন এবং সমগ্র বাংলার পক্ষ হইতে স্থায়ী সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন শ্রীঅনিলকুমার সাধু কাব্যভারতী, সাহিত্যশ্রী। সহ-সম্পাদক শ্রীজলধিনাথ সাধু বার-এ্যাট্-ল এবং কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছেন শ্রীপ্রতাপচন্দ্রচন্দ্র। অন্যান্যদের মধ্যে নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির সম্পাদক শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল, শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবীসরস্বতী, শ্রীমতী বাণী রায়, শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী প্রভৃতি কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। ইহাছাড়া তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বাংলার বিখ্যাত সাহিত্যিক-বৃন্দ ও শিল্পীরা এই সমিতির সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। সভাপতি ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতির উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করিয়া বলেন—"যেবাংলাকে আমরা এতদিন ধরে দেখে এসেছি, হঠাৎ একদিন দেখলাম তার রূপ বদলে গেছে। ভৌগলিক বাংলা আমাদের মনে যে দাগ কেটেছে তা আত্মার নয়। তাই বৃহত্তর বাংলায় আজ আমাদের সংস্কৃতির বাণী বহন করে নিয়ে যেতে হবে। বর্তমান সীমাবদ্ধ বাংলার পরিবর্তে প্রকৃত বাংলার প্রত্যেকটি জেলার সংগে অবিচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রক্ষা করাই হবে এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। আমি আজকের এই খণ্ডিত বাংলাকে স্বীকার করিনা। বাংলার যে চিরন্তন সত্তা তাকে পুনরায় জাগিয়ে তুলবার জন্য এবং খণ্ডিত নয়—বৃহত্তর বঙ্গের আত্মাকে সবার মনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই আজ এই সমিতির প্রতিষ্ঠা।" এর পর শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র এই গুরুদায়িত্বের অর্থকরী সমস্যার দিক আলোচনা করেন।

৺সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

খেলাধূলা

সম্পাদনা শ্রীকৌশেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

ফুটবল প্রসঙ্গ

কোচিং সেণ্টার

গতবারে বাঙ্গালা দেশের ফুটবলের উন্নতিমূলক কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে,বাংলার উঠতি ফুটবল খেলোয়াড়দের খেলার উন্নতি করবার জন্য আই-এফ-একে একটি ট্রেনিং সেণ্টার স্থাপন করবার অনুরোধ জানিয়েছিলাম। জেনে খুসী হলাম যে এইরূপ একটি কোচিং সেণ্টার খুলবার ব্যবস্থা আই-এফ-এ কর্তৃপক্ষ করছেন। বাংলার ফুটবল খেলার উন্নতিমূলক এই প্রচেষ্টার জন্য আই-এফ-এ কর্তৃপক্ষকে আমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই সূত্রে আরও একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে আই-এফ-এ'র দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়টি হচ্ছে এই কোচিং সেণ্টারের ট্রেনার মনোনয়ন। আমার মনে হয় আই-এফ-এ কর্তৃপক্ষ এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত নন—গতানুগতিক পন্থাই তাঁরা অনুসরণ করে চলেছেন। আমার মনে হয় নিজেদের দেশের ট্রেনারদের পারদর্শিতার উপর বিশেষ নির্ভর না করে, ভারতের বাইরের ফুটবল ক্রীড়াকৌশলী কোন পাশ্চাত্য দেশ থেকে সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ ট্রেনার আমদানি করাটাই সমীচীন হবে এবং তাতে বিশেষ সুফল পাবার আশাও আছে। এই ট্রেনার মনোনয়ন বিষয়টির উপর বিশেষ করে জোর দিচ্ছি এই জন্যে যে, ট্রেনারএর যোগ্যতার উপরেই নির্ভর করে কোচিং সেণ্টারের সাফল্য। ট্রেনার যদি উপযুক্ত না হয় তা'হলে কোচিং সেণ্টার থেকে বিজ্ঞানসম্মত উন্নত ধরণের ট্রেনিংও শিক্ষার্থীরা পাবেন না এবং তা' হ'লে কোচিং সেণ্টার স্থাপনের উদ্দেশ্যও ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হবে। তাই উপযুক্ত ট্রেনার নিয়োগের উপর আই-এফ-এ কর্তৃপক্ষকে বিশেষ নজর দিতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

খেলার মাঠে অরাজকতা

ফুটবল খেলার স্ট্যাণ্ডার্ডের আজ যেমন অধোগতি লক্ষিত হচ্ছে, সেই সঙ্গে এক শ্রেণীর দর্শকদের মনের অবনতিটাও বেশ পরিস্ফুট হ'য়ে উঠছে,খেলার মাঠে তাঁদের অশিষ্ট আচরণের ভিতর দিয়ে। এই মানসিক অবনতির প্রকাশ বেশ ভালভাবেই লক্ষিত হয়েছে ইষ্টবেঙ্গল বনাম এরিয়ান্সের খেলার দিন। এই দিন খেলা শেষ হবার ছয় মিনিট আগে যখন ইষ্টবেঙ্গল দল এরিয়ান্সের নিকট ২-১ গোলেহারছিলেন সেই সময় ইষ্টবেঙ্গলক্লাবের সদস্যদের গ্যালারি থেকে কয়েকজন লোক রেফারীকে তাঁর তথাকথিত ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করেন এবং গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে সেইখানেই খেলার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে দেন। হতভাগ্য, লাঞ্ছিত রেফারীকে পরে অজ্ঞান অবস্থায় দেখা যায়! মানসিক অবনতির এই প্রকাশ যে শুধু ফুটবল খেলার মাঠেই পরিলক্ষিত হচ্ছে তা' বললে ভুল বলা হয়। আসলে এই মানসিক বিকৃতির স্বরূপ জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অল্প-বিস্তর বিস্তার লাভ করছে এবং তারই ঢেউ এসে খেলা-ধূলার স্বাস্থ্যপূর্ণ আবহাওয়াকেও করে তুলছে বিষাক্ত, বিকৃত। এই বিষময় আবহাওয়ার দূষিত স্পর্শ থেকে যে সহজে আমরা মুক্তি পাবো তা' আজ মনে হয় না; তবে খেলা-ধূলার ক্ষেত্র থেকে এই অরাজকতার বিষকে বিনষ্ট করতে আজ সুস্থমনা, শিষ্ট দর্শকবৃন্দ, ক্লাব কর্তৃপক্ষগণ ও আই-এফ-এর পরিচালক মণ্ডলীকে এক যোগে দণ্ডায়মান হ'তে আহ্বান জানাচ্ছি। ক্রীড়াক্ষেত্রের এই দুর্নীতিমূলক অশিষ্ট আচরণকারীদের বিরুদ্ধে আজ সকলকে একত্র হ'তে হ'বে, সমূলে উৎপাটিত করতে হবে এই বিষ বৃক্ষকে, বিনষ্ট করতে হবে এই জঘন্য প্রবৃত্তিকে মানুষের মন থেকে।

এর জন্য গভর্ণমেণ্টের সাহায্যেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে এবং সে সাহায্য নিতে হবে শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী, ক্রীড়াক্ষেত্রের কলঙ্ক এই মুষ্টিমেয় দুর্বিনীতদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে। আশা করি জনসাধারণ এর তাৎপর্য্য বুঝে এই দুর্নীতি নিবারণে সচেষ্ট হবেন। এই সূত্রে আই-এফ-এ কর্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে তাঁরা যেন কঠোর হস্তে এই দুর্নীতি দমনের ব্যবস্থা করেন। যদি কোন ক্লাবের সভ্যবৃন্দ তাঁদের প্রিয় দলের পরাজয় সহ্য করতে না পেরে ক্রীড়া-ক্ষেত্রের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে অরাজকতা সৃষ্টির দ্বারা শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে' পূর্ণ সময়ের পূর্ব্বেই খেলার অবাঞ্ছিত সমাপ্তি ঘটায় এবং যদি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় তা' হ'লে সেই অভিযুক্ত ক্লাবকে সেই অসমাপ্ত খেলায় পরাজিত বলেই আই-এফ-এ কে রায় দিতে হবে। তার ওপর সেই অভিযুক্ত ক্লাবকে সতর্ক করে দিতে হবে যে ভবিষ্যতে যেন এরূপ নিন্দনীয় আচরণ তাঁদের ক্লাবের সভ্যরা না করেন এবং করলে আরও কঠোর শাস্তি দিতে আই-এফ-এ বাধ্য হবেন। এইরূপ সতর্কীকরণের পরও যদি সেই ক্লাবের সভ্যরা পুনরায় কোনদিন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেন তা' হ'লে আই-এফ-এ'র একমাত্র কার্য্য হবে সেই ক্লাবকে তৎক্ষণাৎ সাস্পেণ্ড করা। এই সঙ্গে আই-এফ-এ কর্তৃপক্ষকেও জানাচ্ছি যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে খেলার মাঠের সুস্থ আবহাওয়াকে নষ্ট করা, হতভাগ্য রেফারীকে নির্দ্দয়-ভাবে প্রহার করা, বিপক্ষের খেলোয়াড়দের লাঞ্ছিত করা, এই রকম সব জঘন্য অপরাধের কঠোর শাস্তিবিধান করে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করবার ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি যদি আই-এফ-এ কর্তৃপক্ষের না থাকে তা' হ'লে তাঁদের ও গভর্ণমেণ্টের উচিত এইখানেই কলিকাতার ফুটবল খেলার সমাপ্তি ঘটিয়ে এই সব গণ্ডগোলের নিষ্পত্তি করে নিরীহ, ভদ্র দর্শক ও রেফারীদের অহেতুক লাঞ্ছনার হাত থেকে নিষ্কৃতি দান করা।

ষ্টেডিয়ামের প্রয়োজন

এই সঙ্গে সেই অতি পুরাতন, বহুবার আলোচিত ও সমবার প্রত্যাখ্যাত, স্থানাভাবে নির্য্যাতিত ফুটবল দর্শকদের স্বপ্ন, সেই ষ্টেডিয়ামের কথা আবার আই-এফ-এ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি পথে আনবার জন্য উল্লেখ করছি। ভারতীয় ইউনিয়নের প্রধান নগরী ও ভারতীয় ফুটবলের প্রধান কেন্দ্রে একটি ষ্টেডিয়ামের প্রয়োজনীয়তা বিশদ ভাবে আলোচনা করা বাহুল্য মাত্র—বিশেষ করে অতীতে বহুবার আলোচিত হয়ে যখন এই আলোচনা প্রায় তিক্ত হয়ে উঠেছে। ষ্টেডিয়ামের প্রয়োজন যে কতটা তা ভুক্তভোগী দর্শক মাত্রই জানেন। আর শুধু দর্শকগণই বা কেন? খেলোয়াড়গণ, আই-এফ-এ'র কর্ম্মকর্ত্তাগণ ও পুলিশ কর্তৃ-পক্ষও এ বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত আছেন। মাঠের অর্দ্ধেক গোলমাল ঢুকতে না পাওয়ায় অসন্তুষ্ট দর্শকেরাই অনেক সময়ে করে থাকেন এবং তার যথেষ্ট কারণও আছে। সারাদিন রোদ বৃষ্টি সহ্য করে লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও হয়ত শেষ সময়ে টিকিট পাওয়া গেল না, কিংবা পাওয়া গেলেও ভেতরে ঢুকে ভিড়ের চোটে হয়ত খেলা ভাল রকম দেখাই গেল না—নিজেদের মধ্যে গালাগালি, হাতাহাতি, কান্না ছোঁড়াছুঁড়ির মধ্য দিয়েই খেলা দেখার উত্তেজনার পরিসমাপ্তি হল! অবশ্য আই, এফ, এ কর্তৃপক্ষকে খেলার ব্যবস্থা করতে ততটা ভুগতে হয় না—যতটা ভুগতে হয় সাধারণ দর্শকদের প্রবেশ করতে গিয়ে এবং পুলিশকে শৃঙ্খলা রাখতে গিয়ে। তাই বোধ হয় ষ্টেডিয়ামের একান্ত প্রয়োজনীয়তাটা ফুটবল কর্ণধারগণ ঠিক মত হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না বলে মনে হয়। যাই হোক কর্ত্তব্যের খাতিরে ও প্রয়োজনের তাগিদে আমরা আবার তাঁদের ও গভর্ণমেণ্টকে মনে করিয়ে দিচ্ছি অবিলম্বে ষ্টেডিয়াম প্রস্তুতের একান্ত আবশ্যকতা। বাধা যদিও কিছু থাকে তা অলঙ্ঘনীয় বলে মনে হয় না এবং প্রয়োজন যেখানে বড় সেখানে বাধাকে পথ থেকে সরাতেই হবে—বিশেষ করে জনসাধারণের সুবিধার দিকে চেয়ে। স্থানাভাবের অজুহাতও টিকতে পারে না কোর্ট উইলিয়াম সংলগ্ন বিরাট ময়দান, প্রশস্ত ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ড ও উপযুক্ত ইডেন উদ্যান রয়েছে বলে। আশা করি আই-এফ-এ কর্তৃপক্ষ ও গভর্ণমেণ্ট তাঁদের চিরাচরিত আলস্য ছেড়ে ষ্টেডিয়াম নির্ম্মাণের গুরুত্ব বুঝে অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

খেলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

ফুটবল ঃ

প্রথম বিভাগের লীগের দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। লীগের প্রথমার্দ্ধে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ১৩টা খেলায় ২৩ পয়েন্ট পেয়ে শীর্ষস্থান অধিকার ক'রে আজ পর্য্যন্ত সেইস্থানেই আছে। লীগের প্রথমার্দ্ধের খেলায় তাদের হার একটা, মোহনবাগানের সঙ্গে ১-০ গোলে পেনাল্টিতে এবং একটা খেলা গোলশূন্য ড্র ছিল, মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে। দ্বিতীয় স্থানে ছিল গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মহমেডান স্পোর্টিং ; ২১ পয়েন্ট : খেলা ড্র ৩, হার ১ রেঞ্জার্সের সঙ্গে। প্রথম বিভাগের প্রথমার্দ্ধের খেলায় মহমেডান-রেঞ্জার্সের খেলার ফলাফলই ক্রীড়ামহলে একমাত্র বিস্ময়ের বস্তু ছিল। লীগের তালিকায় রেঞ্জার্সের স্থান ১৩, অতএব সংখ্যার জন্য খেলার ফলাফলও মন্দ ; কিন্তু মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে খেলায় জয়লাভ ক'রে এই দলটি ক্রীড়ামোদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই জয়লাভটা যেন খারাপ অবস্থার মধ্যে হঠাৎ রেঞ্জার্সের টিকিট পাওয়ার মতই। ইষ্টবেঙ্গলের থেকে ৪ পয়েন্ট এবং মহমেডান স্পোর্টিংয়ের থেকে ২ পয়েন্ট পিছিয়ে মোহনবাগানের স্থান ছিল তৃতীয়। ভবানীপুর ক্লাব খেলার প্রথম দিকে অপরাজিত অবস্থায় লীগ তালিকার শীর্ষস্থানে ছিল। কালীঘাটের কাছে ৬-০ গোলে শোচনীয় ভাবে পরাজয়ের পর থেকেই তাদের খেলার অবনতি ঘটেছে। আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের ব্যর্থতাই এর মূল কারণ। লীগের প্রথমার্দ্ধে ২টি চ্যারিটি খেলা হয়েছে। মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গল ; ইষ্টবেঙ্গল-মহমেডান স্পোর্টিং। দুটি খেলাতেই বিপুল জনসমাগম হয়েছিলো। খেলার দিক থেকে মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গলের খেলাটি ভাল হয়েছিলো তবে খেলায় তেমন উল্লেখযোগ্য উৎকর্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় চ্যারিটি ম্যাচের ফলাফল খেলার সমতা রক্ষা করেছে কিন্তু খেলা দেখে দর্শকরা হতাশ হয়েছেন। দুই দলই আড়ষ্ট হয়ে খেলেছে ; গোলের সহজ সুযোগের যথাসময়ে সদ্ব্যবহার না ক'রে অথবা বল ড্রিবল ক'রে বিপক্ষদলকে আত্মরক্ষার সময় দিয়েছে। ইষ্টবেঙ্গলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড়দের এ দুর্ব্বলতা সেদিন বেশী চোখে পড়েছে।

লীগের ফিরতি খেলায় ক্যালকাটা ৪-০ গোলে মহমেডান স্পোর্টিংকে পরাজিত ক'রে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। অপর দিকে ক্যালকাটা গ্যারিসন করেছে ভবানীপুরকে ৪-০ গোলে হারিয়ে। নতুন খেলোয়াড় আনিয়ে ক্যালঃ গ্যারিসন নিজ দলকে ঢেলে সাজিয়েছে। লীগের খেলায় যে এরকম হবে গত মাসে তার আভাস দিয়েছিলাম। খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড বলতে কিছু নেই। যেমন লীগের প্রথমার্দ্ধে স্পোর্টিং ইউনিয়ন-মহমেডান দলের খেলা ১-১ গোলে ড্র যায়। ফিরতি খেলায় স্পোর্টিং ইউনিয়ন ভাল খেলে রেলওয়ে স্পোর্টসকে ২-১ গোলে হারায়। মহমেডান-রেল দলের ফিরতি খেলা ড্র যায়। সেই হেতু ক্রীড়ামোদীরা ধারণা করেছিলেন স্পোর্টিং ইউনিয়ন-মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ফিরতি খেলায় মহমেডান দলকে জয়লাভ করতে বেশ বেগ পেতে হবে। কিন্তু দেখা গেল মহমেডান স্পোর্টিং সহজেই ৬-০ গোলে স্পোর্টিং ইউনিয়নকে হারিয়ে দু'পয়েন্ট পেল। এ পর্য্যন্ত লীগ তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকার ক'রে আছে, ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব। ১৯টা খেলায় ৩৫ পয়েন্ট। গোল 'এভারেজ' খুবই ভাল ৫৮টা গোল দিয়ে মাত্র ৪টে গোল খেয়েছে। ড্র ১টা হার ১টা। ইষ্টবেঙ্গল-এরিয়ান্সের ফিরতি খেলায় এরিয়ান্স খেলা শেষ হওয়ার ৬ মিনিট আগে পর্য্যন্ত ২-১ গোলে অগ্রগামী ছিল। একদল উচ্ছৃঙ্খল দর্শক রেফারিকে আক্রমণ করায় নির্দ্দিষ্ট সময়ের ৬ মিনিট পূর্ব্বে খেলাটি বন্ধ হয়ে যায়। এই খেলা সম্পর্কে আই এফ এ কর্ত্তৃপক্ষ এখনও কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি। ইষ্টবেঙ্গলের বাকি খেলার মধ্যে বড় খেলা ২টো, মোহনবাগান এবং মহমেডান স্পোর্টিং দলের সঙ্গে। যদি ধরা যায়, এই দুটো খেলায় ইষ্টবেঙ্গলের হার হয় এবং এরিয়ান্সের সঙ্গে অসমাপ্ত খেলায় সে দিনের ফলাফলকে স্বীকার ক'রে নিতে হয় অথবা দু' একটা খেলা ড্র যায়

তাহলে ইষ্টবেঙ্গলের লীগচ্যাম্পিয়ানসীপের প্রতিদ্বন্দ্বী মোহন বাগান এবং মহমেডান স্পোর্টিংয়ের মধ্যে শেষোক্ত দল ইষ্টবেঙ্গলকে অতিক্রম করবে যদি তারাও কোন খেলায় হার বা ড্র স্বীকার না করে। ইষ্টবেঙ্গলের খেলা দেখে মনে হচ্ছে এবার তাদের লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পাওয়ার পথে আর কোন বাধা নেই। প্রকৃতপক্ষে তারা পাঁচ পয়েণ্টে এগিয়ে আছে। ইষ্টবেঙ্গলের দিক থেকে যেমন খেলায় হার বা ড্র করার সম্ভাবনার কথা বলা হ'ল—তেমনি বলা যেতে পারে মহমেডান স্পোর্টিং এবং মোহন বাগানেরও। সবদিক বিচার করলে দেখা যায় এ পর্য্যন্ত লীগের খেলায় ইষ্টবেঙ্গলের অবস্থা ভাল।

মোহনবাগান-মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ফিরতি খেলার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উভয়েরই সমান ১৯টা খেলায় ৩০ পয়েণ্ট হয়েছিল। ফিরতি খেলায় মহমেডান দলের থেকে গোল করার সহজ এবং অধিক সুযোগ হারিয়ে একেবারে শেষ সময়ের ৩০ সেকেণ্ড পূর্ব্বে অতর্কিতে মোহনবাগান গোল খেয়ে যায়। এই খেলায় মোহনবাগান ৪টী কর্ণার পায়, অপরদিকে বিপক্ষ দল একটিও না। এই থেকে খেলার তারতম্য বিচার করা চলে।

লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ নিয়ে যেমন প্রতিযোগিতা তেমনি এবার কে প্রথম বিভাগের লীগের খেলা থেকে নামবে এই নিয়ে জোর লড়াই চলেছে লীগ তালিকার নীচের দিকে ডালহৌসী, ক্যালকাটা এবং রেঞ্জার্সের মধ্যে। এই তিন দলের মধ্যে রেঞ্জার্স অপর দুই দলের থেকে একটা বেশী খেলে এক পয়েণ্ট পিছনে আছে। ক্যালকাটা গ্যারিসন ১৯টি খেলায় ৪ পয়েণ্ট পেয়েছে। ই আই রেল দল লীগের চতুর্থ স্থানে আছে; গোল দেওয়ার দিক থেকে তাদের স্থান ইষ্টবেঙ্গলের পর, মোট গোল দিয়েছে ৪৪টা, খেয়েছে তেমনি ২৩টা। গোল খাওয়ার দিক থেকে মোহন বাগান এবং মহমেডান দলের থেকে অনেক বেশী। এ পর্য্যন্ত লীগের তালিকায় প্রথম কয়েকটি দলের খেলার ফলাফল দেওয়া হ'ল।

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
ইষ্টবেঙ্গল	১৯	১৭	১	১	৫৮	৪	৩৫
মহঃ স্পোর্টিং	২০	১৪	৪	৪	৪২	৯	৩২
মোহন বাগান	২০	১৩	৪	৩	৩০	৮	৩০
ই আই আর	২১	১১	৪	৬	৫৫	২৩	২৬

উইম্বলডন টেনিস ঃ

উইম্বলডন টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় আমেরিকার টেনিস খেলোয়াড়গণ দেশের সুনাম রক্ষা করেছেন। বলতে কি প্রতিযোগিতায় আমেরিকার অপ্রাধান্য হয়েছে। এ বছর অল্ ইংলণ্ড টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় আমেরিকা পুনরায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড়ের সম্মান লাভ করেছে। ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড় নরেশকুমার এবং এস এল আর সোহনী ডবলসের প্রথম রাউণ্ডে পাঁচ সেট খেলে হেরে প্রতিযোগিতার পর করাসী খেলোয়াড়দ্বয়ের কাছে হেরে যান। কলকাতার উদীয়মান টেনিস খেলোয়াড় নরেশকুমার তৃতীয় রাউণ্ডে ইটালীয় খেলোয়াড়দের কাছে পরাজিত হন। ভূতপূর্ব্ব ভারতীয় টেনিস চ্যাম্পিয়ান এস এল আর সোহনী আমেরিকার খেলোয়াড়ের কাছে হেরে যান। উইম্বলডন সব টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপের ফাইনাল ফলাফল—

পুরুষদের সিঙ্গলসের এফ আর স্বরোইডার (আমেরিকা) ৩-৬, ৬-০, ৬-৩, ৪-৬, ৬-৪ গেমে জারোস্লাভ ড্রোবনীকে (চেকোঃ) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলসে রিচার্ড গনজেলস এবং ফ্রাঙ্ক পার্কার (আমেরিকা) ৬-৪, ৬-৪, ৬-২ গেমে টেড স্বারোইডার এবং গার্ডনার মুলোয়কে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে লুইস ব্রাউ (আমেরিকা) ১০-৮, ১-৬ ও ১০-৮ গেমে মিসেস মার্গারেট ওসবোর্ণ ডু পণ্টকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডবলসে মিস লুইস ব্রাউ এবং মিসেস মার্গারেট ওসবোর্ণ (আমেরিকা) ৮-৬, ৭-৫ গেমে মিস মর্গেন এবং মিসেস টডকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন। গত চার বছরের মধ্যে এই নিয়ে তাঁদের তৃতীয় জয়লাভ। বয়েজ জুনিয়ার ফাইনালে এস ষ্টকেনবার্গ (সুইডেন) ৬-২, ৬-১ গেমে জে এ টি হর্নকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলসে মিস ব্রাউ (আমেরিকা) এবং জন ব্রসউইচ (অষ্ট্রেলিয়ান) [illegible], ৯-১১, ৭-৫ গেমে এরিক ষ্টারগেস এবং মিসেস শীলা ম্যাসনকে পরাজিত করেন। প্রতিযোগিতায় তাঁরা পর্য্যায়ক্রমে তিনবারে বিজয়ী হলেন।

যুযুৎসু-কৌশল

বীরেন্দ্রনাথ বসু

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"যুযুৎসু কৌশল" লেখাটি ধারাবাহিক ভাবে ১৩৩৯ সাল হইতে ১৩৪৩ সাল অবধি দিয়া আসিয়াছি। নানান কারণে বিশেষতঃ ছবি তুলিবার অসুবিধা হওয়ায় বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। ১২৪টী প্যাচ বাহির হইয়াছিল এখন ১২৫নং প্যাচ হইতে আরম্ভ করিলাম।

এইবার যুযুৎসু কৌশলের Ground Lock (জমির

১২৫ নং প্যাচের প্রথম চিত্র

প্যাচ) শ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ যে প্যাচগুলির দ্বারা অপরকে মাটিতে ফেলিয়া নিজের ইচ্ছামত আয়ত্তে আনিতে পারা যায়, সেই প্যাচগুলির বিষয় লিখিব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি প্যাচগুলি অভ্যাস করিবার সময় কিম্বা কাহারও উপর খাটাইবার সময় একাগ্রমনে ও ক্ষিপ্রকারিতার সহিত উহা করিতে হইবে নচেৎ কোন কাজেই আসিবে না। কাহাকেও প্যাচ মারিতে যাইবার সময় নিজের ও অপরের ধরার অবস্থা, পায়তারা, টাল ও 'অওকা' অনুযায়ী প্যাচ মারিতে হইবে। সকল সময়ই মনে রাখিতে হইবে যে এই সব ছাড়াও গায়ের জোর বিনা এই

১২৫ নং প্যাচের দ্বিতীয় চিত্র

প্যাচগুলি অপরের উপর খাটান মোটেই সম্ভবপর হইবে না।

১২৫নং প্যাচ

যদি কেহ পশ্চাৎ হইতে তাহার দুই হাত দিয়া কোমরটি জোরে জড়াইয়া ধরে, তবে নিচু হইয়া দুই পায়ের মধ্য দিয়া

১২৫ নং প্যাচের তৃতীয় চিত্র

হাত দুইটি চালাইয়া দিয়া তাহার আগান পায়ের গোছটি জোরে ধরিয়া (১২৫নং প্যাচের ১ম চিত্র) সোজাভাবে উপরে

তুলিতে তুলিতে সামনে আগাইয়া দিয়া তাহার হাঁটুর উপর জোর চাপ দিয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া (১২৫নং

১২৫ নং প্যাচের চতুর্থ চিত্র

প্যাচের ২য় চিত্র) দিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ধরা পায়ের গোছটি (যদি বাঁ পা হয় ডান দিকে ও ডান পা হয় বাঁ দিকে) জোরে মোচড় দিয়া তাহাকে মাটিতে আটকাইয়া

১২৬ নং প্যাচের প্রথম চিত্র

রাখা যায় (১২৫নং প্যাচের ৩য় চিত্র) বা মোচড় দিতে দিতে নিজের ডান পা হইলে ডান দিক, বাঁ পা হইলে বাঁ দিকে ঘুরিয়া একটি পা তাহার হাঁটুর উপর রাখিয়া তাহার পা-টিকে দোমড়াইলে সহজেই তাহাকে মাটিতে আটকাইয়া রাখিতে পারা যায় (১২৫নং প্যাচের ৪র্থ চিত্র)।

১২৬নং প্যাচ

যদি কেহ সম্মুখ হইতে নিচু হইয়া তাহার দুই হাত দিয়া কোমরটি জড়াইয়া ধরিতে আসে, তৎক্ষণাৎ নিজের দুইটি

১২৬ নং প্যাচের দ্বিতীয় চিত্র

হাত তাহার দুই বগলের নিচু দিয়া চালাইয়া দিয়া ও তাহার মাথাটি নিজের পেটের নিচে রাখিয়া (১২৬নং প্যাচের

১২৬ নং প্যাচের তৃতীয় চিত্র

১ম চিত্র) ঘাড়ের উপর চাপ দিতে দিতে তাহার হাত দুইটি পিছন দিকে সোজাভাবে উপর তুলিয়া উহার মোড়া দুইটিতে চাড় লাগাইয়া (১২৬নং প্যাঁচের ২য় চিত্র) ধ। কিম্বা ডান দিকে ঝোঁক দিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া তাহাকে আটকাইয়া রাখিতে পারা যায় (১২৬নং প্যাঁচের ৩য় চিত্র)। (ক্রমশঃ)

চণ্ডালিকা-রেকর্ড-গীতি-নাটক

নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্য-সাধুনি কর্ণাবদানের সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে বিশ্বকবির অনবদ্য অবদান নৃত্য-নাট্য "চণ্ডালিকা"। সকল মানুষই সমান—নীচ কেউ নয়, হীন কেউ নয়, তাই জন্মের কালিমা মুছিয়ে, পরম আনন্দ—পরম মুক্তির আলো জাগাতেই চণ্ডালিকা কন্যা প্রকৃতির হাতের জল পান করলেন ভিক্ষু আনন্দ। মানবের বংশে যে জন্মেছে, মানবের রক্ত যার ধমনীতে—সে কি কখনো হয় অশুচি? এই মূল নীতিতে রচিত নৃত্যনাট্যটি যে ভারতের গঠনমূলক কাব্যের একটা দিক পরিস্ফুট ক'রে তুলবে একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। সুচিত্রা মিত্র, সুপ্রীতি ঘোষ, বিনেন চৌধুরী, সন্তোষ সেনগুপ্ত, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি রবীন্দ্র-গীতি-শিল্পীরা (N31053-68) দু'খানি রেকর্ডে তাঁদের অনবদ্য সুমধুর কণ্ঠে চণ্ডালিকার রূপ দান ক'রেছেন। উচ্চারণের গভীরতায়, ভাষার ঝংকারে ও ভাবের মাধুর্য্যে এইচ্-এম্-ভি প্রকাশিত গীতিনাট্য চণ্ডালিকার রেকর্ড-নাটক সত্যই একটি অমূল্য সম্পদ।

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় অনূদিত উপন্যাস "মনোযাত্রণ"—২৲

ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "শারদ যৌবন"—২।০

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত ডিটেকটিভ উপন্যাস "দস্যুরাজের কীর্ত্তি"—১৲, "দস্যুরাজের চক্রান্ত"—১৲

শৈলেন্দ্রনাথ গুহ প্রণীত উপন্যাস "হারাণীপুর"—২।০

শ্রীসুধীর গুপ্ত প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "অনাবৃত"—১৸০

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "নবদুর্গা"—৲

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসুমল্লিক প্রণীত "কৃষ্ণা"—২।০

ডাঃ সুরেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত "আনন্দ মঠ"—১৲, "দেবীচৌধুরাণী"—১৲

শ্রীবেণুগোপাল সরকার সম্পাদিত "ধর্ম্ম-পীঠিতা" (১৩৩৩)—২৲

মহর্ষি যোগানন্দ হংস প্রণীত "Mystery of Man"—১৷০

হালিসহর দেবী প্রণীত রহস্যোপন্যাস "রাজকুমার, জাগো !"—১৲

শ্রীপ্রবাধ মিত্রোপ্তি প্রণীত উপন্যাস "বিষ্ণু ও কাপালিক"—১৷০

হেমেন্দ্রবিজয় সেন প্রণীত ডিটেকটিভ উপন্যাস "ডিভোর্সড্ ওয়াইফ"—১৷০

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত "যখী হেসে যায়"—২৲, "বিপ্লবীর বধূ"—২৲

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ সাহা প্রণীত জীবনী-গ্রন্থ "নেতাজী সুভাষচন্দ্র"—৸০, "আচার্য্য জগদীশচন্দ্র"—৸০

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বেদান্তপুরাণ জ্যোতিস্তীর্থ ও শ্রীসুকৃষ্ণ ধর্ম্মাচার্য্য সম্পাদিত "শ্রীমদ্ভাগবতম্" (দশমস্কন্ধ—প্রথমখণ্ড)—১৷০

সুবীল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "অগ্নিযুগের অগ্নিকথা"—৲

অধ্যাপক শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত প্রণীত অলঙ্কার গ্রন্থ "কাব্যশ্রী"—৸০

"পরব" রচিত রহস্যোপন্যাস "মৃত্যু পরের"—১৷০

শ্রীযামাপদ ঘোষ প্রণীত উপন্যাস "যাদের করেছো অপমান"—২৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

ভাদ্র—১৩৫৩

প্রথম খণ্ড | সপ্তত্রিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

ভারতে ভেষজ উদ্ভিদ্

শ্রীসত্যপ্রসন্ন সেন

মানব জাতি যেদিন হইতে খাদ্য হিসাবে উদ্ভিদের ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে শারীরিক অসুস্থতায় অপর কতকগুলি উদ্ভিদ্ যে ক্রিয়াসম্পন্ন তাহাও তাহারা যে প্রায় সেই সময় হইতেই লক্ষ্য করিয়াছে এরূপ ধারণা খুব ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে হয় না। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আদিম মানব ঔষধরূপে ব্যবহৃত উদ্ভিদের সহিত আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করে। এই পরিচয় হইয়াছিল কতকটা প্রয়াসসাধ্য, আবার কতকটা স্বভাবলব্ধ। সাপ এবং নেউলের লড়াইতে নেউল সর্পাহত হইয়াই সন্নিহিত জঙ্গলে প্রবেশ করে এবং ঔষধ আহরণ করিয়া আসিয়া আবার সাপের সঙ্গে লড়াই চালাইতে থাকে। ইহা স্বভাব-লব্ধ। যাহা জন্তু-জানোয়ারের পক্ষে সত্য, তাহা মানব জাতির পক্ষে অধিকতর সত্য কেনই বা না হইবে? ভগবান্ রোগ দিয়াছেন এখানে, আর তার উপশমের পন্থা রাখিয়াছেন সাত সমুদ্র তের নদীর পারে—ইহা অভাবনীয়। মানব জাতি স্মরণাতীত কাল হইতেই রোগাক্রান্ত হইলে নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে বনৌষধি গ্রহণ করিয়া রোগের সঙ্গে লড়াই করিয়াছে এবং রোগকে পরাজিত করিয়াছে। পৌরাণিক গ্রন্থে এরূপ বহু দৃষ্টান্ত মেলে। চ্যবন মুনি বনৌষধির প্রভাবে নব যৌবন লাভ করিলেন, লক্ষ্মণ শক্তিশেল বিদ্ধ হইয়া বনৌষধির গুণে মৃত-প্রায় অবস্থা হইতে তেজোময় পুনর্জীবন লাভ করিলেন। ক্রমে সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রোগের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ হইল। ভিষগাচার্যগণ এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নানা প্রকার গবেষণা দ্বারা তাহাদের প্রতিষেধকও আবিষ্কার করিতে লাগিলেন। ইহারই ফল বোধ হয় আয়ুর্বেদ। পরে বৈদেশিক সভ্যতার আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক

রোগ এবং তাহার প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক আসিতে আরম্ভ করিল বিদেশ হইতে। দেশবাসী ধীরে ধীরে ভুলিয়া যাইতে লাগিল দেশীয় ঔষধের গুণাবলী, আর বিদেশী বিশেষজ্ঞগণ মুগ্ধ হইতে লাগিলেন ভারতীয় বন সমৃদ্ধিতে।

যদিও হিন্দু ভিষগাচার্যগণই সর্বপ্রথম বনৌষধি সম্বন্ধে পারদর্শিতা প্রকাশ করিয়াছেন তথাপি একথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে কালক্রমে নব্য রসায়নের উৎপত্তি ও তাহার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণই ঔষধরূপে ব্যবহৃত বহু উদ্ভিদের সক্রিয় উপাদান আবিষ্কার করেন এবং তাহাদের সঠিক গুণাগুণ নির্ণয় করেন। মরফিন, কুইনিন, ক্যাফিন, নিকোটিন প্রভৃতি দুই চারিটি বস্তুর উল্লেখ করিলেই একথার যাথার্থ্য বুঝা যাইবে। এই সব অদ্ভুত গুণসম্পন্ন বনজাত দ্রব্য সেই কারণেই বহু পরিমাণে বিদেশে সামান্য মূল্যে চালান হইতে আরম্ভ করিল এবং পরে তাহাদেরই সক্রিয় অংশ বহু মূল্যে আবার এ দেশে ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

আমাদের দেশে নব্য-রসায়নের আলো আসিয়াছে অনেক পরে এবং সে আলোও তত তীব্র নয়—যাহার সাহায্যে আমরা আমাদের দেশীয় গাছ-গাছড়ার সক্রিয় উপাদান আবিষ্কার পূর্বক তাহা দেশের জনগণের ব্যাধি প্রতিষেধক রূপে ব্যবহার করিতে পারি। এ দেশের ঔষধরূপে ব্যবহৃত বহু গাছ-গাছড়ার সুপরিকল্পিত অনুসন্ধান প্রথম পাশ্চাত্য মনীষীগণই আরম্ভ করিল এ কথা সত্য, তাহা সত্ত্বেও কিন্তু পরে কর্ণেল বামনদাস বসু, ডাঃ কার্তিকচন্দ্র বসু ও তৎপরে স্যার রামনাথ চোপরা, ডাঃ বি, এন্, ঘোষ ও তাঁহাদের গুণী শিষ্যগণের সাধনায় আমাদের শাস্ত্রোক্ত গাছ গাছড়ার গুণাগুণ নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে।

বনজদ্রব্যের সক্রিয় উপাদান নির্ণয়ে যদিও আমাদের দেশ যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছেন তাহা সত্ত্বেও গাছ-গাছড়ার প্রকৃত রূপ নির্ণয়ে আমরা সামান্যই অগ্রসর হইতে পারিয়াছি। একটা দৃষ্টান্ত দেখা যাক। অর্জুনের ছাল পরীক্ষা করিয়া ট্রপিক্যাল স্কুল দেখিলেন উহার ঔষধ বিষয়ক কোন গুণই বিদ্যমান নাই—কিন্তু আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজ দেখিলেন হৃদ্-যন্ত্রের শক্তিবর্ধক হিসাবে উহার গুণ অপরিমেয়। এরূপ বিভিন্ন ফল লাভের কারণ কি? অর্জুন বৃক্ষ অনেক প্রকারের আছে, সবগুলিই ঔষধ-গুণ বিশিষ্ট নয়। শাস্ত্রোক্ত অর্জুনের ছাল পাওয়া গেলেই তাহা গুণ দর্শাইবে। কিন্তু প্রকৃত রূপ নির্ণয় সহজসাধ্য নয়।

বনজাত ঐশ্বর্যের রূপ নির্ণয়ে আমরা এখনও উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখাইতে পারি নাই। রসায়নশাস্ত্র এবং উদ্ভিদ্ বিদ্যায় আরও অতি আধুনিক জ্ঞান লাভ না করিতে পারিলে এক্ষেত্রে প্রকৃত সাফল্য অর্জন করিতে আমরা পারিব না বলিয়াই আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং তাহার ফলে ভারতীয় গাছগাছড়ার যে সুনাম দেশে বিদেশে ছড়াইয়া আছে তাহা অচিরে বিনষ্ট হইবে। এখনই দেখিতে পাওয়া যায়, বহু গাছগাছড়া যে নামে বিদেশে চালান হইতেছে তাহা ঠিক সেই জিনিষ নয় বলিয়া তাহা আবার এ দেশে ফিরিয়া আসিতেছে। ইহাতে অর্থনষ্ট ও সুনাম নষ্ট কেবল গাছ-গাছড়ারই নয়—দেশেরও।

আমাদের দেশের ঔষধরূপে ব্যবহৃত প্রকৃত উদ্ভিদের চাষ, সংগ্রহ ও সংরক্ষণের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনার বিষয় সম্বন্ধে সামান্য অনুধাবন করিলেই তাহার সবিশেষ প্রয়োজনীয়তা পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

'যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তা' আছে এ ভাণ্ডে' বলিয়া একটি আধ্যাত্মিক কথা আছে। ঈষৎ পরিবর্তন করিয়া 'যা আছে জগতে তা' আছে ভারতে'—উদ্ভিদের বেলায় একথা সর্বাপেক্ষা বেশী প্রযোজ্য; কারণ বিশাল এই ভারতবর্ষে বহু বিচিত্র জল হাওয়ার দরুণ পৃথিবীর যে কোনও মণ্ডলের উদ্ভিদ এখানে দেখিতে পাওয়া যায় বা অপর দেশ হইতে আনীত যে কোনও উদ্ভিদ এ দেশে জন্মান সম্ভবপর।

গত কয়েক বৎসর হইতে ভারতীয় কৃষি গবেষণা সমিতির অন্তর্ভুক্ত 'ভৈষজ উদ্ভিদ কমিটি' এদিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন। পূর্বেই বলিয়াছি ভারতীয় গাছ-গাছড়া যে কেবল মাত্র এ দেশে ঔষধ প্রস্তুত করণেই ব্যবহৃত হয় তাহা নহে, পরন্তু বহু লক্ষ টাকার এই জাতীয় কাঁচা মাল প্রতি বৎসর বিদেশে রপ্তানি হয় এবং ইহা হইতে রাজ সরকারের একটি মোটা রকমের আয় হইয়া থাকে। আমাদের দেশীয় গাছগাছড়ার ব্যবসা সাধারণতঃ অজ্ঞ লোকের হাতে এবং এখনও বহু উদ্ভিদের সঠিক ক্রিয়া উদ্ঘাটিত এবং প্রকৃত রূপ সম্যক নির্ণীত না হওয়ায় গাছ-গাছড়া সংক্রান্ত ব্যবসা এখনও প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। প্রাগুক্ত কমিটি ঔষধ প্রস্তুত

করে অপরিহার্য্য এই সকল গাছ গাছড়া সংগ্রহ, তাহাদের শ্রেণী বিভাগ এবং একটি সাধারণগ্রাহ্য মানদণ্ড স্থির করিয়া দিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন। অনেকেই অবগত আছেন যে বৃটিশ ও মার্কিণ ফারমাকোপিয়া বা ঔষধ-পঞ্জীতে যত প্রকার উদ্ভিদের এবং উদ্ভিদ-জাত ঔষধের বর্ণনা আছে তাহার প্রায় তিন চতুর্থাংশই আমাদের দেশে উৎপন্ন করা যাইতে পারে। ইহার কারণ ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কমিটি এ সব বিষয়েও তত্ত্ব সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

গাছ গাছড়া বিদেশে চালান দেওয়ায় সরকারের রাজকোষে যথেষ্ট অর্থাগম হয়। গত যুদ্ধের পর বিদেশে আমাদের গাছগাছড়ার চাহিদা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়, কিন্তু হঠাৎ আবার রপ্তানীর ব্যবসায়ে বেশ কতকটা মন্দা পড়িয়া গেল। ইহার কারণ পরম্পরার মধ্যে দেখা যায় যে, যে সব গাছড়া বিদেশে চালান দেওয়া হয় তাহা এক প্রকার সমগুণসম্পন্ন থাকে না। ইহাতে ব্যবসায় সংক্রান্ত পূর্ববর্ণিত অর্থাগমই যে ব্যাহত হয় তাহা নহে, পরন্তু ঔষধ প্রস্তুত শিল্প ইহাতে ক্ষতিগ্রস্থ হইবারও সম্ভাবনা। ইহা সম্যক অনুধাবন করিয়াই এই কমিটি সুদৃঢ় অভিমত প্রকাশ করিতেছেন, যাহাতে ভারত সরকার জরুরি ব্যবস্থা অবলম্বন পূর্বক গাছড়া সম্বন্ধে যে সব দোষ ত্রুটির উল্লেখ করা হইল সে গুলির মূলোচ্ছেদ করেন। ভারতীয় কৃষি গবেষণা সমিতির অধীনে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেও এই কমিটি অনুমোদন করিতেছেন। যদিও দেশীয় গাছগাছড়ার গুণাগুণ নিয়ন্ত্রিত করা এবং তদ্বারা ভারতীয় ঔষধ শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গাছড়া সংক্রান্ত বৈদেশিক বাণিজ্যের পথ সুগম করা এই কমিটির প্রধান এবং প্রথম কর্তব্য হইবে তাহা হইলেও কি করিয়া বিদেশজাত উদ্ভিদ্ আমাদের দেশে জন্মান যায় এবং আমাদের দেশীয় উদ্ভিদের গুণ আরও বৃদ্ধি করান যায় সে সম্বন্ধে অনুধাবন করাও এই কমিটির অন্যতম বিশেষ কাজ হইবে।

অনেকেই অবগত আছেন যে প্রগতিশীল অনেক দেশেই এমন কি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও এইরূপ প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। এই সব স্থানে ফেডারাল সিকিউরিটি এজেন্সীর খাদ্য, গাছড়া এবং কীটনাশক দ্রব্যের বিভাগ আইনের সাহায্যে সমস্ত রপ্তানির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ করিয়া থাকেন। ভারত সরকারের কমিটির উদ্দেশ্যও এইরূপ যে সংশ্লিষ্ট ব্যবসাগুলির উন্নতিকল্পে এবং ভারতীয় উদ্ভিদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ভারতীয় কৃষি গবেষণা সমিতির অন্তর্ভুক্ত 'ঔষধ গাছের কমিটি' কর্তৃক এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান অগৌণে স্থাপিত হওয়া উচিত। বটানিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া, কেন্দ্রীয় ঔষধ গবেষণাগার, শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণা সমিতি, ভারতীয় কৃষি গবেষণাগার প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলিও নিজ নিজ বিভাগে কাঁচা মালের মান নির্ধারণ কার্য্যে মনোযোগ দিতে পারেন। ভারতীয় ভেষজ শিল্পে ব্যবহৃত এবং বিদেশে রপ্তানীযোগ্য ঔষধ-গুণসম্পন্ন ভারতীয় গাছগাছড়ার যোগ্যমান ও সুনাম নির্ধারণের একটি উপযুক্ত শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া দেশের কল্যাণ সাধনে সরকার ও জনগণের অনতিবিলম্বে তৎপর হওয়া উচিত।

কয়েদী

শ্রীসুলতা নাগ

অতি সন্তর্পণে ফিসফিসানি চলছে। সাময়িক মুক্তির আনন্দে উৎফুল্ল কয়েকজন কয়েদী। কারা প্রাচীরের বন্ধ আবহাওয়ার বাইরের মুক্ত আলো বাতাস যাদের কাছে শুধুই কল্পনার বস্তু।

"খোলা বাতাসটা কি মিষ্টিরে ভাই!" তিনমাসের বন্দী পকেটমারের অনুভূতি।

"প্রথম যেদিন জেলে ঢুকি সেদিন তো নজর করিনি। বাঃ কি সুন্দর সামনের এ মাঠটা। ছাড়া পাবার পর এ লাল রাস্তাটা দিয়ে একদিন হেঁটে বেড়াতেই হবে ঐ লোকগুলার মত", খুসীতে ঝলমল করে উঠে ঘণ্ডিত ডাকাতের মুখ, যেন সে জীবনের লক্ষ্য খুঁজে পেয়েছে, ছ'মাস ধরে লোহার বেড়ির ঘসায় হাতে পায়ে কড়া পড়ে যাবার পরে।

"কত বেলা হলরে, তবু কি শীত! ভাগ্যিস্ পুকুরটার জল সরাতে হবে। নইলে কার বাবার সাধ্যি এ শীতে রোদ পোহায়?' মনের আনন্দে এককলি গানই গেয়ে উঠল—প্রায় বৎসর পূর্ণ হয়ে এল যার জেলের বন্ধ হাওয়ায়।

আরও কয়েকজন কথায় যোগ দিতে চায়।

"এই, এই কি করছিস তোরা! চুপ কর। ঐ বেটা ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে। বুঝবি এক্ষুণি গল্প করার মজা।" সাবধান করে দেয় এর মাঝেই একজন। পাহারাওয়ালার দৃষ্টিকে কিন্তু তবু এড়াতে পারে না।

"হেই উল্লুক। ক্যায়া করতা তুম লোক? লাইনমে ঠিকসে ঠার, আউর জোরসে পাইপ-পাকড়ো।" কর্কশ কণ্ঠে আদেশ জারী করে হাতের উদ্যত লিকলিকে বেত আস্ফালন করতে করতে এগিয়ে আসে খাকী-পোষাক-পরা যমদূতের মত পাহারাওয়ালা। সঙ্গে সঙ্গে সব কয়জন কয়েদী আপন আপন কাজে অত্যন্ত মনোযোগী হয়ে উঠে। রহমান গল্প করেনি। কাজ করছিল মন দিয়ে, পাইপ তার হাত থেকে একটুও নড়েনি। শুধু সে তাকিয়েছিল পিছন দিকে, যে দিক থেকে দলে দলে ছেলেমেয়ে বই, খাতা, শ্লেট, ছোট ছোট বাক্স বা ব্যাগ নিয়ে স্কুলের দিকে ছুটছিল। নিজেদের মধ্যে কত রকমের গল্পই না জানি করে ওরা। রহমান ওদের দেখে আসছে আজ তিনদিন ধরে। ঐ পুকুরটার কাছে এসে দমকলের মেসিনটা একটু মনোযোগের সঙ্গে নজর করে ছেলেমেয়েগুলো। ঘট, ঘট, ঘটাং ঘটাং করে কী বিশ্রী শব্দই না করে ঐ মেসিনটা। রহমানের কানে তালা ধরে যায় যেন। তবুও ওরা ওখানে দাঁড়াবেই। এখান থেকে গিয়ে আবার দাঁড়ায় যে জায়গায় পাইপ কয়টা দিয়ে ভস্ ভস্ করে জল বেরিয়ে নালাগুলো ভরে দিচ্ছে।

রাস্তায় কিছু জল দাঁড়িয়ে গেছে একটা পাইপের, ওরা সবাই ইচ্ছে করেই ঐ জল মাড়িয়ে চলেছে। বেশ লাগে ওদের দেখতে। কেমন মুক্ত, রুচি প্রাণী সব, হাতের ছোট কাঠির মত একটা কী জিনিষ দিয়ে প্রায় সবাই রাস্তার পাশের গাছগুলোতে অথবা লাইটপোষ্ট গুলোতে দু' এক ঘা লাগাবেই। বড় হয়ে সব কয়েদী পিটুনে পাহারাওয়ালা হবে নাকি? রহমানের হাসি পায় হঠাৎ।

আর দেখা হলনা তার। বেতের ঘা এক সঙ্গে তিন চারটা পিঠে পড়ায় শিরদাড়াটা ব্যথায় টনটন করে উঠল। অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে উঠলো যাতনায়। পিঠে বাঁ হাতটা একটু বুলিয়ে নিল। পিঠটা যেন বেঁকে গেছে। একটু জিরিয়ে হাঁপ নিতে চল তার। পাহারাওয়ালা দূরে চলে গেছে। তবুও সে মুখ ফিরিয়ে দুহাতে পাইপটা ধরে দাঁড়াল। বেতের ঘায়ের অভিজ্ঞতা তার আটমাসের কয়েদী-জীবনে বেশ অর্জন হয়েছে। এখন আর তত কষ্ট হয় না।

মনটা বড় দমে গেল তার। এক্ষুণি নিশ্চয়ই আসবে সেই মেয়েটি—যাকে একটু ভাল করে' আজ সে দেখবে আশা করছিল। এখন যে ভাবে দাঁড়িয়েছে তাতে মেয়েটির পিছন দিকটা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাবে না। তবে তবে একটু ঘাড় ফেরায়। নাঃ, ঐতো বেটা ভাঁটার মত দুই চোখ কটমটিয়ে তাকিয়ে আছে। গত দুদিন তো কত ঘুরে ছিল সে রাস্তা থেকে। ভাল করে দেখতে পারেনি।

খট্-খট্-খট্-খট্…

কিসের শব্দ পিছনে? নিশ্চয়ই সেই মেয়েটির জুতার। নাঃ, এত জোরে কি মেয়েমানুষ হাঁটতে পারে? ঐতো মাটীতে ছাতার ছায়া। হতেও তো পারে—তাড়াতাড়ি যাবার তাগিদে মেয়েটি একটু জোরেই হাঁটছে। এসে পড়ল তাহলে। মন তার দুলে উঠে।

ছাতা হাতে একটি ছেলে চলে গেল তার সামনে দিয়ে। আজ আর এল না তাহলে সেই মেয়েটি। বাপায় তার মনটা টন্ টন্ করে ওঠে যেন। সারাদিন এভাবে কঠোর পরিশ্রম করবে ভাবতেও পারে না। সকাল ছয়টা থেকে এতক্ষণ কি খাটুনি খাটছিল সে? মনে তো হয়নি এত পরিশ্রম সে করেছে।

রাস্তার ভীড় ক্রমে কমে আসে। স্কুলে যাবার সময় চলে যাচ্ছে। এখনও যাচ্ছে কেউ কেউ। খুব তাড়াতাড়ি চলেছে তারা। একটি দশ বার বছরের ছেলে এক গাদা বই আর খাতা নিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে। বড় মায়া হয় রহমানের। কেন এত দেরী করল, আর কেনই বা দৌড়াচ্ছে। একটু আগে এলে তো এত ছুটতে হত না। "আ হা হা হা হা" রহমানের মুখে সমবেদনার সুর। রাস্তার পাইপটা নজর করেনি ছেলেটি। ধাক্কা লেগে পড়েই গেছে। রাস্তার জমাট জল ও কাঁদামাটি লেগে তার অমন সুন্দর জামা কাপড় নষ্ট হয়ে গেছে। বই ও খাতাগুলো ছিটকে এদিক ওদিক ছড়িয়ে গেছে। এদিককার কয়েকটা কয়েদি একটু চাপা হাসি হেসে উঠল। বলেই উঠল একজন—"হুঃ হুঃ বাছাধন, আমরা করি জলে কাঁদায় কাজ, আর তুমি ফুলবাবুটী সেজে রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে! বেশ আক্কেল হয়েছে?" রহমানের পিত্ত জ্বলে উঠে। ছেলেটির জন্যে তার অত্যন্ত মায়া হয়। ততক্ষণে ছেলেটি তার বইখাতাগুলো গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর উল্টোপথে ফিরে চলল।

আরে ঐতো ছোট ছাতা মাথায়, উঁচু গোড়ালিওয়ালা জুতা পায়ে সুন্দর করে শাড়ী পরা মেয়েটি চলে যাচ্ছে। বেশ দূরে চলে গিয়েছে। ছেলেটি পড়ে যাওয়ায় সে এতক্ষণ মোটেই নজর করেনি। খুব তাড়াতাড়ি চলেছে মেয়েটি। অনেক দেরী হয়েছে কিনা তাই। চেয়ে রইল সে মেয়েটির চলে যাওয়ার দিকে। তাড়াতাড়িতে তার চুলের খোঁপা খুলে গিয়ে বেণী ঝুলে পড়েছে। হঠাৎ মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়ল। পিছন ফিরে হাত দিয়ে কাকে যেন ডাকছে সে? মুখও তো নড়ছে। কিছু বলছে নাকি? রহমানকে কিছু বলছে? তাইতো মনে হয়। আবার হাতছানি দিয়ে ডাকছে ও। রহমান স্বপ্ন দেখছে না তো? আবার ভাল করে তাকায় সে। না, না, ঐ তো আর দুটি ছোট মেয়ে দৌড়ে গিয়ে বড়টির সঙ্গ নিল। এদেরই ডাকছিল তাহলে। এরাও কি ওর সঙ্গে রোজ যায়? যায় হয়ত, ওরা। রহমান লক্ষ্য করে নি। চলে গেল মেয়েটি দৃষ্টির বাইরে।

রহমানের হাসি পায় নিজের নির্বুদ্ধিতায়। কি করে সে ভাবে, মেয়েটি তাকেই ডাকছিল? তাকে ডাকবে কেন? সেতো একটা জেলখানার কয়েদী। নিজের সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে উঠে হঠাৎ। আর তার কোনও দিকে তাকাবার দরকার নেই। কিন্তু মনটা তার স্থির হয় না কেন? কেবলই ঐ মেয়েটির কথা মনে পড়ে। আচ্ছা এত বড় মেয়ে কী স্কুলে পড়ে? কি করতে এপথ দিয়ে রোজ এ সময়ে যায়? ফিরেও আসে নিশ্চয়ই এ পথ দিয়েই। তিনটের আগেইতো তাদের পুকুরের কাজ শেষ হয়ে যায়।

সে এদিক ওদিক তাকায়। তারপর পাশের লোকটিকে হাত দিয়ে একটু ধাক্কা দেয়। চাপা গলায় জিজ্ঞেস করে "আজ কতক্ষণ কাজ হবে জান?"

"সন্ধ্যে পর্য্যন্ত" অত্যন্ত শুকনো গলায় বলে লোকটি, "জেলার বাবু কেরাণীবাবুকে বলেছিলেন শুনেছি। আর দুদিনের ভেতর সব জল সরাতে হবে।"

সব কথা রহমানের কানে যায় না। মনটা তার খুশীতে ভরে যায়। সন্ধ্যের আগে মেয়েটি এদিকেই ফিরে যাবে। দেখতে হবে একটু ভাল করে। আচ্ছা মেয়েটি কি কোথাও চাকরী করে নাকি? শুনেছে সে—আজকাল সহরে মেয়েরাও পুরুষের মত চাকরী করে। কিন্তু চাকরী কেন করে এ মেয়েটি? তার কি ঘরে কেউ নেই টাকা রোজগার করবার? ওর বিয়ে হয়েছে কি? মাথায়তো ঘোমটা দেয় না। চাকরী যারা করে তারা কি আর ঘোমটা দেবে? আর হিঁদুর মেয়েরাতো বোরখা পরেই না। রহমান ভাবতে থাকে। কি হয় বোরখা

পরে? তাদের মেয়েদের যেন এক একটা ভূতের মত দেখা যায়। এই যে মেয়েটি এ ভাবে চলে, তাতে কি হয়? সে মনে মনে স্থির করে ফেলে—জেল থেকে বেরিয়ে রহিমাকে কখনও বোরখা পরতে দেবে না। তার বৌকে সে ইচ্ছামত চালাবে।

বেলা বেড়ে যায়। রাস্তাটা ক্রমে জনশূন্য হয়ে আসে। কয়েদীরা কাজ চালায়।

মাঝে দুদিন মেয়েটি যায়নি। ঐ দুদিন দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় মন তার ভরে ছিল। নিশ্চয়ই কোন অসুখ করেছিল তার। কি অসুখ কে জানে? হয়তো খুব কষ্ট হয়েছে। ঘরে লোক আছে কি তার? হয়তো নেই। নইলে কি আর চাকরী করে? সে আল্লার কাছে কত প্রার্থনা জানিয়েছে যেন মেয়েটি ভাল হয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি। তার প্রার্থনার জোর আছে। তারপর দিনই মেয়েটি চলে আসে আবার এ পথ দিয়ে। বেশ কাহিল চেহারা। রহমানের মনটা মমতায় ভরে উঠে। যাক্, ভালো ভাল হয়ে গিয়েছে তাড়াতাড়ি।

মেয়েটির সঙ্গে মাঝে মাঝে অনেক মোটা মোটা বই এক হাতে, আর অন্যহাতে তার ছোট ছাতাটা নিয়ে একটা লোককে যেতে দেখে। হয়তো লোকটা তারই অফিসের চাকর। একদিন কি যেন কাজের কথা বলছিল মেয়েটি ও কে। রহমান শুনেছে, বলছে মেয়েটি "...বুঝলে তো। ঠিক ঠিক ভাবে করবে সব। ভুল হয় না যেন।" লোকটি ঘাড় নেড়ে বললো "আজ্ঞে আচ্ছা"...তারপর তাদের কথা আর শুনা যায়নি। রাত্রিতে ভাবে সে ঐ লোকটার কথা, লোকটা বোধ হয় কেবল ভুলই করে কাজে। কেন করে? ঐ মেয়েটির কথা অমান্য করতে পারে কেউ? হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে তার। লোকটা নিশ্চয়ই ঠিক কাজ করে না। চলে যাবে একদিন তার চাকুরী। তারপর নতুন লোক লাগবে তো!

রহমান যাবে ঐ মেয়েটির কাছে চাকরীর জন্যে। দিয়ে দেবে মেয়েটি তাকে ঐ চাকরীটা। যার জন্যে সে এত কষ্ট পায়, তার মনে কি কোন সাড়া পড়ে না? চাকরী পেলে দেখিয়ে দেবে কাজকরা কাকে বলে।

শেষরাত্রে একটা বড় সুন্দর স্বপ্ন দেখে সে। চাকরী সে পেয়েছে মেয়েটির কাছে। মেয়েটীর সঙ্গে কোথায় যেন চলেছে। স্বপ্নটা শেষ হয় নি। জেলের ঘণ্টা বেজে ওঠে এর মধ্যেই। ধড়ফড়িয়ে উঠে সে। অন্যদের সঙ্গে লাইন দিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে আসে পুকুরের কাজে।

বেলা বেড়ে চলে। রোদে দাঁড়িয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি ফেলছে সে পুকুরের পাড়ে। মোটেই তার কষ্ট হচ্ছে না। রাস্তাটা একেবারে কাছে। তার সন্ধানী চোখ পড়ে আছে সেদিকেই। ঐ তো আসছে। সাদা ধবধবে শাড়ী। পাড়টা তো বড় সুন্দর। ছাতাটা না খুলে হাতে ঝুলিয়ে নিয়েছে। রোদের তেজ মোটেই নেই কিনা তাই। আজ বেশ আস্তে আস্তে আসছে, বেশ ভাল হয়েছে। অনেকক্ষণ দেখতে পাবে। যে ভাবে মাটি ফেলছে তাতে মেয়েটীর কাপড়ে গিয়ে ছিটকে পড়বে না তো! খুব আস্তে আস্তে ঝুড়ি থেকে মাটি ফেলতে থাকে সে। একটু দাঁড়িয়ে দেখতে পারবে কি? পাহারা-ওয়ালাটা আবার কোথায়? নাঃ ঐতো অনেক দূরে বেত দেখিয়ে কাকে ধমকাচ্ছে। চেয়ে থাকে সে একদৃষ্টে। মেয়েটি তার কাছে এসে গেছে। জুতোর গোড়ালিটা কত উঁচু। কি করে হাটছে? উল্টে পড়ে যাবে না তো?

হঠাৎ তার কানে আসে—"দিদি, দিদি, চেয়ে দেখ, একটা চোর কেমন করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।"

চমকে উঠে সে। একটি ছোট মেয়ে ঐ মেয়েটির হাত ধরে তাকেই দেখিয়ে দিচ্ছে। মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়েছে। দেখে রহমান চেয়ে। মেয়েটি কপাল কুঁচকে তার দিকে তীব্রদৃষ্টিতে তাকায়। মুহূর্তের মধ্যেই আবার তারা নিজের পথে চলতে থাকে। রহমান তাড়াতাড়ি খালি ঝুড়ি হাতে তুলে নেয়। আর তাকাতে পারে না সে ওদের দিকে—সে চোর? এছাড়া আর কোন পরিচয়ই তার কারও কাছে নেই। ঐ মেয়েটি তাকে শুধু চোরই ভাবে? আবার তাকায় সে সামনের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে। ঐ দূরে মেয়েটি। না আর দেখবে না সে। কেন দেখবে? কেন চিন্তা করবে যারা তাকে কেবল ঘৃণাই করে তাদের সম্বন্ধে? কি ছিল মেয়েটির ঐ দৃষ্টিতে? ঘৃণা আর অবহেলাই নয় কি? সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় ঐ মেয়েটির

সম্বন্ধে এতদিন সে কত সুন্দর সুন্দর চিন্তাই না করেছে! একবারও তো মনে পড়েনি সে মেয়েটি তাকে চোর ভাববে? এত পরিশ্রম করছে সে, তবুও তার চোর নাম ঘুচবে না? মেয়েটির কাছে সে অনায়াসে দোষ স্বীকার করতে পারত। ক্ষমা চাইতে পারত পায়ে ধরে। বলতে পারত, জীবনে আর কোন অপরাধ সে করবে না। এই যে ডোরাকাটা কম্বলটা তার ছিঁড়ে গেছে, এটাতো আজই সেলাই করে নিতে হবে। সেলাই করলেতো আর ছেঁড়া বলবে না কেউ। কিন্তু এ আট মাস ধরে জেলের ভিতরে এত হাড়-ভাঙা খাটুনী কি তার জীবনের ছেঁড়াটুকুকে একটুও জোড়া দিতে পারল না?

ভাবতে ভাবতে কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল নেই। পাহারাওয়ালা লাফিয়ে আসে চেঁচাতে চেঁচাতে "হেই নবাবকা বাচ্চা, কাম ফেক্‌কে কিয়া শোচতা তুম? হারাম কা কামাই খাতা?" বেত পড়তে থাকে তার পিঠে, হাতে, পায়ে এক সঙ্গে অনেকগুলি। সত্যিই তো অনেকক্ষণ কাজ সে করেনি। আবার মাটি তুলতে যায়। একি! মাথাটা ঘুরছে কেন? মাটি ভর্তি ঝুড়িটা কিছুতেই মাথায় তুলতে পারছে না যে। পা দুটাও কাঁপছে! তবু জোর করে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে যায়। ঝুড়িটা পড়ে ঠিক তার বুকের উপর।···

রহমান চোখ খুলে তাকায়। কোথায় সে? তার বিছানায়। রাত হয়েছে? নাতো? অল্প অল্প রোদ দেখা যায় বাইরে খোলা জানালাটা দিয়ে। পাশের বিছানায় আর একটা মানুষ শুয়ে আছে। ঐ তো আরও অনেক বিছানা, আস্তে আস্তে মনে পড়ে তার সব কথা। তাহলে জেলখানার হাসপাতালে সে আছে। বুকে বড় ব্যথা। এখন কি সন্ধ্যা হয়ে এসেছে? ঐ রাস্তাটা দিয়ে লোক ফিরছে এখন? ঐ মেয়েটিও ফিরছে কি ছাতাটা নিয়ে? মনটা একটু ভাল লাগে। মেয়েটির ঘৃণামাখা দৃষ্টিতো তার উপর আজ আর পড়বে না। সে চোখ বুজে থাকে। তবুও ভাবে মেয়েটি হয়তো এখন সত্যিই ফিরছে ঐ পথ দিয়ে। একবার কি সে তার কথা ভাববে? ভাববে কি যাবার সময়—যে একটা লোক—না-না—যে চোরটা এখানে কাজ করছিল আর আমাদের দিকে তাকিয়েছিল এখন তো এখানে নেই। এখন গেল কোথায় সেই চোরটা? ভাববে কি মেয়েটি একথা একবার?

রবীন্দ্রসাহিত্যে কর্ম্মের আহ্বান

শ্রীঅভয়চরণ দে

উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয় জীবনের নানা দিকে যখন বিভিন্ন প্রতিভাশালী মহামনীষার অভ্যুদয়, তখন বহু মনীষার মাঝে অন্যতম রবীন্দ্রনাথও এক অলৌকিক প্রতিভা নিয়ে ধরণীর পুরোহিত রূপে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই প্রতিভা কোন বিষয় বিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমুখী ও বিশ্বতোগামী। তিনি ছিলেন কবি। কিন্তু এই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। তাঁর বাণী ও উপলব্ধিকে তিনি কর্ম্মের মধ্যে জীবনের মধ্যে রূপায়িত ক'রবার জন্য সচেতন ছিলেন। বস্তুত তাঁর এই কর্ম্মপ্রেরক আদর্শ গীতার কর্ম্মযোগের আদর্শেরই প্রভাব। তিনি নানা ছন্দে নানা ভাবে গীতার কর্ম্মযোগের জয়গান গেয়েছেন—তাঁর কবিতায়, গানে, প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় গীতার কর্ম্মযোগের ইঙ্গিত স্পষ্টরূপে মূর্ত হ'য়ে উঠেছে।

গীতায় আমরা দেখতে পাই, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যখন অর্জ্জুন মোহে কাতর হ'য়ে পড়লেন তখন শ্রীভগবান তাঁকে যুদ্ধে উৎসাহিত ক'রলেন এই বলে—

> ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
> ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।

হে পার্থ! কাতর হ'য়ো না, ইহা তোমার উপযুক্ত নয়। এই ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ত্যাগ ক'রে ওঠ।

রবীন্দ্রনাথও মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি ক'রেছিলেন, জীবন-সংগ্রামে জড়ের মত, দুর্ব্বলের মত, লোকচক্ষুহীনের মত নিশ্চেষ্ট ভাবে বসে থাকলে চলবে না। জীবনের ক্ষুদ্র লাভ লোকসানের ও আত্মকৃপার রূপে বন্দীভূত হ'লে চলবে না। তাই কবি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেন—

এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পায়ের ধুলায়
ধ্যানাতে আসুক নব নব
আঘাত খেয়ে অচল রব।

পৃথিবী কর্মময়, সমগ্র পৃথিবী এক কাজের তাড়নায় নিজেকে পরিচালিত ক'রছে। এই বিশাল কর্মপ্রবাহে অর্জুনের ওপর যে মহান ভারবহ কর্মের ভার অর্পিত আছে, সেই কর্ম না ক'রে অর্জুন কি ক'রে মুক্তি লাভ ক'রবেন, যখন 'ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ' —কেহ ক্ষণকাল কর্ম না ক'রে থাকতে পারে না।

কবি ও কর্ম না ক'রবার যে বোঝা তা ত্যাগ ক'রে সকলকে আহ্বান জানালেন; কারণ এই বিশ্ব যে 'কর্মধাম,' এই পৃথিবী যে জাগ্রত—

ওরে জাগিতেই হ'বে
এ বীণা প্রভাত কালে, এ জাগ্রত ভবে
এই কর্মধামে।

কবি বিশেষ ভাবে উপলব্ধি ক'রেছেন যে, ভবঘুরে যে কর্মের আহ্বান জানিয়ে ডাকছে তাকে উপেক্ষা ক'রে নিভৃত অন্তরালে অলস উপাসনার মাঝে ভগবানের দর্শন লাভ ঘটে না; কারণ ভগবানের নিজেরই প্রকৃত স্বরূপ বিকশিত হয় কর্মের মধ্য দিয়ে—'বর্ধতে চ, কর্মণি।' ভগবান নিজে যখন কর্ম ক'রছেন তখন মানুষ কি ক'রে কর্ম থেকে অব্যাহতি লাভ ক'রবে? আর কেনই বা মানুষকে শক্তি সম্পদ প্রদান করেছেন যদি না সে ভগবানের নিমিত্ত শক্তি সম্পদ প্রয়োগ করে? যীশু বলেছেন, "তৈর্বত্তান প্রযাচেতো যে তুভ্যং ক্ষেত্রেন এব সঃ"—দেবতাগণের দ্বারা প্রদত্ত শক্তি সম্পদ দেবতাদের নিমিত্ত যে প্রয়োগ না করে সে চোর। গীতার এই ভাব কবিচিত্তকে মুগ্ধ ক'রেছে! সকল মানুষের মাঝে রয়েছেন নারায়ণ, সেই বহু নারায়ণের কল্যাণকামী হ'তে কর্মস্রোতে নিজেদের শক্তিসম্পদ নিয়োগ ক'রতে আহ্বান জানালেন—

তিনি ছেড়েছেন, যেথায় মাটি ভেঙে
ক'রছে চাষা চাষ
পাথর কেটে কাটছে যেথায় পথ
খাটছে বারো মাস
রৌদ্র জলে আছেন সবার সাথে
ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে
তাঁহার মত শুচি বসন ছাড়ি'
আয় রে ধূলার পরে।

যেখানে মানব কর্মক্লান্ত কলেবরে প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রছে তথা মানবের সেবার জন্য, সেখানেই ভগবানের আবির্ভাব এবং ভগবৎ উপাসনার সার্থকতা।

কিন্তু সন্ন্যাসীরা কর্মকে বন্ধনের কারণ বলে কর্মত্যাগ ক'রতে নির্দেশ দিয়েছেন, গীতা 'কর্ম সন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে' কর্মসন্ন্যাস হ'তে কর্মযোগকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ গীতার কর্মযোগের এই আদর্শকে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। তিনি কর্মকে বন্ধনের কারণ বলে বিবেচনা করেন নি. বৈরাগ্যের আদর্শ তাঁর মুক্তি লাভের আদর্শ নয় তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

গীতা বলেছেন, 'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়,' হে অর্জুন, তুমি আসক্তি ত্যাগ করে যোগস্থ কর্ম কর,—এটাই কর্মযোগের মূলকথা ও চরম আদর্শ। কবিও ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্মের আদর্শ প্রচার করেছেন, একস্থানে ভারতমাতাকে সম্বোধন করে বলেছেন—

কর্মীর শিখরে তুমি যোগযুক্তচিতে
সর্বফলাকাঙ্ক্ষা রুদ্ধে দিতে উপহার

কবি মন্ত্রদ্রষ্টা ভারতের সনাতন আদর্শের পরিচয় দিতে গিয়ে নিষ্কাম কর্ম সহ আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়, তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন—

'ভারতবর্ষ মানুষকে সকল করিয়া কর্মকে বড়ো করিয়া তোলে নাই। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্মকে মানুষের চিত্ত হইতে ভাসিয়া ফেলা হয়। এই উপায়ে মানুষ কর্মের উপরেও নিজেকে আয়ত্ত করিবার অবকাশ পায়। ইহাই আমাদের দেশে চরম লক্ষ্য, বাকী উপলক্ষ মাত্র।'

কবির এই কর্মযোগ ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ ক'রে নয়, তিনি মুক্তকণ্ঠে জানিয়ে দিলেন,

ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আমার
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

ইন্দ্রিয়ের দ্বার উন্মুক্ত রেখে রূপ-রস-গন্ধময় ধরণীর যেখানে যত আনন্দ আছে তা আকণ্ঠ পান করতে কবি উদগ্রীব হ'য়েছেন, কারণ জগত আনন্দময়, পৃথিবী আনন্দে পরিপূর্ণ। উপনিষদের ভাষায়—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
আনন্দেনৈব জাতানি জীবন্তি।
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

পৃথিবী আনন্দ হ'তে সৃষ্ট হয়েছে, আনন্দ হ'তে আনন্দে চলেছে। আর এই আনন্দের উৎস হ'লেন সৃষ্টি বিধাতৃ ভগবান। তাই কবি চাইলেন, এই আনন্দের মাঝে ভগবানের আনন্দকে বিশেষভাবে উপলব্ধি ক'রতে। 'জগতের এই রূপের মাঝে অপরূপের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করার সাধনাই কবির মুক্তি লাভের সাধনা। বস্তুতঃ কর্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত রেখে বিষয় বস্তু হ'তে নিজেকে নিবৃত্ত করলেই আত্মসংযম হয় না। গীতা বলেছেন—

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্‌।
ইন্দ্রিয়ার্থান্‌ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥

যে কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত রেখে মনের দ্বারা ভোগ্যবস্তু সকলকে চিন্তা ক'রে সে মিথ্যাচারী। আমার মনে হয় গীতায় ইন্দ্রিয়ের দ্বার বন্ধ রাখবার নির্দ্দেশ কোথাও নাই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু গুলোকে উপভোগ ক'রে ভোগ্যবস্তু সকলের চিন্তা ত্যাগ ক'রে সেই আনন্দময় সচ্চিদানন্দের প্রতি নিজেকে সমর্পণ করতে পারলে জীবনে মোহ আসতে পারে না।

গীতা আরও বলেছেন, কর্ম্ম সাধন করবার সময় যেন অহং ভাব না আসে। আমরা সমস্ত মানবজাতি যন্ত্র, আর ভগবান যন্ত্রী। আমরা নিমিত্তমাত্র। ভগবান সাধকের মন বুদ্ধি যন্ত্ররূপে ব্যবহার করে সকল কর্ত্তব্য নির্ণয় ক'রে নেন। সুতরাং অহং ভাব ত্যাগ ক'রে ভগবান নির্দ্দেশিত কর্ম্ম করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথও কর্ম্মের মাঝে নিজেকে যাতে প্রচার না করেন এবং অহং ভাব যাতে না আসতে পারে তার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানালেন,

আমার মাথা নত ক'রে দাও হে
তোমার চরণ ধূলার তলে
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।
* * *
নিজেরে না যেন করি প্রচার
আমার আপন কাজে
তোমার ইচ্ছা কর হে পূর্ণ
আমার জীবন মাঝে।

এ কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে পাশ্চাত্য জগত যাকে কর্ম্ম বলে, যে কর্ম্মের মহত্তায় সমস্ত আধুনিক জগত মত্ত, রবীন্দ্রনাথ নিজে তাকে 'সাগরদোলার ঘূর্ণী নেশা' বলেছেন। ফলের আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়ে যে কর্ম্ম করা হয় তাই ভারতবর্ষের শাস্ত্রের নির্দ্দেশ ও রবীন্দ্রনাথ এই কর্ম্মকেই—'সর্ব্বকর্ম্মফল ত্যাগ তাহে উপহার দিয়ে'—কর্ম্ম করে যাওয়াকেই সমর্থন করেছেন।

কবির জীবন-সায়াহ্নে যখন সমাগত হ'য়েছিল, তখন কবি বলেছিলেন কর্ম্ম ও সব চুকে গেছে, এখন একটু বিশ্রামে বসে উপাসনায় রত থাকবেন, কিন্তু জীবন-দেবতা তাঁকে পুনরায় কর্ম্মের আহ্বান জানালেন, কর্ম্মের ত শেষ নাই, সারাজীবন ভরেই ত কর্ম্ম—যেখানে শেষ বলে মনে করা যায়, সেখানেই নবতর জীবনের নূতন পর্য্যায়ের সূত্রপাত।

সারাজীবন কবি অবসরহীন কর্ম্মের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এসেছিলেন এবং এই আশাই পোষণ করতেন যে, জীবন-পরপারে যখন পা রেখেও তখনও ঐ "অশেষ"

কর্ণধার নব প্রাতে নব খেয়কের হাতে
করি যাব দান
মোর শেষ কণ্ঠস্বরে, যাইব ঘোষণা করে
তোমার আহ্বান।

বীরশ্রেষ্ঠ রুস্তম

শ্রীগুরুদাস সরকার

(সাহনামার চরিত-চিত্র)

সাহনামার রুস্তমের ন্যায় বড় বীর আর কেহই নাই। পারস্যের এই বীর-শ্রেষ্ঠের কাহিনী কতকাংশে আমাদের রামায়ণ ও মহাভারতের বীররসের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। রুস্তমের চরিতকথা সাহনামায় যে ভাবে বিবৃত হইয়াছে তাহাতে অনেকটা কুম্ভকর্ণ, ভীম অথবা ঘটোৎকচের কথাই মনে পড়ে। কুম্ভকর্ণের ন্যায় তিনি অবশ্য ছয়মাস-ব্যাপী নিদ্রায় নিমগ্ন থাকিতেন না, ভীমের মত তিনি অগ্রজের অঙ্গুলি সঙ্কেতেই চালিত হইতেন না, ঘটোৎকচের মত তিনি বয়স ও অভিজ্ঞতা এই দুয়েরই অনেকটা যেন ছাড়াইয়া গিয়াছেন।

মাতামহের দিক্ দিয়া রুস্তম ছিলেন দানবরাজী পাহাকের (জাহাকের) বংশোদ্ভব (১)। তাঁহার পিতা জাল অথবা জালিজার—মাতা ছিলেন রুদাবের কন্যা রুদাবে। উভয়ের মাতা রুদাবে'র উদরদেশ কতকাংশে বিদীর্ণ করিয়া রুস্তমকে ভূমিষ্ঠ করাইয়াছিল। ইস্ফান্দিয়ারের সহিত রুস্তমের যখন যুদ্ধ হয় সে সময়েও এ পক্ষীর আবির্ভাবের কথা জানা যায়, কিন্তু তাহার সে আবির্ভাবে মঙ্গল না হইয়া তখন অমঙ্গলই ঘটিয়াছিল।

রুস্তম ছিলেন মল্লরাজতুল্য বিপুলায়তন। সাহনামা রচিত হয় খ্রীঃ দশম শতাব্দীতে। ইহার দুই তিন শতাব্দী পূর্ব্বেকার, সম্ভবতঃ খ্রীঃ সপ্তম কি অষ্টম শতাব্দীর জনৈক আর্ম্মেনীয় লেখক খোরেনবাসী মোজেস্ (Moses of Khoren) তাঁহাকে শতাধিক বিংশতি হস্তীর বলবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (Noldeke. Iranian National Epic. p. 17. foot note 6)। সিকনের সুবিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থের একটি পাণ্ডুলিপিতে এই গ্রন্থকারেরই উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে যে

(১) Noldeke. the Iranian National Epic (Das Iranische Nationalepos), p. 18.

রুস্তমের বল ছিল ছাব্বিশ হস্তীর সমতুল্য (২)। আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে ইহাই বা কম কি? তাঁহার অমানুষিক দৈহিক শক্তির বর্ণনা শাহনামায় অনেক স্থলেই প্রদত্ত হইয়াছে এবং এতৎ সম্পর্কীয় প্রবাদ যে অনেক পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার পক্ষতরে প্রস্তর ফাটিয়া যায়, সাতজন বীর পহলবান্ যে প্রস্তর উঠাইতে অসমর্থ তিনি একাই তাহা তুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন (৩)। রুস্তম সমূলে বৃক্ষ উৎপাটন করিতেছেন, শুনিলে মহীরুহ তাঁহার হস্তে যেন পক্ষীর পালকের ন্যায় লঘু প্রাপ্ত হইতেছে। রুস্তম মাজেন্দরাণ-

নিজ পুত্র সরাবকে নিদারুণ আঘাত করার পর বিলাপরত রুস্তম

বাসী জনৈক ব্যক্তির বক্ষস্থলে করাঘাত করিতেই সে অদৃশ্য হইতে স্কন্ধে পড়িয়া যায়। আর একব্যক্তি শক্তিপ্রয়োগ করিয়া তাঁহার হাতে চাপ দিতেই তিনি এরূপ উল্টা চাপ দিলেন যে, অঙ্গুলি হইতে তাহার নখগুলি খসিয়া পড়িল, তাহার হাত অকর্মণ্য হইয়া গেল। এই অত্যধিক শক্তিতে বিরক্ত হইয়া তিনি বিধাতার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন উহা যেন কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস হইয়া যায়। শক্তি-সংবরণের জন্য এরূপ আন্তরিক আবেদন বোধহয় আর কোথাও দেখা যায় না।

দেহের অনুরূপ রুস্তমের ক্ষুধাও ছিল অসাধারণ। শৈশবকালে পর পর সাতজন ধাত্রী স্তন্যপান করাইয়া তাঁহাকে তৃপ্ত করিতে পারে নাই। একটি গোটা বন্য গর্দ্দভ তিনি একাই ভক্ষণ করিতেন। শাহনামায় একাধিক স্থলে বর্ণিত হইয়াছে যে বন্য গর্দ্দভ শিকার করিয়া তিনি একাই একটি ভাজিয়া খাইতেন। যতগুলি মেষ ভক্ষণ করিয়া তিনি উদর তৃপ্ত করিতেন তাহার সংখ্যা গণনা করিয়া গ্রীক ইস্কাশিয়ার বিস্ময়াপন্ন না হইয়া পারেন নাই। আহারের অনুপাতে তাঁহার পানের পরিমাণও কম ছিল না। যখন তাঁহার স্তন্যপানের বয়স, তখন হইতেই তিনি শিরার সহিত আসব পানে নিয়ত। বৃদ্ধ বয়সেও দেখা যায় তিনি একেবারে জল না মিশাইয়াই সুরাপান করিতেন। বহ্‌রাম তাঁহার সহিত একত্রে পান করিতে বসিয়া সমর্থ না হইয়া পারেন নাই। মিতাহারী না হইলেও এবং সুরাপানে অত্যধিক অভ্যস্ত হইলেও রুস্তম ছিলেন ধীর ও স্থিরপ্রজ্ঞ। ইহাই হইল তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং এইখানেই বৃকোদরের সহিত তাঁহার বেশ অনেকটা পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

ক্ষমা, দান ও বিবিধ শস্ত্রের প্রয়োগে তিনি সিদ্ধহস্ত, মনুষ্যত্বেও তাঁহার তৎপরতা অপরিসীম (৪)। তাঁহার প্রকৃতি উদার এবং স্বভাবতঃই তিনি পরোপকারী। অনুরুদ্ধ হইয়াই হউক বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই হউক, রাজ পারিষদদিগের মধ্যে কেহ কোনও অপরাধজনক কার্য্য করিলে রুস্তমকে দোষখালনে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়। এইরূপে মাঝে পড়িয়া তিনি তুস্ (Tus) ও তাঁহার সৈন্যদলের এবং গুগিনের অপরাধ মার্জ্জনা করাইয়াছিলেন। বিস্তান গুগিনকে ক্ষমা করেন তাঁহারই অনুরোধে। দুশ্চিন্তা হইলেও তিনি মাঝে মাঝে আমোদপ্রমোদে বিচলিত না হইয়া পারেন নাই। মাজেন্দারাণ যাইবার পথে একস্থলে উৎকৃষ্ট মাহাথ্য ও একটি বীণাযন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া তিনি সঙ্গীত সাহায্যে মনের ক্ষেদ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন যে, তাঁহার সারাজীবন কাটিয়া গেল শুধু যুদ্ধবিগ্রহ কার্য্য করিয়া, তিনি যে জীবন উপভোগ করিবেন সে অবসর তাঁহার আর মিলিল কোথায়?

রুস্তমের ভগবদ্ভক্তির ও ঐশী শক্তির উপর নির্ভরতার অভাব নাই, কিন্তু নিজ সামর্থ্য সম্বন্ধেও তিনি বেশ সচেতন। কে তাঁহার বিপক্ষতা অবলম্বন করিতেছে, কে বা কি তাঁহার পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা তিনি একবারও ভাবিয়া দেখেন না। সিংহ হউক, দানব (বিদ্) হউক, হস্তী হউক, জলবিহীন মরুভূমি হউক, কিম্বা বিশাল নীল নদ (Nile) হউক, শত্রুপক্ষ সংখ্যায় কম হউক কিম্বা বেশী হউক, রুস্তম বলিতেছেন যে, তিনি যদি ক্রোধান্বিত হন তাহা হইলে সকলই তুচ্ছতায়

(২) Moses Chorenensis, Hist. Armen. l. ii, c. 7, p. 98 edit. Whiston, referred to in Gibbons Downfall of Roman Empire, Ed. H. H. Milman, vol. II, p. 125.

(৩) Noldeke, Op. cit., p. 84.

(৪) Ibid, p. 85.

সমান হইয়া যায়। অন্যত্র তাঁহার একটি উক্তি এই মনোভাবই সমর্থন করিতেছে—

"যদি দিব্, ও পিব্ ও পালং চ নিহং
তদঃ শুদ্ দ্বি চেশম্ বি হুমায়্ ই তং"

অর্থাৎ কত না দানব, সিংহ, শার্দ্দূল, তুর্কীর যুদ্ধকালে আমার হস্তে পতন প্রাপ্ত হইয়াছে (৫)।

সাধারণ মানুষের মত রুস্তমও একবারে দুর্ব্বলতা বিবর্জ্জিত নহেন। শাহনামায় একস্থানে ক্রোধে অধীর হইয়া তিনি বলিতেছেন "রাগ যদি হয় তখন কি আমি রাজা কাইকাউসেরও কোনও খবর রাখি? আমার বিরুদ্ধে তিনি হস্তক্ষেপ করিতে যান কেন? আর এই তুসই বা কে একজন এমন বিশিষ্ট ব্যক্তি (৬)?" এস্থলে বলিয়া রাখি যে তুস নামক এই ব্যক্তির নেতৃত্বেই রাজা কাইখস্রু তুর্কিস্থানে এক সমরাভিযান প্রেরণ করেন এবং এই অভিযানে কাইখস্রুর নিষেধ সত্ত্বেও সপদ্ পর্ব্বতের গিরিদুর্গ আক্রমণ করিয়া শত্রুদিগের আক্রমণকারী সন্দেহে কাইখস্রুর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ফারুদ্‌কে হত্যা করা হয়। কাইখস্রুর জ্ঞাতি বিরোধের ইচ্ছা ছিল না, তাই তুসের এই কার্য্যে তিনি তাঁহার প্রতি বিরূপ না হইয়া পারেন নাই।

প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের মধ্যে গরোয়া দুর্ব্বল, রুস্তম তাহাদিগকে অবজ্ঞার চক্ষেই দেখেন। তাঁহার পৌরুষ ও আত্মসম্মানবোধ, কোথাও তাঁহাকে সমাচরণের সামান্য মাত্র ব্যতিক্রম সহ্য করিতে দেয় না। কাইকাউসের নিকট তাঁহার উপযুক্ত সম্মানের অভাব ঘটিলে তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। পরে কিন্তু যখন তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে, তাঁহার এ কার্য্যে সাধারণের মনে কাপুরুষতা বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে তখন তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ফিরিয়া আসেন। প্রিয় মিত্র সিয়াউসের মৃত্যুতে তিনি অতীব শোকার্ত্ত হন এবং শপথ গ্রহণ করেন যে ইহার প্রতিশোধ তিনি গ্রহণ না করিয়া নিদ্রিত হইবেন না। সিয়াউস্ (Siyavush) দেশত্যাগী হইয়াছিলেন তাঁহার পিতার বিরাগ ও বিমাতার শত্রুতাহেতু। রুস্তম্ বেশ বুঝিয়াছিলেন যে ইহাই ছিল সিয়াউসের মৃত্যুর মূলীভূত কারণ। শোকান্বিত রুস্তম্ কাইকাউসকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার তো করিয়াছিলেনই, সিয়াউসের বিমাতা, হীনচরিত্রা সুদাবেকে উপযুক্ত শাস্তি বিধান করিয়াছিলেন তাহাকে অশ্বপদে হত্যা করিয়া (৭)।

আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধারলাভের জন্য রুস্তম্ যে আবশ্যক বুদ্ধি-কৌশল অবলম্বন করিতেন না তা নয়। দিব্ আক্‌ওয়ান্ নামক দৈত্যের কবলে পড়িয়া সপদ্ দুর্গ অবরোধ কালে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া অন্য পথ অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। কিরৌসির দুর্গেও সেকেন্দর—যোধন বিশাল করিত দৈত্য দানবের কাছে সোজা কথা বলিলে ফল হয় না, তাহারা দেখিতে দেখিতে অপকার করিয়া বসে, তাই যখন কাহারও নিকট হইতে তাহারা জানিতে চাহে যে সে ব্যক্তির প্রার্থনীয় কি, তখন সাধু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার উল্টা রকম একটা কিছু বলিয়া, তাহাই যে কাম্য তাহা মিথ্যা কারণ দর্শাইয়া বুঝাইয়া দিতে হয়। রুস্তম্ বিয়াছিলেন ঠিক এই পথে এবং তাঁহার চেষ্টাও বিফল হয় নাই। শুদ্ দিব্ আক্‌ওয়ান্ বয়, সুফিদ্ দিব্ (শ্বেত দানব) নামক অপর একজন দৈত্যের সহিতও তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। সুফিদ্ দিবের সহিত রুস্তমের লড়াই সাহনামার কুশক চিত্রের একটি সুপরিচিত বিষয় বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে।

রুস্তম্ স্বহস্তে তাঁহার নিজ পুত্র সোহরাবকে যে হত্যা করিয়াছিলেন ইহাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা শোকাবহ ঘটনা। ইংরাজ কবি ম্যাথু আর্নল্ড্‌এর এতদ্ বিষয়ক কবিতাটির সহিত স্কুলের ছাত্রেরাও সুপরিচিত, তাই এ বিষয়ে অধিক কিছু বলার প্রয়োজন নাই। যুদ্ধকালে সোহরাব তাঁহাকে ভূপাতিত করিলে পর রুস্তম্ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে একবার মাত্র পরাজয়ের ফলে দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করা বীর ধর্ম্মে অনুমোদিত নয়। কিন্তু মিথ্যা ক্লান্তি দূর হইলে পর পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া যখন তিনি সোহরাবকে ভূপুষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইলেন তখন আর দ্বিতীয় সুযোগ না দিয়া তাঁহাকে রক্তে লাল হইয়াই অশ্বারোহণ করিলেন। সেই অশ্বারোহণের ফলেই সোহরাব দেহত্যাগ করেন। পিতা পুত্রে যখন পরিচয় ঘটিল তখন আহত সোহরাবকে বাঁচান আর সম্ভব হইল না।(৮)

রুস্তমের মৃত্যু হয় তাঁহার বিশ্বাসঘাতক ভ্রাতা শগাদের দুষ্টতার ফলে। তিনি তাঁহার মদ্য রক্ষিতা ভরা প্রভৃতি অশ্বে পূর্ণ একটি গর্ত্ত মধ্যে পড়িয়া শিরা সাংঘাতিক ভাবে আহত হন। (৯) তীক্ষ্ণ অস্ত্রগুলি গর্ত্তের তলদেশে প্রোথিত ছিল। মৃত্যুপথযাত্রী রুস্তম্ ইহাদের কারসাজির পূর্ব্বে ইহার কথোচিত প্রতিশোধ না লইয়া ছাড়েন নাই। শগাদের নিকট হইতে ধনুকটি কৌশলে হস্তগত করিয়া তিনি এমন বেগে তীর ত্যাগ করেন যে, একটি বৃক্ষ ভেদ করিয়া সেই নিশিত শায়ক বৃক্ষ কাণ্ডের অন্তরালে অবস্থিত শগাদকে বিদ্ধ করে। সেই শরাঘাতেই শগাদ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই ঘটনাটির মূলক চিত্র একাধিক সাহনামা পুঁথিতে সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। এই বৃক্ষ ভেদ শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক সপ্ততাল তরু ভেদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

রুস্তম্ শুধু সিমুর্গ পক্ষীর সুখই নহে, তাঁহার পিতা জালের নিকটেও শুনিয়াছিলেন যে, ইস্‌ফান্দিয়ারকে হত্যা করিলে শুধু ইহলোকে নয় পরলোকেও তাঁহাকে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে।(১০) উভয়েই তাঁহাকে এ সম্পর্কে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। ইস্‌ফান্দিয়ার্ আসিয়া ছিলেন রাজাদেশে তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইবার জন্য। তিনি তখন পারস্য সম্রাটের প্রতিভূ মাত্র,

(৫) Ibid, p. 180.
(৬) Loc. cit.
(৭) Ibid, p. 87.
(৮) Ibid, p. 87. (৯) Ibid, p. 19.
(১০) Ibid, p. 87.

ব্যক্তিগত ভাবে স্থবসের সহিত তাঁহার কোনও শত্রুতা ছিল না। কন্তু আত্ম-সম্মান রক্ষার জন্ত তাঁহাকে যুদ্ধে লিপ্ত করেন বটে কিন্তু ইহার জন্ত তাঁহাকে ঐন্দ্রজালিক শক্তির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইহাতেই যাহা কিছু দোষ ঘটে। কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত কন্তুসকে নব প্রচারিত জোরোয়াষ্টার ধর্মের বিদ্বেষী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইস্থাবিয়াসকে দেখাইয়াছেন উক্ত ধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বা সহায়ক রূপে। হিরোদোসির বর্ণনায় কিন্তু এ মতবাদ সমর্থন লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

কন্তুসের কীর্তিপ্রসঙ্গে স্থবসের উল্লেখ না করিলে অনেক কিছুই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কন্তুসের এই মহাকায় অশ্বটি তাঁহার সকল অসমসাহসিক কার্যে শুধু বাহন মাত্র নয়, যেন বিশ্বস্ত সহচর রূপেই বর্ণিত হইয়াছে। কন্তুস এক স্থলে বলিতেছেন "আমার বয়সের সম্মুখে (প্রতিপক্ষের) সকলেই হয় পলায়ন করে, আমার বন্ধুক ও তরবারি দেখিলে তাহাদের সকলেরই পৌরুষ বিলুপ্ত হয়।" প্রভু নিরাপত্তা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এদিকে কোথা হইতে ড্রাগন (Dragon) একটি শাবককে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে, না মারিলে শিশু প্রভু নিহত হন, মারিলে তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করা হয়, এই দ্বিধার মধ্যে পড়িয়াও স্থবসের বিবেচনা বুদ্ধি প্রভাব পাইয়াছে জানা।

'স্থবসু' শব্দের অর্থ কেহ করেন ইন্দ্রধনু লাল বর্ণ, কেহবা করেন ঘোর পাটল বর্ণ। ঘোড়ার বর্ণ অনুসারেই বোধ হয় অশ্বটির এই নামকরণ হইয়া থাকিবে। স্থবস্ এবং গুর্ক নামক দুইজন পারস্যবিজয়ী সেনা, এই দুইটি ভিন্ন কন্তুসের চিত্র সৃষ্টি। সাহনামার চিত্রাবলীতে তাই কন্তুসকে চিনিয়া লইতে বিলম্ব হয় না। তাঁহার আর এক চিহ্ন ব্যাঘ্র চর্মে আবৃত শিরস্ত্রাণ। কোন কোনও কুস্তক চিত্রে এই শিরস্ত্রাণে সিংহ মুণ্ড সজ্জিত দেখা যায়। এরূপ মূর্তি পরিচায়ক বৈশিষ্ট্য (iconographical quality) সাহনামার অপর কোনও চিত্রে দেখা যায় না। আকবরের যখন বিদ্রোহ অধিকার করে তখন লেখানকার একটি স্থান কন্তুসের অশ্বশালা বলিয়া পরিচিত ছিল। বিরাটের গো-গৃহ বাঙ্গলার কোনও কোনও পল্লী অঞ্চলে এখনও লোকে দেখাইয়া দিয়া থাকে। অবশ্য এ প্রকার কল্পনাপ্রসূত স্থান নির্দেশ জনশ্রুতির চিত্রে ঐতিহ্য ও পুরাণ কাহিনীর প্রভাব ব্যতীত অপর কিছুই প্রমাণিত করে না।

চিত্রিত সাহনামা পুঁথির কন্তুস বিষয়ক কুস্তক চিত্র নিচয়ের সম্যক পরিচিতির জন্ত কন্তুসের কথা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। বীরত্বের যে আদর্শ ভারতীয় ও ইরাণীয় পুরাণ কাহিনীতে পরিস্ফুট, উক্ত জাতির সংস্কৃতিগত পার্থক্য তাহার ভিত্তিমূলে অবস্থিত হইলেও এই বৈশাদৃশ্যের ভিতর সাদৃশ্যের পরিমাণও যে কতটুকু তাহা হিরোদোসির চরিত্র-চিত্রণ কৌশলে অনেকটা সুস্পষ্ট ভাবেই জানা যায়। ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে, সে সাসানীয় কৃষ্টির প্রভাব সাহনামার পূর্ব খণ্ডে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান, কন্তুস চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তাহার সংস্পর্শবর্জিত নয়। ত্রয়োবিংশ শতাব্দীর একখানি সাহনামা পুঁথির কুস্তক চিত্রগুলিতে সুপণ্ডিত নোলদেকে (Noldeke) (১১) সাসানীয় ভাস্কর্যের সহিত সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু এ প্রভাব শুধু চিত্রে কেন, হিরোদোসির মহাকাব্যের বিষয় বস্তু ও ভাব ধারাতেও কম বিদ্যমান নয়।

ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক বিচার হেতু অনেক কিছু পুরাতন সংস্কার পরিবর্জিত এবং পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং হইতেছেও। কোনও আধুনিক বিশেষজ্ঞ কন্তুসকে শুধু একটি উপনামে আখ্যা দিয়াছেন। তাহার এই উপনাম (surname) হয়তো কোনও দেবতারই, সম্ভবতঃ স্রোতের দেবতারই হইবে। বৈদিক দেবতা বৃত্রঘ্ন পারসীক ধর্মগ্রন্থে স্রোতঘ্ন নামেই পরিচিত। আবার ঐতিহাসিক দৃষ্টি ভঙ্গীতে লক্ষ্য করিলে পারস্যের পৌরাণিক উপকথার কন্তুসই নাকি খ্রীঃ প্রথম শতাব্দীর রাজা গুণ্ডাফারে পরিণত হইয়া যান।(১২) ইঁহারই রাজত্বকালে সন্ত টমাসের (St. Thomas এর) ভারতে আবির্ভাব ঘটিয়াছিল বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। গুণ্ডাফারের ইরাণীয় রাজকুলোদ্ভব, তাহার জন্ম শক কুলে, সুরেন কুলে (House of suren)। পণ্ডিতগণের বিতর্কের বিষয়ীভূত এ সকল কথার বিস্তারিত আলোচনা এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন বলিয়া এই দুইটি মতবাদের উল্লেখ মাত্র করা হইল।

(১১) Ibid, p. 127.

(১২) Herzfeld, Iran in the Ancient East, p. 291.

পাহাড়িয়া পথ

শ্রীকালীসাধন ঘোষ

কোলাহল ঘুরে রাখি পাইনের ঘন বনমাঝে,
দেখা যায় পাহাড়িয়া আঁকাবাঁকা পথের ইসারা,
বিসর্পিল গতি তার পর্বতের মাঝে হোল হারা,
ধূসর কুহেলি-জাল নেমে এলো অবসন্ন সাঁঝে।
আসিবে কি সাথে মোর—ঘুরে ফেলি আর সব কাজে,
শৈল বাস-বিলাসিতা। ডাকে মোর নববর্ষা ধারা
পুলকিত পাইনের বর্ষা-স্নিগ্ধ হোল বুঝি সারা,
ধূসর দিগন্ত হ'তে শুনি' কার ক্লান্ত বাঁশি বাজে।

শীর্ণ পথ রেখা ধরি চলিয়াছি মোরা দুইজন,
অরণ্য-পুষ্পের বাস নিয়ে এলো তব কালো কেশ,
কেহ নাই চারিদিকে, আরো কাছে সরে
এসো তুমি,
শঙ্কাহীন-চিত্তে দলি' সভ্যতার নিরর্থ বন্ধন।

গোধূলি ঘনায়ে আসে প্রকৃতির স্তব্ধ পরিবেশ,
তুমি কি ফিরাবে মোরে—তীব্রচিত্তে যদি কর ভুল।

মরুর দেশের মায়া

শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য

ভারতের পশ্চিম প্রান্তে একটা ছোট-খাটো সহরে গুটি দু-তিন প্রবাসী বাঙালী। তাদেরই মাঝখানে কার্যব্যপদেশে কক্ষচ্যুত ধূমকেতুর ন্যায় শিবনাথকে একদিন ছিটকে পড়তে হবে একথা তার কুষ্ঠীতে লেখা থাকলেও জানা ছিল না। শুষ্ক, ধূসর, বিস্তীর্ণ প্রান্তরের বুকে ধূলি-মলিন গেঁয়ো সহর। জীবন-যাত্রায় না আছে বৈচিত্র্য, না আছে প্রেরণা। প্রাণ তার হাঁপিয়ে উঠে। কর্মের ফাঁকে মন পালিয়ে আসে সুদূর বাংলার শ্যামল বুকে। ছুটির দিনে বেরিয়ে পড়ে সে নিরুদ্দেশের পথে—সহরের গা-ঘেঁসে যে রেললাইন চলে গেছে, তাই ধরে, অথবা প্রান্তরের বুক দুলিয়ে সেই যে একটা অমৃচ্ছ, অনাবৃত, নগ্ন মালভূমি সাতপুরা পাহাড়ের দিকে ঢেউ তুলে এগিয়ে গেছে, তারই গা বেয়ে। দিনান্তের শেষ রশ্মি আঁধারে মিলিয়ে যায়। শ্রান্ত, ক্লিষ্ট মন ভেবে যেন একটু স্বস্তি পায়—যাক, দিনটা কেটে গেল।

প্রাত্যহিক সান্ধ্য আসরে শিবনাথ অচল। গল্প জমাবার ক্ষমতা নেই, শোনবার ধৈর্যও হয়ত নেই। তাসের আড্ডায় একেবারে অপাংক্তেয়। বন্ধুরা তাকে নিয়ে কৌতুক করে। বিজ্ঞের মতো বলে—"শিবনাথবাবু, সংসারটাতে যখন এসেই পড়েছেন—আর এখানে থাকা-না-থাকাটাও যখন ঠিক আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে না, তখন এর সঙ্গে একটু মিল-মিশ খেয়ে থাকবার চেষ্টাই করেন না কেন?"

শিবনাথ হেসে জবাব দেয়—"হ্যাঁ, তা-ই চেষ্টা করছি।"

সহরের নাম-করা বাঙালী ডাক্তার অরুণ সেনের বাড়ীতে প্রাত্যহিক চায়ের আসর জমেছে। সহরের বাঙালী যে ক'জন আছেন সবাই উপস্থিত। ডাক্তার সেনের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি—প্রায় শিবনাথেরই সমবয়সী; বড় হলেও দু-এক বছরের তফাৎ হবে। সমরজিৎ একটা ব্যাঙ্কে কাজ করে। বয়সে অনেক ছোট বলে সবাই তাকে ছোট ভায়ের মতো দেখেন। নীতীশ রায়কে একটু বয়স্ক দেখালেও এখনও চল্লিশের নিচে আছেন। কোন্ একটা কার্মে বেশ মোটা মাইনের কাজ করেন। সমর অবিবাহিত। নীতীশবাবু সস্ত্রীক। স্ত্রী অঞ্জলি দেবী ও ছোট দু'টি ছেলেমেয়ে। ডাক্তার সেনের ছেলেমেয়ে এখনও হয়নি।

চায়ের পেয়ালায় প্রথম চুমুক দিয়েই ডাক্তার সেন গম্ভীরভাবে ঘোষণা করলেন—"আপনাদের অবগতির জন্যে বলছি আমার স্ত্রী শ্রীমতী নন্দিতা দেবী পণ করেছেন, শিবনাথবাবুকে অচিরেই তিনি আমাদের এই আদরের একজন সুযোগ্য সভ্য করে গড়ে তুলবেন। তাঁর কর্মপন্থা এখনও সবিশেষ জানা যায়নি। তবে এ পর্যন্ত জানা গেছে, এই বড়দিনের ছুটিতে শিবনাথবাবুসহ সবাইকে ইলোরা ও অজন্তা পরিভ্রমণে বের হতে হবে। আশা করি, আপনারা সবাই এতে একমত হবেন, আর শিবনাথবাবুও আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে আপত্তি করবেন না।"

কথাগুলো শেষ হতে না-হতেই নন্দিতা দেবী কৃত্রিম রোষে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন—"ঐ দেখো, তোমার সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি!" তারপর সস্মিত শিবনাথের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ অপ্রতিভস্বরে বললেন—

"না, না, শিবনাথবাবু, ওঁর একটা কথাও বিশ্বাস করবেন না। তবে ইলোরা ও অজন্তা দেখবার ইচ্ছা আমাদের সবারই। আপনিও আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন এই আশা করছি। যাবেন তো?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। বেরিয়ে পড়ার সুযোগ আমি তো কোন দিনই ছাড়ি না। তারপর, আপনাদের সঙ্গে যাওয়া সে তো আমার ভাগ্য।"—শিবনাথ বিনয়ের সঙ্গে বললে।

সমর বৌদির একান্ত অনুগত। কাজেই তার অমত হওয়ার কথা নয়। নীতীশ রায় আফিসে কাজের ভীষণ চাপ জানিয়ে এবং এই সঙ্গে উপরওয়ালার উদ্দেশে দু-একটা তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ ছেড়ে সবিনয়ে যাওয়ার অক্ষমতা জ্ঞাপন করলেন। অঞ্জলি দেবী যেতে না-পারায় বাস্তবিকই দুঃখিত হলেন। পরিহাস-প্রিয় ডাক্তার সেন আবেগে স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন—

"ওগো, তোমার বিজয় অভিযান গোড়াতেই এতখানি সফল হয়েছে দেখে স্বামী হয়েও আমি তোমার হিংসা না করে পারছি না।" তারপর শিবনাথের দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—"তা'হলে এই ঠিক রইলো শিবনাথ-বাবু। আপনি প্রস্তুত থাকবেন। মাঝখানটায় তো আর মাত্র দুটো দিন। বড্ড তাড়াতাড়ি পড়ে গেল। রোগী বাটারাও সবাই যেন পরামর্শ করে বিছানা নিচ্ছে। যাক্ গে, সে একটা ব্যবস্থা হবে।" নীতীশ রায় ও অরুণি দেবীর দিকে তাকিয়ে ডাক্তার সেন একটু ক্ষুণ্ণস্বরে বল্‌লেন—"বড় আক্ষেপের বিষয় আপনারা যোগ দিতে পারলেন না। এই তো—এরই নাম চাকরী; হুঃ।"

সন্ধ্যা-আকাশ হেসিনের মতো ভেঙে গেল। বাড়ী ফেরবার পথে শিবনাথ ভাবে নন্দিতা দেবীর কথা। ডাক্তারের উক্তিতে কৌতুকের ছাপ যতখানিই থাকুক না, তার মূলে সত্য যে অনেকখানি ছিল শিবনাথের তা' জানা আছে। অভ্যর্থনা ও আপ্যায়নের ভেতর তার প্রতি এই নমস্তামন্ত্রীর একটা প্রচ্ছন্ন দরদ সে বরাবরই লক্ষ্য করে এসেছে। পুরুষের ঔদাসীন্য ও নির্লিপ্ততা মেয়েদের যেন অধিকতর বিচলিত ও সক্রিয় করে তুলে। ওটাই বোধহয় তাদের নারীধর্ম। বিধাতার রাজ্যটা নারীহীন হয়ে গেলে কি হতো? শিবনাথ ভাবতে থাকে……

ইলোরার জনহীন নীরস, নগ্ন, নিষ্প্রভ পাহাড়ের বুকচিরে সৌন্দর্যের এ রস-চক্র কবে, কারা গড়ে তুলেছিল! হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, এ তিন বিভিন্ন ধর্ম, সুন্দরের সাধনায় কী অপূর্ব ঐক্য লাভ করেছে এই ইলোরাতে! পুলকে শিবনাথের হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। কিন্তু কে জানত, ইলোরার গুহাতেই তার জীবনের আর এক অধ্যায় সুরু হবার কথা ছিল। সত্ত সব ক'টা গুহা দেখে সবাই শ্রেষ্ঠ গুহা "কৈলাস" দেখতে এসেছে। "কৈলাস" দেখে ফেরবার কথা। সময় বড় অল্প। ফেরবার পথে ঔরঙ্গাবাদ দুর্গ দেখে যেতে হবে। তাই ডাক্তার এবং সমরের ইচ্ছা একটু তাড়াতাড়ি ঘুরে দেখে নেওয়া। কিন্তু মুস্কিল হলো শিবনাথকে নিয়ে। তাড়াতাড়ি সারবার কোন লক্ষণই সে দেখালে না।

ডাক্তার রহস্য করে বল্‌লেন—"শিবনাথবাবু, নন্দিতা আপনার অবস্থা দেখে রীতিমত ভয় পেয়ে গেছে। বেচারী বড় ভরসা করে আপনাকে নিয়ে এসেছিল। এবার আশঙ্কা হচ্ছে ইলোরাতে বুঝি আমরা আপনাকে হারাতে বসেছি।"

সমর একটু ব্যঙ্গ করে বল্‌লে—"শিবনাথবাবু রসের সন্ধান পেয়েছেন। আমাদের মতো নীরস লোকদের ভালো লাগবে কেন?"

শিবনাথ হাসিমুখে জবাব দিলে—"ভয় নেই ডাক্তার সেন, আমি ঠিকই আছি। তবে আমাকে একটু ক্ষমা কর্‌তে হবে। আপনারা যান্। আমি পরের বাসেই আপনাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছি।"

নন্দিতা স্বামীর কথার তীব্র প্রতিবাদ করে বল্‌লেন—"বানিয়ে বলায় তোমার জুড়ি আর নেই। মাগো, কী মিথ্যাই না তুমি বল্‌তে পার!"

কণ্ঠস্বর সংযত করে শিবনাথকে লক্ষ্য করে বল্‌লেন—"শিবনাথবাবু, আপনি পরের বাসেই আসুন। এদের মতো নীরস কাঠখোট্টাদের পাল্লায় পড়ে আমার দেখা যা হবার হয়েছে; কিন্তু আপনার আনন্দ সুখ হতে আমি ক দেবো না।"

ডাক্তার হো হো করে হেসে উঠলেন। গলাটা একটু নামিয়ে সকৌতুকে বল্‌লেন—"নন্দিতা দেবী, রসবোধ তোমারও আছে একথা আমরা অস্বীকার কর্‌ছি না। কিন্তু আমাদের উপর এত অবিচার করো না। রসবোধ আমাদেরই বা কম কি? এই যে ঔরঙ্গাবাদে তোমার হাতের টাট্‌কা সরস পিঁচুড়ি খাবার কথা মনে করে আমাদের জিভ্ সজল হয়ে উঠ্‌ছে একি কম রসবোধের কথা! কি বল হে সমর ভায়া।"—ডাক্তার উৎফুল্ল চোখে সমরের দিকে তাকালেন।

সমর সানন্দে সায় দিয়ে বল্‌লে—"দাদার উক্তির সমর্থন আমি সর্বান্তঃকরণে কর্‌ছি। রসগ্রাহী কে কতখানি, ঔরঙ্গাবাদ দুর্গের পাশে সে পরীক্ষা হয়ে যাবে। সত্যি বৌদি, ডাল-চালের শুভ-মিলন দেখার অপেক্ষায় আমি উন্মুখ হয়ে আছি।"

নন্দিতা স্মিতহাস্যে বল্‌লেন—"হ্যাঁ, তোমাদের ঐ পর্যন্ত।"

ডাক্তারেরা চলে যাবার পর শিবনাথ কাগজ-পেন্সিল

নিয়ে বসল দু'-একখানা চিত্রের স্কেচ্ নিতে। গুহার এক কোণে দেয়ালের গায়ে হর-গৌরীর মিলন-চিত্র। ভাবের ব্যঞ্জনায় চিত্রখানি কী বাস্তব ও সজীব হয়ে ফুটেছে! এ যেন শুধু হর-গৌরীর মিলনের চিত্র নয়। বিশ্বের নর-নারীর প্রথম-মিলনের প্রেমোজ্জ্বল দৃষ্টি সেই হর-গৌরীর মিলন-চিত্রে রূপ নিয়েছে। স্তম্ভিত-বিস্ময়ে শিবনাথ বসলে তার স্কেচ্ নিতে। তন্ময়তার মাঝে শিবনাথ জান্‌তে পার্‌লে না, অনেকক্ষণ ধরে তারই পেছনে একটি সাহেবী পোষাক-পরা ভদ্রলোক ও একটি ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে চিত্র ও চিত্রকরকে দেখছেন।

"ওকি, হঠাৎ কি হলো তোমার!"

কথাগুলো কানে আস্‌তেই শিবনাথ সচকিতে পিছনে তাকিয়ে দেখ্‌লে—ভদ্রলোকটি শশব্যস্তে পতনোন্মুখ ভদ্রমহিলাটিকে ধরেছেন। মুহূর্তে শিবনাথের মুখ থেকে শেষ রক্তবিন্দুটুকু নিঃশেষে মিলিয়ে গেল।

"জল, একটু জল—A little water"—বিহ্বল ভদ্রলোকটি কাতরস্বরে শিবনাথের দিকে তাকালেন। ত্বরিতে শিবনাথ গুহা-মুখে যে দরোয়ান ছিল তাকে জল নিয়ে আস্‌তে আদেশ করে যন্ত্রচালিতের মতো ফিরে এলো। ভদ্রলোকটি বল্‌তে লাগলেন—"পাহাড়ে উঠা-নামা অভ্যেস নেই তো, তাই একটু বেশী strain পড়েছে। বড্ড delicate health কিনা।" ভদ্রলোকটি বুঝতে পেরেছে, শিবনাথও বাঙ্গালী।

দরোয়ান ততক্ষণে জল নিয়ে এসেছে। ভদ্রলোক নিজের রুমাল ভিজিয়ে মহিলাটির চোখে-মুখে বুলাতে লাগলেন। মুখের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"পর্ণা, কেমন লাগ্‌ছে এবার। এই তো সেরে যাবে, ভয় নেই কিছু।"

ঐ সংজ্ঞাহারা নিশ্চল, নিষ্প্রাণ মূর্ত্তির আপাদ-মস্তকের উপর চকিতে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে দ্রুতপদে শিবনাথ বেরিয়ে এলো গুহা থেকে। সম্মুখে একখানা বাস যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ঝড়ের বেগে শিবনাথ ঢুকে পড়ল তার মধ্যে। পশ্চাতে ফেলে-আসা সেই একটা মর্ম্মান্তিক নাটকীয় দৃশ্য স্মৃতির রুদ্ধ-দ্বার ঠেলে বার বার তার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হ'তে লাগলো। সে নাটকের প্রতিটি দৃশ্য তার চিত্তকে ক্ষতবিক্ষত কর্‌তে লাগল। বেদনা-মর্জ্জর চিত্ত মথিত করে একটা কথাই বার বার তার মনে উদয় হতে লাগলো—নীলিমা—নীলা—আজ পর্ণা!

মিনিট কুড়ি পর পর্ণার সংজ্ঞা ফিরে এলো। তার ব্যগ্র দৃষ্টি কি যেন খুঁজে ফির্‌তে লাগল।

"কি চাই পর্ণা?"—ভদ্রলোকটি সস্নেহে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "ভয় পেয়েছ? এই যে আমি কাছে আছি। আর একটু সুস্থ হয়ে উঠ; তারপর ডাকবাংলায় ফিরে যাব।"

কোন কথা যে পর্ণার কানে গেছে এমন বোঝা গেল না। চোখ বুজে অসাড় হয়ে সে পড়ে রইল। শুধু একটা চাপা কান্না যেন তার বুক ঠেলে এসে ঠোঁটের কাছে মুসড়ে ভেঙ্গে পড়্‌তে লাগল।

ঔরঙ্গাবাদ দুর্গের কাছে যখন শিবনাথকে দেখা গেল তখন খাবার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে। তার উপর চোখ পড়্‌তেই ডাক্তার সেন সানন্দে বল্‌লেন—

"এই যে শিবনাথবাবু, একেবারে ঠিক সময় এসে পড়েছেন। আপনাকে অরসিক আর যে-ই বলুক, আমি কখ্‌খনো বল্‌ব না। এবার আমরাও প্রমাণ করে দেবো রস-গ্রহণে আমরাও কারো চাইতে কম নই। কি বলো সমর ভায়া?" নিজের রসিকতায় ডাক্তার নিজেই উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

অন্তর্বিপ্লবকে যথাসম্ভব সংযত রেখে শিবনাথ জোর করে হাসি টেনে বল্‌লে—"এবার রসগ্রাহিতার পরিচয় দিতে আমিও হার মানব না, একথা আপনাকে জানিয়ে রাখ্‌ছি।"

হাস্য-কৌতুকে সে-দিনের বন-ভোজন শেষ হলো।

ডাক্তারের দল যখন ডাক বাংলায় ফিরে এলো তখন রাত প্রায় ন'টা বেজে গেছে। রাত এগারটার গাড়ীতে জালগাঁ রওনা হবার কথা। জালগাঁ থেকে অজন্তা যেতে হবে।

ডাক বাংলায় ফিরে আসার মিনিট পাঁচেক পরই সবিস্ময়ে শিবনাথ দেখ্‌লে ইলোরায় দেখা সাহেবী-পোষাক-পরা সেই ভদ্রলোকটি একহাতে একটা ওষুধের শিশি ও অপরহাতে কিছু আঙ্গুর-বেদানা নিয়ে হন্ত দন্ত হয়ে ছুটে

আসছেন। শিবনাথের উপর চোখ পড়তেই বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে বললেন—

"এই যে, আপনাকে দেখছি এখানে! যাক্, নিশ্চিন্ত হলাম অনেকটা। আপনি হঠাৎ চলে এলেন। আপনাকে পাবো ভরসা ছিল। ওকে তো কোনমতে নিয়ে এলাম এখানে। এসেই ডাক্তারকে 'কল' দিই। এই তো ওষুধ ও পথ্য নিয়ে এলাম। ডাক্তার বললে—সম্ভবতঃ হঠাৎ একটা mental shock পেয়েছে। ডাক্তারের কথার মাথামুণ্ডু কিছু ঠিক করতে পারছি না। হঠাৎ shock পাবার কি হতে পারে!" একটু শ্লেষের সুরে বললে—"একটা যা-হোক্ বলতে হবে তো!"

যাকে উদ্দেশ করে বলা সে শ্রোতাটি আদৌ শুনলে কিনা, বা কতখানি শুনলে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই ভদ্রলোকটি অনর্গল বলে গেল। একটু থেমে বিনয়ের সঙ্গে বললে—

"কিন্তু আর দাঁড়াতে পারছি না, ও একলা পড়ে আছে। দয়া করে একবার আমার ঘরে যদি আসেন তো খুব খুসী হবো।" আবার একটা নমস্কার করে ভদ্রলোকটি ত্বরিতপদে পাশের একটা ঘরে ঢুকলে।

পর্দার ও-পাশ থেকে ভদ্রলোকটির ব্যস্ততার স্বরে কথাবার্তা শুনে এবং হাতে ওষুধ-পথ্য দেখে নন্দিতা বিশেষ সন্দিগ্ধ ও উদ্বিগ্ন হয়ে শিবনাথের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—"শিবনাথবাবু, ব্যাপার কি? ও ভদ্রলোকটি কে?"

গভীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও শিবনাথ অতি সংক্ষেপে ঘটনা বর্ণনা করলে। তারপর হঠাৎ অনাবশ্যক ব্যস্ততা দেখিয়ে বললে—

"ডাক্তার সেন, আমাদের খাবার ব্যবস্থা করতে হবে না? ট্রেণের তো বেশী দেরী নেই!"

নন্দিতা প্রত্যুত্তরে বললেন—"সে কি। ভদ্রমহিলাটিকে না দেখেই যাব! গাড়ীর এখনও বেশ দেরী আছে। চলুন, ও-ঘর থেকে একবার দেখে আসি। স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন—

তোমার ষ্টেথেস্কোপ তো সঙ্গে নিয়ে আসনি; তবু চল, ওঁকে দেখে আসবে।"

শিবনাথের মুখ নিমেষে বিবর্ণ হয়ে গেল। যে সমস্যা জটিল হয়ে তার মনে উত্তরোত্তর গভীর উত্তেজনা ও অস্বস্তি সৃষ্টি করছিল এবং যাকে এড়াবার উপায় সে একান্তভাবে খুঁজছিল এবার তারই সম্মুখীন হতে হবে জেনে তার হৃদয়ে বিরাট বিপ্লব দেখা দিল।

শিবনাথকে একরকম টেনে নিয়েই সবাই ভদ্রলোকটির ঘরে ঢুকলেন। ভদ্রলোকটি সসম্ভ্রমে চেয়ার ছেড়ে হাত তুলে সবাইকে নমস্কার করলে।

ডাক্তার সেনই প্রথমে কথা বললেন—

"আপনার স্ত্রী নাকি ইলোরায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন? ভারী মুস্কিলের কথা তো! অপরিচিত জায়গা।"

প্রত্যুত্তরে ভদ্রলোকটি আশ্বস্ত কণ্ঠে বললে—

"হাঁ, কিন্তু কি ভাগ্যি, আপনারা কাছে আছেন। আপনাদের সান্নিধ্যে ও অনেকটা আরাম পাবে সন্দেহ নেই। সেই জ্ঞান হারাবার পর থেকে ওর মুখে আর একটা কথাও নেই। ওষুধ-পথ্যি কিছুই মুখে নিতে চাইছে না। দেখুন দেখি, কী মুস্কিলেই পড়েছি!"

নন্দিতা মৃদুস্বরে বললেন—"ওনি বুঝি ঘুমুচ্ছেন?"

ভদ্রলোকটি বললে—"হাঁ, এই মাত্র একটু তন্দ্রা এসেছে বলে মনে হচ্ছে। আপনারা দয়া করে একটু বসুন। আপনাদের কথা শুনলে হয়ত ওর অস্বস্তি লাঘব হবে।"

তারপর শিবনাথকে লক্ষ্য করে বললে—"আপনার উপর কিন্তু আমার ভারী ঈর্ষা হচ্ছে। কী সুন্দর ছবিই না আপনি বসে বসে আঁকছিলেন। আমি বাস্তবিকই লজ্জিত, আমরা গিয়ে আপনার সাধনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিলাম।"

নন্দিতার জিজ্ঞাসু চোখের উপর দৃষ্টি পড়তেই শিবনাথ একটু অপ্রতিভ হয়ে গেল। ডাক্তার সেন শিবনাথের দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বললেন—

"আপনি আর্টিষ্ট! হুঃ, তাই বুঝি আমাদের তাড়িয়ে ছিলেন!" একটু ক্ষুণ্ণ স্বরে বললেন—"ছবি আঁকবেন শুনলে আমরা নিশ্চয়ই আপনাকে বাধা দিতুম না শিবনাথবাবু!"

ডাক্তার সেনের কথার জবাবে শিবনাথ মৃদুস্বরে বললে—

"ও-টা একটা অতি সাধারণ ও ব্যক্তিগত বিষয়,

ডাক্তার সেন। ছবি আমি আঁকি চিত্রকর হবার জন্যে নয়। শুধু কল্পনা-সমুদ্রে নিজেকে ক্ষণিক ডুবিয়ে রেখে বাস্তবকে ভুলে থাকার জন্যে।"

ও-পাশে রোগিণীর মুখ থেকে হঠাৎ একটা অস্ফুট আর্তনাদ শোনা গেল। সবাই সচকিতে সে-দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। নন্দিতা ও ডাক্তার মৃদুপদক্ষেপে শয্যার পার্শ্বে গেলেন। ভদ্রলোকটি সোৎসাহে বললে—

"ঐ বুঝি ও জেগেছে।"

শুধু শিবনাথ স্থাণুর ন্যায় নিষ্পন্দ, নিশ্চল হয়ে আপনার জায়গায় বসে রইল।

রোগিণীর তন্দ্রা ভেঙেছে বলে বোঝা গেল না। নন্দিতা কাছে বসে তার মুখে মাথায় অতি ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। ডাক্তার হাতের নাড়ী ধরে পরীক্ষা করে আশ্বাস দিয়ে বললেন—

"কিচ্ছু ভয় করবেন না। ওঁর অবস্থা খুবই আশাপ্রদ। আজ রাত্রে একটু সুনিদ্রা হয়ে গেলেই ব্যস, কাল রীতিমত সুস্থ হয়ে উঠ্‌বেন।"

তারপর একটু বিনয়ের সুরে বললেন—"দুঃখের বিষয়, আমরা আপনাকে কোন সহায়তাই করতে পারছি না। আমাদের আবার এই ট্রেণেই রওনা হতে হবে। কাল জালগাঁ থেকে অজন্তা যাবার সংকল্প আছে।"

সময়ের দিকে তাকিয়ে বললেন—"কই-হে সময়, ক'টা বাজল?"

সময় জানালে—দশটা বাজ্‌তে মিনিট-তিনেক বাকী।

"ওরে বাবা! দশটা বাজ্‌তে চলেছে! তাহলে তো আর দেরী করা চলে না। ষ্টেশনে যেতেও বেশ সময় লাগ্‌বে। আমরা তবে আসি। নমস্কার।"

সবার পেছনে যন্ত্রচালিতের মতো শিবনাথ বেরিয়ে এলো। যাবার মুখে ডাক্তার সেন ভদ্রলোকটিকে আবার আশ্বস্ত করে এলেন।

অজন্তার গুহা দেখে ডাক্তারের দল Rest House-এ যখন ফিরে এলো তখন সন্ধ্যার বড় বেশী বাকী নেই। জালগাঁ থেকে প্রত্যূষে রওনা হয়ে Rest House-এ পৌঁছে তাড়াতাড়ি আহারাদি সেরে সেই সকাল সাড়ে দশটায় ওরা অজন্তা দেখ্‌তে বেরিয়েছিল। ক্লান্তি ও বুভুক্ষায় সবাই অবসন্ন। কিন্তু Rest House-এর দ্বারে পৌঁছেই সবাই সবিস্ময়ে দেখ্‌লে—ইলোরার সেই ভদ্রলোকটি বারান্দার একপাশে ইজিচেয়ারে দেহ এলিয়ে সিগারেট ফুঁক্‌ছেন। অবসাদ ভুলে ডাক্তার সেন দূর থেকেই তাঁকে উদ্দেশ করে সাশ্চর্যে বললেন—

"বাঃ, আপনিও যে এসে পড়েছেন দেখ্‌ছি! আপনার স্ত্রী রীতিমত সুস্থ হয়েছেন নিশ্চয়ই।"

উত্তরের অপেক্ষা না করেই আত্মপ্রসাদের সুরে বললেন—

"কেমন, বলিনি আপনাকে, রাত্রিটা সুনিদ্রা হলেই উনি একেবারে সুস্থ হয়ে উঠ্‌বেন। কৈ, কোথায় তিনি?"

ভদ্রলোক মুখে শুষ্ক হাসি টেনে বললেন—

"সে আর বল্‌বেন না। আপনারা চলে আসার পর রাত যা-হোক্ একভাবে কেটে গেল। ভোর হতে না হতেই ও ধরে বসল এ জায়গা ছেড়ে এখ্‌খনি অন্যত্র রওনা হতে হবে। কী চেষ্টা করে যে টাক্সি যোগাড় করেছি মশাই, তা' আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। আজই রওনা হতে আপত্তি আমার ছিল খুবই প্রবল। শেষে ভাবলাম, স্থান পরিবর্তনে হয়ত ওর অস্বস্তি দূর হবে। কিন্তু কতখানি ভালো যে ও হয়েছে তা' ঠিক বুঝ্‌ছি না। চারটের এখানে পৌঁছেছি। তারপর থেকে ও বিছানাতেই পড়ে আছে। ঐ ঘরটাতে আমরা আছি।"

ভদ্রলোকটি অঙ্গুলি নির্দেশ করে পাশের একটা ঘর দেখিয়ে দিলেন।

ডাক্তার আশ্বাস দিয়ে বললেন—

"ঠিক হয়ে যাবে সব; কিচ্ছু ভাববেন না আপনি। রাস্তার ঝামেলা কি কম! আমাদেরই কতখানি কাবু করেছে সে তো আমরা বুঝ্‌তে পারছি। নিন্, আপনারাও একটু বিশ্রাম করুন। আমরা একটু চাঙ্গা হয়ে উঠি। তারপর বেশ আলাপ হবে।"

ডাক্তার ও অন্যান্য সবাই নিজেদের ঘরের দিকে অগ্রসর হলেন। কথাবার্তার ফাঁকে কেউ লক্ষ্য করলে না, ভদ্রলোকটিকে দেখামাত্র শিবনাথ প্রেতদৃষ্ট-ব্যক্তির ন্যায় হঠাৎ অভিভূত হয়ে পশ্চাতে দাঁড়িয়ে আছে। চলচ্ছক্তি-হীন অসাড় দেহটাকে কোনোমতে টেনে নিয়ে সে নিজের ঘরে ঢুক্‌ল।

খেতে বসে শিবনাথের ভাবান্তর সবার চোখে পড়ল। ডাক্তার সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন—

"শিবনাথবাবু, আপনি যে এসে অবধি কথাই বলছেন না। ব্যাপার কি? অসুস্থবোধ করছেন না তো?"

নন্দিতাও উদ্বেগ প্রকাশ করে বললেন—

"হাঁ, শিবনাথবাবু, আপনাকে মোটেই ভাল দেখাচ্ছে না। নিশ্চয়ই আপনার শরীর ভালো নয়। কী অত্যাচারটাই না করা গেছে এ ক'দিন! থান্, খেয়ে-দেয়ে আপনি শুয়ে পড়ুন।"

শিবনাথ শুধু সংক্ষেপে জানালে শারীরিক সে ভালোই আছে; কিন্তু, আকস্মিক ভাবান্তরের সন্তোষজনক কোন কারণ না জানায় সবাই একটু অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। কথাবার্তার ভেতর দিয়ে মনটা হাল্কা করে নেবার অভিপ্রায়ে ডাক্তার শিবনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন—

"শিবনাথবাবু, এই অজন্তার শিল্পীদের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। শুনেছি বৌদ্ধরা জগতকে ক্ষণিক এবং দুঃখময় বলে মনে করে। আমি তবে আশ্চর্য হই, ক্ষণিকের জগতে এই দুঃখবাদীরা অজন্তার সৌন্দর্যের এ অমরাপুরী গড়ে তুলল কী করে! ক্ষণ-ভঙ্গুর জগতে এ অমর, অমূল্য সম্পদ্ রেখে যাবার প্রয়াস তাদের কেন হলো? এটা সত্যিই একটা বিস্ময় নয় কি?"

নন্দিতা সায় দিয়ে বললেন—

"বাস্তবিক, আমি ভাবতে পারি না কোথা থেকে বৌদ্ধশিল্পীরা এ মধুচক্র সৃষ্টি করবার প্রেরণা পেয়েছিলেন!"

জিজ্ঞাসুনেত্রে ডাক্তার ও নন্দিতা শিবনাথের দিকে তাকালেন।

কথা বলার অনিচ্ছাসত্ত্বেও শিবনাথ চুপ করে থাকতে পারল না। ধীরে ধীরে সে উত্তর দিলে—

"অজন্তা-ইলোরার শিল্প-সম্পদ আমাদের বিস্ময় জাগায় বৈ কি? আমার মনে কি হয় জানেন? ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর পিছনে অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যের দ্বার উদ্ঘাটন করা যদি আর্টের চরম উদ্দেশ্য হয় তবে এই দৃশ্যমান জগতকে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করাই সম্ভবতঃ রসস্রষ্টার পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক এবং প্রয়োজন। পরিদৃশ্যমান এই জগৎ এবং ইন্দ্রিয়-পরিচালিত এই জীবন ক্ষণিকের দুঃখময় এ উপলব্ধি বৌদ্ধ-শিল্পস্রষ্টাদের হয়েছিল বলেই তাঁরা ইন্দ্রিয়াতীতের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাই লোকচক্ষুর আড়ালে নিভৃতে নির্জনে উষর দুর্গম এই পার্বত্যপ্রদেশে তাঁরা সৌন্দর্যের সাধনা করে গেছেন। এ সাধনার রূপ আমরা বুঝতে পারব না যদি না—দুঃখের ও বেদনার গভীর অনুভূতি আমাদের কোন দিন হয়ে থাকে। এ সৌন্দর্য সর্বসাধারণের জন্যে নয়। এ শুধু তার জন্যেই যে ক্ষণিকের জগতের মায়া তুচ্ছ করে শাশ্বত রসের সন্ধানে বেরিয়েছে।"

সবাই চুপ করে শিবনাথের কথা শুনলেন। কেন কে জানে, কেউ এ আলোচনাকে আর বাড়াতে চাইলেন না। যে উদ্দেশ্যে আলোচনার অবতারণা করা হয়েছিল তা সফল তো হলোই না; বরং মনের সঞ্চিত অস্বস্তি অলক্ষ্যে যেন গভীরতর হয়ে একটা অপ্রীতিকর আবহাওয়ার সৃষ্টি করলে।

আহার শেষ করে সবাই একত্রে বসেছে। এমনি সময় পাশের ঘর থেকে সেই ভদ্রলোকটি এসে যোগ দিলেন। কথাবার্তা আবার সহজভাবে সুরু হলো। ডাক্তারের প্রশ্নের উত্তরে ভদ্রলোকটি জানালেন—রোগিণী একইভাবে শুয়ে আছেন। তাঁর অবস্থা এমনি খাপ্ছাড়া ও দুর্বোধ্য বলে ঠেক্ল যে তাঁকে গিয়ে দেখ্বার বিশেষ আগ্রহ কেউ দেখালে না।

গোড়া থেকেই ভদ্রলোকটি লক্ষ্য করে এসেছে শিবনাথের অদ্ভুত আচরণ। ইলোরায় সাক্ষাতের পর সেই আকস্মিক ঘটনা। শিবনাথ তাঁকে সাহায্য করা দূরে থাক্ একটু সহানুভূতিও প্রকাশ না করে তাঁকে অসহায়ভাবে ফেলে এসেছিলেন। তারপর এ পর্যন্ত বহুবার দেখা হয়েছে রোগিণীর অবস্থা সম্পর্কেও একটা কথা জিজ্ঞাসা করেনি। একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য নিয়ে সে যেন সর্বদা নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে এসেছে। বিদগ্ধ হলেও ডাক্তার ও নন্দিতা সম্ভবতঃ ভেবেছেন এ তার স্বভাবসিদ্ধ ঔদাসীন্য ও নির্লিপ্ততা। কিন্তু ভদ্রলোকটি কৌতূহল এবার চাপা রাখ্তে পারলেন না। হঠাৎ এক সময় আস্তে আস্তে ডাক্তারকে বললেন—

"আপ্নার অপর সঙ্গীটি দেখ্ছি বড্ড reserve"—ভদ্রলোকটি একটু দূরে উপবিষ্ট শিবনাথের দিকে কটাক্ষ-পাত করলেন।

"শিবনাথবাবুর কথা বলছেন? ওরে বাবা, উনি গভীর জলের মাছ।" ডাক্তার মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে শিবনাথকে ডেকে বললেন—

"শুনুন শিবনাথবাবু, উনি আপনার সম্বন্ধে কি মন্তব্য করছেন।"

ভদ্রলোকটির দিকে শিবনাথ তাকালে।

"আপনার—আপনার নাম শিবনাথ……"

ভদ্রলোকটি যেন গভীর আঁধারে কি খুঁজছেন! কণ্ঠস্বরে আশঙ্কা, উদ্বেগ। মুখের দীপ্তি যেন আকস্মিক একটা দমকা বাতাসে একেবারে নিভে গেছে! ভদ্রলোকটির অবস্থান্তর দেখে ডাক্তারও বিস্মিত হয়ে উঠলেন।

শিবনাথ শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বললে—"হ্যাঁ। আমার নাম শিবনাথ বসু। আর কিছু জানতে চান?"

ভদ্রলোকটির আকস্মিক পরিবর্তন ও শিবনাথের নীরস-তীক্ষ্ণ উত্তর ডাক্তার, নন্দিতা এমন কি সমরকেও কেমন বিহ্বল করে তুললে। এরপর ভদ্রলোকটি যখন কোন লৌকিকতা না দেখিয়ে আচম্‌কা উঠে গেলেন তখন সমস্ত ব্যাপারটা একটা গভীর রহস্যে পরিণত হয়ে দেখা দিল। সন্দিগ্ধ বিস্ময়ে নন্দিতা ও ডাক্তার পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন। শুধু শিবনাথ একটি কথাও না বলে ধীরপদে শয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

পরদিন ভোরের দিকে ডাক্তারদের স্বস্থানে ফেরবার কথা। চা-খাওয়ার পূর্বেই নন্দিতা ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে ভদ্রলোকটির ঘরে উপস্থিত হলেন। ভদ্রলোকটি ঘরে নেই। এক পাশে খাটের উপর আড় হয়ে রোগিণী শুয়ে। নন্দিতা আস্তে আস্তে তার কাছে গিয়েই চমকে উঠলেন। এ কি বেশ! দীর্ঘ দিনের রোগেও কারো এ অবস্থা হতে পারে না। মুখে রক্তের লেশও নেই। চক্ষু কোটরে বসে গেছে। বিনিদ্র তার কালো গভীর রেখাপাত দু'চোখের নীচে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। আরক্ত চোখের কোণ বেয়ে অশ্রু-ধারা এখনও মুছে যায় নি।

রোগিণী আস্তে মাথায় ঘোম্‌টা টেনে উঠে বসল। অস্ফুটস্বরে বললে—"বসুন আপনারা।"

ডাক্তার একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। নন্দিতা রোগিণীর পাশেই বসলেন। কিছুক্ষণ পর নন্দিতা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনার স্বামী কোথায়?"

রোগিণী কোন উত্তর দিলে না। শুধু উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল একদিকে।

ডাক্তার এ অবস্থায় বড় অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন। তাই চেয়ার ছেড়ে উঠে নন্দিতার দিকে তাকিয়ে বললেন—

"আমি একটু আসছি। উনি এলে পর আবার আসব। যাবার ব্যবস্থা তো করতে হবে।"

ডাক্তার চলে যাবার পর নন্দিতা আবার জিজ্ঞাসা করলেন ভদ্রলোকটির কথা।

"কোথায় গেছেন আমি তো জানি না"—উদাসনির্লিপ্ত-কণ্ঠে রোগিণী জবাব দিলে। একটু থেমে বললে—

"আপনারা বুঝি এ বেলাই চলে যাবেন?" আবার একটু ইতস্ততঃ করে বললে—

"দয়া করে যদি একটা কাজ করেন……"

নন্দিতা জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন।

বালিশের নীচ থেকে একখানা খামের চিঠি নন্দিতার হাতে দিয়ে রোগিণী সবিনয়ে বললে—

"এ চিঠিখানা যথাস্থানে যদি পৌঁছিয়ে দেন তো বড় উপকৃত হবো।"

নন্দিতা দেখলে খামের উপর ইংরেজীতে 'শিবনাথ বসু' লেখা আছে।

গভীর সন্দেহ ও বিস্ময় নিয়ে নন্দিতা ফিরে এসে শিবনাথকে চিঠিখানা দিলেন এবং পাশেই দাঁড়িয়ে রইলেন। অপরের চিঠি সম্বন্ধে অহেতুক কৌতূহল প্রকাশ যে নিতান্ত অশোভন ও ভদ্রতাবিগর্হিত একথা যেন ভুলে গেলেন। শিবনাথ আগন্তু চিঠিখানা পড়ে নন্দিতার দিকে তাকিয়ে বললে—

"নন্দিতাদেবী, যা' ঘটেছে সে জানবার জন্যে উৎসুক্য দেখানো খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না এই আমি আশা করছি। এই নিন্, চিঠিখানা আপনিই পড়ে নিন্। হয়ত আমার কিছু জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজন থাকবে না।"

চিঠিখানা পড়া উচিত কিনা দস্তুরতঃ তাই ভেবে নন্দিতা একটু ইতস্ততঃ করলেন। তারপর হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নিয়ে পড়ে গেলেন—

"আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় কোনদিন নেই। নীলিমাকে না-পাওয়ার বেদনা যত গভীর হয়েই

থাকুক না কেন, ওর বিয়ের পর থেকে আমি তাকে ভুলতে চেয়েছিলাম। হয়ত ভুলে যেতাম, যদি না একদিন একটা সর্বনাশা দুর্বল মুহূর্তে তাকে আমার একান্ত কাছে নিয়ে আসত। আমার সংযম, সংকল্প, শিক্ষা—সব গেল ভেসে। তার পরের কাহিনী সে এক বঞ্চনার ইতিহাস। আপনার নাম জানার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিরাট যবনিকা আমার চোখের সামনে থেকে সরে গেল। আমার বুঝতে বাকী কিছুই রইল না যে, কেন ইলোরার আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের পর নীলিমা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। কেন—কাকে আবার দেখবার জন্যে, তারপর দিনই সে আমাকে টেনে অজন্তায় নিয়ে এলো। হতভাগিনী পূর্বে বোঝেনি—কার আসনে কাকে বসাতে চেয়েছিল! আমার অপরাধের মার্জনা নেই জানি। আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি না। যদি আমি জানতুম আমাকে পেয়ে তার মনে কোনো দ্বিধা নেই; আজ আমি তাকে নিয়ে অবিচলিতচিত্তে আপনার সামনে দাঁড়াতাম। হতভাগিনী নিজেকে এতদিন বঞ্চনা করেছে। আজ তার নিজের পরিচয় সে পেয়েছে। এ বিস্মৃতির, এ প্রবঞ্চনার জন্যে হয়ত তাকে আজীবন প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কিন্তু আমারই ভরসা অধঃপতন থেকে তাকে আপনি রক্ষা করবেন। সাহায্যের কথা উল্লেখ করে আমি আপনাকে অপমান করতে চাই না। কিন্তু যদি কখনও ওর জন্যে কোন কিছু প্রয়োজন হয় আমাকে আদেশ করবেন। আপনাকে নমস্কার।

প্রণত

নির্মল।"

চিঠি পড়া শেষ হয়ে গেলে নন্দিতা নির্বাক হয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে গভীর সহানুভূতিভরস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—"শিবনাথবাবু, কি করবেন ঠিক করেছেন?"

শান্ত সহজ কণ্ঠে শিবনাথ জবাব দিলে—

"আপনারা চলে যান নন্দিতাদেবী। আমি দু'চার দিনের মধ্যেই আপনাদের ওখানে যাব। আমার সেখানকার প্রবাস এবার শেষ হয়ে এলো। স্রোতে-ভাসা জীবন এবার আবার স্রোতের মুখে ভেসে চলবে। কিন্তু এবারের যাত্রা হবে আমার নিঃসঙ্গ কৈবল্য-যাত্রা।"

ডাক্তারের যাত্রার আয়োজন চলেছে। যে আনন্দোজ্জ্বল চিত্ত নিয়ে সবাই বেরিয়েছিল, আজ ফেরবার মুখে অবাক্ত অপ্রত্যাশিত বেদনায় তা যেন একেবারে ম্লানমান। ডাক্তারের চির-সহাস্য মুখ আজ মলিন। ঠাট্টা-তামাসা দূরে থাক্, পরস্পর বাক্যালাপ করতেও যেন ভালো লাগছে না। যাবার আগে নন্দিতা নীলিমার কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলেন। সজল চক্ষে তাকে জড়িয়ে ধরে সস্নেহে বললেন—

"বয়সে তুমি আমার ছোট হবে বোন্, তাই তুমি বলছি। যদি কোন দিন কিছুর প্রয়োজন হয়, দিদিকে ভুলোনা কিন্তু। মনে থাকবে তো?"

উত্তর দিলে না নীলিমা। শুধু নুয়ে পড়ে নন্দিতার পায়ের কাছে মাথা ঠেকালে।

গাড়ীতে পা দিয়ে পেছন ফিরে নন্দিতা শিবনাথের দিকে তাকিয়ে ভগ্নস্বরে বললেন—"আমাদের ছেড়ে সত্যই কি আপনি চলে যাবেন?"

শিবনাথ দেখলে নন্দিতার চোখে অশ্রু ছল ছল করছে। জবাব দিলে না সে। শুধু নন্দিতার দিকে তাকিয়ে করুণ ম্লানহাসি হাসলে।

গাড়ী ছাড়ল। শিবনাথ হাত তুলে সবাইকে নমস্কার করে নীলিমার ঘরে ফিরে এলো। একটা চেয়ারে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে প্রশ্ন করলে—

—"কি করবে এখন?"

"কি করব"—উদাসকণ্ঠে নীলিমা বললে।

নীলিমা শিবনাথের কথার প্রতিধ্বনি করলে। উত্তরে নির্বাক হয়ে বসে রইল।

অদূরে উপবিষ্টা নীলিমার দিকে তাকিয়ে শিবনাথ ভাবে—

নীলিমা নির্মলকে ভালবাসত, কিন্তু তাকে সে পেল না। তাকে চাওয়া ও তাকে পাওয়াই তো তার পক্ষে স্বাভাবিক। বিয়ের পরও তাকে ভুলতে না পারা নীতির দিকে দিয়ে যত বড় অন্যায়ই হোক্ না কেন, অস্বাভাবিক তাকে বলব কি করে। চলে গেল সে নির্মলের সঙ্গে। এ চলে-যাওয়া সমাজ ও নীতির বুকে যতখানি আঘাত করুক না কেন নীলিমার জীবনের সহজ ছন্দকে ব্যাহত করবার তো কোন কারণ ছিল না। তবু সে-জীবনকে কেন

অনুসরণ করতে পারলে না সে? হিন্দু-নারীর পুঞ্জীভূত অদম্য সংস্কার অলক্ষ্যে তার স্বভাবসিদ্ধ কামনার মূলে কুঠারাঘাত করে তাকে কতখানি দুর্বল ও শিথিল করেছিল তা-ই সে প্রথমে বুঝলে সে-দিন, যে-দিন ইলোরায় শিবনাথের সঙ্গে তার পুনরায় সাক্ষাৎ হলো। নির্মলের সঙ্গে চলে যাবার পর সত্যই কি সে শিবনাথকে ভুলে ছিল। স্বভাবও সংস্কারের দ্বন্দ্ব অজ্ঞাতে অলক্ষ্যে তার চিত্তে যে উত্তাপ উত্তরোত্তর সৃষ্টি করছিল ইলোরায় সে নিরুদ্ধ উত্তাপই তার চিত্ত বিদীর্ণ করে বাহিরে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ জন্য দায়ী কে? নীলিমা সংস্কারের কাছে অবশেষে পরাজয় মেনেছে। কিন্তু এই বিপন্ন জীবনে সে কি কোনদিন নিজের স্বাভাবিক গতি ও স্ফূর্তিকে ফিরিয়ে আনতে পারবে?……

নির্মল ঠিকই করেছে। নীলিমাকে আর ধরে রাখা তার পক্ষে শুধু আত্মপ্রবঞ্চনাই হতো না, অপরাধও হতো। নিজের জীবনে এর প্রতিক্রিয়া যতখানি বার্থতাই আসুক না, আজ নীলিমাকে দেখে তার মনে একটা অনুভূতির উদয় হলো—একে ঘৃণা বলা যায় না, ক্ষমাও বলা যায় না। হয়ত বা করুণা, হয়ত আরো কিছু……

কিন্তু কেন শিবনাথ আজ অবিচলিতচিত্তে ডাক্তারদের সঙ্গে চলে যেতে পারলে না? সে-শক্তি তাকে ধরে রাখলে সে কোন্ শক্তি?—সেও কি সংস্কার? কে জানে?……

জীবনের ধরস্রোতে ভেসে-আসা দুটি হতভাগ্য জীব একদিন কাছাকাছি এসেছিল। আবার কোন্ আবর্তের ঘূর্ণীপাকে পড়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ভেসে-যাওয়ার পথে আবার হলো তাদের দেখা। কে জানে এ যাত্রার অবসান কোথায়?……

বহুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে শিবনাথ দ্বিধাবিমুক্তকণ্ঠে বললে—"অবলম্বন তোমার প্রয়োজন নীলিমা, ওঠ, যাও, হাত-মুখ ধোও।"

"তোমার জীবনে আমি বোঝা হয়ে থাকব কোন্ মুখে"—উচ্ছ্বসিত কান্নার আবেগে নীলিমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো।

শিবনাথ কি ভাবলে—যেন নিজের অন্তরে কি খুঁজলে—তার পর ধীর অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বললে—

"বোঝা বইবার মতো ক্ষমতা হয়ত পুরুষের আছে। যাও, আর দেরী করো না।"

কৃষক ও রুশ-বিপ্লব*

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

পূর্বে বলেছি মার্কস্ ছিলেন ভাবপ্রবণ ও মানব দরদী। তিনি চোখের সামনে দেখেছেন—ইংল্যাণ্ডে কৃষি উন্নত যাচ্ছে, উৎসাদিত কৃষককুল বৃত্তিহারা হয়ে সাময়েরবৃত্তি অবলম্বন করছে, দুর্নীতি ও দুরবস্থার চরম গহ্বরে এরা পড়ছে। এরা একমাত্র জীবিকা পাচ্ছে—কারখানা গুরে নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রি ক'রে। কৃষিতে ফিরে যাওয়ার পথ এদের বন্ধ। ইংল্যাণ্ড ও ইউরোপ কৃষি ছেড়ে কারখানার দিকে ঝুঁকেছিল। এই অবস্থাকেই তিনি দেশকাল নিরপেক্ষ সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন। শ্রমের মর্যাদা তিনি দিয়েছিলেন, এবং সেই শ্রমের একমাত্র রূপ তাঁর চোখ ও মনের সামনে ছিল কারখানার শ্রমজীবীর শ্রম। তাই তাঁর অন্তরের সমস্ত আবেগ, তাঁর মস্তিষ্কের সমস্ত বিচারবুদ্ধি দিয়ে তিনি প্রচার করলেন—কারখানার শ্রমিকের বা শ্রমজীবীর (Proletariat) দাবী—তাদের সর্বকর্তৃত্ব।

মার্কস্ ছিলেন যুগপ্রবর্তক—নব চিন্তাধারার সংবাহক, নব সমাজ ধর্মের ঋষি। এঁরা বিচার দিয়ে যা পান, হৃদয়ের আবেগ দিয়ে তাকে রাঙ্গনের মতো বেগবান করে তোলেন। তার ফলে এঁদের উক্তিতে নূতন কথার প্রতি অতিরিক্ত জোর ও ঝোঁক থাকলে। প্রাচীন কালের ধর্মপ্রচারকদের উক্তি ও শিক্ষার মধ্যে এটা বিশেষ ভাবে লক্ষ করা যায়। মার্কসের লেখার মধ্যে তেমনি একপেশে চিন্তার পরিচয় পাওয়া স্বাভাবিক। নিছক চিন্তার ও ভাবের রাজ্য ছেড়ে মার্কস যখন ব্যবহারিক রাজ্যে তাঁর ভাবধারাকে প্রয়োগ করার কথা ভেবেছেন, তখন তিনি নিজেও এই ত্রুটি অনুভব করেছিলেন। ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়, যে নব চিন্তাধারার প্রবর্তক তাঁর অনুগামী ভক্তদের কার্য ও সংগঠনের নিন্দা করেছেন—যা তা থেকে নিজেকে আলাদা করে রেখেছেন। বিখ্যাত ফরাসী মনীষী রোমারোঁলা লিখেছেন, "There

---

* মৌচাক সংখ্যায় 'মার্কস ও রুশ' নামীয় প্রবন্ধের অনুবৃত্তি।—লেখক

is every reason to believe that, like Voltaire, he (Rousseau) would have derided the revolution (the French Revolution) which acclaimed him"—ইহা অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে। কলো বেঁচে থাকলে ভলটেয়ারের মত তিনিও ফরাসী বিপ্লবকে অস্বীকার করতেন—যদিও ঐ বিপ্লব তাঁরই শিক্ষা ও প্রেরণা অনুসরণ করেছে।* মাৎসিনী ইটালীর স্বাধীনতাকে স্বীকার করলেন না—স্বাধীন ইটালীতে ফিরে আসলেন না—যদিও স্বাধীন ইটালী তাঁর মনে স্থান পেয়েছে। ভাবপ্রবণ চিন্তাবীরগণ অনেক আবেগে যে ভাবধারা প্রচার করেন, কার্যক্ষেত্রে তা' প্রয়োগ করতে গেলে অন্যরূপ ধারণ করে।

মার্কসের কীর্তিকলাপ ইউরোপের এক বিপ্লবী যুগে। ১৮১৮ সালে জন্মগ্রহণ করে দেশেতেই তিনি দেশ ছাড়তে বাধ্য হ'ন। ২৫ বছর বয়সেই তিনি সস্ত্রীক প্যারীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দু' বছর পর, সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি যান বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে। ১৮৪৫ সালের পর তিনি এক বছরের জন্য জার্মেনীতে বাস করেন। আবার তাঁকে হতে হয় ইংল্যাণ্ডে এবং সেখানেই ১৮৮৩ অব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর কীর্তিকালে জার্মেনী, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে নূতন ইণ্ডাষ্ট্রির উৎপাদন প্রবর্তিত হয় এবং এর আনুসঙ্গিক অনাচার সবই তিনি দেখেছেন। নির্বাসিত পলাতক অবস্থায় তিনি বাস করেছেন বেলজিয়াম, প্যারী প্রভৃতি বড় বড় সহরে—যেখানে ইণ্ডাষ্ট্রিবাদ তার বিশ্বরূপ প্রকাশ করেছে। ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার পূর্বেই তাঁর মনে ভাবধারা শ্রমিকদের ঘিরেই বড় হয়েছিল। তাই Communist Manifestoতে ১৮৪৮ অব্দেই তিনি Proletariat বা শ্রমজীবীদের আহ্বান করেছেন।

তাঁর কীর্তিকালের মধ্যে—১৮১৫ ও ১৮৩০ সালের রাষ্ট্রবিপ্লবের স্মরণের কথা ছেড়ে দিলেও ১৮৪৮, ১৮৫১, ১৮৫৯ ও ১৮৭০ সালের বিপ্লব বিদ্রোহ ও যুদ্ধবিগ্রহ এবং দ্রুত ইণ্ডাষ্ট্রিবাদের প্রসার, সমগ্র ইউরোপে একটা বিপ্লবাত্মক আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল। ১৮৭১ সালের "প্যারী কম্যুনের" (Paris Commune) ক্ষুদ্র চেষ্টা তাঁর কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। "প্যারী কম্যুন" ছিল সহরে জনতার কীর্তি এবং সহরেই ও তার আশেপাশেই তা সীমাবদ্ধ ছিল। সহরে শ্রমজীবীদের এই প্রচেষ্টাকে ব্যাপকক্ষেত্রে প্রয়োগ করার কোন কল্পনাও তাঁর মনে আসেনি। সে কল্পনা তাঁর মনে জেগেছিল জার্মেনীর বিপ্লবের কল্পনায়। কেবল শ্রমজীবী বা Proletariat দিয়ে যে জার্মেনীতে বিপ্লব সাধিত হতে পারে না, বা বিপ্লবী সমাজ গড়া যায় না, এই ব্যবহারিক সহজ সত্যটি বুঝতে তাঁর দেরী হ'ল না। তাই তিনি এঙ্গেলসের কাছে লিখেছিলেন—"The whole thing in Germany will depend on the possibility of backing the proletarian revolution by a second edition of the Peasants' war."

—জার্মেনীতে সমস্তটাই নির্ভর করবে শ্রমজীবী বিপ্লবের পিছনে প্রথম মহাযুদ্ধের চাষী বিদ্রোহের অনুরূপ কোন বিদ্রোহ আছে কিনা, তার উপর। মার্কস্ এখানে কৃষকদের মূল্যও স্বীকার করেছেন, যা তাঁর দুই শ্লোগানে—"Proletariats of the world, unite" এবং "Dictatorship of the proletariat" স্বীকার করা হয় নি।

কিন্তু মার্কসের এই স্বীকৃতির মর্ম তাঁর তাত্ত্বিক শিষ্যগণ (theoretical disciples) অনুধাবন করতে পারলেন না। এমন কি বিখ্যাত প্লেখানভ (Plekhanov) পর্য্যন্ত লিখেছেন—"apart from the bourgeoisie and the proletariat, we perceive no social forces in our country in which operational or revolutionary conditions might find support."—আমাদের দেশে শ্রমজীবী ও শিক্ষিত ভদ্রলোক ব্যতীত আর কোন শ্রেণী দেখছি না, যার কাছে কোন সরকার বিরোধী অথবা বিপ্লবী পরিস্থিতি সমর্থন আশা করতে পারে। এর অর্থ হ'ল—প্লেখানভের মতে জার্মেনীতে শ্রমজীবী এবং মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরাই কতকটা বিপ্লবাত্মক এবং এরা ছাড়া আর কেউ বিপ্লবাত্মক নেই। সোজা কথায়—কৃষকরা বিপ্লবী গণ্ডীর বাইরেই পড়ল।

কিন্তু লেনিন এসে অন্য সুরে আহ্বান দিলেন। তিনি বললেন—কৃষকদের সঙ্গে হাত মিলাতেই হবে। লেনিন ছিলেন ব্যবহারিক চিন্তক (thinker); ব্যবহারিক পরিমাপে মার্কসের মতবাদ তিনি যথেচ্ছ অবল বদল করেছেন। ফরাসী বিপ্লবের পর রবসপিয়ার (Robespierre) রুশোর কবর তুলে প্যারীতে নিয়ে আসেন; শুনেছি, মার্কসের সমাধিও লণ্ডন হ'তে মস্কোতে আনা হয়েছে। রোঁমারোঁলা রুশো সম্বন্ধে বলেছেন—তিনি জীবিত থাকলে ফরাসী বিপ্লবকে অস্বীকার করতেন। মার্কসের সম্বন্ধে বলা যায়—তিনি জীবিত থাকলে লেনিনকে ও তাঁর বলশেভিক-বিপ্লবকে অস্বীকার করতেন। মার্কস চেয়েছিলেন কেবল শ্রমজীবীদের বিপ্লব; লেনিন সেখানে আনলেন কৃষিজীবীর সহযোগিতায় বিপ্লব। মার্কস বলেছিলেন—"একসঙ্গে সব বা একটামা অধিকাংশ সভ্যদেশে বিপ্লব হলেই কম্যুনিষ্ট বা সাম্যবাদী বিপ্লব সফল হ'তে পারে।"* কিন্তু লেনিন এক দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আয়োজন করলেন। মার্কস্ বলেছিলেন যে পার্লিয়ামেণ্টারী সাধারণতান্ত্রিক

* রুশো ও ভলটেয়ার—উভয়েই বিপ্লবের ১১ বছর পূর্বে—১৭৭৮ অব্দে দেহ ত্যাগ করেন।

* "Engels and Marx arrived a the conclusion that the socialist revolution could not be victorious in one country taken singly, that it could be victorious only by a simultaneous stroke in all or majority of the civilized countries.—Hist. of C. P. S. U. (B) P.

গণতন্ত্রের (Parliamentary democratic Republic) মারফতই পুঁজীবাদ হতে সাম্যবাদে যাওয়া যাবে ; শেষ দিয়ে তিনি একটু ঘুরে বলেছিলেন, যে প্যারী কম্যুনের মতো রাষ্ট্র দিয়েও ইহা সম্ভব। এঙ্গেলস্ শেষ পর্য্যন্ত বলেছেন, "Democratic republic is the specific form for the dictatorship of the proletariat" • কিন্তু তৎস্থলে লেনিন গ্রহণ করলেন সোভিয়েট—যা প্যারী কম্যুনের অনুরূপও নয়, পার্লিয়ামেন্টারী গণতন্ত্রও নয়। War communism, Nep planning এর কোনটাই মৌলিক মার্কসবাদ নয়। কাজেই মার্কস্ এই বিপ্লবকে তাঁর মতানুযায়ী বিপ্লব বলতেন কিনা সন্দেহ।

১৯০৫ সালের পর হ'তে লেনিন ক্রমেই কৃষকদের প্রতি বেশী করে নজর দিতে সুরু করেন। "শ্রমজীবী ও কৃষিজীবীর সোভিয়েট"—এই ছিল তার কথার ধুয়া। তিনি ক্রমাগত তাঁর দলস্থ পুঁথি-বিদ্যাদের বলেছেন—কৃষিজীবীদের সঙ্গে মিতালী করতেই হবে। বিপ্লবের পরও তিনি বহুবার বলেছেন, "It goes without saying that without this alliance, the October revolution could not have been victorious,"—শ্রমজীবী ও কৃষিজীবীদের সঙ্গে এই মিতালী সাধিত না হ'লে অক্টোবর বিপ্লব কখনও সফল হ'ত না। প্রথমে লেনিনের মত ছিল কেবল গরীব কৃষকদের সঙ্গেই সহযোগিতা করতে হবে ; মধ্যবিত্ত ও ধনী কৃষকদের সঙ্গে মিতালীর কথা তখনও কল্পনায় আসেনি। কিন্তু বিপ্লবের বেড় বছর পর লেনিন হৃদয়ঙ্গম করলেন—বলসেভিকদের প্রতিষ্ঠিত কেবল Committees of Poor Peasants"—কেবল—দরিদ্র কৃষক সমিতি দিয়ে কাজ এগুবে না। কম্যুনিষ্ট পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে লেনিনের চেষ্টায় প্রস্তাব গৃহীত হল যে মধ্যবিত্ত কৃষকদেরও সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের কাজে আনতে হবে।—"Gradual and systematic enlistment of the middle peasantry in the work of socialist construction"—এবার সমবেতকণ্ঠের মত তিনি ধ্বনি তুললেন—"Learn to come to an agreement with the middle peasant," মধ্যবিত্ত কৃষকদের সঙ্গে আপোষ করতে শিখো।

ঐ-বিপ্লবের অন্যতম প্রধান কর্মী ছিল যুদ্ধপ্রত্যাগত সৈনিকগণ। যুদ্ধপ্রত্যাগত সৈনিকদের সাহায্য ভিন্ন এই বিপ্লব কখনও সফল হ'তে পারত না। কিন্তু এই সৈন্যরাও আসলে কৃষক। ১৯০৫ সালের বিপ্লব ব্যর্থ হবার কারণ হিসাবে সৈন্যদের অসহযোগের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে কৃষকগণ ব্যাপকভাবে এই বিপ্লবে যোগ দেয়নি বলে সৈন্যগণও এই বিপ্লব সম্বন্ধে অনেকটা নির্বিকার ছিল ; কারণ সৈন্যগণও কার্য্যতঃ কৃষক পুত্রই, কেবল পোষাক পরেছে সামরিক (Hist. of C. P. S. U. P 89)। শ্রমজীবীর শ্রেণী হ'তে সৈনিক বেশী আসে না এবং সৈন্যদের স্বার্থও কৃষিগত (agrarian)। কাজেই বিপ্লবে তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা পেতে হলে, কৃষকদের সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়া চাই।

বিপ্লবে কৃষিজীবীদের উপযোগিতার জন্য বীকৃতিও আছে। ১৯০৫ সালের ব্যর্থতার একটী কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে যে কৃষকগণ ঐ বিপ্লবে বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ দেখান নি। লেনিন বলেছেন—"The peasants' actions were too scattered, too unorganised and not sufficiently aggressive ; that was one of the fundamental causes of the defeat of the revolution,"—কৃষকগণ ছুটকা ছাটকা ভাবে কিছু করেছে, কিন্তু সংঘবদ্ধ ও বিশেষ কিছু ক'রে কিছু করেনি এবং ইহাই ঐ বিপ্লবের ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ।

অক্টোবর বিপ্লবের প্রাক্কালে সমস্ত দলের বিরুদ্ধে একা দাঁড়িয়ে লেনিন যখন ঐ অক্টোবর বিপ্লব করার জন্য জেদ করেছিলেন—যখন তিনি ব'লেছিলেন, ৩রা অক্টোবর হ'লে অতি সত্বর, ৮ই হ'লে অতি দেরী, —৭ই-ই হ'ল ঠিক সময়—তখন তাঁর ঐ জেদের কারণ স্বরূপ তিনি বলেছিলেন,—"সমস্ত দেশময় কৃষকগণ বিদ্রোহী হয়েছে ; ঐ কৃষক বিদ্রোহের অপার শক্তি প্রমাণিত হ'য়েছে। কেরেনস্কির কসাক বাহিনী এক এক ক'রে এই বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করেছে। আমরা কি সেই পর্য্যন্ত অপেক্ষা করব ? • ঐ প্রবন্ধে লেনিন অন্যত্র লিখেছেন —সরকার এই কৃষক বিদ্রোহকে নিষ্পেষণ করার চেষ্টা করছে, এই সময় যদি তারা এই বিদ্রোহে যোগ না দেয়, তবে কৃষকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে।

কারণ এই কৃষক বিদ্রোহকে দাবাতে দেওয়ার অর্থ হ'বে সমগ্র বিপ্লবকে নষ্ট করা—চিরতরে এবং অপ্রত্যাহার্য্যরূপে নষ্ট করা হবে। দূর ও প্রত্যন্ত প্রদেশগুলি (যথা, সাইবেরিয়া, Trans-caucasus প্রভৃতি) বাদ দিয়ে ৯০১টী জেলার মধ্যে ৬৫৯টী জেলায় ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ সুরু হয়েছিল।

কাজেই কৃষকদের বিপ্লব প্রচেষ্টার মূল্য লেনিন সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তেমন মৌলিক মার্কসবাদী হলে হয়ত তিনি বলতেন যে কৃষক প্রবর্ত্তিত এই বিদ্রোহ স্থগিত রাখা উচিত—কারণ বিপ্লব করবে শ্রমজীবীরা ; অন্যের সংস্পর্শ লাগলে ঐ বিপ্লবের জাতযায়া যাবে। সেই জাতযায়া বিপ্লবকে তাঁরা হয়ত অদ্ভুৎ বলে বর্জ্জন করতেন ; যা বড় জোর সেই বিপ্লবে মাতব্বরি করতে গিয়ে বিভেদ সৃষ্টির—

• preface to the Erfurt Programme.

• Throughout the country, the peasant uprising is flaring up The tremendous power of the peasant uprising is proved by the fact ...shall we wait until the Cossack units of the Kornilovist Kerensky have succeeded in suppressing the peasant uprising piece-meal ?

"The Bolsheviks would be traitors to the peasants for, to tolerate the suppression of the peasant uprising .....means to destroy the whole revolution, to destroy it for ever and irrevocably.

faction work—তার দ্বারা কৃষকদের নেতৃত্বে বেশ কিছু লিখেন বা শিখে গেলেন।

কিন্তু লেনিনের মনোভাব অন্যরকম ছিল।—তিনি কৃষকদের সংগ্রামের ব্যথা ও মূল্য বুঝেছিলেন। বিপ্লবের পূর্বের দিন—৭ই নভেম্বর—তিনি লিখেছেন—"কে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতাকে কেড়ে আনবে? এই সময়ে এই প্রশ্নের বিশেষ মূল্য নেই। সামরিক বিপ্লবী কমিটি বা অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠান ক্ষমতা দখল করতে পারে—যদি তারা এই ঘোষণা করে যে তারা সৈন্যদের স্বার্থ দেখবে (অবিলম্বে যুদ্ধ শেষ করে সন্ধি স্থাপন করা) যারা কৃষকদের স্বার্থ দেখবে (ব্যক্তিগত সম্পত্তি লোপ করে অবিলম্বে জমি কেড়ে নেওয়া) এবং শ্রমিকদের স্বার্থ দেখবে, প্রকৃত ক্ষমতায় সেই সব প্রতিনিধিদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা ফিরিয়ে দিবে।*

এখানেও লেনিন বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন সৈন্য ও কৃষকদের স্বার্থের কথা।—শ্রমিকদের উল্লেখের অভাব কি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার নয়? সেক্ষেত্রে এমনি একটা উক্তি করার মতো লোক লেনিন ছিলেন না। এই চিঠিখানার একেবারে শেষের দিকে তিনি লিখেছেন, —ক্ষমতা (বলশেভিকদের) উপরই বিপ্লবকে রক্ষা করা নির্ভর করছে; সন্ধি স্থাপন করা, পেট্রোগ্রেডকে রক্ষা করা, ক্ষুধার হাত থেকে রক্ষাকে বাঁচানো ও কৃষকদের হাতে জমি দেওয়া—। এই ত' হ'ল তার কাছে বিপ্লবকে বাঁচাবার তখনকার মতো মূর্খ এবং প্রত্যক্ষ কাজ। সেখানে শ্রমিকদের কোন উল্লেখ নেই। কথা উঠতে পারে—শ্রমিকেরা ত' বিপ্লব করেছে, তাই তাদের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন কিন্তু এই কথা নির্ভুল নয়। বিপ্লবের বাহন লেনিনের কাছে ছিল—বলশেভিক দল এবং তার মূল ছিল কৃষক, শ্রমিক ও সৈনিকের কোয়ালিশন। তাদের বিপ্লবের মূল ছিসাবে শ্রমিকদের সাথে কৃষিজীবী ও সৈনিকদের কথা। বরং কৃষিজীবীরা বিপ্লব সুরু করে দিয়েছে, শ্রমিকেরা তাদের ত্যাগ করে বিপ্লবের জন্য এক পা' উঠিয়ে তৈরী হয়ে আছে। কৃষক বিদ্রোহ দমনের জন্য অস্থায়ী সরকার যে সব সৈন্য গ্রামে পাঠাত, তারা প্রায় সবাই সেখানে গিয়ে কৃষকদের সঙ্গে যোগ দিত, কেরেন্স্কির কসাক বাহিনী এই বিষয়ে সরকারের নিকট সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বাহিনী ছিল। অনেক সময় যুদ্ধ প্রত্যাগত সৈনিকগণ কৃষকদের মধ্যে যোগ দিয়ে তাদের আরও উত্তেজিত করে তুলত। কৃষকদের মধ্যে অনেক সময় নেতৃত্বের ও ঐক্য সংগঠনের অভাব থাকত; সৈনিকগণ এসে সেই অভাব পূরণ করতে লাগল, কারণ তারাও মূলতঃ কৃষক। Trotsky—History of Russian Revolution. p 876-877)। শ্রমজীবীর চেয়ে তারা পিছিয়ে নেই বরং এগিয়েই আছে। লেনিন ঐ যে সব লেখার ভিতর দিয়ে যাদের কাছে বিপ্লবের জন্য জোর করছেন, যাদের উত্তেজিত করছেন, যাদের সারি (rank) থেকে নিজের পদত্যাগের কথা বলছেন, তারা ত' শ্রমজীবী নয়, তারা হল বলসেভিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটি। (Central Committee)।

কেবল এই নয়—বিপ্লবের পরও তিনি যে ক্রমেই কৃষকদের স্বার্থের দিকে বেশী করে দৃষ্টি দিয়েছেন, তা' পূর্বেই উল্লেখ করেছি। বিপ্লবের প্রারম্ভেই দরিদ্র কৃষক কমিটি (Committee of Poor Peasants) স্থাপন করা হয়েছিল, বিপ্লবের পর পুনর্গঠনের মুখে লেনিন বুঝলেন যে সংঘবদ্ধ কৃষকদের সহযোগিতা ভিন্ন সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন সম্ভব নয়। চতুর্দশ কংগ্রেসে (১৯২৫) পর্য্যন্ত ষ্টালিন বলেছেন যে—বলসেভিকদের দলের প্রধান কাজ (main task) হ'ল সমাজতান্ত্রিক সংগঠনে শ্রমজীবী ও সংঘবদ্ধ কৃষিজীবীর মধ্যে মিতালী বজায় রাখা। (History C. P. S. U.P. 295) ১৯১৮-১৯ সালের গৃহযুদ্ধে (Civil War) এবং বিদেশী হস্তক্ষেপের যুদ্ধের (War of Intervention) সময় সংঘবদ্ধ কৃষকদের সাহায্য বিশেষ দরকারী বলে বিবেচিত হয়েছিল; তাদের সাহায্য ছাড়া বিপ্লব টিকে যাবার উপক্রম হয়েছিল। তাই বলসেভিক পার্টি অষ্টম কংগ্রেসে (১৯১৯) সিদ্ধান্ত করল, ব'লে ক'য়ে বুঝিয়ে তাদের আপত্তি দূর করতে হবে—জোর করে তাদের দল মানিয়ে সে কাজ হবে না। (to be overcome by persuation and not by compulsion or coercion)।

বিপ্লবের পূর্বে, বিপ্লবের মুখে ও পরে কৃষকদের মনোভাব ও কার্যকর্ম সম্বন্ধে এত কথা লিখলাম, এই সম্বন্ধে লিখবার আরও বহু ছিল। একটা খুব সুলভ ধারণা প্রচলিত আছে যে বলসেভিক বিপ্লব বিশুদ্ধ—শ্রমজীবীদেরই কাজ (Proletariat)। এই ধারণা যে কতটা ভিত্তিহীন তা দেখাবার জন্যই রুষ বিপ্লবে কৃষিজীবীদের অংশ ও স্থান সম্বন্ধে এতটা লিখলাম। এবং এই সব কাহিনীই সংগৃহীত হয়েছে তাদের লেখা হতে যারা মূলতঃ শ্রমজীবী বিপ্লবের প্রচারক ও মুরব্বি—যাঁরা যৌবনকাল হতে তাঁদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছেন বৈপ্লবিক শ্রমজীবী সংগঠনে। Narodniks বা Social Revolutionary প্রভৃতি পুরাণো দল বরং যখন কৃষকদের মধ্যে কিছু কিছু বৈপ্লবিক প্রচার ও সংগঠন করেছেন, তখন মার্কসপন্থীরা তাদের নিন্দা করেছে;—ভদ্রলোকের বা ছুটকে ভদ্রলোকের (bourgeoise বা Petty bourgeoise) দল বলে এদের বিরুদ্ধে প্রচার করেছে। লেনিনের বিপ্লবী প্রতিভার স্পর্শ না পেলে এরা কেবল মার্কসের পুঁথি নিয়েই পড়ে থাকত এবং

---

* who should seize power? At present this is not important. Let the Military Revolutionary committee seize it or some other institution which declares it will relinquish the power only to the real representatives of the interest of the people, the interests of the army (Immediate offer of peace), of the Peasants (take the land immediately, abolish private property), the interests of the hungry.

† Upon them (the Bolsheviks) depends the saving of the revolution, the offer of Peace, the saving of Petrograde, the saving from starvation, the transfer of land to the peasants.

বিপ্লবের স্রোত পাশ দিয়ে বৃথা বয়ে গেলেও এরা তাকে কাজে লাগাতে পারত না। যখন বলশেভিক দল বিপ্লবের দিনক্ষণ নির্ণয়ের চর্চা নিয়ে ব্যস্ত ছিল, তখনও গ্রামে গ্রামে ব্যাপকভাবে কৃষকগণ বিপ্লব সুরু করে দিয়েছিল। এই বিষয় দিয়েছেন ট্রটস্কী—তিনি শেষ পর্য্যন্তও সমাজতান্ত্রিক সংগঠনে কৃষকদের সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। বিদেশী হস্তক্ষেপের যুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধের সময় কেবল গরীব কৃষক নয় মধ্যবিত্ত কৃষকদেরও টেনে আনতে হয়েছিল, বিপ্লবকে রক্ষা করতে। যে সামরিক বাহিনী এই যুদ্ধে বিপ্লবকে বাঁচিয়ে রাখল, সেই বাহিনী ছিল ট্রটস্কির ভাষায় Primarily peasant army—প্রধানতঃ কৃষকবাহিনী। Nep—নব আর্থিক ব্যবস্থায় ও পাঁচ বছরের সরঞ্জাম সংগঠনে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত কৃষকদের সহযোগিতা অত্যাবশ্যক বলে বিবেচিত হয়েছিল ;—তাই বলের সভায় বারবার প্রস্তাব পাশ হ'ল—জোর করে নয়, বোঝা-বুঝিয়ে সুজিয়ে তাদের সাহায্য পেতে হবে। কাজেই সুরু হতে শেষ পর্য্যন্ত, কৃষকদের দামই ছিল সব চেয়ে বেশী।

কিন্তু তা সত্ত্বেও বলশেভিকগণ নানা ভাবে কৃষকদের উপর অবিচার করেছে। ধনী কৃষক বা কুলাকের (Kulak) কথা অবশ্য ছেড়ে দিচ্ছি ; কারণ তারা ছিল আমাদের দেশের খুঁদে তালুকদারের মতো পর-শ্রমজীবী। কিন্তু গরীব ও মধ্যবিত্ত কৃষকদের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার না করা নিতান্তই অত্যাচারমূলক ও অন্যায়। কৃষকদের রাষ্ট্রাধিকার প্রায় ছিল না বললেই হয়, রাষ্ট্রের সর্বকর্তৃত্ব ন্যস্ত ছিল কারখানার শ্রমজীবীদের উপরে। মার্ক্সের শিক্ষা ও লেনিনের অনুযায়ীই বলশেভিকগণ এটা করেছিলেন। এই বিষয়ে লেনিনও পুঁথির শিক্ষার উর্দ্ধে উঠতে পারেন নি। তিনি বেঁচে থাকলে হয়ত বাস্তবের ও অবস্থার সংস্পর্শে পুস্তকের মন্ত্রমায়া সত্বরই কাটিয়ে উঠতে পারতেন। তাঁর নেতৃত্ব হ'তে মুক্ত হ'য়ে বলশেভিকগণ আরও বেশী করে পুস্তকগত মন নিয়ে চলবার দিকে ঝুঁকল। বিশেষ করে লেনিনের মৃত্যুর পর হতেই বলশেভিকদের দলের মধ্যে যে আত্মঘাতী লড়াই সুরু হল, তাতে প্রত্যেক পক্ষই মৌলিক ও তত্ত্বঘাতী হ'য়ে উঠল। অপরপক্ষ যে মার্ক্স ও লেনিনের মতের ব্যতিক্রম করছে এবং নিজে যে অত্যন্ত মিষ্টার সঙ্গে পূর্বগামী গুরুদের বাক্য ও শিক্ষা মেনে চলছে—এই ত ছিল তখন দলের বিশিষ্ট লেতাদের প্রতিপাদ্য বিষয়। যখন ট্রটস্কীর প্রভাব সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হল এবং অপর কোন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না, তখনই আবার বলশেভিকগণ বাস্তবকে অবাধন করতে মন দিল। ১৯২৮-৩৯ সালের শাসন সংগঠনে কৃষিজীবী ও শ্রমজীবীর সমান ভোটাধিকার স্বীকৃত হ'ল—তার পূর্বে নয়। আজও বোধ হয় সোভিয়েট রাষ্ট্রে কৃষকদের পূর্ণ রাষ্ট্রাধিকার স্বীকার করা হয় নি—বোধ হয়, এখনও তারা আলাদা ভাবে সংঘবদ্ধ হ'তে পারে না।

দেশের শ্রমশীল বিরাট জনতাকে অধিকারচ্যুত ক'রে রাখতে গেলে রাষ্ট্রের কুফল রাষ্ট্রের ও সমাজের অঙ্গে দেখা দিবেই। এতে শাসন ব্যবস্থা কখনও সহজ ও সরল হতে পারে না। জনতার স্বাভাবিক অধিকার অস্বীকার ক'রে কোন্ প্রকার গণতান্ত্রিক শাসন গড়ে উঠতে পারে? তার ফলে গজিয়ে উঠে আমলাতন্ত্র, পুলিশতন্ত্র ও সেনাতন্ত্র। লেনিন বলেছিলেন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে সৈন্য, আমলাতন্ত্র ও পুলিশ থাকবে না। অন্যত্র বলেছিলেন—a state, replacing the standing army and the police by a direct army of the people itself—স্থায়ী সৈন্য ও পুলিশের বদলে ঐ রাষ্ট্রে সমগ্র জনতাকে সশস্ত্র করা হবে। সোভিয়েট রাষ্ট্রে লেনিনের এই নীতির সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম হয়েছে। লেনিন আরও বলেছিলেন—পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে জনতার স্বাধীন রাজনৈতিক জীবনকে হত্যা করা হয় ; সমগ্র রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক গঠনে জনতার অংশ গ্রহণে বাধা দেওয়া হয়, কিন্তু সোভিয়েট রাষ্ট্রে ঠিক এর উল্টা অবস্থা হবে।* এই দুটি উদ্ধৃত উক্তির মধ্যে People ও masses জনসাধারণ ও জনতা—শব্দ দুটীর উদ্দেশ্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার ;—কেবল শ্রমজীবীর কথা বলেন নি, অথচ এই নীতি সোভিয়েট রাষ্ট্রে প্রতিফলিত হয় নি। লেনিন এই উক্তি করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত এপ্রিল থিসিসে (April Thesis). বিপ্লবের মাত্র ৯।১০ মাস পূর্বে। অথচ দলের এতদিনের মুখস্থ বুলি Dictatorship of the Proletariat—শ্রমজীবীর একতন্ত্রী—দলকে নিয়ে গেল অন্য পথে। তখন সোভিয়েট রাষ্ট্রে বা রুশিয়াতে—শতকরা ৮০ জন ছিল কৃষি-উপজীবী এবং শতকরা ৭।৮ জন মাত্র ছিল কারখানা শ্রমিক।

যারা পরশ্রম-জীবী তাদের ত' সমাজ থেকে খানিয়ে (liquidate) লোপ করে দেওয়া হ'ল। সেই দুষ্টদের পরশ্রমজীবীদের জন্য কেউ দুঃখ করবে না ;—সমাজের সম্পদ উৎপাদনে যারা নিজেদের শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করবে না—সমাজে তাদের অধিকার নিয়ে কোন বিতর্কও হওয়া উচিত নয়। কিন্তু যারা সমাজের সব চেয়ে মৌলিক সম্পদ উৎপাদনে নিজেদের শ্রম নিয়োজিত করছে, যাদের শ্রমোৎপন্ন সম্পদ দিয়েই সমাজের সব কারবার চলছে, যারা সংখ্যায় শতকরা ৮০, তাদের বঞ্চিত করে রাখার পিছনে না আছে যুক্তি, না আছে সমাজ বিজ্ঞানের সমর্থন।

* Parliamentary bourgeoise republic strangles and crushes independent political life of masses, their direct participation in the democratic upbuilding of all state life from top to bottom. The opposite is true about the Soviets.

আকাশ পথের যাত্রী

শ্রীসুষমা মিত্র

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সারারাত ঘুমে ছোটেলে ফিরে ঘরের কাগজটি নিয়ে বসলাম : কাগজের পাতা উল্টে দেখি সামনেই বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে—সভদের হাউস অফ্ কমন্স Indian Independence Bill পেশ করা হল।

স্বাধীনতার নামটুকু শুনেই মুহূ আমায় জিজ্ঞাসা করল—তবে কি আমরা স্বাধীন হলাম, মা ?

স্বাধীন হবার আনন্দ যে আজ কিভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা শুনে আমার চক্ষু সার্থক হল।

কে দুমে কি করছে বিধাতাই জানে।

সকালে চলেছি আমরা ফ্রেডের হাসপাতালের কাছে। আমরা দিবসে ২১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে :—তার মধ্যে, জলে ডুবেছে—১২৭ জন, গাড়ী চাপা পড়েছে ৭৪ জন এবং আরো ৭৪ জনের রহস্যজনক মৃত্যু ঘটেছে। আমরা আজ রাতে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী নিখিলানন্দের সাথে দেখা করতে যাব। সেখানে অনেকদিন পরে তাঁর হাতের রান্না কফির ডালনা, মাছের ঝোল, ডাল ও ভাত খেয়ে পরম পরিতৃপ্ত হয়ে হোটেলে ফিরে এলাম।

রাতে বাক্স গোছানোর পালা শুরু করা গেল। আগামী কাল ভোরেই আমরা 'আটলিণ্টিক যুক্তরাষ্ট্র' ছেড়ে চলে যাব।

৯ই জুলাই। ভোর ৬টায় Dublin যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম Pan American Air Terminus উপস্থিত হয়ে ঘর দিতে গিয়ে দেখি একটি লোক আর মুহূকে চুলতে চুলতে উত্তর করছে আজ বিমান ছাড়বে না। তাকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে বলল, হয়তো বিকালে ছাড়লেও ছাড়তে পারে। বিমান ছাড়ার কোন সঠিক খবর জানা গেল না, আমরা চিন্তিত চিত্তে সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম। আবার আমরা হোটেলে ফিরে ঘরে গিয়ে একটু ঘুমলাম, তারপর কফি খেয়ে বাইরে বেরিতে পড়লাম। মনে পড়ল, আমেরিকা তো ছেড়ে চলেছি কিন্তু বিশ্ববিখ্যাত স্বাধীনতার মূর্তি—Statue of Liberty তো দেখা হল না। আমেরিকার প্রবেশ দ্বারে নিউ-ইয়র্কের বন্দরের ঠিক সম্মুখেই একটি ছোট দ্বীপে মূর্তিটি স্থাপিত। জাহাজ যখন বন্দরে প্রবেশ করে প্রথমেই চোখে পড়ে এই মূর্তি। আমরা একটি Ferryতে করে দ্বীপে গেলাম ; দ্বীপে নেমে Elevatorএ করে ২০ তলা উপরে মূর্তির পাদদেশে উপস্থিত হলাম। মূর্তিটির ভিতরের দিকে ১৭৫ ধাপ সিঁড়ি উপরের মুকুট অবধি উঠে গেছে ; মুকুট হতে বন্দরের দৃশ্য বহুদূর অবধি দেখা যায়। ফরাসী শিল্পী Bartholdi মূর্তির নির্মাতা। স্বাধীনতার প্রতীক এই মূর্তিটি তৈরী করে ফরাসীরা আমেরিকাবাসীদের উপহার স্বরূপ পাঠায়।

আমেরিকা স্বাধীনতার মূর্তি

এই নারী মূর্তিটির এক হাতে বই ও অপর হাতে মশালের আলো

রয়েছে। মূর্ষিটি এত বিরাট যে এর মুকুটের পরিধির ভিতরে ৫০ জন লোক অনায়াসে দাঁড়াতে পারে।

আমরা ফেরিতে করে বন্দরে ফিরে হোটেলে উপস্থিত হলাম। Air Officeএ ফোন করে খবর নিতেই তারা বলল—বিমান সকাল ৯টায় ছেড়ে গেছে। হতবুদ্ধি হয়ে টেলিফোন রেখে তখনই Air Terminusএর দিকে ছুটলাম। P. A. A অফিসে গিয়ে খবর নিয়ে জানলাম তাদের কোনো বিমানই দাঁড়াবে না এবং আজ কোন বিমান দাঁড়াবেও না।

Dublin Medical Conference-এর জন্য ওঁকে ৭ই জুলাইয়ের পূর্বে Dublinএ পৌঁছবেই হবে। সুতরাং উনি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে অন্য যে কোনও বিমানে আজই যাবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সকল কোম্পানী হতেই উত্তর আসে—আজ আর কোন বিমান দাঁড়াবে না কারণ, কোন লোক কাজে আসে নি।

যাহোক শেষে American Overseas Airlinesএ আমাদের তিনটি সিট মিলল। বিমান আজই রাত ৮টায় যাত্রা করবে। প্রকাণ্ড চার ইঞ্জিনের বিমান: কিন্তু যাত্রী আমরা ১০ জন মাত্র; বাকি সমস্ত সিটই খালি চলেছে। আমরা আমেরিকার মাটী ছেড়ে আকাশে উড়ে চললাম। আমি জানলার ধারে বসে বাইরের দৃশ্য দেখছি। হঠাৎ চোখে পড়ল ইঞ্জিনের গা দিয়ে আগুনের শিখা ছুটছে। আমরা ভীষণ ভয় পেয়ে স্টুয়ার্ডেসকে জিজ্ঞাসা করলাম। সে অভয় দিয়ে জানালো যে ওটা কিছু নয়: পুরাতন ধরণের বিমানে Exhaust fire যেমন থাকে এখানে পাশেই থাকে, সেইটাই বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে; নূতন বিমানে আগুন ইঞ্জিনের নীচের দিকে থাকে। আমরা তো চলেছি। ক্রমে রাতের অন্ধকারে পৃথিবী ঢেকে গেল। আমরা আটলান্টিক মহাসাগরের উপরে শূন্যে ভাসতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি স্টুয়ার্ডেস রবারের Jacket পরে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল; তারপর প্রত্যেক যাত্রীর কাছে গিয়ে এই Air Jacketএর ব্যবহার প্রণালী দেখিয়ে দিতে লাগল। আমাদের ভয় আরো বাড়ল, মনে মনে ভাবলাম হচ্ছে যে বিপদের সম্ভাবনা হয় তো রয়েছে তাই এই সতর্কবাণী। শেষে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে স্টুয়ার্ডেস বুঝিয়ে ও দেখিয়ে দিতে লাগল যে কেমন করে শূন্যে লাফিয়ে পড়ে প্যারাশুট খুলতে হয় এবং রবারের জ্যাকেট ফুলিয়ে জলে ভাসতে হয়; অগ্নিনির্বাপণের প্রকৃত ব্যবস্থাও সে দেখিয়ে দিল। খুকুকে আমি কিছুই দেখতে দিলাম না; আমার

বিমান থেকে নিউইয়র্কের শেষ দৃশ্য

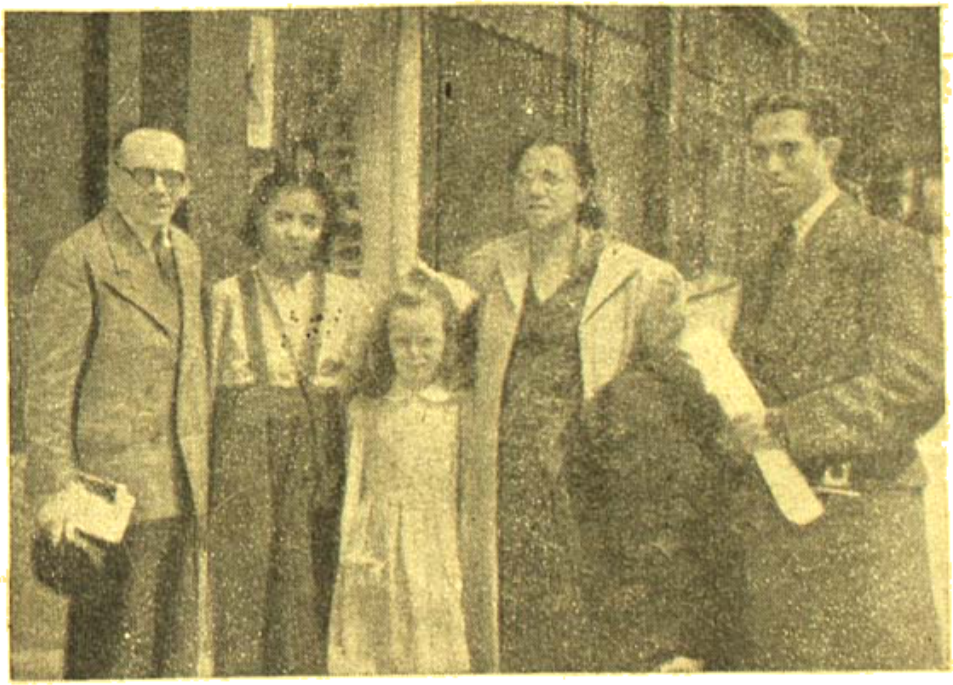

ডাব্‌লিনের রাজপথে

নিজেরই হাত পা ঠাণ্ডা হবার জোগাড়। তিনি আমাদের দিকে চেয়ে একটু হেসে বল্লেন—"ও সব আর দেখতে হবে না, বিপদ যদি আসে তো ও সব তোলাখুলির আগেই সব শেষ হয়ে যাবে।"

আমি স্টুয়ার্ডেসকে জিজ্ঞাসা করলাম যে এ সব সরঞ্জাম কি, আমরা তো বহু বিমানে ঘুরেছি কিন্তু কোথাও তো এ সকল দেখিনি। সে হেসে বল্লে যে সারা রাত আমরা তো মহাসাগরের উপরে কাটাব এবং তার উপর এই লাইনে পর পর তিনটি বিমান দুর্ঘটনায় পড়ে শেষ হয়েছে; এই চতুর্থ বিমানে আমরা চলেছি। সুতরাং সমস্ত কিছুই আমাদের তেমে রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য। তখন বুঝলাম কেন বিমানখানিতে এত কম যাত্রী। ভীষণ তিনটি দুর্ঘটনা হওয়াতে লোকে আর ভয়ে এই বিমানে চড়ছে না।

রাত্রি গভীর হে। যাত্রীরা সব ঘুমুচ্ছে, কেবল একা আমিই জেগে। আমি মাঝে মাঝে পরদা ফাঁক করে বাইরে দেখছি। কি গভীর অন্ধকারের মধ্যে বিমান চীরেকেটে ছুটছে। হঠাৎ চোখে পড়ল কালো আকাশের গায়ে একখানি লাল থালা উঁকি মারছে, ভাবলাম চাঁদ উঠছে হবে। দেখতে দেখতে ভোরের আলো দেখা দিল। আমি আবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি তখন সবে ৪টা বাজে।

আমরা বিশ হাজার ফুট উপর দিয়ে উড়ে চলেছি। আমাদের পথ যেন আর ফুরোয় না।

মনে হচ্ছে মৃত্তিকাময়ী পৃথিবীকে বুঝি আমরা হারিয়ে ফেলেছি।

বিমান ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামতে সুরু করল। চোখের সামনে ভেসে উঠল সরু সুতার মত কেনার মাথাটানা সুদীর্ঘ তীর রেখা। আমরা আয়ারল্যাণ্ডের উপর চলে এলাম। বেল্ট বাঁধার আলো জ্বলল। আমরা আয়ারল্যাণ্ডের Shannon এসে দাঁড়ালাম। এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা আরেকটি বিমানে করে Dublin যাত্রা করলাম। Dublinএর Rotunda Hospitalএ আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। কাজেই আমরা বাস নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলাম। (ক্রমশঃ)

বিরতি

প্রভাময়ী মিত্র

পার্থ সারথি
তব ইঙ্গিতে এই দেহরথে তোমারে স্থাপন করি,
বন্ধুর পথ বাহিয়া চলেছে শোণিত পড়িছে ঝরি।
হৃদয় বন্ধু গোধূলীর দিবস সূর্য্য অস্তে যায়,
আঁখির দৃষ্টি আবরে আঁধার পরাণ ক্লান্তি চায়।

কত ওঠাপড়া ভাঙ্গাগড়া তবু থামি নাই ক্ষয় ক্ষতি,
জীবন যুদ্ধে আমি দুর্ব্বার বন্ধন হারা গতি।
নাই যদি ভয় হয়ে থাকে তবু করি নাই সংশয়,
ধূলি ধ্বজ উড়ে ঝঞ্ঝার ঝড়ে আমি চির নির্ভয়।

প্রলয়ের তালে হানি করতালি শুনি ডমরু বাজে
বক্ষে পিনাকী টঙ্কার হানে শৃঙ্গ গভীরে গাজে।
ঈশানে সঘনে ঝলিছে ত্রিশূল ঝলকে অযুত ফণী,
ধূর্জ্জটী জট আলোড়িয়া লুটে উঠে ভৈরব ধ্বনী।

আমি ফিরিয়াছি রণ চামুণ্ডা কত্যায়নী শূল সাথে,
কালো কেশভার কমনহু তার অরুণ রক্তপাতে।
দলমল দোলে, মালা তার গলে ভাতা খৈ খৈ নাচে,
মহাপ্রলয়ের অগ্নি বহনে "দয় ভূখায়" যাচে।

টুটিয়াছে তবু লুটি নাই ভূমে দীর্ণ বুকের পর,
শঙ্কা মরণ বিজয়িনী শিখা দীপিছে দীপকর।
শত কণ্টক পঙ্কিল পথ আমি চির দুর্জ্জয়,
ফুরাল না কাজ তবু বুঝি আজ পথচলা শেষ হয়।

পক্ষীরাজের গগনময়ী কোথা সে চক্র হানে,
রথচক্রের ঘর্ঘর ধ্বনি কেন পশেনাক কাণে।
শেষবার তবে এবারের মত এপারের বোঝাবুঝি,
নাই কেহ বোঝে, চাহিনা বোঝাতে তুমিত
লইবে বুঝি

গোধূলী ধূসর গৈরিক হ'লো ভিতর বাহির মম
রাত্রি এসেছে ধাত্রীর বেশে কি বিরতি প্রিয়তম।
পাঞ্চজন্য নামাও বন্ধু বেতসের বেণুকরে,
রাঙ্গা পায়ে বেজে উঠুক নূপুর এস এস ভাঙ্গা ঘরে।

কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

পর্য্যটকদের অভাবঅভিযোগ ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্য কাশ্মীর সরকার একটি পর্য্যটক প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন। কাশ্মীরের সর্ব্বত্র ঐ প্রতিষ্ঠানের শাখা আছে।

যাঁহারা আরামের মধ্যে অবসর কাল উপভোগ করিতে ইচ্ছুক কাশ্মীর তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতেছে।

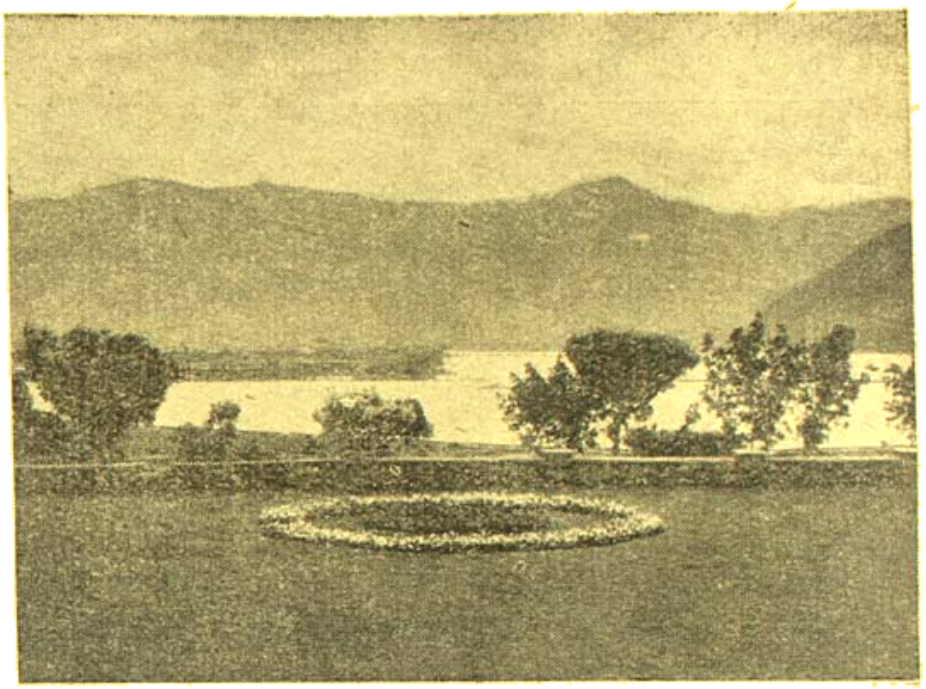

ভারতীয় সৈন্যদের কাশ্মীর সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা—আকাশিক ক্ষেত্র হইতে শত্রু মর্ম্মর ও চালান দেওয়া হইতেছে।

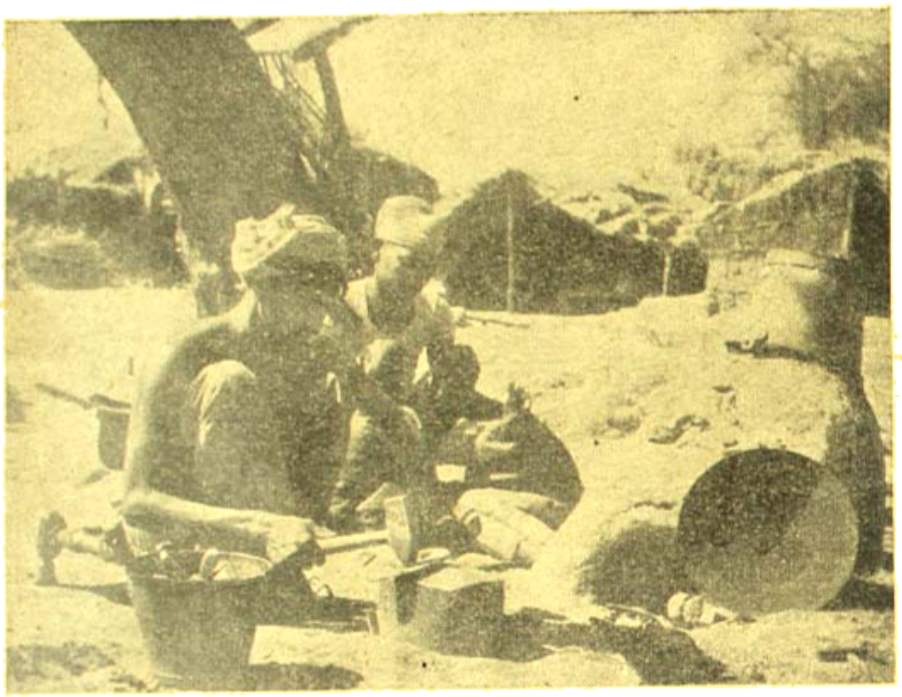

কাশ্মীরে একটি কর্মকারের কারখানা —চাষের উপযোগী যন্ত্রপাতি—কোদাল, লাঙ্গল প্রভৃতি নির্মাণে ব্যস্ত।

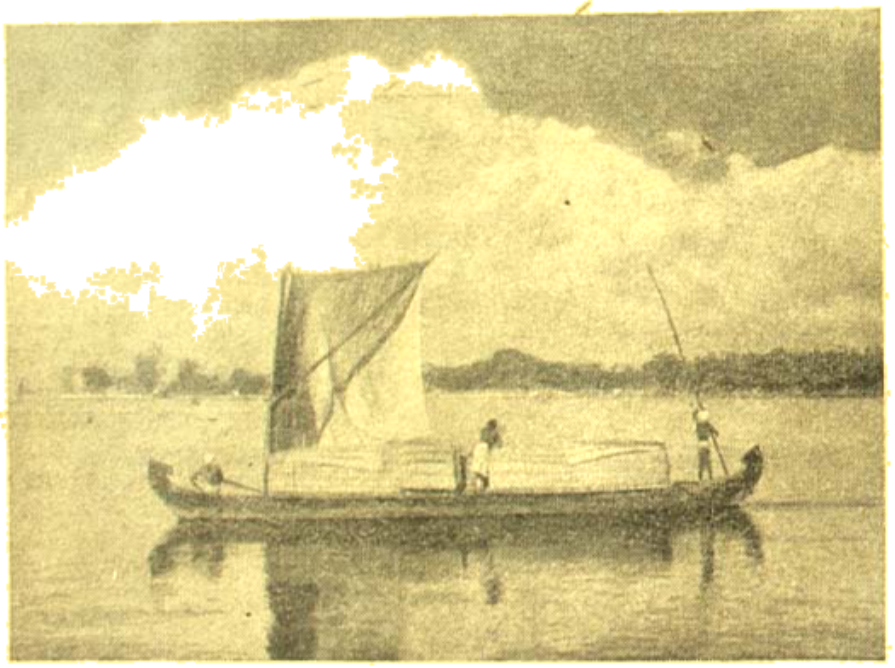

নদী উপত্যকা ও ভারতের সম্পদ

•

সুতরাং শাসনতন্ত্রের অধীনে জলপথের অবস্থা। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের জলপথ সম্পর্কীয় ধারাগুলি এখনও বলবৎ আছে। এই বিধান অনুযায়ী সাধিষ্ঠ পক্ষসমূহ অসম্মত হইলে কোন পরিবর্জনার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের নাই।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ, নৌচলাচল, জলতাড়িত বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভৃতি উদ্দেশ্যে আন্তঃপ্রাদেশিক বা আন্তঃ-উপনিবেশিক জলপথসমূহের—যেগুলিকে পার্লামেন্ট জনস্বার্থের জন্য উন্নয়নের উপযোগী বলিয়া ঘোষণা করিবেন সেগুলিকে ভারতীয় ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা প্রয়োজন।

প্রত্যেকটি নদীপথ একটি অবিভাজ্য পার্থিব একক। সুতরাং রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক এলাকার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া যত অধিক সংখ্যক সম্ভব মানবের উন্নতির পথ যাহাতে সুগম হয় সেইভাবে নদীপথের উন্নয়ন ব্যবস্থা করা উচিত।

মনুসংহিতা ও নারী

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্যৈষ্ঠের 'ভারতবর্ষে' মনুসংহিতা সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পড়িলাম্। বসন্তবাবু শাস্ত্রজ্ঞ, সদাচারী, জ্ঞানী, গুণী ও মনীষী, তাঁহার সহিত বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র, বিশেষ করিয়া যখন তিনি আমার গুরু স্থানীয়। কর্ম জীবনের প্রারম্ভে ও প্রথম অধ্যায়ে তাঁহার নিকট শিক্ষানবীশী করিয়াছি, বহু শিক্ষা লাভ করিয়াছি, সহকারীরূপে কাজ করিয়াছি। তাহা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি। তাঁহার আচার-নিষ্ঠা, স্বধর্ম-পরায়ণতা, গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, বিচার-নৈপুণ্য আমাদের অনেকদিনই মুগ্ধ করিয়াছে। হয়ত তাঁহার প্রাচীনপন্থী নৈষ্ঠিক মতবাদে আমাদের আজকের নাড়াচাড়া খাওয়া মন যুক্তিসহায়ের অনুঘাতে যথেষ্ট সাড়া দেয় না, শুধু একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে আমাদের মতভেদ আসল জিনিষ লইয়া নয়, শুধু দৃষ্টিভঙ্গীর বিশ্লেষণে। প্রাচীন ঋষিদের নির্দেশগুলির মধ্যে যে চিরন্তন সত্য নিহিত আছে সে কথা ত নূতন নয়—আমরা সকলে আমরা তা স্বীকার করি—তাঁহাদের দৃষ্টি হয়ত দেশ-কাল-পাত্রের সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে—তবু আমাদের স্বল্প বুদ্ধিতে মনে হয় এবং এইটাই আমরা নিবেদন করিতেছি যে যুগে যুগে সেই নির্দেশগুলিকেই যুগোপযোগী করিয়া লওয়া উচিত নয় কি। অবশ্য আসল সত্য বস্তুটিকে বাদ দিয়া নয়, রূপায়িত করিয়া।

এই প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বহু পুরাতন কথা মনে পড়িতেছে—"বিধি মনুসংহিতার দোহাই দেন্ তাঁহার প্রতি আমার শুষ্কতর্ক বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ মনুসংহিতা যে সমাজের সংহিতা, সে সমাজের সহিত আমাদের বর্তমান সমাজের মূলগত প্রভেদ। শিক্ষায় ঐক্য নাই অথচ সমাজের ঐক্য আছে ইহা প্রমাণ করিতে বসা বিড়ম্বনা। মনুসংহিতায় ব্রাহ্মণের শিক্ষাপ্রণালী যেরূপ নির্দিষ্ট আছে তাহা যে বঙ্গদেশে কোনকালে প্রচলিত ছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তিন দিনের মধ্যে লো সো করিয়া ব্রহ্মচর্য ব্রতের অভিনয় সমাপনপূর্বক আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ বহুকাল দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। কোথায় সে গুরু গৃহে বাস, কোথায় সে বেদাধ্যয়ন, কোথায় বা কঠিন ব্রতাচরণ। অতএব প্রথমেই দেখা যাইতেছে মনুসংহিতার মতে যে মানুষ গঠিত হইত, এখনকার মতে সে মানুষ গঠিত হয়না। দ্বিতীয়তঃ মনু পুরুষের পক্ষে বিবাহের যে বয়স নির্দেশ দিয়াছেন তাহা কোথাও বা পালিত হইয়া থাকে। তৃতীয় বিবাহের পর মনু স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর যে সকল নিয়ম স্থির করিয়াছেন তাহাই বা কয়জন লোক জানে ও পালন করে।"

কিন্তু এ প্রবন্ধে নারী জাতির সম্বন্ধে মনুর অভিমত আলোচিত হইয়াছে। "যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা" মনুর এই বচন শিরোধার্য করিয়া সত্যই কি আমরা নারীকে তাহার যথার্থ শ্রদ্ধা দেই, না পূজা করি। মহাভারত বলেন যে মনুসংহিতা আজ্ঞাসিদ্ধ শাস্ত্র।

একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখা উচিত যে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে মনু হয়ত এক নন্, একাধিক্ ভাবনেতা। ঋগ্বেদের চেয়েও প্রাচীন নিরিখে একাধিক মনুর নাম পাওয়া যায়। বেদে পুরাণে মহাভারতে গীতায় যে মানব শাস্ত্রের উল্লেখ আছে, তাহার একজনই সংহিতাকার। এ বিষয়ে বিচারের হয়ত অবকাশ আছে কিন্তু বাহ্য। যিনি বা যাহারা এই আদর্শ রীতিনীতি ও বিধি বিধানের সঙ্কলন করুন না কেন তাঁহারাই যে তখনকার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই করিয়াছিলেন তাহা স্বীকার্য। হয়ত বহু শ্লোক প্রক্ষিপ্ত, কিন্তু মোটের উপর মনুসংহিতায় তৎকালীন সামাজিক ও ব্যবহারিক আদর্শের একটা মোটামুটি ভিত্তি পাই।

সংহিতাকার নিজেই বলিতেছেন যে 'আমিই অগ্নি, আমিই মনু, আমিই প্রজাপতি'—

'এতদেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিং'
'অহং প্রজাঃ সিসৃক্ষুস্তু তপস্তপ্ত্বা সুদুশ্চরং'

'আমিই দুস্তর তপস্যার দ্বারা এই সমস্ত সৃজন করিয়াছি' এবং তিনিই প্রজারক্ষার্থ সমাজে শৃঙ্খলার জন্য এই সব বিধি নির্দেশ দিয়াছেন। হয়ত জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত 'নিদেকাদি শ্মশানান্তো' যাঁহারা বেদ বিধি পালন করেন না তাঁহারা মনুর মর্মার্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। কিন্তু আপাতঃ দৃষ্টিতে মনুতেই স্ত্রী-লোকদের সম্বন্ধে নিন্দাসূচক বহু শ্লোক পাওয়া যায়—যাহা বসন্তবাবু উল্লেখ করেন নাই। হইতে পারে "যদ্ বৈ কিঞ্চ মনু অবদৎ তৎ ভেষজম্"—যাহা কিছু মনু বলেন তাহা কটু ঔষধের মতই—কিন্তু মনুতেই এই সব শ্লোকগুলিও আছে—

'নৈতাং রূপং পরীক্ষ্যেষু নাসাং বয়সি সংস্থিতি
সুরূপম্বা বিরূপম্বা পুমান্ ইত্যেব ভুঞ্জতে' (নবম অধ্যায় ১৪)

সত্যই কি নারীরা এতই কামাতুরা ও চরিত্রহীনা যে, রূপ, বয়স কোন বিচার না করিয়াই শুধু অভ্যাস দোষে পরপুরুষের ভজনা করে···

আর পুরুষরা·····

মনু আবার বলিতেছেন—

'পৌংশ্চল্যাচ্চল চিত্তাশ্চ নৈ স্নেহাশ্চ স্বভাবতঃ
রক্ষিতা যত্নতোঽপীহ ভর্তৃষ্বেতা বিকুর্বতে' (নবম অধ্যায় ১৫)

পুরুষ দেখিলেই তাহাদের চিত্ত চাঞ্চল্য হয় এবং স্নেহশূন্যতা বশতঃ তাহারা পতি কর্তৃক সুরক্ষিতা হইয়াও ভর্তৃ বিরুদ্ধে গমন করে—

'এবং স্বভাবং জ্ঞাত্বাসাং প্রজাপতি নিসর্গজং
পরমং যত্নমাতিষ্ঠেৎ পুরুষো রক্ষণংপ্রতি (নবম অধ্যায় ১৭)

প্রজাপতি স্ত্রীদিগকে এই ভাবেই সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাদের স্বভাবই এই। ইহা অবগত হইয়া বিশেষ যত্নবান হওয়া পুরুষের কর্ত্তব্য।

এই শ্লোকগুলি সম্বন্ধেই রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, 'মনু সংহিতায় স্ত্রী নিন্দাবাচক যে সকল শ্লোক আছে তাহা উদ্ধৃত করিতে লজ্জা ও কষ্ট বোধ হয়'।

এই কি নারীদের মহীয়সী ও পূজ্যা, লক্ষ্মীস্বরূপিণী বলিয়া প্রচার করিবার রীতি। শাস্ত্র বাক্য অভ্রান্ত বলিয়া মানিলেও কোথায় যেন সন্দেহ থাকিয়া যায়।

"সন্ধ্যাসনমলঙ্কারং কামং ক্রোধমনার্জবং
দ্রোহভাবং সুযাচ্যেষু স্ত্রীভ্যো মনুরকল্পয়ৎ" (নবম অধ্যায় ১৭)

শয্যা, আসন অলঙ্কার, কাম, ক্রোধ, কুটিলতা, পরহিংসা ও কুৎসিৎ আচার স্ত্রীলোক হইতে হয় ইহা মনু কল্পনা করিয়াছেন।

"নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্ম্মবিদঃ স্থিতঃ
নিরিন্দ্রিয়াহ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োঽনৃতমিতি স্থিতিঃ" (নবম অধ্যায় ১৮)

যেহেতু স্ত্রীলোকের মন্ত্র দ্বারা কোন ক্রিয়া নাই, ধর্ম্মের এইরূপ ব্যবস্থা, অতএব ধর্ম্মজ্ঞানহীন মন্ত্রহীন স্ত্রীগণ অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা পদার্থ।

অষ্টম অধ্যায়েও মনু বলিতেছেন—

"কামিনীং বিবাহেয়ু··· শপথে নাস্তি পাতকং (১১২)

তুমি আমার পরম শ্রেয়ো, অন্যকে আমি প্রার্থনা করি নাই বা অন্য বিবাহ করিব না, কামিনী বিষয়ে এইরূপ শপথ করিলে পাতক হয় না—

মেধাতিথি ও কুল্লুক ভট্টের ভাষ্য শুনুন—

"কাম স্ত্রীতি বিশেষো বিশিষ্টোঽস্যাঃ স্পর্শ নস্তঃ স
যাদৃ তদৃষি পুরুষস্য তা কামিন্যো ভার্য্যাবেত্যাদয়ঃ
তত্র যৎ শপথঃ কামিন্যর্থো·····"

"কিন্তু সুখভোগার্থং কামিনী বিষয়ে বিবাহ বিষয়ে···পাপং ন ভবতি।"

অর্থাৎ স্বয়ং মনু এই কি বলিতেছেন যে কামসিদ্ধির জন্য স্ত্রীলোককে মিথ্যা ভুলাইতে পুরুষের অধিকার বিদিত!

মহাভারতেও অনুশাসন পর্ব্বে অষ্টত্রিংশোত্তর অধ্যায়ে স্ত্রী চরিত্র সম্বন্ধে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও জ্ঞানবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম যে সব কথা বলিয়াছেন তাহাতে নারীর প্রতি অনুরাগের আভাষ থাকে না। ইহার একমাত্র উত্তর হইতেছে যে শাস্ত্রের এই সব উক্তিগুলি-দুষ্কৃতিরা স্ত্রীর পক্ষেই প্রযুজ্য। কিন্তু না শাস্ত্রকার, না টীকাকার কেহই সেইরূপ অর্থ করেন নাই। বরং তাঁহারা স্ত্রীলোককে বলিয়াছেন যে তাহারা বাড়বানল বিষ বা সর্পের ন্যায়। ইহারা পাপপরায়ণা, সৃষ্টির সময়ই বিধাতা ইহাদের দোষের আকর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অন্ধ পুরুষের সম্পর্কে সেরূপ কড়াকড়ি নাই। অন্ধের কথা দূরে থাকুক স্বয়ং ঋষিরাজ বশিষ্ঠের অরুন্ধতী গ্রহণে কোন দোষ হয় না, ঋষি মন্দপাল শারঙ্গী সংসর্গে দোষী হয়েন না, বরং ঐ পাখীরাই অভিশপ্ত মাতা হইয়াছিলেন।

আসল কথা হইতেছে মাতৃতন্ত্র যুগের অবসানের পর প্রাচীনকালে প্রত্যেক দেশেই নারীর স্থান পুরুষের নীচেই ছিল। পুরুষ ছিল কর্ত্তা, সামাজিক ও গোষ্ঠীর প্রয়োজনে তাহার বংশ বৃদ্ধি করা বিশেষ দরকার ছিল এবং ঐ কারণেই নারীকে কোন স্বাধীনতা দেওয়া উচিত মনে হইত না এবং সন্তানের পিতৃত্ব নির্দ্দেশ ঠিক রাখার জন্য সীমা টানিয়া দেওয়া হইত। 'পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে'—এ শুধু মনুর কথা নয়, সারা পৃথিবী জুড়িয়া দেশে দেশে সনাতন বিধি। এই সে দিনও মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক দিনে ক্রীতদাসের ন্যায় স্ত্রীরা প্রভুদের শুধু সম্পত্তি বলিয়াই গণ্য হইত না। গরু বাছুর হুকুরের মত তাহাদের আটক রাখারও ব্যবস্থা থাকিত। জয়ন্ত সতীর কেচ্ছার কথাও অনেকেই হয়ত জানেন।

মনুতেও স্ত্রী যে পুরুষের সম্পত্তি বিশেষ, ইহার আভাস বহু জায়গায় পাওয়া যায়। যেমন নিজের স্ত্রীকে যদি কেহ পরপুরুষের কাছে লইয়া যায় তাহার দণ্ড সম্বন্ধে মনু নমু ব্যবস্থাই করিয়াছেন। তা ছাড়া নারী হইতেছে ক্ষেত্র, পুরুষ হইতেছে বীজ। নারী ভূমিস্বরূপ, ক্ষেত্র স্বামীরই' ক্ষেত্রে পূর্ণ অধিকার ইত্যাদি। তবু এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে ভারতবর্ষের সমাজপতি ঋষিদের চিন্তার ধারায় নারীর স্থান অন্য দেশ অপেক্ষা উন্নত ছিল। তাঁহারা উপদেশ দিতেছেন যে স্ত্রী-পুরুষ ধর্ম্মার্থ কাম বিষয়ে অব্যভিচারী হইয়া ধর্ম্ম পথে থাকিবে।

"পুরুষস্তু ত্রিবর্গস্য ধর্ম্মবর্ম্মি স্থিত স্তোঃ
সংযোগে বিপ্রযোগে চ ধর্ম্মান্ রক্ষ্যাস্ত্রি বর্গতান্"

তাহাদের সমাজ ব্যবস্থায় স্ত্রীলোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেও দৃষ্টি ছিল না যে তা নয়, যেমন সংযোগ, স্ত্রী, গর্ভবতী, সূতা, দুহিতাকে অতিথি সেবার অগ্রেই ভোজন করাইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। এমন বহু বিধান আছে যাহা আপাত দৃষ্টিতে কঠোর হইলেও পরিণামে শুভ। আজকের সমাজেও তাহার প্রবর্ত্তন হইলে কল্যাণকর। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহাদের দৃষ্টিতে স্ত্রীলোকের মূল্য ছিল যে তাহারা "রতিরক্ষিতা" অর্থাৎ পুরুষের আনন্দদায়িনী ও "রক্ষা" অর্থাৎ সমাজ রক্ষায় ও বংশে বংশবৃদ্ধি কার্য্যে একান্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্র।

"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ পুত্রনামে ভাষতে পুনঃ"

ঋগ্বেদে বৈদিক যুগে বহু নারী ঋষির উল্লেখ পাই যাঁহারা মন্ত্র রচনা করিতেন, গান গাহিতেন, যথা ঘোষা, অপালা, সূর্য্যা, সাবিত্রী, ইন্দ্রাণী, শচী, বিশ্ববারা, মৈত্রেয়ী। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন "পত্যাঙ্গ যৌবনা" অধিবাহিতা। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যেও বহু শ্রমণী, শ্রাবিকা, পরিব্রাজিকার দেখা পাওয়া যায়। তাঁহাদের স্থান পুরুষের সমান না হইলেও মর্য্যাদাসম্পন্না। কিন্তু মনুর যুগে পুরুষ বিদ্বেষক নারীর কোন স্বাধীন সত্তার চিহ্ন নাই, তাঁহারা যত পূজ্যাই হউন্ না কেন। তাঁহারা দোষের আকর সেই জন্য সর্ব্বতোভাবে পুরুষের রক্ষণীয়া। তাঁহারা যে নিজের চেষ্টায়, সাধনায় শিক্ষায় সমাজ জীবনে নিজেদের গৌরবের স্থান অধিকার করিয়া লইতে পারেন তাহার কোন কল্পনা নাই। এই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাহার কারণ কি ইহার আলোচনাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, অবশ্য বিতর্ক বা অনুমান প্রকাশ মাত্র।

পরীর দেশের কাপড়

শ্রীস্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রপিতামহের আমলের আধমণি সেগুণ কাঠের সিন্দুকটা খোলা হোল সেদিন। কৃষ্ণ-প্রস্তরের মত কালো সিন্দুকটার গহ্বর থেকে দুশো বছরের অন্ধকার ভেদ করে এ যুগের আলোয় বেরিয়ে এল যেন ভূতত্ত্ববিদের দুর্লভ আবিষ্কার। কত সাচ্চা-জরীর কাজ-করা বালা-পোষ, হাতীমুখো আট-ভরি সোনার বালা। মুসলমান-আমলের সিঁদুর-মাখানো পুরানো রৌপ্যমুদ্রা, রূপোর রেকাবীতে বিষ্ণুর অনন্তশয্যা খোদাই করা। মোহমুদ্গর ভাষাবিশিষ্ট বেনারসী গরদের নামাবলী—সর্বশেষে একখানা সাধারণ রঙ-চঙে বিলিতি কাপড়। অন্য সব আবিষ্কৃত সামগ্রীতেই সেকালের স্মৃতির গন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু এ কাপড়খানা সম্পূর্ণ একালের। এখানা দুশ' বছর পূর্বে এত যত্ন করে রাখবার কি কারণ থাকতে পারে?

ঠাকুমা বললেন—এখানা পরীর দেশের কাপড়; তখন সবে নতুন উঠেছে। সবাই তখন তাঁতের কাপড়ই পরত কিনা। সাধারণ লোকের ঘরে এ কাপড় ছিল না, তাই যত্ন করে রাখা হয়েছে। তখন কে জানত বাপু যে তাঁতের কাপড় আর কেউ পরবে না, এই কাপড়ই লোকে পরবে!

সে সব দিনে সবে সাতসমুদ্র তেরোনদীর পার থেকে পরীর দেশের কাপড় এ দেশে পৌঁচেছে। না, প্রপিতামহের কোন দোষ ছিল না। তিনি ত' আর জানতেন না যে, দুশো বছর পরে একরামপুরের দেড়শ' তাঁতের আর কোন চিহ্নও থাকবে না!

তখন রাত্রিদিনের ঘূর্ণিপাকে দেড়শ' তাঁতের গর্জনে মুখর হয়ে থাকত একরামপুরের মাটি। অনবরত বিকট শব্দে সাধারণ মানুষের কর্ণ বধির হতে পারে বটে; কিন্তু একরামপুরের বাসীন্দারা জন্ম থেকে তাঁতের শব্দ শুনে ঘুমোত। জীবনের শেষে তাঁতের শব্দ তাদের শান্ত মৃত্যুতে ব্যাঘাত আনত না। জীবনের প্রতি কণায় মাকুর সুতোর রেণুগুলো যেন জড়িয়ে যেত হিজিবিজি মাকড়শার জালের মত।

সেদিন মধুনাবিলের বর্ষাঘোলা ঢেউ একরামপুরের কূলে-আসা তাঁতের তর্জনের সঙ্গে তাল রেখে গান গেয়ে চলেছে। কৃষ্ণা-পঞ্চমীর রাতে বিলের জলের ওপর ডিঙ্গি বাইতে বাইতে তাঁতিরা চলেছে সোনাগপুরের হাটে; ভোর নাগাদ পৌঁছবে সেখানে। আল্‌কাতরার মত ভিজে অন্ধকার ভেদ করে তখনও কাণে ভেসে আসছে তন্তু-ধ্বনি সাগরদ্বীপের জংলী অর্কেষ্ট্রার মত। এখনও ক্রোশখানেক গেলে তারা পড়বে বড়কুমের খালে—সেখান থেকে লাঙ্গলমুড়ার চরের কোণাকুণি পাঁচছয় রশি গেলে সোনাগপুরের হাট।

—হোই—শঙ্কর—হোই—গয়না-নায়ের নাগাল বৈঠ্যা ক্যালস্ দেচি! ডিঙ্গি বাঁয়ে লইয়্যা যা'। গলুই ধাক্কা খাইব কইলাম।

উত্তরে শঙ্কর তার ডিঙ্গি বাঁয়ে ত' নিয়ে গেলই না, বরং বন্ধুর ডিঙ্গির ঠিক সামনা সামনি রেখে জোরে বাইতে লাগল। ছইয়ের ভেতর কাপড়ের বস্তার পাশে বসে তামাক খাচ্ছিল শঙ্করের বাবা মাধবলাল—তাঁতি-গাঁয়ের সাতস্কর। ডিঙ্গির দ্রুতগতি লক্ষ্য করে আর দু' চারবার দোলা খেয়ে ধমক দিয়ে উঠল শঙ্করকে—অত দোলাস্ কি কামেরে পাঠা। বেশী ছন্দি-তন্দি কইরলে ডুইব্যা খাইব গা। আস্তে লইয়্যা চল। শঙ্কর অনুযোগ করে বন্ধুর বিরুদ্ধে—বন্ধু কইল গলুই ধাক্কা খাইব।

মাধবলাল বলে—তাহ'লে তোর ডিঙ্গি পিছাইয়্যা ল'। বন্ধুরডা আগে ছাইড়্যা দে।

কথাটা ঠিক মনে ধরেনা শঙ্করের। বন্ধুর ডিঙ্গি তাদের আগে চলে যাবে; আর তারা পিছিয়ে চিমে তেতালায় চলবে—এ বড় লজ্জার ব্যাপার। তাছাড়া বন্ধুত টিট্‌কারী দিয়ে বলতেও পারে—ক্যামন মরদরে তুই? ঘরে নি ভাত খাস্?

সে টিট্‌কারী ত' আর মাধবলাল এসে সইবে না।

কাজেই শঙ্কর যথারীতি বন্ধুর ডিঙ্গির সামনা সামনি জোরে চালাতে লাগল। আর একটা জোর দোলা খেয়ে

আর একটা ধমক দিল মাধবলাল—শুনছনি কি কইল্যাম। ডিঙ্গি পিছাইয়া ল'।

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ডিঙ্গি পিছিয়ে নিল শঙ্কর। সমস্তটা পথ কথা কইল না কারো সঙ্গে। বাড়ী ফিরে বউয়ের সামনে নিশ্চয়ই এ গল্প করবে বহু। তার দুর্বল পরাজয়ে নিশ্চয়ই হাসবে ভবানী। তার গা' জ্বলে যাবে, কিন্তু বলবার থাকবে না কিছু।

সাড়ে বত্রিশভাজার মত বিক্ষিপ্ত জনতা ছড়িয়ে আছে নানাজাতীয় পণ্যের সামনে। হাটের ইজারাদার ঘোষাল মশাইয়ের ভাঙ্গা-কাঁসার-কণ্ঠের ধমকানী শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। হাটের ধুলো পায়ে পায়ে কুড়ি হাত ওপরে উঠে মধ্য দিনের তাপে আতপ্ত হয়ে মানুষের ব্রহ্মতালুতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। হাট মলিন নগ্নপদে কেউ যাচ্ছে ভেলে ভাজা জিলিপী গজার দোকানের সামনে। কেউ বা সামান্য কারণে সাংঘাতিক মারামারি করে বিচারের ভার নিচ্ছে হাটের ইজারাদার ঘোষাল মশাইয়ের কাছে। ঘোষাল মশাইয়ের ভাঙ্গাবেড় রায় হাটের বাতাস কাঁপিয়ে শোনা যাচ্ছে—মার হালারে পঞ্চাশ খড়ম।

গোদস্তা আবেলালীর অভ্যস্ত ইস্পাতের মত কঠি দৃঢ় হয়ে পড়ছে মাধবটার পিঠে। আতপ্ত বাথারির স্রোতে বিচিত্র কোলাহলের মধ্যে একটুখানি নাড়া দিচ্ছে প্রহৃতের আর্তনাদ। এই গতানুগতিক নিয়মে সোহাগপুরের হাট বহু বৎসর নির্বিঘ্নে তার মর্যাদা রক্ষা করে চলেছে। এই অর্ধশিক্ষিত ইজারাদার ঘোষাল—ইস্পাতের মানুষ আবেদালী—বিচিত্র পণ্যসম্ভার—বিক্ষিপ্ত জনতা—অসংখ্য আতপ্ত ধূলিকণা—এমন কি সুধন্যের তেলেভাজা জিলাপী-গজার দোকানটা পর্যন্ত সোহাগপুরের হাটের পরিপূর্ণ সৌন্দর্যে কোথাও ফাঁক রাখেনি।

—এই মটরদানার শাড়ীখান কত দিবুরে চ্যাংরা?

—দুই টাকা।—শঙ্কর বলে।

—ইরে মদি! চাপলী দেওয়ার আর মরদ পাইলা না? হেই—মাধুবাই! চ্যাংরা কয় কি শুনছনি?

মাধবলাল শঙ্করের কথাই সমর্থন করে—দুই ট্যাকাই দর।

একরামপুরের জোলাদের বেচাকেনা চলছে এইভাবে।

ইতিমধ্যে দেখা গেল একটি লোক দশবারো বস্তা কাপড় এনে ফেলল তাঁতিদের পসরার মাঝখানে। তারপর ঘোষালকে ডেকে একটু আড়ালে নিয়ে গেল। একটু পরে ঘোষালের হিংস্র ক্ষুদ্র চোখের তারাগুলো চকচক করে উঠল, মুখে পড়ল তার সন্তোষের ছায়া। ঘাড় নেড়ে বললে লোকটিকে—ডর কর ক্যান? মুই থাকতে কোন সুমুন্দি তোমার কলাডা করিতে পারব না।

ইজারাদার ঘোষালের আশ্বাসবাণী মাথায় নিয়ে আস্তে আস্তে বস্তাগুলো খুলল লোকটি। দেখতে দেখতে বেরিয়ে এল রঙ বেরঙের বাহারে শাড়ী। ঘনবনা—সস্তা দাম। একরামপুরের কাপড়ের চেয়ে অর্ধেক কম-দাম হাঁকল লোকটি। অদ্ভুত কাপড়—কাপড়ের প্রজাপতি যেন। এত ঘনবনাতে এত ঝিনুঝিনে কাপড় হয়! আর কত রঙ বেরঙের বাহারী পাড়। পাড়ের রাজত্ব উজাড় করে এনেছে লোকটি। একরামপুরের তাঁতি সমাজের স্বপ্নের অতীত। মূঢ় বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে একরামপুরের তাঁতিরা। তাদের পসরার চাহিদা কমে যায় দেখতে দেখতে। সমস্ত হাট যেন ভেঙ্গে পড়ে উন্মুখ হয়ে সস্তা সুন্দর কাপড়ের দিকে। এমন কাপড় তারা কখনও দেখেনি। একরামপুরের ইতিহাসে রীতিমত বিস্ময়!

দূষিত ঘোলা রক্তের মত ধিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। আবছা অন্ধকারেও মাধবলাল বিচিত্রবস্ত্র পসারীকে চিনতে পারে—সে শঙ্করের শ্বশুর। শঙ্করের শ্বশুর-বনমালী। তার বন্ধিষ্ণু শত্রু—বনমালী!

শত্রুতা যে বরাবরই ছিল তা' নয়। বনমালীর বিধবা দুর্শীলা একমাত্র কন্যা ভবানীকে দেখে মাধবলাল শঙ্করের সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাব করে পাঠায়। বনমালী সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে বলে—তার মেয়ের বিয়ে সাধারণ তাঁতির ঘরে হতে পারে না। বিদেশে ব্যবসায়ে বনমালীর গর্ব ছিল, কিন্তু সে গর্ব একরামপুরের তাঁতিসমাজ সইবে কেন? তাদের মাতব্বর মাধবলালের অপমান! সেই রাত্রে একরামপুরের জোয়ানরা বেরিয়ে পড়ল দেড়শ' লাঠি নিয়ে মহনা বিল পেরিয়ে বনমালীর বাড়ী সাগরকান্দির দিকে। লাঠির জোরে ছিনিয়ে নিয়ে এল ভবানীকে। বনমালীর গাদা বন্দুক দু' চারবার বৃথা গর্জন করে থেমে গেল—কোন ফল হোল না। মাধবলাল সাতদিনের

ভেতর গোধূলিলগ্নে শঙ্করের সঙ্গে বিয়ে দিলে ভবানীর। সেই থেকে বনমালী তার শত্রু। বনমালী পুলিসের সাহায্য নেয়নি—তাতে মরদের অপমান। সে নিজেই ওর প্রতিশোধ নেবে।

প্রতিশোধ বনমালী নিলে, কিন্তু তা' যে এমন করে নেবে, তা' মাধবলালের স্বপ্নের অতীত। কোপা থেকে নিয়ে এল বাহারী রঙের এক বোঝা কাপড়—দাম একরামপুরের কাপড়ের অর্দ্ধেক। মুখে যেন এক পোঁচ কালী লেপটে দিলে মাধবলালের। ক্রেতার একখানা ফিকে নীল শাড়ীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে মাধবলাল, —কোগনকার জোলারা বুনছে গো?

—ক্যামনে কমু? ব্যাপারী কইল পরীর স্থানের কাপড়।

ব্যাপারী অর্থাৎ বনমালী বলেছে—পরীর দেশের কাপড়! একরামপুরের সুবিখ্যাত তন্তুবায়-সমাজকে যে পঙ্গু করেছে—সে পরীর দেশের নইলে আর কোথাকার হবে! কিন্তু এভাবে পরীর দেশের কাপড় প্রতি হাটে আমদানী হলে একরামপুরের তাঁত স্তব্ধ হয়ে যাবে চিরদিনের মত, —আরগুলা বাসা করবে তাতে।

ঘোষাল—হাটের ইজারাদারকে বলে মাধবলাল—এয়ার এট্টা বিহিত করেন কর্ত্তা! ওই ছালার ব্যাপারী আমাগো ভাতে মাইর‍্যা দিব। ওয়ার উপুর দুইগুণ নজর বসান।

ঘোষাল দশ তিনশ' মুদ্রা নজরাণা পেয়েছে। সে দ্বিগুণ খাজনা বসাতে নারাজ। সমান খাজনায় ওরাও ব্যবসা করবে—নতুন ব্যাপারী বনমালীও ব্যবসা করবে। অন্যায় খাজনা নিতে ঘোষাল পারবে না।

—স্যাষে কি পাপে ডুইব্যা মরমু।

পাপে ডুবতে ঘোষাল পারবে না। একরামপুরের তাঁতিদের না পোষায়, তারা তাঁত বিক্রি করে হালচাষ করুক। তার কাছে সোজা কথা!

সেদিন রাত্রে তাঁতিরা ফিরে এল ঘরে নিঃশব্দে। সকলেরই মুখে গভীর আশঙ্কায় হতাশার ছায়া। শুধু শঙ্করের মুখে আগুনের দীপ্তি। দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে—ফিসফিস কথা বলেছে সবাই। শঙ্কর ব'সে ছিল গভীরতম নীরবে। যে যার ঘরে চলে গেল বিনা বাক্যব্যয়ে। ভবানী নিজের কানে শুনলে সব কথা। শোবার সময় ভয়ে ভয়ে বললে শঙ্করকে—আমারে সাগরকান্দি লইয়া চল। বাবার পায়ে ধইর‍্যা কমু—আমাগো সর্বনাশ কইরো না গো!

শঙ্কর কথা বলেনি। বেদনাটা তার বেধেছে বেশী বোধহয়। তার ভবানীর বাবা—তার নিজের শ্বশুর কিনা এতবড় শত্রুতা করলে! টিটকারীও কেউ কেউ তাকে দিতে ছাড়ে নি।

মাঝরাত্রে শৃগালের চিৎকারে চমকে জেগে উঠল ভবানী। পাশে শঙ্কর নেই। দরজা খোলা। বেরিয়ে গেছে। কখন শঙ্কর বেরিয়ে গেছে ভবানী জানতেও পারেনি। ঘরের কোণে দেওয়ালে ঝকঝকে টাঙ্গিখানা নেই—অন্ধকারে তা' ভবানীর নজরে পড়ল না।

রাষ্ট্র-সংগীত

অধ্যাপক শ্রীনির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

'পড়া জিনিস ভাঙতে পারে এমন লোক অনেক দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু একবার ভেঙে আবার গড়তে পারে এমন মানুষ পৃথিবীতে দুর্লভ—বিশ্বে ক'রে শ্রদ্ধা, ধর্ম, ভালবাসা একবার ভাঙলে আর পূর্বের মত ক'রে গড়ে তোলা যায় না।

আমাদের প্রাণসখিরা 'বন্দেমাতরম্' গানের কয়েক বৎসর পূর্বে যে মর্মান্তিক হয়েছিল, তারপর আজ তাকে রাষ্ট্র সংগীতের আসন দিলেও পূর্বের আঘাতের কালো দাগটি অন্তত আমাদের জীবনকালাবধি থেকে যাবে। যে দেশের মাটিজল থেকে আমরা প্রাণ পাচ্ছি, সেই দেশকে মার আসনে বসিয়ে মনের ভক্তি প্রণাম-বন্দনা তো অনেক জাতিই করেছে। দুর্গা ব'লে অন্য কোন দেবী নেই, তুমিই দশপ্রহরণধারিণীরূপে দশদিক থেকে আগত বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করছ, দেবী লক্ষ্মী তো আর কেউ নয়, তুমিই কমলদলবিহারিণী কমলাক্ষরূপে আমাদের সর্বৈশ্বর্যে মণ্ডিত করছ, জ্ঞানধর্ম কত কাব্যকাহিনীর আকর তুমিই তো আমাদের বাণী বিদ্যাদায়িনী, তা ছাড়া আর বাণী কে? এই গৌরবোজ্জ্বল দেশবন্দনার মধ্যে পৌত্তলিকতা আছে, না পৌত্তলিকতার বিসর্জন আছে? এ সংগীতের অপূর্ব কাব্যময়কতা আমাদের সকল

শ্রেষ্ঠের অন্তরে প্রবেশলাভ করতে পারল না, এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। সিউরিটির, একেশ্বরবাদী, মোড়া মিনটনের তো মিটমের বন্দনা করতে বাধে নি!

তাঁরা বাঙলাকে এক করবার জন্য বাংলাদেশে চল্লিশ বৎসর পূর্বে যে জীবনপণ-আন্দোলন চলেছিল, রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে তার কেন্দ্রস্থলে ছিলেন—সংগীতে, কাব্যে, প্রবন্ধে, বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ সেই আন্দোলনের আত্মিক রূপ দিয়েছিলেন। সে সময়ে সভায় সভায় জাতীয় সংগীত গান করার খুব হেওয়াজ ছিল এবং সে সময়ে বহু নূতন জাতীয় সংগীত রচিতও হয়েছিল। তৎকালে প্রকাশিত জাতীয় সংগীত-সংগ্রহ পুস্তকগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রচিত গীতের সংখ্যাই অধিক, আর যাঁর রচিত গানগুলিই যে কাব্যাংশে শ্রেষ্ঠ সেকথা বলাই বাহুল্য। "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি", "অয়ি ভুবনমনো-মোহিনী", "আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে", "ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা", "যে তোমারে ছাড়ে ছাড়ুক আমি তোমায় ছাড়ব না মা", "বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান্", "ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে", "তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে, তা বলে ভাবনা করা চলবে না", "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে", "যদি তোর ভাবনা থাকে, ফিরে যা না", "আগে চল, আগে চল ভাই", "নববৎসরে করিলাম পণ, লব স্বদেশের দীক্ষা", "আজি বাংলা দেশের হৃদয় হ'তে কখন আপনি", "যে তোরে, আজি তোমারি সভায় শুন এ কবির গান", "সার্থক জনম আমার করেছি এই দেশে", "বাংলার মাটি বাংলার জল" প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথ রচিত ইদানীন্তনের জাতীয় সংগীতগুলি তখনকার দিনে বহুল ভাবে প্রচলিত ছিল। তখনকার প্রবন্ধগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বিদেশী শাসকের নিকট আবেদন-নিবেদন পরিত্যাগ ক'রে বাঙালিকে স্বাবলম্বী, আত্মপ্রতিষ্ঠ হ'তে বলেছেন। যে বিদেশী শাসক আমাদের প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত, অপমানিত করে, আমরা তারই বেশভূষায় সজ্জিত হ'য়ে পর্যবেক্ষণ করি, আমরা তারই "কাছে ফিরি সম্মানের তরে", এ দেখে রবীন্দ্রনাথ দুঃখপ্রকাশ করেছেন। দুঃখের সঙ্গে তিনি বলেছেন,—"যে তোমারে তুচ্ছ করে, সে আমারে মারে: কি দিবে সম্মান?" কবির জীবনধারার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, স্বদেশীযুগের রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও গীতগুলির প্রকৃতি ও ভাবধারার যাঁরা পরিচয় রাখেন, রবীন্দ্রনাথ যে ১৯১১ সালে "জনগণমন-অধিনায়ক" গানে বিদেশীশাসক সম্রাট পঞ্চম জর্জের বন্দনা করেছেন, একথা তাঁরা স্বপ্নেও কল্পনা ক'রতে পারেন না। অথচ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় কবি সম্বন্ধে এ মিথ্যা উক্তিই আজ ভারতের রাজধানীতে প্রচারিত হচ্ছে!

জনসাধারণের মনের উপর এ জাতীয় প্রচার কার্যের ফল অতি বিষময় হয়। অসাধারণ ঐতিহ্য, অধিতীয় জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও এ ভাবেই অপপ্রচারের ফলে "বন্দে মাতরম্" সংগীতের স্থানচ্যুতি ঘটেছে, আর অগণিত উৎকৃষ্ট স্বদেশী গানের কবি রবীন্দ্রনাথের একটি উচ্চশ্রেণীর জাতীয় সংগীত "জনগণমন-অধিনায়ক" গানটি বিশেষভাবে, এরপর থেকেই "বন্দে মাতরমে"র বিরুদ্ধপক্ষে সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবারকার কুৎসারটনা রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেষ্ঠ সংগীতটির যাতে অবমাননা করতে না পারে তার জন্য আমাদের সচেতন হওয়া উচিত। এটা রাষ্ট্র-সংগীত নির্বাচনের প্রাক্‌কাল। গণবিধান-পরিষদে কয়েক মাসের মধ্যে এ বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। "বন্দে মাতরম্" ও "জনগণমন"র মত শ্রেষ্ঠ সংগীত হয়ত অবজ্ঞাত হবে কোন তৃতীয় শ্রেণীর গীত রাষ্ট্র-সংগীতের মর্যাদা পেয়ে যাবে।

"জনগণমন" গানটি রাজবন্দনা-গীত নয়, এ মর্মে অনেকগুলি বিবৃতি সংবাদপত্রাদিতে প্রচার করা হয়েছে। গত ৩০শে নবেম্বর শান্তি-নিকেতন থেকে বিশ্বভারতী-সংসদের সভ্যগণ কর্তৃক ভারতের সকল প্রদেশের সংবাদপত্রগুলিতে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে "জনগণমন-অধিনায়ক" গীতটি সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তি দিয়ে বলা হয়েছে যে, "পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় যুগযুগ ধাবিত যাত্রীদের যিনি চিরসারথি, যিনি জনগণের অন্তর্যামী পথপরিচায়ক, সেই যুগযুগান্তের মানব-ভাগ্যরথচালক পঞ্চম বা ষষ্ঠ কোন জর্জই কোনক্রমে হতে পারেন না।" শত প্রমাণ প্রয়োগ করলেই বা কি, আর রবীন্দ্রনাথের মত মানুষের নিজের উক্তি উদ্ধৃত করলেই বা কি? প্রয়াগের বিখ্যাত হিন্দী পত্রিকা "সরস্বতী" বলছেন,—"মেনে নিচ্ছি যে, এখানে স্পষ্টভাবে সম্রাট পঞ্চম জর্জের নাম ব্যবহার করা হয় নি, তবে এ কবিতার 'ভারত ভাগ্য বিধাতা' আর 'রাজেশ্বর' প্রভৃতি সম্বোধন তাঁর জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে বলে মেনে নেওয়া হবে?" অর্থাৎ 'ভারতভাগ্যবিধাতা' আর 'রাজেশ্বর' এ দুটি শব্দ যখন পাওয়া যাচ্ছে, তখন এ গান নিশ্চয় সম্রাট পঞ্চম জর্জকে লক্ষ্য ক'রে দিল্লী দরবারের জন্য লেখা!

হিন্দী সাহিত্যে সর্বজনপরিচিত, আধুনিককালে হিন্দীভাষা ও সাহিত্যের প্রভূত হিত ও উন্নতিসাধক মাসিক পত্রিকা এই "সরস্বতী"। সংবাদপত্রাদিতে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর "সরস্বতী"র মত পত্রিকায় এই বৎসরের মার্চ মাসের সংখ্যায় ২২১ পৃষ্ঠায় "জনগণমন-অধিনায়ক" সংগীতটি সম্বন্ধে বলা হয়েছে:—

"* * যহ তো এক বিদেশী বাদশাহ কী চাটুকারী সে ভরা হুয়া গীত হৈ। * * * যহ পরতন্ত্রতা কী ভাবনা ভরতা হৈ। ইসমেঁ রাষ্ট্রীয় গীতোচিত প্রাণ, আত্মাভিমান কহীঁ হৈ হী নহীঁ। ন জানে কিস বিচার সে ইসে (অস্থায়ী রূপ সে হী সহী) রাষ্ট্রীয় গীত স্বীকার কিয়া গয়া হৈ। জ্ঞাত হোতা হৈ, ইস মেঁ কথিত ভারত কে প্রতোঁ। ঔর জাতিয়োঁ কে নাম পর হী মুখ হো কর ইসে রাষ্ট্রীয় গীত মান লিয়া গয়া হৈ। ইস পর ধ্যান নহীঁ দিয়া গয়া কি ইন সবসে ভারতভাগ্যবিধাতা কী জয়গাথা গানেবালে কে লিয়ে ঔর উনকে সিংহাসনকে আসপাস বিরাজনেবালে কিস কিস কী ইনকা নাম লিয়া গয়া হৈ। * * * যহ অবাধা নহীঁ এক ক্ষণকে লিএ ভী হমারা রাষ্ট্রীয় গীত হোনেকে যোগ্য নহীঁ হৈ।"

অর্থাৎ—"এ তো এক বিদেশী সম্রাটের তোষামোদেভরা গান। * * * এ পরাধীনতার ভাব এনে দেয়। এতে জাতীয় সংগীতের প্রাণ আত্মগৌরববোধ কোথাও নেই। অস্থায়ীভাবে হ'লেও আমি কি

বিচার ক'রে এ গান রাষ্ট্র-সংগীতরূপে স্বীকৃত হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে, এতে কথিত ভারতের প্রদেশগুলির এবং জাতিগুলির মাঝের জন্যই মুখ হ'য়ে একে রাষ্ট্র-সংগীত ব'লে মেনে নেওয়া হয়েছে। এ কথা চিন্তা করা হয় নি যে, এদের ছিয়ে ভারত ভাগ্যবিধাতার জয়গান গাওয়ানোর জন্য আর তাঁর সিংহাসনের আশেপাশে বসানোর জন্য এদের নাম করা হয়েছে। * * * এ গান অস্থায়ীভাবে নয়, এক মুহূর্তের জন্যও আমাদের রাষ্ট্র-সংগীত হবার যোগ্য নয়।"

"জনগণমন"—সংগীতকে হেয় করার জন্য বিশিষ্ট পত্রিকাতেও এখনও কি ধরণের উক্তি প্রকাশিত হচ্ছে, তার একটা নমুনা উপরে উদ্ধৃত করা হ'ল। এ জাতীয় উক্তি যখন এখনও প্রকাশিত হচ্ছে, তখন তার সমযোগ্য প্রতিবিধান হওয়া বাঞ্ছনীয়। শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা একবার নষ্ট হ'লে, তা আবার পুনরুদ্ধার করা বড়ই কঠিন।

পণ্ডিত নেহরু একবার সংবিধান পরিষদে রাষ্ট্র-সংগীত সম্বন্ধে বিবৃতি দিতে উঠে "বন্দেমাতরম্" ও "জনগণমন" এই দুটি জাতীয় সংগীতের রাষ্ট্র-সংগীত হিসাবে উপযোগিতা তুলনা ক'রে সব শেষে বলেছিলেন :

"It may decide on a completely new song or tune, if such is available."

পাওয়া যাবে না কেন? "বন্দেমাতরম্" ও "জনগণমন" দুটি গানই অপব্যবহৃত হয়ে পরিত্যক্ত হলে, এদের স্থানে অধিকার করবার জন্য অনেক নূতন গান নিশ্চয় রাজপথে এসে সারি দিয়ে দাঁড়াবে।

ফল্গুধারা

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস

আমি রাত্রে শুই দেরিতে, সকালে উঠিও দেরিতে, ইহা আমার বরাবরের অভ্যাস। সেদিন ঘুম ভাঙিতেই কানে আসিল পিসীমার সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠের খন্‌খনে আওয়াজটা। ইহা প্রায় নিত্যকারের ব্যাপার হইলেও একটু বিরক্তি যে আসিল না, তাহা নহে। পিসীমাই এ বাটীর প্রভাবশালিনী ঝংকারময়ী কর্ত্রী। কিন্তু সেজন্য কোনও অসুবিধা ছিল না। পরিবারের মধ্যে বাস করিতে হইলে কাহারও-না-কাহারও কর্তৃত্ব মানিয়া চলিতেই হয়, আপত্তি করিলে শৃঙ্খলা থাকে না। সুতরাং সেদিক্ দিয়া আমাদের কোন অভিযোগ ছিল না। কিন্তু গোলযোগ বাধিয়াছে এ-বাড়ির ছেলেমেয়েদের আচারহীনতা লইয়া। দুষ্ট ছেলেমেয়েরা সকাল হইতেই দল বাঁধিয়া চা, বিস্কুট, ডিম প্রভৃতি নিষিদ্ধ পানীয় ও খাদ্যগুলি গো-গ্রাসে গিলিবে···আচ্ছা, তাহাতেও না-হয় পিসীমার তেমন আপত্তি নাই। ছেলেমানুষের অতো বিচার করিতে গেলে চলে না। কিন্তু তাই বলিয়া এই দুরন্ত ছেলে-মেয়েদের খেয়ালপনা করিবার একটা নির্দিষ্ট স্থান থাকিবে না? তাহারা কিনা তাঁহার দ্বিতলস্থ কক্ষের সম্মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া সারা বারান্দা ভরাইয়া ত্রিতলের পূজার ঘরের সিঁড়ি পর্যন্ত স্থান জুড়িয়া যাহা-খুসি খাইবে ও ভুক্তাবশেষ যথেচ্ছভাবে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া রাখিবে? রাগ হইবার কথা নয়? একালের ছেলেমেয়েদের দুর্দান্ত স্বভাব ও নোংরামির তীব্র প্রতিবাদ করিতে করিতে সমস্ত জায়গাটিতে গোবরজলের ছড়া দিয়া পথের উপরের ছেঁড়া পাতা ও কাগজের টুকরা, কিসের জাকড়া ও খড়কুটা একটি একটি করিয়া খুঁটিয়া তুলিয়া পথিপার্শ্বের নর্দমায় নিক্ষেপ করিতে করিতে আমাদের সদ্যস্নাতা সেকালের পিসীমা পুনরায় স্নান করিতে চলিলেন।

সেদিন শনিবার। কর্মস্থল হইতে সকাল-সকাল বাড়ি ফিরিতেছি, কাছাকাছি আসিয়াই শুনিলাম পিসীমার অভ্যস্ত কণ্ঠের সুপরিচিত ঝংকার।

ব্যাপার যে গুরুতর কিছু নহে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। বলিলাম, কি হোলো পিসীমা? পিসীমা তখন রাগে গরগর করিতেছেন। বুঝিলাম আমার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে না। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটি এক নিমিষেই সুস্পষ্ট হইয়া গেল। সেজকাকার তিন বছরের ছেলে মিণ্টু পিসীমার অঞ্চলটি ডান হাতের মুঠোয় ধরিয়া তখন অপরূপ ভংগীতে মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছে। তাহার শুভ্র দন্তে, উজ্জ্বল চক্ষে, ঝাঁকড়া চুলে—কোথাও ভয়ের লেশমাত্র চিহ্ন বর্তমান নাই।

ব্যাপারটি এই। স্নানাকে ও শুচাচারে পিসীমা হবিষ্যান্নের পাত্রটি উনান হইতে নামাইয়া ঘর হইতে হাত

ধুইবার জন্য বাহিরে আসিতেছিলেন, এমন সময় পূর্বোক্ত মিটুর পায়ায় পড়িয়া গিয়াছেন—অর্থাৎ কাণ্ডজ্ঞানহীন অপোগণ্ডটি তাঁহাকে দুইটি বাহু দিয়া জাপটাইয়া ধরিয়াছে। কাকিমা বলিলেন, ওতো দিগম্বর শিশু, দিদি, ওর পরণে তো কাপড়ের কোন বালাই নেই, ও ছুঁলে আর দোষ কি? দোষ কি! এই গা-জ্বালানে বে-হিসাবী কথায় পিসীমা আরও অধিক জ্বলিয়া উঠিয়াছেন। কথাটা ওঁর হিসাব না করিয়া বলা ঠিক হইয়াছে কি? দিগম্বর শিশু শুধু যদি তাঁহার আঁচল চাপিয়া ধরিত, তাহা হইলে কি তিনি অতো রাগ করিতেন, না, রাগে তাঁহার সর্বাঙ্গ জ্বালা করিত? তাহা নহে। সে দক্ষিণহস্তে অঞ্চল ধরিয়া আছে এবং সেই সঙ্গে বামহস্তের দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার ক্ষুদ্র একপাটি জুতাও ধরিয়া রহিয়াছে যে! সেই বস্তুবিশেষটির স্পর্শ সে ত্যাগ করিতে পারে নাই।

আগে-আগে দেখিয়াছি পিসীমা ছেলেদের ভালবাসিতেন বেশ। ছেলেরাও তাঁর খুব ন্যাওটো ছিল। ইদানীংই কেবল তাঁহার আচারপরায়ণতার উত্তাপে তাঁহার হৃদয়ের শিশুপ্রীতির রসটুকু যেন নিঃশেষে বিশুষ্ক হইয়া উঠিতেছে। উচ্চকণ্ঠে অভ্যস্ত প্রতিবাদসহকারে সমালোচনার মুখর বুলিগুলি আওড়াইতে আওড়াইতে আমাদের পিসীমা পুনরায় স্নান করিতে চলিলেন।

আর একদিনের কথা। নিত্যকার অভ্যাসমত সেদিনও পিসীমা সন্ধ্যার কিছু পূর্বে স্নানাদি সাঙ্গ করিয়া ঠাকুরের বৈকালিকী সমাপন করিতে মন্দিরে ঢুকিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বহু অনুরোধে টুনিকে বিশ্বাস করিয়া দূর্বা-করবীগাছ তুলিয়া আনিতে বলিয়াই কাল করিয়াছিলেন। সেই কথাই বলিতেছি।

টুনি আমাদের পাড়ার এক নমঃশূদ্রের মেয়ে—এবাড়ির ছেলেমেয়েদের খেলার সাথী। মধ্যে মধ্যে সে পিসীমার দুই-একটি কাইফরমাস খাটিয়া যেন বর্তিয়া যায়। অবশ্য, স্পর্শদোষে কদাপি দূষিত হয় না এইরূপ সনাতন ফরমায়েসই সে খাটিতে পায়। আজও সে দূর্বা তুলিবার অনুমতি পাইয়া পরমাহ্লাদে নৃত্য করিতে করিতে বহির্বাটিতে গিয়াছিল ও প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাছিয়া বাছিয়া সতেজ দূর্বাদলের নধর ডগাগুলি তুলিয়া আনিয়া পিসীমার তুলসীর রেকাবির একান্তে আলগোছে রাখিয়া দিয়াছিল। কিন্তু চঞ্চলমতি হতভাগী মেয়েতো দুচোখে দেখিয়া কোন কাজ করিবে না! দূর্বা সে তাহাই আনিয়াছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে জড়াইয়া জীর্ণ-কাপড়-থেকে-খসে-পড়া এক টুকরা সূক্ষ্ম সুতাও যে আনিয়া দিয়াছে! এখন উহারই ফাঁক দিয়া কোন্ অজ্ঞাত অশুচাচার যে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিল, তাহাই ভাবিতে গিয়া পিসীমার গা কাঁটা দিয়া উঠিয়াছে—মাগো! ব্রাহ্মণকন্যা ও নমশূদ্রকন্যার ছোঁওয়া কাপড়ের সুতো যে একই কার্পাস তুলায় তৈয়ারি এবং ভগবান্ শুধু মানুষের অন্তরের নিষ্ঠাটুকুই দেখেন, বাহিরের নয়—এমনই-কিছু বলিতে যাইব, এমন সময় দেখি, পিসীমা যেন তাঁহার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে কাহাকে শাসন করিতে করিতে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে নদীপথে চলিলেন।

দুর্জয় শীতের সন্ধ্যা কখন্ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সেদিকে কাহারই খেয়াল নাই। পূর্ণোদ্যমে একটি উপাদেয় আলোচনা চলিতেছিল। আচারহীনতার জন্য পিসীমার নিকট সদাসাঙ্কিতা একাড়ির ছোটবধূ ওরফে আমাদের আধুনিকা ছোটকাকিমা বলিতেছিলেন, "মরণ আর কি! খালি নাওয়া আর নাওয়া, স্বর্গ থেকে সোনার রথ নেমে আসবে ওঁকে তুলে নেবার জন্য, হাতে ছাতা—পায়ে ছাতা, অশুচি আর কি! ভগবান্"……আর বলা হইল না। দেখিলাম, দ্বারপথে সদ্যস্নাতা পিসীমা গজ্ গজ্ করিতে করিতে বাড়ি ঢুকিতেছেন।

ইহার কিছুদিন পরের কথা। শীত তখনও যাই-যাই করিয়াও একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। হঠাৎ অসময়ে মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রবল বন্যা আসিয়া দেখিতে দেখিতে গ্রামের পর গ্রাম গ্রাস করিয়া ফেলিল। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগটিকে উপলক্ষ করিয়া রিলিফ ওয়ার্কসের কর্মীদের সাহায্য করিবার জন্য সংবাদপত্রের স্তম্ভে স্তম্ভে, হ্যাণ্ডবিলের ছত্রে ছত্রে বিপুল সাড়া পড়িয়া গেল। সর্ব-কর্মে-সকল-সময়ে—অগ্রণী ছেলের দল গলায় হারমনিয়ম্ ও মৃদঙ্গ ঝুলাইয়া, খঞ্জনী বাজাইয়া নগরের পথে, গ্রামের গলিতে সঘোষে সমস্বরে সংগীত গাহিয়া চলিয়াছে—"ভিক্ষা দাওগো, ভিক্ষা দাওগো।" রিলিফের কার্যের সুবিধার জন্য ছোট-বড় কয়েকটি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে এবং আরও কয়েকটি হইবে, তাহার উদ্যোগ চলিতেছে। নানা স্থান

হইতে কর্মীরা আসিয়া জুটিতেছেন। আমাদের সমস্ত বাড়ির দুইখানি ঘরের মধ্যে বড় ঘরটি ও লম্বা দালানটি তাঁহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, স্থির হইয়াছে। ইহা জ্যাঠামশায়ের সম্মতিক্রমেই হইয়াছে। কিন্তু পিসীমাকে না জানাইয়া বা তাঁহার অনুমতি না লইয়া কোন কার্য করা এবাড়ির রীতিও নহে এবং তাহা সম্ভবও নহে। সুতরাং এ ব্যাপারে মা, জ্যাঠাইমা কাহাকেও লইয়া কাজ চলিবে না—পিসীমার দয়া ভিক্ষা আমাদের করিতেই হইবে। "ইঁহারা ভদ্র সন্তান, দুর্গতদের সেবার ভার মাথায় লইয়া পথে বাহির হইয়াছেন এবং জনসাধারণের সাহায্যভিক্ষা করিয়া দেশে দেশে ফিরিতেছেন" ইত্যাদি বলিয়া আমি পিসীমার নিকট ইঁহাদের মহৎপ্রাণের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম। আশা হইল, নিরন্ন, বস্ত্রহীন নরনারীর দুর্দশার ছবি পিসীমার মনশ্চক্ষের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে সমর্থ হইয়াছি। অতঃপর ভদ্রসন্তানগণের আতিথেয়তা স্বীকার করিবার জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি সর্তে পিসীমার সহিত সন্ধি স্থাপিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ সর্তগুলি তাঁহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইল। সর্তগুলি এইরূপ :—যথা (১) আহার্য গ্রহণকালে উচ্ছিষ্ট পাত্র হইতে অন্ন ও ব্যঞ্জনের কোন অংশ যেন আদনে পতিত না হয়। (২) বাম হস্তে দৈবাৎ অন্নপাত্রের স্পর্শ ঘটিলে, সেই হস্ত যেন ভূমক্রমে নিজ পরিধেয়ে সংস্পৃষ্ট না হয়। (৩) প্রত্যূষে যেন আর্দ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া কার্যবিশেষটি সম্পাদন করা হয় অথবা উক্ত ক্রিয়ানিষ্পত্তি শেষে পরিহিত বস্ত্রটিকে যেন রীতিমত সিক্ত করিয়া লওয়া হয়। চতুর্থ বা সর্বশেষ সর্তটি হইতেছে এই যে, (৪) ভ্রমণান্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন কালে যেন কনুই পর্যন্ত হস্ত ও জানুপর্যন্ত পদদ্বয় প্রক্ষালন করা হয়। অপরিহার্য এবং অনুপেক্ষণীয় এই সর্তচতুষ্টয় আগন্তুকগণের শ্রুতিগোচরীভূত করা হইলে তাঁহারা হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। হাসি থামিলে একজন বলিলেন, "আপনারা এই সকল নিয়ম মেনে চলেন?" যথাসম্ভব গাম্ভীর্য ধারণ করিয়া বলিলাম, "এই সকল আচার পালন করা এ বাড়ির মজ্জাগত অভ্যাস। এগুলি পালন-না-করার কথা আমরা কেউ ভাবতেই পারি না। তাই বোলে আপনারা ভাববেন না যেন এগুলো মেনে চলতে আমাদের কোন কষ্ট হয়! না, আমাদের মোটেই কোন অসুবিধা হয় না।"

আচার ও অনুষ্ঠানের জন্য মধ্যে মধ্যে মতভেদ হইতে থাকিলেও দেখিলাম, পিসীমার সহিত মিলিয়ের ছেলেদের বেশ একটু ঘনিষ্ঠতা জমিয়া উঠিতেছে। বন্যা কমিয়া আসিল। ছেলেদের এখানকার কাজও প্রায় ফুরাইয়া আসিল। এ অঞ্চলের যাঁহারা ভিক্ষা দিবার, তাঁহারা সকলেই সাধ্যমত সাহায্য করিয়াছেন। আমাদের বাড়িটিকে কেন্দ্র করিয়া চতুর্দিকে পাঁচ মাইলের মধ্যে তাঁহাদের কার্য সারা হইয়াছে। তাঁহারা এখন অন্যত্র গিয়া ভিক্ষা করিতে চান। সুতরাং এইবার তাঁহাদের বিদায়-দিবার পালা। পরদুঃখকাতর পরিচয়হীন এই পথের ছেলেগুলির জন্য হৃদয়ের একটি নিভৃতকক্ষে বেদনা অনুভব করিতে লাগিলাম। তাঁহাদের বিদায়বেলায় দেখি, পিসীমা অশ্রুসজলচক্ষে একটি ছেলের মাথায় হাত রাখিয়া তাহার কল্যাণ কামনা করিয়া বলিতেছেন, "তোমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছি বাবা, সে সব ভুলে যেও; যদি কখনো এদিকে আস তো পিসীমার সঙ্গে দেখা কোরে যেও আবার।"

বর্ষা শেষ। ম্যালেরিয়াটা এবার বেশ কায়েমীভাবেই চাপিয়া ধরিয়াছে, দেখিতেছি। বাড়ি-বাড়ি অসুখ।

ছুটির বার। হঠাৎ বাহির হইতে এক সময়ে বাড়ি ফিরিয়া দেখি, পিসীমার মূর্তিমতী অনাচার আমাদের ছোট কাকিমা পিসীমার হবিষ্য নামাইতেছেন। শুভ্র গরদের শাড়ির উপর ভিজা চুলগুলি এলাইয়া দিয়াছেন—চুলের জলে পিঠের খানিকটা ভিজিয়া গিয়াছে—তাঁহার এইরূপ মূর্তি সচরাচর দেখি না—সচরাচর কেন, কোনদিন দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। যথেষ্ট কৌতুক বোধ করিলাম। কিন্তু তাহার চেয়ে বেশি মানিলাম বিস্ময়। পিসীমার হবিষ্য নামাইতেছেন আমাদের ছোট কাকিমা—যাঁহার হাতের ছোঁওয়া জল পান করিতে রুচি হয় না, তিনি? এ কি বিস্ময়! অচিন্তনীয় কোন ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছি বলিয়াই মনে হইল।

ছোট কাকিমা ধীরে সুস্থে বলিলেন, দিদিমণি আজকাল সকল সময়েই ব্যস্ত থাকেন, সময়মত আসতে পারেন না—তাই আমিই দুটো ফুটিয়ে রাখি। না হ'লে যে তাঁর খাওয়াই হয় না, বাবা।

পিসীমা ব্যস্ত থাকেন? কিসে তাঁহার এত ব্যস্ততা—যাহার জন্য তাঁহার আজন্ম বদ্ধমূল সংস্কারের অভ্যস্ত

অনুষ্ঠানগুলি উপেক্ষিত হইতেছে? সময়ে আসিতে পারেন না? কোথাই থাকেন তিনি? তবে কি আজকাল তাঁহার বাতিক অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে? শুচিবায়-গ্রস্ততা শুনিয়াছি ক্রমবর্দ্ধমান এক প্রকার মানসিক ব্যাধি। তবে কি আজকাল তিনি নদীর ঘাটেই সারাদিন কাটাইতেছেন? এইরূপ বহু প্রশ্ন মুহূর্তমধ্যে বিদ্যুতের মত আমার মাথায় খেলিয়া গেল। নিমেষমাত্র। আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ছোটকাকিমার মুখের দিকে তাকাইতেই তিনি আমার মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "দিদিমণি এখন কলুপাড়ায় গেছেন। সেখান থেকে যাবেন বাগ্দীবস্তিতে। ঘরে-ঘরে অসুখ। কে-কার মুখে জল দেয়, তার ঠিকানা নাই। তাই তিনি নিজের হাতে সেই সব অভাগার সেবার ভার মাথায় তুলে নিয়েছেন।" আমাকে বলিতে বলিতে ছোটকাকিমার চক্ষু দুইটি সজল হইয়া উঠিতেছিল। তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন।

সন্ধান লইয়া একটি বাড়িতে প্রবেশ করিলাম। ছাঁচা-বাঁশের বেড়া-দেওয়া খোড়ো চালা। দাওয়ায় উঠিয়া ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়া দেখিলাম, পিসীমা সেই চির-অস্পৃশ্য জাতির ছোট্ট একটি মেয়ের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছেন। অপর পার্শ্বে আর-একটি বিছানায় আধা-গোড়া লেপমুড়ি দিয়া অস্ফুটস্বরে গোঙাইতেছে আর-একজন। যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিলাম, তেমনি নিঃশব্দে পিসীমার অলক্ষ্যে ফিরিয়া চলিলাম।

ধূসর সন্ধ্যা। ছায়ার মত নিঃশব্দে ধীরে ধীরে ঘরে ফিরিলেন ঐ আমার সন্ন্যাসিনী পিসীমা। আজ আর কোন বাধা নাই। ছুটিয়া চলিলাম তাঁহার ঘরে। তাঁহার পা দুইটির উপর আমার মাথাটি রাখিয়া বলিলাম, পিসীমা, না জেনে অনেক অপরাধ ক'রেছি, আমাকে তুমি ক্ষমা করো। তারপর কয়েক ফোঁটা অবোধ অশ্রু আপনিই ঝরিয়া পড়িয়া তাঁহার চরণ দুইটি সিক্ত করিল।

অকাল-সন্ধ্যায়

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

ধরা পড়ার মর্ম্মব্যথায় অশ্রুজলের গর্ব্ব তোমায় টুটবে,
কোথায় কবি পাঠায় সোহাগ হাত্না আপনি ফুটে উঠবে।
হয়-তোশেষের শেষ দুপুরে আপন ঘিরে মগ্ন আছ হায়,
উদাস কোণে মেঘ দেখেনা, বাদলা বাতাস লাগছে বাকি গায়?

সত্যি সখী বর্ষা আসে, মাটির বুকেও জাগলো তারি সাড়া,
অভিমানের বন্ধ আমার মনের তলে হ'ল আপন-হারা।

আজ অকালে সন্ধ্যা নামে, রাত্রি নামে দুপুর হ'তেই বুঝি,
মেঘের ফাঁকে সূর্য্য চোরে, মেঘের ফাঁকেই তোমায় আমি খুঁজি।
কাজের তাড়া নেইকো কিছু, বাইরে যাবার নেইকো প্রয়োজন,
মাটির বুকে উড়ছে ধূলো, ওই ধূলোতে ওড়ে আমার মন।

সকাল বেলার দুষ্টুমেতে দুঃখ যদি পেয়েই থাকো কোন,
দুঃখ তোমার লয় এলো, সত্যি কথা বলছি সখী শোন।

কাব্য তুমি নিজেই, তবু কাব্য পড়, তোমার বলা মিছে
মন ভোলানো উদাস হাওয়া বইছে কেন মেঘের পিছে পিছে।
শুকনো নদীর বালুচরে, কেয়ার ঝাড়ে বর্ষা কথা কয়,
ঘরে আদিম ব্যথা জাগে, বাইরে শুধু বর্ষা জেগে রয়।

বর্ষা আসে, নতুন ধানের পুলক জাগে মাটি মায়ের বুকে,
বর্ষা আসে, ভুলে যাওয়া হাসি ফোটে কিশোর বধূ মুখে।

তাই তোমাকে এমন দিনে এই কথাটি ভুলতে বেবোমাকো :
—ঘুমন্ত মোর বুকে তুমি রাত্রি জেগে দৃষ্টি মেলে থাকো।
হঠাৎ যদি ঘুম ভেঙে যায়, অন্ধকারে চক্‌চকে ওই চোখে,
নিবিড় করে আপন করে পাই যে আমার হারা বিশ্বলোকে।

দিনের বেলা দিনের কথা, রাত্রি বেলা অন্য কথা কও,
আজ অকালে রাত্রি নামে, মিথ্যে কেন অন্তরালে রও।

তথাগতের পথে

নরেন্দ্র দেব

বাড়ীখানির নাম 'সপ্তপর্ণী' শুনে এত ভাল লেগেছিল যে মনে মনে তার একটা স্নিগ্ধ শান্ত রূপ কল্পনা করে নিয়েছিলুম। 'সপ্তপর্ণী' ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নাম। বুদ্ধদেবের দেহরক্ষার পর একবার সেখানে সমবেত হয়েছিলেন তাঁর প্রধান শিষ্যপ্রশিষ্যগণসহ প্রায় পাঁচশত বৌদ্ধ শ্রমণ, তথাগতের অবর্তমানে তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্তব্য নির্ধারণের জন্য। এটি সেই সপ্তপর্ণী, অথবা বৈভার শৈলশিখরস্থ সেই সপ্ত-গিরিগুহার অনুকরণে নির্দ্মিত হয়েছে এই গৃহখানি? কে জানে।

ষ্টেশনে নেমে দেখি, আমাদের তত্ত্ব লোকজন নিয়ে অপেক্ষা করছেন

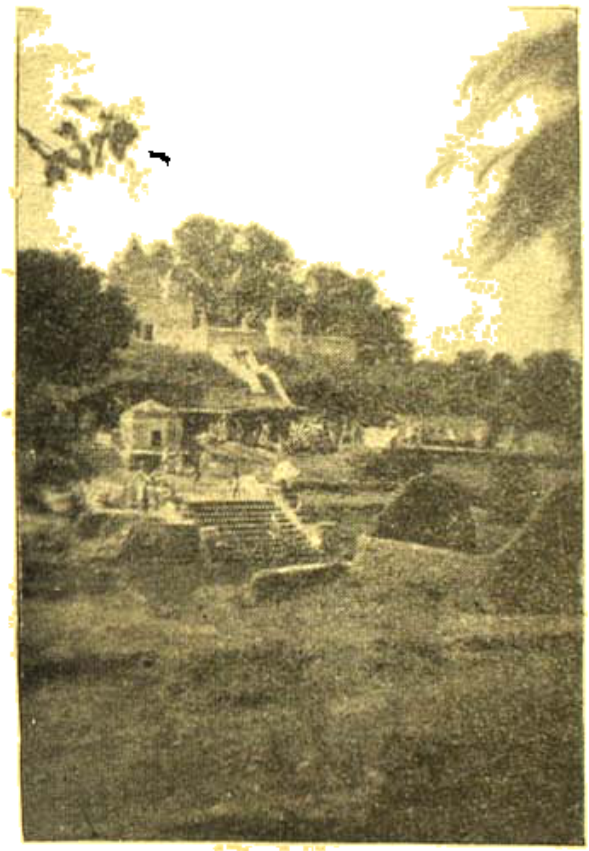

রাজগীর উষ্ণ প্রস্রবণ—সপ্তপর্ণী

স্বামী কৃপানন্দজী ও যুবরাজ পাণ্ডা। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন সিমুলিয়ার ৺হরিদাস সোম মহাশয়ের পুত্র এটর্ণী বাসবদেব সোম। তাঁর কন্যা ও জামাতা এখানে বায়ুপরিবর্তনে এসে রয়েছেন। পূজার ছুটিতে তিনি সস্ত্রীক কিছুদিনের জন্য রাজগীরে এসেছেন। অনেকদিন পরে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ায় মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠলো।

স্বামী কৃপানন্দজী ও যুবরাজ পাণ্ডা আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। লাইনের ওপারে প্রায় ষ্টেশনের বিপরীত দিকে 'সপ্তপর্ণী' বাড়ীখানি। রেলিং দিয়ে ঘেরা। দুপাশে দুটি ফটক। ফটকের একধারে একটি বেত করবীর ঝাড়, শাখাপ্রশাখা তার ফুলে ফুলে আচ্ছন্ন। আর একধারে একটি রক্তকরবী গুচ্ছ গুচ্ছ কলি ও কুসুমে ভরে রয়েছে।

স্বামীজী আমাদের অনুরোধ মতো বাড়ীখানি ঘুরিয়ে খুঁটিয়ে পরিষ্কার করিয়ে রেখেছিলেন, একটি কলসীতে খাবার জল তুলিয়ে, এক বোকা কাঁচ আনিয়ে এবং কিছু ভাল দুধও সংগ্রহ ক'রে রেখেছিলেন। রাজগীরের অধিবাসী প্রবাসী বাঙালীদের তিনি বন্ধু ও সহায়স্বরূপ। বহুদিন তিনি রাজগীরে রয়েছেন, নিজের একক চেষ্টায় এখানে একটি ধর্ম্মশালা ও সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। অবশ্য আশ্রমটি এখনও পাকা

রাজগীর—ধর্ম্মশালা ও আশ্রম

করতে পারেন নি, কুটীর আশ্রম ক'রেই সে তার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করছে। স্বামীজী শীঘ্রই এই আশ্রমটিকে পাকা করবেন শোনা গেল। চাঁদা সংগ্রহ চলছে। রাজগীরে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই একটা না একটা সাধারণ আশ্রয়স্থল আছে—যেমন জৈনদের শ্বেতাম্বরী ও দিগম্বরী ধর্ম্মশালা, বিহারী ও হিন্দুস্থানীদের চত্তর একাধিক ধর্ম্মশালা, শিখ ও পাঞ্জাবীদের বহু সংখ্যক মঠ, মারোয়ারীদের মঠ, বর্ম্মীদের আশ্রম, কিন্তু বাঙালীদের এসে দাঁড়াবার মতো কোনও স্থান নেই। কিছুদিন আগে একজন উৎসাহী বাঙালী যুবক এখানে একটি বাঙালী হোটেল স্থাপন করেছেন, কিন্তু এখানে বাঙালী খাওয়ার আয়োজন থাকলেও স্থানাভাবে দু'তায়

জনের বেশী যাত্রীদের ঠাঁই দেবার শক্তি নেই এঁদের। কাজেই দু'চার দিনের বাঙালী যাত্রীরা কোনও না কোনো ধর্মশালায় উঠে আহারের ব্যবস্থা করেন এখানে, কারণ ধর্মশালায় রেঁধে খাবার ব্যবস্থা থাকলেও মাছ মাংস ডিম প্রভৃতির প্রবেশ নিষেধ। বাঙালী সব পারে, কিন্তু নিরামিষ খেয়ে থাকতে পারে না; অবশ্য, বৈষ্ণব, বিধবা আর ফলাহারী ব্রাহ্মণ ছাড়া। রাজগীর জৈনপ্রধান স্থান বলে এখানে মাছ মাংস সব দিন পাওয়াও দুর্লভ। রাজগীর থেকে মাইল তেরো ঘুরে অবস্থিত বৌদ্ধ যুগের ওদন্তপুর ও পাঠান পরে যুগের 'বেহারেশরীফের' বাজারে যেদিন মাছের চালান আসে সেই সেদিন কিছু মাছ রাজগীরেও আমদানী হয়, নইলে ঐ করলার নদী নালা ডোবা থেকে ছেলে ছোকরাদের ধরে আনা চুনোপুঁটি আর ল্যাঠা মাছই একমাত্র ভরসা। কদাচ সিঙ্গী মাগুরও মেলে। শোনা গেল এখানে আগে ডিম ও মুর্গী প্রচুর পাওয়া যেতো, কিন্তু, বোমাপটির ব্যাপারের পর বিহারে যখন ফেন্সু-নিবহ-নিধন চলে একা চালাচ্ছে। প্রত্যেক মিলিসের দর প্রায় কলকাতার সমান। দুধ খাঁটি টাকায় পাঁচ পোয়া। পরিষার তৈরী ঘানীর ২৷৷০ টাকা সের। সস্তার মধ্যে ভাল ঘৃত এখনও এখানে পাঁচ টাকা সের পাওয়া যাচ্ছে; কলকাতার মতো ১৲ টাকায় ওঠে নি। বাংলার সের ২৷৷০ টাকা। মুর্গী একটি ২৲ টাকা। ডিম ।৵০ পোড়া। এখানে কেরসিন তেল, পেট্রল এবং লোহা, সিমেন্ট ছাড়া আর কোনও জিনিসের উপর কণ্ট্রোল নেই। বাজারে চাল প্রচুর পাওয়া যায়। কিন্তু দর বেশী। উৎকৃষ্ট সরু চাল ৩০৲ টাকা মণ। কলকাতায় সরকারের কণ্ট্রোল দর ২৭৲। বস্ত্র ও ছিটের কাপড় দোকানে দোকানে যথেষ্ট রয়েছে। দর অবশ্য কলকাতার কণ্ট্রোলের চেয়ে বেশী, কিন্তু ব্ল্যাক মার্কেটের চেয়ে কম। রান্নাঘরে এখানে কাঠের জ্বালের ব্যবস্থা, কারণ কয়লা পাওয়া যায় না। রেলের ইঞ্জিন থেকে ফেলে দেওয়া পোড়া কয়লা ভিখারী ছেলেরা বেছে এনে বাড়ী বাড়ী বেচে যায় চার আনা থেকে দু'আনা ঝুড়ি। এক ঝুড়িতে আন্দাজ এক সের দেড় সেরের বেশী হয় না।

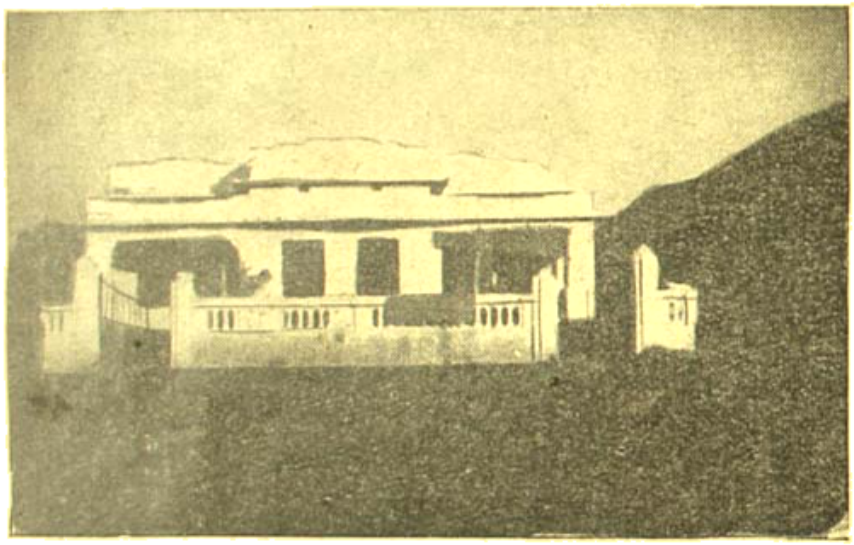

'সপ্তপর্ণী' (বহির্ভাগ)

ঘি, রাবড়ি, মিষ্টান্ন, ক্ষীরের পেড়া, রসগোল্লা পান্তুয়া, ক্ষীরমোহন ইত্যাদি যথেষ্ট পাওয়া যায়। স্টেশনের পিছনের দোকানটি এখানে পরেশ খাবারের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই খাবারওয়ালাটি শুধু মিষ্টান্নই সরবরাহ করে না, টেবিল, চেয়ার, তক্তাপোষ, আলো, বাতী, বাল্‌তি, ঘটি, এমনও যাত্রীদের সামান্য ভাড়ায় সরবরাহ করে।

রাজগীরের জল খুব ভালো। পেটরোগারা তো 'সপ্তধারা' নির্ঝর উষ্ণপ্রস্রবণের জল পান করেন, যাতের রোগীরাও তাই। কোনও কোনও সুস্থ পরিবারেও উষ্ণপ্রস্রবণের জল পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার হয়। এই জল মাটির কলসিতে ভরে রাখলে বরফ জলের মতো ঠাণ্ডা হয়ে যায়, কিন্তু অনেকের এ জল পান করলে কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দেয়। তাঁরা এখানকার প্রসিদ্ধ কূপ "পাঁচরখিয়া ইঁদারার" জল পান করেন। আমরাও প্রথম প্রথম স্থানীয় পরামর্শ মতো 'পাঁচরখিয়ার' জল পান করতুম। কিন্তুদিন উষ্ণপ্রস্রবণের জলও ঠাণ্ডা করে সেবন হল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নিজেদের বাড়ীর সপ্তপর্ণী কূপার জলই ফুটিয়ে নিয়ে পান করা হ'ত। কারণ পাঁচরখিয়া আমাদের বাড়ী থেকে প্রায় ১৷৷০ মাইল পশ্চিমে এক অপরিষ্কার কূপা, আর উষ্ণপ্রস্রবণ আমাদের বাড়ী থেকে ১ মাইল দক্ষিণে এবং এ জলে কোষ্ঠবদ্ধতা আনে। একদিন গিয়েছিলাম পাঁচরখিয়ার কূপা দেখতে। দেখি কূপাটি অত্যন্ত নোংরা। জলের মধ্যে সাপ ব্যাঙ, প্রভৃতি নানা জলচর প্রাণী কিলবিল্ করছে এবং সবচেয়ে বিপজ্জনক হচ্ছে—যে-কোনও সাধারণ লোক এসে তাদের

মোংরা বালতি টব, তাসা বা ঘড়া অবাধে এর মধ্যে ডুবিয়ে জল নিচ্ছে। রাস্তার ধারেই কুয়ো। মুখে কোনও ঢাকার ব্যবস্থা নেই। রাস্তার ধুলা ময়লা সারাদিন অবিরত হাওয়ায় উড়ে এসে সেই জলে পড়ছে। সেই রাস্তায় অনেকগুলি বর্দ্ধিষ্ণু থাকায় পথের দু'ধারে তীর্থযাত্রীরা ওঁদের পাকস্থলীর তৃপ্তার্থমলে নামিয়ে রেখে গেছেন। এখানে কোনও মিউনিসিপ্যালিটি নেই এবং পথের আবর্জ্জনা পরিষ্কারেরও কোনও ব্যবস্থা নেই। একটি নামমাত্র মুনিসিপ বোর্ড আছে, তার চেয়ারম্যান জনৈক মুসলমান ভদ্রলোক। তিনি এতই ভালমানুষ যে মাতব্বরের ধাওড় ও মেথরেরা তাঁর কোনও নিয়মই মেনে চলে না। কাজেই বাড়ীর নর্দ্দমা ও পায়খানা পরিষ্কারের জন্য এখানে আলাদা মেথর নিযুক্ত করতে হয়েছিল সপ্তাহে ২৲ টাকা মজুরীতে। এখানে কাজের লোকেরা সবাই হপ্তা মজুরীতে কাজ করে। রাজধীরের সবচেয়ে উপভোগের খাদ্য, এখানকার উৎকৃষ্ট গুদ-ভাঙা চাটকা আটা! এরও দাম মণ করা ২৮৲ টাকার কম নয়। কি বলতে বলতে কোথায় চলে এসেছি। একেই বলে খেই হারিয়ে ফেলা। আমরা 'সপ্তপর্ণীতে' প্রবেশ ক'রে কুলিদের বিদায় দিয়ে সবে একটু বিশ্রাম করবো ভাবছি। দিদি বাঁদুনী ও বাসনকে নিয়ে রান্নাবান্নার কি ব্যবস্থা করা যায় সেই চেষ্টায় পাকশালার দিকে অগ্রসর হ'তে না হ'তে দেখি 'নন্তু' ওরফে শ্রীমান নীরোদকুমার বসু ও তদীয় পত্নী কল্যাণীয়া শ্রীমতী পূর্ণিমা বসু এসে হাজির। বললেন—কিন্তু রান্নাবান্না করবেন না এবেলা। আমরা আপনাদের এবেলার খাওয়ার আয়োজন করেছি। আপনারা মুখ হাত ধুয়ে স্নান সেরে নিন। এখনি আপনাদের খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বলা বাহুল্য যে এ ঘটনায় আমরা খুবই খুশী হয়েছিলুম! কিরকম অসময়ে এরকম সাহায্যের দাম যে কত বেশী তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। এই ছেলে মেয়ে দুটিকে তখন একান্তই ঈশ্বর-প্রেরিত বলে মনে হ'তে লাগলো। নন্তু জিজ্ঞাসা করলে—আমার শ্বশুর দশা'য়ের সঙ্গে কোথাও আপনার দেখা হয়নি? তখন দাশরথীবাবুর কথা মনে পড়লো—এরাই তা'হলে আমাদের দাশরথী সোমের মেয়ে জামাই। কিন্তু নীরদদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় বহু পূর্ব্বের। নীরদ এবং এরই দাদা নরেনকে বাল্যকাল থেকে আমরা জানি। শ্রীনীরোদকুমার বসু আজ প্রাইস ওয়াটারহাউস এণ্ড পীট মার্কে প্রসিদ্ধ হিসাব পরীক্ষক কোম্পানীর একজন অডিটর। ছেলেটি যেমনি প্রিয়দর্শন, তেমনি মিষ্টভাষী ও বিনীত স্বভাব। পূর্ণিমা মেয়েটি রূপে গুণে তার যোগ্যা সহধর্ম্মিণী হয়েছে।

আমরা স্নানাহ্নিকে স্নান সেরে উঠতে না উঠতেই নন্তু আমাদের মধ্যাহ্নভোজনের বিবিধ আহার্য্য এনে উপস্থিত করলে। ভাত দধি, মিষ্টান্ন, নুন লেবু কাঁচা-লঙ্কা চাটনি পাপর পর্য্যন্ত। আমরা অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করলুম—এই কিমেলে এতসব কাণ্ড করা কেমন করে সম্ভব হ'ল তোমাদের পক্ষে? নীরোদ ওরফে নন্তু সলজ্জভাবে বললে আপনারা আজ এসেছেন শুনে আমার শাশুড়ী ২।১ ঘণ্টার মধ্যেই নিজের হাতে এই সব রান্না ক'রে পাঠিয়েছেন। তাঁর আক্ষেপ যে এখানে সব জিনিষ পাওয়া যায়না, আর, আগে জানা থাকলেও যা একটু গুছিয়ে ব্যবস্থা করতে পারতেন। আপনাদের তিনি মনের মতো ভাল ক'রে খাওয়াতে পারলেন না। আমরা নন্তুর শাশুড়ীর দীর্ঘায়ু ও সুখ সৌভাগ্য কামনা করে খেতে বসে গেলুম এবং নন্তুকে বললুম—তোমার শাশুড়ীকে আক্ষেপ করতে নিষেধ কোরো,

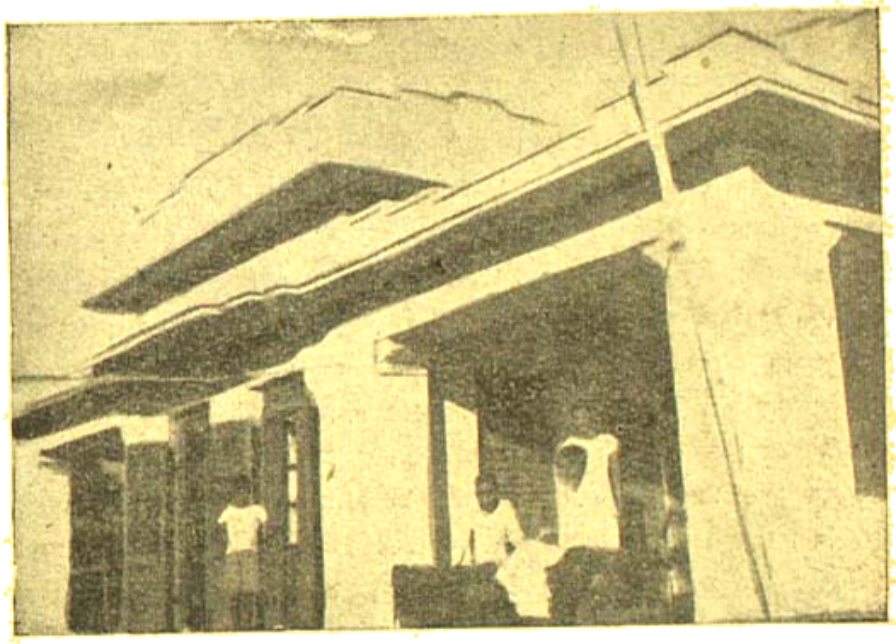

'সপ্তপর্ণী' (অন্যান্য ভাগ)

আমরা কলকাতায় ফিরে গিয়ে একদিন তাঁর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ ক'রবো।

সেইদিনই অপরাহ্ণে পরিচয় হ'ল আমাদের প্রতিবেশী, ব্যবসায়ী জগতে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত রাধিকামোহন সাহা মহাশয়ের সঙ্গে। একটি পুরাতন ভৃত্য নিয়ে ইনি একলা এখানে আছেন। এঁদের বাড়ী বেলেঘাটায়। বড়বাজারে ওঁতের কাপড়ের মস্তবড় কারবার। 'সপ্তপর্ণী' বাড়ীটি বোধ করি ভাড়া দেবার সুবিধার জন্যই পরে দিব্যি বিভক্ত করে দুটি অংশে পরিণত করা হয়েছিল। প্রথম অংশটি আমরা পেয়েছিলুম এবং দ্বিতীয় অংশটি রাধিকাবাবু পেয়েছিলেন। রাধিকাবাবু মানুষটি ভালো, কিন্তু, বড় খুঁৎখুঁতে। প্রবীণ ব্যক্তি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-সম্পন্ন। বললেন—বাড়ী তাঁর পছন্দ হয়নি। নর্দ্দমা দিয়ে জল বেরোয় না, পায়খানার দুর্গন্ধে টেঁকা দায়। টিউবওয়েলটি ভাঙা। আমি এখানে থাকবো না, চলে যাবো। আমার ছেলেদের ও বৌমাদের

এখানে আসবার কথা ছিল, আমি তাদের পত্র লিখে নিষেধ ক'রে দিয়েছি। আমি এতদিন চলে যেতুম, শুধু আমার ছেলেদের বন্ধু ও আমার এটর্ণীবাবু সপরিবারে আসবেন বলে চিঠি লিখেছেন—তাই তাঁর জন্য অপেক্ষা কচ্ছি। তিনি ট্যুরে বেরিয়ে ঘুরছেন, তাঁর নির্দ্দিষ্ট কোনও ঠিকানা জানিনে তাই তাঁকে কোনও খবর দিতে পারছিনে। তবে দু'একদিনের মধ্যেই তিনি এসে পড়বেন আশা করি। তিনি এলেই আমি এখান থেকে কাশী পালাবো। এখানে কিছুই খাবার জিনিস পাওয়া যায় না, রাস্তা পরিষ্কার হয় না, ভূগা হয় না, এখানে কি মানুষ থাকে?

সপ্তাহকালের মধ্যেই তাঁর এটর্ণীবাবু সপরিবারে এসে পড়লেন, কিন্তু তাঁরা সপ্তপর্ণীতে ওঠেন নি। এখানে বেহার গভর্ণমেণ্টের 'রেষ্ট হাউসে' এসে উঠেছেন। এই 'রেষ্ট হাউস' চমৎকার। মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের মাঝখানে এবং উক্ত প্রস্রবণের খুব নিকটেই এই 'রেষ্ট হাউস' তৈরী হয়েছে। বিতল বাড়ী, বেশ প্রশস্ত বারান্দা। নীচের তলাতলি "ফ্যামিলি কোয়ার্টার্স" দুখানি বেডরুম, একটি কিচেন, স্নানের কল ও স্যানিটারী পায়খানা। ভাড়া মৈনিক তিনটাকা। ওপরে "ব্যাচিলার্স কোয়ার্টার্স" একখানি বেডরুম ও এটাচ্‌ড বাথ। রান্না ঘরের কোনও বালাই নেই। রেষ্ট হাউসের খানসামা এঁদের খানা দিতে পারে, ব্যবস্থা আছে। খারাপ খাওয়ায় না, তবে ব্যয় একটু বেশী পড়ে। পাটনার পি, ডব্লিউ, ডিপার্টমেণ্টের চীফ্ ইঞ্জিনীয়ারের আদেশে সপরিবার ক'রে এবং অগ্রিম টাকা জমা দিয়ে এই 'রেষ্ট হাউস্' বন্দোবস্ত করে নিতে হয়, কিন্তু ১৫ দিনের বেশী এঁরা কাউকে দেন না। একটা অপশ্যম থাকে অবশ্য যে অপর কোনও ক্যান্ডিডেট না থাকলে আরও ১৫ দিনের এক্সটেনশান্ দেওয়া হবে। কিন্তু, সে আশা বিষম। কারণ এই বাড়ীগুলির চাহিদা অত্যন্ত বেশী। পাটনা শহর থেকে মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূরে এমন একটি স্বাস্থ্যকর পার্ব্বত্য প্রদেশ। সকলেই এর সুযোগ নিতে চায়। পাটনার ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায় এখানে প্রায়ই নিজেদের মোটরে এসে 'উইক্-এণ্ড' কাটিয়ে যান।

অবশ্য যাঁরা এখানে মাসাধিক কাল থাকতে চান তাঁরা একেবারে এক সঙ্গেই তিন চারটি মাসের দরখাস্ত ক'রে এবং টাকা জমা দিয়ে-পর পর তিন চার পক্ষকালও থেকে যান। সব নিয়মেরই ফাঁকিও আছে। আমরা প্রথমে এই 'রেষ্ট হাউস্' আসবারই চেষ্টা করি। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সে মহাশয়ের দ্বারা আমি দরখাস্ত ও টাকা পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তাঁরা নভেম্বরের আগে আমাদের জায়গা দিতে পারবেন না বলায়, প্রবোধবাবু আমার টাকা ফেরত পাঠান। আমি চেয়েছিলুম অক্টোবরের জন্য। কারণ, ঐ সময় আমার কন্যার স্কুলের পূজার ছুটী থাকবে। ঐ সময় গিয়ে ঘুরে আসতে পারলে মেয়েটার স্কুল কামাই হবে না। ইতিমধ্যে নিরুপমা দেবীর 'সপ্তপর্ণীতে' আশ্রয় পাওয়া সেল মনে আমরা অক্টোবরেই বেরিয়ে পড়েছিলুম। উদ্দেশ্য ছিল রাজগীরেই মাস দু'তিন থাকা। কিন্তু এখানে এসে বুঝতে পারলুম যে আমরা অসময়ে এসে পড়েছি। রাজগীরের সীজন্ নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত। ঐ সময় এখানে সব জিনিস পাওয়াও যায়। অক্টোবরে রাজগীর গিয়ে পড়ে আমরা ভুল করেছি। তখন আলু পর্য্যন্ত বাজারে মেলে না! আমাদের মতো আরও অনেকেই ভুল করে গিয়ে পড়েছেন দেখে কতকটা সান্ত্বনা পাওয়া গেল। ভবিষ্যতে কথাপিরী সরৎ না করতেম যে পাঠশালার সব ছেলের পিঠে বেতটা যদি চারিয়ে পড়ে, তাহ'লে পিঠের জ্বালাটা কম বোধহয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক ডাঃ জ্ঞান ভাদুড়ী এই সময় স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য রাজগীর এসেছিলেন। তিনি দমে যাবার পাত্র নন। অবস্থাকে জয় করবার তাঁর কঠোর জিদ্ যা দৃঢ়তা আছে। তিনি ভোরে উঠে একখানি খাড়ন নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন দূর দুরান্তের গাঁয়ের মধ্যে আহার্য্য সন্ধানে, ফিরে আসতেন ভাল ক'রে রোদ ওঠবার আগেই তাঁর খাড়নখানি বিবিধ চাট্‌নী কলমূল তরি তরকারী আনাজ ও শাকসব্জী ভরে এবং ডিম ও মাখন সংগ্রহ ক'রে। ভাল ঘী দুধও তিনি গ্রামের চাষীদের কাছেই সংগ্রহ করে আনতেন। প্রাণ প্রাচুর্য্য ও যৌবনের উৎসাহ তাঁর মধ্যে সাধারণ বাঙালীর ছেলের চেয়ে অনেক বেশী। এরা দৃঢ় চরিত্রের মানুষরা কোনও অবস্থাতেই নিজেদের নিরুপায় বোধ করেন না। ওঁর য়ুরোপ ঘুরে আসার ও বিলিতী ডিগ্রী নিয়ে আসার গল্প রোমাঞ্চকর। ইনি প্রাণীবিদ্যার পরিভাষা নিয়ে যে অসাধারণ পরিশ্রম করেছেন তা দেখলে বোঝা যায়—মানুষটির 'টেনাসিটি' আছে। আর একটি মানুষের সঙ্গে এখানে পরিচয় হ'ল—কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের প্যাথলজিষ্ট্ ডাঃ মণ্ডলের সঙ্গে। রাজগীরের উক্ত প্রস্রবণ 'সপ্তধারা'র ইনি অত্যন্ত অনুরাগী। এঁর মতে এই জল মৃত-সঞ্জীবনী সুধা বিশেষ। দু'বেলা এই জলে স্নান করলে ও এই জল পান করলে মানুষ অমর হ'তে পারে। (ক্রমশঃ)

অনেকেরই মনে এখনও একটা ধারণা আছে কম্যুনিজিম হইলে হয়ত দেশের অবস্থা ভালই হইবে। এই মারাত্মক ধারণা অস্পষ্ট চিন্তার ফল—ইহা দূর করিতেই হইবে। দেশের বর্তমান অর্থ নৈতিক অবস্থা যে খুবই শোচনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই—কিন্তু বর্তমানে গভর্ণমেণ্টকে উল্টাইয়া দিয়া তাহার পরিবর্তে কম্যুনিষ্ট প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করা যে ইহার প্রতিকার নহে—পরন্তু তাহাতে সর্বনাশকেই ডাকিয়া আনা হইবে—এইটি আজ ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। বিশেষ করিয়া শুরুণ সম্প্রদায়ই কম্যুনিষ্টদের দলপুষ্টি করিতেছে। তাহারা আদর্শবাদী—আদর্শের জন্য তাহারা সকল রকম ত্যাগ ও নির্যাতন স্বীকার করিতে প্রস্তুত, তাহারা দেশের কল্পিত কল্যাণের জন্য তাহার উপর সকল প্রকার দুঃখ ও নির্যাতন টানিয়া আনিতে কুণ্ঠিত হয় না—তাই তাহারা কম্যুনিজিমের রক্তাক্ত পথে অগ্রসর হইয়াছে। তাহাদিগকে আজ ফিরাইবে কে? ফিরাইবার এক উপায় ছিল, আমাদের ছেলেমেয়েরা যে-সব স্কুল কলেজে শিক্ষা লাভ করিতেছে, সেখানে যদি তাহাদিগকে সৎশিক্ষা দেওয়া হইত, দেশের প্রকৃত কল্যাণ কিসে হইবে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হইত। গীতায় আসুরিক মানবের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে সোভিয়েট রুশিয়ার কম্যুনিষ্টদের পক্ষে তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। তাহারা বলে—ভগবান নাই, ঐহিক ভোগই পরমার্থ, তাহাদের মধ্যে নৈতিকতা নাই, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিতে তাহারা কোন রকম অন্যায় অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হয় না—

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥

"এবম্বিধ নাস্তিকতাকে আশ্রয় করিয়া এই সকল দুর্নীতিপরায়ণ অল্পবুদ্ধি লোক উগ্রকর্মের দ্বারা সংসারকে ধ্বংস করিবার জন্য বাড়িয়া উঠে।" —সারথি

* * *

প্রধানমন্ত্রীর আগমনের পূর্বদিন "অমৃতবাজার পত্রিকা" পণ্ডিত নেহরুর আগমনের গুরুত্ব বিস্তৃত করিবার সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছিলেন—

(১) পশ্চিমবঙ্গ বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল চাহে। (পণ্ডিত জওহরলাল তাহার বিরোধী)

(২) অন্যান্য স্থানে সাময়রাজ্য ভারতরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিলেও কোচবিহার ও ত্রিপুরা পশ্চিমবঙ্গ ভুক্ত করা হইতেছে না।

(৩) বিহার ও আসামে বাঙ্গালাভাষী লাঞ্ছিত।

(৪) পাঞ্জাবের আশ্রয়প্রার্থীরা যেরূপ সদয় ব্যবহার পাইয়াছে, পূর্ববঙ্গ হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীরা সেরূপ সদয় ব্যবহার পায় নাই।

(৫) পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যা তীব্র।

সহযোগী আরও ২টি কথা বলিতে পারিতেন—

(১) পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুর্নীতিদমনে অক্ষম—এমন কি কোন কোন মন্ত্রিবের সম্বন্ধেও দুর্নীতির অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছে।

(২) বাঙ্গালী স্বাধীনতা বলিতে—বৃটিশ সাম্রাজ্যপুঞ্জে থাকা বুঝে না। —বিশ্ববার্তা

* * *

বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েৎ প্রথা প্রবর্তনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার চেষ্টা করিতেছেন এবং এই সমস্ত পঞ্চায়েতের কাজ হইবে গ্রামের জনসাধারণকে সরকারপ্রদত্ত বীজ বা কৃষির জন্য সার তাগা মূল্যে বিক্রয় করা ও বাঁটিয়া দেওয়া। সরকারের পূর্ণ পরিকল্পনা এখনও কোথাও প্রকাশিত হইতে দেখা যায় নাই কিন্তু এই ধরণের পঞ্চায়েৎ সৃষ্টির সোজা অর্থ হইল পুরাতন মোহগ্রস্তদের বা গণতন্ত্র পরিবর্তে গৃহীত প্রস্তাব পাশ করিয়া পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠার নামে জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়া। বীজ বাঁটিবার জন্য বা সার বেচিবার জন্য সরকারী নিয়ন্ত্রণে গঠিত প্রতিষ্ঠান, সরকারের বেতনভুক্ত কর্মচারীর পরিবর্তে অবৈতনিক কর্মচারী সহ প্রতিষ্ঠা, দেখানে কাহারও স্বাধীন সত্তা থাকিবে না. সরকারী বড় দপ্তরখানায় রচিত সরকারী হুকুমনামা তামিল করিবার যন্ত্র তৈয়ারী হইবে। এ ধরণের পঞ্চায়েৎ গ্রামের তো কোন উপকারই করিতে পারিবে না বরং অনুগ্রহলাভের আশায় স্বার্থের দ্বন্দ্বে বিষাক্ত গ্রাম্য বায়ু আরও বিষময় করিয়া তুলিবে। —সমাজ

* * *

আমাদের দেশে কৃষির উন্নতি না হইলেও তার নামে টাকা যে কি ভাবে খরচ হইতেছে তাহা বস্তুতঃই বিস্ময়কর। মন্ত্রীদাতা বা কৃষি-মন্ত্রী শ্রীযাদবেন্দ্র পাঞ্জা ইহার একটা হিসাব পর্যন্তও লওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। একজন সিভিলিয়ান সেক্রেটারী এবং মেদিনীপুরের ভূতপূর্ব ম্যাজিষ্ট্রেট এম এম খাঁর প্রিয়-পোষ্য লাঙ্গলের সিকা নামক একজন পাঞ্জাবী ভাগ্যান্বেষীর হাতে অজস্র টাকা খরচের অবাধ অধিকার ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। এখন একজন অবসরগ্রহণোন্মুখ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটকে কৃষি ডিরেক্টর করা হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর কৃষি বৃদ্ধি "আন্দোলনের" জন্য বীজ, সার, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয়ের খরচ :—

১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ হইতে—

৩১শে মার্চ ১৯৪৮	২২,১৯,১৭৭ টাকা
১৯৪৮—৪৯ (বাজেট)	১,২১,৩৫,০০০ টাকা
১৯৪৯—৫০ (বাজেট)	১,২৮,৩১,০০০ টাকা

কয়েকটি খরচের নমুনা

(১) "রোগমুক্ত" আলু বীজ বিতরণ—

বীজের দাম—	১০,০০০ টাকা
বিলির ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের বেতনাদি	১,৩৭,০০০ টাকা
	১,৪৭,০০০ টাকা

(২) গাছ সংরক্ষণ খাতে—

গাছের দাম—	৫০০০ টাকা
বনবিভাগ কার্য্যে নিযুক্ত কর্মচারীদের বেতনাদি	৫,২২,০০০ টাকা
	৫,২৭,০০০ টাকা

(৩) বীজ মুদ্রণের খরচ-বৃদ্ধি খাতে—

বীজ মুদ্রণের দাম—	১৩,০০০ টাকা
খরচবৃদ্ধি কার্য্যে নিযুক্ত কর্মচারীদের বেতনাদি	১,৪৯,০০০ টাকা
	১,৪৯,০০০ টাকা

(৩য় সংস্করণ—ইণ্ডাষ্ট্রেজ পাঁজার মুরগী বাছিবার ছবিসম্বাটার ভিন পাড়িতে করের করিয়াছে। দাম ১।০ আনা ডজন।)

(৪) ৩য় সংস্কার বীজ বিতরণ খাতে—

জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা প্রভৃতি গবাদি পশুর খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ১৯৪৮-৪৯ সালে ১,৫১,০০০ টাকার বীজ এবং ১৯৪৯-৫০ সালে ১,৫০,০০০ টাকার বীজ বিনা মূল্যে বিতরণ করা হইবে এই কথা ছিল। ৩৫০ মণ জোয়ার এবং ৭১২ মণ ভুট্টা বীজ বিক্রয় করা হইয়াছে। ১৯৪৮-৪৯ সালের হিসাব হইতে দেখা যায় মোট ১০৫৫ মণ ভুট্টা ও জোয়ার বীজ ১,১৫,০০০ টাকায় কেনা হইয়াছে। এই হিসাবে মণ করা দাম ১০৯ টাকার মত পড়ে। প্রকৃত হিসাব প্রকাশ হওয়া উচিত।

(৫) সরকার বেসরকারী চাকা বিলি খাতে—

বরাদ্দ—১৯৪৮-৪৯	১,০৯,০০০ টাকা
১৯৪৯-৫০	১,১০,০০০ টাকা

রিপোর্টে বলা হইয়াছে দুই বৎসরে ১১০টি করিয়া ৩৮২ চাকা তৈরির ব্যবস্থা হইয়াছে। এক একটি চাকা তৈরীর খরচ পড়িবে ২০০ টাকা এবং ইহা ১৯১ টাকায় বিক্রয় করা হইবে ঠিক হইয়াছে। ৫০টি চাকা তৈরি হইয়াছে। এই চাকাগুলি বিক্রী হইয়াছে কিনা তাহা বলা হয় নাই। —যুগবাণী

* * * *

খাদ্য আইন কিভাবে কার্যকরী হইতেছে তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক মহকুমায় ও জেলায় একটি করিয়া কমিটি গঠিত হইয়াছে। অনেক সময় অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায় যে খাদ্য ও বস্ত্রের চোরাকারবারেও অতি লাভ বন্ধ করিবার জন্য যে আইন আছে তাহা ঠিক মত প্রয়োগ হয় না। যেখানে নিষ্কৃতি পায় সেখানকার কথা ছাড়িয়াই দিলাম, যেখানে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সাজা পায় সেখানেও সাজা নামমাত্র হয়। এই কমিটি নিয়োগে কতখানি তাহার প্রতিকার হইবে জানি না—তবে চোরাকারবার করিয়া জোচ্চুরি কিভাবে আইনের মত এড়াইয়া চলিতেছে তাহা ধরিতে পারা যাইবে। —বর্তমানের কথা

* *

সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক কার্যকরী পরিষদ তাহার প্রথম অধিবেশনে প্রদেশের কংগ্রেসকর্মীদের প্রতি নির্দেশ দিয়াছেন যে, তাঁহাদের সকলকে এখন হইতে জনসংগঠন উপরেই। কমিটি বা ঐ ধরণের কমিটি, যাহাতে দুর্নীতি বিশেষ ভাবে প্রশ্রয় পাইতেছে সেগুলির সংস্রব ত্যাগ করিতে হইবে। কোন কংগ্রেসকর্মীই নিয়ন্ত্রিত কোন দ্রব্যের কোনরূপ ব্যবসায় ও কারবারে লিপ্ত থাকিতে পারিবে না। প্রাদেশিক কমিটি সমস্ত কংগ্রেস কর্মীকে সকল প্রকার স্বার্থ ত্যাগ করিয়া স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বকালের ন্যায় দেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিতে আহ্বান জানাইয়াছেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর কংগ্রেসের হাতে শাসন ক্ষমতা আসায় অধিকাংশ কংগ্রেসকর্মীর অন্তর হইতে সেবার প্রবৃত্তি অন্তর্হিত হইয়া ক্ষমতার নেশা প্রবেশ করিয়াছে। তাহার প্রতিক্রিয়াই কংগ্রেসকে আজ আমূল সংস্কারের পথ নির্দেশ করিতেছে। কংগ্রেস তাহার জয়পুর অধিবেশনে কংগ্রেসকর্মী, দেশ ও জাতির প্রতি তাহার কর্তব্য নির্দেশ করিয়া জাতিকে সচেতন ও সাবধান করিয়া দিয়াছেন। জয়পুরের নির্দেশ সত্ত্বেও ক্ষমতামোহীর দল কংগ্রেসের নাম গ্রহণ করিয়া জয়পুরের নির্দেশকে অমান্য করিয়াছে। —যুগান্তর

* * *

মর্দারের পুত্র শেঠ।—বালদা বনস্পতি প্রস্তুতকারী লিভার ব্রাদার্সের ডিরেক্টর বোর্ডে শেঠ মহাভাই প্যাটেলকে লওয়া-লইয়াছে বলিয়া নানারূপ আলোচনা আন্দোলন চলিয়াছে। মন্ত্রী বা সরকারী কর্মচারীর পুত্র বা আত্মীয়রা ব্যবসা করিতে পারিবে না এইরূপ আইন যখন নাই তখন ইহা লইয়া আন্দোলন করিবার কি আছে? শেঠজী নিশ্চয়ই যোগ্য ব্যক্তি এবং লিভার ব্রাদার্সের মত পাকা বিলাতী ব্যবসাদার যখন তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন তখন ইহা অপরিহার্য হইয়াছিল ইহাতে, সন্দেহ নাই। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের খাদ্য-মন্ত্রীত্বের সময় ভারত সরকার বালদা বনস্পতি ভেজিটেবল ঘি মানুষের স্বাস্থ্যহানিকারক বলিয়া ইহার প্রচলন বন্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন এবং গান্ধীজীও এই ভেজিটেবল ঘি ভারত হইতে দূরীভূত করিবার সম্বন্ধে বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। আশা করি শেঠজী সংবেদনার দ্বারা ভারত সরকারের ভ্রান্তি দূর করিতে পারিয়াছেন এবং প্রমাণ করিয়াছেন যে বালদা খাদ্যের হানিকর নহে। লিভার ব্রাদার্সের বালদা বিক্রী ইহার পর কতটা বাড়িয়াছে তাহা জানিতে পারিলে শেঠজীর যোগ্যতার পরিমাপ করা যাইত। —যুগবাণী

* * *

হিমালয়ের পাণ্ডব বংশধর। হিমাচল প্রদেশ এবং মেরাদুন জেলার মধ্যবর্তী দুই হাজার একর পরিমিত স্থানে বাট হাজার জৌনসারি উপজাতীয়দের বাস। সম্প্রতি ওয়াচ পণ্ডিত নেহেরু যমুনা-জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। যুক্তপ্রদেশ সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই উপজাতীয়দের শিক্ষা ও অন্যান্য উন্নতির জন্য ব্যবস্থা করা হইবে। জৌনসারি উপজাতীয়রা নিজেদের মহাভারতোক্ত পাণ্ডবদের বংশধর বলিয়া মনে করে এবং তাহাদের উৎসব অনুষ্ঠানে পাণ্ডবদের পূজা করে। এই জাতির সামাজিক আচরণ এখন অত্যন্ত অদ্ভুত। পরিবারের জ্যেষ্ঠ

ভ্রাতার পত্নী পরিবারের অন্যান্য ভ্রাতারও পত্নী বলিয়া গণ্য হয়। পরিবার যদি বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় তবে পত্নী ইচ্ছামতো যে কোনো ভ্রাতার পরিবারে আশ্রয় লইতে পারে। ফলে এই সমাজে এক স্ত্রীর বহু পতি বর্তমান। এই বিবাহ পদ্ধতিই ইহাদের উন্নতির প্রধান বাধা বলিয়া অনুমান করা হয়। বহু বৎসর হইতে ইহাদের জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। ইহাদের সন্তানেরা দুর্বল এবং কুড়ি বৎসরে পৌঁছিবার পূর্বেই এই সমাজের যুবকেরা একাধিক সন্তানের পিতা হয়। —মহিলা মহল

* * *

ভারত সরকারের যোগাযোগে-সচিব রফি আহমেদ কিদোয়াই সম্প্রতি এলাহাবাদে এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্বীকার করিয়াছেন যে, দেশের বর্তমান সঙ্কটের সময় সংবাদিকের উচিত নির্ভীক ভাবে সত্য কথা বলা ও গভর্নমেণ্টের ভুল-ত্রুটির সমালোচনা করা। পূর্বে যে সকল সংবাদপত্র গভর্নমেণ্টের সন্তোষ বা অসন্তোষের অপেক্ষা না রাখিয়া স্পষ্ট কথা বলিত, সেই সব সংবাদপত্র এখন একেবারে কংগ্রেস-গভর্নমেণ্টের সমালোচনায় বিমুখ। ইহাতে কোন কোন কংগ্রেস নেতা বা মন্ত্রী তুষ্ট হইতে পারেন; কিন্তু কংগ্রেস গভর্নমেণ্টের প্রকৃত উপকার ইহাতে হয় না। অতীত গভর্নমেণ্টের দোষ ও গুণ যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করিয়া জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়াই সংবাদপত্রের কর্তব্য। ক্ষুদ্র ব্যবসাবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া হাওয়া যখন যেদিকে বহিতেছে, সেইদিকে ঝুঁকিয়া পড়া পক্ষান্তরে দেশের জনগণকে বিভ্রান্ত করার সামিল। এ বিষয়ে সাংবাদিকগণ অবহিত হইলেই আমরা খুশি হইব। —শনিবারের ডাক

* * *

বাঙ্গালা ভাষায় যাহারা কথা বলে তাহারা ভারতের জনসমূহের একটি বিরাট অংশবিশেষ। সমগ্র পূর্ব-বিহারে, বর্তমান বাংলায় ও পূর্ব-পাকিস্তানে, সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব আসামের সুবিস্তৃত অঞ্চলে বাঙ্গালা ভাষা সাত কোটি লোকের মধ্যে ছড়াইয়া রহিয়াছে। চীন বাদে পৃথিবীর আর কোন দেশে মাতৃভাষা হিসাবে কোন একটী আঞ্চলিক একক (unit) ভাষায় এত লোকে কথা বলে কিনা সন্দেহ। ছোট নাগপুরের জঙ্গল হইতে আরম্ভ করিয়া আসামের পার্বত্য অঞ্চল পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষাভাষী এক বিরাট মানব-সমাজ বসবাস করিতেছে বহুকাল হইতে। তথাপি বাঙ্গালা ভাষাকে সর্বভারতীয় ভাষা করা যাইতেছে না। —প্রণব

* * *

প্রায় ছয় বৎসর পরিশ্রম করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, প্রায় ২০ বিশ বৎসরে সমগ্র দেশে এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইবে। শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের অসুবিধা নানাবিধ। আমরা তাহা জানি; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বলি যে, স্বাধীন রাষ্ট্র কি এতদিন অপেক্ষা করিতে পারিবে? আমরা জানি, শিক্ষার জন্য ব্যয় বরাদ্দ করিতে গেলেই টাকার অভাব হয় সকলের আগে। উপযুক্ত শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের জন্য আবাস-পত্র সংগ্রহ করা তত সহজ-সাধ্য নয়। কিন্তু জনগণের সহযোগিতা যদি সরকার লাভ করেন, তবে অতি শীঘ্র দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্ভব হইতে পারে। আমাদের গরীব দেশ; স্কুলের ঘরটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও কাজ চলিবার উপযুক্ত হইলেই হইল। বহু অর্থব্যয়ে সুরম্য অট্টালিকা তৈয়ার করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন আমরা মনে করি না। তবে শিক্ষকদের বেতন উপযুক্ত হওয়া চাই। ভবিষ্যৎ নাগরিক তৈয়ার করার ভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত হইবে, তাঁহাদিগকে অর্দ্ধাহারে রাখিলে চলিবে না। শিক্ষকদের দাবী সর্বাগ্রে মিটানো আবশ্যক। —বাঙ্গলার শিক্ষক

অভ্যুদয়

শ্রীঅনিলকুমার সাধু কাব্যভারতী, সাহিত্যশ্রী

প্রাচী-উদীচীর উষার আকাশে আমারই নাম লেখা :
নতুন কালের মানুষ এসেছি আমি
পুরাণ দিনের হিসেবীর দল চক্ষুকালে লাভ নেই,
নতুন সূর্য জাগাবই আমি এই আঁধারের তীরে।

তাই সে এসেছি ফিরে,
চক্ষে আমার আগামী দিনের সম্মোহনের নেশা—
ভেঙে পড়ে যায় এত দিনকার সন্তার রঙ্গ ভিৎ,
অন্ধকারের কারার ডাকে নিকট যে হয়ে এল
রক্তেতে আঁকা আজকে যে তার নতুন অংগীকার।

ছাড়তেই হবে পথ,
নতুন যুগের দাবীতে ঝলকে উঠেছে যার শপথ।
মানবেনা জানি সে কোনই প্রতিরোধ,
জাগতেই হবে তারে আনি এই দুরাশার ভূমিকায়।
নোঙর সে ওরে তোল্,
ওরে সাবধানী এতকাল পরে ঘন্ন সে ভোল্ ভোল্।

নতুন কালিতে রচা সে আমার গান,
আগুন জ্বালাবে এ মাটীর বুকে,
সূর্যের উত্থান !···

শ্রীঅরবিন্দায়

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(কীর্তন)

ধীর ! তোমারে প্রণাম করি···
ঋষি ! তোমারে প্রণাম করি···
ওগো অজেয় তপন ! গানে তব নাম করি ॥

জানি : যুগের আঁধার হবে ছারখার তব নবোদয়ে ভরি'
যদি অটল সাহসে আলোর তাপসে আমরা হৃদয়ে বরি ॥
মদিরা-মাতন, বাসনা-বাঁধন,
মিথ্যাশক্তি, স্বার্থ-সাধন
আনে গরলের মরণ-মাতন
অমৃতশান্তি হরি'
জানি : উহার তব পরিত কালো মেঘসম যাবে সরি'
যদি অটল সাহসে আলোর তাপসে আমরা হৃদয়ে বরি ॥

তুমি হে অমরণীর প্রেমবাণীবাহ ! অভয়শঙ্খ রবে
প্রাণ- নিরাশায় এনেছিলে জাগরণ—দেশ জাগে নাই যবে।
কবি ! গেয়েছিলে : "মেঘ ক্ষণিকের ছায়া,
দুঃখ বেদনা অলীকের মায়া,
যুগে যুগে ধরে এ-ভারতে আসা
আনন্দময় হরি :"
জানি : নিখিলবন্ধু তাঁরি দূত তুমি দিবে দিশা অমা ভরি'
যদি অটল সাহসে আলোর তাপসে আমরা হৃদয়ে বরি ॥

(শ্রীঅরবিন্দের সপ্ত-সপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে···১৫ আগষ্ট, ১৯৪৯)

একতালা

॥ গা গমা । ০মপা পা পা । ১পধা পধা র্সা । +না ধপা -া । ৩-া মা মপা ।
রী ধ্ তো মা রে প্র ণা ম্ ক রি ও ঋ ষি

০পা পা পা । ১পধা পধা র্সনা । +ধা পা -া । ।-া র্সা র্সর্রা । নর্রা র্সা না ।
তো মা রে প্র ণা ম্ ক রি ও গো অ জে য়

ধনা ধা পধা । ধপা পা পা । পধা পধা র্সর্সা । না ধপা -া । -া ॥
ত প ন গা নে ত ব না ম্ ক রি

মা মা । মা মপা পা । পা পধা পধা । মা মধা পধা । মপা মগা গমা ।
জা নি যু গে র আঁ ধা র ছ বে ছা র খা র

মপা পা পা । পা পা ধনা । পধা না -া । -া র্সা র্সা । ধা র্গা র্রা । র্সা না ধা ।
ত ব ন বো দ য়ে ভ রি' য দি অ ট ল সা হ সে

পা র্রা র্সা ।+না ধা পা । মা ণা ধা । পা মা গা । রা সা -া । -া ॥
আ লো র তা প সে আ ম রা হ দ য়ে ব রি

না না I না র্সা না | ধনা ধপা ধা I না র্সা নর্সা | ধনা না -া I পা না র্সা |
ধ ত ম দি রা মা ত ন্ বা স না ধী ধ ন্ মি ধ্যা
ক বি গে য়ে ছি লে মে ষ ক দি কে র ছা য়া দুঃ খ

র্রা -া র্গরা I না রা র্সা | নর্সা ধনা পধা II না না র্সা | না ধপা ধা I
শ ক্ ভি স্বা ন্ থ সা ধ ন্ য দি রা মা ত ন্
বে দ না অ লী কে র মা য়া গে য়ে ছি লে মে ষ

না র্সা নর্সা | ধনা না -া I পা না র্সা | র্রা -া র্গরা I না রা র্সা | নর্সা ধনা পধা I
বা স না ধী ধ ন্ মি ধ্যা শ ক্ ভি স্বা ন্ থ সা ধ ন্
ক দি কে র ছা য়া দুঃ খ বে দ না অ লী কে র মা য়া

পা ধা র্সা | র্সা র্সা -া I র্সা র্সর্গা রা | র্সা র্সরা র্সনা I না র্সা না | ধনা পা ধা I
আ নে গ র লে র ম র ণ ঘা ত ন্ অ মৃ ত শান্ ভি
যু গে যু গে ধ রে এ ভা র তে কা য়া আ ন ন্ দ ম য়

না র্সা -া | -া র্সা র্সা I সা গা পা | গা পা পা I গা পা না | পা না না I
হ রি জা নি ড ঙ্ কা য় ত ব শ ঙ্ খ ত কা লো
হ রি জা নি নি খি ল ব ন্ ধু ডা রি ন্ ত ত্ ত্ মি

পা না রা | না রা গা I রা র্সা -া | -া র্সা র্সা I ধা র্গা রা | র্সা না ধা I
মে ঘ ল ম ঘা বে স বি য দি অ ট ল সা হ সে
দি বে দি শা অ ন্ ত রি য দি অ ট ল সা হ সে

পা রা র্সা | না ধা পা I মা পা ধা | পা মা গা I রা সা -া | -া II
আ লো র তা প সে আ ম রা ছ দ য়ে ব রি
আ লো র তা প সে আ ম রা ছ দ য়ে ব রি

সা সা I সা রা মা | পা পা -া I মা পা না | র্সা রা র্সা I রা র্মা র্মা | রা র্সনা র্সা I
তু মি হে অ ম র ণী ন্ প্রে ম বা ণী বা হ অ ভ য় শং খ

রা র্সা -া | -া র্সা র্সা I র্সা রা রা | র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা I র্দা দা পা | পা পা -া I
র বে প্রা ণ নি য়া শা য় এ নে ছি লে জা গ র ণ

র্সা -া র্জ্ঞা | র্জ্ঞা রা সা I রা সা -া | -া
দে শ জা গে না ই ব বে

জাহানারার আত্মকাহিনী

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্ত্রী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যখন দারার দূত এসেছিল আমি তখন পিতার কাছে উপস্থিত ছিলাম। শাহ্‌জাদা সন্ধ্যবেশের সঙ্গে জানিয়েছিলেন—"তুমি যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলে, তা সফল হয়েছে।" সম্রাটের সৈন্যদলের পুরোভাগে উপস্থিত থাকবার সুযোগ না দেওয়ায় দারার কি ভীষণ আক্ষেপ। আমরা সম্রাটের নিকট তাঁর বিশ্বস্ত খোজা ভৃত্যকে পাঠিয়ে দিলাম—সান্ত্বনার জন্য। আমি এখনে জানলাম যুদ্ধের পরিস্থিতি। ঔরঙ্গজেবের সৈন্য যখন পলায়মান এবং যখন তার নিজের বন্দী হওয়ার মত অবস্থা তখন ঔরঙ্গজেব তার সর্ব্বোৎকৃষ্ট অশ্বারোহীর দল দারার অশ্বপতি রুদ্ধ করবার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তার সঙ্গে একটী ক্ষুদ্র সৈন্যবল আত্মরক্ষার জন্য রেখেছিলেন। ঔরঙ্গজেব তাঁর হস্তীটীকে ভূমির সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রেখেছিলেন, সুতরাং সেই শৃঙ্খলবদ্ধ হস্তীর উপর উপবিষ্ট হয়ে তিনি তাঁর সৈন্যদলকে দেখিয়েছিলেন যে তিনি মৃত্যুভয়ে ভীত নন্ এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রের জন্য তিনি কৃতপ্রতিজ্ঞ। যদি শাহজাদা দারা পূর্ব্বের মত অশ্বারোহণে সৈন্যের অনুসরণ করতেন ঔরঙ্গজেব ও মুরাদ পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে সেদিন আগ্রায় আসতে বাধ্য হতো। কিন্তু অশ্বহীন ভূমির উপর দিয়ে দারার অশ্বপতি ব্যাহত হ'ল। পরিত্রাণ দারা বিপক্ষের জন্য অপেক্ষা করলেন।

দারার একজন সৈন্যাধ্যক্ষ আমাদের বলেছিল—রক্তাক্ত ধূলিধূসরিত দারা আমাদের সম্মুখে মূর্ত্তিমান পরাজয়ের মত এসে দাঁড়ালেন। তারপর যে তাঁর বর্ণনা দিতে লাগল—যেন সে দুঃসংবাদের জন্য আমাদের প্রস্তুত হওয়ার সময় দিচ্ছে। অবশ্য আমি সব কিছুর জন্যই প্রস্তুত ছিলাম। তারপর আবার সেই সৈন্যাধ্যক্ষ বলতে লাগল, "যখন শাহজাদা বিপ্লব করছিলেন, তখন সুলতান মহম্মদের সঙ্গে যুদ্ধে রুস্তম খাঁন নিহত হয়েছেন—আর রাও ছত্রসাল বুঁদি নরবৎ খাঁনের সঙ্গে যুদ্ধে ওতপ্রোতভাবে নিহত হয়েছেন।" আমি বলতে চেয়েছিলাম এই সংবাদ মিথ্যা। কিন্তু আমি আমার আসনে অবসন্ন হ'য়ে প'ড়লাম। যখন চক্ষু উন্মীলন করলাম, আমি দেখলাম আমার চারিদিকে সমস্ত জগৎ পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গেছে। সত্যই তো আমরা সেই কক্ষে ব'সে আছি এবং দারার সৈন্যাধ্যক্ষ তখন কথা বলছিল। কিন্তু এর সবই যেন আমার কাছ থেকে বহুদূরে। আর কি হবে? সবই তো শেষ হয়ে গেছে। আমরা তো মৃত্যুর রাজ্য পার হ'য়ে এসেছি। আমার পিতা কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রলেন। তারপর আমি শুনলাম সেই দূত উত্তর দিচ্ছে, "যদি রুস্তম খাঁন আর ছত্রসালের মৃত্যুর সংবাদ শুনে খলিলুল্লা খাঁন শাহজাদা দারার উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হ'য়ে আসতেন তবে এই যুদ্ধের পরিণাম অন্য রকম হ'ত।"

যা আমরা সকলে তখনও বুঝিনি। প্রতিশোধের জন্য নূতন ক'রে বাঁচতে হ'বে।

আমি আবার শুনতে লাগলাম—"রামসিং তাঁর রাজপুত যোদ্ধাদের সঙ্গে সসম্মানে মৃত্যুবরণ ক'রেছিলেন। তারপর দারা আগ্রহের আতিশয্যে মুরাদ বক্সের বিরুদ্ধে হিন্দু-সৈন্য পরিচালনা করলেন। কিন্তু তখন এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটে গেল,—দারা তাঁর হস্তীপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ ক'রলেন। তৎক্ষণাৎ গোলযোগের সৃষ্টি হ'ল। সৈন্য এবং অধিনায়কগণ মনে ক'রল যে দারা মৃত, সুতরাং পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ করার জন্য অগ্রসর না হ'য়ে যাত্যার সম্মুখে মেষের মত বিক্ষিপ্ত হ'য়ে গেল।

যে এই সংবাদ বহন ক'রে এনেছিল, যুদ্ধক্ষেত্রে যদি তার মৃত্যু হ'ত। সে দেখে এসেছিল যে খলিলুল্লা খাঁন পাঁচ সহস্র সৈন্য নিয়ে শত্রুর শিবিরের দিকে অগ্রসর হয়েছে—কিন্তু যুদ্ধ করবার জন্য নয়। ঔরঙ্গজেব তখন হস্তী পৃষ্ঠে সমাসীন—যেন পৃথিবীর মধ্যে সেই একমাত্র স্থল যেখান থেকে জয়লাভ সুনিশ্চিত।

আমি আর শুনতে পারলাম না। আমি পিতাকে পরিত্যাগ ক'রে আমার প্রাসাদে চ'লে এলাম।

একটা দুঃসহ দুঃস্বপ্ন আমার স্নায়ুপিণ্ডকে এমন কঠিনভাবে পেষণ ক'রেছিল যে আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম না। আমি যমুনার সম্মুখে শুভ্রপার্শ্বে ঝরঝার নিকট দাঁড়িয়েছিলাম। এমন সময় কোরেশ উপস্থিত হ'ল। অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে সে বলে যে যুঁশীরাজ্যের একজন অশ্বারোহী সৈন্য বেগমসাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থনা ক'রছে। সে তার বার্ত্তা অন্য কোন লোককে জানাবে না। কোরেশ একবার এই অশ্বারোহীকে অন্তঃপুরে দেখেছিল।

আমি আমার কক্ষের সমস্ত প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে বললাম;—আনন্দের উচ্ছ্বাসে আমার হৃদয় ভরে উঠলো।

অশ্বারোহী সৈন্য অন্ধকারে অগ্রসর হচ্ছিল। তার নিঃশ্বাস ঘন, ক্ষত স্থানগুলি রক্তউৎপাদিত। সতর্কভাবে সে উপবেশন করল—আমি তার ক্ষতস্থান পরিষ্কার ক'রে দিলাম। যেন সে আমার প্রিয় কোন বন্ধু। তারপর আমি দেখলাম তার হাতে রয়েছে মুক্তাহার-শুভ্র, রক্তাক্ত। অনেকক্ষণ পরে সে কথা বলেছিল। কি কোরে আমি সেই শব্দের প্রতিধ্বনি ক'রব! সে যেন মূর্চ্ছাবেগে অসংলগ্ন কথা ব'লেছিল। কিন্তু আমি সে শব্দগুলির সারাংশ লিখছি :—

"যখন ভয়ার্ত্ত দারার সহস্র সহস্র সৈন্য শত্রুর অগ্নিবর্ষণের সম্মুখে পলায়মান—যুঁশীরাজ তাঁর উৎকৃষ্ট সৈন্য দল নিয়ে নরবৎ খাঁনের অশ্বারোহীকে আক্রমণ করে মুরাদের সম্মুখে উপস্থিত হ'লেন। তারপর নিজের অনুচরদিগের দিকে ফিরে উচ্চৈঃস্বরে বলেন, পলায়নের জীবন

অভিশপ্ত। আমার কাজ বর্ষীয়ান অনুসারে আমি যুদ্ধক্ষেত্রে পৃথমিত। আমি জয়লাভ ভিন্ন এই যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করতে পারি না। তারপর তিনি তাঁর সৈন্যদের উৎসাহিত করে মৃত্যুকে উপেক্ষা করে অগ্রসর হ'লেন। কামানের গোলা তাঁর হস্তীকে আহত ক'রল, হস্তী পলায়ন ক'রল। জয়পাল হস্তীপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ ক'রে অশ্বের জন্য আহ্বান ক'রে বল্লেন, আমার হস্তী শত্রুর পশ্চাৎমুখ। কিন্তু হস্তীর অধীশ্বর কখনও পশ্চাদ্গামী হবে না। তাঁর সৈন্যগণকে ব্যূহ বদ্ধ ক'রে তিনি মুসলমানকে লক্ষ্য ক'রে বর্শা উত্তোলন ক'রলেন, এমন সময় একটি গুলি তাঁর ললাট বিদ্ধ করল।"

আমি ধীরবে ব'সেছিলাম। ধীরম্, নিশ্চল্. তার একটী লক্ষণও হারাতে আমি প্রস্তুত ছিলাম না, আমার ভয় হ'ল, যদি মুহূর্তের এই মানুষটীর কথা বন্ধ হ'য়ে যায়। তবে ত আর জয়পালের কাহিনী শুনতে পাব না। তার দীর্ঘ মুখমণ্ডল থেকে চক্ষুর উজ্জ্বল দীপ্তি তখনও নিষ্প্রভ হয় নি। আমি শুনলাম—বুন্দীরাজের কনিষ্ঠ পুত্র পিতার মৃত্যুর পরে শত্রুকে ভাবাবেগে আক্রমণ ক'রে মৃত্যু বরণ ক'রেছিল। এইভাবে উজ্জয়িনী ও চোলপুরে যাদব রাজকুমার সম্রাটের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল.....

এইবার ঔরঙ্গজেব শাহজাদা দারার পরিত্যক্ত কুসুম বর্ম শিবির অতিক্রম ক'রতে পারলেন। কুসুম রাগ—কুসুম্ কুসুম্—রক্ত. রক্ত, রক্ত * * * * * *"

সেই লোকটী মুক্তাহারটী নিয়ে তার উষ্ণীষের অঞ্চল দিয়ে রক্তকণা মুছে দিল। তারপর বল্ল, একটি বন্দুকের পশ্চাৎ ভাগ দিয়ে আমায় কে যেন আঘাত করল। আমি মৃতের মতন সমরক্ষেত্রে পড়েছিলাম। যখন শত্রু চলে গেল, আমি আমার প্রভুর দিকে অগ্রসর হলাম।

আমার প্রভুকে তখনও তারা দেখেনি। তার পবিত্র দেহ চোলপুর নদীতীরে দাহ করবার জন্য নিয়ে গেছে। আমি তাঁর মুক্তাহার দেখে ভাবলাম—বোধহয় সম্রাট-সঙ্গিনী তাঁর পিতার সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিষাদী সাদরের স্মৃতিচিহ্নরূপে এই মুক্তাহার গ্রহণ করবেন।

আমি আমার উভয় হস্ত প্রসারণ করে সেই পবিত্র অর্ঘ্য গ্রহণ করলাম। আমার অবগুণ্ঠনের অন্তরালে সেই হার আমার বক্ষে লুকিয়ে রাখলাম। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, "কার আঘাতে তোমার প্রভুর মৃত্যু হয়েছে?" সে চারদিকে দেখল, অন্য কোন লোক সেই কক্ষে আছে কিনা—তারপর মৃদুকণ্ঠে বল্ল—

"সম্ভবতঃ সুনিশ্চিত ভাবে এর উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। অনেকের ধারণা মুরাদের গুলিতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আমার পাশ দিয়ে গুলি ছুটে বেরিয়ে গেল—আমার বিশ্বাস মজরৎ খানের গুলিতে তাঁর মৃত্যু হ'ল।"

তারপর সে আমার খুব নিকটে এল,—বল্ল, "বাদশার বেগম, বোধহয় কাল আমি আর পৃথিবীতে থাকব না। আপনাকে একটা গোপন কথা ব'লে যাব। যখন ঔরঙ্গজেবের পক্ষে যুদ্ধ করছিলাম, প্রভু একদিন আমাকে একটা সংবাদ দিয়ে ঔরঙ্গজেবের শিবিরে প্রেরণ করেন। প্রহরী আমাকে অপেক্ষা করতে বল্ল—আমি ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম, ঔরঙ্গজেব এবং মজরৎ খান আলোচনা করছেন। * * *

এই সৈন্যটী অন্তর্ধান করার সঙ্গে সঙ্গেই কোরেশ আমাকে সংবাদ দিল —"খলিলুল্লা খাঁনের পত্নী বাইরে পাল্কীতে অপেক্ষা ক'রছেন।" তৎক্ষণাৎ জানেন, এই নারীর শাস্তি কে দেবে। এই নারীর উপস্থিতি মোগল সম্রাটের ও সাম্রাজ্যের কি ভীষণ সর্বনাশ করেছে। আমি তাকে সাদর সম্ভাষণ জানালাম। সে অনেকক্ষণ বিলাপ ক'রল। তার স্বামী শীঘ্রই বিজেতা ঔরঙ্গজেবের শিবির থেকে প্রত্যাবর্তন করবে। ইতিমধ্যে সে সম্রাট এবং সম্রাট দুহিতার মতই পরাজয়ের জন্য শোক অনুভব করেছে। তারপর সে মৃদুকণ্ঠে বলল, "বোধ হয় খলিলুল্লা খাঁনের পরামর্শেই শাহজাদা দারা হস্তীপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করেছিলেন এবং সেই জন্যই সৈন্য দলের মধ্যে বিশৃঙ্খলা এসেছিল। ঔরঙ্গজেবকে অশ্বপৃষ্ঠে অনুসরণ করে বন্দী করা সহজ হবে এই ধারণা দিয়ে তার স্বামী শাহজাদা দারাকে প্রতারিত করেছিল। দারা তার পরামর্শ অনুসারে কাজ করবার পূর্বেই খলিলুল্লা খাঁন শত্রুর শিবিরে যোগ দিয়েছিল।

আমি একাকিনী যমুনার পাশে বারান্দায় এলাম। আমি একটী স্তম্ভের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালাম। মনে হ'ল হয়ত এই স্তম্ভই আমার জীবনের শেষ অবলম্বন। তখনও সেই অসহ্য কঠিন হস্ত আমার হৃৎপিণ্ড পেষণ করছিল—অবশ্য এখানে একটু সহজ নিঃশ্বাস নিতে পারলাম।

দুঃখে, ঘৃণায়, প্রতিশোধের স্পৃহায় আমার রক্ত গরম হয়ে যাচ্ছিল। আমার মাথার ভার অসহ্য মনে হ'ল. তারপর আমি হঠাৎ একটা অলৌকিক অভিজ্ঞতা অর্জন ক'রলাম। আমার এই মুহূর্তের যেন রূপান্তরে পরিণত হ'ল, আমি অনুভব করলাম যেন আমি পঞ্চভূতের সঙ্গে মিশে যাচ্ছি। আমার দেহ যেন বায়ু, জল, অগ্নিতে পরিণত হ'ল, আমি যেন রক্ত মাংসের শরীর থেকে বিমুক্ত হ'য়ে গেলাম। আমার পদ নিম্নে নদীজল ধারা ব'য়ে চলেছে। যমুনার কলধ্বনি অতি শান্ত, মৃদু হয়ে আমার কর্ণে প্রবেশ করছে—আমার শিরায় শিরায় প্রবেশ করছে সেই কলধ্বনি। ক্রমশঃ সেই কলতান এক অপূর্ব সঙ্গীতে পরিণত হ'ল. যেমন আমি দিল্লীর মজরৎখানায় শুনেছিলাম—একটীমাত্র মানুষের বাক্যধ্বনি আর বহু মানুষের ক্রন্দন। যমুনা আমাকে ব'য়ে নিয়ে চলেছে দূরে—বহু দূরে, এই জীবন নদীর তীর থেকে আরও দূরে। সেই যমুনার জলধারা পৃথিবীর সমস্ত পাপ ও লজ্জা নির্মল করে দিয়েছে। আমার অন্তর্দৃষ্টিতে আমি দেখলাম—সমস্ত জগত আলোকময়। আমি আর ইহ জগতে নেই। আমি আজ বহু দূরে ব'সে আছি; আমার বয়স বন্ধ হয়েছে।

আমি আমার জীবন কাহিনী আমাকেই ব'লতে চেয়েছিলাম। সে কাহিনী শেষ হ'য়ে গেছে। কিন্তু আমার দুঃখ তো নিঃশেষ হ'য়ে যায়নি।

আবার যেন কেউ আমাকে বাধ্য ক'রে দেখাচ্ছে। আমি যেন আমাকে ছাড়াও অন্য কারো সম্মুখে এই কাহিনী বলে যাচ্ছি।

বিস্মৃতিকেই উৎসর্গ করে যাব আমার কাহিনী। সে বিস্মৃতিই হ'বে আমার একমাত্র বাহন। সামুগড়ের যুদ্ধের পরের দিন রাতে কোরেন আমাকে দেখতে পেয়েছিল বারান্দার একটী স্তম্ভের পাশে বাহু নিবদ্ধ শক্তির মূর্ত্তিরূপ। সে আমাকে জাগ্রত না ক'রে আমার চারিদিকে একটী আস্তরণ ছড়িয়ে দিয়েছিল। প্রত্যুষে আমি নিদ্রোত্থিত হ'লাম, আমি অনুভব ক'রলাম যেন আমার সমস্ত শরীর রূপান্তরিত হ'য়ে গেছে। আমি রাত্রি তৃতীয় যামে অনুভব ক'রেছিলাম এক অপূর্ব্ব অনুভূতি। সেই অনুভূতি আমাকে আজও সকল দুঃখ সহনে সামর্থ্য দিয়েছে।

আজকে আমার মনে হচ্ছে যেন ভারতের চাষাটাই বংশ শ্রেষ্ঠের সমষ্টি মাত্র—তারা পৃথিবীতে এসেছে প্রতিহিংসা গ্রহণের উদ্দেশ্যে। সেই জন্যেই তো ব'লেছিলেন যে ঔরঙ্গজেব তৈমুর বংশ ধ্বংস করবার জন্য নির্দ্ধারিত হ'য়েছে এবং এই যুদ্ধের পরে সেই ভবিষ্যবাণী সফল হয়েছে।

রাজার সৈন্যেরা পলায়ন করেছে। ধূলিধূম্রা ঘাম মানব ও পশুর দুর্ব্বারস্রোত ওপর দিয়ে ঔরঙ্গজেবের শিবিরের দিকে চ'লেছে। বিজয়ের ঘোষণা ক'রে সামামার ধ্বনি দ্বারা তাকে অভ্যর্থনা করা হ'ল। ধলিমুল্লাহ ও মুরাদের যৌথবাহিনী ঔরঙ্গজেবকে বেষ্টন ক'রে ঔরঙ্গজেবকে অভিবাদন ক'রল। ঔরঙ্গজেব মুরাদকে অভ্যর্থনা ক'রলেন—যেন মুরাদ ভারতের অধীশ্বর। তারপর দুই রাজভ্রাতা দারা শুকোর পরিত্যক্ত শিবিরে উপস্থিত হ'লেন। ঔরঙ্গজেব মুরাদকে বন্ধুতা স্বীকারের সমস্ত আনুষঙ্গিক রাজকীয় প্রথা অনুযায়ী অভ্যর্থনা ক'রলেন এবং বলেন, "আজকে তোমার রাজত্বের প্রথম দিন।" মুরাদ এ সমস্তই বিশ্বাস করেছিলেন। ঔরঙ্গজেব কি কোরাণ স্পর্শ করে শপথ করেন নি যে মুরাদকে সে সিংহাসনে বসাবেন? কিন্তু প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই জানত যে সুযোগমত ঔরঙ্গজেব মুরাদের আত্মগোপন পরিত্যাগ ক'রে সম্রাটের পরিচ্ছদ গ্রহণ করবেন। ঔরঙ্গজেব তার উদ্দেশ্য সাধন ক'রবার জন্য দিবারাত্রি পরিশ্রম করেছেন।

এই ব্যাপারে আওরংজেব শায়েস্তাখানের নিকট যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিলেন। তিনি সম্রাটকে যথেষ্ট ঘৃণা ক'রতেন, তিনিই ছিলেন সম্রাটের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আমীর। ঔরঙ্গজেব এবং শায়েস্তা খাঁন সমস্ত রাজ-প্রতিনিধি এবং শাসনকর্ত্তাদের কোথাও জল ফেরিয়ে কোথাও সুরাবাহের লোভ দেখিয়ে দারাকে অনুসরণ করার জন্য আদেশ দিলেন। দারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দিল্লীর পথে পলায়ন করেছিলেন। সুলেমান শুকোর সৈন্যাধ্যক্ষকে পত্র লেখা হ'য়েছিল যেন তারা সুলেমান শুকোকে ঔরঙ্গজেবের হস্তে সমর্পণ করে।

যুদ্ধের কয়েকদিন পরে সম্রাটের বিশ্বাসঘাতক সেনানীগণ আগ্রার অদূরে এক বিখ্যাত উদ্যানে সমবেত হ'য়েছিল। সেইস্থান থেকে ঔরঙ্গজেব সম্রাটের কাছে দূত প্রেরণ করেছিলেন। ঔরঙ্গজেব ভাণ ক'রে লিখলেন, "আমি আপনার বশংবদ পুত্র। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য দারা শুকোর ষড়যন্ত্র থেকে আমার পিতাকে মুক্ত করা।" সম্রাটও সেই সুরেই উত্তর দিলেন—তার উদ্দেশ্য ছিল ঔরঙ্গজেবকে প্রতারণা করবেন। আমরা যে সাংঘাতিক পরিস্থিতিতে উপস্থিত হ'য়েছি সেস্থান থেকে উদ্ধার পাওয়া কি সম্ভব? মিষ্টাখাঁ ঔরঙ্গজেব সমস্ত সেনানায়ক ও আমীরদের তাঁর দলভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু আগ্রার প্রত্যাবর্ত্ত নেতৃ-বিহনে আমাদের কি ক'রে সাহায্য করবে! আমরা কেবল চিন্তাই করলাম, কেবল চিন্তা করলে……

তারপর আমার পিতা ঔরঙ্গজেবকে দেখা করার জন্য একখানি পত্র লিখলেন। কারণ তাঁর চিঠিতে ছিল যে ঔরঙ্গজেব সম্রাটের সঙ্গে দেখা কোরতে চান এবং তার সঙ্গে বাক্যালাপ করতে চান। কে জানত সম্রাটের কি উদ্দেশ্য? বোধহয় ঔরঙ্গজেব জানতেন যে সম্রাট তাতার নারীবাহিনী নিযুক্ত করেছিলেন। বোধহয় সেই বাহিনীকে হস্তগত করাও ও তার উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং ঔরঙ্গজেব সাক্ষাতের জন্য আসেননি। কিন্তু প্রত্যেকদিন ঔরঙ্গজেব রটনা করে দিতেন যে তিনি আসবেন। কিন্তু প্রতিদিনই তিনি সম্পূর্ণ বিভিন্ন কর্ম্মের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তারপর সহসা একদিন ঔরঙ্গজেব তাঁর সমস্ত সৈন্য নিয়ে তাজমহলের অপর পার্শ্বে শিবির স্থাপন ক'রলেন। নগরের সমস্ত বিশ্বাসঘাতক আমির খানের পরিচালনায় ঔরঙ্গজেবকে সাদর সম্ভাষণ জানাবার জন্য উপস্থিত হ'ল, মুখে সুমিষ্ট অভিনন্দন, হস্তে মূল্যবান উপঢৌকন।

একদল মাত্র বিশ্বাসী আমীর সঙ্গে নিয়ে আমার পিতা সমস্ত দুর্গ পরীক্ষা করে কামানে অগ্নিসংযোগের আদেশ দিলেন কারণ ঔরঙ্গজেবের সৈন্য নগরের অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিল। ইতিমধ্যে ঔরঙ্গজেব সমস্ত সহর অধিকার ক'রে দারা শুকোর গৃহ আবাসে গিয়ে প্রবেশ করলেন, সমস্ত গোলন্দাজ বাহিনীকে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করা হ'ল, তাঁদের হস্তকে সংযুক্ত একখানি পত্র প্রাসাদের অভ্যন্তরে নিক্ষিপ্ত হ'ল…। ফলে, সৈন্যের পর সৈন্য রজ্জুর সাহায্যে প্রাচীর গাত্রে অবতরণ ক'রে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করল। সমস্ত দুর্গ ঔরঙ্গজেবের অধীনতা স্বীকার ক'রল। আমরা দুর্গের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেলাম। ঔরঙ্গজেবের পুত্র সুলতান মহম্মদের আদেশে কোন খাদ্যদ্রব্যই আমাদের কাছে পৌঁছতে পারত না। ক্ষুধা তৃষ্ণা-পীড়িত প্রহরী আর আমাদের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করতে পারছিল না। পরিশেষে সম্রাট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হ'লেন। সুলতান মহম্মদের হস্তে ছিল সমস্ত দুর্গের চাবি। আমি আজও দেখতে পাচ্ছি খোজা ভৃত্যগণ বিরাট চাবির গুচ্ছ নিয়ে দিল্লী তোরণের দিকে চ'লেছে; আমি এখনও শুনতে পাচ্ছি ষড় ফড় চাবির গুচ্ছগুলির পরস্পর আঘাতে ঝনঝন শব্দ। সেই সঙ্গে বহুদূর আগত ঘণ্টাধ্বনির মত মানুষকে বিচারের জন্য আহ্বান করেছিল …।

পুনরায় আমার পিতা ঔরঙ্গজেবকে সাক্ষাৎ করবার জন্য আহ্বান ক'রলেন। ঔরঙ্গজেব সম্রাটকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ করে সেই পত্রের উত্তর দিলেন। পিতার কারাগার পরিত্যাগ করে ঔরঙ্গজেবের অন্তঃপুরে প্রবেশের জন্য অনুমতি দিয়ে রোশেনআরাকে ও আমাকে ঔরঙ্গজেব পত্র লিখলেন। আমি উত্তরে লিখেছিলাম, "আমি সম্রাটের পরিবর্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দেব, তবু সম্রাটের রাজ্যের অপহারকের

গৌরবের অংশভাগী হবনা। কিন্তু আমার ভগ্নী দুর্গ থেকে দাড়ঝরে ঔরঙ্গজেবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। আজকেই রোশেনারার বিজয়ের দিন। আজকে আমার মনে পড়ল একদিন সে গায়েবা খান এবং আমিন খানকে মুক্ত করবার জন্য দারা শুকোকে অনুরোধ করেছিল।

আওরঙ্গজেবের শক্তি অপরিসীম হওয়া সত্ত্বেও সে তার শক্তির মাত্রা বৃদ্ধি করতে চেষ্টা ক'রছিল, রাজ্যের অভিজাতবর্গের আনুগত্য লাভের উদ্দেশ্যে সে অমাত্যদের দ্বারা সম্রাট কর্তৃক লিখিত জাল পত্র রাজদরবারে পাঠ করতে লাগল। এই প্রতারণা খুব সফল হয়েছিল। তার সমস্ত কাজের মধ্যে একটী মূল উদ্দেশ্য ছিল—তিনি সকলকে বলতেন—তার প্রধান লক্ষ্য সম্রাটকে ধর্মদ্রোহী দারার কবল থেকে মুক্ত করা।

একদিন যা' মানুষকে ভীত ও আশঙ্কা করে দিত আজ তাকে অদৃষ্টের বিধান ব'লে মনে হয়।—আমি কি জানতাম না যে আওরঙ্গজেব ব্যাঘ্রের মত তার শিকারের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত; আজকেই ব্যাঘ্র শিকার করলের মধ্যে পেয়েছে। তাগ্য তারকা তার নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হয়ে স্থির হয়ে আছে। যা' একদিন ছিল, আজ আর তা' নেই। ঋতুদের মধ্যে আজ শান্তি বিরাজমান। যীশুখৃষ্ট বলেছিলেন—"আমাদের মাথার মুকুট খসে পড়েছে, আমরা হতভাগা যে আমরা এইরূপ পাপ করেছি, প্রভু! আমাদের তোমার কাছে নিয়ে যাও প্রভু, তোমার কাছে আমার প্রত্যাবর্ত্তন করতে দাও, আমাদের দিনগুলি নবীন করে দাও; যেন আবার আমরা অতীতের মত পাপহীন হতে পারি।"

আমরা কি আবার পূর্ব্বের মত নিষ্পাপ হ'তে পারব? আমার সখা বহুদূরে চলে গেছে। যদি আমার মধ্যে কোন অগ্নি বিদ্যমান থাকে তবে তা আমার বৃদ্ধ পিতা এবং ভাগ্যহীন ভ্রাতা দারার জন্য নিয়োজিত হউক। তাদের জন্যই আমি জীবন ধারণ করব। আমি জুমার রেজকে স্মরণ করলাম—তিনি অন্তরের তীব্র যেদনার প্রলেপ স্বরূপ এসে চিতাগ্নি শিখাকে অভিনন্দন করেছিলেন।.....

আগ্রার সমস্ত ব্যবস্থা ব্যবস্থা শেষ করে আওরঙ্গজেব শায়েস্তা খানকে আগ্রার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন, তারপর রাজকোষ থেকে যথা প্রয়োজন অর্থ সংগ্রহ করে সুজার সঙ্গে দারার বিরুদ্ধে অভিযান করবার জন্য দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হলেন; দারা তখন লাহোরে একদল সৈন্য সংগ্রহ করছিলেন।—

কিন্তু পথে আওরঙ্গজেবের একটু কাজ অবশিষ্ট ছিল—তখনও মুরাদের রাজ্যাভিষেক হয়নি। মুরাদকে অনেকে পরামর্শ দিয়াছিল—আওরঙ্গজেব একাকী দারাকে অনুসরণ করুক। তিনি নিজে তার বিপুল বাহিনী নিয়ে দিল্লী আগ্রা অবরোধ করে থাকুন। মুরাদ সর্ব্বদা নিজের দুর্ব্বার সাহসের গর্ব্বে স্ফীত ছিলেন তাই ভীত হলেন না। তার উপর আওরঙ্গজেব কি কোরাণ স্পর্শ ক'রে শপথ করে নি! ..

মথুরায় পৌঁছে সৈন্যদল বিশ্রাম ক'রল। সেই অভিযানের দিনগুলি মুরাদের পক্ষে খুব আনন্দ দায়ক হয়ে উঠেছিল। মিষ্টতম ফল, সুন্দরতম ফুল, তীব্রতম সুরা নিরন্তর মুরাদের তৃপ্তি সাধন করছিল। মুরাদ সংবাদ পেয়েছিলেন যে আওরঙ্গজেবের শিবিরে রাজাভিষেক ভিন্ন আর কোন আলোচনাই হয় না। এজন্যেই হস্তী ও অশ্বের জন্য নূতন সাজের তৈরী হচ্ছে, নূতন শিবির নির্ম্মাণ করা হচ্ছে। উৎসবের সব পরিচ্ছদ নূতন অলঙ্কার—আরও কত কি! রন্ধনশালায় খুব ব্যস্ততা সুমিষ্ট খাদ্য তৈরী হচ্ছে, সুগন্ধ ফুল নির্ব্বাচন করা চলেছে, নর্ত্তকী ও গায়িকা তাদের শিবিরে দিনরাত্রি নূতন নৃত্য গীত পূর্ব্বাভিনয় করছে।—

কিন্তু মুরাদের শিবিরে চলেছিল মন্ত্রণায় আর উদ্যোগিতা। মুরাদের বিশ্বস্ত বন্ধু ছিল খোজা শাহ্‌বাজ। সে তার প্রভুর জ্ঞান-চক্ষুন্মেলন কর্ত্তে বথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হল। আওরঙ্গজেব নদীতীরে অতি মনোরম পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর মধ্যে উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। অবশেষে জ্যোতিষ-নির্দ্দিষ্ট অভিষেকের শুভদিন উপস্থিত হ'ল। মুরাদ অশ্বারোহণে আওরঙ্গজেবের শিবিরে উপস্থিত হলেন। ইব্রাহিম খান—যিনি সামুগড়ের শাহজাদা দারাকে সদুপদেশ দিয়েছিলেন—মুরাদের অশ্ববল্গা ধরে মুখ ফিরিয়ে দিলেন—ভেবেছিলেন মুরাদ সেই ইঙ্গিত বুঝতে পারবেন। কিন্তু মুরাদ অগ্রসর হলেন।

ইব্রাহিম বলেছিলেন—সম্রাটের পথ চলেছে কারাগারের দিকে; শাহ্‌বাজ আল্লাহর নাম করে মুরাদকে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করেছিল। শিবিরের দরজায় পর্য্যন্ত অনেকেই তাকে সতর্ক করে দিয়েছিল। সকল বাধা সত্ত্বেও মুরাদ শিবিরে প্রবেশ করলেন।

শেখজীর আমিন খান এবং আওরঙ্গজেবের কয়েকজন বিশ্বাসী অনুচর উৎসবের পরিচ্ছদে ভূষিত হ'য়ে সহাস্যে মুরাদকে অভিনন্দিত করল। আওরঙ্গজেব মুরাদকে অভিনন্দন করলেন ও ভ্রাতৃস্নেহের, ভ্রাতৃপ্রেমের কথা বললেন, তারপর মুরাদকে সিংহাসনে নিয়ে গেলেন। সঙ্গীত আরম্ভ হ'ল—নর্ত্তকীকুল সমাগতা, বিকীর্ণ পুষ্পরাশি, বিস্ফুরিত গন্ধবারি, প্রজ্বলিত ধূপ গুগুল,—সমস্ত বায়ুমণ্ডল তীব্র মদের গন্ধে আমোদিত।

মুরাদের সৈন্যাধ্যক্ষগণ আওরঙ্গজেবের সেনাপতি কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন, মুরাদের সৈন্যদল আমোদপ্রমোদের জন্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে।

উৎসবের ভোজ আরম্ভ হ'ল—সুস্বাদু খাদ্য ও সুরের সুরা। আওরঙ্গজেবের শিবিরে কোন সম্মানিত অতিথির পানপাত্রই কখনো শূন্য হয় নি। ঘণ্টা পরে আওরঙ্গজেব মুরাদকে বলেন—ভ্রাতা তুমি বিশ্রাম কর। আমি অভিষেকের সমস্ত আয়োজন ও ব্যবস্থা ক'রব, আমি তোমাকে যথাসময়ে জাগ্রত করে দেব।

বিশ্বস্ত শাহ্‌বাজের সঙ্গে মুরাদ অন্য কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করল। সেখানে এক অপরূপ সুন্দরী নারী অপেক্ষা করছিল—খোজা কৃত্য তাকে

দূর করে দিল। অতিরিক্ত মদ্যপানের পর মুরাদ খুব শীঘ্রই নিদ্রামগ্ন হ'য়ে পড়ল।

এই সমস্ত ও পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি একজন বিশ্বস্ত লোক আমার কাছে বিবৃত করেছিল। আমি সেই কাহিনী শুনে লোকে নিষ্পন্দিত হয়ে পড়েছিলাম—সমস্ত রাত্রি জেগেছিলাম—আর প্রার্থনা করেছিলাম। * * * ইয়া আল্লাহ্, !!!!

শাহ্‌জাদা মুরাদের পরিবর্ত্তে মনে মনে অতি দুঃখিতভাবে—তাঁর পদসেবা করছিল। হঠাৎ আওরঙ্গজেব উন্মুক্ত দরজার প্রান্তে উপস্থিত হলেন তাঁর পরিধানে শ্বেত পরিচ্ছদ, মস্তক শিরোপা-বিহীন; অতিরেকের অনুরূপ কোন ভূষণ তাঁর অঙ্গে ছিল না। মৃদুগতিতে আওরঙ্গজেব অগ্রসর হলেন।

তারপর মস্তক উত্তোলন ক'রে খোজাকে উঠে আসতে ইঙ্গিত ক'রলেন। খোজা আদেশ প্রতিপালন করল। তৎক্ষণাৎ চারজন লোক সেই খোজাকে নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে হত্যা ক'রল এবং সেই স্থানেই তাকে ভূমিসাৎ প্রোথিত করা হ'ল।

এবার আওরঙ্গজেবের রাজভূমিকা আরম্ভ হ'ল। তিনি তাঁর চার বৎসর বয়স্ক কনিষ্ঠ পুত্র আজীমকে ডেকে একটী উজ্জ্বল মুক্তা দেখিয়ে বলেন—"যদি তোমার ঘুমন্ত চাচার পাশ থেকে তাঁর তরবারি তাঁকে না জানিয়ে নিয়ে আসতে পার তবে তোমাকে এই মুক্তাখণ্ড উপহার দেব।" এই ব্যাপারে যদি মুরাদ জেগে ওঠে তবে মুরাদ দেখবে একটী নির্ব্বোধ শিশু তরবারি নিয়ে খেলা করছে। শিশু আধীর উল্লসিত হ'য়ে মুরাদের তরবারি নিয়ে এল। আর একটী মুক্তা শিশুকে দেখিয়ে ঔরঙ্গজেব বললেন,—"তুমি চাচার ঐ ক্ষুদ্র ছুরিকা নিয়ে আসতে পার?" শিশু আবার মুরাদের কটিবন্ধের ছুরিকা নিয়ে এল। ঔরঙ্গজেব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

(ক্রমশঃ)

বেলওয়া তাম্রশাসনের দেশে

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত বি-এস্‌সি

তৃতীয় প্রস্তাব

তৃতীয় প্রস্তাবের উপজীব্য—

ভারতবর্ষের ফাল্গুন (১৩৫৫) ও বৈশাখ (১৩৫৬) সংখ্যায় প্রকাশিত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাবে আপনাদিগকে বেলওয়ার তাম্রশাসনের দেশের সহিত পরিচিত করিয়াছি। তাহাতে যে সকল বিবরণ দিয়াছি সেই পট-ভূমিকার উপর দাঁড়াইয়া আমরা এখন এই মত প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিব যে টলেমীর বর্ণিত পেণ্টাপোলিস হইল পঞ্চনগরী এবং এই পঞ্চনগরী হইল বর্ত্তমানে পাঁচবিবি রেল ষ্টেশন হইতে ২।৩ মাইল পূর্ব-উত্তরে অবস্থিত পাথরঘাটা নামক স্থ প্রাচীন চিহ্নযুক্ত স্থান। এই প্রস্তাবে আমরা ভাণ্ডিতবীথি যে ভূমিপরিপাটিতে বর্দ্ধনকোট হইয়াছে এবং ভাণ্ডিত নামটি যে এখনও পানিতোলা হইয়া স্মৃতি বহন করিয়াছে তাহা বিস্তৃত করিয়া প্রচার করিব।

টলেমী প্রভৃতি প্রদত্ত বিবরণ—

(ক) "খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্রীক ভূবেত্তা টলেমী। ইনি ভারতে আসেন নাই) * * * ভারতের পূর্বপ্রান্তে "কিরাদিয়া" নামক প্রদেশের উল্লেখ করিয়াছেন। 'পেরিপ্লুস্ অব্ দি ইরিথি য়ান্ সি' নামক গ্রন্থেও উক্ত 'কিরাদিয়া' প্রদেশের উল্লেখ আছে। এই প্রদেশ হইতে প্রচুর তেজপত্র বিদেশে রপ্তানী হইত, অদ্যাপি রংপুর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর তেজপত্র উৎপন্ন হওয়া পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ "কিরাদিয়া" প্রদেশ করতোয়া প্রবাহিত প্রদেশ।" (প্রত্নতত্ত্ব দেবের বগুড়ার ইতিহাস, ভূমিকাংশ, পৃঃ ২৭)

(খ) "টলেমী "কিরাদিয়া" নাম দিয়া পেণ্টাপোলিস (নগর) হইতে আরও দূরবর্ত্তিত (এখানে পূর্ব—লেখক) ভারতের সমুদ্রতীরস্থ প্রদেশ বুঝাইতে চাহিয়াছেন। * * * ভূমির নাম দেখিয়াই মনে হয় স্থানটি কিরাতের দেশ—সেই কিরাত যাঁরা লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্রের নিকটবর্ত্তী দেশের অধিবাসী। সুতরাং টলেমী যেখানে এই স্থান বসাইয়াছেন তাহা হইতে ইহা অনেকটা উত্তরে হইতেছে। সুতরাং এই প্রশ্নই উত্থিত হইতেছে যে অত আগে (দ্বিতীয় শতক—লেখক) কিরাতরা কি অতদূরে (চট্টগ্রাম আরাকান অঞ্চলে) দক্ষিণ দিকে গিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল—অথবা ভুল করিয়া তিনি অত দক্ষিণে কিরাত বলিয়াছেন? * * * যদিও কিরাতগণ উত্তরাঞ্চলস্থিত পিতৃভূমি ছাড়িয়া টলেমীর কালের আগেই ব্রহ্মপুত্র-অঞ্চলে চলিয়া আসিয়াছিল তবু তাহারা যে চতুর্গ্রাম (চট্টগ্রাম) এবং আরাকানের কিয়দংশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা বিশ্বাস হয় না। * * * আমি এখানে মন্তব্য করিতেছি যে পেণ্টাপোলিস (অর্থাৎ পাঁচ নগর) ও কিরাদিয়ার সর্ব্বোত্তরস্থিত চতুর্গ্রাম (অর্থাৎ চারিগ্রাম) নাম দুইটির মধ্যে যে একটি সম্পর্ক আছে তাহা ভুলিলে চলিবে না। কারণ প্রায়ই চতুর্গ্রাম কোন দেশের নাম হইতে পারে না। উহা প্রথমে একটি স্থানের নাম ছিল, পরে তাহা রাজধানী হয়—যদিও প্রথমে ৪টি গ্রামেরই সর্দ্দারের (Headman) অধিষ্ঠান ওখানে হইয়াছিল। আর পেণ্টাপোলিস হইল এইরূপ পাঁচটি গ্রামের সর্দ্দারের রাজধানী···কারণ কিরাদিয়ার অধিবাসীদের মত অনুন্নতরা যে নগরের বাসিক হইবার মত সভ্য হইয়াছিল তাহা বোধ হয় না। * * * আমাদের আরও বলিতে হয় যে টলেমী যে সকল সুতকাদি ব্যবহার

করিয়াছিলেন তাহাদের মতে 'কিরাদিয়া'তে সর্বোৎকৃষ্ট Malabathrum (তেজপত্র—লেখক) পাওয়া যাইত। এই বর্ণনা যে সত্য তাহাতে সন্দেহ করার আমি কিছু দেখি না। যদিও এই দামী তৈল ও মশলা এই অঞ্চলের এখনকার গাছপালায় আর দেখা যায় না * * * যদিও আরাকানের সব গাছপালার সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই; যদিও শ্রীহট্টে এখনও Malabathrum (তেজপাতা—লেখক) হয় এবং চট্টগ্রামে [ইনি চট্টগ্রামকে চট্টগ্রাম বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন—লেখক] হইতে শ্রীহট্ট বেশী দূরে নয়।" (Morindle's Ancient India as described by Ptolamy, Edited by Surendra Mazumder —page 192, 193, 194 এর অন্তর্গত Lassen (লাসেন) এর মন্তব্যের (Ind. Ant, Vol III page 235-237) অংশ-বিশেষের স্বানুবাদ।)

পেণ্টাপোলিস ও চতুর্গ্রামের অবস্থান—

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাবে যে সকল তথ্য সন্নিবেশিত আছে তাহার আলোকে উপরোক্ত বর্ণনা হইতে বোঝা যাইতেছে যে 'কিরাদিয়া' হইল বেলওয়ার তাম্রশাসনের এই কৈবর্তদের আদি স্থান—এবং পেণ্টাপোলিস হইল এই অঞ্চলের পঞ্চ নগরী ও চতুর্গ্রাম হইল চৌখণ্ডী, যাহার অপর নাম হইল ঘোড়াঘাট। [ভারতবর্ষ, ১৩৪৬ বৈশাখ, পৃঃ ৪০৬ সংলিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য]

পঞ্চনগরীর অবস্থান—

(ক) দ্বিতীয় শতকে বৈগ্রাম লিপিতে পঞ্চ নগরীকে একটি শাসন কেন্দ্ররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। (Epigraphia India, vol xxI p 81, 82) ঐ শতকেই প্রদত্ত কলাইকুড়ি শাসনে পঞ্চনগরী একটি বিষয়-রূপে ব্যাপ্ত হইয়াছে। (Indian Historical quaterly Vol XIX No. 1 page 15) দুইটি শাসনের প্রদত্ত ভূমিই এই অঞ্চলে—সুতরাং কোটিবর্ষ বিষয়ের পশ্চিমাঞ্চল (পুনর্ভবা নদী ও আত্রাই নদীর অঞ্চল) ছাড়িয়া দিয়া পূর্ব দিকে (করতোয়ার অঞ্চল) এই কৈবর্ত দেশে বা সন্নিহিত স্থানে পঞ্চনগরী খুঁজিতে হইবে।

(খ) এই শেষোক্ত অঞ্চলে প্রাচীনচিহ্ন সমন্বিত বিস্তীর্ণ স্থান আছে

১। ঘোড়াঘাটের নিকট
২। পাঁচরাজের জঙ্গলে
৩। সাহেবগঞ্জের জঙ্গলে
৪। পাঁচবিবির নিকটবর্তী পাথুরেঘাটা নামক স্থানে
৫। বেলওয়ার দীঘিগুলির নিকটে

[এই সকল স্থানের বিস্তৃত বিবরণ ভারতবর্ষ, বৈশাখ, ১৩৪৬, ৪০৬ ও ৪০৭ পৃষ্ঠায় সংলিখিত প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য] এই স্থানগুলির মধ্যে আমরা পাথুরেঘাটাকেই পঞ্চনগরী বলিয়া স্থির করিয়াছি। ইহার কারণ লিখিতেছি—

(গ) ১৯০১ খৃষ্টাব্দের বগুড়া জেলার লোকগণনায় পাওয়া যায় যে ঘুরাওয়ারী কৈবর্ত, বৈরাগী ও রাজবংশী স্ত্রীপুরুষের সংখ্যা নিম্নরূপ

থানা	কৈবর্ত	বৈরাগী	রাজবংশী	মোট
বগুড়া	২০০১	১৬৫৭	৫৭৪১	৮৪০৫
সারিয়াকান্দি	১৯২০	৭১২	৫০৮০	৭৭১০
শিবগঞ্জ	১৮৭৪	৮৪১	২০৫৮	৪৭৯৩
পাঁচবিবি	৪০৫১	২৪৯৭	৬০৮১	১২৩২৯
কেতলাল	৩১৩	৫৫৭	২১৮১	৩০৫১
আদমদীঘি	২২৭৩	২০৮০	৩৪১৮	৭৯৪৪
নেরপুর	৯৪০	৯০০	৩৪৩৮	৫২৭৪
ধুনট	৭১২	২৪৩	১০৫৮	২০১০
	১৪১২২	৯৪৪৩	২৯২৪৪	৪২৮৩০

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কৈবর্ত, বৈরাগী ও রাজবংশীদের সংখ্যা পাঁচবিবি থানায় অন্যত্রের এত আর কোন থানায় নহে।

(ঘ) পাঁচবিবি থানার কলাইর পরগণাটি সম্পূর্ণ পড়িয়াছে। উহাতে ২৬৯টি গ্রাম। তন্মধ্যে হিলি (থানার অতিনিকটে পূর্বোক্ত বৈগ্রাম), কলমপুর (এখানে একটি ভাস্কিনীর প্রস্তরময় দেহ ছিল, প্রবাদ আছে), মহীপুর (এখানে পাথুরেঘাটায় বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ বর্তমান) রহিয়াছে। সন্তগা পরগণার ১৭৮টি গ্রাম ও পাঁচবিবি থানাতে আছে। তন্মধ্যে বেলআদলা (যাবশ শিবমন্দির ও অন্যান্য প্রাচীন চিহ্ন আছে) রহিয়াছে। ঘোড়াঘাট পরগণার ২৪টি গ্রাম ও পাঁচবিবি থানার অন্তর্গত। সুতরাং আমাদের প্রার্থিত সব অঞ্চলই এই থানাতে পড়িতেছে। এবং দেখা যায় যে বহুদিন হইতে যাহা মাইকেভ্রূপে চলিয়া আসিয়াছে তাহাই অনেক ক্ষেত্রে জেলা, মহকুমা বা থানারূপে একালে গৃহীত হইয়াছে।

(ঙ) নগরী হইতে নাগরী এবং নাগরী হইতে মুসলমান আমলে বিবি—এইভাবে পঞ্চনগরী কালে কালে পাঁচবিবি হইয়াছে বলা যায়। কিন্তু খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতক (বৈগ্রাম ও কলাইকুড়ি লিপি) হইতে একাদশ শতক (মহীপালের বেলওয়া লিপি) পর্যন্ত যে পঞ্চনগরী একটি বেশাংশ বা রাজ্যাংশের রাজধানী ছিল তাহার ধ্বংসাবশেষ কোথায়? বর্তমান পাঁচবিবির কাছেই তাহার থাকিবার কথা এবং তাহা আছেও।

পাথুরেঘাটা বা মহীপুরের ধ্বংসাবশেষই পঞ্চনগরী—

বর্তমান পাঁচবিবি ষ্টেশন হইতে ২৮/৩ মাইল পূর্ব উত্তর দিকে মহীপুর নামক গ্রাম। তাহাতে প্রস্তরময় বিস্তীর্ণ ধ্বংস চিহ্ন আজও বর্তমান। স্থানটি তুলসী-গঙ্গা নামক ক্ষুদ্রনদীর তীরে অবস্থিত। কতকগুলি গ্রাম, তার মাঝে বাঘের মুখ, হিন্দু আমলের কামান এখনও আছে। আর আছে দক্ষিণাস্য নিমাই পীরের দরগা নামক মসজিদ্। মসজিদের দরজায় লেখা 'সুলতান নসরৎ শাহার সময় * * * হিজরীতে নির্মিত। নিকটেই একটি প্রস্তর স্তম্ভের ব্যাসযুক্তবিশিষ্ট অগ্রভাগ মাটির উপর ছিল—প্রায় ৪০ বৎসর আগে মাটি খুঁড়িয়া দেখা গিয়াছিল যে উহা মস্তবড় স্তম্ভের অগ্রভাগ। ইহা খুঁড়িলে ও ঘোড়া পাইলে বাদলস্তম্ভের মত কোন লেখ পাওয়া যাইবে কিনা কে বলিতে পারে।

এই বরগার কাছেই তুলসীগঙ্গার দুই তীর দিয়া যে ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় তাহা রাজা মহীপালের প্রাসাদের অবশেষ বলিয়া জনপ্রবাদ।

ইহারই অল্প দক্ষিণে প্রাকার বেষ্টিত ইষ্টকনির্ম্মিত একটি অট্টালিকার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এই অট্টালিকা চতুষ্কোণ, ১৬ হাত×১৬ হাত; এবং ৪ হাত প্রস্থ প্রাচীর। হয়তো ইহা কোন বৌদ্ধ স্তূপ।

এই স্থানে সতীর ঘাট বলিয়া একটি স্থান স্থানীয় লোকেরা দেখায়। তাহারা এই প্রবাদ প্রচার করেন যে এখানকার সামন্ত নৃপতি নিজ প্রভুর বিরুদ্ধে পাঠানের পক্ষাবলম্বন করেন। কিন্তু সতী স্ত্রীর পরামর্শে পরিশেষে প্রভুর পক্ষে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দেন ও তাহার স্ত্রীও সহমরণ করেন। (বঙ্গভূমির ইতিহাসে বিশেষতঃ শ্রীযুক্তপ্রভাসচন্দ্র সেন প্রদত্ত বিবরণ হইতে গৃহীত)

এই পাহাড়পর্ব্বতসঙ্কুল দেশে এক স্থানে এত প্রস্তরাদি দেখিয়াই বোধহয় নদীতীরবর্ত্তী এই মহীপুর গ্রামকে স্থানীয় লোকেরা পাথুরেঘাটা নাম দিয়াছে। প্রাচীন চিহ্নের কীর্ত্তিধারী এই পাথুরেঘাটাতে প্রতিবৎসর একদিন মেলা বসিয়া থাকে। ১৮৬৫-৭৫ খৃঃ মধ্যে যে জরিপ হইয়াছিল তাহাতে এই স্থানটি **Patherghoita fair** নামে নক্সায় অঙ্কিত আছে।

কাশিতবীথির ক্রমপরিণতি বর্দ্ধন কোটে—

(১) আমরা মহীপালের বেলওয়া লিপিতে তাঁহার মত বস্তুর বর্ণনা পাইয়াছি, "কৈবর্ত্ত দিগকে যে বৃত্তি প্রদত্ত ছিল তাহার নিকটবর্ত্তী কাশিতবীথি, সম্বন্ধে 'অমুক বস্তু'; পুণ্ড্রিকামণ্ডলস্থোপাধি 'অমুক বস্তু'; পক্কনগরী বিষয়স্থঃ পাতি 'অমুক বস্তু'।" (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৫৪, পৃঃ ৫২) এবং তৃতীয় বিগ্রহপালের (একাদশ শতকের শেষ ভাগে) বেলওয়া লিপিতে তাহার মত বস্তুর বর্ণনা পাইয়াছি, "কাশিতবীথি বিষয়স্থঃ পাতি পুণ্ড্রিকানগর সম্বন্ধে 'অমুক বস্তু'।" (এই লিপির সংস্কৃত সম্পূর্ণ পাঠ, ব্যাখ্যা ও মন্তব্যাদি প্রকাশার্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রেরিত হইয়াছে।)

পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে গুপ্ত, পাল, ও সেন প্রভৃতি রাজারা রাজ্যকে বিভিন্ন ভুক্তিতে (Provinces) ভাগ করিয়া শাসন করিতেন। এবং ভুক্তি বিভক্ত ছিল বিষয়ে (জেলা)। বিষয়ের নিম্নে ছিল বীথি বা মণ্ডল। বীথি ও মণ্ডলের সম্পর্ক খুব পরিষ্কার বোঝা যায় না।

বর্ত্তমানক্ষেত্রে দেখা যায় যে 'মহীপালের আমলের কাশিতবীথি' তাহার পৌত্র বিগ্রহপালের আমলে কাশিত'বীথি' বিষয় হইয়াছে কিন্তু তাহার 'বীথি' পদবী ঘুচে নাই। তবে একথা নিশ্চিত যে কাশিতের শাসন পূর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত স্থানে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

(২) পক্কনগরী বিষয়ের স্মৃতি বহন করিয়া আজও মহীপুর (পাথুরেঘাটার মেলা) বাঁচিয়া আছে। কাশিতবীথি বিষয় কোথায় তলাইয়া গেল? নিকটেই ইহার চিহ্ন থাকিবার কথা, যদি কালে কালে পরিবর্ত্তিত করতোয়ার তটরেখা উহা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত না করিয়া থাকে। ইহাই কি সেকালের পোড়াঘাট? আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু সেকাল বিষয় অস্তিত্বান কালে করতোয়ার পশ্চিম তীরস্থ 'আবর্দ্ধন' নামক স্থানে বক্তিয়ার খিলিজির সৈন্য দলকে যে (ত্রয়োদশ শতাব্দী) আলিমেচ লইয়া আসিয়াছিলেন তাহার সহিত এই কাশিতের কোন সম্বন্ধ কি ছিল না? তখন এই কাশিতবীথি বিষয়ের রাষ্ট্রকেন্দ্র কোথায় লুকাইয়া ছিল? বিশেষত পোড়াঘাটের অবস্থানও দুর্গের গঠনের অন্ত বিবরণ তো পূর্ব্বরূপ প্রচলিত আছেই।

(৩) বক্তিয়ার খিলিজি সম্পর্কে ঐ বর্ণনাটি বিস্তারিত—

"আলিমেচ বখতিয়ারের সৈন্যগণকে অন্ত একটি প্রদেশে লইয়া যায়। ঐ প্রদেশ আবর্দ্ধন ও বরমনগতি নামক নগর বর্ত্তমান ছিল। পূর্ব্বতন ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, এই নগর রাজা পরমাসেপের কীর্ত্তি। পদ্মা নদীর বিশুণ গভীরতা ও বিস্তার বিশিষ্ট নামকন্দী নাম্নী এক নদী ঐ নগরের সম্মুখে প্রবাহিতা ছিল। ঐ ভৈরবনাদিনী নদী পার হইবার কোন উপায় ছিল না। এ জন্য বখতিয়ার ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া দশদিন পর অন্য এক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে নদীর উপর প্রস্তর নির্ম্মিত এক বৃহৎ সেতু ছিল; উহা ২৯টি প্রস্তর নির্ম্মিত খিলানের উপর বর্ত্তমান ছিল। ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে পরমাসেপ যখন হিন্দুস্থান আক্রমণ করেন তখন ঐ সেতু নির্ম্মাণ করিয়া কামরূপ আসিয়া ছিলেন। (রিয়াজউস্—সালাতিনের রামপ্রাণ কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদ, পৃঃ ৪১)

বিদেশী লেখা নাম কখনও বড় শুদ্ধ হয় না; তাই আবর্দ্ধন, বরমনগতি, নামকন্দী ও পরমাসেপ ঠিক হয় নাই; তবকৎইনাসিরী গ্রন্থে (Raverty's ইংরাজী অনুবাদ, p. 561) এই নগরকে বর্দ্ধনকোট ও নদীকে বাঘমতী বলা হইয়াছে এবং নদীর নিম্নভাগে সমুদ্র আছে বলিয়া বর্ণিত আছে। এই বাঘমতী ও করতোয়া অভিন্ন বলিয়া প্রকাশ্যান প্রভৃতি পণ্ডিতগণ গ্রহণ করিয়াছেন।

(৪) বক্তিয়ারের এই অভিযানের সঙ্গে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্য একটি বিষয়ের ও রাষ্ট্র কেন্দ্রেরও যোগ আছে। উহা হইল দেবকোট বা দেবীকোট। তিব্বত হইতে অকৃতকার্য্য হইয়া তিনি এই দেবকোটে আসিয়াই অসুস্থ অবস্থায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ঘাতকের হস্তে প্রাণ দেন। এই দেবকোটই হইল মহীপালের বাণগড় লিপির কোটিবর্ষ বিষয়ের শাসন কেন্দ্র। এই বাণগড়, দেবকোট ও কোটিবর্ষ বিষয়ের শাসন কেন্দ্র একটি বিস্তীর্ণ স্থানে (৩৫ মাইল ব্যাপী স্থানে) খননাদি দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সবই পুনর্ভবা নদীর তীর দেখিয়া।

(৫) যে কালে যে উপায়ে কোটিবর্ষ বিষয়ের শাসন কেন্দ্র দেবকোট হইয়া গেল সেই কালে সেই উপায়েই কাশিতবীথি বিষয়ের শাসন কেন্দ্র বর্দ্ধনকোট হইয়া গিয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তাই বাণগড় গুপ্ত, পাল, সেন, পাঠান ও মোগলের রাজত্বের চিহ্ন স্তরে স্তরে যেমন সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে তেমনি বর্দ্ধনকোটেও স্তরে স্তরে রাষ্ট্র বিপ্লবের চিহ্ন নিশ্চিত বহন করিয়া ছিল। কিন্তু বিস্ময় করিয়াছে বহু পরিবর্ত্তিত করতোয়ার তটরেখা, যাহার ফলে পূর্ব্বের মত বর্দ্ধনকোট আর করতোয়ার পশ্চিম তীরে নাই; বর্ত্তমানের পূর্ব্ব তীর হইতেও বহু পূর্ব্বে সরিয়া গিয়াছে—রাখিয়া গিয়াছে গোবিন্দ মন্দিরের সাক্ষী করিয়া গোবিন্দগঞ্জ গাঁও,

কিন্তু সঙ্গে লইয়া গিয়াছে প্রাচীন দুর্গ ও রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ। কোচবিহার বিষয়ের কোচীয়ন মাবটি আর ঐ অঞ্চলে আছে কিনা জানি না, কিন্তু কাপিতবীথি বিষয়ের কাপিঠ মাবটির স্মৃতি একাধিক পুরাতন রাস্তার সংযোগস্থল—করতোয়া নদীর পূর্বস্থিত পাদিতোলা (কাপিঠ—পাদিঠ—পাদিতোলা) নামে আজও বহন করিয়া আছে। করতোয়ার আয়তন এখন নিতান্তই ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে।

(৬) সম্রাটতুল্য রাজাদের আমলে বিষয়গুলির অধিপতিরা সম্রাটকে মান্য করিয়া বিনীত থাকিতেন, কিন্তু এই সম্রাটরা দুর্বল হইলে এই অধিপতিরা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতেন। সম্রাট পরিবর্তন কালেই এ সব বেশী ঘটিত এবং কালে কালে বিষয়পতিরা এই ভাবে জমিদার হইয়া পড়িতেন। বর্ধনকোটের জমিদার এইরূপ কোন অধিপতির বংশধর বা বংশধরের বিজেতা বা স্থলাভিষিক্ত বলিয়া আমাদের ধারণা।

"এই জমিদারীর ইতিহাসে আছে যে ঘোড়াঘাটের বিস্তীর্ণ জমিদারী ইহার একাংশ ছিল। এই ঘোড়াঘাটের জমিদারী দিনাজপুর জেলার অধিকাংশ, রংপুর জেলার দক্ষিণের কিয়দংশ এবং বগুড়া ও মালদহ জেলার প্রায় সব লইয়া গঠিত ছিল। একদা ঘোড়াঘাট সহর মোগলের পূর্ব-সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল, রাজস্ব ছিল ৯০ লক্ষ টাকা। * * * প্রাচীনকালের জমিদারদের (যাঁরা বস্তুত রাজা ছিলেন এবং এই বেশ শাসন করিতেন) কোন বিবরণ আমরা পাইনা।"

"মুসলমান বিজয়ের পরও ইহারা রাজ্য চালাইয়া যাইতে থাকেন এবং ইন্দ্রাকপুর ও দিনাজপুরের জমিদারী বিরূপে ভাগ হয়।"

"ভগবান নামক রাজা বোকা ছিলেন, তাহার বেওয়ারেও ঐ নাম ছিল। শেষোক্তব্যক্তি চাকার সুবাদারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া মিথ্যা নামে মালিকানা ঘোষণা করান। সহ বিচারের পর, সম্পত্তি ভাগ হয়। ইন্দ্রাকপুর বা ৯ আনা ঘোড়াঘাট পান আসল ভগবান এবং বেওয়ান পান ৭ আনা ঘোড়াঘাট। এই ৭ আনা ঘোড়াঘাট এখনও দিনাজপুর রাজার। * * * ঘোড়াঘাটের যে প্রাচীন ঢিবাদি আছে তাহা এই বর্ধন কোট জমিদারীর অন্তর্গত, কিন্তু বর্তমানকালের ঘোড়াঘাট সহর ইহার বাহিরে।" (রংপুর জেলা গেজেটিয়ার হইতে, ১৩৭, ১৩৮ পৃঃ)

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কাপিতবীথি বিষয় কালে কালে বর্ধন-কোটের রাষ্ট্রতন্ত্রের দ্বারা গ্রাসিত হইয়াছিল এবং মোগল আমলে ঘোড়াঘাট সরকার আবার ইহাকে গ্রাস করে, যদিও বর্ধন কোটের জমিদারেরা কিছু কিছু অধিকার সহত্নে রাখিতে পারিয়াছিল।

(৭) বর্তমান প্রবন্ধে পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির রাজধানীর স্থানের আলোচনা প্রায় অনাবশ্যক। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ইহাকে পোড়াগাছা অঞ্চলে, কেহ পাহাড়পুর, কেহ বর্ধন কোটে, কেহ মহাস্থানগড়ে ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এখন মহাস্থানগড়ই বোটামুটি সকলে গ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতার অত কাছে যদি হাওড়া জেলাপতির অধিষ্ঠান থাকিতে পারে তবে মহাস্থানগড় হইতে ১৮ হইতে ২০ মাইল মধ্যে কাপিতবীথি বিষয়ের রাজধানী থাকিতে পারিবেনা কেন?

পালরাজাদের জয়স্কন্ধাবার—

এ পর্যন্ত যে সকল স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের নাম ১। পাটলীপুত্র, ২। মুদ্গগিরী, ৩। বটপর্বতিকা, ৪। বিলাসপুর ৫। সাহসগড, ৬। রমাবতী। তন্মধ্যে সাহসগড় জয়স্কন্ধাবার হইতে বেলওয়ার মহীপালে লিপি প্রচার হইয়াছিল। পৃথক প্রবন্ধে এই সব জয়স্কন্ধাবারের অবস্থান বিষয় আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

মালাকর

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

নিরালায়
রাত্রি-দিন যায়
কবিতার মালা শুধু গাঁথি' প্রাণপণে।
অন্তরে যে-আমি মোর হাসে আর কাঁদে সঙ্গোপনে—
মুক্তি তা'রে দিতে চাই অনাগত শতাব্দীর সম্মেলন মাঝে।
আমার সর্বস্ব যেন সেথা চির অম্লান বিরাজে
সহস্রের কণ্ঠ ঘেরি' বিজয়-গৌরবে
অপূর্ব সৌরভে।

মনে জানি
মোর স্বপ্নখানি
একদা সফল সত্য হবে সুনিশ্চয়;
মালার কুসুমগুলি আজিকার ক'বে পরিচয়।
যে-শ্রাবণ অন্ধকার বাঁধে আসি' বাসা তা'র আমার আকাশে,
শরতের যে-প্রশান্তি হৃদয়ের নভস্তলে ভাসে—
ঝলিত পরাগ তাহা সে দিনের প্রাণে
ক'বে কানে-কানে।

শুধু তাই
সাজাইয়া যাই
উপেক্ষিত জীবনের শতদলগুলি—
যেদনার সরোবরে জাগিয়াছে যা'রা আঁখি তুলি'।
সেই সঙ্গে রেখে যাই যে-মধু সঞ্চিত মোর ছিল মর্মকোষে,
আমার যে-ভালোবাসা লাগিল না কাহারো সন্তোষে,
যতো সূর্য গেল জ্বলে', যতো শশি-তারা
মিলনাক' সাড়া॥

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

গোয়ালন্দ স্টীমার ঘাটে বসিয়া বসিয়া নেতা সূর্য সেন ও দলের অন্যান্য সকলে নানারূপ চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। ভবিষ্যতের ভাবনা একটু পরে ভাবিলেও ক্ষতি নাই—কিন্তু সর্বাগ্রে প্রয়োজন কিছু খাদ্য এবং পানীয়ের। দলের সকলেই ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অতিশয় কাতর ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন। খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহের আশায় তাই নির্মল সেন অপর দুইজন বিপ্লবীকে সঙ্গে লইয়া লোকালয়ে অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পাহাড়ের পথ নির্জন নয়—নানার স্রোতে লোকজন। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। বহুক্ষণ পথ চলিয়া তাঁহারা অনেক মাইল দূরবর্তী নাদুর হাটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গোলমালের আশঙ্কায় সন্ধ্যা রাত্রিতেই সেখানকার দোকানপাট সব বন্ধ হইয়া গিয়াছিল—একখানি মাত্র দোকানের দ্বার কেবল সামান্য উন্মুক্ত ছিল। তাঁহারা সেখান হইতেই সামান্য খাদ্য ও খানিকটা পানীয় সংগ্রহ করিয়া পুনরায় ফিরিয়া গেলেন

গুহায়। খাইয়া-দাইয়া সকলে অনেকটা সুস্থ বোধ করিলেন। তারপর তাঁহারা রাত্রির অন্ধকারেই পাহাড়ের গুহা ত্যাগ করিয়া গেলেন

হালদা নদী ও কর্ণফুলীর সঙ্গমস্থল হইতে কয়েক মাইল দূরেই সূর্য সেনের আপন গ্রাম নোয়াপাড়া। সেই গ্রামে পৌঁছাইতে হইলে নদী অতিক্রম করিয়া অপর পারে যাইতে হইবে। মাঝ রাত্রিতে দলবলসহ সূর্য সেন নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একখানি ডিঙ্গি নৌকা কূলে ভেড়ানো ছিল। পলাতক বিপ্লবীদের সন্ধানেই যে লস্করখানি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। অতি কষ্টে তাঁহারা নদীর খর স্রোত ও পুলিশের দৃষ্টি এড়াইয়া একখানি সাম্পানে চাপিয়া নদী পার হইলেন; তারপর পুনরায় অতি দ্রুত পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন যাহাতে রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্বেই নোয়াপাড়া গ্রামের বাটীতে পৌঁছান যাইতে পারে। অবশেষে সূর্য সেন দলবল লইয়া তাঁহার বাটীতে গিয়া হাজির হইলেন। সেখানে গিয়া শুনিলেন যে, অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর হইতে ইতিমধ্যেই তাঁহাদের বাটীতে দুইবার খানাতল্লাসী হইয়া গিয়াছে।

কয়দিন পরে স্নানাহার সারিয়া বিশ্রাম গ্রহণের সুযোগ পাইলেও সেখানে যে অধিকক্ষণ থাকা নিরাপদ হইবে না—তাহা বিপ্লবীরা জানিতেন। তাই সেইদিনই রাত্রিকালে পুনরায় তাঁহারা যাত্রা সুরু করিলেন। নোয়াপাড়া গ্রামে বিশু সেনের তত্ত্বাবধানে বিপ্লবীদের কয়েকটা আস্তানা ছিল। সূর্য সেন তাঁহার দলটিকে লইয়া সেইখানেই গিয়া উঠিলেন। বিশু সেনের বাটীতে তাঁহাদের অবস্থানকালেই একদিন নিরুদ্দিষ্ট লোকনাথও কয়েকজন বিপ্লবীসহ আসিয়া তাঁহাদের সহিত পুনরায় মিলিত হইলেন। সকলেরই আগমন ইহাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল এবং নূতন করিয়া কার্যারম্ভের জন্য সকলে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। উক্ত বাটীতে থাকিতে থাকিতেই বিপ্লবীরা একদিন সংবাদ পাইলেন যে, অমরেন্দ্র নন্দী এক হস্তে পিস্তল ও অপর হস্তে রিভলবার লইয়া পুলিশের সহিত গুলি বিনিময় করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি পুলিশের গুলিতে নিহত হইয়াছেন অথবা আপন হস্তের আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিতে আত্মহত্যা করিয়াছেন, তাহা সঠিকভাবে জানা যায় নাই।

অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের দিন অধিকৃত অবস্থায় হিমাংশু সেনকে লইয়া গণেশ ঘোষ প্রভৃতির প্রস্থানের বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। হিমাংশুকে চন্দনপুরায় লইয়া গিয়া সুখেন্দু দস্তিদারের তত্ত্বাবধানে অর্পণ করা হয় এবং সে দলের অন্যান্য বিপ্লবীরা গিয়া দলের অন্যতম বিপ্লবী রজতকুমার সেনের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রজতকুমারের পিতা ও মাতা তাঁহাদিগকে অতি সন্তর্পণে লুকাইয়া রাখেন। পুলিশ কিন্তু সেখানে তাঁহাদের অবস্থানের বিষয় কোনও মতে জানিতে পারে এবং পরদিনই মধ্যাহ্নকালে গিয়া উক্ত বাটী খানাতল্লাস করে। বিপ্লবীরা কিন্তু এমনভাবে লুকাইয়া থাকেন যে পুলিশ তাঁহাদের সন্ধান পায় না। অগত্যা তাহারা বিফল হইয়া ফিরিয়া যায়। ইহার পরেও আর একবার পুলিশ ঐ বাটীতে তল্লাসী চালায়।

হিমাংশু সেনকে অধিকদিন লুকাইয়া রাখা সম্ভব হয় নাই। তিনি আহত অবস্থায় শয্যাশায়ী থাকাকালেই পুলিশ তাঁহাকে ও সুখেন্দু দস্তিদারকে গ্রেপ্তার করে। হিমাংশুকে হাসপাতালে রাখা হয় এবং তাঁহার মৃত্যু হয় সেইখানেই। বিপ্লবী দলের অন্যান্য যাঁহারা ইতিমধ্যেই স্ব স্ব বাটীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেককেই তাঁহাদের বাটীর অভিভাবকগণ আপনাদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য পুলিশের হস্তে অর্পণ করেন।

অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ প্রভৃতি স্থির করিলেন যে, ২২শে এপ্রিল তারিখে রাত্রিকালে তাঁহারা চট্টগ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইবেন, কারণ চট্টগ্রামে অবস্থান আর নিরাপদ নহে বলিয়া তাঁহাদের মনে হইল। চট্টগ্রাম শহরের নিকটবর্তী ভাটিয়ারী ষ্টেশন হইতে উক্ত দিবস রাত্রিকালে অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, শ্রীবন ঘোষাল ও অপর একজন ভূমিকা যাইবার চারখানি টিকিট ক্রয় করেন। ষ্টেশন মাষ্টারের ইহাতে কেমন সন্দেহ হয় এবং তিনি তাঁহার সন্দেহের বিষয় ও টিকিটের নম্বরগুলি

জানাইয়া কয়েকটি ষ্টেশনে টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন। ইহার ফলে যখন ফেনী ষ্টেসনে ট্রেণখানি গিয়া উপস্থিত হইল, তখন সেখানকার পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে ট্রেণ হইতে অবতরণে বাধা করিলেন। ষ্টেশন ঘরে লইয়া গিয়া যখন তাঁহাদের শরীর তল্লাশ করিবার উদ্যোগ হইতেছিল, তখন সহসা তাঁহারা রিভলবার বাহির করিয়া পুলিশ দলকে আক্রমণ করিলেন। দুইজন কনষ্টেবল ও একজন দারোগা ইহার ফলে আহত হইল। ষ্টেসনের লোকজন ও অন্যান্য কনষ্টেবলগণ প্রাণভয়ে ভীত হইয়া যে যেদিকে পারিল ছুটিয়া পলাইল এবং চারিদিকে বাধিয়া গেল এক ধুন্ধুমার কাণ্ড। সেই সুযোগে গুলিবর্ষণ করিতে করিতে তাঁহারা চারিজন পলায়ন করিলেন। জনৈক কনষ্টেবল অবশ্য একজনের নিকট হইতে একটি রিভলবার ছিনাইয়া লইতে সমর্থ হইল।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হওয়ার ফলে এত অধিক পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র ও গুলি-বারুদ বিপ্লবীদিগের হস্তগত হইয়াছিল যে, ইংরাজ কর্তৃপক্ষ তাহাতে রীতিমত শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। কি বিপুল এবং ব্যাপক প্রস্তুতির ফলে যে এই অসমসাহসিক লুণ্ঠনকার্যের অনুষ্ঠান সম্ভব হইয়াছে—তাহা ভাবিয়া তাঁহারা হইলেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। উপযুক্তভাবে তদন্ত ও অনুসন্ধানকার্য্য চালাইবার জন্য পুলিশের গোয়েন্দা-বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ লোম্যান অন্যান্য দক্ষ অফিসারদের সহিত চট্টগ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কলিকাতার তৎকালীন পুলিশ কমিশনার মিঃ টেগার্টও তাঁহার কর্মতৎপরতাবৃদ্ধি করিলেন। বিপ্লবী দলটিকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া হৃত অস্ত্র-শস্ত্রের পুনরুদ্ধার মানসে সমগ্র বঙ্গদেশের পুলিশ-কর্তৃপক্ষ তৎপর হইয়া উঠিলেন।

কিন্তু "যুগান্তর" দল এবং তাঁহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলটি পুলিশকর্তৃপক্ষের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়াই তাঁহাদের কার্য্য চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। এই সময় ডাঃ নারায়ণ রায়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে কলিকাতায় বিপ্লবীদের জন্য মারাত্মক ধরণের বোমা প্রস্তুত হইতে লাগিল। নিরুদ্দিষ্ট অবস্থায় গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, জীবন ঘোষাল এবং আনন্দ গুপ্ত একে একে কলিকাতায় "যুগান্তর" দলের আড্ডায় আসিয়া সমবেত হইলেন। লোকনাথ বলও ক্রমে আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন এবং "যুগান্তর" দলের নেতা ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত তাঁহাদের নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

চন্দননগরের গোন্দলপাড়ায় একটি দ্বিতল গৃহে তাঁহাদের থাকিবার ব্যবস্থা হইল। যুগান্তর দলের জনৈক কর্মী অধিবাহিত শরৎচন্দ্র আচার্য্যকে সকল গৃহস্বামী সাজাইয়া সুহাসিনী দেবীকে তাঁহার নকল স্ত্রী সাজাইয়া সেখানে পাঠাইয়া দেওয়া হইল—আর তাঁহাদেরই উপর ন্যস্ত হইল বিপ্লবীদের ভার।

যাহারা ইতিপূর্ব্বেই ধরা পড়িয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বীকারোক্তি প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বিপ্লবীরা ইহাতে প্রমাদ গণিলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে কোনও উপযুক্ত নেতা নিকটে না থাকাতেই তাহাদের পক্ষে মনোবল অটুট রাখা সম্ভব হইতেছে না এবং তাহারই ফলে তাহারা দুর্ব্বলচেতা ব্যক্তির মত অসাবধানতাবে যাবতীয় স্বীকারোক্তি প্রদান করিতেছে। ইহা বন্ধ করিতে হইলে কোনও একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির তাঁহাদের মধ্যে থাকা প্রয়োজন। আলোচনার পর অনন্তলাল স্থির করিলেন যে স্বেচ্ছায় তিনি পুলিশের নিকট ধরা দিবেন।

২৮শে জুন, ১৯৩০ সাল। গোয়েন্দা-বিভাগের প্রধান কেন্দ্র ১৩নং ইলিসিয়াম রো-তে অবস্থিত। সেখানে গিয়া অনন্তলাল গেটের প্রহরীর হস্তে তিনখানি পত্র প্রদান করিলেন। একখানি পত্র গোয়েন্দা-বিভাগের ডি, আই, জি মিঃ লোম্যানের নামে, একখানি ঐ বিভাগের সেক্সান সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নলিনী মজুমদারের নামে এবং একখানি ঐ বিভাগের ইন্সপেক্টর কুমারনাথ বসুর নামে। পত্রগুলি প্রহরী গিয়া তাঁহাদিগকে দিল—এবং স্ব স্ব পত্র পাঠ করিয়া তাঁহারা তিনজনেই অতিশয় স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। মিঃ লোম্যানকে অনন্তলাল লিখিয়াছিলেন—

—Dear Mr. Lowman,

I shall meet you on the 28th June, 1930. It is sure that you will never miss that opportunity to arrest me then and there. Yes, I am also quite ready for it. Never think it, please, that I am going to surrender. When a person surrenders? When he becomes quite helpless and finds no other means to protect him; then and then only he yields.

Am I helpless now? No, certainly not. I have arms to protect me; ample money to spend in time of need; many helpers to help me and good many shelters in Bengal, outside Bengal as well as outside India to abscond.

Now I am absconding with my friends and we are quite safe. But still I am allowing my arrest and why? Do you think I am repentant for any of my action? No, never, not a bit sorry. Then is it a mandate on me by any authority? No, it is my personal matter and absolutely private.

I am,
Revolutionary
Ananta Lal Singha.

পত্র পাঠ করিয়া কুমারনাথ বসু তাড়াতাড়ি গেটের কাছে বাহির হইয়া আসিলেন এবং দেখিলেন যে সম্মুখেই অনন্তলাল সশরীরে বর্ত্তমান। তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা হইল। অনন্তলাল এইভাবে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিলেন।

চন্দননগরের বাসায় তখনও রহিয়া গেলেন গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, আনন্দ গুপ্ত ও জীবন ঘোষাল। কয়েক মাস নির্ব্বিঘ্নেই কাটিয়া গেল, কিন্তু একদিন তাঁহাদেরও বিপদ বাধিল। পুলিশ কোনও সূত্রে জানিয়া ফেলিল যে, তাঁহারা কয়জন ঐ বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। পুলিশ তখন তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তারের জন্য প্রস্তুত হইল। ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতার তৎকালীন পুলিশ কমিশনার সার চার্লস টেগার্ট

কয়েকজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী এবং কয়েকখানি গাড়ী বোঝাই পুলিশ ও সৈন্য লইয়া সন্ধীর রাত্রিতে চন্দননগর অভিমুখে রওয়ানা হইয়া গেলেন। চন্দননগর পৌঁছিতেই রাত্রি প্রায় এগারটা হইল। গাড়ী দূরে রাখিয়া পদব্রজে গিয়া তাঁহারা রাত্রির অন্ধকারে বিপ্লবীদের আস্তানাটি ঘেরাও করিয়া ফেলিলেন। বহু লোকের পদশব্দে নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়াই বিপ্লবীরা দেখিতে পাইলেন যে, গৃহটি সম্পূর্ণরূপে পরিবেষ্টিত হইয়াছে—পলাইবার পথ নাই। তাঁহারা কিন্তু তথাপি হাল ছাড়িলেন না। বাটীর সম্মুখের প্রাঙ্গণের অল্প দূরেই একটি প্রাচীর—প্রাচীরের অপর দিকে একটি পুষ্করিণী। প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া অপর দিকে যাইতে পারিলে হয় তো পলায়নের একটা উপায় হইতে পারে। আপন আপন অস্ত্র সঙ্গে লইয়া সেই চেষ্টাতেই তাঁহারা অন্ধকারে মাটি হইয়া প্রাচীরের নিকট পৌঁছিলেন এবং দ্রুত অথচ সন্তর্পণে উহা লঙ্ঘন করিতেও সক্ষম হইলেন; কিন্তু অপর দিকে যাওয়ামাত্র জনৈক সার্জ্জেণ্ট উহার আলোয় তাঁহাদের দেখিয়া ফেলিল এবং দেখিবামাত্রই গুলি চালাইল। বিপ্লবীরাও তখন মরিয়া হইয়া গুলি চালাইতে লাগিলেন অতগুলি পুলিশ ও সৈন্যের বিরুদ্ধে কিন্তু কতক্ষণই বা তাঁহারা একাই চালাইবেন? তাহাদের একযোগে গুলিবর্ষণের মুখে উহাদের আত্মরক্ষা করাই কঠিন হইয়া উঠিল। শেষপর্য্যন্ত লোকনাথ, গণেশ ও আনন্দ মৃত হইলেন। জীবন ঘোষাল প্রাণ দিলেন পুলিশের গুলিতে। তাঁহার মৃতদেহ পুষ্করিণীর জলে পড়িয়াছিল—সকালবেলা তাহা উদ্ধার করা হইল। শশধর আচার্য্য ও সুহাসিনী দেবী পুলিশের হাতে গুরুতররূপে আহত ও ধৃত হইলেন। চিত্ত মণ্ডল নামে নিকটবর্ত্তী অপর এক বাটীর জনৈক ব্যক্তি গুলি লাগিয়া নিহত হইল।

এদিকে কোতরপাড়া গ্রামে সুধা সেন ও নির্ম্মল সেনও চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন না। পাহাড়তলীর সেতাঙ্গপাড়া আক্রমণের জন্য দুইই এক পরিকল্পনা রচিত হইল। উক্ত আক্রমণ পরিচালনার ভার রজতকুমার সেন, দেবীপ্রসাদ গুপ্ত, অমল রায়, মনোরঞ্জন সেন, অমৃত নন্দী এবং সুবোধ চৌধুরী অংশ গ্রহণ করিবেন বলিয়া স্থির হইল। তদনুযায়ী তাঁহারা এই যে তারিখে অস্ত্র-শস্ত্র ও বোমা লইয়া যাত্রা করিলেন। নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া কিন্তু তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে আক্রমণ পরিচালনার মোটেই সুবিধা নাই, কারণ প্রচুর পরিমাণ ইংরাজ-সৈন্য আসিয়া সে অঞ্চলটিকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ করার ব্যবস্থা হইয়াছে। অগত্যা ক্ষুণ্ণ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করা ব্যতীত তাঁহাদের আর উপায় রহিল না। ফিরিবার সময়ে তাঁহারা স্থির করিলেন যে রজতকুমারদের বাটীতে একবার ঘুরিয়া যাইবেন; কারণ রজতের জননী সকলকেই খুবই ভালবাসিতেন।

রজতকুমারদের বাটীতে কয়েকবার থানাতল্লাসীর বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই পরিস্থিতির মধ্যেই প্রত্যাবর্ত্তন পথে উপরোক্ত বিপ্লবী কয়জন রজতকুমারদের বাটীতে গিয়া হাজির হইলেন। রজত-কুমারের জননী তাঁহাদের জন্য তাড়াতাড়ি আহার্য্যে প্রস্তুত করিলেন বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আর আহার করা ঘটিয়া উঠিল না। রাত্রির অন্ধকার তখন সবেমাত্র ফিকা হইতেছে এমন সময় খবর পাওয়া গেল যে পুলিশ আসিতেছে। বিপ্লবীরা আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেলেন। ছুটিতে ছুটিতে তাঁহারা উপস্থিত হইলেন গিয়া কর্ণফুলী নদীর তীরে। রজতকুমারের পিতাও নদীর ধার পর্য্যন্ত তাঁহাদের সহিত গেলেন এবং একজন পরিচিত মাঝিকে তাঁহার নাম্পানে করিয়া উপরোক্ত কয়জনকে নদী পার করিয়া দিতে বলিলেন। মাঝিও তাঁহাদের লইয়া নাম্পান ছাড়িয়া দিল।

তাঁহাদের এই নদী পার হওয়ার সংবাদ পুলিশ পাইল। তাহারাও একখানি লঞ্চে করিয়া নদীর উপর তীব্র আলোক বিচ্ছুরিত করিতে করিতে নাম্পানখানির অনুসরণ করিল। মধ্যে মধ্যে নাম্পান ও লঞ্চের ব্যবধান এতই কমিয়া আসিতে লাগিল যে, বিপ্লবীদের ধরা পড়িবার আশঙ্কা বাড়িয়া যাইতে লাগিল। আর নাম্পানে না থাকিয়া তীরে অবতরণ করাই তাঁহারা সমীচীন মনে করিলেন। তদনুযায়ী তাঁহারা কালারপোল নামক স্থানে পৌঁছিয়া নাম্পান হইতে তীরে নামিলেন। বিপ্লবীদের দৌড়াইয়া পলাইতে দেখিয়া সেখানকার জনৈক ব্যক্তি তাঁহাদিগকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করিল—বিপ্লবীরা তাহাকে গুলি করিলেন। সে অঞ্চলের বহুলোক ইহার পর দল বাঁধিয়া তাঁহাদের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। বিপ্লবীরা পুনরায় গুলি চালাইয়া আরও কয়েক জনকে আহত ও একজনকে নিহত করিলেন। বহু চেষ্টায় শেষ পর্য্যন্ত কোনও মতে তাঁহারা কিছুক্ষণের জন্য লোকচক্ষুর অন্তরালে অদৃশ্য হইলেন।

পুলিশের দুইটি দল তো তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছিলই, ইহার উপর আবার সেখানকার থানার দারোগাও সংবাদ পাইয়া পুলিশ দল লইয়া বহির্গত হইলেন বিপ্লবীদের সন্ধানে। মাঝ রাত্রিতে যেন চারি-দিকে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। তাঁহারা কয়জনে ছুটিতে ছুটিতে একটি সেতুর নিকট আসিয়া পড়িলেন। বহু লোক ও পুলিশ সেখানে পথ আগলাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুবোধ চৌধুরী তাহাদের দ্বারা আহত ও ধৃত হইলেন। অপর কয়জন গুলি নিক্ষেপ করিতে করিতে কোনও মতে পলায়ন করিলেন।

কর্ণেল হেলাম্বিথ ও মিঃ কার্ম্মারের অধীন দুইটি বাহিনীও অনুসন্ধান কার্য্যে বাহির হইয়াছিল। কর্ণফুলী নদী তাহাদের একটি দলের হাতে ধরা পড়িলেন। অপর চারিজন ছুটিতে ছুটিতে ক্লান্ত হইয়া জনৈক মুসলমান গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হইয়া কিছু খাদ্য প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু একটু পরেই সেখানেও পুলিশ আসিয়া পড়িল। উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহারা গৃহস্বামীর নির্দ্দেশে নিকটবর্ত্তী এক শণের ক্ষেতে প্রবেশ করিয়া আত্মগোপন করিলেন। এদিকে তখন প্রায় ভোর হইয়া আসিয়াছে। অস্পষ্ট আলোকে পুলিশ তাঁহাদিগকে শণ ক্ষেতের মধ্যে দেখিতে পাইল। মিঃ কার্ম্মারের অধীন বাহিনী তখন মুহূর্ত্তমধ্যে জমিটি ঘেরাও করিয়া বিপ্লবীদিগকে আত্মসমর্পণের জন্য আহ্বান করিল। বিপ্লবীরা আত্মসমর্পণ করিলেন না—বরং তাহাদের উপর গুলিবর্ষণ সুরু করিলেন। দুই পক্ষে গুলি আরম্ভ হইয়া গেল, তীব্র ও

কঠোর সংগ্রাম। গুলি লাগিয়া লাগিয়া তাঁহাদের চারিজনেরই শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইতে লাগিল—কিন্তু তথাপি তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন না। মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত শত্রুর উপর তাঁহারা অবিশ্রান্তভাবে গুলিবর্ষণ করিয়াই চলিলেন। পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী তাঁহাদের শৌর্য ও সাহসে চমৎকৃত না হইয়া পারিল না। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল যে, তাঁহারা চারিজনেই নিহত হইয়াছেন।

যথাসময়ে পুলিশ মৃতদেহগুলির ফটো গ্রহণ করিল, তারপর আগুন ধরাইয়া অর্ধদগ্ধ করিয়া সেগুলি মাটিতে পুতিয়া ফেলিল। চট্টগ্রামের মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবীরা নূতন করিয়া আর একবার তাঁহাদের সংগ্রামশীলতার পরিচয় দিলেন।

সূর্য সেন ও নির্মল সেন কোয়েপাড়া গ্রামের কেন্দ্রে থাকিয়া সকল সংবাদই শুনিলেন। শুনিলেন যে তাঁহাদের দলের চারিজন বিপ্লবী ধরা না দিয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। এদিকে তাঁহারা আরও সংবাদ পাইলেন যে বিনয় সেনও গ্রেপ্তার হইয়াছেন। বিনয় সেনই কোয়েপাড়া গ্রামের বিপ্লবী আস্তানাগুলি দক্ষতার সহিত পরিচালিত করিতেছিলেন। তিনিও ধৃত হওয়ায় কোয়েপাড়া গ্রামে আর অবস্থান করা তাঁহাদের যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইল না। তাই অতঃপর সূর্য সেন, নির্মল সেন প্রভৃতি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, আর একত্রে সকলের থাকা চলিবে না; বেলায় নানা স্থানে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আত্মগোপন করিয়া সকলকে থাকিতে হইবে। (ক্রমশঃ)

ষ্টার্লিং এলাকায় ডলার সঙ্কট

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

যুদ্ধোত্তরকালে সারা পৃথিবীতে ডলার সঙ্কট ক্রমেই তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। রপ্তানী বাণিজ্যের আধিক্য হেতু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পাওনার পরিমাণ বাড়িতেছে, কিন্তু মার্কিণ পণ্য-আমদানীকারক দেশগুলি পণ্য-মূল্য পরিশোধের কোনই উপায় করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে রপ্তানীকারক দেশের মুদ্রায় অথবা স্বর্ণে পণ্য-মূল্য দিতে হয়। মার্কিণ পণ্যের চাহিদা সব দেশেই এখন প্রচুর, কিন্তু কোন দেশের হাতেই এখন মজুত স্বর্ণ বা মার্কিণ মুদ্রা ডলারের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য নয়। এ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিয়মে মার্কিণ পণ্য আমদানী বন্ধ করিয়া পণ্যাভাব সহ্য করা ছাড়া অন্যান্য দেশগুলির আর উপায় নাই। কিন্তু এই ভাবে আমদানীকারক দেশ মার্কিণ পণ্য আমদানী বন্ধ করিবার ইচ্ছা করিলেই মার্কিণ পণ্য রপ্তানী বন্ধ হইতে পারে না। আমেরিকা ধনতান্ত্রিক দেশ, সে দেশের সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থা মুষ্টিমেয় কয়েকজন জোতদারের হস্তগত, সরকার এবং এই সব অর্থবানদের সম্পর্কও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ লোক কলকারখানায় কাজ করিয়া জীবিকার্জন করে। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে অকৃষি বৃত্তির এইরূপ লোকের সংখ্যা ছিল শতকরা ৬৬ জন, ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এই সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে শতকরা ৮৫ জন। কাজেই বিদেশে পণ্য রপ্তানী করিয়া পেলে মার্কিণ কল কারখানার মালিকেরা যদি সস্তা বাজারের মজুহাতে লোক ছাঁটাই সুরু করেন, তাহা হইলে দেশব্যাপী অনিবার্য বিশৃঙ্খলা সামলানো মার্কিণ কর্তৃপক্ষের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিবে। এই জন্যই মার্কিণ সরকার তথা মার্কিণ শিল্পপতিরা বিশ্বব্যাপী ডলার সঙ্কটের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াও নিজ দেশের আর্থিক কাঠামো দৃঢ় রাখিতে বিকল্প কোন ব্যবস্থার দ্বারা বিদেশে মার্কিণ পণ্যের কাটতি যতটা সম্ভব বাগাইয়া রাখিতে চান। এই জন্য মার্কিণ কর্তৃপক্ষ আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের কার্যমান নীতি উদারতর করিবার জন্য সচেষ্ট, এই জন্যই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলির পুনর্গঠনের নামে মার্শাল পরিকল্পনার মত মার্কিনী সাহায্য পরিকল্পনার উদ্ভব।

যুদ্ধের পর বিদেশের নিকট যুক্তরাষ্ট্রের পাওনা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র মোট ১২০০ কোটি ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানী করে এবং বিদেশ হইতে ৭১০ কোটি ডলার মূল্যের মাল আমদানী করে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ডলার সঙ্কটের জন্য ব্রিটেন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি বহু দেশে ডলার এলাকা হইতে পণ্য আমদানী সঙ্কোচনের চেষ্টা চলে, তবু মার্কিণ পণ্যের চাহিদা এত বেশী থাকে যে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ১২১১ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার মূল্যের পণ্য বিদেশে রপ্তানী করিয়াছে এবং বিদেশ হইতে ৭০৭ কোটি ডলার মূল্যের পণ্য আমদানী করিয়াছে এবং ফলে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে পাওনা হইয়াছে ৫২৪ কোটি ডলার! এই বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ছাড়াও বিভিন্ন দেশে পরিত্যক্ত মার্কিণ সমর পণ্য বিক্রয় করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কম পাওনা হইতেছে না। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে এই হিসাবে পাওনা হইয়াছে ১০০ কোটি ডলারের মত। এই বিপুল পরিমাণ পাওনা পরিশোধ এখন আর শুধু দেনদার দেশগুলির সমস্যা নয়, পাওনাদার দেশ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও ভবিষ্যতে আত্ম-রক্ষার জন্য এই সমস্যা লইয়া মাথা ঘামাইতেছে। দেনদার দেশগুলি কি ভাবে ডলারের হিসাবে অন্ততঃ কিছুটা সাশ্রয় লাভ করিতে পারে এবং কি ভাবে ডলার এলাকার পণ্য অন্য এলাকায় মোটামুটি বিক্রীত হইতে পারে, তাহা লইয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা প্রভৃতি সকল ডলার এলাকাভুক্ত দেশগুলির, বিশেষ করিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দুর্ভাবনার শেষ নাই।

সমস্যাটি সত্যই এত জটিল ও বিরাট যে প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও মার্কিণ

কর্তৃপক্ষ ইহার কোন সমাধান সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না। যদি তাহাদের চেষ্টা বিফল হয়, অর্থাৎ মার্কিণ পণ্যের বিদেশী বাজার ক্রমেই সঙ্কুচিত হইতে থাকে, তাহা হইলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে অর্থ-নৈতিক সমস্যা বা বেকার সমস্যা ক্রমেই তীব্রতর হইবে। এই গুরুতর পরিস্থিতি অন্ততঃ খানিকটা এড়াইতে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে বেকার বীমা ব্যবস্থা প্রসারের চেষ্টা করিতেছেন এবং প্রত্যেক বেকার মার্কিণ নাগরিক যাহাতে বেকার থাকার ২৬ সপ্তাহ সপ্তাহে ৩০ ডলার হিসাবে ভাতা পায়, তজ্জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতে তিনি মার্কিণ সিনেটকে নির্দেশ দিয়াছেন।

ডলার সঙ্কটের চাপে বর্তমানে ব্রিটেন এবং ব্রিটেনের অর্থ নীতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, মিশর প্রভৃতি দেশ অত্যধিক বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বহির্ভারতীয়। বিশেষ করিয়া ডলার এলাকার সহিত বাণিজ্য সমতারক্ষা করিতে পারিতেছেন না। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ছয়মাসের হিসাবে দেখা যায়, এই সময় সামুদ্রিক বাণিজ্যে ব্রিটেন আমদানী হইয়াছে ৬৫ কোটি ষ্টার্লিং মূল্যের পণ্য এবং ব্রিটেন হইতে রপ্তানী হইয়াছে ২০ কোটি ৫০ লক্ষ ষ্টার্লিং মূল্যের পণ্য, ঘাটতি হইয়াছে ৯ কোটি ৫০ লক্ষ ষ্টার্লিং। ডলার ঘাটতি পূরণে এসাধারণ ব্রিটেন ব্যয় নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেও এইভাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বা কানাডার কাছে বারবার ঋণ প্রার্থনা করিলে এবং এইরূপ অবিরাম ঋণ-গ্রহণ ব্রিটিশ অর্থনীতির দিক হইতে বিপজ্জনক। যাহা হউক, এইরূপ বহির্বাণিজ্য ঘাটতির জন্য ব্রিটেনের মজুত স্বর্ণ ও ডলার, সম্পদ ক্রমেই নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছে। ষ্টার্লিং এলাকার জন্য যেটুকু ডলার ও স্বর্ণ সম্পদ হাতে মজুত রাখা ব্রিটেনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক বলিয়া অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, ব্রিটেনের হাতে এখন তাহাটুকু সম্পদও অবশিষ্ট নাই। ব্রিটেনের মজুত স্বর্ণ ও ডলারের পরিমাণ ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ৫৫ কোটি ২০ লক্ষ ষ্টার্লিং ছিল, ইহা তিন মাস পরে জুন মাসে ৬৭ কোটি ১০ লক্ষ ষ্টার্লিং দাঁড়ায়; ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে কমিতে কমিতে ইহা ৪০ কোটি ৩০ লক্ষ ষ্টার্লিং দাঁড়াইয়াছে। বলা নিষ্প্রয়োজন, এইভাবে মজুত ষ্টার্লিং ও ডলার হ্রাস পাওয়াতে শুধু ব্রিটেনের অর্থ-নীতির বিপদই সূচিত হইতেছে না, ভারতবর্ষাদি ষ্টার্লিং এলাকার সব দেশের অর্থ নীতির পক্ষেই ইহা ভয়ের কথা। ডলার সঙ্কটের বিপরীত দিকে ব্রিটেনের আভ্যন্তরিণ অর্থনৈতিক অবস্থাও এখন বেভাবে আতঙ্কজনক হইয়া উঠিয়াছে, মাত্র ছয় মাস আগেও তাহা অনেকেই কল্পনার অতীত ছিল। ব্রিটিশ চ্যান্সেলর অব এক্সচেকার স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস ব্রিটেনের ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দের বাজেটে এই আর্থিক বৎসরে ৬৭ কোটি ষ্টার্লিং উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া অনুমান করেন। বাজেট ঘাটতির মুখে উদ্বৃত্তের অনুমান সকলকেই আশ্চর্যান্বিত করিয়াছিল। কিন্তু এ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের চলতি বৎসরের যে প্রথম ত্রৈমাসিক আয় ব্যয়ের হিসাব জানা গিয়াছে, তাহাতে উদ্বৃত্ত বলিতে একরূপ কিছুই হয় নাই। অবস্থা এত শোচনীয় যে অনেকে শেষ পর্যন্ত এ বৎসর ব্রিটিশ সরকারের লক্ষ্যীয় উদ্বৃত্ত হইবে না বলিয়াই ধরিয়া লইতেছেন। স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস্ গত ৮ই ও ১০ই জুলাই লর্ডস অব কমন্সের বক্তৃতায় ব্রিটেনের শোচনীয় আর্থিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিয়া আতঙ্কপ্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য এই প্রসঙ্গে ইহাও ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, যুদ্ধের চাপে সর্বস্বান্ত এবং যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের সমস্যা পীড়িত ব্রিটেনের পক্ষে সার্বজনীন কর্ম সংস্থান করিয়া ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক ঘনিষ্যাদ সুদৃঢ় করিয়া তোলা সরকারী আয়ব্যয়ের হিসাবে ব্যয়ের তুলনায় আয়ের আধিক্যের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

ডলার সঙ্কট হইতে আত্মরক্ষার যে কোন উপায় ব্রিটেনকে অবিলম্বে করিতেই হইবে। ডলারের চাহিদা আজ শুধু ব্রিটেনেই সীমাবদ্ধ নয়, ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, সিংহল, দক্ষিণ আফ্রিকা, মিশর প্রভৃতি ব্রিটেনের পাওনাদার দেশগুলিরও মার্কিণ পণ্য আমদানীর জন্য ডলার মুদ্রার একান্ত প্রয়োজন। এইজন্য উল্লিখিত দেশগুলি উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং পাওনা আদায়ের সময় যত বেশী সম্ভব ডলার আদায়ের জন্য চেষ্টা করিতেছে। ব্রিটেন কিন্তু এহিসাবে বর্তমানে অসহায়, কাজেই পাওনাদার দেশগুলির দাবী পূরণ করা তাহার সাধ্যে কুলাইতেছে না। যেমন পরিশোধের সময় অধিকসংখ্যক ডলার দেওয়া যুদ্ধের কথা, প্রাণের দায়ে ব্রিটেন এখন ষ্টার্লিং এলাকাভুক্ত দেশগুলিকে যথাসম্ভব ডলার ব্যয় কমাইবার জন্য উৎসাহিত করিতেছে। ব্রিটেনের পক্ষে আপাতঃ রক্ষা এই যে, ভারতাদি সংশ্লিষ্ট দেশগুলি এই ব্যাপারে সাড়া দিয়াছে এবং ইহার ফলে আশার তুলনায় ষ্টার্লিং এলাকার বর্তমান বৎসরে কমবেশী ১০ কোটি ডলার বাঁচিয়া যাইবার আশা দেখা যাইতেছে। ষ্টার্লিং এলাকার মোট ডলার ঘাটতি এখন বৎসরে ৮০ কোটি ষ্টার্লিংয়ের মত, ইহার মধ্যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নিজস্বোগে ডলারলাভ পণ্য ব্যবহার কমাইয়া এ বৎসরে ১০ কোটি ষ্টার্লিং, (১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ কোটি ষ্টার্লিংয়ের স্থলে ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে ২০ কোটি ষ্টার্লিংয়ে নামাইয়া), ষ্টার্লিং এলাকাভুক্ত অপরাপর দেশে ১০ কোটি ষ্টার্লিং, একুনে এই ২০ কোটি ষ্টার্লিং বাঁচাইবার আশা করিতেছেন। এছাড়া ষ্টার্লিং এলাকার চলতি বৎসরের মার্শাল পরিকল্পনা অনুযায়ী যে পরিমাণে অর্থ ধরা হইয়াছে তাহাও ২০ কোটি ষ্টার্লিংয়ের মত। এইভাবে শেষপর্যন্ত ২০ কোটি ষ্টার্লিংয়ের ডলার ঘাটতি থাকে। এই ঘাটতিও পূরিত হইতে পারে যদি ষ্টার্লিং এলাকাভুক্ত দেশগুলি হইতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য আমদানী বাড়ে। অবশ্য ব্রিটেন এবং ষ্টার্লিং এলাকার দেশগুলি এ বিষয়ে চেষ্টা করিতেছে, তবে ডলার এলাকায় ষ্টার্লিং এলাকার পণ্যরপ্তানী লক্ষ্যীয় ভাবে এখনও বাড়িতেছে না। পণ্যরপ্তানীবৃদ্ধি যতই সম্ভব হইবে, ডলার সঙ্কটের চাপ তদনুপাতে কমিবার সম্ভাবনা।

আর এক উপায়ে ষ্টার্লিং এলাকার ডলার ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব ছিল। আমরা ষ্টার্লিংয়ের মূল্যমূল্য হ্রাসের (Devaluation of Sterling) কথা বলিতেছি। ব্রিটেনও সম্প্রতি এই সম্ভাব্য মূল্যমূল্য হ্রাস লইয়া বহু জল্পনা কল্পনা চলিয়াছে। অবশ্য ষ্টার্লিংয়ের মূল্যমূল্য

করিলে ষ্টার্লিং এলাকার পণ্য ডলার এলাকায় সস্তা হইত বলিয়া বাড়তি ডলার সংগ্রহ অনেক সহজ হইত, কিন্তু ইহাতে মুদ্রানীতির দৃঢ়তা ও মুদ্রার মূল্য নষ্ট হয় বলিয়া অর্থ-নৈতিক বিশৃঙ্খলার ভয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ষ্টার্লিংয়ের মূল্য হ্রাসে রাজী হইতেছেন না। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এখন ডলার খরচ কমাইয়া ও রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণের সাহায্যে অধিকতর পরিমাণ উদ্বৃত্ত ডলার সংগ্রহ করাই সাম্প্রতিক প্রচণ্ড ডলার-সঙ্কট সমাধানের প্রকৃষ্ট উপায় হিসাবে ধরিয়া লইয়াছেন। দ্বিতীয় ব্যবস্থাটি সম্পর্কে কোন কথা না উঠিলেও ডলার খরচ বা ডলার এলাকার পণ্য আমদানী কমাইবার প্রথম ব্যবস্থাটিকে উপলক্ষ্য করিয়া মার্কিণ মহলে কিন্তু একটু অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে। শুধু মার্কিণ ব্যবসায়ীরা নয়, মার্কিণ সিনেটের কোন কোন সদস্যও বাণিজ্য ও সম্প্রতির প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে ষ্টার্লিং এলাকার দেশগুলির জোর করিয়া ডলার খরচ কমাইবার চেষ্টার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন।

পুরাণে দুর্ব্বাসা

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্-এ

বিষ্ণু পুরাণে ইন্দ্র ও দুর্ব্বাসা

শঙ্করের অংশসম্ভূত দুর্ব্বাসা উন্মত্তব্রতধৃক হইয়া জগতে উন্মত্তবৎ বিচরণ করিতেন।

এক বিচিত্র মাল্যধরী বিদ্যাধরীকে দেখিলেন। মাল্যের সুগন্ধে মোহিত হইয়া তিনি তাহার নিকট উহা যাচ্ঞা করিলেন। বিদ্যাধরী ভক্তি সহকারে ঋষিকে ঐ মালা অর্পণ করিল।

উন্মত্তবৎ ঋষি ভ্রমণ করিতে করিতে ঐরাবতারূঢ় দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রীতি সহকারে ঐ মালা ছুড়িয়া দিলেন। ইন্দ্র ঐ মালা লইয়া ঐরাবতের মস্তকে ন্যস্ত করিলেন। গন্ধে আকৃষ্ট ঐরাবত মালা শুণ্ড দ্বারা গ্রহণ করিয়া আঘ্রাণ করিয়া ধরণীতলে নিক্ষেপ করিল।

মাল্যের এই অবমাননা দেখিয়া ঋষি কুপিত হইলেন। তাঁহাকে অভিসম্পাত দিয়া বলিলেন "হে ইন্দ্র যেহেতু তুমি আমার প্রদত্ত এই অপূর্ব্ব মালার অবমাননা করিলে, ইহাকে প্রণতি সহকারে প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিলে না, অতএব তোমার দর্প ভঞ্জন করিতেছি। তুমি লক্ষ্মীহীন হইবে।"

ইন্দ্র তাড়াতাড়ি ঐরাবত হইতে নামিয়া ঋষিকে প্রসন্ন করিবার প্রয়াস পাইলেন। ঋষি প্রসন্ন হইলেন না। বলিলেন—

"নাহং কৃপালু হৃদয়ো ন চ মাং স্তুবতে ক্ষমা।
আমি কৃপালু হৃদয় নই; আমাকে ক্ষমা স্তবনা করেনা।
"অক্ষান্তিসারসর্ব্বস্বং দুর্ব্বাসসমবেহি মাম্।
ক্ষমা হীনত্বই যাহার সর্ব্বস্ব আমাকে সেই দুর্ব্বাসা বলিয়া জান।

জনস্তটাকলাপস্য ভ্রুকুটী কুটিলং মুখম্।
নিরীক্ষ্য কস্ত্রিভুবনে ন যো ন স্যতো ভয়ম্।

জলৎ জটাকলাপযুক্ত আমার ভ্রুকুটী কুটিল মুখ দেখিয়া ত্রিভুবনে কে ভয় প্রাপ্ত না হইয়াছে?

উপরের কয়টি উদ্ধৃত অংশে দুর্ব্বাসা চরিত্র ফুটিত হইয়াছে।

ইন্দ্রের পতন হইল। তিনি লক্ষ্মীহীন হইলেন। দানবগণ কর্তৃক পরাজিত হইলেন।

ভাগবতে অম্বরীষ ও দুর্ব্বাসা

মহাভাগ অম্বরীষ সপ্তদ্বীপবতী মহীর ঈশ্বর; অব্যয় তাঁহার শ্রী, পৃথিবীতে অতুল তাঁহার বিভব।

সেই অম্বরীষ কিন্তু বিষ্ণুভক্ত :—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠ গুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জনাদিষু শ্রুতিং চকারাচ্যুত সৎকথোদয়ে।

তিনি তাঁহার মন কৃষ্ণপদারবিন্দে নিযুক্ত করিলেন; তাঁহার বাক্য কৃষ্ণগুণানুবর্ণনে নিযুক্ত করিলেন, হস্তদ্বয়কে হরিমন্দির মার্জনাদিকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন, এবং কর্ণকে অচ্যুত সৎ কথা শ্রবণে নিযুক্ত করিলেন।

স ইত্থং ভক্তি যোগেন তপোযুক্তেন পার্থিবঃ।
স্বধর্ম্মেণ হরিং-প্রীণন্ সর্ব্বান্ কামান্ শনৈর্জহৌ।

তিনি এইরূপে তপোযুক্ত ভক্তিযোগের দ্বারা এবং স্বধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা হরিকে প্রীত করিয়া ধীর সর্ব্ব কাম ত্যাগ করিলেন।

হরি তাঁহার প্রতি প্রীত হইলেন।

তস্য অদাদ্ধরিশ্চক্রং প্রত্যনীক ভয়াবহম্।
একান্ত ভক্তি ভাবেন প্রীতো ভক্তাভিরক্ষণম্।

তাঁহার একান্ত ভক্তি ভাবের দ্বারা হরি প্রীত হইয়া ভক্তের রক্ষার্থে সর্ব্বদৈত্য ভয়ঙ্কর চক্র নিয়োজিত করিলেন।

সেই রাজা সংবৎসরব্যাপী দ্বাদশী ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া ব্রতান্তে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া যমুনায় স্নান করিয়া মধুসূদন হরির অর্চনা করিলেন।

ব্রত ভঙ্গের বিষয় ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া নিজে পারণা করিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় ভগবান দুর্ব্বাসা অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহার সম্যক অর্চনা করিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। দুর্ব্বাসা তাঁহার যাচ্ঞা স্বীকার করিয়া আবশ্যক কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য যমুনার দিকে গমন করিলেন।

তিনি যমুনার জলে নিমগ্ন থাকিয়া মন্ত্রজপে (স্নানস্থানে) নিবিষ্টমনা হইলেন।

ঋষির আদিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। রাজার অতিথিসেবী পারণা করিবার সময় অতিবাহিত হইবার উপক্রম হইল। পাছে অতিথির নিমন্ত্রণ ভঙ্গ হয় এ জন্য তিনি ব্যস্ত হইলেন। মান্য অতিথিকে না ভোজন করাইয়া নিজে ভোজন করিলে তাহার অবমাননা করা হয়। পারণা না করিলেও ভয়ানক দোষ ঘটে। ব্রাহ্মণগণ ব্যবস্থা দিলেন—নাম মাত্র এক বিন্দু জল পান করিলে অতিথির পারণা করা হইবে অথচ ভোজন করা হইবে না। রাজা তাহাই করিলেন।

দুর্ব্বাসা যমুনাজল হইতে উঠিয়া রাজার ঐ কার্য্যের কথা বুঝিতে পারিলেন।

তিনি ক্রোধান্বিত হইলেন—

মন্যুরা প্রজ্বলদ্বাস্যো ভ্রুকুটী কুটিলাননঃ।

ক্রোধে তাঁহার গাত্র কম্পিত হইতে লাগিল; তাঁহার মুখ ভ্রুকুটি কুটিল হইয়া উঠিল।

রাজাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন—

যো মামতিথিমায়ান্তমাতিথ্যেন নিমন্ত্র্য চ।

অদত্ত্বা ভুক্তবাংস্তস্য সদ্যস্তে দর্শয়ে ফলম্।

যে আমাকে অতিথি প্রাপ্ত হইয়া আতিথ্যানুসারে নিমন্ত্রণ করিয়া, না দিয়া নিজে ভোজন করিয়াছে সদ্য তাহার ফল দেখাইতেছি।

এবং ব্রুবাণ উৎকৃত্য জটাং রোষপ্রদীপিতঃ।

তয়া স নির্ম্মমে তস্মৈ কৃত্যাং কালানিলোপমাম্।

এই বলিয়া রোষে প্রদীপ্ত ঋষি নিজের জটা ছিঁড়িয়া রাজাকে ধ্বংস করিবার জন্য কালানিলোপমকৃত্যা নির্ম্মাণ করিলেন।

রাজা কিন্তু নির্ভীক—অবিচল চিত্ত।

তালপত্রীং ক্ষুরান্তাগ্রবিষহস্তাং পদা ভুবং।

বিপত্রীং সমুদীক্ষ্য ন চচাল পদান্নৃপঃ।

তালপত্রী, অসিহস্তা, পদভরে পৃথিবী কম্পায়িতকারিণী আক্রমণকারিণী সেই কৃত্যাকে দেখিয়া রাজা সামান্যও বিচলিত হইলেন না।

অতঃপর রাজার রক্ষার্থ সুদর্শনের আবির্ভাব। সে অবিলম্বে কৃত্যাকে ভস্মীভূত করিয়া ঋষির অভিমুখে অগ্রসর হইল।

ঋষি নিজের প্রযত্ন নিষ্ফল দেখিয়া এবং চক্রকে নিজের দিকে আক্রমণার্থ আগমন করিতে দেখিয়া দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রাণরক্ষার জন্য ছুটিলেন।

যতো যতো ধাবতি তত্র তত্র

সুদর্শনং দুষ্প্রসহং দদর্শ।

ঋষি যেখানে যেখানেই পলায়ন করেন সেখানেই দুষ্প্রসহ সুদর্শন দেখিলেন।

অনন্তনাথ ঋষি আশ্রয়-অন্বেষণার্থী হইয়া ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার শরণ লইলেন। বলিলেন যে বিধাতা, আমাকে অচ্যুত তেজ হইতে রক্ষা কর।

ব্রহ্মা অস্বীকার করিলেন। বলিলেন আমি, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি সকলে যাহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লোকহিত ব্যাপারে নিযুক্ত আছি তাহার বিপক্ষে কি প্রকারে যাইব।

ঋষি কৈলাসে গিয়া শিবের শরণাপন্ন হইলেন। শিব তাঁহাকে হরির আশ্রয় লইতে বলিলেন।

দুর্ব্বাসা বৈকুণ্ঠে যাইয়া হরির শরণ লইলেন। তিনি বলিলেন আমি ভক্তাধীন।

অহং নির্ব্বন্ধহৃদয়ৈঃ সাধ্বীভিঃ সতীধর্ম্মভিঃ।

বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা।

আমাতে বদ্ধহৃদয় সতীধর্ম্ম সাধ্বী সৎ স্ত্রী যেমন সৎপতিকে বশীভূত করে সেইরূপ আমাকে বশ করে। অভিচার-ক্রিয়া সাধুর প্রতি প্রযুক্ত হইলে প্রয়োগ-কর্ত্তারই অকল্যাণ বিধান করে। তোমাকে এ বিপদ উদ্ধার পাইবার উপায় বলিতেছি—অম্বরীষের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কর। দুঃখের শান্তি হইবে।

ঋষি আবার অম্বরীষের কাছে গিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া ক্ষমা-প্রার্থনা করিলেন। অম্বরীষ অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। তিনি ঋষির প্রয়াণের পর হইতে তাঁহার আগমন আকাঙ্ক্ষায় উপবাস করিয়া আছেন। তিনি ঋষির দিকে ধাবমান সুদর্শনকে দেখিয়া তাহার স্তব করিলেন। বিষ্ণুর ন্যায় তাহার অস্ত্রাদিও পূজ্য। স্তব করিয়া প্রার্থনা করিলেন।

যদি নো ভগবান্ প্রীতো একঃ সর্ব্বগুণাশ্রয়ঃ।

সর্ব্বভূতাত্মভাবেন দ্বিজো ভবতু বিজ্বরঃ।

যদি আমার সর্ব্বভূতাত্মভাবের দ্বারা এক সর্ব্বগুণাশ্রয় ভগবান প্রীত থাকেন তবে দ্বিজ বিজ্বর হউক।

দুর্ব্বাসা রক্ষা পাইলেন।

তিনি গাহিলেন :

ব্রহ্মাদি প্রতিমায়েণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।

তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে।

যাহার নাম শ্রবণ মাত্রে পুরুষ নির্ম্মল হয় তাহার দাসদিগের কিবা পাইবার অবশিষ্ট থাকে।

মহাভারতে

দুর্ব্বাসা—দ্রৌপদী

এরূপ চিত্র। অনিয়ত বেশধারী মুনি উন্মত্তবৎ বিচরণ করিতেন। কখনও বিবাসা হইতেন। ভোজন করিয়া সর্ব্বাঙ্গ উচ্ছিষ্টানুলিপ্ত করিতেন। পরুষবাক্য ব্যবহার করিতেন।

এই দুর্ব্বাসা আসিতেছেন শুনিয়া রাজা দুর্য্যোধন শাপ বিদূরিত হইলেন। কিন্তু দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনির পরামর্শমত এই দুর্য্যোধনকে সুযোগে পরিণত করিতে ইচ্ছুক হইলেন।

পাণ্ডবগণ বনে গমন করিয়াও নগরবাসীর সহ লোকজন খাওয়াইয়া সুখে বাস করিতেছেন, ইহার জন্য ঈর্ষ্যায় দুর্য্যোধন অতীব উদ্বিগ্ন ও দুঃখিত ছিলেন।

দুর্ব্বাসা আসিলে দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণের সহিত অতি বিনীতভাবে তাহাকে অর্চ্চনা করিয়া আমন্ত্রণ করিলেন। শিষ্যগণসহ মুনি সেখানে কয়েকদিন থাকিলেন। দুর্ব্বাসা ক্ষুধিত হইয়াছি শীঘ্র অন্ন দাও : স্নান করিয়া আসিতেছি বলিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু বহু বিলম্বে আগমন করিলেন। আর ক্ষুধা নাই কিছু ভক্ষণ করিব না বলিয়া অবর্শন হইলেন। অকস্মাৎ আসিয়া বলিলেন—শীঘ্র আমাকে ভোজন করাও। ক্ষণমও গভীর নিশীথে উত্থিত হইয়া গালাগালি দিতে লাগিলেন। অন্নাদি প্রস্তুত করাইয়া তাহা ভোজন করিলেন না।

এরূপ কয়দিন ব্যবহারের পর যখন দুর্য্যোধনের কোনও রূপ ক্রোধ বা বিকৃতি হইল না, তখন ঋষি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন —আমি তুষ্ট হইয়াছি যাহা তোমার প্রিয় সেইরূপ বর গ্রহণ কর।

পূর্ব্বে কর্ণাদি কর্তৃক মন্ত্রিত দুর্য্যোধন বলিলেন—আমাদের কুলে রাজা যুধিষ্ঠির, জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ এবং পরমধার্ম্মিক। তিনি ভ্রাতৃগণের সহ বনে বাস করিতেছেন। আমার প্রার্থনা আপনি তাহার অতিথি হউন। যখন যশস্বিনী, সুকুমারী রাজপুত্রী দ্রৌপদী দ্বিজ ও পতিগণকে ভোজন করাইয়া এবং নিজে ভোজন করিয়া বিশ্রাম লাভ করিবেন সেই সময়ে আপনি সেখানে গিয়া অতিথি হউন। যদি আমার প্রতি আপনি প্রীত হইয়া থাকেন তবে আমার এই প্রার্থনা পূরণ করুন। দুর্ব্বাসা ও তাহাই হইবে বলিয়া চলিয়া গেলেন। দুর্য্যোধন আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। আনন্দে কর্ণের কর গ্রহণ করিলেন। কর্ণ বলিলেন—

দিষ্ট্যাকামঃ সুসংবৃত্তো দিষ্ট্যা কৌরব বর্দ্ধসে।
দিষ্ট্যা তে শত্রব মগ্না দুস্তরে ব্যসনার্ণবে।
দুর্ব্বাসা ক্রোধনো যত্নো পতিতাঃ পাণ্ডুনন্দনাঃ
বৈরেব তে মহাপাপৈর্গতা বৈ দুস্তরং তমঃ।

অদৃষ্টক্রমেই কামনা সুসম্পন্ন হইল; অদৃষ্টক্রমেই কৌরব বর্দ্ধিত হইতেছে; অদৃষ্টক্রমেই আপনার শত্রুগণ দুস্তর বিপদে পতিত হইল। পাণ্ডুনন্দনগণ দুর্ব্বাসার ক্রোধ বহ্নিতে পতিত হইয়া মহাপাপগ্রস্ত হইয়া বিনষ্ট হইবে। দুর্য্যোধনেরা প্রীতমনা হইয়া হাসিতে হাসিতে নিজ নিজ নিকেতনে গমন করিলেন।

দ্রৌপদীর পাক ভাণ্ড। বনগমন করার পর দ্রৌপদী ঋষিগণের পরামর্শ অনুসারে সূর্য্যের আরাধনা করিলেন। প্রার্থনা করিলেন যেন তিনি অতিথি ও আশ্রিতবর্গকে যথাসময়ে খাওয়াইতে পারেন। সূর্য্যদেব উপাসনায় প্রীত হইয়া দ্রৌপদীকে বরস্বরূপ এক তাম্রময় ভাণ্ড দিয়া বলিলেন—অন্নাদি রন্ধন করিবার পর যতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি নিজে ভক্ষণ না করিবে ততক্ষণ এই পাত্রে অপূর্ণ থাকিবে না। দ্রৌপদী অভ্যাগতগণকে ও পাণ্ডুপুত্রগণকে ভোজন করাইয়া রাত্রে নিজে ভোজন করিয়া বিশ্রাম করিতে যাইতেন। পাকপাত্র তখন শূন্য থাকিত।

পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী আহারাদি করিয়া যখন বিশ্রাম করিতে যাইতেছেন তখন শিষ্য দুর্ব্বাসার আবির্ভাব। রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণসহ বীর প্রকৃতিসুলভ সৌজন্যের সহিত ঋষির অর্চ্চনা করিয়া তাহাকে আতিথ্য গ্রহণ করিতে আমন্ত্রণ করিলেন। ঋষি স্বীকার করিয়া নদীতে সান্ধ্যাহ্নিক করিতে গমন করিলেন।

দ্রৌপদীর উপর সশিষ্য ঋষির আহারাদি ব্যবস্থা করিবার ভার পড়িল। তাহার মুখ শুকাইল। দেখিলেন ভাণ্ড অপূর্ণ। এখন কোনও ব্যবস্থা করা যায় না যাহাতে অতগুলি লোককে খাওয়ান যায়।

এই বিপদে দ্রৌপদী অন্য উপায় না দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিলেন; তাহার স্তব করিলেন:

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো দেবকীনন্দনাব্যয়।
বাসুদেব জগন্নাথ প্রপন্নার্ত্তিনাশনঃ।
বিশ্বাত্মন বিশ্বজনক বিশ্বহর্ত্তঃ প্রভোঽব্যয়ঃ।
প্রপন্নপাল গোপাল প্রলয়াপাল পরাৎপর।

* * * *

সর্ব্বাধ্যক্ষ পরাধ্যক্ষ স্বাময়ংশরণংগতা।
পাহি মাং কৃপয়া দেব শরণাগত বৎসল।

দ্রৌপদীদ্বারা এইরূপে স্তুত হইয়া ভক্তবৎসল, অচিন্ত্যগতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত হইলেন।

দ্রৌপদী পরমানন্দে বাসুদেবকে নমস্কার করিয়া মুনির আগমন বৃত্তান্ত বলিলেন।

কৃষ্ণ বলিলেন—আমি অত্যন্ত শ্রান্ত ও ক্ষুধিত শীঘ্র আমাকে ভোজন করাও। পরে অন্যকথা হইবে।

দ্রৌপদী বলিলেন—

স্থাল্যাং তাম্রময়ত্যাং মে ভোজনাবধি।
ভুক্তবত্যাময়ং দেব তস্মাদন্নং ন বিদ্যতে।

তাম্র রচিত স্থালীতে আমার ভোজন পর্য্যন্ত অন্ন থাকে। আমি ভোজন করিয়াছি, সুতরাং আর অন্ন নাই।

কৃষ্ণ বলিলেন—তোমার কথা রাখ আমাকে শীঘ্র ভোজন করাও। স্থালী আনয়ন কর। স্থালী আনয়ন করাইয়া কৃষ্ণ উহার কণ্ঠসংলগ্ন সামান্য শাকান্ন গ্রহণ করিয়া ভোজন করিয়া বলিলেন।

বিশ্বাত্মা প্রীয়তাং দেবস্তৃপ্তাস্ত্বিতি বদত্যুত।

যে বিশ্বাত্মা যজ্ঞভুক দেব প্রীত হও ও তুষ্ট হও। তন্নিমিত্ত তুষ্ট জগৎ তুষ্ট।

কৃষ্ণ ভীমসেনকে বলিলেন—শীঘ্র মুনিগণকে আহারার্থ আনয়ন কর।

এদিকে দুর্ব্বাসার সঙ্গী মুনিগণ স্নান করিয়া তীরে উঠিয়া নিজদিগকে অত্যন্ত আহার তৃপ্ত অনুভব করিলেন। দুর্ব্বাসাকে বলিলেন—আমাদের আর কিছু খাওয়া অসম্ভব। দুর্ব্বাসা বলিলেন—রাজাকে বিনা আহার প্রস্তুত করাইয়া ভোজন না করিলে অপরাধ হইবে। পাণ্ডবরা বীর, কৃতবিদ্য, ব্রত ও তপস্যাপরায়ণ, সদাচাররত ও বাসুদেব পরায়ণ। অম্বরীষের কথা স্মরণ করিয়া আমার হরিপদাম্ভোরুহকারী মন সকল হইতে ভয় হইতেছে। অতএব ক্রুদ্ধ পাণ্ডবেরা যাহাতে তোমাদিগকে তৃণ-রাশির মত ভস্ম না করে, তাহাদিগের সহিত দেখা হইবার পূর্ব্বেই তোমরা পলায়ন কর। গুরু ও শিষ্যগণ সকলেই দ্রুত পলায়ন করিলেন।

কৃষ্ণ এইরূপে পাণ্ডবদিগের রক্ষা বিধান করিলেন।

যুগ-গুরু শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

আমি চেয়েছি, আমি নিয়েছি শরণ তোমারি
তুমি প্রিয়, করুণা-নিদান—
(যেথা) জীবন-জলধি-জলে ভাবের তরণী চলে
পার হ'য়ে প্রাণের তুফান।
দেখা তুমি দেবে না কি বিদ্যুৎ-চপল,
কুসুমিত হ'বে না কি মরমেরি শতদল,
কোন্ সে অতল তলে, প্রেমের মাণিক জলে
খুঁজে ফেরে আকুল পরাণ!
অরূপ-রতন-আশা বুকে যে বেঁধেছে বাসা
কভু যদি মেলে সন্ধান!
(ঐ) যুগ যুগ সঞ্চিত সাধনার সৌরভ
বয়ে আনে উচ্ছল তব জয়-গৌরব,
জাগে তাই তমোনাশি' অন্তর পরকাশি'
নিতি নব চেতনার বাণ।

হৃদয়-যমুনা-তীরে বাঁশরী বাজিল কি রে
মন-তরী বহিল উজান!
আকাশে বাতাসে জাগে আনন্দ-হিল্লোল,
শয়নে স্বপনে যেন শুনি তার কল্লোল,
আমার এ হিয়াখানি তোমার চরণে আনি'
করি না যতই কেন দান—
(চাই) আরো প্রেম আরো আলো তোমার স্বপন ঢালো
তোমার ও জ্যোতি অম্লান!
জীবনে মরণে যেন ও চরণে দিও ঠাঁই—
তোমার পরশ পেলে সব চাওয়া ভুলে যাই—
অনম অনম চাহি' নীলিমায় অবগাহি'
দিতে ঢালি' যত আছে প্রাণ—
(মোর) তনু মন ব'য়ে যাক প্রীতিভরা নির্ঝাক
যুগ-গুরু-শরণ-নিধান।

পেরেক-মার্চ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

—তিন—

টাকা মাঠের ভেতরে লাল-শাদা রঙের বাড়িটা। যেন কোনো মরা গোরুর রক্ত রঞ্জিত অস্থিকার পঞ্জর রোদে ছড়িয়ে পড়ে আছে।

পাহাড়ের মতো উঁচু ডাঙার ওপর থেকে ওই রকমই দেখায় বটে। কিন্তু কাছে এগিয়ে এলে ওই বাড়িটার মূর্তি একেবারে বদলে যাবে। দেখা যাবে, বাড়িটা একটা আকস্মিক নিঃসঙ্গতা নয়—তার সাত মহলায়, বারী দৌবারিকে, পিলখানা আর গ্যারাজে, ঠাকুর-বাড়ি আর বাই-নাচের রংমহলে একেবারে জমজমাট। দেউড়ির বারোয়ান সিদ্ধি ঘুঁটতে ঘুঁটতে রামলীলার গান গায়—অন্তঃপুর থেকে চড়া গলার রেডিয়োতে গানের চীৎকার আসে।

লোক-লস্কর, আমলায় পেয়াদায় দস্তুরমতো রাজকীয় কারবার। মহাল নেহাৎ ছোট নয়, প্রায় সাট হাজার টাকার জমিদারী। আগে আরো ছিল, কিন্তু মদিরা এবং মদিরাক্ষীদের অনুগ্রহে তার অনেকটাই বেহাত হয়ে গেছে। জমিদার ভৈরবেন্দ্র নারায়ণ অবশ্য পিতৃপুরুষদের এই দুর্বলতার ইতিহাসটুকুকে স্বীকার করে নিতে রাজী নন। গোঁফে চাড়া দিয়ে বলেন, এক সময় দশ লাখ টাকার সম্পত্তি ছিল আমাদের। কান্তনগরের যুদ্ধে দিনাজপুরের মহারাজার সঙ্গে যোগ দিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি আমরা।

—সে সম্পত্তি গেল কোথায়?—কোনো কোনো চাটুকার হয়তো মুগ্ধকণ্ঠে জানতে চায়।

—আরে, সে দেবীসিংহের আমলে। শোনা কথাকে ইতিহাসের গাম্ভীর্য দিয়ে তার ওপরে রং বুলোতে থাকেন কুমার ভৈরবেন্দ্র, সংক্ষেপে ভৈরবনারায়ণ: দেবীসিংহ হল এ এস্টেটের ইজারাদার। জমিদারদের তখন যেমন লাঠির জোর, তেমনি টাকার তাকৎ—কথায় কথায় হাতে মাথা কেটে আনে। দেবসিংহ দেখল—এদের অস্ত্র না করলে আর চলছে না। কিস্তির টাকা এমনি চড়িয়ে দিলে সে তা দিতে দিতেই অনেকের জমিদারী সরকারী লাটে চড়ল। নইলে—হুঁ:—হঠাৎ ভৈরবনারায়ণ নাকের ওপরে বসা মাছিটাকে হিংস্রভাবে থাবা দিয়ে ধরতে চেষ্টা করেন: নইলে এতকাল কি আর ইংরেজে রাজ্যিশাসন করত। করতাম আমরা—আমরা।—মাছিটাকে ধরতে না পেরে উত্তেজিতভাবে একটা থাবড়া কষিয়ে দেন নিজেরই পেটের ওপরে।

সুতরাং শরীরে আপাততঃ আফিঙের জড়তা থাকলেও মনে জেগে আছে প্রচণ্ড ক্ষাত্র তেজ। গীতা শুনতে শুনতে কখনো কখনো তেতে উঠে কোমরের আলগা কষি দুটোকে বাঁধতে চেষ্টা করেন সজোরে, মনে হয় এক্ষুণি বুঝি যুদ্ধে চললেন। কিন্তু তা করেন না। হাত বাড়িয়ে গাণ্ডীবের বদলে ফরসীর নল টেনে নেন, তারপরেই তাঁর পাকযন্ত্র বাজতে থাকে—মানে সারা বাড়ির লোক ভৈরবনারায়ণের ভৈরব নাসিকা নিনাদ শুনতে পায়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ একটা হয় বটে, কিন্তু সেটা মাছিদের মধ্যে; কৌরবরাজ্য অধিকার করবার জন্যে নয়—তাঁর নাসিকাগ্র দখল করবার সুমহান্ অনুপ্রেরণায়।

তবুও বেশ বড় জমিদার। বাইরে প্রচুর নাম-ডাক আছে। এই জমিদারীর এলাকাতেই গোটা কয়েক বড় বড় বিল রয়েছে—অগ্রহায়ণ থেকে বুনো হাঁসের মচ্ছব পড়ে যায় সেখানে। কুমার ভৈরবনারায়ণ বৈষ্ণব, তাঁর বিলে কারও পাখি শিকার করবার নিয়ম নেই। কিন্তু নিয়ম নেই বলেই তার ব্যতিক্রম আছে। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব প্রতি বছরই শিকারের জন্য এখানে এসে তাঁবু পাতেন, কখনো কখনো আসেন ডিভিশন্যাল কমিশনার—বছর পাঁচেক আগে লাট সাহেবও একবার এসেছিলেন। লাট-সাহেব আবির্ভাবের সেই স্মরণীয় দিনটির কথা যখনই মনে পড়ে, সেই মুহূর্তেই বীররসোদ্দীপ্ত কুমার ভৈরবনারায়ণের হৃদয় হঠাৎ ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে যায়। কৌন্তেয় আর

সামনে কুরু-সৈন্য দেখতে পান না। যেন সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ করতে থাকেন।

—আহা—অমন সাহেব আর হয় না।

—খুব ভাল সাহেব বুঝি?—মুখ চাটুকার মুহুতর কণ্ঠে জানতে চায় হাজার বার শোনা সেই পুরোনো গল্পের পুনরাবৃত্তি—রোমাঞ্চিত হতে চায় সাহেবের প্রায় অলৌকিক অপূর্ব চরিত গাথা শ্রবণ করে।

—ভালো মানে?—কোমরের কষি আঁটতে আঁটতে আবার উঠে পড়েন ভৈরবনারায়ণ: একেবারে খাসবিলিতী জিনিস তো! একদম ভেজাল নেই কোথাও। কী লম্বা চওড়া আর লাল টকটকে চেহারা! কথা তো বলে না—যেন ঠুঁটের ভারে দাঁড়ের মতো গাক গাক করে ওঠে। আর খাওয়া! একাই একখানা মেড়সেরী খাসির রাং নেবে দিলে। হ্যাঁ—একেবারে জাত-সাহেব, অমন লাট দেখলেও পুণ্যি হয়।

চাটুকারের স্বরে মুহুতা এবার উচ্ছ্বাস হয়ে গলে পড়ে: তা যা বলেছেন।

—এখনো সব বলাম কই!—কথার মাঝখানে বাধা পড়ায় চটে ওঠেন কুমার বাহাদুর: তুমি তো বড্ড ঘ্যাচ্ ঘ্যাচ্ করো হে। ভারী বাধা দাও।

চাটুকার কাঁচু মাচু মুখ করে বসে থাকে।

—হ্যাঁ, যা বলছিলাম।—সভা শাসন করে আবার শুরু করেন ভৈরবনারায়ণ: তখন বাবা বেঁচে। লাটসায়েব বাবার পিঠ থাবড়ে দিয়ে বলেছিল, ইউ আর এ ভেরি লয়্যাল্ সার্ভেন্ট। বাবা আবার এক থলি সিনি দিয়ে ওঁকে প্রণাম করেছিলেন কিনা!

চাটুকার আবার কী যেন বলবার জন্যে মুখ খোলে, কিন্তু কুমার বাহাদুরের একটা রুদ্র দৃষ্টি তার ওপর এসে পড়তে কেমন থেমে যায় থমত খেয়ে। যে শব্দটা প্রায় ঠোঁটের সামনে এসে পৌঁছেছিল, অস্ফুট কৌশলে সামলে নেয় সেটাকে—খানিকটা হাওয়া আচম্‌কা গিলে খাওয়ার মতো কোঁৎ করে একটা শব্দ হয় গলায়।

আজও চায়ের আসরে তারই জের চলছিল।

এই সময়টাতেই একটু প্রকৃতিস্থ থাকেন কুমার বাহাদুর—আফিমের মৌতাতটা কিকে হয়ে আসে। নেশা ছেড়ে-যাওয়া শিরাগুলোর মধ্যে যে মন্থর অবসাদ ঘনিয়ে থাকে, তাকে সতেজ করে তোলবার জন্যেই যেন ভৈরবনারায়ণ এই সব গল্প শুরু করেন—হাজার বার বলা হিউমারের পুনরাবৃত্তি করে আবহাওয়াটাকে সজাগ করে রাখবার প্রয়াস পান।

একটুকরো কাটা পেঁপে চামচেতে তুলে নিয়ে বলেন, আমি একবার ঘোড়ায় চড়েছিলুম—বুঝলেন ঠাকুরবাবু!

স্বাভাবিক বিতৃষ্ণ অনুভূতির মধ্যেও গলার স্বরে কেমন করে যে একটা কৌতূহলের আমেজ এসে যায় সেটা রীতিমতো বিস্ময়কর। হঠাৎ কোথাও একটা আঘাত লাগলে তড়িৎগতি শারীরিক প্রতিক্রিয়ার মতো অজ্ঞানে দাঁড়িয়ে গেছে ব্যাপারটা। মাঝে মাঝে তার পাঞ্জা একটা হিন্দুস্থানীর কথা মনে পড়ে—লোকটা পুলিশের কন্‌স্টেবল ছিল এক সময়। 'পুলিশ সাহেব' শব্দটা কানে গেলেই যেখানে যে অবস্থাতেই সে থাক—ফিরে দাঁড়িয়ে খটাস্ করে সেলাম ঠুকত একটা।

সঙ্গে সঙ্গে চকিত হয়ে রঞ্জন বলে, তাই নাকি? বলুন—বলুন।

ভৈরবনারায়ণ চারদিকে তাকিয়ে নেন একবার। লক্ষ্য করেন সকলের চোখ তাঁর ওপর উদগ্র আর সজাগ হয়ে আছে কিনা—সকলের মুখে ফুটে উঠেছে কিনা অসহ্য কৌতূহল। তারপর শুরু করেন:

—বুঝলেন, বাবা সেবার মেকমর্গনের মেলা থেকে কিনে আনলেন এক ভুটানী ঘোড়া। যেমন তাকৎ, তেম্‌নি চাল। কিন্তু কে জানত ঘোড়াটার মাথা খারাপ। যেমনি চেপে বসেছি, অম্‌নি—সবাই এর মধ্যে হাসতে শুরু করেছে। যাদের কোনোমতেই হাসি পায়নি, তারা যে-কোনো একটা মারাত্মক হাসির কথা ভেবে নিয়ে অন্তত একটুকরো হাস্যরেখা ফোটাবার প্রাণান্তিক চেষ্টা পাচ্ছে ঠোঁটের আগায়। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, মানুষগুলো নিশ্চয় পাগল হয়ে গেছে। নইলে এমন সামান্য ব্যাপার নিয়ে এভাবে কেউ হাসির প্রতিযোগিতা চালাতে পারে এ একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা।

তবু কখনো কখনো যেন কেমন একটা সন্দেহ জাগে রঞ্জনের।

হঠাৎ মনে হয় কুমার বাহাদুর বড় বেশি ক্লান্ত—বড়

বেশি হতাশায় আচ্ছন্ন তাঁর মন। আফিংটা তাঁর আত্ম-রক্ষার একটা প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়—যেমন তীব্র যন্ত্রণার ওপর মর্ফিয়ার প্রলেপ। কিন্তু সে মর্ফিয়ার নেশা যখন কাটে তখন যেমন যন্ত্রণায় শরীরের নাড়ীগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে চায়, সেই রকম কুমার বাহাদুরও নেশার শেষে নিজের নিরুপায় নিরাশাকে আড়াল করতে চান ওই পুরোনো রসিকতার ঘুড়্‌ঘুড়ি বুলিয়ে। যেটাকে তাঁর হাস্যভরা মুখ মনে হয়, আসলে সেটা হয়তো মুখোস মাত্র।

কিন্তু কেন এমন হয়?

পচন ধরেছে নিজের মধ্যে? বহুকাল ধরে মানুষের গড়ে তোলা কীর্তিস্তম্ভে ফাটল ধরেছে কি প্রাকৃতিক নিয়মেরই অনুসরণে? কালের ঝোড়ো হাওয়ায় ক্ষয়ে যাচ্ছে উত্তুঙ্গ গ্র্যানাইটের শিলাস্তর? হঠাৎ কি টের পাচ্ছেন পায়ের নীচের মাটিটা আসলে চোরাবালি—এতদিন পরে দরতে শুরু করেছে একটু একটু করে? কিংবা যে আসনটিকে এতকাল তাঁরা রাজত্ব করবার জন্যে নিশ্চিন্ত ময়ূরসিংহাসন বলে মনে করেছিলেন—দেখা যাচ্ছে সেটা কোনো সুপ্ত আগ্নেয়গিরির ক্রেটার—এতদিন পরে ধুঁইয়ে উঠেছে কোনো ভৈরব-মন্ত্র সংকেতে?

অথবা এসব কিছুই না—সবটাই তার নিছক ভাব-বিলাস? নিজের দৃষ্টির রং দিয়ে ফুলবুদ্ধি একটা আফিংখোর মাংসপিণ্ডকে মননময় করে তোলা?

ভাববার সময় পাওয়া যায়না—ইতিমধ্যে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে ফেলেছেন কুমার বাহাদুর। আরম্ভ করেছেন আর একটি চাঞ্চল্যকর বিষয়বস্তু: আপনারা কেউ ভূত দেখেছেন?

—ভূত!

—হ্যাঁ-হ্যাঁ।—গাল নাচিয়ে নাচিয়ে হাসেন ভৈরব-নারায়ণ: জিন, প্রেত, কঙ্ককাটা, এইসব। ঠাকুরবাবু, আপনিও কি কিছু দেখেননি?

এক মুহূর্তে রঞ্জনের মনে আসে তার ছেলেবেলার দেশকর্মী অবিনাশবাবুর মৃতি। আত্রাইয়ের বানে রিলিফ করতে গিয়ে প্রাণ দেন। তবু ডাহুক-ডাকা এক কালীসন্ধ্যেবেলায় রঞ্জন তাঁর অদৃশ্য গলার ডাক শুনে মন্ত্র-মুগ্ধের মত কোথায় যেন চলে গিয়েছিল। জীবনে সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা!

কিন্তু এই ফুলতার আদরে সে বেদনা-রোমাঞ্চিত স্মৃতিটাকে উদ্ঘাটন করতে তার ইচ্ছে হয় না। মাথা নেড়ে বলে, না, আমি কিছু দেখিনি।

—কিছুই না?

—না—আরো সংক্ষেপে জবাব দিয়ে মুক্তি পেতে চায় রঞ্জন।

—তা হলে আমি জিতেছি আপনার চাইতে—ভৈরব-নারায়ণের চোখে মুখে এবার সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে পরম আন্তরিক একটি আত্মপ্রসাদ: হুঁ-হুঁ—এবারে হারিয়েছি আপনাকে।

গীতা-পড়ুয়া পণ্ডিতকে হারানোটা গৌরবের ব্যাপার নিশ্চয়। রঞ্জনের মন চায়না কুমার বাহাদুরের সে গর্বটাকে খর্ব করতে। প্রসন্নমুখে বলে, বেশ তো, বলুন।

তখন কুমারবাহাদুর কোনো এক চণ্ডাতলার মাঠে নিশীথ রাত্রে দেখা ভূতের গল্প আরম্ভ করে দেন। ছুটছুটে ওরা জ্যোৎস্নায় নির্জন মাঠে সে পকাশ হাত লম্বা দুখানি বাহু প্রসারিত করে দাঁড়িয়েছিল—আর সেই সঙ্গে কী যেন খুঁজে ফিরছিল অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে। রসান দিয়ে কুমার বাহাদুর বলেন: তার আঙুলের নোখ্‌গুলো যেন জ্বলে জ্বলে উঠছিল এক একটা ধারালো ছোরার মতো—

হাসির গল্প, ভূতের গল্প, আফিং। সমস্ত শরীরটা সঙ্গতি আর শৃঙ্খলাহীন একটা বিসদৃশ মাংসপিণ্ড। কানের কাছে প্রতিদিন গীতাপাঠের দুঃসহ অভিনয়। বিচিত্র! একটা অদ্ভুত অসঙ্গতির জগতে যেন কৃত্রিম উপায়ে লোকটা বেঁচে আছে—যেমন করে মৃত্যুমুখী মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে অক্সিজেন টিউবের সহায়তায়!

কিন্তু রক্তে রক্তে রক্তবীজেরা মরেও ফুরোয় না। দেবীসিংহের সাধ্য কি তাদের বিনাশ ঘটায়! আজও স্বাভাবিক নিয়মে সবটা চলতে চলতে হঠাৎ আলোচনাটা বাঁক নিলে একটা।

কথাটা বলে বসলেন রাজা সূর্যনারায়ণ দাতব্য চিকিৎসা-লয়ের ডাক্তার পান্নালাল মণ্ডল। সাইনবোর্ডে তিনি নিজের নামের পাশে বসিয়েছেন—এল্-এম্-এফ্, ব্র্যাকেটে 'পি'।

'পি' মানে প্রফেসর—একথা তিনি নিজে বুঝিয়ে না দিলে কারুই বোঝবার উপায় নেই—বরং কোনো একটা বাড়তি উপাধি মনে করে তারা আরো বেশি প্রকাম্পিত হয়ে ওঠে।

ভৈরবনারায়ণ একটা চাই তুলসে দশবার তুড়ি দেন ডাক্তার পাঁচালাল মজুমদার এল-এম্-এফ্ ব্র্যাকেটে 'পি'। আজ কিন্তু তিনিই হুসড়ম্ করলেন।

—একটা খবর শুনে এলাম হুজুর।

কুমার বাহাদুর তখন সবে তাঁর ভয়ঙ্কর ভূতের গল্পটা শেষ করে ভীষণ ভঙ্গিতে তাঁর শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে আছেন, দেখতে চাইছেন ভয়ে তাদের কারুর গা দিয়ে ঘাম ছুটছে কিনা। এমন সময় ডাক্তারের এই অবান্তর কথাটায় তিনি ভ্রূকুটি করলেন।

ডাক্তার ঘাবড়ালেন না। কারণ খবরটা জরুরি। এতক্ষণ ধরে বলবার জন্যে তাঁর জিভ নিস্‌পিস্ করছিল, কিন্তু ভৈরবনারায়ণের গল্প বলবার তোড়ে বিভ্রান্ত হয়ে তিনি আর কোনোখানে সুবিধেমতো একটা ফাঁক খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

—তুরীদের একটা পঞ্চায়েত বসেছিল কালাপুখুরিতে।

—কালাপুখুরিতে তুরীদের পঞ্চায়েত!—এবারেও ভৈরবনারায়ণ ভ্রূকুটি করলেন, কিন্তু তার জাত আলাদা। এতক্ষণ ধরে চাঁপির মধ্যে যে সাপটা আক্ষিকের নেশায় ঝিমুচ্ছিল, সে হঠাৎ খোঁচা খেয়ে ফোঁস্ করে উঠল।

—ব্যাটারা ভয়ঙ্কর পাজী—চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন ভৈরব নারায়ণ: পঞ্চায়েতে বসলেই একটা না একটা কুমতলব বার করে ছাড়বে। কয়েকটাকে ফিলাম—বি-এল্ কেসের আসামী করে ফাঁসিয়ে, তবু ধরি একটু হুঁশিয়ার হয় ব্যাটারা। ওদের মাপাগুলো আবার বড় হয়ে উঠেছে দেখছি, ভালো করে ছাঁটাই করতে হবে আর একবার।—চিবিয়ে চিবিয়ে হিংস্র স্বগতোক্তিটা শেষ করে জানতে চাইলেন: কিন্তু পঞ্চায়েত কেন?

—কামারহাটির ডাঁড়ার জন্যে।

—বটে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওরা ঠিক করেছে, তিন চারশো মানুষ কোদাল ধরে এবার ডাঁড়ার মুখ বন্ধ করে দেবে—ওদিক দিয়ে আর জল বেরুতে দেবেনা।

—বটে—বটে। কুমারবাহাদুরের স্বরে মর্মঘাতী ব্যঙ্গের আভাস ফুটে বেরুল: হঠাৎ এ রকম সাধু সংকল্প কেন তাদের?

—সে তো তারা হুজুরে জানিয়েছে।

—হুঁ!—কয়েক মুহূর্ত গম্ভীর হয়ে থেকে ভৈরবনারায়ণ বললেন, কারণটা আমি শুনেছি। ওরা বলে বানের জল ওই ডাঁড়ার মুখ দিয়েই আজকাল বেরিয়ে যায়, ফলে ওদের ফসলী জমি ডুবে যায়।

—আজ্ঞে তা নেহাৎ অন্যায় বলে না—সাহসে ভর করে পোস্টমাস্টার বিভূপদ হাজরা জানালো। কালাপুখুরির দিকে তার নিজেরও কিছু ধানী আছে, তাই ক্ষতিটা তার গায়ে লাগছিল।

—আরে রাখো ওসব বাজে কথা—কুমারবাহাদুর চটে উঠলেন: দু-চার কাঠা ধানী জমি ডুবলেও ডুবতে পারে, সেটা এমন মারাত্মক ব্যাপার নয়। কিন্তু আমার ক্ষতি কী রকম, সে জানো? ওই ডাঁড়া দিয়ে জল না নামলে আমার ফিরিঙ্গিপুর আর হাঁসমারীর বিল শুকবেনা—বছরে তিন হাজার টাকার জলকর বেমালুম বরবাদ। অমন বাজে আবদার করলে আমি শুনবনা—ঠেঙিয়ে ঠাণ্ডা করে দেব—সংকল্পে ভয়াল শোনালো তাঁর গলা।

—কিন্তু ওরা তো বলে তিন চার কাঠা-জল, প্রায় তিন হাজার বিঘে জমির ফসল ওই ডাঁড়ার জলে নষ্ট হয়।—আবার দীনতম প্রতিবাদ ঘোষণা করল বিভূপদ।

—তার মানে? তাহলে কি তুমিই ওদের ভাতিয়ে তুলছ?—মুহূর্তে, সমস্ত চক্ষুলজ্জার আড়ালটা সরিয়ে দিয়ে স্পষ্ট গলায় সরল প্রশ্ন করলেন ভৈরবনারায়ণ।

বিভূপদ এক মুহূর্তে মাটিতে মিশিয়ে গেল। ছেলে সাপের মতো একটু একটু আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করছিল, এবারে যেন কেন্দ্রো হয়ে গুটিয়ে গেল নিজের চারপাশে।

—ছিঃ ছিঃ—এটা কী করে বললেন হুজুর। এমন বেয়াদবী আমি কখনো ভাবতে পারি?

—কী জানি, কিছুই বলা যায় না—কুমারবাহাদুর হঠাৎ বিচিত্রভাবে দৃষ্টিটা রঞ্জনের নির্বাক মুখের ওপর দিয়ে বুলিয়ে নিলেন। আর তখনি রঞ্জন বুঝতে পারল। আসলে বিভূপদ তাঁর উপলক্ষ্য, তাঁর লক্ষ্যটা একান্ত করে রঞ্জনের দিকে।

আফিংয়ের নেশায় ঝিমন্ত চোখ যে নিছক একটা ভাণ মাত্র—এটা কে বুঝতে পেরেছিল!

একবারের জন্যে বুকের ভেতরটা দোলা খেয়ে উঠে পরক্ষণেই স্থির হয়ে গেল তার। জানাজানি যখন হয়েই গেছে, তখন আর আত্মগোপনের চেষ্টা করে লাভ কী। পরশু কুমারবাহাদুর জয়গড়ের ব্যাপার নিয়ে একটা নিরাসক্ত মন্তব্য করেছেন, আজও বিভূপদকে সাবধান করে দিতে গিয়ে তার দিকে হয়তো বা বিনাকারণেই দৃষ্টিক্ষেপ করলেন একটা। কিন্তু অনেক বলার চাইতে এই না বলা দৃষ্টির সংকেত অনেক বড় ঝড়ের প্রতীক্ষা করতে থাকে, রঞ্জনের জীবনে এ অভিজ্ঞতা নেহাৎ কম হয়নি।

তবু যখন কুমারবাহাদুর একটা ছলনার মুখোস টেনে রেখেছেন, তখন নিজেকেও সে সুস্পষ্ট করে ধরা দিল না। পরস্পরের ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়বার আগে আরো কিছুক্ষণ ধরে না হয় চলুক না মৈত্রীর ছদ্ম-অভিনয়। বাঁ হাতে ছোরা লুকিয়ে ডান হাতে করমর্দনের পর্ব।

রঞ্জন মাথা নাড়ল। কুমারবাহাদুরের দৃষ্টির উত্তরে মাথা নেড়ে জবাব দিলে, ঠিক।

আলোচনাটা আবার হয়তো শুরু হত পূর্বোদ্যমে। একটা বক্সিং রিংয়ের ভেতর পরস্পরকে আঘাত করবার আগে আরো খানিকক্ষণ সন্তর্পণ পদচারণা। কিন্তু ছেদ পড়ল হঠাৎ।

একজন হিন্দুস্থানী পাইক প্রবেশ করল ঝড়ের বেগে।

—হুজুর, ঘটাধর সিং খুন হো গিয়া!

—কেয়া!—চবির প্রকাণ্ড পিণ্ডটা লাফিয়ে উঠল একটা টেনিস বলের মতো: কেইসে খুন হুয়া? কোন্ খুন কিয়া?

—মালুম হোতা কি ই গোয়াল আদ্‌মীকে কাম হ্যায়। সব একদম চুপ্ চুপ্ কর্‌কে জঙ্গল মে মুর্দা ফেক্ দিয়া—

—কাঁহা মুর্দা?—ভৈরবনারায়ণ গর্জন করলেন।

—লে আয়া—দেখিয়ে আপ—রুদ্ধ স্বরে জবাব দিলে পাইকটা।

—চলো—ভৈরবনারায়ণ উঠে দাঁড়ালেন। এখনো মৌতাতের আফিং খানিনি, চোখ দুটো বাঘের মতো কপিশ আলোয় জ্বল জ্বল করে উঠছে তাঁর।

(ক্রমশ)

বৈশাখী পূর্ণিমা

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

আহ্বান যাঁরে করিল আদরে সোনার সিংহাসন,
প্রিয়া যাঁরে বাঁধি বাহু-লতিকায় শোনাল প্রেমের গান,
নবীন বয়সে তুচ্ছ করিয়া সে কামিনী-কাঞ্চন
দীন ভিখারীর জীর্ণ বসন করিল যে পরিধান
ব্যর্থ কি আজি সেই বুদ্ধের মানব-মৈত্রী-বাণী?
ভারত তাঁহারে ভুলিয়া শুধুই করিবে কি হানাহানি?

চণ্ড অশোক শোণিত-সিন্ধু করিয়া সন্তরণ
হিংসা ছাড়িয়া লভিয়া স্নিগ্ধ চরণাশ্রয় যাঁর
করুণ নয়নে চাহিয়া নিমিষে জিনিল বিশ্ব-মন,
মিথ্যা কি হবে ভারতের বুকে প্রেমের বার্তা তাঁর?
জ্বলিতেছে আজ ছলনা-কুটিল লোভের বহ্নি-শিখা,
পাপ-ইন্ধন পরাবে কি তারে কালিমার জয়-টীকা?

বরষে বরষে আসে ফিরে ফিরে বৈশাখী পূর্ণিমা।
জানাইতে আসে ধরণী-দুলারে বুদ্ধ-জন্ম-তিথি
হসিত চাঁদের ললিত-মাধুরী ছড়ায়ে গগন-সীমা।
ব্যর্থ কি সেই মহা-মানবের অমর সাম্য-গীতি?
হিংসা-হরণ শাক্য-সিংহ আনিল যে নির্বাণ
হবে না কি আজি সিকনে তার দুঃখের অবসান?

পাট ও পাঠ

ছায়া-ছবির মাসকাবারী

শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল

জাতীয় শিল্প-পঞ্জীতে চলচ্চিত্রের স্থান :

মাসিক-সাহিত্যের মাধ্যমে, অন্যান্য শিল্পকলার সঙ্গে চলচ্চিত্র শিল্পের আলাপ-আলোচনার সার্থকতা আজ আর উপেক্ষা করা চলে না। চলচ্চিত্র এবং বেতারের প্রভাব আজ সমস্তরের জাতীয় জীবনে অনস্বীকার্য। নির্বাক যুগকে চলচ্চিত্রের প্রাথমিক বা হাতে-খড়ির যুগ বলা যায়। কথক-ছবির অভ্যুদয়ের পর থেকে গত বিশ বৎসরে, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ভারতীয় চিত্র-শিল্পকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার প্রচেষ্টা লক্ষ্যনন্দিত হয়েছে। যে দুরন্ত প্রাণ-প্রবাহে আজ ভারতীয় কথক-ছবি এগিয়ে চলেছে অগ্রগতির পথে—সে গতিকে রোধ করবার শক্তি কারু নেই।

মূলতঃ আনন্দ-পরিবেশনের বাহন-হিসাবেই মুখর ছবির সার্থকতা। এর বিপুল জনপ্রিয়তার মূলেও আছে সেই আনন্দ-পরিবেশন-যোগ্যতা। নিছক শিক্ষা-বিস্তার, গঠন-মূলক প্রচার-কার্য বা 'ডকুমেণ্টারী' উদ্দেশ্য প্রণোদিত ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষায় চলচ্চিত্রের যোগ্যতা প্রতিপন্ন হলেও, তার ব্যাপক প্রসার ও জনপ্রিয়তা উপরোক্ত কারণেই সম্ভবপর হয়েছে। এর ফলে যে ব্যবসাগত সাফল্য —চিত্র-শিল্পের ভিত্তিকে দৃঢ়তর করে তুলতে সেই সাফল্যই হয়েছে একমাত্র সহায়।

ভারতের প্রধান পাঁচটি Productive industry-র মধ্যে চিত্র-শিল্প অন্যতম, এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় হলিউডের পরেই ভারতের স্থান। আমেরিকায় প্রতি বৎসর গড়পড়তা ৫৫০ থেকে ৫০০খানা ছবি তৈরী হয়, ব্রিটেনে হয় ৫০ থেকে মাত্র ৬০খানা। ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর ২৫০ থেকে ২৮০ খানা চলচ্চিত্র জন্মলাভ করে।

হলিউডে ১৬০টি "সাউণ্ড-ষ্টেজ" সমন্বিত স্টুডিওর সংখ্যা ২২টি; ইংলণ্ডে ৭৪টি 'সাউণ্ড-ষ্টেজ'যুক্ত স্টুডিও আছে ২৪টি; সারা ভারতে স্টুডিওর সংখ্যা বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৬০টি এবং 'সাউণ্ড-ষ্টেজ'-এর সংখ্যা হচ্ছে ১২০টি।

আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে চলচ্চিত্র প্রযোজকের সংখ্যা যথাক্রমে ১৫০ ও ৭০জন; ভারতবর্ষে ফিল্ম-নির্মাতার সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৩৮০জন।

হলিউড মাত্র একখানি চিত্র গঠনের জন্য ৩০ থেকে ৫০ লাখ টাকা খরচা করেন। ভারতে গড়পড়তা খরচা হয় ৪ থেকে ৫ লাখ টাকা। হলিউড এবং ব্রিটেনে—এঁদের ছবি World market পান বলেই একখানি ফিল্মে এত অর্থ ব্যয় সম্ভব হয়। Over-seas মার্কেট দখল করতে ভারতের চিত্র-শিল্প এখনও সচেতনার পরিচয় দেয় নি।

সরকারী সাহায্য ত' দূরে থাক, বিপুলভাবে ট্যাক্সভারে পীড়িত হয়েও, ভারতের চিত্র-শিল্প যে আজ প্রধান পাঁচটি Industry-র মধ্যে তার স্থান অধিকার করে আছে—এটা কম যোগ্যতা বা গৌরবের কথা নয়।

সরকারী একাধিপত্য ও বাধ্যতামূলক ছবি :

ভারতীয় 'ডকুমেণ্টারী' এবং নিউজরীল্-প্রডাকসান একচেটিয়া করবার জন্য ভারতের জাতীয় সরকার যে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা চালু করেছেন, আমরা তা সমর্থন করি না। বাঙলা দেশের চলচ্চিত্র শিল্পের মুখপত্র "B. M. P. A. Journal" এই প্রসঙ্গে যা মন্তব্য করেছেন, সরকারী যথেচ্ছাচার-নীতির প্রতিবাদ-কল্পে তা বিশেষভাবে সমর্থন-যোগ্য। "close to the heel of recent enhancement of entertainment tax in several of the provinces, come another tax in a different garb—a tax in the shape of rentals against compulsory exhibition of documentaries and news-reels supplied through the Film Division of Government of India. The entire quota

of news-reels, 52 issues a year are to be covered by the Film Division itself……"

সরকারী কারখানা থেকে প্রস্তুত এই বাধ্যতামূলক ব্যবস্থায় যে সব ছবি প্রতি সপ্তাহে প্রদর্শন আরম্ভ হয়েছে, সেগুলি যে বিষয়বস্তুর আবেদনের দিক থেকে বা প্রডাকসন হিসাবে চিত্তাকর্ষক হয়নি—অন্তত এ অপবাদ কেউ দেবে না। কিন্তু এই ধরণের নিউজ-রীল বা ডকুমেণ্টারীর ক্ষেত্রটুকু সম্পূর্ণভাবে জাতীয় সরকার গ্রাস করলে, বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি ঘোরতর অবিচার করা হয়। ফিল্ম-শিল্পের তরফ থেকে প্রতিবাদের ফলে কোন সুবিচার আশা আপাতত সুদূরপরাহত। এই সেদিনও, আমোদ-করের সর্বভারতীয় প্রতিবাদ-কল্পে ভারতের সকল প্রদেশের ছবিঘরগুলি একদিন ছবি-প্রদর্শন বন্ধ করে রেখেছিলেন। গত ৩০শে জুনের সে প্রতিবাদ-দিবস যথাযথ পালিত হয়েছে, কিন্তু এখনও কোন প্রতিকারের আভাষ মাত্র পাওয়া যায় নি।

প্রবল কর-ভারের পীড়নে ছবিঘরগুলির সাপ্তাহিক আয় যথেষ্ট হ্রাস প্রাপ্ত হয়েছে এবং সর্বসাধারণের পক্ষে তা কতখানি ক্ষতিকর হয়েছে, ছবির দর্শকমাত্রেই তার সাক্ষ্য দেবেন।

আগষ্ট আন্দোলনে সেন্সার-ভীতি :

প্রকাশ যে গত আগষ্ট '৪২ আন্দোলনের নাটকীয় পট-ভূমিকায় তোলা একখানি চলচ্চিত্রের প্রদর্শন-সম্মতি দিতে বাঙলা সরকার—ফিল্ম সেন্সার বোর্ড অস্বীকার করায় এক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

ভারতের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে, ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচার-কলঙ্কিত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিতে বর্তমান কংগ্রেস সরকারের কুণ্ঠার কারণ কি থাকতে পারে, তা আমাদের বুদ্ধি ও বিচার-শক্তির অগম্য। সাহিত্যে, রঙ্গমঞ্চে, বেতারে এবং কলকাতা পুলিশ-অনুষ্ঠিত প্রকাশ্য [illegible]নীতে, স্বাধীনতা-যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ কত শহীদের জীবন-ধারা আলোচিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। "আগষ্ট '৪২"—বিপ্লব দমনে, শাসন ও ন্যায় বিচারের নামে যে পাশবিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার জন্যে বর্তমান জাতীয় গভর্ণমেণ্টের পুলিশ ও মিলিটারী বাহিনীর কলঙ্কভাগী হবার কথা নয়। বিদেশী শাসকের আদর্শে গড়া স্বদেশী পুলিশ, অতীতে যে অপরাধই করে থাকুক—সে অত্যাচারের কলঙ্ক এদের স্পর্শ করবে কেন?

ভারতের জনমত উপেক্ষা করে এই ধরণের উদ্দেশ্যমূলক ছবির প্রচার বন্ধ করে দেবার অধিকার প্রয়োগ করলে, তার ফলাফল কদাচ কল্যাণকর হবে না। আশা করি কর্তৃপক্ষের সুবুদ্ধি উদয়ের ফলে ইতিমধ্যে এই ছবিখানির উপর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে, তা প্রত্যাহৃত হবে।

জীবনী-চিত্রের সাফল্য :

এ বৎসরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ফিল্ম—স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বাশ্রম জীবনী অবলম্বনে রূপায়িত—"স্বামিজী"। অথচ গভীর লজ্জার কথা যে, ছবিখানিকে সেন্সার কর্তৃপক্ষ দীর্ঘকাল না-মঞ্জুর রেখে, শেষে বহু চেষ্টা-তদ্বিরের ফলে মাত্র 'স্বামিজী' নামে মুক্তির ছাড়-পত্র দান করেন। ছবির নাট্যাংশে বিবেকানন্দ বা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করবার সুযোগ থেকেও প্রযোজককে বঞ্চিত করা হয়। নিখিল ভারত সাংবাদিক সঙ্ঘের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয় সমস্ত সভ্যদের সঙ্গে একটি বিশেষ প্রদর্শনীতে এই ছবিখানি দেখে সরকারী বিচার-বুদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা করেন।

ছোট বড় নির্বিশেষে বাঙলার সকল সংবাদ-পত্রে 'স্বামিজী'র সমর্থনমূলক ও প্রশংসাপূর্ণ অভিমত প্রকাশিত হওয়ায় এই সত্যই প্রমাণিত হ'ল যে—প্রডিউসরের প্রচেষ্টা আশাতীতরূপে সাফল্য মণ্ডিত হয়েছে। এই কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দনযোগ্য—ছবির কাহিনীকার সুসাহিত্যিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ এবং প্রযোজক তথা পরিচালক, শ্রীঅমর মল্লিক।

সুখের কথা, 'স্বামিজী'র সাফল্য বাঙলা দেশের অন্যান্য প্রডিউসারদেরও জীবনী-চিত্রের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। মাইকেল মধুসূদন ও বিদ্যাসাগর—এঁদের ঘটনাবহুল জীবনী অবলম্বনে দুখানি ছবি গঠন করবার আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে বলেও জানা যায়।

'রামের সুমতি'-র আন্তর্জাতিক সম্মান :

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস ও গল্পগুলি ভারতীয় কথক-ছবিকে শুধু আভিজাত্য দান করেই ক্ষান্ত হয়নি—তার বিপুল ব্যবসাগত সাফল্য বর্ধনেও সহায় হয়েছে।

"রামের সুমতি"-র হিন্দি সংস্করণ বোম্বাই-এ যে সমাদর ও অভিনন্দন লাভ করেছে—তা কল্পনাতীত বললেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতের জাতীয় গভর্মেণ্ট এবং Indian Motion Picture Producers' Association এই ছবিখানিকে নির্বাচিত করেছেন, ক্যানেডার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে ভারতীয় চিত্র শিল্পের চরমোৎকর্ষতার প্রতীক হিসেবে।

স্বয়ংসিদ্ধার হিন্দি-সংস্করণ :

হিন্দি স্বয়ংসিদ্ধার অভাবনীয় সাফল্যও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বাঙলাদেশে এই ছবিখানির জনপ্রিয়তা ও ব্যবসাগত সাফল্যের কথা কে না জানেন!

যে নারী-চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে এই কাহিনীটি নাটকাকারে শাখা-পল্লবিত হয়েছে, মূলত তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই এই ছবিখানিকে এতখানি আকর্ষণীয় করে তুলেছে। বোম্বাইয়ের সুবিখ্যাত "Blitz" পত্রিকার চিত্রসম্পাদক এই প্রসঙ্গে যে মন্তব্যটি করেছেন, তা বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্য : "The indian screen has so far glorified generally the meek and submissive woman resigned to her fate, suffering in silence and rarely paid a tribute to a woman in revolt against the old order. But seldom has it tried to present a portrait of a woman who is militant but not modern, who refuses to submit to her fate who is at the same time religious, worshipper of the old tradition. And it is the best presentation of such a rare woman who combines Western education with Eastern outlook and philosophy that distinguishes I.N.A. Pictures' "Swayam Siddha" giving it dramatic strength and refreshing novelty.

কবি ও প্রতাপাদিত্য :

তারাশঙ্করের বিখ্যাত উপন্যাস 'কবি'-র চিত্ররূপদানে প্রবীণ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ পরিচালক শ্রীদেবকীকুমার বসু যে সূক্ষ্ম রসবোধ, শালীনতাজ্ঞান ও কলা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, তার তুলনা তাঁর অন্যান্য ছবিতে বিরল। দেবকীকুমারের পরিণত জীবনের স্মরণীয় দান হিসেবে এ ছবিখানি চিরভাস্বর অধিকার করে রইল।

বাঙলার শেষস্বাধীন নৃপতি প্রতাপাদিত্যের জীবনী অবলম্বনে একখানি চিত্রগঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে দেবকীবাবু শীঘ্রই নবউদ্যমে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবেন বলে প্রকাশ। আমরা তাঁর আগামী প্রচেষ্টার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

চিত্রাভিনয়ে সোসাইটি-আর্টিষ্ট :

'দেবী-চৌধুরাণী' ও 'স্বামী' চিত্রের নায়িকা, লাবণ্যময়ী সুমিত্রা দেবী, বোম্বাইয়ে শ্রীনীতীন বসুর পরিচালনায় একখানি ছবিতে অভিনয় করবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। তাঁর বোম্বাই যাত্রার দিনও সন্নিকট হয়ে এসেছে।

সোসাইটি-আর্টিস্টদের মধ্যে সুমিত্রাদেবী ও সুনন্দা দেবী, উভয়েই জনপ্রিয়তার দিক থেকে, তারকার সম্মানে সমাদৃতা। সাময়িক ভাবে আমরা একটি শিল্পীকে হারালেও, সুমিত্রাদেবী যে আবার বাঙলায় ফিরে আসবেন, এটা আশাকরা বোধ করি অসংগত নয়।

অভিজাত সমাজের আর একটি উচ্চশিক্ষিতা ও রূপবতী মহিলা সম্প্রতি চিত্রাভিনয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে বাঙলার একটি চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেছেন। এঁদের সম্ভ্রম বহুবত-উত্তীর্ণ, বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা'-চিত্রের অন্যতম নায়িকা-চরিত্রে এই তরুণীটি সম্প্রতি চিত্রাবতরণ করেছেন। ছবিখানির পরিচালনা করছেন, 'সংগ্রাম'-খ্যাত শ্রীঅর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়।

কপি-রাইট মুক্ত হওয়ার বিপদ :

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি কপি-রাইট থেকে মুক্ত হওয়ায়, তাঁর দশটি কাহিনী নিয়ে বিভিন্ন প্রডিউসারের মধ্যে যেন 'রীলে রেস্' সুরু হয়ে গেছে। দুঃখের কথা, যাঁরা চিত্র-পরিচালনার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে মাত্র ২।৩ জন ছাড়া অধিকাংশেই পূর্ব অভিজ্ঞতা বঞ্চিত নবব্রতী।

বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনীর বিকৃতি রূপায়ণের জন্য বাঙলার প্রবীণ পরিচালক দেবকী বসুকেও তাঁর অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চাইতে হয়েছিল। এ দিক থেকে আমাদের জাতিগত দায়িত্ব অনস্বীকার্য। অনভিজ্ঞ পরিচালকের হাতে পাতে বঙ্কিমের কাহিনী বিকৃততর না হয়ে ওঠে, সে দিকেও সতর্ক হবার সময় এসেছে। আগামী মাসে এই বিষয়টি নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

বাঙ্গলার সমস্যা সমাধান—

পশ্চিম বাঙ্গালার মন্ত্রিসভা যেমন সকলের প্রিয় হইতে পারে নাই, তেমনই প্রাদেশিক-কংগ্রেসের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি ও সকল দলের সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই। সে জন্য এই প্রদেশে গণ্ডগোল লাগিগাই আছে এবং দেশের লোকও অনন্ত দুর্দ্দশা ও দুর্নীতি ভোগ করিতেছে। এত-দিন পর্য্যন্ত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এ বিষয়ে কিছু করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। সম্প্রতি দক্ষিণ কলিকাতা নির্ব্বাচনে কংগ্রেস পক্ষের নিদারুণ পরাজয়ের পর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের টনক নড়িয়াছে। প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু নিজে আসিয়া বাঙ্গালার অবস্থা দেখিয়া গিয়াছেন ও বাঙ্গালার সকল দলের সকল নেতার সহিত পরামর্শ করিয়া গিয়াছেন। তাহার পর দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে এ বিষয়ে কয়দিন ধরিয়া আলোচনার পর নিম্ন-লিখিত সিদ্ধান্তগুলি স্থির হইয়াছে—(১) পশ্চিম বঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদ ও পশ্চিম বঙ্গ কংগ্রেস দুইটিতেই নূতন নির্ব্বাচন করিতে হইবে। (২) পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস এসেম্বলি দল অন্তবর্ত্তী মন্ত্রিসভা গঠন সম্বন্ধে ওয়ার্কিং কমিটির নিকট প্রস্তাব পেশ করিবেন। মন্ত্রিসভায় পরিষদের বাহিরের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদেরও লওয়া হইবে। (৩) পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর কর্ম্ম পরিষদ নূতন করিয়া গঠন করিতে হইবে। উহাতে সকল উপদলের প্রতিনিধি যথাযোগ্য সংখ্যায় রাখিতে হইবে। উপদল-সমূহের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি ছোট প্রাদেশিক কংগ্রেস-ওয়ার্কিং কমিটী গঠন করিতে হইবে। (৪) প্রাদেশিক কংগ্রেসের কর্ম্ম-পরিষদ পুনর্গঠন অসম্ভব হইলে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর বর্ত্তমান সদস্যদের লইয়া উহা গঠিত হইবে, কারণ উহাতে প্রত্যেক উপদলের প্রতিনিধিরা আছেন। (৫) বিভিন্ন উপদল লইয়া গঠিত প্রাদেশিক কংগ্রেসে যদি আবার গোলমাল হয়, তবে ওয়ার্কিং কমিটী যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। (৬) ব্যবস্থা পরিষদের সাধারণ নির্ব্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের চূড়ান্ত দায়িত্ব কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারী বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

আপাতঃ দৃষ্টিতে সমস্যা সমাধানের এই সকল উপায় ভাল বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু এই সকল ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করা আদৌ সম্ভব হইবে কি না এবং সম্ভব হইলেও তদ্বারা সমস্যার আসল সমাধান হইবে কি না, তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই ব্যবস্থার দ্বারা উপদলগুলি থাকিয়া যাইবে, কাজেই সকলে কোন দিন একমত হইয়া কাজ করিতে পারিবে না। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যরা এইভাবে বাঙ্গালার দলাদলি বজায় রাখিয়া বাঙ্গালাকে দাবাইয়া রাখার পক্ষপাতী। তাহার কারণ যে অনেক, সে কথা আমরা বহুবার আলোচনা করিয়াছি। বাঙ্গালা কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা আজ সর্ব্বক্ষেত্রে উপেক্ষিত, সে কথা কাহারও অজ্ঞাত নাই। বাঙ্গালার দলাদলি মিটিয়া গেলে বাঙ্গালার দাবী পূর্ণ করিতে ওয়ার্কিং কমিটী বাধ্য হইবেন, কিন্তু তাঁহারা সে দাবী পূর্ণ করিতে সম্মত নহেন, কাজেই দলাদলি জিয়াইয়া রাখাই তাঁহাদের কাম্য।

মাদ্রাজে দুর্নীতি—

মাদ্রাজের মন্ত্রিসভার মধ্যে দুর্নীতি সম্বন্ধে পত্রান্তরে একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে—আমরা নিম্নে তাহা প্রদান করিলাম। বাঙ্গালাদেশেও ঐরূপ ঘটনার অভাব নাই—সেগুলি যাহাতে বন্ধ হয়, সে জন্য সর্ব্বত্র চেষ্টা হওয়া প্রয়োজন। ঘটনাটি এইরূপ—১৯৩৫ সালে মাদ্রাজে সুদর্শন অয়েল মিল লিঃ স্থাপিত হয়। সম্প্রতি মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট ঐ মিলকে ৩ টাকা সুদে ১০ লক্ষ টাকা ধার দিয়াছেন। মাদ্রাজের অর্থসচিব গোপাল রেড্ডির ভগিনীর নাম সুদর্শন। তাঁর নামে মিলটির নাম হইয়াছে। মন্ত্রী মহাশয় নিজে উহার একজন ডিরেক্টর ছিলেন, মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর কেহ কোন কোম্পানীর ডিরেক্টর থাকিতে পারিত না, এই নিয়ম অনুসারে তিনি নিজে পদ ত্যাগ করিয়া তাঁহার স্ত্রীকে ডিরেক্টার করিয়া দিয়াছেন। দুই মাস আগে অংশীদের

এক সভা হয়, সভার স্থান ছিল মন্ত্রী মহাশয়ের বাটী। মিলের ডিরেক্টর ৯ জন, তন্মধ্যে একজন তাঁহার স্ত্রী, একজন তাঁহার ভ্রাতা, একজন তাঁহার খুড়তুতো ভাই, একজন তাঁর ভায়ের শ্যালক, দুইজন তাঁহার জামাই ও একজন তাহার শ্বশুরের ব্যবসায়ের অংশীদার। সরকার হইতে ১০ লক্ষ টাকা ধার দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু এখনও মিলের কোন কাজই আরম্ভ হয় নাই; কোম্পানীর অংশীদাররা অধিকাংশই মহাজন, সুদে টাকা খাটানো তাঁহাদের প্রধান ব্যবসা, এঁদের সুদের হার শতকরা ১২ টাকা। সরকারের নিকট ইহারা টাকাটা পাইয়াছেন ৩ টাকা সুদে এবং যন্ত্রপাতি না আসা পর্য্যন্ত বেশ কিছুদিন টাকাটা হাতেই থাকিবে।

এইরূপ ঘটনা অন্য প্রদেশেও ঘটিতেছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী কয়েক না হইলে দেশ হইতে দুর্নীতি দূর হওয়া সম্ভব হইবে না।

প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ—

অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী হইয়াই শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার অল্পদিনের মধ্যে কয়েকটি রেডিও বক্তৃতা করিয়াছেন ও সংবাদপত্রে কয়েকটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার একটিতে তিনি ইঙ্গিত করিয়াছেন যে বাঙ্গালী যুবকরা কায়িক পরিশ্রমে অনিচ্ছুক। কিন্তু কলিকাতার রাস্তায় বাহির হইলে তিনি দেখিতে পাইতেন এক মুষ্টি অন্ন সংগ্রহ করিবার জন্য কত শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর বাঙ্গালী যুবক ফুটপাতে ও হকার্স কর্ণারে উদ্‌ভ্রান্ত রৌদ্র বৃষ্টিতে পরিশ্রম করিতেছে। আসল কথা, তাহারা পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না। কেহ তাহাদের পথ দেখাইতেছে না। নলিনীবাবু স্বীকার করিয়াছেন যে বাঙ্গালী যুবকরা ভিন্ন প্রদেশে গিয়া মার খাইতেছে, বিতাড়িত হইতেছে। কিন্তু তাঁহার নিজের প্রদেশেও কি বাঙ্গালী যুবকরা সুবিচার পাইতেছে? কলিকাতায় কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের যে সকল অফিস আছে, তাহাতে বাঙ্গালী কর্ম্মপ্রার্থীর আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি আমদানী করা হইতেছে। কলিকাতার বুকের উপর বসিয়া যে সব বিদেশী ব্যবসায়ী কোটি কোটি টাকা উপার্জ্জন করে, তাহাদের অফিসের দরজাও বাঙ্গালীদের নিকট বন্ধ। অথচ বিহারে টাটা কোম্পানীতে বা আসামের ডিগবয় তৈলখনিতে সেদেশের গভর্ণমেণ্ট বিহারী ও আসামী কর্ম্মচারী গ্রহণে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করিতেছেন। স্বাধীন বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী হইয়া নলিনীবাবু যদি বাঙ্গালার বিদেশী পরিচালিত কারখানা ও অফিসগুলিতে বাঙ্গালীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন, তবে বাঙ্গালার বেকার সমস্যা অনেকটা কমিয়া যাইবে। বাঙ্গালায় সকল স্থানে আজ অবাঙ্গালীর প্রাধান্য বাঙ্গালীর শঙ্কার কারণ হইয়াছে। শাসক সম্প্রদায় যদি সে শঙ্কার কারণ দূর করিবার চেষ্টা না করেন তাহা হইলে বাঙ্গালায় নূতন করিয়া আবার অশান্তি দেখা দিবে।

নির্ব্বাচনের ব্যয়—

বাঙ্গালার কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত অমরকৃষ্ণ ঘোষ রাষ্ট্রপতি শ্রীপট্টভি সীতারামিয়াকে যে সুদীর্ঘ পত্র দিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ, দক্ষিণ কলিকাতার নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের ৪০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী বাঙ্গালার যে নূতন নির্ব্বাচনের আদেশ দিয়াছেন, তাহাতে ৯০টি আসনের জন্য বাঙ্গালায় মোট ৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তাহার কিছুদিন পরে সর্ব্বভারতব্যাপী নির্ব্বাচনেও ঐরূপ হারে ব্যয় হইবে। এই ব্যয়ের টাকা কোথা হইতে আসিবে, তাহা ভাবিলে মাথা ঘুরিয়া যায়। কংগ্রেস-নেতারা কি করিয়া এই ভাবে ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন?

খাদ্যসঙ্কট—

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সম্প্রতি বেতারে খাদ্যসঙ্কট সম্বন্ধে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি সকলকে আবাদী জমি গভীর ও ভালভাবে চাষ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ইহাতে শতকরা ১৫ ভাগ বেশী শস্য উৎপন্ন হইবে। ভারতে বর্ত্তমানে শতকরা ১০ ভাগ খাদ্য কম আছে। ইহার দ্বারা খাদ্য সমস্যার এক দিক দিয়া সমাধান হইবে। পরিপূরক খাদ্য হিসাবে মিঠা আলু, কলা প্রভৃতির চাষ অধিকভাবে করিবার জন্য তিনি নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু শুধু নির্দ্দেশ দিলেই কাজ শেষ হইবে না। লোককে একদিক দিয়া কৃষি কার্য্য করিতে বাধ্য ও অন্য দিক দিয়া উৎসাহিত করিতে হইবে। শুধু উৎসাহ দানের দ্বারা যদি দেশবাসী অধিক ফসল উৎপাদনে আগ্রহশীল না হয়, তবে বাধ্য করারও প্রয়োজন হইবে। দেশে যে সকল জমি পতিত আছে, সে জমি যদি কৃষিকার্য্যের জন্য গৃহীত না

হয়, তবে সে সকল জমির মালিকের শাস্তির ব্যবস্থা পর্য্যন্ত করা উচিত। নচেৎ কৃষি-বিমুখ দেশকে কখনই কৃষি-অনুরাগী করা যাইবে না।

করিয়াছেন, তাহা দ্বারা বাঙ্গলা আদৌ লাভবান হইবে কি না সন্দেহ। বাঙ্গালার অবস্থা ক্রমে ক্রমে খারাপ হইতেছে —এখানে দুর্নীতি দমনের কোন ব্যবস্থা না থাকায় দরিদ্র

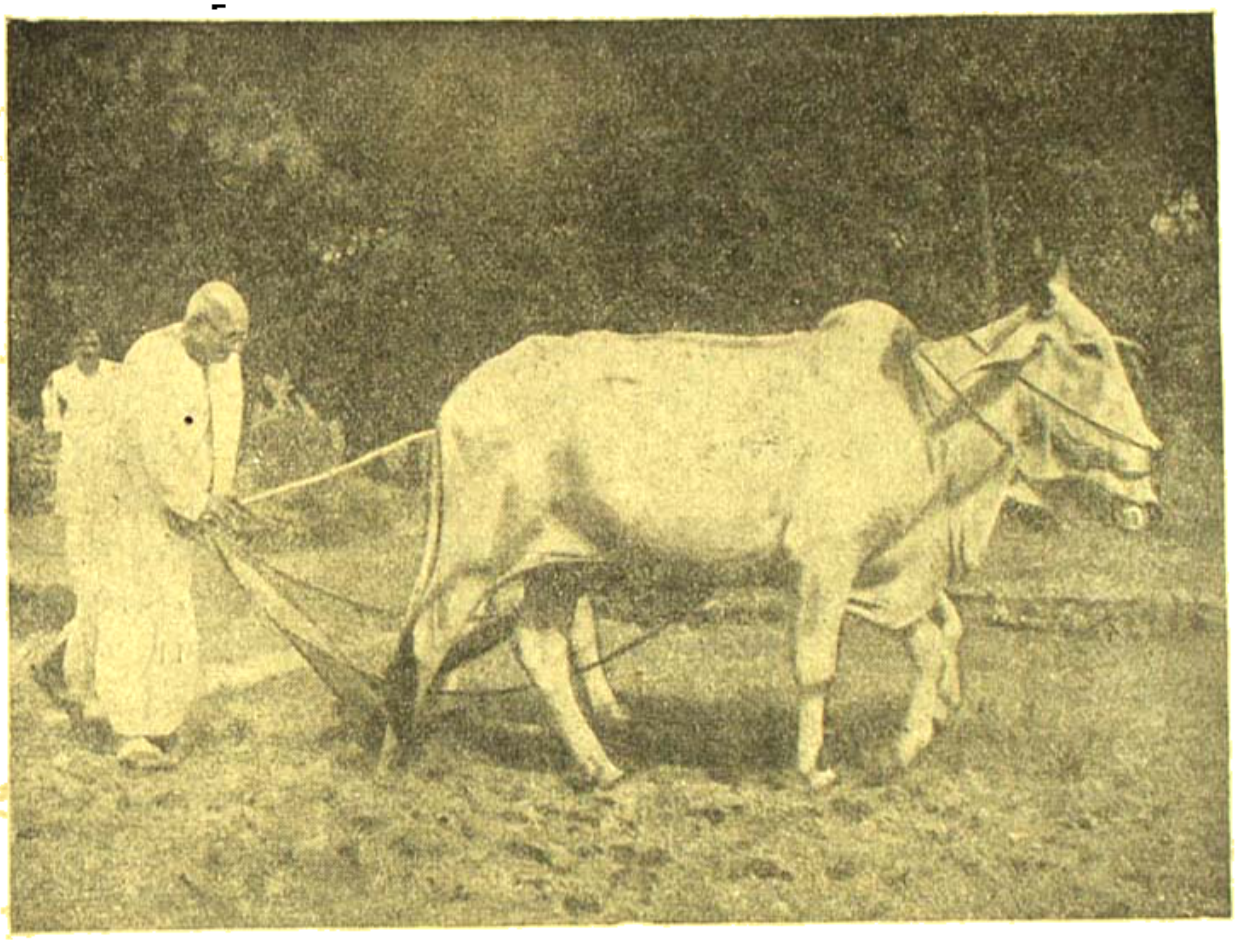

রাষ্ট্রপাল চক্রবর্ত্তী শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারী 'কমল কলাও আন্দোলনে' কৃষকদের উৎসাহ প্রদানের জন্য হল কর্ষণে রত

কলিকাতায় প্রধান মন্ত্রী—

ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু গত ১২ই জুলাই বেলা ১টায় আসিয়া ৩ দিন এখানে বাস করিয়াছিলেন। ১৫ই সকালে তিনি দিল্লীতে ফিরিয়া গিয়াছেন। ৩ দিন তিনি বাঙ্গালার সকল দলের নেতাদের ও সরকারী কর্ম্মচারীদের সহিত বাঙ্গালার বর্ত্তমান দুরবস্থা ও তাহার প্রতীকারের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। ১৪ই বিকালে গড়ের মাঠে এক বিরাট জনসভাতে ও তিনি বক্তৃতা করেন। পণ্ডিতজী নিজে সব জানিয়া ও দেখিয়া গিয়াও বাঙ্গালার সমস্যা সমাধানের কোন উপায় করিতে পারেন নাই—ইহাই বাঙ্গালার দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীতে যে উপায় নির্দ্দেশ

জনসাধারণের দুঃখদুর্দ্দশা বাড়িয়াই চলিয়াছে। তাহার ফলে দেশে অসন্তোষও বিরাট আকার ধারণ করিতেছে। একদিন সেই পুঞ্জীভূত অসন্তোষ বিপ্লবের আকার ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইলে তাহাতেও বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিবে না। যে কংগ্রেসকে লোক পূজা করিত, এখন সেই কংগ্রেসের নামে কোন কথা বলিতে গেলে লোক ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। এ অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে বাঙ্গলা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

সমাজ বিদ্রোহী কার্য্য—

গত ২১শে এপ্রিল এক ভোজে ৫ শত বন্ধুবান্ধবকে তৃপ্ত করার জন্য আলিপুরের স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে শ্রীভৃগুকুমার সেনের ৫ শত টাকা অর্থদণ্ড (না দিলে ৬

মাস সশ্রম কারাদণ্ড) ও মিষ্টান্ন বিক্রেতা শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ দাসের ৪ শত টাকা অর্থদণ্ড (না দিলে ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড) হইয়াছে। কলিকাতায় কোন ভোজে ৫০ জনের অধিক লোক নিমন্ত্রণ করার আইন নাই। এই দণ্ডাদেশ যদি অপর সকলকে এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করে, তবেই উহা সার্থক বলিয়া মনে করা হইবে। পুলিস বা কর্ত্তৃপক্ষ এই আদেশ অমান্যকারীদের যে কেন ধরেন না, তাহা জানি না। বহুস্থানে এই আদেশ অমান্য করিয়া কাজ করা হয়, অথচ অপরাধীর শাস্তি হয় না। যখন দেশে খাদ্যের প্রাচুর্য্য নাই, তখন ভোজ বন্ধ করা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়—ভোজ বন্ধ হইলে অন্ততঃ সেই ভোজ্যের দ্বারা বহু ক্ষুধিতের অন্নের সংস্থান হইবে। আমরা ভবিষ্যতে এই আইন কঠোরভাবে পালিত হইতে দেখিলে সুখী হইব।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু—

বহুদিক হইতে বহু লোক প্রচার করিতেছেন যে নেতাজী শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু জীবিত আছেন। তিনি কোথায়, কি ভাবে আছেন, কি করিতেছেন—এ বিষয়ে কিন্তু কেহই কোন সঠিক সংবাদ দিতে পারেন না। বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট তাঁহার পুনরাগমনের পথে বাধা দিবেন বলিয়া যে সকল গুজব শুনা গিয়াছিল, তাহাও ঠিক নহে। এ অবস্থায় যাঁহারা সুভাষচন্দ্র জীবিত আছেন বলিয়া ঘোষণা করেন, তাঁহারা এ বিষয়ে সঠিক সংবাদ না জানিয়া এইরূপ ঘোষণা কেন করিয়া থাকেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। সুভাষচন্দ্র দেশে ফিরিয়া আসুন, সকলেই তাহা চাহেন। কিন্তু এ বিষয়ে শুধু গুজব প্রকাশ করিয়া কোন লাভ নাই। ভারত সরকার কি চেষ্টা করিলে এ বিষয়ে কোন সঠিক সংবাদ প্রকাশ করিতে পারেন না? শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু, শ্রীযুত ফুইকর প্রভৃতি কোন সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে গুজব প্রকাশ করেন, তাহা জানাও সরকারের পক্ষে আদৌ কঠিন নহে। আমরা আশা করি, সত্বর এ বিষয়ে সঠিক সংবাদ দান করিয়া সরকার সকলের সন্দেহ দূর করিবেন!

শ্রীশরৎচন্দ্র বসু—

দুইমাস কাল ইউরোপ বাসের পর বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ নেতা শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু গত ২রা আগষ্ট মঙ্গলবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাকে দমদম বিমানঘাঁটিতে ও দমদম হইতে বাড়ী পর্য্যন্ত পথে জনতা প্রচুর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছে। তাঁহার অনুপস্থিতিতে দক্ষিণ কলিকাতায় উপনির্ব্বাচনে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শরৎচন্দ্র দেশে ফিরিয়া সকল বামপন্থী দলকে একত্র করিয়া দেশসেবা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কংগ্রেসের মধ্যে দুর্নীতি প্রবেশ করায় আজ কংগ্রেসী শাসনযন্ত্র সর্ব্বত্রই প্রায় অচল হইয়া পড়িয়াছে—এ অবস্থায় শক্তিশালী বিরোধী দল গঠিত হইলে তাহা দেশবাসীর কল্যাণসাধন করিবে বলিয়া আমরা মনে করি। আমরা কর্ম্মী শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দিত করি ও আশা করি, তাঁহার ত্যাগ ও দেশপ্রেম তাঁহাকে সুপথে পরিচালিত করিয়া তাহার দ্বারা দেশকে উপকৃত করিবে। বাঙ্গালার বর্ত্তমান সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায় যদি তিনি দেশের বিক্ষিপ্ত বামপন্থীদের একত্র করিয়া তাহাদের দ্বারা প্রকৃত দেশসেবার কাজ করাইতে সমর্থ হন, তবে তাহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর হইবে না।

বাঙ্গালায় বেকার সমস্যা—

পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টের যানবাহন বিভাগে ৩১৪টি ড্রাইভার ও কণ্ডাক্টার পদের জন্য ৫০ হাজার আবেদন পড়িয়াছিল। এই সামান্য ঘটনা হইতে বাঙ্গালার বেকার সমস্যার পরিমাণ বুঝা যায়। এই সমস্যা সমাধানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবিলম্বে অগ্রসর না হইলে দেশে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দিবে। এদেশে বিদেশী ও অবাঙ্গালী পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে যদি সকল শূন্যপদে বাঙ্গালী গ্রহণ করিতে বাধ্য করা যায়, তাহা হইলে সত্বর এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। এখনও এদেশে বিদেশীদের পাটকলগুলিতে বহু খেতাঙ্গ অত্যধিক বেতন লইয়া যে কাজ করে, সে কাজ বাঙ্গালীদের দ্বারা অল্প বেতনে করানো যাইতে পারে। বিরলা প্রভৃতির কারখানায়ও ঐ একই অবস্থা বর্ত্তমান। অবিলম্বে এ সকলের প্রতীকার হওয়া প্রয়োজন।

কলিকাতা পুলিসে অবনতি—

কেন্দ্রীয় সরকারের সচিব শ্রীযুত সত্যনারায়ণ সিংহ কয়দিন কলিকাতায় বাস করিয়া চলিয়া যাইবার সময় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—গত ২।৩ বৎসরে কলিকাতার

পুলিস বিভাগের পরিচালনায় যথেষ্ট অবনতি দেখা দিয়াছে। তিনি মনে করেন, পুলিস বিভাগকে আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে না পারিলে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভবপর হইবে না! লাঠি ও গুলী চালাইবার ব্যাপারে পুলিসের উৎসাহ এতটুকুও কম হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এক সময়ে এই সকল পুলিস কর্ম্মচারী যে ভাবে কংগ্রেস-কর্ম্মীদের নির্য্যাতন করিতেন, এখন সেইভাবে সরকার-বিরোধী সকলকেই নির্য্যাতীত করিতেছেন। মফঃস্বলেও এখন পর্য্যন্ত পূর্ব্বের মতই পুলিসকে ঘুস না দিলে কোন কাজ হয় না। উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এ বিষয়ে অভিযোগ জানাইয়াও সব সময়ে লাভবান হওয়া যায় না। এ অবস্থার প্রতীকার যে প্রয়োজন, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

বস্ত্র সঙ্কট—

আমেদাবাদের কাপড়ের কলগুলিতে বহু কাপড় জমিয়া গিয়াছে বলিয়া কলওয়ালারা গণ্ডগোল আরম্ভ করিয়াছিল। ইহা যে কলওয়ালাদের কারসাজি তাহা টেক্স্‌টাইল কমিশনার শ্রী টি-পি-বরাট জানাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন—কাপড়ের দাম যখন কম ছিল, তখন কলওয়ালারা কম মাল চালান দিয়াছিল। গত জানুয়ারী মাস হইতে তাহারা যদি উৎপন্ন মাল নিয়মিত চালান দিত, তাহা হইলে মাল কখনও মজুত পড়িয়া থাকিত না। এই বৎসরের প্রথম ৩ মাস তুলার দাম কম থাকায় কাপড়ের দামও কম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তখন কলওয়ালারা ইচ্ছা করিয়াই কম লাভ হইবে বলিয়া কাপড় মজুত করিয়া রাখিয়াছিল। অথচ সে সময়ে কাপড়ের যথেষ্ট চাহিদা ছিল। এখন তুলার দাম বাড়াতে কাপড়ের দাম ও বাড়িয়াছে। সে জন্য কলওয়ালারা এখন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট কলওয়ালাদের এই চাতুরী ধরিয়া ফেলিয়াছে। ইহার পরও কাপড়ের কলের মালিকদের দুর্নীতি ও মুনাফালোলুপতা গভর্ণমেণ্ট কেন সহ্য করিতেছে, তাহাই বিস্ময়ের বিষয়।

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ—

গণপরিষদ তথা ভারতীয় পার্লামেণ্টের সদস্য, খ্যাতনামা কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ সম্প্রতি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর অস্থায়ী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সভাপতি শ্রীযুত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ দীর্ঘকাল অসুস্থ ছিলেন। অরুণবাবু সুলেখক—তাঁহার বহু গল্প ও প্রবন্ধ ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি 'মন্বিরা' মাসিক পত্রের

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

সম্পাদক। অরুণবাবু আজীবন কংগ্রেস-সেবক—তাঁহার নেতৃত্বে বাঙ্গালায় নূতন ভাবের ধারা প্রবাহিত হউক, ইহাই আমরা কামনা করি।

বঙ্কিমচন্দ্র স্মরণোৎসব—

গত ১৯শে আষাঢ় রবিবার সকালে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাসভবন কাঁটালপাড়া গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্রের বার্ষিক স্মৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক সার যদুনাথ সরকার উৎসবে সভাপতিত্ব করেন এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল ডাঃ কাটজু উৎসবের উদ্বোধন করেন। আজ স্বাধীন বাঙ্গলায় বঙ্কিমচন্দ্রকে স্মরণ করা বিশেষভাবে প্রয়োজন হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার সংস্কৃতি ও দেশাত্মবোধের জনক। তিনি বাঙ্গালীকে স্বদেশ চিনাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি আনন্দমঠে বাঙ্গালীকে যে ভাবে দেশ চিনাইয়া দিয়াছিলেন, আজ বিভ্রান্ত বাঙ্গালীকে

সেই পথে অগ্রসর হইতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিপূজা করিয়া আমরা যেন তাঁহার প্রদর্শিত সত্য, প্রেম ও ত্যাগের পথ আবার চিনিতে পারি, আজ বাঙ্গালীমাত্রকেই সে কথা চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। সত্যই বাঙ্গালী আজ পথ হারাইয়াছে, তাই তাহার দুঃখ দুর্দ্দশার অন্ত নাই। এক-দিন এইরূপ অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ রচনা করিয়া-ছিলেন—ফলে দেশ নূতন প্রাণ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দ সৃষ্টি করিয়াছিল। আজও তাহারই প্রয়োজন হইয়াছে। তাই আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি।

পুরীতে নূতন যাত্রী নিবাস—

কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী তাঁহার স্বর্গত পিতা ভবনাথবাবুর স্মৃতি রক্ষার্থ পুরীতে একটি নূতন যাত্রী নিবাস নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পরিচালন ভার

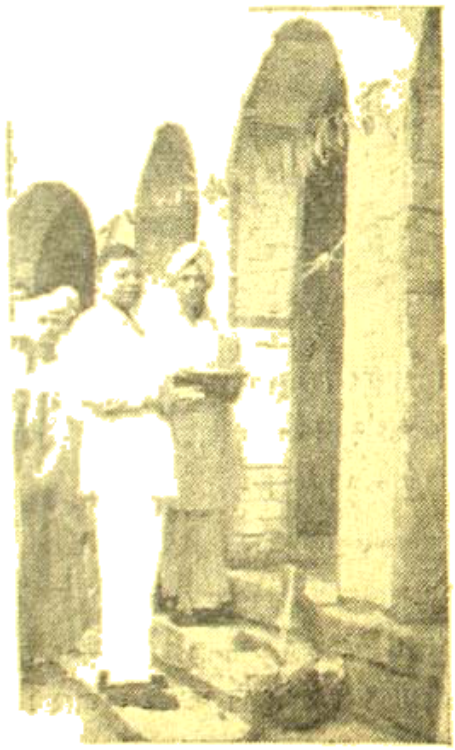

পুরীতে নূতন যাত্রীনিবাসের উদ্বোধন

ভারত সেবাশ্রম সংঘের উপর প্রদান করিয়াছেন। গত ২৪শে জুলাই উড়িষ্যার প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মহাতাব উহার উদ্বোধন করিয়াছেন। সেদিন উৎসবে বহু বাঙ্গালী ও উড়িষ্যাবাসী একত্র সমবেত হইয়া এই শুভকার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন।

সর্ব্ব ভারতীয় ভাষা—

সংস্কৃত ভাষাকে যাহাতে সর্ব্ব ভারতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করা হয়, সেজন্য কিছুদিন হইতে সর্ব্বত্র আন্দোলন পরি-চালিত হইতেছে। বাঙ্গালার গভর্ণর ডাঃ কাটজু উড়িষ্যার যখন গভর্ণর ছিলেন, তখনই তিনি সংস্কৃতকে সর্ব্বভারতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করার দাবী জানাইয়াছিলেন। বিহারের গভর্ণর শ্রীযুত এম-এস-আনে ও আসামের গভর্ণর শ্রীযুত শ্রীপ্রকাশও সংস্কৃত ভাষাকে সর্ব্ব ভারতীয় ভাষা করার পক্ষপাতী। হিন্দী সর্ব্ব ভারতীয় ভাষা করার উপযুক্ত নহে —উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের হিন্দী ভাষা ব্যবহৃত হয়, তাহাদের সকলকে মিলাইয়া একটা সাধারণ হিন্দীভাষা সৃষ্টি করা সহজসাধ্য হইবে না। সংস্কৃত ভাষা সারা ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট পরিচিত—তাহার সাহিত্যের সম্পদ ও সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান। কাজেই সংস্কৃতই ঐ স্থান পাওয়ার একমাত্র অধিকারী। বাঙ্গালাদেশে সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য সম্প্রতি এক সমিতি গঠিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ অমরেশ্বর ঠাকুরকে সম্পাদক ও কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেন-গুপ্তকে সভাপতি করিয়া সে সমিতি গঠিত হইয়াছে, আমরা সংস্কৃতানুরাগী সকলকে তাহার কার্য্যে সাহায্য করিতে অনুরোধ করি ও যাহাতে সংস্কৃত সর্ব্ব ভারতীয় ভাষারূপে গৃহীত হয়, সকলকে সেজন্য আন্দোলন করিতে আহ্বান করি।

আগামী নির্ব্বাচনে কর্ত্তব্য—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চ্যান্সেলার ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার পশ্চিম বাঙ্গালার আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনে প্রার্থী স্থির করার সময় নিম্নলিখিত ৪টি বিষয়ে সকলকে অবহিত করিয়াছেন—(১) কালোবাজার বন্ধ করার জন্য ট্রাইবিউনাল নিয়োগ ও তাহাকে প্রচুর অধিকার দান (২) কুচবিহার এবং বিহারের বঙ্গ-ভাষাভাষী অঞ্চল বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্তির চেষ্টা (৩) পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্বসতি ব্যবস্থা (৪) কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টে বাঙ্গালীকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দানের চেষ্টা।

শ্রদ্ধেয় মজুমদার মহাশয় যে ৪টি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই ৪টি বিষয়ই সকল বিবেচক বাঙ্গালীকে

এখন বিব্রত করিতেছে। মানভূম সমস্যা লইয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী যেরূপ অচল মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আজ আর কাহারও অবিদিত নাই। কুচবিহার সমস্যা বাঙ্গালীমাত্রেরই ক্ষোভের ও দুঃখের কারণ হইয়াছে। কালোবাজার বন্ধ না হইলে বাঙ্গালী কিছুতেই বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না। আমরাও দেশবাসী সকলকে আগামী ব্যবস্থা-পরিষদ নির্ব্বাচনে এই ৩টি কথা মনে রাখিয়া প্রার্থী স্থির করিতে অনুরোধ করি।

আফ্রিকায় রথযাত্রা—

ভারত সেবাশ্রম সংঘের সাংস্কৃতিক মিশনের সদস্যগণ স্বামী অদ্বৈতানন্দজীর নেতৃত্বে পূর্ব্ব আফ্রিকার সহরসমূহ ভ্রমণ করিয়া হিন্দু-ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি প্রচার করিতেছেন। রথ-যাত্রা উপলক্ষে তাঁহারা যোশী সহরে রথ বাহির করিয়াছিলেন, জগন্নাথ প্রভৃতির পূজা হইয়াছিল এবং এক ধর্ম্মসভায় রথযাত্রার রহস্য আলোচিত হইয়াছিল।

আফ্রিকায় রথযাত্রা

দ্বিজেন্দ্রলাল উৎসব—

খ্যাতনামা কবি ও নাট্যকার স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের ৮৬তম জন্মদিবস উপলক্ষে দিঁথি বিপিন বনমালী সাধারণ পাঠাগারের কর্তৃপক্ষ গত ২৩শে ও ২৪শে জুলাই ২দিন তাঁহাদের পাঠাগার ভবনে নিখিল-বঙ্গ দ্বিজেন্দ্রলাল সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠান করিয়া দেশবাসী সকলকে দ্বিজেন্দ্রলালের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। যাঁহাদের চেষ্টায় আমরা আজ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহাদের অন্যতম—কারণ তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া দেশবাসীর মনে স্বাদেশিকতা জাগ্রত হইয়াছিল। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রসিদ্ধ জীবনীলেখক শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, সুধী শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, নাট্যকার শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি ডাক্তার কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজা শ্রীক্ষিতীন্দ্র দেবরায় মহাশয়, শ্রীসুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী প্রভৃতি ঐ সম্মিলনে বিভিন্ন অংশ গ্রহণ করিয়া উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন। ২দিন বহু ঘটা করিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য আলোচিত হইয়াছিল। শ্রীযুত রাধারমণ দাস এই উৎসবের আয়োজন করিয়া সকলের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

সতর্কী করণ—

তারকেশ্বরের মোহন্ত দণ্ডীখানা জগন্নাথ আশ্রম মহারাজের পক্ষ হইতে গত শ্রাবণ এক নিবেদন প্রচার করিয়া দেশবাসী সকলকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মোহন্ত মহারাজ সারা জীবন তপস্যা দ্বারা দেশের বর্ত্তমান অবস্থা উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন—"সোনার ভারত আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে ছারেখারে যাইবে। কি অবস্থা হইবে তাহা তপস্যাদ্বারা অবগত হওয়া যায়। তাহার পথ স্বামীজি মহারাজ নিজে বুঝিয়াছেন ও সকলকে বুঝাইয়া দিতে চাহেন। সারা ভারতে অধর্ম্ম প্রবল হইয়াছে। তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে ধ্বংস আসিতেছে। মোহন্ত মহারাজ যে এ সময়ে জনগণের উপকারের জন্য অগ্রসর হইয়াছেন, ইহা আশা ও আনন্দের বিষয়। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের মত লোক এ সময়ে দেশহিতে ব্রতী হইলে, দেশকে আসন্ন ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করা সম্ভব হইবে।

খেলাধূলা

সম্পাদনা শ্রীকেদারেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

ডি' মেলো বনাম অমরনাথ ঃ

ভারতীয় ক্রিকেট কন্‌ট্রোল বোর্ডের সভাপতি এবনি ডি' মেলো ও ভারতীয় টেষ্ট ক্রিকেট দলের অধিনায়ক লালা অমরনাথের মধ্যে যে গভীর মনোমালিন্য চলছিল এবং যার ফলে অমরনাথকে ভারতীয় ক্রিকেট ক্রীড়াজগত থেকে বহিষ্কার করা হয় তার হঠাৎ পরিসমাপ্তি ঘটায় ক্রিকেট ক্রীড়ামোদী মাত্রেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন। আরও সুখের বিষয় যে এই বিরোধের নিষ্পত্তি দুঃখময় না হয়ে আনন্দময়ই হয়ে উঠেছে অমরনাথের বিরুদ্ধে আনীত সব অভিযোগ ক্রিকেট কন্‌ট্রোল বোর্ড কর্তৃক প্রত্যাহৃত হওয়ার জন্য। অমরনাথের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করে ভারতীয় ক্রিকেট জগতের এই মহাসমস্যার নিষ্পত্তি করায় জন্য ভারতীয় ক্রিকেট কন্‌ট্রোল বোর্ডকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু সেই সঙ্গে কন্‌ট্রোল বোর্ডের নীতির সমালোচনা ও দূরদর্শিতার অভাবের উল্লেখ করাও প্রয়োজন বলে মনে করি। যদি প্রথমেই ক্রিকেট কন্‌ট্রোল বোর্ড টেষ্ট অধিনায়ককে এইরূপ অপ্রত্যাশিত, অযাচিত ও অশোভনভাবে চরম দণ্ডদানের গুরুত্ব বুঝতেন তাহলে ভারতীয় ক্রিকেট তথা ভারতীয় অধিনায়কের সম্মান আজ বিশ্বের ক্রিকেট মহলে এরূপভাবে নষ্ট হোত না। বোর্ড প্রেসিডেন্টের কথাকে শিরোধার্য্য করে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রায় দান করে কন্‌ট্রোল বোর্ড নিজেদের অপরিণামদর্শিতারই পরিচয় দিয়েছেন। অমরনাথকে এই অপ্রত্যাশিত চরম দণ্ডদানের আগে বোর্ডের একবার ভেবে দেখা উচিত ছিল না কি যে, এই অনুপস্থিত খেলোয়াড়কে তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দান না করে তাঁকে সাস্‌পেণ্ড করা উচিত হবে কি না? আর যখন এই অভিযুক্ত খেলোয়াড় ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছাড়া আর কেউ নয়! তারপর দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত অমরনাথ যখন আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ডি' মেলোর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার ও কন্‌ট্রোল বোর্ডের দুর্নীতিগুলি জনসমাজে প্রচার করতে লাগায় ভারতীয় ক্রিকেটের আবহাওয়া দূষিত হয়ে উঠল ও অমরনাথের অদম্য হৃদয় যখন কিছুতেই দমিত হল না এবং তিনি শেষ চেষ্টা হিসাবে আইনের শরণাপন্ন হবার অভিলাষ জানালেন তখনই

অভিযোগমুক্ত বিদায়ী অধিনায়ক
লালা অমরনাথ

পুনঃনির্বাচিত সভাপতি
'এক্সমি ডি' মেলো'

বোর্ডের চৈতন্যোদয় হল এবং অমরনাথের বিরুদ্ধে যে ভাবে দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হয়েছিল ঠিক সেই ভাবেই কোন অনুসন্ধান না হয়েই হঠাৎ দণ্ডাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হল। সঙ্গে সঙ্গে ডি' মেলোর পুনরায় কনট্রোল বোর্ডের সভাপতি ও বিজয় মার্চ্চেণ্টের ভারতীয় দলের অধিনায়ক নির্ব্বাচিত হওয়ার সংবাদও প্রচারিত হল। মার্চ্চেণ্টের অধিনায়ক নির্ব্বাচিত হওয়া খুবই যুক্তিপূর্ণ ও আনন্দজনক হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ডি' মেলোর সভাপতি নির্ব্বাচন অনেকের কাছেই বোধহয় স্বস্তি দায়ক হবে না। বিশেষ করে এই ব্যাপারের পর কনট্রোল বোর্ডের ও তার সভাপতির নিরপেক্ষতার ও নীতির উপর লোকের আস্থা অনেকটা কমে গেছে।

রোগাক্রমণের পরে অপেক্ষা আগেই সাবধান হওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ড সে বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেন নি। নিজেদের প্রেসিডেন্টের ও অধিনায়কের নোংরামি ও দুর্নীতির পরিচয় প্রথমে লোকসমাজে প্রচারিত হবার সুযোগ দিয়ে পরে তার মীমাংসা বা মেটাবার চেষ্টার দ্বারা তাঁদের অপরিণামদর্শিতারই পরিচয় পাওয়া যায়। উচিত ছিল অমরনাথকে ডেকে তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে নিজেদের মধ্যেই এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মীমাংসা করা। তাহলে ক্রিকেট মহলে তাঁদের ও বোর্ডের সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকত। কিন্তু তা না করে বোর্ড-প্রেসিডেন্ট তাঁর মূর্খতারই পরিচয় দিয়েছেন চালাকি করে অমরনাথকে সাস্পেণ্ড করতে গিয়ে। তিনি বোধহয় ভেবেছিলেন অমরনাথ নীরবে তাঁর দণ্ড মাথা পেতে নেবেন। এইখানেই হয়েছিল তাঁর ভুল এবং এই ভুলের জন্যই তাঁর স্বরূপ আজ প্রকাশ হয়ে পড়েছে! কিন্তু তিনি ভুল করলেও সম্পাদকসহ বোর্ডের সভ্যরা তাঁকে তা করতে দিলেন কেন? সভাপতির সব বিষয়ে এতটা হস্তক্ষেপই বা তাঁরা সহ্য করেন কি করে? ডি' মেলোর মতন এত সক্রিয় সভাপতি এবং ভাবের মতন এত নিষ্ক্রিয় সম্পাদক সচরাচর চোখে পড়ে না। মনে হয় ডি' মেলোই যেন হয়ে উঠেছেন বোর্ড—অন্যেরা তাঁর ছায়া মাত্র। কিন্তু ডি' মেলো কনট্রোল বোর্ডের উপর প্রভাব বিস্তারে যেরূপ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন এই অমরনাথের প্রতি দণ্ডদান ব্যাপারে প্রথম দিকে কৃতকার্য্য হলেও দেখা যাচ্ছে সেরূপ চাতুর্য্যের পরিচয় দিতে পারেন নি। আমরা বলব বরং তিনি বুদ্ধিহীনতারই পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ব্যক্তিগত আক্রোশ বশতই যে অমরনাথের প্রতি চরম দণ্ড দিতে চেয়েছিলেন তা বুঝতে দেরি হয় না। ক্রোধান্ধ হয়ে তিনি ব্যাপারটির গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি না করেই এরূপ ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়েছিলেন। তারপর যখন বুঝলেন ব্যাপার গুরুতর আকার ধারণ করছে এবং তাঁর সভাপতিত্বও যায় যায় তখনই সব অভিযোগ প্রত্যাহার করতে সম্মত হলেন খুব সম্ভব বোর্ডের চাপে এবং পুনরায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ার আশ্বাসে। তা ছাড়া বাংলার ক্রিকেট এসোসিয়ে-

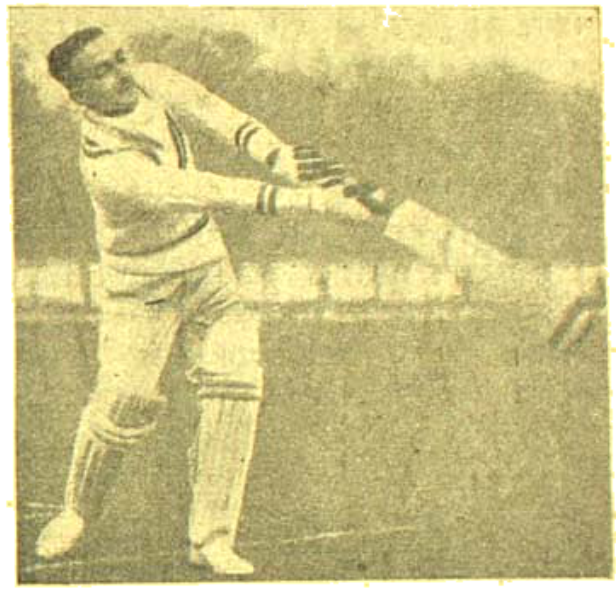

ভারতের স্থেট ওপনিং ব্যাটসম্যান্
বিজয় মার্চ্চেণ্ট
পুনরায় অধিনায়ক নির্ব্বাচিত হয়েছেন

সনের মুখপাত্ররাও ডি' মেলোকে ব্যাপারটির গুরুত্ব ও তাঁর কার্য্যের অযৌক্তিকতাটা সম্যক উপলব্ধি করাতে সাহায্য করেছেন বলে মনে হয়। কিন্তু সাধারণ্যে যখন সব প্রকাশ হয়ে পড়েছে তখন এত সহজে এ ব্যাপার ধামা চাপা পড়া উচিত নয়। এর একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে বাংলার ক্রিকেট এসোসিয়েসন ও এই প্রদেশের কয়েক ব্যক্তি অমরনাথের প্রতি অভিযোগের মধ্যে জড়িয়ে থাকায় বাংলা থেকেই এই অনুসন্ধানের জন্য কনট্রোল বোর্ডকে চাপ দেওয়া দরকার। অবশ্য 'ক্রিকেট এসোসিয়েসন্ অব বেঙ্গল' নিজে

সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ না হলে যে কন্‌ট্রোল বোর্ডকে ভোগাতে যাবে না তা ঠিক, বরং আরও চাপা দেবারই চেষ্টা করবে।

অমরনাথ ও ডি' মেলোর এই দ্বন্দ্ব যুদ্ধ থেকে এইটাই মনে হয় যে কেহই নির্দ্দোষ নন। ডি' মেলো তাঁর ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থ করবার স্বপক্ষে কিছু না পেলে অধিনায়ক অমরনাথের বিরুদ্ধে অন্যান্য অভিযোগের সঙ্গে এরূপ উৎকোচ গ্রহণের ও বিশেষ খেলোয়াড়ের প্রতি পক্ষপাতিত্বের হীন অভিযোগ আনয়ন করতে সাহসী হতেন না বলেই মনে হয়। তবে ডি' মেলোর এই 'আমিই বোর্ড' নীতির সমর্থনও তাই বলে করা চলে না। অমরনাথের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ যা ছিল তা অমরনাথকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সম্পূর্ণ সুযোগ দিয়ে এবং বোর্ডের সভ্যদের এ বিষয়ে আগে থেকে জানিয়ে দিয়ে তারপর বোর্ডের অধিবেশনে উত্থাপিত করা উচিত ছিল এবং সেইটাই শোভনীয় হত। কিন্তু তা না করে ডি' মেলো চালাকির আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন অমরনাথকে ভারতীয় ক্রিকেট ক্রীড়াঙ্গণ থেকে বহিষ্কৃত করে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য। এইটাই হচ্ছে ডি' মেলোর সভাপতি হবার উপযুক্ততার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রমাণ। সুতরাং সব দিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে এই সব ব্যাপারের প্রকাশ্যেই হোক আর অপ্রকাশ্যেই হোক একটা অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন। এবং তা করতে হলে প্রত্যেক প্রাদেশিক এসোসিয়েসানের পক্ষ থেকে একজন করে নিয়ে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করে এই কমিটির উপর তদন্তভার অর্পণ করতে হবে এবং দোষ প্রতিপন্ন হলে অমরনাথকে সতর্ক করা, ডি' মেলোকে ক্ষমতার অপব্যবহার করতে না দেওয়া এবং নিষ্ক্রিয় বোর্ড মেম্বারদের অবসর দিয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিদের হাতে কন্‌ট্রোল বোর্ড চালাবার ভার দেওয়া প্রভৃতির দায়িত্বও এই কমিটির উপর ন্যস্ত করতে হবে। মনে রাখতে হবে শুধু খেলার ক্ষেত্রের দিয়েই আমাদের দেশের ক্রিকেটের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হবে না। উন্নতি করতে হলে এই সব দলাদলি, নোংরামি প্রভৃতি বন্ধ করা একান্ত দরকার; বিশেষ করে ভারতীয় ক্রিকেটের ধনমুণ্ডের কর্ত্তা 'ক্রিকেট কন্‌ট্রোল বোর্ড অব ইণ্ডিয়া' ও প্রাদেশিক এসোসিয়েসানগুলির ত্রুটিবিচ্যুতির আমূল সংস্কার করে ভারতীয় ক্রিকেটের শাসন ও পরিচালনা ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে আশা করি ক্রিকেটের উন্নতিকামী ও ক্রীড়ানুরাগী জনসাধারণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হবে এবং এই সব গোলমালের নিবৃত্তি করে ক্রিকেট পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতি করতে তাঁরা ক্রিকেট কর্ণধারগণকে সচেষ্ট করে তুলবেন।

যাই হোক, আমরা সভাপতি ডি' মেলো ও কন্‌ট্রোল বোর্ডকে তাঁদের শুভবুদ্ধির জন্য ধন্যবাদ, অমরনাথকে অভিযোগ মুক্তির জন্য শুভেচ্ছা এবং বিজয় মার্চ্চেন্টকে পুনরায় ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করতে ইচ্ছুক হওয়ার জন্য সানন্দ অভিনন্দন জানাচ্ছি।

খেলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

ফুটবল লীগ ঃ

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ১৯৪৯ সালের ক্যালকাটা ফুটবল লীগের প্রথম বিভাগের প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করেছে। এই নিয়ে তারা চারবার লীগ পেল। প্রথম লীগ পায় ১৯৪২ সালে। এরপর ১৯৪৫ এবং ১৯৪৬ সালে উপর্যুপরি দু'বার লীগ বিজয়ী হয়েছে। লীগে রাণার্স-আপ হয়েছে ৬ বার—১৯৩২, ১৯৩৩, ১৯৩৫, ১৯৩৭, ১৯৪১ এবং ১৯৪৩ সালে।

১৯২২ সালে দ্বিতীয় বিভাগের লীগে কাস্টমস্ ফুটবল ক্লাবের শূন্য স্থানে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব যোগদান করে। ১৯২৪ সালে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব দ্বিতীয় বিভাগের লীগের খেলায় তৃতীয় স্থান অধিকার করে খেলায় ৩২ পয়েন্ট ক'রে। ঐ বছর পুলিস দ্বিতীয় বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান হয় ৩৭ পয়েন্ট ক'রে এবং লীগে রাণার্স-আপ হয়েছিল ক্যামেরোন্স 'বি' ৩৭ পয়েন্ট ক'রে। পুলিস লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েও প্রথম বিভাগের লীগে শেষ পর্য্যন্ত যোগদান করে না। এদিকে প্রথম বিভাগের লীগের খেলায় ক্যামেরোন্স মিলিটারী দলের 'এ' টীম যোগদান করায় দ্বিতীয় বিভাগে ক্যামেরোন্স 'বি' রাণার্স-আপ হয়েও প্রচলিত নিয়মানুসারে প্রথম বিভাগের লীগে প্রমোশন পায় না। এর পর প্রথম বিভাগে প্রমোশন পাওয়ার কথা ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের। কিন্তু তৎকালীন লীগ প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুসারে প্রথম বিভাগের লীগে দুটির বেশী ভারতীয় দলের যোগদানের অধিকার ছিল না। সে সময়ে প্রথম বিভাগের লীগে ছিল মোহনবাগান এবং এরিয়ান্স ক্লাব। এই আইনের ফলে সব থেকে বেশী ক্ষতি স্বীকার করেছে কুমারটুলী ক্লাব। ১৯১৭-১৯১৯ সাল পর্য্যন্ত উপর্যুপরি তিনবার দ্বিতীয় বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েও কুমারটুলী

ক্লাব প্রথম বিভাগের লীগে প্রমোশন পায়নি তৎকালীন প্রচলিত আইনের জন্য। প্রথম বিভাগের লীগে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রমোশন পাওয়ার পথে এই আইনই বড় বাধা হয়ে দাঁড়ালো। এই নিয়ে ফুটবল ক্রীড়ামহলে এক আন্দোলন হয়। রেঞ্জার্স ক্লাবের মিঃ এ বি রোনার, স্পোর্টিং ইউনিয়নের মিঃ পি গুপ্ত কালকাটা ক্লাবের সহযোগিতায় লীগ কমিটিকে এই বর্ণবৈষম্যমূলক নীতি পরিবর্তনে বাধ্য করেন। ফলে তৃতীয় ভারতীয় দল হিসাবে প্রথম বিভাগের লীগে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ১৯২৫ সালের খেলায় যোগদান করে, যদিও বহু পূর্বেই তৃতীয় ভারতীয় দল হিসাবে কুমারটুলি ক্লাবের প্রথম বিভাগে প্রমোশন হওয়া খুবই উচিত ছিল। ১৯২৫-১৯২৮ সাল পর্যন্ত ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব প্রথম বিভাগে নিয়মিত খেলে ৪বছর পর দ্বিতীয় বিভাগে নেমে যায়। ১৯৩১ সালে দ্বিতীয় বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপ পেয়ে তারা পুনরায় ১৯৩২ সাল থেকে প্রথম বিভাগের লীগে খেলছে।

খেলায় অনেক সময় ভাগ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। ভাল খেলেও ভাগ্যদোষে একদলকে হারতে দেখা গেছে, অপরদিকে প্রতিপক্ষদল ভাগ্যের জোরে শেষ পর্যন্ত খেলায় জয়লাভ করেছে—এরকম ঘটনা খেলাতে হামেশাই দেখতে পাওয়া যায়। ভাগ্যের জোরে অনেক ক্লাব লীগও পেয়েছে। কিন্তু এবছর ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব লীগের খেলায় কখনও এমন অবস্থায় পৌঁছয়নি যেখানে প্রতিপক্ষের থেকে খারাপ খেলে শেষে ভাগ্যের জোরে বিপক্ষদলকে হারিয়ে একটা কি দুটো পয়েন্ট কুড়িয়ে শেষে কোনপ্রকারে দু'এক পয়েন্টের ব্যবধানে লীগ পেয়েছে। লীগের খেলার সূচনা থেকে লীগ খেলার শেষ পর্যন্ত তারা মোটামুটি একটা খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড বজায় রেখে এসেছে যেটা অপর কোন দলেরই আজ নেই। লীগে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের হার ৩টে, মোহনবাগানের কাছে ১-০ ও ২-১ গোলে এবং এরিয়ান্সের সঙ্গে অসমাপ্ত খেলায় ২-১ গোলে। গোলশূন্য ড্র একটা, মহমেডান স্পোর্টিং দলের সঙ্গে। লীগের সমস্ত খেলার মধ্যে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব উল্লিখিত চারটি খেলায় এবছরের তাদের খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড অনুযায়ী মোটেই খেলতে পারে নি। লীগের দ্বিতীয়ার্ধে খেলা সমাপ্তির ছ'মিনিট আগে পর্যন্ত ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ২-১ গোলে এরিয়ান্সের কাছে হারছিল। এরিয়ান্সকে ১টা গোল শোধ দেওয়ার আগে পর্যন্ত তারা এরিয়ান্সের থেকে খুব খারাপই খেলছিল কিন্তু একটা গোল শোধ দেওয়ার পর দলের মধ্যে সংঘবদ্ধ আক্রমণের এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে বেশ বোঝাপড়া পরিলক্ষিত হয়। খেলার দিক থেকে ছয় মিনিট সময় যথেষ্ট। তারা গোলটি হয়ত পরিশোধ করতে পারতো, অবিশ্যি ভাগ্যদেবী তাদের উপর যদি বিরূপ না হতেন। কিন্তু একটি অবাঞ্ছিত কারণে খেলাটি বন্ধ হয়ে যায়। মুষ্টিমেয় দর্শকের উচ্ছৃঙ্খল আচরণে রেফারী খেলাটি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই ছয় মিনিট সময় যথেষ্ট ছিল এবং ধৈর্য্যসহকারে দলের সমর্থকদের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করাই উচিত ছিল। এবছর লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপ ছাড়া ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের অপর একটি বড় কৃতিত্ব, শোচনীয়ভাবে লীগের দ্বিতীয় খেলায় ৬-১ গোলে মহমেডান স্পোর্টিং দলকে পরাজিত করা। লীগের প্রথম খেলাটি তারা গোলশূন্য ড্র করে। ইষ্টবেঙ্গল ছাড়া মহমেডান স্পোর্টিংকে এ পর্যন্ত কোন খেলাতে কোন দলই এত অধিক গোলে হারাতে পারেনি। সেদিনের খেলায় মহমেডান স্পোর্টিং দলের সেন্টার হাফ দার মহম্মদ এবং রমজান নামেননি। প্রথম গোল হয় ২৫ সেকেণ্ডে। ছয় মিনিটের মধ্যে ৩টে গোল হয়। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব খেলার প্রথমার্ধে ৪-১ গোলে অগ্রগামী থাকে এবং দ্বিতীয়ার্ধে আর ১টা গোল দেয়। প্রকৃতপক্ষে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের সামনে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের রক্ষণভাগ একেবারে দাঁড়াতে পারেনি। লীগের রাণার্স-আপ হয়েছে গত বছরের লীগ বিজয়ী মহমেডান স্পোর্টিং। এই নিয়ে তারা ৩বার লীগে রাণার্স আপ হ'ল। ইষ্টবেঙ্গলের থেকে তাদের ব্যবধান ৭ পয়েন্টের। লীগে এবার মহমেডান স্পোর্টিংয়ের শোচনীয় পরাজয় ইষ্টবেঙ্গলের কাছে ৬-১ গোলে, রাজস্থানের কাছে ৪-১ গোলে এবং ক্যালকাটার কাছে ৩-০ গোলে। গত বছরের লীগের রাণার্স আপ এবং আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগান ক্লাবের স্থান এবার তৃতীয় স্থানে। ইষ্টবেঙ্গলের থেকে ৯ পয়েন্ট এবং মহমেডান স্পোর্টিংয়ের থেকে ৩ পয়েন্টের ব্যবধান। মোহনবাগান ক্লাবের রক্ষণভাগের সুনাম বহুদিনের কিন্তু এবার তাও নষ্ট হ'তে বসেছে। যে সব খেলোয়াড় এই দলে আনা হয়েছে তাদের দিয়ে মোহনবাগান ক্লাব মোটেই লাভবান হয়নি। এই দলের গত বছরের নামকরা খেলোয়াড়রা পর্যন্ত এ বছর একেবারেই সুবিধা করতে পারেনি। খেলোয়াড় সংগ্রহের তথাকথিত নীতি যদি গ্রহণ করাই বিবেচ্য হয় তাহ'লে পুরোপুরি তার সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করাই উচিত। গোলের মুখে ফরওয়ার্ডদের ব্যর্থতা মোহনবাগানের অনেক দিনের অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। অনেক নামকরা খেলোয়াড়দের পর্যন্ত মোহনবাগানের আক্রমণভাগে যোগদানের পরই খারাপ খেলতে দেখা গেছে। গোলের মুখে বল পেয়ে অহেতু দেরী করা এ অভ্যাস মোহনবাগানের খেলোয়াড়দের আছেই, তাছাড়া দু'একজন ছাড়া সকল ক্লাবের খেলোয়াড়দেরও। মোহনবাগানের দুর্ভাগ্য, অলিম্পিক প্রত্যাগত মান্না, আও এবং মহাবীরকে এ মরসুমে কোন কাজে লাগানো যায় নি। পায়ের আঘাতের ফলে মান্নাকে

একরকম খেলা ছেড়ে দিতে হয়েছে। আওসের দু'একটি খেলা ভাল হয়েছে। নামকরা খেলোয়াড় নাজার এখন একমাত্র পেনাল্টি স্পট করার পক্ষে নিভরযোগ্য। হাফ লাইনের সখন অনিল দে এবং অভয় ঘোষ। শরীর ভারী হওয়ার দরুণ অনিলের খেলার গতিবেগ আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে সত্য, কিন্তু তাঁর মত দায়িত্বশীল খেলোয়াড় ক্লাবের পক্ষে গৌরবজনক। দলের অতি সঙ্কটের সময় অনিল দে আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের অস্ত্র বল দিয়ে কেবল দলের খেলোয়াড়দেরই উদ্দীপ্ত করে না, সমগ্র দর্শকমণ্ডলীকে তাঁর সৃষ্টিকারের প্রচেষ্টায় আশান্বিত করে। অনেকবারই দলকে পতনের মুখ থেকে এইভাবে রক্ষা করেছেন। অভয় ঘোষ বেশ পরিশ্রম করে খেলতে পারেন, আক্রমণ এবং আত্মরক্ষামূলক খেলায় তিনি নিজের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ডি সেন, মুস্তাফী এবং চক্রবর্তী এই তিনজন গোলরক্ষক অনেক বারে গোল খেয়েছেন।

সারা লীগের খেলায় মোহনবাগান বড় খেলাগুলিতে ভাল খেলেছে। মহমেডান স্পোর্টিং দলের সঙ্গে তাদের প্রথম খেলা ড্র যায় কিন্তু খেলায় ভাল খেলে শেষ সময়ে খেলা সমাপ্তির ৩০ সেকেণ্ড আগে অতর্কিতে একগোল খেয়ে যায়। ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে দুটি খেলায় মোহনবাগান জয়লাভ করেছে প্রথমটা ১-০ গোলে এবং ফিরতি খেলায় ২-১ গোলে। হার, ভবানীপুর, এরিয়ান্স, মহমেডান স্পোর্টিং, স্পোর্টিং ইউনিয়ন এবং রেলদলের কাছে। লীগের দ্বিতীয় অধিকারী রেঞ্জার্স দলের সঙ্গে দুটি খেলা ড্র করা বিশেষের কারণ। লীগের শেষের দিকে মোহনবাগান ক্লাবের শোচনীয় ব্যর্থতা এবং অপরদিকে ইস্টবেঙ্গল দলের কাছে গত বছরের লীগ বিজয়ী মহমেডান স্পোর্টিং দলের ৬-১ গোলে শোচনীয় পরাজয়ে খেলার মাঠের এক শ্রেণীর দর্শকমণ্ডলী আশা করেছিলেন মোহনবাগান দলকে ফিরতি খেলায় ইস্টবেঙ্গল দলের কাছে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের মত এমন কি তার চেয়েও অধিক গোলে হার স্বীকার করতে হবে। মোহনবাগান ক্লাবের 'tradition' বড় খেলায় জয়লাভ করা আর সাধারণ খেলায় অপ্রত্যাশিত খারাপ খেলে হার স্বীকার কিম্বা খেলা ড্র করা। এবার লীগের ঘরসুমে মোহনবাগান ক্লাব তাদের পূর্ব্ব খ্যাতি এবং অখ্যাতি সমানভাবেই বজায় রেখেছে। ফিরতি খেলায় ইস্টবেঙ্গল দল তাদের অস্তগামী মাদ্রাজদের নিয়েও শেষ রক্ষা করতে পারেনি। এই খেলায় মোহনবাগান ক্লাবের পক্ষে আরও অধিক গোলের ব্যবধানে জয়ী হওয়া উচিত ছিল, এরা একাধিক অব্যর্থ সুযোগ নষ্ট করেছে। ই আই রেলদল লীগের চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে। অলিম্পিক প্রত্যাগত ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে দেখা গেল একমাত্র মেওয়ালালের খেলাই পড়েনি বরং বহু গুণ উন্নত হয়েছে। এবার লীগের খেলায় মেওয়ালাল সর্ব্বাধিক গোল দেওয়ার কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছেন। তাঁর গোলসংখ্যা ৩০। লীগ এবং আন্তঃ-প্রাদেশিক খেলা নিয়ে 'হ্যাট্রিক'র সংখ্যা ৫টা। এই দলের লেফট আউট এস নন্দী এবং রাইট আউট এস ঘোষের খেলাও উল্লেখযোগ্য। ভবানীপুর ক্লাব লীগের প্রথমদিকে যে রকম খেলছিল, শেষ পর্য্যন্ত তার কিছুটা খেললে তাদের গত বছরের শীল্ড খেলায় রানার্স-আপ হওয়ার খ্যাতি বজায় থাকতো। এই দলের গোলরক্ষক এম সরকার খেলায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে আন্তঃ-প্রাদেশিক সন্তোষট্রফি প্রতিযোগিতায় বাংলা দলে স্থান পেয়েছিলেন। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের আক্রমণভাগে আবিদের খেলা বিশেষ ক'রে হেড দেওয়ার কৌশল দর্শনীয় কিন্তু এই দলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রায় সকলেই 'গ্যালারী লো' করে খেলতে বিশেষ উৎসাহবোধ করেন। বর্ত্তমান কালের ফুটবল খেলার পদ্ধতিতে এরকমধরণের খেলা বিগত দিনের ব্যাপার। লীগের খেলায় বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে ক্যালকাটা গ্যারিসন দল। ক্যালকাটা গ্যারিসন দল আজ ফুটবল মহলে আলোচনার বিষয়ে দাঁড়িয়েছে।

লীগে ক্যালকাটা গ্যারিসন নাম দিয়ে যে সামরিক দলটি প্রথম খেলতে নেমেছিল তারা খেলার মাঠে একটি উপহাসের পাত্রে পরিণত হয়েছিল। পর্য্যায়ক্রমে ১৭টা খেলায় হেরে এই দলটি প্রথম জয়লাভ করে ২-১ গোলে জর্জ্জ টেলিগ্রাফ দলের সঙ্গে লীগের ফিরতি খেলায়। ঐদিন পূর্ব্বের দলটির পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ নতুন খেলোয়াড় দিয়ে সামরিক দলটি গঠন করা হয়। এই সব খেলোয়াড় গুর্খা রাইফেলস দলের অন্তর্ভুক্ত। প্রথম জয়লাভের পর তারা ভবানীপুর দলকে ৪-০ গোলে হারিয়ে দর্শক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরপর রেলদলকে ৩-২ গোলে, এরিয়ান্সকে ২-১ গোলে এবং রেঞ্জার্সকে ৩-২ গোলে হারিয়ে দর্শক মণ্ডলীর যথেষ্ট সমর্থন লাভ করেছে। প্রথমেই এই দলের খেলোয়াড়দের দেহের বলিষ্ঠ গঠনের কথা উল্লেখ করতে হয়। ফুটবল খেলার উপযোগী এই দলের খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্য বটে! খেলায় মনও যথেষ্ট। সামরিক জীবনে পরিমিত পুষ্টিকর খাদ্য এবং নিয়মাধীন জীবনযাত্রায় এইরূপ স্বাস্থ্য সকল সম্ভব হয়েছে স্বীকার করি। দলের খেলোয়াড়রা বেশ সময় পায়ে বল রেখে বিপক্ষের খেলোয়াড়দের আত্মরক্ষায় সুবিধা দেয় না। এদের খেলাকে খেলাধূলার ভাষায় বলা যায় অবিকল 'copy book football.' আক্রমণভাগে তিনজন খেলোয়াড়ের নাম উল্লেখযোগ্য—লেফট আউট পুরন বাহাদুর, রাইটইন সুখলাল এবং সেণ্টার ফরওয়ার্ড ধনবাহাদুর। এদের মধ্যে পুরন বাহাদুরই শ্রেষ্ঠ।

মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষা

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১২৭নং প্যাঁচ

অপরে যদি পিছনে যাইয়া কোমরটি জড়াইয়া ধরে এবং তাহার মাথাটি নিজের ডান ধারে থাকে তাহা হইলে ডান বাহু দিয়া তাহার গলাটি জোরে জড়াইয়া ধরিয়া (১২৭নং প্যাঁচের ১ম চিত্র) নিম্নে পা-দুইটি আগাইয়া দিয়া চিৎ

১২৭নং প্যাঁচের ১ম চিত্র

হইয়া শুইয়া পড়িলে তাহার গলায় লাগাইয়া তাহাকে মাটিতে আটকাইয়া রাখা যায় (১২৭নং প্যাঁচের ২য় চিত্র)

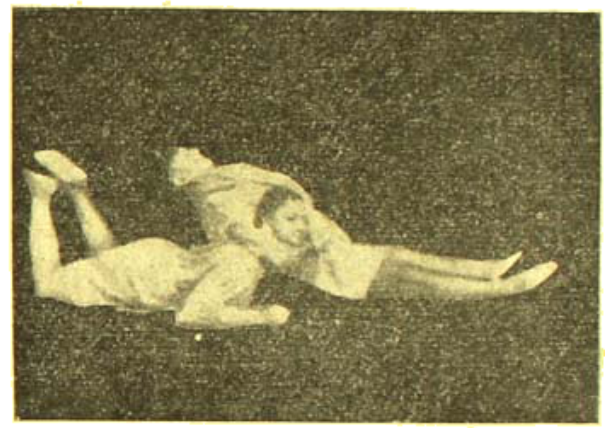

১২৭নং প্যাঁচের ২য় চিত্র

১২৮নং প্যাঁচ

যদি কেহ ডান হাত দিয়া মুখে ঘুষি মারিতে আসে তৎক্ষণাৎ তাহার ডান কব্জীর ডান ধারে নিজের ডান

বাহু দিয়া আটকাইয়া সঙ্গে সঙ্গে ঐ হাত দিয়া তাহার ডান মুঠোটি ধরিয়া হইয়া বাঁ পা-টি তাহার ডান পায়ের

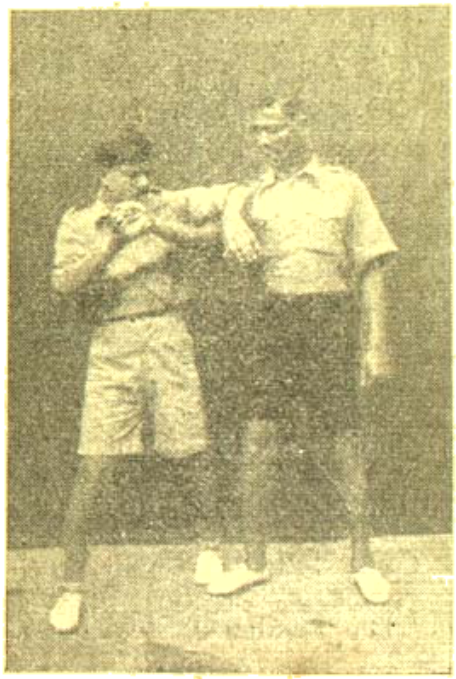

প্যাঁচের ১ম চিত্র

ডান পাশে আগাইয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজে ডান দিকে ঘুরিয়া ও বাঁ হাতটি তাহার ডান হাতের উপর দিয়া লইয়া গিয়া (১২৮নং প্যাচের ১ম চিত্র) তাহার কব্জিটি চিৎ করিয়া বাঁ হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া ও বাঁ হাত দিয়া

১২৮নং প্যাচের ২য় চিত্র

১২৮নং প্যাচের ৩য় চিত্র

নিজের ডান কব্জিটি ধরিয়া তাহার কনুই ও মুঠোটিতে চাড় দিতে দিতে (১২৮নং প্যাচের ২য় চিত্র) নিচু হইয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলে তাহাকে মাটিতে আটকাইয়া রাখা যায়। (১২৮নং প্যাচের ৩য় চিত্র)

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীহরি দেব সরকার প্রণীত উপন্যাস "অনেক মিল"—৩।০
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রণীত "নির্বাচনের স্বপ্নভঙ্গ"—১৸০
স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত "শিক্ষা"—১৲
অধ্যাপক যোগেশ প্রণীত "যোগাযোগিতে গান্ধীজী"—২।০
হরেন্দ্রলাল সেন প্রণীত উপন্যাস "কারেন"—৪।০
শৈলেন চক্রবর্তী প্রণীত "গীতি-গুচ্ছ"—১৲
ব্রহ্মচারী কৃষ্ণচৈতন্য প্রণীত "বাঙ্গলার দুই ঠাকুর"—২।০
মনোরঞ্জন ঘোষ প্রণীত "চট্টগ্রাম বিপ্লব"—৩৲
বিজয়কুমার প্রণীত "বুনিয়াদী শিক্ষা"—২৲
ধীরেন দাস প্রণীত উপন্যাস "মেট্রোপলিস"—২৲
বনফুল প্রণীত উপন্যাস "তীর্থপতি"—৪।০
শ্রীশরৎ দত্ত প্রণীত রহস্যোপন্যাস "রক্ত মোহন"—২৲, "জ্বাল-বীপে মোহন"—২৲, "ইটেরাপে মোহন"—২৲, "মোহন-বিভীষিকা"—২৲
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত "কপালকুণ্ডলা"—১৲
শ্রীবিভূতি মুখোপাধ্যায় প্রণীত "এ্যাট্ টেকার অফ মার্কো পোলো"—১৷০
হেমেন্দ্রবিজয় সেন প্রণীত রহস্যোপন্যাস "বেডফোর্ড মার্ডার কেস"—১৷০
শ্রীসময় সরকার প্রণীত উপন্যাস "বীরেশ লাহিড়ী"—২৸০
শ্রীমৎ চণ্ডীচৈতন্য ব্রহ্মচারী প্রণীত "ব্রহ্মচর্য্য-প্রসঙ্গ" (১ম ভাগ)—১৲
"ব্রহ্মচর্য্য-মাহাত্ম্য"—৶০

বিজ্ঞাপন দাতাদের প্রতি

সবিনয় নিবেদন : 'ভারতবর্ষ' আশ্বিন এবং কার্ত্তিক সংখ্যা অন্যান্য বৎসরের মত এবারেও ৺পূজার পূর্বে যথা নিয়মে প্রকাশিত হইবে ; সুতরাং বিজ্ঞাপন-দাতাগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন সময় মত আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপনের কপি একত্রে পাঠাইয়া আমাদের কার্যে সহযোগিতা করেন। ইতি—

কর্ম্মাধ্যক্ষ—"ভারতবর্ষ"

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

আশ্বিন—১৩৫৬

প্রথম খণ্ড	সপ্তত্রিংশ বর্ষ	চতুর্থ সংখ্যা

স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও "বন্দেমাতরম"

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের অনিবার্য্য দাবী

বরিশালের প্রাদেশিক রাষ্ট্র-সম্মেলন ; বাংলা দেশের সর্বপ্রিয় নেতৃবৃন্দ সভায় উপস্থিত, বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতিনিধিগণের অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়াছে,—নাম্বিষ্ক স্বেচ্ছাসেবকগণের মধ্য দিয়া নির্ব্বাচিত সভাপতি সর্ব্বজন-প্রিয় নেতা স্বাধীনবর সুরেন্দ্রনাথ সভামঞ্চের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন, চারিদিকের জনসমুদ্র যেন উথলিয়া উঠিল—সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—"বন্দেমাতরম্।"

সম্মেলনের চারিদিকে লাল-পাগ্‌ড়ীর ঘরে ও 'রেগুলেশন' লাঠির ঠক ঠক শব্দে সন্ত্রাসিত জনতা একবার আগাইয়া আসিতেছে, একবার পিছনে হটিয়া যাইতেছে। চারিদিকে যেন কেমন একটা থমথমে ভাব। সম্মেলনের কাজ আরম্ভ হইল "বন্দেমাতরম" সঙ্গীতের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের পর। কিছুক্ষণের মধ্যে কোথা হইতে কি হইল কে জানে—পুলিশের লাঠিতে প্যাণ্ডেল ভাঙিল—নরনারী শিশু নির্ব্বিশেষে অধিকাংশ লোক আহত হইল ; কিন্তু সেই বিপ্লব-সভা-প্রাঙ্গণে সমবেত মুক্তকণ্ঠে উচ্চারিত হইতে লাগিল—বন্দেমাতরম। সে ধ্বনি মুহুর্মুহু চারিদিক হইতে উত্থিত হইয়া সমগ্র পুলিশবাহিনীকেও যেন সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতে লাগিল।

দেখা গেল, স্বেচ্ছাসেবক চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিতেছে -এবং পুষ্করিণীতে নামানি চুবানি খাওয়াইতেছে। ইংরাজ শাসনের কড়া আইনে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় ভারপ্রাপ্ত প্রহরী বাঙালী ও বিহারী পুলিশ পুরুষের দল সভাই সেদিন ইংরাজ সরকারের নিমকের মর্য্যাদা রাখিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বহুবার ডুব দম্ভ করিবার পর পুলিশ চিত্তরঞ্জনকে জলে ডুবাইতে লাগিল—বাংলাদেশের অন্যায়াচারিত দুর্বলশক্তির প্রতীক কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক চিত্তরঞ্জন শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় জলের উপরে মাথাটা তুলিতে পারিলেই পরিত্রাহি কিন্তু নির্ভিক কণ্ঠে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন—"বন্দেমাতরম" ! "বন্দেমাতরম" !!

তাহার পর অর্থাৎ ১৯০৬ সাল হইতে ১৯৪৮ সালের শেষ পর্য্যন্ত "বন্দেমাতরম" ধ্বনির তাৎপর্য্য ও সার্থকতা আমরা নানাভাবে নানা ক্ষেত্রে উপলব্ধি করিলাম। দেশের স্বাধীনতা লাভের দুর্জ্জয়নীয়

আকাঙ্ক্ষায় বাংলার বিপ্লবীগণ হাতে হাত-কড়া পরিবার সময় অম্লানচিত্তে যাত্রার পথে নির্ভীক কণ্ঠে উচ্চারণ করিত "বন্দেমাতরম,"—কারাগারের দুর্ভেদ্য লৌহ কপাটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একবার অপরিচিত কারাজীবনের নির্মম কঠোরতা ও নির্যাতনের কথা তাহারা ভাবিল না—বন্দীজীবনের পরম গৌরব অর্জ্জন করিয়া প্রবেশপথে ধ্বনি তুলিল—"বন্দেমাতরম"। কারাদ্বারের অর্গল বন্ধ হইয়া গেল—প্রাচীরের অন্তরাল হইতে কাণে আসিতে লাগিল—"বন্দেমাতরম"—কারাধ্যক্ষ সহকর্ম্মী বিপ্লবীর মন রুদ্ধ কক্ষ হইতে সানন্দে নূতন বন্দীকে অভিনন্দন জানাইয়া বলিতেছে—"বন্দেমাতরম" ; ফাঁসির মঞ্চে উঠিবার সময় সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নিজের হাতে ফাঁসির রজ্জু লইয়া আপনার গলায় পরিতে পরিতে বলিয়া উঠিল "বন্দেমাতরম" ; সেই মৃত্যুগ্রহী বার 'বন্দেমাতরম' শুনিয়া জেলার সাহেব এক পা পিছাইয়া গেল, কিরিঙ্গি ওয়ার্ডার মাথা নীচু করিল, জল্লাদের হাতের মধ্যে হঠাৎ যেন বিদ্যুৎবহ্নি খেলিয়া গেল—তাহার বুকও যেন একবার কাঁপিয়া উঠিল—ফুলের পরিতে পরিতে মৃত্যুকে একেবারে মুখোমুখি দেখিতে পাইয়াও বীর বিপ্লবী বাঙালীর কণ্ঠে অকুতোভয়ে ধ্বনিত হইল—"বন্দেমাতরম।" —চিরাভ্যস্ত হাতির দাঁতের কৌটায় রাখিতে রাখিতে আমাদের ঘরের মাতব্বরেরা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন, "বন্দেমাতরম"—ফুলবন্ধু মাথায় বোঁটাইয়া "বন্দেমাতরম" মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে নারায়ণের সিংহাসনের তলে সেই ভস্ম শ্রদ্ধাভরে স্থাপন করিয়া প্রণত হইয়া প্রণাম করিলেন। সে যুগের স্মৃতি এখনও নিঃশেষে মুছিয়া যায় নাই।

দেশের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে প্রারম্ভিক মাঙ্গলিক মন্ত্র "বন্দেমাতরম" —সভাগৃহে হাততালিতে "বন্দেমাতরম"—নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে "বন্দেমাতরম"—বক্তৃতা আরম্ভে "বন্দেমাতরম" এবং শেষে "বন্দেমাতরম"। শহীদ বরণে—"বন্দেমাতরম",—শোকযাত্রায় "বন্দেমাতরম"। এমনি ভাবে স্বদেশমন্ত্রের সঞ্জীবনী মন্ত্র ছিল বন্দেমাতরম, বিপ্লবীরা বুকের রক্ত দিয়া প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষরের সময় উচ্চারণ করিতেন "বন্দেমাতরম" —এক কথায় দেশের প্রতি ধূলায়, দেশবাসীর প্রতি অণুপরমাণুতে এই "বন্দেমাতরম" ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া গিয়াছে—এই পবিত্র মন্ত্রখানি স্বকীয় মহিমায় এমন একটি ঐতিহ্য গড়িয়া তুলিয়াছে যে তাহাকে বাদ দিয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস রচিত হইতেই পারে না। স্বাধীনতা লাভের পরও নূতন যে ইতিহাসের আরম্ভ সৃষ্টি হইতে চলিয়াছে—বন্দেমাতরমকে বাদ দিলে তাহারও সার্থকতা বিশেষভাবে ম্লানপ্রাণ হইবে—বহুজীবনের শোণিত ধারার অতিরিক্ত এই মহামন্ত্রটি ভুলিয়া দেশে মাতৃপূজার অন্তরায় হইবে—শুভকর্ম্মে ব্যাঘাত ঘটিবে—সন্তানের সে পূজা মা কখনই গ্রহণ করিবেন না।

তাই বলিতেছিলাম বন্দেমাতরম ছাড়িয়া বাংলা যেন বাংলা নহে, বাঙালীও বাঙালী নহে—ভারতবর্ষও ভারতবর্ষ থাকিবে না—তাহার যুগ যুগান্তরের ঐশ্বর্য্য, গৌরব, ঐতিহ্য ও ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। বন্দেমাতরম—বাঙালীর জীবনের পরমায়ু—ভারতবাসীর প্রাণস্পন্দন—তাহাকে বাদ দিয়া বাঙালী বাঁচিবে না, ভারতবাসীও বাঁচিতে পারে না ; তাহার বৈপ্লবিক আদর্শ ও চিন্তাধারার উৎস রুদ্ধ হইয়া যাইবে।

স্বাধীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত

সম্প্রতি স্বাধীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে "বন্দেমাতরম"কে গ্রহণ করিবার পক্ষে স্থির হইয়াছে দেখিয়া আমরা যুগপৎ বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি। বিস্ময় আমার জন্য এই যে এক পূর্ব্ব-পাঞ্জাব ছাড়া ভারতের সকল প্রাদেশিক কংগ্রেস বন্দেমাতরম সঙ্গীতটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ করিয়াছেন এবং এই কার্য্যের অগ্রণী হইয়াছে—যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ। আমরা বাঙালী—আমাদের মনে আনন্দ হয় যখন দেখি, ভিন্ন ভাষা-ভাষী প্রদেশও "বন্দেমাতরম"এর ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়া জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে তাহাকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে চাহিতেছেন। কিন্তু বাঙালী হইয়া ইহার জন্য আমরা কি করিয়াছি? কাগজে কাগজে অন্যান্য লেখালেখি করিয়াছি সত্য—তাহাও সম্পাদকীয় হিসাবে তেমন উল্লেখযোগ্য নহে—খবরের কাগজের চিঠিপত্রের কলমে পত্রাঘাত করিয়া অর্থাৎ চিঠি পাড়িয়া দেবতার মাথায় ফুল দিবার চেষ্টা করিয়াছি। তেমন তীব্রভাবে আন্দোলন করি নাই—ঘরে ঘরে প্রতিবাদ উঠে নাই—সভাসমিতিতে জনসাধারণের দৃঢ় মতকেও মুখর হইয়া উঠিতে দেখা যায় নাই। 'হইলে ভাল হইত'—ভাবটা আমাদের এইরূপ।

আমরা অবশ্য বন্দেমাতরম সঙ্গীতের সম্পূর্ণ অংশকে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী নহি। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে কংগ্রেস যে অংশটুকু গ্রহণ করিয়াছিলেন—সেই অংশটুকু গৃহীত হইলেই আমরা সুখী হইব। তাহা হইলে অন্য কোনও সম্প্রদায়ের আপত্তির কোনও কারণ থাকিবে না।

আপত্তি উঠিয়াছে, উহা সমবেত কণ্ঠে বা ফুট মার্চ্চের অর্থাৎ সামরিক সুরতাল সমন্বয়ে গীত হইতে পারে না।

এ আপত্তির মধ্যে যৌক্তিকতা কতখানি আছে তাহার বিচার করিবেন সুরজ্ঞেরা—চিরিবন্দরণের সরঞ্জাম-পরিষদ হয়ত ইহার একটা নিষ্পত্তি করিতে পারেন। তবে ইহা দেশ-প্রীতি জাগাইবার পক্ষে কার্য্যকরী নহে—এ কথার মধ্যে কোনও যুক্তি নাই। কারণ আমরা দেখিয়াছি কোনও অনুষ্ঠানে বন্দেমাতরম সঙ্গীতটি সুষ্ঠুভাবে গীত হইলে দেশমাতৃকার প্রতি স্বভাবতই ভক্তিপূর্ণ অনুভূতি জাগে, বন্দেমাতরম-এর ইতিহাসের কথা মনে পড়িয়া অন্তরে উদ্দীপনা আসে। "যুদ্ধং দেহি" "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া মাল কোঁচা আঁটিয়া লাফাইয়া উঠিবার ইচ্ছা না হইলেও—'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের গুণে প্রয়োজন হইলে—সুযোগ ঘটিলে মানুষ যুদ্ধের জন্যও প্রস্তুত হইতে পারে—। প্রয়োজন হইলে ত্যাগ স্বীকারের সংকল্প একদিন যেমন প্রয়োজনেই আগিয়াছিল—তেমনই সংকল্প পুনরায় গ্রহণ করিবার ইচ্ছাও অনায়াসে জাগিতে পারে। প্রশ্ন সেখানে নহে—যাঁহারা 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত বর্জ্জন করিতে চাহেন—তাঁহাদের কল্পনাশক্তি ও যুক্তি-সাধনার ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধার একান্ত অভাব ঘটিয়াছে—সেইখানেই এ সকল অবান্তর প্রশ্ন উঠিতেছে।

এ সম্বন্ধে কৃষ্ণ ঊষরভারকার তাঁহার একটি প্রবন্ধে ঠিকই বলিয়াছেন :—

"Bankim Chandra Chatterjee is in a deep slumber today—in a sleep of eternity • • • but his "Vande-mataram" is the trumpet-Call of the Nation to awake into national consciousness, political unity and integration, social and economic solidarity and international fraternity. The message he has left behind in his Song, echoes and re-echoes in the patriotic hearts of the people, while their pulses throb with convergent life and inspiration every time it is sung."

অর্থাৎ আজ বঙ্কিমচন্দ্র অস্তিমশয়নে চিরনিদ্রায় রহিয়াছেন কিন্তু তাঁহার বন্দেমাতরম আজ জাতিকে স্বজাত্যবোধে জাগ্রত হইতে, রাজনৈতিক ঐক্যে ও সংঘবদ্ধতায়, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক একত্বে এবং আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্রে মিলিত হইবার জন্য তেরী নিনাদে আহ্বান করিতেছে। এই সঙ্গীতে তিনি যে বাণী রাখিয়া গিয়াছেন, জাতির দেশপ্রীতিপূর্ণ অন্তরে তাহাই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে।—এবং যখনই এ সঙ্গীত গীত হয় তখনই নবজীবনের উদ্দীপনা ও প্রেরণায় তাহাদের ধমনী নাচিয়া উঠে।"

এই 'বন্দেমাতরম' গান সারা দেশের জাতীয় জীবনের উদ্দীপনা জাগাইয়াছে, —আমিকার এই স্বাধীন জাতি-গঠনের মূলে রহিয়াছে বঙ্কিমের এই গান—সেই গানের শব্দ-তরঙ্গ বায়ুস্তর ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠে, ভারতের ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হইয়া আমাদের গর্ব্বের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়।

বিংশ শতকের প্রাক্কালে, বাংলা সাহিত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান ছিল বঙ্কিমের—তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত, ধর্ম্মগুরু রামকৃষ্ণ পরমহংস। বাঙলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশিষ্ট অবদান ছাড়া তিনি অমর সঙ্গীত বন্দেমাতরমের স্রষ্টা বলিয়া অভিনন্দিত হইবার যোগ্য। তাই স্বাধীনতার অন্যতম অগ্রদূত হিসাবে শুধু এই গানের জন্যই তাঁহার স্থান হওয়া উচিত পুরোভাগে। স্বর্গীয় প্রেরণা হইতে এ গানের উদ্ভব—ভারতের সেই দুর্দ্দিনে বুকের রক্ত ও চোখের জলে লেখা এই গান—ভারতবাসীর অন্তরে ও মনে ক্ষোদিত হইয়া গিয়াছে। ঐক্য ও দেশপ্রীতিতে বিশ্বজাতির সঙ্গে একত্ববোধে—'বন্দেমাতরম'কে স্বাধীন ভারতের 'মার্সাই' (Marsailles) বলিয়া অভিহিত করা যায়।

"বন্দেমাতরম"এর উৎপত্তি ও প্রভাব

বাল্যকাল হইতেই বঙ্কিম ছিলেন ব্রিটিশ নীতির বিরোধী। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন (Permanent Settlement) বাংলাদেশে প্রবর্ত্তিত হইলে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। সেদিন বন্দিনী ভারতের কাতর কৃষকদিগকে পল্লী-রাজের হাত হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী উদ্যত হইয়া উঠিল। তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে বে-আইনী ও ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষণা করিলেন, সমগ্র জাতিকে এই প্রথা দুর্বল করিয়া ফেলিবে বলিয়া বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় ধারাবাহিক ভাবে উহার সমালোচনা করিতে লাগিলেন। ঐ বৈপ্লবিক ভাব—সাধনা হইতেই "বন্দেমাতরমে"র উদ্ভব বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ"এ। দেশের মুক্তি সাধনার এই মন্ত্র লোকলোচনের অন্তরালে প্রতিষ্ঠিত আনন্দ মঠের সন্তানগণ গাহিতে লাগিলেন; সেই সঙ্গীতের ভাষায় ও ভাব-ব্যঞ্জনায় ফুটিয়া উঠিল বিপ্লবী সন্তানগণের মাতৃপূজার স্বরূপ।

ইহার পর বন্দেমাতরম সঙ্গীত প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবৎ লুপ্ত অবস্থায় থাকিয়া যায়। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের সময় সভায় বন্দেমাতরম সঙ্গীতটি গীত হইলে সভায় সকলে তাহার সুরে সুর মিলাইয়া সমবেত কণ্ঠে গাহিয়া উঠিলে সেখানে এক অপূর্ব্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি হইত। এই সঙ্গীত সেদিন বাংলার যুবশক্তিকে জাগ্রত করিয়া দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকারে সংঘবদ্ধ করিয়া তুলিল, কারাগারে রাজবন্দীরা সে সঙ্গীতে তাহাদের ক্লান্তি, অবসাদ ও নৈরাশ্য ভুলিল,—গৃহে গৃহে জননী ভগ্নীরা সে সঙ্গীতে প্রিয়জনের বিচ্ছেদ—বেদনায় সান্ত্বনা লাভ করিল।

সে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা বঙ্গদেশ হইতে অন্য প্রদেশে তরঙ্গিত হইয়া উঠিল—ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম সুরু হইল সেদিন 'বন্দে-মাতরম' সঙ্গীতে।

১৯০৬ সালে দাদাভাই নওরোজির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় মহাসভার উদ্বোধন হইল এই বন্দেমাতরম সঙ্গীতে। বর্ত্তমান রাজনৈতিক ইতিহাসের সূচনা হইল 'বন্দেমাতরম'এর পটভূমি ও আদর্শে। ১৯০৬ সাল হইতে সেদিন পর্য্যন্ত জাতীয় মহাসভার জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে ইহাই গীত হইয়াছে—দেশসেবকগণ এই সঙ্গীতকেই জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি সকলের মনে, বিশেষতঃ বাঙালীর মনে নানা কারণে সন্দেহ আসিয়াছে—হয়ত 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে যথাপরিষদে গৃহীত হইবে না। অথচ এতদিন আমরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 'বন্দেমাতরম'কে প্রধান অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি।

কিছুকাল পূর্ব্বে 'বন্দেমাতরম'কে ব্রিটিশ-বিদ্বেষী বলিয়া কলঙ্কিত (?) করা হইয়াছিল এবং কেহ সে গান গাহিলে তাহাকে কারারুদ্ধ করা হইত। বন্দেমাতরম এরেলের অসহযোগ ও অসংযোগ আন্দোলনে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল—ইহা আমরা সকলেই জানি। সেদিনও উহা হিন্দুধর্ম্মভাবাপন্ন বলিয়া মুসলমান ভাইদের তরফ হইতে কোনও আপত্তি উঠিতে শুনা যায় নাই। বন্দেমাতরম সঙ্গীতে সেদিন আমরা মনে নূতন বল পাইয়া নূতন তরঙ্গায় উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছি। 'বন্দেমাতরম' ত শুধু গান নহে, ইহা যে মন্ত্র, তাই বন্দেমাতরম অশেষ অমানুষিক নির্য্যাতন সহ্য করিবার ক্ষমতা দিয়াছে, অভাবিত অসম্ভব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সাহস দিয়াছে,—বন্দেমাতরম মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে কত দেশসেবক অকাতরে হাসিমুখে মৃত্যু বরণ করিয়া লইয়াছেন। ধর্ম্ম ও ভাষার প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও, বন্দেমাতরম ক্রমশঃ সকল প্রদেশকে এক সূত্রে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছে, অসীম সংহতি শক্তিতে শক্তিমান

করিয়া তুলিয়াছে একথা আর কে অস্বীকার করিবে? "বন্দেমাতরম"এর ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রকে সেই কারণে জাতীয় সঙ্গীতের জনক বলা যাইতে পারে।

বন্দেমাতরম ও জাতীয় পতাকা একই পদকের দুইটি দিক—অভিন্ন ও অচ্ছেদ্য। সেদিন পর্য্যন্ত ভারতের নবজন প্রবেশ হর্ষের সহিত বন্দেমাতরম সঙ্গীত গাহিয়াছে—আজ কিন্তু সেই অপ্রতিহত অনুরণন বারবার আমরা তালভঙ্গ হইতে শুনিতেছি—ইহা খুবই দুঃখের কথা।

জাতীয় সঙ্গীত নির্ব্বাচনে মতদ্বৈধ

ভারতের জাতীয় সঙ্গীত কোনটি হইবে তাহা লইয়া এ পর্য্যন্ত বহু তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে। জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে—বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম', মহম্মদ ইকবালের "হিন্দুস্থান হমারা" এবং রবীন্দ্রনাথের "জনগণমন-অধিনায়ক"—। রবীন্দ্রনাথের এই সঙ্গীতটিকে ডাঃ কাজিনস্ (Dr. Cousins) ভারতের প্রভাত সঙ্গীত ("Morning song of India") বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

ইকবালের "হিন্দুস্থান হমারা" সঙ্গীতটি এমনি দেশাত্মবোধক ও উচ্ছ্বাসের যে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই উহা বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে গাহিয়াছে। পরে হিন্দু মহাসভা এই গানখানির উর্দ্দু ভাষার জন্য বোধহয় ইহার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন। তাই এই গানখানি তাঁহাদের সমর্থন পাইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। এ সঙ্গীতটিও অমরত্বের দাবী করিতে পারে।

আর খরচস ও কচ্ছাপের পাল্লাপাল্লি হইতেছে—"বন্দেমাতরম"ও "জনগণমন"এর মধ্যে। একই প্রবেশে এই দুইখানি গানের জন্ম এবং দুইখানিই বিশেষ জনপ্রিয়। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, ইহাদের মধ্যে কোনখানি ভারতের জাতীয় সঙ্গীত বলিয়া গৃহীত হইবে। দুইখানি গানের গুণ বিচার করিলে দেখা যায় "জনগণ" সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করে, ইহার সুরও খুব আকর্ষণী—উচ্চগ্রামে হৃদয়-উদ্বোধক। কবিতা হিসাবেও ইহা অনবদ্য—ইহাতে উদ্দীপনা আছে, স্বদেশ প্রেমের উদ্দীপনা আছে, এবং ইহার সৃষ্টিও সুদূর প্রসারী—স্বদেশের মধ্যে সীমা বদ্ধ নহে। সুরটিও যে কোনও ভাষাভাষী সহজেই ধরিতে পারে।

"জনগণ"এর সুরে পাশ্চাত্য আরোহ অবরোহের মাত্রা বা 'গ্রাব' আছে। ইহার উচ্চারণে বাংলা দেশের বৈশিষ্ট্য থাকাই স্বাভাবিক এবং ভাবপ্রকাশের ভঙ্গিটিও একান্ত বাঙালীর। ইহার কথাগুলি সাধারণ মানুষের পক্ষে গাহিতে পারা কঠিন হইলেও ইহার মধ্যে যে আধুনিক মনস্তত্ত্বিকতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে ইহা ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে পারে এবং দেশের লোকের চিত্ত অধিকার করিয়া লইবার মত ইহার আবেদনও যথেষ্ট আছে বলিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ ভারতের প্রধানতম কবি—তিনি কবিগুরু বলিয়া আখ্যাত ও পূজিত—তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাইয়া আসিতেছি, অন্তর দিয়া তাঁহাকে আমরা ভালবাসিয়াছি। তাঁহার সৃষ্টির সৌরভে আমাদের দেশ আমোদিত হইয়া আছে। হয়ত তাঁহার সঙ্গীত বন্দেমাতরম অপেক্ষা আমাদের উপর অধিকতর প্রভাবও বিস্তার করিয়াছে।

দেশের যুবকগণ হয়ত "জনগণ"কেই অধিক পছন্দ করিবে এবং হয়ত তাহারা "বন্দেমাতরম"এর ঐতিহ্য, ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে আমোল দিবে না। কিন্তু কোনও সঙ্গীতের জনপ্রিয়তাই জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে স্বীকৃত হইবার দাবী রাখিতে পারে না।

দুঃখের বিষয় কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতি 'বন্দেমাতরম'এর দুইটি চরণ মাত্র রাখিয়া ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ফ্রান্সের মার্সাই সঙ্গীতের মত দেশ ও জাতির অতীত ইতিহাসের সহিত সম্পর্কিত সঙ্গীতই কোনও দেশের জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত হইতে পারে। কাজে কাজেই রবীন্দ্রনাথের 'জনগণ' অন্যতম জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গৃহীত হইবার পক্ষে কোনও বাধা নাই। কিন্তু এই 'বন্দেমাতরম' এর কথা স্বতন্ত্র। দেশের অতীতের গৌরবময় ইতিহাসের সহিত ইহার সুগভীর সম্পর্ক—"অতীত গৌরবময়ী" ইহার বাণী। বিপ্লবী ভারতের মন্ত্র-বাণি ছিল এই "বন্দেমাতরম"। আমাদের হিন্দু ফৌজের 'দিল্লী চলো' গানের পর্য্যায়ে না পড়িলেও—"জনগণে"র আবেদন কতকটা শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নিকট আবেদন—কিন্তু জনমনের কাছে ইহার সুনির্ব্বাচিত বাক্যাবলি ও উচ্চাঙ্গের কাব্য-সম্পদের বিশেষ কোনও আবেদন না থাকাই সম্ভব।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন "বন্দেমাতরমে"র মধ্যে সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য্য বেশী—সংস্কৃত ভারতের ভাষা হইলেও সাধারণ সে ভাষা বুঝিতে পারে না। কিন্তু 'বন্দেমাতরম'এর সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে অন্যান্য ভাষার এমনই একটা মিল আছে যে তাহারই জন্য এ পর্য্যন্ত ভাষার দিক দিয়া কোনও আপত্তি কোনও প্রদেশ হইতেই উঠে নাই। কেহ কেহ এমনও বলেন যে সেই কারণেই অর্থাৎ ভাষার দুর্বোধ্যতার জন্যই ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিন্দুস্থানীতে রচিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ হিন্দুস্থানী ভাষা যেন আমাদের দেশের আপামর সাধারণ জানে এবং বুঝে। অন্ততঃ বাংলা মাদ্রাজ উড়িষ্যার ক্ষেত্রে এ কথা খাটে না। অবশ্য সর্ব্ব-ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীতের ভাষা—দুর্বোধ্য হওয়া উচিত নহে এবং তাহার মধ্যে জন-যাত্রার পথে অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইবার মত আহ্বান ও আবেদন থাকা দরকার! আমাদের জাতীয় সঙ্গীতে অরকেষ্ট্রার সুর সংযোগের অবসর থাকা চাই—এ দাবীও উঠিয়াছে। অরকেষ্ট্রা 'ভারতীয় সুর বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে খাপ খায় না—উহা সম্পূর্ণ বৈদেশিক। ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে ভারতীয় যন্ত্র সমূহের সুর সংযোগে গীত হইবার সুযোগ থাকা একান্ত দরকার এবং তাহার পটভূমি যে ভারতীয় বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত হইবে ইহাও কল্পনা করিতে কষ্ট হয়। পণ্ডিত নেহেরু বলিয়াছেন—ভারতের জাতীয় সঙ্গীত কোনটি হইবে তাহা এখনও পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হয় নাই কিন্তু ভারতীয় সৈন্যবিভাগে "জনগণ" গানটি অভ্যাস করিতে দেখা যাইতেছে। 'বন্দেমাতরম'কে বরবাদ করিবার চেষ্টাও আমরা দেখিতেছি। কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে গীত হইবার জন্য কোনও জাতীয় সঙ্গীতের উদ্ভব হয় না। মার্সাই'এর মত যে গান বিপ্লবের মধ্যে অন্তর হইতে জাগিয়া উঠে—তাহাই দেশের জাতীয় সঙ্গীতরূপে আত্ম-প্রকাশ করে। কেবল রাজনৈতিক নেতৃবর্গ লইয়া নহে—দেশের বিখ্যাত কবি, ও সুরশিল্পী—গীতকার ও সাহিত্যিকদের লইয়া অবিলম্বে একটি সমিতি গঠন করা উচিত। তাহারা সঙ্গীতের ভাষা, ভাব, ও সুরের সমতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া—এমন একটি সঙ্গীতের নির্ব্বাচন করিবেন যাহা সর্ব্বজনগ্রাহ্য হইয়া ভারতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিবে। আমাদের বিশ্বাস উদার দৃষ্টি ও প্রশস্ত মনোভাব লইয়া অগ্রসর হইলে এই সমিতি নিশ্চিত ভারত কংগ্রেস কমিটিতে গৃহীত "বন্দেমাতরম" সঙ্গীতটিকে ভারতীয় রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করিবেন না, "বন্দেমাতরম"।

শ্রীপঞ্চমী

শ্রীহীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শেষ পর্যন্ত সংকল্পটা স্থিরই হ'য়ে গেলো। আমার দিনপঞ্জিকার মোটা খাতাখানা পুড়িয়ে ফেলব। ইতিপূর্বে এ চেষ্টা যে করিনি তা নয়, কিন্তু শেষ অবধি মমতার দুর্বলতায় পেছিয়ে এসেছি। আমার যে সব কাহিনী কারোর কাছে প্রকাশ হয়নি, কোনোদিন হবেও না, যে বেদনা কারোর কাছে ব্যক্ত করিনি এবং যা চিরদিন অন্তরালেই থেকে যাবে, সে সব উজ্জ্বল ও জীবন্ত হ'য়ে আছে এই ডায়ারীর বুকে। কালের যে দুর্নিবার প্রবাহ অন্তর্জীবনের সঞ্চয়কে নিরন্তর সীমাহীনতার মধ্যে বিলীন ক'রে দিয়ে যাচ্ছে, একমাত্র শব্দের অবার্থ বাঁধন ঠেকাতে পারে কালের সেই অমোঘ নিয়তি নিয়মকে, তার প্রবাহকে পারে প্রতিহত ক'রে যুগযুগান্তের মধ্যে শাশ্বত ক'রে রাখতে। জীবনের বহুমূল্যে অর্জিত সেই সব পরম সঞ্চয়গুলিকে আগুনের বুকে আহুতি দেবার আগে একটিবার তার গভীর স্পর্শ পাবার জন্যে মনটা কেমন লোভাতুর হ'য়ে উঠল।

বাড়ির ত্রিতলের একটি টেরে আমার ঘরটি। বৈকালে খাতাপানি নিয়ে আবার পড়তে বসি টেবিলে। এই দু'দিনে শেষের দিকে এসে গেছি।

ওদিকে নিচের তলায় ছোট ছেলেমেয়েদের কলরব ছুটোছুটি। কিছুতেই আর ভুলে থাকতে পারছিনে, আগামী কাল বাড়িতে শ্রীপঞ্চমী উৎসব। গতবারের উৎসবের কথাটা কেবলই মনে হচ্ছে মনে। পড়তে পড়তে একবার ক'রে থেমে যাই, চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে অল্পক্ষণ বসি, তারপর একসময় পা-ঝাড়া দিয়ে বিক্ষিপ্ত মনটাকে কঠোরভাবে সংহত করি দিনপঞ্জিকার বুকে :

'আজ বাড়িতে এসে মর্মান্তিক দুঃসংবাদ পেলাম, আড়ডুবো মামার বড় মেয়ে মায়ার স্বামী মারা গেছে। এই দু'বছর হ'লো তাদের বিয়ে হ'য়েছে। রূপে গুণে কী জামাই পেয়েছিলো বড়দা···পক্ষিদির অবশ উপযুক্ত ছেলের মধ্যে মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে। কিছুদিন আগে সে জামসেদপুর থেকে এসে আমাদের বাড়িতে মা ছুকে সারারাত্রি গলিতে গোয়াকেরা ক'রেছে। সকালে তাকে বাড়িতে আনা হ'লো, সম্পূর্ণ উন্মাদ। কিছুদিন কাছে রেখে বড়দা লোক দিয়ে তাকে জামসেদপুরে পাঠিয়ে দিলে মা মায়ার কাছে···রেল ভাড়া হওয়ায় মামা কলকাতা থেকে বদলী হ'য়ে বহুদূর প্রদেশে নির্বাসিত হ'লো। মামা বাইরে চ'লে যাওয়ায় বড় ক্ষতিগ্রস্ত হতে হ'লো আমাদের। মামার ছেলেমেয়েরা থাকল কলকাতায় আমাদের কাছে—বুলু প্রণব ওঙ্কার মন্টু। বৌদির মৃত্যুর পর সেই শিশু অবস্থা থেকে ওঙ্কার ও মন্টু আমাদেরই কাছে মানুষ···আজ জামসেদপুর থেকে চিঠি এলো, কঠিন প্রবল স্নায়ুরোগের পর পক্ষিদির উন্মাদ ছেলেটি মায়ের কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে। চিকিৎসার গুণে ছেলেটি ক্রমশঃ আরোগ্যের পথেই যাচ্ছিল এবং ভবিষ্যতে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করত।··· ওঙ্কার স্কুলে পড়ছে, মন্টু বাড়িতে। মন্টুটার একদম পড়ার চাড় নেই। কেবল বাঁচমুখ নেড়ে পাকা-পাকা কথা আর তার ছোড়দা ওঙ্কারের সঙ্গে ঝগড়া। দু'পক্ষের নালিশ শুনতে শুনতে আমার প্রাণান্ত। লেখাপড়ায় ওঙ্কার আশ্চর্য কৃতিত্ব দেখাচ্ছে। এবারেও ভবল প্রমোশন পেয়ে ক্লাশে উঠেছে। সে ক্লাসের মনিটার, খেলায় ক্যাপ্টেন। লেখা-পড়ায় সামে ঘুড়িনির্মাণে এবং নানারকম ছোটখাট কর্মের পরিকল্পনায় তার কৃতিত্ব আমাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে কিন্তু সবচেয়ে বিস্মিত হয়েছি তার মমতা ও নিষ্ঠায়। এই লেলিহান হিংসা ও বৈরভরা পৃথিবীতে এমন অপূর্ব জীবন-নিষ্ঠা ঐ বালক পেলো কোথা থেকে? এ বংশে ঐ একটি মাত্র ছেলে—যার প্রাণ ও প্রতিষ্ঠা আমাকে তার বড় বিকাশ সম্বন্ধে আশান্বিত ক'রেছে। ভগবানের কাছে ওঙ্কারের দীর্ঘায়ু কামনা করি···'

পারিবারিক জীবনের সুখ দুঃখের মধ্যে একেবারে মগ্ন হ'য়ে পাতার পর পাতা প'ড়ে যাচ্ছি, সহসা একটা প্রচণ্ড কোলাহলে চমকে মুখ তুলে তাকাই। কাণে আসে মিশু মন্টু বাবলু প্রভৃতির সমবেতকণ্ঠে হৈ হৈ রব 'ঠাকুর এসেছে' 'ঠাকুর এসেছে, শিগ্‌গির'। সঙ্গে সঙ্গে দুম দুম শব্দে বাড়ি কাঁপিয়ে সকলে বাইরে ছোটে, অন্দরটা স্তব্ধ হ'য়ে সবরটা কোলাহলে মৌমাছির ব্যস্ততায় ঝাঁকডাকে মুখরে একেবারে সরগরম। তারপরই সমস্ত বাড়ি কাঁপিয়ে মুহুর্মুহু শাঁখ বেজে ওঠে। বাড়িতে দেবীর আগমন, তাই বরণ করা হচ্ছে। পড়া বন্ধ ক'রে চেয়ারে হেলান দিয়ে নিঃশব্দে বসে একটুখানি কাণ পেতে শুনি, তারপর একসময় আস্তে আস্তে উঠে খোলা খরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে নিজের আসনে এসে বসি।

এবার কিন্তু আর তেমনভাবে পড়া হয়না, পাতাগুলি উল্টে-উল্টে শুধু চোখ বুলিয়ে যাই এবং একসময় ৩০.১০.৪৮ তারিখে লেখা পাতায় এসে হাতের আঙুল যেন অবশ ও নিশ্চল হ'য়ে যায়। চোখের উপর মসীবর্ণ অক্ষরগুলি যেন জ্বলে ওঠে ফুলিঙ্গের মতো :

'পরশু উত্তরপাড়ায় গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে ওঙ্কার শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হ'য়েছে। দু'দিনের জন্যে সে ওখানে মামার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলো।

মহাপ্রান্তরের শূন্যতায় হা হা ক'রে আগুনের হল্কা ছুটছে যেন, আমার বুকে তেমনি একটা অনুভূতি। এ বেদনা নয়, শোক। মৃত্যুর বেদনা জীবনে অনেকবার অধীর ক'রেছে আমাকে কিন্তু শোকের সঙ্গে পরিচয় এই প্রথম। পরমায়ু সম্পদ বঞ্চিত ওঙ্কারের জন্যে বুক ফাটি,

তার মুখে বেদনা। বেদনা কাঁদায় কিন্তু আশ্রয় দেয়। শোকের মতো মৃত্যুর বর্ণহীন রূপহীন অতলান্ত পৃষ্ঠতার সমগ্র অস্তিত্বকে এমন আশ্রয়হীন ক'রে ফেলে রেখে না।

শুধু মনে পড়ে, জলের টানে অতলে তলিয়ে যাবার আগে হাত বাড়িয়ে তার সঙ্গীটির পেনটুলুন ধ'রে তার বাঁচবার সেই শেষ প্রয়াস এবং তার কাছ থেকে সজোরে ধাক্কা খেয়ে তার অতলে তলিয়ে যাওয়া···

রুদ্ধদ্বার সহসা যেন আর্তনাদ ক'রে ওঠে। আহত হ'য়ে মুখ ফেরাই। বেরি সশব্দে দরজা খুলে মন্থু ঘরে ঢুকছে, তার পেছনে বেলি। মন্থুর খেলার সাথী, তার বাবা গোপাল ওস্তাগরের ছায়ার মতো সঙ্গী ছিলো।

আমার সামনে এসে মন্থু দাঁড়ায়, তার মুখে চোখে আনন্দের প্রখর উত্তেজনা। কাছে দাঁড়িয়েই হাত-মুখ নেড়ে চোখ বড় ক'রে ব'লে যায়: 'উঃ কী সুন্দর ঠাকুর এসেছে মেজুকাকা! ওবারের চেয়েও ভালো, না রে বেলি? দাদা হামুদা বিশুদা গোপাল সবাই মিলে ঠাকুর নিয়ে এলো। বিশুদা গোপাল আমার কাছে চাল মারছিলো। বলে, কি রকম ঠাকুর কিনে এনেচি দেখচিস! আমি বললুম, ইস্ তোমরা কিনেচো না কলা। দাদারা কিনেছে বলে। আমার কাছে ধাপ্পা মারতে হবে না।'

মন্থুর মুখ দিয়ে কথার স্রোত বইতে থাকে: 'ভালো মেজুকাকা এবার সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি পূজো, ঠাকুর এসেচে। আমাদেরটা কিন্তু সব চেয়ে ভালো। সামনের বাড়ির ঐ রবিটা তাদের বাড়ির ঠাকুর নিয়ে ভারি জাঁক করছিলো, এমন রাগ হ'ছিল তখন। এখন রবিটা যেই এসেছে আমি বলেচি, তোদের বাড়ির চেয়ে আমাদেরটা কত ভালো ভাখ্; চোখ বড় ক'রে ভাখ্। মুখটি চুণ হ'য়ে গেছে যাচ্ছেতাই। বারে বেলি!'

বেলি সলজ্জে ঘাড় নাড়ে। মন্থু হেসেমি ক'রে ব'লে চলে, তারা সবাই মিলে আজ রাত জেগে ঠাকুর, পুজোর দালান, সব সাজাবে। সাজানো হ'লে তার কী রূপ খুলবে, দেখে সব তাক লেগে যাবে। আজ দিদিদের সঙ্গে সে কত কাপড় ছুপিয়েছে বাসন্তী রঙে। কাল সকালে চান ক'রে উঠে সেই রঙিন কাপড় প'রে অঞ্জলি দেবে। বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে, ভগবতী ভারতী দেবী বসন্তে।

শ্লোকটা শুনিয়েই মন্থু টেবিলের ড্রয়ারের সামনে বসে পড়ল। আমার টেবিলের তলার ড্রয়ারটিতে সে তার জিনিষ পত্র রাখে। এক-টানে সেটা খুলে সেভিং-ষ্টিকের দামী কৌটো থেকে পয়সা বার করে উঠে দাঁড়িয়ে বললে: 'আমি এই চার আনা চাঁদা দিচ্ছি। তোমার কিন্তু পাঁচ টাকা চাঁদা দিতে হবে, চালাকি নয়। বাড়ির সবাই চাঁদা দিচ্ছে, এতো টাকা উঠেছে। কাল আমাদের বাড়িতে সন্ধ্যেবেলা কি রকম ঘটা হবে জান মেজুকাকা?'

জানবার জন্যে কোনো আগ্রহ প্রকাশ করতে পারিনে, খোলা পাতাটার দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকি। সমস্ত ভালো অবস্থা নিয়ে। যাও মেজুকাকা।'

গুলি যেন বুকের শোণিতে রাঙা চ'ষে চোখের উপর জমছে। মন্থু কাছে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বলতে থাকে: 'কাল উঠোনে সিনেমার মতন একটা পর্দা খাটানো হবে, নাচ গান বাজনা ম্যাজিক কমিক সব দেখানো হবে। উঃ কী মজা! কত লোক বাইরে থেকে আসবে। সবাইকে খাওয়ানো হবে! দিদি মাস্তিদি শান্তিদি আমি উমু—কি রে?'

মুখ ফেরাই। মানু মুনু দুর্গা প্রভৃতি বালিকার দল এক ঝাঁক পাখির মতো ঘরে এসে ঢুকে সমস্বরে মন্থুকে বলে: 'মন্থুদি এতো বেরি করচো কেন, আজ বুঝি খেলতে হবেনা। উমুদি কখন থেকে যে ডাকছে তোমাকে আর বেলিকে।'

উমুদি ওরফে উমা পণ্ডিতদির ছোট মেয়ে। কাল তার মা বাবার সঙ্গে এসেছে জামসেদপুর থেকে।

মন্থু ফিরে দাঁড়িয়ে চক্ষের পলকে তাদের সঙ্গে মিশে পাখির ঝাঁকের মতোই যেন উড়ে চ'লে গেলো। দরজা খোলা; তার মধ্যে দিয়ে আসন্ন উৎসবের আনন্দময় কলরব ঘরে এসে ঢুকছে। সহসা উঠে গিয়ে সশব্দে দ্বার রুদ্ধ ও অর্গলবদ্ধ করে ফিরে আসি। নিজের এই রূঢ়তা ও উত্তেজনা নিজের কাছেই অস্বস্তিকর মনে হয়। অশান্ত মনটাকে শান্ত ক'রে ডায়ারীর বুকে নিবিষ্ট করি···

'ওদের চ'লে যাওয়ার কয়দিন পরের ঘটনা।

বেলা দশটায় বাইরে থেকে বাড়ি ঢুকছি। ঢুকেই যার সঙ্গে মুখোমুখী দেখা সে বিশু। বই হাতে স্কুলে যাচ্ছে। বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে মনে হ'লো, ও, আজ যে পুজোর ছুটির পর বিশুদের স্কুল খুলেছে। বিশু তাকালো আমার দিকে, আমিও তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। কি যেন দেখলুম দু'জনে দু'জনের মুখে। তারপর আস্তে আস্তে সে পাশ দিয়ে চ'লে গেলো। বিশু আজ থেকে রোজ একাই স্কুলে যাবে। আজ স্কুলের নিঃসঙ্গ পথ চলতে চলতে বিশুর মনটা কি রকম করছে? অন্দরে ঢোকবার আগে কাঠের-পার্টিশান দেওয়া ওদের পড়বার ঘরটির সামনে এসে একবার দাঁড়াই। টেবিলের দু'দিকে দুটি চেয়ার—একটার পিঠ ভাঙা। বিশু এখন রোজ একাই এই ঘরে ব'সে পড়ে। যে পড়ার ঘর থেকে সকাল সন্ধ্যা পড়ার প্রাণময় কণ্ঠ শোনা যেতো, এখনও হয়তো যায় কিন্তু সে কণ্ঠে সেই রব সেই সুর বাজে কৈ? বিশু একা ব'সে অস্পষ্ট স্বরে পড়ে যায়, পড়তে পড়তে একবার করে অভ্যাস মতো চোখ তুলে তাকায় সামনের পিঠ-ভাঙা চেয়ারের দিকে। কেউ নেই। শূন্য চেয়ার শূন্য পিঞ্জরের মতো প'ড়ে আছে।'

রুদ্ধদ্বারে ঘন-ঘন আঘাত।

মুহূর্তে সমস্ত মনটা হিম ও কঠোর হ'য়ে ওঠে। মন্থুর আনন্দময় কণ্ঠের ডাকে সাড়া দিইনা। দরজা না খুলে সর্বাঙ্গ শক্ত ক'রে নিরুত্তরে বসে থাকি, তীব্র অসন্তোষ ও উত্তেজনার কেতরটা কাঁপতে থাকে। শেষকালে মন্থুর কণ্ঠ কাণে আসে: 'একবারটি দরজাটা খুলে দাও মেজুকাকা, আমি এখ্খুনি চ'লে আসব বেরাল থেকে একটা জিনিষ

আমি আর কি করি। আস্তে আস্তে উঠে দরজা খুলে দিয়েই সহসা যেন চমকে উঠি। মিতের ঘর থেকে হারমোনিয়াম ও বাঁশীর সমবেতে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অপূর্ব সুর ঘরে ঢুকে আমাকে যেন বিবশ ক'রে তোলে। সব কিছু ভুলে নির্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

মধু বেরাম থেকে কি একটা বায় ক'রে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। তার চালচলনে তেমনি ব্যস্ততা, মুখে চোখে উৎসবের মততা। তাকে ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবার কথা আর বলতে পারিনে, তার মুখের দিকে চেয়ে থাকি। মুক্তধারা দিয়ে বায়ুতরঙ্গে অবিরাম সুর ভেসে এসে আমার সমস্ত শিরা উপশিরা দিয়ে যেন ব'য়ে যাচ্ছে। মধু আমার মুখের দিকে চেয়ে বলতে লাগল, দোতলার ঘরে কালকের উৎসবের রিহার্সাল বসেছে। বাড়ির সবাই ঐ ঘরে জমা হ'য়ে রিহার্সাল শুনছে। দিদিরা একে একে সবাই গান গাইবে। গানের পরই তার নাচ। কাল তার দু'দুটো নাচ হবে। একটা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সঙ্গে একা, আর একটা হর-পার্বতীর নৃত্য—উমার সঙ্গে। উমা হর, সে পার্বতী। উমা কী সুন্দর নাচে। আমেদপুরের নাচের স্কুলে সে নাচ শিখেছে কি না। আজ উমা আর সে দু'তিনবার একসঙ্গে নেচেছে, উমা তাকে চমৎকার শিখিয়ে নিয়েছে।

আমি বললুম: 'তুই রবীন্দ্রনাথের কোন্ গানের সঙ্গে নাচবি রে মধু?'

মধু বললে গানের প্রথম চরণ। আমার জিজ্ঞেস করি, তার দিদিরা কোন্ কোন্ রবীন্দ্র-সঙ্গীত নির্বাচিত করেছে কালকের জন্যে? মধু বললে: 'তা আমায় বলেনি। আমি শুধু আমারটা জানি। একটু পরেই আমার নাচ হবে, তুমি ঠিক দেখো।' ব'লে নিমিষে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

একটু পরেই সুরের মিহলতা একটা মর্মান্তিক আঘাতে দূর হ'য়ে গেলো। পরক্ষণেই হাত বাড়িয়ে প্রচণ্ড শব্দে যার পুনরায় অর্গলবদ্ধ করতেই আমার জগৎ থেকে মধির জ্যোৎস্নাল সুরলোক নির্বাসিত হ'লো নির্মমভাবে। স্থানে এসে বসি, নিজের প্রতি নিজের বিরূপতা ও তীব্র বিতৃষ্ণাকে শান্ত ক'রে দিনপঞ্জিকার অসম্পূর্ণ অংশের উপর মনকে সংহত করি:

'ওঙ্কার ও বিত্তর পড়বার ঘরের দরজা থেকে আস্তে আস্তে উপরে উঠে আসি। নিজের ঘরে ঢুকতেই যতীন এসে দাঁড়ায়—বিনয় সঙ্কুচিত ভঙ্গী। জিজ্ঞাসার উত্তরে সে ধরাগলায় বললে: 'মা বললেন—'

কি? যতীন একটু থেমে বললে: 'ওঙ্কার-দাদাবাবুর ইস্কুলে একটা চিঠি দিতে হবে খবরটা জানিয়ে।'

ঘাড় নেড়ে তাড়াতাড়ি আয়নার কাছে গিয়ে দাঁড়াই ওদিকে মুখ ক'রে।

পুজোর ছুটির পর আজ স্কুল খুলেছে। ক্লাসে ক্লাসে ছেলেদের হৈ চৈ আনন্দ, পরস্পরের মধ্যে ছেলেমানুষি কোলাকুলি, পুজোর উৎসবের ও নতুন জামা কাপড় জুতো কেনার গল্প। বিত্ত বোধ হয় এতোক্ষণ স্কুলে পৌঁছে গেছে। সহপাঠিদের উদ্দাম আনন্দ কলরবের মধ্যে বিত্ত আজ কি করছে? ৫: ৫: ৫:। ঐ স্কুল বসবার ঘণ্টা পড়ল। মাস্টার মশাই ক্লাসে ঢুকলেন গম্ভীরমুখে। তাঁকে প্রণাম করবার জন্যে ছড়োহুড়ি ঠেলাঠেলি ছেলেদের মধ্যে। মাস্টার মশাই আজ সবারের মাথায় হাত দিয়ে দীর্ঘজীবী হবার আশীর্বাদ জানাচ্ছেন। একটানা ছুটির পর আজ প্রথম স্কুল, তাই আজ পড়া হবেনা। আজ যে মিলনের দিন, আনন্দের দিন। প্রণামের পালা সাঙ্গ ক'রে দীর্ঘায়ু হবার আশীষ মাথায় নিয়ে যে যার জায়গায় গিয়ে বসেছে। এইবার মাস্টার মশায়ের তৃষিত দৃষ্টি ছেলের মধ্যে কাকে খুঁজে খুঁজে ফিরছে। তাঁর ক্লাসের মধ্যে যে ছেলেটি রত্ন, যার সম্বন্ধে তাঁর সকলের মত আশা, সেই অপূর্ব প্রাণময় ছেলেটিকে খুঁজে না পেয়ে যখন তিনি তার কথা জিজ্ঞাসা করবেন, তখন বিত্ত উঠে দাঁড়িয়ে বলবে, সে আর নেই। এ কথা মুখ ফুটে বলতে পারবে তো বিত্ত?

গ্রাটেণ্ডেল-রেজিষ্টারে একটি ছাত্রের নাম লাল কালী দিয়ে কাটবার সময় মাষ্টার মশায়ের হাতের কাঁপন হয়তো বালক ছাত্রদের দৃষ্টি এড়াবে না।

ওঙ্কার তো চলে গেলো। তার যাওয়াটা বুদ্ধি দিয়ে মেনেছি, প্রাণের গভীরে কিন্তু সে বার্তা এখনো পৌঁছয়নি। তাই তার ফিরে আসা সম্বন্ধে এখনো সব অসম্ভব আশা কল্পনা মনের মধ্যে জেগে ওঠে। জীবনে কত তো কল্পনাতীত অলৌকিক ঘটনা ঘটে, তেমনি ওঙ্কারের ক্ষেত্রে ঘটা বিচিত্র কি? বর্ষায় প্রবর্ধমান বানের মতো জীবনের লাবণ্যে উচ্ছ্বসিত সেই ছেলেকে দু'দিন আগে তো আমি তার মামার বাড়ি রেখে এসেছি, দু'দিন পরে সে আমার সঙ্গে ফিরবে এই কথা সে আমাকে বলেছিলো। হঠাৎ শুনি সে আর নেই। এমনতরো অসম্ভব কথা কেমন ক'রে বিশ্বাস করি? তাছাড়া তার সব শেষ দেওয়া আমি তো চোখে দেখিনি। আমার চক্ষুর অন্তরালে এমন অলৌকিক কিছু তো ঘটতেও পারে যাতে সে আবার ফিরে আসে! কে বলতে পারে? মনের এই সব অসম্ভব আশা কল্পনাকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছি যে, ওঙ্কারের নির্বাণ এখনো প্রাণে পৌঁছয়নি, পৌঁছতে সময় লাগবে। শোকের সেই বিমিশ্র রাতটিতে যার একটি আশার কথা আজও আমার বুকে শাণিত ছুরির ফলার মতো বিঁধে আছে। সেদিন সারারাত্রি অসাড় উচ্ছ্বসিত কান্নার মধ্যেও মা আশা করেছিলো কোথো একটি সংবাদ পাবার। এমন তো কত ঘটেছে, ডুবে-মরা ছেলে আগুনের মধ্যে বেঁচে উঠেছে। সেদিন সারারাত্রি আমারও প্রাণে ঐ শেষ আশা……'

টুক টুক টুক।

শিরায় শিরায় রক্তস্রোত উদ্দাম হ'য়ে ওঠে, মুখ দিয়ে কথা যায় সরে না। প্রাণপণে নিজেকে সংযত রাখবার প্রয়াস করি।

বাইরে থেকে উচ্চকণ্ঠের আহ্বান তরঙ্গলার মতো দু'কাণ ছেপে ধরে: 'বেনুকাকা এখুনি মধুদির নাচ হবে, শিগ্‌গির এসো। তোমায় সবাই নিচের ঘরে ডাকছে। দেরি করো না।' কথা শেষ হতেই চকল পদধ্বনি ঘরের সামনে থেকে ওদিকে চলে যায়।

মনের আলোড়ন শান্ত হ'তে এবার অনেকখানি সময় লাগে। তারপর আয়নার আলমারীর উপর মুঁকে পড়া মুখ তুলি।

সেদিনের সেই পঁচশত মুখরোচকও আমার বুকে কেটে কেটে বসে আছে।

বেলা একটা তখন। বাইরে যাবার জন্যে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম। উপরের ঘরগুলির দরজা বন্ধ, এরই মধ্যে সবাই শুয়ে পড়েছে। কোথাও কারোর সাড়া শব্দ নেই। বৃহৎ কলেবরের কাজের চাকাটা যেন ঝিমিয়ে হয়ে থেমে থেমে আসছে। ঝিমিয়ে পড়ছে বাড়িটা এক অদ্ভুত শূন্যতায় বুকের মধ্যে হা হা ক'রে উঠল। আজ স্কুল বন্ধ, তথাপি বাইরে থেকে ছেলের দল খেলা করতে আসেনি। ছুটির দিনে এই বাড়ির চত্বরগুলা তাদের খেলার মাতামাতিতে দর্পণ কাঁপত। বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটানোর জন্যে কত তর্জন, কত তাড়না, তবু কেউ তাদের সে খেলা বন্ধ করতে পারেনি। আজ বিনা তাড়নায় তারা সেই খেলা ছেড়ে দিয়ে কোথায় চ'লে গেছে। পর মুহূর্তে দ্বিরুক্তিতেও আর তারা এখানে খেলতে আসবে না। এই বাড়ির যে প্রাণের উৎসটি শত প্রাণ উৎসারিত করত, সেই কলকল্লা উৎস চিরদিনের মতো কোন অদৃশ্য গহ্বরে বিলীন হ'য়ে গেছে। আস্তে আস্তে বারান্দার শেষের ঘরটিতে ঢুকি। বহুর সুতুলে ছড়ানো, দেয়ালের এক কোণে কি একটা নাড়াচাড়া করছে। মনে পড়ল, ছুটির দিনে বহু ও তার ছোড়দার ঘুড়ি নিয়ে খেলায় প্রতিযোগিতা হ'তো, প্রতি মুহূর্তে ছোড়দার সঙ্গে লাগত ঠোকাঠুকি, বহু এসে তীব্রকণ্ঠে নালিশ করত তার বিরুদ্ধে। আজ সে আসামী হো পলাতক। সেই পলাতকের শূন্য পরিত্যক্ত খেলাঘরে আজ এমন ক'রে একা ব'সে বহুর প্রাণে তার বিরুদ্ধে কি নালিশ গুমরে গুমরে উঠছে? বহু আমার দিকে তাকাতেই তাড়াতাড়ি বললুম: 'গোপাল বেলি আসেনি? কখন আসবে?'

বহু পাড় নেড়ে বললে: 'গোপাল আর তো আমাদের বাড়ি আসে না। বেলি সেই বিকেলে সন্ধিবেলায় যাবার সময় আসে।'

আমি শুধু বললুম: 'ও।'

বহু একবার চোঁক গিলল, তারপর আস্তে আস্তে বললে: 'ছোড়দার নাম কাল সন্ধিবেলা থেকে কেটে দিয়েছে মেজকাকা!'

কাজের ব্যস্ততার ভাণ ক'রে তাড়াতাড়ি বহুর সামনে থেকে পালিয়ে নিচে নেমে আসি। একতলার অন্ধকার উঠোনে কানিসে চতুর্দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে চড়ুই বিচিত্র চঞ্চলতায় কিচির কিচির শব্দে উড়ে উড়ে খেলে বেড়াচ্ছে। শূন্য পরিত্যক্ত বাড়িতে বাসা বেঁধে যেন নিরুপদ্রবে খেলে বেড়ায় চড়ুই। অন্ধকার থেকে বাইরে যাবার সময় রান্নাঘরে দৃষ্টি পড়তেই একবার শুধু থমকে দাঁড়াই:

রান্নাঘরে মা খেতে বসেছে, সামনে সেই কালো পাথরের থালাটি। চোখে পড়ল, থালার উপর হাতখানি রেখে মা চুপ ক'রে বসে। অমন ক'রে মা এখনো বসে কেন? বেলা যে অনেক হ'লো! সেই যে ছেলেটি রোজ এই সময় বিস্তর সঙ্গে বাড়িতে টিফিন খেতে আসত এবং মার কাছে বসে মার হাতে মাখা-ভাত পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে তুলে চ'লে যেত, ছুটির দিনেও যার সঙ্গে মার খাওয়া আর কেউ না, সে তো আর আসবে না! তবু মা এমন ক'রে ব'সে কেন? তার কথা বুঝি মনে পড়ছে? না আগুনের আঁচে তার বেঁচে ওঠার আশার মতো মার মনে এখনো কোনো অসম্ভব আশা ছানা দিচ্ছে? পা টিপে টিপে বাইরে যাবার সময় শুধু মনে পড়ল, মা রোজ আগের মতোই এই সময় খেতে বসে, খেতে খেতে কার গলা শুনে মা রোজই একবার চমকে উঠে রান্নাঘরের বাইরে তাকায়, কিন্তু টিফিন খেতে এসেছে কিন্তু সেই আর কেউ আসেনি। আস্তে আস্তে আজন্ম অবস্থায় বাইরের উঠোনটা অতিক্রম করি, সদর দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে চলার বন্ধ গতি আর একবার থেমে যায়:

বাড়ির ঠিক সামনে গলির রাস্তায় বহুরই বয়সী দুটি বালিকা খেলা করছে। রাস্তার উপর ইঁট দিয়ে চতুষ্কোণ কয়েকটি ঘর কেটেছে পাশাপাশি। এক একজন পালা ক'রে এক পা তুলে ঘরের রেখাগুলি লাফিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে। বালিকাদের সেই চিরন্তন খেলা। হঠাৎ চোখে পড়ল, একটু দূরে আমাদের বাড়ির জোড়াকে খেলার দিকে চেয়ে আছে। আমি যার হ'তেই সে আমার মুখের দিকে তাকাল, আমি তাকালুম একবার। ইটের হাওয়া সহসা হু হু ক'রে উঠল, পরক্ষণেই আমি রাস্তায় নেমে পা টেনে টেনে চলতে লাগলুম। গোপাল ঠিক তেমনি করে দাঁড়িয়ে অপরের খেলা দেখতে লাগল।

আমার শুধু মনে হ'তে লাগল, এ পথ যেন আর আমি চলতে পারছিনা, পারছিনা। আমার পথের পাশের যেন লুপ্তিত হ'য়ে গেছে।'...

ঘুম ঘুম ঘুম।

রুদ্ধ দ্বারের করাঘাত হাতুড়ির মতো বুকে এসে পড়ে। সমস্ত প্রাণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এতক্ষণ আসার ব্যর্থতায়। পরক্ষণেই কানে আসে, বহুর মৃত্যু-উৎসবে যোগদানের জন্যে মার আহ্বান। আস্তে আস্তে উঠে দরজার দিকে যাই—মাকে শুধু এই কথাটি বলতে, আমাকে তোমরা বাদ দাও। দরজা খুলেই মুহূর্তে একেবারে নির্বাক বিহ্বল হ'য়ে যাই। মনে হয়, বালুবেলায় পূর্ণিমায় উদ্বেলিত উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ দলের মতো বাঁশি ও কণ্ঠ সঙ্গীতের সহযোগে ঘুঙুরের গুরুগুরু আমার বুকের উপর এসে যেন শতধারায় ভেঙে পড়ল। এই পুঞ্জীভূত সুরস্রোত নির্মমভাবে আমার জগৎ থেকে নির্বাসিত হ'য়ে এতোক্ষণ বাইরে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছিলো, দরজা ক'রে রুদ্ধ দ্বার খুলিয়েই হুড়মুড় ক'রে ঢুকে সব একাকার লণ্ডভণ্ড ক'রে দিলে। কেমন যেন আচ্ছন্নের মতো দ্বার থেকে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই। মনে হয়, জীবনের রহস্যাঙ্কিত কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে কে যেন বার বার আমাকে নিয়ে যাচ্ছে। দুই চরণ বিরুদ্ধ অনুভূতির মধ্যে মুহুর্মুহু করাঘাত করছে সত্তাঘাত। কে গান গাইছে? শান্তি মা? মা শান্তিই তো! কী মিষ্টি গলা। কাণ পেতে শুনি: 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে চলে আয় আয়।' মাঠের গানের সঙ্গে বাঁশের বাঁশির মেঠো সুরটি কী সুন্দর খাপ খেয়েছে। এই বর্ষায় শীতনিবসের সঙ্গে বহুর পায়ের ঘুঙুর বাজছে রুন রুন রুন। ক্রত লয় বিলম্বিত লয় তালের সুরের আবর্তন বিবর্তন। ঘরে—বহু

বেশ তালে নাচছে তো। এক দুই তিন, এক দুই তিন, আমি মনমে তার সঙ্গে তাল দিয়ে যাচ্ছি, কৈ একবারও তো তাল ভঙ্গ হ'চ্ছে না। একবার কিন্তু ভারী দেখতে ইচ্ছে করছে মন্নুর নৃত্যের রূপভঙ্গীটি। অনেকটা মন্ত্রমুগ্ধের মতো নিচের ঘরে গিয়ে একপাশে বসলুম।

ঘরে আর জায়গা নেই। সমস্ত পরিবারবর্গ মিলিত হয়েছে এই ঘরে। মা, বৌদি, বোনারা, বড়বার ছেলেমেয়ের মধ্যে শান্তি বিশু, মামার ছেলেমেয়েরা। মায়ের কাছে পিসিমি। কী চেহারা হ'য়েছে পিসিমির, আহা। উনা বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে ঘনটির সামনের দিকে বসেছে, তাদের সঙ্গে গোপাল আর বেলি। বর্ষিয়সীরা কৌতুক হাস্যে, বালকরা রহস্য কৌতুহলে এবং শিশুরা মুগ্ধ বিস্ময়ে মন্নুর গীতোচ্ছল নৃত্য দেখছে। মুখ ফিরিয়ে মন্নুর দিকে তাকাই। গানের সুরের সঙ্গে মন্নু তার দুটি প্রসারিত বাহু লীলায়িত করে নাচছে। আমার মনে হলো, তার বাহুর অপূর্ব লীলায়নে ঈথারের উপর দিয়ে অবিরাম ঢেউয়ের পর ঢেউ খেলে যাচ্ছে, আর প্রতি পদক্ষেপে ভেসে উঠছে ঢেউগুলির গীতধ্বনি। বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে সেই নৃত্য-রূপের দিকে চেয়ে থাকি।

প্রাণের এই বিস্ময় ও তন্ময়তা সহসা কেটে গেলো খিলখিলানি ও চকিত হাসির শব্দে। দেখি বিশু বাবলু গোপাল পরস্পরের মুখের কাছে মুখ নিয়ে ভারী কৌতুকে ফিসফিস করে কি বলাবলি করছে এবং মুখে হাত চেপে উচ্ছ্বসিত হাসি চাকবার চেষ্টা করছে। প্রাণ ফুল হাসিয়ে যেন উথলে উঠতে চাইছে। ঠিক সেই সময় পেছন থেকে একজন গম্ভীরকণ্ঠে তাদের উদ্দেশে 'ফের' বলতেই নিমিষে সবাই সোজা হ'য়ে ভালোমানুষটি সেজে নাচ দেখতে লাগল। একটু পরেই চোখে পড়ল, মন্নু নাচতে নাচতে সেই তাদের দিকে ফিরেছে অমনি বিশু বাবলু গোপাল একই সঙ্গে অদ্ভুত মুখভঙ্গী ক'রে, বক দেখিয়ে, জিভ ভেংচে মন্নুকে হাসিয়ে দেবার চেষ্টা করলে এবং ব্যর্থ হ'য়ে তিন মাথা এক ক'রে মুখে হাত চেপে সেই হাসি। পেছন থেকে তাদের উদ্দেশে পুনরায় সতর্ক বাণী, এবারের কণ্ঠ আরও কঠোর। নির্বাক দর্শকের মতো দেখছি সব।

হঠাৎ গোলমাল হ'লো, ভায়ারীর খাতাখানা টেবিলের উপর অরক্ষিত অবস্থায় প'ড়ে। যে দুটি পাতা পড়া শেষ করেই চলে এসেছি, সেই দুটি পাতা এখনো তেমনি খোলা আছে। ভায়ারীর খাতাখানা তেমনি বন্ধ ক'রে রেখে আমার জরুরী প্রয়োজন কিন্তু হঠাৎ কি যেন হ'লো আমার, আর উঠতে পারিনে। সুরের উচ্ছলিত আবহাওয়ার আনন্দ উৎসবে মত্ত পরিবারবর্গের মধ্যে ব'সে হঠাৎ চোখের সামনে ভায়ারীর মুক্ত আঁকা রবির পর রবি আলোর পটে তিমিরের গভীর বর্ণে যেন ফুটে উঠতে লাগল। মামা পিসিমি মা মন্নু বিশু গোপাল আরও কত জনের কত রবি।...

বুকের মধ্যে কেমন যেন ক'রে ওঠে। এই তো সেদিনের আঁকা রবি, কিন্তু আজকের সঙ্গে তার এতোখানি প্রভেদ কেন? এ কী অসামঞ্জস্য? অমন জীবনের ঐ রকম মর্মান্তিক অপচয় উৎসবকে তিমিরময়ী না ক'রে তাকে দীপ্ত গীতোজ্জ্বল করে কোন্ নিয়মে?

ঘর থেকে বেরিয়ে আসি নিঃশব্দে। এ ঘরে সমস্ত মেয়েরা নাচ গানে মত্ত, বাইরের পুজোর দালানে প্রতিমার কাছে মন্নু বিশুর মামারা, রূপসজ্জার পরিকল্পনায় তারা রত। সমস্ত বাড়িতে উৎসবের আয়োজন বেশে নবম পরে ঘরে এসে আমার মনে হ'তে লাগল, মৃত্যু বা মৃতজন সম্বন্ধে বালকের যে মনোভাব তা নির্মম কিন্তু অকপট। তার মধ্যে ভান নেই। আমাদেরও মনোভাব অধিকাংশ ঐ, শুধু ভান করি ব'লে বালকের চেয়ে তাকে স্বতন্ত্র মনে হয়।

অন্তরঙ্গভাবে দিনপঞ্জিকার পরিচিত পৃষ্ঠা উল্টেই একবার চমকে উঠি। ভায়ারীর শেষ পৃষ্ঠায় পৌঁছে গেছি যে! এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেলো! আর তো পুতো দু'পাতাও নেই। যেখানে লেখা শেষ হ'য়েছে তার তলায় এখনো একটুখানি খালি জায়গা প'ড়ে আছে। থাক, আঙুলের বুকে আঘাত দেবার আগে শেষ বিলাপের বাণীটি লিখে নেওয়া চলবে। প্রাণের গভীর আবেগ ও মমতা নিয়ে শেষবারের মতো শেষ পৃষ্ঠাটি পড়ি :

'বাড়ি থেকে আর বার হই না। বাইরে গেলেই মুক্তা দ্বিগুণ হ'য়ে বুকে চেপে ধরে। মনে হয়, শোকের দিনে মানুষ একমাত্র আশ্রয় পায় পরিবারবর্গের মধ্যে, বাইরের জগতে তখন তার আশ্রয় থাকে না। তা ছাড়া শোকের মধ্যে নিজস্বার একটা গভীর লজ্জা প্রচ্ছন্ন থাকে, তাই মানুষ তখন বহির্জগৎ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখে।

আর লক্ষ্যহীনভাবে রাস্তায় অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে এলুম। মার ঘরে নিঃশব্দে ঢুকে দেখি, মা খাটে চোখ বুজে শুয়ে, বুকের উপর একখানা বই। মায়ের শিয়রে খাট ও দেয়ালের সংকীর্ণ ফাটালের স্বল্পটুকুর মধ্যে মন্নু ব'সে কি যেন আঁকছে শ্লেটের উপর। মায়ের মুখের চেহারায় এক রকম তো অভ্যস্তই হ'য়ে গেছি তথাপি আজ সে মুখের ভাব যেন কেমন লাগল। এ ভাবান্তর কিসের জন্যে? মনে পড়ল, শুক্রবারের রেশন কার্ড আজ রেশনিং অফিসে জমা দিয়ে তার নম্বর কাটিয়ে এনেছে বটবীন। কাঁকরওয়ালা করেক ছটাক চাল, পাথর গুঁড়ো মেশানো আটা, ধুলো-বালি মেশানো ডাল, এই খেয়েও যে বালক পরিপূর্ণ জীবন-প্রীতি ও নিষ্ঠায় পূর্ণ হ'য়ে উঠছিলো, সেটুকু থেকেও সে বঞ্চিত হ'লো, এই অনুভূতি বুঝি মায়ের ঐ ভাবান্তর ঘটিয়েছে? খাটের এক-পাশে বসতেই মা চোখ মেলে তাকাল।

দু'জনে নীরব। আর কিছু যেন বলবার নেই, সব বলা শেষ হ'য়ে গেছে। একটু পরে মা জানাল, আজ উত্তরপাড়া থেকে রবিন এসেছিলো। এইটুকু বলেই মা থেমে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা অসহ্য যন্ত্রণায় বুকের ভেতরটা অস্থির হয়ে উঠল। মা কি বলবে আমি জানি, পুজোর সময় নিজে পছন্দ ক'রে কেনা যে পোষাক পরে ওখার দু'দিনের জন্যে উত্তরপাড়ায় বেড়াতে গিয়েছিলো, আজ সব অবসান হ'য়ে যাবার পর তার সেই পোষাক রবিন এসে ফেরৎ দিয়ে গেছে, মা নিজের হাতে আনতে কিছুতেই আমরা মনকে রাজি করাতে পারিনি।

মা যেন কথা বলতে পাচ্ছিল না, একটু একটু ক'রে থেমে থেমে

বলতে লাগল, মরিন বলতে এসেছিলো শেষ পর্যন্ত সিমেন্ট অতি কষ্টে পাওয়া গেছে যার অভাবে কাজ আটকে ছিলো এতো দিন। উত্তর-পাড়ার বাড়িতে বন্ধুর ঘিয়ি লাগানো হ'য়েছে, মতুন গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের উপর বাড়ির যে অংশ পড়েছে, সেই অংশে দোকান ঘরগুলি তাড়াতাড়ি তৈরী করা হ'চ্ছে, ওগুলি শেষ হ'লেই বাড়ি মেরামত ও চুণকাম করা হবে। ঐ দোকান ঘরগুলি ও বাড়ি থেকে মাসে বহু টাকা আয় হবে, এর উপর মোটা টাকার সেলামি।

শাণিত ছুরির চাবের মতো মার কথাগুলি বুকের ভেতর কেটে দিয়ে চ'লে গেলো। সেই মুহূর্তে শুধু মনে পড়ল, মাতুলানী ওঁকার কিছুদিন আগে বিধিমার মৃত্যুর পর তাঁর বাড়ি ও সম্পত্তি পেয়েছিলো যার মূল্য অন্তত টাকার বেশি। তার বিষয় পাওনার মার ও বাড়ির সকলের কত আনন্দ। আরও মনে পড়ে, সেই অপূর্ব জীবন নিষ্ঠা ও বিকাশোন্মুখ প্রতিভার সঙ্গে ঐ ঐশ্বর্যকে যুক্ত ক'রে তার পূর্ণ বিকাশ লক্ষ্যে আমার সেই স্বপ্ন দেখা, মনে মনে কত কল্পনা করনা। সব, সব কোন অতল জলে তলিয়ে গেলো।

মা কাঁদে কিন্তু আমি আর কাঁদি না। আমার বেদনা আজ প্রাণস্তর থেকে মনের কোঠায় আশ্রয় নিয়েছে, মনস্তত্ত্বে পৌঁছে তার রূপান্তর ঘটেছে জিজ্ঞাসায়। সব সত্তার বেদনারই স্বাভাবিক পরিণতি এই। আজ সে জীবনের এই শোকাবহ ঘটনা, এই নির্মম অপচয়ের অর্থ জিজ্ঞাসা ক'রে ঘুরে ঘুরে ফিরছে। হয় তো চিরদিন এমনি অর্থ সন্ধান করেই ফিরবে, জিজ্ঞাসার প্রশ্নচিহ্নের আর ছবে না কোনো দিন। 'তবু সেই চির-বিস্ময়ের সামনে সে কখনো থেমে থাকে না।'

সহসা ঝড়ের বেগ ক'রে একটা হৈ চৈ উল্লাস কানে এলো। নাচ গানের রিহার্সাল শেষ হবার পর সবাই ঘর থেকে বার হ'চ্ছে। এ আনন্দ কলরব তারই। ডায়ারী শেষ করে পুস্তকের প্রান্তিতে চোখে দেহ এলিয়ে দিলুম।

মানুষের কথা কখনো শেষ হয় না, তথাপি মানুষকে শেষ কথাটি ব'লে ফেলতেই হয়। এই দিনপঞ্জিকার শেষ পাতাটির ক'টিকুটুকে আমি শেষ লেখা লিখে বিদায় নিচ্ছি :

আজ এইমাত্র শ্রীপঞ্চমীর উৎসব শেষ হ'লো। একটি পরিবারের কতকগুলি ছেলে-মেয়ের উৎসবের মধ্যে দিয়ে আমি সুচিরকালের উৎসবের অন্তর্নিহিত তত্ত্বরূপকে দেখতে পেয়েছি, যা আমার জিজ্ঞাসার মূলে প্রবল ভাবে নাড়া দিয়ে গেছে।

আজ দেখলুম, উৎসবের সর্বপ্রধান অঙ্গ 'তার অপচয়। যেখানেই বিপুল উৎসব, সেখানেই বিরাট অপচয়। ফুলের সঙ্গে তার গুরুতার মতোই, উৎসবের সঙ্গে অপচয়ও অপরিহার্য। আজ মনশ্চক্ষু ভরে শাশ্বত উৎসবের রূপলীলা দেখতে দেখতে কেবলই মনে হ'তে লাগল, চরাচর-ব্যাপী প্রাণের যে বিরাটমহীন মহোৎসব চ'লেছে, সেই মহোৎসবে ওঙ্কার, আমার ওঙ্কার—অপচয়ের মধ্যেই পড়ে গেলো।

মহাকবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের যুগের রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ যে মনীষীকুলের চরণতলে বসিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহাদিগের অন্যতম। দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত আমার পরিচয়ের একটী গল্প বলি :—কবির বাড়ীতে গিয়া আমি একদিন তাঁহার টেবিলে একখানি "মন্দাকুল" দেখিয়া আসি। বইখানিতে আমার টীকাসহ লেখা ছিল। পরদিন অতি প্রত্যুষে ডাকাডাকি শুনিয়া আমি বাহির হইয়া দেখি, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল স্বয়ং আমার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিতেই তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "আহা! কি অপূর্ব! তোমার "মন্দাকুল" প'ড়লাম। "সোনা আতার সোনার গায়ে রবির কিরণ পিছলে পড়ে"—কী সুন্দর! সত্যিই কবিত্ব"। এইরূপে তিনি মন্দাকুলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিলেন এবং আমাকে তাঁহার বাড়ীতে যাইতে নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। তাহার পর কতবার আমি তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গণে গিয়া বসিয়াছি এবং তাঁহার স্নেহ ও উপদেশ পাইয়া ধন্য হইয়াছি।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক, গান ও কবিতার সমালোচনা আমি করিব না, সে সম্বন্ধে অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে। কোনও এক মনীষী বলিয়াছেন যে কবি ও সাহিত্যিকগণ ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। বর্তমানে দেশের সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতেই আমি শুধু এইটুকুই দেখাইতে চেষ্টা করিব যে দ্বিজেন্দ্রলাল এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

বর্তমান সময়ে—বিশেষ করিয়া আমাদের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর, দেশ যখন অতি দ্রুত অবনতি এবং ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইয়া চলিতেছে, জাতির নৈতিক চরিত্র যখন কেবল নামমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে, কালোবাজার, উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতিতে দেশ যখন ছাইয়া গিয়াছে, স্বার্থ লইয়াই যখন সকলে মত্ত—স্বাধিকার কর্মযোগ, সেবাব্রত, পরহিতব্রতের কথা যখন কেহ মনেও আনে না, সেই যুগের উদ্দেশে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার কবিতা, গান ও নাটকের মধ্য দিয়া স্বাধিকার স্বার্থ প্রচার করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিতেন :—

"আপনার প্রবৃত্তিই আপনি, নিরঙ্কুশ উদ্ভিদের মত,
জীবন ধারণ করা ধর্ম্ম নহে। নাহি যার পরহিতব্রত,
হোক্ না সে নিষ্পাপ, সে জীবনের উদ্দেশ্য কি আছে?
সংসারের কিবা যায় আসে সে বিরাট জীব মরে কিবা বাঁচে!"

আবার—

"স্বর্গ—সে পরকীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম করা, স্বর্গ মহাযোগ
স্বর্গ পরহিতব্রত, ধর্ম্ম পরহেতু দুঃখ ভোগ।"

প্রতাপসিংহ নাটকে ইহার মুখ দিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার নিজেরই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। "ইয়া—না বাবা, পৃথিবীই একদিন সে স্বর্গ হবে। যেদিন এ বিশ্বময় কেবল পরোপকার, প্রীতি ও ভক্তি বিরাজ কর্ব্বে, যেদিন অসীম প্রেমের জ্যোতি নিখিলময় ছড়িয়ে পড়বে, যেদিন স্বার্থত্যাগেই স্বার্থলাভ হবে।"

অন্যত্র—

"ইয়া—সম্রাট মনুষ্যত্ব খুইয়ে যদি চিতোর নিয়ে সুখী হন, হোন: তাঁকেও দেতে হবে। চিতোর তাঁর সঙ্গে যাবে না, কিন্তু মনুষ্যত্বটুকু সঙ্গে যেতো। আমার দেশ—আমার নিয়ে দিবারাত্র এ ভাবনা, এ দ্বন্দ্ব কেন মা? পৃথিবীতে আমার কি আছে বাবা?"

ভারতবর্ষে হিন্দুমুসলমানের ঐক্য দ্বিজেন্দ্রলাল মনে প্রাণে চাহিয়াছিলেন। তাই আমরা দুর্গাদাস নাটকে দিলীরের মুখে শুনি, "হিন্দু-মুসলমান একবার জাতিভেদ ভুলে পরস্পরকে ভাই ব'লে আলিঙ্গন করতে দেখি।"

অপরপক্ষে দ্বিজেন্দ্রলালের এই ঐক্য সাধনের প্রচেষ্টা স্বজাতি এবং স্বদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। টলষ্টয় প্রমুখ মনীষীবৃন্দের প্রভাবে তিনিও মনুষ্যপ্রীতি—আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্যের কথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। জাতীয় চরিত্র উন্নত করিতে হইবে—সত্যকার মানুষ হইতে হইবে—তাহার পর স্বাধীনতা—কিন্তু সেইখানে থামিলেই চলিবে না—স্বদেশপ্রেম হইতে মানবপ্রেম আরও উচ্চস্তরের এবং সেই মানবপ্রীতিই হইবে দেশের কাম্য। মেবারপতন নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণকে মনের সমস্ত শক্তি, প্রাণের গভীর আবেগ দিয়া বলিয়াছেন—'আবার তোরা মানুষ হ'—এবং কি করিয়া সেই মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইবে তাহার পথও তিনি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন—তিনি বিশ্বপ্রেমিক হইতে উপদেশ দিয়াছেন।

বিশ্বপ্রেমই যে দ্বিজেন্দ্রলালের চরমলক্ষ্য ছিল তাহা 'মেবার পতন' নাটকে মানসীর চরিত্র হইতেই আমরা বুঝিতে পারি।

"মানসী—যেমন স্বার্থ চাইতে জাতীয়ত্ব বড়, তেমনি জাতীয়ত্বের চেয়ে মনুষ্যত্ব বড়। জাতীয়ত্ব যদি মনুষ্যত্বের বিরোধী হয় তবে মনুষ্যত্বের মহা-সমুদ্রে জাতীয়ত্ব বিলীন হ'য়ে যাক্। দেশ-স্বাধীনতা ডুবে যাক্। এ জাতি আবার মানুষ হ'ক।···

সত্যবতী—সে কবে?

মানসী—যেদিন তারা এই অবর্ণ্য আচারের ক্রীতদাস না হ'য়ে নিজে আবার ভাবতে শিখবে, যেদিন তাদের আত্মার আবার জাগরণ হবে, যেদিন তারা যা উচিত, যা কর্ত্তব্য বিবেচনা কর্ব্বে, নির্ভয়ে তাই করে যাবে, কারো প্রশংসার অপেক্ষা রাখবে না, কারো ভ্রূকুটীর দিকে ভ্রূক্ষেপ কর্ব্বে না, যেদিন তারা যুগসঞ্চিত পুঁথি ফেলে দিয়ে নবধর্ম্মকে বরণ কর্ব্বে।···সে ধর্ম্ম ভালোবাসা। আপনাকে ভেঙ্গে, ক্রমে ভাইকে, জাতিকে, মনুষ্যকে, মনুষ্যত্বকে ভালোবাসতে শিখতে হবে, তারপরে আর তাদের নিজের কিছুই কর্ত্তে হবে না, ঈশ্বরের কোন অজ্ঞেয় বিধানে তাদের ভবিষ্যৎ আপনিই গড়ে আসবে। জাতীয় উন্নতির পথ পৌরোহিত্যের প্রবাহের মধ্য দিয়ে নয় না, জাতীয় উন্নতির পথ আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে। যে পথ বঙ্গের শ্রীচৈতন্যদেব দেখিয়ে গিয়েছেন, সেই পথে চল মা। শস্ত্র মিত্র জ্ঞান ভুলে গিয়ে—বিশ্বে বর্জ্জন ক'রে—নিজের কালিমা, দেশের কালিমা, বিশ্বপ্রেমে ধৌত ক'রে দিয়ে।···"

দ্বিজেন্দ্রলালের উপদেশ আগে মানুষ হও, তাহার পরে দেশের দুঃখমোচন দূর করিবার অধিকারী হইবে।

স্বার্থলাভে শান্তি নাই, স্বার্থত্যাগেই শান্তি, ভোগে তৃপ্তি নাই, ত্যাগেই তৃপ্তি—সেবা, অনুকম্পাই শ্রেষ্ঠ গুণ—দ্বিজেন্দ্রলাল এই কথা প্রচার করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। "পৃথিবীতে দুইটী রাজ্য আছে। একটীর নাম স্বার্থ, আর একটীর নাম ত্যাগ। একটীর জন্মস্থান নরক, আর একটীর জন্মস্থান স্বর্গ। একটীর দেবতা শয়তান, আর একটীর দেবতা ঈশ্বর।"

এইরূপে আমরা দেখি দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার কাব্য, নাটক এবং গানের মধ্য দিয়া জাতির নৈতিক চরিত্র গঠনে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। সকল যুগেই সাহিত্যিকদিগের প্রভাব জনসাধারণের উপর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। বর্ত্তমানে দেশের দুর্দ্দিনে আমার সাহিত্যিক ভ্রাতাগণ Art for Art's sake নীতির অনুসরণ করিতে গিয়া প্রায়শঃই এই দায়িত্বের কথা ভুলিয়া যান। তাঁহাদিগকে আমি কাব্য সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের মতটী বিচার করিয়া দেখিতে বলি। ১৩১৬ সালে সাহিত্য পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছিলেন।

"কবিতা লিখিতে বসিলেই নব্য কবিগণ প্রেম লইয়া বসেন। যে দেশের প্রকৃতি নীলিমায়, শ্যামলতায়, পর্ব্বতে, উপত্যকায়, ক্ষেত্রে, নির্ঝরে, সৌরভে, ঝঙ্কারে, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশকে পরাস্ত করিয়াছে, তাহার সন্তানগণ সে দিকে একবার চাহিয়াও দেখিলেন না, আর ধূমাচ্ছন্ন ইংলণ্ডের কবিগণ তাহাদের সেইটুকু লইয়াই উন্মত্ত। এ দুঃখ কি রাখিবার স্থান আছে।"

কাব্যে নীতি নামক এক প্রবন্ধে তিনি একবার লেখেন।

"দুর্নীতি কাব্যে সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইতেছে। তাহার উচ্ছেদ করিতে হইবে। যাঁহারা ধর্ম্ম ও নীতির দিকে, তাঁহারা আমার সহায় হউন। কবিতা লিখিতে বসিলেই নব্য কবিগণ প্রেম লইয়া বসেন। নভেল নাটকও প্রায় তাই। যেন পৃথিবীতে মাতা নাই, ভ্রাতা নাই, বন্ধু নাই, সব নায়ক, আর নায়িকা। আর তাও যদি কবিরা বাস্তব প্রেম লইয়া কাব্য লেখেন, তাহাও সহ্য হয়। ইহাদের চাই—হয় বিলাতী কোর্টশিপ, নয় ত' ইয়ার্কি। বহিলে প্রেম চলে না। অবিবাহিত

পুরুষ ও নারী চাই-ই। ফল দাঁড়ায় এই যে এইরূপ প্রেম হয় ইতরামি (অতএব আমাদের দেশে অস্বাভাবিক), না হয় দুর্নীতিমূলক। সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে উভয়েরই উচ্ছেদ আবশ্যক।

যিনি কাব্যে দুর্নীতির সপক্ষে, তিনি সাহিত্যের শত্রু এবং এইরূপ কদর্যতার সহিত বীভৎসতা ও অশ্লীলতা যিনি আজ্ঞাদন খুলিয়া প্রকাশ করিয়া না যেন, তিনিও সাহিত্যের প্রতি নিজের কর্তব্য পালন করেন না।"

দ্বিজেন্দ্রলালের মত প্রতাপসিংহ নাটকে বোষ্টির মুখ দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। "বোষ্টি এমন কবিতা লেখে, যা পড়ে ভাই ভাইএর জন্য মরে, মনুষ্য মনুষ্যত্বের জন্য মরে।"

অক্ষয়—"এমন কবিতা লেখো—যার গম্ভীর সঙ্গীতবিরাট বন্যার মত অর্ণ্যাবর্তে ছেয়ে পড়ে।"

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার কর্তব্য সম্পাদন করিয়া অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন—আজও মনে পড়ে ১৩১৯ সালের কথা। আমি তখন রাঁচিতে। একদিন একটী নির্জন জায়গায় দাঁড়াইয়া ফাল্গুনসন্ধ্যার শোভা দেখিতেছি এমন সময় কে যেন আমার পাশে বসিয়া গেল কবি দ্বিজেন্দ্রলালের পরলোকগমনের কথা। আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। সহসা ফাল্গুনসন্ধ্যা মেঘে আবৃত হইয়া গেল। দুর্দুর্ধ বজ্রপাত হইতে লাগিল। প্রবল ঝড়ে ওক-পাইনের সারি প্রচণ্ডভাবে দুলিতে লাগিল। শোকাহত হৃদয়ে আমি গৃহে ফিরিয়া আসিয়া লিখিলাম :

"একি মর্মভেদী বাণী! একি হায়—এত অকস্মাৎ,
নিখিল গগন হ'তে আচম্বিতে বজ্র বজ্রপাত!
স্বপ্নেও নাহি জানি বহুদিনে সূর্যাস্তের শোক,
আঁধারিবে বাণী-সূর্য,—ভারতীর আরতি আলোক,
বাষ্পাকুল আঁখিকূলে মেঘারিব অস্ফুট মলিন,
আকার হারাবে শিল্প হ'বে হায় ছায়ার বিলীন।
যে কবীন্দ্র, বাণী-ভক্ত, মহাপ্রাণ, স্বদেশ-প্রেমিক,
পরিহরি বসুধায় এই মায়া-কুহুক অলীক,
মহিমায় উপাধানে রাখি' শির ঘুমাইছ সুখে,—
স্বর্গবাসী কি প্রশান্তি! কি নির্মলে ভাসে তব মুখ!

* * * *

জাতীয় কলঙ্ক লজ্জা, জড়তার ধিক্কৃত গঞ্জনা,
লভিয়াছ মর্মে মর্মে আত্মবিস্মৃতির বেদনা—
দেখিয়া যে এসেছিলে সমুদ্রের পরপার হ'তে
মানবত্ব-'পিগমেলিয়ন' গড়ে যা'রা আত্মজন-ব্রতে
জাগিয়ে তুলিতে ধন্য। হে মহান্, হে উচ্চ, উদার,
জাগাতে এ মরা-প্রাণে জীবনের যে মন্ত্র জোয়ার,
প্রাণপণ আকিঞ্চনে তন্ত্রী তব বাজিলে উদার—
জীবন্মৃত মোরা হায় তন্দ্রাঘোরে বেলিনি সাড়া।
অন্তরে করি' মোরা রচি' তব বিজয়-তোরণ,
তোমার স্মৃতিরে সেবা পুণ্যমন্ত্রে করিব বরণ।
সভাষীর ইতিকথা কীর্তি তব রাখিবে গাঁথিয়া
জ্যোতিষ্ক-নওশী মাঝে রত্ন বেদী দিবে উদ্ভাসিয়া।"

আমরা যেন কবির উপদেশ ভুলিয়া না যাই—ভুলিয়া না যাই আমাদের কর্তব্য এবং দায়িত্ব। সভাসমিতি করিয়া আজ আমরা তাঁহার পবিত্র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। কিন্তু কবির আত্মার প্রতি সত্যকার শ্রদ্ধা আমরা সেই দিন নিবেদন করিব—যেদিন তাঁহার স্বপ্নকে আমরা সফল করিয়া তুলিব, যেদিন আমরা সত্যকার মানুষ হইয়া উঠিব, সাম্য ও মৈত্রীর বাণী লইয়া বিশ্বপ্রেম স্থাপনে সফল হইব—যেদিন বিধাতার আশীর্বাদপূত এই ধরণীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইব। সফল হউক দ্বিজেন্দ্রলালের কামনা, সার্থক হউক আমাদের সাধনা, বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হউক।

আলঙ্কারিক কুন্তক

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র যেমনি বিশাল, তেমনি গভীর, ইহার তুলনা নাই। এ শাস্ত্র এরূপ সুসমৃদ্ধ যে এর যে কোনও একটী অংশের সঙ্গেও জগতের কোনও রসশাস্ত্র তুলনীয় হয় না।

আধুনিক খ্রীষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত ভরতের নাট্যশাস্ত্রই অলঙ্কার গ্রন্থের আদি গুরু, বলা চলে। নাট্যশাস্ত্রকে বাদ দিলেও, ভট্টিকাব্যের কবি ভর্তৃহরির অন্যূন দু'শত বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে অলঙ্কারশাস্ত্র বহুবিধ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। সুতরাং খ্রীষ্টপূর্ব দু'শত বৎসর থেকে সাহসাঙ্কের সভাকবি [illegible] পণ্ডিতরাজের [illegible] প্রায় উনিশ শত বৎসর ধরে ভারতে অলঙ্কারশাস্ত্রের অফুরন্ত অনুশীলন ও প্রসার ঘটেছে, এ সগৌরবে বলা চলে। বৌদ্ধ ও জৈনেরাও সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে প্রভূত দান করে গেছেন।

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে কাব্যের প্রয়োজন, লক্ষণ, বিভিন্ন শ্রেণী, দোষ ও গুণ, এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধির উপায় প্রভৃতির আলোচনা নিবদ্ধ আছে। আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্র বা রসশাস্ত্রকে চার ভাগে ভাগ করা চলে—

১। অলঙ্কারসম্প্রদায়

২। রীতিসম্প্রদায়

৩। রসসম্প্রদায়

৪। ধ্বনিসম্প্রদায়

প্রতি সম্প্রদায়েই সুপ্রসিদ্ধ কাব্যসমালোচক অপরিচিত আছেন। তন্মধ্যে প্রথম সম্প্রদায়ে ভামহ, উদ্ভট ও রুদ্রট, দ্বিতীয়ে দণ্ডী ও বামন; তৃতীয়ে রোদ্রট, বক্রোক্তি ও ভট্টনায়ক এবং চতুর্থশ্রেণীতে অভিনবগুপ্ত এবং আনন্দবর্ধনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে অলঙ্কারবাদীরা অলঙ্কারের, রীতিবাদীরা রীতির, রসবাদীরা রসের এবং ধ্বনিবাদীরা ধ্বনির কাব্যে সর্বপ্রাধান্য ঘোষণা করেছেন। এই সমস্তের মধ্যে এ চারিটী সম্প্রদায়ের পারস্পরিক বিভেদ সম্বন্ধে কিছু বলা সম্ভবপর নয়। তজ্জন্য ঐ বিষয়ে আমি কোনও প্রচেষ্টা করবো না। আজ আমি অলঙ্কারসম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় কুন্তকের বিষয়েই সামান্য কিছু বলবো।

কাব্যে অলঙ্কারেরই সর্বপ্রাধান্য, স্বকীয় যুক্তিজালে এটী প্রমাণিত করার জন্য কুন্তক বক্রোক্তিজীবিত নামক বিশিষ্ট গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। এ গ্রন্থে তিনি ভামহের মতবাদই বিশেষভাবে প্রপঞ্চিত করেছেন।

কুন্তক খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ সময়ের মধ্যে প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন; এবং খুব সম্ভবতঃ তিনি অভিনব গুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন। ধ্বনিমতবাদ কুন্তকের নিকট অপরিজ্ঞাত না হলেও তাঁর উপর এর কোনও বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না।

কুন্তকের কুন্তল বা কুন্তলক নামও পাওয়া যায়। তিনি যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিক ছিলেন এবং তাঁর মতবাদ যে বিশিষ্ট সম্মান অর্জন করেছিল, সাহিত্যচূড়ামণি-প্রণেতা বিখ্যাত আলঙ্কারিক শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভৃতির উক্তি থেকেই তা' প্রমাণিত হয়। শ্রীগোপাল ভট্ট তাঁকে আলঙ্কারিকদের মধ্যে তৃতীয় স্থান প্রদান করেছেন এবং তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন—

বক্রোক্তিরঞ্জনীমুক্তিং চক্ষুষিব মুখে বহন্।
কুন্তকঃ ক্রীড়তি সুখং কীর্তি-স্ফটিক-পঞ্জরে॥

অর্থাৎ চক্ষুর মত বক্রোক্তিরঞ্জনী উক্তি মুখে বহন করে কুন্তক কীর্তির স্ফটিকপঞ্জরে সুখে বিহার করছেন।

কুন্তক তাঁর "বক্রোক্তি-জীবিত" নামক গ্রন্থে কীদৃশ মতবাদ প্রপঞ্চিত করেছেন, তা' বলবার আগে "বক্রোক্তি" কথাটার অর্থ কি, এ বিষয়ে আপনাদের কাছে আমি একটু বলতে চাই।

দণ্ডীর মতে বক্রোক্তি স্বভাবোক্তি ব্যতীত অন্য সমস্ত অলঙ্কারের সমষ্টি। বামনের মতে বক্রোক্তি অর্থালঙ্কার বিশেষ এবং রুদ্রটের মতে ইহা একটী শব্দালঙ্কার মাত্র। কিন্তু কুন্তক সহজ উক্তি বা সরল বৈদগ্ধিপূর্ণ উক্তি এর বিপরীত রূপেই বক্রোক্তি কথাটীর ব্যবহার করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি ভামহেরই মতাবলম্বী। ভামহ বলেছেন, সূর্য অস্ত গেছে, চন্দ্রোদয় হচ্ছে, পাখীরা বাসায় ফিরে চলেছে, এ জাতীয় রচনা কাব্য নয়, এগুলিকে "বার্তা" বলা চলে, অর্থাৎ এগুলি প্রয়োজন সাধারণের সামিল। এ রচনা কাব্য-পদবীতে তখনই উন্নীত হয়, যখন ইহা বক্রোক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে। বক্রোক্তির অর্থ এখানে সৌন্দর্য বা রমণীয়তা; বাংলা অর্থে বাঁকা বাঁকা বা টারা টারা কথা নয়। অর্থ প্রকাশ করার সাধারণ যে উপায়, সে উপায় পরিত্যাগ করে যখন সৌন্দর্যসৃষ্টি করার জন্য কবি অন্য উপায় অবলম্বন করেন, তখনই তিনি বক্রোক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাই মহিম ভট্ট কুন্তকের মত ব্যাখ্যায় স্বকীয় গ্রন্থে বলেছেন—"শাস্ত্রাদি-প্রসিদ্ধ-শব্দার্থোপনিবন্ধ-ব্যতিরেকি যদ্ বৈচিত্র্যং তদাত্মলক্ষণং বক্রত্বং নাম কাব্যস্য জীবিতমিতি"। এই বক্রোক্তি, বিচিত্রতা, বা রমণীয়তার কোনও একটা সংজ্ঞা প্রদান করা সহজ নহে। কুন্তক নিজে বলেছেন—বক্রোক্তিরেব বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতিরুচ্যতে", অর্থাৎ ব্যুৎপত্তিচমৎকৃত অভিবিশিষ্ট কবির উক্তিকে বক্রোক্তি বলা হয়। এই উক্তি-বৈচিত্র্য বাস্তবিক পক্ষে কবির প্রতিভা, ব্যুৎপত্তি ও কৌশলের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কবির প্রতিভার অনন্তত্বহেতু বক্রোক্তিও, কবিতঃ অনন্তপ্রকারের। তবে মূলতঃ ইহা পাঁচ প্রকারে আত্মপ্রকাশ করে।

১। বর্ণবিন্যাসে।

২। পদে।

৩। বাক্যে।

৪। প্রকরণে।

৫। (সম্পূর্ণ) প্রবন্ধে।

এর মধ্যে প্রথম প্রকারের বক্রতা বা সৌন্দর্য বর্ণসংঘটনের উপর নির্ভর করে, অন্যান্য আলঙ্কারিকেরা একেই যমক ও অনুপ্রাস নাম দিয়ে থাকেন। উদাহরণস্বরূপে আমাদের অতি প্রিয় "গীতগোবিন্দ" থেকেই উদ্ধৃত করছি—

"ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে"।

অথবা—"চন্দনচর্চিতনীলকলেবরপীতবসনবনমালী
কেলিচলন্মণিকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডযুগস্মিতশালী।

কুন্তকের মতে, দ্বিতীয় প্রকারের বক্রতা পদ-বক্রতা। এই পদ-বক্রতা দুই প্রকারের—পদপূর্বার্ধ-বক্রতা ও পদপরার্ধ-বক্রতা। পদ-পূর্বার্ধ-বক্রতার পর্যায় বা সমার্থক শব্দ, রূঢ়ি বা প্রসিদ্ধার্থক শব্দ, উপচার বা সাদৃশ্যমূলক সম্বন্ধনির্দেশ, বিশেষণ, সংবৃতি বা সংহতভাষণ (covert expression), বৃত্তি (সমাস ও তদ্ধিত), ভাব (roots of words), লিঙ্গ ও ক্রিয়ার বিশিষ্ট প্রয়োগ এবং পদ-পরার্ধ-বক্রতার কাল, কারক, সংখ্যা, পুরুষ, উপগ্রহ বা বাচ্য (Voice) এবং অব্যয়ের বিশিষ্ট প্রয়োগ বর্ণিত হয়েছে।

এই পদবক্রতার উদাহরণস্বরূপে মহাকবি কালিদাসের অমর কাব্য মেঘদূত থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করছি। মন্দাক্রান্তা ছন্দে এই শ্লোকটী উপচারবক্রতা হেতু অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী।

গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং
[illegible]

সৌধাভিত্তি কণকনিকষস্নিগ্ধা যত্র ভাতি।
হেমাম্ভোরুহনিভমুখো যাম্ভ তুষ্টিং ত্বয়া তাঃ।

(মেঘদূত—পূর্ব ৩৮)

মেঘদূতে যক্ষ তাঁর বন্ধু মেঘকে অনুরোধ জানাচ্ছেন, অলকায় যাওয়ার পথে আম্রকূট, চিত্রকূট প্রভৃতি পাহাড় হয়ে অবন্তীতে মহাকাল শিবকে দর্শন করে তার যাওয়া উচিত, তবে সেখানে গ্রিপ্রোদ্ভেদে যে সব রমণী আলোকহীন রাজপথ সূচিভেদ্য অন্ধকারে চলেছেন, তাঁদের যেন সে বিদ্যুচ্চমকে আলো প্রদান করে, যদি বা গর্জন করে যেন এঁদের ভয় দেখানো না হয়, কারণ এঁরা বড়ই ভীতিপ্রবণ। পদবন্ধনের দিক থেকে এ শ্লোকের "সূচিভেদ্য" পদটি অসাধারণ। এই একটী কথায় অন্ধকারের নিবিড়তা মূর্তিমান হয়ে পাঠকের কাছে ধরা দিয়েছে। মূর্তিহীন অন্ধকারের এই যে নিবিড়তা হেতু মূর্তিপরিগ্রহ, যা সূচি দিয়ে ভেদ করা যায়,—তাতে মূর্তিহীনে মূর্তিপরিগ্রহের ধর্ম উপচার করা হয়েছে। এ যে উপচারসম্ভিন্ন সৌন্দর্য, এটাই কুন্তকের উপচার-বক্রতা।

বাক্যবক্রতায় কুন্তক অর্থালঙ্কারসমূহের পর্যালোচনা করেছেন; তবে স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে বস্তুর যথাযথ রূপ বর্ণনা করা হয় বলে এবং ইহা বক্রোক্তিবিহীন বলে এ অলঙ্কারকে কুন্তক অলঙ্কার বলে স্বীকার করেন নি।

কুন্তকের মতে অলঙ্কার দুটী জিনিষের উপর নির্ভর করে—(১) চমৎকারিত্ব*; (২) কবি-প্রতিভা। কবি-প্রতিভার বলে এ চমৎকারিত্ব অলঙ্কারের সহায়তায় কাব্যে কীরূপভাবে প্রকাশ পায়, তার উদাহরণ শকুন্তলা থেকেই দিচ্ছি। একটী বস্তুকে বোঝাতে গিয়ে অপর একটী বস্তুকে যখন উপমেয়রূপে বর্ণনা করা হয়, তখন আমরা "উপমা" নামক অলঙ্কার পাই; এবং কবি যখন একটী বিশেষ বাক্য সমর্থনের জন্য একটী সামান্য বা সর্বসাধারণ বাক্যের প্রয়োগ করেন, তখনই অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কারের আশ্রয় নেওয়া হয়। এই শ্লোকটী উপমা ও অর্থান্তরন্যাসেরই উদাহরণ।

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্।

অর্থাৎ পদ্ম শৈবালের দ্বারা পরিবৃত হলেও সুন্দর দেখায়; চন্দ্রের কৃষ্ণ চিহ্ন উহার সৌন্দর্যই বর্ধিত করে। এই তন্বী শকুন্তলা বল্কল-পরিহিতা হলেও অত্যন্ত মনোহারিণী; সুন্দর আকৃতি যাঁদের, তাঁদের সব কিছুতেই সুন্দর দেখায়। এই উদাহরণে প্রথম দুই পংক্তিতে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার এবং শেষ পংক্তিতে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার থাকায় এ কবিতা অত্যধিক চমৎকারিতা লাভ করেছে।

ব্যাজস্তুতির একটী উদাহরণ দিচ্ছি—

পুনঃ পুরাণাদ্যমধিত্য শ্রিয়ং পরিভুঞ্জতে
রাজন্নিদং কুলবশস্তু কিমিবং তব যুজ্যতে।

হে রাজন্! তুমি ইক্ষ্বাকু বংশে জন্মগ্রহণ করেও পুরাণ পুরুষ নারায়ণ থেকে লক্ষ্মীকে অপহরণ করে নিয়ে যে উপভোগ করছ, তা কি তোমার উপযুক্ত কাজ হচ্ছে? এ বাক্য শুনতে নিন্দার মতই শোনাচ্ছে; কিন্তু আসলে এ রাজার প্রশংসা—কেননা রাজা ধন-সৌলতের অধীশ্বরী লক্ষ্মীদেবীকে নিজের ঘরে রেখে দিয়েছেন এবং সমগ্র পৃথিবী উপভোগ করছেন। এটী ব্যাজস্তুতি।

এ ভাবে কুন্তক অধ্যায়ে ও সমগ্র প্রবন্ধে বক্রত্ব বা সৌন্দর্য প্রতিপাদিত করেছেন।

কুন্তকের আর একটী মত অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। তিনি দেশভেদ অনুসারে বিভিন্ন রীতির নামকরণে বিশেষ আপত্তি করেছেন। তিনি বলেছেন, একই দেশের বিভিন্ন লোক বিভিন্ন প্রণালীর রচনায় অভ্যস্ত। গৌড় দেশে জন্মগ্রহণ করলেই গৌড়ী রীতি, আর বিদর্ভে জন্মগ্রহণ করলেই বৈদর্ভী রীতিতে কবি সুদক্ষ হবেন, এমন কোনও স্বাভাবিক নিয়ম নাই। তাই কবির শক্তি, ব্যুৎপত্তি এবং অভ্যাস অনুসারেই যখন রচনার রীতি বিভাজিত হয়,* তখন দেশের অংশবিশেষের সঙ্গে কোনও রীতিকে চির-সংবদ্ধ রাখলে চলতে পারে না।

রস সম্বন্ধে কুন্তকের বক্তব্য এই যে রস বিশেষপ্রকারের বক্রত্ব পুষ্ট করে তোলে বলে ইহা কাব্যের পক্ষে প্রয়োজনীয়। ইনি ভামহ ও দণ্ডীর "রসবৎ, প্রেয়ঃ, ঊর্জস্বী এবং সমাহিত" এই চারটী অলঙ্কারকে অলঙ্কার বলেই স্বীকার করেন না। এই চারটী অলঙ্কার কুন্তকের মতে অলঙ্কার্য, অলঙ্কার নয়। তবে কুন্তক রচনায় রসের গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। প্রবন্ধ ও প্রকরণবক্রতায় রসের অত্যধিক গুরুত্ব তিনি ঘোষণা করেছেন। কুন্তক ধ্বনির গুরুত্বও স্বীকার করে নিয়েছেন; তবে ধ্বনিই কাব্যের প্রাণ—তা তিনি স্বীকার করতে রাজী নন। অবশ্য মম্মটের কাব্য-প্রকাশ রচনার পরে "ধ্বনি"-বাদ এমন প্রসার লাভ করে যে তারপরে অন্য কোনও মতবাদ আলঙ্কারিকেরা স্বীকার করতে চান নি। ফলে কুন্তকের অসাধারণ প্রতিভা ও ব্যাখ্যানকৌশল সত্ত্বেও তাঁর মতবাদ পরবর্তী যুগে বিশেষ সমাদর লাভ করে নি। পরবর্তী যুগের আলঙ্কারিকেরা কেবল খণ্ডনের জন্যই কুন্তকের মতবাদ স্বকীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

যাহা হোক্, কুন্তকের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তি মতবিশেষ স্থাপনের অপূর্ব কৌশল, নির্ভীকতা এবং যুক্তির দৃঢ়তা, ফলতঃ তাঁর অতুলনীয় প্রতিভা সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রভূত সমৃদ্ধি সম্পাদন করেছে, এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

* এই চমৎকারিত্ব বিচ্ছিত্তি, বৈচিত্র্য, চারুত্ব, চমৎকার, সৌন্দর্য, রসত্ব প্রভৃতি নামেও অভিহিত হয়েছে।

* অল্-ইণ্ডিয়া রেডিওর "সাহিত্য-আসরে" পঠিত এবং কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত।

লণ্ডন থেকে ফিরবার পথে

ডক্টর শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী লণ্ডন থেকে বেলা ১০টায় রেলগাড়িতে চড়ে প্রায় দু ঘণ্টায় উলউইচ গোডাউনে পৌঁছি। সেখানে টেমসের একটি কাটা খাড়ির মধ্যে 'মালোজা' জাহাজ দাঁড়িয়েছিল। বেলা ১২টায় জাহাজে উঠি। উঠামাত্রই দুপুরের খাওয়ার ঘণ্টা পড়ে। সফরকালের ভাত পেয়ে বাঙালী যাত্রীরা খুব উৎফুল্ল হল। অবশ্য এর পরে জাহাজে আর দুদিন মাত্র ভাতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। জাহাজখানি বড় হলেও (২৩ হাজার টন) পুরাতন—গতিও ২৪ ঘণ্টায় ৩৮০-৩৯০ মাইল মাত্র ছিল। যাত্রী সংখ্যা ছিল বার তের শত। সবই এক ক্লাস—টুরিষ্ট ক্লাস—তাড়াও অনেক সস্তা। লণ্ডন থেকে বোম্বাই এর ভাড়া ৫২ পাউণ্ড মাত্র—অবশ্য খাই খরচা সমেত। পাউণ্ডের দাম এ সময় ছিল সওয়া তের টাকা। যাবার সময় গিয়েছিলাম বিখ্যাত জাহাজ ষ্ট্রাথেয়ার্ডে (২৭ হাজার টন) —প্রথম শ্রেণীতে—তাড়াও নিয়েছিল ৯২ পাউণ্ড। অবশ্য কামরায় একক ছিলাম। এবার আসতে হল অপর পাঁচজনের সঙ্গে এক কামরায়। শ্রেণী বিভাগ না থাকাতে এ জাহাজে যে কোনও তলাতে গিয়ে পরস্পর দেখা শুনা বা আলাপ আলোচনা করবার কোনো বাধা ছিল না। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ভোর থেকেই ছিল ভীষণ কুয়াশা। সারাদিন প্রায় সমভাবেই ছিল। আমি যে কয়মাস ওদেশে ছিলাম—সূর্য্যের মুখ বড় একটা দেখতে পাই নি। অধিকাংশ সময়ই যেন কুয়াশায় ঢাকা থাকত—জার্মানি সুইজারল্যাণ্ডে ত বরফই পড়ত প্রায়শঃ। সুতরাং বারমাস উজ্জ্বল সূর্য্য দেখার অভ্যাস যাদের—তাদের কাছে এ অবস্থা যে কষ্টদায়ক হবে তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। তাই মালোজা জাহাজ সুদূর সাগরে আসার পর যখন নির্মল সূর্য্যকরোজ্জ্বল আকাশ ও সমুদ্র এবং শুভ্রপক্ষের শুভ্র জ্যোৎস্নাপুলকিত প্রকৃতির সাক্ষাৎ পেলাম তখন সত্যিই বড় ভাল লাগল। অজ্ঞাতসারেই একটি কবিতায় এই উচ্ছ্বাস হল প্রকাশিত। আপনাদের বিরক্তি উৎপাদনে বিরত হবার জন্য এর প্রথম ৩ ছত্র মাত্র উদ্ধৃত করলাম—

মালোজা ফুল্ল সরোজিনী সম ভাসিয়া জলে
আঁধারের দেশ পিছনে ফেলিয়া—
সাগর দোলায় দুলিয়া দুলিয়া
চির সুন্দর আলোকের দেশে হাসিয়া চলে।

কবিতাটির ইংরেজী করে সহযাত্রী জার্মান ও ইংরেজ বন্ধুদের দেখাতে তারাও এর খুব তারিফ করেছিল। নীচে প্রথম চার ছত্র উদ্ধৃত করলাম।

Like a full blown lotus on the Sea
The Maloja floats all gay and free.
Leaving the land of fog and mist
Onward She moves to the Sunny East.

আবার কিছু সময়ের জন্য সেই আঁধারের দেশে—উলউইচ জাহাজ-ঘাটে আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি। লাঞ্চের পর জাহাজের অনেক অলিগলি ছেড়ে নিজের কামরায় গিয়ে মালপত্র গোছগাছ করে ডেকে উঠলাম। তখন বিকাল হয়ে গেছে। চারদিকে মানুষ—'ফিগার' দিয়ে বোঝার উপায় নেই। যাঁরা প্রিয়জনদের বিদায় দিতে এসেছিলেন তাঁরা সজল চক্ষে বিদায় নিয়ে নেমে যাচ্ছেন। ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে অনেকের আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব; তাঁরা একদৃষ্টে জাহাজের দিকে চেয়ে আছেন; জোরে কথাবার্তাও দুএকটি বলছেন। ক্রমে জাহাজ চলতে সুরু করল। টুপি রুমাল প্রভৃতি নেড়ে চলমান এবং স্থির জনতার মধ্যে বিদায়ের পালা শেষ হল। এই সময় ডেকে দেখা হ'ল একজন খর্বাকৃতি, কৃষ্ণকায় বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে। ইনি শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী গুপ্ত। ইনি ওরিয়েন্টাল লাইফ ইনসিওরেন্সের ঢাকা শাখার ম্যানেজার ছিলেন। অবসর গ্রহণ করেছেন অনেকদিন—লণ্ডনের কাছে থাকেন। প্রায় এক বৎসর ইনি ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ ও পরিবর্তন করে ফিরছেন। বৈষ্ণব ধর্মের মহিমা প্রচার করাও বাকি তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। শ্রীযুক্ত গুপ্তের সাহিত্যানুরাগ ও বৈষ্ণব সাহিত্যের দখল অসাধারণ। এই বয়সেও তাঁর স্মৃতিশক্তি এবং শারীরিক শক্তি যথেষ্ট। প্রবলবেগে খেলাতেও তিনি সমভাবে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতেন। এঁর লিখিত গোবিন্দ-ধামের কড়চার প্রতিবাদ পুস্তক দেখালেন। রামকৃষ্ণ পত্রিকাতেও এঁর লেখা দেখলাম। ফলতঃ শ্রীযুক্ত গুপ্তের সাহচর্য্য জাহাজের এক-ঘেয়ে দিন কাটানোর পক্ষে মূল্যবান হয়েছিল আমার কাছে। এঁর তাগিদেই জাহাজে কবিতা লিখতে বাধ্য হই। একটির উল্লেখ করেছি—আর একটিতে উপসংহার করব।

আমার কামরায় ছিল দুটি পাঞ্জাবী যুবক। এদের ঘরের আরও কয়েকটি পাঞ্জাবী যুবক ছিল পার্শ্ববর্তী অন্য কামরায়। বাঙালী আমরা বিলাতে যাই টাকা খরচ করতে, কিন্তু পাঞ্জাবীরা ইংলণ্ডে টাকা উপার্জন করে—তা নিয়ে দেশে ফিরছে। এদের সবারই কাটা কাপড়ের ব্যবসায় —লিভারপুল, মানচেষ্টার প্রভৃতি শহরে। নিজেদের জ্ঞাতি ভাইদের হাতে দোকানের ভার দিয়ে তারা কয়মাসের জন্য দেশে ফিরছে। এদের মধ্যে শান্তি নামে যুবকটির কথা বড়ই বিস্ময়কর। সে লেখাপড়া জানে না: কোনও রূপে নিজের নামে দস্তখত করা মাত্র শিখেছে। আঠার বৎসর সে লিভারপুলে আছে। এখন বয়স হবে ত্রিশের কাছাকাছি। অবিবাহিত, স্বাস্থ্যবান, সুদৃঢ় গঠন। তবে চরিত্র বলতে আমরা সাধারণতঃ যা বুঝি—সে বালাই এর নেই। লিভারপুলে এর বড় দোকান—নিজে নানা হাট ও লণ্ডন প্রভৃতি সহর থেকে সাইকিরী ঘরে কাপড় কিনে নিয়ে যায়। দোকানে হিসাব রাখার জন্য কর্মচারী রেখেছে একজন ইংরেজকে

—একে মাসে সপ্তাহে ৬ পাউণ্ড মাইনে দিতে হয়। সপ্তাহে শনিবার দোকানের লাভ হয় কুড়ি পঁচিশ পাউণ্ড। অবশ্য এই টাকার অধিকাংশই সে করে অপব্যয়। অকৃত জ্ঞানহীন এই সরল পাঞ্জাবী যুবক মাঝে মাঝে তার বিচিত্র জীবনকাহিনী অকপটে বলে যেত আমাদের সামনেই—পিতার বহু সহস্র সরল ভাষা ভাষা ইংরেজীতে। আমার কামরায় যে দুই পাঞ্জাবী যুবক ছিল, তাদের মধ্যে একজন মোটামুটি শিক্ষিত এবং বেশ মার্জিতরুচিসম্পন্ন। মীরাটের সঙ্গে কমনীয়তার সুন্দর সমাবেশ দেখেছি তার মধ্যে। এই যুবক ছিল এদের চালক ও উপদেষ্টা। অপর যাত্রীটি ছিল খুব হিসাবী, সরল, অনাড়ম্বর প্রকৃতির; মদ দূরে থাক, সিগারেট পর্যন্ত সে স্পর্শ করত না। সদা হাসি মুখ এই যুবকের আপ-খোলা ব্যবহারের কথা অনেকদিন মনে থাকবে।

আহারে দুই তিন দিন চলার পর আমাদের একজন বাঙালী যুবক আমায় বলল—ডেকে একজন মাঝারি বৃদ্ধ ভদ্রলোককে সে দেখেছে—ভদ্রলোক ইংরেজী প্রায় বলতে পারেন না করেই কথা বলার সঙ্গী খুঁজছেন। আমি পরদিন একে খুঁজে বের করে আলাপ করলাম—ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে পেটের ব্যথে ইনি (বের হাইনরিখ কাপ্‌স) মহীশূরের একটি চিনির কলের কেমিষ্ট হ'য়ে ভারতে আসছেন। ফেটেখাটো চেহারার এই বৃদ্ধ জার্মান ভদ্রলোকের উদাস অনাহার কারণ দৃষ্টি আমাকে বড়ই আনমনা করত। তিনি আমার কামরায় এসে জার্মান প্রার্থনা বেখে কয়েক দিন উহা পড়লেন এবং মহীশূরে গিয়ে এই বইএর সাহায্যে ইংরেজী শিখতে চেষ্টা করবেন, বললেন। কয়েক দিনের মধ্যে বেশি ঢের বাপর অনেক জার্মান সহযাত্রী আবিষ্কার করে ফেলেছে। এদের কেউ আসছে কেমিষ্ট হয়ে কলের সাবানের কলে, কেউ ইটালি ইঞ্জিনিয়ারের পদে, কেউবা যাচ্ছেন অধ্যাপক হয়ে। কলকা খনির মালিক কলিকাতার একজন বাড়োয়ারী বণিকের চাকরী নিয়েও একজন আসছেন দেখলাম। এদের সবার সাথেই আমার বেশ আলাপ হয়েছিল এবং এঁদের মধ্যে কেউ কেউ পরে চিঠিপত্রও লিখেছেন আমাকে। কয়েকজন সপরিবারে এসেন। তার জন্যে ব্যাঙ্গালোরে যিনি পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হয়ে এলেন তাঁর চার পাঁচটি কাচ্চাবাচ্চা। তাঁর কথা যা শুনলাম তাতে পেটের পিলে চমকে ওঠে। তাঁকে মোটা মাইনে যা দিতে হবে তা ছাড়াও তাঁকে এখানে আসবার অনুমতি দেবার জন্য দৈনিক বাকি ৫০ ডলার ক'রে দেশানি দিতে হবে মার্কিন মিলিটারী সরকারকে। অথচ পরেকে হিসাবে তাঁর ক্লাসে কোনও খ্যাতির কথা ত পূর্বে শুনিনি। যুইজারল্যাণ্ডে বিজ্ঞানের মেকেল লেবরেটরি অধ্যাপকগণ যেখানে বড় জোর দু' হাজার টাকা বেতনে সন্তুষ্ট—সেখানে এরূপ একজন বিজ্ঞানীর জন্য ভারতের এই ঔদ্ধত্যের রহস্যের কি মানে হ'তে পারে তা বুঝে উঠতে পারলাম না। ব্যাপারটি বড় রহস্যময় ঠেকল।

কল্পনা ভুলেও মরণা যায় না—ভারতীয়রা বহুদিন বিলাতে থাকলেও যে তাদের চরিত্রের উৎকর্ষ কেমন লক্ষিত হয় না—তার প্রমাণ মিলল কয়েকটি পাঞ্জাবী যুবকের ব্যবহারে। একটি কামরায় দু'জন পাঞ্জাবী ও বোধ করি তিনজন বাঙালী ছিলেন। সবাই উচ্চ-শিক্ষিত। যুক্তপ্রদেশ নিবাসী জনৈক বাঙালী ভদ্রলোক যুদ্ধের গোড়া থেকেই লণ্ডনে ছিলেন—তিনি ওষুধ কি ডাক্তার হবেন, ঠিক জানা নেই। এঁর সাধারণ চালচলন খুব রুচিসম্মত ছিল না, তারপর একদিন রাত্রে কামরায় মুখ ধোবার জন্য যে সিঙ্ক থাকে তাতে তিনি প্রস্রাব করেন। টের পেয়ে তাঁর সহযাত্রী বাঙালী ও পাঞ্জাবীরা এই কাজের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাঁর পায়সার মদ খেতে চায়। ভদ্রলোক উহাতে স্বীকৃত না হওয়ায় পাঞ্জাবী যুবকদ্বয় প্রৌঢ়ের অনুপস্থিতিতে তাঁর বিছানায় প্রচুর মূত্রোৎসর্গ করে। এই ব্যাপার শেষে এতদূর গড়ায় যে, একদল ক্যাপ্টেনের কাছে গিয়ে নালিশ করে এবং ক্যাপ্টেন উভয় পক্ষকেই ডেকে যারপরনাই তীব্র ভাষায় তিরস্কার করে দেন। ক্যাপ্টেনের ঘর থেকে লাউডস্পিকারে যখন উভয়পক্ষের ডাক পড়ে তখন ব্যাপারটি বেশ রাষ্ট্র হয়ে যায় এবং ইহা সুরুচিসম্পন্ন ভারতীয় যাত্রীদের মনে গভীর রেখাপাত করে।

বোম্বাই বন্দরে তার স্বামীর কাছে আসছিল একজন ইংরেজ যুবতী। একজন ব্যাপারও পাঞ্জাবী যুবক নিজেকে অক্সফোর্ডের ডক্টরেট উপাধিধারী বলে পরিচয় দিয়ে তার সঙ্গে এমন বেহদ ঘনিষ্ঠতা জমায় যাতে করে জাহাজের ইংরেজ এবং পাঞ্জাবী মহলে বেশ চাঞ্চল্য জেগে ওঠে। মাদ্রাজের এবং পাঞ্জাবের কয়েকটি আমেরিকা-ফেরৎ ছাত্র জাহাজে ছিল। এম, এস প্রভৃতি ডিগ্রী নিয়ে ফিরছে। এদের মালিকতা এবং 'মেমসাহেবচাটা'-স্বভাব দেখে আদৌ ভাল লাগেনি। জাহাজে দুএকটি বাঙালী পরিবার এবং বাঙালী মধ্যবিত্ত অবস্থার ছাত্র অনেকগুলি ছিল। এদের কয়েকজন বিলাতের লোহালক্কড়, কাপড়ের কল প্রভৃতিতে ট্রেনিং নিয়ে দেশে ফিরছে। এদের মধ্যে অবশ্য পাঞ্জাবী-মাদ্রাজীদের মত কামড়-চাপল্য দুষ্ট হয়নি। মিতভাষিতা, শিষ্টাচার প্রভৃতিও এদের ইরেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। দেখে মনে হল—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিবেকানন্দ, অশ্বিনী দত্ত, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বাংলা দেশে জন্ম বিফলে যায়নি। আমি নিজে বাঙালী বলে নয়, পরন্তু ক্ষুদ্র প্রাদেশিকতার ঊর্দ্ধে দাঁড়িয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যা দেখেছি তারই উল্লেখ করলাম মাত্র। বোম্বাই এবং উড়িষ্যার যুবক ছাত্র সহযাত্রীদেরও চারিত্রিক দার্ঢ্য এবং চরিত্রমাধুর্য দেখে খুশী হয়েছি।

জাহাজে ছোট ছেলেমেয়েসহ যে পনর কুড়িজন জার্মান ছিল তারা সবাই বোম্বাই বন্দরেই নামল। প্রায় তিনগুণ শত ইংরেজ যুবক যুবতীও সেখানে নেমে অধিকাংশই গেল পশ্চিম পাকিস্তানে। এছাড়া মিশনারী স্ত্রীপুরুষ ছিল তিন চারিজন। শিশুসন্তান এবং ছেলেমেয়েও এদের ছিল অনেকগুলি। এরা বিভিন্ন মহলে যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও দক্ষিণ ভারতে যাচ্ছে শুনতে পেলাম। এদের যিনি চাই—তিনি বিরাটকায় পুরুষ, পঞ্চাশের কাছে বয়স, ক্রেকফাট দাড়ি। ইনি আগেও অনেকদিন ভারতবর্ষে কাটিয়ে গেছেন। অপর একজন মিশনারী যুবক আমায় খুব দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বয়স এর সাতাশ, আটাশ বৎসর। সুঠাম কমনীয় চেহারা—বিলাতের ডাক্তারী পাশ—

সঙ্গে শিশুপুত্রসহ স্ত্রী। ভদ্রলোক যেরূপ দুষ্টু ও দীর্ঘকায়—স্ত্রী ঠিক তার উল্টো—নিতান্ত রোগা, কাপড়ী এবং সারামাটী চেহারা। এই দম্পতিকে প্রায় সময়ই হিন্দী পড়তে দেখা যেত। এরা যাবে যুক্তপ্রদেশের গ্রাম-অঞ্চলে। মাঝে মাঝে এরা সহযাত্রী হিন্দীভাষী লোকের কাছে পাঠ নিত। অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে পড়ত এবং একখানি বোর্ডে হিন্দী হরফ ও বানান লিখত। যে ঢাই মিশনারীর উল্লেখ করলাম, তিনি মাঝে মাঝে ভারতগামী এই সব মিশনারীদের একত্র ডেকে আচার ব্যবহার সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। একদিন তাঁর বক্তৃতা শুনলাম। তাঁর বক্তৃতার কয়েকটি কথা বলছি—

"তোমরা নতুন কুর্তন যা করবার এই জাহাজেই সেরে নাও ; কারণ কর্মস্থলে গিয়ে বৃহত্তীতাধি করলে 'নেটিভরা' তোমাদের কথায় আস্থা স্থাপন করবে না। হিন্দীও যথাসম্ভব শিখে নাও—কারণ স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে তাদের ভাষায় কথা না বললে তোমরা তাদের হৃদয় জয় করতে পারবে না। বাবুগিরিও তোমাদের ছাড়তে হবে। গরীব চাষীর বা কুলীর ঘরে গিয়ে গ্রামের ধাওড়ার মাতুর বা মাটিতেই তোমরা বসবে—তাহলে তোমাদিগকে তারা বেশী আপনার জন মনে করবে। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ জাতির কাছে যেও না। স্কুল কলেজের ছাত্র বা শিক্ষিত 'নেটিভদের' কাছে ঘেঁসবে না। সিভিলাইজড (civilised) লোকেদের সর্বথা এড়িয়ে চলবে। কারণ তারা তোমাদের কথা বিশ্বাস করবে না, বরং তোমাদের কার্যোদ্ধার তারা বাধা সৃষ্টি করবে।" পাদরী পুঙ্গবের ওজস্বিনী এই চূড়ান্ত পাঠ দিতে দেখে মোটেই ভাল লাগল না। ধর্মের নামে কী ভয়ানক ওজস্বিনীরই না এরা প্রশ্রয় দিতে চলেছে! ধর্মপ্রচারকে রাজনীতির কুটিলতা এবং বণিকের ব্যবসায়ের চেয়েও হীন পর্যায়ে নামিয়েছে এরা। বহুদিন পরে নাকি এরা বেশী বলেকলে আসা আরম্ভ করেছে। হতভাগা খণ্ডিত-ভারতে 'খৃষ্টরাজ' করার দুরভিসন্ধি এদের পশ্চাতে আছে কিনা কে বলতে পারে?

পূর্বেই বলেছি, শ্রীযুক্ত গুপ্তের নির্বন্ধাতিশয্যে জাহাজে বসে কবিতা লিখতে বাধ্য হই—

দ্বিতীয় কবিতার কয়েকটি ছত্র নীচে দিলাম—

নোঙর নৌকা বুঝিবা আবার ভাসিল সুখে
সারা দুনিয়ার জীবনযোয়ার লইয়া বুকে।
ঐ দেখ বক চেয়ে আছে বসে সাগর পানে
মন তার ঘোরে কার পিছু পিছু কেইবা জানে!
নিমীলিত চোখে পেচক যোগায় রয়েছে বসি
কষে তাহার লাহারার ঝড় মেখেছে খসি।
বুলবুল বসে মনোদুখে গায় মধুর গান
কপোত-কপোতী নিরালায় করে অধর পান।
বাঘিনীরা ঘোরে রক্ত ওঠে শিকার আসে
কত কালো ছাগ গলা বাড়াইয়া ফেরেছে পাশে।

কোন্ দুর্ভাগা বেদে গিয়ে দেবে ছিড়িবে তরি
উদ্বেগে তাই ঘুম নাই চোখে ভাবিয়া মরি!

এতক্ষণ তুরিষ্ঠ জাহাজ বালোয়ার কথা আপনারা যা শুনলেন ও জানলেন, তাহাতে এইরূপ কবিতাই যে আপনারা শেষ পর্যন্ত আমার কাছে প্রত্যাশা করবেন—তা আমি হলফ করেই বলতে পারি।

কাব্যিক পৃথিবী

শ্রীবটকৃষ্ণ দে

আমার স্বপ্নেরা সব ভেঙ্গে ভেঙ্গে চূর্ণ হয়ে যায়
পরশ্রীকাতর দিন ঝড় তোলে সমুদ্রের কোণে,
শূন্যের আকাশ, দেখি, বার বার নির্মোক হারায়
ছায়ার মিছিলগুলি পশ্চাতী আহ্বান নাহি শোনে!

•

• •

অশ্রান্ত যাত্রার তীরে ছায়ান্বিত কল্পনার নীড়ে
পাখীদের গান-ঢালা উর্বশীর মায়াবী লগনে,
যখন সূর্যাস্ত-মুগ্ধ মৌন মন ভরে আসে ধীরে
রঙের রূপসীরাজি খেলা করে অপূর্ব স্পন্দনে!

আবছা কুহেলী ছুঁয়ে দূরদেশী তারার আলোক
হয় তো লুটাবে তব লীলায়িত তনুর তনুতে,
অভিসারী ভীরু হাওয়া খুলে দেবে মায়া স্বর্গ লোক
দিবসের দগ্ধ ঘর ভয় পাবে তার প্রান্ত ছুঁতে!

•

আজ্‌কে যান্ত্রিক বিশ্ব, জানি হ'বে একদা কাব্যিক—
সেদিনের সে-আশ্বাসে ভরে মোর প্রাণ কল্পান্তিক!

অভিমান

শ্রীঅমরবন্ধু রায়চৌধুরী

১৯৩০ সালের অসহযোগ আন্দোলন যখন সমগ্র ভারতবর্ষকে এক অভূতপূর্ব্ব বিপ্লবে বিপর্য্যস্ত করে দিয়েছিল অমলের বয়স তখন এগারো। সেই বৎসরই অমলকে তার মাতৃভূমি প্রথম ছাড়তে হয়। অপেক্ষাকৃত একটি বড় গ্রামের বিদ্যালয়ে তাকে যোগ দিতে হয় তার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। অমল কোনদিন তার বাবা মাকে ছেড়ে থাকে নি। দিদিমার অপরিমিত আদর ও মামীমার সস্নেহ যত্ন তাকে তার ছোট্ট গ্রামটির কথা আর মা বাবার কথা ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু তার মন বার বার উড়ে গেছে তার প্রিয় গ্রামটির কাছে। ভেসে এসেছে তার মনে—তার শৈশবের মধুর স্মৃতি। মায়ের স্নেহ, দাদা ও বৌদির আদর, ছোটদিদির সাহচর্য্য, বন্ধুদের ভালবাসা—এ সব স্মরণ করে অমল প্রায়ই উন্মনা হয়ে উঠেছে। দিদিমা মামীমারা অনেক চেষ্টা ক'রেও তার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ফিরিয়ে আনতে পারেননি।

ইতিপূর্ব্বে অমল কোনদিন বিদ্যালয়ে পড়ে নাই। সাহিত্যে তার বিশেষ অনুরাগ ছিল। অল্প বয়সেই বিদ্যালয়ে বাংলা ও ইংরাজী রচনার জন্য তার খুব সুনাম হ'ল। ক্লাশের সকল ছেলেরাই এই শান্ত ও বিনয়ী ছেলেটিকে ভালবেসেছিল। কিন্তু অমলের মন সুস্থির হ'তে পারেনি এই যত্ন ও প্রশংসা পেয়েও, কবে সেই ছোট্ট গ্রামটিতে ফিরে যাবে, কবে তার স্নেহময়ী জননীর সঙ্গে মিলিত হবে নির্জ্জনে এই তার ভাবনা ছিল। গ্রামের নূতন কাটা দীঘির বালি দিয়ে কত মন্দির গড়েছে ভেঙেছে, তার জলে কত সাঁতার কেটেছে, আমের দিনে ভাঙা স্কুলঘরের পাশের গাছের কত আম কুড়িয়েছে, কতদিন মায়ের-দেওয়া কনলালেবু দিয়ে বন্ধুদের আপ্যায়িত করেছে—এ সব মনে করে তার দু'চোখ জলে ভরে উঠেছে। বাবা মা কেন তাকে বাড়ী থেকে দূরে পাঠিয়ে দিলেন এই ভেবে অভিমানে ক্ষুব্ধ হ'য়েছে।

দু'মাস না যেতেই অমল অসুস্থ হয়ে পড়ল। জ্বরের বিকারে কেবল মাকে ডেকেছে। খবর পাঠানো হ'ল তাদের বাড়ীতে। পরদিন পাল্কী করে অমলের মা তাদের পুরাতন ভৃত্য নীলমণিকে নিয়ে এলেন। অমল তার মাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে অনেকক্ষণ। মা যখন বললেন তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন, তখন সে শান্ত হ'ল।

কয়েকদিন পরে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হলে অমলকে নিয়ে তার মা বাড়ী ফিরে এলেন। মা বার বার সাবধান করে দিয়াছেন পাল্কী থামলেই যেন সে নাবতে চেষ্টা না করে। তার শরীর দুর্ব্বল; তাতে অনিষ্ট হতে পারে। পাল্কী যখন তাদের গ্রামের নূতন দীঘির পাড়ে এল, অমল মুখ বাড়িয়ে দেখেই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সে চোখের জল রাখতে পারেনি। পাল্কী মাটীতে রাখতেই মায়ের কথা ভুলে গিয়ে সে নিজেই নাবতে চেষ্টা করল। দুর্ব্বল শরীরে অবসন্ন হ'য়ে পড়ল। বৌদি তাকে তাদের বড়ঘরের নীচের তলায় সুন্দর করে বিছানা করে দিলেন। খবর পেয়ে পাড়ার লোক ও বন্ধুরা এল, অমল তাদের দেখে কত খুসী হ'ল। মা ও বৌদির সস্নেহ যত্নে অমল শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠল।

এবার ঠিক হ'ল কয়েক মাস পরে তাকে তার মেজদাকে দিয়ে তাদের সহরের বাড়ীতে পাঠানো হবে। শুনে অমল কিছুটা নিশ্চিন্ত হ'ল। ভাবলে সহরে দাদার কাছে থাকবে, দিদিদের সঙ্গে দেখা হবে, গ্রামের কত লোক মোকদ্দমা করতে যাবে তাদের সঙ্গেও দেখা হবে, আর প্রতি মাসে অন্তত কয়েকদিন করে বাবা নিশ্চয়ই সেখানে থাকবেন। বড়দিন, গ্রীষ্ম ও পূজার ছুটিতে অনেকদিন বাড়ীতে থাকতে পারবে শুনে আরও সাহস হ'ল। তা'ছাড়া ইতিমধ্যে অমলের বাবা তার মনে অনেক উচ্চাশা জাগিয়ে তুলেছেন। লেখাপড়া শিখলে তার ভবিষ্যত কত উজ্জ্বল হ'তে পারে তিনি তাকে সবিশেষ বুঝিয়ে বলেছেন। সব কথা শুনে অমল এবার মনে মনে স্থির করে নিয়েছে যে বিদেশে না গিয়ে উপায় নেই। গ্রামের জন্য তার কষ্ট হবে, কিন্তু লেখাপড়া না শিখলেই বা চলে কি করে?

বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রান্তে একটি ছোট সহরে তাদের পৈতৃক বাড়ীতে তার মেজদা ও ছোড়দার কাছে অমলকে পাঠান হ'ল। অসংখ্য পরিজনের মধ্যে অমল এবার শান্তি বোধ করল এবং নিবিষ্টমনে পড়াশুনা আরম্ভ করে দিল।

ছোট সহর হ'লেও আইন-অমান্য আন্দোলনের ঢেউ তাকে স্পর্শ করেছিল। সরকারী স্কুলের সুন্দর বাড়ীতে তাদের ক্লাশ হত। উজীর-দীঘির পাড়ে অবস্থিত পুলিশ সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্টের বাড়ীর পাশ দিয়ে অমল তার তিন চারজন সহপাঠীকে নিয়ে রোজ স্কুলে যেত। সে পথের নির্জ্জনতা ও সৌন্দর্য্য তাদের আকৃষ্ট করেছিল। স্কুলের পশ্চিমদিকে বিস্তীর্ণ দীঘি ধর্ম্মসাগর; তার জল থেকে কত পদ্ম তারা তুলেছে। বিশ্রামের সময় উত্তর দিকের বিরাট বটগাছের উপর বসে কত অদ্ভুত গল্প তারা বলেছে ও শুনেছে। যেদিন ঘণ্টা পড়ার পূর্ব্বে স্কুল পৌঁচেছে সেদিন কামিনী গাছের ছায়ায় মার্ব্বেল পাথর দিয়ে তারা কিছুক্ষণ খেলা করত। কোনদিন হয়ত ছাদের সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে অমল অন্যমনস্কভাবে দশটার গাড়ীর আসা-যাওয়ার শব্দ শুনেছে।

কোন কোন দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাদের পাড়ায় কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ব্যায়াম চর্চ্চাতেও অমল যোগ দিয়েছে। কিন্তু ভাল লাগেনি তার কাছে সেই বাঁশের লাঠি নিয়ে লাইন করে চলা। মাঝে মাঝে সহরে বিপর্য্যয় ঘটে যেত। বিধ্বংসাত্মক কাজের অভিযোগে কত বাড়ী পুলিশের লোক এসে খানাতল্লাস করেছে। ঘুম থেকে উঠে অমলও এ সব শুনেছে, কোন কোন দিন নিজেও দেখেছে। বন্ধুরা সকলেই নানা রকম মন্তব্য করেছে; কিন্তু শান্ত গম্ভীর এই ছেলেটি চুপ করে কি যেন মনে মনে ভেবেছে।

মেধাবী ছেলে বলে ইতিমধ্যে সুখ্যাতি অর্জ্জন করেছে সে। সকলেই ভেবেছে বড় হয়ে সে কোন সরকারী কাজে ঢুকবে। তার মনেও ক্রমে উচ্চাশা জেগে উঠেছে। কিন্তু চারদিকে যখন অত্যাচার ও উৎপীড়ন ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায়নি, তখন তার মনে ব্যক্তিগত সুখের প্রতি ধিক্কার এসেছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে অথবা মৃদু জ্যোৎস্নালোকে তাদের বাড়ীর পাশে নাহুয়ার দীঘির পাড়ে বসে সে নিশ্চিন্ত মনে দেশের ভবিষ্যতের কথা ভেবেছে। গান্ধীজী ও জওহরলালের জীবনের ঘটনাবলী মনে করে সে মুগ্ধ হয়েছে। গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের যে দুর্জ্জয় ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছিল ভারতের নানা স্থানে, তার কাহিনী স্মরণ করে সে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছে। কতদিন বসে বসে ভেবেছে সে—দেশের প্রতি তার কর্ত্তব্যের কথা। ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা ভেবে সে নিজেকে হীন বোধ করেছে। এই তার পরিবারের স্নেহের বন্ধনকে ছাড়িয়ে, নিজের আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জ্জন দিয়ে সে যেতে পারে নি দেশের কাজে যোগ দিতে। নিজের এই অক্ষমতাকে সে ধিক্কার দিয়েছে বারবার।

ইতিমধ্যে অমল স্কুল ছাড়িয়ে কলেজে উঠেছে। কলেজের সব চেয়ে ভাল ছেলে বলে তার খুব সুনাম হ'ল। এবার সে তার চিন্তাধারাকে ভাষায় রূপ দিতে আরম্ভ করে দিল। প্রতি সন্ধ্যায় তার সেদিনকার শ্রেষ্ঠ চিন্তাকে ভাষায় রূপান্তরিত করার মোহ তাকে পেয়ে বসল। দেশের ভবিষ্যৎকে সে উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত করেছে, মুক্তি আন্দোলনের নেতাদের প্রতি তার সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়েছে, অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে তার লেখনী ওজস্বী হয়ে উঠেছে। দেশের মর্ম্মান্তিক অবস্থা তার ভাবপ্রবণ মনকে নিষ্পিষ্ট করেছে।

ইতিমধ্যে কংগ্রেস নির্ব্বাচনে যোগ দিয়েছে, কোন কোন প্রদেশে শাসনকার্য্যও গ্রহণ করেছে। দেশের অবস্থা ক্রমে শান্ত হয়ে এল। সংগ্রামের শেষে যেন একটা অবসাদ এল।

অমলের পরীক্ষার ফল খুব ভাল হ'ল। ব্যক্তিগত জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে দিয়ে তার মনকে স্বদেশী আন্দোলন থেকে দূরে রাখতে আত্মীয়স্বজন সকলেই সচেষ্ট হলেন। বন্ধুদের পরামর্শে তাকে কলকাতায় স্কটীশ চার্চ্চ কলেজে পাঠান হ'ল। সেখানে নূতন পরিবেশে তার মন ক্রমে শান্ত হয়ে এল। ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স নিয়ে এবার অমল নিবিষ্টমনে পড়া আরম্ভ করে দিল। কিন্তু আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তার মনে যে অনুপ্রেরণা এসেছিল তাকে তার কর্ম্মমুখর জীবনও শুদ্ধ করে দিতে পারে নি। সাময়িকভাবে সুপ্ত হয়ে পড়ল মাত্র।

অমল কলেজের ভাল ছাত্রদের অন্যতম, তার অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ। ছাত্রাবাসে সকলেই তাকে স্নেহ

করে। ক্রমে সাহিত্যচর্চ্চায় তার মন আকৃষ্ট হ'ল। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে দেশ সেবার ইচ্ছা তার মনে জেগে উঠল।

ভাবপ্রবণ আদর্শবাদী অমলের মনের গোপনতম স্থানে তার সহপাঠী সুহাসের বোন যুথিকার মানসী রূপ দেখা গেল। যুথিকার বাবা উমাশঙ্কর জেলাজজ। যুথিকাদের বাড়ীতে আইন-অমান্য আন্দোলনের ঝঞ্ঝাতম সাড়াও পড়েনি। কনষ্টিটিউশানের মধ্যেই উমাশঙ্কর দেশের শান্তি ও মঙ্গলকে দেখতে চেষ্টা করেছেন। সুহাস এম-এ পাশ করেই অক্সফোর্ডে পড়তে যাবে পূর্ব্বেই স্থির ছিল। যুথিকা ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশানে ইংরাজী সাহিত্যে অনার্স নিয়ে বি-এ পড়ে। সুহাস প্রায়ই অমলকে তাদের বাড়ীতে নিয়ে আসে। বহুক্ষণ বহুবিষয়ে তাদের আলোচনা হয়। মাঝে মাঝে উমাশঙ্করও যোগ দেন। যুথিকা অহিংস আন্দোলনে মোটেই বিশ্বাস করে না। তার বাবা উমাশঙ্কর এবং অমল দু জনেই সমানভাবে ভুল করছেন। দেশকে স্বাধীন করতে হলে সংগ্রাম করতে হবে, তাতে রক্তপাত যদি হয়ও তাকে ভয় করলে চলবে না। পৃথিবীর ইতিহাসে অহিংস আন্দোলনের সাফল্যের কোন সাক্ষ্য নাই, এত বড় ক্ষমতাকে বিনা যুদ্ধে ছাড়ান যায় না—এ সমস্ত মতবাদ প্রকাশ করতে যুথিকা কুণ্ঠিত হয় নি। অমল গান্ধীজীর জীবন-দর্শন তাকে বোঝাতে অনেক চেষ্টা করেছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের আধুনিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করেছে। যুথিকার কাছে তার স্নিগ্ধ সুমধুর ভাষায় অহিংসার নীতিকে বিশ্লেষণ করেছে, নিজের বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় ভিত্তি দেওয়ার জন্য। অনেক তথ্যসংগ্রহ করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছে যে গান্ধীজীর সত্য ও অহিংসার বাণীতেই পৃথিবী মুক্তির সন্ধান পাবে। যুথিকা তাতে মত পরিবর্ত্তন করতে পারে নি। অমল নিরাশ হলেও রুষ্ট হয় নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে এসে অমল কি করবে সহজে স্থির করতে পারে নি। নিজের আদর্শবাদকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হ'লে তার ব্যক্তিগত জীবনে ত্যাগ স্বীকার করা ছাড়া উপায় ছিল না। শিক্ষা ও সাহিত্য ছাড়া দেশ সেবার সুবিধামত পথ খুঁজে পাওয়া তার পক্ষে শক্ত হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে মহাযুদ্ধের প্রভাব পরিলক্ষিত হল। দেশের অসহায় অবস্থা দেখে অমল ক্লিষ্ট হল। অনেক ভেবে সে স্থির করে নিল যে ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জ্জন না দিলে প্রকৃত দেশ-সেবা হ'তে পারে না।

সুহাস ইতিমধ্যে অক্সফোর্ডে চলে গেছে। একদিন যুথিকার সঙ্গে অমলের দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ও তার ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে আলোচনা হ'ল। যুথিকা তাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করতে পারে নি। অমল ব্যথিত হলেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি। আশা করেছিল যুথিকার কাছে সে পাবে উৎসাহ ও উদ্দীপনা। কিন্তু গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনকে সে কিছুতেই সমর্থন করতে পারে নি। উমাশঙ্কর অমলের কথা শুনে বিচলিত হলেন। অমলের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য থাকলেও তিনি তাকে তার আদর্শ ও নিষ্ঠার জন্য মনে প্রাণে শ্রদ্ধা করতেন।

অমল স্থানীয় একটি কলেজে অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করল এবং অবসর মত তার রাজনৈতিক মতবাদ প্রকাশ করতে আরম্ভ করে দিল। অল্পকাল মধ্যেই দেশের লোক তার আদর্শ ও নিষ্ঠার প্রতি আকৃষ্ট হল। পুলিসেরও নজর পড়তে বিলম্ব হল না।

একদিন রাজদ্রোহের অভিযোগে অমলকে পুলিস গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। বিচারে চার বছরের জেল হল। যথাসময়ে এই খবর যুথিকা পেল। রাজনৈতিক মতানৈক্যের অন্তরালে যুথিকা যে অমলের প্রতি এতটা আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল তা কোনদিন তার মনে হয় নাই। অমলের অভাব ক্রমেই তাকে পীড়া দিতে আরম্ভ করল। তার আনন্দময় জীবন হঠাৎ বিষাদ ও রিক্ততায় ভরে উঠল।

যুথিকার এ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে উমাশঙ্কর বিচলিত হলেন। মনে করলেন যুথিকার বিয়ে দেওয়াই তার একমাত্র সমাধান। ব্যারিস্টার সমীর রায় অনেকদিন থেকেই আনা গোনা করছিলেন। যুথিকার মনোযোগ আকর্ষণ করতেও চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই।

অমল জেলে যাওয়ার পর হতে যুথিকার জীবনে আমূল পরিবর্ত্তন এল। ক্রমে সে বহুমূল্য অলঙ্কার ও আভরণ ত্যাগ করে সহজ সাধারণ বেশভূষা গ্রহণ করল। আজকাল যুথিকা মোটরে কলেজে না গিয়ে ট্রামে বাসেই যাওয়া পছন্দ করে। উমাশঙ্করের প্রশ্নের উত্তরে বলে—সবই

অভ্যাস রাখতে হয়। যূথিকার এই মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করে তিনি চিন্তিত হলেন। অমলের প্রভাব যে তার উপর কত গভীর ভাবে পড়েছে এতদিনে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। সমীর রায়ের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব সে শান্ত অথচ দৃঢ় ভাবে প্রত্যাখ্যান করল।

সাহিত্য ও রাজনীতি সম্বন্ধে বই পড়া ছাড়া কারান্তরালে অমলের কোন কাজ ছিল না। সিপাহী বিদ্রোহের পর হতে এপর্য্যন্ত ভারতের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসকে সাহিত্যে রূপ দিতে অমল সচেষ্ট হ'ল! কারাগারের নির্জ্জনতায় যূথিকার কথা তার বারবার মনে পড়েছে। ভেবেছে তার লেখনী দেশের অসংখ্য লোককে জাগিয়ে তুলেছে, অথচ যূথিকার মত একটি সামান্য মেয়ের উপর এতটুকু প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি কেন। যূথিকা সুন্দরী নয়; অথচ তার সপ্রতিভ কমনীয় স্নিগ্ধ রূপ দূর থেকে তাকে যেন দুর্ব্বারভাবে আকর্ষণ করছিল। কত সন্ধ্যায় তার কাছে যেতে ইচ্ছা করেছে। আর জেলে বসে বসে মনে পড়েছে তার শৈশবের লীলাভূমি তার গ্রামকে, তার আত্মীয় পরিজনকে, প্রতিবেশী সকলকে, আর সবচেয়ে বেশী কষ্ট হয়েছে যখন তার বৃদ্ধ পিতামাতার কথা মনে হয়েছে। তাঁদের কাছে আবার ফিরে যেতে, আবার কলেজে ছাত্রদের পড়াতে তার কত ইচ্ছা করছে।

চার বছর পর আলীপুর জেল থেকে বেরিয়ে এসে অমল দেখতে পেল—একদিকে ছোড়দা তার বাবা মাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, আর একদিকে সুহাস যূথিকাকে নিয়ে অপেক্ষা করছে। বাবা, মা ও ছোড়দাকে প্রণাম করে উঠতেই সুহাস হাসিমুখে তাকে অভিনন্দন জানাল। সুহাস বিদেশ থেকে বলিষ্ঠ মন নিয়ে ফিরে এসেছে দেখে অমল সুখী হল। যূথিকা নীরবে তার পাশে দাঁড়িয়েই রইল। কি বলবে সে এতক্ষণেও স্থির করতে পারে নি। যূথিকার সাধারণ সুশ্রী বেশ দেখে অমলের মুখ স্নিগ্ধ আনন্দের হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সস্নেহে সে সকলকে পরস্পরের সহিত পরিচয় করিয়ে দিল। সন্ধ্যায় তাদের বাড়ী যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অমল সুহাস ও যূথিকার নিকট বিদায় গ্রহণ করল।

অমলকে কলেজের ছাত্র ও শিক্ষক সকলেই সাদরে অভ্যর্থনা জানাল, মুক্তিকামী ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে সে সম্মান সে কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করল। দেশের সর্ব্বত্র স্বাধীনতার ব্যাকুল আগ্রহ দেখে অমল প্রীত হ'ল।

প্রথম পরিচয়েই সুহাস ও যূথিকাকে অমলের বাবার ভাল লেগেছিল। সুহাসের নিকট তিনি অমলের সঙ্গে যূথিকার বিয়ের প্রস্তাব করলেন। উষাশঙ্কর তাঁর ভুল বুঝতে পেরে এবং দেশের পরিবর্ত্তিত অবস্থার কথা ভেবে খুসী হয়েই এ প্রস্তাবে রাজী হলেন। অমল ধনী না হলেও তার মনের সম্পদের পরিচয় তিনি পূর্ব্বেই পেয়েছেন।

যূথিকাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে পেয়ে অমল সুখী হ'ল। কিন্তু যূথিকা ভাবে সংগ্রামের শেষ নেই। কবে আবার অমলকে যেতে হ'বে কে জানে?

আশাবাদী

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস

আগেকার মত আজো হেরিয়াছি পাহাড়ের কোল ঘেঁষে
আকাশের গায়ে আবীর ছিটায়ে রবিটি ডুবেছে হেসে।
ভোরের আকাশে দেখেছি আবার শুক্ক-তারকার পানে,
কি জানি কেমন বেদনা-কাতর ছলছল আঁখি হানে।
আগেকারি মত রহিয়াছে সব, তবু ঘুরিয়াছে চাকা,
বিধাতা কি জানি কোন্ লীলাটির ভিত্তি করিল পাকা!
দেখেছি বন্ধু, দোষীর পাপেতে নিরীহ পেয়েছে সাজা,
আমীরে দেখেছি ফকির হইতে, ভিখারী হ'য়েছে রাজা।
কি কথা লিখিব! কাল হেরিয়াছি যে-মুখে উজল হাসি,
বিষাদের মেঘ আজ ঘনায়েছে, দুচোখে অশ্রুরাশি।
এও থাকিবে না জানি গো বন্ধু, দুদিনের ছায়াবাজি
মিলাবে দুদিনে। কোন্ যাদুকর খেলিছে কারসাজি।
আবার আসিবে ধরায় শান্তি, অশিব নাশিবে কাল,
প্রভাতের আলো টুটবে আবার নিশির তিমিরজাল।
তথাপি বন্ধু, থাকিবেই চির সুখ ও দুঃখ বোধ,
হাসি ও অশ্রু, ভাঙাগড়া আর জন্ম ও মরণের শোধ।
বিষাদে হরষে বিরহে মিলনে প্রীতি ও প্রেমের ছবি
একদা আঁকিবে নিখুঁত করিয়া আগামীকালের কবি।

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

গঠন ও দহন

মহৎ মুনির কল্পনায় এই চিত্রই স্পষ্ট হইয়া উঠিল, শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার আশ্রমে আসিতেছেন, মহামানবের পদরেণুস্পর্শে আশ্রম ধন্য ও আশ্রম-দেবতা শবরী হইবে জীবন্মুক্ত। উৎসুক ত্রিকালজ্ঞ ঋষি আদেশও দিলেন অনুরূপ।

একাকিনী দিবস রজনী অনলসভাবে শবরী আশ্রমের রক্ষণাবেক্ষণ ও আগন্তুক পথিকদের পরিচর্যা করিয়া আসিতেছিলেন। ঋষির ঐ শেষ আদেশ ও আইনটুকু ব্যর্থ হয় নাই। শবরীর সাধনা পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল রামচন্দ্রের পদরেণু স্পর্শে। রাত্রির এই তপস্যা উদ্‌যাপিত হইয়াছিল জ্যোতিষ্কদের উষার অভ্যুদয়ে। প্রভাত সূর্যের পুণ্য-পরশ-পুলকে শবরীর বহু আকাঙ্ক্ষিত মুক্তিস্নান এ জীবনেই সম্ভব হইয়াছিল। দুঃসহ বিরহের অবসানে মুক্তির সুধা তাহাকে নূতন করিয়া বিশ্বরূপে সাহায্য করিয়াছিল।

কবে, কোন যুগে সাধনার এই পবিত্র হোমানল পম্পা নদীর উত্তর তীরে প্রজ্বলিত করিয়াছিল কে জানে? রামায়ণকাব্যের অমর লেখনী আজও ইহাকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। যুগে যুগে ঘোর বিপদসঙ্কুল মরু-প্রান্তরের দুর্গম-অন্ধকার জনপদে দিয়া যাঁহারা নূতন দিনের প্রতিষ্ঠা করিয়া গেছেন তাঁহারা অমর, তাঁহারা প্রণম্য, সুখ-দুঃখের হাসি কান্নার ভরা এই বসুধা তাঁহাদের বরমাল্য লাভ করিয়াই ধন্য হয় এবং নিত্য চলার পথপ্রান্তে নূতন ইতিহাস রচনা করিয়া চলে।

পরাধীন ভারতে দীর্ঘ তমিস্র রজনীর কাহিনীও অনুরূপ। বহু শত-লাব্দের দুঃসহ সাধনায় এই রজনীর প্রভাত আসিয়াছে, দেশ আজ স্বাধীন হইয়াছে। দিবস প্রভাতকে আহ্বান করিবার পূর্বে যেমন বহুকার কোন কোন শবরীর দুঃসহ সাধনায়, বুকের কেমিল তপ্তরক্তে এই দীর্ঘ রজনীর অবসান হইল। কাহাদের চরম দুঃসাহসিকতা, অনমনীয় দৃঢ়তা, অতুলনীয় ত্যাগ হইবে এই নূতন পথের পাথেয়। একটার পর এক বিদেশী জাতি তাহার রকমফের লুণ্ঠনের পাশবিকতায় যখন সমস্ত জাতিটাকে দরিদ্র, নির্বীর্য ও অমানুষ করিয়া তুলিতেছিল, আকণ্ঠ-পঙ্কে নিমগ্ন সমস্ত জাতির অস্তিত্বই যখন বিলীয়মান হইতে চলিয়াছিল, তখন শিবরাত্রির সলিতার ন্যায় যাঁ হারা-আপনি জ্বলিয়া নিবিড় অন্ধকারের মধ্যেও পথচলার নির্দেশ দিয়া যাইতেছিলেন আজ দিবসের আলোকে তাঁহাদের বুঝিয়া উঠা অসম্ভব। প্রতিবিধানের প্রচেষ্টাহীন, অক্ষমতায় স্তব্ধ, নিস্পন্দে ভগ্ন মেরুদণ্ড, কাপুরুষতার প্রপঙ্কে নিমগ্ন জাতির চরম প্রত্যক্ষের সামনে মনে হইয়াছিল বুঝি ঐ সকল দীপ-শলাকা নীরবে ভস্মসাৎ ও নিঃশেষে ফুরাইয়া হারাইয়া গেল। আজ মনে হয় না কি বিদেশী শাসন, শোষণ ও তাহার সহস্রমুখী আয়ুধ পর্যন্ত বিপর্যস্ত হইয়াছে এই বীর্যবন্ত সাধনার নিকটে, ঐ পথিক দুইজনের ভস্মরাশি পাকভূমে বিলীন হয় নাই—সন্ন্যাসরা ভারতকে দুর্জয় সাহস ও স্বাধীনতা অর্জনের কঠিন সাধনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে বলা যায়।

চৈতন্যোত্তর বাংলা সমাজ সহস্র পরাধীনতার মধ্যেও বিদেশী শাসক-গণের সহিত সংস্কৃতির যুদ্ধে বিজয়লাভ করে। তাই দেখা যায় কিছু-কালের জন্য বাঙালার খেত ও বিজেতা উভয়েই পারস্পরিক সমঝৌতায় এসাইয়া চলিয়াছে। বিশু মুসলমান উভয় সমাজের সাধকের প্রেম সঙ্গীতে বাংলাভাষার মোড়াপত্তন দৃঢ় হইয়াছে। কিন্তু চৈতন্যের এই বিজয়ী অবদান আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে উত্তরোত্তর ব্যাপক না হইয়া শিথিল হইয়া যায়। বাংলা ও বাঙালী সমাজ পুনরায় তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, মাঝে মাঝে খদ্যোতের আলো অন্ধকারকে বরং নিবিড় করিয়া তুলিত। মেষ-দেশের ধন্য হরিণের ন্যায় ঝাঁকে ঝাঁকে যে সকল যাযাবর পাহাড় পর্বত ডিঙাইয়া এ দেশের শাসন ভার গ্রহণ করিল তাহারাও ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল, যাহারা তাহাদের ক্ষুদ্রতায় রুদ্রতায় দেশের আপামর সকলকে অপমানিত করিল—প্রকৃতির অভিশাপে ক্রমে তাহারাও এক সঙ্গেই অপমানিত হইতে লাগিল।

ভারতের ভস্মসত্তায় যুগে যুগে বিদেশীকে প্রযুদ্ধ করিয়াছে। দেশের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার রন্ধ্রপথে এবার আসিল নূতন ধরণের লোক, সপ্তডিঙ্গার পাল চড়াইয়া লাভ সাগরের ওপার থেকে, এর আগে যাহারা পাহাড় ডিঙাইয়া আসিত তাহারা ছিল বৈরীত্বেও হিংসায় প্রবল। কিন্তু এবারের অভিযাত্রীদের রকম কিছু পৃথক ছিল, এরা ছিল প্রকৃতির পূজারী কাজেই জড় জগতের ব্যবহার এদের জানা ছিল, পোষ্টাফিস, বাষ্পীয় রেলগাড়ী, বাষ্পীয় পোত, নূতন ধরণের কামান বন্দুক, গোলাগুলি তৈয়ার ও ব্যবহার এদের জানা ছিল। আর একটী প্রধান বৈশিষ্ট্য এদের মজ্জাগত, তাহা হইল অত্যাচারের মধ্যে ও একটু লোভনতা এবং শালীনতা, হিংস্রতায় তীব্রতা এতে পুরোপুরি ছিল—হয়তো বেশী তীব্রই ছিল, কেবলমাত্র ধারাল ছুরিকার ফলা খোলায়েম রসফলের খাপে ঢাকা থাকিত। লুণ্ঠন ও অত্যাচার বরং বেশীই ছিল কিন্তু ব্যক্তিগত প্রকাশ্য লুণ্ঠন দ্বারা অপরাধ করিত, বিচারের নামে, খাজনা আদায়ের নামে, শুল্ক আদায়ের অনুহাতে, দেশীয় শিল্পের উন্নতির জিগীরে, দেশীয় শিক্ষা সংস্কারের নামে, শিল্পের নামে, সংস্কৃতির সংস্কার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিপুণতার সহিত সম্পন্ন করিতে পারিত। বরং একশ্রেণী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গড়া করিতে সমর্থ হইলেন যাঁহারা তাহাদের ভাষায় কথা বলিত, বিদেশী ভাষায় স্বপ্ন দেখিত এবং দেশীয় সকল কিছুকেই ঘৃণা করিত। বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে একাকে অন্ধ অনুকরণ, নির্বিচারে মদ্যপান ও এদেশীয় রীতিনীতিতে

অশ্রদ্ধা প্রকাশ রাজকীয় সমর্থন লাভ করিত। তাহাদের ধর্ম-প্রচারকেরা ধর্মের নামে এ দেশীয় রীতিনীতির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশই কর্তব্য মনে করিত। ঠিক এই সময়ে এ দেশীয় জনসাধারণের মধ্য হইতেই আসিল প্রতিবাদ।

রাজর্ষি রামমোহন দুই সভ্যতা তরঙ্গের মাঝখানে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিলেন—বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে প্রমাণিত না হইলে বৈদেশিক আচার ব্যবহার গ্রহণ করা যাইতে পারে না। দেশীয় জনসাধারণকে প্রাচীন বেদ, উপনিষদসম্মত জ্ঞান এবং আধুনিক বিচারগ্রাহ্য বিজ্ঞান উভয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে। উভয়ের সামাজিক রীতিনীতি শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিয়া গ্রহণ কিম্বা বর্জন করিতে হইবে। যে দেশে যাহার জন্ম সেই দেশের পুরাতন সংস্কৃতির সহিত-বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতন অজানা শিক্ষা-সংস্কার গ্রহণে দেশের উপকার হইবে না। স্বাধীন মতবাদ স্বাধীন আবহাওয়া ব্যতীত পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। ভারতের রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে বৈদেশিক কৃশাসনে প্রপীড়িত জনসাধারণের মুক্তি ও স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইল, ভারতে পুনরায় নবজাগরণের লক্ষণ দেখা দিল। উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস প্রধানতঃ এই মুক্তি আন্দোলন, ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতিবিজড়িত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, বহু সাধকের দীর্ঘকালব্যাপী সাধনায়, জ্ঞানা ও অজ্ঞানা বহু মহাজনের রোমাঞ্চকর মনীষায়, অমিত তেজ এবং চারিত্রিক বৃঢ়তায় নূতন বাংলার জন্ম হয়।

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়?

অসংখ্য ত্যাগ ও আত্মাহুতিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারা সম্মিলিত হইয়া পলাশীর উত্তাল জলতরঙ্গের ন্যায় বিপুল জনস্রোতের সৃষ্টি হইয়াছে। ধ্যান নেত্রে সাধক দেখিলেন, মায়ের ঘরছাড়া ভৈরবী মূর্তি। উদাসিনী, পাগলিনী, কঙ্কালমালী ভৈরবীর বন্দনা কবির কণ্ঠে গাহিয়া উঠিল, মা কি ছিলেন ও মা কি হইবেন? আপার আলোও কবি ধ্যান নেত্রে দেখিতে পাইলেন। সেই মাতৃবন্দনা সম্বল করিয়া গোটা দেশ জাগিয়া উঠিল। এই মহাসঙ্গীত হিরিঙ্গি জ্বরে ত্রাসের সঞ্চার করিল। কিন্তু সেই উন্মত্ত জলতরঙ্গ রোধিবে কে? বিদেশী বুঝিতে পারিল, উদ্বেল জল-তরঙ্গের উপরে তাহার সাম্রাজ্যের খোল এখার চুরমার হইবার পালা, তাই সময় থাকিতে সরিয়া পড়িল কিন্তু যাওয়ার কালে তস্করের শেষ বিষদাঁত ছাড়িতে ভুলিল না। যাক সে কথা!

যাঁহাদের ত্যাগে ও মানসিক দৃঢ়তায় আমরা আজ স্বাধীনতা পাইয়াছি তাঁহাদের আলেখ্য নূতন বাংলার সামনে তুলিয়া ধরাই হইল এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। তাঁহাদের অস্তিত্বের এবং রোমাঞ্চকর জীবনবেদ সভ্যতা বিচ্ছিন্ন এই দেশে আজ বেশী প্রয়োজন। উনবিংশ শতাব্দীর বহু মহাজনের মধ্যে আপন ভোলা ব্রহ্মবান্ধব অন্যতম। তাঁহার অপূর্ব ত্যাগ ও বিরাট-সাধনা ভারতের আদর্শ হউক। জাতির একটী ক্ষুদ্র অংশও যদি তাঁহাদের মত শক্তিশালী, মর্যাদাসম্পন্ন, চরিত্রবান এবং ব্যক্তিগত, দলগত, স্বার্থবুদ্ধিলেশশূন্য হয় তবে ভারত যে পুনরায় 'মহাভারত' হইবে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী (বাংলা ১২৬৭ সালের ১লা ফাল্গুন) হুগলী জেলার অন্তঃপাতী সহরের গ্রামে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। পিতা দেবীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইনি কনিষ্ঠ পুত্র। উত্তর কালে এই ভবানীচরণই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নাম গ্রহণ করেন। ব্রহ্মবান্ধবের সমসাময়িক অনেকেই ছিলেন ভারত-বিখ্যাত। সাহিত্য দেশজননীর মুখে হাসি ফুটাইবার জন্য অনেকেই আপন সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। কেহ কেহ সংসার আশ্রম পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মের বৎসরেই স্বামী বিবেকানন্দ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হয়, ঋষি অরবিন্দ ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বয়সে অপেক্ষাকৃত কনিষ্ঠ ছিলেন, আচার্য জগদীশচন্দ্র ও স্যার নীলরতন ২।১ বৎসরের জ্যেষ্ঠ ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দী, বিশেষতঃ এই দশককে শতাব্দীর স্বর্ণ যুগ বলা যাইতে পারে। দেশ আজ অনেককেই ভুলিতে বসিয়াছে.

ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী।
আপন সোনার ধানে গিয়াছে ভরি—

জাতির অগ্রগতি যাহাদের নিঃস্বার্থ দানে সমৃদ্ধ ও দ্রুত হইয়াছে, শতাব্দীর সৌরবময় ঠাসা বুননের এই ইতিহাস—সাধারণ মানুষের ছোট স্মৃতি আজ তাঁহাদের ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না।

শিশুকালেই ভবানীচরণ মাতৃহারা হন। পিতৃদেব কার্যব্যপদেশে বিদেশে থাকিতেন। পিতামহীর স্নেহক্রোড়ে তিনি মানুষ হন। প্রতিভার ছিলেন বলিয়া বাল্যকালেই গ্রাম্যছড়া, হেঁয়ালি, রামায়ণ ও মহাভারত মুখে মুখেই শিখিয়াছিলেন। বালক কাল হইতেই খেলাধুলা ও দুষ্টামির তিনি গ্রিয় ছিলেন। এই কারণে স্বাভাবিকভাবেই সমবয়স্ক বালকদের তিনি দলপতির করিতেন; তাই বলিয়া পড়াশোনায়ও তিনি পশ্চাদপদ ছিলেন না। চুঁচুড়ায় হিন্দুস্কুলে ও হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে প্রতিবৎসরই তিনি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অসামান্য বক্তৃতা ছিল। কলিকাতায় জেনারেল এসেম্বলী স্কুলে পড়িবার সময় তিনি স্বীয় প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়া ইংরেজ শিক্ষককে বিস্মিত করিয়া তুলিতেন। ত্রয়োদশ বৎসরে তাঁহার উপনয়ন হয়। ইহার পরেই পাঠাদিতে তিনি মিরামিষাশী হন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরেই গঙ্গার আড়পারে ভাটপাড়ায় গিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যে তিনি ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকিলেও আমাদের সাধারণ ছেলেদের মতন শরীর চর্চায় অমনোযোগী হন নাই। মস্তিষ্ক-চর্চার সহিত কুস্তি, জিমন্যাষ্টিক, লাঠি ও ক্রিকেট খেলায় তাঁহার খুব ঝোঁক ছিল, বস্তুতঃ তাঁহার হৃষ্টপুষ্ট চেহারা ও দৃঢ় মাংসপেশীর দিকে চাহিলে অনেকেই তাঁহাকে উত্তর ভারতের পার্বত্য প্রদেশের অধিবাসী বলিয়া ভ্রম করিত। এই সময় চুঁচুড়ায় তাঁহার শারীরিক শক্তির প্রয়োগ এক আলোড়ন তুলিয়াছিল।

কতকগুলি আদেশবাক্য ও কিংবদন্তী ছেলে মেয়ের ঘাটে বাটীরের প্রতি অত্যন্ত অশ্রদ্ধা ও ঘৃণার সঞ্চার করিত, প্রতিকারের উপায় ছিল না বলিয়া সকলেই এই অত্যাচার সহ্য করিত। সহ্য করিল না কিশোর ভবানীচরণ ও তাহার কিশোরমন। ট্রাজেডির কোটে বিদ্রোহের ধ্বজা আর নামার ঘাটের দিকে এগোয় নাই।

ব্রহ্মেন্দ্রনাথের আবেদন নিবেদন ও কেবল বক্তৃতা তাঁহাকে কখনও আকর্ষণ করে নাই। তরুণ বয়স হইতে শিখিল শিবাজীর আদর্শ, রাণা প্রতাপের ত্যাগ ও অধ্যবসায় এবং গুরু গোবিন্দের কাছ শক্তি। একদিন সোজা মইলেসের বাড়ীতে তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি আনন্দমোহন বসুর নিকট উপস্থিত। প্রশ্ন করিলেন—স্বাধীনতা প্রাপ্তির উপায় কি? বলী না অসি? 'Not with pen but the sword' তাহাকে বলা করিতে হইলে কলম দিয়ে কিছুই হইবে না—অসির বিকল্প অসির ব্যবহার দরকার হইবে। আনন্দমোহন ভবানীচরণের খুল্লতাত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্ধু ছিলেন। সেই পরিচয় পাইয়া সস্নেহে তাঁহার ভাগিনেয়কে বেঞ্চাইয়া বলিলেন, "বাবাজী বেঙ্গল না সরকারী রাকিস সাহেব"। তারপরে মিষ্টভাষায় ভবঘুরীর অসারতার সম্বন্ধে অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু তরুণ বালক বুঝিল না, একই চিন্তা—তাইতো কি করা যায়, এখন কি করি। তখন তিনি কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর সতর বৎসর বয়স্ক তরুণ কিশোর মাত্র।

এই সময় (খৃঃ ১৮৭৭) আফ্রিকায় জুলু যুদ্ধ চলিতেছে। যুদ্ধবিদ্যা শিখিবার আগ্রহে তিনি সৈনিকবৃত্তি লইতে চলিলেন। কিন্তু এক আইনের বাধায় ফিরিতে হইল—তাহার বয়স কম হইবার দরুণ তিনি নিতে পারিলেন না। যুদ্ধবিদ্যা অর্জন করিতেই হইবে। কলেজের দুই মাসের বেতন ১২৲ ঘণ্টাকা হাতে ছিল। সঙ্গী ছিল আশুতোষ আর তিনটি তরুণ, অবশ্য প্রায় একই প্রকার। লক্ষ্য—পোর্তুগিজের সরকারে সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করিবেন এবং আফ্রিকা আসিলেই তাহার বিরুদ্ধ আচরণ করিবেন। যখন তাঁহারা যমুনা নদী অতিক্রম করিলেন তখন সকলেই প্রায় ভগ্নোৎসাহ। তারপরে পদব্রজে যাত্রা, খাদ্য কেবলমাত্র ছোলা ভিজা। 'লেডস্‌মিথ' যাত্রা কাহিনী পথের মতই অভিনব এবং রোমাঞ্চকর, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এত করিয়াও সৈনিক হওয়া হইল না। কোন ক্রমে টিকানা জানিতে পারিয়া সঙ্গীদের একজনের পিতা 'লন্ডনে' ফিরে যাইবার এবং তাঁহারা দিগের বাধ্যতামূলক কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন। আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধাচরণে বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হইলেন কিন্তু তখন তাঁহার বৈরাগ্য আসিয়াছে—কিছুই ভাল লাগে না, পড়াশোনায় মন বসে না। এই সময় ব্রহ্মেন্দ্রনাথ কলেজে ইংরাজী পড়াইতেন। তাঁহার বাগ্মিতা তাঁহার মানসিক দৃঢ়তা ফিরাইতে সাহায্য করিল। ব্যারিস্টার হইবার প্রলোভন জাগিল। কোনক্রমে ৩০৲ টাকা জোগাড় করিয়া পুনরায় জোড়াসিঁকো-এ পৌঁছিলেন। কিন্তু সেদিনকার রাজনৈতিক দারিদ্র্যে বিমুখ হইয়া বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই সময় তাঁহার মনে দুইটী প্রতিজ্ঞা,—বিবাহ করিব না, উপাধি গ্রহণ করিব না। তাঁহার ধারণা সংসারে ঢুকিবার পক্ষে এই দুই আছে প্রবল। মানসিক অস্থিরতা দূর করিবার জন্য যেন ভ্রমণে বাহির হইলেন। তখনপুর, হরিদ্বার, বেণারেস প্রভৃতি ভ্রমণান্তে আগ্রায় ফিরিয়া আসিলেন। এই সময় তাঁহার খুল্লতাত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর খুব নাম যশ। তিনি ছিলেন একাধারে খ্রীষ্টিয়ান পাদরী, বিরাট পণ্ডিত এবং দেশহিতব্রতী। যদিও সেকালের প্রটেষ্টাণ্ট সমাজের নামজাদা লোক, কিন্তু বাড়ীতে একেবারে হিতাচারী, সদাচারী ব্রাহ্মণসুলভ বিনয় ও পাণ্ডিত্য এক অদ্ভুত যোগাযোগ। ভবানীচরণের চরিত্রে ছিল তাঁহার এক স্থায়ীন আধিপত্য। ভবানীচরণ স্বীকার না করিলেও উত্তর জীবনে নানা পরিবর্তনের মধ্যে এই ব্রাহ্ম খ্রীষ্টানের আধিপত্যই প্রমাণিত হয়।

ভবানীচরণ যখন কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন তখন বঙ্গভূমিতে তীব্র ধর্মালোলন চলিতেছে। তখনও রাজনীতি ধর্মালোলন হইতে পৃথক হয় নাই, বরং একে অন্যের পরিপূরক হিসাবে এক বিশুদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে রাজনীতি কল্পনদীর ধারার ন্যায় অন্তঃস্থ ভাবে প্রবাহিত হইতেছিল। এই যুগের বাণী ছিল স্বাধীনতা—মনের স্বাধীনতা, সমাজের স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা। তখনও অর্থনৈতিক সমস্যা তীব্র হয় নাই। ছাত্র আন্দোলন ও যুব আন্দোলন সবে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু ধর্মালোলনের গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, চারিত্রিক দৃঢ়তাসম্পন্ন আপোষহীন নেতৃত্বে রাজনৈতিক আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল। কৃষ্ণবিহারী বিদ্যা উপলক্ষ করিয়া বিভিন্ন খৃষ্টিকর্মীর নেতৃত্বে বিরোধ উপস্থিত হইল। আনন্দমোহন বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন অগ্রসর দলের নেতা। কেশবের নেতৃত্ব অস্বীকার করিয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে যুব আন্দোলনের এক প্রধান অংশ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনে যোগদান করে। ভবানীচরণও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের আন্দোলনে ভিড়িয়া পড়িলেন। এখানে ব্রহ্মেন্দ্রনাথ বসুর সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং এই মিলন কিছুকাল পরে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে থাকা সত্ত্বেও দুই বন্ধুই 'নববিধান' সমাজে যাতায়াত করিতেন। উভয়েই কেশববাবুর প্রিয়পাত্র হন। ১৮৮১ সালে কেশবের নেতৃত্বে 'নববৃন্দাবন' নামক এক ধর্মমূলক নাটক অভিনীত হয়। উক্ত নাটকে ব্রহ্মেন্দ্রনাথ 'যোগীর' ভূমিকায় অভিনয় করেন। ভবানীচরণ টিকেট বিক্রয় এবং অন্যান্য উদ্যোগ আয়োজনে ব্যস্ত থাকেন। 'অরেন' পরে পরমহংসদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাহাতে 'বিবেকানন্দ' নামে পরিচিত হন। ভবানীচরণ কেশবের সহিত যুক্ত রহিলেন। কেশবের সর্ববর্ম সমন্বয়ের আদর্শ ভবানীচরণকে আকৃষ্ট করিয়াছিল বিশেষতঃ কেশবের ব্রহ্মবাদ ও বাইবেলীয় মুক্তিবাদের সমন্বয়ের তাঁহার পছন্দ হইত। কেশবের সতীর্থ, বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বাইবেলের সহিত বেদান্তের অদ্ভুত নৈকট্য অনুভব করিতেন। ভবানীচরণও খৃষ্টীয় মুক্তিবাদের সহিত বেদান্তের প্রত্যক্ষ সহচারিবাদের যৌক্তিকতায় বিশ্বাসী হইয়া উঠিলেন। কেশবের অনেক উপদেশে বাইবেলোক্ত পাপবোধহরণ মূলতঃ খ্রীষ্টীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত। বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবর্ম ও খৃষ্টীয় ভাবধারা এই উভয় স্রোতের মিলিত সঙ্গমে অবগাহন করিয়া ভবানীচরণ ভক্ত ও যোগী হইয়া উঠিলেন।

প্রতাপচন্দ্রের সমালোচি ছিল না। অনুপ্রাণিত ভবানীচরণকে তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পরিবেশে, বিভিন্ন রূপান্তরের মধ্যেও ভবানীচরণ নিজকে বৈরাগিক খৃষ্টান বলিয়া দাবী করিয়া গিয়াছেন, প্রতাপচন্দ্রের মানসিক আধিপত্য সম্ভবতঃ ইহার অন্যতম কারণ।

কেশবের সহিত ভবানীচরণের পরিচয় হয় ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে, কেশব-বাবুর তিরোভাবের পরে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী আচার্য্য ভাই গৌরগোবিন্দের নিকটে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই সময় দুইখানি পত্রিকার সহিত তিনি যুক্ত হন। ১৮৮৬ সালে কনকর্ড (concord) কাগজ প্রকাশিত হয় এবং ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' কাগজের সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন। সাধু হীরানন্দ নামক সিন্ধীসাধু হায়দরাবাদে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার অনুরোধে ভবানীচরণ হায়দরাবাদ (সিন্ধু) আসেন এবং উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় প্রচার উদ্দেশে 'ইউনিয়ন একাডেমী' নামক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ভারত বিভাগের পূর্বে শাখা পরিশাখাযুক্ত এই বিদ্যালয় বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল এবং সাধু হীরানন্দের নামানুসারে "হীরানন্দ একাডেমী" নাম দেওয়া হইয়াছিল। ভবানীচরণের পিতৃদেব এই সময়ে মুলতানে চাকুরী করিতেন। পিতার অসুস্থতার সংবাদ শুনিয়া তিনি মুলতানে যান এবং সেখানে পিতার শুশ্রূষার ফাঁকে পিতৃদেবের সংগৃহীত 'ক্যাথোলিক ডিসিপ্ল' নামক পুস্তক পাঠ করিয়া "ক্যাথোলিক" মতবাদে আকৃষ্ট হন। সিন্ধু দেশে বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ব্যতীত ব্রাহ্ম সমাজে উপাসনা, বক্তৃতা ও বিবাহে আচার্য্যের দায়িত্ব তাঁহাকে লইতে হইত। ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক থাকা সত্ত্বেও জীবনে তাঁহাকে গোড়ামীর দ্বারা কখনও স্পর্শ করে নাই। সিন্ধু দেশের সকল সমাজেই—হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান এবং 'আমিল' সম্প্রদায়ের সভায় তিনি যাতায়াত করিতেন। সিন্ধু দেশে 'মেলা' উৎসব খুব জাঁকজমকের সহিত নিষ্পন্ন হইত, এই সকল মেলা উৎসবে তিনি 'আর্য্য বিদ্যা' প্রসঙ্গে ভাষণ দিতেন। ছাত্র সমাজে গতায়াত ও তাহাদের উপরে তাঁহার মানসিক আধিপত্য অত্যন্ত বেশী ছিল। ছাত্রগণের খেলা-ধূলায় তিনি সঙ্গী, সন্তরণ শিক্ষায় তিনি শিক্ষক এবং নূতন তর্কমূলক আলোচনা সভায় তিনি আচার্য্য, নূতন ছাত্র আন্দোলনে তিনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন। এই সময়ে সিন্ধু দেশে বিশেষতঃ করাচী প্রভৃতি নগরে 'প্লেগ' মহামারীরূপে প্রকাশ পায়। কতিপয় সঙ্গী সমভিব্যাহারে তিনি নিরাশ্রয় প্লেগ-রোগীদের শুশ্রূষা ও পথ্য সংগ্রহে নিযুক্ত হন এবং এতদুদ্দেশ্যে 'সেবা-বাহিনী' গঠন করেন। হায়দরাবাদ ও সুক্কুরেও তিনি 'সেবা বাহিনী' গঠন করেন। সুক্কুরে তাঁহার অন্যতম সহকর্মী বৌদ্ধ সিং রাম সিং সেবা করিতে আসিয়া আক্রান্ত হন এবং পরলোকগমন করেন, এই নিঃস্বার্থ ত্রীবন্ধনে সমস্ত সিন্ধু দেশে এক প্রবল ভাবধারা প্রবহমান হয়। এই সমস্ত কারণে সিন্ধু দেশে তাঁহাকে 'সাধু' বলিয়া সম্বোধন করিত।

ক্যাথোলিক মতবাদে দৃঢ়তা তাঁহার ক্রমেই বাড়িতে থাকে। সিন্ধু দেশে ব্রাহ্ম সমাজের ভাবনে থোড়া 'ক্যাথোলিক' মত প্রকাশের জন্য—বিশেষতঃ যীশুখ্রীষ্টের অলৌকিকত্ব প্রচার করিবার জন্য কতিপয় সিন্ধু ব্রাহ্মের সহিত তাঁহার মতান্তর হয়। অবশেষে ১৮৯১ সালে হায়দরাবাদে চার্চ অব্ ইংলণ্ডের পাদরী হিটনের নিকটে তিনি ক্যাথোলিক ধর্মে দীক্ষিত হন। এই সংবাদে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা মর্মাহত হইয়া পত্র লিখেন; কিন্তু যখনই যে বিষয়ে তিনি দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিতেন কোন বাধাই তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিত না। খ্রীষ্টীয় ধর্ম গ্রহণ করিলে খ্রীষ্টীয় সমাজ হইতে তাঁহাকে অনেক প্রলোভন দেখান হয়, পাদরী হইবার জন্য অনুরোধ আসে, অনেক সুবিধার কথা তাঁহাকে জানান হয়; কিন্তু জাগতিক সুখসুবিধার জন্য তিনি খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন নাই বরং ভারতীয় খ্রীষ্টান মিশনকে বৈদেশিকী মতবাদের তিক্ত তর্কে বিজড়িত হইতে নিষেধ করেন এবং আর্য্যোচিত পটভূমিকায় বাইবেলের পবিত্র ধর্মে বিশ্বাসী হইতে বলেন তিনি যীশুখ্রীষ্টের অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁহার মতে যীশুর স্বয়ং লওয়া সন্ন্যাসের নিকটে আত্মসমর্পণ তুল্য। মতের দৃঢ়তার সহিত তাঁহার আরও পরিবর্তন আসে। আজন্ম হোঁসা-ভাষায় "জোতে" ও "সোফিয়া" কাগজে তাঁহার এই পরিবর্তিত মতবাদ প্রচারিত হইতে থাকে। সিন্ধু দেশের যুবক সমাজে চাঞ্চল্য উঠে, খোঁড়া পাদরীদের মধ্যেও গুঞ্জরণ আরম্ভ হয়। অল্পান্ত প্রদেশের মতনই ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনে 'আমিল' যুবকদের মধ্যে নিষিদ্ধ মাংস ও মদ্যপানের প্রভাব বাড়িতেছিল। ব্রাহ্ম সমাজে সংশ্লিষ্ট থাকিতেই ভবানীচরণ মদ্যপান বিরোধী হইয়াছিলেন এবং "আশা বাহিনীর" ('BAND OF HOPE') কর্মী ছিলেন এবং এখানেও 'আশা বাহিনীর' শাখা কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। ভবানীচরণের নেতৃত্বে 'আশা বাহিনী' মদ্যপানের বিরুদ্ধে প্রবল অভিযান সুরু করে। ঠিক এই সময় অ্যানি বেসান্ত থিয়োসফীর ব্রহ্মবাদ প্রচার করিতেছিলেন, ভবানীচরণ থিয়োসফীর মতবাদের দুর্বলতা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিলেন এবং উত্তর ভারতের সর্বত্র অ্যানি বেসান্তের পিছনে পিছনে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতে থাকেন, অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে সহরেই বেসান্ত মহোদয়া যাইবেন সেখানে প্রতিবাদ জানাইতে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও আসিবেন শ্রোতাদের এই রকম একটা ধারণা দাঁড়াইয়া যায়। আর্য্যসমাজীদের সহিতও তাঁহার তর্ক যুদ্ধ হয়, বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাকচাতুরীর সিন্ধু দেশে আর্য্যসমাজীদের কার্যকলাপ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

ভারতীয় প্রাচীন ধর্মতত্ত্বে বেদান্তের প্রভাব তাঁহার মধ্যে অক্ষুণ্ণ ছিল, অথচ ভগবানের অলৌকিক মানবত্বও তিনি বিশ্বাস করিতেন। বেদমূর্ত যীশু তাঁহার পথপ্রদর্শক গুরু ও নিয়ামক। তিনিই সচ্চিৎ আনন্দময় ব্রহ্মের প্রেরিত প্রতীক। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন—কি উপায়ে ভারতীয় খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকদিগকে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির আওতায় আনা যায়। তিনি মন স্থির করিয়া ফেলিলেন। তিনি নিজেই সমাজের সন্ন্যাসীর পোষাক পেরুয়া বস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং পিতৃদত্ত নাম পরিবর্তন করিয়া ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নাম গ্রহণ করিলেন। এই ঘটনা ঘটে ১৮৯৫ সালে। খ্রীষ্টান সমাজেও প্রবল ঢেউ উঠিল,

অধিকাংশই তাহাকে বর্জন করিল, আবার দুই একজন এই সেক্সকে অবলম্বন করিয়া ভারতে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে খ্রীষ্টীয়ান ধর্মের প্রচার সুবিধাজনক হইবে কল্পনা করিয়া তীব্র উৎসাহিত হইল। উপাধ্যায়জী কিন্তু অটল, তিনি কখনও লাভ লোকসানের হিসাব করিতেন না এবং সুবিধাবাদীদের তোয়াক্কা রাখিতেন না। ভারতীয় ঋষিদের অনুকরণে ধ্যান-ধারণার জন্য তপোবন প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হইলেন। গির্জা কিম্বা ওকনাম্নের নাম তাঁহার ভাল লাগিল না। নির্জনে নীরবে 'ঠাকুরের' আরাধনা করিতে হইলে 'মঠ' স্থাপনই প্রয়োজন। সেই সিদ্ধান্ত, অবশি কার্য। হুগলীপুর বর্ধমানের তীরে 'মঠ' প্রতিষ্ঠার সকল আয়োজন সমাপ্ত হইল। 'মঠ' নিষ্কাম ও খ্রীষ্টীয় ভাবধারায় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের পূজার জন্য সারা পৃথিবীর নরনারীকে আহ্বান করিতে ভারতের প্রথমে প্রধান স্থানে গমন করিলেন এবং সর্বত্র বক্তৃতা দিলেন। প্রচার ও বক্তৃতায় দুই রকম সাড়া মিলিল। ক্যাথোলিক সম্প্রদায়ের অনেকে ক্ষুব্ধ হইল, ভারতীয় সংস্কৃতির ভাবধারায় যীশুর অপূর্ব প্রেমবাদের ব্যাখ্যা অনেকেই বুঝিতে পারিল না—বরং অনেকেই ইহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হিন্দুয়ানী দেখিতে পাইয়া ক্যাথোলিকদিগকে তাঁহার কাছে "লোকিয়া" পাঠ করিতে নিষেধ করা হইল। উপাধ্যায়জী প্রধান ধর্মযাজকের নিকটে বিচারপ্রার্থী হইলেন কিন্তু বিশেষ কিছু ফলপ্রসূ হইল না। তাহাকে পরিচ্ছদের সংস্রব ত্যাগ করিতে বলা হইল। উপাধ্যায়জী ইহাতেও সম্মিলেন না, সুযোগ পাইলে রোমে খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগুরুর নিকটে লেখা করিবেন ঘোষণা করিলেন। এই ঘটনার পরে তিনি 'মঠ' তুলিয়া দিলেন। ১৯০০ সালে চিরকালের জন্য তিনি নিজ পরিত্যাগ করিয়া বিডন ষ্ট্রীটে (কলিকাতায়) এক বাসায় উঠিলেন। তাঁহার সহিত থেমচাঁদ ও রেওয়াচাঁদ প্রমুখ নিজ দেশীয় কয়েকজন ভক্ত চলিয়া আসিলেন। থেমচাঁদের শিশু কন্যা 'অ্যাগনেস' এই সঙ্গে ছিল। উপাধ্যায়জী সাধু অ্যাগনেসের নামানুসারে এই কন্যার নামকরণ করেন। এই অ্যাগনেস থেমচাঁদ বি-এ পাশ করিবার পরে হায়দ্রাবাদের কৃষ্ণনগর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হন। শিশুকালে পিতৃ-গুরুকে যেমনটী দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার লেখার মধ্যে জানিতে পারা যায়।

উপাধ্যায়জী কলিকাতায় আসিয়া নবকলেবরে সাপ্তাহিক 'সোফিয়া' প্রকাশ করেন। রেওয়াচাঁদ কাগজের কর্মসচিব হইয়াছিলেন (এই রেওয়াচাঁদই পরে স্বামী অনিমানন্দ নামে খ্রীষ্টীয়ান সাধু বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।) অনিমানন্দের ন্যায় শিষ্য ও অনুচর দুনিয়ায় খুব দুর্লভ। বড়বাজারের মধ্যেও বহুবৎসর তিনি গুরুর সকল কাজে ঐকান্তিকতার সহিত যুক্ত ছিলেন। উপাধ্যায়জী সাপ্তাহিক 'সোফিয়ার' উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লিখিলেন, "প্রজ্ঞার সহিত বিভিন্ন ধর্মের আলোচনাই হইল আমাদের উদ্দেশ্য। সহজ, সরল, ভাব ও ভাষায় ধর্মের আলোচনা না হইলে সাধারণ লোকে কখনও বুঝিতে পারে না। কাজেই আমাদের ভাষা হইবে সহজ, সাধারণের বোধ্য"।

অ্যাগনেস লিখিতেছেন—উপাধ্যায়জী বাহুচর্মের আসনে "আসন" করিয়া বসিতেন, ধ্যান ধারণা, পড়াশুনা, প্রবন্ধ লিখা, আলোচনা, সব কাজই হইত এই আসনে, বহু রাত্রি পর্যন্ত কাজ করিতেন হয়তো কাজ করিতে করিতে এই আসনেই ঘুমাইয়া পড়িতেন। তাঁহার ধারণা পাশ্চাত্যভাব ও পোষাক প্রাচ্যে খ্রীষ্টধর্মপ্রচারে প্রকাণ্ড বাধা। প্রাচ্য দেশের লোক হয়তো সহজেই বাইবেল ও বেদান্তের সমন্বয় বুঝিতে পারিত, কিন্তু হ্যাট, কোট ও টাই এর বাঁধনে ইহা আটে পিষ্টে আটকাইয়া দিয়াছে। য়ুরোপীয় ভাবধারায় বস্ত্রবাধন হইতে খ্রীষ্টীয় ধর্মকে পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। ঠিক এই সময়ে চীন দেশে কয়েকজন পাদরী নিহত হয় ও ইংলণ্ড এই উপলক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ব্রহ্মবান্ধব কণ্ঠকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—চীনকে য়ুরোপের পদানত করিবার জন্যই এই যুদ্ধ, যীশুর পদানত করিবার চীৎকার নিছক ভণ্ডামী। ১৮নং বেথুন রো'র গৃহে তিনি পুনরায় এক বিদ্যালয় খোলেন। এই গৃহের মালিক কার্তিকবাবু ছিলেন তাঁহার ছাত্র ও সুহৃদ। ব্রহ্মবান্ধবের শিক্ষাদানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল বেতন লওয়া হইবে না। বেতন লইয়া বিদ্যাদান করা আর ভারতীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধাচরণ করা একই কথা। এই গৃহেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ আসিতেন। কবিকে বসিবার জন্য চেয়ার দেওয়া হইত এবং ব্রহ্মবান্ধব আসনে বসিয়া আলোচনা করিতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আদর্শের বিনিময় হইত। মহর্ষিদেব এই সময় বোলপুরে একটী বিদ্যালয় খুলিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ব্রহ্মবান্ধবের নিকটে কবি প্রস্তাব করেন যে উক্ত বিদ্যালয় বোলপুরে লইয়া যাওয়া হউক। কবির সহিত ব্রহ্মবান্ধব স্থান নির্বাচন করিতে বোলপুর আসেন। এদামঝোরা খোলা উঁচু নীচু মাঠ এবং ছায়াঘন বৃক্ষরাজি ব্রহ্মবান্ধবের কবি মনকে মুগ্ধ করে। ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রহ্মবান্ধবের সহিত রেওয়াচাঁদ ও বোলপুরে আসেন এবং শিক্ষকতাব্যতীত বোর্ডিংএর পরিচালক হন। উপনিষদের পরিভাষা এবং অনুবাদ সম্পর্কে এইখানে কবির সহিত ব্রহ্মবান্ধবের দীর্ঘ আলোচনা হইত। ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন শঙ্করের মতানুবর্তী অদ্বৈতবাদী, কবি রামানুজের বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ ভালবাসিতেন। দীর্ঘ সময় শান্ত আলোচনায় তাঁহারা ব্যস্ত থাকিতেন। অসীম ধৈর্য্যের সহিত উপাধ্যায়জী শঙ্কর ভাষ্যের ব্রহ্মবাদ কবিকে বুঝাইবার চেষ্টা পাইতেন। এই সময় শুনিতে পাই যে রেওয়াচাঁদ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করিতেছে। ব্রহ্মবান্ধব রুদ্র ভাষায় রেওয়াচাঁদকে পত্র দেন বলে রেওয়াচাঁদ তাঁহার দলবল লইয়া সিমলা ষ্ট্রীটের এক বাড়ীতে উঠিয়া আসেন। ১৯০২ সালে এই ঘটনা ঘটে। উপাধ্যায় এই সময় 'টেরেস্টিয়েল সেক্রেটরী' ও 'আদুর আশ্রম' নামক সংবাদপত্র সম্পাদন করিতেন। উক্ত দুই কাগজে ব্রহ্মবান্ধবের নিয়ম লেখা তাঁহার সহিযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইত। "টেরেস্টিয়েল সেক্রেটরী" কাগজে সকল ধর্মের আলোচনা ব্যতীত রাজনৈতিক প্রবন্ধও স্থান পাইত। উপাধ্যায়জী ধর্মমূলক প্রবন্ধে 'নরহরি দাস' এই ছদ্মনাম ব্যবহার করিতেন। যীশু ছিলেন একাধারে মানুষও ভগবান। তাই নরশ্রেষ্ঠ দেবপুত্র প্রেমিক যীশুর দাস ইহাই ছদ্মনামের বৈশিষ্ট্য।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মবান্ধব ইংলণ্ড যাওয়ার অভিলাষ প্রকাশ করেন। তিনি লিখিতেছেন—৪ঠা জুলাই হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়াই তিনি বিবেকানন্দের তিরোভাবের কথা শ্রবণ করেন। সেখান হইতে এক রকম দৌড়াইয়া বেলুড়ে যান। তাঁহার ধারণা হইল বিবেকানন্দের অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব তাঁহার উপরে বর্ত্তিয়াছে। বিদেশে ভারতের বাণী প্রচার করিবার জন্য তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন, কম্বল ও তাম্রপাত্র সম্বল এই সাধু প্রাণের আবেগে বোম্বাই অভিমুখে রওনা হইলেন। তাঁহার এই 'আর্ত্তি' দেখিয়া কয়েকজন বন্ধু ট্রেণের টিকিট ও কিছু অর্থ সাহায্য দেন। বোম্বাইতে গিয়া বন্ধুদের টাকায় এক ইতালীয়ান জাহাজে মেসোপা পর্য্যন্ত টিকেট কেনেন। সেই জাহাজে কয়েকজন সিন্ধী ভদ্রলোকও ছিলেন, তাঁহারা তাঁহার নাম জানিতেন এবং যথেষ্ট সাহায্য করেন। তাঁহার রোমের পত্রাবলীতে জানা যায় "জাহাজে ঠাণ্ডা লাগিয়া গায়ে অল্প ব্যথা হইয়াছে তজ্জন্য আমি পুরিয়া বেড়াইতেছি"। জাহাজে তিনজন "যুরপ" বন্দীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয় তন্মধ্যে একজন 'যুরপ' সৈন্যদের অধিনায়ক ছিলেন। এই 'যুরপ' অধিনায়ক তাম্রপাত্র দেখিয়া অনেক আগ্রহ প্রকাশ করেন, ব্রহ্মবান্ধব বন্দীকে তাম্রপাত্রটী দান করিয়া দেন। ৯ই মেডেথ লণ্ডনে পৌঁছিয়াই জ্বরে আক্রান্ত হন। ভারতে সন্ন্যাসীদের নানা স্থানে আশ্রম আছে। পরিব্রাজকেরা বিদেশে, বিভূয়ে বিপাকে পড়িলে এই সকল আশ্রমে কিছু দিনের আশ্রয় পাইয়া থাকেন। অনেক গৃহী ও বিপন্নগ্রস্ত সাধুদের আশ্রয় দিয়া থাকেন। কিন্তু ইংলণ্ডের নিয়ম কানুন আলাদা,ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য প্রধান এই দেশে তিনি অত্যন্ত বিপদে পড়িলেন। স্থানাভাবে, অর্থাভাবে এক এক সময় অবসন্ন হইয়া পড়িতেন, পরক্ষণেই নরহরি যীশুর নির্য্যাতনের কথা স্মরণ করিয়া উঠিয়া বসিতেন, অবস্থা এমনই দাঁড়াইল যে কোন কলকারখানায় কাজ লওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় রহিল না। ঠিক এমন সময় এক খৃষ্টীয় ধর্মগুরুর নিকট হইতে কিছু অর্থ সাহায্য আসে। অতঃপর তিনি অক্সফোর্ডে যান, সেখানে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক মাকডোনাল্ডের সহিত "টেক্সটিরেথ লেকচুরী" মারফৎ পরিচয় ছিল। অধ্যাপক মহাশয় ভারতীয় একেশ্বরবাদ, ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে কয়েকটী বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এই সকল বক্তৃতায় অনেক প্রশংসা হয়। সংবাদ পত্রে কয়েকটী প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। এই সকল নানা কারণে কিছু অর্থও সংগৃহীত হয়। ঐ দেশের মতন ব্যয়বহুল স্থানে তাঁহার খুবই কষ্ট হইতে থাকে কিন্তু উপাধ্যায়জী চিরদিনই এই সকল বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। অক্সফোর্ড হইতে কেম্ব্রিজ এবং কেম্ব্রিজ হইতে মানচেষ্টার যান। সর্বত্রই তাঁহার বক্তৃতা সভায় প্রচুর লোক সমাগম হইত। কেম্ব্রিজে ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবার ব্যবস্থা তিনি করিয়া আসেন। ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রয়োজনীয় অর্থও সংগ্রহ করেন এবং প্রসিদ্ধ দার্শনিক ডয়েসেনকে পাঠাইবার কথা স্থির হয়। কিন্তু কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পর্য্যন্ত পিছাইয়া পড়ে। কেম্ব্রিজে থাকাকালীন তাঁহার অর্থকষ্ট লাঘবের জন্য কতিপয় ইংরেজ বন্ধু টুকেট বিক্রয় করিয়া বক্তৃতা আয়োজন করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তিনি উত্তর করিলেন, ভারতীয় সন্ন্যাসী জ্ঞান দান করে বিক্রয় করে না। এই বলিষ্ঠ সন্ন্যাসীর দারিদ্র্যের মধ্য তাঁহাদিগকে চমৎকৃত করিয়াছিল। বিলাতে থাকিতে তাঁহার আর এক বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয়। তিনি দেখিলেন প্রাসাদের পার্শ্বেই দারিদ্র্যের নিষ্করুণ বীভৎসতা। একদিন একটী রমণীকে গভীর তুহিন শীতল রাত্রে পুষ্প বিক্রয়ের ছল করিয়া ভিক্ষা করিতে দেখিলেন। এই দৃশ্যে তাঁহার কোমল হৃদয় বিচলিত হইল। ভিক্ষারী রমণীকে ভগ্নী সম্বোধন করিয়া বলিলেন। "ভগ্নী ভিক্ষা নাও তোমার প্রয়োজন আমার চেয়েও বেশী।" এই বলিয়া তাঁহার শেষ শিলিংটী দান করিয়া দিলেন। কেবল ইহাই শেষ নহে সর্বত্র অতি দ্রুত, অতি ব্যস্ত ঐহিক ভোগ সুখ পরায়ণ খৃষ্টান সভ্যতার চাপে দীনবন্ধু নরহরির অভিশাপ তাঁহাকে ঘরমুখো করিল। ১৯০৩ সালের জুলাই মাসে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।* (ক্রমশঃ)

* উপাধ্যায়জীর যে সকল বাণী উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার বেশীর ভাগ ইংরাজী অনুবাদের বাংলা অনুবাদ। তাঁহার নিজস্ব ভাষার বৈশিষ্ট্য পাঠকগণকে কল্পনা করিয়াই সাধ মিটাইতে হইবে। প্রবন্ধ লিখিবার সময় উপাধ্যায়জীর আজীবন সহচর ও শিষ্য ব্রহ্মচারী ৺অনিমানন্দের সদ্য প্রকাশিত "BLADE" পুস্তক হইতে এবং অন্যত্র প্রকাশিত বিভিন্ন সাময়িকী হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়ায় প্রবন্ধ লেখক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

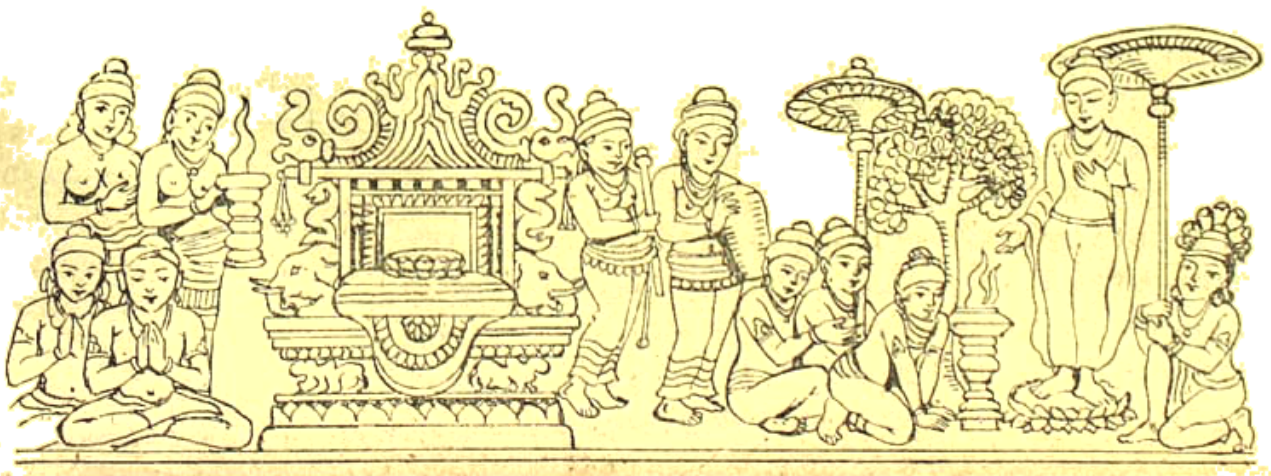

ভারতচন্দ্র ও বাঙ্গালা প্রবচন

শ্রীহিমাংশুচন্দ্র চৌধুরী এম-এ, বি-এল

মহাকবি ভারতচন্দ্র রাজগুণাকর যুগসন্ধিক্ষণে জন্মগ্রহণ করেন। মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব-রবি তখন অস্তমিত ; প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারাই প্রকৃত-পক্ষে স্বাধীন নবাবের ন্যায় বাঙ্গালাদেশ শাসন করিতেছেন। মহারাষ্ট্রশক্তি হেন দৃষ্টিতে বাঙ্গলার দিকে চাহিয়া আছে, আর বিদেশী বণিকেরা সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টায় বাঙ্গালার প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছেন! পলাশীর যুদ্ধের ফলে বাঙ্গালাদেশে যে পরিবর্ত্তন আসিল, তাহা বাঙ্গালার রাষ্ট্র ও সমাজকে একেবারে ভাঙ্গিয়া দিয়া গেল। পুরাতন যাহা ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া গেল এবং সেই ধ্বংসের উপর যাহা গড়িয়া উঠিল তাহার সহিত পুরাতনের যোগসূত্র খুব কমই রহিল। রাজনীতি, ধর্ম্ম ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে নূতন যুগ দেখা দিল।

মেঘনাদের প্রাচীনপন্থী বাঙ্গলার শেষ মহাকবি। সে-সময়ে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মত বিদ্যোৎসাহী পৃষ্ঠপোষক না থাকিলে আমরা ভারতচন্দ্রকে তখনই পাইতাম না। কিন্তু মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারও তখন নানা আলোচনায় ব্যস্ত ছিল। নতুবা "বিদ্যাসুন্দরের" কাহিনী রাজদরবারে স্থান পাইত না। স্মার্ত্ত ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ভারতচন্দ্রের কাহিনীর বিষয় বস্তুর অভাব হইত না এবং শব্দ, অলংকার ও ছন্দের উপর অসুস্থ দখল থাকা সত্ত্বেও রাজোপযোগী মনস্তুষ্টিসাধনের জন্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী ও অশ্লীলতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। চাঁদের কলঙ্কের ন্যায় এই অশ্লীলতা ভারতচন্দ্রের একমাত্র কলঙ্ক।

উনবিংশ শতক পর্য্যন্ত বাঙ্গলা-সাহিত্য-দেব-মহাত্ম্য কীর্ত্তনেই পরিপুষ্ট হইয়াছে। দেবলীলা ও দেব মাহাত্ম্যই লেখকগণের কাব্যরচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ভারতচন্দ্রও সেই পদ্ধতি অনুযায়ী বিদ্যাসুন্দরের মত আদিরসাত্মক কাব্যকে দেবী-মাহাত্ম্যের ছলে লিখিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের কাব্যেই আমরা প্রথম মানবিকতার বিকাশ দেখিতে পাই। ঈশ্বরী পাটনী মোক্ষ চায় নাই, স্বর্গ চায় নাই,—চাহিয়াছে শুধু "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।" ভারতচন্দ্রের প্রভাব বাঙ্গালীর উপর এক সময়ে খুবই পড়িয়াছিল এবং তাঁহার অন্নদামঙ্গল কাব্যের কতক কতক পংক্তি এক সময়ে প্রবচন হিসাবে ব্যবহৃত হইত। আমরা এখনও ইহাদের কতকগুলি, যেমন, "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন", "পড়িলে দেবার দুঃখে জানে হীরার ধার" প্রভৃতি ব্যবহার করি। অশ্লীলতার ভয়ে যাঁহারা ভারতচন্দ্রের কাব্য পড়েন না, তাঁহারা নিজেরাই বঞ্চিত হন। অনুপ্রাস, যমক, উপমা ইত্যাদি অলংকার, ছন্দ ও শব্দ-বিন্যাসে ভারতচন্দ্র সিদ্ধহস্ত। আমি ভারতচন্দ্রের প্রবচনগুলি সংগ্রহ করিয়া পাঠক-সমাজে উপস্থিত করিলাম। কাহিনীর সূত্রে অবতারণা করিয়া কি উপলক্ষে সেই গুলি ব্যবহৃত হইয়াছে—তাহার আলোচনা এই প্রবন্ধে করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

গ্রন্থসূচনায় কবি নবাব আলীবর্দ্দী কৃত উড়িষ্যা-বিজয় প্রসঙ্গে নবাব আলীবর্দ্দী-কর্ত্তৃক ভুরসুটের অত্যাচারের মৃদু বর্ণনা করেন। সেই অত্যাচারের প্রতি নন্দী ত্রিশূল দ্বারা আলীবর্দ্দীকে সংহার করিতে উদ্যত হন। শিব বাধা দান করেন, এবং তাঁহার আদেশে নন্দী গড়-সেরাস্তায় শিব-ভক্ত বর্গীরাজকে স্বপ্নাদেশ করেন। সেই স্বপ্নাদেশ পাইয়া রঘুরায় ভাস্কর পণ্ডিতকে বাঙ্গলা আক্রমণ করিতে বলেন। সেই সময়ের বাঙ্গালায় যে বর্গী-হাঙ্গামা হয়, তাহাতে বহু ধার্ম্মিক ব্যক্তিও দুঃখ ভোগ করেন। ইহাতে কবি মন্তব্য করিতেছেন—"মন্দির পুড়িলে দেবতার কি এড়ায়?"

শিবের "ললাট—লোচন বহ্নির" দ্বারা মদন ভস্ম হইবার পর রতি বিলাপ করিয়া বলেন—

একের কপালে দহে আরের কপালে দহে
আগুনের কপালে আগুন।

নারদ সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন—

পাখা নাই তবু ঢেঁকি উড়িয়া বেড়ায়।
কোপের বহ্নিটা সদা কোন্দলে জড়ায়।

শিবের সংসারে অনটন চলিয়াছে। গৌরী সেজন্য শিবকে অনুযোগ করায় হরগৌরীর বিবাদের সূচনা হইল। শিব তখন আক্ষেপোক্তি করিতেছেন—

(১) সদয় হৃদয় গেল উদরের লেগে।
(২) নীচলোকে উচ্চ ভাবে রহিতে না পারি।
(৩) পরস্পরা পরস্পর শুনি এই সূত্র।
স্ত্রী-ভাগ্যে ধন আর পুত্রে-ভাগ্যে পুত্র।

"ভবানীর কটূক্তিতে" কৈলাস ছাড়িবার সময় ভবানীপতি

"নারী যার বশতরা সে যেন জীয়ন্তে মরা
তাহার উচিৎ বনবাস"—

বলিয়া কৈলাস ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। পার্ব্বতীর সহিত কলহ করিয়া শিব কৈলাস ছাড়িয়া চলিয়া গেলে পার্ব্বতী পিত্রালয়ে যাইতে মনস্থ করিলেন। তখন তাঁহার সখী জয়া বলিলেন—

বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে
ঘরি থেকে লক্ষ্মীছাড়া।

শিব ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন, কিন্তু অন্ন ভিক্ষা পাইতেছেন না। সেই প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন—

যে জন চেতনামুখী সেই সদা সুখী।
যে জন অচিত্ত চিত্ত সেই সদা দুখী।

অন্নপূর্ণার মায়ায় শিব কোথাও অন্নচিন্তা না পাইয়া বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর নিকট যান। সেখানে লক্ষ্মীও অন্ন দিতে না পারায় শিব খেদোক্তি করিতেছেন—

(১) হাবাতে যদ্যপি চাষে সাগর শুকায়ে যায়
হেসে লক্ষ্মী হইল লক্ষ্মীছাড়া।
(২) ঘরে অন্ন নাই যার, মরণ মরণ তার
(৩) অন্নপূর্ণা যার ঘরে সে কাঁদে অন্নের তরে
এ বড় মায়ার পরমাদ।

শিব তপস্যা করিতেছেন। সেই উপলক্ষে বারমাসের বর্ণনা করিতে গিয়া কবি মাঘমাস সম্বন্ধে বলিতেছেন—

বাঘের বিক্রম সম বাঘের শিশির।

একদা ব্যাসদেবের সহিত কথোপকথন করিয়া শিব ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কাশী পরিত্যাগ করিতে বলেন। ব্যাসদেব অসম্মতির কারণ লইয়া বলিলেন—

জনক হইতে যেই জননীর বাড়া।
মা'র কাছে পুত্র যায় বাপে দিলে তাড়া।

শিবের সহিত বিবাদ করিয়া ব্যাসদেব দ্বিতীয় কাশী নির্ম্মাণ করিতে মনস্থ করিলেন এবং গঙ্গার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। গঙ্গা ব্যাসদেবকে শিবের সহিত বিবাদ করিতে বারণ করিলেন এবং সাহায্য করিতে অস্বীকার করিলেন। ব্যাসদেব তখন ক্রুদ্ধ হইয়া গঙ্গাকে বলিলেন—

মাতঙ্গ পড়িলে ঘরে পতঙ্গ প্রহার করে
এ দুঃখ পরাণে নাহি সহে।

গঙ্গা, বিশ্বকর্ম্মা ও প্রজাপতি ব্রহ্মা ব্যাসদেবকে কাশী নির্ম্মাণে সাহায্য করিতে অস্বীকার করিলে ব্যাসদেব অন্নপূর্ণার শরণ লইতে মনস্থ করিলেন। সেই উপলক্ষে কবি বলিতেছেন—

যে হৌক সে হৌক আগে করিব যতন।
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।

ব্যাসদেবের কঠোর তপস্যায় অন্নপূর্ণার টনক নড়িল, কিন্তু ব্যাসদেবের মনস্কামনার জন্য অন্নপূর্ণা তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। সেজন্য কবি বলিতেছেন—

দুর্দ্দৈব যখন করে তালকর্ম্ম মন্দ করে—

অন্নদার ছলনায় ব্যাসকৃত কাশীতে মরিলে গর্দ্দভ হইবে এই বর যখন ব্যাসদেব লাভ করিলেন, তখন—

ভবিতব্যং ভবত্যেব ত্বরাকর নর। ✓

অন্নদার ছলনায় অকৃতকার্য্য হইয়া ব্যাসদেব প্রস্থান করিয়াছেন, এমন সময়ে অন্তরীক্ষ হইতে অন্নপূর্ণা তাঁহাকে শিবের সহিত বিবাদ করিতে মানা করিলেন। শিবের সহিত ব্যাসদেবের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য কবি বলিতেছেন—

অযোগ্য হইয়া কেন বাড়াও উৎপাত।
খুঁয়ে হাঁড়ি হবে সেই তস্করেতে ঘাত।

দরিদ্র হরিহোড়কে সাহায্য করিতে আসিয়া দেবী ভবানী তাহার দুর্দ্দশার কাহিনী শুনিয়া মন্তব্য করিলেন—

পৃথিবীর পাপপুণ্য যত আছে মহে।

কুবেরের পুত্র বসুদ্ধর দেবীর শাপে হরিহোড় রূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং দেবীর অনুগ্রহ লাভ করিয়া ধনবান হইয়া তিনটি বিবাহ করেন। দেবীর নিকট বসুদ্ধরের স্ত্রী বসুন্ধরা উপস্থিত হইয়া এই অভিযোগ করেন যে, তাঁহার স্বামী অনুগ্রহলাভ করিয়া তিনটি বিবাহ করায় তাঁহার তিনটি সতীন হইয়াছে এবং ইহাতে তাঁহার মনে বড়ই দুঃখ হইয়াছে! এই প্রসঙ্গে সতীনের প্রতি নারীদের যে কিরূপ বিদ্বেষ, তাহা কবি অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

বরঞ্চ শমনে লয় তাহা লয় প্রাণ।
সতিনী লইলে স্বামী সহা নাহি যায়।

ভবানন্দ মজুমদারের ভবনে গমন-কালে দেবী 'ঈশ্বরী পাটনী'কে কৃপা করিয়া বর দিতে চাহিলে ঈশ্বরী পাটনী যে বর প্রার্থনা করিল, তাহা প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙ্গলা সাহিত্যে অভিনব। পাটনী মোক্ষ চাহিল না, দেবীর পূর্ণমূর্ত্তি দেখিতে চাহিল না, স্বর্গ বা ঐশ্বর্য্য চাহিল না। চাহিল শুধু—

আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম মানববিকাশের বিকাশ এই কয়েকটি কথার মধ্যে নাই। এ যেন Wordsworthএর True to the kindred points of Heaven and Homeএর ভারতীয় রূপ! বিদ্যার রূপ বর্ণনায় সুন্দরের মনের যে বিকার ঘটিয়াছিল, কবি অতি সুন্দরভাবে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন—

খুলিল মনের দুয়ার না লাগিল কপাট।

সুন্দর বর্দ্ধমাননগরে প্রবেশ করিবার সময় দ্বারী তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, সুন্দর নিজেকে "বিদ্যাব্যবসায়ী" বলিয়া পরিচয় দেন। দ্বারী তাহাতে সন্দিহান হইয়া বিতর্ক করিলে সুন্দরের যে মনোভাব হয়, কবি এই ভাবে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন—

নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে

হীরা মালিনী অত্যন্ত কৌতুকপ্রিয় ছিল এবং কোনও কারণ না থাকিলেও সে লোকের সহিত ঝগড়া করিতে ভালবাসিত। কবি তাই বলিতেছেন—

বাতাসে পাতিয়া কাঁদ কোন্দল তোলায়।

সুন্দরের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আনিতে স্বীকৃত হইয়া হীরা দ্রব্য ক্রয়ের জন্য কড়ি চাহিল। সে সময়ে তাহার স্বভাবানুযায়ী কৌতুকের সহিত কড়ির যে মহিমা সে বর্ণনা করিল, তাহা অস্বীকার করা চলে না। কড়ির মহিমা বোধহয় এখনও লুপ্ত!

কড়ি কটকা চিড়া দই বহু নাই কড়ি বই
কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মিলে।
কড়িতে বুড়ার বিয়া কড়ি লোভে মরে ঝিয়া
কুলবধূ ভুলে কড়ি দিলে।

বিদ্যার রূপ-বর্ণনায় ভারতচন্দ্র যে শব্দ ও ধ্বনি-চাতুর্য্য দেখাইয়াছেন তাহার তুলনা মেলে না। উপমা এবং অনুপ্রাসে কবি সিদ্ধহস্ত। এই অতুলনীয় রূপবর্ণনার কয়েকটি পংক্তি প্রবচন হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।—

(১) কে বলে শারদ-শশী সে মুখের তুলা।
পাঁজেখ পড়ে আছে তার কতগুলা।
(২) বাঁশীরে কলঙ্কী চাঁদ দুখ লয়ে ভোলে।
(৩) মেদিনী হইল মাটী নিতম্ব দেখিয়া।

সুন্দর মালার সহিত পত্র গাঁথিয়া দিয়া বিদ্যার মন জানিতে ইচ্ছুক হইলেন। সে জন্য তিনি হীরাকে অনুরোধ করিতেছেন যেন সে একদিন সুন্দরের গাঁথা মালা বিদ্যার নিকট লইয়া যায়। সুন্দর এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন যে, এ যেন—

বেড়া নেড়ে যেন দুয়ারের মন বুঝা।

হীরার অবশ্যই চরকার—

গাঁথিনু গাঁথিলে নাহি আর তোখা যায়।

হীরা ফুল ও মালা লইয়া যেইতে আসিলে বিদ্যা তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন—

রাঁড় হয়ে যেন রাঁড়ের নাই!

হীরা তখন কান্না জুড়িয়া দিল। ও আক্ষেপ আরম্ভ করিল। সেই আক্ষেপের ভিতর কবি দুইটি সত্য প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথমটি হইতেছে সতীর শাশ্বতিক তত্ত্ব—

যৌবন জীবন গেলে কি ফিরে।

আর দ্বিতীয়টি হইতেছে সংসারের তিক্ত অভিজ্ঞতা—

বড়র পিরীতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।

সুরঙ্গ খনন করিয়া সুন্দর "বিদ্যার মন্দিরে" আসিয়াছে। বিদ্যা তখন সুন্দরের বিরহে কাতর। সুন্দর বিদ্যার সহিত বিচার করিতে চাহিলেন ও সখীগণকে সাক্ষী হইতে অনুরোধ করিলেন। একজন সখী আপত্তি করিয়া যে উত্তর দিলেন, তাহা এখনও আমরা ব্যবহার করি—

উত্তমে উত্তমে মিলে অধমে অধমে।
কোথায় মিলন হয় অধমে উত্তমে।
আমি যদি কথা কহি একে হবে আর।
পড়িলে ভেড়ার সূত্রে ভাঙ্গে হীরার হার।

বিদ্যা ও সুন্দরের প্রথম মিলন উচ্ছ্বাসে সখীগণ পলায়ন করিলেন। কবি তাহা এই ভাবে বর্ণনা করিলেন—

লাজে পলাইল লাজ ভয়ে ভাগে ভয়।

বিদ্যা ও সুন্দরের প্রথম মিলন বর্ণনা করিবার সময় কবি সাংসারিক অভিজ্ঞতা হইতে দুইটি উক্তি করিয়াছেন—

(১) রসলাভ হইবে রহিয়া লুটিলে।
ধন কি হইবে কলিকা ধলিলে।
(২) জল না চুইবে জল না তুলিলে।
রস কি ইক্ষু যেন মলা করিলে।

সুন্দরের সহিত প্রথম মিলনের পর বিদ্যা সখীগণকে সাবধান করিতেছেন যে, তাহারা যেন হীরাকে সে খবর না দেয়। কেননা, হীরা যদি রাণীর নিকট এ কথা বলিয়া দেয়, তবে বিপদ ঘটিবে। ভবিষ্যতে অনেক অপেক্ষা কারণ থাকা সত্ত্বেও লোকে বর্তমান লইয়া মত্ত হইয়া উঠে। কবি তাহার প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিতেছেন—

ভবিষ্যতে ভাবি কেবা বর্ত্তমানে মরে।

হীরার বাড়ীতে থাকিয়াই সুরঙ্গ খনন করিয়া সুন্দর বিদ্যার আবাসে গিয়াছিলেন। কিন্তু সে কথা হীরার নিকট তিনি প্রকাশ করেন নাই। বরং বিদ্যার সহিত দেখা করিবার কোনো সুযোগ বা উপায় বাহির করিতে না পারার জন্য হীরাকে অনুযোগ করিয়া বলিলেন—

সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।
যেয়ের আশাসে রহে সে বড় পামর।

মিলন প্রসঙ্গে বিদ্যা সুন্দরকে যে অনুযোগ করিয়াছিলেন তাহা আমরা, অর্থাৎ পুরুষেরা স্বীকার করি না—

করিয়া সুখের নিধি পুরুষে গড়িল বিধি
দুঃখ হেতু গড়িল তরুণী।

বীরসিংহ রাজার কন্যা বিদ্যা বিদুষী ছিলেন। বীরসিংহ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, বিচারে যিনি বিদ্যাকে পরাস্ত করিতে পারিবেন, তাঁহারই নিকট তিনি কন্যা সমর্পণ করিবেন। সুন্দর গোপনে বিদ্যার সহিত মিলিত হইবার পর সন্ন্যাসীর বেশে বীরসিংহ রাজার দরবারে গিয়া বিদ্যার সহিত বিচার করিবার প্রস্তাব করিলেন। সন্ন্যাসীর বেশ থাকায় সুন্দরের সৌন্দর্য্য ছাপাইয়া সন্ন্যাসীর রুক্ষতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। রাজা ঘোর সমস্যায় পড়িলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল—

হারিলে ইহাকে নাকি বিদ্যা দেওয়া যায়।
শুন হয়ে দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়।

রাজাকে চিন্তামুক্ত দেখিয়া সুন্দর ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন—

ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।

বিদ্যা ও সুন্দর নিভৃতে মিলিত হইলে বিদ্যা সন্ন্যাসীর প্রশ্ন তুলিলেন। সুন্দর প্রকৃত কথা গোপন করিয়া বিদ্যাকে রহস্য করিয়া বলিলেন যে,

সন্ন্যাসীর সহিত বিবাহ হইলে বিদ্যা নূতন পতি লাভ করিবেন। ইহাতে বিদ্যা পুরুষের চপলতা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

পুরাতন ফেলাইয়া নূতনেতে মন।
পুরুষ যেমন পারে নারী কি তেমন।

বিদ্যা ও সুন্দরের মিলন প্রসঙ্গে কতকগুলি উক্তি আছে। সেই সব বিশেষ পরিবেশের উল্লেখ না করিয়া কেবল উক্তিগুলি উদ্ধৃত করিলাম—

(১) যুবে লোক যে জানে সন্ধান।
(২) আদর কালের বেলা তারপর অবহেলা
(৩) আমি ইথে যদি যাই সুখে যাইব মধু।
কেবল কথায় বাকি যাগা যায় বঁধু।
(৪) মিছা কথা সাঁচা জল কতক্ষণ রয়।

বিদ্যাকে যখন স্ত্রী জননীরূপে তাহার সখীরা জানিতে পারিল, তখন তাহারা কহিল—

লোকে বলে পাপ কার ক'দিন লুকায়।

বিদ্যার ঐরূপ অবস্থা জানিতে পারিয়া বিদ্যার মা তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং এই পাপের সহায়তা কে করিয়াছে তাহা প্রশ্ন করিয়া তাহার দুঃসাহসিকতা সম্বন্ধে বলিলেন—

সাপের মাথায় ভেকেরে নাচায়
কেমন কুটিনী সে যা।

বিদ্যার অবস্থা রাজাকে জানাইয়া, তাঁহাকে অনুযোগ করিয়া রাণী নিজের মরণ কামনা করিলেন :—

যে জন আপন বুঝে পর দুঃখ তারে বুঝে
সকলে আপন ভাবে জানে।

সুন্দর ধরা পড়িয়াছে শুনিয়া বিদ্যা যে আক্ষেপ করিয়াছে, তাহা সমস্ত বাঙ্গালী মেয়েদের প্রতি প্রযোজ্য—

যুবতী জনম কালামুখ
পরের অধীন সুখ দুখ।
পর ঘরে ঘর-করে পরের মরণে মরে
পরে সুখ দিলে হয় সুখ।

বিদ্যার লজ্জা আত্মসমর্থনে বীরার উক্তি বেশ সমুচ্চারণযোগ্য হইয়াছে :—

নষ্ট নই নষ্ট সঙ্গে হয়েছে মিলন।
ব্রাহ্মণের বোধে যেন সিন্ধুর বন্ধন।

বর্দ্ধমান হইতে মানসিংহ যখন ফিরিয়া যাইতেছিলেন, তখন অন্নপূর্ণা আপন মহিমা প্রকাশের জন্য মানসিংহকে বিপদে ফেলিলেন। কারণ—

বিনা ভয়ে প্রীতি নাই মুখে বলে বটে।

তাহারই বাসগৃহের আড়ায় ভবানন্দ মজুমদার বন্দী হইলেন। তাঁহার দুই ভৃত্য তখন কিসেসে যাওয়ার জন্য খেয় করিতে লাগিল। সেই খেয়োক্তির মধ্যে চিরকালের প্রবাসীর আক্ষেপ লুকাইয়া আছে :—

দিবসে মজুরী করে রজনীতে গিয়া ঘরে
নারী লয়ে যে থাকে সে সুখী।
নারী ছাড়ি ধন আশে যেই থাকে পরবাসে
তার বড় কেবা আছে দুখী।

ভবানন্দ মজুমদার দিল্লী হইতে সম্মানিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার দুই স্ত্রী বর্ত্তমান। আগে কাহার সহিত দেখা করিবেন ভাবিতেছেন। দুই স্ত্রীর দাসীরাও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন—আগে কাহার সহিত দেখা করেন। শুধু কবি মৃদুচিত্তে সত্য কথাটি বলিয়া গেলেন—

দুই নারী বিনা নাহি পতির আদর।

দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভবানন্দ মজুমদার কর্ত্তব্যের খাতির মাতার নিকট বসিয়া আছেন, কিন্তু তাঁহার মন পড়িয়া আছে দুই স্ত্রীর ঘরে। তাঁহার মা তাঁহাকে নিজ ঘরে যাইতে অনুমতি দিলেন। কবি মাতা ও সন্তান সম্বন্ধে উক্তি করিলেন—

মায়ের পোয়ের ভাব রহে নাকি ছাপা।

যে যুদ্ধে দুই সতীন—সেখানে অশান্তি লাগিয়াই আছে। তাহার উপর তাহাদের দাসী থাকিলে সে অশান্তি আরও অধিক হয়। তাই ভবানন্দ মজুমদারের দুই স্ত্রীর দাসীদের লক্ষ্য করিয়া কবি বলিয়াছেন—

দু সতিনী ঘরে, দাসী অনর্থের ঘর।

বহুবিবাহ প্রচলিত থাকায় তৎকালীন সমাজে অনেকেই দারান্তর গ্রহণ করিতেন। প্রায়ই দেখা যাইত যে, বেশীর ভাগ লোকেই নূতন স্ত্রীর প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করিতেন। ভবানন্দ মজুমদারের প্রথমা স্ত্রী সেজন্য তাঁহার সতীনকে উদ্দেশ করিয়া স্বামীর পক্ষপাতিত্বের প্রতি অনুযোগ করিয়া বলিয়াছেন—

মুয়া যদি নিব দেয় সেই হয় চিনি।
দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হয় তিনি।

বাঙ্গালার নূতন পরিস্থিতিতে জাতীয় জীবনের উন্নতির সহিত বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অধিকতর উন্নতি ঘটিবে। বাঙ্গালা সাহিত্যের বহু লুপ্ত রত্নের উদ্ধার হইয়া একাধিক বিদ্বৎপ্রায় কবির কাব্যও আবার সমাদর লাভ করিবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ভারতচন্দ্রের কাব্যেরও নূতন করিয়া আলোচনা সুরু হইবে এবং ভারতচন্দ্রের প্রবচনগুলি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

সঙ্গীত

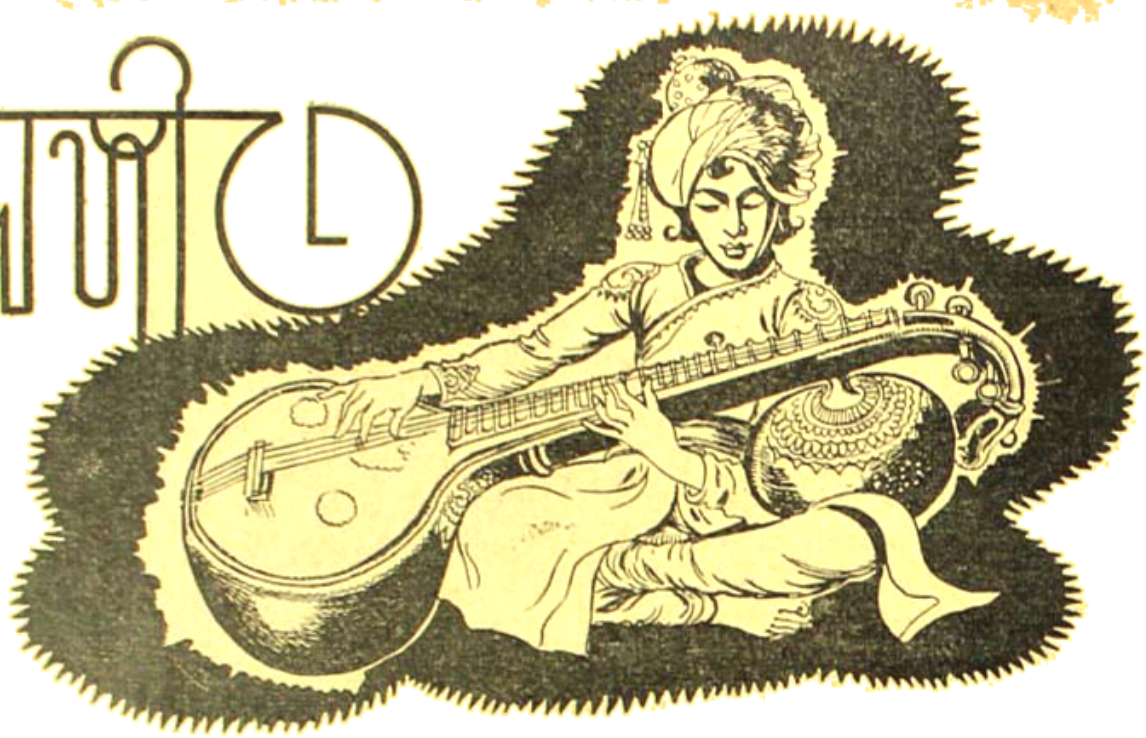

মালকৌশ—তেতালা

কে জানে তোমার মহিমা অপার, যুগে যুগে তুমি
কত যে দেখাও অসীম লীলা অন্ত নাহি তার।
জীবের জনম চলে মরণ নিশ্চয়, গোপেশ কহিছে কেহ হয় না কভু অমর
নীর সম বহিছে জীবন নিরন্তর মৃত্যুর পারাবার হতে নাহি নিস্তার॥

রচনা—সঙ্গীত-নায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
স্বরলিপি—গীত-সরস্বতী শ্রীমতী সুলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়

৹	১		২		৩		
মা জ্ঞা সা সা	ণ্া সা ণ্দা ণ্া	সা সা মা মা	মা -া -া মা				
কে জা — নে	তো মা র ৹	ম হি মা অ	পা র				
৹	১		২		৩		
ম্জ্ঞা ম্জ্ঞা -া মা	দা দা মা জ্ঞা	ম্জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা	মা দা মা দা				
যু গে যু গে তু মি ৹	ক ত যে দে	খা ৹ ৹ ও					
৹	১		২		৩		
ণা র্সা র্সা ণা	র্সা র্সা দা ণা	দা মা -া র্সা	র্সা র্সণা দা মা ‖				
অ সী ম লী ৹	লা অ ৹ ৹	ন্ত না হি	তার ৹ ৹				
৹	১		২		৩		
র্সা র্সা র্সা র্সা	ণা ণা দা মা	ম্জ্ঞা মা দা ণা	র্সা র্সা র্সা -া				
জী বে র জ	ন ম ম হ লে	ম্ র ণ নি ৹	চ য় -				

০　　১　　২　　৩
সা সা সা সা | সা সা পা পা | দপা সা পা সা | পা দা মা মা |
গো পে শ ক হি ছে কে হ হ• য় না ক ভূ অ ম র

০　　১　　২　　৩
প্‌া সা সা মা | মা মা মা মা | জ্ঞা মা দা পা | সা -া সা সা |
নী • র স ম ব হি ছে জী ব ন নি র - ন্ত র

০　　১　　২　　৩
দপা সর্জ্ঞা সা সা | পদা -া মা জ্ঞা | মা দা পা সা | পা দা মা -া ‖
মু• •• ক্ষ্য র পা রা বা র হ তে না হি নি স্তা র

তান ৪—

২　　৩
১। দ্‌পা সজ্ঞা মদা পপা | দমা জ্ঞসা জ্ঞসা প্‌সা ‖
আ• •• •• •• •• •• •• ••

২　　৩
২। পপা দপা পদা মজ্ঞা | মদা পপা দমা জ্ঞসা ‖
আ• •• •• •• •• •• •• ••

০　　১　　২　　৩
৩। দ্‌প্‌া সসা প্‌সা জ্ঞজ্ঞা | সজ্ঞা মমা জ্ঞমা দদা | মনা পপা দপা সর্সা | দপা সর্পা দমা জ্ঞসা ‖
আ• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

শিল্পী*

শ্রীসতীন্দ্রনাথ লাহা

শিল্পী, তোমার রূপের তুলিকা ডুবে থাকে রঙে রসে।
কত কী যে ছায়া রূপ লভিবারে তোমার হৃদয়ে পশে॥
তোমার চোখের গভীর চাহনি ধ্যান করে অবিরত
চোখের আড়ালে রয়েছে যাহারা যত।
তাইত রঙের মায়া—
স্বপ্ন মাখান ছায়ারে পরশি জাগায় অরূপ কায়া॥
হৃদয় তোমার ভরে আছে জানি পরাণ রাঙাণ রসে।
সৃষ্টিকা তব বার্ত্তা যে আনে সৃষ্টির হরষে॥
অন্তবিহীন নিরুদ্দেশের অসীম প্রান্ত পারে
সে যে নিয়ে যায় একান্ত একধারে।
সেখানে বসিয়া আঁকো—
স্পর্শ অতীত ভুবনেরে তুমি স্পর্শ মাঝারে রাখো॥

তোমারে বেড়িয়া শত শ্রদ্ধা অন্তর তলে জাগে
তুমি যেঁচে আছ আপনার অনুরাগে॥
তোমার জগৎ কল্পনালোক সেথায় নিভৃতে চুপে
সৃজিছ আপন ধেয়ানের ধনে রূপে।
নাহি সেথা বিষ বায়ু—
তাই মরে নাক তোমার শিল্প, কমেনা তোমার আয়ু॥
তোমার হাতের তুলিকা নাচনে মূক রেখা মুখরিত
রঙের মিলনে মর্ম্মরি ওঠে গীত।
রূপ গিয়ে মেশে ভাবের ভুবনে, ভাব গিয়ে মেশে সুরে—
সেই সুর থাকে ভিতর বাহির জুড়ে।
হে মোর চিত্রকর—
তাই ত তোমারে প্রণাম জানাই, ভরে ওঠে অন্তর॥

* অবনীন্দ্র-জয়ন্তীতে পঠিত

একসিডেণ্ট

শ্রীঅনন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

একসিডেণ্ট !—স্রেফ্ একসিডেণ্ট !!

একরাশ ছেঁড়া কাগজ—মলাট খোলা বই—প্যাকিং বাক্স—কতকগুলো মরা আরশুলা, ভাঙা কাঁচের গ্লাস—ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত এমনি বহু অবান্তর দ্রব্য সম্ভারের মাঝে মাথায় হাত দিয়ে বসে অপূর্ব্ব এই কথাই ভাবছিল। সেদিন কোথা থেকে যে তার মাথায় এক দুর্বুদ্ধি আশ্রয় করলে। —সাধারণের চলতি পথ ছেড়ে—প্রায় কারো না-চলা উঁচু-নিচু পথে বেড়াতে গিয়ে একটা বড় শিমুল গাছের তলায় ছোট ছাতাটার উপর ভর দিয়ে মিস্ মু-ট্রাকে দুরন্তময়ী ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সেও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। আশ্চর্য্য ডরওয়ার্ড মেয়ে মিস্ মু-ট্রা, সোজা সামনে এসে বলে—আপনিও দেখছি টায়ার্ড হ'য়ে পড়েছেন—what a nasty road; but how pleasant···

সব ইংরেজী উচ্চারণ—বাংলা শব্দগুলির উচ্চারণ ভঙ্গিও ইংরেজী ছাচে ঢালাই করা। অপরিচিত মেয়ের সপ্রতিভ ধারে-পড়া আলাপে থতমত খেয়ে যায় অপূর্ব্ব !

—এগিয়ে আসে মিস্ মু-ট্রা,—"চলুননা আরও একটু উপরে যাই—মিঃ···মিঃ···"

অপূর্ব্বকে আত্মপরিচয় দিতেই হয়, বলে—"আমার নাম অপূর্ব্ব ঘোষ।"

"Wait"—মিস্ মু-ট্রা থমকে দাঁড়ায়—তারপর টেনে' টেনে বলে "—অ-পূ-র্ব্ব গা-উ-ষ্ The name seems to be rather familiar to me—" ভ্রূ-কুঞ্চকে আরও একটু ভেবে বলে—"আচ্ছা মিঃ গাউষ, আপনিই কি কিছুদিন আগে একটা Weekly-তে Freaks of Nature বলে কতকগুলি সিরিজ ওফ্ আর্টিকেল লিখেছিলেন।"

লজ্জায় লাল হ'য়ে ওঠে অপূর্ব্ব। কোনরকমে ঘাড় নেড়ে জানায়—হ্যাঁ···

"ওঃ মিঃ গাউষ—They were simply charming —আমার কী অসীম সৌভাগ্য যে আপনার দেখা পেয়েছি। ড্যাডি আর আমি যে আপনার ঐ লেখাগুলির কত প্রশংসা কোরেছি—wonderful—simply wonderful ! আশ্চর্য্য —who ever thought that I would meet you··· চলুন ফেরা যাক, আপনাকে আমার সঙ্গে বাসায় যেতে হবে—ড্যাডি আপনাকে দেখলে কী খুশীই না হবেন।"

অপূর্ব্ব কোনরকমে আমতা আমতা কোরে বলে—"আজ থাক মিস্···"

"মু-ট্রা—আমার নাম লিলি মু-ট্রা" নামটা চট কোরে ধরিয়ে দেয় লিলি। অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলে—"না, না, আজ থাকবে কেন—আপনার কি কোন engagement আছে ?"

"এনগেজমেণ্ট। না ঠিক তা নয়···মানে···"

"না, না—তবে আপনার কোন আপত্তিই শুনবো না মিঃ গাউষ"—তাকে কথা শেষ কোরতে না দিয়েই লিলি স্বচ্ছন্দ আবদারের সুরে বলতে থাকে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও অপূর্ব্বকে ওর সাথী হতে হয়। পথের মাঝে লিলি তার হাতব্যাগ খুলে একটি মিনে-করা সাদার অফ্ পার্লের সিগারেট কেস বার কোরে ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে—"Please···"

অপূর্ব্ব চমকে উঠে একটু সরে গিয়ে বলে—"ধন্যবাদ"

"Don't you smoke মিঃ গাউষ !!"—কণ্ঠে একরাশ বিস্ময়।

অপূর্ব্ব আবার থতমত খায়—মনে হয় সিগারেট না খাওয়াটাই একটা মস্ত অপরাধ। ওরা ইতিমধ্যে পাকা রাস্তার ধারে এসে দাঁড়ায়। ঝকঝকে উর্দ্দিপরা সোফার এসে সেলাম কোরে একটী নীল মটরের দরজা খুলে দেয়।

তারপর অপূর্ব্বকে পাশে বসিয়ে লিলি নিজে ড্রাইভ কোরে যে সুন্দর বাগানওয়ালা বাড়ীর সামনে এসে থামে—সেই বাড়ীটার সামনে দিয়ে এমনি বহুবার বেড়াতে গেছে অপূর্ব্ব।

মাথায় হাত দিয়ে বসে অপূর্ব্ব এই ঘটনাটাকেই তার জীবনের মস্তবড় একটা একসিডেণ্ট ভাবছিল। কারণ—তার Freaks of Nature—বৃদ্ধ আর তার তরুণী কন্যাকে

এমনভাবে মুগ্ধ কোরেছে যে এই সাতদিনের মধ্যে তিনদিন চায়ের নিমন্ত্রণ কোরে মোটর পাঠিয়ে তাকে নিয়ে গেছে—আর গতকাল কী কুক্ষণে সেও হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় তাদের চায়ের নিমন্ত্রণ কোরেছে আজ—আর তার চেয়েও মারাত্মক সরলতা বৃদ্ধ সানন্দে এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ কোরেছে।

এত বিরাট—এতখানি গভীর সমস্যায় অপূর্ব্ব এর পূর্ব্বে আর কখন পড়েনি। দুটি ছোট ছোট ঘরের—ভাঙ্গা তেপায়া টেবিল, হাতলভাঙ্গা একখানা চেয়ার, একটা নড়বড়ে খাট—একগাদা বই—আর রাশীকৃত কাগজপত্র সমেত তার এই হাস্যকর অবস্থানের মাঝে কোন দুঃসাহসে মিঃ ও মিস্ মু-ট্রার মত কড়া বিলেতি ফ্যাসনের পরিবারকে নিমন্ত্রণ কোরলে কাল সন্ধ্যাবেলায়—আজ সকালে কিছুতেই সে কথাটা মনে কোরতে পারেনা। কিন্তু মনে কোরতে পারুক আর না পারুক—ঠিক বেলা চারটার সময় ঘন নীলরংএর অষ্টিনটা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াবে—ঝকঝকে উর্দ্দিপরা লোকটা আগে আগে নেমে দরজা খুলে দেবে—কন্যা লিলি চঞ্চল নৃত্যভঙ্গিতে নামবে নিজে—নামাবে বৃদ্ধ পিতার হাত ধরে। তার পরে অন্ধকারে সরু কাঠের সিঁড়িটা দিয়ে উঠতে উঠতে হয়ত বলবে—"What a horrible place Mr. Ghuse!" ··

আর ভাবতে পারেনা অপূর্ব্ব—বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে ওর কপালে।

ভোর থেকে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত চাকরটাকে সঙ্গে নিয়ে শার্শির কাঁচ মুছেছে—তেপায়া, ভাঙ্গা টেবিলটাকে কোনরকমে জোড়াতাড়া দিয়ে ঠিক কোরেছে, খাট বিছানা বইপত্তর সাধ্যমত একটা ঘরে পোরবার চেষ্টা কোরেছে। শ্রীশবাবু খানতিনেক চেয়ার আর যতীশবাবু একটা টেবিলক্লথ দেবেন বলেছেন—ফুলদানীর সাধ্যমত চেষ্টা কোরেও মনের মত একটাও না পেয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বে তার আশা ছেড়ে দিয়েছে। বেলা ১২টার সময় অপূর্ব্বর খেয়াল হ'ল উপলক্ষের দিকে নজর দিতে গিয়ে আদল লক্ষ্যই তার দৃষ্টি এড়িয়েছে—চায়ের কোন ব্যবস্থাই করা হয়নি। ঝুলমাখা হাতে পাঞ্জাবীটা গায়ে চড়িয়ে অপূর্ব্ব বেরিয়ে পড়ে।—"এক পাউণ্ডের একটা কেক্ আর এক ডজন স্যাণ্ডউইচ।"—"না মশাই বেলা ১২টার অর্ডার নিয়ে ৩৷৷০টায় ডেলিভারী দেওয়া অসম্ভব।"—কনফেকসনার অর্ডার নিতে নারাজ। অপূর্ব্ব সেখান থেকে পাগলের মত দৌড়োয় কপালের ঘাম মুহুর্ত্ত মুহুর্তে।

"সন্দেশ রসোগোল্লা তৈরী আছে মশাই—তবে একেবারে টাটকা হবেনা তা আপনাকে আগেই বলে রাখছি—ছোট টাউন কজনই বা খদ্দের। আর নিমকি সিঙ্গাড়া সকালের—শুধু গরম কোরে দিতে পারি।"

নিরুপায় অপূর্ব্ব তারই কিছু তৈরী রাখতে বলে বাসায় ফিরে আসে। বারটা পঁয়তাল্লিস্! ফিরে এসে ছোট ঘড়িটার দিকে চেয়ে অপূর্ব্ব শিউরে ওঠে—ঘড়িটার আজ হ'ল কী? এইমাত্র ১২টা মেপে বেরিয়েছে অপূর্ব্ব—আর এর মধ্যে ৪৫ মিনিট কি কোরে হয় অপূর্ব্ব বুঝতে পারেনা।

"হ'রি—হরে—" চিৎকার করে অপূর্ব্ব।

কিন্তু কারো সাড়া পাওয়া যায়না। চাকরটা কি পালাল নাকি! অপূর্ব্বর চিন্তা শক্তি আচ্ছন্ন হয়ে আসে—ও মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। কিছুক্ষণ পরে কাঠের সিঁড়িটার উপর হরিহরের পায়ের শব্দ পেয়ে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত অকারণে গর্জ্জে ওঠে অপূর্ব্ব।

"কোথায় গিয়েছিলি হতভাগা?—আমার এই বিপদ—আর তুমি ফুর্ত্তি কোরে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছ, শুয়ারকি···"

হরিহর বলে—"যোতীশবাবুর বাসা থেকে টেবিলক্লথ আনতে গিয়েছিলুম, গিন্নী বল্লেন, কি ব্যাপার রে হরিহর—আজ কি···"

বাধা দিয়ে অপূর্ব্ব খেঁকিয়ে ওঠে—"থাক খুব হ'য়েছে—আর গাজীর পট আওড়াতে হবে না।—চেয়ার এনেছিস?"

"চেয়ার?"—হরিহর কথাটাকে একটু টেনে বলে।

"চেয়ার—চেয়ার—কুরসী। শুয়ার, বেলা দুটোর সময় তোমার এখনও খেয়াল হ'লনা! যত সব নরাধমের পাল্লায় পড়েছি।"

টেবিলক্লথ রেখে হরিহর দৌড়োয়।

কিন্তু ঘড়িটা! এরই মধ্যে একটা পঁচিশ। না নিশ্চয়ই বিগড়েছে—কাণের কাছে এনে শোনে তেমনি টিক্‌টিক্ কোরছে—দুবার ঝাঁকানি দিয়ে থামিয়ে দেবার চেষ্টা করে

অপূর্ব্ব, কিন্তু থামে না। হরিহর আসে কৈ? অপূর্ব্ব একবার ঘর একবার বার করে। কিছুক্ষণ পরে দু'বগলে দুখানা চেয়ার নিয়ে হরিহরকে আসতে দেখা যায়। সিঁড়ির কাছে গিয়ে অপূর্ব্ব বলে—"ঐ দুটো ওখানে রেখে তুই ছুটে যা—আর একখানা আন।"

"আর ত মিলবি না বাবু।"

"মিলবেনা কী রে? শ্রীশবাবু আমায় নিজে বলেছেন···" রাগে আর ক্ষোভে কাঁপতে থাকে অপূর্ব্ব।

"হিঁ—কিন্তু বাবুর দক্ষি ছেলেটা আজ সকালেই তার একটা পায়া ভেঙেছে।"

"উঃ"—অপূর্ব্বর মনে হয় তার নিজের পাখানা ভাঙলে এর চেয়ে অনেক ভাল হত।

"উপায়?"—হতাশার সুরে বলে অপূর্ব্ব।

"আমি দেখছি বাবু" বলে হরিহর তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়।

পাশ্ব আড়াইটার সময় হরিহর আর একখানা চেয়ার ঘাড়ে কোরে ফেরে। এই সময়টুকুর মধ্যে অপূর্ব্ব কিছু করেনি—কিছু ভাবেওনি বোধ হয়। দুটো হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসেছিল। হরিহরের পায়ের শব্দে মাথা তুলতে—সে মনিবের চেহারা দেখে বিস্মিত হ'য়ে যায়। এরই মধ্যে অপূর্ব্বর চোখদুটো কোটরে ঢুকেছে—চুলগুলো উস্কোখুস্কো—সমস্ত মুখখানা বিবর্ণ।

হরিহর হঠাৎ সক্রিয় হ'য়ে ওঠে, চেয়ার রেখে বলে—"কি হ'য়েছে বাবু আপনি উঠুন ত—চলুন আমি সব ঠিক কোরে দিচ্ছি।"

"আর হ'ল না হরি···" একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অপূর্ব্ব বলে। মনে হ'ল, ঠিক পাশের ঘরে তার সব চেয়ে পরমাত্মীয়ের কঠিন রোগে জীবনের শেষ আশ্বাসটুকু হারিয়ে কথাগুলি বললে।

তবু তাকে উঠতে হয়—টেবিলের উপর টেবিলক্লথ বিছিয়ে তিনদিকে চেয়ার সাজিয়ে অপূর্ব্ব ভ্রূকুঞ্চকে একবার ভাবে—টি-পট, কাপ, প্লেট, চামচ এগুলো!! এগুলোর কোন ব্যবস্থা তো হয়নি। কাপ গোটা তিনেক হয়ত মোড়ের মাথায় চায়ের দোকান থেকে চাইলে দেবে—কিন্তু টি-সেট কে তাকে দেবে? সেওতো এখানে প্রায় নতুন আগন্তুক—কদিনের জন্য হাওয়া বদলাতে এসেছে। সেই বা কাকে চেনে, আর তাকেই বা চেনে কে? জিওলজিষ্ট বলে যতই তার সুনাম থাক না কেন—তার Freaks of Nature ওরা কেউই পড়েনি···

"উঃ—মা—"

হরিহর বলে—"কী হল বাবু"

"অসম্ভব হরি—অসম্ভব!! আমায় সুইসাইড কোরতে হবে—কিছুতেই হবে না"—ব্যাপারটা সংক্ষেপে জেনে তবু হরিহর বেরিয়ে যায়।

অপূর্ব্বর চিন্তা দ্রুত কোরে এগিয়ে চলে—বেশ—যেন ওগুলো পাওয়াই গেল, কিন্তু সার্ভ কোরবে কে? হরিহর! যার গায়ের গন্ধে এতদিন অভ্যস্ত হয়েও অপূর্ব্বর বমি আসে। ময়লা শতচ্ছিন্ন একটা গেঞ্জি আর জানু পর্য্যন্ত একখানা ধুতি সমেত হরিহরের চেহারাখানা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। নাঃ—অসম্ভব!! কি কোরবে অপূর্ব্ব—সুইসাইড। একবার ফ্যাল ফ্যাল কোরে চেয়ে দেখে ঘরটার চারদিকে—নিজের উপর অসহ্য আক্রোশে তার চোখ দুটো জ্বালা কোরতে থাকে।—কি দরকার ছিল ওই মেকী সাহেব মেমদের সঙ্গে তার অত বেশী মেলামেশা করবার। তার ত প্রথম দিন থেকেই ওদের একটুও ভাল লাগেনি। মেয়েটা গায়ে-পড়া স্মার্ট—অথচ না আছে রূপ—না আছে শরীরের কোন, মানে একটু লালিত্য। কাল মুখখানাকে পাউডার—আরও কি কি যেন মেখে একেবারে পাণ্ডটে কোরে তুলেছে। আর সবচেয়ে বিশ্রী কথাগুলো—ইংরেজীর মাঝে ইংরেজী সুরে বাংলার টাক্না দিয়ে কথা—ইমিটেশন, ফল্স, মেমসাহেব!! মুট্টা-গাউস, যত সব ননসেন্স! রাগে অপূর্ব্ব হাত দুটো মুঠো কোরে পায়চারী করে—কপালের দুপাশের শিরদুটো ফুলে উঠে দপদপ কোরতে থাকে।

হরিহর অনেকক্ষণ পরে ফিরে আসে—অপূর্ব্ব সে দিকে চেয়েও দেখেনা। তেমনি পাইচারী কোরতে থাকে। এবার আর Illustrated weeklyতে Freaks of Nature নয়—এবার Fancies of a sham European Grill। মনে মনে একটা প্লট ঠিক কোরতে থাকে—হুঁ—গ্রাণ্ড!! If I could take a snap of that monkey।

হরিহর ভয়ে ভয়ে বলে—তিনটে কাপ আর একটা

কেটলি পেলাম বাবু কিন্তু ঐ যে কি বলছিলেন চা ভিজাবার বাটি—তা কোথাও মিলল না।—"ফেলে দে হরে, দূর কোরে দে—" অপূর্ব্ব গর্জ্জন কোরে ওঠে।

অকস্মাৎ নিজেই একটান দিয়ে টেবিল ক্লথটা এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে দেয়—সামনের চেয়ারটাকে সজোরে পদাঘাত করে, সেটা ছিটকে গিয়ে এক কোণে পড়ে।

চারটে বাজতে কুড়ি! অর্থাৎ ঠিক কুড়ি মিনিট পরে গাঢ় নীল র'এর ছোট অষ্টিনটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াবে—সকলকে উর্দ্দিপরা শোফার নেমে সেলাম কোরে দরজা খুলে দেবে—ঐ লালিত্যহীন ছাইরংএর ঠোঁটে লিপস্টিক মাখা মেয়েটা নামবে—হাতদুটো যে পর্য্যন্ত ঘসে ঘসে ছাইরং কোরেছে—তার উপরে একটু অসতর্ক মুহূর্ত্তে জামার হাতাটা উঠলেই ভিতরের কদর্য্য রং আত্মপ্রকাশ কোরবে। পরণে থাকবে হয়ত গাউন—আজ শাড়ী থাকতেও পারে—হাতে থাকবে ভ্যানিটী ব্যাগ—হ্যাঁ ভ্যানিটিই বটে! গাড়ী থেকে নেমে সিঁড়ি পর্য্যন্ত যা কিছু দেখবে—তাতেই বাপ আর মেয়েতে মিলে গ্রাণ্ড, ডিলাইটফুল, চার্মিং প্রভৃতি বিলেতি বিশেষণের ছড়াছড়ি কোরবে, তারপর হয়ত ঐ পালিশ করা ঠোঁট দুটোর পাশে ঘৃণা ফুটে উঠবে—বলবে—Horrible!···অপূর্ব্বর আর ভাবা হয় না। সারা গা তার ঝিমঝিম করিতে থাকে। কি করা যায়? নড়বড়ে বেয়ারের খাটটায় শুয়ে পড়বে নাকি লেপ গায়ে দিয়ে? হরিহর চেপে ধরুক—কিংবা মাথায় হুড় হুড় কোরে জল ঢালতে থাকুক! ম্যালেরিয়া—ম্যালিগন্যাণ্ট টাইপ। কিন্তু ঐ বিলেতি ভাইপার এগিয়ে আসবে টেবিলের উপর হাতের ব্যাগটা রেখে,—মুখে একমুখ ছদ্ম উৎকণ্ঠা টেনে। তারপর কপালে হাত দিলেই বুঝতে পারবে। অপূর্ব্বর মনে পড়ে ছোটবেলায় সে যেন শুনেছিল শরীরের কোথায় কয়ুন রাখলে উত্তাপ বাড়ে। কিন্তু তাও যেন হ'ল—তারপর মোটর ছুটিয়ে ডাক্তার ডেকে এনে হয়ত একটা কাণ্ডই বাঁধিয়ে বসবে। তখন সব ধরা পড়ে যাবে। তাছাড়া ঐ খাট আর বিছানাগুলো—অসম্ভব, ওদের সামনে তা কোনমতেই বার করা চলে না—কিছুতেই না। তার চেয়ে বরং সিঁড়ির উপর থেকে তর্জ্জনী তুলে সোজা "গেট আউট" বলা ঢের সহজ। তাই বলবে নাকি অপূর্ব্ব। ও মরিয়া হ'য়ে ওঠে একবার—পরক্ষণেই ভেঙ্গে পড়ে—দূর! তাই কখন সম্ভব—সে ত আর সত্যিই পাগল হ'য়ে যায়নি।

চারটে বাজতে দশ মিনিট।—ওঃ কী করা যায়। হঠাৎ বিদ্যুৎপৃষ্ঠের মত সে চমকে ওঠে—হাঁ ঠিক হয়েছে—রাইটলি সার্ভড—ওরা আজীবন সকলকে ওদের মেকীপনা দিয়ে ঠকিয়ে এসেছে—আর আমি—আমি না হয় একদিন ঠকালুমই। আর চা?—চা না খেলে কেউ মরে যায় না, আর মরলেও ওদের মত লোকগুলোর মরাই ভাল—হাঁ ঠিক হয়েছে। যাও—ফিরে গিয়ে নিজের বাড়ীতে চা খাওগে—আর বাপবেটীতে মিলে—গ্রাণ্ড ডিলাইটফুল করোগে। সহসা ঘড়ির দিকে চেয়ে অপূর্ব্ব দেখে চারটে বাজতে পাঁচ। তাড়াতাড়ি একটা কাগজ টেনে নিয়ে খসখস কোরে কী কতকগুলো লিখতে থাকে—হাতটা থরথর কোরে কাঁপে। চিঠিখানা একটা খামে এঁটে হরিহরের হাতে দিয়ে বলে—"সাহেব আর মেমসাহেব এলে এই চিঠিখানা তাঁদের হাতে দিয়ে বলবি একটা জরুরী তার পেয়ে বাবুকে·····"

কথা শেষ হয়না—দোরের গোড়ায় মোটরের হর্ণ বেজে ওঠে। অপূর্ব্ব কাঁপতে কাঁপতে চেয়ারের হাতল ধরে বসে পড়ে। তার মনে হয় এক্ষুণি সে অজ্ঞান হ'য়ে যাবে। অনড় অশক্ত দেহখানার উপর মাথাটা সামনের দিকে কুঁকে পড়ে। সিঁড়ির উপর পায়ের শব্দ শোনা যায়। প্রত্যেকটা শব্দ তার বুকের উপর হাতুড়ি পিটতে থাকে। সিঁড়ির মুখে উর্দ্দিপরা শোফারের ভারী গলার আওয়াজ ভেসে আসে—"সাহাব! চিঠ্ঠি"

এবার অপূর্ব্ব ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মত সোজা হয়ে দাঁড়ায়—"চিঠ্ঠি!!"

কাঁপতে কাঁপতে বাইরে এসে বারাণ্ডার রেলিং ধরে দাঁড়ায়—জড়িয়ে জড়িয়ে বলে—"সাহাব—মেমসাহাব!!"

শোফার সেলাম কোরে বলে—"একসিডেণ্ট সাব্—বহুত আফশোষকি বাত—বুড্ডা সাব আনেকো বখৎ সিড়িমে গির পড়া—আউর উনকে ঘটনামে বহুত চোট আয়ি" কম্পিত হাতে চিঠিখানা নিয়ে সামনে মেলে ধরে অপূর্ব্ব। কিন্তু একবর্ণও বুঝতে পারেনা। বৃদ্ধের এই আকস্মিক দুর্ঘটনার সংবাদে যে অপরিসীম তৃপ্তির জোয়ারে তার দেহমন কানায় কানায় ভরে ওঠে—তাকে কিছুতেই যেন সামলাতে পারেনা। সেইখানেই চুপ কোরে বসে পড়ে। চাপবার সাধ্যমত চেষ্টা কোরেও পারেনা। চোখের জল ঝর ঝর কোরে ঝ'রে পড়ে। শোফার হাঁ কোরে কিছুক্ষণ সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে থাকে—তারপর সেলাম কোরে নেমে যায়।

নন্দীর পুকুর

যমদত্ত লিখিত

কলিকাতা চিৎপুর রোড হইতে বাহির হইয়া বাগবাজারের খাল পার হইয়া বর্ত্তমানের কাশীপুর রোডের আরম্ভ ; কাশীপুর রোড যেখানে শেষ হইয়াছে, অর্থাৎ বরাহনগরের ডেমোরার কালিতলা হইতে গোপাললাল ঠাকুর রোডের আরম্ভ (পাথুরিয়াঘাটার স্বর্গীয় গোপাললাল ঠাকুরের বাগানবাড়ী এই রোডের উপর একশত বৎসর আগে অবস্থিত ছিল—তিনি গঙ্গার বাগানে আসিবার সুবিধার জন্য এই সড়কটী সর্ব্ব প্রথমে পাকা বাঁধাইয়া দেন) ; গোপাললাল ঠাকুর রোড বড় রাস্তার (বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডকে ইহার জন্ম হইতেই 'বড় রাস্তা' বলে ; আমরা এই জন্য ইহাকে ইহার প্রকৃত সরকারী নাম জানা সত্ত্বেও 'বড় রাস্তা' বলিলাম) শেষ হইয়াছে। বড় রাস্তা পার হইয়া টেরচা ভাবে পূর্ব্বদিকে কৈতের খালের (যে কৈতের খালের পাড়ে বসিয়া মদনমোহন তর্কালঙ্কার বরিয়াছিলেন ; যে কৈতের খালের পাড়ে বসিয়া মদনমোহন তর্কালঙ্কার ৺৺৺ ৺৺৺ করকার রামদুলাল সরকার—যিনি মৃত্যুকালে ১ কোটী ২৩ লক্ষ টাকা রাখিয়া যান—তাঁহার সঙ্গী ব্রাহ্মণ বিষ্ণুপুরের বৈকুণ্ঠ চেড়ুকে কলার পাতায় চামাক খাওয়া পোড়া টিকে দিয়া 'আমি যদি লেখাপড়া হই তবে তোমাকে বা তোমার ছেলেদের এক হাজার টাকা দিব' বলিয়া লিখিয়া দিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যত ধনী হইলে এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিলেন) কিছু উত্তর হইতে আরম্ভ করিয়া বর্দ্ধমানের বেলেঘাটা পুলিশ আউট-পোষ্ট বা কাঁড়ির (পূর্ব্বেকার বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্কের পত্নির পত্নির বারাকপুরের লাট-বাগানে চৌ-বুড়ি করিয়া লইবার পাল্কীর ঘোড়া বদল করিবার আড়পড়া বা আস্তাবলের) পূর্ব্বদিক ঘেঁষিয়া বর্দ্ধমানের আধাপাকা বারাকপুর 'রাধাল' রোডের (এখন নাকি যেখের নব 'রাধাল' বোর্ড উঠিয়া গিয়াছে) নীলগঞ্জ রোড গিয়াছে। এই রাস্তা নবাবী আমলের বড় পুরাতন রাস্তা। কেহ কেহ এই রাস্তাকেই গৌড় বঙ্গের বাণিজ্যিক সড়ক বলেন—আবার কেহ কেহ ইহাকে গৌড় বঙ্গের বাণিজ্যিক সড়কের একটী শাখা বলেন। যে যাহাই হউক না কেন, এই রাস্তা দিয়াই বাঙ্গালার সুবেদার রাজা মানসিংহ লোক-লস্কর লইয়া বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন মহারাজা প্রতাপাদিত্যের জগদ্দলের ও কাউগাছির দুর্গ জয় করেন ও কালিঘাট পার হইয়া ডুমঘাট আক্রমণ করিতে যান। (প্রবাদ দাদুর মুখে শুনা লোক-প্রবাদ—আপনাদের বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় করুন ; ইচ্ছা না হয় করিবেন না ; আমি কিন্তু বিশ্বাস করি)। আর রাজা মানসিংহকে পথ দেখাইয়া লইয়া যান ওখানকার জমিদার ও বিদ্যাধর সরকার। এই পথ দিয়াই নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা স সৈন্যে বাংলা সন ১১৬৩ সালে কলিকাতা আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়েন।

সোদপুর রেল ষ্টেশনের অনতিদূরে রামভদ্রবাটী গ্রাম। এই গ্রামে নবাবী ছাউনী পড়ে—নবাবী ও নবাবী সৈন্যদের অত্যাচারে গ্রামের গৃহস্থগণ উৎসন্ন যাইতে বসিল ; তিন দিনে গ্রাম শ্মশানে পরিণত হইল। রামচন্দ্র ভদ্র বা রামদুলাল ভদ্র (ঠিক নাম জানি না) বলিয়া এক ধনিক রাঢ়ী কায়স্থ বনী এই গ্রামের পত্তন করিয়া সর্ব্বপ্রথম পাকা বাটী করেন বলিয়া এই গ্রামের নাম রামভদ্রবাটী। নবাব যখন এই গ্রামে ছাউনী করেন তখন জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষাশেষী বা আষাঢ়ের প্রথম। প্রচণ্ড গ্রীষ্ম—ঝাঁটাল পাকানো গুমোট ; জলের নামে গন্ধ নাই ; তাহার উপর নবাব রমজানের রোজা করিয়াছেন ; রোজা খুলিবার কালে হঠাৎ নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার খুব কচি কচি জলভরা সাদা তাল শাঁস খাইবার ইচ্ছা হইল। খোয়ালী নবাবের খেয়াল—চারিদিকে লোক লস্কর দৌড়াইল ; গ্রামে গ্রামে সাড়া পড়িয়া গেল যে নবাব খুব কচি সাদা তালশাঁস খাইবেন। পানিহাটীর দরবেশ গাজীর (এই দরবেশ গাজীকে মহীউদ্দীন মৈজুদ্দীন আলমুস্থির পাদশাহ গাজী তাঁহার দৌড়াণী ও পাণ্ডিত্যের জন্য পানিহাটী গ্রামে কাজীপাড়ার বাসস্থান ও দশ-কাজাই অর্থাৎ দশটী কাজির এলাকা ও বিচার করিবার ক্ষমতা এক্তে দিয়াছিলেন) প্রপৌত্র কাজী নসরৎ উল্লার (?) (আমার নামটি ঠিক স্মরণ হইতেছে না) তলব পড়িল। তিনি খুব কচি সাদা তাল শাঁসের সন্ধান দিতে পারিলেন না—তাঁহার সব কাজই নবাব কাড়িয়া লইলেন। কাজি মহম্মদ আশ্‌রাফ্ ইহাদের বংশধর। বেঙ্গল কেমিক্যালের পানিহাটীর কারখানার জমীর Land acquisitionএর ফলে পানিহাটীতে একটী কাজিও নাই—কাজীপাড়াও নাই—সবই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

খবর নন্দী বুড়ির কানে গেল। নন্দী বুড়ি হইতেছে নীলকণ্ঠ নন্দীর মা। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন নীলকণ্ঠ নন্দীর বয়স ১৬।১৭। গায়ে খুব জোর। নন্দী বুড়ি খুব ভোরকো করিয়া ভোরের আলো হইতে না হইতে ছেলেকে যো-কলা তাল গাছের উপর তুলিয়া দিল এবং কোমরের গামছায় তাল কাটিয়া লুকাইয়া ফেলিতে লাগিল। নন্দী বুড়ি সারাদিন সেই তাল পুকুরের পাঁকের ভিতর পুঁতিয়া তাল ঠাণ্ডা করিল। সূর্য্য পড় পড় হইতে সেই তাল কাটিয়া তাল শাঁস বাহির করিয়া কলা পাতায় ঢোবায় করিয়া নবাবের কাছে লইয়া গেল। নবাব এই রকম কচি সাদা তাল শাঁস খাইয়া খুব খুসী—নন্দী বুড়িকে বখশিস করিলেন ১০ আসরফী।

এই যো-কলা তাল গাছের বাগান আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি। সোদপুরের "কমলার ধনির" মালিক অর্থাৎ নিকটস্থ সাত গাঁয়ের কমলার একচেটিয়া ব্যবসায়ের কৈলাসচন্দ্র সরকার ও সাতকড়ি ঘোষক এই তাল বাগান কাটিয়া বিক্রয় করিয়া দেন। যো-কলা তাল গাছ তখন সোনার

বুড়ো হইয়াছে ; ফল দেয় না, তালের গুঁড়ি পাকিয়া কাল হইয়াছে ; গাছও মাত্রা ছাড়াইয়া উঁচু হইয়াছে। এই রকম তালের গুঁড়ির নাকি দাম খুব বেশী। তক্ষকদারের হাতে পড়িয়া কুড়ুলের ঘায়ে এই তাল বাগান মাঠে পরিণত হইল। এখনও ঐ অঞ্চলে ২।৩টি বো-কলা তাল গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। আষাঢ় মাসেও কচি তাল শাঁস খাওয়া যায়। উপস্থিত ১৩।১৪ বৎসরের খবর বলিতে পারি না। কারণ আমরা দেশ-ছাড়া।

নবাবের প্রদত্ত আম্রকী কয়টিই হইল নন্দী বুড়ির লক্ষ্মীর কাঁপি। নীলকণ্ঠ নন্দী এই আম্রকী কয়টি সম্বল করিয়া ব্যবসা ফাঁদিল ও প্রচুর ধনোপার্জ্জন করিয়া বড় মানুষ হইল। নন্দী বুড়ি তখন "বুড়ী বুড়ুবুড়ী" ; মা দিত্য গঙ্গা স্নান করিবেন বলিয়া নিকটস্থ গঙ্গা তীরবর্ত্তী গ্রামে (এই গ্রাম থানা এঁড়িয়াদহের অন্তর্গত, রেভিনিউ সার্ভের ৩২নং গ্রামে) বাগান ও বাটী করিল। মাকে দিয়া পুষরিণী ও তুলসী মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করাইল। এখনও "নীলু" নন্দীর মায়ের প্রতিষ্ঠিত পুকুর "নন্দীর পুকুর" নামে খ্যাত। বিগত মন্বন্তর পর্য্যন্ত নন্দী প্রতিষ্ঠিত তুলসী মঞ্চ, তুলসী গাছ না থাকিলেও দাঁড়াইয়াছিল। নন্দী বাগানের বর্ত্তমান মালিকেরা সাহেবী ভাবাপন্ন বলিয়া ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন।

নন্দী-বুড়ী ১১০ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে তীরস্থ হইয়া জাহ্নবীজলে শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্রে মতা হইলে তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গে গিয়াছেন। নীলু নন্দীও বহুকাল হইল গত হইয়াছে। কালক্রমে নীলু নন্দীর বংশে এক নিলমণি নন্দী—আর এক "নীলু নন্দী" নন্দীর বাগান, বাড়ী ও পুকুরের মালিক হয়েন। নিলমণি নন্দী বড় বাবু ; 'বাবু' হইলে যে সব দোষ বা গুণ হয় নিলমণির তাহা সবই ছিল। শুনিয়াছি সোমপুরের ঈশ্বর শুঁড়ির পিতার নিকট প্রীর মূল্যের নথ বাঁধা দিয়া ধান্যেশ্বরীর সেবা করিয়াছিলেন। এই ঈশ্বর শুঁড়ি গঙ্গার তীরে একটী বাঁধা ঘাট ও চাঁদনী করিয়া দেয়—আজিও তাহা বর্ত্তমান। নিলমণি নন্দী ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া ধান্যেশ্বরীর কৃপায় হিতাহিত বোধশূন্য হইয়া এক ব্রাহ্মণ কন্যার সর্ব্বনাশ সাধন করে—ফলে ব্রাহ্মণকন্যা নন্দীর পুকুরে ডুবিয়া আত্মহত্যা করেন ও সাঁপ দেন যে নীলু নন্দীর 'ভিটামাটি চাটি' হইবে এবং নন্দীর পুকুর ও বাগান কাহারও ভোগে হইবে না।

আশ্চর্য্যের বিষয় জলে ডুবার বৎসরেই 'নীলু' নন্দীর ভিটায় ঘাঘু পড়ে ; পর বৎসর ভূমিকম্পে—সামান্য ভূমিকম্প, পাড়ার অন্য বাড়ীর কিছু হইল না—"নীলুর" বাড়ীর নাটঘর পড়িয়া গেল ; তার পর বড় নারিকেল গাছ পড়িয়া নন্দীর ঘরের ছাদ ভাঙ্গিয়া গেল। ব্রাহ্মণ কন্যার মৃত্যুর তারিখ জানিনা ; তবে বয়নামা দৃষ্টে জানিতে পারা যায় যে "নীলু" নন্দীর বিষয় আশয় সব ইংরাজী ১৮৬৮ সালের মধ্যে নীলাম হইয়া যায়। ৪৫৲ টাকা মূল্যে নন্দীর পুকুর ও ২২ বিঘা বাগান মধু মালা কিনেন। কিনিবার অল্পদিনের মধ্যে মধু মালার এক ছেলে—সে মারা যায়। শোকে মধু মালা তাঁহার ।ভটা (যেখানে বিখ্যাত পাখোয়াজ বাজিয়ে কলিকাতার "মিরজা" শিবচন্দ্র ঘোষের পৌত্র ক্ষেত্র-মোহন ঘোষ বাস করিতেন) এবং নন্দীর পুকুর ও বাগান বিক্রয় করিয়া কাশীবাসী হয়েন। বাগান ও পুকুর কেবল চুঁচড়ার (চুঁচুড়া বলিলে বাঙ্গালরা বুঝিবেন না, ইহা E I Railএর Chinsurah—স্বাধীনতা পাইবার পর Cawnpur—Kanpur হইয়াছে ; Benares—Banaras হইয়াছে ; কিন্তু পোড়া বঙ্গদেশে বর্দ্ধমান এখনও Burdwan ! মেদিনীপুর এখনও Midnapore ! চন্দননগর এখনও Chander-nagore ; আর পূর্ব্ব বঙ্গের বাঙ্গালরা বলিতেছে বড়ওয়ানের মিহিদানা ; মিডনাপোরের কেওট ; চাঁদেরনগরের গণ-ভোট হইয়াছে) মল্লিকরা কিনেন। যে বছরে মল্লিকরা দখল লয়েন সেই বৎসরই মল্লিকদের বড় ভাই মারা যায়েন ও অতি শীঘ্রই উহাদের মধ্যে সরিকানি বিবাদ পাকিয়া উঠে। পরে তাঁহারা নন্দীর পুকুর ও বাগান গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম বাবুকে বিক্রয় করেন। গঙ্গানারায়ণবাবুর তখন খুব বোলবোলা ; নূতন পাঁচ কোকরের ঠাকুর দালানে ঘটা করিয়া দুর্গাপূজা করিতেন ; ১০৮ পাঁঠা বলি হইত ; অষ্টমীর দিনে মেষ ও মহিষ বলি হইত—সে যে সে মহিষ নহে, শিংওয়ালা সাদা মহিষ। ৩২টী ঢাক্ বাজিত—নারিকেলবেড়িয়ার ঢাকীরা ঢাকের অনেক রকমের বোল বাহির করিতে জানে ও তাহা বাহির করিত। মহিষ বলির সময় বাজাইত :—

ষোল ব্যাটা ; বড় ঢ্যাঁটা
মাথায় ঝুটো সিং ;
উঁচিয়ে ল্যাজ, নাড়ছে সিং ;
নড়ছে ব্যাটা তিড়িঙ্ তিড়িঙ্ ;
হাড়কাটেতে ফেলে মাথা
ছ্যাড্যাং, ড্যাড্যাং, ড্যাং
মায়ের কৃপায় হইল বধ
ছ্যাড্যাং, ড্যাড্যাং, ড্যাং
পাব্‌না মাহের ঝুটো ঠ্যাং
পাব্‌না মাহের ঝুটো ঠ্যাং
ছ্যাড্যাং, ছ্যাড্যাং, ড্যাং।

আরও কত রকমের বোল বাজাইত তাহা কে শুনিয়া মনে রাখিয়াছে ? মেজ গিন্নি—আমাদের পাড়ার মেজগিন্নি—আমাদের ছেলে-মেঠাইবার মুখে যাহা শুনিয়াছি ও তাহার যেটুকু মনে আছে তাহাই ওপরে লিখিলাম।

নন্দীর পুকুর ও বাগান খরিদের দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মারা যায়েন ও তাঁহার সৌভাগ্যে ভাঁটা ধরে। পূজার ধুমধাম ক্রমশঃ কমিতে থাকে ; মৃত্যুকালে তিনি প্রত্যেক পুত্রকে ১০,০০০৲ টাকা করিয়া দিয়া যায়েন। ব্যবসাদি করিতে তাঁহারা এই টাকা লোকসান করিয়া ফেলেন। চাকুরী না করিলে তাঁহাদের দিন চলিত না। কিছুদিন বাদে তাঁহারা এই নন্দীর পুকুর ও বাগান ঐ গ্রামের "তামুবাবু"কে বিক্রয় করেন। তামুবাবুর যতন দানশীল, ক্রিয়াবান, সদাশয় পুরুষ কদাচিৎ দেখা যায়। তিনি স্নানের পাকা সান বাঁধান ঘাট, চাঁদনী, পঞ্চরত্ন কালীমন্দির, শিবমন্দির, বাঁধান

গঙ্গাবাসীর ঘর ও শ্মশান ঘাট, ফুলবাড়ী ইত্যাদি করিয়া বিক্রয় করেন। সিরিশ ভট্টাচার্য্য তাহাদিগকে বলা করিয়া বলিতেন যে আমাদের গ্রামের কি সুখ; টাকা যার চাহিলেই পাওয়া যায়—শোধ দিতে হয় না। তাহারা কখনও কাহারও নামে মকদ্দমার নালিশ করেন নাই —তাহারা হারিলে খত ফেরৎ দিতেন। কখনও নীলামে কাহারও ভিটা বিক্রি করেন নাই। যে বৎসর তাহারা নন্দীর পুকুর ও বাগান খরিদ করেন সে বৎসর তাঁহার কারবারের আয় তখনকার হিসেবে ৪০,০০০৲ চল্লিশ হাজার টাকা। এছাড়া তাঁহার সম্পত্তির আয়ও ছিল। বহর ঘুরিতে না ঘুরিতে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর কৈলাসবাবু মারা গেলেন। তাহার পর বৎসর কারবারের একটা বৃহৎ অংশ অন্য লোকের হাতে চলিয়া গেল। এই সময়েই তাঁহার একমাত্র জামাতার কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া পেন্সন লইয়া স্বগৃহে আসিলেন। ইহার কিছুদিনের মধ্যে তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হয়। এই সময় কারবারে মনোযোগ না দেওয়ায় তাঁহার দেনা হইতে সুরু হয় এবং তিনি তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগের ৩ বৎসরের মধ্যে মারা যান। নন্দীর পুকুর ও বাগান খরিদের তারিখ হইতে তাহাদের দুর্দ্দশা কারবার মাত্র দশ বৎসরের।

তাঁহার বংশধরেরা ক্রমশঃই হীনবল ও গরীব হইতে থাকেন। আজ এ তাঁহাকে বিক্রয় করিলেন, কাল গুরুতরভাবে লাট বিক্রয় হইয়া গেল; পরশ্ব কলিকাতার বাড়ী বিক্রয় করিতে হইল। এই রকম করিয়া কিছু দিন চলিবার পর তাঁহারা নন্দীর পুকুর ও বাগান "নেপেন-করেন" তাহাদের কাছে বন্ধক রাখেন। পরে বন্ধকের দায়ে উহা বিক্রয় হইয়া যায়। তাহাদের দুর্দ্দশা ঠিক ২৫ বৎসরের মধ্যে তাহারা ভিটা বাড়ী অবধি নীলাম হইয়া যায় এবং তাঁহার বংশধরগণ প্রায় হাতে করিয়া দুরবস্থায় বসবাস করেন।

যে বৎসর "নেপেন-করেন" দায়ে এই নন্দীর পুকুর ও বাগান বন্ধক রাখেন, তাহার আগের সনে তাঁহাদের Super-tax দিতে হইয়াছিল; অর্থাৎ তাঁহাদের আয় ৫০,০০০৲ টাকার ওপর ছিল। "নেপেন-করেন" কারবারের বড়বাবু ভোলাবাবু দুর্গোৎসবের সময়ে তিন দিনই একবস্ত্রে থাকা, থিয়েটার, সামাজিক ও বৈঠকীখানার মহড়া ও বাইনাচ দিতেন। যাঁহার যেটা রুচি তিনি সেইটা করুন—আর থাওয়া দাওয়ার ত কথা নাই। পাড়ার কাহারও বাড়ীতে উনান জ্বলিত না। এই সম্পত্তি বন্ধক রাখার সময় লয়ে Exchange fluctuation এর দরুণ তাঁহাদের অনেক টাকা খেসারত দিতে হয়। বোম্বাই হাইকোর্টের এক ডিক্রীতেই তাঁহাদের ১,৮০,০০০৲ টাকা দিতে হয়। ভোলা-বাবুর শরীর ক্রমশঃ খারাপ হইতে থাকে; যে বৎসর বন্ধকী নন্দীর পুকুর ইত্যাদি নীলাম ডাকিয়া আনিলেন সেই বৎসরেই তাঁহাদের কারবার ভাঙ্গিয়া যায় ও মকদ্দমা মামলার সূত্রপাত হয়। বিষয় এতদূর অবধি গড়াইয়াছিল যে তাঁহাকে ফৌজদারী মামলার আসামী হইয়া কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হইয়াছিল। এই সময় তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হয় এবং ইহার অল্পদিন পরে তিনি হাসপাতালে মারা হইয়া মারা যায়েন।

উহার সম্পত্তির মধ্যে শ্যামবাজারের যতীনবাবু নন্দীর বাগান ও পুকুরিণী খরিদ করেন। ইচ্ছা ছিল যে এইখানে একটি বৃহৎ-বাটিকা প্রস্তুত করিয়া মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকিবেন। কিন্তু তিনি খরিদের দুই বৎসরের মধ্যেই মারা যান। তাঁহার পুত্রেরা ইহা বিখ্যাত ভারোগী ধনী আবিরচাঁদ বাবুকে বিক্রয় করেন। নূতন খরিদার মহাশয় খরিদের অল্পকালের মধ্যে মামা প্রকার পারিবারিক দুর্ঘটনার মধ্যে পড়েন ও মারা যায়েন। তাঁহার একমাত্র পুত্র নিঃসন্তান। তাঁহার ভাতার বংশ নির্ব্বংশ হইবে এইরূপ স্থানীয় লোকে এই নন্দীরপুকুর ও বাগানকে "হানা" সম্পত্তি বলে এবং এখনও সেই আত্মহত্যাকারী ব্রাহ্মণ-কন্যার পাপ-মুক্তি হয় নাই বলিয়া বিশ্বাস করে।

আমি কাশীর এক মহাপণ্ডিত, নারায়ণ ভট্টের (যিনি সম্রাট আকবরের সময় কাশীতে বিশ্বনাথের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং যাঁহার প্রপৌত্র গাগা-ভট্ট শিবাজীকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করায় শিবাজী ছত্রপতি-মহারাজ উপাধি গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন) এক বাগবাজারকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করি—যে কবে এই সম্পত্তি ব্রাহ্মণ-কন্যার পাপ-মুক্ত হইবে ও কবে তাঁহার উদ্ধার হইবে। তাহাতে তিনি বলেন যে ব্রাহ্মণ-কন্যার পাপের তারিখ হইতে ১১০টী চান্দ্র বৎসর অতিক্রান্ত হইলে এই সম্পত্তি পাপ-মুক্ত হইবে এবং গয়ার প্রেতশীলা পর্ব্বতে অন্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত সিঁড়ি বিনা আরোহণ করিয়া সাত তিলের পিণ্ড দিলে তিনি উদ্ধার পাইবেন।

এই পর্য্যন্ত ত নন্দীর পুকুরের জন্ম-বৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া নন্দীর পুকুরের পর পর সাংসারিকগণের ঘটনা পাওয়া যায় ধারাবাহিক ইতিহাস দেওয়া গেল। কিন্তু একজন বিখ্যাত ইতিহাস-লেখক বলিয়াছেন যে;—The history of a Country is not the history of its Kings and the wars they have waged or the loves they have made; but the history of its people in all its aspects—social, cultural, political and religious. আমরাও সেইরূপ ঘটনা সংগ্রহ পারি—নন্দীর পুকুর ও বাগানের সামাজিক ইতিহাস লিখার চেষ্টা করিব। আমরা আমাদের এই সামাজিক ইতিহাসের প্রচেষ্টায় যাঁহারা নন্দীর বাগানে বসবাস করিতেন বা ইহার জল পাড়িয়া খাইতেন তাঁহাদের ও ধরিবই; এমনকি যাঁহারা নন্দীর পুকুরের জল স্পর্শিতেন তাঁহাদেরও খরিদ এবং নন্দীর পুকুরের ধারে যে সব বিশিষ্ট ঘটনা হইয়াছিল তাহারও একটা বিবরণ দিবার চেষ্টা করিব। তবে আমাদের শক্তি সীমাবদ্ধ ও ক্ষুদ্র বলিয়া পাঠকগণ কিছু মনে করিবেন না, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

নন্দীর পুকুরের পূর্ব্ব ধারে নন্দীর বাগানের এক কোণে সন্ন্যাসী ঘোষ ওরফে সন্ন্যাসী ডাকাতের চালা ছিল। আমরা সন্ন্যাসী ঘোষকে দেখিয়াছি—লম্বা, জরাগীরক্ষকে খুব লম্বা, গোরাটে রং, ঘোড়ায় পাকান চেহারা। ঘোড়ায় যাতিবিধি করিত। সিপাহী পাল্টী ছিল—৩ জন বাড়ি সন্ন্যাসীর অধীনে কাজ করিত। দক্ষিণের বাজার ঘাট হইতে

নৌকা ছাড়িয়া বড়বাজারের জগন্নাথ ঘাট অবধি যাইত—ভাড়া মাত্রী পিছু ৷৷ পয়সা। ভোর পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটার সময় নৌকা ছাড়িত; ফিরিবার সময় মালপত্র লইয়া আসিত—ঘাটে ঘাটে নামাইয়া দিত। ১০টা—১১টার মধ্যে বাড়ী ফিরিত। খাওয়া দাওয়ার পর যদি কিছু সোয়ারী থাকিত ত লইয়া যাইত। আমরা মামার বাড়ী যাইবার জন্য সন্ন্যাসীর নৌকা ভাড়া করিতাম—এঁড়েদহ মামার বাড়ী, যাতায়াত এক টাকা ভাড়া; আর সন্ন্যাসীকে দিতে হইত ছিলিম কয়েক তামাক বা এক ছিলিম 'বড়' তামাক্। নৌকা ভাড়া যাহা হইত, তাহা সাড়ে পাঁচ ভাগ হইত; প্রত্যেক বাড়ি এক ভাগ, সন্ন্যাসী মাঝি 'বলিয়া এক ভাগ; নৌকার মালিক বলিয়া এক ভাগ; আর আধ ভাগ থাকিত নৌকার সরঞ্জাম ও মেরামতী খাতে জমা। ফাল্গুন, চৈত্র বা বৈশাখ মাসে যে সময়ে সন্ন্যাসীর নৌকায় কাজ কম থাকিত সেই সময়ে সন্ন্যাসী নৌকায় গাব দিত; রং করিত; নৌকায় 'পাট' করিত। ১০।১২ দিনে সব কাজ শেষ হইয়া যাইত।

সন্ন্যাসীর নৌকা ভাড়া করিলে অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যাইত। চাঁপদানীর শরৎবাবু যাচ্ খেলায় মঙ্কিপেশ্বরের প্রসন্ন বাঙ্গালকে হারাইয়া দিয়া সন্ন্যাসীকে ডান হাতে সোনার তাগা যৎকিঞ্চিৎ করিয়াছিলেন। হাঁড়ের ১০০ ঘায়ে গঙ্গা পার হওয়া যায়। আজকাল নৌকার গলুই উঁচু করা হয়—সামনীতে নৌকার গলুই 'ফুস্ ফুস্' থাকিবে, তবে ত জল কাটিবে। হাঁড়ের পাতা তেজপাতের মতন হওয়া চাই—আরও কত কথা বলিত, সেসব কথা কেই বা মন দিয়া শুনিত; আর কেই বা মনে করিয়া রাখে। যে দুই একটী কথা মনে আছে তাহাই বলিতেছি। সন্ন্যাসীর মতন পাকা দাঁড়িয়ার মাঝি লছরাচর দেখা যাইত না। গঙ্গার কোথায় কি আছে, সব নখ-দর্পণে। কুলীন-পাড়ায় ত্রিশিশ ঘোষের বাগানের সামনে গঙ্গার চড়ার মাঝখানে একটী সোঁতা আছে। ভাঁটার সময় সেইখান দিয়া সোজা নৌকা বাহিয়া গেলে ঐঞ্জ-ঐঞ্জ মাহেশে পৌঁছান যায়। কাল-বৈশাখীর ঝড়ে সন্ন্যাসী বহুবার নাজাপার করিয়া বহু সোয়ারীকে রেল ধরাইয়া দিয়াছে। কোন্নগরের রাইমোহন সেন সন্ন্যাসীর নৌকা পাইলে অন্য নৌকায় চড়িতে চাহিতেন না। তক্ষকতলার ঘাটের কাছে গঙ্গার জলে এক 'ঘুরণী' আছে; সেইটে পার হইতে অনেক সময় যায়; সন্ন্যাসী কিন্তু 'ঘুরণী' এড়িয়ে যায়। টীটাগড়ে বিশালাক্ষীতলায় যে দহ আছে তাহা আগে খুব গভীর ছিল, এখন (অর্থাৎ সন্ন্যাসীর সময়ে) বুজিয়া আসিতেছে। এই দহে চাঁদ সদাগরের এক মৌকা ডুবিয়া যায়। ডুবুরী নামাইলে এখনও নাকি নৌকার কিয়দংশ দেখিতে পাওয়া যায়; নৌকার ভিতরে অনেক পাথরের খোরাই মূর্ত্তি আছে; নাবু পালের মহাশ্মশানে এক সাধু এই রকম একটা মূর্ত্তি তুলিয়া অযথ তলায় রাখিয়াছিল—আদি কত গল্প যে সন্ন্যাসী করিত। বিশালাক্ষীর দহে এক জোড়া মকর বাস করে। মকর বা গঙ্গার নাম করিয়া ডুব দিলে মানুষকে কিছু বলে না। দেখিতে কুমীরের মতন কালো—মাথা। সন্ন্যাসীর এই উক্তিটী তাহার মৃত্যুর পরে আংশিক ভাবে Verified বা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল। Sir Alexander Murray ঐ দহ হইতে আধ মাইলের মধ্যে গুলি করিয়া এক নদ্যা কুমীর মারেন। কুমীরটা দেখিতে কুমীর অপেক্ষা মাঝা; আর সাধারণতঃ মানুষ খায় না; শুড়ের নাকের দিকটা কিছু উঁচু, তাহাতে মকর বলিয়া ভ্রম হওয়া বিচিত্র নহে। বহু আগে গড়ফরের খাল দিয়া জেলে ডিঙ্গী করিয়া খোলাগ্রামে যাওয়া যাইত। জোয়ারমানে অধিকাংশ যাত্রী মানে একবারে পানিহাটীর ঢেলোপটী থেকে চাউল, ডাল ইত্যাদি কিনিয়া ডিঙ্গী বোঝাই করিয়া গড়ফরের খাল দিয়া তাঁহাদের খোলার বাড়ীতে যাইতেন। রেলের লাইন বেহার জঙ্গল করা হয়; সেইবার থেকে খাল ক্রমশঃ বন্ধিয়া যাইতেছে। এই খাল কাটা-খাল নহে; মা গঙ্গার খাল। এই খাল দিয়া ত্রিবেণীর ডাকাতরা গঙ্গায় পড়িয়া লুটপাট করিয়া যাইত। বর্দ্ধমানের নাম Itoda (বা রড়া) হইতে রহড়া গ্রাম হইয়াছে—এইখানেই Itoda (বা রড়া) থাকিত। নিকটেই বন্দীপুর; বন্দীপুরে বন্দীদের রাখিত; টাকা পাইলে ছাড়িয়া দিত।

লোকে কিন্তু বলিত যে সন্ন্যাসী আগে ডাকাতি করিত। সন্ন্যাসীর কব্জীর খুব জোর; তরওয়ালের এক ঘায়ে মহিষের মাথা উড়াইয়া দিতে পারিত। সন্ন্যাসীর যখন বয়স ৬০এর উপর, তখন সন্ন্যাসীকে এক কোপে খাড়ি খাসীর মুণ্ডচ্ছেদ করিতে দেখিয়াছি। হেসো দিয়া এক কোপে সুপারি গাছ কাটিতে দেখিয়াছি। Sir Stuart Hogg পুলিস বিভাগের একজন বড় সাহেব; তিনি জিজ্ঞ সন্ন্যাসীকে ডাকাত বলিয়া গ্রেপ্তার করেন ও হাতে হাতকড়া লাগান। সন্ন্যাসীকে নৌকা করিয়া যখন কলিকাতায় চালান দেওয়া হইতেছিল—সন্ন্যাসী সাহেবকে বলিল যে খাড়িদের একটু সরিয়া আসিতে বলুন আমি নৌকায় গলুইয়ে বসিয়া প্রস্রাব করিব। সাহেব হুকুম দিলে সন্ন্যাসী প্রস্রাব করিবার ছলে নৌকার গলুই হইতে জলে পড়িয়া গিয়া হাত বাঁধা অবস্থায় ডুব সাঁতার দিয়া একেবারে গঙ্গার ওপারে উঠিল। হুগ সাহেব ভাবিলেন যে ডাকাতটা বোধ হয় জলে ডুবিয়া মারা গেল। এই ভাবে ডাকাতের লিষ্ট হইতে সন্ন্যাসীর নাম কাটা গেল। সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলে সন্ন্যাসী কেবল হাসিত—হাঁ বা না কোনও উত্তর করিত না।

যেদিন সন্ন্যাসী মারা যায়েন, সেই দিন আমাদের পাড়ায় একটী বিশিষ্ট ঘটনা ঘটিয়াছিল। সেই ঘটনার কথা এইবার বলিব। সকাল বেলায় শুনিলাম যে সন্ন্যাসী আজ মারা যাইবে; পাড়ার মাতব্বরেরা বলিতেছেন যে উহাকে "তীরস্থ" করা হউক—সন্ন্যাসীও নাকি সেই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু সন্ন্যাসীর এক মাত্র কন্যা নেড়ী খোসালিনী মাঝি হইতেছে না। সন্ন্যাসীকে দেখিতে গেলাম, শুধু হাতে যাইতে নাই বলিয়া এক পোয়া মিশ্রি লইয়া গেলাম। দেখিলাম সন্ন্যাসী খুব দুর্ব্বল; কিন্তু আমরই যে মারা যাইবে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সন্ন্যাসী দুর্গা নাম জপ করিতেছে।

ভূতির বোন "মানী"—ভাল নাম বোধ হয় মোহিনী বা ঐ রকম একটা কিছু হইবে। মানী বাল্য-বিধবা; ভাইয়ের সংসারে বাসন মাজে; কাপড় কাচে; ঘর-দোর, থাকে। মানী মধ্যাহ্ন পুকুরে বাসন

মালা ইত্যাদি খেয়া করিয়াছে। সকাল সকাল স্নান করিতে আসিল; নদীর পুকুর পাড়ে ওকনা কাপড় ও গামছা রাখিল। পাড়ার লোকে এই অবধি দেখিয়াছে। তাহার পর সন্ন্যাসীকে 'তীরস্থ' করা হইবে স্থির হইল, সন্ন্যাসীকে গাওয়ায় বাহির করা হইল; গঙ্গা মৃত্তিকায় ঘরিয়াম সর্ব্বাঙ্গে লেপা হইতে লাগিল—সকলেই সন্ন্যাসীকে লইয়া ব্যস্ত। মানির কি হইল কেহ লক্ষ্য করে নাই। বেলা ২টার সময় মানির খোঁজ হইল; গামছা জীর ইত্যাদি সব খোঁজা হইল।

মানিকে পাওয়া গেল না। পুকুর পাড়ে ওকনা কাপড় ও গামছা দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা হইল যে মানি নদীর পুকুরের জলে ডুবিয়া গিয়াছে। জেলেদের বড় টানা জাল দিয়া নদীর পুকুর এপার ওপার টানা হইল; ডুবুরী নামাইয়া পুকুর তোলপাড় করা হইল; জল ঘোলা হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু মানির কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না।

একটী তেওয়ারের ছেলে, পাড়া থেকে কিছু দূরে থাকে, মানিকে ভাল করিয়া চেনে না, বলিল যে মোলার ঘাটের কাছে এক থার্ড ক্লাস গাড়ীতে "ভূ" মাষ্টারের সঙ্গে মানির মতন একটী মেয়েকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছে। "ভূ" মাষ্টারকে শুঁড়ির দোকান থেকে বিলাতী মদ কিনিতেও দেখিয়াছে। "ভূ" মাষ্টার আমাদের ওমঞ্চলের বিখ্যাত কায়েত বাবু; তাহার পক্ষে সবই সম্ভব; শুঁড়ির দোকানে খোঁজ করিতে বলিল যে হাঁ ভূ বাবু এক বোতল বিলাতী কিনিয়াছেন। গাড়ীতে নেয়েছেলে ছিল; গাড়ীর নম্বর ৭৭—কলিকাতার গাড়ী। যাহা হউক মানির একটা হদিস্ মিলিল; মানি জলে ডুবে মারা যায় নাই। সে রাত্রিতে মানির আর কোনও খোঁজ হইল না। পরদিন পাড়ায় বেণীবাবু কলিকাতা কর্পোরেসনের গাড়ীর খাতা দেখিয়া ৭৭নং গাড়ীর ঠিকানা বাহির করিলেন; পুলিস সাহায্যে কোথায় গত কল্য মেয়ে নোয়াণী আসিয়াছে—গাড়োয়ান তাহা দেখাইয়া দিল। মানিকে পাওয়া গেল; কিন্তু "ভূ" মাষ্টারের পাত্তা মিলিল না। অনেক বলা কওয়া সত্ত্বেও মানি বাড়ি ফিরিতে রাজি হইল না। বলিল বাড়ী ফিরিলে "টি। টি!" নিন্দা হইবে। সপ্তাহ খানেক সেই খানে থাকিয়া মানি কলিকাতায় বৈষ্ণব চরণ শেঠের গলিতে চলিয়া গেল। নিমতলায় কাঠ-গোলায় যেসের লোক কাঠ কিনিতে যাইলে মানি ডাকিয়া পাড়ার খবর লইয়া এইরূপ বছরখানেক চলিল—তাহার পর মানি ঠিকানা বদল করিল। আর মানির খবর কেহ পায় নাই। ৩০।৩১ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। হঠাৎ আঠারবাড়ীর জমীদারের এক কাজে আমাকে পুরী যাইতে হয়। কোর্টের কাজেই কয়দিন কাটিয়া গেল। ভাবিলাম পুরী আসিয়াছি একদিনও জগন্নাথ মহাপ্রভুকে দর্শন করিলাম না—কি পাপী আমি! সেই দিনই সন্ধ্যায় মন্দির হইতে ভগবদ্দর্শন করিয়া ফিরিতেছি এমন সময় আমার ছেলে-বেলার ডাক্-নাম ধরিয়া চেনা চেনা গলায় কেহ ডাকিল। ফিরিয়া দেখিলাম, একটী বৃদ্ধা আমার মুখপানে চাহিয়া আছে। বলিল "তুমি ত নারাণ বাবুর ছেলে।" আমি বলিলাম যে আপনি কে আমি চিনিতে পারিতেছি না। বলিল—আমার পরিচয় জানিয়া লাভ নাই। তবে পাড়ার এত detailed প্রশ্ন করিল ও ভূতির বাড়ীর প্রত্যেক লোকের খবর এত খুঁটি-নাটী করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে আমার সন্দেহ উদ্রেক করিল। তার পর যখন বলিলাম যে ভূতি মারা গিয়াছে; খাঁদা মারা গিয়াছে, তখন কাঁদিয়া ফেলিল—স্বীকার করিল যে সে মানি! তাহার পর আরও দশবৎসর কাটিয়া গিয়াছে; মানির খবর কেহ জানে না। আত্মীয়স্বজনেরাও জানে না। Indian Evidence Act অনুযায়ী মানিকে মৃতা ধরিয়া লইতে পারা যায়। স্বাভাবিক কারণেও মানি এতদিনে মরিয়া গিয়াছে বলিয়া আমরা অনুমানও করিতে পারি। আজ এই পর্য্যন্ত।

আমার মাতাপিতা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

দরিদ্র পূজারী যেমন বড় বড় দেবতা অপেক্ষা তাহার গৃহ দেবতার কথা বলিতে ও মহিমা প্রচার করিতে উল্লসিত হয়, আমিও আমার মাতা পিতার কথা বলিতে আনন্দ পাই। সহৃদয় পাঠকপাঠিকারা আমার এ দৌর্ব্বল্য ক্ষমা করিবেন।

আমার মাতা ঠাকুরাণী তাঁহার পিতার প্রথমা কন্যা এবং অত্যন্ত আদরিণী ছিলেন। এগারো বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়, খুব সমারোহের সহিত। আমার বাবার বয়স তখন একুশ বৎসর। বাবার যখন তিন বৎসর বয়স তখন তাঁহার পিতা এবং যখন পাঁচ বৎসর বয়স তখন তাঁহার মাতা ইহলোক ত্যাগ করেন। অল্প বয়সেই তিনি সব ভাটা চুকাইয়াছেন। তাঁহার মাসিমা-দ্বয় তাঁহাকে মানুষ করেন। শুনিতে পাই আমার পিতা-মহী ঠাকুরুণ তাঁহার ভাবী পুত্রবধূর জন্য তাঁহার সমস্ত গহনাপত্র, সাজানো পুতুলের বাক্স, এমন কি খেলিবার শাঁখের ঘুটিং ও কড়ি রাখিয়া যান। মৃত্যুকালে বলিয়া যান যেন এসব তাঁহার ভাবী পুত্রবধূ পান। পাঁচ বৎসরের পুত্রের জন্য এ চিন্তা অভাবনীয় আনন্দজনক বটে। আমার মাতাঠাকুরাণী তাঁহার শাশুড়ী দত্ত গহনা গাঁটী পাইয়া-ছিলেন কিনা ঠিক জানিনা, তবে সাজানো পুতুল বাক্স ও

কড়ি, ঘুটিং পাইয়াছিলেন। আমার জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত তাহা ছিল—সেগুলির প্রতি মাতৃদেবীর এতই মমতা।

আমার মায়ের রূপসী বলিয়া যেমন খ্যাতি ছিল, বুদ্ধিমতী ও গুণবতী বলিয়া ততোধিক খ্যাতি ছিল। সর্ব্বদা দেবকার্য্যে ও গৃহকার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহার বৃদ্ধ পিতামহের অবিশ্রান্ত সেবা শুশ্রূষা করিয়া তিনি বহু আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। শৈশব হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত সমভাবে মা ব্রতাদি পালন করিতেন। তাঁহাকে ভক্তিমতী ও পুণ্যময়ী বলিয়া সকলে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি ও সম্মান করিতেন। প্রতিদিন তুলসীতলে এমনভাবে প্রণাম করিতেন যে মনে হইত প্রত্যেক প্রণাম শ্রীভগবানের চরণে গিয়া পড়িতেছে—রাঙা চরণ আরো রাঙা হইয়া উঠিতেছে।

মায়ের হৃদয় বড় কোমল ছিল, তিনি আত্মীয় পরিজনের সামান্য অসুখ বিসুখে কাতর হইতেন। গ্রামের কাহারো কোনো দুঃখে তিনি কাঁদিয়া আকুল হইতেন। তাঁর ভগ্নীদের প্রতি তাঁর স্নেহ ছিল অসাধারণ—তাঁহার এক ভগ্নী বিধবা হইলে তিনি একমাস শয্যাশায়ী ছিলেন—জননী ও ভগিনীর সহিত সর্ব্বদা রোদন করিতেন। বাড়ীর গৃহ-পালিত পশুপক্ষীর জন্য তাঁহার যত্নের সীমা ছিল না। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিয়োগে তিনি একবৎসর পাগলিনীর ন্যায় থাকিতেন। তাঁর এই ভাব দেখিয়া আমি ভীত হইতাম এবং মনে মনে ভগবানকে বলিতাম আমার মা, 'যেন আমি মারা যাবার আগে মারা যান। তাঁকে এমন নিদারুণ ব্যথা দিয়ে গেলে স্বর্গেও আমি শান্তি পাব না।'

মা দীর্ঘকাল বাবার কাছে কাশ্মীরে ছিলেন—জম্মু ও কাশ্মীরের প্রত্যেক বাঙ্গালী ও সেখানকার অধিবাসীরা তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করিত। পরকে তিনি এমন ভাবে আপন করিয়া লইতে পারিতেন যে জম্মু কাশ্মীরের সব বাঙ্গালী ও কয়েকঘর সেই দেশীয় লোক আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হইয়া গিয়াছেন। আমরাও তাঁহাদের নিকট অনুরূপ ব্যবহার পাইয়া আসিতেছি। কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, প্রফেসর বীরেন্দ্রবাবু, সাম্যাল মহাশয়, লালা শঙ্করলাল প্রভৃতির নাম তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাধক পাগল হরনাথ বাবাকে 'দাদা' বলিতেন। আমরা সকলেই তাঁহার অজস্র আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি।

মা আমাকে খুব শাসনে রাখিতেন, তাঁকেই খুব ভয় করিতাম। তিনি অতিশয় তেজস্বিনী ছিলেন, আত্মীয় প্রভৃতির নিকট কোনো কিছু সামান্য জিনিষ লইলেও তাহা ফেরৎ দেওয়ার একটা নিষ্ঠা ছিল—ভুল হইবার উপায় ছিল না। তাঁহার গোপন দান অনেক ছিল।

আমার শৈশবে একটী ঘটনা মনে পড়ে—একজন পশ্চিমার আমাদের নিকট দুই টাকা পাওনা ছিল—সে হঠাৎ মারা যায়, সে টাকা পরিশোধ করার কোনো উপায় রহিল না। মা অতিশয় চিন্তিত হইলেন—খোঁজ করিয়া তাহার আত্মীয় স্বজনের ঠিকানা পাওয়া গেল না। দুই তিন জায়গায় চিঠিও লেখা হইল, কিন্তু কোনো উত্তর আসিল না। মা একজন দুঃস্থ পশ্চিমাকে দুই টাকা দিলেন,—একটী দেবালয়ে দুই টাকা উহার ঋণ শোধ করিয়া দিলেন তবুও অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। একবার একটী লোক আসিয়া বলিল তাহার বাড়ী নাগপুর এবং সেই পশ্চিমার আত্মীয়। মা তাঁকে দুটী টাকা দিয়া ঋণ মুক্ত হইলেন।

মা একবার জম্মু যাইবেন—সেখানকার একটী বাঙ্গালী নাম রায় সাহেব ললিতকুমার সপরিবারে জম্মু ফিরিতেছেন, তাঁর সঙ্গেই যাওয়া ঠিক হইল—তিনি আমায় লিখিলেন—আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করা আছে—টিকিট করিতে হইবে না বর্দ্ধমানে তুলিয়া দিবেন। মা বর্দ্ধমান ষ্টেশনে গিয়াই প্রথমে আমাকে একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া আনিতে বলিলেন—আনিয়া দিলে মা সেটা খুঁটে বাঁধিয়া আমাকে বলিলেন—'তিনি সঙ্গে লইয়া যাইবেন এই যথেষ্ট। তাঁদের টিকিটে আমি যাইব না।'

পাঞ্জাব মেল আসিলে মাতাঠাকুরাণীকে কামরায় উঠাইয়া দিলাম। টিকিট করা হইয়াছে শুনিয়া ললিতবাবু বলিলেন—"অনেকগুলা টাকা অনর্থক ব্যয় করিলেন।"

মাকে আমি যেমন ভয় করিতাম তেমন ভক্তি করিতাম। তাহাতে আমি জগজ্জননীর ছায়া দেখিতাম তাই লিখিয়াছিলাম—

মাগো আমার পুণ্যময়ি, তুমিই আমার জগন্মাতা,
জনম জনম পেলাম তোমার এই করুণা, এই মমতা।
শুদ্ধ হয়ে বস্তুরে শুদ্ধ তোমার টেনেছি গো,
পূর্ণিমা তোর সুধার আদর চকোর হয়ে জেনেছি গো।

পক্ষিণী মা বুঝতে পারি এই বুকেতে তা দিয়েছ,
এক ঠাঁয়ে আজ সব পেয়েছি জনম জনম যা দিয়েছ।
বৎস হয়ে শ্যামলী তোর সাথে সাথে ছুটেছিলাম,
হরিণ শিশু তোমার সাথে কোথায় তৃণ খুঁটেছিলাম।
তুমি ভীমা ভয়ঙ্করী, তুমি আমার ডাকিনী মা,
উষ্ণতা এই রক্তে দিলে দুগ্ধ তোমার বাখিনী মা।
শবরী মা, আঁচল দিয়ে বুকে আমায় বেঁধেছ গো,
দুঃখিনী মা আমায় নিয়ে ভিক্ মাগিয়া কেঁদেছ গো।
দোলনাতে মা জনম জনম তুমিই আমায় দোল দিয়েছ,
আমি যখন কুসুম কোরক লতা হয়ে কোল দিয়েছ।
আমার লাগি প্রাসাদ রচি আপনি থাকো শ্মশানে মা,
চণ্ডী হয়ে আমার লাগি তুমিই ছোটো শ্মশানে মা।
তোমার ভালে চাঁদ আমারে টিপ্ দিয়ে যায় বরণ করি,
সাঁজের প্রদীপ লয় মা আমার 'আলাই' 'বালাই'
হরণ করি।
জনম জনম মা হয়েছ, জনম জনম হবেও মা
ডাকবে আমায় শুক তোমার, তোমার কাজল,
তোমার চুমা।

মাতাঠাকুরাণী যখনই কাশীর হইতে আসিতেন আমি বর্দ্ধমান ষ্টেশনে গিয়া গোটা দিন রাত অপেক্ষা করিতাম। মা বাবার আগমনে ষ্টেশন যেন নব শোভা ধারণ করিত—তাই একটী কবিতায় লিখিয়াছিলাম।—

সে দিন এমনি শরৎ প্রভাত, স্মরণ হতেছে বেশ,
প্লাট ফর্ম্মেতে আসিয়া দাঁড়ালো ডেরাডুন একস্‌প্রেস।
নামিলেন মোর জনক জননী বহু বর্ষের পর,
দেবতা আসিয়া উজল করিল শূন্য আমার ঘর।
উল্লাসে সব পোটলা পুঁটলী নামাইতে যাই ভুলি,
শুধু বারবার আমি তাঁহাদের লই চরণের ধূলি।
এনেছেন আহা কতই দ্রব্য—অন্তরস স্নেহরাশি,
বর্দ্ধমানের ষ্টেশনটী বড্ডই ভালবাসি।

একটী বেলা যে কাটায়েছি ওই ওভারব্রিজের ছায়,
পঞ্চবটীর বনেই পেয়েছি আমার অযোধ্যায়।
কৈলাস মোর নামিয়া এসেছে রেলের এ প্রাঙ্গণে,
আমার কমলে কামিনী উদয় হেথায় শুভক্ষণে।
ক্ষণিকের এই পূজা মণ্ডপ—আজ মনে পড়ে সব
অনন্ত সেই আনন্দমেলা—বোধনের উৎসব।
এই ঠাঁই মোর মাতৃতীর্থ—এই ঠাঁই মোর কাশী,
বর্দ্ধমানের ষ্টেশনটী বড্ডই ভালবাসি।

আজিকে আমি যে আশ্রয়হীন মাতৃ-পিতৃহারা,
কাতর কণ্ঠে মা বলিয়া ডাকি—আর ত পাইনে সাড়া।
আসে যায় ট্রেণ ব্যাকুল নয়নে তেমনি তাকায়ে থাকি,
হয় ত হেরিব সে পুণ্যছবি—স্নেহ ছল ছল আঁখি।
জ্ঞান ত এখন অনেক বেড়েছে—বেড়েছে বয়ঃক্রম,
এখানে এলেই ছেলে হয়ে যাই—করি যে তেমনি ভ্রম।
হেথিয়া হাসেন মাতা পিতা মোর—আজিকে স্বর্গবাসী
বর্দ্ধমানের ষ্টেশনটী বড্ডই ভালবাসি।

মা আমার বহু তীর্থ করিয়াছেন। বাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুর্গম 'অমরনাথ'ও দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। কত দেবতার আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্য যে তিনি আমার ও আমার পত্নীর জন্য পাঠাইতেন তাহার ইয়ত্তা নাই। জপ, তপ ও পাঠ করিতে তাঁহার বহু সময় লাগিত। শ্রীশ্রী৺মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা তিনি প্রতি শনি মঙ্গলবার পাঠ করিতেন। জ্যৈষ্ঠ মাসে 'অন্নমঙ্গলবার' ব্রত অতীব নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত পালন করিতেন।

১৩৪২ সালের ৬ই পৌষ 'বড় দিনে'র দিন সত্তর বৎসর বয়সে তিনি স্বর্গারোহণ করেন—তাঁহার শেষ চিঠি ২৭শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার পাই—তাই লিখিয়াছিলাম।

চিঠিখানি মায়ের হাতের লেখা
শুক্রবারে পেয়েছিলাম কবে,
গভীর স্নেহ অমৃতের সে রেখা
ভাবি নাই ও শেষ চিঠি যে হবে।

২

বুড়া খোকার তৃষিত এই মুখে
মায়ের বুকের শেষ দুধের এ ধার,

শেষের কাজল জলভরা এই চোখে,
এ জনমে মিলবে না ত আর।

৩

পরের কাছে মূল্য ইহার নাই,
অমূল্য এ আমিই শুধু জানি,
বাৎসল্যের সাম্রাজ্যের এ-ভাই
মায়ের দেওয়া দানপত্র খানি।

৪

দুধ সাগরের মানচিত্র এ গোটা
শেষ আশীষের দূর্ব্বা এবং ধান,
ললাটে শেষ দই-হলুদের ফোঁটা
মায়ের লেখা শেষ চিঠি এইখান।

—গয়া কাশীর উৎকৃষ্ট তামাক সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইত। আমি যত বার তামাক কিনিয়া আনিয়াছি বিষম ঠকিয়াছি—বিক্রেতারা অনধিকারী জানিয়া নকল ও খেলো জিনিষ দিয়া দেয়া জিনিষের দাম লইত। আমি তামাক খাই না শুনিয়া বাবার জনৈক বন্ধু বলিয়াছিলেন—'তোমার বাবা যে তামাক খান, তাহার ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় তোমাদের তিন পুরুষ কাটিয়া যাইবে।'

বাবা কবিতা লিখিতেন, তাঁহার 'কাশ্মীর' নামক একটী সুন্দর কবিতার চার লাইন আমার মনে আছে—

"স্বর্গলিকা জনশ্রুতি সোনার প্রাচীর
স্বচক্ষে দেখিনু শীতে রজত কাশ্মীর।
কোথা লোভা মনোলোভা ব্রহ্মাণ্ড মাঝার
মরুভূমি—জন্মভূমি—সৌন্দর্য্য আগার।"

আমার বাবা ছিলেন উদাসীন, সরল সকল প্রকৃতির লোক। হৃদয় কোমল হইলেও—বাহিরে একটা কঠিন আবরণ ছিল। দুর্ব্বলতাকে পছন্দ করিতেন না। কীর্ত্তন গান শুনিতেন না, হরিনাম সংকীর্ত্তন ভালবাসিতেন। সন্ধ্যা আহ্নিক করিতেন—প্রতিদিন নিয়মিত শিবপূজা করিতেন। ভক্তির বহিঃপ্রকাশ একেবারেই ছিল না। বাড়ী তাঁহার শ্রীখণ্ডে, কিন্তু বৈষ্ণবতার বড় ধার ধারিতেন না। সঙ্গীত শুনিয়া কখনো তাঁহার চক্ষে জল দেখি নাই—কেবল একবার একজন বাজিকর নীলকণ্ঠের "হরি তোমার মাতৃরূপ সর্ব্বরূপ সার"—এই গানটী সুমধুর সুরে গান করিয়া তাঁহাকে শুনাইতেছিল—যখন সে বার বার ফেরতা দিয়া —"ওই বদন ভরা মা কথাটির তুল্য কথা নাই হে আর।" তখনি দেখিয়াছিলাম তিনি চক্ষের জল চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। পাঁচ বৎসর বয়সেই ত তাঁর 'মা' বলা শেষ হইয়াছিল—তবুও কি টান, কি ব্যথা!

বাবা ইংরাজী, হিন্দি, উর্দ্দু, পুস্তু খুব ভাল জানিতেন এবং মাতৃভাষার ন্যায় বলিতে পারিতেন। তিনি সুদীর্ঘকাল কাশ্মীর রাজষ্টেটে কাজ করিয়া সুপারিনটেনডেণ্ট হইয়াছিলেন। কাজে তাঁহার খুব সুনাম ছিল, স্পেশাল পেনসেন পাইয়াছিলেন। তিনি তামাক সর্ব্বদা খাইতেন তিনি দর্শন শাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিতেন। ভগবানে তাঁহার গভীর ভক্তি ছিল—লিখিয়াছিলেন—

চরণে মিনতি—এই করো দয়াময়।
যেন প্রাচীন বয়সে উপেক্ষি' শুশ্রূষা
সহজ মরণ হয়।

হইয়াছিলও তাহাই। তিনি ১৩৩৩ সালে দশহরার দিন রাত্রি ৯টায় হঠাৎ হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তিয়াত্তি বৎসর বয়সে মারা যান। তাঁহার দুই বৎসর পূর্ব্বে আমি মাতৃদেবীকে হারাই। মৃত্যুকালে বলিয়াছিলেন—'ছেলেকে বলো আমি চল্লাম—সে ঘরে আমার সহোদরা ও অন্যান্য বহুলোক ছিলেন—হতভাগ্য আমিই, তখন উপস্থিত ছিলাম না।

মাতাঠাকুরাণী সব ব্রতকথার শেষে প্রায়ই বলিতেন—এ ব্রত যে করে, ব্রতকথা যে শোনে, সংসারে দীর্ঘকাল অতুল সুখ ভোগ করে—অন্তিমে স্বর্গ থেকে মর্ত্ত্যে রথ এসে তাঁদিকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যায়।" বাবার যন্ত্রণাহীন মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর উজ্জ্বল দেহ ও সহাস্য মুখ দেখিয়া মনে করিয়া স্বর্গে যাওয়ার কথাই মনে হইয়াছিল।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এদিকে যাঁহারা গ্রেপ্তার হইলেন, তাঁহাদের লইয়াই বিচারপর্ব সুরু করার ব্যবস্থা হইল। Chittagong Armoury Raid Ordinance নামে গভর্ণমেণ্ট এক আইন জারি করিলেন। চট্টগ্রামের জেলা জজ মিঃ ইউনিকে চেয়ারম্যান করিয়া রায় বাহাদুর ডি. পি. ঘোষ (১৯১০-৩০ জুরিষ হইতে ইঁহার পরিবর্তে রায় নরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী বাহাদুর) ও খান বাহাদুর মৌলভী আব্দুল হাই-কে লইয়া গঠিত হইল একটি স্পেশাল ট্রাইব্যুন্যাল। বিচার আরম্ভ হইল—১৯৩০ সালের ২৩শে জুলাই তারিখ হইতে। চন্দননগর হইতে লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ প্রভৃতিকে তখনও গ্রেপ্তার করা হয় নাই, সুতরাং তখন কেবলমাত্র অনন্ত সিংহ ও অন্যান্য ধৃত বিপ্লবীদেরই বিচার আরম্ভ হইল। ইহার কিছুদিন পরে যখন চন্দননগর হইতে অপর কয়জন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করা হইল, তখন তাঁহাদিগকে চট্টগ্রামে লইয়া গিয়া ধৃত অন্যান্য বিপ্লবীদের সহিত একত্র করিয়া আবার নূতন করিয়া বিচারকার্য্য আরম্ভ করার ব্যবস্থা করা হয়। প্রায় জন ত্রিশ বিপ্লবী তখনকার মত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার অভিযুক্ত হইলেন। সূর্য্য সেন, নির্মল সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার প্রভৃতি যত বিপ্লবীর নামই তখনও কিন্তু কেরারি আসামীর নামের তালিকাতেই রহিয়া গেল।

আসামীদের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, সন্তোষকুমার বসু, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, অখিলচন্দ্র দত্ত, কামিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীবিগণ। পূর্বে যাঁহারা স্বীকারোক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই বিচার চলিবার সময় উহা প্রত্যাহার করিলেন। এই ঐতিহাসিক মামলার বিচার দেখিবার জন্য আদালতে এবং আদালতের বাহিরে প্রত্যহ বহু জনসমাগম হইত। মামলার শুনানীর সময় মধ্যে মধ্যে আসামীগণ এবং বিচারক অথবা সরকারী উকীলের মধ্যে এরূপ তীব্র বাদানুবাদের সৃষ্টি হইত যে পুলিশকেও অনেক সময় শান্তিস্থাপন কল্পে আহ্বান করিতে হইত। বিপ্লবীদের সঙ্গত অনুরোধ রক্ষা করিতে অস্বীকার করা হইলে তাঁহারা ভীষণ হট্টগোল সুরু করিতেন—যাহার ফলে বিচারকার্য্য পরিচালনা মোটেই সম্ভব হইত না। হয়তো বা কখনও তাঁহারা জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে থাকিতেন—অথবা "বন্দেমাতরম্" ধ্বনির সহিত নানাবিধ শ্লোগান দিতে থাকিতেন। একদিন পাবলিক সিকিউটর অভিযুক্ত বিপ্লবীদের সম্বন্ধে অপমানজনক মন্তব্য করায় লোকনাথ তাঁহাকে সেই উক্তি প্রত্যাহার করিতে বলিলেন। পাবলিক প্রসিকিউটর তাহা না করায় লোকনাথ বজ্রকণ্ঠে উহার প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন এবং ট্রাইব্যুন্যালের চেয়ারম্যান মিঃ ইউনি পর্য্যন্ত তাঁহাকে থামিতে বলিলেও তিনি নিরস্ত হইলেন না।

অবস্থা নিরূপায় মিঃ ইউনি ইংরাজ পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ হ্যাটারকে পুখলা ফিরাইয়া আনিবার জন্য আদেশ দিলেন এবং আদালতের আদেশ পাইয়া মিঃ হ্যাটার আরও কয়েকজন সার্জেণ্টকে সঙ্গে লইয়া লোকনাথকে শায়েস্তা করিবার জন্য আসামীদের কাঠগড়ায় প্রবেশ করিলেন। উত্তেজিত পুলিশ কর্মচারিগণ লোকনাথের দিকে অগ্রসর হইতেই অন্যান্য বিপ্লবীগণও গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। সঙ্কট এইরূপ ঘনাইয়া উঠিল যে, যে কোন মুহূর্ত্তে একটা ভয়ঙ্কর কিছু সংঘটিত হইবার আশঙ্কা হইতে লাগিল। বিপ্লবীদের ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ মূর্ত্তি দেখিয়া ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতে লাগিল যে, পুলিশ কর্মচারিগণ লোকনাথের কেশাগ্র স্পর্শ করিবামাত্র তাঁহারা একযোগে তাঁহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাদের প্রাণ সংহার করিবেন।

ব্যাপারের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া মিঃ ইউনি তখন মিঃ হ্যাটারকে সদলবলে বাহির হইয়া আসিবার জন্য আহ্বান করিলেন এবং তাঁহারাও তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া আসিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। শেষ পর্য্যন্ত এইভাবেই ব্যাপারটির পরিসমাপ্তি ঘটিল। বিপ্লবীরা বিজয়োল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

একদিকে যখন এইভাবে বিচারকার্য্যপরিচালিত হইতেছে, তখন নেতা সূর্য্য সেন চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন না। পলায়িত অবস্থায় যে সকল বিপ্লবী তখনও জেলের বাহিরে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাদেরই সাহায্যে তিনি বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ চালাইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময় একদিন সংবাদ পাওয়া গেল যে বাংলার তৎকালীন ইন্‌স্পেক্টর জেনারল অফ পুলিশ মিঃ ক্রেগ ১লা ডিসেম্বর তারিখে চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন পথে চাঁদপুরে ট্রেণ হইতে ষ্টীমারে আরোহণ করিবেন। পুলিশের বড় কর্ত্তাকে এই সুযোগে হত্যা করিবার লোভ চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের নিকট দুর্নিবার হইয়া উঠিল এবং এই কার্য্য সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালীপদ চক্রবর্ত্তী।

১৯৩০ সালের ১লা ডিসেম্বর শেষ রাত্রে চট্টগ্রাম মেলে মিঃ ক্রেগের চাঁদপুরে পৌঁছাইবার কথা এবং তাঁহার মত একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী যে ট্রেণের প্রথম শ্রেণীর কামরাতেই ভ্রমণ করিবেন—তাহাতেও কোনও সন্দেহ নাই। ট্রেণখানি আগমন করিলে চাঁদপুরের ষ্টেশন প্ল্যাটফরমের উপর ঘুরিয়া ঘুরিয়া রামকৃষ্ণ ও কালীপদ ট্রেণের প্রথম শ্রেণীর কামরাগুলির মধ্যে মিঃ ক্রেগকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহারা একখানি কামরার মধ্যে কর্ণা ও তথা চেহারার সাহেবী পোষাকে সজ্জিত জনৈক ব্যক্তিকে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখিলেন। দেখিয়াই তাঁহাদের মনে হইল যে ঐ ব্যক্তিটই নিশ্চয় মিঃ ক্রেগ হইবেন। মনে হওয়া মাত্রই তাঁহারা সেই লোকটির উপরই সবল

করিলেন রিভলবারের গুলি এবং নিজের মধ্যে স্বাসত্যাগ করিয়া অমর হইয়া গেলেন। আততায়ীদিগকে ঘটনাস্থলেই ধৃত করা সম্ভব হইল না।

তাঁহার উপর এইভাবে গুলি বর্ষিত হইল, তিনি কিন্তু আসলে মিঃ ক্রেগ্ নহেন—তিনি ছিলেন ইন্‌স্পেক্টর তারিণী মুখোপাধ্যায়। মিঃ ক্রেগের রক্ষী হিসাবে তাঁহার চাঁদপুর পর্য্যন্ত আসিবার কথা ছিল। মিঃ ক্রেগ্ ভ্রমে বিপ্লবীরা কিন্তু তাঁহারই উপর গুলি চালাইলেন। গুলিবিদ্ধ হইয়া তারিণী মুখোপাধ্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত এই আক্রমণে সমগ্র চাঁদপুর ষ্টেশন সহসা অতিশয় চঞ্চল ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। চাঁদপুরের পুলিশ ঘাঁটিতে এবং আশ-পাশের অন্যান্য বড় বড় সহরগুলিতে অতি দ্রুত এই সংবাদ পাঠাইয়া দেওয়া হইল। চাঁদপুর সহর হইতে যে সকল রাস্তা বিভিন্ন দিকে গিয়াছে—পুলিশ সতর্ক দৃষ্টি রাখিল সেই পথগুলির উপর।

চাঁদপুর হইতে প্রায় মাইল কুড়ি দূরে মেঘের কালীবাড়ী নামক ষ্টেশন। সেই ষ্টেশনের নিকট পৌঁছিয়া ক্লান্ত রামকৃষ্ণ ও কালীপদ যখন একটু বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ বি. সি. দাশগুপ্ত তাঁহার দলবল লইয়া মোটরে করিয়া সেইখান দিয়া যাইতেছিলেন। দুইজনকে সেই অবস্থায় দেখিয়া তাঁহাদের সন্দেহ হইল এবং তাঁহারা রামকৃষ্ণ ও কালীপদর দিকে অগ্রসর হইলে তাঁহারাও পলায়নের চেষ্টা করিলেন। পুলিশের দলটিতে বহু লোক থাকায় পলায়ন করা তাঁহাদের পক্ষে আর সম্ভব হইল না। রামকৃষ্ণ ও কালীপদ উভয়েই ধৃত হইলেন। তাঁহাদের পরীক্ষা তল্লাস করিয়া যে আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া যায়—চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার হইতেই তাহা লুণ্ঠিত হইয়াছিল।

আলিপুরের স্পেশাল ট্রাইব্যুন্যালে মিঃ পার্লিক, মিঃ এম, কে, বসু ও খান আবিদমুজান চৌধুরীর নিকট ১৯৩১ সালের ৩রা জানুয়ারি হইতে রামকৃষ্ণ ও কালীপদর বিচার আরম্ভ হয়। বিচার শেষে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন এবং বয়স অল্প বিবেচনায় কালীপদ চক্রবর্ত্তীর প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হইল। রামকৃষ্ণ ছিলেন চট্টগ্রাম কলেজের বৃত্তিপ্রাপ্ত একজন মেধাবী ছাত্র। চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলের তিনি ছিলেন একজন প্রধান কর্ম্মী। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পূর্ব্বে বোমা তৈয়ারী কার্য্যে লিপ্ত থাকাকালে একবার তাঁহার গুরুতররূপে আহত হওয়ার বিষয় ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই ভাবে তাঁহার ফাঁসি হইয়া যাওয়ায় বিপ্লবী দলটির খুবই ক্ষতি হইল।

বিপ্লবীদিগের কার্য্যকলাপ কিন্তু চলিতেই লাগিল। বিপ্লবী তারকেশ্বর দস্তিদার ও বীরেন্দ্র সেন-এর অনুসরণরত থাকাকালে ১৯৩১ সালের ১৬ই মার্চ্চ বরমা নামক স্থানে পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর শশাঙ্ক ভট্টাচার্য্য তারকেশ্বরের নিক্ষিপ্ত রিভলবারের গুলিতে আহত হইলেন। অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা উপলক্ষে যে সকল বিপ্লবী জেলখানার মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাদের সহিত বাহিরের বিপ্লবীদের গোপনে যোগাযোগ স্থাপিত হইল। বিচারাধীন বন্দীদিগকে মুক্ত করিবার জন্য ইহার পর আরম্ভ হইল এক ব্যাপক ষড়যন্ত্র। বন্দিগণকে মুক্ত করিবার দুইটি উপায় ছিল। যখন তাঁহাদিগকে বিচারার্থ কোর্টে হাজির করা হইত, তখন সুবিধামত কোনও এক সময় বিস্ফোরণ ও ধ্বংস কার্য্য ঘটাইয়া আগ্নেয়াস্ত্র সহ রক্ষীদিগকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাদিগকে মুক্ত করার সম্ভাবনা ছিল; অথবা জেলখানার অভ্যন্তরে বিস্ফোরক পদার্থ ও আগ্নেয়াস্ত্র প্রেরণ করিয়া উহার সাহায্যে জেলখানার অংশ বিশেষ উড়াইয়া দিয়া বিপ্লবীদিগের পলায়নের পথ প্রশস্ত করা যাইত। দুইটি পরিকল্পনা লইয়াই কার্য্য সুরু হইল এবং ইহার মূলে রহিলেন নেতা সূর্য্য সেন, নির্ম্মল সেন এবং তারকেশ্বর দস্তিদার প্রভৃতি। আদালত-গৃহের প্রবেশ পথের নিকট ডিনামাইট স্থাপনের ব্যবস্থা হইল; কিন্তু বিপ্লবীদের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই ষড়যন্ত্রটি অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিল না—অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া গেল। ১৯৩১ সালের ২রা জুন আদালত-গৃহের নিকটে অতি প্রত্যূষে বিস্ফোরক পদার্থপূর্ণ একটি আধারসহ একটি বালক সন্দেহবশে ধৃত হইল। ইহার পর পুলিশ ষড়যন্ত্রের আভাষ পাইয়া তল্লাসী চালাইল বহু স্থানে এবং তাহার ফলে উদ্ধার করিল বৈদ্যুতিক তার, বাল্ব, বিস্ফোরক দ্রব্যপূর্ণ আধার প্রভৃতি। আদালত-গৃহ এবং গোয়েন্দা পুলিশের কার্য্যালয়ের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে মারাত্মক প্রকারের বিস্ফোরকদ্রব্যপূর্ণ আধার আবিষ্কৃত হয়। এই উপলক্ষে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়া যে মামলা রুজু হয়, তাহাই ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলা নামে অভিহিত।

ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলাতে আসামী ছিলেন অর্দ্ধেন্দু গুহ, অনিল রক্ষিত, নিবারণ ঘোষ, রবীন্দ্র সেন, সুধীন সেন, প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায় এবং অপূর্ব্ব সেন। ১৯৩১ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর এই মামলায় যে রায় প্রদত্ত হয় তাহাতে অর্দ্ধেন্দু, নিবারণ ও রবীন্দ্রের প্রতি তিন বৎসর হিসাবে কারাদণ্ডের আদেশ হয় এবং সুধীন ও প্রফুল্লের কারাদণ্ড হয় দুই বৎসর হিসাবে। অনিল রক্ষিতও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। অপূর্ব্ব সেন কিন্তু পলাতক হইয়া রহিলেন।

উপরোক্ত পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হইয়া গেলেও বিপ্লবীরা মোটেই হতাশ হইলেন না। অসীম অধ্যবসায় ও সতর্কতা সহকারে তাঁহারা অপর পরিকল্পনাটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জেলখানার ভিতর হইতে উহার অংশ বিশেষ বিস্ফোরণ ঘটাইয়া উড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। জেলখানার মধ্যে তখন কঠোর সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছিল। সেই ব্যবস্থাকে এড়াইয়া জেলখানার মধ্যে প্রচুর পরিমাণ বিস্ফোরক দ্রব্য ও অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণের কথা কেহ কল্পনাও করিতে পারে না, কিন্তু অন্য যাহা কল্পনাও করিতে পারে না—তাহাই বাস্তবে রূপায়িত করা, চট্টগ্রামের বিপ্লবীগণের বৈশিষ্ট্য। তাই এই অসম্ভবও সম্ভব হইল। কুখ্যাত নেতা সূর্য্য সেনের পরিচালনায় বিপ্লবীরা প্রচুর পরিমাণ অর্থ এই উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং জেলখানার কর্ম্মচারীদিগকে বশীভূত করিবার জন্য উহা ব্যয়ও করিতে লাগিলেন অকাতরে। বহু কর্ম্মচারীকে

এই ভাবে গোপনে মনস্থির করিয়া অতি সন্তর্পণে ও সাবধানতার সহিত বিবিধ দ্রব্য সম্ভার জেলখানার মধ্যে বিপ্লবীদিগের নিকট চালান যাইতে লাগিল ; কিন্তু প্রতিবন্ধক কে খণ্ডন করিবে ? তাই সফলতার পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াও এই পরিকল্পনাটিও শেষ পর্য্যন্ত বানচাল হইয়া গেল।

১৯৩১ সালের জুন মাসেরই শেষাশেষি। জেলখানার কয়েদীদের প্রকোষ্ঠেরই সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণের সংস্কার কার্য্য চলিতেছিল। আজ মৃত্তিকা খননের পরই সহসা মাটির তলা হইতে একটি ইলেকট্রিক বাল্ব পাইয়া সকলে বিস্মিত হইয়া উঠিলেন এবং সে সংবাদ তৎক্ষণাৎ জেলখানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে জানান হইল। সন্দেহ সকলেরই দৃঢ় হইয়া উঠিল। অতিশয় সাবধানতার সহিত আরও মৃত্তিকা খনন করিয়া যাহা পাওয়া যাইতে লাগিল—তাহাতে সকলেই হতবাক্ হইয়া গেলেন। মাটির তলা হইতে বাহির হইতে লাগিল জোরা, তরবারি ও আগ্নেয়াস্ত্র—ইলেকট্রিক তার, বারুদ ও বিস্ফোরক দ্রব্য। বড়যন্ত্রটি অব্যর্থরূপেই এই ভাবে নষ্ট হইয়া গেল এবং কড়াকড়ির ব্যবস্থা আরও জোরালোরূপেই করা হইল।

পুলিশ ও মিলিটারির অত্যাচার চট্টগ্রামের অধিবাসীদিগের উপর ঝরিতেছিল সমানেই। এক দণ্ডও জনসাধারণের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবার উপায় ছিল না। খানাতল্লাসী, অত্যাচার ও গ্রেপ্তারে জনসাধারণ রীতিমত ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই দমননীতির প্রতিবাদকল্পে এইবার কোন্ বিপ্লবিগণ উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন।

জনাব লাহোর আসামুল্লা ছিলেন তৎকালে চট্টগ্রামের গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী এবং অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সম্পর্কিত ব্যাপারের তদন্তকার্য্যে তিনি ছিলেন গভীরভাবে লিপ্ত। চট্টগ্রামে বিভীষিকার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করায় তাঁহার দক্ষতা নেহাৎ কম ছিল না। বিপ্লবীদের রোষ এইবার তাঁহার উপর গিয়া পড়িল এবং তাঁহাকে হত্যা করিবার সুযোগ তাঁহারা খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সুযোগও ইহাই মিলিল। ১৯৩১ সালের ৩০শে অক্টোবর নিজাম পল্টনস্থ খেলার মাঠে চট্টগ্রামের ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলা অনুষ্ঠান এবং সেই উপলক্ষে পুরস্কার বিতরণের দিন ধার্য্য হয়। বিপ্লবীরা স্থির করিলেন যে ঐ দিনেই আসামুল্লা সাহেবের জীবনের উপর যবনিকা টানিয়া দিতে হইবে। এই গুরু দায়িত্বের ভার অর্পিত হইল হরিপদ ভট্টাচার্য্য নামক একটি তরুণ বালকের উপর। হরিপদর সহিত সূর্য্য সেনের সাক্ষাৎ কয়েকমাস পূর্ব্বে পরিচয় হইয়াছিল। হরিপদ ছিলেন একটি টোলের ছাত্র।

ফুটবলের ফাইন্যাল খেলার দিন চট্টগ্রামের প্রায় সকল উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীই খেলার মাঠে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে পাহারা দিবার জন্য সেদিন পুলিশ ও মিলিটারির ব্যবস্থাও খেলার মাঠে রীতিমতই হইয়াছিল। তাহারই মধ্যে বালক হরিপদ আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

খেলা শেষ হইয়া গেল—পুরস্কার বিতরণও নির্ব্বিঘ্নেই সম্পন্ন হইল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। সমবেত দর্শকবৃন্দ ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা একে একে তাঁহাদের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। খান বাহাদুর আসামুল্লাও খেলার মাঠ ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন এবং গেটের নিকট কয়েকজন ভদ্রলোকের সহিত দাঁড়াইয়া আলাপ পরিচয় করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য নিকটেই গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। এমন সময় সহসা উপর্য্যুপরি কয়েকটি গুলিবর্ষণের শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যে আসামুল্লা সাহেব রক্তাক্ত কলেবরে মাটির উপর লুটাইয়া পড়িলেন। সঙ্গের রক্ষীরা সেই হট্টগোলের মধ্যেই আগ্নেয়াস্ত্রসহ হরিপদকে ধরিয়া ফেলিল। কেবল মাত্র তাঁহাকে ধরিয়াই তাহারা ক্ষান্ত হইল না—প্রহার করিয়া তাঁহাকে অর্দ্ধমৃত করিয়া ফেলিল। আসামুল্লা সাহেবের শবদেহ এবং হরিপদকে লইয়া ইহার পর পুলিশ স্থান ত্যাগ করিল।

এই ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া চট্টগ্রামের অধিবাসীদের উপর বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যে অত্যাচার আরম্ভ করিলেন—তাহা যেন সীমা ছাড়াইয়া গেল। শাসন ক্ষমতা যাঁহাদের দ্বারা অধিকৃত, তাঁহাদেরই দ্বারা যে এইরূপ নিষ্ঠুর মারকীয় উৎপীড়ন সম্ভব হইতে পারে, চট্টগ্রামের তৎকালীন অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ না করিলে ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। পুলিশ ও মিলিটারি বাহিনী চট্টগ্রামের প্রতিটি গৃহস্থের বাটীতে বিভীষিকার দ্বারা-পাত করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল ধরপাকড় ও লুণ্ঠনকার্য্য। কেবলমাত্র তাহাই নহে। আসামুল্লা সাহেবের হত্যা-কাণ্ডকে উপলক্ষ করিয়া সুকৌশলে সাম্প্রদায়িকতারও সৃষ্টি করা হইল এবং পুলিশ ও মিলিটারি বাহিনীর সহিত একদল গুণ্ডাও অবাধে লুণ্ঠনরাজ ও খুন-জখম করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সেই নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনার হাত হইতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কেহই রেহাই পাইল না।

আর কিশোর হরিপদ ? তাঁহাকে লইয়া পুলিশ কি করিল ? পুলিশের নারকীয় নিষ্ঠুরতার যত রকমের প্রক্রিয়া থাকিতে পারে, তাহা সমূহই বালক হরিপদর উপর প্রযুক্ত হইতে লাগিল। হরিপদর কার্য্যের পশ্চাতে যে সূর্য্য সেন ও নির্ম্মল সেনের পরিকল্পনা বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হইল না ; সুতরাং তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থান, পরবর্ত্তী পরিকল্পনা এবং তাঁহাদের দলটির সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহের আশায় হরিপদর উপর বিবিধ প্রকারের নির্য্যাতন চালান হইতে লাগিল। তাঁহার অঙ্গুলীর নখের পার্শ্বে সূচ ফুটান হইতে লাগিল, চার্জ দেওয়া হইতে লাগিল ইলেকট্রিক ব্যাটারির—আবার আদর্শ শান্তির নমুনা দেখাইয়া জনসাধারণকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিবার জন্য এক মিয়াট পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী হরিপদকে লইয়া প্রহার করিতে করিতে পথে-ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহার ফলে কখনও বা হরিপদ চক্ষু, মুখ অথবা নাসিকা দিয়া রক্ত নির্গত হইতে থাকে—আবার কখনও বা প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া ফুলিয়া উঠে। সাম্রাজ্যবাদের নগ্নরূপ প্রকাশ পাইতে থাকে ; কিন্তু হরিপদ কি এই অত্যাচারের নিকট নতি স্বীকার করিলেন ? এত

নির্য্যাতন চালাইয়াও কি পুলিশ তাঁহার নিকট হইতে বিপ্লবীদের সম্বন্ধে একটি কথাও আদায় করিতে পারিল? তাহা পারিল না। একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবীর দেশপ্রেম ও নিষ্ঠার চরম ও পরম বিকাশ সেদিন দেশবাসী হরিপদর মধ্যে দেখিয়া ধন্য হইল। দমন অত্যাচার-উৎপীড়নের মধ্যেও তিনি রহিলেন—একইভাবে দৃঢ়, নির্ভীক ও অনমনীয়।

উপর্য্যুপরি চারিটি গুলির আঘাতে খান বাহাদুর আশানুল্লা মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছিলেন। যথাসময়ে হরিপদর বিচার শেষ হইল। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন আই-সি-এস বিপুল যুক্তির সাহায্যে বিচার করিয়া হরিপদকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করিলেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা হইলে মৃত্যুদণ্ড রদ্ হইয়া হরিপদর প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হইল।

চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলটি ইতিমধ্যে আশ-পাশের কয়েকটি জেলাতেও তাহাদের কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপন করিতেছিলেন। জালালাবাদ যুদ্ধে অংশ-গ্রহণকারী বিনোদ দত্ত দলের নেতাদের নির্দ্দেশে কুমিল্লায় গিয়া সেখানকার বিপ্লবী দলটির নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। এই সময় কুমিল্লার সহকারী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এলিসন সেখানকার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান-সমূহের কর্ম্মীদিগের উপর এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিদিগের উপর দমননীতি চালাইয়া অতিশয় কুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বিনোদ দত্তের পরিচালনাধীন কুমিল্লার বিপ্লবী দলটি মিঃ এলিসনের প্রাণ সংহার করিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন।

ইহার পর হইতে বিপ্লবীরা মিঃ এলিসনের গতিবিধির উপর নজর রাখিতে লাগিলেন। হত্যার ভার অর্পিত হইল দলের অন্যতম কর্ম্মী শৈলেশ রায়ের উপর। হত্যার জন্য নির্দ্দিষ্ট দিনে একটি পথের ধারে শৈলেশ রায় রিভলবার লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে মিঃ এলিসন সাইকেলে চাপিয়া সেই স্থানে আসা মাত্র তাঁহার উপর গুলি বর্ষণ করিয়া চকিতে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। কাহার দ্বারা যে হত্যাকাণ্ড সাধিত হইল, তাহা কেহই তখন জানিতে পারিল না। বহু চেষ্টা করিয়াও পুলিশ আততায়ীর কোনও সন্ধান পাইল না।

নরেশ গুহ ছিলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার অন্যতম নির্দ্দিষ্ট আসামী। চট্টগ্রাম হইতে তিনি ঢাকায় চলিয়া যান। সেখানে গিয়া তিনি রমেন ভৌমিক নামক নোয়াখালির অপর একজন বিপ্লবীর সহিত ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডুর্গোকে একদিন হত্যা করিবার চেষ্টা করিলেন। ঘটনার দিন অপরাহ্ণকালে নরেশ গুহ ও রমেন ভৌমিক একটি দোকান হইতে মিঃ ডুর্গোকে একটি মদের দোকানে প্রবেশ করিতে দেখিলেন। ইহারই অল্পকাল পরে মিঃ ডুর্গো যখন মদের বোতল লইয়া দোকান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বাহিরে অপেক্ষমান আপনার গাড়ীতে আরোহণ করিতে যাইবেন, অমনি তাঁহার উপর রিভলবারের গুলি বর্ষিত হইল। মিঃ ডুর্গো আহত হইয়া পড়িয়া গেলেন এবং আততায়ী দুইজন অতিশয় তৎপরতার সহিত মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হইলেন। এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া ঢাকায় ব্যাপকভাবে ধর-পাকড় ও খানাতল্লাস হইল বটে, কিন্তু প্রকৃত আক্রমণকারীদের কোনও সন্ধানই পুলিশ সংগ্রহ করিতে পারিল না।

এদিকে পটিয়া মহকুমার কলুয়াই গ্রামের এক গুপ্ত কেন্দ্র হইতে পুলিশ অম্বিকা চক্রবর্ত্তীকেও গ্রেপ্তার করিল। তাঁহাকে যখন গ্রেপ্তার করা হয়, তখন তিনি পীড়িত ছিলেন। ১৯৩২ সালের ২৬শে আগষ্ট কলিকাতার মাণিকতলা ষ্ট্রীটের একটি মেস হইতে বড়তলা থানার সাব্-ইন্‌স্‌পেক্টর ষতীন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিপ্লবী হেমেন্দু ঘোষ দস্তিদারকে গ্রেপ্তার করেন। হেমেন্দুর ভ্রাতা অরেন্দুই জালালাবাদ যুদ্ধে আহত হইয়া পরে হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। নোয়াখালি জেলার রহমতপুর গ্রামে সরোজ গুহ ধরা পড়েন। তাঁহাদের লইয়া অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার দ্বিতীয় পর্য্যায়ের বিচার আরম্ভ হয়। তাঁহাদের বিচারার্থ গঠিত স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের কর্ণধার ছিলেন চট্টগ্রামের জেলা জজ মিঃ এ. ডি. ইউলিয়ামস্, মিঃ এ. এফ. এম. রহমান ও হিরণ্ময় মুখোপাধ্যায়। মিঃ এ. ডি. ইউলিয়ামস্ এই ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

অশ্রু-অর্ঘ্য

শ্রীবীণা দেবী

নয়নের জলে অর্ঘ্য রচিনু
হে কবি তোমার আঙিনা 'পরে,
আবিলতা সব ধুয়ে গেল আজ
শ্রাবণ-সন্ধ্যা অঝোরে ঝরে!
আনি নাই ফুল, গাঁথি নাই মালা
জ্বালি নাই ধূপ, নাই দীপ জ্বালা,
শুধু-হৃদয় শূন্য-ধরণী
অশ্রু-সলিলে ভরাই ভালো
তাইতো সিক্ত তোমার আঙিনা
বকুলের তলে স্মৃতির আলো।
কবিতার রসে ভরা ও হৃদয়
দিয়েছ মেলিয়া আকাশে ছুঁয়ে,—
কবি-দেহ আজ অস্ত হ'য়েছে—
কবি-প্রাণ আছে ধরণী ছুঁয়ে।

আকাশ পথের যাত্রী

শ্রীসুষমা মিত্র

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

Rotunda হাসপাতালের ছাত্রাবাসে আমাদের জন্য দু'টি ঘর ঠিক করা হয়েছিল। সেখানকার Lady House Keeper আমাদের যথাযথ বন্দোবস্ত করে ঘরে মালপত্র তুলে দিয়ে Breakfast পাঠিয়ে দিলেন। ট্রেনের গোলমালের দরুণ আমাদের পৌঁছতে একটু দেরীই হয়েছিল.

সেন্ট্রপ্যাট্রিকের সহধর্ম্মিণী এবং তাঁহার পুত্র

ছাই ঘরি ছাড়াছাড়ি বেরিয়ে গেলেন মিটিংএ যোগদান করতে। ছাইয়ে ঘর্ম্ম, ঘর্ম্ম, দুই পড়ছে, ক্লেদে ভরা আকাশ ; আমরা আর বেরোতে না পেরে ঘরেই বিশ্রাম করলাম.

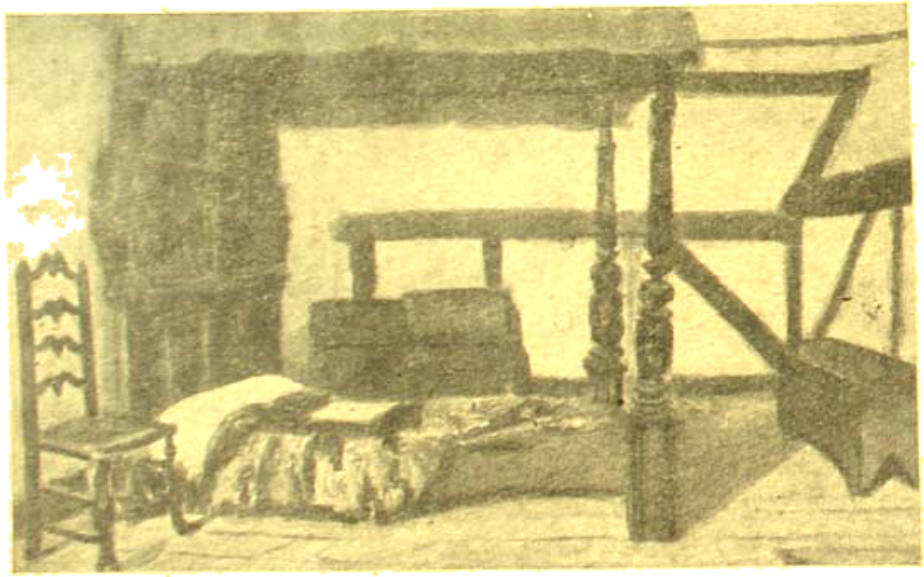

সেন্ট্রপ্যাট্রিকের সহধর্ম্মিণীর শয়ন কক্ষ

বিশ্ব বিদ্যাত Rotunda হাসপাতাল আজ ২০০ বৎসরে পদার্পণ করল, সেই উপলক্ষেই এখানে এই International Medical Congress আহ্বান করা হয়েছে। দেশবিদেশের বহু বিশিষ্ট চিকিৎসক আহুত হয়ে এসেছেন। আমাদের বাড়ীটিতেও অনেক বিশেষ অতিথি আছেন এবং বাকি ঘরগুলি কলেজের ছাত্রছাত্রীতে ভরা।

আজ রাত ৮টায় ইউনিভার্সিটির তরফ থেকে অতিথিদের জন্য একটি Receptionএর ব্যবস্থা হয়েছে। সেখানে সকলের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হল ; তারপর ছবি তোলার পালা শেষ হলে ঘরে ফিরলাম।

৮ই জুলাই। সকাল ৮টায় উনি Medical Congressএ চলে গেলেন। আমার জ্বর-ভাব হওয়াতে সারাদিন ঘরেই রইলাম। Lady House Keeper আমার সেবা যত্ন খুবই করছেন। তিনি আমাকে একলা থাকতে দেখে তাঁর অফিস ঘরে নিয়ে গিয়ে বইএর পোকা দিয়ে বসিয়ে দিলেন।

৭ তারিখ হ'তে ১২ তারিখ অবধি এই কংগ্রেসের অধিবেশন চলল ; রোজই রাতে অতিথিদের আপ্যায়িতের জন্য নানাস্থানে ভোজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার মধ্যে আমার সব চেয়ে ভালো লাগল ১০ই তারিখে বিকেলের Garden Partyটি।

এখানে অনেকের সঙ্গেই বেশ সহজ এবং সুন্দরভাবে আলাপ পরিচয় হয়েছিল বটে, তবে আইরিশদের দেশ-প্রতীক De Valeraর কথাটাই আজ বেশ করে মনে পড়ছে।

চমৎকার লোক। ওঁর সঙ্গে অনেক কথাই তিনি বলেন। কথা বলতে বলতে হঠাৎ De Valera জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমাই কি তোমাদের দেশে হিন্দুমুসলমানের problem খুব acute ?"

উনি বলেন—"একটুও না। আমরা বহুবছর একসঙ্গে এক-জায়গায় বাস করছি ; এ problem কখনও ওঠেনি। এই সম্পূর্ণ manmade problem এবং তুমি আমার চেয়ে ভালো জান কারা এটা করেছে।"

De Valera শুনে বললেন—"ঠিক বলেছো ডাঃ মিত্তির। আমি জানি—এটা ইংরাজদের একটা প্রকৃতিগত কুটিল স্বভাব। আমরাও 'আলস্টার' নিয়ে সেইজন্য অনেক কষ্ট পাচ্ছি।"

এমন খোলাখুলিভাবে কথা বলতে দাবলেন বলে তো আমরা অবাক্।

লেবকালটায় De Valera বললেন—"যদি পার ত হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের ভিতর একটা কিছু Common link রাখতে চেষ্টা কোরো—নইলে পরে মুস্কিল হবে। আমিও সেইজন্য ইংলণ্ডের সঙ্গে কিছু যোগ রেখেছি—নইলে Northern Ireland আমাদের একেবারে হাতছাড়া হয়ে যাবে।"

তিনি আরো বলেন—"গান্ধীকে Christএর মত সম্মান করতে পারি বটে, কিন্তু তাঁর policyতে কোনও দেশ স্বাধীন হ'তে বা সে নীতি Civil war বন্ধ করতে পারবে না। সেখানে হাতের জোর থাকা চাই এবং দরকার হলে সে জোর কাজেও লাগাতে হবে।"

তিনি বলেন—মহাত্মাজী তো তাঁর বিরোধী নন। Do or Die তাঁর নীতি। প্রয়োজন হ'লে জোর দেখাতে হবে বৈকী।

রোটারায় ইন্টারন্যাশান্যাল মিডিক্যাল কংগ্রেসের খাবার পার্টি

ভদ্রলোক শুধু চিন্তাশীল তাই নয়, অদ্ভুত কর্মীও বটে। এই মুক্তি মঠের কুচ্ছ্র সাধকের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি।

১৯ই জুলাই। আজ এখানকার India Leagueএর শুভ

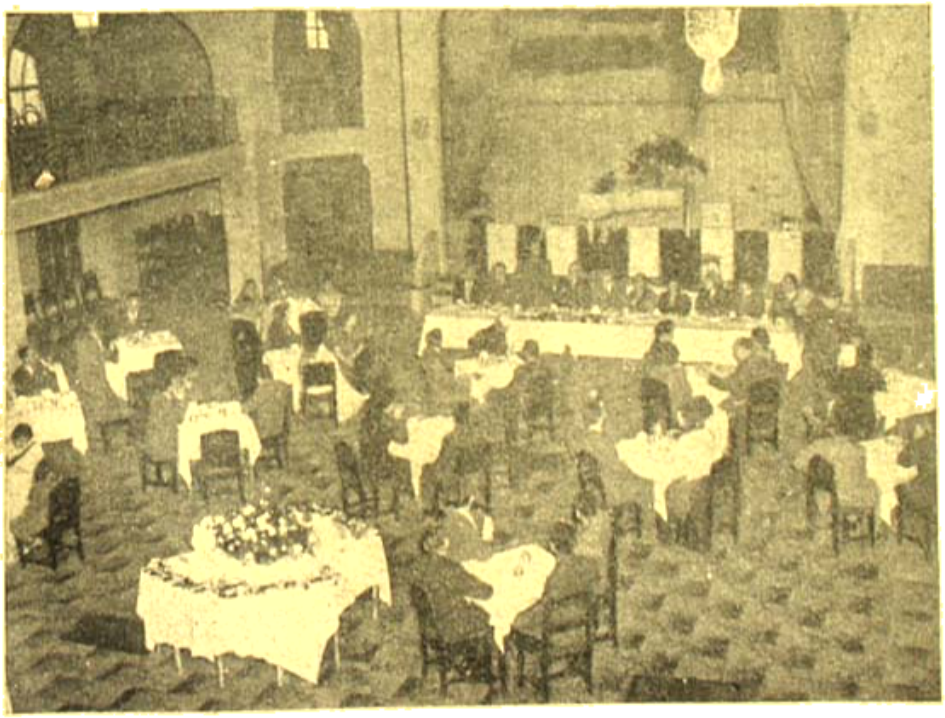

রোটারায় ইণ্ডিয়া লীগের সম্বর্দ্ধনা সভা

উপলক্ষে ভারতীয়গণ এক অধিবেশনের আয়োজন করেছেন। চায়ের নিমন্ত্রণে সকলকে ডাকা হয়েছে। তাঁকেই গ্রহণ করতে হল Guest in chiefএর আসন। বহু বিশিষ্ট আইরিশ ভদ্রলোক উপস্থিত হয়ে তাঁদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে একজন আইরিশ বক্তা বলেন যে আয়ারল্যাণ্ড দীর্ঘ সাত শত বৎসর ধরে বৃটিশের করাঘাতে থেকে যে দুঃখ দুর্দ্দশা বহন করেছে তা অবর্ণনীয়। কিন্তু যতকাল ধরে এই নিদারুণ দুঃখদুর্দ্দশার মধ্য দিয়ে এসেও তারা "মুক্তিপাগল ভাগ্যহারা আয়ার্ল" হয়ে স্বাধীনতার আলোক পেয়েছে। ভারতও দুই শত বৎসর এই পরাধীনতার দুঃখ ভোগ করে আসছে, কিন্তু তার মুক্তি আসন্নপ্রায়। (চলবে ভারত

স্বাধীন হয়ে নয়। ভারতের ও আমেরিকার মাঝে যেন একটা বহুযুগের মাঠের মেঠোপথ ধরে ছোট ছোট পাহাড়ের সারি প্রাচীরের মত, অদূর দূরে যায়।

তারা সবাই ভারতের প্রতি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানালেন

অভ্যর্থনার প্রেসিডেন্ট ডাঃ মিত্রকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন

এয়ারন নদী তীরে লেখিকা ও কন্যা ছবি

১৮ই জুলাই। সকালে একটি ট্যাক্সিতে করে সহরের বাইরে বেড়াতে গেলাম। সহরের বাইরে সমুদ্র মাঠের দৃশ্য অতি অপূর্ব। শস্যশ্যামলা বসুন্ধরা মতই দেশটি উর্বরা; ক্ষেতগুলি শস্যে পরিপূর্ণ। গমের ফলন ও পশুপালন গৃহস্থের শ্রীবৃদ্ধি করেছে; দেশে খাদ্যের অভাব নেই। যদিও সম্প্রতি এই যুদ্ধবিগ্রহের ফলে জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি হেতু অসুবিধার ঘটন ঘটেছে। এ দেশে শীতের প্রকোপ যেমন সারা বছর ধরে, বৃষ্টির অত্যাচারও তেমনি।

আমরা মদ তৈরীর কারখানার পাশ দিয়ে Derbyর ঘোড় দৌড়ের মাঠ পেরিয়ে সহরের অপরদিকে চললাম। কিছু দূর গিয়ে ড্রাইভার একটি বাড়ী দেখিয়ে বলল সেই বাড়ীটিতে নাকি মৃতদেহকে 'মমি'তে রূপায়িত করা হয়।

আমরা Rotundaর ফিরে Lady Hostess Keeperএর হিসাব চুকিয়ে বিদায় হলাম। Air Officeএর সামনে এসে দেখি আমাদের পরিচিত সেই Air Officerটি তাঁর ছোট মেয়েটিকে সঙ্গে করে এসেছেন আমাদের বিমানে তুলে দিতে।

এদেশের লোকেরা যেমন অমায়িক, তেমনই ভদ্র; এদের ব্যবহারে প্রত্যেক ভারতীয়ই অতিশয় তুষ্ট। কয়েকজন ভারতীয় ছাত্রদের কাছে শুনলাম যে তাদের কলেজের সহপাঠী আইরিশ বন্ধুগণ ভারতীয়দের সকল সময়ে যথাসাধ্য সাহায্য করে থাকে এবং তাদের কাজের সুযোগ সুবিধা ও হুদ্যোবস্ত করে দেয়।

বেলা পটের সময় Air Linerএর বিমানখানি আকাশে উড়ল। ছোট বিমান বেশ নীচে দিয়ে চলেছে। নীচে তাকালে মনে হচ্ছে এই বুঝি গাছের ডগায় আটকে গেলাম। আমরা সাগর পেরিয়ে ইংলণ্ডের উপরে চলে এলাম। ছোট ছোট মেঘের স্তবক ভেদ করে বিমান মাটীর দিকে নেমে চলল। আমরা লণ্ডনের ইটরো এরোড্রমে এসে দাঁড়ালাম। তারপর আবার সেই Balleys Hotelএ গিয়ে মালপত্তর নিয়ে ওঠা।

আমাদের ঠিক ছিল আয়ারল্যাণ্ড থেকে Glasgow হয়ে Amster- ও Paris নগর ঘুরে লণ্ডনে ফিরব ; সেই মত টিকিট ও হোটেলের dam ব্যবস্থাও করা হয়েছিল, কিন্তু এতটা ঘোরার পর আমার ও খুকুর শরীর বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তার উপর আবার যাত্রার শেষ দিকটায় মেঘের জন্য মনটাও বড় ঈষুণ হয়েছিল, তাই এবারকার মত ওটুকু বাদ দিয়েই সরাসরি লণ্ডনে চলে এলাম। এখানে পৌঁছে যেন একটা ঘোরাপ্তির নিশ্বাস ফেলাম। জানি না কেন লণ্ডন সহরটা এবার একটু বেশীই ভালো লাগছে। আমার কেবলই মনে হচ্ছে এখানে Skyscraperগুলি মুক্ত আলো বাতাসের পথ রুদ্ধ করে সারি সারি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে নেই। চারিদিকের এই খোলা আলো হাওয়া যেন দ্বিপ্রাহরের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

এখন ঘরমুখী মন। প্রতিদিনই উৎসুক আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে আছে কবে ঘরোপে ফিরব। আমরা প্রায় ১০দিন এখানে রইলাম। একদিন Oxford বেড়িয়ে এলাম। খুকুর ইচ্ছায় Shakespeareএর আবাসভূমি দেখতে Avon নদীর উপকূলে Stratford সহরে আর একবার গেলাম। Shakespeareএর বাড়ীর প্রত্যেক কোনটি খুকুর জানা, সে Loreto স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়েছে। কোথায় সেই চেয়ারখানা যেখানে বসে তিনি অমুক বইখানা লিখেছিলেন, কোথায় সেই Statueটি যেটা Shakespeareএর বসবার ঘরে ছিল ইত্যাদি। এই সব দেখেশুনে মনে হচ্ছিল শিশুদের দেখবার এবং জানবার কত সাধ। আজ যে Shakespeare সম্বন্ধে সে এত সজাগ তার কারণ স্কুলে সে Shakespeareএর বিষয় অনেক কিছু পড়েছে এবং স্বাভাবিক ভাবেই অনুপ্রাণিত হয়েছে। কেন খুকুর মত ছেলেমেয়েরা এ দেশেও কালিদাস, বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের খুটিনাটি সম্বন্ধে এই রকমভাবে অনুপ্রাণিত হবে না? কোথায় আছে সেই ধরণের বই এবং কেইবা আমাদের ছেলেমেয়েদের এই সব মহামনীষীদের কথা শেখাবে।

আমরা ২৮শে জুলাই রাত ৯টায় লণ্ডন ছেড়ে ভারতের দিকে যাত্রা করলাম। আমাদের এই যাত্রার উদ্যোগ পর্ব্বটা খুব নির্ঝিঞ্ঝাটে হয়নি। কেবলা Pan American Planeএর ইঞ্জিন খারাপ হওয়ার জন্য আমাদের যাত্রার তারিখ দু'দিন পিছিয়ে গেল। পথে বিশেষ কিছু কষ্ট হয়নি বটে কিন্তু ইস্তাম্বুলে আমার সেই ইঞ্জিনের গোলমাল হওয়ার জন্য পুরো একদিন এয়ারোড্রোমেই বসে থাকতে হল।

পরদিন বেলা ১টায় আমরা কলিকাতায় পৌঁছলাম। বাংলার মাটী, বাংলার গাছপালা, বাংলার রাস্তা, বাংলার ঘরবাড়ী যে এত সুন্দর এত মধুর তা সারা পৃথিবী ঘুরে এসে আজ প্রথম অনুভব করলাম। বন্দেমাতরম্!

সমাপ্ত

কলিকাতা বন্দরের প্রচ্ছন্ন বিপদ ও নাগরিকগণের কর্ত্তব্য

শ্রীরবীন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

কি প্রকারে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নগর ও বন্দর ও পূর্ব্বভারতের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র কলিকাতা—পূর্ব্বকালীন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য-ব্যপদেশে স্থাপিত সামান্য উপনিবেশ হইতে ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া বর্ত্তমান সমৃদ্ধিশালী মহানগরের অবস্থায় পহুঁছিয়াছে, —এ ইতিহাস বাঙ্গালার স্বাধীনতা লোপের ক্লেশদায়ক বিবরণে পরিপূর্ণ। তবে একথা সত্য যে কলিকাতার ক্রমবর্দ্ধমান সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি বহুলপরিমাণে হুগলী নদীর তীরে এ নগরের বন্দররূপে অবস্থিতির উপর নির্ভর করিয়া আসিয়াছে ও আসিতেছে এবং একথাও সত্য যে ঐ নদীর উপর দিয়া সর্ব্বকালে ও সর্ব্বসময়ে সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচল করিতে পারে এইরূপ অপরিবর্ত্তনীয় হুগলীর জলপ্রবাহ—বিশিষ্ট নদীর অবস্থার উপর কলিকাতার বর্ত্তমান শ্রীসমন্বিত অবস্থার স্থায়িত্ব সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। নদীর ঐরূপ অবস্থার অবনতি ঘটিলে, কলিকাতা বন্দরের উপর প্রতিক্রিয়া কেপা দিবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এখন, আমরা স্বাধীনতালাভ করিয়া সেই কলিকাতা বন্দরকে অবহেলায় ও না বুঝিবার দোষে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিব,—ধারণারও অতীত এই দুর্মতি যেন আমাদের কখন না হয়। বিষয়টী পরিষ্কারভাবে বলা উচিৎ হইবে।

পদ্মা নদী হইতে উদ্ভূত নদীয়ার নদী শ্রেণী (Nadia River System) নামে খ্যাত ৩টী শাখানদী যথা ভাগীরথী, জলঙ্গী ও মাথাভাঙ্গার জলধারা মিলিত হইয়া হুগলী নদী সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ নদী-শ্রেণীর অন্তর্গত সকল শাখা নদীগুলিই পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট ও নির্ঝরশীল, এরূপ স্থলে ঐ শাখানদীসমূহের জলপথের সহিত হুগলী নদীর অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে। বর্ত্তমানে ভাগীরথীর উৎস বালিবদ্ধ অবস্থায় বুঁজিয়া যাওয়ায় উক্ত নদীর উর্দ্ধাংশের জলধারা বর্ষাকাল ব্যতীত সর্ব্বকালে ও সর্ব্বসময়ে শুষ্ক অবস্থায় থাকে। ইহার উপর অদূরের পরিত্যক্তক্রমে হুগলী নদীর প্রবাহ পরিবেষ্টনকারী অবশিষ্ট দুইটী শাখানদীর মধ্যে প্রধান মাথাভাঙ্গা নদী, পদ্মানদী হইতে বহির্গত হইবার উৎস সমেত বাঙ্গলা বিভাগ সম্বন্ধীয় অবৈধ, অন্যায় ও ভ্রমাত্মক রোয়েদাদমূলে পূর্ব্ববঙ্গের অংশভুক্ত হইয়া গিয়াছে।

ঐরূপ রোয়েদাদ বলবৎ থাকিলে হুগলী নদীর প্রবাহপোষণকারী

অতি আবশ্যকীয় মাথাভাঙ্গা নদীর জল-ধারা চিরতরে লোপ পাইবে এবং হুগলী নদীর অবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে অতীব ক্ষীণ ও হীন হইবে। এইরূপ ভাবে ঐ নদীর ভাগ্যবিপর্য্যয়ে উহার উপর দিয়া জাহাজ চলাচলের পথ বন্ধ হইয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা বন্দরও ধ্বংসের মুখে ধাবিত হইবে। ঐরূপ ঘটনা কি ভাবে ঘটিতে পারে, নিম্নে বর্ণিত হইল। বাটোয়ারা কমিশনের জেরা-ম্যান ম্যাডক্রিপ্ সাহেব যে ম্যাপ্খানির উপর নির্ভর করিয়া বাঙ্গালা কে বিখণ্ডিত করিয়াছেন তাহার সিদ্ধির উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে সঙ্কলিত বাঙ্গালা দেশের মানচিত্রে আসল মাথাভাঙ্গা নদীর উৎপত্তিস্থল ও ঐ নদীর আবশ্যকীয় পথ ও অবস্থিতি সম্পূর্ণ লুপ্ত করিয়া দিয়া তৎস্থলে পদ্মানদী হইতে উদ্ভূত জলঙ্গী নদীর প্রকৃত উৎস হইতে ৫ মাইল দূরে কাল্পনিক মাথা-ভাঙ্গার নদীরেখার কাল্পনিক উৎস বা (পদ্মা হইতে উদ্ভূত) কাল্পনিক উৎপত্তি বিন্দু দেখান হইয়াছে এবং ১৮ মাইল দূরে অবস্থিত ভৈরব নদী নামে প্রচলিত একটা মরা নদীর—মাথাভাঙ্গা নদী নূতন নামকরণ করিয়া সেই মরা নদীকে মাথাভাঙ্গা নদী নামে চালান হইয়াছে। এখানে বলা আবশ্যক যে আসল মাথাভাঙ্গা নদীর উৎস জলঙ্গী নদীর উৎস হইতে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত। জলঙ্গী নদীর উৎস হইতে ৫ মাইল দূরবর্ত্তী কৃত্রিম মাথা-ভাঙ্গা নদীর নদীরেখায় কৃত্রিম উৎস পশ্চিম বাঙ্গালার প্রতিকূলে সকল প্রকার অনর্থের ও অনিষ্টের মূল কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ম্যাডক্রিপ্ সাহেব বিভ্রান্ত হইয়া প্রকৃত মাথাভাঙ্গা নদীর উৎস হইতে ৫ মাইল দূরে উত্তরে, মাথা-ভাঙ্গা নদীরেখায় কাল্পনিক উৎসবিন্দু স্থাপন করিয়া ঐ কৃত্রিম নদীরেখার

দ্বারা উভয়বঙ্গ মধ্যস্থিত সীমানা রেখা করিয়া প্রকৃত মাথাভাঙ্গা নদীর জল-পথ হইতে পশ্চিমদিকে বহু দূরে,—খানাওয়ারি সীমারেখা টানিয়া ধরা-বিভাগ করিয়াছেন এবং এই উপায়ে মাথাভাঙ্গা নদীর প্রকৃত জলধারা উৎস-সহিত পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং এক্ষণে ঐ আসল নদীর উৎস ও আসল নদী পূর্ব্ব পাকিস্থানে রাষ্ট্রের ভূমির উপর অবস্থিত হইয়া ঐ রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ অধীন ও করায়ত্ত হইয়াছে। এইরূপ কৃত্রিমতা একটী তাজ্জব ব্যাপার। এক্ষণে অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে আসল মাথাভাঙ্গা নদীর মূল প্রবাহ-নিয়ন্ত্রণ পূর্ব্ব পাকিস্থান রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন ব্যাপার। উক্ত রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলেই এবং ঐরূপ ইচ্ছা করাই স্বাভাবিক, পূর্ব্ববঙ্গের ভিতর দিয়া প্রবাহিত আসল মাথাভাঙ্গা নদীর মূল প্রবাহ পূর্ব্ববঙ্গ এলাকাভুক্ত মিরপুর, দৌলতপুর, গাঙ্গনি ও আলমডাঙ্গার থানার সীমানার সংযোগ বিন্দুতে যেখানে মাথাভাঙ্গা নদীর মূল জলপ্রবাহ সর্ব্বপ্রথম দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পূর্ব্বশাখা, কুমার নদী নামে পূর্ব্ববঙ্গের ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, ঐ দ্বিধা বিভক্ত হইবার বিন্দুতে মাথাভাঙ্গা নদীর মূল জলপ্রবাহের গতি কুমার নদীর ভিতর দিয়া ফিরাইয়া দিলে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন বাধা বা আপত্তি থাকিবেনা। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল এই হইবে মাথা-ভাঙ্গা নদীর অবশিষ্ট জলধারা যাহা চুর্ণি-পাথানদীর ভিতর দিয়া হুগলী নদীতে মিলিত হইতেছে, ঐ জল-ধারা জল অভাবে মরা নদীতে পরিণত হইবে। যাঁহারা ১৯৪৭ সালে সংকলিত বলিয়া প্রচলিত কিন্তু (প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৪ সালে প্রস্তুত বলিয়া চিহ্নিত করিয়া ১৯৪৭ সালে প্রস্তুত হওয়া কি অসম্ভব বলিয়া মনে হইবে?) বাঙ্গালার মানচিত্র দেখিয়াছেন তাঁহারা ঐ কৃত্রিমতার ব্যাপারটী বেশ বুঝিতে পারিবেন। ঐ ১৯৪৪ সালের মানচিত্রই র‍্যাড্‌ক্লিপ্ সাহেব অবলম্বন করিয়া বঙ্গ বিভাগের কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। হুগলী নদীর এইরূপ শেষ পরিণতিতে হুগলী নদীর মুখস্থ জলপ্রবাহের উপর নির্ভরশীল বন্দরও ক্রমশঃ লুপ্ত হইবে। আশা করি, কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকগণ, বঙ্গীয় কংগ্রেস কর্ম্মীগণ ও বাণিজ্য-পতিগণ এই বিষয়ে অবহিত হইবেন। খুলনা প্রকাশ উহার বাঙ্গালার মধ্যে সীমানা সংস্থায় এই ব্যাপারটী দীর্ঘকাল পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের মারফতে ইণ্টার-ডোমিনিয়ন কনফারেন্সের সভাধিবেশনে প্রথম অধিবেশনে উত্থাপিত করিয়াছিলেন এবং ঐ বিষয়টী ট্রাইবিউনালে নিযুক্ত করিয়া বিচার করান হইবে সেই অধিবেশনে এইরূপ স্থির হইয়াছিল, কিন্তু তাহাও ৯মাস পূর্ব্বেকার কথা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা কেন্দ্রীয় সরকারের পরবর্ত্তী নিষ্ক্রিয়তার ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের ভিতর নৈরাশ্য দেখা দিয়াছে। এক্ষণে অনুরোধ উভয় গভর্ণমেণ্ট ঐ বিষয়ে তৎপর হইবেন।

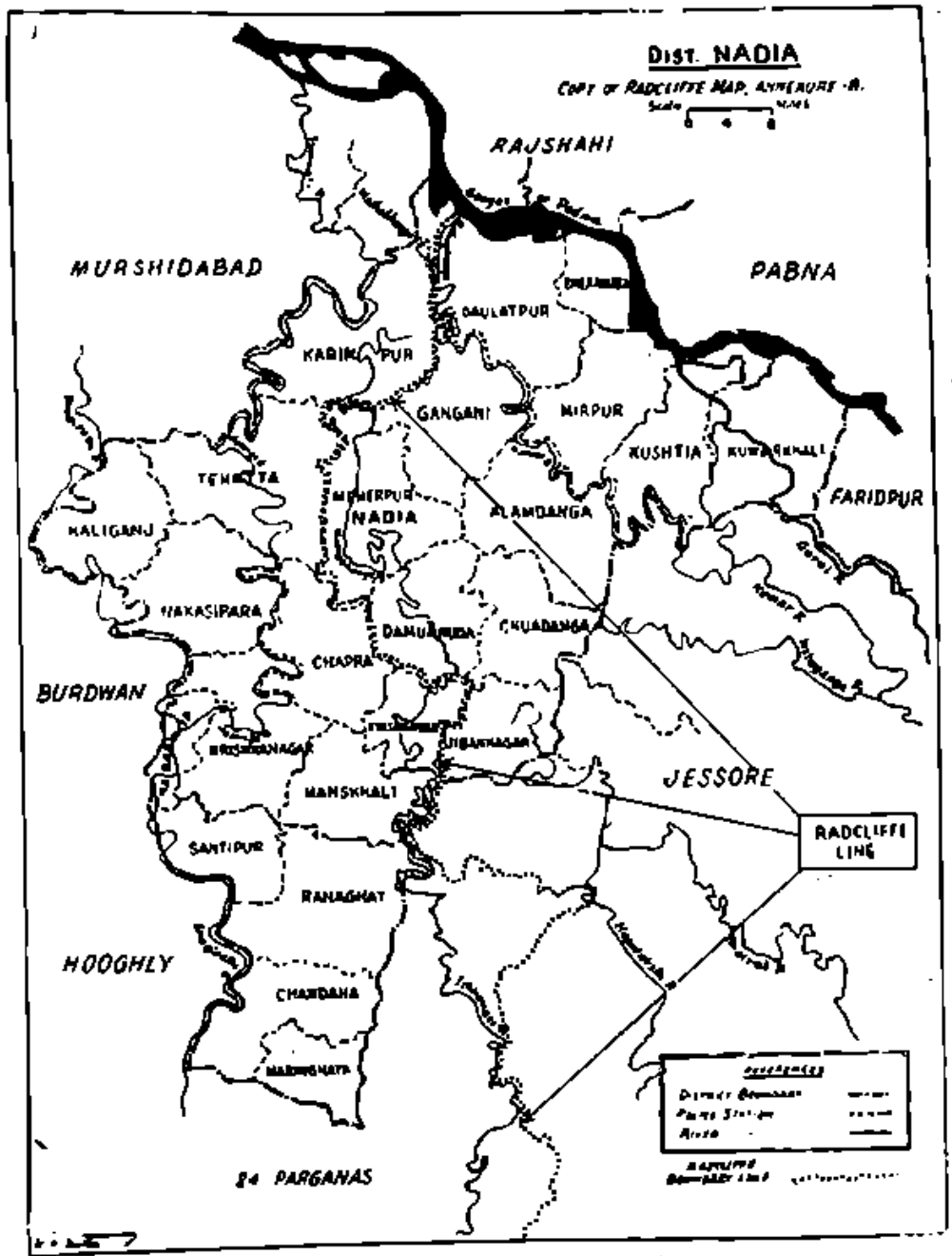

বিকৃত মানচিত্র (প্রকৃত মানচিত্র পূর্ব্ব পৃষ্ঠায়)

এখানে বলিতে বাধ্য হইলাম, যে উভয় সরকারেরই পরস্পরের হিতের জন্য দিবা তিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই বিরাট্ ব্যাডক্লিপ্ সাহেবের রোয়েদাদ নির্দ্দেশিত মূল নীতি অনুসারে—উভয় সরকার মধ্যে আপোষ নিষ্পত্তি হওয়া সমীচীন হইবে। আশা করি, পূর্ব্ববঙ্গ সরকার অনুধাবন করিয়া দেখিবেন যে মাথাভাঙ্গা নদীর উৎস হইতে মাত্র ১৬।১৭ মাইল দূরে হাডিংব্রীজ অবস্থিত; ঐ ব্রীজের নিরাপদ অবস্থা রক্ষা করিবার জন্য অবিলম্বে পদ্মার জলের চাপ কমান আবশ্যক এবং তজ্জন্য মাথাভাঙ্গা নদীর পদ্মানদীস্থিত মূল উৎস সংস্কার করিয়া মাথাভাঙ্গা নদীর মূল প্রবাহ চূণা খাখনদীর ভিতর দিয়া গতিশীল মাথাই হরিবেচনায় কার্য্য হইবে। মাথাভাঙ্গা নদী আপোষ সূত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অংশে নির্দ্দিষ্ট হইলে, ঐ জলস্রোত পরিপুষ্ট রাখা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্ত্তব্য হইবে।

কন্যাকুমারী

শ্রীবাসন্তী দেবী

গত এই ফেব্রুয়ারী দাক্ষিণাত্য তীর্থ ভ্রমণে যাত্রা করিয়াছিলাম। সঙ্গে ছিলেন আমাদের গুরুদেব, কয়েকজন গুরুভ্রাতা, আমার মা এবং স্বামী। এই তীর্থ ভ্রমণে দাক্ষিণাত্যের বহু বিশিষ্ট স্থান এবং দেবদেবীর মন্দির ও মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছি। তন্মধ্যে নিম্নে শুধু কন্যাকুমারীর কথাই উল্লেখ করিলাম।

১।৩।৬৯ তারিখে মাদুরা হইতে আমাদের রিজার্ভ বগি ত্রিবেন্দ্রমে পৌঁছিল। সেদিন গাড়ী লেট থাকায় বৈকাল সাড়ে তিনটার স্থলে সন্ধ্যা ৮টার সময় ত্রিবেন্দ্রমে আসিল। ২রা তারিখ সকাল ৮টার সময় আমরা কন্যাকুমারী দেবীকে দেখিবার জন্য রওনা হইলাম। ত্রিবেন্দ্রম্ হইতে কন্যাকুমারিকা যাইবার কোন রেলপথ নাই। ট্যাক্সি বা বাসে করিয়া যাইতে হয়। আমাদের জন্য একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করা হইল। ত্রিবেন্দ্রম্ হইতে কন্যাকুমারিকার দূরত্ব ৫৫ মাইল। ট্যাক্সি ভাড়া যাতায়াতে প্রতিখানা ৩০৲ টাকা করিয়া পড়িল। প্রশস্ত পিচ্ ঢালা রাস্তায় যাইতে কোনরূপ কষ্ট হয় নাই। এখানে ভারতমহাসাগর আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর মিলিয়া এক হইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরের সর্ব্বত্রই বন বসতি, তাহার তুলনায় এই স্থানে বাড়ীঘর বেশী নাই। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার একখানা বেশ ভাল বাড়ী আছে। দুইটি বর্ত্মশালাও আছে। কন্যাকুমারিকাতে যাইতে পথের শোভা অতি মনোরম। পথের দুইধারে ছবির মত বহু বাড়ীঘর এবং অসংখ্য নারিকেল গাছের সারি, কোথাও বা গগনচুম্বী পাহাড়শ্রেণী নানাবিধ ফলে ফুলে সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। কোন কোন স্থানে জলাশয়ের পদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে। এই গুলির দিকে তাকাইলে চোখ আর ফিরাইতে ইচ্ছা করে না।

আমাদের পাণ্ডা ঠাকুর আমাদেরই গাড়ীতে ছিলেন, তিনি কন্যাকুমারীর গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন।—

পূর্ব্বে বানাসুর নামক এক অসুর দীর্ঘদিন তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার দেখা পাইল। ব্রহ্মা অসুরের একাগ্র তপস্যায় মুগ্ধ হইয়া বর দিতে চাহিলে অসুর বলিল—কোন পুরুষে যেন আমার বধ না করে। ব্রহ্মা বর দেওয়ার সময় এর ফল কি হইবে তাহা চিন্তা করিলেন না। তিনি বলিলেন "তথাস্তু"। আর কি! অসুররাজ বর পাইয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইল। ক্রমে ক্রমে স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া বসিল। দেবতারা দুঃখে ইন্দ্ররাজ নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন। নারায়ণ বলিয়া দিলেন তুমি পৃথিবীতে যাইয়া দুহিতারূপে পার্ব্বতীকে পাইবার জন্য তপস্যা কর। তিনি যদি তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে পিতৃরূপে গ্রহণ করেন, তবে এই অসুরকুল ধ্বংস হইবে। নারায়ণের বাক্যে ইন্দ্ররাজ পৃথিবীতে যাইয়া কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। ইন্দ্ররাজের কঠোর তপস্যায় মুগ্ধা পার্ব্বতী যজ্ঞাগ্নি হইতে আবির্ভূতা হইয়া ইন্দ্রদেবকে ভয় নাই বলিয়া আশ্বস্ত করিলেন। অপূর্ব্ব সুন্দরী কন্যা দেবরাজের গৃহ আলোকিত করিয়া রহিলেন। ক্রমে কন্যার বয়স ৯ বৎসর হইল। বানাসুর লোকপরম্পরায় জানিতে পারিল যে ইন্দ্র তাহাকে বধ করিবার জন্য তপস্যা করিয়া কন্যা লাভ করিয়াছেন। হুঁ! ত্রিলোক কম্পিত যাহার ভয়ে, দেবতারা যাহার প্রবল প্রতাপে স্বর্গচ্যুত হইয়াছে তাহাকে বধ করিবে ক্ষুদ্র বালিকা। মদগর্ব্বে গর্ব্বিত অসুররাজ ত্রিলোক কম্পিত করিয়া যুদ্ধে আসিল। এই যুদ্ধই তাহার শেষ যুদ্ধ, সে আর যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিল না। দেবকার্য্য সমাধার পর কুমারী কন্যা মহাদেবের তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

কুমারীর তপস্যায় অসাধারণ নিষ্ঠা দেখিয়া মহাদেব প্রলোভিত হইলেন। আরাধ্য দেবকে সম্মুখে পাইয়া কুমারী একবার চাহিয়া দেখিয়া চক্ষু নত করিলেন। অন্তর্য্যামী পুরুষ কন্যার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন—আমি তোমার অভিপ্রায়ে সম্মত আমি কিন্তু একটি সর্ত্তে। কুমারী মুখ তুলিয়া চাহিলেন মাত্র। চাহনীর অর্থ হইতেছে, সেটি কি? মহাদেব বলিলেন—"বিবাহের যে লগ্ন স্থির হইবে, সে লগ্ন ভ্রষ্ট হইলে আর বিবাহ হইবে না।" ক্রমে বিবাহের দিন আসিয়া পড়িল। কুমারীর অধিবাসে হইয়া গেল। তিনি আরাধ্যদেবের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। এদিকে মহাদেবও ঠিক সময় মত বিবাহের আসরে পৌঁছিবেন বলিয়া বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু বাধ সাধিলেন দুষ্টমতি ঋষি নারদ। পথিমধ্যে তিনি মহাদেবকে একটি অতীব সুন্দর বীণাখানা

করিয়া দিতে বলিলেন। ঐ প্রশ্নের সমাধান শেষ করিয়া দিতে রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইল। প্রশ্নের সমাধান শেষ করিয়া মহাদেব যখন বাহির হইলেন ঠিক সেই সময় নারদ মুনি বন হইতে কা কা রব করিতে লাগিলেন। প্রভাত হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া মহাদেব আর কুমারীর বিবাহ বাসরে উপস্থিত হইলেন না। যে স্থানে তিনি রহিয়া গেলেন সেই স্থানের নাম—সুচিন্দ্রম্। এদিকে কুমারী কন্যা আশায় বসিয়া বসিয়া প্রহরের পর প্রহর কাটাইলেন। এলেন না আরাধ্য দেবতা, লগ্নভ্রষ্ট হইল দেখিয়া কুমারী তখন বিবাহের সাজশয্যা খুলিয়া ফেলিয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন।

গল্প শুনিয়া মন ভারাক্রান্ত হইয়া রহিল। আমাদের ট্যাক্সি আসিয়া কন্যাকুমারীতে পৌঁছিয়া গেল। একে একে আমরা সকলেই মটর হইতে অবতরণ করিলাম।

কন্যাকুমারী

গুরুদেব মটর হইতে নামিয়া মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সোজা সমুদ্রের তীরে জল মধ্যে নামিয়া বাঁধান একটি জায়গায় ধ্যান গম্ভীর হইয়া বসিলেন। ক্রমে ক্রমে আমরা সকলেই সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে সমুদ্র স্নানের জন্য বড় বড় পাথর দিয়ে মেরা দুইটি বাঁধান ঘাট আছে। একেবার শ্রীযুক্ত নারায়ণের মাসের বইতে পড়েছি যে এই দুইটি বাঁধান ঘাট পিতৃ তীর্থ ও মাতৃ তীর্থ নামে পরিচিত। এইখানে নাকি পরশুরামের মাতৃহত্যা পাপ দূরীভূত হইয়াছিল, পিতৃ আজ্ঞায় পরশুরাম যে কুঠারের দ্বারা মাতৃহত্যা করিয়াছিলেন ঐ কুঠার তাঁহার হাতে আটকাইয়াছিল। তা কা জে লা র অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্র নদে লাঙ্গলবন্ধ ঘাটে স্নান করিয়া ঐ কুঠার তাঁহার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল কিন্তু মাতৃহত্যা পাপ ওখানেও দূর হইল না। এই স্থানে আসিয়া স্নান করায় সেই মাতৃহত্যা পাপ বিমোচন হয়। সে কারণে এই স্নান-ঘাটের নাম মাতৃতীর্থ হইয়াছে। কথিত আছে পরশুরামজী এই কুমারীদেবীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

ঘাট অতিক্রম করিয়া আমরা সমুদ্র গর্ভস্থিত একটী পাহাড়ে যাইয়া বসিলাম। ডাক্তারবাবু এখানকার ফটো তুলিয়া লইলেন। কি মনোহর দৃশ্য—ভারতমহাসাগর, আরবসাগর ও বঙ্গোপসাগর এই তিনের মিলন স্থান এই কন্যাকুমারিকা—তাহার বোঝান যায় না, এমনি মহাসে মহাসে মিলনের মাধুর্য্য।

গুরু গম্ভীর গর্জ্জনে ঢেউগুলি আসিয়া মাতা কন্যাকুমারীর পদতল যেন ধৌত করিতেছে। মনে হইতে লাগিল কুমারীর অশ্রুধারাতে এই তিনের উৎপত্তি হইয়াছে। যেন ইঁহারা বলিতেছে—মাতার ব্যর্থ জীবনের সাক্ষীস্বরূপ আমরা এখানে আছি। কিন্তু মা! তুমিত ব্যর্থকাম হও নাই। যদি তুমি সেদিন মহেশের সহিত মিলিত হইতে হয়ে ত সবই ফুরাইয়া যাইত, অবশিষ্ট কিছুই থাকিত না।

প্রেমের আনন্দ থাকে শুধু ক্ষণকাল
প্রেমের বেদনা থাকে সমস্ত জীবন।

আর তোমার বিরহ ব্যথার ভার সকলেই গ্রহণ করিয়াছে। অনন্ত কাল হইতে মহাসমুদ্র অনন্তগম্ভীর মন্ত্রে তোমার এই বিরহ গীতি গাহিতেছেন। প্রভাতের তরুণ রবি নখরাঘে রঞ্জিত হইয়া যেন তোমার পদ বন্দনা করিয়া যাইতেছেন। সন্ধ্যা-মিলনের অধিবাসের সিন্দুর-রূপে তোমাকে রাঙ্গিয়ে দিয়ে যান। আমার অন্তরবি তোমার কপোলে অনুরাগ চন্দন মিশ্র মাখাইয়া যেন। সন্ধ্যারাণী আসিয়া কৃষ্ণবর্ণের শাড়ীতে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া যেন। পৌরীকে কহেন মহাকালের বক্ষে সমর্পণ। মায়ের বিরহ বেদনা আমাকে বিষণ্ণ করিয়া দিল। আমি সেবিনের কথা ভাবিতে লাগিলাম, যেদিন কুমারীকন্যা শাস্ত্র পড়া করিয়া বসিয়াছিলেন, আর কান পাতিয়াছিলেন হৃদয়ের তারের ধ্বনি শুনিবার জন্য, যাহারা পথে দেখিতে ছিলেন লোপার ঝলা দেখা যায় কিনা, বাঁশীর তান আসে কি না আসে। এই ভাবে বিভোর হইয়া আমরা সমুদ্র স্নানে নামিলাম। বলিলাম—এই ত্রিসঙ্গমে যেমন করে তোমার মন প্রাণ জ্ঞান দিয়াছিলে গুরু মহাকালের পায়ে বিসর্জ্জন, তেমনই আজ আমি, আমার ক্ষুদ্র মন প্রাণ জ্ঞানকে গুরু মহাকালের বক্ষে অর্পণ করিলাম। আর যেন ক্ষুদ্রের পরিধিতে জড়াইয়া না পড়ি। ক্রমে স্নান সারিয়া মন্দিরে গেলাম। এখানে আসিয়া বাবা কোন কথাই কহেন নাই। মন্দিরে আসিয়াও ধ্যান গম্ভীর শিবের মত বসিয়া রহিলেন। এখানে দেবীর কুমারী মূর্ত্তি। কি সুন্দর মূর্ত্তি—নয়ন আর ফেরে না। শিবের সমস্ত সৌন্দর্য্য নিংড়াইয়া কুমারী নয়নে অঞ্জন পরিয়াছেন। সমস্ত রং গলাইয়া পদতল অনক্ত রাগে রঞ্জিত করিয়াছেন। জগতের সব কিছু সুষমা দেবীর শ্রীঅঙ্গে শোভা পাইতেছে। ভাবাবেশ মনের গভীরে শুধু মা, মা বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। মা ছাড়া আর কিছুই মনে আসিল না।

এখানে আসিয়া দেবীর অভিষেক দেখিলাম। অন্যান্য মন্দিরে মায়ের অভিষেক দেখা গিয়াছে কিন্তু এই স্থানে দেবী কুমারী বলিয়া অভিষেক দেখিতে কোন বাধা নাই। মন্দিরে দেবীর অতি নিকটে আমরা বসিয়াছিলাম। এখানেও প্রথমে মাকে পঞ্চামৃতে স্নান করাইল। পরে কলসি কলসি দুধ ও সমুদ্র জলে স্নান হইতে লাগিল। স্নানে অন্তে দেবীর গাত্র মুছাইয়া, ফুল সাজে সাজান হইল। পরে আরতি হইল। বাবা (গুরুদেব) আরতির সময় আমাদিগকে ভাব বিহ্বল গদ্গদ কণ্ঠে মন্ত্র পাঠ করাইলেন—

যান্ অগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং
বৈরোচনীং কর্ম্ম ফলেষু জুষ্টাং
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে।
সুতরসি তরসে নমঃ।

জীবের কর্ম্মফলের দ্বারা সেবিতা হইয়া যিনি দীপ্তিমতী হন, এবং তপস্বীর তপস্যা প্রভাবে যিনি প্রজ্বলিত হইয়া উঠেন এবং স্বরূপতঃ যিনি অগ্নিবর্ণা অর্থাৎ প্রকাশ লীলা জননী সেই দেবীকে—দুর্গাকে পরিত্রাণের তরে আমি আত্মনিবেদন করি—প্রণাম করি।

প্রপন্নার্ত্ত প্রশমনে ত্বং দেবি! ভক্তিমুক্তিদা।
ত্রৈলোক্য বাসিনী নীতা! লোকানাং বরদা ভব।

হে দেবী! হে বিশ্বের আর্ত্তিহারিণি (জগৎ দুঃখ নাশিনী) মাতা তুমি প্রপন্নগণের প্রতি প্রসন্না হও। হে ত্রিলোকবন্দিতা তুমি পুত্রের দুঃখ দুর্গতি হরণ কর।

সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোস্তুতে।

তুমি সর্ব্ববিধ মঙ্গলেরও মঙ্গলরূপিনী এবং কল্যাণদায়িনী এবং জগতের সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজন তোমা হইতেই নিষ্পন্ন হয়। তুমি আশ্রিত পালিকা এবং ভূত ভবিষ্যৎ আর বর্ত্তমান এই ত্রিকাল ধুগপৎ তোমার দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত। হে গৌরী, তুমি সকলের আশ্রয়স্বরূপা, তোমাকে প্রণাম।

দক্ষিণান্তে আবার প্রণাম করিয়া দেবীর বিষ্যাক্ষণ অন্তরে ধ্যান করিতে করিতে আমরা বাবার সহিত বাহির হইলাম। সকলের অন্তর মায়ের রূপে আলোকিত, প্রেমে পূর্ণ। ওখান হইতে বাহির হইয়া বাবা কিরোনস্কের সাধনার স্থান, শ্রীগণেশ মন্দির, মহাত্মা গান্ধীর চিতাভস্ম বিসর্জ্জনের স্থান দেখিলাম। পাণ্ডাজীর মুখে শুনিলাম, অভিমানে দেবী যেখানে বরণ ডালা ফেলিয়া দিয়াছিলেন সেই স্থান বিচিত্র রঙে রঞ্জিত হইয়া আছে। এই স্থানও দেখিলাম, আরও দেখিলাম বিবাহের রাত্রের বরণ-ডালার অন্য সমুদ্র উপকূলে যে স্থানে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন ঐ স্থানের বালির দানাগুলি চালের মত। ঐ চাল আবার টুকরিতে করিয়া মেয়েরা বিক্রয় করিতেছে। কন্যাকুমারিকায় ছবির দোকান আছে। উহাতে মা কুমারীর ছবি কিনিতে পাওয়া যায়। আমরা কন্যাকুমারীর ছবি এক একখানি করিয়া কিনিলাম, তারপর ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু যাইতে প্রাণ চায় না। ডাক্তারবাবু বলিলেন—কিছুই দেখা হ'লো না। তাঁহারও দেখিলাম ঐদিন ঐখানে থাকিবার ইচ্ছা। কিন্তু হইল না। শেষ পর্য্যন্ত যাইতেই হইল। মোটর ত্রিবেন্দ্রমে ফিরিয়া চলিল। ওখান হইতে ফিরিবার পথে গুচীন্দ্রমে নামিলাম। ওখানেই মহাদেব লক্ষ্মেই হইয়া থাকিয়া যান; কিন্তু সব ফাঁকা বোধ হইল, কুমারী জননী ছাড়া আর কিছুই হৃদয়ে স্থান পাইল না। শুনিলাম এই স্থানের নাম পূর্ব্বে জ্ঞানারণ্য ছিল। ইন্দ্র, ঋষি গৌতমের পত্নী অহল্যাকে হরণ করিয়াছিলেন বলিয়া, গৌতমের অভিশাপে ইন্দ্র সহস্র যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই স্থানে আসিয়া ইন্দ্রের সহস্র যোনির পরিবর্ত্তে সহস্র লোচন হইয়াছিল, তাহাতেই এই স্থানের নাম হয় গুচি-ইন্দ্রম্। আবার ত্রিবান্দ্রম ট্রেনে ওখান হইতে ফিরিয়া আসিলাম; কিন্তু—প্রতি মুহূর্ত্তে আমার মন প্রাণ ব্যাকুল হইতে লাগিল। নিকটে একখানি খালি ট্রেণ ছিল, বিকালে তাহার পাশে বসিয়া, মা, মাগো বলিয়া অবিশ্রান্ত কাঁদিতে লাগিলাম। যেন মা কেবলই আমাকে বুকে তুলিয়া লন এবং আমার সমস্ত মুখে চোখে যেন তাঁহার স্নেহ চুম্বন, আমি আত্মহারা হইয়া যাইতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল, আমি ত্রিসঙ্গমেই রহিয়াছি। আমার শরীর ত্রিবেন্দ্রম থাকিলেও ব্যাকুল মনপ্রাণ কেবলই ত্রিসঙ্গম সাগর উপকূলে কুমারী জননীর বক্ষে অনুক্ষণ শুনাদৃত পান করিতে লাগিল। রাত্রে কানুদার নিকট শুনিলাম শেষ রাত্রে সাড়ে তিনটার সময় শ্রীশ্রী বাবা (জেঠামহাশয় ও কানুদা সঙ্গে যাইবেন) আবার যাবেন কন্যাকুমারিকায় মায়ের চিন্ময় রূপে ও ভাবে অবগাহন করিবার জন্য। ধ্যানময় পিতা সেদিন আমাদের সুবিধা অসুবিধার কথা ভাবিয়া অধিকক্ষণ যে চিন্ময়ীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতে পারেন নাই। তাই আজ আমাদিগকে সঙ্গে লইবেন না। আমার ক্ষুব্ধিত মন নিজেদের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল, সমস্ত বেদেন্দ্রিয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল—কিন্তু না তাঁহার কাছে অসুবিধা ঘটাইব না। মীনাক্ষী দেবীর মন্দির ঘুরিয়া আসিয়া বাবা বলিয়াছিলেন, শ্রীমীনাক্ষী দেবীর শ্রীচরণ যখন মস্তকে ধারণ করেছিলাম তখন ইচ্ছা হয়েছিল এই চরণ তোমাদের মস্তকেও স্পর্শ করাই। কিন্তু বড় ভুল হ'য়ে গেল। যেদিন সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার হইয়া জবাব দিয়াছিলাম কোন প্রয়োজন ছিল না; আপনার মস্তকে দেবী চরণ দেওয়ায় আমরা সকলেই পূর্ণকাম হইয়াছি, আংশিক ভাবে না হইলেও কোন ক্ষতি হয় নাই।

যৎপ্রাপ্যঃ শ্রীগুরোরাপ্যোযদ্দেহো গুরুসম্ভবম্।
পূর্ণমন্দর্ষিবিম্বেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

এ কথা তাহা হ'লে আমাদের জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়—আর আজ তাঁহার তৃপ্তির জন্য, শান্তির জন্য নিজের যদি কিছুই ত্যাগ করিতে না পারি তবে সকলই বৃথা। তখনি তুষ্ট জগৎ তুষ্ট এই মহাবাক্য ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে আমাদের জীবনে। আমি যাইবারকালীন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিলাম—যাও দেব তোমার অভিলসিত স্থানে, পূর্ণ হোক তব গোপন বাসনা, তোমার নিকট তোমারই জন্য প্রার্থনা করিতেছি আমি। আমি সেই নির্জ্জন অন্ধকারে দাঁড়াইয়া থাকিয়া যতক্ষণ দেখা যায় দেখিতে লাগিলাম। মনে মনে বলিলাম—পিতঃ! কৃপারূপে তোমার কাছে এই প্রার্থনা—যেন আমরাও পূর্ণ

হৃদয়ে ফিরিয়া না যাই। মায়ের দিব্য আলোকে যেন জীবন আলোকিত থাকে নিরবধি।

বেলা দুইটার সময় তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন। কানুদার নিকট শুনিলাম—ভোর ৫টায় তাঁহারা কন্যাকুমারিকাতে পৌঁছিয়াছিলেন। আজ বাবা কন্যাকুমারিকায় যাইয়া মন্দিরে যান নাই। তিনি সমুদ্র উপকূলে যে বাঁধান স্থানটি আছে তাহাতে ধ্যানে বসিলেন। কারণ মন্দিরে যাইয়া দেবদর্শন করিবার প্রয়োজন আমাদের জন্য। আমাদের এই মনীষের মধ্যে অসীমকে ধরিবার বুঝিবার প্রয়োজন। তিনি যে মহাযোগী, তাই সাধক রামপ্রসাদের সুরে সুর মিলাইয়া বলা যায় তিনি ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটি অঙ্কাকে তুচ্ছ পোঁটায় গাঁথিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার বুদ্ধি সর্ব্বথাই নিশ্চাত্মিকা বুদ্ধিতে সমাধিভাবে সংস্থাপিত রহিয়াছে। তাই তিনি ইচ্ছা মাত্রই সমাধি অবস্থা লাভ করেন। এই স্থানেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। সূর্য্যোদয়ের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তিনি সমাহিত হইয়া পড়িলেন।

সমাধির নাম আমাদের হিন্দু সম্প্রদায়ে ছোট বড় সকলেই জানেন বা শুনিয়াছেন। তবুও গুরুমুখে যাহা শুনিয়াছি তাহা ব্যক্ত করিতেছি। আমাদের এই জীবাত্মা সাধনাবলে ও গুরু কৃপায় যখন মহান চৈতন্যে অখণ্ড চিৎ সমুদ্রে পরমাত্মায় নিজের বিশিষ্টতা পরিচ্ছন্নতা হারাইয়া ফেলে তখন তাহাকেই নির্ব্বিকল্প সমাধি বলে। ইহা ভিন্ন সবিকল্প সমাধির চারিটি অবস্থা আছে। সবিকল্প সমাধি লাভ হওয়ার পরই নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ হয়। যদিও অনন্তকাল ধরিয়া প্রতিনিয়ত আমাদের ভিতর জীব ও পরমাত্মার মিলন বিচ্ছেদ অহরহঃ সংঘটিত হইতেছে কিন্তু আমরা ইহাকে ধরিতে বা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না বলিয়া জন্ম-মৃত্যু শোক-তাপ জ্বালা-যন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি পাই না।

ভোর হইতে বেলা প্রায় বারটা পর্য্যন্ত ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া তাঁহারা মটরযোগে বেলা প্রায় ১টায় ত্রিবেন্দ্রম্ ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলেন। তখনও ভাবের নেশা কাটে নাই। তাঁহার সেই ভাবমগ্নতার অবস্থা দেখিয়া আমরা দূর হইতে প্রণাম করিলাম।

কথা প্রসঙ্গে বাবা (গুরুদেব) পরে একদিন বলিয়াছিলেন—অবসর পাইলে কন্যাকুমারীর তত্ত্বকথা তিনি লিখিবেন। তিনি এ কথাও বলিয়াছিলেন—অন্য স্থানে ধ্যান করিয়া তিন বৎসরে যাহা লাভ হয়—এখানে তিন মাসে এমন কি তিন দিনেও তাহা লাভ হইতে পারে। এমন অনুকূল স্থান কন্যাকুমারিকার এই সমুদ্র তীর। শুনিয়াছিলাম স্বামী বিবেকানন্দও এখানে আসিয়া প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া তন্ময় হইয়া যান এবং গভীর সমাধিতে বহুক্ষণ ছিলেন।

৪।৩।৩৯ তারিখে বেলা ৯টায় আমাদের রিজার্ভ বগীকে বহন করিয়া ট্রেণ চলিল ত্রিচিনাপল্লী ও ভিল্লীপুরম্ হইয়া তিরুভেন্নামলাই। আজ কন্যাকুমারিকা হইতে বহু দূরে আসিয়াছি কিন্তু হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া মা অধিষ্ঠিতা রহিয়াছেন। শরীর প্রায় দুই সহস্র মাইল দূরে অবস্থান করিলেও মন ও প্রাণ চিন্ময়ী মায়ের অঞ্চল ধরিয়া অনেক সময়ই লুকোচুরি খেলে, কখনও কখনও সমুদ্রের বেলাভূমিতে মায়ের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়, কখনও বা ভূলুণ্ঠিত হইয়া মায়ের চিন্ময় শ্রীচরণে প্রণত হয়। তাই আজ সাধক কবি রবীন্দ্রনাথের সুরে সুর মিলাইয়া গাহিতে ইচ্ছা হয় :—

ধন্য হল জন্ম মম পূর্ণ হল অন্তর
তোমার নামে এমনি করে
নবীন করে লও গো মোরে
এ জীবনে ঘটাও গো মা চরম জীবন অন্তর,
সুন্দর গো সুন্দর।

সাঁঝের পুরবী

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় এম-এ

সন্ধ্যা তখনো পড়েনি ঝরিয়া আকাশের পরপারে,
ছিন্ন মেঘের ম্লান রাশিটুকু কে জানে ভুলায় কারে।
আকাশের পথ শব্দবিহীন,
বিহগের গীতি হ'য়েছে বিলীন,
নীরব পল্লী, পথ জনহীন
সন্ধ্যা নামিছে ধীরে ;
আলোকের মুখে ম্লান যবনিকা নামিছে পৃথিবী ঘিরে।
পুবালি বাতাস থাকিয়া থাকিয়া দিকে দিকে ব'য়ে যায়,
ঘন হ'য়ে আসে সন্ধ্যার ছায়া রাত্রির কালিমায়।
মেঘলা দিনের কাজল আকাশে,
শুভ্র তারকা আজ না বিকাশে,
বিরাট মুখর আকাশে বাতাসে
একটি বিষাণ-রেখা ;
ওপারের আলো নিভে গেছে হায়—কৃষ্ণ মেঘের রেখা।

মনে প'ড়ে যায় জীবনে আমার কা'রা এসেছিল সব
প্রভাতের পাখী গ'ণেছে কুলায় ফুটায়েছে কলরব
বিষাদ মলিন আজিকার সাঁঝে
অতীতের কোন কি যে মায়া রাজে
হারায়ে গিয়াছে তাহাদেরি মাঝে
গোধূলি আলোকসম ;
পুরবী গীতির শেষ রেশটুকু হৃদয়ে নিবিড়তম।

তথাগতের পথে

নরেন্দ্র দেব

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

স্বামী কৃপানন্দজী প্রত্যহ একবার আমাদের 'সপ্তপর্ণী'তে পদধূলি দিতেন। আমাদের কুশল প্রশ্ন করে, কিছু অসুবিধা হচ্ছে কিনা, কিছু প্রয়োজন আছে কিনা জেনে যেতেন। কিন্তু তাঁকে বিরক্ত করবার আমাদের প্রয়োজন হত না। 'রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম' গড়ে তোলবার স্বপ্নে কৃপানন্দজী কীরূপ উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। গত আট বৎসরের মধ্যে যত বাঙালী হাসপাতালে গিয়েছেন সকলেই তাঁরা সকলেই আমার কথা সমর্থন করবেন। কথা উঠলেই এই সন্ন্যাসী তাঁর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের যে নানারূপ বর্ণনা করেন এবং তাঁর একখানি চলচ্চিত্র যা প্রস্তুত করেছেন,

স্বামী কৃপানন্দজী

আমাদের দেখিয়ে বর্ণনা দিয়ে বুঝিয়েছেন। বাড়ী থেকে একদিন টেনে নিয়ে গিয়ে ষ্টেশন থেকে মাইল দুই দূরে উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত ছাই স্তূপের প্রায় বিপরীত দিকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সেবাশ্রমটি দেখিয়ে নিয়ে এলেন। দিগন্ত দুই জমীর উপর যাতায়াতি বিদ্যুতে স্থাপিত খোলার চালা দেওয়া কাঁচা মাটির দেওয়ালে গড়া কুটীর একখানি। একেই পাকা করবার জন্য তাঁর ঐহলৌকিক একমাত্র ঐকান্তিক সাধনা আজ সিদ্ধির পথে অগ্রসর। খবর পেয়েছি—ইট পোড়ানো হচ্ছে ; ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নাম যাহাদ্বারা কৃপানন্দজীর আশ্রমের ঘর সফল হ'তে চলেছে।

আর একজন বাঙালী সন্ন্যাসীর সঙ্গেও এখানে পরিচয় হল। স্বামী বিশ্বানন্দজী। ইনি এখানকার জাপানী বৌদ্ধ মঠের তত্ত্বাবধায়ক। কিন্তু, জাপানী বৌদ্ধ মঠ ছাড়াও রাজধানীর ভাল মন্দ নানা ব্যাপারের সঙ্গে ইনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছেন।

একদা প্রভাতে আমরা সপ্তপর্ণীর বাইরের চত্বরে বসে আলাপ আলোচনা করছি, এমন সময় গৈরিকধারী দীর্ঘ আলখাল্লা-পরা মাথায় বৈরাগী টুপি, পায়ে জুতো মোজা আঁটা, মুখে একমুখ কাঁচা পাকা দাড়ী, একজন অপরিচিত পরিব্রাজক এসে উপস্থিত হলেন। সসম্ভ্রমে তাঁকে আসন দিয়ে সত্বরে জিজ্ঞাসা করলুম—তাঁর এ অহেতুক অনুগ্রহের উদ্দেশ্য কি? তিনি উচ্চহাস্যে অভয় দিয়ে বললেন—তয় নেই, ভিক্ষা চাইতে আসিনি, আপনাদের গৃহে অতিথি হয়ে আশ্রমপীড়া উৎপাদন করতেও আসিনি। এসেছি একটিমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে ;

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম

আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হ'তে। আমার নাম—'বিশ্বানন্দ'—আমি জাপানী মঠের পূজারী। আমার নাম নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে আপনাদের কানে এসেছে।

তাঁর এই নাটকীয় আবির্ভাব ও অকপট আত্মপ্রকাশে আমরা স্তম্ভিত হয়েছিলুম। প্রায় একঘণ্টা নানা বিষয়ে আলাপ ক'রে তিনি যখন চলে গেলেন, তখন আমাদের মনে এই ধারণাটাই বদ্ধমূল করে রেখে গেলেন যে—ইনিও বাঙালীদের একজন বন্ধু। স্বামী বিশ্বানন্দজীর যে বর্ণনা লোকমুখে পেয়েছিলুম, তাতে তাঁর সম্বন্ধে আমাদের একটু বিরূপ ধারণাই হয়েছিল। ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা লাভের সুযোগ না হ'লে কী ভুল ধারণাই না থেকে যেতো তাঁর সম্বন্ধে। লোকটি বলিষ্ঠ মনের স্বাভাবিক মানুষ। অসির মতো ধারালো। কোনও রকম

সাধুগিরির স্বর্গীয় রহস্যের ঘুণাক্ষর নেই তাঁর ঘুণে। ভণ্ডামী করেন না এবং ভণ্ডামী সইতেও পারেন না। পরিচয়ের পর প্রায়ই আসতেন আমাদের কাছে। আত্মনির্ভরতার পক্ষপাতী তিনি। দেশের রাজনীতির সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। শিক্ষায় দীক্ষায় অনেকখানি অগ্রসর মনে হ'ল। একদিন তাঁর নিজের জীবন সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করেছিলুম। শুনলুম তিনি গিরিপুরীদের অলস ভিক্ষুকজীবন ছেড়ে রামকৃষ্ণ মঠে ঢুকেছিলেন সন্ন্যাস আশ্রমেও যাতে লোকসেবার কাজে নিযুক্ত থাকতে পারেন। পরে বৌদ্ধদর্শন ও তত্ত্বমতে আকৃষ্ট হয়ে তিনি বৌদ্ধমন্দিরে যোগ দেন। কলকাতার জাপানী লেক্ টেম্পলে তিনি দীর্ঘকাল ছিলেন। পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানী সন্ন্যাসীদের বন্দী করায় এই জাপানী মঠের তত্ত্বাবধানের ভার বর্মী মহাজন বিড়লা ব্রাদার্স কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছেন। কারণ, জাপানী বৌদ্ধমঠগুলি ওঁদেরই হাতে রয়েছে।

জাপানী বৌদ্ধ মন্দিরটি আমরা একদিন দেখতে গেলুম। বেশি-

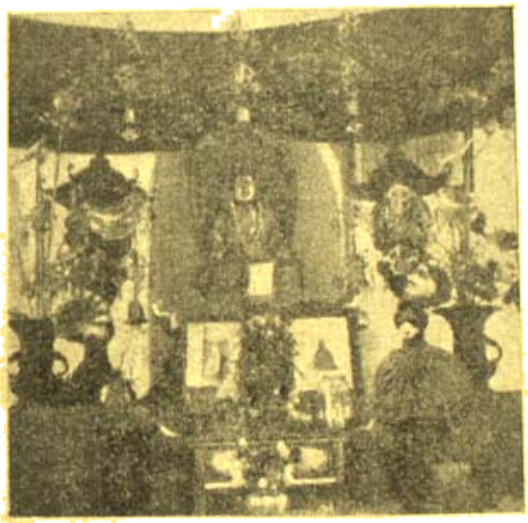

জাপানী মঠের ভিতরে বিগ্রহ পীঠ

স্বামী বিবেকানন্দ মন্দিরের বেদীর উপর তথাগত তথাগতের মূর্তির সঙ্গে সঙ্গে সাজিয়ে রেখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতি, স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি এবং মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতি। তাঁর এরূপ আচরণের অর্থ জানতে চাওয়ায় তিনি বলেন—বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের বাইরের কোনও নতুন তত্ত্ব নয়। বেদ উপনিষদের মন্ত্রের সঙ্গে তিনি বুদ্ধদেবের উপদেশ উদ্ধৃত করে আমাদের বিনয়ভাবে বুঝিয়ে দেন—বৌদ্ধধর্মন হিন্দুধর্মের বিরোধী নয় বরং অনুপূরক। এই জন্যই বুদ্ধদেব হিন্দুর দশ-অবতারের অন্যতম বলে গ্রাহ্য হ'য়েছেন। কৃপানন্দজী সম্বন্ধে বিবানন্দজীর ধারণা মোটেই উচ্চস্তরের নয়। বিবানন্দজী সম্বন্ধে কৃপানন্দজীর ধারণা ও তদনুরূপ। এঁদের উভয়ের সঙ্গ লাভে ধন্য হ'য়ে আমার বারবার কেবল এই কথাই মনে হয়েছে. এই দুই সংসারবিরাগী জনহিতকামী সন্ন্যাসী যদি পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হ'য়ে একত্রে মিলে মিশে কাজ করতেন, তাহ'লে রাজগীরে হয়ত' বাঙালীদের একটা উল্লেখযোগ্য কীর্তি এতদিনে স্থাপিত হতে পারতো। দুঃখের বিষয় ওঁদের পক্ষে মিলে মিশে কাজ করা সম্ভব হয়নি। আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে সামান্য একটু চেষ্টা করেছিলুম এই উদ্দেশ্যে। সন্ন্যাসীরা হয়ত মিলতে পারতেন, কিন্তু তাঁদের পার্শ্বচরবৃন্দ থাকতে তা' সম্ভব নয়। কাজেই এদিকে আর অগ্রসর হইনি। পরস্পর বৈরীভাবাপন্ন এই দুই সন্ন্যাসীর সঙ্গে নিজের মৈত্রী ভাব অক্ষুণ্ণ রেখেই চলে এসেছি।

প্রস্রবণ উষ্ণই হোক আর শীতলই হোক, উৎসধারায় স্নান করবার লোভ মানুষ মাত্রেরই আছে। রাজগীরের 'সপ্তধারায়' স্নানে যেতে চাই শুনে মস্ত ওরফে মীরজহান আমাদের জন্য একখানি টমটম্ ঠিক ক'রে দিলেন। কুণ্ডে যাতায়াত ভাড়া ১৲ টাকা। এখানকার উষ্ণ প্রস্রবণটি 'কুণ্ড' নামেই খ্যাত হ'য়ে পড়েছে। কারণ, ধারা জলটি ধারণ ক'রে একটি কৃত্রিম 'কুণ্ড' সৃষ্টি করা হয়েছে। এই কুণ্ডটি

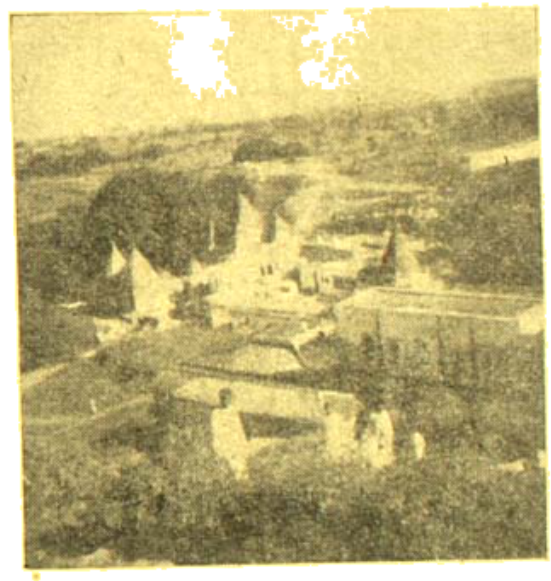

সপ্তধারা ও ব্রহ্মকুণ্ড

'ব্রহ্মকুণ্ড' নামে প্রসিদ্ধ। 'সপ্তধারা' দেখেও মনে হ'ল—এরই পার্শ্বস্থ ধারার গতি মিস্ত্রিরা ক'রে তাকে সাতটি ধারায় বিভক্ত করা হয়েছে—সম্ভবতঃ যাত্রীদেরই সুবিধার জন্য। স্টেশন থেকে প্রায় মাইল খানেক দূরে বৈভার পর্বতের গায়ে এই 'সপ্তর্ষি উৎস' বা 'সপ্তধারা' ও 'ব্রহ্মকুণ্ড'। পূর্বেই বলেছি রাজগীর একটি ক্ষুদ্র জনপদ। একখানি গ্রামের চেয়ে বড় নয়। তবে সামান্য দেশের যাত্রী আসে বলে পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস আছে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সারী, হাইস্কুল এবং একটি পুলিশ আউট পোষ্টও আছে। রাজগীরে মাত্র তিনটি মেটাল রোড বা পাকা রাস্তা আছে। তার মধ্যে প্রধান রাস্তাটি স্টেশনের পিছন দিয়ে উত্তর দক্ষিণে রাজগীরের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে সোনা কুণ্ডর ধার ঘেঁষে পাহাড়গুলির ভিতর দিকে। এইটেই রাজগীরের বড় সড়ক্। পাটনা থেকে রাজগীর পর্যন্ত মোটর গাড়ী ও যাত্রীদের যাতায়াত চলাচল ক'রে এই রাস্তা ধরেই। রাজগীরের

হাট বাজার দোকানপাটও সবই এই রাস্তায়। এই রাস্তার ধারেই বর্মীদের বৌদ্ধমন্দির, জাপানীদের বৌদ্ধমন্দির, রেস্ট্ হাউস, ইন্‌স্পেকশান বাংলো, গোশালা প্রভৃতি। এ ছাড়া মন্থুম কুত, সুধাকৃত এবং বুড়কটী পাণ্ডাদের ধর্মশালাও ঐ স্থানে আছে। আর একটি রাস্তা গেছে—চ্যাম্বিটেবল ডিস্পেন্সারীর উত্তর দিকে—প্রধান রাস্তা থেকে বেরিয়ে পশ্চিমমুখে হাইকুল ও রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের দিকে। এই পথেই পড়ে পাঞ্জেখিয়া কুণ্ড, শিবমন্দির ও খেয়াঘাট রৈন ধর্মশালা, ঈশ্বর পুরুতদার মাহারের প্রস্তরনির্মিত বাড়ী, প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকার সুন্দর বাড়ী এবং আরও কয়েকজন ধনী রৈন মহাজনদের বাড়ী। ডাক-অফিসের পেছন, বাঙালী হোটেল এবং পাণ্ডা পাড়াও এই দিকে।

নব রাজগৃহের ধ্বংসাবশেষ

পূর্বমুখী আর একটি রাস্তা রাজগীরের বাজার থেকে বেরিয়ে রেললাইন অতিক্রম করে মাঠ ও শস্য ক্ষেত্রের ধার দিয়ে বরাবর 'নওয়াদার' দিকে গেছে। এই রাস্তার উপরই মুনিসিপাল বোর্ডের অফিস, শিখ-মন্দিরের প্রশস্ত মন্দির এবং দু'চারঘর পাণ্ডাদের বাড়ীও আছে। রাজগীরে আরও অনেক প্রাচীন অলি গলি সরু মোটা আঁকা বাঁকা কাঁচা পথ আছে, যেগুলিতে কোনও যান বাহন যাবার উপায় নেই। শুধু পায়ে চলা পদাতিকেরাই যেতে পারে। রাজগীরের প্রধান রাজপথে কুণ্ডের দিকে যেতে রেলওয়ে স্টেশনের পরেই দেখা যায় একটি উঁচু টিলার উপর মধ্যযুগের বৌদ্ধ-মন্দির। এই মন্দিরটি খুব প্রাচীন নয়। মাত্র ১৯২৮ খৃঃ অব্দে একজন ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধ ধর্মী পুরোহিত এই নির্মাণ করিয়েছিলেন।

এই বৌদ্ধ মন্দিরের বিপরীত দিকে প্রায় সামনাসামনি দেখা যায় অজাতশত্রু গড়ের প্রাচীর চিহ্ন। এই খানেই মহারাজ বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু নূতন রাজধানী নির্মাণ করিয়ে তার নাম দিয়েছিলেন, নব রাজগৃহ। অজাতশত্রু গড় পার হবার পর রাস্তা ক্রমে নীচের দিকে ঢালু হয়ে গেছে। কিছুদূর অগ্রসর হবার পর পথ আবার উচ্চগামী হয়ে উঠেছে। এইখানে পথের ডান দিকে 'ইন্‌স্পেক্‌শন্ বাংলো' এবং 'রেস্ট্ হাউস'। বাঁ দিকে জাপানীদের বৌদ্ধ মন্দির। জাপানী বৌদ্ধ মন্দিরের পরই রাস্তার বাঁ দিকে একটু উঁচু স্থানে একটি প্রাচীন

সিপ্তপর্ণী গুহা

ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে। পাথরের তৈরী, কিন্তু মন্দির নয়। ভলোমাইট জাতীয় ঈষৎ নীলাভ প্রস্তরে প্রস্তুত। এটিকে ওঁরা বলেন—মহাকাশ্যপের ধ্বংসাবশিষ্ট সমাধি মন্দির। এখান থেকে আর দক্ষিণ মুখে অগ্রসর হলেই চোখে পড়বে একটি প্রকাণ্ড বটগাছ। তলদেশ উচ্চ বেদীর আকারে বাঁধানো। লোকে এ স্থানকে বলে 'ধুবীবট'। এখান থেকে পশ্চিম দিকে দৃষ্টিপাত করলে যে জায়গাটি চোখে পড়ে, ইন্‌স্পেকশান বাংলোর সামনে সেই স্থানটি নাকি ছিল বৌদ্ধ যুগের সেই বিখ্যাত 'বেণুবন'। দক্ষিণে আর একটু অগ্রসর হলেই পর্বতপুঞ্জ। অবশ্য তার আগেই বাঁ দিকে পড়বে 'মকুল্ কুণ্ড' এবং পাহাড়ে ওঠবার মুখেই বাঁহাতি বিপুল

পাহাড়ের কোলে সূর্য্য কুণ্ড। উষ্ণপ্রস্রবণ এখানকার প্রায় প্রত্যেক পাহাড়েই আছে। রাসায়নিকেরা কুণ্ডের এই গরম জল পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করে দেখে বলেছেন যে এর মধ্যে Iron Sulphates Nitrates এবং Chlorine আছে। এই জলে নিয়মিত স্নান করলে নাকি পুরাতন বাতব্যাধি ও চর্ম্মরোগ প্রভৃতি আরোগ্য হয় এবং এই জল পান করলে উদরাময় ও অতিসার নিরাময় হয়। পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীরাও নাকি এই জলে অবগাহন করলে তাদের অবশ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শৈথিল্য দূর হয়ে পুনরায় স্বাভাবিক বল ফিরে আসে।

আমরা যে ক'দিন ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করতে গেছলুম, সেখানে সর্বপ্রকার রোগীরই প্রচুর সমাবেশ দেখে ভীত হয়েছি। কারণ 'ব্রহ্মকুণ্ড' নাম হলেও কুণ্ডটি ব্রহ্মাণ্ড জোড়া নয়—একটি বড় রকম 'চৌবাচ্চা' মাত্র! তার মধ্যে পাশাপাশি সর্বাঙ্গে দূষিত ক্ষত বা চর্ম্মরোগগ্রস্ত সহস্রাধিক সমাবেশ কার না ভীতি উৎপাদন করে বলুন? তা'ছাড়া নারী ও পুরুষ

কুণ্ডে যাবার পথে—ঘুনীঘট

স্নানার্থীর নিত্য এত ভীড় হয় সেখানে যে ধারার নিচে মাথা পাতে কার সাধ্য? সাতটি ধারা আছে বটে, কিন্তু তার মধ্যে দুটি অব্যবহার্য্য অর্থাৎ এত নীচু যে তার তলায় মাথা পেতে বসা যায় না। গামছা কাপড় কাচা চলে মাত্র! দুটি ধারা বেশ উঁচু এবং তোড়ে জল পড়ে। সমস্ত স্নানার্থীর ভীড় সেই দুটির নীচে। বাকী তিনটি জলের ধারা অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ এবং তলায় আরামে বসে স্নান করবার মতো যথেষ্ট উঁচু নয়। ছেলে-পুলেরা সেখানে দল বেঁধে জোটে বটে, কিন্তু বড়রা বড় একটা সেদিকে ঘেঁসেন না।

এই সপ্তধারায় স্নান করতে গিয়ে আমরা প্রথমেই হতাশ হ'য়ে পড়ি এর কৃত্রিম রূপান্তর দেখে। প্রস্রবণের জল পাহাড়ের কোথা দিয়ে উৎসারিত হ'চ্ছে কিছুই দেখা যায় না। তাকে প্রাচীর দেখে লোক-চক্ষের অন্তরালে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে এবং সেই প্রাচীর গাত্রে সাতটি কৃত্রিম নল-মুখ তৈরী করে তার ভিতর দিয়ে জলধারা কলের মুখের মতো ক'রে এনে ফেলার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে নিমূল-বন্দী ক'রে প্রয়োজনকে অসৌন্দর্য্যের পীঠে বসানো হয়েছে।

স্বামী বিশ্বানন্দজী

কারা এ গর্হিত কাজ করেছেন খবর নিয়ে জানা গেল এখান-কার পাণ্ডা ঠাকুরেরা একটি কমিটি করেছেন। সেই কমিটি থেকে তাঁরা বড় বড় যজমানদের ধ'রে চাঁদা তুলে এই সব কুকীর্ত্তি করেছেন। শুনলুম আমাদের যুবরাজ পাণ্ডা এই কমিটির সেক্রেটারী!

ব্রহ্মকুণ্ডের তলদেশ ভেদ করে উষ্ণ জলের উৎস উৎসারিত হ'চ্ছে কিন্তু তার গতি বড় মৃদু ও উৎক্ষেপণ অতি ক্ষীণ, তাই বিশেষ লক্ষ্য করে না দেখলে চোখে পড়ে না। একটি 'চৌবাচ্চা' দেখে এটিকে কুণ্ডে পরিণত করা হয়েছে এবং সেই চৌবাচ্চার চারি পাশে দেওয়াল একতলার সমান উঁচু করে এর মধ্যে একটা বৃহৎ আয়োজনের চেষ্টা হয়েছে। দেওয়ালের গায়ে বিষ্ণু মূর্ত্তি, গণেশ, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতির মূর্ত্তি এনে

ব্রহ্মকুণ্ডের মধ্যে স্নানার্থীরা

সেঁটে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক যাত্রীকে এই ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করবার আগে শ্রাদ্ধ তর্পণ, গঙ্গাপূজা বা পাণ্ডা পূজা করানো হয়। ফুল তুলসী এখানেই কিনতে পাওয়া যায়। এখানে আবার একটা ম্যাজিকও দেখানো হয়। যাত্রীদের বলা হয় গরম জল বিষ্ণু পাদপদ্মে অঞ্জলি দাও, সেই জল মুহূর্ত্তে শীতল হয়ে ঝরে পড়বে। মাথা পেতে সেই ঠাণ্ডা জল ফিরে ধারণ করো। পরীক্ষা করে দেখেছি। এটা সত্যই হয়। (ক্রমশঃ)

কিসে বিশ্বাস? গঠনকর্ম পন্থায়। দেশের কর্তৃত্ব হাতয়া নিরস্ত্র দেশের ধ্বংসই পরিত্রাণ হইতে পারে। আজ দুর্দিনে সেই দেশেরই আহ্বান আসিয়াছে আমার নূতন রূপে। বিশ্বাস করিবার বলিষ্ঠ মন আমার চাই।

বিশ্বাস তো একদিন আমরা করিয়াছিলাম। ১৯০৫ সালের সেই অখণ্ড বিশ্বাস 'স্বদেশী'কে ধারণ করিয়া স্বাধীনতার পথ খুলিয়া দিয়াছিল। ১৯২০ সনে, ১৯৩০ সনে আমরা বলিষ্ঠ বিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছিলাম, তবু করিয়া আপনাকে নিষ্ফল ও ব্যর্থ করি নাই। আজ আবার নূতন করিয়া বিশ্বাসকে ঝাঁকড়াইয়া ধরিবার সময় আসিয়াছে। বহু সাধনায় যাহাকে আজ হইয়াছে, বহু সাধনার দ্বারাই তাহাকে সুপ্রতিষ্ঠ করিতে হইবে। সাধনা তবের ব্যাপার নহে, বিশ্বাসের ব্যাপার। আজ চাই বিশ্বাসী একদল যুবক, যাহারা দেশকে অন্তর দিয়া ও বুঝে, যাহারা স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি ঠিকমত লক্ষ্য করিয়াছে, যাহারা গান্ধীর নেতৃত্বের ব্যাপ্তি ও গভীরতা, গান্ধীর ব্যক্তিত্বের অন্যান্য শক্তি, গান্ধী কর্মপন্থার সম্ভাবনা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। তাহাদেরই একদল আজ ঐকান্তিক আগ্রহে, অপরাজেয় কর্মজোয়ারে দেশের মানসিক জড়তা, কর্মবিমুখতা, ভাগ্যনির্ভরতা, সর্বনাশা কুসংস্কারিতা ঘুচাইয়া নিজের হাতে অবসাদ ঘটাইয়া নূতন বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

—'রূপনারাণ' নির্মল

* * *

গত ২রা আগষ্ট কালনায় নদীয়ায় কংগ্রেস কর্মী শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র কুমার বেতনদীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন যে, আগামী বৎসরে নিশ্চয়ই বেতো খাল কাটা হইবে, তবে বেতো নদী বর্তমানে যে স্থান দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, সে স্থান দিয়া না কাটিয়া বর্তমান হইতে সোজা একটী খাল গড়াই মিশিবে। তিনি বলেন যে, আগামী ১৩ বৎসরের মধ্যেই কাজ শেষ হইবে এবং খালটী এমনভাবে কাটা হইবে যেন বারমাস ষ্টীমার চলিতে পারে। তিনি আশা করেন যে, তাহা হইলে খালের ধারে ধারে নূতন নূতন গ্রাম সৃষ্টি হইবে এবং বৈতপুর অঞ্চল একটী ব্যবসাকেন্দ্র হইয়া উঠিবে; কারণ ভারতের পশ্চিমাংশ হইতে এই খাল দিয়াই পণ্য আমদানী রপ্তানী হইবে। তিনি আরও আশা প্রকাশ করেন যে, খাল কাটা হইলে দেশ হইতে ম্যলা জল নিষ্কাশিত হওয়ার ফলে ম্যালেরিয়া নিবারিত হইবে এবং কলিকাতা হইতে ধনী ব্যক্তিগণ বৈতপুর অঞ্চলে যাহা নিবাস তৈয়ারী করিবেন। —'দৃষ্টি'

* * *

গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল রোটারী ক্লাবের সভায় তিন সপ্তাহের গভর্ণর স্যার বি এল মিত্র বলিয়াছেন যে ভারতের জনগণ যখন অশিক্ষিত তখন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটের দ্বারা রাজ্য পরিচালনা উচিত হইবে না, ভারতের বর্তমান অবস্থায় প্রেসিডেন্সিয়াল গভর্নমেন্টের প্রয়োজন, গণতন্ত্র চলিবে না। মিত্র মহাশয় কমিউনিষ্ট পার্টিতে নাম লিখাইয়াছেন কি না এখনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই, তবে গণতন্ত্র উচ্ছেদের জন্য যে ভাবে গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল হইতে প্রচার কার্য্য সুরু করিয়াছেন তাহাতে কংগ্রেস হাইকমাণ্ড তাঁহাকে বহু পূর্বেই বহিষ্কার করিতে নতুবা জেলে পাঠাইতে বাধ্য হইবেন সন্দেহ নাই। —যুগবাণী

* * *

"আমার অভিমত যেমন তেমনই আছে। ভারতের পুনর্গঠন পরিকল্পনায় গ্রামগুলি এখনকার মত আর সহরের উপর নির্ভর করিবে না, সহরগুলিই গ্রামের জন্য এবং গ্রামের কল্যাণে বাঁচিয়া থাকিবে। সুতরাং কেন্দ্রের গৌরব-স্থান অধিকার করিবে চরকা, আর তারই চতুষ্পার্শে আবর্তন করিবে সহযোগী গ্রামশিল্পগুলি।"

—মহাত্মা গান্ধী—হরিজন পত্রিকা

* * *

ব্যাপারটা আপনাদের চোখে পড়িয়াছে কি না জানিনা, পড়িলেও পড়িতে পারে। কংগ্রেসের নিন্দার পঞ্চমুখ কাহারা? কংগ্রেসের নিজের লোক—অর্থাৎ কর্মী বলিয়া পরিচিতেরা ও পদাধিকারীরা। সরকারের নিন্দা করে কাহারা? তাহার নিজের লোকেরা ও সরকারি কর্মচারিরাই। একেই বলে জাতির পক্ষ জাতি। —বর্দ্ধমানের কথা

* * *

শারদীয় পূজা প্রায় মাসখানেক পরেই হবে। দিকে দিকে তার আয়োজন সুরু হয়ে গেছে। অনেক জায়গায় কমিটিও গঠিত হয়েছে। বাঙ্গালীর এতবড় পূজার উৎসব আর নেই। উৎসবের সে আনন্দ আজ কোথায়? আজ অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, অর্থ নেই, নূতন কাপড় জামা সংগ্রহ করা কি দুরূহ ব্যাপার। উৎসবমুখরিত পূজাবাড়ীর সেই দীপ্তোজ্জ্বল আনন্দ আজ অন্তর্হিত হয়ে গেছে। গৃহস্থবাড়ীর পূজার সংখ্যা, পূজার আয়োজন, পূজার ঔজ্জ্বল্যক্রমেই কমে আসছে। অন্যদিকে সর্বজনীন পূজার মধ্য দিয়ে গ্রামের সকলে আমরা একত্রিত হচ্ছি, পরস্পর পরস্পরের সুবিধা লাভ করছি, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সকলেই সমভূমিতে নেমে পূজার যথার্থ উৎসবকে সার্থক করে তুলছি, কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে সর্বজনীন পূজার উদ্ভব হয়েছিল, আমোদোৎসবকেলোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্য থেকে বার করে এনে সর্বজনীন করে তোলবার যে মহান আকাঙ্ক্ষা ছিল, তা কি আজ আবার ধূলিসাৎ হতে চলছে না? আবার কি তা খণ্ড খণ্ড হয়ে যাচ্ছে না? অকারণে একের জায়গায় কি বহু পূজার আবির্ভাব হচ্ছে না? মনে মনে আজ এই প্রশ্ন জাগছে। আজ আর্থিক সঙ্কটের দিনে বহু পূজার মধ্য দিয়ে বহু অর্থ অনর্থক অপব্যয়

হ'য়ে কি না? মধ্যবিত্তরাও আজ আর্থিক দিক দিয়ে সকলের চেয়ে সঙ্কটাপন্ন। অন্ন দুই দরখাস্তগুলোর অন্নবিত্ত মধ্যবিত্তদেরই কি একের স্থলে পাঁচ গায়গায় একই সময়ে চাঁদা দিতে হ'য়ে না? তাছাড়া পূজার শ্রদ্ধা, পারত্রিক ও আনুষ্ঠানিক দিকটার চেয়ে অজ্ঞাতে পূজাকে উপলক্ষ করে বাহাড়ম্বরের উপর কি বেশি ঝোঁক মিলি না? —সাধারণী

• • •

ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র গুহরায় কংগ্রেসের উচ্চতম কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন কলিকাতা সহরের জন্য একটি স্বতন্ত্র কংগ্রেস কমিটি গঠিত হউক। কলিকাতাকে পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে আনা হইবে এইরূপ একটা গুজব কিছুদিন আগে শোনা গিয়াছে এবং এই আশঙ্কার বিষয় আমরা গত ফাল্গুন মাসে 'নূতন-প্রভাত' পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়াছিলাম।

ডাঃ গুহরায়ের প্রস্তাব এই আশঙ্কাকে সত্যে পরিণত করিবে বলিয়া মনে হইতেছে। কংগ্রেস কমিটি স্বতন্ত্র করা হইলে আর সব কিছুও ক্রমে ক্রমে স্বতন্ত্র হইতে আরম্ভ হইবে এবং এই স্বাতন্ত্র্যবাদের সুযোগে কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গচ্যুত হইতে বিলম্ব করিবে না। কমতালাভের মন্ত্রের মন কোথা হইতে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে তাহা সম্ভবতঃ ডাঃ গুহরায় তলাইয়া দেখিতে চান নাই; যদি দেখিতেন তাহা হইলে এই আত্মঘাতী প্রস্তাব করিতে তিনি লজ্জা বোধ করিতেন। যাহাই হউক, একবার যখন প্রস্তাব করিয়া ফেলিয়াছেন, তখন প্রত্যাহার করিয়া লইতে খানিকটা বিলম্ব কাটিবে বলিয়া মনে হইতেছে। —নূতন প্রভাত

• • •

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে বিবেচনা ও রিপোর্ট করিবার জন্য যে কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন সেই কমিটির সুপারিশগুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রাথমিক স্তরে ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া হইবে না। নিম্নলিখিত হিসাবে মাধ্যমিক স্তরে ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইবে।

(১) ইংরাজী ও বাংলা—৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে একাদশতম শ্রেণী পর্যন্ত।

(২) রাষ্ট্রভাষা—৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত।

(৩) প্রাচীন ভাষা—৮ম শ্রেণী হইতে একাদশতম শ্রেণী পর্যন্ত। অষ্টম শ্রেণী হইতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি চারি শাখায় শিক্ষাদান করিবে—(১) কলা বিভাগ (২) বিজ্ঞান বিভাগ (৩) টেকনিক্যাল বিভাগ (৪) কমার্শিয়াল বিভাগ। অষ্টম শ্রেণীতে আসিয়া প্রত্যেক ছাত্রকে স্থির করিতে হইবে—সে কোন্ শাখায় প্রবেশ করিবে।

প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ছাত্রদের ব্যক্তির বিকাশই হইবে ইহার লক্ষ্য, আর ছাত্রেরা যাহাতে সামাজিক ও নাগরিক পরিবেশের যোগ্য হইয়া উঠিতে পারে—তাহার দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। —কৈশোরক

• • •

বাঙ্গালীর প্রবেশ-বিমুখ আপিসার অনেক কারণ আছে। বাংলার প্রায় সমস্ত প্রধান শিল্প এবং বড় বড় বাণিজ্যিক ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান অবাঙ্গালীর এবং বিদেশীর পরিচালনাধীনে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশে শ্রমিক বাংলার লোক নয়। সুতরাং বাংলার আর্থিক অবস্থায় মধ্যে ভারসাম্য নাই। বাঙ্গালী মনে করে যে, রাজনৈতিক কারণে একদিন ইংরাজ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতির বদল বাঙ্গালীকে সাহেব করিবার যে নীতি গ্রহণ করিয়াছিল অবাঙ্গালী বণীরা সেই কায়েমীতে যোগ দিয়া আজ এ দেশে এই অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার প্রতিকার হওয়াও একান্ত প্রয়োজন। আন্তঃপ্রাদেশিক ব্যবসায় সংগঠনের উদ্দেশ্যে সরকারী বোর্ড প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে এই সমস্যার কতকটা প্রতিকার হইতে পারে। বোর্ড অথবা কেন্দ্রীকরণ এবং একচেটিয়া ব্যবসায় সংগঠন যাহাতে না হইতে পারে সে দিকে দৃষ্টি রাখিবে।

ভারতের বাহিরে রাষ্ট্রদূতের পদে বা বৈদেশিক বিভাগের চাকুরীতে বাংলা দেশের লোকের নাম শোনা যায় না—যদিও বাঙ্গালীদের মধ্যে কমতাবান লোক কম, কিন্তু তবু পণ্ডিতজীর কর্তব্য ভারসাম্য রক্ষণের জন্য অন্ন কয়েকজনকেও এই বিভাগে গ্রহণ করা। —সমাজ

• • • •

পাকিস্থানীয় কার্য কলাপ বুঝ হইতে যতই মন্দ বলিয়া ধারণা করা হউক—উহা যে ক্রমেই ভাল হইতে আরও ভালর পথেই চলিয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষদর্শী অনায়াসেই বলিবে। খাদ্য দ্রব্যের মূল্য পূর্ব হইতে সত্যই হ্রাস হইতেছে। যে সকল মুসলমান পাকিস্থান হইতে পশ্চিম বঙ্গে অথবা আসামে আসিয়া জড় হইতেছে—তাহার মূলে আছে প্রকৃতির একটা সুস্পষ্ট সঙ্কেত। পেটের দায়ের চেয়ে ভারত সাম্রাজ্যে এইরূপ মুসলমানের ভিড় উদ্দেশ্য মূলক বলিয়া আমাদের ধারণা। পাকিস্থানের হিন্দুরাই ক্রমেই বলিতে সুরু করিয়াছে আমরা পাকিস্থানের উন্নতি চাই, হিন্দুস্থানের নহে। এই সকল হিন্দু পাকিস্থানেই বসবাসের সুযোগ পাইতেছেন। যাঁহারা বাস্তুত্যাগী তাঁহাদের দুঃখের কথা অবধারণ করিয়া পাকিস্থানের হিন্দু অধিবাসীবর্গ ক্রমেই সতর্ক হইয়া বাস্তুত্যাগে আর ইচ্ছুক নহেন। —নব সংঘ

• • • •

যুক্তপ্রদেশের মীরাট জেলার পিলসুয়া গ্রামের চাষী শ্রীযজ্ঞাপরণ বিঘা প্রতি ১৪০/০ মণ আলুর ফলন ফলাইয়া দেশের চাষীদের তাক্ লাগাইয়া দিয়াছে। জাতীয় সরকার যজ্ঞাপরণকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দিয়া খুবই ভাল কাজ করিয়াছেন। আমাদের দেশের চাষীরা যদি যজ্ঞাপরণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারে, তবে বাংলায় যে সত্যসত্যই সোনা ফলিতে পারে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

—পল্লীবাসী

জাহানার আত্মকাহিনী

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্ত্রী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মুরাদ জেগে বেঘোরে তার পরনে গুরুভার পৃথ্বলাবদ্ধ। হস্ত প্রসারিত ক'রে মুরাদ তাঁর অঙ্গের সন্ধান ক'রে দেখলেন, তার অস্ত্র নেই। পরিক্ষণে নিজের অবস্থা অনুভব করলেন। তিনি প্রতিশোধের কোন চেষ্টাই করেন নি। অবনত মস্তকে পাত্তরের মুরাদ ব'ললেন,—কোরাণ স্পর্শ ক'রে আমার কাছে এই শপথই করা হয়েছিল।

সঙ্গীত সুরের মেজে উঠল। মুরাদের অনুচরবর্গ মনে ক'রল যে ঘড়িতে সময় তখনও চলেছে। সন্ধ্যাসমাগমে দুটী হস্তী চ'লেছে—একটী আগ্রার দিকে, অন্যটী দিল্লীর পথে—দুটী হস্তীই প্রহরীবেষ্টিত। দিল্লীর পথে হস্তী পৃষ্ঠে চ'লেছে দুর্ভাগা মুরাদ।

তখনও মুরাদের অনুচরবর্গ চঞ্চল হ'য়ে উঠল। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশ দেওয়া হ'য়েছিল—যেন কোন মুরাদের সেনাপতিকে শিবির ত্যাগ ক'রতে না পারে। তারা জানত যে ছোঁড়া।

হঠাৎ ঔরঙ্গজেবের সৈন্যদল আনন্দধ্বনি ক'রে উঠল "জিলা জিলাপুরাঁ" (ঔরঙ্গজেব দীর্ঘজীবী হউন)। তার সঙ্গে ঘোষণা করা হল যে, পাহুজাহানের এবং মুরাদের অধীনস্থ সৈন্যগণ দ্বিগুণ বেতন পাবে। মুরাদের সেনাধ্যক্ষগণ প্রথমে পলায়নের চেষ্টা ক'রেছিল এবং সৈন্যদল ভীত হ'য়েছিল। কিন্তু পরের দিন বেলা গেল মুরাদের সমস্ত সৈন্য ঔরঙ্গজেবের দলে যোগ দিয়েছে।

ঔরঙ্গজেবের হস্তীদলের আনন্দধ্বনির নীচে তাঁর শিরায় চেঙ্গিসের রক্তধারা প্রবাহিত হ'ত। চেঙ্গিস সমস্ত পৃথিবীকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করেছিল। শক্তি সংগ্রহের আকুলতায় যখন সে রক্ত উষ্ণ হ'য়ে উঠত, তখনই মনে হত কোরাণের অক্ষরগুলি।

মুরাদ চ'লেছে দিল্লীর রাজপথে, অত্যন্ত অপমানিতভাবে। তার পশ্চাতে হস্তীপৃষ্ঠে অনুসরণ ক'রে চ'লেছে ঘাতক—পলায়নের চেষ্টা মাত্রই মুরাদের শিরশ্ছেদ ক'রবে। এই অবস্থায় তাকে কারাগারে নিয়ে গেল, সেখানে তাকে পান করতে হল "পর্শিয়"—সরবৎ।

তারপর ঔরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করলেন। আমি দারার ইতিহাস লিখছি—আমার কপোল আমি পত্রের উপর ন্যস্ত করলাম, আমার অশ্রুধারা কালির অক্ষরের সঙ্গে মিশে যাক।

মাঝে মাঝে দারার ইচ্ছাশক্তি দুর্ব্বলতায় হ'য়ে উঠত। সেই শক্তির আবেগে দারা লাহোরে প্রায় তিন লক্ষ সৈন্য সমাবেশ ক'রলেন—লাহোরের পার্শ্ববর্ত্তী একজন রাজা দারাকে সৈন্য সাহায্য ক'রবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। দারা তার কথায় উপর অত্যন্ত বেশী নির্ভর ক'রলেন। আবার সংগ্রামের মধ্যে দারার মতন ছলা জয়ের ক্ষমতা আর কারো ছিল না। তার ছিল মুখে সরল হাসি, কণ্ঠে সঙ্গীতের সুর। দারা এই হিন্দুস্থানের হৃদয় জয় করার বাসনা ক'রলেন। তাকে রাজানুগ্রহের বহু নিদর্শন এবং যথেষ্ট অর্থ উপহার দেওয়া হ'ল। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের গুপ্ত পত্রাবলি রাজ্যের প্রতি কোণে ছড়িয়ে গেল।

হিন্দু রাজা দারাকে পরিত্যাগ ক'রল, কিন্তু ঔরঙ্গজেবের প্রেরিত অর্থ ত্যাগ ক'রতে পারল না।

ঔরঙ্গজেব সৈন্যদের পুরোভাগে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। তিনি জানতেন যে বহু বিখ্যাত সৈন্যাধ্যক্ষ দারার পক্ষপাতী। তাদের অনেকেই দারার সঙ্গে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ। তন্মধ্যে দায়ুদখান অন্যতম। ঔরঙ্গজেব অনেকগুলি জাল পত্র তৈরী ক'রলেন—পত্রের মূল কথা ঔরঙ্গজেব ও দায়ুদখানের পত্র বিনিময় এবং সেই পত্রগুলি দারার হস্তগত হওয়ার ব্যবস্থাও করা হ'ল। ক্রুদ্ধাগত বিপদ গাঢ়ে দারার চিত্ত সন্দিগ্ধ হ'য়ে উঠেছিল। দুর্ভাগ্য দারা তার বিশ্বাসী সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে অবিশ্বাস ক'রতে লাগলেন। দারা দায়ুদখানকে আদেশ করলেন, আমাকে ত্যাগ কর। আমার সৈন্য পরিত্যাগ ক'রে চলে যাও। দায়ুদখান শিশুর মতন ক্রন্দন ক'রলেন। তার পর দায়ুদখান উত্তর দিলেন—"দুর্ভাগ্য দারাকে মৃত্যুর পথে নিয়ে যাচ্ছে"—দায়ুদখান দারাকে পরিত্যাগ করে গেলেন।

অতি দ্রুতগতিতে দারা লাহোর ত্যাগ ক'রে স্থানান্তরে আশ্রয় অন্বেষণ করলেন। ভাক্কারের দুর্গে তাঁর বহু সুশিক্ষিত সৈন্য পশ্চাতে রেখে গেলেন—অবশ্য তাঁর অনেক সৈন্য তাঁকে পরিত্যাগ ক'রে গেছে। পরিশেষে দারা গুজরাটে উপস্থিত হ'লেন ;—সেখানে সৈন্য সংগ্রহ করলেন।

ইতাবসরে ঔরঙ্গজেব সংবাদ পেলেন শাহ্সুজা বাংলাদেশ পরিত্যাগ ক'রে বহু সৈন্য নিয়ে অভিযান আরম্ভ করেছেন। সুজা দারার অনুসরণ ত্যাগ ক'রে তাঁর সমস্ত সৈন্য নিয়ে দক্ষিণ অভিমুখে অভিযান করলেন। তার সন্ধানে উপস্থিত হওয়ার জন্য ঔরঙ্গজেব দ্রুত অশ্বচালনা ক'রে অনেকবার সৈন্যদের অতিক্রম ক'রে একাকী বহুদূর চ'লে যেতেন, কখনও একাকী বৃক্ষতলে বিশ্রাম করতেন। কখনও নিজের ঢালের উপর মস্তক ন্যস্ত ক'রে নিদ্রা যেতেন।

অতর্কিতে ঔরঙ্গজেব একদিন বনপথে রাজা জয়সিংহের সম্মুখীন হ'য়ে পড়লেন। জয়সিংহ সুলেমান শুজোর সৈন্য পরিচালক। তিনি দারাকে ঘৃণা করতেন—কারণ দারা তাঁকে একদিন "গাধক" ব'লে উপহাস ক'রেছিলেন। কিন্তু জয়সিংহ শাহজাহানের প্রিয় পাত্র ছিলেন। জয়সিংহের সৈন্যগণ ঔরঙ্গজেবকে হত্যা ক'রে সম্রাট শাহজাহানকে মুক্ত

করবার জন্য অনুরোধ করল। যদি তারা করত হ'ত জয়সিংহের প্রশংসায় পৃথিবী মুখর হ'য়ে উঠত।

ঔরঙ্গজেব বিপদের গভীরতা অনুভব করলেন। তিনি একাকী জয়সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্তে উপস্থিত হলেন—যেন তাঁর প্রত্যাশাই ঔরঙ্গজেব করেছিলেন। তৈমুরের ভাষায় রাজা জয়সিংহকে প্রশংসা করলেন। তারপর নিজের কণ্ঠ থেকে বহুমূল্য মুক্তাহার খুলে রাজার কণ্ঠে পরিয়ে দিয়ে বল্লেন, "আমি আপনাকে দিল্লীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করলাম···সাম্রাজ্যের প্রয়োজন—আপনি এই মুহূর্ত্তে দিল্লীর পথে যাত্রা করুন"।

ভাগ্য নিজের পথ রচনার জন্য কতকগুলি অস্ত্র ব্যবহার করে—সে অস্ত্র সৎ হউক আর অসৎ হউক। কিন্তু আমাদের পথের গতি কোন্ দিকে?

রাজা জয়সিংহ অবিলম্বে দিল্লী যাত্রা করলেন।

আগ্রার তীব্র উত্তাপ কণ্ঠরোধ করে দেয়। প্রায়ই আমি বিনিদ্র রজনী যাপন করেছি—আমার মনে হত যেন আমার সুবর্ণ শয্যার উপরিভাগে ছাদের ছাদ আমার শবাধারের আবরণে পরিণত হয়েছে। আমার পিতা ও আমি যেন সমুদ্রে এক নির্জ্জন দ্বীপে জলমগ্ন যাত্রী—আমাদের কাছে আগত সংবাদগুলি যেন একটী বিরাট নৌবাহিনীর যাত্রাশিক্ষুক ছাংগীকৃত নৌকার ভগ্ন অংশ। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের ঘৃণা যেন আমার পিতার দেহে নূতন জীবনী-শক্তি সঞ্চার করেছিল।

অদূরে খাজুয়ার প্রান্তরে নবীন সম্রাট ও শাহ্ সুজার যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল—কি ভীষণ সংগ্রাম। ঔরঙ্গজেবের হস্তীর চতুর্দ্দিকে তীর বৃষ্টি চলেছে। সামুগড়ের প্রান্তরের মত মৃত্যুর সম্মুখীন—সেখানেও বিপক্ষী শত্রুদলের মধ্যে একজন বিশ্বাসঘাতকের অভাব হ'ল না। যখন ঔরঙ্গজেব হস্তীপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করছিলেন—বীরজুষ্টা চিৎকার করে উঠল—"হস্তীপৃষ্ঠে অপেক্ষা করুন"। ঔরঙ্গজেব হস্তীপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করলেন না। সামুগড় ঔরঙ্গজেবকে সিংহাসনের পথে চলা শিখা দিয়েছিল। সেই বিশ্বাসঘাতক সুজাকে পরামর্শ দিল—হস্তীপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করুন, যদিও ভারার দুর্ভাগ্যের ইতিহাস সুজা অবগত ছিলেন। তবু ভাগ্যহীন সুজা হস্তীপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করলেন। তাতে তাঁর সৈন্যদলের মধ্যে বিশ্রান্তি সৃষ্টি হ'ল। সৈন্যদল পলায়ন আরম্ভ করল। অল্পের চরম মুহূর্ত্তে সুজা ঔরঙ্গজেবের নিকট পরাজিত হ'ল।

আমার লেখনী শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছে। এই কয়েকটী ঘটনা শাহ্জাহানের সাম্রাজ্যের ভিত্তি চিরতরে শিথিল করে দিয়ে গেল, পিতা শাহ্জাহান পুত্রদের বিষাদ করতেন—সেই পিতা-পুত্রের সংগ্রামের ধ্বনি হল, "হয় সিংহাসন, না হয় সমাধি।" শাহ্ সুজার ভাগ্যে সমাধিলাভও হয় নি। আশ্রয়ের জন্যে শাহ্ সুজা বর্ম্মাদেশে পলায়ন করেছিলেন, সেখানে রাজা তাঁকে পশ্চাদ্ধাবন ক'রে বধ ক'রে গেল। রাজার অনুচরের ছুরিকাঘাতে সুজাকে হত্যা হতে হ'ল। তাঁর মৃতদেহ বন্যজন্তুর আহারে পরিণত হয়েছিল। রাজপুত্র সুজাই প্রথম সাম্রাজ্যের শান্তি ভঙ্গ করেছিলেন।

খাজুয়াতে সুজার পতনের পর আমার আরম্ভ হল দারার কাহিনী। এখানে আমার কাহিনী আমার প্রারম্ভ দিনে এসে পড়েছিল। * * *

সেদিন ছিল এক হাজার উনসত্তর হিজরী জমাদিউল-আওয়াল। (১৬৫৯ খৃঃ অব্দ)। দারা পূর্ব্বব্যবস্থামত রণোবন্ত সিংহের সৈন্যের সঙ্গে আগ্রার পথে মিলিত হওয়ার জন্যে তাঁর নূতন সৈন্য নিয়ে গুজরাট থেকে অভিযান আরম্ভ ক'রলেন। রাজা রণোবন্ত সিংহের সাহায্য ব্যতিরেকে শাহজাদা দারার পক্ষে আওরঙ্গজেবকে প্রতিহত করার বা সিংহাসন উদ্ধার করার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু আমার পিতার বিষণ্ণ সামন্ত রণোবন্ত সিংহ প্রতিশ্রুতির মর্য্যাদা রক্ষা করে নি। আওরঙ্গজেবের ইন্দ্রজালে ধরা পড়ে নি, এমন ত কেউ ছিল না।

দারা একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপত্যকায় আজমীরের অদূরে শিবির সংস্থাপন করলেন এবং সেখানে আত্মরক্ষার জন্য কয়েকটী পরিখা খনন করলেন। আওরঙ্গজেব উপস্থিত হ'য়ে বুঝলেন আক্রমণ অসম্ভব। আওরঙ্গজেব নূতন সূত্র অবলম্বন করলেন। অত্যন্ত বিশ্বাসী দিলওয়ার খান তাঁর পক্ষে যোগ দিল। দিলওয়ার খান দারার নিকট পত্র লিখলেন—সে পত্রে লিখিত ছিল, "আমি কোরাণ স্পর্শ করে বলছি যে যুদ্ধের সময় আওরঙ্গজেবের পক্ষ ত্যাগ ক'রে আপনার সঙ্গে যোগ দেব।" সুতরাং দারা সেই পত্রে বিশ্বাস ক'রে তাঁর সৈন্যদের আদেশ দিলেন যেন তা'রা দিলওয়ার খানের সৈন্যদের আক্রমণ না করে।

যুদ্ধের পূর্ব্বদিন আওরঙ্গজেবের জ্যোতিষ ভবিষ্যদ্বাণী ক'রল যে আকাশের জ্যোতিষমণ্ডলী সম্রাটের সৈন্যাধ্যক্ষমণ্ডলীর দুর্ভাগ্য সূচনা করছে। আওরঙ্গজেবের সৈন্যাধ্যক্ষগণ তাঁদের গোপন মন্ত্রণা সভায় এই সংবাদ শুনে পেখমীর সম্রাটের হস্তী আরোহণ ক'রে সম্রাটের জন্য জীবন উৎসর্গ করবার অনুমতি প্রার্থনা ক'রলেন। প্রত্যূষের প্রথম প্রহরে সৈন্যগণ যুদ্ধযাত্রা ক'রেছে। পেখমীর আওরঙ্গজেবের হস্তীপৃষ্ঠে সমাসীন, আওরঙ্গজেবের ভূষণ-পরিহিত। প্রত্যূষের অস্পষ্ট আলোকে সৈন্যগণ নিশ্চিত ছিল যে তাদের অধিনায়ক স্বয়ং পুরোভাগে। যুদ্ধ আরম্ভ হ'য়েছে। দারার গোলন্দাজবাহিনী শত্রুকে বিধ্বস্ত ক'রেছিল। পেখমীর গুলীর আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ল। কিন্তু তাঁর শরীর-রক্ষী মৃতদেহ যথাস্থানে নিবদ্ধ ক'রে সৈন্যদের উৎসাহিত ক'রছিল। আওরঙ্গজেবের সৈন্যগণ অধিনায়ককে জীবিত মনে ক'রে প্রাণপণে যুদ্ধ ক'রতে লাগল। আওরঙ্গজেব এবারও তাঁর হস্তীপৃষ্ঠ ত্যাগ করেন নি।·····

দিলওয়ার খানের সময় এসেছে। তিনি দারাকে ইঙ্গিত ক'রলেন যেন তাঁর সৈন্যদের অতিক্রম ক'রতে দেওয়া হয়। তারপর তিনি বাদশ সহস্র সৈন্য নিয়ে আক্রমণ ক'রলেন। কিন্তু দারার পক্ষে যোগ না দিয়ে দারার সৈন্যদের ক্ষতবিক্ষত করে দিলেন। দারার সমস্ত সৈন্য পলায়ন করল। সুতরাং দারা দ্বিতীয়বার পরাজিত হ'লেন। হতভাগ্য দারার দুর্ভাগ্য আরও ঘনিয়ে এল। গুজরাটের যে নগর থেকে দারা শুরু

অভিযান আরম্ভ করেছিলেন, সেই নগর নিজের গৃহ মনে ক'রে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রলেন। সেই নগরে তুষারাবৃত, ধূলিধূসরিত ধারার প্রবেশ নিষিদ্ধ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে ধারার সমস্ত আশা নির্ম্মূল হ'য়ে গেল। শিবির হ'তে উত্থিত নারীকণ্ঠে আকাশ বিদীর্ণ করে দিল। সে কণ্ঠস্বরে ছিল বিধাতার করুণা যাচ্ঞা!

কেন, কেন ভগবান মানুষের সহ্যকে অবলম্বিত করেন? অথচ সেই আত্মাকে আবার ভগবান নিজের কাছে টেনে নেন। শাহ্‌জাদা ধারার পুরাতন বন্ধুগণ তাঁকে ত্যাগ করে গেল; তাঁর পরাজয়ের পরেও যে সমস্ত সৈন্য তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, তাদের অধিকাংশ আজ তাঁকে ত্যাগ করে গেছে। আজ ধারা তাঁর হীনতম অনুচরের সঙ্গেও আলাপ ক'রলেন,—যেন তিনি পৃথিবীতে রিক্ততম।

আওরঙ্গজেবের অনুচর কর্ত্তৃক অনুধাবিত হ'য়ে ধারা পারস্যের দিকে অগ্রসর হ'লেন। তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁর তিন স্ত্রী, কন্যা জানি বেগম এবং কতিপয় পুত্র শিশুর শুশ্রূষা। দুই সহস্র অনুচর তখনও তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করে নি।

কেন ধারা বিশ্রাম না ক'রে ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম করে যান নি? এবার অদৃষ্ট তাঁর সম্মুখে সর্ব্বশেষ বাধা সৃষ্টি করল। তাঁকে ভ্রাতৃবধূ গুলেরুখ বেগমের তাঁবুতে টেনে নিল। পারস্য সীমান্তের অনতিদূরে কান্দি দুর্গ ধূসরাভা অবস্থিত ছিল। সে রাজ্যের আফগান রাজাকে ধারা অতীতে তিনবার মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছিলেন। তার কাছে সাহায্য প্রত্যাশা করে ধূসরাভা পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা ক'রলেন। আফগান রাজা তাঁকে সাহায্য না করে সপরিবারে কারারুদ্ধ ক'রল এবং সৈন্যদল থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রল। ধারার খোজা ভৃত্য আফগানকে হত্যা ক'রে তাঁর প্রভুকে রক্ষা করবার সংকল্প করল। কিন্তু তার বন্দুকের গুলি ব্যর্থ হ'য়ে গেল। ধারার সমস্ত সৈন্য কারারুদ্ধ হ'ল। সংবাদ রটে গেল যে আওরঙ্গজেবের সৈন্য ধূসরাভা থেকে বেশী দূরে নয়। ধারার প্রধান স্ত্রী নাদিরা বেগম ভয়ার্ত্ত, কম্পিত, বিবাহাহত হ'য়ে পড়লেন। তিনি তাঁর স্বামীকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। সুতরাং তিনি স্বামীর অবর্ত্তমানে জীবনধারণের ইচ্ছা ত্যাগ করলেন। আওরঙ্গজেবের পার্শ্বচারিণীরূপে নিজেকে কল্পনা করে তিনি শিউরে উঠলেন। তিনি চীৎকার করে উঠলেন, "প্রতিহিংসাপিপাসু আওরঙ্গজেব আমার স্বামী-পুত্রের রক্তে তার রক্তপিপাসা নিবারণ করবে। সে অত্যাচারীর জয়যাত্রার পথে আমার মৃত্যু হবে তার জয়চিহ্ন।" তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর অঙ্গুরীয় বিষ লেহন করলেন; মুহূর্ত্তে তাঁর মৃতদেহ ভূলুণ্ঠিত। এমন দুর্ভাগ্য আর ধারার জীবনে কখনও উপস্থিত হয় নি। নাদিরা বেগম ছিলেন নারী-কুলমণি। মৃত্যু-শিখির তখনও ভস্মবিলীন শেষ হয় নি, অন্যের শবকণা কেড়ে উঠল দুর্গদ্বারে। আওরঙ্গজেবের অনুচর দুর্গদ্বারে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে উঠল, "বন্দী কর"। সে স্বর দুর্গের সমস্ত দুর্গে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠল। ধারা তরবারি উত্তোলন করলেন, তাঁর আকাঙ্ক্ষা বীরের পার্শ্বে সংগ্রাম ক'রে নিহত হবেন। কিন্তু শত্রুগণ তাঁকে বন্দী করল। তাঁর হস্তপদ শৃঙ্খলিত করল। তার অল্প দুই স্ত্রী, সন্তানগণ এবং ক্রীতদাসীদের নিয়ে যাওয়ার জন্য চারিটী হস্তী দুর্গদ্বারে নীত হ'ল। একাকী ধারা যে হস্তীতে আরোহণ করলেন, তার সম্মুখে গোপন রাখা হ'ল। প্রত্যেক হস্তীপৃষ্ঠে উন্মুক্ত বর্শা ও তরবারি নিয়ে ঘাতক উপবিষ্ট ছিল। সে বর্শার শোভাযাত্রা বাজার দুর্গের দিকে অগ্রসর হ'ল। বাজার দুর্গরক্ষীগণ বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করেছিল; উৎকোচ গ্রহণে তাঁরা বশ্যতা স্বীকার করে নি, আক্রমণেও তারা পরাভূত হয় নি। তারা ধারার আদেশ ভিন্ন অন্য কোন মানুষের আদেশ—পালন ক'রবে না। এই দুর্গবাসীর বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে বন্দী ধারাকেও বাধ্য হয়ে তাদের প্রাণরক্ষার জন্য শত্রুর নিকট দুর্গদ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিতে অনুরোধ পত্র প্রেরণ করতে হ'ল।

(আগামী সংখ্যায় শেষ)

যুগের পূজা

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

নব প্রভাতের অমল আলোকে
উজ্জ্বল তপোবন,
অতুল ছন্দে অমর মন্ত্র
কে করে উচ্চারণ?
হে দেবী দুর্গা, সত্যযুগের
ঋষি ও দ্রষ্টা যারা
করিল তোমার অর্চ্চনা বুঝি
শ্বেত-শতদলে তারা।
অম্বর নীল, অম্বুধি নীল,
নীলাম্বুরাশি-তীরে
জলদ-মন্ত্র— গম্ভীর স্বরে
মন্ত্র পড়িল ধীরে।
সেই সীমাহীন শারদ সুনীল
চন্দ্রাতপের তলে
ত্রেতায় তোমারে শ্রীরামচন্দ্র
পূজিল নীলোৎপলে।

কেশব-কণ্ঠে অনুচ্চারিত
তখনো গীতার শ্লোক,
পুর-দেউলের কনক-কলসে
জ্বলিছে স্বর্ণালোক।
দ্বাপরের বীর স্বর্গ হইতে
সুবর্ণ—কোকনদে
শর—সন্ধানে আহরিয়া, দিল
পুষ্পাঞ্জলি পদে।
কাল আবরণে আবরি অঙ্গ
এল যুগান্তে কলি,
শুধু থেকে থেকে ঝলকি তিমির
আলেয়া উঠিছে জ্বলি।
নাচে উত্তাল প্রলয়—পয়োধি
প্লাবি' তট-তীর ভাঙা,
রক্ত-কমল নিবেদিনু দেবী,
হৃদয়-রক্তে রাঙা।

পাট ও পীঠ

শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল

বাঙলার বাহিরে মঞ্চাভিনয়ের অভাব

একমাত্র বাংলাদেশ ছাড়া ভারতের অন্য কোন প্রদেশে কোন চিরস্থায়ী জাতীয় রঙ্গালয়ের সন্ধান পাওয়া যায় না। অবশ্য সৌখীন মঞ্চাভিনয় এবং নৃত্যগীতাদি সময়ে অসময়ে জলসা-জাতীয় অনুষ্ঠান সব স্থানেই প্রচলিত। বহুকাল পূর্বে বোম্বাইয়ে বিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় নট ও নাট্যাচার্য বালগন্ধর্বের প্রযোজনা ও সুঅভিনয়ে অনেকগুলি সমাজ-শিক্ষামূলক সামাজিক নাটক উপভোগ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। মারাঠি ভাষায় লেখা এই সব নাটক তদানীন্তন কালের রঙ্গমঞ্চে স্থায়ীভাবে অভিনীত হ'ত এবং দর্শক-মহলে তার অধিকাংশই প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। একখানি নাটকের স্মৃতি আমার আজও মন থেকে বিলুপ্ত হয় নি। সে নাটকখানির নাম : "একচ পিয়ালা"। স্বর্গত দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নামক বিখ্যাত নাটকের আদর্শে মদ্যপানের বিষময় পরিণাম প্রচারের উদ্দেশ্যেই এই নাটকখানি লিখিত হয়। নারী-চরিত্রে বালগন্ধর্বের অতুলনীয় অভিনয় এই নাটকখানিকে স্মরণীয় করে তোলে।

সম্প্রতি স্বনামধন্য চিত্রাভিনেতা পৃথ্বীরাজ কাপুরের উৎসাহ ও চেষ্টায় বোম্বাই সহরে অনেকগুলি দেশাত্মবোধক নাটকের সহজবোধ্য হিন্দি ভাষায় অভিনয় বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তথাপি স্থায়ী রঙ্গালয়ের অভাবে বাঙলার বাহিরে কুত্রাপি কোন নাট্য-প্রচেষ্টা জাতীয়-শিল্প হিসাবে স্থায়িত্ব লাভ করে নি। ভ্রাম্যমান সম্প্রদায় দ্বারা অভিনীত কোন কোন নাটকের অভিনয় সাময়িকভাবে বাঙলার বাহিরে, দর্শকবৃন্দের তৃপ্তি বিধান করতে সক্ষম হ'লেও, তা মঞ্চ-রসিকের নাট্যপিপাসা নিবৃত্তির পক্ষে যথেষ্ট নয়।

বাঙলার মঞ্চ-শিল্পের অবস্থা

বাঙালীর রঙ্গালয় তার সামাজিক ও জাতীয় জীবনের দর্পণস্বরূপ। মনে-প্রাণে নাট্যানুরাগী বাঙালীর সার্থক নাট্য-প্রচেষ্টার পরিচয় বহন করছে শতাব্দীর ইতিহাসে। গৈরিশী যুগের প্রারম্ভ থেকে প্রাক্তন কাল পর্যন্ত অবৈতনিক এবং পেশাদার রঙ্গমঞ্চকে আশ্রয় করে বাঙলার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও ঔপন্যাসিকদের রচনা নাটকাকারে মঞ্চস্থ হবার সুযোগ লাভ করে। সমাজ-সেবা ও জাতীয় জীবনের কল্যাণ সাধনে আমাদের পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটকাদির অভিনয়, পরম সার্থকতায় স্মরণীয় হয়ে আছে।

গিরিশচন্দ্রের অভিনয় প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্য আমার হয় নি। কিন্তু পরিণত বয়সে, রসরাজ অমৃতলাল বসু, অমর দত্ত, তারাসুন্দরী ও কুসুমকুমারীর অভিনয় দেখে যে আনন্দ পেয়েছি, বোধ করি তার স্মৃতি মন থেকে কখনও অবলুপ্ত হবে না। দানীবাবু গৈরিশী যুগের অভিনেতা। অপরেশচন্দ্রও অগ্রবর্তীদের অন্যতম। বর্তমান শিশির যুগেও তাঁদের প্রতিভা ছিল অম্লান।

পেশাদার রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের আবির্ভাব ১৯২২-২৩ সালে। আর্ট থিয়েটারের অভ্যুদয়ও প্রায় এই সময়। শিশিরকুমার, নরেশ মিত্র, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অভিনেতাদের পেশাদার রঙ্গমঞ্চে যোগদানের পর থেকেই, আবার নতুন করে বাঙালার স্তিমিতপ্রায় রঙ্গালয়ের জীবন-দীপ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠবার সুযোগ লাভ করে। এঁদের মধ্যে অভিনয়-কৃতিত্ব ছাড়াও, নবযুগের প্রবর্তক হিসাবে, একাধারে নট, নাট্যাচার্য ও প্রযোগ-শিল্পীরূপে, শিশিরকুমার ভাদুড়ীর দাবী অনস্বীকার্য। এই স্বীকৃতি ও সম্মানের স্মারণিকা হিসাবে, পরবর্তী যুগকে 'শিশির-যুগ' নামে অভিহিত করার যোগ্য।

রঙ্গালয়কে নব আভিজাত্য দান করে তাকে পরিপুষ্ট করে তোলবার দাবীও শিশিরকুমারের। প্রায় ৩০ বৎসরকাল একাধিক্রমে রঙ্গালয়ের সেবা করেও তিনি আজও ক্লান্ত হয়ে পড়েন নি। শুধু নাট্য প্রযোজনায় নয়, শিক্ষক ও আচার্য হিসেবে এ যুগে শিশিরকুমার অপরাজেয়

বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁর শিল্প ও শিল্পীদের মধ্যে কৃতি শিল্পীর সংখ্যা অপরিমেয়।

কথক-ছবির প্রতিযোগিতায় মঞ্চ-শিল্পের স্থিতি ও গতি

যারা মনে করেন, কথক-ছবির প্রবল প্রতিযোগিতার ফলে মঞ্চশিল্পের ক্ষতি হয়েছে, তাঁদের এ ধারণা সত্য নয়। গত কয়েকবৎসর রঙ্গালয়গুলি নিস্তেজ হয়ে পড়েছে অন্য কারণে। মঞ্চশিল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে, মূলত ভাল নাটকের অভাবে এবং অংশত প্রয়োগ-যোগ্যতার দুর্লভতায় ও উৎকৃষ্ট শিল্পীর সাক্ষাৎ না পাওয়ায়। গিরিশ-চন্দ্র, রবিনচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমুখ বিগত নাট্যকারদের বহু অভিনীত নাটকের পৌনঃপুনিক অভিনয় দর্শনে দর্শকের মন আর তেমন ভাবে আকৃষ্ট হয় না। কারণ যাঁরা এই সব নাটকে অতীতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের অভিনয় উপভোগ করবার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা আর হালে-আমদানী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয় দেখে পুরো আনন্দ পান না। শিশির কুমার, অহীন্দ্র চৌধুরী বা নরেশ মিত্র মঞ্চাবতরণ করলেও, নব দ্রষ্টাদের সঙ্গে তাঁদের 'টিম-ওয়ার্ক' সামঞ্জস্য রেখতে না পারায়, সমগ্রভাবে অভিনয় হৃদয়গ্রাহী হয় না।

নূতন নাটকের অভাবে আমাদের রঙ্গালয়গুলি যেন ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। আমাদের পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত হবার পর, স্বাধীন ভারতের মঞ্চ প্রচেষ্টা জাতীয়তাবাদের আদর্শে অনেক বলিষ্ঠ ও সক্রিয় হওয়া উচিত ছিল। স্বাধীনতা-যুদ্ধে আত্মবলির বিনিময়ে আজ যাঁরা স্মরণীয় এমন দু' একটি শহীদের জীবনী অবলম্বনে রচিত কয়েকটি নাটকের অভিনয় সময়োপযোগী হয়েছে। নট-নাট্যকার শ্রীযুক্ত গুপ্তের কয়েকটি দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয় জাতির শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জন করেছে।

গণ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ নব আদর্শে সত্যিকারের জাতীয় রঙ্গালয় গোড়ে তোলবার এই ত সময়।

বাঙালী কথক-ছবির ভক্ত, একথা মিথ্যা নয়। কিন্তু দুধের স্বাদ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনি খাঁটি নাট্য-রসিকের রস-পিপাসা, সিনেমার কায়াহীন সচল ছবি দেখে মেটবার নয়। বস্তুহীন নাটক যেমন নির্দোষ প্রয়োগ-নৈপুণ্যে উৎরে যেতে পারে না, তেমনি ভাল নাটক দার্ঢ্যজনীন ভাবে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে হ'লে চাই—প্রথম শ্রেণীর নাট্য-শিক্ষক, প্রতিভাবান ও সুদর্শন শিল্পী এবং আধুনিক রুচিসম্মত প্রয়োগ-কৌশল এবং উন্নততর সঙ্গীতের আবেদন। এককালে রঙ্গমঞ্চে কণ্ঠ-সঙ্গীতের আকর্ষণ ছিল প্রবলতর। আজকাল মঞ্চাভিনয়ে সঙ্গীতের নামে যা সচরাচর পরিবেশিত হয়, তা অনভিজ্ঞের কাছেও দুঃসহ।

হিন্দি ও বাংলা বাণী-চিত্রের তুলনামূলক আবেদন

প্রতিযোগিতায় হিন্দি বাণী-চিত্রের তুলনায় বাংলা কথক-ছবি যে পরাজয় স্বীকার করছে, বাঙলার চিত্র-শিল্পের পক্ষে এটা লজ্জার কথা। বাঙলা দেশে, দেখা যাচ্ছে, প্রথম শ্রেণীর হিন্দি ছবিগুলি অবলীলাভরে ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ সপ্তাহ চলে যাচ্ছে। কিন্তু গড়পড়তা প্রাদেশিক ছবির আয়ু দশ-বারো সপ্তাহের বেশী নয়। হিন্দি ছবির আমরা বিরোধী নই। কিন্তু এদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাঙলা ছবি যদি না সমতালে পা ফেলে চলতে পারে, তবে সেটা নিশ্চয়ই খুব গৌরবের কথা নয়।

বোম্বাই বা দিল্লীতে বাঙালীর সংখ্যা বর্তমানে খুব উপেক্ষা করবার মত নয়। এই দুটি শহরে অর্ধ সপ্তাহের জন্যও কোন বাঙালা ছবি চলতে দেখা যায় না কেন? অথচ এই বাঙলাতেই মাঝে মাঝে প্রদর্শিত হয়, তামিল, তেলেগু ও পাঞ্জাবী বাণী-চিত্র।

সংখ্যার দিকে দৃষ্টি রেখে বাঙলার প্রডিউসারগণ ছবির জন্ম দিয়ে চলেছেন। ফলে ছবির বংশ বৃদ্ধি হচ্ছে, কিন্তু গুণের দিক দিয়ে বিচার করলে, শতকরা দশখানিও ধোপে টিকছে না। আমাদের চিত্র-নির্মাতাদের এ বিষয়ে অবিলম্বে সচেতন হওয়া কর্তব্য।

আমাদের দাবী

নিউথিয়েটার্স বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। একই স্থানে এত গুণী, টেক্‌নিশিয়ান্, কর্মী, সঙ্গীত-পরিচালক ও প্রয়োগ-শিল্পীর যোগাযোগে ঘটেছে, যা অন্যত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। হিন্দি ছবির পরিবেশনাতেও এঁদের সর্বভারতীয় খ্যাতি সুবিদিত।

একমাত্র 'রামের-সুমতি'র চিত্ররূপদান ছাড়া গত কয়েক বৎসর নিউ থিয়েটার্সের অন্য কোন ছবি তাঁদের অতীতের খ্যাতি ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। তথাপি উন্নত শ্রেণীর রুচিপূর্ণ ছবি দেখতে পাবার আশাই এঁদের কাছ থেকে স্বাভাবিক।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের জীবন-সঙ্গিনী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনী অবলম্বনে সদ্য-গৃহীত বাণী-চিত্রটি খুব সম্ভবত আগামী শারদীয়া অবকাশে মুক্তি লাভ করবে। 'প্রতিশ্রুতি'-চিত্রের খ্যাতনামা পরিচালক হেমচন্দ্র চন্দ্র এই ছবিখানির পরিচালন-দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং বাণী-চিত্রে সন্নিবেশিত গানগুলিতে সুরযোজনা করেছেন—ভারতীয় চিত্ররাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক, রাইচাঁদ বড়াল।

এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম চিত্র-শিল্পী ও পরিচালক বিমল রায় 'উদয়ের পথে'-চিত্রের পরিচালনায় প্রচুর খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁর শেষ ছবি 'মহুয়া' আমাদের পুরোপুরি খুশি করতে না পারলেও, ভবিষ্যতে তাঁর কাছে আমরা প্রথম শ্রেণীর এবং সর্বগুণসম্পন্ন ছবি পাবার আশা রাখি।

সাহিত্যিক-পরিচালকের উল্লেখযোগ্য দান

'উদয়ের পথে'-র সুখ্যাত লেখক, সাহিত্যিক জ্যোতির্ময় রায় তাঁর স্বলিখিত উপন্যাস অবলম্বনে সম্প্রতি যে সমস্যা-মূলক সমাজ-চিত্রটির পরিচালনা ও প্রযোজনা করেছেন, তার মধ্যে তাঁর সূক্ষ্ম রসবোধ, সৌন্দর্যজ্ঞান ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। এই ছবিটি "দিনের পর দিন" নামে বহু নামজাদা সাহিত্যিক ও সমালোচকদের দ্বারা সমাদৃত হয়েছে।

চিরাচরিত প্রেমের কাহিনী জমাবার বাঁধা রাস্তা এড়িয়ে, রায় মহাশয় এমন পথ দিয়ে গল্পটিকে টেনে নিয়ে গেছেন, যার দুধারে চোখে পড়ে ফণী-মনসা ও কাঁটা-গাছের সমারোহ। এই পথে এগিয়ে চলেছেন যে কটি পথিক, তাঁদের বুকে আছে সাহস, চোখে আছে অবিচল আত্ম-বিশ্বাসের ইঙ্গিত। এমন কয়েকটি নরনারীর পরিচয় পাই এই ছবিতে, যারা বেঁচে—মরে নেই; বরং মরণকে জয় করতেই এরা ছুটে চলেছে দুর্গম-পথে।

দিনের পরদিন যারা অন্যায় সহ্য করে বিনা প্রতিবাদে, শাস্তির ভয়ে লুটিয়ে পড়ে দণ্ডদাতার পায়ে, তাদেরই আসন্ন-কাতর, শিথিল মেরুদণ্ডকে খাড়া করে তুলতে, কতখানি শক্তি, সাহস ও একতার প্রয়োজন—আলোচ্য ছবিখানি তারই ইঙ্গিত বহন করছে। আধুনিক যুগের তরুণ-তরুণীর প্রতিক্রিয়াশীল মনে সাড়া জাগিয়ে তুলতে এই ছবিখানির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবার নয়।

সংলাপ-রচয়িতা হিসেবে জ্যোতির্ময়বাবু যে তাঁর সমসাময়িক চিত্রনাট্যকারদের পশ্চাতে ফেলে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন, এটা কম আশার কথা নয়।

নাটকোপযোগী সংগীত-রচনায় তরুণ কবি দীনেশ দাসের যোগ্যতা স্বীকার করি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুর-সংযোজনায় প্রায় প্রত্যেকটি গান উপভোগ্য হয়ে ওঠবার সুযোগ পেয়েছে।

সাধারণ দর্শককে খুশী করবার প্রচলিত ও চিরন্তন 'ফরমুলা' থেকে বঞ্চিত হ'লেও, "দিনের পর দিন" সাহিত্য ও কাব্যরসিক দর্শককে পরিতৃপ্ত করবার দাবী রাখে। ছোট-বড় প্রায় সকল চরিত্রেই শিল্পীরা সু-অভিনয় করেছেন। এঁদের আতিশয্য-বর্জিত অভিনয়ে নিষ্ঠা ও সংযমের ছাপ বিদ্যমান।

৪২-চিত্রের পরিণাম ও বাতিলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

গত মাসে উল্লিখিত, ফিল্ম ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়ার আগষ্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় গৃহীত "৪২" ছবিখানি, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের ফিল্ম সেন্সার বিভাগের "Full Board" কর্তৃক প্রদর্শনের অযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়ায় বাতিল করা হয়েছে। ছবিখানির বিরুদ্ধে বোর্ডের অভিযোগ যে নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, দেশের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে তার যুক্তিকে সুস্থ মনে গ্রহণ করা চলে না। কিন্তু "৪২" ছবির অংশ বিশেষকে অশ্লীলতার অপরাধেও এঁরা অভিযুক্ত করায়, সাধারণের মধ্যে যথেষ্ট বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

'আগামী সাহিত্য সঙ্ঘের' বিশিষ্ট সভ্যগণ সম্প্রতি মহাবোধি সোসাইটি হলে অনুষ্ঠিত প্রকাশ্য-সভায় সরকারী দমন-নীতির তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে দেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শিক্ষাব্রতী ও সমালোচকদের দ্বারা সরকারী অভিযোগগুলি বিশ্লেষিত হবার উদ্দেশ্যে একটি অপ্রকাশ্য

প্রদর্শনীর দাবী করেন। এ দাবী যুক্তিপূর্ণ ও ন্যায়সংগত বলে আমরা মনে করি।

অশ্লীলতা-অভিযোগের সপক্ষে দেশবাসের কর্তৃপক্ষ কোন যুক্তি দেন নাই। সুতরাং তার সারবত্তা সম্বন্ধে সরকারের নির্দেশ চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করা চলে না।

সহ-শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে আগামী বাংলা ছবি

সুখ্যাত কাহিনীকার নিতাই ভট্টাচার্যের সদ্যলিখিত একটি মৌলিক কাহিনীকে আপাততঃ "সাগরিকা" নামে অভিহিত করা হয়েছে।

আধুনিক কালের একটি সহ-শিক্ষা কেন্দ্রকে পটভূমিকা স্বরূপ গ্রহণ করে, বাংলা মুখর ছবির জন্য নাট্যরচনার প্রচেষ্টা এই প্রথম।

প্রখ্যাত প্রযোজক-পরিচালক দেবকীকুমার বসু তাঁর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান 'চিত্র-মায়া'-র দ্বিতীয় অবদানের জন্য এই নতুন ধরণের কাহিনীটিকে গ্রহণ করায় তিনি রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। এই গল্পটি চিত্র-নাট্যাকারে শোনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। দেশ-প্রেমের প্রচলিত বাণী, 'শ্লোগান্', বহু-আলোচিত সমস্যা-বিবর্জিত এই রসাল কাহিনীটি প্রেম উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও আত্মত্যাগের মহৎ আদর্শকে কেন্দ্র করে নাটকাকারে শাখাপল্লবিত হয়েছে। শিক্ষা-ব্রতী তরুণ-তরুণীদের কাছে সে আদর্শের আবেদন ব্যর্থ হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

সমুদ্র তটে

শ্রীবিমলকৃষ্ণ সরকার

নামিছে সন্ধ্যার ছায়া। অশ্রান্ত ক্রন্দন
সৃষ্টির আদিম ক্ষুধা, প্রাণের স্পন্দন
গর্জিছে অতল সিন্ধু। সাগর বেলাতে
জনস্রোত হ'তে দূরে মোদের জগতে
ব'সে আছি আজি মোরা। পশ্চিম গগনে
কাঁপিছে রহস্য শিখা।

আজি পড়ে মনে
পৃথিবীর জন্মকথা—অপূর্ব কাহিনী
মহাশূন্য মাঝে চির অগ্নি-প্রবাহিনী,
অসহ উত্তাপ জ্বালা। তাহারি আভাস,
প্রাণময়ী পৃথিবীর উন্মত্ত উচ্ছ্বাস
হেরি শুভ্র ফেনপুঞ্জে দীপ্ত নীলিমায়
অন্তহীন তরঙ্গ লীলায়। অসহায়
আর্ত বায়ু বহি' আনে বিস্মৃত বারতা
সুগোপন মর্মব্যথা, তীব্র আকুলতা।

মুছে গেল শেষ রশ্মি। ঘনকৃষ্ণ মেঘে
আঁধারে ভরিল ধরা। প্রলয় উদ্বেগে
স্তব্ধ আজি মহাকাশ। ভরিয়া শর্বরী
জ্বলে যেই দীপশিখা—অনন্ত প্রহরী
নিভিয়া সে গেছে নভপটে।

মনে হয়
এখনো জাগেনি, নব সূর্যোদয়,
তারি লাগি' প্রতীক্ষিয়া আছি দুইজনে
স্বজনের পরপারে। এই মহাক্ষণে
ঘুচে গেছে সর্ব দ্বন্দ্ব, সর্ব অনুভূতি,
তুচ্ছ মান অভিমান, করুণ কাকুতি,
বিরহ বেদনা। রূপহীন, তনুহীন,
মোরা যেন পরমাণু আঁধারে বিলীন,
মোরা যেন মৌন ব্যথা সৃষ্টি কামনার,
নিস্তরঙ্গ পারাবার, অতল, অপার।

স্মরণ উৎসব—

গত ১৫ই আগষ্ট ভারতের সর্ব্বত্র ভারতের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির দ্বিতীয় স্মরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর ২ বৎসর অতীত হইয়াছে, আমাদের অন্নবস্ত্র সমস্যার কোন সমাধান হয় নাই, নানাপ্রকারে আমরা অধিকতর বিপন্ন হইয়াছি—তথাপি ২ বৎসর পরে ঐ দিনটি আনন্দের সহিতই স্মরণ করা কর্ত্তব্য। দেশের দুর্দ্দিনে নেতারা ঐ দিন অধিক তামাসা না করিয়া ঐ দিন গঠনমূলক কাজে সকলকে আত্মনিয়োগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। সেজন্য ঐ দিন সর্ব্বত্র বৃক্ষ রোপণ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। নানা-কারণে দেশ আজ কৃষি বিমুখ ও শ্রম বিমুখ হইয়াছে—সে জন্য দেশপাল চক্রবর্ত্তী শ্রীরাজাগোপালাচারী, প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই এখন কৃষির প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন। কাজেই স্বাধীনতা উৎসবের দিনে সকলের 'অধিক ফসল উৎপাদনে'র চেষ্টা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। দুঃখের বিষয় এক দল বিপথগামী লোক স্বাধীনতাকে 'ভুয়া স্বাধীনতা' আখ্যা দিয়া সে

গেটপ্রোগ্রামে স্বাধীনতা উৎসবে মহিলাবৃন্দ। ফটো—অমিত মুখোপাধ্যায়

গেটপ্রোগ্রামে স্বাধীনতা উৎসবে বাজনিক নৃত্য। ফটো—অমিত মুখোপাধ্যায়

কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশপালের গৃহে স্বাধীনতা উৎসবে মঙ্গলানুষ্ঠান। ফটো—অসিত মুখোপাধ্যায়

স্বাধীনতা উৎসবে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশপালের গৃহে তরু রোপণ অনুষ্ঠান। ফটো—অসিত মুখোপাধ্যায়

সম্বন্ধে অবহিত হই নাই এবং কর্ত্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হই নাই—ইহা সত্য কথা। তাহা করিলে আমরা অবশ্যই স্বাধীনতার সুখ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব। যাঁহারা আজ শাসন যন্ত্র পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে অল্প সময়ের মধ্যে সকল সমস্যার সুসমাধান করিয়া দেওয়াও সম্ভবপর নহে। তাঁহারা দেশকে মুক্তি সংগ্রামে পরিচালিত করিয়া জয়ের পথে লইয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ছিল না। কাজেই নানা অসুবিধার মধ্য দিয়া তাঁহা-দিগকে কাজে অগ্রসর হইতে হইতেছে। এ অবস্থায় যদি দিনও লোককে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করিয়াছিল। স্বাধীন ভারতে আমরা যে এখনও নিজ নিজ কর্ত্তব্য আমরা নিজেদের কর্ত্তব্য না করিয়া শুধু শাসকবর্গকে

গালি দিই, তাহা হইলে দেশকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে সমর্থ হইব না। একদিকে ইহাও যেমন সত্য, অন্য দিকে কংগ্রেস-নেতারা ক্ষমতালাভের পর যে পূর্ণ প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইয়াছেন, সে কথা তেমনই সত্য। দেশের

কলিকাতার ময়দানে মাইনুতগণের পতাকা অভিবাদন ফটো—পাণ্ডা সেন

সর্ব্বত্র যে ধনিক-শ্রমিক বিরোধ ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহা দূর করিতে হইলে শাসনযন্ত্রকে সুবিবেচনার সহিত পরিচালনা করা প্রয়োজন। স্বাধীনতার উৎসবের মধ্য দিয়া যদি আমরা উভয় পক্ষই প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকি—তবে স্বাধীনতা উৎসব সম্পাদন সার্থক হইয়াছে।

নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতিতে স্বাধীনতা উৎসব
—পঞ্চপল্লের আলিপনা

প্রাদেশিকতা—

শ্রীযুত শ্রীপ্রকাশ বর্ত্তমানে আসামের গভর্ণর। তিনি কাশীর সুপ্রসিদ্ধ ধনী ও পণ্ডিত বংশের সন্তান, কৃতী পিতা ডাঃ ভগবান দাসের পুত্র এবং নিজেও অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন। আসামে প্রাদেশিকতার ফলে তথায় ভীষণ বাঙ্গালী বিদ্বেষ দেখিয়া তিনি বিব্রত হইয়াছেন। শুধু আসামে নহে,

নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতিতে স্বাধীনতা উৎসব

উড়িষ্যা, বিহার ও যুক্তপ্রদেশেও প্রাদেশিকতা ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। এ ৩টি প্রদেশ হইতে প্রবাসী বাঙ্গালীদের তাড়াইবার জন্য তীব্র আন্দোলন চলিতেছে। কি করিয়া এই প্রাদেশিকতা দূর করা যায়, সে জন্য শ্রীযুত

শ্রীপ্রকাশ নানা উপায় চিন্তা করিয়া সে বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। তিনি প্রায়ই বলিয়া থাকেন—বাঙ্গালী যখন অন্য কোন প্রদেশে যাইয়া বাস করিবে, তখন তাহাকে সেই প্রদেশের অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার-প্রভৃতি গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা ছাড়া অন্য উপায় নাই। তিনি আন্ত-প্রাদেশিক বিবাহও সমর্থন করেন। বিবাহের দ্বারা মিলনের বন্ধন সুদৃঢ় হইবে। উড়িষ্যার বর্ত্তমান প্রধান-মন্ত্রী শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মহাতাব উড়িষ্যায় বাঙ্গালী বিদ্বেষ কমাইবার জন্য বাঙ্গালী উড়িয়া বিবাহে উৎসাহ দান করিয়া থাকেন। সহসা এ বিষয়ে পরিবর্ত্তন সম্ভব নহে। তবে গভর্ণর ও প্রধান মন্ত্রীর মত পদস্থ ব্যক্তিরা এই প্রাদেশিকতা দূরীকরণে চেষ্টা করিলে উহা যে লুপ্ত হইবে, সে বিশ্বাস আমরা করিতে পারি।

জাপান যাত্রার পথে ইণ্ডিয়ার (হকী-পায়ক) কলিকাতা আগমন ও স্বাগত ফটো—পান্না সেন

বিদেশে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ—

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমেরিকার ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে যাইয়া সে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। মন্‌ট্রিলে ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে সম্মানসূচক ডি-এল উপাধিও দান করিয়াছেন। ক্যানাডাতে ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে—তাহার কতকগুলি বৃটিশ, কতকগুলি আমেরিকান ও কতকগুলি ফরাসী আদর্শে পরিচালিত হয়। তিনি বোষ্টনের ম্যাসাচুসেট্‌স ইনিষ্টিটিউটের অধ্যাপক চালমার্সের নিকট শুনিয়াছেন যে সর্ব্বদাই ভারতীয় ছাত্রগণ তাঁহার প্রশংসা লাভ করিয়া থাকে। যাহা হউক, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৯০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিয়াছেন। ঐ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক ও কৃতী-ছাত্র দান গ্রহণের ব্যবস্থা করিবেন। বাঙ্গালার ছাত্ররা বিদেশে যাইয়া ব্যবহারিক জ্ঞান লাভে সমর্থ হইলে তাহার দ্বারা দেশ উপকৃত হইবে সন্দেহ নাই। দেশকে সমৃদ্ধ করিতে হইলে দলে দলে বিদেশে ছাত্র পাঠাইয়া তাহাদের শিল্প ও বিজ্ঞানে শিক্ষিত করা প্রয়োজন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সে বিষয়ে আগ্রহশীল হইয়াছেন দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইবেন।

দাহনান্তে শ্মশানঘাটে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মৃত্যু যাত্রিণী বিকসে পুষ্পমালো বিভূষিত প্রতিমূর্ত্তি ফটো—পান্না সেন

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের চাকরী—

আমাদের কংগ্রেসী শাসনবর্গ যে সর্ব্বত্র আত্মীয়-পোষণের জন্য নূতন মোটা বেতনের পদ সৃষ্টি করিতেছেন, সে কথা 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রের মত সাংস্কৃতিক সাময়িক পত্রেও আলোচিত হইয়াছে। চাকরীর সংখ্যা কি ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হইল—

পদ	১৯৩৯	১৯৪৯
সেক্রেটারী	৯	১৯
অতিরিক্ত ঐ	৩	৭
সহকারী ঐ	৮	৪০
ডেপুটী ঐ	১২	৮৯
আণ্ডার ঐ	১৬	৪৬
সুপারিটেণ্ডেণ্ট	৬৮	২৯৩
ভারপ্রাপ্ত সহকারী	৮	১৬৮

এখনও সেক্রেটারী ও অতিরিক্ত সেক্রেটারীরা মাসিক ৪ হাজার টাকা এবং সহকারী সেক্রেটারীরা মাসিক ৩ হাজার টাকা বেতন পাইতেছেন। পূর্ব্বে আমরা এই উচ্চ বেতনের জন্য বৃটিশকে নিন্দা করিয়াছি। এখনও এরূপ অধিক বেতন দানের কোন অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া এত অধিকসংখ্যক মোটা বেতনের কর্ম্মচারীর বেতন দিবার পর দেশের মঙ্গলজনক কাজের জন্য আর সরকারী তহবিলে টাকা পাওয়া যাইবে না। কেন্দ্রের অনুকরণে প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলিও কাজ করে—তাহারাও যে এই ভাবে চলিবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

শ্রীঅরবিন্দ জয়ন্তী—

গত ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস উৎসবের সঙ্গে দেশের সর্ব্বত্র শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের জন্মদিবস উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। ১২৭৯ সালে শ্রীঅরবিন্দের জন্ম। বর্ত্তমানে তিনি পণ্ডিচারীর ঋষি শ্রীঅরবিন্দ হইলেও বাঙ্গালার লোক তাঁহাকে দেশ-সেবক, শিক্ষা-ব্রতী, বিপ্লবী, সাংবাদিক বলিয়াই জানে। ১৯০৮ সালে বোমার মামলার আসামী অরবিন্দের কথা বাঙ্গালী ভুলে নাই। কারামুক্ত হইয়া তিনি ধর্ম্ম ও কর্ম্মযোগীন নামক বাংলা ও ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদনা করিতেন। সামসুল আলামের হত্যার পর পুলিস তাঁহাকে সেই হত্যার ষড়যন্ত্রে গ্রেপ্তার করিবে বলিয়া ভগিনী নিবেদিতার নির্দ্দেশে তিনি আত্মগোপন করেন। প্রথমে চন্দননগরে প্রবর্ত্তক সংঘের গুরু শ্রীমতিলাল রায়ের নিকট থাকিয়া, পরে তিনি পণ্ডিচেরীতে যাইয়া আশ্রম প্রতিষ্ঠা

শ্রীঅরবিন্দ আবির্ভাব মহোৎসব ফটো—পাঞ্চা সেন

করেন। বহু বৎসর তপায় তিনি যোগ-সাধনায় মগ্ন আছেন। আজ ভারতবাসী সকলে তাঁহার জন্ম দিনে তাঁহার পূজা করিয়া ধন্য হইয়াছে। এই পূজা শ্রীঅরবিন্দকে উপলক্ষ করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির আরাধনা। যে যোগ সাধনায় ভারত তাহার দীপ্তি লাভ করিবে, দেশবাসী

শ্রীঅরবিন্দ আবির্ভাব মহোৎসবে কলিকাতার রাজপথে শ্রীঅরবিন্দের প্রকাণ্ড প্রতিমূর্ত্তি বহ দীর্ঘ শোভাযাত্রা —ফটো পাঞ্চা সেন

শ্রীঅরবিন্দের আদর্শে সেই যোগ সাধনা গ্রহণ করুক—আমরা তাঁহার শুভ জন্ম দিনে এই প্রার্থনাই করিব। তিনি

মানুষকে দেবতায় পরিণত করার জন্য যে সাধনা করিতেছেন তাঁহার পূজা দ্বারা আমরা যেন সেই সাধনাকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারি।

শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিবস উপলক্ষে কলিকাতায় ৭ দিন ধরিয়া আলোচনা-সভা ও উৎসব হইয়াছিল। বিচারপতি শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীকালিদাস নাগ, রাজগোলার রাজা শ্রীযীরেন্দ্র নারায়ণ রায় প্রভৃতির চেষ্টায় সে উৎসব সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীদিলীপকুমার রায় এই উপলক্ষে পণ্ডিচেরী হইতে কলিকাতায় আসিয়া সেই উৎসবকে সঙ্গীত-মুখর করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন।

শ্রীঅরবিন্দ আবির্ভাব মহোৎসবের যোগদান ফটো—পান্না সেন

কংগ্রেসের বিরোধী দল—

বাঙ্গালায় কংগ্রেসের বিরোধী দলের নেতা শ্রীযুত শরৎ চন্দ্র বসু কয়েক মাস ইউরোপ ভ্রমণের পর গত ২রা আগষ্ট কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি আসিবার পর হইতে ভারতের সকল বাম-পন্থী দলকে একত্র করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। খ্যাতনামা সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীজয়-প্রকাশ নারায়ণও ২রা আগষ্ট কলিকাতায় আসিয়া ২০ দিন এখানে বাস করিয়াছিলেন। ঐ সময় ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রীযুত আর-এস-রুইকর প্রভৃতিও কলিকাতায় ছিলেন। সকল বামপন্থী দলকে একত্র করিয়া আগামী নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কার্য্য করার চেষ্টা বিফল হইয়াছে। তাঁহাদের পরিস্থিতিতে কলিকাতায় রাজ-নীতিক আবহাওয়া গত ২০ দিন খুব গরম ছিল—কিন্তু একদল যুবককে বামপন্থী করার নামে উচ্ছৃঙ্খল করা ছাড়া তাঁহারা কোন উল্লেখযোগ্য কার্য্য করিতে পারেন নাই। শরৎবাবুর নেতৃত্বে বামপন্থী দল সংঘবদ্ধ হইলে হয় ত তাহাদের দ্বারা দেশ উপকৃত হইতে পারিত। আলোচনায় দেখা দিয়াছে—সকলেই স্ব স্ব প্রাধান্য বজায় রাখিয়া চলার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা যদি আত্মম্ভরিতা ত্যাগ করিয়া দেশকল্যাণে মনোযোগী হইতেন, তবে মিলনের পথে কোন বাধা থাকিত না।

আচার্য্য রায় স্মৃতিভাণ্ডার—

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ভারতে বিজ্ঞান, শিল্প, জনসেবা, মুক্তি-সংগ্রাম প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে আমাদের যে দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার পরিবর্ত্তে আমরা তাঁহার স্মৃতি রক্ষার কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা করি নাই। ভারতীয় রাসায়নিক সমিতি সম্প্রতি ২ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া রসায়ন-বিজ্ঞানের ছাত্রগণকে উৎসাহ দানে অগ্রসর হইয়াছেন। ঐ টাকার শতকরা ২৫ ভাগ পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেণ্ট দান করিবেন। ভাণ্ডারে মাত্র ৪২ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। ভারত-বর্ষে আচার্য্য রায়ের দ্বারা উপকৃত কৃতী লোকের সংখ্যা কম নহে—তাঁহারা সকলে অবহিত হইলে রসায়নিক সমিতির

পক্ষে এই অর্থ সংগ্রহ করা আদৌ কষ্টকর হইবে না। আচার্য্য রায়কে কি আমরা এত শীঘ্রই ভুলিয়া যাইব ?

পুলিনবিহারী দাস—

ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা—বাঙ্গালার বিপ্লববাদের অন্যতম নেতা, খ্যাতনামা ব্যায়াম-শিক্ষক পুলিনবিহারী দাস গত ১৭ই আগষ্ট বুধবার বিকালে ৭৩ বৎসর বয়সে সহসা পরলোকগমন করিয়াছেন। কলিকাতা বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীটে বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি প্রত্যহ তথায় শিক্ষার্থীদিগকে ব্যায়াম শিক্ষা দিতেন। মৃত্যুর দিনও বৈকালে তিনি কৈলাশ বসু ষ্ট্রীটের বাড়ী হইতে রিকসায় করিয়া তথায় গমন করেন ও তথায় যাইয়াই সহসা হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মারা যান। ১৯০৫ সালে তিনি সারা বাঙ্গলাদেশে অনুশীলন সমিতি করিয়া প্রায় ৩০ হাজার যুবককে বিপ্লব-

পুলিনবিহারী দাস

বাদে দীক্ষা দান করেন। ১৯০৯ সালে কৃষ্ণকুমার মিত্র, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রভৃতির সহিত তিনিও বন্দী হন—কিন্তু মুক্তি লাভের পর পুনরায় ধৃত হন। তাহার পর পুনরায় ধৃত হন ও ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করিয়া আন্দামানে প্রেরিত হন। তাঁহার বিচারের সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। মুক্তির পর তিনি গান্ধীজির আন্দোলনে যোগদান করিয়া শান্তভাবে দেশের যুবকগণকে শরীর চর্চ্চা শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করিতে আহ্বান করেন। গত ৩০ বৎসর কাল তিনি নিষ্ঠার সহিত সে কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার বিপ্লবীদের গুরু হিসাবে তাঁহার নাম মুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

বাঙ্গালায় দলাদলি—

বাঙ্গালী কংগ্রেসে দলাদলি ক্রমে চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীতে পরাজিত দল তাঁহাদের প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সর্ব্বত্র আন্দোলন করিতেছেন। বিজেতা দলকে সকল প্রকার কার্য্যে বাধা প্রদানের চেষ্টা চলিতেছে। বিজেতা দল কাজ চালাইবার জন্য প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি ও সম্পাদক ছাড়া শ্রীঅমর কৃষ্ণ ঘোষ, ডাঃ নৃপেন্দ্র নাথ বসু ও ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় এই ৫ জনকে লইয়া ওয়ার্কিং কমিটী গঠন করিয়াছেন। উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ হইতে কোন নির্দ্দেশ না আসিলে বাঙ্গালার দলাদলি আরও বাড়িয়া যাইবে ও তাহার ফলে বাঙ্গালা দেশের দুঃখদুর্দ্দশাও বাড়িবে। কংগ্রেসের উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ এই বিরোধ বাড়াইবার পক্ষপাতী বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালায় দলাদলি থাকিলে লোক ব্যস্ত থাকিবে—মানভূম, কুচবিহার প্রভৃতি সমস্যার কথা স্মরণ করিবে না। বাঙ্গালার অধিবাসীরা যে বর্ত্তমান শাসন-ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের দাবী করিয়াছিল, সে বিষয়েও আর উর্দ্ধতন কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষকে কোন ব্যবস্থা করিতে হইবে না। এ সময়ে বাঙ্গালী দলাদলি ভুলিয়া সকলে একত্রিত না হইলে বাঙ্গালা দেশের ভবিষ্যতে আর কোন অস্তিত্ব থাকার আশা নাই।

কুচবিহারের শাসন ভার—

শুনা যাইতেছে, শীঘ্রই ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকার কুচবিহার রাজ্যের শাসন ভার গ্রহণ করিবেন। কুচবিহারের অধিবাসীরা অধিকাংশই বাঙ্গালী—তাহারা ঐ রাজ্যকে পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত করিবার জন্য আপ্রাণ আন্দোলন করিয়াছে—কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কোন প্রকারে কুচবিহারের মহারাজাকে হাত করিয়া লইয়া তথায় অন্যরূপ ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। আজ যদি কুচবিহার কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তবে অচিরে কুচবিহার পশ্চিম বাঙ্গালায় না আসিয়া আসামের সহিত সংযুক্ত হইবে। বাঙ্গালা দেশকে সকল প্রকারে ছোট করিয়া বাঙ্গালী জাতিকে দাবাইয়া রাখাই এখন কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছা বলিয়া মনে হয়। কুচবিহার, ত্রিপুরা ও মণিপুরে

বাঙালীই অধিক সংখ্যায় বাস করে—আজ দুর্ভাগ্যের বাঙালা হইতে পৃথক করা হইল, কাছাড় ত্রিপুরা ও মণিপুর আসামের সহিত সংযুক্ত করা হইবে। পূর্ব-পাকিস্থান পৃথক হওয়ায় আজ বাঙালীর বসবাসের স্থান নাই—তাহার পর বাঙালা আরও ছোট করা হইলে বাঙালী জাতির অস্তিত্ব লোপ পাইবে। বাঙালার সংস্কৃতি একদিন সমগ্র ভারতে প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে—আজ তাহা ভারতের সকল প্রদেশের লোকের অসহনীয় হওয়ায় এই ভাবে বাঙালার প্রভাব নষ্ট করা হইবে।

অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র—

[illegible] ও প্রথম শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র

ত্রিশ বৎসর অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্দ্যোপাধ্যায় ৬২ বৎসর বয়সে তাঁহার বৈদ্যবাটীর বাসভবনে পরলোকে গমন করিয়াছেন। ছাত্রাবস্থা হইতে তিনি সুনাম অর্জন করেন। প্রথম জীবনে কিছুকাল জাতীয় বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার পর কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনিই সর্ব্ব প্রথম ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী হইয়া ঐ পদ লাভ করেন। চট্টগ্রাম কলেজে সহকারী অধ্যক্ষ থাকার সময় তিনি ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া সহকারী চাকরী ত্যাগ করেন। কিছুকাল কারাবাসের পর তিনি কলিকাতায় আসিয়া তৎকালীন প্রসিদ্ধ দৈনিক সংবাদপত্র সার্ভাণ্টের সম্পাদক হন এবং বঙ্গীয় কংগ্রেসের শিক্ষাবোর্ডের সম্পাদক হন। পরে কিছুকাল তিনি রেঙ্গুনে একখানি ইংরাজি দৈনিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। ১৯২৫ সাল হইতে তিনি বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক হন। ঐ সময় হইতে তিনি বৈদ্যবাটীতে (হুগলী) গৃহ-নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন ও বহুদিন বৈদ্যবাটী মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যানের কাজ করিয়াছিলেন। তিনি বহু বাংলা পুস্তক রচনা করিয়াছেন—তন্মধ্যে তাঁহার কয়েকখানি কবিতা পুস্তক বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। তাঁহার মধ্যে যেমন অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও ধীশক্তি দেখিয়াছি—তেমনই শিশু সুলভ সরলতা ও সকল মানুষের জন্য দরদ তাঁহাকে সকল শ্রেণীর শ্রদ্ধার পাত্র করিয়াছে। চট্টগ্রামে সে যুগে তাঁহার আদর্শে বিরাট আন্দোলন সাফল্য লাভ করে এবং তাঁহারই ছাত্রদল সারা বাংলা দেশে এক সময়ে জাতীয় আন্দোলনের পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়াছিল। তিনি শিক্ষাব্রতী ছিলেন এবং দেশের বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিয়া তাহা দেশোপযোগী করিবার জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশে একজন অকৃত্রিম ও চির-উৎসাগী দেশপ্রেমিকের অভাব হইল।

শেষ সম্রাট

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

—চার—

বেশ নিপুণ হাতেই খুন করেছে লোকটাকে।

অতবড় জোয়ান হিন্দুস্থানীটার পাথুরে মাথাটাকেও গুঁড়ো করে ফেলেছে বাজের মতো নিষ্ঠুর লাঠির ঘায়ে। বীভৎস বিকৃত মুখে রক্ত আর কাদার প্রলেপ। শুধু লাঠি নয়—দু চার জায়গায় টাঙ্গিও চালিয়েছে মনে হয়। অক্ষকক সেই ধারালো টাঙ্গির আঘাত হাঁ করে আছে ঘাড়ের ওপর। কোনোমতেই বাঁচতে দেওয়া যাবে না—এই সংকল্প নিয়েই জটাধর সিংকে খুন করেছে নির্মম ভাবে।

দৃশ্যটার পৈশাচিকতা কয়েক মুহূর্ত পাথর করে রাখল সকলকে। এ হত্যা যেন মানুষে করেনি, এই নিধনের ভেতরে কোথাও যেন চিহ্ন নেই মানবিক কোমলতার; শুধু কোনো রক্ত সমুদ্রের মতো 'বরিন্দের' বন্য-মৃত্তিকার এ যেন একটা প্রাকৃতিক-হিংসা। যেন আচমকা ঝড়ের ঝাপটায় কোনো দিগন্ত-প্রহরী তালগাছ ধ্বসে পড়ে একটা মানুষকে নিষ্পিষ্ট করে ফেলার মতো—বুনো-শুয়োরের দাঁতে কোনো ছিনোদর অপমৃত্যুর অনানুষ্ঠিক বিভীষিকার মতো। এদেশের মাটিতে এই মৃত্যুই যেন স্বাভাবিক, সব চাইতে যুক্তি-সঙ্গত।

খানিকক্ষণ কেটে গেল। দুঃসহ একটা স্তব্ধতা সকলের বুকের ওপর চেপে রইল জগদ্দল-পাথরের মতো।

রঞ্জনই কথা বললে তারপরে।

—একটু ভুল হয়েছে বোধ হয়?

—কী ভুল?—এমন একটা দৃষ্টিতে ভৈরবনারায়ণ তাকালেন যে তার ব্যাখ্যা হয় না।

কিন্তু ও দৃষ্টিকে ভয় পাবার বয়েস তার কেটে গেছে উনিশশো তিরিশ সালে। ওর চেয়ে অনেক বেশি ক্ষুধিত চোখে তাকে গিলে খেতে চেয়েছিল ধনেশ্বর—বিপ্লবী যুগে সেই আই বি ইন্‌সপেক্টার। একটা ছোট বলের মতো হাতের ওপর লোফালুফি করেছিল ছয় চেম্বারের লোড করা রিভলভারটাকে—বাইসনের হিংস্র চামড়াটা বাতাস কেটেছিল তীক্ষ্ণ শোঁ শোঁ শব্দে।

সমান দৃষ্টিতেই রঞ্জন তাকালো ভৈরবনারায়ণের চোখের দিকে।

—বডিটা তুলে আনা উচিত হয় নি। পুলিশে খবর দিলেই ভালো হত।

—পুলিশ!—তাচ্ছিল্যের ক্রুর ভ্রূকুটি ফুটলো ভৈরব-নারায়ণের মুখে। তারপর যেমন করে ম্যান্‌ইটার বাঘ তার 'নড়ি' আগলায়, মৃতদেহটার দিকে তেমনি আগ্নেয় দৃষ্টি ফেলে বললেন, সে খবর একটা দিলেও চলবে পরে। কিন্তু তার আগে—

ভৈরবনারায়ণ সমবেত জনতার ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন, যেন খুঁজলেন কাউকে। বললেন, দত্ত কোথায়?

—বাসায় গেছেন—একজন পাইক জবাব দিলে।

—এক্ষুণি ডেকে নিয়ে আসছি। বলবি, জরুরি তলব। তারপর একবার ঘোষেদের আদায় দেখে নিতে হবে।

—মুর্দা, বাবু?

—থাক ওখানেই। থানায় একটা খবর দিয়ে আয়। তারা ওটা নিয়ে যা খুশি করুক। আমাদের কাজ আমরা বুঝব।

পায়ের ভারী চটিটায় শব্দ করে কুমারবাহাদুর ভেতরে চলে গেলেন।

•

রাত্রে নিজের ঘরে বসে কিছু একটা পড়বার চেষ্টা করছিল রঞ্জন।

গুরুভার একখানা অর্থনীতির বই। লাল পেন্‌সিল দিয়ে দাগিয়ে দাগিয়ে মার্জিনে নোট করে পড়বার মতো বই। কিন্তু আজ আর ওই তর্ক তত্ত্বের অরণ্যে সে প্রবেশ করতে পারল না। মাথাটা কেমন ভারী হয়ে আছে, পড়তে পড়তে বার বার ঝাপসা হয়ে আসছে

দৃষ্টি। বইয়ের পাতায় হঠাৎ যেন ছন্দ-শৃঙ্খলা হারিয়ে একটা আর একটার ঘাড়ে এসে পড়ছে। অসম্ভব।

উঠে পড়ালে সে। চারিদিকে ঘন হয়ে নেমেছে কালো রাত্রি। খোলা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে সেই অন্ধকারের মধ্যে সে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলে।

তার ঘরখানা বিশাল বাড়িটার এক প্রান্তে। সামনেই চণ্ডীমণ্ডপ, নাটমন্দির। পুরোণো ঘরগুলো ছাড়া এ মহলটা অনাদরেই ম্লান হয়ে থাকে। নাটমন্দিরের চালার টিন পড়ে ফিকে বর্ষার জল পড়ে, তার তলায় ছাগল গোরু অবসর বিনোদন করে। চণ্ডীমণ্ডপ মাকড়শার জাল আর বাদুড় ঝুলে আবৃত হয়ে যায়, বাঁধানো বেদীর ঘুটে ঘোষে ভুষো মাঠ থেকে দু একটা গোখরো সাপ এসে রোদও পোহায় কখনো-কখনো। আর চাপ চাপ অন্ধকার-জড়ানো মণ্ডপের কোনায় আরো ঘন টুকরো টুকরো অন্ধকারের মতো চামচিকে ঝুলে থাকে—বাতাসে ডুবে ওড়ায়, আর দিনান্তিক পাণ্ডুরতা চারদিকে সঞ্চারিত হয়ে এলে কতকগুলো প্রেত সবার মতো কদাকার ডানা ঝাপটে ঝাপটে সামনের আম বাগান আর নদী পার হয়ে কোথায় উড়ে যায় কে জানে!

নিজের নির্জন ঘরটিতে বসে বসে রঞ্জন এক একটা সন্ধ্যায় তাদের ডানার শব্দ শোনে। কী একটা বিভীষিকা যেন সমস্তখানা সেই অন্ধকারকে দুঃস্বপ্ন করে তোলে। হঠাৎ যেন মনে হয়: বেদীসিংহের আমল, অথবা তারও অনেক আগে থেকে এই বাড়িতে বসে যারা জমিদারী করেছে, তারা এখনো এখানকার মায়া কাটাতে পারেনি; চামচিকে হয়ে পক্ষের মতো এ বাড়ির প্রতিটি ইট পাথরকে চলেছে পাহারা দিয়ে। রাত্রির অন্ধকার নেমে এলে পুরোণো অভ্যাসের তাগিদে তারা বেরিয়ে পড়ে। নদী পার হয়ে, মাঠ পার হয়ে তারা চলে যায় গ্রামে গ্রামে—তমসার মধ্যে নিজেদের মিশিয়ে দিয়ে—চামচিকে নয়—ভ্যাম্পায়ার হয়ে মানুষের রক্ত শুষে খায়।

হঠাৎ ভয় করে। মনে হয় তারও চারদিকে যেন চক্র দিয়ে ফিরছে এই চামচিকেরা। লণ্ঠনের বিমর্ষ হলদে আলো পড়ে দেওয়ালে—নতুন জিনিস দেখতে পায় একটা। পুরোণো বাড়ি, কতকালের পুরোণো এই দেওয়াল। তার গায়ে এলোমেলোভাবে অনেক ভাঙনার বিসর্পিল সবুজ রেখা পড়েছে। ওই রেখাগুলো হঠাৎ যেন কতগুলো মুখ হয়ে ওঠে—যেন চামচিকের ডানার শব্দে ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে তারা। অদ্ভুত, অস্বাভাবিক কতগুলো মুখ—এই মৃন্ময়ী প্রাসাদের তারা মৃত প্রতিহারীর দল। ফিস্ ফিস্ করে তাদের কথা বলবার শব্দও যেন স্পষ্ট কানে আসে—বাইরের আমবাগানে বাতাস মর্মরিত হয়ে বয়ে যাচ্ছে, এই সহজ প্রত্যক্ষ সত্যটাকেও যেন বিশ্বাস করা যায় না কিছুতে।

এই ভয়! একে ভাঙতে হবে। চুনকাম করতে হবে এই প্রেত-পুরীর বেদীকে। ছাদভাঙা খানিকটা তীব্র তীক্ষ্ণ সূর্যের আঘাতে মিলিয়ে ছায়া হয়ে যাবে এই চামচিকেরা। আজও মানুষের মনের ওপরে এরা ভর করে আছে—প্রেতের ভয়! আজও কুমারবাহাদুরের আটটা বন্দুক আর আটত্রিশজন পাইক পাহারা দিচ্ছে এই পিশাচগুহকে। কিন্তু কতদিন আর?

কতদিন আর? ঘরের দেওয়ালে সরীসৃপ মুখাকৃতি গুলোর দিকে সে তাকালো না—তাকালো না সবুজ ভাঙনার আঁকা সেই বীভৎস প্রেতসত্তাগুলোর দিকে—উষ্ণ চামচিকের পাখার শব্দ যাদের জাগরণের সংকেত। এখন অনেক রাত। জানালা দিয়ে সে বাইরে সেদিকেই তাকিয়ে রইল—নদীর ওপারে যেখানে পূর্ব দিগন্ত, যেখানে আগুনের পদ্মের মতো সূর্য উঠে তার বিছানার ওপরেই সর্বপ্রথম তার আলো ছড়িয়ে দেয়।

প্রভাতী সীমান্তের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে ভাবতে লাগল।

পিশাচ মন্দিরের পাথর খসছে। তুরীদের পঞ্চায়েত বসেছে কালা পুখরিতে। কামারহাটির ডাঁড়ার মুখে জল নামতে দিয়ে তারা আর সর্বনাশ করবে না হালায় বিঘে ফসলী জমির। জমিদারের ফিরিঙ্গিপুর আর হাঁসবাগীর অসচর না ভরলেও তাদের ক্ষতিবৃদ্ধি নেই—এবার রুখে দাঁড়িয়েছে তারা। ওদিকে সাঁওতালেরা বুনোশুয়োর মারতে শিখছে—বীরু সাঁওতালের ছেলে বীরু সাঁওতাল ধান সিঁড়ির আলপথে খেলা করে বেড়ানো কেউটের শিশুর মতো বিষ সঞ্চয় করছে আস্তে আস্তে। আর তাদের সঙ্গে আজ বাহু মিলিয়েছে 'ডুবা'র ঘোষেরা—বাঘের মতো লাঠির মুখে ভেঙে চুরমার

করে দিয়েছে লোহা পেটা মোয়ান জটাধর সিংয়ের ইস্পাতী মাথাটা!

একটা ছবি মনে পড়ল হঠাৎ।

হোই বাবু, সামাল।

সাইকেলে করে আসছিল। পেছন থেকে আবার ডাক এল: সামাল বাবু, সামাল।

কী ব্যাপার? এমন ভাবে সাবধান করে কে?

চারদিকে তাকাতেই ব্যাপারটা বোধগম্য হল তার কাছে।

চৈত্রের মাটি ফাটানো রোদে শুকিয়ে একেবারে খড় হয়ে গেছে চারদিকের বুক সমান উঁচু ইকড়, বিন্না আর শন ঘাসের বন। সেই বনে কে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। সামনে, পেছনে, ডাইনে বাঁয়ে ধূ ধূ করে জ্বলছে শুকনো ঘাস, কালো ধোঁয়া কুণ্ডলিত হয়ে উঠছে আকাশে। যেন চারদিক থেকে একটা অগ্নিবৃত্ত আসছে ঘিরে ঘিরে।

—সামলে বাবু। আগুনের ভেতর গিয়ে পড়িস্ না।

সেই আগুনটা যেন আজও এগিয়ে আসছে অনিবার্য মূর্তিতে। কিন্তু ঘাসবন নয়। অরণ্যের দাবাগ্নি। এর হাত থেকে নিস্তার নেই এই প্রেতপুরীর। পুড়ে ছাই হয়ে যাবে—ষোড়ো বাতাসে উড়তে থাকবে সেই ছাই—মহাকালের বুকে মিলিয়ে যাবে নিশ্চিহ্নতায়।

—মচ্—মচ্—মচ্—

নাগ্‌রা জুতোর শব্দ। কাঁচা চামড়ার আওয়াজ। ওদিকের লম্বা বারান্দাটা দিয়ে দুলতে দুলতে যাচ্ছে একটা লণ্ঠনের আলো। মুখ ফিরিয়ে দেখল। প্রহরী। জমিদার বাড়ি পাহারা দিয়ে ফিরছে। ঠুক্ ঠুক্ করে লাঠির শব্দ পাওয়া গেল, বারকয়েক শোনা গেল কুঁই কুঁই করে খানিকটা কাতরোক্তি। দারোয়ানের লাঠির ঘা খেয়ে একটা ঘুমন্ত কুকুর পালিয়ে গেল বারান্দা থেকে।

আবার জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইল নিশীথ দিগন্তের দিকে। একটা ভোঁতা ছুরির মতো তমসাকীর্ণ নদীটা বয়ে যাচ্ছে। ওপারের মাঠটার শেষপ্রান্তে একটা মস্ত বড় আলো—কারা একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বেলেছে যেন। ঠিক তারই ওপরে আকাশে একটা ঝলমলে প্রকাণ্ড তারা। ওই তারাটা থেকে খানিকটা আগুন মাটিতে ছিটকে পড়েই কি জ্বলে উঠেছে অমন দাউ দাউ শব্দে?

নক্ষত্রের আলো, না আগামী দিনের সংকেত। আকাশের সীমান্তে সীমান্তে যেন ভবিষ্যৎ দিনের প্রত্যাশা। যেন দলে দলে মানুষ মশাল হাতে আসছে এগিয়ে। পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ—প্রতিটি প্রান্ত থেকে পদক্ষেপ করেছে মশালধারী সৈনিকের দল। আসছে—এগিয়ে আসছে। চারদিকের পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকারে তারা আগুন ধরিয়ে দেবে।

আচ্ছা—ওই দিকে, নদীর ওপারে ওই অগ্নিকুণ্ডটার কাছাকাছিই কোথাও কি গোয়ালাদের সেই গ্রাম নয়? সেই গ্রাম—যেখানে লাঠির ঘায়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে জটাধারী সিংয়ের মস্ত শক্ত মাথাটা? আর শুধু তারই মাথা নয়—সে চোটটা সোজা কুমার ভৈরবনারায়ণেরও ঘাড়ের ওপরে এসে পড়েছে?

হ্যাঁ—ওদের দেখেছে রঞ্জন। বন্দিনের আরণ্য মৃত্তিকায় চিনেছে আর একটি দুর্ধর্ষ শক্তিকে। মাথা নোয়ায় না—হার মানতে জানে না। খোলা মাঠ আর খোলা হাওয়ায়, পোষা মহিষের ক্ষীরের মতো ঘন দুধ খেয়ে খেয়ে দরজার কপাটের মতো চওড়া তাদের বুক, প্রতিটি পাঁজর যেন লোহার আগল। 'শাল-প্রাংশু মহাভুজ' আর পুঁথির জগতে বেঁচে নেই, তা নেমে এসেছে জনগণের পৃথিবীতে—পৌরাণিক ক্ষত্রিয়ের শৌর্যবান বিপুল সত্তা আজ ওদের মধ্যেই সার্থক হয়েছে—পেয়েছে সর্বোত্তম পূর্ণতা।

আদিতে ছিল যাযাবর। ঘর ছিল পশ্চিমের মাটিতে। রক্তের মধ্যে কোন্ আদিম যাযাবরী প্রেরণায়, কোন্ জমিদারের অত্যাচারে গ্রাম-নগর-নদী-পাহাড়-বন পেরিয়ে এখানে এসে বাসা বেঁধেছে কে জানে। কিন্তু শুধু বাসাই বাঁধেনি—শক্ত করে শিকড় মেলেছে মাটিতে—সাঁওতালদের মতো সহজে উৎপাটিত হয়ে যাবে এমন শিথিল মূল নয় এদের। হাতে এদের দশ থেকে বারো হাত পর্যন্ত লম্বা লাঠি; তার গিঁটে গিঁটে পিতলের তার জড়ানো, বছরের পর বছর সর্ষের তেলে সে লাঠি পাকানো। লোহার মতো তা দৃঢ় আর নির্মম—তার দণ্ড চরম দণ্ড।

রঞ্জনকে দেখে খুব অভ্যর্থনা জানিয়েছিল বোধেরা।

অদ্ভুত ভাষা বলে। খানিকটা ভাঙা হিন্দী, খানিকটা বাংলা। কিছু কিছু সাঁওতালী আর ওঁরাও ভাষার স্বাদ তার সঙ্গে। রঞ্জনের মনে হয়েছিল বেশ চমৎকার একটা

সহজলীন ভাষা তৈরী করে ফেলেছে এরা—রাষ্ট্রভাষার সমস্যা ফেলেছে মিটিয়ে।

—ঠাকুর বাবু, নমস্তে।

—নমস্তে। কী খবর তোমাদের?

—খবর খুব আচ্ছাই।—মোষেদের মুরুব্বি যমুনা আহীর বলেছিল: লেকিন্ থোরা থোরা গণ্ডগোল হচ্ছেন।

—কী গণ্ডগোল হচ্ছেন আবার?

—বলছি ঠাকুর বাবু। আপনি আচ্ছা আদমি আছেন, আপনি সমঝাবেন। তো আগে আসেন, একটু তামাকু খেয়ে যান।

—আমি তো তামাক খাই না।

—তো ভি আসেন—বসেন একটু—আবার অভ্যর্থনা করল যমুনা আহীর।

আমন্ত্রণটা আর উপেক্ষা করা গেল না। তা ছাড়া পথ চলতে চলতে সেও ভারী ক্লান্তি বোধ করছিল। সারাটা সকাল এই কড়া নয় রোদ মাথার ওপর নিয়ে সাইকেল করেছে সে—শরীর যেন বইছিল না। একটু বিশ্রাম পেলে মন্দ হয় না—মনের ভেতর থেকে এই জাতীয় একটা তাগিদ ঠেলে উঠছিল বার বার।

তাকিয়ে দেখল আহীরদের বাগানের দিকে। এক জোড়া নিমগাছ এই টিলাটার ওপর ভারী স্নিগ্ধ ছায়া ছড়িয়েছে। গাছ দুটো ওরাই লাগিয়েছে সম্ভব—নইলে লাল মাটির এই দেশে এমন করে প্রাকৃতিক খেয়ালে নিমগাছ জন্মায় না। কিন্তু নিজেরাই লাগাক আর মাটির খেয়ালেই হোক—এই রোদের মাঝখানে তাদের ঠাণ্ডা ছায়া যেন দূর একটা মরুদ্যানের আভাস বয়ে আনে। সেখানে খান দুই দড়ির খাটুলি পাতা। ইচ্ছে করল ওই খাটুলি দুটোর ওপরে সেও খানিকটা গড়িয়ে নেয়, একান্ত করে জুড়িয়ে নেয় তার উত্তপ্ত শরীরের যা কিছু জ্বালাকে।

খাটুলিতে এসে সে বসল। যমুনা আহীর তাকে বসিয়ে ঘরে ঢুকল, তার একটু পরেই বেরিয়ে এল একটি মেয়ে। বছর কুড়ি-বাইশ বয়েস হবে—স্বাস্থ্য আর যৌবন যেন সর্বাঙ্গে প্রখর হয়ে জেগে আছে তার। সুডৌল নিখুঁত হাতে মোটা রূপোর বালা, কিন্তু সে বালা অলঙ্কার নয়—অস্ত্র। তার একটি ঘা লাগলে যে কোনো দুর্বিনীত লোভী মানুষের মুখ চোখ ভোঁতা হয়ে যাবে চক্ষের নিমেষে। উজ্জ্বল শ্যাম কান্তি—সারা শরীরে তার রূপ আছে কিনা যে জানে? কিন্তু বরেন্দ্র ভূমির অমন্দ রৌদ্র যে বিচ্ছুরিত হয়ে আছে কোনো সন্দেহ নেই সে বিষয়ে।

যমুনা আহীরের মেয়ে। ঝুমরি।

ঝুমরি রূপোর বালা পরা নিটোল হাতে পরিচ্ছন্ন একটি কাঁসার গ্লাস বয়ে এনেছে। রঞ্জনের সামনে ধরে বললে, পীজিয়ে।

—কী এ?

যমুনা এসে বললে, ওটুকু খেয়ে নিন্ ঠাকুরবাবু। দুধ আছে।

—দুধ! দুধ খাবো?

হা হা করে হেঁসে উঠল যমুনা আহীর—মাঠের মধ্য দিয়ে হাসিটা দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছুটে গেল যেন। বললে, দুধ তো পিবারই জন্তে। দেখবার জন্তে তো নয়।

মুক্তা-ধবল দাঁত বের করে হাসল ঝুমরি। নিটোল হাতে গেলাসটি আরো কাছে এগিয়ে এল। আর প্রত্যাখ্যান করতে পারল না রঞ্জন।

খাঁটি মহিষের দুধ। মৃদু ঝাল্ পড়ে তাতে সঞ্চারিত হয়েছে আরো খানিকটা সুমিষ্ট আস্বাদ। এক চুমুকে গ্লাসটা শেষ করল সে। মনে হল, সে শুধু দুধই খেল না, তারও সর্বদেহে যেন 'ধরিত্রীর' মাঠ থেকে আহরিত হ'ল 'জল-বাতাস-রৌদ্র স্বাস্থ্য'—যেন কোনো পরিপূর্ণ জীবনের একটা বিশাল তরঙ্গ ভেঙে পড়ল তারও রক্তের গভীরে।

গ্লাসটা ঝুমরিকে ফিরিয়ে দিলে। তারপর তাকালো যমুনা আহীরের দিকে।

—এইবার তোমার কথা শুনব বোধ। কী গণ্ডগোলের কথা বলছিলে?

(ক্রমশ)

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলাধূলা

সম্পাদনা শ্রীকৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সন্তোষ ট্রফি ঃ

আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে পশ্চিম বাঙ্গালা ৪-০ গোলে হায়দরাবাদকে হারিয়ে সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী হয়েছে। এই নিয়ে বাঙ্গলার চতুর্থ জয়। ফুটবল খেলার একান্ত অনুরাগী হিসাবে আই এফ এ-র ভূতপূর্ব্ব সভাপতি স্বর্গীয় মহারাজা সন্তোষের খ্যাতি ক্রীড়ামহলে সুবিদিত। ফুটবল খেলায় তাঁর দানের কথা স্মরণ ক'রে আই এফ এ-কর্তৃপক্ষ মহারাজা সন্তোষের নামে একটি ট্রফি অল্‌ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের হাতে দান করেছেন। আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতার বিজয়ী দলকেএই ট্রফিটি উপহার দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতার প্রবর্ত্তন হয়েছে ১৯৪১ সালে। মাঝখানে ৩ বছর খেলা হয়নি। বাঙ্গালা দেশ প্রতিবারই ফাইনালে উঠেছে। ট্রফি বিজয়ী হয়েছে ৬ বছরের খেলার মধ্যে ৪ বার। ফাইনালে দল থেকে বেশী গোল ক'রে রেকর্ড করেছে বাঙ্গালা দেশই। এ বছরের প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালা দেশ সি পি কে ৯-০ গোলে হারিয়ে নতুন রেকর্ড করেছে; এত অধিক গোলে অপর কোন দলই এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়নি। বাঙ্গালা দেশ এ বছরের খেলায় মোট ২২টি গোল দিয়েছে, এটাও একদিক থেকে

সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী বাঙ্গালা দল ফটো : প্রভাত বসু (বেলো)

প্রতিযোগিতার রেকর্ড। ২২টি গোলের মধ্যে দলের সেণ্টার ফরওয়ার্ড মেওয়ালাল নিজেই দিয়েছে ১১টা, তার মধ্যে একটা 'Hat-Trick'। এত বেশী গোল ব্যক্তিগত ভাবে কোন খেলোয়াড়ই এই প্রতিযোগিতায় ইতিপূর্ব্বে

দিতে পারেনি। এই খেলার আলোচনা প্রসঙ্গে, খেলোয়াড় মনোনয়ন কমিটির সভ্যদের খামখেয়ালীর উল্লেখ খুবই প্রয়োজন। প্রথমেই দলের অধিনায়ক মনোনয়ন সম্পর্কে ধরা যাক। প্রথম দুটি খেলায় মোহন-বাগান ক্লাবের ভূতপূর্ব্ব অধিনায়ক এবং বর্ত্তমানবৎসরের ফুটবল সম্পাদক অনিল দে বাঙ্গলা দলের নেতৃত্ব করেন। এই দুটি খেলায় বাঙ্গলা দল ৯—০ গোলে সি পি কে এবং ৫—০ রাজপুতানাকে হারিয়ে দেয়। বাঙ্গলাদলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের চাপে পড়ে আগন্তুক দল যে কিরকম হয়েছিল তা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের প্রয়োজন

বিজেতা বাঙ্গলার দল ফটো : প্রভাত বসু (জেগো)

নেই, খেলার ফলাফলই তার সাক্ষ্য দেয়। এরূপ অধিক গোলের ব্যবধানে অগ্রগামী থাকলে শেষের দিকে বিজয়ী দলের খেলোয়াড়দের গোল দেওয়ার আর উদ্দীপনা থাকে না, এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের কোন সময়েই বড় বিপদের সম্মুখীন হতে হয়নি। ছেড়ে খেলার দরুণ কদাচিৎ বিপক্ষদলকে বাঙ্গালা দলের রক্ষণব্যূহ ভেদ করতে দেখা গেছে কিন্তু অব্যর্থ গোলের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেনি। সুতরাং এই চ'দিনের খেলায় এমন কোন ত্রুটিই চোখে পড়েনি যার জন্য তাঁর স্থানে অন্য খেলোয়াড় দিয়ে দলের অধিনায়ক বদলের প্রয়োজন হয়েছিল। অধিনায়ক অনিল দের শূন্য স্থানে মান্নাকে অধিনায়ক নির্ব্বাচন করা হয়েছিল মাদ্রাজের বিপক্ষে। মান্নাকে এবছরের ফুটবল মরসুমে দু' একটা ম্যাচ খেলতে দেখা গেছে, সমস্ত লীগমরসুমই পায়ের আঘাতের ফলে অবসর নিতে হয়েছিল। সুতরাং প্রতিনিধিত্বমূলক খেলায় পূর্ব্ব খ্যাতিমত তিনি সে দিন যে খেলতে পারবেন না এ আমরা পূর্ব্বাহ্নেই ধরে নিয়েছিলাম। হয়েছিলও তাই। ফাইনাল খেলায় যোগদান সম্পর্কে পূর্ব্ব থেকেই অক্ষমতা জানিয়ে তিনি সুবিবেচনার কাজই করেছেন। ফাইনালে এদানীকে অধিনায়ক নির্ব্বাচিত করা হয়। শেষ পর্য্যন্ত অধিনায়ক নির্ব্বাচন পর্ব্বটা অত্যন্ত অশোভন ব্যাপারে দাঁড়িয়েছিল অথচ এই তিন জনের অধিনায়কত্বের দাবী সম্পর্কে কারও আপত্তি নেই। সচরাচর কোন প্রদেশ বা দেশের প্রতিনিধিত্বমূলক খেলার প্রথম যে খেলোয়াড়কে অধিনায়ক নির্ব্বাচন করা হয় সেই ব্যক্তিই শেষ পর্য্যন্ত ঐ পদেই অধিষ্ঠিতে থাকে, ক্রীড়াজগতে এই নীতিই আমরা দেখে আসছি। অবিশ্যি ক্যাপ্টেনের কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য ভাইস-ক্যাপ্টেনকে দলের ভার নিতে দেখা গেছে। টেষ্ট ম্যাচ ও প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় ক্যাপ্টেনকে কতবার শূন্য রাণ করতে দেখা গেছে এবং খেলায় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে কিন্তু আমরা সাত তাড়াতাড়ি খেলোয়াড় নির্ব্বাচক মণ্ডলীকে এর জন্য দলের ক্যাপ্টেন বদলাতে দেখিনি। যে দেশের নামকরা সম্ভ্রান্তিপন্ন দলগুলির কর্ত্তৃপক্ষ লীগ-শীল্ড পাওয়াটাই সব থেকে বড় গৌরব বিবেচনা করেন এবং স্বদেশের প্রকৃত বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের খেলায় যোগদান থেকে বঞ্চিত ক'রে আধা-পেশাদারী অবাঙ্গালী খেলোয়াড় দিয়ে দল পুষ্ট করতে লজ্জাবোধ করেন না, তাঁদের নির্ব্বাচক মণ্ডলীতে হাত থাকলে তাঁরা যে বাঙ্গলার ক্রীড়ামোদীদের কাছে একটা নতুন কিছু দৃষ্টান্তও প্রতিষ্ঠা

করতে ছাড়বেন না এ অন্ততঃ জানা কথা তা সে কাজ যত লজ্জাকর এবং অবিবেচনারই হউক না কেন? এ বছরের আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগীতায় বাঙ্গলার খেলোয়াড় নির্ব্বাচক মণ্ডলী কোন একটি নির্দ্দিষ্ট নিরপেক্ষ দৃষ্টিপথ এবং বিবেচনা বোধ নিয়ে খেলোয়াড় নির্ব্বাচন করেন নি। ধরা যাক খেলার তুলনামূলক বিচার ক'রে তাঁরা রাইট হাফের খেলোয়াড় পরিবর্ত্তন করেছিলেন যার ফলে ক্রীড়া-জগতের এতদিনের প্রচলিত নীতির বিরুদ্ধে গিয়ে তাঁদের অধিনায়ক পরিবর্ত্তন করতে হয়েছে। তাই যদি হয় তাহলে তাঁদের সেই তুলনামূলক বিচার জ্ঞানে কি ভাবে অভয় ঘোষের প্রশংসনীয় খেলা উপেক্ষিত হয়। দু'দিনের প্রাদেশিক খেলায় এবং বিশেষ ক'রে সন্তোষ ট্রফির ফাইনাল খেলার পূর্ব্বদিন মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গলের লীগের খেলায় ইষ্টবেঙ্গলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের তিনি কেবল আটকেই রাখেন নি, নিজ দলের খেলোয়াড়দের বল দিয়ে বিপক্ষ দলকে পরাস্ত করতে দলকে সাহায্য করেছিলেন। এই রকম একজন খেলোয়াড়ের দাবী অস্বীকার ক'রে একেবারে ফাইনাল খেলায় তাঁর স্থানে কালীঘাট ক্লাবের জুনিয়র এস রায়কে নির্ব্বাচন করা হয়েছিল। এস রায় উদীয়মান খেলোয়াড়। এরকম উদীয়মান খেলোয়াড় আরও অনেক দলেই আছে। সেই হিসাবে ট্রায়াল ম্যাচে রায়কে স্থান দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁকে রিজার্ভে রাখা হয়েছিল। এরকম একজন খেলোয়াড়কে একেবারে ফাইনালে খেলানোর কোন যুক্তি নেই একমাত্র দলীয় স্বার্থ ছাড়া। যদি কেবল উদীয়মান খেলোয়াড় নিয়ে দল গঠন করাই নির্ব্বাচকমণ্ডলীর উদ্দেশ্য থাকতো তাহলে সমস্ত দলটিকেই এভাবে গঠন করলে শোভন হ'ত না কি? এ নির্ব্বাচন সম্পর্কে খেলার মাঠে বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা শুনা গেছে এবং সংবাদপত্রে বের হয়েছে। ফাইনাল খেলায় এস রায়কে অসহায় অবস্থায় মাঠে ঘুরতে দেখা গেছে; তবু ভাল খেলা দেখাতে পারলে নির্ব্বাচকমণ্ডলীর কিছু মুখরক্ষা হ'ত। সংবাদপত্রে প্রকাশ, ফাইনাল খেলায় খেলোয়াড় মনোনয়নের জন্য বাঙ্গলা দলের যে টিম মনোনয়ন সভা বসেছিল সেই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন কালীঘাট ক্লাবের মিঃ এ সেন। এদিকে এস রায় কালীঘাটেরই খেলোয়াড়। তাহলে সভাপতির সম্মানরক্ষার্থেই কি শেষ পর্য্যন্ত রায়কে ফাইনালে দলভুক্ত করা টিম মনোনয়ন কমিটির সভ্যগণ সাব্যস্ত করেছিলেন? ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থ এবং কূটনীতির চালে ক্রীড়ামহলের কর্ত্তৃপক্ষগণ যে ভাবে চলছেন অদূর ভবিষ্যতে ফুটবল খেলা দেখা শেষ পর্য্যন্ত বর্জ্জন করতে জনসাধারণকে বাধ্য হতে হবে। জনৈক দৈনিক সহযোগী ঠিকই মন্তব্য করেছেন, খেলোয়াড় মনোনয়নের ঝামেলা বাদ দিয়ে মনোনয়ন কমিটির সভ্যগণ নিজেরাই মাঠে নামতে পারেন। এদিকে বাঙ্গলা দলের রাইট আউট এস ঘোষকে বসিয়ে ফাইনালে রবিদাসকে খেলানো হয়েছিলো। রবিদাস প্রথম খেলাতে দুটো গোল করেছিলেন এবং যদিও ফাইনাল খেলায় কোন বড় রকমের ভুল খেলেননি, তবু ই আই রেলদলের এস ঘোষের স্থানে তাঁর নির্ব্বাচন দর্শকদের চোখে খুবই অশোভন হয়েছে। এস ঘোষ প্রতিযোগিতার দুটি খেলাতেই ভাল খেলে গোল দিয়েছিলেন। আমাদের দেশের ক্রীড়ামহলের কর্ত্তৃপক্ষগণের ত্রুটিবিচ্যুতি এবং পক্ষপাতিত্বই যে খেলার মাঠের দর্শক-শ্রেণীর উত্তেজনার বড় কারণ তার প্রমাণের অভাব নেই।

যুযুৎসু-কৌশল

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১২৯নং প্যাঁচ

যদি কেহ ডান হাত দিয়া ঘুষি মারিতে আসে তৎক্ষণাৎ তাহার ডান কব্জির ডান ধারে নিজের ডান বাহু দিয়া আটকাইয়া সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত দিয়া তাহার ডান মুঠোটি ধরিয়া লইয়া যদি তাহার হাতটি কনুই হইতে মোড়া অবস্থায় থাকে তবে বাঁ হাতটি তাহার ধরা হাতের কনুইয়ের নিচে রাখিয়া নিজের বাঁ পা-টি তাহার ডান পায়ের ডানদিকে

১২৯নং প্যাঁচের ৩য় চিত্র

আগাইয়া ডান দিকে ঘুরিয়া (১২৯নং প্যাচের ১ম চিত্র). একটু নিচু হইয়া তাহার ধরা হাতটি ডান বগলে পুরাভাবে পুরাইয়া নিজের বাঁ হাতের তলির কাছে আটকাইয়া তাহার পিঠে ঘুরিয়া তাহার মোড়া, কনুই ও কব্জিতে চাড় দিতে দিতে নামাইয়া (১২৯নং প্যাচের ২য় চিত্র) তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া নিজের আয়ত্তে আনিতে পারা যাইবে (১২৯নং প্যাচের ৩য় চিত্র)।

১২৯নং প্যাচের ১ম চিত্র

১২৯নং প্যাচের ২য় চিত্র

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত কাব্য গ্রন্থ "কত বসন্ত"—৸৹

শ্রীহারাধন সেনগুপ্ত প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "আউট স্কেচেস্"—১৲

শিল্পী চক্রবর্ত্তী অঙ্কিত "কত্তা বাবল ?"—১৷৹

শ্রীসুধীর গুপ্ত প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "মাটির মাধুরী"—১৸৹

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত যৌন-বিজ্ঞান "যৌবনের ডাক"—২৷৹

ঘরোয়া লাইব্রেরী প্রকাশিত উপন্যাস "এস্. এস্. ওয়েডু"—৸৹

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোপিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কার্ত্তিক—১৩৫৩

প্রথম খণ্ড	সপ্তত্রিংশ বর্ষ	পঞ্চম সংখ্যা

বর্ত্তমান

রাধারাণী দেবী

সুদীর্ঘ নিস্তব্ধ রাত্রি হোলো শেষ ; প্রত্যূষ উদয়।
অন্ধকার মসীলিপ্তি দিগন্তে আপনি হলো ক্ষয়
ঘূর্ণমান কালচক্রে। পূরব প্রত্যন্তে দিলো দেখা
ভাবীযুগ-আরম্ভের প্রথম-উদয়ারুণ-রেখা।

সুদীর্ঘ দুঃস্বপ্ন অন্তে হে ভারত। সুপ্তিশয্যা ছাড়ি
বিলুপ্তির গ্রাস হতে জীবনেরে আনিয়াছো কাড়ি।
সে-জীবন হোক্ তব স্বপ্রতিষ্ঠ সত্যরূপে স্বীয়,
কর্মে তব, ধ্যানে তব, জীবনের আদর্শে স্বকীয়।

আজিও তোমার বক্ষে বিরাট কৃচ্ছ্রের বহ্নি জ্বলে ;
অশান্তির বুভুক্ষার তুষানলে দহি পলে পলে
এখনও রয়েছো তুমি অগ্নিপরীক্ষায় সমাসীন ;
শেষ-ধৈর্য-মূল্যে তব দিবে দেখা আকাঙ্ক্ষিত দিন।

নিকটের দুঃখদ্বন্দ্ব নিকটের সমস্যার জাল
নিকটের স্বার্থ যেন আচ্ছন্ন না করে দূরকাল।
তোমার জাগ্রত দৃষ্টি নিবদ্ধ হউক ভবিষ্যতে—
মানবে দেবত্ব যেথা বিলাইবে বিপুল জগতে।

স্বাধীন ভারতবর্ষ! পৃথিবীর হট্ট কোলাহলে
বিভ্রান্ত হোয়োনা তুমি। 'পরধর্ম' কভু ক্রীড়াচ্ছলে
লইয়োনা নিজে তুলি। 'ভয়াবহ' পরিণাম যার।
বিশ্ব-মানবের সেবা চিরন্তন স্বধর্ম তোমার।

স্মৃতি বিস্মৃতির চিহ্নে বিচিহ্নিত জীর্ণ স্বর্ণতরী
আবার ভাসিল জলে, নবীন কেতন ঊর্ধ্বে ধরি ;
বিক্ষুব্ধ সমুদ্র আজি উন্মত্ত তরঙ্গে সমুত্তাল,
ধ্রুবতারা লক্ষ্য রাখি দৃঢ় করে থাকো ধরে হাল।

আজিকার কৃষ্ণপটে দূরকালে হবে নাকি লিখা
মহত্তর-গৌরবের সমুজ্জ্বল আনন্দ-ভূমিকা ?
অনাগত ভবিষ্যের নব নব তোরণে তোরণে
বর্তমান এই দিন ঝকিবে কি অমর-কিরণে।

১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা-উৎসব উপলক্ষে নিখিল ভারত বেতার কেন্দ্রে রচয়িত্রী কর্তৃক পঠিত।

ভারতের ষ্টার্লিং পাওনা

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

যুদ্ধের মধ্যে ব্রিটেনের নিকট ভারতবর্ষের প্রভূত পরিমাণ ষ্টার্লিং পাওনা জমিয়া উঠিয়াছে। আগে ব্রিটেন ছিল ভারতের উত্তমর্ণ দেশ। ভারতে রেলপথ বসাইতে এবং যুদ্ধাদি নানা উপলক্ষে ভারতসরকার ব্রিটেন হইতে ঋণ হিসাবে বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। যুদ্ধকালীন সঞ্চিত ষ্টার্লিং হইতে এই ঋণগুলি শোধ হইয়া গিয়াছেই, অধিকন্তু যুদ্ধান্তে ভারতসরকারের নিকট ব্রিটিশ সরকারের দেনা থাকিয়া গিয়াছে কোন শত কোটি টাকার বেশী। এই ভাবে যুদ্ধের দৌলতে বহির্জগতে দেনদার দেশ ভারতবর্ষ পাওনাদার দেশরূপে পরিগণিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে।

কিন্তু বহির্জগতে ভারতবর্ষের অবমর্যাদা ঘুচিয়া উত্তমর্ণের প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়াই ষ্টার্লিং পাওনার জন্য ভারতের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক দুর্গতি ঘুচে নাই। বরং অদ্যকার অর্থনীতির হিসাবে ভারতের অবস্থা এখন যুদ্ধের আগের তুলনায় অনেক শোচনীয়। সকলেই জানেন, ব্রিটেনের নিকট ভারতের ষ্টার্লিং পাওনা এত বেশী জমিবার প্রধান কারণ—১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের আংশিক চুক্তি অনুসারে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতের সমর খাতের একাংশ প্রদানের প্রতিশ্রুতি। এই হিসাবে ব্রিটেনের ভাগে এক হাজার সাত শত কোটি টাকার বেশী পড়িয়াছে। এই টাকা ব্রিটেন বন্ধ না দিয়া দিয়াছে ষ্টার্লিং প্রতিশ্রুতিপত্রে। ব্রিটেনের হিসাবে যে খরচ হইয়াছে, তা ছাড়া যুদ্ধের সময় ভারতের জিনের হিসাবেও প্রচুর খরচ হইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৪-৪৬ খ্রীষ্টাব্দ এই ছয় বৎসরে দেশরক্ষা খাতে ভারতসরকারের ব্যয় হইয়াছে প্রায় ১৭৪০ কোটি টাকা। নানা ভাবে করনীতির সংস্কার করিয়াও ভারতসরকারের পক্ষে এতটাকা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই, কাজেই ঘাটতি পূরণ করিতে আমরা এবং করিতে হইয়াছে ঋণপত্রের উপর। এই ভাবে যুদ্ধের মধ্যে ভারতসরকারের মোট ঋণের পরিমাণ দুই হাজার কোটি টাকা ছাড়াইয়া গিয়াছে। বাজারে প্রচলিত নোটের পরিবর্তে সরকারের তহবিলে স্বর্ণ থাকাই নিয়ম, কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ৩০(২) ধারার সুযোগ লইয়া (এই ধারায় ভারতীয় মুদ্রার আদিম হিসাবে ষ্টার্লিং সিকিউরিটিকে স্বর্ণের সমান মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে) ভারতসরকার সঞ্চিত পাওনা ষ্টার্লিংয়ের জামিনে অবিরাম নোট ছাপিয়া গিয়াছেন এবং যুদ্ধের আগে ১৭৮ কোটি টাকার স্থলে ভারতের বাজারে প্রচলিত নোটের পরিমাণ বাড়িতে বাড়িতে যুদ্ধাবসানে বারো শত কোটি টাকায় আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। এই নোটের বিপরীত দিকে ভারতসরকারের হাতে মজুত স্বর্ণের মূল্য ছিল মাত্র ৩৩ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা।

নোট ও ঋণপত্র মিলাইয়া ভারতসরকারের এই পর্বতপ্রমাণ আর্থিক দায়িত্বের একমাত্র আশাভরসা সঞ্চিত ষ্টার্লিংগুলি। সরকারী আয় ব্যয় অপেক্ষা যদি অধিক হয়, তবেই আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টির ফলে ভারতসরকার দেনা শোধ করিতে পারেন। এজন্য পূর্বাহ্নে সরকার দেশবাসীর আর্থিক সচ্ছলতা। মেলে শিল্পবাণিজ্য যদি বাড়ে তবেই সে সচ্ছলতা সম্ভব। শিল্পাদি বাড়াইতে হইলে যন্ত্রপাতির প্রয়োজন এবং যন্ত্রপাতি এদেশে তৈয়ারী হয় না বলিয়া বিদেশ হইতে তাহা আমদানী করিতে হইবে। এই আমদানীকৃত যন্ত্রের দাম দিবার ক্ষমতা ভারতসরকারের নাই, সঞ্চিত ষ্টার্লিংগুলির মূল্য এই জন্যই ভারতের কাছে এত বেশী। এছাড়া যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের বহু বিস্তৃত এবং জটিল সমস্যা আছে। ভারতের এই অসহায় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই যুদ্ধ থামিবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেনের নিকট হইতে পাওনা ষ্টার্লিং ফিরিয়া পাইবার জন্য ভারতে প্রবল আন্দোলন সুরু হয়। ব্রিটেনের শ্রমিক সরকার ষ্টার্লিং দেনা অস্বীকারের বিশেষ চেষ্টা না করিলেও এই সময় ব্রিটেনের টোরি দল এবং কয়েকখানি সংবাদপত্র নানা অজুহাতে ষ্টার্লিং পাওনা বাতিল করিবার অথবা অন্ততঃ বহুলাংশে হ্রাস করিবার অনেক চেষ্টা করেন। অবশ্য ভারতের তৎকালীন অন্তর্বর্তী সরকার (ইহাতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় দলের সদস্যরাই ছিলেন) এ ব্যাপারে বিশেষ দৃঢ়তা দেখাইবার ফলে শেষ পর্যন্ত এই সব অপচেষ্টা বিফল হয়। তবে ষ্টার্লিং পাওনা আদায় সম্পর্কে ভারতবাসীর দাবী সর্বাংশে পূর্ণও হয় নাই। এই সময় ভারতবিভাগের ফলে সারা দেশে

প্রভৃত বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং দেশরক্ষার দিক হইতে ষ্টার্লিং পাওনা পুরোপুরি আদায়ের আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হইয়া পড়ে। ব্রিটিশ সরকার অতঃপর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষের সহিত পৃথক ভাবে ষ্টার্লিং দেনা পরিশোধ সম্পর্কে যে চুক্তি করেন, তাহাতে ধীরে ধীরে আংশিক ঋণ পরিশোধেরই ব্যবস্থা হয়।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন এ সম্পর্কে দুইটি অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তি করে। এই চুক্তি দুইটিতে সঞ্চিত ষ্টার্লিং হইতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে ব্রিটেন মোট ৮ কোটি ৩০ লক্ষ ষ্টার্লিং ছাড়িয়া দিতে সম্মত হয়। গত বৎসর বা ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুলাই লণ্ডনে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সহিত ব্রিটেনের একটি পূর্ণাঙ্গ ষ্টার্লিং চুক্তি সম্পন্ন হয়। পূর্বোল্লিখিত ৮ কোটি ৩০ লক্ষ ষ্টার্লিংয়ের মধ্যে ভারতসরকার (ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষকেই অতঃপর ভারতসরকার বলা হইবে) ইতিমধ্যে মাত্র ৩০ লক্ষ ষ্টার্লিং খরচ করেন এবং ৮ কোটি ষ্টার্লিং অব্যয়িত থাকে। সম্ভবতঃ যন্ত্রপাতি সংগ্রহে অসুবিধার এবং তোষাপণ্য আমদানী করিয়া ষ্টার্লিংগুলি নষ্ট করিতে ভারতসরকারের অনিচ্ছার জন্যই এই অর্থ খরচ হয় নাই। ৯ই জুলাইয়ের চুক্তিতে স্থির হয় যে আগেকার অব্যয়িত ৮ কোটি ষ্টার্লিং ছাড়া ব্রিটেন ভারতকে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুনের মধ্যে আরও ৮ কোটি ষ্টার্লিং ঋণ পরিশোধ করিবে। এই ত্রৈবার্ষিক চুক্তি অনুসারে ভারতসরকার ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুনের মধ্যে আগেকার অব্যয়িত ৮ কোটি ষ্টার্লিং খরচ করিবার অধিকারী হন এবং স্থির হয় যে, এই আট কোটি ষ্টার্লিংয়ের মধ্যে ১ কোটি ৫০ লক্ষ ষ্টার্লিং তাঁহারা ডলার-মুদ্রায় রূপান্তরিত করিতে পারিবেন। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই হইতে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের জুন এবং ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই হইতে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের জুন এই দুই বৎসরে ভারতসরকার ব্রিটিশ সরকারের নিকট হইতে বৎসরে ৪ কোটি ষ্টার্লিং হিসাবে পাইবেন বলিয়াও স্থির হয়। এই সমস্ত পাওনা ছাড়াও আলোচ্য চুক্তিতে ভারতসরকার ব্রিটেনের নিকট হইতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে উদ্বৃত্ত সমরসরঞ্জামসমূহ ১০ কোটি ষ্টার্লিং বা ১৩৩ কোটি টাকার কিছু বেশী মূল্যে (এইগুলির ক্রয়-মূল্য ছিল ৩০০ কোটি টাকা) কিনিয়া লইলেন এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে চালুরিয়া ব্রিটিশ প্রজাদের পেন্সন নিশ্চিত করিতে ১৬ কোটি ৮০ লক্ষ ষ্টার্লিং বা ২২০ কোটি টাকার (কেন্দ্রের হিসাবে ১৯৭ কোটি টাকা এবং প্রাদেশিক হিসাবে ২৭ কোটি টাকা) স্থাপিত হইল একটি পেন্সন তহবিল।

যাহা হউক বিভক্ত ভারতের অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য এবং মূলতঃ ব্রিটেনের অর্থ-নৈতিক অবস্থার বিবেচনায় এই ষ্টার্লিং চুক্তির বিরুদ্ধে ভারতে বিশেষ কোন বিরুদ্ধ মনোভাব দেখা দেয় নাই। এই চুক্তিপত্রে ভারতসরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎকালীন অর্থসচিব শ্রীসমুখম্ চেট্টি। মোটামুটি অনেকেই বলিয়া লয় যে, অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে অগ্রসর হইতে হইয়াছে বলিয়া ইহার চেয়ে ভারতীয় স্বার্থের অধিকতর অনুকূলে চুক্তি সম্পাদন করা শ্রীযুত চেট্টির পক্ষে সম্ভব ছিল না।

এই চুক্তির পরেই ভারতীয় বহির্বাণিজ্যিক পরিস্থিতিতে অকস্মাৎ গুরুতর পরিবর্তন দেখা দেয়। বৈদেশিক মুদ্রার তীব্র অভাবের জন্য এ পর্যন্ত ভারতসরকার বিদেশ হইতে বালপত্র আমদানী কঠোরভাবে সঙ্কোচ করিয়া আসিতেছিলেন, ষ্টার্লিং চুক্তি হইবার পর বিদেশী মুদ্রার আপেক্ষিক সচ্ছলতা আশা করিয়া তাঁহারা অন্ততঃ ষ্টার্লিং এলাকার পণ্য আমদানী নিয়ন্ত্রণ নীতি অনেকটা শিথিল করেন। ইহার ফলে আবার বিদেশী মাল ভারতে প্রচুর আমদানী হইতে থাকে। ভারতের নিয়ন্ত্রণ পাওনাগুলির জন্য বিদেশ হইতে পাল্প আমদানীও এই সময় পুরোদমে চলে। এইভাবে আমদানী নিয়ন্ত্রণ শিথিল করিবার ফলে গত জুন মাস পর্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে দেখা যায় যে, ব্রিটেনের নিকট প্রাপ্য সমস্ত ষ্টার্লিং খরচ হইয়াও ষ্টার্লিং এলাকা হইতে আমদানীকৃত যে বাড়তি পণ্যের দাম অপরিশোধিত থাকিয়া গিয়াছে, তাহা ৪ কোটি ২০ লক্ষ ষ্টার্লিংয়ের কম হইবে না। এই মারাত্মক অবস্থার সম্মুখীন হইয়া শেষপর্যন্ত ভারতসরকার গত ১৮শে যে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন এবং অতঃপর এসেনশিয়াল্ স্‌ চটকলের সরঞ্জাম, কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি, সিমেন্ট, খনিজ তৈল, কাঁচা কিস্ম, ঔষধ, রঙ, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি কতকগুলি পণ্য ব্যতীত ষ্টার্লিং এলাকা হইতেও কঠোরভাবে আমদানী নিয়ন্ত্রণ করেন।

এইভাবে বিদেশী পণ্য আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিয়া ভারতসরকার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করেন এবং বর্তমান আর্থিক সমস্যা সমাধান কল্পে ষ্টার্লিং পাওনা সম্পর্কিত পূর্বোক্ত জুলাই চুক্তি সংশোধনে সচেষ্ট হন। এই উদ্দেশ্যে ভারতসরকারের বর্তমান অর্থসচিব ডাঃ জন মাথাইয়ের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে লণ্ডনে যান। আশ্বাসের কথা ভারত সরকারের এই চেষ্টা অনেকটা সফল হইয়াছে এবং ডাঃ মাথাই পরিচালিত প্রতিনিধিদল ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে গত বৎসরের জুলাই মাসের ষ্টার্লিং চুক্তি সংশোধন করাইতে সক্ষম হইয়াছেন। এ সম্পর্কে গত ৯ই আগষ্ট দিল্লী হইতে অর্থ সচিবের একটি বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে।

এই নূতন চুক্তি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অবশ্য গতিকে সন্তোষজনক বলে করা যায়। এখনও ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই চুক্তির কার্যকাল অতিক্রান্ত হয় নাই, ভারতের অসুবিধা হইয়াছে বলিয়া চুক্তি সংশোধনের যে প্রশ্ন উঠিয়াছিল, আর্থিক অসচ্ছলতার অজুহাতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাহাতে সাড়া না দিয়াও পারিতেন। এবারের চুক্তিতে স্থির হইয়াছে যে ব্রিটেন ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস পর্যন্ত এই এক বৎসরে যে ৮ কোটি ষ্টার্লিং পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, সে স্থলে এই সময়ের মধ্যে ৮ কোটি ১০ লক্ষ ষ্টার্লিং দিবে। এ ছাড়া আলোচ্য বৎসরে ভারতের বহির্বাণিজ্যে ষ্টার্লিং এলাকার পণ্যের ঘাটতি বা ৪ কোটি ২০ লক্ষ ষ্টার্লিং ঘাটতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সেই ষ্টার্লিং ঘাটতি পূরণ করিয়া দিতেও সম্মত হইয়াছেন। গত বৎসরের চুক্তিতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র প্রথম বৎসরে ১ কোটি ৫০ লক্ষ ষ্টার্লিং ডলারে রূপান্তরিত করিবার অধিকার পাইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে

এই বৎসর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ডলার এলাকার সহিত বাণিজ্যে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি ষ্টার্লিং ঘাটতি হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। এই বিরাট ডলার ঘাটতি ভারত সরকারের পক্ষে স্বাভাবিক ভাবে পূরণ করা অসম্ভব। ভারত সরকার সম্প্রতি উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের হিসাবে ৫০ কোটি ১০১ লক্ষ ডলার আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল হইতে ঋণ হিসাবে সংগ্রহ করিয়াছে। ব্রিটেন ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস পর্য্যন্ত এই এক বৎসরের হিসাবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে পূর্ব্বোল্লিখিত ১ কোটি ৫০ লক্ষ ষ্টার্লিং বা প্রায় ৬ কোটি ডলারের পরিবর্ত্তে আদায়যোগ্য ষ্টার্লিংয়ের মধ্যে ৮ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার প্রদান করিতে রাজী হইয়াছে। গত বৎসরের চুক্তিতে ১৯৪৯-৫০ এবং ১৯৫০-৫১ এই দুই বৎসরের প্রত্যেক বৎসরের হিসাবে ব্রিটেনের ৯ কোটি ষ্টার্লিং করিয়া পরিশোধের কথা ছিল এবং এই ষ্টার্লিংয়ের কতখানি ডলারে রূপান্তরিত করা যাইবে সে সম্পর্কে কিছুই স্থির হয় নাই। এবার নূতন চুক্তিতে স্থির হইয়াছে যে ব্রিটেন ভারতকে উপরি উল্লিখিত দুই বৎসরের হিসাবে প্রতি বৎসর ৭ কোটি ষ্টার্লিং পরিশোধ করিবে এবং প্রথম বৎসর, অর্থাৎ ১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে ডলারে রূপান্তরিত করিতে দিবে প্রায় ১৫ কোটি ডলারের অনুরূপ ৩ কোটি ৫০ লক্ষ ষ্টার্লিং। বিষজোড়া ডলার সঙ্কটের মুখে ভারতবর্ষ ডলারের হিসাবে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এ হিসাবে ব্রিটেনের অবস্থা যে কিছুমাত্র ভাল তাহা জোর করিয়া বলা যায় না (এ সম্পর্কে প্রবাসীর লেখা "ষ্টার্লিং এলাকার ডলার সঙ্কট" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। তবু ভারতের অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বা নিদারুণ আর্থিক দুর্দ্দশা ডলার সঙ্কট সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিয়া ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যে এইভাবে ৫ বৎসরের চুক্তি সংশোধনে সম্মত হইয়াছেন, ইহাতে সকলেরই আনন্দিত হইবার কথা। এইরূপ চুক্তি সংশোধন ব্রিটেনের পক্ষে ভারতের অর্থনৈতিক বনিয়াদ সংরক্ষণের প্রচেষ্টামূলক বলিয়াই মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে ভারতের বাজারের উপর ব্রিটেন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃত ভরসা রাখে। বাণিজ্যজীবি এই দুই দেশের পক্ষে পণ্যবাজার হারানো আত্মহত্যারই সমতুল। অথচ বহির্বাণিজ্যের হিসাবে ভারতের যে অবস্থা হইতেছিল, তাহাতে ডলার এলাকার পণ্য আমদানী বন্ধ থাক, ষ্টার্লিং এলাকা হইতেও পণ্য আমদানী ভারতের পক্ষে হইয়া উঠিতেছিল অসম্ভব। এক্ষেত্রে ষ্টার্লিং চুক্তির সংশোধন দ্বারা পরিশোধযোগ্য ষ্টার্লিংয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া এবং পূর্ব্বের তুলনায় সেই ষ্টার্লিংয়ের অধিকতর অংশ ডলারে রূপান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো রক্ষায়, বিশেষ করিয়া আমদানী বাণিজ্য দ্বারা বজায় রাখিবার সহায়তা করিলেন। অনুরূপ উদ্দেশ্যেই বলিতে গেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গরজ করিয়া ইয়োরোপে মার্শাল সাহায্য পরিকল্পনা চালু করিয়াছে এবং প্রাচ্য দেশগুলিতেও অনুরূপ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার কথা গভীরভাবে চিন্তা করিতেছে। যাহা হউক, ষ্টার্লিং চুক্তি নূতন করিয়া সম্পাদন করিয়া ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নিজেদের ভবিষ্যত রক্ষার যে ব্যবস্থাই করুন, ইহাতে আশু অসুবিধায় ভারত সরকারের সুবিধা কম হয় নাই। এই ব্যবস্থার দ্বারা ভারতের সহিত ব্রিটেনের সম্প্রীতি কিছুটা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই আশা করা যায়। অবশ্য ইহার পর ভবিষ্যতে আমরা ডলার এলাকা হইতে অপেক্ষাকৃত পণ্য আমদানী করিয়া ষ্টার্লিং এলাকার দেশগুলি যাহাতে নিজেদের এবং ব্রিটেনকে বিপন্ন করিয়া না তোলে, তজ্জন্যেও এই সব দেশকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে শতকরা ২৫ ভাগ ডলার এলাকার পণ্য আমদানী কমাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ষ্টার্লিং এলাকার দেশ হিসাবে সাম্প্রতিক ডলার সঙ্কটের অনুপাতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের এই অনুরোধ কার্য্যকরী করিতে সম্মত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতে যন্ত্রপাতি আমদানীর প্রয়োজন অত্যধিক এবং সেই সব যন্ত্রের অধিকাংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ডলার এলাকা হইতেই প্রাপ্তব্য। কাজেই ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ডলার এলাকা হইতে পণ্য আমদানী সঙ্কুচিত করিতে রাজী হইবার ফলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধোত্তর আর্থিক পুনর্গঠন ব্যবস্থা বিঘ্নিত ও বিলম্বিত হইবে বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন। ষ্টার্লিং পাওনা অকেজোভাবে জমিয়া থাকা সত্ত্বেও এই ভাবে ডলার এলাকার পণ্য আমদানী নিয়ন্ত্রণে সম্মত হওয়া ভারতীয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে অসঙ্গত কার্য্য বলিয়াও কেহ কেহ মন্তব্য করিয়াছেন। তবে সকল দিক বিবেচনা করিয়া আমাদের মনে হয় গত বৎসরের চুক্তির সময় আমরা যেমন 'অবস্থাগতিকে এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা করা কঠিন' বলিয়া মোটের উপর শ্রীযুক্ত সুখময় চেট্টিকে সমর্থন করিয়াছিলাম, এবারও পরিস্থিতি বহুলাংশে অনুরূপ থাকায় বর্ত্তমান অর্থ সচিব ও ষ্টার্লিং চুক্তিক্ষেত্রে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা ডাঃ জন মাথাই সম্পর্কে আমরা একইরূপ মন্তব্য করিতে পারি। আমরা মনে করি যাহা যাতীত জোগ্য পণ্যের আমদানী যতদূর সম্ভব কমাইয়া ভারতসরকার অতঃপর বিদেশ হইতে যে কোন উপায়ে যতখানি সম্ভব যন্ত্রপাতি আমদানী করিতেই সচেষ্ট হইবেন। যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক মন্দাভাব এদেশে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতেছে বলিয়া এবং সঞ্চিত ষ্টার্লিংয়ের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে বলিয়া ভারতের দিক হইতে এই যন্ত্রপাতি আমদানী যত ত্বরান্বিত হয় ততই মঙ্গল।

তোড়ী

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

এক্, দুই, তিন্—রাতশেষের পেটা ঘড়ির ঘণ্টা যেন হাতুড়ি পিটতে থাকে মেজবাবুর মাথার ভিতর। মগজটা আরো তপ্ত চকল হয়ে ওঠে। পোড়াচোখে একে ঘুম ত নেইই বয়সের দোষে, তবু শেষপ্রহরে আধোঘুমন্ত নেশার আমেজ কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখতো, কিছুটা দেহের উত্তাপ ক্ষয়িত করে, ক্লান্তি কমিয়ে, স্নায়ুকে স্নিগ্ধ করে আনতো—আজ কি তাও হবে না। শুধু ভিড় করে আসবে—সিন্ধু, সাহানা, সোহিনী, ভৈরবী, ভৈরো, তোড়ী—না না তোড়ী নয়।

ভয় করে কেমন্—ফেলে আসা দিনগুলো, নিষ্পেষিত কামনার ফুটে না ওঠা ছায়াগুলো গুলিয়ে দেয় মাথাটা। ভাঙা জানালার ফাঁকে চেয়ে দেখেন্ তিনি বাইরের দিকে—চোখের জোর ও জলুষ কমেছে অনেকদিন, ছানি কাটিয়ে দুই দৃষ্টিশক্তিকে খানিকটা শোধন্ করিয়ে নিয়েছেন তিনি, তবু ঠিক ঠাহর হয় না—মনে হয় যেন ঝাকজোছনার পাণ্ডু রজত ধারা আপটা দিচ্ছে প্রকৃতিকে কিছুটা প্রকৃতিস্থ করবার দুশ্চেষ্টায়। রাত্রি যখন ঢলে পড়ে, পুব দিগন্তে অরুণের একটু আভাস যখন আকাশে বাতাসে অনাগতের বারতা আনে, সেই সন্ধিক্ষণই ত স্বপ্ন দেখার সময়! ভোরের স্বপ্ন যে সত্যি—সে যে নতুন দিনের, নতুন আশার।

কিন্তু তাঁর ত সব ফুরিয়ে গেছে, অস্তাচলে এসে আর পূর্বাচলের দিকে তাকালে হবে কি? ছিয়াশী বছর তিনি কাটিয়েছেন এই শক্ত মাটির আশ্রয়ে, কৃত কর্মাকর্মের অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায়। বয়স বেয়ে বেদনার মজবুত্ ইমারৎ গড়ে উঠেছে বুকের ভেতর, চোখের জলের ইতিহাসে, বঞ্চিতের হাহাকারে।

এসব স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম, হাসি পায় কান্নাও আসে। চোখ বুজলেই ফরসা, কিন্তু তাঁর চোখ বোজে কই—অতলান্ত প্রশান্তিতে ডুবে যেতে পারেন কই গহিন্ অবলুপ্তির মহাসাগরে, বিস্মৃতির কুহেলিকায় মিলিয়ে যায় কেন ঐ স্মরণের আবরণগুলো—কিল্‌বিল্ করছে কালো হাত তুলে।

এক্ এক্ সময় রাগ হয় নিজের উপর, সৃষ্টির উপর, সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টিকর্তার উপর। কেন তিনি বেঁচে থাকবেন এতদিন্—কি সুখে অতীতের কঙ্কালকে বয়ে বেড়াবেন মৃত সতীদেহের মত—চক্রধারী কি কেটে কেটে টুকরো করে দিতে পারেন না দিকে দিকে।

হাঁপিয়ে ওঠেন্ তিনি, কেমন যেন নিঃসঙ্গ বোধ হয়—পুরাণো হাড়গুলো যেন ব্যথায় মড়মড়িয়ে ওঠে—কোথায় যেন খচ্ খচ্ করে। ডাকবেন্ নাকি রসিক্ মোহনকে—

রসিক্—মাষ্টার—

রাতে কি একটুও ঘুমোবেন না মেজবাবু—এখনও যে তিন পহর হয়নি—একটু জিরিয়ে নিন্ না—

আর জিরনো—তার বিরক্তি মিশ্রিত কাতরতা দেখে চুপ করে যান্ মেজবাবু। বেঁচে থাকার এই প্রান্তিক অধ্যায়ে ঐ বেচারী রসিকই তাঁর শেষ ভরসা। কালের চলতি চাকার ঘূর্ণীতে সবাই তাঁকে ফেলে এগিয়ে গেছে—শুধু আজও তিনিই ধুঁকছেন্ অচল, অনড়, কেউ তাঁকে চেনে না, কেউ জানে না। কেন যে লোকে বেঁচে থাকে প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবার পর।

ভারী হয়ে ওঠে বুকটা—বরাটীর একটা নতুন ঠাট যেন মনে পড়ে—রসিককে আর একবার ডাকবেন্ নাকি। মনে পড়ে রসিক্ মাষ্টারের প্রথম আসার কথা। জমজমাট আসর—সঙ্গত করবেন স্বয়ং বিশুঠাকুর—বিষ্ণুপুরের সুরসেন্, সঙ্গে আছেন গোয়ালিয়রের শিরাণী—লক্ষ্ণৌ এর ফাঁতে খাঁ যাঁকে দোস্ত বলে মেনে নেয়, বহু ভট্ট যাঁকে স্বীকার ক'রে গুরু ঘরাণা বলে। ইমনে বন্দনা সুরু হয়ে গেছে। আসল তবলচি, কিন্তু তখনও তরলিত সুধায় বেশ একটু নাজেহাল হয়ে গরহাজির।

মেজবাবুই কথাটা পেড়েছিলেন্—ফৈজখাঁকে আনতে জুড়ি গেছে—আধঘণ্টার মধ্যেই এসে পড়বে, ততক্ষণ একটু

সঙ্গত চলুক না। এত বড় আসরের মানসম্ভ্রম বাঁচিয়ে ঠেকা দিতে পারে এমন কেউ নেই কি?

এগিয়ে এসেছিলো দীর্ঘ তরুণটি। অবাক্ হয়ে গিছলো সকলে, তিনি নিজেও অবাক হয়েছিলেন তার সাহসে। কৈবর্তকে আনতে যেখানে জুড়ি যায়, সেখানে সঙ্গত করবে একটা অর্বাচীন যুবক্।

—কি হে ছোকরা—পারবে ত, লোক্ হাসিয়ো না—

ছোকরা জোড়হাতে নমস্কার করেছিলো সুরলক্ষ্মীকে, মনে মনে বলেছিলো—মান রেখো ওস্তাদ—

হ্যাঁ, মানই রেখেছিল, যেমন্ গলার কাজ, তেমনি তবলায় হাত। সঙ্গত আরম্ভ হয়—তা না না দেরে দেরে তুম্ দেরে দেরে তুম্ দ্রে দ্রে না দেরে দেরে না তা দিম্।

আজও মনে পড়ে তবলার বোলে যেন আগুন ঠিকরে বেরুলো, গান যেন এক চাটিতে জীবন্ত হয়ে উঠলো শিক্ষিত কলাবন্তের হাতে। ক্রমশ চড় ক্রমপদ, খেয়াল গিয়ে লুটিয়ে পড়ে সেই সেরা খেয়ালীর পায়ে।

বাহবা পড়ে যায়—কেয়াবাৎ, কেয়াবাৎ!

কৈবর্তকে শুধু শুধুই দুশো টাকা নিয়ে গেলো, বলেছিলো—কর্তা, উনিই আজ বাজান্—

মেজবাবু সেই রাত্রেই মতলব ঠিক করে ফেলেছিলেন—ইংরাজী-পড়া শুনে বলেছিলেন—বেশ্ বেশ্, শুধু গুণী নয় জ্ঞানীও দেখছি—আচ্ছা সকাল বিকেলে ছেলেদের পড়াবে, রাতে গানবাজনা—মাসিনা খাওয়াপরা বাদ পঞ্চাশ—

গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে আনন্দে রাজী হয়ে গেলো।

মেজবাবু নিজে শিক্ষা পেয়েছিলেন ডিরোজিওর সেরা ছাত্রের কাছে। পড়ার দিকে ঝোঁক ছিল অদ্ভুত—কার্যকলাপও একটু গোঁয়ার ধরণের। আত্মীয়েরা বলতো—কালাপাহাড়—

খাদ্য-পানীয় সম্বন্ধে কোন বিচারই তিনি করতেন না—অগম্য স্থানও ছিল না—কিন্তু খাড়া সোজা মানুষ, দিল-দরিয়া মেজাজ, কন্দর্পকান্তি চেহারা। কোন নীচতা, কোন হীনতা যেন তাকে স্পর্শ করতে সাহস করতো না।

হো হো করে হেসে বলতেন—দরাজ সে হাসি—কি বলো হে ষাষ্টার, মনে ময়লা না লাগলেই হলো—বাস্—তেজীয়সাং ন দোষায়—পৃথিবী চিরকালই ও বীর্যশুল্ক—

তাঁদের বংশের তখন জোর দহ্দহা, প্রকাণ্ড তাঁদের বিষয় সম্পত্তি, প্রচণ্ড তাঁদের শাসন, বিরাট তাঁদের খোল-বোলা। যেন অসন্ত খদবুওয়ালা খাঁটি ঘিয়ের কড়ায় ফুটন্ত বুদ্বুদে আভিজাত্য ফুটছে টগ্বগ্ করে। তাঁদের নীলরক্ত তখনও পাকা নীল, লাল শুধু ধমনীতে, মনে নয়, চালে নয়, চলনে বলনে নয়। শুধু মেজবাবুই ছিলেন চলন্ত ব্যতিক্রম। পড়বার সময় বিধবা বিবাহ নিয়ে এতো মাথা ঘামাতে লাগলেন যে 'সম্বাদ রসরাজে' তাই নিয়ে গালাগালি। এমন সব সমাজে ঘুরতে লাগলেন যে বাপ নিজে গিয়ে ধরে নিয়ে এলেন। দেশে এসে অবশ্য একটু পবিত্র গোময় ঠেকাতে হয়েছিল প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ দায়ের কাল্লাকাটিতে। অন্য সরিকরা যখন সারারাতের ক্লান্তির পর বেলা দশটায় ঘুম ভেঙে উঠছেন তৎক্ষণ মেজবাবুর কুস্তী ডন্ বৈঠক স্নান সারা হয়ে গেছে, পেস্তার সরবৎ ফলাদি জলযোগ করে আলবোলা মুখে তিনি কালিদাস ভবভূতিদের নিয়ে বসেছেন—কোথাও হংসপদিকা বীণা বাজাচ্ছেন, কোথাও ভাব রেভিল গান শোনাচ্ছে, শূদ্রক চারুদত্ত বসন্তসেনাকে। ওদিকে তাঁর বৈঠকখানায় ন্যায়রত্ন মহাশয় বেদান্ত উপনিষদের নতুন ভাষ্য করে নস্যাৎ করছেন তর্কচূড়ামণিকে। কোনদিন বা মৌলভী সাহেব ছাড়চেন রুমীহাকেজের বয়েৎ, বাদশাহী তক্ত-তাউসের গল্প, জাহানারা রোশেনারার আশনাই এর কাহিনী। মিশনের রেভারেণ্ড নাথও উপস্থিত হতেন্ মাঝে মাঝে। তাঁর নমঃশূদ্র বাপ অবশ্য কর্তাদের আমলে ত্রিসীমানা মাড়াতে সাহস করতো না।

মেজবাবু উৎসাহিত হয়ে উঠতেন, বলতেন—বলুন ত করাসী বিপ্লবের গল্প, ভারী ভালো লাগে—

ঐসব গল্প বলতে নাথ সাহেবও যেন অভিভূত হয়ে পড়তেন্। যেদিন আবার অধ্যাপক নন্দী আর মিঃ ব্যানার্জী জুটতেন, সেদিন ত আর কথা নেই—রীতিমত কমাঝম লেগে যেত ধর্ম কর্ম নিয়ে—মাঝে মাঝে শোনা যেত কতকগুলো নাম শুধু—মিল, বেন্থাম্, কোঁত কোঁত, ডারুইন্ ল্যামার্ক, শোপেনহায়ার, ম্যাক্সমূলর। তারই ভিতর কখনও বা কেরী মার্শম্যান্, রামমোহন, তত্ত্ব-বোধিনী, দেবেন ঠাকুর, কেশব সেন। দক্ষিণেশ্বর কৃষ্ণতত্ত্বও বাদ যেতনা।

বেশী বাড়াবাড়ি হলেই মেজবাবু থামিয়ে দিতেন—মাষ্টার ধরতো হে একটা গৌড়সারেঙ্গ—

কোন দিন বা কেউ পড়তো স্বপ্ন-প্রয়াণের দু এক ছত্র, মেঘনাদবধের একটা সর্গ, তর্ক হোত মাালথাস্ মেওেল নিয়ে।

একদিন অভিনয়ই হয়ে গেল নীলদর্পণ, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ। কালীসিংহের মহাভারত একদিন কুরুক্ষেত্রই বাধিয়ে দিলে।

তাঁর জলসা-ঘরে পাঁচশো বাতি ঝাড়ের নীচে শুধু নামকরা বাইজীরাই নাচতো না, গুণীদেরও বিচার হতো—ভূপালীতে নি দিলেই বিভাস এসে যায় কিনা, ছায়ানটে কড়িমধ্যম দিলে কেমন ফোটে, টপ্পা ঠুংরীর চেয়ে ভৈরবী বেশী জমে কিনা, মিড়ের আরোহণ অবরোহণে কোথায় দরদ ফোটে বেশী, এরও মীমাংসা হোত।

কিছুদিন মেজবাবু ব্যবসাতেই মন দিলেন, বল্লেন—দেখো হে—জমিদারী কিছু নয়—বাণিজ্যেই লক্ষ্মী, দেখনা ইংরেজদের, সাতসমুদ্দুর তের নদী পেরিয়ে সারা পৃথিবীর রত্ন সঞ্চয় করছে—তাইত বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড হলো—আর আমরা ভাবছি সবই মায়া—

নিজেকে অবশ্য বেশ কিছু দণ্ড দিয়ে ক্ষান্ত হতে হলো—সেবার ব্যবসাসংক্রান্ত কাজ শুটুতে গিয়ে কিনে নিয়ে এলেন মস্ত বড় একটা টেলিস্কোপ্—ঘর বাঁধা হলো ছাদে—বসে থাকেন তিনি সারারাত আকাশের দিকে চেয়ে, আশ যেন মেটেনা। পূরবী, ইমন্ আড়ানা, ললিত কেঁদে কেঁদে ফিরে যায়। হেসে বলেন—আরে, এও ত নাচগান্—মিউজিক্ অফ দি স্ফিয়ার্স—কি খাম্বাজের তালে তালে নাচ চলছে ওখানে নটেশের—লচক্ লচক্ বিজলি ঝলক্—একটু ইদিক্ ওদিক্ হোক্ ত! চুরমার হয়ে যাবে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, ছাতু বনে যাবে তোমাদের ঐ অতি-বুদ্ধিমানদের মাথার খুলিগুলো।

মেজগিন্নী এসে তাড়া দিতেন—কত রাত হলো বল দিকিন্!

এই যে যাই।

তারপর মুচকি হেসে বলতেন—বাবুদের রাত হলে গিন্নীরা ধরে নিয়ে যাবেন সে রেওয়াজত এ বাড়ীর ছিলনা—

মেজগিন্নী অরুন্ধতীর দিকে চেয়ে চোখ মুছতেন্।

একবার এক ওস্তাদ এসে হাজির—কর্ত্তা, খাস আলমগীর বাদশার জন্য তৈরী টোড়ী ঝাঁপতাল আর মালশ্রী সুর ঝাঁকতালের ছুটো ঠাট্ আমার পূর্ব্বপুরুষেরা করেছিলেন—জানেন ত এককালে তিনি তাড়িয়ে দিয়েছিলেন গুণীদের দরবার থেকে—আমাদের বংশ ছাড়া কেউ জানে না। বলেন ত হুজুর আপনাকে শুনিয়ে দিই, খুশী হলে ইনাম্ দেবেন হাজার টাকা—আলমগীর বাদশার আমলের কিনা—

লাফিয়ে উঠলেন মেজবাবু—মাষ্টার, শীগগির তুলে নাও—

লোকটী গুণী, সুরটাও নতুন! কিন্তু আলমগীর বাদশার গল্পটা শ্রেফ্ ধাপ্পা কিনা মেজবাবু বুঝতেই চাইলেন না। আর একবার লোচনের রাগতরঙ্গিণীর 'জনক' রাগগুলোর চাটের জন্য খরচাই করলেন মবলগ্ টাকা—শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীতরত্নাকরের খোঁজে মাষ্টারকে পাঠালেন দ্রাবিড়ে কাশ্মীরে।

এদিকে হাণ্টার হাঁকাতেও পটু। একবার এক মহালের কোন নায়েব গেরস্ত ঝিউড়ির দিকে কুনজর দিয়েছিল, ধরে এনে গাছে বেঁধে পিটের ছাল তুলেছিলেন তিনি—একটা দুষ্টু দারোগার কান মূলে নাকখত্ দিইয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন আর একবার।

বড়বাবু মাঝে এসে না পড়লে সেদিন আরো বিশ্রী কাণ্ড হয়ে যেতো—খোদ শাসনযন্ত্রের সঙ্গে ঠোকাঠুকি।

সস্নেহে বড়বাবু বলতেন—ওটা একটা গোঁয়ার কালা-পাহাড়—ওর কথা গ্রাহ্যি করলে চলে, গানবাজনা নিয়েই থাকে ভালো—

শিকারে যেতেন মেজকর্ত্তা একেবারে রাজার কায়দায়, রাজসিক্ ভাবে—হাতীতে চ'ড়ে লোকলস্কর নিয়ে। বাঘ-ভাল্লুক ছাড়া মারতেন না কিছু—পাখী মারা, হরিণ মারা ছোঃ। কুফের জীব। কারুর অনিষ্ট করেনি, শুধু শুধু তাদের মেরে মনের প্রবৃত্তিটাকে দুর্দ্দাম করে তোলা কেন বাপু? রসিকমোহন টিপ্পনী কাটতেন—তা যা বলেছেন মেজবাবু। হাহা করে হেসে জবাব দিতেন—পালাতে পারবে না রসিকমোহন, রক্তে রয়েছে যে মাংসের লোভ, অতি আদিম, অতি অকৃত্রিম, দলে দলে ছিঁড়ে খেতে চাই

ভেতরের মাংসপেশীটা—নাও, চালাও ঘুম পাড়িয়ে দাও সেই বন্য বর্বরটাকে সুরের ইন্দ্রজালে, না হলে যে কোন উপায়ে সে বেটা কোনদিন মাথা চাগাড় দেবেই, বুড়ো বয়সেও রেহাই নেই। এই রকম ছিল তাঁর কথা।

সাহেবরা এসে তাঁবু ফেলে—ভারি জোব্বা সাহনরী হাঁর পরে মুরেঠা মাথায় প্রভু সন্দর্শনে চলেন সরীকরা।

মেজবাবু হেসে বলেন—দেতে দাও মাষ্টার, তার চেয়ে ধরো দিকিন্ একটা মীরার ভজন—অনেকদিন শুনিনি—চোখের জলে ভাসিয়ে দাও শ্রীমতীর বিরহ।

মেজোগিন্নী মাঝে মাঝে চটে উঠতেন—তোমার কাণ্ড-কারখানা কি বলো ত—

তিনি জবাব দিতেন—গরীব কুলীন ঘরের মেয়ে রূপ আর কুলমর্যাদা দেখে বাবা জমিদার ঘরে নিয়ে এসেছিলেন—এত বড় বাড়ীর মেজোগিন্নী হয়েছো—আর চাই কি—তবু ত রাত একটায় হোক্ দুটোয় হোক্ কিছুটা ফিকে চোখে ঘরে ফিরি, সতীসাধ্বী দেখা পাও—

একদিন বলেছিলেন—মাষ্টার, প্রেমে পড়েছো কখনো? —কোথায় যেন ভেসে আসে একটু সুরের ইঙ্গিত, ঝড়ো হাওয়ার এক টুকরো। মেজবাবুর নাকি অপবাদ ছিল, তিনি কুষ্ঠান্ মেয়েকে বিয়ে করবেন বলে খেপে উঠেছিলেন—রত্নর মত পাইক্ সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ধরে এনে বাপ জোর করে বিয়ে দিয়েছিলেন মহাকুলীন বংশের হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে।

স্তব্ধ হয়ে থাকেন মেজবাবু—আলোর একটু রেখা যেন দিগন্তে—মনে মনে রোমন্থন করেন সে সব দিনের কথাগুলো—সময়ের স্রোত বেয়ে ভেসে আসে একটি নাম —অনুরাধা—অনু—আর—আর—বুকটা কেমন করে ওঠে —একটি ছায়া—শুধু ছায়া।

নামটি মন্ত্রের মত কাজ করে তাঁর মনে—ফুটে ওঠে শিশির-ভেজা শীতের রাতের সঙ্কুচিত পদ্মের মত—লাজনম্রা একটি তরুণী বালবিধবা—এয়োতীর চিহ্ন লুপ্ত—আয়ুষ্মতীও সে হয়নি—পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ কুলীনের উনপঞ্চাশী বধূ সে। কুলীনের কন্যাকে উদ্ধার করেই সজ্ঞানে তিনি গঙ্গালাভ করেন—উর্দ্ধলোকে বোধ হয় তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলো উর্ব্বশী মেনকা রম্ভার দল, কিছু কৌলীন্যের প্রণামী নিয়ে, এত বড় পুণ্যশ্লোক অন্তাস্তকর্ম্মীকে অভ্যর্থনা করতে।

বাবুদের দূরসম্পর্কের ভাগিনেয়ী ছিল অনু—মেজবাবুই তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন বিধবা হবার পর। মেজগিন্নীর মহালেই সাংসারিক কাজকর্ম্ম নিয়ে থাকতো—সবাই বলতো —কি লক্ষ্মী মেয়ে, নেহাৎ ভাগ্য খারাপ তাই। মেজ-বাবুর বইগুলো নিয়ে সে নাড়াচাড়া করতো সময় পেলেই, দূর থেকে শুনতো তাঁদের আলাপ-আলোচনা, গান সঙ্গীতের মহরৎ।

রসিকমোহন তত দিনে এসে গেছেন। অনু যেন হঠাৎ কি আবিষ্কার করলে—অন্ধকারে যেতে যেতে সে দেখতে পেলে—দূর-সন্ধানী লক্ষ লক্ষ ভোল্টের আলো যেন নেমে আসছে নীহারিকা থেকে—অতিবেগুনী রঙ মিলিয়ে যাচ্ছে নবজলধর-ঘনশ্যামে, একটি মানবীর বিদ্যুতে। রসিক যখন এক মনে তবলায় চাটি দিচ্ছে চৌতালে, দরজার আড়াল থেকে তাকিয়ে দেখছে অনু। রসিক যখন আলাপ করছে কোমল রেখাবীতে আশাবরী, অষ্টাদশী কানাড়ার নায়িকীকে ধরবার জন্য গলা সাধাসাধি, হাঁ করে শুনছে অনু। রসিক যখন মেজবাবুর সঙ্গে বাগানে বেড়াচ্ছে তাকে লুকিয়ে দেখছে সে ছাদ থেকে, আকাশ ও পৃথিবীর মিলনের মাঝে।

একদিন সকালে সে গুণ্ গুণ্ করে গান করছিলো, মেজকর্ত্তা চুপ করে শুনলেন এক মনে—আরে, এ যে ভৈরবী তোড়ী—পঞ্চম প্রবল—এ ঠাট্ তো নেই আজকাল —মাষ্টার সেদিন সাধছিলো বটে—

এগিয়ে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে বল্লেন—গান শিখবি অনু, খাসা গলা তোর—

হাঁ, মামা—

মেজগিন্নী ধমক দিয়ে ওঠেন—পেরত ঘরের ধিঙ্গী মেয়ে, কপাল মন্দ—নইলে কোলে কাঁকালে ভর্ত্তি থাকতো —গান শিখবে, লজ্জা করে না।

মেজবাবু নিঃশব্দে চলে যান্। কিন্তু শত ধমকানীতেও অনুর ভ্রূক্ষেপ নেই—আস্তে আস্তে জেগে উঠছে তার মনে একটা অস্ফুট আলোড়ন, একটা অস্পষ্ট আন্দোলন। ফুটে উঠছে বিকশিত দিগ্-বাসনার দল মেলে সুদাম মালীর ঘরের অকালপদ্ম। সমস্ত অন্তর ভরে ওঠে গানে। সে গান শোনাবে কাকে—ঠাকুর যে দিলেন না কিছু—

কি করবে সে খুঁজে পায় না, কেবল করে সংসারের

কাজে লেগে যায়, বুকের ব্যথা চাপা দেবার জন্ত বই পড়ে, ব্রত-পূজো-আচ্চায় সময় কাটায়।

বড়গিন্নী মাতঙ্গিনী গদ্‌গদ্ হয়ে বলেন—সত্যি মেজো, মেয়ে বটে অনু—মানুষ করেছিস্ যা হোক্, এই বয়সেই এত ভক্তি—

—শুধু পুজো দিদি, কেমন রামায়ণ মহাভারত আরও কত কি পড়ে, কপাল পুড়েছে তবু পাঁচটা কাজ নিয়ে থাকুক—

মেজবাবু হাসেন—চেয়ে থাকেন নদীর দিকে, ওপারে বড় বাঁকটার কাছে জেগে উঠছে ছোট্ট একটী বালুচর, হয়ত ফুলে ফলে সবুজ ও শ্যামলে সোনা হয়ে উঠবে একদিন। না হয় ক্ষোভে ক্ষেপে নিজেকে তলিয়ে যাবে বড় গাঙের মধ্যে, কে জানে।

আর একদিন সকালে দস্তুর মত সভা বসেছে মেজবাবুর বৈঠকে। পণ্ডিত মহাশয় মহাকবি বাণভট্টের কাদম্বরীর সাড়ম্বরে ব্যাখ্যা করছেন্—গহন নিবিড় বন, সূর্য্যের আলো ঢোকে না, বৃদ্ধ বনস্পতিদের জটিল জটাজাল ছড়িত শিব-মন্দির, তারই অলিন্দে বসে গান ধরেছেন, তাপসী তরুণী সুন্দরী মহাশ্বেতা, দূরে শুধু চন্দ্রাপীড় নয়—বনের পশু-পক্ষীরাও হিংসা ভুলে একমনে শুনছে, আর শুনছে গন্ধর্ব্বের দল। হাতীর দাঁতে গড়া বীণা তার হাতে—ঝঙ্কার দিয়ে উঠছে মাঝে মাঝে মনের সমস্ত নিবিড় আকুলতা—ব্যাকুল হয়ে আছড়ে পড়ছে, গান যেন বলছে—হে রুদ্র, হে বিরূপাক্ষ, হে শশাঙ্কমৌলি, প্রসন্ন হও দেব—বিশ্ব মাঝে যে প্রেমকে ছড়িয়ে দিয়েছো তাকেই আবার গ্রহণ করো গঙ্গাধর। বিশ্বের যৌবন তা না হলে ব্যর্থ হয়, সৃষ্টির আবর্ত্তন চক্র স্থগিত, যুগে যুগে উমারা কি শুধু তপস্যাই করবে, তাদের যোগ কি বিয়োগেই পর্য্যবসিত হবে, প্রণীত যোগীশ্বর?

হঠাৎ অন্দর মহলের দিকে একটী ঝন্‌ঝন্ শব্দে পণ্ডিতের তাল কেটে গেলো। মেজবাবু গিয়ে দেখেন নিত্য শিবপূজার পুষ্পপাত্রটি বিমনা অনুর হাত থেকে পড়ে গেছে মাটিতে—লুটিয়ে পড়েছে পদ্মগুলি।

বলেন—কেন মা, শুনতে যদি ইচ্ছে করে, ভেতরে এসে বসলেই পারিস্—

লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে অনু।

মেজবাবু সেইদিনই একান্তে কথাটী পাড়লেন্—বিয়ের কথা কিছু ভেবেছো, রসিকমোহন—মেয়ে মেলে কেলা হচ্ছে যে—ঋতুপতি রাজবসন্ত যে আওল—লণ্ডভণ্ড একটা কিছু করে ফেলো—

—আমতা আমতা করেন রসিকমোহন্—একটা অস্পষ্ট ক্ষণিক-দেখা ছায়া যেন মনের মণিকোঠায় উঁকি দেয়।

স্পষ্ট করেই কথাটী বলেন্ মেজবাবু—মাষ্টার বিয়ে করবে অনুরাধাকে—

—কাকে—

—অনুকে, তুমি যে শ্যাম সুনাগর গুণগণ আগর।

হতভম্ব হয়ে যান্ রসিকমোহন্, মাথায় কিছুটা ঢুকলে বলেন্—

—ও যে বিধবা—

জ্বলে ওঠেন্ মেজবাবু—মাষ্টার, তুমি না সুরসাধক, তুমিও ও কথা বলবে—সুর মানেই ত মিল—

—কর্ত্তা—

—পটমঞ্জরীর নাম শুনেছো, রাগ বসন্তের যে সুর-সাধনায় নিষ্পত্রবৃক্ষে গজিয়ে উঠছিলো সৃষ্টির নতুন রূপ, এই পোড়া দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেই বন্যাই আনতে হবে, পদ্মাবতী যার দোত্রী, অমরদেব যাঁর উত্তরসাধক—সব লঙ্ঘন, সুর বন্ধন্ ভেঙে দিয়ে—

—কি বলচেন্ মেজবাবু—

পেটে খিদে মুখে লাজ করো না, দুটো জীবন যদি জুটে ওঠে সেটা কি দোষের, আজকাল বিধবা বিবাহ চলছে—বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ত জানো—মহাপুরুষ বললে তাঁকে ছোট করা হয়, টাটকা জ্যান্তো জলন্ত মানুষ—তিনি বলেন্ এটা শাস্ত্রসঙ্গত, হ্যাঁ বিয়ে ওর হয়েছিলো বটে, সেটা বিয়ে নয়, বিয়ের ভ্যাংচানী—

—কিন্তু—

—আবার কিন্তু রসিকমোহন্, আচ্ছা ভাল করে ভেবে দেখো, শিকার থেকে ফিরে আসি, তারপর পাকাপাকি যা হয় করা যাবে, কিন্তু সাবধান্ কানাকানি না হয়, চুপিচুপি সারতে হবে।

মাতাল স্বপ্নে মাষ্টারের তাল কেটে যায় আর কি। বুকের ভেতর যেন বসন্ত বাহারের আসর বসে। ওপারে

চরটা চিক্‌চিক্ করে, প্রাণের অঙ্কুর জেগে উঠেছে কচি ঘাসের সবুজে।

মেজবাবু ফেরবার আগেই কথাটা কি রকম রাষ্ট্র হয়ে পড়ে—বড়বাবু বড়গিন্নী মারমুখী হয়ে ওঠেন্। সতমুখী হাতে ছুটে আসে আত্মীয়স্বজনেরা।

—কালামুখী—

—মুখপুড়ী—

হতচ্ছাড়ী—পুকুরেও স্থান হয় না।

গঞ্জনা, অপবাদ চীৎকার কুৎসায় বড়বাড়ী ছোট হয়ে যায়। অনুরাধা হঠাৎ হকচকিয়ে ওঠে, মেজবাবুর মতলবের কথা, রসিকের মনের ভাব সে কিছুই জানতো না। কিন্তু তার গোপন মনের সত্যটি ত মিথ্যা নয়। নিজের অজান্তে শঙ্কাকুর প্রত্যাশাকে সে গোপনে লালন্ করেছে, সেই পাপেই কি রুদ্র হলেন্ বাম।

সলিল নিঃশ্বাসে শুকিয়ে উঠে শুভ্র ফুলটি বিছানা নেয়।

ওরই মধ্যে মেজগিন্নী অনেক বকে ঝকে তাকে তুলে বললেন—কাঁদিস নি মা, হিঁদুর ঘরে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছিস্ তায় বিধবা, মনের কি কোন বালাই রাখতে আছে—ওরে কাঁদবার অনেক সময় পাবি, নে দুটো মুখে দে দিকিন্—মা আমার—

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলছিল অনুরাধা—শক্ত কাঠ হয়েছিল এতক্ষণ।

শিকার থেকে মেজবাবু আর রসিকমোহন্ পরের দিন ভোরেই ফিরলেন্। হাতির হাওদায় বসে বসে রসিকমোহন্ ভাঁজছিলেন বিলাসখানি তোড়ীর একটা করুণ আকুতি—তন্ময় হয়ে শুনছিলেন মেজবাবু, তারপর খানিকক্ষণ গুম হয়ে থেকে বলে উঠলেন—মাষ্টার, আর কোন কথা নয়, এবারে তোড়ীকে মিলিয়ে দিতেই হবে ভৈরোর সঙ্গে—

বাড়ীতে ফিরে দেখেন, বিপর্যয় ব্যাপার—ভরা নদীতে ডুবেছে নাকি অনুরাধা—প্রচণ্ড বানে ওপারের চরও ডুবে গেছে। মেজবাবু শুনেই এগিয়ে গেলেন—অনুরাধার ঘোলাটে চোখ দুটোর দিকে চাইলেন, তারপর হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসলেন। সাধে কি আর আত্মীয় স্বজনরা নাম দিয়েছিলো গোঁয়ার কালাপাহাড়।

হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন রসিকমোহনকে, জোর করে মালা বদল করালেন, সিঁদুরের রক্তরেখা লাগিয়ে দিলেন অনুর সীমন্তে, পরিয়ে দিলেন লাল চেলী—

বল্লেন—মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাচ্ছি—চালাও জয়-জয়ন্তী—

হাঁ হয়ে রইলো বাড়ীর লোকজনেরা—আচার শুচি-বায়ুগ্রস্ত সমাজধ্বজীরা—একী খ্রীষ্টানী কাণ্ড—অনাচার!

তবু মেজবাবুকে সবাই চিনতো, প্রতিবাদ করতে সাহস করলে না, এমন কি বড়বাবু বড়গিন্নীও না।

বড়বাবু শুধু বল্লেন—পাগলামী ওর গেলো না—মেজ-গিন্নী গোপনে চোখ মুছলেন্।

রাত্রে উন্মাদের মত মাঝে মাঝে মেজবাবুর পিয়ানো ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো—বীঠোভেনের কিউনার্ল মার্চ।

রসিকমোহনও সেদিন সারা রাত পাইচারী করেছিলেন নদীর ধারে—অতিদূরে যেন তোড়ীর সুর মিলিয়ে যাচ্ছে বনের ভিতর। একটা হরিণ যেন কান খাড়া করে দাঁড়ালো, হ্যাঁ ঠিক তোড়ীই, ভ্যাঁরো বুঝি প্রসন্ন হলেন না, তাই তন্বী তোড়ী চঞ্চল হয়ে চলেছেন গান শোনাতে—হরিণদের নয়, মানুষের! টলটলে জল, তলতলে স্রোতস্বতী—ঐ যে হিমকুন্দকান্তি সুন্দরী তোড়ী নামলেন শোনাতে তাঁর অভিমানের, আত্মসমর্পণের গান—ভৈরব দেখা দেবেন এবার—ভোর রাতের শেষ ছায়া পড়েছে তার মুখে।

সকালে উঠে মনস্থির করে বলেছিলেন রসিকমোহন—কর্তা, এবার বিদায় দিন্।

হাতদুটো শক্ত করে ধরে মেজবাবু উত্তর দিয়েছিলেন—হয় না, রসিকমোহন, একই সূত্রে বাঁধা দুই মন।

কালে বৈ বৈ টা মিলিয়ে গেল বটে, কিন্তু দাগ মিলুলো না—না রসিকমোহনের, না মেজবাবুর। আস্তে আস্তে মেজবাবু সরে গেলেন সংসার থেকে—পাঁচজনরা সরিয়েও দিলে, বদনাম হলো খ্রীষ্টান্ নাস্তিক, মাথার ছিট আছে। দূরে নদীর ধারে বাগান বাড়ীতেই আস্তানা গাড়লেন তিনি, সঙ্গে রসিকমোহন। লোকে বলতো—মোসাহেব।

লেখাপড়া গানবাজনার মধ্যেই ডুবে গেলেন দুজনে—মাঝে মাঝে গুণীরা আসতো। পুরাণো রাগরাগিণীগুলোকে ভেঙে নতুন মিশ্র রাগ সৃষ্টি করবার অদ্ভুত পাগলামী যেন মেজবাবুকে পেয়ে বসেছিলো, বলতেন—রসিক গোঁড়ামি

ভেঙ্গে মিশিয়ে দাও রাগরাগিণীদের, না মিললে সৃষ্টি মিথ্যে, সব মিথ্যে।

শৌরী মিয়াঁর টপ্পা লাগালেন তিনি নতুন ঢংএ। মিয়াঁ কি মলহার বেজে উঠলো—চলত পবন পুরবৈ সন্ সন্—মন হোল মেঘের সঙ্গী। নব নট নাচতে লাগলো নতুন ছন্দে। তানসেন, সদারঙ্গ, গোপাল নায়ক, বৈজুবাওরার বহু গান তাঁরা রূপান্তরিত করলেন—আমীর খসরুর ইমন্ ভূপালী পিলু, বারোয়া ঝিঁঝোটী নতুন রূপ পেলে। কর্ণাট গিয়ে মিশলো গুর্জ্জরীতে, পুরিয়া গিয়ে মধুমাধবীতে, বাগীশ্বরী জেগে উঠলেন। কৃষ্ণধন বাঁড়ুয্যের সঙ্গে চলতে লাগলো বাদানুবাদ, শৌরীন ঠাকুর দিলেন বাহবা।

মেজবাবু প্রায়ই বলতেন—মাষ্টার ঐ যে তোমাদের রবী ঠাকুর, দেবেন ঠাকুরের ছোট ছেলে—আসল জাতগুণী, কত সুরই মিশিয়েছে—গান কি শুধু মিছে কথার ছলনা, না হাসিকান্না প্রমোদের মেলা? এ হচ্ছে বিরাটের পুজো, মনের নিভৃতে প্রতিষ্ঠা করতে হয়—তবেই ও নটনারায়ণ ফুটে ওঠেন! চাটিখানি কথা, শুধু তবলায় চাঁটি আর প্রিং প্রিং করে ম্যাও ম্যাও করলেই তাঁকে ধরা যায় না—ঢেলে দিতে হয় নিজেকে দরদ দিয়ে।

চেয়ে থাকেন তিনি নদীর দিকে—চরটা আবার জাগছে।

ওদিকে কিন্তু দরিকী আবদারে জমিদারী বিষয়সম্পত্তি লাটে চড়ে, ফোকী পরোয়ানায় মৌজাগুলো যায়—মেজবাবু নির্ব্বিকার। মেজগিন্নী দৌড়ে এসে কাঁদাকাটি করেন—সব যে গেল—

হেসে জবাব দেন তিনি—মেজগিন্নী অনেকদিনই তো সব গেছে।

—তোমার বাপপিতোমোর বিষয়, আমার সুধীর মনু খাবে কি?

—মানুষ করে দাঁড় করিয়ে দাও, সবাই কি পৃথিবীতে পৈতৃক জমিদারী নিয়ে জন্মায়, বুকের রক্ত জল করে অর্জ্জন করিনি কিনা, তাই মায়াও কম, ভোগ করতেও লজ্জা করে—

বড়গিন্নী শুনে বলেন—একেবারে দৈত্যকুলের পেল্লাদ—

সেই খ্রীষ্টান মেয়েটাই যত নষ্টের মূল, জানলি মেজো—আবার বুকটা কি রকম করে, মনে পড়ে সেদিনই রসিক-মোহনকে বলেছিলেন—যাবার সময় বাপু একটা মালকোশ না হয় দীপক ধরে বিদায় দিয়ো, ভাল করে পোড়ে যেন সব ময়লা—শিকল-ভাঙা আগুন-রাঙা মূর্ত্তিটিকে একবার ধ্যানে নিয়ে এসো দিকিন্।

তারপর হেসে বলেছিলেন—বুঝলে না মাষ্টার, মুখাগ্নিটা গানেই করো—তুমিও শীগ্‌গির চলে এসো—হ্যাঁ, এবার আর অনুরাধাকে কেউ কাড়তে পারবে না আর মেরীকেও নয়—

কান্না যেন বুক ঠেলে আসে, ছিন্নাশী বছরের ঝাঁঝরা করা বুকের কান্না, বরফের মত জমাট কান্না। আজও সন্ধ্যেবেলায় যে নালীর মেয়েটা কেঁদে গেল। ষোল সতেরো বছরের মেয়ে—হরিণীর মত আসে, ছুটে পালায়। কোথায় কোন ছোকরার সঙ্গে তার বুঝি ভাব হয়েছে—তারুণ্যের অভিশাপ আর কি—জাতভাইরা কি সব বলেছে—বাপ তাড়ি খেয়ে মেরেছে মেয়েটাকে বেদম্। ভয়ে ভয়ে তাঁর পায়ের কাছে এসে বসেছিল। মাথায় হাত বুলিয়ে তিনি শুধু তানপুরোটা তুলে নিয়েছিলেন, তারগুলো মোচড় দিয়ে উঠেছিল—তুঁ কেউ রোঁদিয়া—কেন তুই কাঁদিস্, রোদনভরা পৃথিবীতে অনন্তকাল ধরে যে প্রশ্ন জেগেছে—কেন তুই কাঁদিস্।

বুকটি কেমন করে উঠলো বুড়োর, গলাটা যেন চেপে আসে। রসিকমোহন উঠে দেখেন, সারা রাত জেগে ঘুমিয়ে পড়েছেন মেজবাবু শান্ত হয়ে চিরকালের মত।

মহাব্যোমের আর এক প্রান্তে হাজার মাণিকজ্বলা জলসা-ঘরে আবার আসর বসছে—তোড়ীর গৎ বাঁধা হচ্ছে—সেখানেও যে নতুন দিন—নতুন গুণী এলো।

প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পর কৃষক *

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

এখন আমাদের দেখতে হয়, প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান হ'তে এই মহাযুদ্ধের সুরু পর্যন্ত রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী কে কোন অভিনয়াংশ গ্রহণ করেছে। মার্কস পুঁজীবাদের (Capitalism) যে রূপ দেখেছেন ও যার উপর তিনি মত ও আদর্শ গঠন করেছেন, তা হ'ল প্রাক্-সাম্রাজ্য পুঁজীবাদ; তখনও আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ দেখা দেয়নি। তাই তাঁর লেখায় সাম্রাজ্যবাদ বা Imperialism শব্দ প্রায় নেই। লেনিন সাম্রাজ্যবাদকে বিশ্লেষণ ক'রে মার্কসের মত থেকে এগিয়ে গেলেন। তিনি পুঁজীবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের পার্থক্যকে নিছক পরিমাণগত (quantitative) মনে করতেন না। এই দুইর মধ্যে একটা গুণগত (qualitative) পার্থক্যও আছে বলে তিনি মনে করতেন। Imperialist epoch as a continuation lent at the same time a qualitative by a new stage in the development of Capitalism (Text book of Marxist Philosophy, P, 274-75)। ইতিহাসে এর পরও আর এক গাঁট (Knot) পড়েছে; সেটা হ'ল ফ্যাসিবাদ। পুঁজীবাদ থেকে সাম্রাজ্যবাদের যেমন অভ্যুদয়—কিন্তু যেমন উভয়ের মধ্যে গুণগত পার্থক্য রয়েছে, ঠিক তেমনি সাম্রাজ্যবাদ থেকে ফ্যাসিবাদের উদয়, অথচ উভয়ের মধ্যে একটা গুণগত পার্থক্যও রয়েছে। এই ফ্যাসিবাদের উদয়ে ও এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমজীবী এবং কৃষিজীবীর কার কতটুকু অংশ আছে, তা দেখা দরকার।

অত্যাধুনিক ইতিহাসের এই অধ্যায়টি বিচার করার পূর্বে কৃষিজীবী ও শ্রমজীবীর আর্থিক জীবন-ব্যবস্থা ও তজ্জনিত বা তৎপ্রভাবিত মানসিক গঠনেরও বিচার করা দরকার।

আমাদের মধ্যে একটা খুব সহজ ধারণা আছে যে মানসিক গঠনে কৃষিজীবী বিপ্লববিরোধী এবং শ্রমজীবী বিপ্লব-অনুগামী। এর পিছনের যুক্তি হ'ল—কৃষকরা জমি নিয়ে পড়ে আছে; এই শুষ্ক বস্তুর স্থাবরত্বের মতো তাদের মনও ওতে স্থাণু হ'য়ে থাকে;—জমির মায়া কাটিয়ে তারা অনিশ্চিত ও বিপদসঙ্কুল বিপ্লবের পথে যেতে চায় না। কৃষিও জমির সঙ্গে জড়িয়ে আছে আদিম ধর্ম অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান ও বিধিনিষেধ এবং রাষ্ট্রিক শাসন ব্যবস্থা। এই সবই কৃষকের মনকে বেঁধে রাখে। নিশ্চিত মুষ্টিভিক্ষাকে ছেড়ে বিপ্লবের অনিশ্চিত ভূরি-ভোজের জন্য সে লালায়িত হয় না। এই যুক্তির পিছনে অনেকখানি সত্য আছে। এটা ঠিকই, জমির মায়া কৃষকের মনে অত্যন্ত প্রবল, ধর্মাচরণ তার মনে একটা প্রত্যক্ষ বোঝা ও বন্ধন, রাষ্ট্রের ও সমাজের শাসন মেনে চলতেই সে অভ্যস্ত। কিন্তু এই একটা দিক দেখে বিচার করলে তা হয় একদেশদর্শী। লেনিনের ভাষায় লক্ষকোটী ঘটনার সূত্র (billions of threads) জড়িয়ে থাকে এক একটী কার্যের সঙ্গে; আমাদের ন্যায়ের ভাষায় বলা যায় —কারণ-সমষ্টির যোগাযোগে কার্য সংঘটিত হয়। কাজেই কোন কার্যের কারণ বিশ্লেষণ করতে হ'লে, ঐ সব ঘটনার বিচার করা দরকার।

বিপ্লব করার মতো মনের বল একেবারে দুর্বল ও নিঃস্বের হয় না;—এই নিয়ম স্বীকার ক'রেই যাদের বলা হয় rampen proletariat তবঘুরে বাউণ্ডুলে, তাদের বিপ্লবী পর্যায় মধ্যে ধরা হয়নি। বাংলার গত দুর্ভিক্ষের তদন্তকারী কমিশনও এই তত্ত্ব কতকটা স্বীকার করেছেন। যখন এত বড় দুর্ভিক্ষের মধ্যেও লুটপাট ও বিদ্রোহোন্মুখতার অভাবের কারণ নির্দেশ করেছেন, তখন ঐ কমিশন প্রকারান্তরে ঐ কথাই বলেছেন যে অন্তর্নিহিতভাবে বাংলার দরিদ্রশ্রেণী দুর্বলতা ও নিঃস্বতার এমন গভীর আবর্তে প'ড়ে গেল যে লুটপাট বা কোন প্রকার বিদ্রোহ করার স্পৃহা ও অবস্থা

* আর এক খণ্ড 'ভারতবর্ষে'—"কৃষক ও কৃষিবিপ্লব" শীর্ষক প্রবন্ধের অনুবৃত্তি।

এদের রইল না। যদি দীর্ঘ বৎসর ধীরে ধীরে এরা অনাহারের পথে এগুত তবে হয়ত এমন নীরবে এসব মেনে নিত না। পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্যন্ত যত বিপ্লব ও বিপ্লবপ্রয়াসী বিদ্রোহ হয়েছে তার মধ্যে একেবারে চরম নিঃস্বদের অংশ অতি সামান্য। ক্রীতদাসের বিপ্লব-প্রসারের কথা ইতিহাসে প্রায় নেই;—একেবারে নেই কথাটা বড় বেশী ব্যাপক; সাধারণ নিয়ম ও ঝোঁকের বা গতির ব্যতিক্রম সব সময়ই স্বীকার্য। গ্রীক ইতিহাসে যে সামাজিক সংঘর্ষের পরিচয় পাই, তা হেলট্ (Helot) বা ক্রীতদাসদের বিদ্রোহ নয়; তা হ'ল একতন্ত্রের (Tyranny) ও ধনিকতন্ত্রের (Plutocracy) বিরুদ্ধে Demos বা জনতার বিদ্রোহ—গণতন্ত্র (Democracy) প্রতিষ্ঠার বিদ্রোহ। রোমীয় ইতিহাসে যে সামাজিক সংঘর্ষের কথা পড়তে পাই, তাও ক্রীতদাসের (Slaves) বিদ্রোহ প্রায়ই নয়; তা' হ'ল অভিজাতদের বিরুদ্ধে জনতার বিদ্রোহ—Plebians against the Patricians। রোমের বাইরে ইটালীর দূর প্রান্তে বা সিসিলিতে বরং ক্রীতদাসদের বিদ্রোহের চেষ্টা হয়েছে; কারণ ঐ সব আত্মকর্তৃত্ব রহিত স্থানে পরাধীনতার ফলস্বরূপ—জনতার বিরাট অংশই ছিল ক্রীতদাস পর্যায়ে।

মার্কস্ ডাক দিয়েছেন—Proletarians of the world, have nothing to lose but their chain—বিশ্বের শ্রমজীবিগণের শৃঙ্খল ব্যতীত আর কিছুই তাদের হারাবার নেই। এই যাদের রূপ—যাদের হারাবার কিছুই নেই, তাদের বিপ্লবী মনোভাব হবার বিশেষ কোন কারণ নেই। যাদের অন্তরে কিছু হারাবার ভয় নেই, তাদের অন্তরে আশা উদ্রেক করারও কিছু নেই। ইউরোপীয় ইতিহাস নিয়েই আমরা নাড়াচাড়া করি—কোন তত্ত্বের ঐতিহাসিক অনুমোদনের জন্য আমরা সেখানেই নজির খুঁজি। ইউরোপীয় ইতিহাসেও ইংল্যাণ্ড, জার্মেণী প্রভৃতি দেশে পরপর কৃষক বিদ্রোহ হয়েছে। কিন্তু একেবারে হৃত-সর্বস্ব যারা—উন্নতির আশা যাদের কাছে দুরাশা—তারা কখনও বিপ্লব প্রচেষ্টা করেনি।

কিন্তু কথা উঠবে আজকার শ্রমজীবী ত' তেমনভাবে নিঃস্ব নয়—হারাবার মতো তার কিছুই নেই, একথা আজ আর সত্য নয়। বাস্তবিকই তা ঠিক নয়। অভিজ্ঞ শ্রমিক আজ এক নূতন আভিজাত্য লাভ করেছে। অর্থের দিক দিয়েও সে সমাজে স্থান করে নিচ্ছে। সমবায় ও যৌথ কারবারে—যে কারখানায় সে কাজ করে, অনেক সময় সেই কারখানার মূলধনেরও তার হিস্যা হয়েছে। সেই হিসাবে পূর্বোক্ত আপত্তি তার সম্বন্ধে খাটে না। কিন্তু অভিজ্ঞ শ্রমিকের সংখ্যা মুষ্টিমেয় এবং তাদের মধ্যেও বেকার-সমস্যা প্রবল হয়ে উঠেছে। কৃষকের পক্ষে বিদ্রোহের প্রধান অস্ত্র হ'ল, খাজনা বন্ধ করা; শ্রমিকের পক্ষে তা হল সাধারণ ধর্মঘট। এই সাধারণ ধর্মঘট করার পক্ষে মস্ত বড় অন্তরায় দেখা দিয়েছে বেকার শ্রমিকগণ একজনের পরিবর্তে এখন গিয়ে ধর্মঘটী শ্রমিকের স্থান পূরণ করছে। কৃষক বিদ্রোহের যে প্রধান অস্ত্র—খাজনা-বন্ধের পক্ষে তেমন কোন অন্তরায় নেই। বেকার সমস্যা সমস্ত শ্রমিক জগতকে দুর্বল করে তুলেছে; শক্তিমান রাষ্ট্রনায়ক বা ধন ও প্রতিপত্তিশালী রাজনৈতিক দল সহজেই বেকার সমস্যার সুযোগ নিয়ে শ্রমিকদের স্বাধীনতা নষ্ট করেছে। বিলাতে ১৯২৬ সালে General Strike—সাধারণ ধর্মঘট—এই বিষয়ে নূতন দিক-দর্শন হিসাবে গণ্য হয়। ৯দিনের মধ্যেই সব ভেঙ্গে গেল—হাড়া আর বেলতলায় যাবে না—এই সঙ্কল্প করে—"Never again: Never again"—ব'লে শ্রমিকরা দলে দলে কাজে পুনরায় যোগ দিল; হাজার হাজার শ্রমিক পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে কারখানায় ফিরে এল। রাজনৈতিক ধর্মঘটকে বেআইনী ক'রে আইন পাশ হতে দেরী লাগল না।

এর পর আর ঐদিকে কোন বিশেষ চেষ্টা হয়নি। অথচ ব্রিটেন হ'ল গণস্বাধীনতা ব্যাপারে ইউরোপের মধ্যে অগ্রণী। শ্রমিক সংঘের (Trade Union) স্বাধীনসত্ত্বা ব্রিটেনে যতটা স্বীকৃত হয়, অন্য কোন দেশে তেমন হয়নি। সরকারী খয়রাতী মুষ্টি ভিক্ষার (dole) উপর লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের জীবনযাত্রা নির্ভর করে। যারা কর্মে নিয়োজিত থাকে, তাদের মনের ও চোখের সামনে থাকে ঐ অনিয়োজিত বেকার শ্রমিকদের অপমানকর করুণ জীবন-যাত্রা। আর বেকাররা সব সময়েই তাকিয়ে থাকে, কোন সুযোগে নিয়োজিতদের হটিয়ে তাদের স্থান দখল করবে—নিজের শ্রম-অর্জিত জীবিকার সম্মান ভোগ করবে। একই শ্রমজীবীশ্রেণীর একপ্রান্তের কখন-হারাই কখন-হারাই

ভাবলাভ আতঙ্কিত মনোভাবও তার অপর প্রান্তের ভাগ্যবান লোকদের প্রতি ঈর্ষা ও লোলুপতা হ'তে উদ্ভূত মানসিক দুর্বলতা। দুই প্রান্তের এই দুই বিপরীত চাপে শ্রমজীবীশ্রেণীর প্রাণশক্তি ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হয়েছে। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের সময় লেনিন বিশেষভাবে আশা করেছিলেন যে জার্মেনী প্রভৃতি ইওরোপীয় দেশে শ্রমজীবীরা নিশ্চয়ই বিদ্রোহী হবে। কার্যতঃ তিনি এই সম্বন্ধে একেবারে নিঃসন্দেহ ছিলেন এবং এমনও বহুবার বলেছিলেন—যে নভেম্বরে রুশিয়ায় বিপ্লব না হ'লে পশ্চিম ইউরোপের বিদ্রোহোন্মুখ শ্রমজীবীদের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতার অপরাধ বলশেভিকদের উপর বর্তাবে। লেনিন ইহাও বলেছিলেন যে জার্মেনী প্রভৃতি দেশে বিপ্লব না হ'লে —সমগ্র ইউরোপে (রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক হিসাবে যে ভূখণ্ডকে তারা বিশ্ব ব'লে মনে করত) বিপ্লব না হলে রুশের বিপ্লব সম্ভব নয়—কারণ সাম্যবাদী-বিপ্লবের সাফল্য নির্ভর করবে বিশ্বব্যাপকতার উপর। মার্কস-এঙ্গেলসের মত-অনুসারে তখনও তাদের বিশ্বাস ছিল বিশ্ব-বিপ্লবেই সাম্যবাদী বিপ্লবের সাফল্য নিহিত আছে; মাত্র একদেশে সাম্যবাদী বিপ্লবের (Socialist revolution in one Country) সাফল্যে তখনও তাদের বিশ্বাস আসেনি। ইউরোপব্যাপী বিপ্লব ব্যর্থ হবার পর ওই মতের উৎপত্তি।

জার্মেনী প্রভৃতি ইওরোপীয় দেশের শ্রমজীবীরা বিপ্লবে ত' যোগ দিলই না, বরং কিছুদিন পর তারা উল্টা রাস্তাই গ্রহণ করল। তখন জার্মেনীর কৃষকদের মধ্যে রুশ কৃষকদের মতো কোন বিপ্লবীর আগ্রহ ছিল না। কেন ছিল না—সে বিতর্ক এখানে অপ্রাসঙ্গিক। তার কারণ অনেকটা ছিল শ্রমজীবীর চেয়ে কৃষকদের সংখ্যার অল্পতায়, কৃষকদের অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল ও নিয়ন্ত্রিত অর্থ ব্যবস্থায় এবং সমগ্র জার্মেনীর অর্থব্যবস্থায়। আর কতকটা কারণ ছিল জার্মেনীর ইতিহাসে লুথারীয় বিপ্লব, কৃষক বিদ্রোহ, নেপোলিয়ান-উত্তর যুগের জাতীয় ঐক্যসাধনের সংগ্রাম প্রভৃতিতে তাদের বিদ্রোহভাবের সাম্য ও উপসমতা লাভে এবং অবশেষে এর কতকটা কারণ নিহিত ছিল বিগত চার বছরের যুদ্ধের গতি ও তজ্জনিত আর্থিক ও রাজনৈতিক, অবস্থার মধ্যে রুশের থেকে পার্থক্যে। কারণ যাই থাক, কৃষকরা বিদ্রোহোন্মুখী হয় নাই।

অপরদিকে লাইবনেক্ট ও রোজা লুক্সেমবার্গের চেষ্টা সত্ত্বেও শ্রমজীবীরা কিছুই করলে না; নৌ ও স্থলবাহিনী (যারা লেনিনের ভাষায়—সামরিক পোষাক পরিহিত কৃষকের সন্তান) বরং কিছু করেছিল। ইটালী, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, জার্মেনী প্রভৃতি দেশে কম্যুনিষ্টগণ ও বিভিন্ন রকমের সাম্যবাদীরা শ্রমজীবীদের নিয়ে কিছু করবার অনেক চেষ্টা করেছিল—কিন্তু এই সমস্ত শ্রমজীবীদের দ্বারা যে সমস্ত হুজ্জত-হাঙ্গামা, ধর্মঘট প্রভৃতি হয়েছে, তা প্রায় সবই অর্থনৈতিক;—হয় বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য, না হয় জীবনযাত্রার খরচের অনুপাতে তাদের মজুরীর অপর্যাপ্ততা পূরণের জন্য—তারা দাঙ্গা করেছে, ধর্মঘট করেছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে সামান্য কিছু করেছিল জার্মেনীতে স্পার্টাসিষ্ট (Spartaciste) দলের রোজা লুক্সেমবার্গের নেতৃত্বে। লাইবনেক্ট ও লুক্সেম-বার্গের (Luxemberg) ব্যক্তিগত প্রভাবএর মধ্যে অনেকখানি কার্যকরী ছিল।

সর্বত্রই এই চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল; এই ব্যর্থতার মূলে ছিল একদিকে শ্রমজীবীদের সংঘবদ্ধ সুশৃঙ্খল দৃঢ় সংকল্প প্রচেষ্টার অভাব, অপর দিকে কৃষিজীবীদের মধ্যে বিদ্রোহ ভাবের অনস্তিত্ব। বেকার হ'য়ে যন্ত্রণাতী মুষ্টি ভিক্ষার উপর নির্ভর করত বহু শ্রমিক; যারা কাজে নিয়োজিত ছিল, তাদেরও মজুরীর হার বর্দ্ধিত-জীবিকা খরচের অনুপাতে অত্যন্ত কম ছিল। তা নিয়ে ছোটখাট দাঙ্গা, ধর্মঘট প্রভৃতি বহু হয়েছে। কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাদের এই বিক্ষোভ ও উচ্ছ্বাসকে চালিত ও নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হয়নি। এই বিক্ষোভ ও উচ্ছ্বাস এর পরে চালিত ও নিয়ন্ত্রিত হ'ল উল্টা পথে—বিপ্লব-বিরোধী দিকে—ফ্যাসীবাদের প্রতিষ্ঠায়। ইটালীতে কম্যুনিষ্ট-ঘেষা সমাজতান্ত্রিক (Socialist) মন্ত্রিত্বের পর এল মুসোলিনীর ফ্যাসীবাদ। এর জন্ম মিলান সহরে। এটা শহরে আন্দোলন। শহরের বেকার শ্রমিক, বেকার মধ্যবিত্ত যুবক ও বাহিনীচ্যুত (demobilised) ভূতপূর্ব সৈনিকদের মধ্যে যারা শহরে ছিল—তাদের নিয়েই এই আন্দোলনের সুরু। কৃষকগণ বা গ্রাম্যজনতা এই আন্দো-লনের আবর্তে আসে অনেক পরে। হাঙ্গেরীতে স্বল্পকাল-স্থায়ী কম্যুনিষ্ট শাসনের বিরুদ্ধে শ্রমিক সংঘ (trade union) বিদ্রোহ করল; মধ্যবিত্ত শ্রেণীও বিদ্রোহে যোগ দিল।

বেলারুসের শ্রমজীবী তোষণ নীতির ও কৃষিজীবীর প্রতি বিরাগের ফলে কৃষকরাও তার বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহে পরে যোগ দেয়। জার্মেনীতে সমাজতান্ত্রিক (Socialist) শাসন কয় বছর চলল ; কিন্তু ক্রমেই তারা জাতির আস্থা হারাতে লাগল। ১৯৩০ সালের নির্বাচনে নাজী দলের প্রতিনিধির সংখ্যা ১২ হ'তে ১০৭ হ'ল। জার্মেনীতে কৃষিজীবীর চেয়ে শ্রমজীবীর সংখ্যা বেশী। শ্রমক্ষম ব্যক্তির (working population) মধ্যে শতকরা ৩০ ছিল কৃষিজীবী ; শতকরা ৫০ এর মতো ছিল শ্রমজীবী—এর মধ্যে যান বাহনের কাজে (transport) নিয়োজিত লোকের সংখ্যাও ধরা হয়েছে। এই শ্রমজীবীরাও তাদের পোষ্যবর্গ একত্র হ'লে এবং বিপ্লব প্রয়াসী হ'লে ভেইমার শাসন ব্যবস্থার (weimer constitution) নির্বাচনের বলেই তারা সমগ্র রাষ্ট্রকে করায়ত্ত করতে পারত। অথচ—১৯২৪ সালের পর হতে রিখষ্টাগে (Reichstag) কম্যুনিষ্টদের সদস্য সংখ্যা ক্রমেই কমেছে। ১৯২৪ সালের মে মাসের নির্বাচনে—৬৩, ডিসেম্বরের নির্বাচনে—৪৬ ; ২৫ সালের মে—৪৪ এবং ১৯৩০—সেপ্টেম্বর—২৩। ঐ নির্বাচনে নাজীদের সংখ্যা হয়—১০৭ ; পূর্বে তা'দের সংখ্যা ছিল মাত্র—১২। কাজেই জার্মাণ শ্রমজীবীরা ঐ সময় বিপ্লবী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে—এমন কথা বলা যায় না। বরং মিউনিক শহরে নাজীদলের জন্ম ও পরিপোষণে শহুরে জনতার সমর্থন ও অনুমোদন ছিল। এই শহুরে জনতার মধ্যে শ্রমিক ছিল প্রধান ; তা'দের মধ্যে বেকারের সংখ্যা ছিল ৪০ লক্ষ। ইউরোপের সর্বত্রই এই সামাজিক প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর ইউরোপব্যাপী যে বিক্ষোভ দেখা দেয়, তার মধ্যে কৃষিজীবীদের তরফ হ'তে যে একটা বিপ্লব প্রচেষ্টা হয়েছিল, সে সম্বন্ধে একটু উল্লেখ করা দরকার। বুলগেরিয়া-ই—জার্মেনীর মিত্রদের মধ্যে প্রথম পরাজয় স্বীকার ক'রে সন্ধি প্রার্থনা করে। বুলগেরিয়া যখন প্রথম যুদ্ধে যোগদান করে, তখনই কৃষক-নেতা ষ্টাম্বুলিস্কী (Stambulisky) রাজা ফার্ডিনাণ্ডের মুখের উপর তীব্র ভাষায়—জনসাধারণের দারিদ্র্যের ও দুঃখের দোহাই দিয়ে যুদ্ধে যোগদানের বিরুদ্ধে বলেন। ফার্ডিনাণ্ড এতে বিরত হলেন না ; বরং ষ্টাম্বুলিস্কীকে কারাগারে বন্দী করলেন। যুদ্ধাবসানের পর ষ্টাম্বুলিস্কী জেল হ'তে মুক্ত হ'য়ে নূতন রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী হলেন। ইনি "সবুজ সাম্যবাদ" (Green Socialism) প্রচার করতে লাগলেন ;—মস্কোর লাল সাম্যবাদের (Red Socialism) সঙ্গে তাঁর মতের তীব্র বিরোধ ছিল। ষ্টাম্বুলিস্কী কৃষক সন্তান, বুলগেরিয়া কৃষকদের দেশ ; তাই তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন—কৃষকদের সাম্যবাদ—কৃষকদের কর্তৃত্ব—শ্রমজীবীদের সর্বকর্তৃত্ব নয়। তিনি শ্রমকে সামাজিক অধিকারের ভিত্তি ব'লে গ্রহণ করলেন ; প্রত্যেককে গায়-গতরে পরিশ্রম করতে হবে এই ছিল তাঁর নীতি।

তাঁর মতে কৃষকই হ'ল মৌলিক শ্রমিক, সংখ্যায়ও এরাই বেশী ; গণতন্ত্রের দাবীতে, অর্থনীতির দাবীতে এবং সমাজকে নূতন ক'রে গড়বার একমাত্র উপায় হিসাবে—কৃষকদের অবস্থার সর্বাঙ্গীন উন্নতি বিশেষ দরকার ; তাদের হাতে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষমতা ন্যস্ত করা সমীচীন। তিনি মনে করতেন কার্ল মার্কস ও তাঁর অনুগামী সাম্যবাদীরা যে শ্রমজীবী সর্বকর্তৃত্বের দাবী তুলছেন তা অন্যায় ও যুক্তিহীন।

১৯২১ সালে বুলগেরীয় কৃষক সম্মেলনে—ষ্টাম্বুলিস্কীর চেষ্টায় যে প্রস্তাব পাশ করা হয়—তার মধ্যে একটিতে বলা হয়—এই সম্মেলন বিশ্বের কৃষকদের আহ্বান জানাচ্ছে,—তারা সংখ্যায় বেশী, তারা সম্মিলিত হ'য়ে নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠা করুক, সমগ্র রাষ্ট্রে ক্ষমতা নিজেরা আহরণ করুক। জার্মেনীর আন্তর্জাতিক সংঘের পাল্টা তারা এক আন্তর্জাতিক কৃষক-সংঘ স্থাপনের সঙ্কল্প ক'রল। এই সংঘ সমস্ত মনুষ্য জাতিকে নূতন ক'রে গড়বে। ষ্টাম্বুলিস্কী এই সবুজ সাম্যবাদের আদর্শে আইন প্রণয়নের চেষ্টা করলেন—যে প্রত্যেককে কায়িক পরিশ্রম করতে হবে। কিন্তু বিজেতা জাতিসমূহ এই আইন পাশ করতে দিল না। অগত্যা আইন হ'ল—বছরে অন্তত দশদিন প্রত্যেককে কায়িক পরিশ্রম ক'রতে হ'বে। কিন্তু এই শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নানা দিক হ'তেই বাধা আসতে লাগল। বলকানের অন্য সব রাজ্য—যারা ঐ যুদ্ধে বিজয়ীর দলে থেকে বুলগেরিয়ার অনেক অংশ কেড়ে নিয়েছে—তারা সবাই ষ্টাম্বুলিস্কীর এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ছিল,—তাদের ইঙ্গিতে ইংরাজ ও ফরাসী-ও

অনুকূল ছিল না। কায়িক পরিশ্রমের বাধ্যতামূলক আইনে এরাই বাধা দেয়। দেশের মধ্যেও সুবিধা-ভোগী, পর-শ্রম-উপজীবী শ্রেণী—এর বিরুদ্ধে গেল এবং তারা সহজেই পার্শ্ববর্তী রুমানিয়া, গ্রীস ও যুগোস্লোভিয়ার কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছিল। ১৯২৩ সালে ষ্টাম্বুলিস্কীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে এই পর-শ্রম-উপজীবী অভিজাতরা এক সামরিক রাষ্ট্র-দ্রোহ সংগঠন করে। ষ্টাম্বুলিস্কী উপস্থিত ছিলেন না; অপর সব মন্ত্রীরা ঐ অভিজাত সমর-পতিদের হাতে বন্দী হলেন। ষ্টাম্বুলিস্কী ফিরে এসে ৪।৫ দিনের মধ্যে সৈন্যদের হাতে নিহত হন।

এই যুদ্ধের পর, আবার বুলগেরিয়া ও বল্কানে ষ্টাম্বুলিস্কীর স্মৃতি ও তাঁর সবুজ সাধারণের কথা লোকের মনে জাগছিল। বল্কান-মৈত্রী-সংঘ গঠনের প্রস্তাবে ষ্টাম্বুলিস্কীর অসমাপ্ত কাজের সূত্র টেনে আনার কথাও উঠছিল। ঘটনার চাপে এই নূতন গতি কতদূর এগুতে পারবে জানি না।

জাহানারার আত্মকাহিনী

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্ত্রী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

চব্বিশ দিন পরে বন্দীগণ দিল্লীতে উপস্থিত হ'লেন। সমস্ত পথ তারা বহু সশস্ত্রপ্রহরী দ্বারা পরিবৃত হ'য়ে এসেছিল। দারার পার্শ্বে ও পশ্চাতে প্রত্যেক বর্ম-পরিহিত কয়েকটী অশ্বারোহী বাহিনী প্রহরী নিযুক্ত হয়েছিল। এইবার আমার জীবন কাহিনী আরম্ভের দিনে এসেছে।

একটী ছিন্ন হাওদায় হস্তীপৃষ্ঠে শাহজাদা বুলন্দ, একবাসে দারা-শুকো। মানুষের করুণ দৃষ্টির সম্মুখে দিল্লীর রাজপথে একদা বিশ্রুত শক্তিমান দারা-শুকো এই অসম্মানাহত অবস্থায় চলেছে। একজন ধর্মিক চীৎকার ক'রে উঠল, "দারা যখন তুমি স্বাধীন ছিলে, তুমি প্রত্যহ আমাকে ভিক্ষা দিয়েছ, আজ তোমার দেওয়ার মত কিছু নেই জানি, তবুও" সম্রাটপুত্র তাঁর ছিন্ন পরিচ্ছদের শাল ধর্মিককে দান ক'রলেন। ইহলোকে তার শেষ দানে অর্পণ করার লোভ সম্বরণ ক'রতে তিনি পারেন নি।

দারার বিচার শেষ হ'ল। "মূর্তিপূজক, ইস্লামের শত্রু এই অপরাধে তার শিরশ্ছেদ করা হবে। ঔরঙ্গজেবের ধর্ম-বিশ্বাস তাকে ভীত ক'রেছিল। ঘাতকের আঘাতের পূর্বে দারা চীৎকার ক'রে ব'লেছিল, "বহুদিন আমার প্রাণ হরণ করেছে, ঈশ্বরের পুত্র আমাকে জীবন দান ক'রেছে"। (১)

মানুষ যত, ঈশ্বরের পথ তত। দারা বহু পথে ঈশ্বর লাভের চেষ্টা ক'রেছিলেন কিন্তু ঈশ্বর লাভ ক'রেছেন কি? মৃত্যুর মুহূর্তে তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছিল—জগতের সনাতন বিষয় কোন মানুষ অতিক্রম ক'রে যেতে পারে না। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে এমন একটী বন্ধন আছে, যা কোন ভাষা পূর্ণ প্রকাশ ক'রতে পারে না।

যে আমার রাজত্রাতা, পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত ঈশ্বর তোমার করুণা বর্ষণ করুন।

দারার শিরশ্ছেদ করা হ'য়েছে। কিন্তু তাঁর দুই স্ত্রী ও পুত্রগণ তখনও জীবিত।

আওরঙ্গজেব উদীপুরী বেগমকে সাক্ষাতের জন্য আমন্ত্রণ ক'রলেন। সে ছিল জর্জিয়া দেশের খৃষ্টান কন্যা। উদীপুরী আওরঙ্গজেবের আদেশ পালন ক'রলেন। আওরঙ্গজেব তাঁকে বিবাহ ক'রলেন। কিন্তু রাণা দিল নীচজাতীয়া নর্তকী, প্রত্যুত্তরে আওরঙ্গজেবকে জিজ্ঞাসা ক'রল, জাহাপনা কেন আমাকে সাক্ষাতের জন্য ডেকেছেন? সম্রাট উত্তরে লিখলেন যে, তিনি রাণা দিলকে বিবাহ ক'রতে চান। রাণা দিল্ লিখল—"আমার মধ্যে এমন কি আছে যা সম্রাটকে সন্তুষ্ট ক'রতে পারে?" সম্রাট উত্তর দিলেন, "তোমার ঘন কৃষ্ণ কেশদাম আমাকে মুগ্ধ ক'রেছে।" তৎক্ষণাৎ রাণা দিল্ তার কুন্তল দাম কর্তন ক'রে আওরঙ্গজেবের নিকট প্রেরণ ক'রে পত্র লিখল—"জাঁহাপনা এই সেই সুন্দর কেশদাম, যা আপনি পেতে চেয়েছিলেন। আমি শান্তিতে জীবন যাপন ক'রতে চাই।"

আবার আওরঙ্গজেব লিখলেন, "আমি তোমাকে বিবাহ ক'রতে চাই। কারণ তোমার রূপ অতুলনীয়। আমি তোমাকে আমার অন্যতম সাম্রাজ্ঞী ব'লেই মনে ক'রব। তুমি আমাকে শাহজাদা-দারা ব'লেই কল্পনা কর…"

রাণা দিল্ একখানি ছুরিকাঘাতে তার সুন্দর মুখ ক্ষত বিক্ষত করে দিল। তারপর একখণ্ড বস্ত্র রক্ত-লিপ্ত ক'রে আওরঙ্গজেবের নিকট পাঠিয়ে দিল। সঙ্গে একখানি পত্রে সে লিখল, "সম্রাট যদি আমার

---

(১) মহম্মদ মরা জান্ মি ফুরমদ ইকন্ আল্লাহ্, মরা জান্ মি বকুশাদ।

সৌন্দর্য্য আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন তবে সে সৌন্দর্য্য আর নেই। যদি সম্রাট আমার রক্ত আকাঙ্ক্ষা করেন, তবে আমি আমার সমস্ত রক্তপাত করতে প্রস্তুত আছি।"

আওরঙ্গজেব রাণা বিলের দৃঢ়চিত্ততার সম্মুখে পরাজয় স্বীকার করলেন। কিছুকাল লোকান্তরে জীবন যাপন করে রাণা দিল্ মৃত্যুর অপর পারে তার দেবতার সঙ্গে মিলিত হ'ল। কারণ রাণা দিল্ ছিল ভারতবর্ষের দুহিতা হিন্দু কন্যা।

রাজার কন্যা রূপসী জানি-বেগমকে আমার ভগ্নী রোশেন্-আরার নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল। রোশেন-আরা রাজার মৃত্যুর পর এক বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করেছিল। রোশেন-আরা এই পিতৃমাতৃহীন বালিকার প্রতি অত্যন্ত সুন্দর ব্যবহার করেছিলেন। জানি-বেগম প্রতিদিন ঈর্ষা হ'য়ে যাচ্ছিল। তারপর একদা সম্রাট আওরঙ্গজেব তাকে আগ্রার দুর্গে আমাদের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। সেদিন ছিল আমার এক আনন্দের দিন। সেদিন আঙ্গুরীবাগের উচ্ছ্বসিত ঝর্ণা আমার অতীত আনন্দের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। বিষণ্ণকুল বহুদিন বিস্মৃত সুর জাগিয়ে তুলেছিল। যতদিন পর্য্যন্ত মোগল রাজবংশের অন্যান্য ভ্রাতাদের একটী বংশধরও জীবিত থাকবে ততদিন আওরঙ্গজেবের স্বস্তি নাই। দুই বৎসরের মধ্যে সমস্ত মোগল বংশধর বন্দী হ'ল এবং গোয়ালিয়র দুর্গে তাদের হত্যা করা হ'ল। এই গোয়ালিয়র দুর্গে আওরঙ্গজেবের পুত্র সুলতান মহম্মদকেও "পশীর" সরবৎ পান করান হ'য়েছিল। কোরাণের নির্দ্দেশ—কোন মানুষকেই বিনা দোষে শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। ঘোষণা করা হ'ল মুরাদ একদা এক নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে হত্যা ক'রেছিলেন। অভিযোগকারী উপস্থিত হ'ল। মুরাদ হত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। মুরাদের দোষ অনুসন্ধান করা ও প্রমাণ করা যে আওরঙ্গজেবের প্রয়োজন ছিল।

পর্ব্বতে, বনে, প্রান্তরে বহু কষ্ট ভোগের পরে সুলেমান শুকো বিশ্বাসঘাতক কর্ত্তৃক প্রতারিত হ'য়ে আওরঙ্গজেবের সম্মুখে আনীত হ'লেন। এই বন্দীত্ব দুর্ভাগ্য তরুণ যোদ্ধা যখন পিতৃব্যব্যের সম্মুখে উপস্থিত হ'লেন তখন রাজদরবারে একটা অস্ফুট আলোড়ন সৃষ্টি হ'য়েছিল এবং অন্তঃপুরে অবগুণ্ঠনের মধ্যে বহু অশ্রুপাত হ'য়েছিল। সুলেমান এবং সম্রাটের একই রক্ত। তাকে কি হত্যা করার পূর্ব্বে পশীর সরবৎ পানের অপমান থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া যেত না?

এই বীরপুরুষ প্রার্থনা করেছিলেন, "চাচা! আমাকে পশীর সরবৎ পান করতে দিও না, তোমার কাছে এইটুকু অনুগ্রহ প্রার্থনা করি।" আওরঙ্গজেব কোরাণ স্পর্শ করে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—তোমাকে পশীর বিষ দেব না। কিন্তু প্রথম দিনেই গোয়ালিয়র দুর্গে সুলেমানকে পান পাত্রে সেই বিষাক্ত সরবৎ দেওয়া হয়েছিল। একমাস পরে তাকে হত্যা করা হয়।

কে যেন আগ্রার উপর দিয়ে তীব্র উষ্ণ বায়ু সহ-আস্ফালন বজ্রের হুঙ্কার বিছিয়ে দিয়েছে। আমি কাশ্মীর পরিদর্শনের জন্য কতবার আকাঙ্ক্ষা করেছি। সেখানে যেসকল বৃক্ষ কলের রক্ষীর মত পর্ব্বত শিখরে দণ্ডায়মান। হরিয়াভ রক্তমুখী ওপেস বর্ণের বন-পুষ্পরাশি সমস্ত মনে ছড়িয়ে রয়েছে। সে বন কখনও মানুষের রক্ত সম্পর্কে কলঙ্কিত হয়নি। আমি যদি সেখানে তাজোলেট ও গোলাপ-বীথি অতিক্রম ক'রে পদ্মবাকীর্ণ বৃক্ষরাজির মধ্য দিয়ে একটি সরোবর তীর স্পর্শ ক'রে পর্ব্বত হ'তে পর্ব্বতান্তরে ভ্রমণ ক'রতে পারতাম। পর্ব্বত যেন কোন বিরাট রহস্যকে গোপন করবার জন্য আকাশের প্রজ্ঞাপটে এক বিরাট অর্গল রচনা করেছে। একটি মৃদুমন্দ বায়ু শুভ্র তুষারের দেশ থেকে ভেসে এসে পর্ব্বতের উপরে চিন্তার আবরণ উন্মুক্ত ক'রে দিয়ে এক নিরবচ্ছিন্ন আকাঙ্ক্ষার বেগে আমাকে নিয়ে যাবে।

আমার বিনিদ্র রজনীতে আমি কতবার আগ্রার অন্তঃপুরের মধ্যে ফতেপুর শিক্রিতে বেড়িয়ে এসেছি। আজ ফতেপুর শিক্রি সকলের দেশ পরিত্যক্ত—কিন্তু আমার স্মৃতিতে জড়িয়ে রয়েছে ফতেপুর শিক্রির গৌরবময় অংশগুলি। সম্রাট আকবরের নগর ফতেপুর শিক্রি আর কখনও তৈমুর বংশের অধিকারে উন্নতির সুযোগ পাবে না! বংশের দেবতা শিব কখনও পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর স্কন্ধে আসন পরিগ্রহ করেন না। বোধহয় এমন একদিন আসবে যখন ভারতমাতার সন্তান হিন্দীর সিংহাসনে আরোহণ করবে এবং সেই নরপতি মসজিদের দ্বারে আপনার অশ্বখুর ত্যাগ করে মন্দিরে প্রবেশ করবে। সেই মহা-মন্দিরে উপলব্ধি করবেন.....একমেবাদ্বিতীয়ম্"

৪র্থ স্তবক

[পাণ্ডুলিপির অংশগুলি ছিন্ন ভিন্ন অসংলগ্ন, কোথায় যা সাধারণ ঘটনার ইঙ্গিত মাত্র। পত্রগুলি পাণ্ডুলিপির সঙ্গে একত্র গ্রথিত ছিল না। মধ্যে অনেকগুলি পাতা নাই। বোধহয় জাহানারা তাঁর জীবন কাহিনী গদ্য করে লিখা করেছিলেন—এবং কিছুটা লিখেও করেছিলেন, পরে হয়ত মত পরিবর্ত্তন করেন এবং অসংলগ্ন পত্রগুলি পাণ্ডুলিপির পার্শ্বে রেখে দেন।]

আমার যদি ঘৃণা করার শক্তি থাকত তবে সে ঘৃণা আওরঙ্গজেবের প্রাণহরণ করা পর্য্যন্ত শেষ হত না—যেদিন তিনি অন্যের প্রাণ হরণ করেছিলেন! ওঃ, তিনি যে তার পিতার প্রাণ হরণ করতে চেয়েছিলেন।

একদা সম্রাট জাহাঙ্গীর নাসীরউদ্দিন খসেরার কবরে পদাঘাত ক'রেছিলেন এবং আদেশ দিয়েছিলেন, "পরলোকে ও এই পিতৃহন্তার শরদেহের যা কিছু অবশিষ্ট আছে সমস্ত দহন কর এবং নদীর জলে নিক্ষেপ কর।" যে মানুষ প্রতিহিংসার প্রেরণায় উদ্দীপ্ত, তার জীবন বিকৃত। হে ভগবান, তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রতে শিখিয়ে দাও।

সব নিঃশেষ হ'য়ে গেছে; আলো নিভে গেছে; ভোরের উৎসব শেষ হ'য়ে গেছে। সবাই চলে গেছে; আমি একাকিনী চ'লেছি; সঙ্গী আমার নেই, আমি যে রিক্ত।

আমার বাহিরে শূন্য, আমার অন্তরেও বিরাট শূন্যতা। এই সমস্ত

জগতে পুতুল ভিন্ন আর কি আছে? আমার মনে পড়ে আমার স্নেহময়ের শৈশবে পুতুল-খেলা নিয়ে খেলা ক'রতেন। একদিন একটা "হুবাবের ঝড়ে" আমাদের ছাদের পুতুলগুলি ভূপতিত হয়ে গেল, কিন্তু অনেকটা পুতুল সৈন্য তখনও দাঁড়িয়েছিল। কেউ প'ড়ে গেল, কেউ দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? সে যে পুতুল খেলা!

আমাদের মধ্যে যারা প'ড়ে গেছে আর যারা দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? এ সব কি ভগবানের হাতের পুতুল খেলা নয়?

আমার জীবন—একটা ভগ্ন মুকুট। কিন্তু এর প্রতিটি অংশ পরিপূর্ণ।

..... আনন্দ, প্রাচীর গাত্রে প্রতিফলিত অস্ত সূর্য্যের রশ্মি মাত্র! নয় কি?

প্রত্যেক মসজিদই একটী কারাগার, প্রত্যেক রাজপ্রাসাদ একটী কারাগৃহ। যারা ঈশ্বরের পথে চ'লে বেড়ায়—তারাই পৃথিবী জয় করে।

আমার জীবন বর্ষা-বাতাস-বিমুক্ত একটী বৃক্ষপত্র মাত্র, অবশিষ্ট রয়েছে বয়েকটী তন্তু। আজও সূর্য্যের লালিমায় সেই তন্তুর মধ্য দিয়ে আলো স্ফুরিত করতে পারে?

সম্রাট আলমগীর পঞ্চপুত্রের পিতা। আওরঙ্গজেব তার পুত্র ভ্রাতাদের মধ্যে দুলতান মহম্মদ ইতিমধ্যেই কারারুদ্ধ। যে মানুষ একদা মুক্তির সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে আল্লার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, যে মানুষ মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়েও ধর্ম্মপথ থেকে অবতরণ করেন নি—আজ তার নিজেরও শাস্তির ভয়ে ঐতিহাসের মত অবনমিত হয়ে প'ড়েছে।

একদিন আমি মীরাবাইএর উদ্দেশ্যে রচিত তানসেনের একটী গান শুনে ফেলে ছিলাম। কোথেকে আমুরাবাগ থেকে এক গুচ্ছ গোলাপ ফুল আমার উপহার দিয়েছিল, সেদিন ছিল আমার শাস্তির মুহূর্ত। হকীম এসে আমাকে সংবাদ দিল যে যুবরাজ দারাশিকোর পুত্র রাও ভাওকে মার্জ্জনা করা হয়েছে। মৃত পিতার প্রতি শ্রদ্ধা-প্রণোদিত হয়ে আওরঙ্গজেব রাও ভাওকে বহু শাস্তি দিয়েছিলেন। আজ পুণ্যকীর্ত্তি রাও ভাও আওরঙ্গবাদের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হয়েছেন। আমি কখনও সে কথা ভুলব না! আমি ভুলতে পারব না এই অপমান।

আওরঙ্গজেব একদা ভালবেসেছিলেন। আমি সেকথা জানি। একদা জৈনাবাদীর মৃত্যুতে আওরঙ্গজেব অশ্রু বিসর্জ্জন করেছিলেন। জৈনাবাদী প্রেমের খেলা ক'রে সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে ঔরঙ্গজেবের হৃদয়ের গুপ্ততম কক্ষে প্রবেশ করেছিলেন। জৈনাবাদী প্রেমের জন্য আওরঙ্গজেবের পার্থিবত্যাগের কথা পরীক্ষার জন্য তাঁকে মদ্যপান পর্য্যন্ত করিয়েছিল। জৈনাবাদীর প্রেমে আওরঙ্গজেব অন্ততঃ কয়েকটী মুহূর্ত্তের জন্য বিষয়গৎ ভুলে যেতে পারেন, আমি জৈনাবাদীকে চিরকাল স্মরণ ক'রব।

পিতা অসুস্থ—একদিন পিতার মৃত্যু হবে। কিন্তু আমি আমার হস্তীগুলি এখনও দান ক'রতে পারছি না। আমি আমার ক্রীতদাসদের মুক্তি দিতে পারছি না; কারণ তারা হয়ত সম্রাটকে রোগমুক্ত করতে পারে, তা আমি হ'তে দিতে পারি না। এখনে আমি মৃত্যুকে আমার মুক্তিদাতা ব'লে স্মরণ করি।

আমার স্নেহময় ভ্রাতা আওরঙ্গজেব প্রায়ই পিতার কাছে পত্র লিখতেন। তাঁর ইচ্ছা নয় যে প্রজাবর্গ তাঁকে কঠোরচিত্ত ব'লে আখ্যায়িত করে। বৃদ্ধ সম্রাট অনেক কিছুই ভুলতে পেরেছেন, কিন্তু তিনি কখনই আওরঙ্গজেবকে ক্ষমা ক'রতে পারেন নি। কারণ, যাদের রক্তাক্ত ছিন্নমুণ্ড একদা তাঁর কাছে প্রেরিত হ'য়েছিল, তা' তিনি বিস্মৃত হ'তে পারেন নি। তারপর সেই মৃত পুত্রের বিপরীত দিকে তাজমহলে প্রোথিত করা হ'য়েছে—সেই তিক্ত স্মৃতি আজও শাহজাহান ভুলতে পারেননি। আওরঙ্গজেবের বহু অনুরোধ সত্ত্বেও সম্রাট তাঁকে মুকুটমণির সন্ধান দেননি।

এখন আমার মনে আসছে একদিন ফতেপুর শিক্রিতে ভারতের বুকে তৈমুর সম্রাজ্ঞের রক্ত-পদচিহ্ন রেখার বিষয় চিন্তা ক'রেছিলাম। সেই পদচিহ্ন তারপর থেকে আরও কত বেশী রক্তাক্ত হ'য়ে উঠেছে।

বহু শতাব্দী পূর্ব্বে মহম্মদ তুঘ্‌লক্ দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। তিনি তাঁর বৃথাস কার্য্যের দ্বারা প্রজার হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার ক'রেছিলেন। শেষ বিচারের দিনে, মহম্মদ তুঘ্‌লকের দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্তের কথা ভেবে ফিরোজ শাহ তুঘ্‌লক্ মহম্মদ তুঘ্‌লকের নির্য্যাতিত শত্রুদের প্রতি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার ক'রেছিলেন এবং তাদের দ্বারা একটী মার্জ্জনা পত্র লিখিয়েছিলেন। সেই পত্র তিনি মক্কায় মহম্মদের সমাধি মন্দিরের পদতলের পার্শ্বে শেষ বিচারের দিনে আত্মরক্ষার জন্য রেখে দিয়েছিলেন। পত্রখানি এখনও সেখানে রক্ষিত আছে।

আমি যদি কখনও কারামুক্ত হই এবং আওরঙ্গজেব যদি কখনও আমার উপদেশ চান, তাহ'লে আমি তাকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে উপদেশ দেব। তার নির্য্যাতিত শত্রুর মধ্যে অনেকেই আমার নিকটতম ও প্রিয়তম আত্মীয় ছিল। আমি তাকে ব'লব, "রাজ্যলাভের আশায় আর রক্তপাত করো না। মানবের দুর্গ মনে ক'রে হিন্দুর মন্দির ধ্বংস ক'রো না। বিজয়ী ইসলাম পূর্ণ হ'য়ে উঠুক জ্ঞানের আলোকে। ধ্বংসের মধ্য দিয়ে ইসলামের বিজয় পতাকা পরিচালিত ক'রো না।"

আমি তাকে আরও একটী জিনিষ দান করতাম, সেই জিনিষের শক্তি তাকে বিজীবিকার রাজ্য অতিক্রম করবার শক্তি দিত। যদি এই সম্রাটের চিত্তবৃত্তি অন্য প্রকার হ'ত, তবে এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অধ্যবসায়ী রাজকুমার কি না হতে পারত? আমি তার অন্তরে দেখতে পাচ্ছি শুভ্র সন্ধ্যার অস্পষ্ট ছায়া, নীরব গভীর অনুতাপের ক্ষীণ আলোক রেখা এবং সেই ক্ষীণ আলোকের উপর নির্ভর ক'রে তার হৃদয়ে ভগ্নী-প্রীতি সঞ্চারিত করব।

আমার পিতার মৃত্যু হ'য়েছে। একটী আলোকশিখা পৃথিবী থেকে খসে পড়েছে, সেই আলোকশিখা অমৃত লোকে আবার জ্বলে উঠবে। তার দেহ নিয়ে গেছে সেই স্বেতমর্ম্মর প্রাসাদে যেখানে আমার মাতা তাঁর জন্য অপেক্ষা ক'রছেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাঁদের সমাধিতে দুজনের জন্য আলো জ্বলে উঠবে, দুজনের জন্যই কোরাণ আবৃত্তি করা হবে।

• • • •

আমি আমার আত্মজীবনীর শেষ কয়েকটী ছত্র লিখে যাচ্ছি। এই আত্মজীবনী আমার রুদ্ধকারার দিনগুলির সখা। আমি আজ সম্রাট বাবরের কথাগুলি স্মরণ করছি,—"আমার আপন আমার মত বিশ্বস্ত কোন বন্ধু আমি পাইনি। আমার নিজ অন্তর ব্যতীত আমি কোন নির্ভরযোগ্য স্থান পাইনি।" বোধহয় কোন একদিন—যখন জেনুদ্দিন প্রাসাদ ধ্বংস হ'য়ে যাবে, তখন আমার এই আত্মজীবনী পাথরের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে মানবের অক্ষিগোচর হবে।

তাজমহল গমনের পথে আওরঙ্গজেব যে মসজিদে প্রার্থনা করেছিলেন তাকে আমি মূল্যবান স্বর্ণের ও রত্নখচিত দিয়ে শোভিত করেছি। আমি সেই দুর্গে আওরঙ্গজেবের সঙ্গে সাক্ষাত করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। আমি সঙ্গে নিয়ে যাব তার জন্য একটী স্বর্ণ পাত্র, মণি মুক্তায় পূর্ণ, সে তার বহুদিন বাঞ্ছিত ধন—আরও সঙ্গে নেব ক্ষমা—যে ক্ষমা সে বহুবার পিতার নিকট যাচ্ঞা করেছিল কিন্তু পিতা তাকে সে ক্ষমা ভিক্ষা দেননি। আমি পিতার হয়ে তাঁকে ক্ষমা করব। আমি তাঁর কাছে একখানি পত্র লিখেছি। সে পত্রে আমার মুমূর্ষু পিতার পুত্রের নিকট শেষ ইচ্ছার কথা আমার ভাষায় আমি লিখেছি।

আমি ভাসোলেট পুষ্পের নির্য্যাস দিয়ে আমার কেশদাম সিক্ত করে নেব। আমার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যুথির স্নেহ দিয়ে অনুলেপন করে নেব। তারপর আমি একখণ্ড শুভ্র শাড়ী পরিধান ক'রে আমার ভ্রাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। সে হবে ভ্রাতা-ভগ্নীর পুণ্যমিলনের পূর্ণাদিবস। পোয়ালির দুর্গে আমার পিতার বংশধরদের মস্তিষ্কের শক্তি বিলোপ করবার জন্য পানপাত্রে বিষ মিশ্রিত করা হ'য়েছিল। আমি কিন্তু অন্য একটী পানপাত্র নেব। সে পানপাত্রে থাকবে ঘৃণা ও বাসনা বিনষ্ট করবার অমৃত ধারা, সে পানপাত্র থেকে যে ধারা নিঃসৃত হবে তার নাম হবে "দুঃখ"। আমার দিক থেকে আমার ভ্রাতা আওরঙ্গজেবের আর ভয়ের কোন হেতু নেই।

আমি আমার ভ্রাতার প্রদত্ত কোন বিষপানে আমাকে হত্যা করব না, অথবা আমি বিষপানে আত্মহত্যা করব না। আমার চারিপার্শ্বে নীরবতার রাজ্য রচিত হবে। শান্তিকামীদের আমি বিতরণ করব শান্তি, যে শান্তি তারা আকাঙ্ক্ষা করে সমাধি পার্শ্বে। সে সমাধিতে আজও বর্ষার সৌরভের পার্শ্বে গোলাপ পদ্ম ছড়িয়ে পড়েছে।

শারমোথেসের তারতের লালসা বেলতার অন্ধকূপে মদীয় জলস্রোতে জীবন প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়—আমিও দিবাশক্তি স্রোতে কালের মরীচে জ্বালিয়ে রেখে আমার অন্তরের আলোক শিখা।

• • • •

আমি জানিয়াছ করেছি, সমস্ত জাগতিক জ্ঞান ব্যর্থ হয়ে গেলেও এই বিশ্বে যে একটী করুণার উৎস রয়েছে—যে উৎস কখনো নিঃশেষ হয় না। এখানে রয়েছে একটী প্রেমের উৎস—যা' সমস্ত বিশ্বে প্রাণ সঞ্চার করে, বিশ্বের সমস্ত রহস্যের উৎস সেই প্রেমধারা। একজন মানুষের জীবনের ধারা পরিবর্ত্তনের তুলনায় একটী পর্ব্বত উৎপাটন অতি তুচ্ছ ব্যাপার।

আর পাঠ উদ্ধার করা যায় নি।

সমাপ্ত

বন্ধন

শান্তশীল দাশ

বারে বারে মনে হয় এ পৃথিবী বড় অকরুণ,
দয়া মায়া মমতার স্থান নাই অন্তরে তার ;
মানুষ ধরায় এসে পায় শুধু দুঃখ যাতনা,
সারাটি জীবন ভরে আঁখিজল ফেলে বেদনায়।
আকাশে বাতাসে ভাসে বিষাদের মূক হাহাকার,
দিকে দিকে শোনা যায় হতাশার কাতর বিলাপ ;
আশাহত জীবনের দিনগুলি ধূসর বরণ ;
এর মধ্যে বেঁচে থাকা, নিয়তির ক্রূর পরিহাস।

তবু এ পৃথিবী ছেড়ে যেতে কারো নাহি চায় মন,
যতই আঘাত আসে, তত জাগে জীবনের নেশা,
প্রাণপণে ধরে থাকে ; দুঃসহ বেদনার মাঝে
জানি না কী খুঁজে পায়, তবু সয় দুঃখ অনিবার।
সকল বাসনা যায় আঘাতে আঘাতে হয় লীন,
পুরে নাকো কোন আশা নির্ম্মম পৃথিবীর বুকে,
কেন তবু এ ধরণী ছেড়ে যেতে ব্যথা বাজে প্রাণে :
বুঝি, পৃথিবীর সাথে কোথা যেন বাঁধা আছে মন।

রোগের ভয়

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

(১)

ডাঃ ললিত সেন বন্ধুত্বের দাবীতেই উকীল নরেন মণ্ডলকে বল্লে—নক্ষ সর্ষম অত্যন্ত-গর্হিতম্। অত চা খেয়োনা, হজম হবে না।

চিকিৎসকের এমন উপদেশ পাল্টা জবাবের অবকাশ হ'তে পারে না। কিন্তু নরেন চিকিৎসা ও দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে মাত্র একজনেরই নির্দ্দেশ মান্‌তো, যার উপদেশ দেবার অধিকারের দুটো কারণ ছিল। সে নির্দ্দেশক ও উপদেষ্টা তার স্ত্রী শ্রীমতী সুষমা রাণী। শ্রীমতী বড় ডাক্তারের আদরের কন্যা এবং ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্বের জোরে নরেন্দ্রের অবশ্য সম্ভ্রম সমাদর লাভ করেছিল। সুষমা স্বয়ং প্রত্যহ সকালে সন্ধ্যা নিজের পছ হাতে স্বামীকে চা পান কর্ত্তে দিত। চা এবং শিরদাঁড়ের অহি-নকুল সম্পর্ক হ'লে সে কথা ব্যক্ত হ'ত তারই শ্রীমুখ হ'তে। আর যখন এ মন্তব্য প্রকট হ'ল তখনও তারের পেয় চা পাঠিয়েছেন শ্রীমতী সুষমা নতুন সুদৃশ্য চীনামাটির আধারে। তাই নরেন বন্ধু ললিতের চা-বিরোধ মন্তব্য পেশাদারী মন্তব্য ব'লে গ্রহণ করতে কুণ্ঠাবোধ করলে না।

সে বল্লে—ললিত পদ্ম-লোচন নাম রাখলে কানা ছেলে দেখতে পায় না। তুমি ধন্বন্তরী বাটা খেলেও ভিষক-ভাগ্য ললিত বাঁড়ুজ্যে হবে না। যদিও তোমার নাম ললিত।

ডাক্তার বল্লে—তুমি নরেন বোস্ হ'তে পারবে আমাদের সেইটাই ভাবী গৌরবের পূর্ব্বছায়া। আর উনি ভিষক-ভীষ্ম নন—দ্রোণাচার্য্য, যাঁর হাতের অস্ত্র কথা কয়।

এ মুখ-তোড় জবাবের পর আর ঝগড়া চলে না। বিশেষ যখন মহেন্দ্র ব'ল্লে—শোধবোধ।

কিছুক্ষণ ফুটবল, ট্রাম-পোড়া এবং কণ্ট্রোলের চালের গল্পের পর ডাক্তার আবার এক দফা লড়ায়ের মাদল বাজালে।

ডাঃ ললিত সেন বল্লে—স্টুপিড নরেন ডাক্তারের মেয়ে বিয়ে করেছিস ব'লে আজ মেম-সাহেবের চাউনির মত তেজচুক্‌চুকে—যদিও কণ্ট্রোলের চালে লোকের পেট ভরে না।

তর্ক হল নরেন মণ্ডলের জীবন-সংগ্রামের গুলিবারুদ। প্রত্যেক ব্যবহারজীবী মনে করে তার বচনাধুধ এটম্-বম্ব হ'য়ে তাকে অন্তিমে বিজেতার আসন দেবে। সুষমার সুখ্যাতি নরেন্দ্রের মুখ-রোচক। কিন্তু এক্ষেত্রে যখন মহেন্দ্র হেসেছে তখন এ কথার প্রতিবাদ আবশ্যক।

সে এদিক ওদিক তাকিয়ে বল্লে—ব্রাদার-সকল গোলাপে কাঁটা আছে। বেশী মধু খেলে গলা জ্বলে।

এ মন্তব্যর পর মুখ-বিবাদ অনন্তর। বিশেষ তারা যখন শিশুকাল হ'তে চিরকাল অভিন্ন-হৃদয়। তারা স্কুলে প্রশ্নের উত্তর বলা-বলি করেছে। ট্রামে কতবার টিকিট না কিনে সোয়ারী হয়েছে, আর তিনজনে একমত হ'য়ে পর-নিন্দা করেছে এবং কলেজের নিরপরাধ শান্ত শিষ্ট ছাত্রের জীবন অতিষ্ঠ করেছে।

মহেন্দ্র বল্লে—সে কি বন্ধু! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা! তোমার সোনার সংসারে কাঁটা তো দূরের কথা—আরশোলা, ইঁদুর থাকতে পারে, এ চিন্তা অসহনীয়।

আজ দীর্ঘ এক বৎসর পরে তারা মিলেছে। ললিত চিকিৎসা করে মুর্শীদাবাদ জেলার ইশলামপুরে। মহেন্দ্র বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। নরেন্দ্র এবং সুষমা মণ্ডলের সংসারে যেন মা লক্ষ্মী স্বয়ং বিরাজিতা। চকচকে তকতকে ঘর, বাছা বাছা সরঞ্জাম, নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট ভোজ্য তিনবন্ধু একত্রে উপভোগ করবে দু ঘণ্টা পরে। তাদের নিজেদের পল্লীগ্রামে বাস, হাওয়া আছে, গাছ আছে, সম্মান আছে, কিন্তু মাত্র কষ্ট অন্নবস্ত্রের।

বন্ধুত্রয় অবগত ছিল যে সে সময় নরেন্দ্রের প্রেমময়ী স্ত্রী তিন তলায় রান্নাঘরে পাকশালা পরিদর্শনে প্রবৃত্ত। তবু মানুষের মন না মতি—বিশেষ মহিলার মন। এক বার নিচে এসেওতো পড়তে পারেন শ্রীমতী। নরেন উঠে ঘুরে তদন্ত ক'রে এল, অপ্রিয় কথা ব্যক্ত করবার পূর্ব্বাহ্নে।

তারপর অতি মৃদু-স্বরে বল্লে,—সুষমর সব ভালো। কিন্তু ডাক্তারের মেয়ে কিনা—দুর্দ্দান্ত রোগের ভয়।

মহেন্দ্র বল্লে—রোগের ভয় কার বা নেই। যুঃ!

সত্য কথা এই যে গৌর-চন্দ্রিকার অনুপাতে গাওনা জমলোনা। সমাচারের অনুপাতে তার বাঁধনীর আধিক্যতা হাস্যাস্পদ। তাই ডাঃ ললিত বল্লে—রোগের ভয় আছে বলেই তোমার সংসারে ভোগের জয়। তোমাদের বিজলী বাতি বা জল গ্যাস ড্রেণ মারিভয়ের বিলোপ কর্ত্তে পারে না। ঐ ভয়টা প্রতি গৃহস্থের থাকলে, জীবনের স্বচ্ছন্দতা বাড়ে, সুস্থর অধিক উপভোগ্য হয়—

—তোমার মুণ্ডুতে কবিতার লহর ছোটে। ওরে বাবা, মুখস্থ বিদ্যে ছাড়। কথাটা তলিয়ে বোঝ।

তার্কিক নরেন্দ্রের মগজের তর্ক-কেন্দ্রে বান ডেকে উঠলো। এরা মূর্খ। বাস্তবের পট-ভূমিতে না বুঝলে বিজ্ঞান হয় তোতা-পাখির ভোঁতা বুলি।

ললিত বল্লে—এ বচনগুলাও রাধাকৃষ্ণ বুলি। পড় বাবা আত্মারাম।

শিক্ষক মহেন্দ্র ছেলে তাড়িয়ে খায়। সে জানে শিক্ষা দেওয়া মানে শেখানো নয়, পাশ করাবার আয়োজন। ছেলে ঝাঁকে ঝাঁকে পাশ করে বলেই জীবন সংগ্রামে ফেল হয়। কারণ শিক্ষাটা ঢাকের বাঁয়ার মত। সুতরাং ডাইরেক্টরের অনুমোদিত শিক্ষা-পুস্তকের মত এদের ছেঁদো কথাগুলা। কোন্ সত্যকে পরদায় ঢাকছে সেটা বোঝা অবশ্য-কর্ত্তব্য।

সে বল্লে—বন্ধু বড় বড় বচন ছাড়ো, যেহেতু বচন-সুধা জ্ঞানের ক্ষুধাকে দাবাতে পারে না। কিসে তোমার গৃহ-লক্ষ্মীর রোগের ভয় ভীতিকর, সে কথা দৃষ্টান্ত এবং ঐতিহাসিক ঘটনার দ্বারা প্রমাণ কর।

ললিত বল্লে—পণ্ডিত হ'লেই মানুষ মূর্খ হয়। জগদীশ্বরের কৃপায় হেডমাষ্টার হ'লেও মহেন্দ্র তেমন মূর্খ নয়, তাই একটা পাকা কথা দৈববশে ব'লে ফেলেছে। বল মণ্ডল, ব্যাধির ভয় কিসে?

নরেন্দ্র বল্লে—ওটা ঠাকুরমার সুচি-বাইয়ের মত। ধর গত মাসে সুমুকে সাতদিন বাসন মাজতে হয়েছে,দাসী তাড়িয়ে।

ললিত বল্লে—দাসীরা মেনকা উর্বশীর মত। দীর্ঘ কাল স্বর্গ-ভোগ তাদের পক্ষে রোগ। তাই হাওয়া-বদল করতে কল্প-বৃক্ষের ছায়া ফেলে কিছুকাল স্যাওড়া-তলায় বিচরণ করে।

নরেন্দ্র বল্লে—না এ ক্ষেত্রে মানদা-দাসী নিরপরাধ। সুমু তাকে যে কারণে জবাব দিয়েছিল সেটা উনপঞ্চাশের একটি বায়ুর ঝোঁকে।

প্রকৃতপক্ষে উকীল নরেন্দ্র মণ্ডলের বন্ধুত্ব তার মনের এমন বিদ্রোহী ভাব কল্পনা করেনি। তবে কাল-মাহাত্ম্য এবং স্থান-মাহাত্ম্য সনাতন। যে যুগে নধর-দেহ নবেন্দুচাঁদ ছেলে বাপের তিরস্কারের ফলে প্রতি-তিরস্কারের জন্য সঙ্ঘের ছেলে ডেকে আনে, সেকালে সুষমার মুষ্টু হাতে পুষ্ট নরেন মণ্ডল অশিষ্ট পথের গণ্ডগোলে উষ্ম-মুণ্ড হবে সে আর আশ্চর্য্য কথা কিরূপে! আর তার উপর তাদের মনের পটভূমিতে যে কিঞ্চিত পরনিন্দা-রূপ বিমল আনন্দ উপভোগের চাহিদা ছিল না, এ কথা বল্লে সত্যের অপলাপ করা হয়। মৌচাকে খোঁচা না দিলে মধু-ক্ষরণ হয় না। সুতরাং হেডমাষ্টার বল্লে—মিসেস মণ্ডলের মত সাক্ষাৎ মানময়ী কমলা বিনা দোষে মানদাকে তাড়ায় নি।

মণ্ডলের রসবোধ কিছু কম ছিল না। সে উকীল—পরের দুর্বলতা এবং কলহ-প্রিয়তা তার জীবিকা ও বিলাসের উপায়।

সে বল্লে—খোষামোদ করলে যে সুমু তোদের একটা সন্দেশ বেশী দেবে তা' নয়। না শুনতে চাও তো—বাস্।

ডাঃ সেন বল্লে—মাষ্টারের কথা পূর্বযুগে গ্রহণ কর্ত্তব্য লোক। এখন এলো-মেলো পথিক হাওয়ার যা মর্য্যাদা আছে, মাষ্টারের কথার সে ইজ্জত নাই, বল ব্রাদার মানদার কর্ম্মচ্যুতি কাহিনী।

মণ্ডল বল্লে—তার ননদের ভাইপোর—

মাষ্টার বল্লে—তা' হলে তার স্বামীরও ভাইপো?

মণ্ডল বল্লে—না ভুল হয়েছে। মানদার ননদের স্বামীর মাসীর নাতির হাম বেরিয়েছিল। দাসী তার খবর আনতে গিয়েছিল। রোগীর ঘরেও ঢোকেনি। সে সমাচার পেয়ে সুমু মানদা দাসীকে সাতদিনের বেতন বেশী দিয়ে সরাসরি বিদায় করলে। আর দু টাকার ক্লোরিন ডি ডি টি, এবিসি কি সব ছাই-ভস্ম কিনে আমার মেহনতের টাকা বরবাদ করলে।

অবশ্য হাম কাণ্ডটা ভীতিকর। তার স্বামী-পুত্রের

কল্যাণে যদি ঘটা ক'রে একটা শুচি প্রকরণে শ্রীমতী আত্ম-নিয়োগ করে থাকে তো দোষ কি ?

মণ্ডল বন্ধুদের মতে মত দিতে পারলে না। এ নহে অকস্মাৎ।

এই অকস্মাতের প্রসঙ্গে তার স্মরণ পথ রাঙিয়ে তুললে কবির স্মরণ-কবিতা, আর পরক্ষণেই তার বিস্মৃতি অধঃপুপ্তির যোগাযোগ।

সে বল্লে—আমার শালা মণ্টুকে জানো। সে আমার সঙ্গিতা নিয়ে গিয়েছিল তাদের ক্লাবের সরস্বতী পূজায় আবৃত্তির জন্য। সেদিন বই ফেরত দিতে এলো। একটু গদগদ কণ্ঠে মিত্র গদাই মিত্রের সুখ্যাতি করলে। সহোদরার কাছে আদর কাড়িয়ে বল্লে—জান দিদি গদাইয়ের সেদিন জ্বর, আলমিত ছুলেছে পিতলের টোটার মত। তবু বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে তো মোর নয়—এমন ধরণ দিয়ে পড়লে যে কোনো নবীন সন্ন্যাসী শুন্‌লে লোটা কম্বল ফেলে, বেহালায় তান মেরে গাইতো—দিবস রজনী আমি যেন কার আসার আশায় থাকি।

তিন বন্ধু হাসলে। তারা খানিক মণ্টুর রসবোধ ও সাহিত্য-সন্ধানের সুখ্যাতি করলে। পরক্ষণেই নরেন মণ্ডল সামলে নিয়ে বল্লে—দাঁড়াও ব্রাদার, গল্প ওখানে শেষ নয়। শ্রীমতী সুষমা মণ্ডল একটু জেরা ক'রে বল্লে—মণ্টু ও বইটা ছুই নিয়ে যা। আর ডিডিটি দিয়ে হাত ধো।

এরা সমস্বরে বল্লে—সঙ্গিতা !

স্বরের অন্তরে লোভ ছিল, বিস্ময়বহিরাবরণ। মণ্ডল সাম্‌লে নিয়ে বল্লে—সঙ্গিতা। সে সারাদিনের পরের ঝগড়ার দুর্বিসহ ক্লেশ নাশ করতে অদ্বিতীয়। দিনের শেষে ঘুমের দেশে—

বাধা দিয়ে ঘরণী বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করলে, মণ্ডল একখানি কেনেনি কেন ?

—ভাই জানতো। যুদ্ধের আগে পাঁচ সিকায় সমস্ত সেক্সপেয়ার পাওয়া যেতো। দশটাকার বার্ণার্ড স আমার কাছে আছে। কিন্তু আমরা মুখে রবীন্দ্রনাথের জয়গান করি, কজন তাঁর অমূল্য রচনাবলী মূল্য দিয়ে কিন্‌তে পারে ? ওঃ ! কী দাম।

হেডমাষ্টার বল্লে—অমূল্য গ্রন্থ সস্তা হবে কেমন ক'রে ? বেশী দামে কেনা মানে স্বার্থত্যাগ। অন্যদিকে ব্যয় সংকোচ করতে হবে, সে রয় আহরণের জন্য। একখানা সামান্য টিকটিকি নভেলের কি দাম একবার চিন্তা কর তো। তার তুলনায়—

ধৈর্য্য-চ্যুত চিকিৎসক বাধা দিয়ে বল্লে—মূর্খ ছাত্রদের মলাট-সাহিত্য শেখানো আর বড় কথায় অবুঝের মত মন্তব্য দেওয়া এক রকমই সুলভ কাজ। কিন্তু বুদ্ধি জিনিসটা সস্তা নয়।

মহেন্দ্র বল্লে—মানুষ-মারা বুদ্ধি-কোয়ারার মনীষা-বরষণের একটু পরিচয় দাওনা ডাক্তার।

ললিত বল্লে—মমবাতি দিয়ে একটা ঘরকে আলোকিত করতে যে খরচ হয়, বিজলী বাতিতে সেই পরিমাণের আলো আরও সস্তায় পাওয়া যায়। আবার চাঁদের আলো বিনা ব্যয়ে পাওয়া যায়। আর আলোর রাজা রবি তাঁর কর ঝোঁপে ঝোঁপে পর্বতে কন্দরে ধনী ও দরিদ্রের প্রাঙ্গণে সমানভাবে বিতরণ করেন। কবি রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থও ধনীর কাছে চাঁদা তুলে ছাপিয়ে লোকের ঘরে ঘরে বিতরণ করা কর্ত্তব্য।

গল্পের স্রোত এখানে বহিবার পর আর তাদের ফিরিস্তি সংগ্রহ করা হলনা, শ্রীমতী সুষমা মণ্ডলের রোগের ভয়ে বেচারা উকীলকে কোন্ কোন্ পদার্থ হতে বঞ্চিত হতে হয়েছে।

(২)

পরদিন ললিত এবং মহেন্দ্র একত্র হ'ল হাজরা পার্কে। শ্রীঅরবিন্দ আবির্ভাব উৎসব। লোকের মনকে স্বার্থের দিকে, ধর্ম্মের পথে, সাধনার উচ্চভূমিতে উঠিয়ে নিয়ে যাবার আয়োজন হ'য়েছিল বিপুল।

সভার শেষে দেখা গেল সাধনমার্গ দুরূহ। কারণ মহেন্দ্র মাষ্টারের নিত্য-কর্ম্ম জ্ঞানাঞ্জনশলাকাদম্পর্কিত। তার মনের লোভ এবং চিটিংবাজী একটুও টোল খায়নি, ধরণে প্রকাণ্ড কথা। সেদিন রাত্রে ঘরে ফেরবার প্রাকালে গগনে গরজে মেঘ, মুষলধারে বৃষ্টি, কোন সাগরের পার হতে এলোরে পরবাসীর হাওয়া। সেদিন শ্রীমতী সুষমা তাকে চর্ব্যচুষ্যলেহ্যপেয় দ্বারা পরিতৃপ্ত ক'রে বলেছিল—আপনার গলা-খোলা হাত-কাটা সার্ট। এটা বিদেশ। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগতে পারে। একটা কোট নিয়ে যান্।

আজ তার মনে যে বে-ইমানী ভাব হুঙ্কার দিলে তার

জন্ত দায়ী নরেন্দ্রের কথা। এ সিদ্ধান্ত হ'ল তার বিবেকের চোখের টুঁটি। নরেন্দ্র বলেছিল—না, না, সুমু তুমি মাথা ঘামিয়ো না। ও পল্লীগ্রামের মানুষ, অত শীঘ্র ওদের ঠাণ্ডা লাগে না।

আজ ধর্মস্থান থেকে বেরিয়ে মহেন্দ্র ললিতকে বল্লে—ডাক্তার, এ কোটটা আমাকে কেমন মানিয়েছে?

বিজলীর আলোতে দেখে চিকিৎসককে স্বীকার কর্ত্তে হ'ল যে কোট এবং তার অঙ্গ যেন কাশ্মীরী আপেল ও তার খোসা। বেশ ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে। তার পর ডাক্তার বল্লে—তাতে তোমার কি বন্ধু? ও পরের জিনিস। দশ মিনিট বাদেই ফেরত দিতে হবে।

শিক্ষক বল্লে—নরেন্দ্র পর নয় এবং জামাও ফেরত দে'বনা।

ললিত বল্লে—এ দুটো কথাই সত্য। তোমার গায়ে এমন কাপে কাপে বসেছে এবং তোমার বাসনা হ'য়েছে, ও জামাটা নিজস্ব করবার, এ সংবাদ পেলে নিশ্চয়ই নরেন্দ্র আর জামা ফেরত নেবেনা।

মহেন্দ্র বল্লে—বল কি ডাক্তার? ভুলছ কেন এদিন আমাদের মন বস্তুভারশূন্য। আমাদের জীবনটা দশ বৎসর পেছিয়ে গেছে। তা' হ'লে তখনকার নীতি স্মরণ কর। কেউ আদর ক'রে সোনার চাটনী বা মুক্তার ঘুষনীদানা দিলে আমাদের রুচি হত না। কিন্তু খেলার মাঠে চিনেবাদাম কেড়ে নিয়ে খেলে তবে সুখ হ'ত। এ কোট চিটিংবাজি করে আত্মসাৎ করলে তবে সোনামুখী বিদ্যালয়ের ছাত্ররা বুঝবে হেডমাষ্টার মশায় ইথে বড় ই লয়।

—কিন্তু আজকের দিনটা? ধর্মসভা, মোক্ষের পথ, বিশ্ব-চেতনা—

—জগাই-মাধাই অন্তে তো উদ্ধার হ'য়েছিল। যখন প্রথম জীবনে—

—থাক।

যখন তারা নরেন্দ্রের বাড়িতে পৌছিল, তখন মহেন্দ্রের শরীর হ'তে ইউক্যালিপ্টসের গন্ধ নির্গত হ'চ্ছে। তার চুলগুলা উস্কোখুস্কো। সে এক একবার কাসছে।

তারপর যে কাণ্ড হ'ল সেটা নৃশংস। কারণ তাদের দেখে যেমনি সাতবছরের পরী সুমু ছুটে এলো, মহেন্দ্র বল্লে—সরে যাও মা। সরে যাও। কাল মজার গল্প বলব। আজ ভীষণ সর্দ্দি হ'য়েছে। কেমন সুমু? কাল। কাঁকড়া কেমন খাঁকশেয়ালের নেজ কামড়েছিল সে গল্প বলব। লক্ষী মা। সোনা মা।

একটু অপ্রস্তুত ও অভিমানের ছায়া দেখা দিল শিশুর কমল-মুখে। ডাঃ ললিত সেন বুকের মাঝে একটা আঘাত পেলে। নরেন্দ্রের দূরদৃষ্টি দেখলে, অন্ততঃ সুমুর পোষাকটা বেঁচে গেল, কিন্তু বুঝলে এ সর্দ্দির তলে বিরাজিত শয়তানী।

তারা গল্প করলে। আনন্দের কথা, সুখ দুঃখের কথা, পুরাতন দিনের বন্ধু বান্ধবের কথা এবং অধুনা রাজ-নীতির কথা। শেষে শ্রীমতী সুষমা এলেন। তখন গল্পর খাদ বদ্‌লালো।

সুষমা বল্লে—মহেন্দ্রবাবু আপনার সর্দ্দি হয়েছে। অবশ্য ললিতবাবু রয়েছেন। না হ'লে একবার বাবাকে ডাকতাম।

মহেন্দ্র বল্লে—কী সর্বনাশ। মশা মারতে কামান দাগা। আমরা গেঁয়ো লোক এ-সর্দ্দি নাইতে খেতে সেরে যাবে।

তার পর ধর্ম-সভার কথা হ'ল। শেষে মহেন্দ্র বল্লে—ওঃ। ভুলে যাচ্ছিলাম। নরেন ভাই তোমার কোটটা।

সে ত্রস্ত হাতে দুটা বোতাম খুল্‌লে।

সুষমা বল্লে—ছিঃ! ছিঃ! করেন কি। করেন কি।

সে কাল চলে যাবে। আর জামা ফেরত দিতে সময় পাবে না। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? না হয় বন্ধুর একটা স্মৃতি তার মাঝে রহিল। এই সব আলোচনার পর শ্রীমতী সুষমা মণ্ডল বল্লেন—এ-ক'দিন আমার কী আনন্দে কেটেছে কি আর বলব? ইনি সারাদিন পরিশ্রম করেন। পুরানো দিনের বন্ধু পেয়ে একেবারে যেন ভিন্ন মানুষ।

ললিত বল্লে—সেটা উভয়তঃ।

শেষে তাদের প্রতিশ্রুতি দিতে হ'ল যে পূজার ছুটিতে আবার কলিকাতায় এসে আনন্দ করতে হ'বে।

সুষমা আবার বল্লে—কিন্তু আমার বোনদের আনবার চেষ্টা করুন। তাহ'লে আমার বড় আনন্দ বাড়বে।

ললিতের স্ত্রী পিত্রালয়ে হুগলি যাবে। মহেন্দ্রের স্ত্রী বীরভূমিতে না গেলে মাতৃ-সমর্পন হবে না। সেন-জায়া নিশ্চয়ই একদিন হুগলী থেকে এসে শিখে যাবে গৃহ-সজ্জা ও রন্ধনের মোচ্‌কোফের।

—আবার আমাকে পরিহাস করছেন ললিতবাবু?

ললিত বল্লে—ভগবান হাতীর চোখ ছোট করেছেন।

সে তার দেহের বৃত্ত দেখ্‌তে পাবে না বলে। আপনার গুণ-পনা, সৌচয়—

বাস্ বাস্—ব'লে এক মুখ হেঁসে, নমস্কার ক'রে ললিত রণে ভঙ্গ দিয়ে পিটটান দিলে।

সদর দরজায় এসে মহেন্দ্র বল্লে—নরেন পূজার সময় এক জোড়া ভালো জুতা কিনে রাখিস্। থাক্ একেবারে বিনা ব্যয়ে তোর কোট্‌টা নিইনি। নগদ চার আনার ইউক্যালিপ্টাস কিন্‌তে হয়েছে। জুতাটা যেন ভাল হয়।

নরেন্দ্রর মুখে আসছিল তার পিঠ্ শক্ত করবার উপদেশ। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল—সর্বত্যাগতো গুরু। সুতরাং মাত্র বল্লে—শয়তান।

পরের নিমন্ত্রণে তাদের শুনতে হয়েছিল, গল্পের বাকীটুকু। কারণ সুষমা ভোলবার পাত্র নয়। সে রাত্রে নরেন্দ্রকে স্পিরিটিন দিয়ে মুখ ধুতে হ'য়েছিল, আর গলায় ক্লোরিটোনের হাওয়া দিতে হ'য়েছিল।

৩

পূজা অবধি অপেক্ষা করতে হ'ল না। মুর্শীদাবাদের এক ধনী রোগীর সঙ্গে ডাঃ ললিত সেনকে কলিকাতায় আসতে হল তাড়ে। সে সময় তার স্থালক গিয়েছিল ইসলামপুর। তার সঙ্গে ললিত সেনের স্ত্রী সাত দিনের ছুটিতে এলো হুগলি।

সেদিন শনিবার। নষ্টচন্দ্র দর্শন নিষেধ। শ্রীমতী রেবাকে তার স্বামী বন্ধুর বাড়ি নিয়ে গেল। সোনামুখী থেকে মহেন্দ্র এসেছিল রবিবার কলিকাতায় কাটাতে।

সুষমা ও রেবার এই প্রথম মিলন। কিন্তু তাদের মধ্যে এমন একটা ঘনিষ্ঠতা পরিয়ে উঠলো যে কাহারও পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভবপর হল না যে তারা মাত্র তিন দিনের পরিচিত। মোট কথা বন্ধুরা নিজ নিজ স্ত্রীর কাছে সদাই পুরাতন কথা বলত, তাই পরস্পরের জীবনের বহু রহস্য কথা লুকানো ছিল না এদের নিকট। শ্রীরেবা সেন শুনেছিল—শ্রীসুষমার রোগ ভীতির বার্তা। কিন্তু নতুন বান্ধবীর হাব-ভাব কথা বা কাযে তার চরিত্রের সে দিকটা আত্মপ্রকাশ করলে না। অথচ সকল মহিলা স্ত্রীলোক। গোপন সমাচারের ভাণ্ডার লুট করার প্রবৃত্তি তাদের চেঙ্গীজ খাঁ বা সুলতান মামুদের বিজিত রাজার ধন ভাণ্ডার লুটের তৃষ্ণার সমান।

রেবা বল্লে—আমি যদিও ডাক্তারের স্ত্রী, তোমার মত ঘরকরনা এতো পরিষ্কার রাখতে পারিনি। ডাক্তারের মেয়েরা এ-বিষয় ভালো।

সুষমা হেঁসে বল্লে—কলিকাতায় সুবিধা আছে, কারণ ঘরের মেজেগুলো প্রায়ই পেটেণ্ট পাথরের। তারপর সাফ করবার ওষুধ সহজে পাওয়া যায়। আর আমার মনে হয় পল্লীগ্রামে ভিড় কম, তাই বাতাস পরিষ্কার।

রেবা এবার সুবিধা পেলে। সে বল্লে—হ্যাঁ যদি পর্ণ-কুটীরে বদ্ধ হয়ে কেহ তপোবনে বসে থাকে, তার সংক্রামক রোগের ভয় থাকে না। কিন্তু মোটেই ভুলো না যে আমার স্বামী ডাক্তার। তাঁর কাছে যক্ষা রোগী থেকে ম্যালেরিয়া রোগী দলে দলে আসে। আর ভাই ভয় করে ছেলেটাকে নিয়ে। ছুটে ছুটে ডাক্তার খানায় যায়। ডাক্তারকে তুষ্ট করবার জন্য লোকে তাকে কোলে করে। সে-দিন এক ইনফ্লুয়েঞ্জার রোগীর কোলে দেখি খোকাকে।

সুষমা বল্লে—বাবা বলেন, লোকের মধ্যে এমন প্রতিরোধের সহজ শক্তি আছে যে সংক্রমণ সহজে কিছু করতে পারেনা।

রেবা সেন একটু অপ্রস্তুত হল। ভাবলে পুরুষদের পর্য্যবেক্ষণের ক্ষমতা অল্প। তাই তারা তার নবার্জিত বান্ধবীর বদনাম দিয়েছে।

ঠিক সেই সময় মেঘ সরে গেল। কাস্তের ফলার মত চাঁদ দেখা দিল পশ্চিম আকাশে। রেবার পক্ষে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, সীমার মাঝে অসীমের নানা বর্ণ, নানা ছন্দ ইত্যাদির বিশেষ সমাদর ছিল না। কারণ তারা দৈনন্দিন জীবনের সাথী।

সে বল্লে—তোমরা কলকাতার লোক জান না। আজ সৌভাগ্য-চতুর্থীর ব্রত। কিন্তু নষ্টচন্দ্র দেখলে নামে কলঙ্ক রটে।

সুষমা বল্লে—নামটা অজ্ঞাতবাস করার চেয়ে কলঙ্ক কাঁধে নিয়ে বেড়ালেও সার্থক। এই কলঙ্কর কথায় মনে পড়লো বাবার বন্ধুর গান। আমরা শিশুকালে পাশের ঘর থেকে শুনতাম—প্রেম সুখে হয় সে সুখী কলঙ্কে ভূষণ করিলে।

দুজনে হাসলে। রেবা বল্লে—আজকের দিনে ও গান

পারিলে লোকের নাকের ডগা কিঞ্চিদধিকমাত্রায় মুক্তি-ধারণ করে।

কিন্তু পরক্ষণেই শ্রীরেবা সেন চাক্ষুস প্রমাণ পেলে সেই কথার—যা জানবার জন্য তার চিত্ত হ'য়েছিল ব্যাকুল। হঠাৎ শ্রীসুষমা মণ্ডলের দৃষ্টি পড়লো একটা প্লেটে রক্ষিত দুটি পুষ্ট আতা ফলে।

সে উত্তেজিতভাবে ডাকলে চাকর সীতারামকে। তার পর বল্লে—সীতারাম তোমায় কি বলেছিলাম—ঐ আতা দুটা কোনো গরু বা অন্য জানোয়ারকে খাওয়াতে।

সে বল্লে—না মায়িজি।

—এখনি নিয়ে যাও, তোমরাও খেয়োনা। আমি বলছি কেন? যে স্ত্রীলোকটি ঐ ফল বেচে গেল, পরে দেখলাম তার হাতের তিনটে আঙুলে, গলার কণ্ঠির কাছে আর কানের পিছনে সাদা দাগ। ও ব্যারামটা মোটে ভালো নয়—শ্বেত-কুষ্ঠ।

রেবা হেঁসে বল্লে—তাকে ফেরত দিলেই পারতে।

সুষমা বল্লে—ছিঃ ভাই। ওর যে মন আছে। ওর মনে কষ্ট দিয়ে কি হবে? আর ও গরু টরু না। ও সীতারাম কোনো গরীবকে দেবে। নিজে খেতে সাহস করবে না।

রাত্রি আটটার সময় ললিতবাবু ও মহেন্দ্রবাবুর আগমন-বার্ত্তা এনে দিলে সীতারাম। দুজন বান্ধবী তাদের সঙ্গে গল্প করতে নিচে নেমে গেল।

৪

ঠিক এখানে আসবার পূর্বে কালীঘাটের মোড়ে মহেন্দ্র দেখতে পেলে তাদের বন্ধু পশুপতিকে। সে চিরদিনই দীর্ঘ দেহ, তাই মিত্র মহলে তার নাম ছিল—চিমুরে। পশু ক্রমশঃ তাও সংক্ষিপ্ত হ'লে তার নামকরণ হল—চিমুপশু। তবে সময় সংক্ষেপের জন্য অনেক সময় ওকে লোকে বলত—চিমু।

তিন বৎসর পরে দেখা। কলেজের নাম লোকে ভুলেছে। তার নিজেরই সব সময় স্মরণ হতনা নিজের পরিহাসের নাম। সুতরাং যখন সে হঠাৎ শুনলে পুরা-কালের অধুনা-বিস্মৃত ডাক—চিমু, একটা লম্বর খেলে গেল পশুর মাথার। কী কাণ্ড! যমালয়ের ফেরতা মানুষ।

দুই বন্ধুতে পূর্ণ সাতাশ মিনিট গল্প হ'ল। প্রারম্ভে, মাঝে এবং শেষে তাদের হাসির রোল পথের-যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। অবশেষে উভয়ে সমস্বরে বল্লে—দশটা।

মণ্ডল গৃহে ভোজের পূর্বে ওদের পাঁচজনের যে সব প্রসঙ্গ গল্পের বিষয় হ'ল, তার মধ্যে নিজেদের জীবনে দৈনন্দিন পথ-চলার সুবিধাঅসুবিধার কথাই হ'ল অধিক। কিন্তু যেহেতু সৌভাগ্য-ক্রমে রাজনীতি বাঙ্গালী-জীবনের সকল চিন্তা ও উদ্যমের সঙ্গে মিশিয়ে গেছে, জহরলাল, বিধান রায়, শরত বসু বা ডাঃ কাটজু আলাপের বাহিরে রহিলেন না।

একবার উকীল নরেন মণ্ডল প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য বল্লে—যেমন কানু বিনা গীত নেই, তেমনি রাজনীতি বিনা কথা নাই বাঙ্গালীর আবালবৃদ্ধ বনিতার মুখে। এইটাই হয়েছে জীবনের অস্তিত্বসাপাত। ট্রামে, বাসে, বার-লাইব্রেরিতে, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে সর্বত্রই নয় কংগ্রেসের মুণ্ডপাত, না হয় কম্যুনিষ্টের আত্মশ্রাদ্ধ—আর না হয় বাম-পন্থীর ভাঙাকৌড়।

ললিত-গৃহিণী বল্লে—পূর্বে মুণ্ডপাত হত ইংরাজের। মুণ্ড নিয়ে গোলা খেলাটা ঠিক আছে—মুণ্ডের আকারটা বদলেছে।

সুষমা বল্লে—তখন ছিল ভারতবর্ষ পরাধীন। এখন আমরা স্বাধীন জাতি।

এবার প্রসঙ্গ মাষ্টার মশায়ের বিশেষ বিদ্যার মাঝে এসে পড়েছিল।

সে বল্লে—দেখুন স্বাধীন দেশ নিজের নির্বাচিত প্রতি-নিধির হাতে নিজের ঘোথ-স্বার্থ ছেড়ে রাখতে পারে। কিন্তু আজ যাঁরা দণ্ড-মুণ্ডের বিধাতা তাঁরা শক্তিলাভ করেছেন ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীর ওয়ারিসন হিসাবে। যে যন্ত্র শাসন করছে সেটিও ইংরাজের গড়া এবং ছাড়া। ইংরাজ কল-চালানো মিস্ত্রির স্থলে বসেছেন দেশী ড্রাইভার। আর এই গবর্ণমেণ্ট খাদ্য-সরবরাহ করবার দায়িত্ব নিয়ে মানুষকে অর্দ্ধ-ভুক্ত রেখেছেন এবং আকাশবাণীতে পরামর্শ দিচ্ছে—কলা আর কচু খেয়ে প্রাণ ধারণ কর।

শেষের কথা এমন অঙ্গ-ভঙ্গী করে উচ্চারিত হ'ল, যার ফলে সভায় ভদ্র-মণ্ডলী ও মহিলা-বৃন্দ খুব হাসলেন।

বলা বাহুল্য সভার কার্য্য খুব সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদিত হ'ল। কিন্তু সভা ভঙ্গের পূর্বে একটা শোচনীয় ব্যাপার ঘটলো, যার ফল সম্বন্ধে সারারাত্রি সকলের নিদ্রার ব্যাঘাত হ'ল।

রাত্রি দশটায় সভা-ভঙ্গের আয়োজন হ'ল। প্রত্যেকে স্বীকার করলে জীবনের ইতিহাসে সেটা একটা লাল-অক্ষরে লেখা দিন হবে, পরদিন রবিবার আবার তারা সকাল হ'তে সন্ধ্যা অবধি একত্র কাটাবার সঙ্কল্প করলে। রথ বেশ মসৃণ পাকা রাস্তায় চলছিল, হঠাৎ সেই শোচনীয় ঘটনার ফলে, চলতি রথের চাকা পড়লো পথের ধারের মর্দ্দমায়। এক কলসী দুধে পড়লো একফোঁটা—থাক্!

বিদায়ের প্রাক্কালে সীতারাম খবর দিলে পশুপতিবাবু এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে বাহির হ'তে শব্দ হ'ল—নরেন ভাই। আমি পশু—চিনু।

একটা সোরগোল হ'ল। নরেন বল্লে—এসো এসো। মহেন্দ্র মাষ্টার মহিলাদের বল্লে—ঘাবার দরকার নেই। এ আমাদের বাল্য বন্ধু—পশুপতি চক্রবর্ত্তী।

দ্বারে প্রবেশ করলে শাল, কম্ফার্টার প্রভৃতিতে মোড়া দীর্ঘ চিনু, হাতে একটা লাঠি, মাঝে মাঝে কাসছে। এসেই উচ্ছ্বসিত আনন্দে বল্লে—বাঃ! মেঘ না চাহিতে জল। নবগ্রহ একত্রে। তার পর সে হ'ল গলগ্রহ। পর পর তিন বন্ধুকে আলিঙ্গন করলে, গালে গাল ঘষলে।

কী কাণ্ড! অবসন্ন হ'য়ে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বল্লে—আর ক'দিন বাঁচবে এ যক্ষ্মা-রোগী। যম-রাজের-শমন এসেছে। হঠাৎ খেয়াল হ'ল নরেনকে দেখে আসি। রাস্তা মালুম না। ফিকসাচড়ে এলাম। ভাগ্য—শেষ ভাগ্য। একত্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ওঃ।

তার পর কাশির বেগ এলো। শ্রীমতী সুষমা ছুটে বাহিরে গেল। মাষ্টারের অধর কোণে দুষ্টামির হাসি ফুটে উঠ্‌লো। বাকী সব বিস্মিত।

তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল এনে তার হাতে দিল সুষমা। অতি স্নেহ-ভরে বল্লে—আপনি স্থির হ'ন। জল খান। আমি কালই বাবাকে ব'লে ডাঃ উকীলকে পাঠিয়ে আপনার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব।

৫

মোড়ে তাদের গাড়ি থামালো। চিনু হেঁসে বল্লে—বাবা নরকে যারা যাচ্ছিলাম। কিন্তু পরিত্যক্ত নরেনকে তোরা কে নিবি?

মহেন্দ্র বল্লে—ও ঠিক থাকবে। সুষমা চলে যাবে মেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি। তার পর ডাঃ উকীল খুঁড়ে দেবেন সেই নূতন দাবাই—যার কথা উনি রোটারীতে বলেছিলেন।

যখন প্রকাশ পেলে যে এ অভিনয়ের জন্য দায়ী মহেন্দ্র, শ্রীমতী রেবা সেন ভদ্রতা ও সৌজন্য জলাঞ্জলি দিয়ে বল্লেন—ছিঃ! আপনাদের উচিত এখনি ওঁর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাওয়া। ছিঃ! ছিঃ!

পরদিন সকালে দুই বন্ধু এবং রেবা নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই পৌঁছিল মণ্ডল-গৃহে। তাদের অভ্যর্থনা করলে শ্রীমতী সুষমা।

—নরেন কোথায়?

সমস্বরে দুই বন্ধু জিজ্ঞাসা করলে।

সুষমা বল্লে—সে যক্ষ্মা-রোগী ছোঁয়া পদার্থ। ছোঁয়াছে রোগীর স্পর্শ করা আমার স্বামীকে দান করবার পাত্রী খুঁজছিলাম। যখন রেবার স্বামী তাকে কেড়ে নিতে চেয়েছে ও রোগের বীজ-ভরা পদার্থটি রেবাকেই দ'ব ঠিক করেছি। ওটা আমার নেশা। ছোঁয়াচ-লাগা পদার্থ ঘরে রাখিনা। আয় ভাই রেবা।

তার পর সে রেবার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল কক্ষান্তরে। সে কক্ষে বসেছিল হাস্য-মুখ নরেন। রেবাকে বল্লে—রাগ করিসনি তো অপদার্থ উপহার পাবার প্রস্তাবে।

রেবা বুঝলে কাণ্ডটা। খুব হাসলে।

সুষমা বল্লে—কর্ত্তার হঠাৎ কী মতলব হ'ল আমার নিন্দা করবার, তাই নষ্ট চন্দ্র দেখার পূর্বেই নামে কলঙ্ক দিলেন। স্বামীর সত্য রাখবার জন্য গরীবকে ত্যাগ করতে হ'ল একটা কোট আর এক জোড়া আস্তা। খাসি পশুপতিবাবু অভিনয় করেন না। আমিও গোখ্‌লেতে অভিনয় কর্ত্তাম।

যখন নরেনবাবুর হাত ধরে রেবা এ ঘরে এলো, আবরণ-মুক্ত পশুপতিও সেথায় এসে ছুটেছে।

রেবা বল্লে—না রেবা পাবে না। রোগের ভয়ে পরিত্যক্ত এ নতুন দান পশুপতিবাবুর প্রাপ্য—এই নিন।

নরেন যখন চেপে তার কোলে বস্‌ল, কাতরকণ্ঠে পশুপতি বল্লে—সত্যি মৃত্যু এলো। ওঃ বাবা!

পূর্ব আফ্রিকায় প্রচার কার্য্য

ব্রহ্মচারী রাজকৃষ্ণ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা (ভারত সেবাশ্রম সংঘের কর্মীরা) কাম্পালায় বেশীদিন থাকবো না তা' প্রথম থেকেই ঠিক কোরে নিয়েছিলাম। তাই তিন চার দিনের মধ্যেই আমাদের কাজকর্ম সেরে বেরুবার চেষ্টা করতে লাগলাম। এখানে হিন্দুদের মধ্যে বেশ একটা সংঘবদ্ধের ভাব আছে। লোকজনের ধার্ম্মিকতাও বেশ। ছোট বড় সকলেই প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় হিন্দুমন্দিরের বাড়ীতে একত্রিত হয়। সেখানে সমবেত প্রার্থনা, পূজা, ভজন, কীর্ত্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের বাহিরে হিন্দুর এরূপ ধর্ম্মভাব বড় একটা দেখা যায় না। সহরে একটী সরকারী হাসপাতাল আছে। তার ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার শ্রীযুক্ত ডি-কে মুন্স—বেশ কর্মনিষ্ঠ সরলপ্রাণ একজন খোঁড়া হিন্দু যুবক। তাঁর চেষ্টা ও প্রেরণাতেই সহরের হিন্দুদের এই মিলনের ভিত্তি স্থাপিত হোয়েছে। ডাক্তার মুন্সই এই সহরের সেতা, কর্ত্তা, সেবক ও অভিভাবক সব। একশ সবাই জন হিন্দুর বাস এই সহরে। আমরা যে-কয়দিন ছিলাম, সে কয়দিন প্রায় সকলেই আমাদের সভায় আসতো।

আফ্রিকার আধিবাসী—মোরেনী

আফ্রিকার আধিবাসী—মাসাই

সেখানে দু' তিন দিন থাকার পর আমরা একদিন বিকাল ৫টায় মাটুরা যাওয়ার জন্য কাম্পালা থেকে বিদায় হ'লাম—ইলাকা ষ্টেসন অভিমুখে। ডাক্তার মুন্স তাঁর নিজের মোটরে আমাদের ষ্টেসনে পৌঁছে দিয়ে এলেন। স্থানীয় সমস্ত হিন্দুর বালিক ঐকান্তিকতায় লীলাধরের বাড়ীতেই আমাদের বেশ ভোজনের ব্যবস্থা হোয়েছে। আমাদের বিদায় দেওয়ার জন্য কাম্পালা থেকে দুইটি মোটরে ৮' সাত জন লোক এসেছিলো। সবার খাওয়া দাওয়ার পর সামান্য কিছু বক্তৃতাও হোল। ইলাকায় হিন্দুর বসতি নেই। ষ্টেসন মাষ্টারের পরিবারের চার জন, শ্রীযুক্ত লীলাধরের দিলের পাঁচজন, আর আমাদের বিদায় দিতে যারা এসেছিলেন—এই হোল মজুরের হোলো। শ্রীযুক্ত লীলাধর মাকেরে সিনিয়রদা মানে একটা সহরে—তাই

এখানে আর থাকার ধারাবাড়ীটি বড় নয়। রাত দুটোর ঘণ্টার ঘণ্টা বাজতে আমরা সকলেই ট্রেসনে গেলাম। ট্রেন থেকে একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠে বোসলাম। যাঁরা আমাদের বিদায় দিতে এসেছিলেন—গাড়ী ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। ট্রেসনের গ্যাসের আলোগুলোও ক্রমে অদৃশ্য হোয়ে গেলো। রাতের গভীর অন্ধকারের বুক চিরে ভয়ানক বৈত্যের মতো আমাদের গাড়ী ছুটছে।

ভোরের রক্তরাঙা আকাশে সূর্য্যদেবের আবির্ভাবে যখন

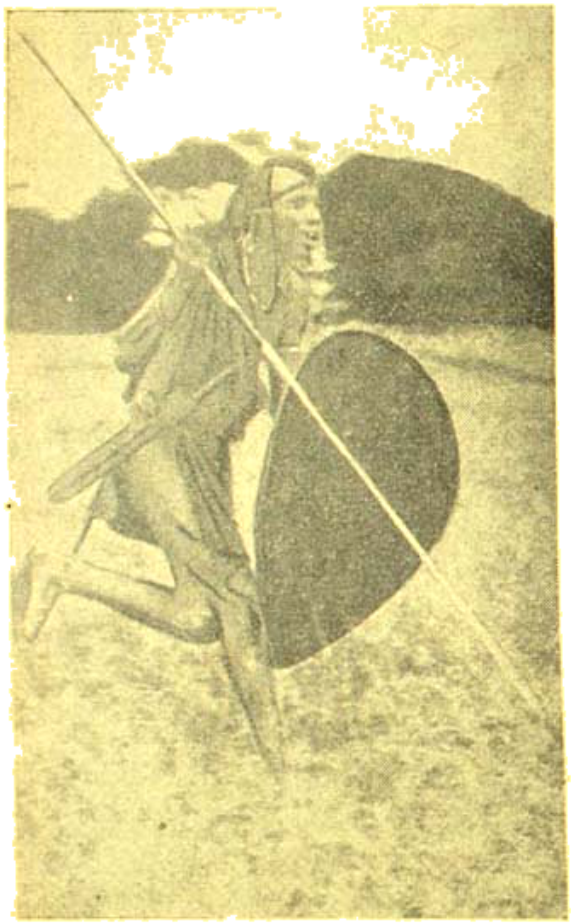

শিকারী মাসাই

পৃথিবীর বুকে সোনালী রংয়ের আলো ছড়িয়ে পড়ছিলো তখন আমাদের সেই যানবের মতো ট্রেনখানা এসে দাঁড়ালো—পূর্ব্ব আফ্রিকার বিখ্যাত সহর সিনিয়াগায়। জানিনা আমাদের এই ট্রেনে মাউম্বা যাওয়ার সংবাদ কেমন কোরে জেনেছিলো এই সহরের হিন্দুরা। অনেকে এসে আমাদের সহরে নিয়ে যেতে চাইলে, কিন্তু আমরা আর বাসলাম না। আমরা একেবারেই মাউম্বা যাবো জানাতে নিরাশ হোয়ে ফিরে গেলো সকলে। এখানেই শুনলাম, বহুকাল আমাদের মিশনের সকলে এখান থেকে মাউম্বা রওনা হোয়ে গেছেন।

একদিন ছিলো যখন এই সিনিয়াগার নাম কেউ জানতো না। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে একজন ইংরাজ তাঁর এক ভারতীয় বন্ধুর কাছ থেকে টাকা ধার কোরে চাষ আবাদের জন্য কিছু জমি কেবেন এই সিনিয়াগায়। সেই জমিতেই আবিষ্কৃত হোয়েছে একটা হীরকখনি। পৃথিবীর ভাল ভাল হীরা এখন এই খনি থেকেই বেরোয়। ডাঃ উইলিয়ামসন হোলেন এই হীরকখনির মালিক। আগে ছিলেন তিনি গরীব; আর্থিক কষ্ট লাঘবের জন্যই তিনি আসেন যখন ছেড়ে এই আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে চাষ বাসের উদ্দেশ্যে। জমি কেনার মতো-টাকাও তাঁর হাতে ছিল না—টাকা ধার কোরে জমি কেবেন। হয়তো তিনি স্বপ্নযোগে দ্বারা শুনতে পেয়েছিলেন যে এই জমিতে হীরা পাওয়া যাবে। আজ এই কয় বছরের মধ্যে ডাঃ উইলিয়ামসনের স্থান অনেকের মতে—পৃথিবীর তৃতীয় ধনাঢ্য ব্যক্তির পর্য্যায়ে। নিজের অধ্যবসায় ও কর্ম্মদক্ষতাই যে তাঁকে এই সৌভাগ্যের অধিকারী

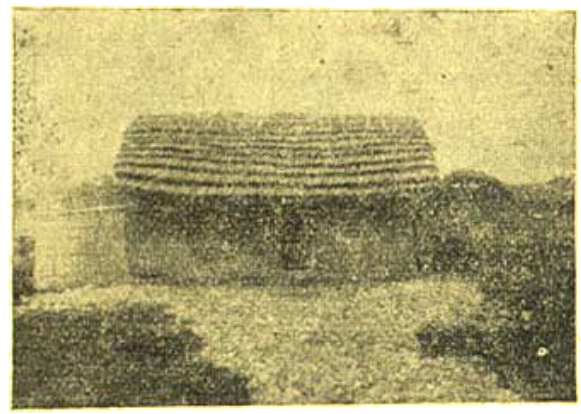

গরীব আফ্রিকানদের ঘর

কোরেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ডাঃ উইলিয়ামসন্ ভারী সাদা-সিদে লোক। বিলাসিতা নেই এতটুকু। রাস্তায় বেরুলে চেনা যায় না ইনি পৃথিবীর একজন নামকরা ধনী লোক। যে দেশের ভূমি তাঁকে এই প্রচুর অর্থসম্পদের মালিক কোরেছে—যে দেশের মাটিতে তাঁর সৌভাগ্য-লক্ষ্মী বাস করছিলো সেই দেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য ডাঃ উইলিয়ামসন একজন সদ্বংশজাত ইংরাজ হোয়ে—বিয়ে কোরেছেন একজন গরীব আফ্রিকান্ নিগ্রো রমণীকে। অথচ যিনি ইচ্ছে করলে বিয়ে কোরতে পারতেন আমেরিকার স্টার হেসেরী ফোর্ডের মেয়েকে।

সিনিয়াগা থেকে ট্রেন ছেড়ে চলছে তো চলছেই—গাধার মাস পর্য্যন্ত করে না গু' চার ঘণ্টার মধ্যে। গাড়ীর ঝাঁকুনীতে মনেও দোলা লাগে। মন ক্লান্ত হোয়ে আসে, শরীরও অবশ হোয়ে পড়ছে ট্রেনের ঝাঁকুনি ও অবিরাম চলার গতিতে। যখন ফির ফিরে একটা জলো হাওয়া এসে আমাদের চোখে মুখে লাগে তখনই আমরা হিসেব কোরতে থাকি—ভিক্টোরিয়া লেকের দূরত্ব। মাউম্বা এই লেকের তীরে একটা বন্দর। যতই মাউম্বার দিকে ট্রেন এগুতে থাকে ততই পাহাড়ের অবস্থিতি, উপত্যকার গভীরতা প্রভৃতি দেখে মনে

হোতে লাগলো যে কয়েক হাজার বছর আগে হয়তো এই অঞ্চলটাও সেকের গর্ভে ডুবেছিলো—হঠাৎ ভূমিকম্পে জেগে উঠেছে। এইসব দেখে আমাদের গন্তব্যস্থানের দূরত্বটা মনে মনে মাপতে লাগলাম। মনে দূরত্ব দেখে পরমাত্মাকে বিশ্বাস আনলে কী হয়—বেলা প্রায় তিনটায় আমাদের ট্রেন ভিক্টোরিয়া সেকের গায়ে যাইঙ্গা ষ্টেসনে গিয়ে দাঁড়ালো। ভারী সুন্দর সহরের অবস্থিতিটা। তিন দিকে সেকের চলচলে নীল জলের জল, আর একদিকটায় সবুজবরণের গাছ-পালায় ঢাকা পাহাড়ের শ্রেণী—একটার পর একটা যেন আমাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রোয়েছে। ভগবান হিমালয়ের দেশের লোক কিনা আমরা—তাই কী বার্ত্তা নিয়ে আমরা তাদের সম্রাটের দেশ থেকে এসেছি—তাই যেন শোনার জন্য উৎকর্ণ হোয়ে দাঁড়িয়ে রোয়েছে—আমাদের মুখের পানে চেয়ে। ষ্টেসনে গাড়ী দাঁড়াতেই আমরা নামলাম। নামলাম বটে, কিন্তু আগের থেকে কোন সংবাদ জানানো হয়নি তাই কেউ আমাদের নিতে আসেনি। ষ্টেসনে নামতেই একজন ভারতীয় ভদ্রলোক টেলিফোন কোরে আমাদের আগমন-বার্ত্তা জানিয়ে দিলেন সহরে। পাঁচ-মিনিটের মধ্যে একজন সাদা পোষাক-পরিহিত লম্বা ছিপছিপে গৌরবর্ণের হিন্দু ভদ্রলোক এসে আমাদের জানালেন তিনি আমাদের নিতে এসেছেন। তিনি ছিলেন স্থানীয় হিন্দু ইউনিয়ন নামে একটা হিন্দুপ্রতিষ্ঠানের একজন কর্ম্মকর্ত্তা। যাই হোক আমরা তো মোটরে উঠে বোসলাম। বেশ সুন্দর সহর। 'ইণ্ডিয়া এভেনিউ'এর উপর দিয়ে মোটর গিয়ে দাঁড়ালো একটা নবনির্ম্মিত একতালা বাড়ীর সামনে। কার্ণিশের উপর লেখা রোয়েছে—"লোহানা পঞ্চিকাশ্রম"। ছর্ম বাজাতেই রুদ্ধ দ্বার সসম্ভ্রমে খুলে গেলো। হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলেন মিশনের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীরা। মালপত্র মোটর থেকে নামিয়ে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

গ্রীক ভদ্রলোকের সাইকেল ষ্টেটে ভারতীয় সাংস্কৃতিক মিশনের নেতা স্বামী অখিলানন্দজী

কচ্ছ ও কাথিয়াবাড় প্রদেশে 'লোহানা' নামে একটি হিন্দু সম্প্রদায় আছে। পূর্ব্ব আফ্রিকার প্রায় প্রত্যেক সহরেই সেই লোহানাদের বসতি আছে। কোথা থেকে এই লোহানা জাতির উদ্ভব তা' ঠিক কোরে বলা কঠিন—তবে এঁদের দেহের গঠন, নাক-চোখ, আচার-বিচার এই সব দেখে মনে হয় এঁদের পূর্ব্বপুরুষগণের সঙ্গে শ্বেত হুনদের (White Huns) কোনো সম্পর্ক ছিলো। এঁরা উপবীত ধারণ করেন। আচার-বিচার, বিবাহপ্রথা সবই হিন্দুদের মতো—তবু কিছু কিছুতে যেন তাদের সেই প্রাচীন ধারা (tradition) রোয়ে গেছে বলে মনে হয়। সেখানে হিন্দু রীতি-নীতির সঙ্গে যেন ঠিক খাপ খায় না। যাই হোক, এই লোহানা সম্প্রদায় অনেকদিন থেকেই এই আফ্রিকায় ব্যবসা বাণিজ্য কোরে আসছে। অনেক সহরেই তাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের জন্য ধর্ম্মশালা, লাইব্রেরী, পাঠশালা, ক্লাব প্রভৃতি গ'ড়ে তুলেছে। এই লোহানাদের পাঠশালাতেই আমাদের থাকার বন্দোবস্ত হোয়েছে।

তাড়াতাড়ি স্নান-আহ্নিক সেরে নিয়ে খেতে খেলাম গিয়ে তাঁর বাড়ীতে তিনি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত। কয়েকমাস আগে তাঁর সঙ্গে দেখা হোয়েছিলো মাঞ্চিষার দীপে—তারপর সেই পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠতর হোয়েছিলো মাত্র মাসখানেক আগে ডোডোমায়; তার পর এই সাক্ষাৎকার। তাই—পরিচিত অতিথির সৎকারের বাড়াবাড়িটাও বেশ উপভোগ কোরতে হোল। খাওয়া দাওয়ার পর আশ্রমে গিয়ে শুনলাম—এখানে দুর্গাপূজার আয়োজন করা হোচ্ছে। মিশনের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদের মনেপ্রাণে আকাঙ্ক্ষা জেগেছে—পূজোর আনন্দ বইয়ে দিতে হবে বাংলা থেকে পাঁচ হাজার মাইল দূরে এই আফ্রিকার বুকেও। মায়ের আগমনীর পুলকস্পন্দন আজ বাঙালীর অন্তর থেকে ছড়িয়ে দিতে হবে বিশ্ববাসীর অন্তরে অন্তরে। ভারী আনন্দ হোল মাতৃপূজার আয়োজনের কথা শুনে।

এই মাতৃপূজা বাঙালীর একটা বিশিষ্ট অবদান। বাঙালী তখন বন্দনা গায়—"সৌম্যা সৌম্যতরাশেষ সৌম্যেভ্যস্ত্বতি সুন্দরী" মন্ত্রে। আবার যখন জগতের বুকে কালের করালছায়া ঘনিয়ে আসে, পাপের অত্যাচারে যখন ধরণীতে জাগে অশান্তির দাবদাহ, অসংখ্য প্রকারের রোগ-শোক-জ্বালা-যন্ত্রণা সমস্ত বাঙালীকে ঘিরে ধরে নগ্নরূপীর মতো, অন্তরে বাইরে যখন বাঙালী কোন আলোর সন্ধান পায় না—তখন অমাবস্যার সূচীভেদ্য অন্ধকারে নটনাথ মহাকাল রুদ্রের বুকে প্রলয় নৃত্যকারিণী, মুণ্ডমালিনী খড়্গখাপিনী মহাকালীর সাধনা করে। বাঙালীর কোমল কণ্ঠেই তখন ঝঙ্কৃত হয়ে

ওই—'কালী করাল বদনী—বিনিদ্রাস্যাসিপাশিনী, বিচিত্র খট্টাঙ্গবরা নরমালা বিভূষণা।'

প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে বিভোর হয়ে বাঙালী যেমন পূর্ণিমার রাতে ঘরের কোণে সুখ সমৃদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী জননী লক্ষ্মীর আসন পাতে—তেমনই আবার শোক-তাপ অশান্তিতে অস্থির হয়ে তমিস্রা রজনীতে তার সকল দুঃখ-ভিটার ভীষণা লোল রসনা মহাকালীর প্রলয়ংকরী মূর্ত্তিকে সব সাধনার অনুষ্ঠানেও অভ্যস্ত। এটাই বাঙালীর সাধনার বৈশিষ্ট্য।

ভারতে কার্ত্তিকমাসে মহা ধুমধামে লক্ষ্মীর পূজোৎসব হয়। সে উৎসবে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে লক্ষ্মীর পাশা ও অন্য আয়গায় প্রচারব্রত সব সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ও প্রচারকগণ সমবেত হন।

অল্প সময়ের মধ্যে জিনিষ পত্র যোগাড় করা সুরু হ'লো। খড় পাওয়া যায় না—তাই দূর গ্রামের এক রকম শুকনো ঘাস দিয়ে ঠাকুরের দেহ তৈরী হ'লো। স্থানীয় লোকজনের ভারী আনন্দ। ভারত

পূর্ব্ব আফ্রিকার টাঙ্গোয়া সহরে ভারতীয় সাংস্কৃতিক মিলনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বৈদিক যজ্ঞ

থেকে এই দূরে দুর্গা পূজা হবে—তাও সন্ন্যাসীর উদ্যোগে। তাই ভাবের দিক দিয়েও সহরে বেশ একটা পরিবেশের সৃষ্টি হ'ল। হিন্দু মণ্ডলীর বড় বড় কর্ত্তা-কর্ত্তারা আমাদের বল্লেন—আপনাদের যা দরকার হবে আমাদের ব'লবেন, আমরা সব যোগাড় ক'রে দেবো। প্রাণপণে চেষ্টা ক'রতে লাগলো সকলে। কিন্তু এটা তো আর বাংলা দেশ নয়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ডিস্ট্রীক্টরিক্ট বোর্ডের পাড় থেকে মাটি নিয়ে এলো। কিন্তু প্রতিমা তৈরীর মতো আঁটাল নয় মোটেই। পাট বা তুঁষ পাওয়া যায় না, তাই আঁটালো করার কোন উপায়ও দেখলাম না! হঠাৎ একজন বল্লে—তুলা মিশিয়ে দেয় মাকি দেখলে হয়। কিছুটা তুলা আনতে বল্লাম।

কিন্তু তুলাতেও হল না। শেষে সিমেন্ট আর তুলা মিশিয়ে চেষ্টা চললো। কোনরকমে 'একমাটি' হোল। সময় বেশী নেই—তাই রাত জেগে কাজ চলছে। সিমেন্ট-মেশানো মাটি একটু শুকুতেই ফেটে যেতে লাগলো। কী করা যায়! আরও কোরে এখন যদি না হয়—তবে মোকদ্দমাই বা কী ঘনে কোরবে। পেয়ে অনেক চেষ্টা বা খোঁজাখুঁজির পরও যে মাটি পেলাম তাও প্রতিমা তৈরীর মোটেই উপযুক্ত নয়—তবু আগেরটার চেয়ে ভাল। আগুনে জাল দিয়ে কোন রকমে কাজ চালানোর মতো কোরে নেওয়া হোল। সেই দিনই—'একমাটি' তৃতীয় দিনে 'দোমাটি' কোরে চতুর্থ দিনে খড়ি দেওয়া হোল। প্রতিমা রং করার উপযুক্ত রং আবার পাওয়া গেল না। যাই হোক যা পাওয়া গেল—তাই দিয়েই রং করা হোল। একেবারে যে খারাপ হোল তা বলা যায় না। তবে সন্ন্যাসীরাই শিল্পী,—আর্টিষ্ট, তাই ওরিয়েন্টাল আর্টের অভাব কে অস্বীকার কোরবে! প্রতিমাতৈরী থেকে সুরু কোরে বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত এত লোকের ভিড় আর কোনদিন দেখেনি। প্রতিমা তৈরী তো শেষ হোল—এখন সাজানোর পালা। মাটির গহনা-পত্র তৈরী করা সম্ভব হয়নি। তাই স্বর্ণকারের দোকান থেকে কেমিক্যাল-সোনার গহনা-পত্র দিয়ে গেলো। কাপড়ের দোকান থেকে সিল্কের কাপড় আসা এলো। ষষ্ঠীর দিন দুপুরেই ঠাকুরের যাবতীয় কাজ শেষ হোল

এদিকে পূজার তিনটি দিনে তিনটি প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।' আফ্রিকার দিগ্বিদিকে টেলিগ্রাম, টেলিফোন করে নিমন্ত্রণের চিঠি পাঠিয়ে আমন্ত্রণ জানানো হ'লো। সকলে বিস্ময়ে স্তব্ধবাক! আফ্রিকার ভূমিতে দুর্গাপূজা! ট্রেন, ষ্টীমার, মোটর, বিমানে করে লোক আসতে লাগলো এই পূজা ও সম্মেলনে যোগ দিতে। বহু চেষ্টা করেও ষোড়শোপচারে পূজার জিনিষ পাওয়া গেল না, তাই পঞ্চোপচারেই পূজা হ'ল। পুরোহিতের অভাব, তাই নিজেরাই পূজা করলাম। তন্ত্র ধারকের ভার পড়লো আমার উপর—পূজা করলেন মৃত্যুঞ্জয় ব্রহ্মচারী।

মহাসপ্তমী পূজা আরম্ভ হ'ল। সকাল থেকে ছেলে-মেয়ের দল সাজিভরা ফুল নিয়ে দলে দলে আসতে লাগলো। যুবকের দল এলো অঞ্জলি দিতে। স্কুল, কোর্ট এবং অন্যান্য অফিস এই সময় বন্ধ ছিল। তাই উকিল-ব্যারিষ্টার, ছাত্র-ছাত্রী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলেই যোগ দিলো এই অনুষ্ঠানে। প্রাতে পূজা, অঞ্জলি, হোম, ভোগ, প্রসাদ বিতরণ, বৈকালে হিন্দু সম্মেলন, অস্ত্র-শস্ত্রসহ দেবীর বীর ভাবোদ্দীপক আরতি—এই সব দেখার জন্য শত শত ভারতীয়, আফ্রিকান ও ইউরোপিয়ান আসতে লাগলো।

কম্পা, কাম্পিয়াবাড় ও গুজরাট প্রভৃতি দুর্গা পূজাতে নবরাত্রি

উৎসব হয়। এই নয়টি দিন এই দেশের অধিবাসীরা পবিত্র ভাবে পূথা পাঠের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করে। এই সময় প্রতি রাত্রে গ্রামের বা সহরের লোকজন একত্রে মিলে নাচ-গান, ভজন-কীর্ত্তন প্রভৃতি করে। বাংলা দেশের ব্রতচারীর 'কাঠি-নাচের' মতো এক প্রকার নাচ নাচে। মেয়েরাও এই নাচ নাচে। পুরুষদের নাচকে 'গর্ব্বি' এবং মেয়েদের নাচকে 'গর্ব্বা' বলে। ধনী বিধান সকলেই এই নাচে যোগ দেয়। নাচের সঙ্গে গান ও তালে তালে বাজনা চলে। ভারী সুন্দর লাগে এই 'গর্ব্বি'। প্রতি রাত্রে দেবীর সম্মুখে এই নাচ হ'ত। এই নাচ দেখার জন্যও অনেক রাত পর্য্যন্ত ইউরোপীয়ানরা থাকতো। অসংখ্য প্রদীপ দ্বারা সুসজ্জিত একটা রথের মধ্যে শ্রীশ্রীদেবী মূর্ত্তি রক্ষিত হয়। তার চার পাশে সকলে নেচে নেচে ঘুরতে থাকে। মেয়েরা সকলে মিলে কোন কোন বাড়ীতে এই গর্ব্বা নাচে—সেখানে পুরুষদের প্রবেশাধিকার থাকে না। আর পুরুষদের এই গর্ব্বিতেও মেয়েরা যোগ দেয় না। আমাদের রামদাস ব্রহ্মচারী গুজরাটের লোক, তাই তিনিও এই গর্ব্বা নাচ নাচতে পারতেন।

মহা ধুমধামের মধ্য দিয়ে পূজার তিনটি দিন কাটলো। এখন বিসর্জ্জনের পালা। এমন সুন্দর প্রতিমা, এত পরিশ্রম ক'রে তৈরী ক'রে বিসর্জ্জন—অর্থাৎ কিনা জলে ফেলে দেওয়া হবে—তা কেউ আগে বিশ্বাসই করেনি। কেননা গুজরাটে দুর্গা পূজার প্রতিমা নির্ম্মিত হয় না। তাই প্রথমে ত অনেকে মনে ক'রল—যে প্রতিমা রাখার জায়গায় অভাবেই বুঝি এই মূর্ত্তি বিসর্জ্জন দেওয়া হ'বে। কিন্তু যখন বিসর্জ্জনের তাৎপর্য্য বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল—তখন সকলে বিসর্জ্জনের আয়োজন সুরু কর'ল। শোভাযাত্রা সহকারে প্রতিমা নিয়ে গিয়ে ভিক্টোরিয়া হ্রদে বিসর্জ্জন দেওয়া হবে। দশমীর দিন বিকাল চারটা থেকেই লোকজন জমতে লাগলো পূজা মণ্ডপে। পাঁচটায় শোভাযাত্রা বেরুলো। সহর প্রদক্ষিণ ক'রে যাবে লেকের দিকে। আফ্রিকানরাও শোভাযাত্রায় যোগ দিল। মাউঞ্জায় এই জাতীয় শোভাযাত্রা আর কোনদিন হেঁটে যেতেনি। এইরূপ সকলে বলাবলি ক'রতে লাগলো। ঘন ঘন জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত ক'রে এই শোভাযাত্রা এগুতে লাগলো হ্রদের দিকে। ছোট একটা মোটর লঞ্চে প্রতিমা নিয়ে তীর থেকে বহুদূরে প্রতিমা বিসর্জ্জন দেওয়া হ'ল। তীরে শতশত নরনারী দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখতে লাগলো। বিসর্জ্জনের পর সকলে এক সঙ্গে বাসায় ফিরলাম।

মাউঞ্জা থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে ভিক্টোরিয়া হ্রদে উকুরেওয়ে নামে একটা দ্বীপ আছে। সেই দ্বীপের নানসিও সহরের লোকজন এসেছিল—আমাদের এই পূজা ও সম্মেলনে। এই সব অনুষ্ঠান দেখে-শুনে তারা তাদের সহরে যাওয়ার জন্য আমাদের অনুরোধ করলে। সেই অনুরোধ স্বীকার ক'রে আমি এবং পরমানন্দ স্বামীজি একখানি ছোট লঞ্চে নানসিওর দিকে রওনা হ'লাম। ভিক্টোরিয়া হ্রদ—হ্রদ হ'লেও পৃথিবীর বৃহত্তম স্বাদু জলের হ্রদ। আয়তন প্রায় পাঁচশ' বর্গ মাইল, লঞ্চটা খুবই ছোট, তাই ঢেউএ দুলতে লাগল। বোধায় আমিকো গা বমি বমি ক'রতে লাগল। শুয়ে প'ড়লাম। সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হ'য়ে বিমঝিমে পশ্চিম গগনের এক কোণে ঢলে পড়েছে; দূর থেকে মৎস্য শীকারীর ছোট ছোট নৌকাগুলো একে একে কিনারার দিকে ফিরছে, মহাউৎসা প্রচারকের বিদায় ও সন্ধ্যাদেবীর আগমনীর আয়োজনে নানসিও দ্বীপের হিন্দুর গৃহ-সংসারে বেশ একটা সাড়া পড়ে গেছে; মঙ্গলময়ের গুণগান ক'রতে ক'রতে নানান্ রকমের পাখীরা দল বেঁধে বেঁধে সোনালী রংএর সূর্য্যকিরণে ডানা মেলে দিয়ে নিতান্ত ক্লান্ত দেহখানি নিয়ে যখন রাত কাটানোর মতো একটা আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটে চলেছিল—তখন আমরা নানসিও দ্বীপের বন্দরে পৌঁছিলাম।

বেশ সুন্দর দ্বীপটি, সবুজ শ্যামলিমায় ঢেকে রয়েছে। মাঝে মাঝে রং বেরংএর ফুল ফুটে তার শোভা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। কমলা, আনারস, আম এখানে যথেষ্ট জন্মে। নিতান্তই ছোট সহরটী। মূল ভূমির (Main land) সঙ্গে কোন সংযোগই নেই। এখন পর্য্যন্ত টেলিফোন বা টেলিগ্রাফের লাইনও বসানো হয়নি—তাই বহির্জগতের সঙ্গে এই ক্ষুদ্র দ্বীপের যেন একান্ত সম্পর্কই নেই। দু' তিন দিন আমরা নানসিওয় ছিলাম। প্রায় শ' দুই হিন্দুর বাস। বেশ ধার্ম্মিক সকলেই। আমাদের সংগঠনের বক্তৃতার পর 'হিন্দু মণ্ডল' গড়ে উঠলো। হিন্দু মহিলাদের জন্যও একটা কার্য্যপদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হ'ল। এখানের কাজ শেষে আবার আমরা মাউঞ্জায় ফিরে এলাম। কয়েক দিনের মধ্যেই আমাদের মাউঞ্জার কাজ-কর্ম্মাদি শেষ হ'ল। তখন আমরা ভিক্টোরিয়া লেকের অপর পাড়ে মুকোমা নামে একটা সহরে যাওয়ার তোড়জোড় করতে লাগলাম।

(ক্রমশঃ)

সংকলন

কিছুদিন যাবৎ বাংলার মাননীয় চীফমিনিস্টার হইবার পর হইতে দৈনিক-পত্রিকাগুলিতে বাংলার মাননীয় প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধান-চন্দ্র রায়ের বিভিন্ন প্রকার বিবৃতি প্রকাশিত হইতেছে। আমেরিকার যাত্রাপূর্ব হইতে তাঁহার যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বাংলার নারীদের সম্বন্ধে তিনি যে উক্তি করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ, তাহা যেমনই অহেতুক তেমনই অযৌক্তিক। বাংলার নারীজাতি হৃদয়ের কোনরূপ দুর্বলতা পরিহারপূর্বক নিজেকে দৃঢ় করিয়াছে বলিয়া তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা বিজ্ঞজনোচিত হয় নাই।

বাংলার নারী দেশের স্বাধীনতা আনয়নের জন্য যে ত্যাগ, শক্তি ও সাহসের পরিচয় দিয়াছে তাহার তুলনা নাই। ডাঃ রায় সে কথা স্মরণ করেন নাই। এ কথা সত্য যে, কিছুদিন যাবৎ একদল বহুলাংশে সরকারী দলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতেছেন, কিন্তু তাহার প্রধান কারণ বাস্তবিকের দুরবস্থার প্রধানতঃ তাঁহাদের উপরই পতিত হইয়াছে। স্বামীপুত্রকন্যাদের মুখে আহার তুলিয়া দিতে না পারিলে তাঁহাদের বিবাহিত জীবন বিষাক্ত হইয়া যায়। —সমাজ

• • •

কলিকাতা হইতে বহরমপুর পর্য্যন্ত যে একমাত্র ছুট প্রশস্ত রাস্তা নির্ম্মাণের পরিকল্পনা ছিল, তাহার পরিত্যাগ করা হইয়াছে। খবর ভালো বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু উক্ত রাজপথ নির্ম্মাণার্থে কিছু কিছু বাসী জমি নষ্ট হইয়া যাইবে বলিয়া একটী সংবাদ বহরমপুর হইতে আমরা পাইয়াছি। বেতোড়া থানার লোকনাথপুর গ্রামের পূর্ব্ব দিয়া নবীনা জেলার দীগা-নগর হইতে এই রাস্তা রেলপথ বরাবর উত্তরাভিমুখে আসিবে এবং তাহার জন্য যেসব কিছু আবাদী জমি নষ্ট হইয়া যাইবে। রেলিনগর-চিৎপুরের মধ্য দিয়া বহরমপুর যাইবার পূর্ব্ব হইয়া রাস্তাটি বর্ত্তমানে কৃষ্ণনগর রোডে মিলিত হইবে। ইহাতেও কিছু আবাদী জমি পড়িতেছে। উক্ত অঞ্চলে আবাদ-যোগ্য জমির অভাব আছে। কাজেই তাহা বিবেচনা করিয়া রাস্তাটি অপর দিক দিয়া অর্থাৎ লোকনাথপুরে পশ্চিমের গঙ্গার বাঁধ বরাবর করিলে কি দুই দিক রক্ষা করা যাইত না? উক্ত রাজপথ নির্ম্মাণে সম্ভবতঃ আবাদী জমি যাহাতে নষ্ট না করা হয়, সেদিকে জনস্বার্থের খাতিরে দৃষ্টি রাখিতে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা যাইতেছে। —সমরাজ

• • •

পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গ বিভক্ত হইলেও, আমরা সকলেই যে বাঙ্গালী সে কথা ভুলিলে চলিবে না। আমরা সকলেই সম্প্রীতিতে বাস করিতে চাই। তাই উভয় দেশের মধ্যে আদান প্রদান, লোক যাতায়াতের এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যবস্থা যত সহজ হয় ততই ভাল। একদল লোক পূর্ব্ব বাংলাকে পশ্চিম বাংলা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিতে চান। বাংলার পরিবর্ত্তে উর্দু চালাইতে চান, ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ করিতে চান। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে উভয় বাংলার পরস্পরের উপর নির্ভর না করিয়া চলিবার উপায় নাই; সুতরাং বাধার সৃষ্টি করিয়া তাঁহারা দেশের ক্ষতি করিতেছেন, দেশবাসীকে কষ্ট দিতেছেন। বৈঠকের পর বৈঠক বসিতেছে, একটার পর একটা সমস্যা সমাধান হইতেছে কিন্তু আবার সমস্যা গজাইয়া উঠিতেছে ব্যাঙের ছাতার মত। বাহির হইতে সমস্যা সমাধানের দ্বারা সমস্যা মিটিবে না। চাই অন্তরের ভাব-পরিবর্ত্তন। মুসলমানরাই পাকিস্তান চাহিয়াছিলেন, আজ পাকিস্তান পাইয়াছেন, তাহাকে বড় করিয়া তোলাই হইতেছে তাঁহাদের বড় কাজ। কিন্তু তাহা প্রতিবেশী পশ্চিম বাংলার সহিত কলহের দ্বারা হইবে না। পশ্চিম বাংলা চায় সম্প্রীতিতে থাকিতে, যাহাতে উভয় দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয় তাহাই করিতে। একে পূর্ব্ব বাংলা হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের সমস্যা সমাধান করিতেই তাহাকে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইতেছে। তাহার উপর উভয় দেশের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে সমস্যা এত প্রবল আকার ধারণ করিবে যে সমাধান অসম্ভব হইবে। ইহাতে পূর্ব্ব-বাংলারও ভাল হইবে না—হিন্দুকে তাহাদের বাপ পিতামহের বাস্তু ভিটা হইতে বিতাড়িত করিলে স্বাধীন মুসলমানদেরও কোন সুবিধা হইবে না। সে কথা তাহারাও বোঝে। সুতরাং তাঁহাদের উচিত গবর্ণমেণ্টকে জানান যে পশ্চিম-বঙ্গ-বিরোধী আইন ও নিয়ম রহিত করিতে হইবে—উভয় দেশের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করিতে হইবে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দিতে হইবে। —'দেশ ও দশ'

• • •

দিল্লীর শতকরা ৯০ জন এবং কলিকাতার শতকরা ৭৫ জন মধ্যবিত্ত সরকারী কর্ম্মচারীর সকলেরই কমবেশী ঋণ আছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে মধ্যবিত্ত সমাজের দান অপরিমেয়। গান্ধীজীর ডাকে প্রথম যাহারা ছুটিয়া আসিয়া বিপ্লবে যোগ দিয়াছিল তাহাদের বেশীর ভাগই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়ে। আমরা ভাবিতেছি, এই মধ্যবিত্ত সমাজ আজ যদি ঋণভারে জর্জ্জরিত হইয়া পঙ্গুত্ব লাভ করে, তবে সমাজে আদর্শ-বাদের হোমানলশিখা জ্বালাইয়া রাখিবে কাহারা? বেপরোয়া হইয়া অকূলে ঝাঁপ দিবার দুর্জ্জয় সাহস আছে যাহাদের—তাহারা যদি দারিদ্র্যে নিষ্কল হইয়া যাইবার উপক্রম করে তবে সমাজের সেই ক্ষতি সত্য সত্যই অপূরণীয়। —লোকসেবক

• • •

স্বাধীন ভারতের বড়লাটের বেতন বার্ষিক ২ লক্ষ টাকা হইতে কমাইয়া ৮০ হাজার টাকা করা হইয়াছে, কিন্তু ঐ সঙ্গে এই সর্ত্ত হইয়াছে যে বড়লাটের এই বেতনের উপর আয়কর লাগিবে না। ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বড়লাটকে আয়কর দিতে হইত, অর্থাৎ ২ লাখ টাকা হইতে

৭০ হাজার টাকা অবশিষ্ট থাকিত। নূতন নিয়মে ৬১ হাজার টাকা বৃদ্ধতঃ মাসে সাড়ে পাঁচ হাজার হইলেও আয়কর দিতে হইলে মাসে ১৫ হাজার অর্থাৎ বছরে ঐ দুই লাখেরই কাছে গিয়া দাঁড়ায়। ফাঁকিটা দেওয়ার কি দরকার ছিল সে বিষয় প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক, উঠিয়াছেও।

বড়লাটের এখনকার চালচলন পুরাণো আমলের নাম্রাজাবাদী ইংরেজ, এমন কি মোগল বাদশাহদেরও হার মানাইয়াছে। যুদ্ধের আগে ১৯-৩৯ সালে তাঁর যে সব খরচ ছিল, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাহা আরও বাড়িয়াছে।

স্বাধিনীর বড়লাট প্রাসাদে ৮৬টি বড় বড় ঘর আছে, তৎসঙ্গে ৫৮টি বাথরুম আছে। ইহার প্রত্যেকটি ঘরে এক একটি মধ্যবিত্ত পরিবার স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে। ঘরগুলি সেই ভাবেই তৈরি করা হইয়াছে, কারণ আগে বিলাত হইতে বড়লোকেরা অনেকেই দিল্লী আসিলে হোটেলে না উঠিয়া লাটবাড়ীতে থাকিতেন এবং তাঁহাদের সুবিধার জন্য ঘরগুলি কতকটা ফ্ল্যাটের ষ্টাইলে তৈরি হইয়াছে।

বড়লাট প্রাসাদে ৩১২ জন ভৃত্য এবং ২৯ জন ঝাড়ুদার আছে। এদের মোট মাসিক বেতনের বিল হয় ২৫০০৮৮ টাকা, অর্থাৎ বছরে ৩ লক্ষ টাকা। যে বড়লাটের নিজের বার্ষিক বেতন ৮৮ হাজার টাকা, তাঁর চাকর ও ঝাড়ুদারদের জন্য বছরে বেতন বাবদ খরচ ৩ লক্ষ টাকা। ভৃত্যদের উর্দ্দির জন্য বার্ষিক ব্যয় ৪০ হাজার টাকা।

বড়লাট প্রাসাদের সংলগ্ন একটি বাগান আছে, উহার আয়তন ২৮০ একর অথবা ৮১০ বিঘা। বাগান তদারকের জন্য ৩৬৩ জন ফুল-বিশেষজ্ঞ ও মালি নিযুক্ত আছে। তাদের বেতন এবং ভাতা বছরে প্রায় ৩ লাখ। অন্যান্য কর্ম্মচারিদের জন্য খরচ বছরে সাড়ে চার লাখ। বাড়ী মেরামতের খরচ বছরে ১২ লাখ। আসবাবপত্র মেরামত ইত্যাদির খরচ বছরে ১ লাখ। বড়লাটবাড়ীর আসবাবপত্রের মোট দাম ৫০ লক্ষ টাকা হইবে। —যুগবাণী

*

আজ অধিক খাদ্য উৎপাদনের দিনে আমাদের এই প্রদেশে যে সকল বিস্তৃত জলাভূমি পড়ে রয়েছে তাদের দিকে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

হাওড়া জেলার কেদোর মাঠ এমনি একটী জলা বা বিল।

বর্গমাইল বিস্তৃত এই জলাভূমি হাওড়া জেলার প্রায় এক চতুর্থাংশ। হাওড়া জেলার পরিমাণ ফল ৫৩৪ বর্গমাইল। হাওড়া আমতা লাইট রেলওয়ে দিয়ে এই বিলের সন্নিকটে পৌছান যায়। এই জলার জল নিকাশের জন্য প্রায় ৮০ বছর পূর্বে এক পরিকল্পনা হয়েছিল। তা কার্যে পরিণত হয় নি। আলমারি ষ্টেশনের কাছে রেলা-রোডের রাস্তার নীচ দিয়ে যে কালভার্ট রয়েছে তাকে প্রশস্ত করে পূর্বেকার জলপথকে বাধাহীন করে কানা নদীতে ফেললে ঐ বিলের জল অনেক পরিমাণে বেরিয়ে যাবে। ইহা ঐ বিলের প্রায় ৭৮ বর্গমাইল গভীরতর জলাভূমির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিনিধিরা বলেন। কথাটি বিশেষরূপ অনুসন্ধান যোগ্য। —সত্যাগ্রহ পত্রিকা

* * *

পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য সচিব শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর সম্প্রতি সাংবাদিক-সম্মেলনে পশ্চিম বাংলার মৎস্যের প্রয়োজনের তুলনায় আমদানী ও উৎপাদনের যে চিত্র পরিবেশন করিয়াছেন তাহা ভয়াবহ। চাউল নাই, দুধ নাই, ডাল নাই, মাংস নাই এবং মাছও যদি অমিল হয় বাঙ্গালী কি খাইয়া বাঁচিবে?

দৈনিক প্রয়োজন	৩১০০০ মণ।
দৈনিক উৎপাদন	২০০০ মণ।
কলিকাতার প্রয়োজন	৬৮০০ মণ।
কলিকাতায় আমদানী	২৪০০ মণ। —সংগঠনী

* * *

ভিক্ষার ঝুলি লইয়া সহস্র সহস্র আশ্রয়হীন ও সুদার্ত্ত উদ্বাস্তুরা চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এক মুষ্টি অন্নের জন্য নারী ও শিশুরা হাহাকার করিতেছে—এই পরিবেশের মধ্যে স্বাধীনতার কল্যাণময় রূপ রসাস্বাদন ও উপভোগ করিবার মত মানসিকতা তাহাদের নিকট হইতে আশা করা যায় না। কি ভারতে, কি পাকিস্থানে—অন্ন ও বস্ত্র ক্রয় করা জন-সাধারণের অধিকাংশ লোকের ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। ধীরে ধীরে জাতি ভিক্ষুকের জাতিতে পরিণত হইতেছে।

—মেপন

* *

অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশ, কুমারী গ্যামেলা মাউন্টব্যাটেন শীঘ্রই লণ্ডনে ভারতের হাইকমিশনার শ্রীকৃষ্ণ মেননের প্রাইভেট সেক্রেটারী নিযুক্ত হইবেন। এজন্যকালীন ভারতের ভাগ্যবিধাতার কন্যা ইণ্ডিয়া-হাউসে চাকুরী গ্রহণ করিলে বিশ্বের দরবারে ভারতের কদর বাড়িয়া যাইবে। ইহাতে একমাত্র কৃষ্ণ মেনন ছাড়া সব ভারতবাসী আনন্দ লাভ করিবেন। অত বড় ঘরাণা এবং প্রতিপত্তিশালিনি সেক্রেটারী লইয়া কাজ করিতে ভীত হওয়া সত্যই স্বাভাবিক। কে কাহাকে চালাইবে এবং তাহাকে কায়দায় রেখে কাজ করিয়া চলিতে হইবে, ইহা সত্যই ভাবিবার বিষয়। —যুগবাণী

*

তথাগতের পথে

নরেন্দ্র দেব

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সপ্তধারার উপর দিকের দুদিকে আরও তিনটি গুহাগৃহ আছে। ব্যাসকুণ্ড, গণেশকুণ্ড ও মার্কণ্ডকুণ্ড। ব্যাসকুণ্ডের উষ্ণপ্রস্রবণটি মহিলাদের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট থাকলেও, সকল মহিলার সেখানে স্নান সংকুলান হয় না। তাঁরা অনেকেই সপ্তধারায় পুরুষদের সাথে মধ্য-স্নানে প্রবেশ করতে বাধ্য হন্। তারই ফলে হয়তো সপ্তধারায় পুরুষ স্নানার্থীদের ভীড় বেড়ে যায়। পাহাড়ের কিছুটা উপরে উঠলেই 'গণেশকুণ্ড ধারা' পাওয়া যায়। চমৎকার সে ধারা দুটি। প্রবলবেগে প্রচুর জল পড়ছে। সপ্তধারার জলের উত্তাপ বৈজ্ঞানিকেরা

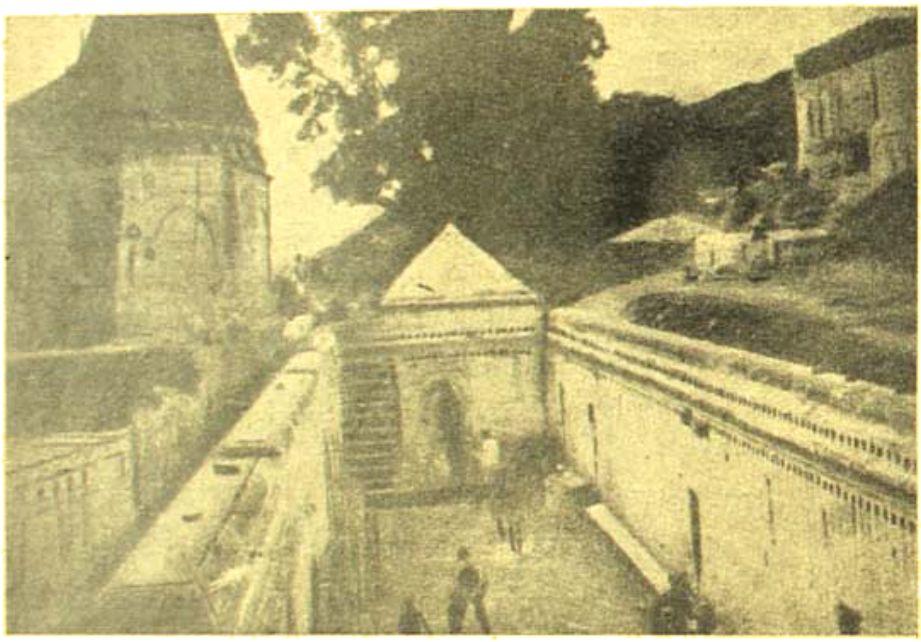

'সপ্তধারা' বা সপ্তর্ষিকুণ্ডের অভ্যন্তরে স্নানাগার

১০ ডিগ্রি ফারেনহিট বলে ঘোষণা করেছেন। গণেশকুণ্ডের উষ্ণতা তার চেয়ে বেশী ছাড়া কম নয়। সেখানে বেশ নিশ্চিন্ত আরামে দীর্ঘকাল স্নান করা যায়, তবুও যত স্নানার্থীর ভীড় সপ্তধারায়। গণেশকুণ্ডে বড় কেউ আসেন না। বোধকরি এখানে মাথা ঠোকাঠুকির কোনও সুযোগ নেই বলেই।

জল বেশ গরম, বুদ্বুদ বুদ্বুদ ধোঁয়া উঠছে। স্নান করতে গেলে প্রথমটা গায়ে ছ্যাঁক্ করে লাগে। মনে হয় ফোস্কা পড়ে যাবে। কিন্তু একটু একটু ক'রে জলে সইয়ে নেবার পর দেহটা খুব আরাম বোধ করে স্নান করতে। সমস্ত শরীরে রক্ত চলাচল দ্রুত হ'তে থাকে। দেহের সকল ক্লান্তি ও জড়তার অবসাদ নিমেষে দূর করে দেয়। বোঝা গেল, রুগ্ন ও অসুস্থ মানুষেরা কেন এখানে বার বার ছুটে আসেন।

কিন্তু মুস্কিল এই, এখানে স্নানার্থীদের এত ভীড় যে ধীরে সুস্থে গায়ে গরমটুকু সইয়ে নিয়ে আরামে স্নান করার মোটেই অবসর মেলে না। অন্ততঃ কিছুজন স্নানার্থী চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে তাঁর স্নান সেরে নেবার তাড়া দিতে থাকেন। যাঁরা অসহিষ্ণু, হয়তো অধৈর্য্য হয়ে একজন স্নানার্থীর দেহের উপর দিয়েই নিজের দেহটা বাড়িয়ে দেন। মাথায় মাথায় তখন ঠোকাঠুকি হ'তে থাকে, বেয়াড়ী রকমের মধ্যে হাতাহাতির উপক্রম হয়। বাক্‌যুদ্ধ প্রায়ই হাতাহাতিতেও পরিণত হয়। কুণ্ডে স্নানের সময় এটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এতটা গরম জল অনেকের মাথায় সহ্য হয় না। তাঁরা গামছা ভিজিয়ে জল ঠাণ্ডা ক'রে নিয়ে মাথায় নিংড়ে নেন। কেউ বালতি ভরে রাখেন ঠাণ্ডা হলে মাথায় ঢালবেন। কেউ কেউ অবশ্যে সেই দারুণ গরম জলে মাথা পেতে বসে যান স্নান করতে। দুয়েক রকমের জল পাত্র ভরে নিয়ে যান তাঁরা পানীয় জলরূপে ব্যবহার করবার জন্য।

সপ্তধারার পাশে পীর মকদুম-সাহেবের সমাধি সৌধ আছে। এখানে ঈদের নমাজ পড়া হ'ত আগে। কিন্তু ১৯৫৩ সালের ১৩ই আগষ্ট, জাতুড়িয়োগ আরম্ভ হওয়ার পর থেকে এই ইদ্‌গা পরিত্যক্ত ও জনশূন্য। একদিন আমরা কৌতূহলের বশে 'মকদুম কুণ্ড' দেখতে গেলুম। দেখে খুশি হলুম। পাহাড়ের কোলে শান্ত নির্জন পরিবেশ। পীর মকদুমসাহেবের সাধনগুহার নিচে পাথরে বাঁধা প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড হাম্মামতল, জলদেশ বাঁধানো। শ্রান্ত পথিকদের বিশ্রামে ও ক্লান্তি দূর করবার আদর্শ স্থান। উত্তর পাশে যাত্রীদের আবাস কক্ষ। প্রাঙ্গণের পুরোভাগে একধারে এই 'মকদুম কুণ্ড'। স্ফটিকস্বচ্ছ নির্মল জল, ঈষদুষ্ণ জলে স্নানের পক্ষে অত্যন্ত আরামপ্রদ। এখানে স্নানেরও অত্যন্ত সুব্যবস্থা। কুণ্ডের মধ্যে

প্রবেশের একটিমাত্র দ্বার। সেই দ্বার পথে কোনও সামাণী পরিবার যদি একখানি বস্ত্রখণ্ড পর্দার মতো ঝুলিয়ে দেন্ তাহলে সেই পর্দা খুলে না নেওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় আর কোনও লোক তার মধ্যে প্রবেশ করবে না। কুণ্ডের মধ্যে একপাশে কাপড় ছাড়া ও তেলমাখার পৃথক দুটি ঘর আছে। সম্ভবতঃ একটি মেয়েদের, আর একটি পুরুষদের। আমরা এই সব সুব্যবস্থাবলী দেখে এবং এই উষ্ণপ্রস্রবণ জলের আকর্ষণে প্রলুব্ধ হ'য়ে সপরিবারে স্নানপর্ব সেরে নিলুম। মনে মনে স্থির করলুম রাজগীর অবস্থান কালে কুণ্ডস্নানে যদি আসি তবে এই পীরসাহেবের মকদুম্ কুণ্ডেই আসবো। এখানে পাণ্ডার অত্যাচার নেই। একজন প্রৌঢ় মৌলভী কুণ্ডের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত আছেন। তিনি আমাদের কাছে কুণ্ডের মাহাত্ম্য সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। এখানকার জল নাকি সর্ব-রোগ-হর-পঞ্চ-বক্ত্র-সিংহ! পীর মকদুম সাহেব অদ্ভুত জীবনীও শোনালেন তিনি আমাদের। কিন্তু কোন দক্ষিণা যাচ্ঞা করেননি।

গঙ্গা-যমুনা ধারাপ্রপাত

আমরা খুশী হয়ে তাঁকে পীরের মহাপ্রসাদ ফুলের মালা ও আতর পান খেতার জন্ত কিছু দক্ষিণা দিয়ে এলুম।

এই কুণ্ডটি শোনা গেল মোগলেরা অধিকারে যাবার পূর্বে বস্তুতঃ কুণ্ড নামে খ্যাত ছিল। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে দু'দিন রাজগীরে অবস্থান করা সত্ত্বেও আমরা মাত্র আর একটি দিন মকদুম্ কুণ্ডে যাবার অবকাশ পেয়েছিলুম। সপ্তধারা, ব্রহ্মকুণ্ড, সূর্যকুণ্ড এবং গঙ্গাযমুনাতেও দু'বারের মধ্যে পনেরো দিনও গেছি কিনা সন্দেহ। আসলে রোগী ভিন্ন নিত্য ঐ গরম জলে 'বাথ্ নেওয়া' হ'য়ে আসা পোষায় না। তবে বাড়ীর মেয়েরা প্রায় নিত্যই স্নানে যেতেন কুণ্ডে। কুণ্ডে যাবার পথটি কিন্তু বেশ। সরস্বতী নদীর ছোট সেতুটি পার হ'য়ে বাঁ হাতি বেঁকলেই দেখা যায় কুণ্ডে ওঠবার জন্ত পাহাড়ের বুকে তৈরী প্রশস্ত সোপান শ্রেণী। কুণ্ড স্নানের আর একটা প্রত্যক্ষফল দেখেছি, মাথা ঘুরে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই দারুণ ক্ষুধার উদ্রেক হয়। কোনও অসুবিধা নেই সেজন্ত। কুণ্ডে যাবার পথে একাধিক উৎকৃষ্ট খাবারের দোকান আছে। অমৃতির ছোলা আর টাটকা মালাই ও মাখন এখানকার এক বিশেষ আহার্য্য। তা ছাড়া গরম অমৃতী, গরম ক্ষীরমোহন এবং পেঁড়াও মেলে।

এখানকার পাহাড়গুলির চূড়ায় চূড়ায় একাধিক ছোটবড় জৈন-মন্দির আছে। বিপুল পর্বত শৃঙ্গ থেকে নাকি জৈন তীর্থঙ্কর শ্রীমহাবীর প্রথম তাঁর অহিংসাধর্ম প্রচার করেন। সে আজ হ'ল প্রায় ২৫০০ বছর আগের কথা। কার্তিক অমাবস্যার পুণ্য তিথিতে প্রতি বৎসর এখানে ভারতের নানা দিক দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ জৈন তীর্থযাত্রীর সমাবেশ হয়। তাঁরা কুণ্ডস্নান ও পাঁচটি পাহাড় পরিক্রমা করেন। গাঁরা বৃদ্ধ

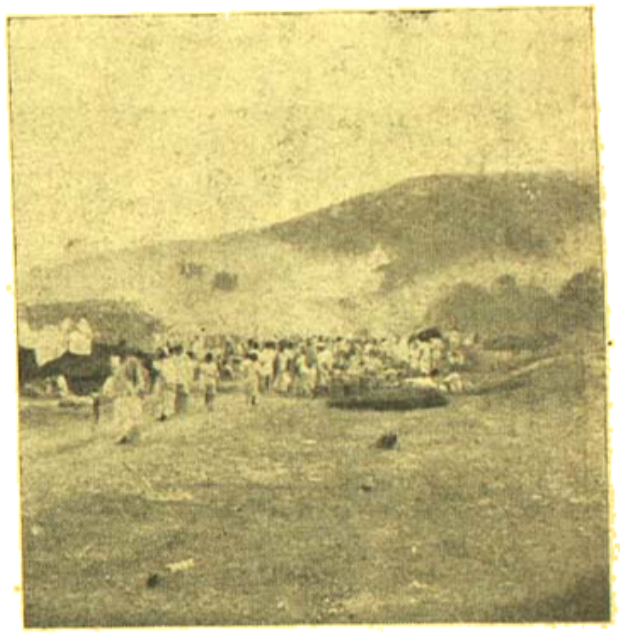

সরস্বতী নদীর এপার থেকে সপ্তর্ষিকুণ্ড দেখা যাচ্ছে।

(পথে স্নানার্থীদের ভীড়)

অশক্ত ও অক্ষম তাঁদের জন্ত কুণ্ডে যাবার ও পাহাড় পরিক্রমার জন্ত 'ডুলি' পাওয়া যায়। আগে পাঁচ টাকাতেই হ'ত, আজকাল দশ পনেরো টাকা চায়। শুধু কুণ্ডে যাতায়াত করতে ডুলি নেয় বেড় টাকা দু'টাকা। যাতে পঙ্গু গাঁরা, তাঁদের কুণ্ডস্নানের একমাত্র উপায় এই ডুলি। এরা একেবারে আরোহীদের পাহাড়ের উপর তুলে বাড়ীর সামনে নিয়ে যায়। সপ্তপর্ণীর অপর অংশের পলায়নোন্মুখ অধিবাসীটি বেনারস চলে যাওয়ার পর বাড়ীর মালিকদের আত্মীয়েরা ঐ অংশে আসবেন খবর আসায় সে অংশ খালি রইলো। ইতিমধ্যে আমাদের অনেক বন্ধুবান্ধব প্রায়ই আমাদের বাড়ী এসে পড়তে লাগলেন। পরিচিত বাঙালী যাঁরাই আসতেন, ষ্টেশনের সামনে সপ্তপর্ণীতে আছি শুনে দেখা করে যেতেন। স্বর্গীয় প্রাতঃস্মরণীয় বন্ধু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান্

অষ্টপতুবাবু বন্দ্যোপাধ্যায় আলবার্ট-ভিক্টরিয়ানের স্বাবধায়ক হয়ে এই সময় আসানসোলে ছিলেন। আমরা রাজগীরে এসেছি শুনে তিনি আমাদের চিঠি লিখে আসানসোল লাইব্রেরির নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। তারপর আমাদের ছেলে মেয়ে সঙ্গে দেখে সপরিবারে রাজগীরে এসে দেখা করে গেলেন। বহুকাল বাদে অষ্টপতির সাথে দেখা। বৌমা এবং পাঁচটি সুবর্ণলতা মাতৃকা ও একটি সুন্দরশিশু নাতিকে পেয়ে খুব আনন্দ করা গেল। এর পরে অক্টোবর আরও কয়েকবার রাজগীরে সপরিবারে এসে আমাদের সঙ্গে পরমগুরুত্বে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে দিয়েছেন। আসানসোলে যাওয়ার আমাদের খুবই আগ্রহ। রাজগীর আসার সর্বপ্রধান আকর্ষণ বলতে গেলে আসানসোল। দুবছর অক্টোবর ও বৌমার আহ্বানে আমরা আসানসোল যেতেই সম্মতি দিয়েছিলুম। শুধু, আরও একটু ভাল করে শীত পড়লে বৌমের ভাগে কষ্ট হবেনা

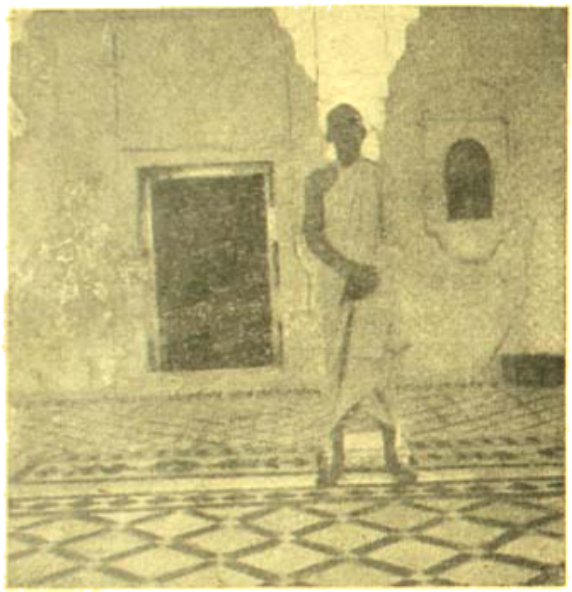

বৈভব মণির প্রাঙ্গণ

বলেছিল বলে—এই জন্য দিনকয়েক পরে যাওয়াই স্থির হোলো।

এইখানে একটা বিষয় বলে রাখা উচিত মনে করি। রাজগীরে ম্যালেরিয়া আছে। টাউনের সমস্ত বাড়ীর ময়লা জল নিষ্কাশনের কোনোও ব্যবস্থা নেই। সর্বত্র আশেপাশে ময়লা জল জমে দুর্গন্ধ হয়, মশার উপদ্রব বাড়ে। রোগও যেথা সেথা; কিন্তু ভাল ডাক্তার নেই। প্রায় ছ'মাস থেকে আমি 'হৃদয় দৌর্বল্য' রোগে ভুগছিলুম। কলকাতার খ্যাত ও অখ্যাতনামা অনেকগুলি চিকিৎসক নানা উপায়ে পরীক্ষার পর আমার রোগ নির্ধারণ করেন occlusion of the coronary artery! হৃৎপিণ্ডের রক্তবাহী একটি প্রধান ধমনী নাকি রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে! চিকিৎসা ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট হয়েছিল—কায়িক পরিশ্রম সম্পূর্ণ নিষেধ। মানসিক উত্তেজনা অত্যধিক নিষেধ। হাঁটা চলা যথাসম্ভব অল্প করলেই ভাল। ট্রামে বাসে ওঠা এবং জনসভায় যোগদান নিষেধ। স্বাভাবিক আহারের পরিমাণ অর্ধেকের বেশি কমিয়ে ফেলতে হবে। ধূমপান আর চলবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। আর নিতে হবে প্রতিমাসে ভিটামিন-বি,—২০ সি. সি, গ্লুকোজের সাথে অন্তত আটটি ইন্ট্রাভেনাস্ ইন্জেকশান।

সঙ্গে তিন ডজন ২০ সি, সি, গ্লুকোজ এবং তিন শিশি 'ভিটামিন্-বি' সংগ্রহ করে নিয়ে রাজগীরে এসেছিলুম। এখানে পৌঁছেই পত্নী সর্বপ্রথমে ডাক্তারের খোঁজে ব্যস্ত হলেন। ইন্জেকশনগুলি নিয়মিতভাবে দিয়ে যেতে হবে, এই পরামর্শটি কলকাতার চিকিৎসকেরা তাঁর মাথায় বেশ ভালো করে বসন করে দিয়েছিলেন। সারা রাজগীর ঘুরে ইন্ট্রা-ভেনাস্ ইন্জেকশান্ দেওয়ার মত ডাক্তার তিনি আবিষ্কার করতে না পেরে অকূল পাথারে পড়ার মত চঞ্চল হয়ে পড়লেন। আমি অবশ্য এতে মনে মনে বেশ খুশীই হয়ে উঠেছিলুম। শ্রীমতীর ব্যাকুলতাটি উপভোগ করতে করতে তাঁকে আরও চঞ্চল করে তোলার সাধু মতলবে ইন্জেকশন্ দেওয়ার উপযুক্ত ডাক্তারহীন স্থানে বাস করা যে কতো বেশি অস্বাস্থ্য ও বিপজ্জনক, বিশেষ করে আমার মতো হার্টের রোগীর পক্ষে, এটা তাঁকে বোঝাতে গিয়ে কিন্তু বিপদে পড়লুম। বলেন—এখানে থাকা হবে না, চলো পাটনায় যাই! মনে মনে তিনি অস্থির হয়ে পড়েছিলেন খুবই, কিন্তু বাইরে অটল ধীরতা অবলম্বন করে মৃদুভাবে চিকিৎসকের অনুসন্ধানে তৎপরতা অবলম্বন করলেন। সারা রাজগীর তন্ন তন্ন করে আশানুরূপ চিকিৎসক না পেয়ে স্বামী কৃপাদন্ডজীকে সাথে নিয়ে পৃথিবী বিহার পরীকে ফেতে প্রস্তুত হলেন। সেখানে আছে একজন এম্, বি, আই, এম্, এস্ বাঙালী ভালো ডাক্তার আছেন। তাঁর কাছে গিয়ে ব্যবস্থা করে আসা হবে, নিয়মিতভাবে তিনি বিহার-শরীফ্ থেকে রাজগীরে এসে একদিন অন্তর আমাকে আত্মঃশৈরিক-পূচিকা ভেদ করে ঔষধ দিয়ে যাবেন। যে—কথা সেই কাজ! শ্রীমতী এসে বললেন আমি আজ ১১টার ট্রেণে স্বামীজীকে নিয়ে বিহারশরীফ ক্যাপ্টেন্ ঘাসগুপ্তের সঙ্গে দেখা করে তোমার ইন্জেকশনের একটা ব্যবস্থা করে আসব। আমি বললুম, রোগীকে শুদ্ধ নিয়ে চলো না। একটু পরীক্ষা করে দেখবেন তিনি, এই গণ্ডারচর্ম ভেদ করবার মত সূচী নৈপুণ্য তাঁর আছে কিনা!

এই সূত্রে বলে রাখি, আমি নিজে এলোপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশ্বাসী মানুষ নই। আমি জানি, যা' হবার তা' হয়ই, কোনও চিকিৎসকই তা প্রতিরোধ করতে পারেন না, আর যা দেরে যাবার তা' দেরে যায়ই, কিনা ডাক্তারেও তা' লাগবেই। মধ্যবর্তী পুস্তকলেখা পূর্বজন্মের কর্ম শোধ করতে চিকিৎসকদের ঘরে এসে 'নিমিত্ত মাত্র ভব সব্যসাচিন্' ঘটান মাত্র। সুদীর্ঘ জীবনে আত্মীয়বন্ধু পরিচিত বহুজনের বহু বিচিত্র রোগ ও তার চিকিৎসা, মৃত্যু এবং নিরাময়তা দেখে দেখে ঔষধে ও ডাক্তারে বিশ্বাস বুদ্ধি না হয়ে দিনের দিন কমে কমে এখন প্রায় বিশ্বাস নেই বললেও অত্যুক্তি হবে না। সুতরাং আমার বৃদ্ধ বয়সের হৃদয়-দৌর্বল্যের চিকিৎসায় গভীর আগ্রহ ও

প্রচেষ্টা যতখানি ছিল, আমার নিজের নির্বিকার নিশ্চিন্ততা ততখানিই অবিচল ছিল বলা চলে। এই সূত্রে একটা ব্যাপার বলি।

ডাঃ ডেন্‌হাম্ হোয়াইটের নির্দেশে মৃন্ময়ী আমাকে নিয়ে পাঠিয়ে দিলেন এক চক্ষুরোগ-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসাগারে। পার্ক ষ্ট্রীটে ওঁরলোকের চেম্বার। আমাকে সঙ্গে নিয়ে একজন ডাক্তার তাঁর কাছে পৌঁছে দিলেন। সেখানে আমার চক্ষুপিণ্ডের বা চক্ষুরাভ্যন্তরের বৈদ্যুতিক আলোকচিত্র তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা হলো। যো হুকুম!—ঘরে পড়লুম লম্বা হয়ে একখানি দীর্ঘকায় পরিচ্ছন্ন শয্যার উপরে। আমার সঙ্গী ডাক্তার এবং আরও দুইজন ডাক্তার আমাকে ঘিরে ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে দাঁড়ালেন। ওঁরা আমার হাতে পায়ে বৈদ্যুতিক—মাপীবন্ধন করে বুকের উপরে একটি বিজলী যন্ত্র স্থাপন করলেন। আমি ওঁদের মুখের পানে তাকিয়ে স্থির হয়ে শুয়ে সবই দেখছি। লক্ষ্য করতে লাগলুম—প্রধান পরীক্ষকের ভ্রূ রীতিমত কুঞ্চিত হয়ে উঠছে। যন্ত্রটির পানে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। ক্রমশঃ মুখ গম্ভীর কালো হয়ে উঠলো।

তারপর আমার প্রতি প্রশ্নবাণ নিক্ষিপ্ত হতে লাগলো।—আপনার কি বুকের মধ্যে কোনও রকম কষ্ট হয়? উত্তর দিলুম—বেশী হাঁটলে মাঝে মাঝে হাঁফ্ ধরা ছাড়া আর কিছু হয় না।

—না না, তা' নয়। ধরুন বুকের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তি বা যন্ত্রণা হয়ে আপনার মনে হয়? কিম্বা বুক ধড়ফড় করা বা হঠাৎ বুকের মধ্যে কেমন যেন ব্যথা করে ওঠা—ঐ রকম কিছু হয়?

একটু চিন্তা করে যথার্থ সত্য উত্তর দিলুম।—না, কখনও হয়নি এমন।

—ঘুমুতে ঘুমুতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে বা বুকের মধ্যে কেমন একটা কষ্ট হচ্ছে, এমনতর কি 'ফীল' করেছেন কখনও?

একটু লজ্জিত হয়েই উত্তর দিলুম, ঠিক ঐ রকমই দুঃস্বপ্নঘটিত ঘর্ণনা আমরা বইতে অনেক লিখি বটে, কিন্তু সত্যিকথা বলতে কি মশাই—ঐ বুকের মধ্যে ধড়ফড় করা, প্রাণের মধ্যে কেমন করা, বুক হুহু করা এসব ব্যাপারের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা একেবারেই নেই। এক ঘুমে রাত্ কাটিয়ে ভোরে ওঠাই আমার আবাল্যের অভ্যাস। বুক কেমন করা, প্রাণ কেমন করে ওঠা—মেয়েমানুষেরই তো স্বাভাবিক লক্ষণ বলে জানি।

এবার প্রশ্ন হলো—আচ্ছা, আপনার খুব মাথা ধরে কি? বললুম—বিশ্বাস করুন, মাথাধরা ব্যাপারটা যে কী তা আমার চিরদিনের কৌতূহল সত্ত্বেও আজও জানতে পারিনি। অনেকেরই মুখে 'মাথা ধরেছে' কথাটা শুনি আর ভাবি, আচ্ছা কার যা হোক! মাথাটা তো মানুষের নিজেরই, ধরছে সে কোন্ যুক্তি? মোটের উপর আজও পর্যন্ত আমার মাথাটা যে কেউই ধরতে ছুঁতে পারেনি এ কথা আমি হলফ্ করে বলতে পারি।

—আচ্ছা, মাথা না ধরুক, মাথা ঘোরে কি মাঝে মাঝে? মাথা ঘোরা ব্যাপারটার সঙ্গে আপনার নিশ্চয় পরিচয় আছে আশা করি?

—বিশ্বাস করুন ডাক্তারবাবু, আমার মাথা কখনও ঘোরেনি,

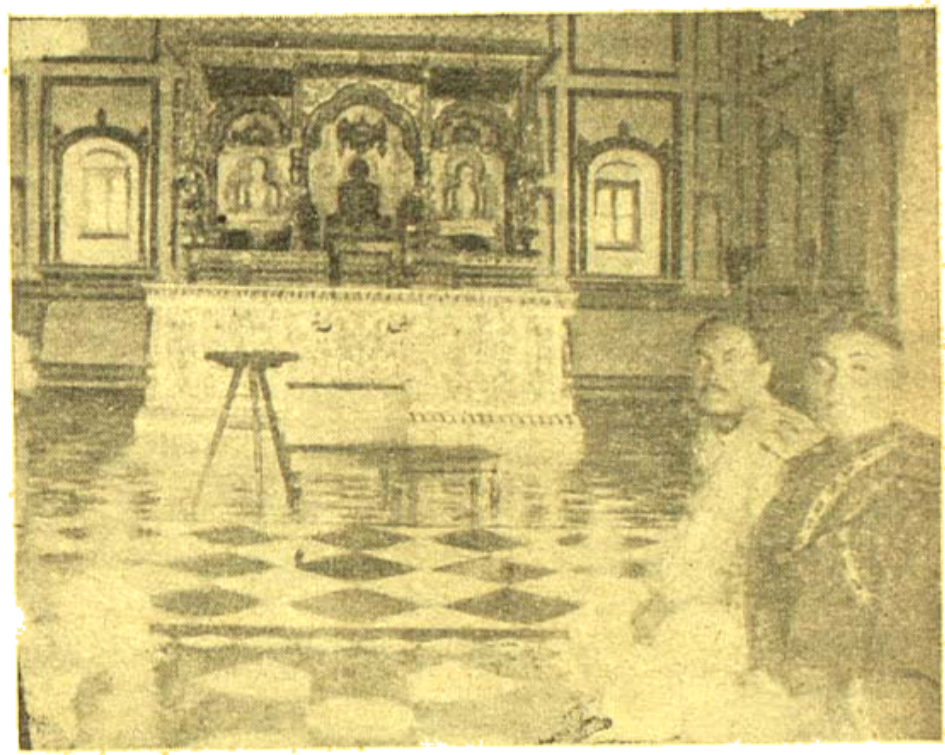

মন্দির অভ্যন্তরস্থ বিগ্রহপীঠ

এখনও ঘোরে না। আমি একথাটাও অনেকের মুখে শুনি বটে। বাড়ীতেই আমার স্ত্রীকে মাঝে মাঝে শয্যা নিতেও দেখি—এই মাথা ধরা আর মাথা ঘোরার স্বরূপ।—কিন্তু, আমি তো বুঝতে পারিনি ঘাড়ের উপর যে-মাথাটি এমন কিরকম্ ঘুরছে,—সে ঘুরবে কি করে? ঘোরাটা সম্ভবই বা হয় কী করে? কিছু মনে করবেন না, আমি বড়ই দুর্ভাগা। সংসারে অনেক সর্বজনবিদিত ব্যাপারে আমি সত্য সত্যই আজও অনভিজ্ঞ। ঘাড়ের উপর আঁটা মাথাটা আমার শুধু এপাশ ওপাশ নড়ে মাত্র, ঘুরতে আদৌ পারে না। ঘুরলে সুবিধা হ'ত খুব, পিছনে কে আসছে সহজেই দেখতে পেতুম।

ডাক্তারেরা বিরক্ত হয়েই অবশ্য আমাকে খুব সন্তর্পণে এবং সাবধানে জীবন যাপন করতে উপদেশ দিয়ে সেদিন সেখান থেকে বিদায় দিয়েছিলেন।

আমার বিহারবন্ধু দাওয়ার প্রস্তাবে পত্নী প্রথমে একটু ইতস্তত করে শেষকালে বললেন চলো—তোমাকেও একটু দেখিয়ে আনি তাহলে।

ডাক্তার দেখাবার জন্য তো আমার জারী মাথা ব্যথা। আসল উদ্দেশ্য বেড়ানটুকু, চাক্ষুষটা একটু দেখে আসবো। বৌদ্ধ যুগের প্রসিদ্ধ জনপদ ওদন্তপুরই নাকি পালের বীর বক্তিয়ারের আক্রমণের পর বিহারশরীফে রূপান্তরিত হয়েছিল। আমাদের বিহারশরীফে যাওয়ার আগের দিন সকাল বেলায় মাহতাবের অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টাল কনফারেন্স যেখানে বসেছে সেই বঙ্গ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য বর্ণমালার ও পণ্ডিত শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য মহাশয় রাজগীরে আবির্ভূত হলেন। শিবপ্রসাদবাবুর সঙ্গে এসেছিলেন তাঁর কন্যা-তুল্য ছাত্রী অরুণি দেবী। ইনি স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র পরলোকগত রামচন্দ্রের সুযোগ্যা সহধর্মিণী। বেনারসের অরুণি দেবী ওরিয়েন্টাল কনফারেন্সে সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করেছিলেন। শুধী শ্রোতারা নাকি সে রচনার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। সতীশচন্দ্র নেই, রামচন্দ্র নেই। বসুমতী অন্ধকার। তারই মাঝে ক্ষীণ শিখার মতো প্রোজ্জ্বল এই বিদুষী বুদ্ধিমতী বালিকা। এঁদের আকস্মিক আগমন মাত্র ছ'দিন পেয়েছিলুম। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই এঁরা রাজগীর ছেড়ে কলকাতা রওনা হয়ে যান। এঁরা যে ট্রেনে কলকাতার গাড়ী ধরবার জন্য বক্তিয়ারপুর যাচ্ছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে আমরাও সেই ট্রেনেই বিহারশরীফের ডাক্তার দাশগুপ্তের খোঁজ করতে বেরুই। সমস্ত পথটা ট্রেনে গল্প-গুজবে কাটিয়ে বিহারশরীফে এসে আমরা নেমে পড়লুম। ডাঃ দাশগুপ্ত, তাঁর পত্নী শ্রীযুতী দাশগুপ্ত ও তাঁর পুত্র-কন্যাদের সাথে পরিচিত হয়ে খুব আনন্দ পেয়েছিলুম। উদার অমায়িকচিত্ত সংস্কৃতিবান এই পরিবারের আতিথেয়তায় ও আন্তরিক যত্ন আদরে পরিতৃপ্ত হয়ে ফিরে এসুম। ডাক্তার দাশগুপ্তের সময় অত্যন্ত কম। আশে-পাশে আর বড় ডাক্তার নেই বলে তাঁর 'ডাক' খুব বেশি। তিনি বন্ধুর মত পরামর্শ দিলেন, এতদূর থেকে আমার পক্ষে রাজগীর ফিরে নিয়মিত একদিন অন্তর ইন্‌জেক্‌শন্ নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। আর আপনার পক্ষেও এত দূরে ট্রেনে এসে নিয়মিত ভাবে ইন্‌জেক্‌শন্ নিয়ে যাওয়াও সুবিধা হবে না। আপনি রাজগীর চ্যারিটেবল্ ডিস্পেন্সারীর ডাঃ সোমীনাথের কাছে ইঞ্জেক্‌শন্ নেবেন। ডাক্তার দাশগুপ্ত অকপটে স্বীকার করলেন যে বড় বড় ডাক্তারের চেয়ে তাদের কম্পাউণ্ডাররাই ইন্‌জেক্‌শান দেয় ভালো, কারণ তারা ঐ কাজ করে করে সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠে! আমার স্ত্রীকে বললেন—আপনি বরং বিহারশরীফ থেকে একটা ভালো দামী সুঁচ সিরিঞ্জে ব্যবহারের জন্য কিনে নিয়ে যান্।

চিকিৎসা ব্যাপার ছাড়া আরও অনেক কিছু আলোচনা করে সন্ধ্যার পর আমরা বিহারশরীফ থেকে রাজগীর ফিরে এসুম। শ্রীযুতী দাশগুপ্ত পত্নীকে ষ্টেশনের অপর দিকের ডিস্পেন্সারী থেকে ইন্‌জেক্‌শনের জন্য একটি সিরিঞ্জের সুঁচ পছন্দ করে কিনে নিয়ে এসে ট্রেনে উঠলেন। ইচ্ছা ছিল, ডাঃ দাশগুপ্তর বাড়ী থেকে বেলাবেলি বেরিয়ে একটু বিহারশরীফটা ঘুরে দেখে নেবো; কিন্তু দাশগুপ্ত পরিবারের আন্তরিকতায় ও গল্প-গুজবে মত্ত হয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানেই কাটিয়ে শেষ-ট্রেণে রাজগীরে ফিরলুম।

(ক্রমশঃ)

কেদার-সাহিত্যের কিঞ্চিৎ

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-টি

কেদারবাবুর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার সময় আমাদের মনে একটা দ্বিধার ভাব জাগিয়া উঠে—মনে হয় তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কিছু বলিতে যাইয়াও পাছে বর্ণনার কার্পণ্যে, দৃষ্টি এবং শক্তির দীনতায় তাঁহার মহত্বকে খর্ব করিয়া ফেলা হয়।

আমাদের ভাগ্যের গুণে এবং ভগবানের আশীর্বাদে যদিও তিনি এখনও আমাদের মধ্যে একজন হইয়া রহিয়াছেন, তবুও আমরা জানি তিনি আমাদের দলের লোক ঠিক নন; তিনি সমস্ত সাহিত্যিক সমাজটীর দলেরই একজন ছিলেন বাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আজ নাই। নূতন বাংলা, তথা নূতন ভারতকে যাঁহারা রূপ দিয়াছেন, বাণী দিয়াছেন, আশা আকাঙ্ক্ষার প্রেরণা দিয়াছেন, কেদারবাবু সেই যুগপ্রবর্তকদের দলের অন্যতম। একে একে তাঁহাদের দলের জ্যোতিষ্কগুলি অস্ত গিয়াছে, তিনিই শুধু স্নিগ্ধ আলোকে উদ্ভাস হইয়া নিজের আকাশটিকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছেন।

এই কেদারবাবু সম্বন্ধে আলোচনা করার সত্যিই বিপদ আছে। নিজের ব্যক্তিগত জীবন দিয়া যিনি অতীতের সহিত বর্তমানের বর্ণসেতু বাঁধাইয়া রাখিয়াছেন, বিভিন্ন যুগের সাহিত্যিক রীতিগুলিকে যিনি মালাগুলি ফুলের মতই আগে পাশে ফুটিতে ও ঝরিতে দেখিয়াছেন এবং তাহাদেরই মধ্যে যিনি প্রাচীন বনস্পতির মত মাথা উঁচু করিয়া আজও দাঁড়াইয়া আছেন, যিনি এখনও সাহিত্যের কলম ধরে ধরে ফুটাইয়া তুলিতেছেন, তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে ভয় হয় পাছে স্পর্ধার অহঙ্কারে তাঁহার প্রতি অবিচার করিয়া প্রত্যবায়ভাগী হইয়া বসি।

কাজেই বর্তমান প্রবন্ধে কেদার-সাহিত্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিতে আমরা সাহস করিতেছি না। আমরা শুধু তাঁহার সাহিত্যের স্থানে স্থানে উঁকি মারিয়া, অতর্কিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার রচনাগুলিকে আকস্মিক উপলব্ধ হিসাবে গ্রহণ করিয়া, তাঁহার সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব।

উপন্যাস, ছোট গল্প, রস-রচনা, কবিতা প্রভৃতি নানা জাতীয় সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্য দিয়াই দীর্ঘদিন ধরিয়া কেদারবাবু বঙ্গবাণীর সেবা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার সৃষ্টির বৈপুল্য বিস্ময়কর না হইলেও সামান্য নহে। তবে এই সাহিত্য সৃষ্টির বিচার করিতে হইলে শুধু তার পরিমাণ দেখিলেই চলিবে না, প্রকারটিও দেখিতে হইবে। কেদার-সাহিত্য আলোচনা করিতে হইলে তার রস, তার ইঙ্গিত, তার শব্দালঙ্কার-চাতুর্য্য, তার শব্দ সৃষ্টির কৌশল, তার ব্যঞ্জনা—এই সমস্ত গুলিকেই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে।

কেদার-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য তার বৈপুল্যে নয়, তার শক্তি ও সংহতে, তার নৈপুণ্যে।

এই শক্তির উৎস কোথায়?

করাসী পণ্ডিত টেন্ তাঁহার "ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস" নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—প্রত্যেক মনীষার মধ্যেই একটা "মেন্ স্ট্রোক" আছে। যদি সেই "মেন্ স্ট্রোক"টির সন্ধান পাওয়া যায় তাহা হইলে অন্যান্য ছোট-খাট কলকব্জার কার্য্যপ্রণালী সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

সাধারণ পাঠককে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় "কেদার-সাহিত্যের এই "মেন্ স্ট্রোক" কি—? তাহা হইলে সকলেই একবাক্যে বলিবেন, "কেদারবাবুর "রসানুভূতি"। কেদারবাবু যে "রস-রচনায়" সুদক্ষ ইহা সকলেই স্বীকার করিবে।

এই রসটি কি?

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা রস বলিতে যাহা বুঝেন এ রস অবশ্য তাহা নহে; কারণ, সংস্কৃত সাহিত্যে করুণ হইতে বীভৎস পর্য্যন্ত সব কিছুই এই রসের পর্য্যায়ে পড়ে। কেদারবাবুর "রস রচনা" বলিতে আমরা তাঁহার ব্যঙ্গ-রসিকতা-সমৃদ্ধ উজ্জ্বল সাহিত্যকেই বুঝিয়া থাকি। অথচ সাধারণ ব্যঙ্গের যে দোষ, সেই আঘাত-প্রবণতার দোষ কেদারবাবুর মধ্যে নাই। তাঁর তিরস্কার গুলি যেন প্রতিপক্ষের বিদ্রূপের মত শুনায় না, তাহা যেন দাদাবয়স্কের সস্নেহ শুধরণ ব্যঙ্গোক্তি, তাহাতে তত্ত্বকথা আছে, সত্য কথা আছে, গালাগালি আছে, তবুও তাহা মিষ্টই লাগে।

কবি বলিয়াছেন "হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ"। কেদারবাবু যেন এই বাক্যের প্রতিবাদ করিবার জন্যই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন। মনোহারী বিদ্রূপের হিতকারী বাক্যে তিনি যেন আমাদের উৎপথ-প্রধাবিত সমাজকে সংশোধন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। বাংলা সমাজের অন্যায় ও অসঙ্গতিগুলিকে রসমুষ্টি দিয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া বিদ্রূপে বিদ্রূপে তাহাকে লজ্জায় অপদস্থ করিয়া তাহাদিগকে সমাজদেহ হইতে বিতাড়িত করাই যেন তাঁহার উদ্দেশ্য।

অথচ এই বিদ্রূপ-প্রবণতার জন্য তাঁহাকে নিষ্ঠুর অথবা বেদরদী ভাবা যায় না। জলাতঙ্ক রোগীকে প্রহার করিয়া রোজা যখন ভূত তাড়ায় তখন রোজার প্রহারটা তার নির্দ্দয়তার প্রমাণ হয় না—কারণ সে নির্দ্দয়তার অনুপ্রেরণা হইতেছে চিকিৎসকের মনোবৃত্তি। কেদারবাবুও যেন সমাজের রোজা হইয়া সমাজের ভূতকে মাঝে মাঝে প্রহার করিতে থাকেন। তাঁহার হাতে চাবুকের লাঞ্ছনা দেখিয়া আমাদের মধ্যে হাস্যরসের উপলব্ধি হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এই হাস্যরসের মূল অনুপ্রেরণা আসিতেছে করুণ রস হইতে।

কথাটা হয়ত কাহারও কাহারও কাছে যুক্তিহীন বলিয়া মনে হইতে পারে। তাঁহারা হয়ত বলিবেন "হাস্যরসের সহিত আবার করুণ রসের সম্পর্ক কি?" কিন্তু সম্পর্ক থাকাটা সত্যই আশ্চর্য্য নয়। ভবভূতি বলিয়াছেন—

"একোরসঃ করুণ এব নিমিত্ত ভেদাৎ
ভিন্নঃ পৃথক্ পৃথগিবাশ্রয়তে বিবর্ত্তান্।
আবর্ত্ত বুদ্বুদ তরঙ্গময়ান্ বিকারান্
অম্ভো যথা সলিলমেব তু তৎ সমগ্রম্।"

কেদারবাবুর সম্বন্ধেও এই কথাই প্রযোজ্য। করুণ রসের প্রেরণাতেই তিনি সমাজের দুঃখ কষ্টকে অনুভব করিতে পারিয়াছেন এবং করুণ রসের প্রেরণাতেই তাঁহার দরদী এবং ভাবপ্রবণ হৃদয় ব্যথিত হইয়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মধ্য দিয়া তাহার সংস্কার চাহিয়াছে।

তবে এই সংস্কার তিনি খিজ prophetদের মত চিৎকার করিয়া অভিশাপের তীব্র বেগাইয়া আনিতে চাহেন নাই; ইহার জন্য তিনি cabypsএর মত তৎপরতা করেন নাই; জলাটএর মত বীভৎস বিদ্রূপের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শিরঃপীড়াকর কটু বাক্যে অন্তরের কিলোলায় করেন নাই। অত্যন্ত ক্ষোভের উক্তির সময়টিতেও তাঁহার মুখের হাসিটি যেন মিলিয়া যায় না।

তাঁহার ব্যঙ্গগুলি করুণ রসের সহানুভূতিতে স্নিগ্ধ হইয়া থাকে বলিয়া সেগুলি আমাদের কাছে খুবই চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠে এবং সেগুলির প্রতি একটা নৈতিক সমর্থনও আমরা স্বীকার করিয়া লই।

অবশ্য একথা নিশ্চয়ই স্বীকার্য্য যে, সমস্ত হাস্যরসের মূলেই এই নৈতিক সমর্থনটি থাকে না; তবুও সে সব ক্ষেত্রে হাস্যরসটিকে রস হিসাবে গ্রহণ করিতে আমাদের দ্বিধা যায় থাকে না। সংস্কৃত নাট্য-শাস্ত্রে হাস্যরসের প্রধান আলম্বন হইতেছে বিদূষক। কিন্তু সেই বিদূষক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে হাস্যরসের সৃষ্টি করে তাহা অত্যন্ত স্থূল, তাহার মূলে করুণ রসের প্রেরণাও নাই আর অন্যে নৈতিক সমর্থনও বিশেষ নাই। ভোজন-লোলুপ লোভী ব্রাহ্মণ চাটুকারিতা ও বিকৃত ভাঁড়ামি করিয়া রাজার অন্যায় লালসার ইন্ধন যোগাইবার জন্য ছদ্ম কলার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলের বিদূষকের প্রতি সত্যিকারের ক্রোধ না হইলেও বিশেষ রকম আকর্ষণ জাগে না, কিন্তু রত্নাবলী বা কর্পূরমঞ্জরীর বিদূষককে দেখিলে যেন ঘৃণাই জাগে। প্রমোদে বিবাহিতা সাধ্বী স্ত্রী থাকিতেও অন্য নারীর রূপ মোহিত কামাতুর রাজার অন্য নারী সংগ্রহের ব্যাপারে রাজার সহকারী বিদূষকের উপর আমাদের মন যেন স্বতঃই বিরূপ হইয়া উঠে। এই রাজাদের পত্নী বর্ত্তমানেও পত্নান্তর গ্রহণ করিবার একমাত্র যুক্তি হইতেছে রাজবংশবর্ত্তির লাভের সম্ভাবনা। "স্ত্রী ভাগ্যে ধন" এই শাস্ত্রবাক্য প্রসিদ্ধ। রূপসী অপরিচিতার কর রেখার মাকি জানা গিয়াছে তাহার

ধর্মের রাজচক্রবর্ত্তির যোগ আছে; সুতরাং রাজা তাহাকে নিশ্চয়ই বিবাহ করিবেন—বীরাঙ্গনা ধরণীকে বীর্য্য বলে জয় করিতে চেষ্টা না করিয়া উপযুক্ত বাহুর ভরসায় সঙ্গে নিজের ভাগ্যের জোড় কখন মিলিয়া যাবে কিনা ইহার অনুসন্ধানে বিরহের ভয়ানক দিনগুলি কাটাইবার প্রবৃত্তি নয়। কাজেই তাহাকে কেন্দ্র করিয়া যে হাস্যরস জমিয়া উঠে তাহাতে কোনও করুণ রসের প্রেরণা অথবা নৈতিক সমর্থন আমরা খুঁজিয়া পাই না। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' অথবা ভাসের "অবিমারক" প্রভৃতি দুই একটি নাটক ছাড়া সাধারণ প্রচলিত নাটকাদির মধ্যে হাস্যরসের আলম্বনগুলিকে আমরা যেন ভালবাসিতে পারি না এবং তাহাদের হাতে যোগও দিতে পারি না। "রত্নাবলী" কাব্যটির বিদূষক বস্তুগুলিও যেন আমাদের রুচি বিরোধী।

ইংরাজী সাহিত্যে swift, pope প্রভৃতির অনেক রচনাতেও আমরা এই নৈতিক সমর্থনটি খুঁজিয়া পাই না এবং সেই জন্যই মনে হয় তাহাদের সাহিত্যিক অমরত্বের অধিকারও নাই।

এই প্রসঙ্গে দুইটি আপত্তি উঠিতে পারে, একটি সমালোচকের আর একটি মনস্তাত্ত্বিকের।

সমালোচক বলিতে পারেন হাস্যরসের সৃষ্টির সহিত নৈতিক সমর্থনের প্রশ্নের কি সার্থকতা থাকিতে পারে? pope Dryden প্রভৃতি যে সকলের যে রচনার মধ্যেই নৈতিক সমর্থন নাই, তাহাদের অনেক স্থানেই বাক্‌চাতুর্য্য আক্রমণের ঘায় প্রতিঘাতে লিখিত হইয়াছে। সেখানে মানুষ হিসাবে pope প্রভৃতিকে আমরা সমর্থন করিতে না পারিলেও তাহাদের কথাগুলিকে কি প্রবল আদরের চক্ষে দেখি না?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে সেটা ভাষা হিসাবে ঐ সমস্ত লিখিত পাঠ করিয়া উহা পাঠ করিবার আকর্ষণ হইতেছে ঐ সব ভাষার সৌন্দর্য্যের বিস্ময়কর, শব্দের ঝঙ্কার, বাক্যবিন্যাসের চাকচিক্য এবং সাময়িক ইতিহাসের প্রতিচ্ছবি। ইহা আমাদের নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে এই সমস্ত বাক্‌কাব্যের চরম ব্যক্তিগত আক্রমণ ও নৈতিক দৌর্বল্য আমাদের রসানুভূতিকে আঘাত করে। তবে অন্যান্য বিষয়ের বিচারের সময়-প্রভৃতি আমরা এই ত্রুটিকে সহ্য করিয়া লই এই মাত্র।

মনস্তাত্ত্বিক বলিবেন, হাস্যরসের সহিত নীতির কোনও সম্পর্ক নাই। হাস্য হইতেছে মানুষের অতীতের বর্ব্বর যুগের একটা বৈশিষ্ট্য। শত্রুকে অথবা শিকারের বন্যকে অসহায় অবস্থায় দেখিয়া তাহার অবস্থার অসঙ্গতি ভাবিয়া প্রতিপক্ষের মনে যে একটা ক্রূর বিদ্বেষাত্মক আনন্দ জাগিয়া উঠে, হাস্যরসের মূল উৎস সেই স্থানেই আছে। কবলাগত মূষিককে লইয়া বিড়াল যে খেলা করে, বন্দিগৃহের জানা কটিয়া, বেরুবে খোঁচা দিয়া, কীটদষ্টকে চিল মারিয়া ছেলেরা যে আনন্দলাভ করে, তাহাই হইতেছে আদিম হাস্যরসের উদাহরণ। এখনও কর্দ্দম পিচ্ছিল পথে চলিতে যাইয়া কোনও লোককে পড়িয়া হাত পা ভাঙিতে দেখিলে আমরা যে হাসি চাপিয়া রাখিতে পারি না, তাহার মধ্যেই বা নৈতিক সমর্থন কোথায়?

কথাটা সত্য। নৈতিক স্বতঃস্ফূর্ত্ত ক্রিয়া হিসাবে হাস্যের সঙ্গে নীতির কোনও সম্পর্ক নাও থাকিতে পারে। কিন্তু শোক এবং সাহিত্যিক করুণ রস যেমন এক জিনিষ নয়, হাস্য এবং সাহিত্যিক হাস্যরসও সেইরূপ এক জিনিষ নয়। সেই জন্য নিছক গালাগালি, বর্ব্বর ভাঁড়ামি, নির্জ্জলা বিদ্রূপের মধ্যে মাঝে মাঝে হাসি পাইলেও সাহিত্যিক হাস্যরস তাহার মধ্যে ঠিক জমিয়া উঠিতে পারে না।

কেদারবাবুর হাস্যরসের মধ্যে আমরা যে জিনিষটির সন্ধান পাই, তাহা সত্যই সাহিত্যের সামগ্রী এবং উচ্চদরের সামগ্রী।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে হাস্যরস জমাইবার জন্য যে বিচিত্র উদ্ভাবন বিভাগের কথা অনন্তর পাশে দেখিতে পাওয়া যায় কেদারবাবু তাহার কোনগুলিকে গ্রহণ করিয়াছেন? এ প্রশ্নের উত্তর এক কথাতেই দেওয়া যাইতে পারে। তিনি হাস্যরসের "বিকৃতাকার বাক্‌চেষ্টা"র উপর বিশেষভাবে নির্ভর করেন নাই।

অবশ্য একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে তাঁহার ভানুঠাকুরমশাই বীরাজবাবু ঘীসু-মামা চাটুয্যেমশাই প্রভৃতির মধ্যে তাঁহাদের শরীরের বিশৃঙ্খলার জন্যই হোক্, অথবা কুরুচির জন্যই হোক্ "বিকৃতাকারত্বে"র উপাদান আছে এবং ঘীসু-মামা চাটুয্যেমশাই প্রভৃতির মধ্যে তোতলামৌওতা এবং 'বাক্‌চেষ্টা'রির বৈশিষ্ট্যগুলি সংস্কৃত নাটকের বিদূষককে স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু ইহাই তাঁহাদের সম্বন্ধে শেষ কথা নয়।

তাঁহার 'পাওনা' নামক উপন্যাসের নায়ক কৌলীন্যসর্ব্বস্ব ঘীসুমামা একটির পর একটি করিয়া বিবাহ করিয়া সমাজের উপকার ও কুলীনের কুল রক্ষার সহায়তা করিয়া যাইতেছেন দেখিয়া আমাদের মনে যখন একটা তরল ও সহজ হাস্যরস জমিয়া উঠে সেই সময় হঠাৎ গ্রন্থের শেষে যোড়শী ও অন্নদার পরিচয় পাইয়া শান্ত ও করুণ রসের প্রাধান্যে আমাদের মন যেন অভিভূত হইয়া উঠে, ভারতের চিরন্তনী আদর্শের কুললক্ষ্মী সর্ব্বংসহা নারী যাহারা শত অত্যাচার ও অবহেলার মধ্যেও শুধু নিজের সতীত্বের গৌরবেই পতিসেবতার জন্য নিষ্কাম সেবার আত্ম-বিলোপ করিতে পারে, তাহাদের সন্ধান পাইয়া আমরা যেন চমকিত হইয়া উঠি।

তাঁহার "সন্ধ্যা-শঙ্খের" মধ্যে দেখি বড় ঘরের মেয়ে সুরমার আভিজাত্য যখনই বীরাজবাবুর ক্ষীণ চিত্তের চালচলনের সঙ্গে বাধা পাইয়া বাধাহত হইয়া উঠে তখনই সে পাইয়া উঠে তাহার মতপুত। স্বামী বীরাজবাবু ঠিক সামলাইতে পারেন না, অথচ তাঁহার চালচলনে মিত মিষ্ট এমন ব্যর্থবোধক শব্দ বাহির হইয়া যায়; যাহাতে অনর্থ আরও বাড়িয়া উঠে।

ইদানীং কিন্তু বহু পরিশ্রমের শুচিবাতিকগ্রস্তা স্ত্রীকে লইয়া ঘর-করা করার দুঃখ দেখিয়া বীরাজবাবু নিজের ছন্নছাড়াকে বাঞ্ছা করিয়া লইতে শিখিতেছেন। ফলে তাঁহাদের বাস্তবিক কলহের আগুন ফুলঝুরির ফুলের মত বাহিরে শক্তিহীন স্ফুলিঙ্গগুলি আকাশ বাতাসে, ফুল

কাটিয়াই নিঃশেষিত হয় এবং ব্যথার ব্যথা হইয়া বীরাজবাবু পুল-যন্ত্রণা-ধারা দাঁতগুলি তুলিয়া ফেলিয়া আপনার হাড় উপড়াইয়া ফেলিবার জন্য সুরমা দেবীকে অনুরোধ করেন। কিন্তু সুরমা দাঁত তুলিবেন কি করিয়া? দাঁত তুলিলেই ত ডেন্টিষ্ট নির্ম্মলের সঙ্গে সম্পর্ক মিটিয়া যায়! কিন্তু নির্ম্মলের মত ছেলে কি শহরে আছে? বাড়ীর অবিবাহিতা মেয়ে রাধারাণীর বয়সটা দেখিতে হইল ত? বাস্তবিকই "স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং" —"দেবা ন জানন্তি"।

এ জাতীয় গল্প পড়িতে পড়িতে শেষে আমাদের থমকিয়া দাঁড়াইতে হয়। হাসাইতে হাসাইতে গ্রন্থকার যে আমাদের ভাবাইতে, কাঁদাইতে, চমক দিতে পারেন, ইহা প্রায় তাঁহার সব গল্পতেই দেখা যায়।

এই জন্যই কেদারবাবুর হাস্যরস সংস্কৃত নাটকের হাস্যরস অপেক্ষা ইংরাজী সাহিত্যের wit ও humourএর সহিত অধিকতরভাবে সম্পর্কিত।

ইংরাজী সাহিত্যে humour কথাটির একটি চমৎকার ইতিহাস আছে। প্রাচীন শরীরতত্ত্বে মানবদেহের মধ্যে রক্ত (blood) পিত্ত (bile) কফ (phlegm) এবং melancholy নামক চারটি রস বা humourএর অস্তিত্ব কল্পনা করা হইত এবং ইহাদের যথাযথ মিশ্রণে মানুষের temperament (মনের অবস্থা) নির্ণীত হইত। ফলে কেহ হইত phlegmatic, কেহ হইত bilious, কেহ melancholy কেহ বা sanguine মনোবৃত্তি যুক্ত।

পরে এলিজাবেথের সময় বরাবর humour কথাটির অর্থ বদলাইয়া গিয়া মানুষের ব্যক্তিগত এক একটা খেয়াল বা বাতিক এই অর্থে কথাটা প্রযুক্ত হইতে লাগিল। Ben Jonsonএর Everyman in his humour নাটকে আমরা humourটি অনেকটা এই অর্থেই প্রযুক্ত হইতে দেখিতে পাই। এখন পর্য্যন্ত humour কথাটির মধ্যে খেয়ালীর যে খেয়ালটিকে লক্ষ্য করা হইত, তাহাতে খেয়ালীর আত্মসচেতন ভাবটি ছিল না।

বর্ত্তমানে এই কথাটির মধ্যে একটা আত্মসচেতন দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়। ব্যক্তিগত খেয়াল, অসঙ্গতি বা দুর্ব্বলতার প্রতি একটা সমাধ মনোভাব লইয়া একটা ত্রুটি স্বীকারের সরলতা লইয়া, একটা সরস মনোবৃত্তি লইয়া হাসি-হাসান ও হাস্যাস্পদ হওয়াই হইতেছে এই humourএর বিশেষত্ব।

Wit humour ঠিক এক কথা নহে। witএর সমালোচক বিচারকের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অপরের বিচার করে এবং বিচারক নিজে সেই সমালোচ্য দোষের গণ্ডীর বাহিরেই থাকিয়া যায়। humour এর মধ্যে সমালোচক নিজেও যেন নিজ ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন থাকিয়া ত্রুটি অসঙ্গতিগুলিকে খানিকটা নিজের বলিয়াই ভাবেন এবং মানুষের অখণ্ডনীয় এবং অনিবার্য্য দুর্ব্বলতার জন্যে নিজেকেও যেন সাধারণের মত জড়িত, অসহায় অবস্থায় দেখিতে পান।

কাজেই এই humour এর মধ্যে একটা করুণ রসের অনুভূতি আছে। কেদারবাবুর রচনার মধ্যে এই humourটিকে আমরা অত্যন্ত সমৃদ্ধভাবে দেখিতে পাই। তাঁহার সন্ধ্যা-কন্যার "মায়ের অনুগ্রহ" নামক গল্পে মৃত্যুর সহিত মুখোমুখি হইয়া মতি মুকুজ্জেকে যখন বলিতে শুনি "না ঠিক সময়ে এসেছেন, তাঁর ভুল হয় না, যদি এসেছো মা ভদ্র ঘরে লুকিয়ে-কাদা আর দেখিয়ে-হাসি আমিয়ে যাও এ জুচ্চুরি আর পারি না মা" তখন আমরা নিজেদের সহিত একই দোষে জড়িত বাবু-সর্ব্বস্ব চাকরবর্গের, প্রাণভয়ের অপ্রতিভ অবস্থাটা দেখিয়া হাসিব, না মতি মুকুজ্জের দুঃখের সহিত নিজেদের অপরাধের অনুভূতিতে কাঁদিব তাহা ঠিক বুঝিতে পারি না। ফলে জীবনের অসঙ্গতি ও বীভৎসতায় আমরা যেন অভিভূত হইয়া পড়ি। "প্রেমের ফাঁদ" গল্পটিতে ভ্রমরপুরীর অন্ধ-নিবাস প্রতিষ্ঠা করিয়া লক্ষপতি পুত্র গোপালের জন্য বসিয়া থাকার মধ্যে নারী হৃদয়ের যে কাতরতা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা একদিক দিয়া যেমন আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে, অন্য দিক দিয়া তেমনই মনকে আর্দ্র ও চক্ষুকে সিক্ত করিয়া তুলে। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ক্ষণ-মিলন

শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়

সান্নিধ্যের উষ্ণশ্বাস শিরায় শিরায়
তীব্র অনুভূতি আনে, জ্বালায় আগুন;
হিম-নিষ্পীড়িত নীড়ে বিহগ-মিথুন
তূষীন-ঝটিকা হতে আত্ম-রক্ষা চায়।

ক্ষণ-মিলনের মধু-আনন্দ আভায়
বিগত বিরহ কাটে বেদনা নিবিড়,
উষার উচ্ছ্বাস নাশে রাত্রির তিমির
হৃদয়-নিলয় প্রেম উজ্জ্বলিয়া যায়।

ক্ষণিকের পরিতৃপ্তি ক্ষণ-অনুরাগে,
স্বল্পতম পুলকের প্রদীপ্তি ভাস্কর,
আলিঙ্গনে আশ্লেষের উদ্দামতা জাগে,
যৌবন-প্রমত্ত প্রাণ তৃপ্ত নিরন্তর।

ক্ষণস্থায়ী এ মিলন স্মরণে অক্ষয়,
শান্ত জীবনের মাঝে অনন্ত প্রণয়।

অমৃতস্য পুত্রাঃ

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য

বহুদিন বাদে গ্রামের স্কুলে আসিলাম। অনেক দিনের বিস্মৃত স্মৃতি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অকস্মাৎ যেন মুখর হইয়া ওঠে; কিন্তু অতীতকে লইয়া নাড়াচাড়া করিবার সময় এখন নয়।

কিশোর ছাত্র-জীবনের কয়েকটি দিন এই বিদ্যালয়টিকে ঘিরিয়া আছে—মহকুমা সাব-ডেপুটির সে কথা এখন আর ইনাইয়া বিনাইয়া ভাবিবার অবকাশ কই?

ভারতের ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল এই দিনটিতে রাষ্ট্র-শাসনকর্তার প্রোগ্রাম অনেক। অনেক সভা-সমিতিতে আজ খৃষ্টান ভারতেশ্বরীর এবং ভারতবাসীর স্বাধীন দেশের নাগরিক কর্তব্যের কথা প্রকাশ করিতে হইবে। ধারালো অভিভাষণে সভাপতি এবং প্রধান-অতিথির জ্ঞান-পরিধিকে প্রচার না করিলে রাষ্ট্রচেতনা জাগ্রত হইবে না।

ছাত্রেরা প্যারেড করিয়া মিলিটারী কায়দায় পতাকাকে অভিবাদন জ্ঞাপন করিল। 'আওা উঠা রহে হামারা'—ভাষার সঙ্গীতে স্বাধীন ভারতের স্বাধীন সত্তাকে প্রকাশ করা হইল। ১৫ই আগষ্টের স্বাধীনতা-উৎসব মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি, গ্রামের পথে পথে তোরণ-দ্বার, ঊঁকা বন্দুকের তোপধ্বনি, কুচকাওয়াজ, ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত একটি গ্রামকেও আজ প্রাণ-চেতনায় উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

স্কুলের প্রধান-শিক্ষক মহাশয় গর্ব প্রকাশ করিলেন—এই গ্রাম্য-স্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্র আমি, আজ তাঁহাদের মাননীয় অতিথি। স্বাধীনতা সংগ্রামের বিজয়ী সেনানী না হইলেও গ্রাম-সংগঠন এবং স্বদেশপ্রীতিতে আমার তুলনার কথা নাকি ভূভারতে মেলে না। এই মহকুমার শাসনকর্তা হিসাবে আমার যোগ্যতা ইতিমধ্যেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আজিকার স্বাধীনতা উৎসবে এই গ্রাম্য-বিদ্যালয় আমার ন্যায় দেশের গৌরব এবং দশের রক্ষককে প্রধান অতিথিরূপে লাভ করিয়া ধন্য!

উচ্ছ্বাসের আধিক্যে স্তুতিবাদ মাত্রা অতিক্রম করিতেছিল। ইঙ্গিতে প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে থামাইয়া দিলাম।

স্বাধীনতা-তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া প্রধান অতিথির বক্তব্য শেষ করিতেই অকস্মাৎ পণ্ডিত মশায়কে মনে পড়িল।

শঙ্কর পণ্ডিত। শঙ্করাচার্যের ন্যায় তেজস্বী পুরুষ, উন্নত নাসিকার স্ফীত। প্রশস্ত ললাটে চিন্তার রেখাকয়টি স্পষ্ট-ভাবে জাগিয়া ওঠে—যখন গভীরভাবে কোন কিছু অনুধাবন করিতে থাকেন। এই গ্রাম্য স্কুলে একটি বৎসরের ছাত্র-জীবনে এই বিদ্যালয়ের মধ্যে সবচেয়ে তাঁহাকেই চিনিয়াছিলাম বেশি। জানিয়াছিলাম—অনেক ঐতিহ্য পণ্ডিত মশায়ের দীর্ঘ সমগ্রটিকে ঘিরিয়া আছে। সাধারণ ছেলের কাছে তিনি ছিলেন দুর্দান্ত—কঠিন নীতিজ্ঞানে অধ্যাপনার নিষ্ঠায় সুকঠোর শাস্তি দিতেন। কিন্তু আমি দেখিয়াছিলাম ভারতীয় সৃষ্টির এক অপূর্ব জ্যোতিষ্ক।

মাথা দুলাইয়া অত্যন্ত গভীরতার সহিত সংস্কৃত শব্দ কয়টি উচ্চারণ করিতেন তিনি—শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।

অমৃতের সন্তান তোরা, তোদের মৃত্যু নাই। কিন্তু ঋষি-বাক্য আজ মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে—তোদের ভীরুতায়, কাপুরুষতায়, হীন কলঙ্কে তেত্রিশ কোটি ভারতের সন্তান তোদের মৃত্যু এনে দিয়েছে মুষ্টিমেয় বিদেশীর দল আর তাদের অনুচরেরা।

কথাগুলি বলিতে বলিতে উত্তেজনার আধিক্যে শঙ্কর পণ্ডিতের দীর্ঘ অবয়বে বৈশাখীর ঝড় দেখা দিত। দুই চক্ষু বহিয়া অগ্নি বর্ষণ করিতেন তিনি—শুধু দেশের স্বাধীনতা নয়, দেশের ঐতিহ্যকেও পর্যন্ত শৃঙ্খলিত করতে চায় ওরা। ওরা এনে দিয়েছে—

নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্র শিখা তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালি—

শঙ্কর পণ্ডিতের খোঁজ করিতে গিয়া শুনিলাম—ইংরাজ রাজত্বে রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁহার শিক্ষক বৃত্তির অবসান ঘটিয়াছে। এখানকার স্কুলের চাকুরী খোওয়াই তিনি অন্য কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।

চাকরি বৃত্তির মাঝে ছাত্রজীবনের একটি ক্ষণকে

পুনরায় চেতনাসমৃদ্ধিতে উজ্জ্বল হইতে দেখিয়া যেমন আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম, সেই জীবনের প্রধান গুরুর সন্ধান না পাইয়া তেমনি বেদনা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলাম। আজিকার এই স্বাধীনতা-উৎসব এই বিদ্যালয়ে সেই ধ্বনিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিতে পারিল না—

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্—হে অমৃত লোকের সন্তান—তোমরা ওঠো জাগো। তোমাদের মনুষ্যত্ব অর্জন করো। স্বাধীনদেশের প্রাণ প্রতিষ্ঠার যোগ্যতা লাভ করে বিশ্বের কাছে প্রকাশ করো তোমাদের প্রাণের সত্যকে—তোমাদের জ্ঞানের আলোককে।

আর ও দু' একটি সভার কার্য সারিয়া ফিরিতেছিলাম—নিজের আবাসস্থলে। একটি আদর মামলার জটিল তত্ত্ব সাব-ডেপুটি মনকে জুড়িয়াছিল।

পথে দুর্ঘটনা ঘটিল। চলন্ত জীপখানি গ্রামা পথে হঠাৎ অচল হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। ষ্টীয়ারিং ফিরিয়া হাণ্ডেল ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইল যখন, তখন গাড়ি হইতে অবতরণ করিলাম। এখান হইতে মহাকুমার সদর গ্রাম দশ মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত। ইতিমধ্যেই থানার খবর পৌঁহাইয়া গেছে—গাড়ির ব্যবস্থা করিতে জমিদার ভবনে লোক ছুটিয়াছে।

গ্রাম পথে নামিয়া যে সংবাদ পাইলাম—তাহাতে মন আমার প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সন্ধান পাইলাম—শঙ্কর পণ্ডিতের।

এই গ্রামেরই নিকটবর্তী পল্লী-অঞ্চলে পণ্ডিত মশায় এক টোল খুলিয়াছেন। কয়েকটি সংস্কৃত-শিক্ষার্থীকে দর্শন-শাস্ত্র পড়ান—প্রাচীন প্রথায়। আমার আগমনবার্তা শুনিয়া পণ্ডিত মশায় লোক পাঠাইয়াছেন আমাকে আমন্ত্রণ জানাইয়া। জটিল মামলার কথা ভুলিয়া রাজকর্মচারিদের পরিত্যাগ করিয়া একাকী খুশী মনে গুরু সন্দর্শনে ছুটিয়া চলিলাম।

ছোট্ট একটি গণ্ডগ্রাম। মাত্র জনকয়েক ভদ্র-পল্লীবাসী এবং কৃষিজীবী লোকজনের সমাবেশে পরি-বেষ্টিত। অদূরে মজা নদীর জলে বিশীর্ণ জলধারা ঘন সবুজ কচুরি পানার মাঝে স্থানে স্থানে জাগিয়া আছে। তাহারই উপকূলে খড়ের-ছাউনি মাটির আবাস একটি—পরিচ্ছন্ন সাধনায় আত্ম-প্রতিষ্ঠিত। ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম—পণ্ডিত মশাইকে। সেই দীর্ঘকান্তি বলিষ্ঠ পুরুষ বার্ধক্য-প্রপীড়িত।

আমাকে দেখিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া বসিয়া পণ্ডিত মশাই কহিলেন—অমল তুমি এসেছো? আমি জানি খবর পেলে তুমি নিশ্চয়ই ছুটে আসবে। বড় আনন্দ পেয়েছি হাকিম হয়েছো শুনে।

অবনত মস্তকে পণ্ডিত মশায়ের পদধূলি গ্রহণ করিয়া-বিনীত কণ্ঠে কহিলাম—বড় সৌভাগ্য আমার, আজ আপনার মতন সাধুজনের সাক্ষাৎ পেলাম। ফুলবাড়ির স্কুলে ছাত্র-জীবনের কয়েকটি মূল্যবান দিনের কথা আমি আজও ভুলতে পারি নি। সাক্ষাৎলাভে ধন্য হব বলে। ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরছিলাম, হঠাৎ এই গ্রামের পথে গাড়ি খারাপ হ'য়ে গেল।

পণ্ডিত মশাই খুশী মনে বলিলেন—একেই বলে ঘটনা-চক্র। আমি কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। শঙ্কর পণ্ডিতকে দেখিয়া—উন্নত বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় চেহারা তাঁহার ধনুকাকৃতি হইয়া বেঁকিয়া গেছে। প্রশস্ত ললাটের সেই চিন্তাশীলতার ছাপ গাঢ় সবীবর্ণে আচ্ছাদিত। স্ফীতকায় নাসিকার অবসন্নতার নিষ্প্রভ শ্বাস প্রশ্বাস। চক্ষু দুইটির গভীরতা কেবল থাকিয়া থাকিয়া প্রকাশ পায়।

ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিলাম—স্কুলের চাকরি ছেড়ে নিশ্চয়ই খুব আর্থিক কষ্টে আছেন?

পণ্ডিতমশাই উত্তর দিলেন—না, কষ্ট আর এমন কী? দিন একরকম চলে যায়। কয়েকজন ছাত্রকে উপনিষদ আর দর্শনশাস্ত্র পড়াই। প্রচুর আনন্দে আছি এই নিয়ে। অতীত ভারতের লুপ্ত ঐশ্বর্য প্রকাশ করবার বরাত যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছি, কিন্তু দুঃখ এই যে ভগবানের মার—দুনিয়ার বার।

পণ্ডিতমশায়ের এ কথায় খুশী হইতে পারিলাম না। বলিলাম—আমার কিন্তু পণ্ডিতমশাই ফুলবাড়ির স্কুলের কথা খুব মনে পড়ে। সেখানে যে শিক্ষা আপনার কাছে পেয়েছিলাম—আমার জীবনের তা প্রকাণ্ড সম্পদ।

আমার কথায় পণ্ডিতমশাই আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। আত্ম-প্রতিষ্ঠার বিরাট সার্থকতাকে তিনি যেন খুঁজিয়া পাইয়াছেন। খুশীর আধিক্যে তিনি কাটিয়া পড়িলেন। উচ্চৈঃস্বরে গৃহিণীকে ডাক দিয়া তিনি সগর্বে

প্রকাশ করিলেন—শুনেছো লক্ষ্মণের মা। শোনো আমার শিক্ষা ব্যর্থ হয়নি। মহকুমার হাকিম আজ সে কথা সগর্বে উচ্চারণ করছেন।

কৃশতনু পণ্ডিতগৃহিণী—মলিন শাড়ির আচ্ছাদনে সর্বাঙ্গে দারিদ্র্যের ছাপ লইয়া আমার সম্মুখে আসিতে লজ্জা পাইতেছিলেন।

পণ্ডিতমশাই কহিলেন—ও আমার ছাত্র অমলকুমার। মহকুমার হাকিম হলেও ও অমল তোমার পুত্রতুল্য। ওকে দেখে আবার তোমার লজ্জা কিসের?

স্বামীর আগ্রহাতিশয্যে পণ্ডিতমশায়ের স্ত্রী অগত্যা ঘরে প্রবেশ করিলেন।

আমি অবনত মস্তকে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলাম।

—পণ্ডিতমশাই, চাকরি ছাড়লেন কেন?

আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি যেন ক্রোধে ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইলেন। অতীতের কোন জলন্ত নির্যাতনের কাহিনী অগ্নি-অক্ষরে তাঁহার চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল। উত্তেজনার আধিক্যে সর্বশরীর কাঁপিতেছে। ক্রোধবহ্নি জলন্ত চোখ দুটি হইতে ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইতে লাগিল। পণ্ডিত-গৃহিণী থামাইয়া দিলেন।

শুনিলাম—সে কথা।

১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের একটি জলন্ত কাহিনী।

পণ্ডিতমশায়ের আদর্শে অনুপ্রেরিত তাঁহার এক ছাত্র ঘনঘর্ষায় রাজদ্রোহী বিপ্লবীবেশে তাঁহার আশ্রয়ে আত্মগোপন করিয়াছিল। তিনি তাহাকে সযত্নে আশ্রয় দিয়াছিলেন। পুলিশের দল তাহার সন্ধান পাইয়া তাঁহার গৃহে হানা দিয়াছিল। গ্রাম্য স্কুলপণ্ডিত অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করিয়াও রাজদ্রোহী বিপ্লবী বীরকে রক্ষা করিয়াছিলেন। পণ্ডিতমশায়ের স্ত্রীর নিকট শুনিতেছিলাম—এই বীরত্ব কাহিনীর আদর্শ স্বদেশপ্রেমিকতা।

রাজরোষে পণ্ডিতমশাই অনেক কিছু বিসর্জন দিয়াছিলেন—স্বল্প আয়ের গ্রাসাচ্ছাদন, গ্রাম্য স্কুলে শিক্ষকতার বৃত্তি, আজন্মের কষ্টোপার্জিত যাহা কিছু সঞ্চয় এবং এমন কী তাঁহার দক্ষিণ হস্তের কয়েকটি আঙুল পর্যন্ত।

লক্ষ্য করি নাই এতক্ষণ পণ্ডিতমশায়ের দক্ষিণ হস্তের ক্ষতিত আঙুল কয়েকটি। পুলিশের অত্যাচারে চিরতরে বিনষ্ট হইয়া গেছে। দক্ষিণ হস্তে তিনি আর লেখনী ধারণ করিতে পারেন না—এই বেদনাই পণ্ডিতমশায়ের অন্তরকে থাকিয়া থাকিয়া বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে।

অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। সরকারের অনুগ্রহপুষ্ট উচ্চ রাজকর্মচারী আমি—স্বাধীনতার মূল্য পাইয়াছি প্রচুর, যশ, মান, অর্থ, ঐশ্বর্য—জীবনের যাহা কিছু কাম্য সবই। আর আমার শিক্ষা এবং দীক্ষাগুরু স্বাধীন ভারতে স্বাধীনতার লড়াইয়ে অপূর্ব আত্মত্যাগে স্বদেশ-প্রেমিকতার লাভ করিয়াছেন স্বাস্থ্যহীনতা, বার্ধক্য, আজন্ম-দারিদ্র্য এবং অপযশ। অখ্যাত গণ্ডগ্রামে বসিয়া কায়ক্লেশে সংসার জীবন যাপনের মাঝে ভারতীয় ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করিবার মহান আদর্শকে গ্রহণ করিয়া আজও তিনি অমৃতের পুত্রদের সঞ্জীবিত করিবার প্রচেষ্টা করিতেছেন।

ঘনায়িত সন্ধ্যায় প্রদীপের মৃদু আলোকে পণ্ডিতমশায়ের কাটা আঙুলগুলি দেখিয়া বেদনা-হত কণ্ঠে বলিলাম—পণ্ডিতমশাই, স্বাধীন ভারতে আপনার চরিত্র মহিমান্বিত। আপনার ত্যাগের কথা দেশ জানে না। আজকাল স্বদেশী সরকার আপনাদের ন্যায় আদর্শ স্বদেশ-প্রেমিকদের পুরস্কৃত করছেন। আমি আপনার মাসোহারা সরকারী তহবিল থেকে দেবার ব্যবস্থা করবো।

আমার এ কথায় পণ্ডিতমশাই উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। বিশ বছর আগেকার ফুলবাড়ির গ্রাম্য স্কুল-পণ্ডিত কণ্ঠে সেই জোরালো সংস্কৃত ধ্বনি পুনরায় দীপ্তকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিল—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ। স্বদেশ-প্রেমের পুরস্কার চাইবো দেশ-সেবা করেছি বলে? জানো, অতীত ভারতের চাণক্য পণ্ডিতের আদর্শ? রাজা তাঁকে প্রলুব্ধ করতে পারে নি।

পণ্ডিতমশায়ের এ কথার তাৎপর্য অনুভব করিয়া স্তব্ধ হইয়া গেলাম।

গ্রামের জমিদার মোটর লইয়া স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন—মহামান্য মহকুমা সাব-ডেপুটিকে সাদরে পৌঁছাইয়া দিতে। কিন্তু গাড়ি ফিরাইয়া দিলাম। ১৫ই আগষ্টের কার্যসূচী আমার শেষ হয় নাই।

পণ্ডিতমহাশয়ের ছাত্রেরা এবং ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মাতিয়া উঠিলাম স্বাধীনতা দিবসের উৎসব পালনে। পণ্ডিত মশায়ের গৃহ প্রাঙ্গণে উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

আয়োজন প্রায় শেষ।

জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিবার সময় দীপ্তকণ্ঠে শতবর পণ্ডিত ভারতের মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া স্বাধীন ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যময় সত্তাকে প্রকাশ করিলেন। ফুলবাড়ির গ্রাম্য স্কুলের পণ্ডিতমশায়কে নূতন করিয়া চিনিলাম। অতীত ভারতের ঋত্বিক ঋষি—তাঁহার উদাত্ত কণ্ঠে অমৃত লোকের আহ্বান—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ

রাজরোষগাম্ভীর্য্যচারিত্রিকমহিমাকে খর্ব করিতে পারে নাই—উন্নতমস্তকে যিনি সকল অত্যাচারকে উপেক্ষা করিয়াছেন, দারিদ্র্য যাঁহার অঙ্গের ভূষণ—অভাব যাঁহাকে কোন দণ্ড দিতে পারে নাই—অতীত ভারতের সেই ঋষি-শক্তিকে স্বাধীনতার বার্ষিকী উৎসবে নিঃশব্দে প্রণাম করিলাম।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

(বহ্নি ও সৌরভ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

১৯০৩ সালের জুলাই মাসে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। বিলাত যাওয়ার পূর্বে বিডন ষ্ট্রীটে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের অনুকরণে এক বিদ্যালয় তিনি স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন। এখন এই বিদ্যালয়টীকেই আদর্শ শিক্ষালয়ে পরিণত করিবার জন্য প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করেন। বিদ্যালয়ের নাম হইল "সারস্বত আয়তন"। তাঁহার কল্পনা ছিল জাতির প্রতিমূর্ত্তি এই আয়তন হইতে দলে দলে শিক্ষিত আচার্য সৃষ্টি হইবে এবং আয়তনের শিক্ষিত, ব্রহ্মবী, দেশহিতব্রতী আচার্যের চেষ্টায় সমগ্র দেশের চেহারা বদলাইয়া যাওয়া যাইবে। তাঁহার তত্ত্বাবধানে রেওয়াচাঁদ আয়তনের ভারপ্রাপ্ত কর্মাধ্যক্ষ হইলেন। দিন দিন বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। ছাত্রসংখ্যা বিপুলভাবে বাড়িতে লাগিল।

বসন্তকাল সমাগত হইলে উপাধ্যায়জী জ্ঞান ও সরস্বতীর প্রতীক সরস্বতী পূজা ও বসন্তোৎসব আয়োজন করিবার জন্য বলিলেন। রেওয়াচাঁদ কিন্তু ভুল বুঝিলেন। তাঁহার ধারণা হইল—জীবন-সহচর ও গুরু ব্রহ্মবান্ধব বুঝি সনাতনী প্রতিমা-পূজক হইয়াছেন। আরও ভুল করিলেন, 'প্রকৃত ক্যাথোলিক কি প্রতীক পূজার সমর্থক হইতে পারে?' ব্রহ্মবান্ধবের যুক্তি ছিল যে 'আয়তনের' অধিকাংশ ছাত্রই সনাতনী হিন্দুসমাজের,হিন্দু ছেলেদিগকে তিনি হিন্দু হিসাবেই শিক্ষিত করিয়া তুলিতে চাহেন। তাহাছাড়া বাংলার লালপার্শ্বকে ব্রহ্মবান্ধব অন্য দৃষ্টিতে দেখিতেন, ভগবান সৎ চিৎ ও আনন্দ— এই সকল উপাধির মধ্যে আনন্দময় ব্রহ্মকে তিনি প্রত্যক্ষ করিতেন এবং বিশ্বাস করিতেন যে সাধারণ মানুষও বুঝিতে চাহিলে আনন্দ মুখর উৎসবের ভিতরেই উৎসবের অধিপতিকে উপলব্ধি করিতে পারে। 'আয়তনে' পূজা হইল এবং গ্রাম বাসীও মহানন্দোল্লাসে বিভোর হইল। ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন সকল কিছুর মধ্যেও বিরাজিত সত্তার মত। রেওয়াচাঁদ কিছুতেই গুরুকে বুঝিতে পারিলেন না। মহার সম্পত্তি বেশ সকল কিছু পরিত্যাগ করিয়া, অনাহার ও মৃত্যু প্রতি পদক্ষেপে উপেক্ষা করিয়া যিনি গুরুকে কারার পিছনে ছায়ার মতন অনুসরণ করিয়া আসিতে ছিলেন আজ তাঁহাকেই নীরবে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এই সাধু খ্রীষ্টান সকল কিছুই সহ্য করিতে প্রস্তুত—কিন্তু প্রতিমা-পূজক হইতে রাজী হইলেন না। রেওয়াচাঁদই পরে ব্রহ্মচারী অমিয়ানন্দ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 'Boy's own home' এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। প্রিয় সহচরের অভাব দূর করিবার জন্য প্রবোধচন্দ্র সিংহ, যোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী প্রমুখ অনেকেই আসিয়া আসিলেন, কিন্তু রেওয়াচাঁদের অভাব উপাধ্যায়জী কখনও বিস্মৃত হন নাই।

বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে উপাধ্যায়জীর অন্যতম কীর্ত্তি বাংলা সংবাদপত্র সম্পাদনা, এতদিন তিনি ইংরাজী ভাষায় সংবাদপত্র পরিচালনা করিতেছিলেন। বাংলা সংবাদপত্রের নাম ছিল "স্বরাজ", "সন্ধ্যা" এবং "করালী"। এতদ্ভিন্ন শ্রীঅরবিন্দ পরিচালিত "ধর্ম্মমতরম্" পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখিতেন। উক্ত তিনখানি পত্রিকা এক সঙ্গে কিম্বা পর পর পরিচালিত হইতেছিল তাহা সঠিক বলিতে পারা যায় না। পুলিসের অত্যাচারে তাঁহার নিজস্ব বহু প্রবন্ধ আজও লোকচক্ষুর অন্তরালে। অনেক সময় সরকারী ফাইল হইতে তাঁহার প্রবন্ধের ইংরাজী অনুবাদ পড়িয়াই সন্তুষ্ট হইতে হয়। আশা হয় স্বাধীনতার স্বাধীন আবহাওয়ার শুভ্র হৃদয়ের গোপন অন্তস্তল হইতে এই সকল অমূল্যরত্ন লোক লোচনে আবির্ভূত হইবে।

'সুলভ সমাচারের' পরে সাধারণে 'সন্ধ্যা'র প্রকাশ এক অপূর্ব কাহিনী। এই নূতন সংবাদপত্রের মূল্য "সুলভ সমাচারের" ন্যায় ছিল

যায় একপয়সা। 'সন্ধ্যা' প্রকাশের কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছিলেন "আমাদের অভিপ্রায় আজ পঞ্চম সন্ধ্যা, প্রথম সন্ধ্যায় পার্শ্বিবাবু উঁকি আসিয়াছিলেন এবং তড়তড় এই দেশে টীয়া ধর্ম্মের প্রচার করিলেন; দ্বিতীয় দেশে ধর্ম্মের বিষয় বৈরাগ্যটী তিনিই উচ্চৈঃস্বরে করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় সন্ধ্যা আমিয়াছিল এই দেশে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রাবল্যে, আমরা ও ধর্ম্ম চুরমার করিয়া ফেলিয়াছিল সেই প্লাবন, ভারত তাহার সনাতন আত্মবীর্য, শ্রেদ্ধা ও ভিক্ষাপাত্রে উদাড় করিয়া বিলাইল।

তৃতীয় সন্ধ্যা আসিয়াছিল শঙ্করের আবির্ভাবে, পুরাতন ধূলিকণার মত হইতে মুছে ভারত জাগ্রত হইল এই সন্ধ্যার অবাবহিত পরে। চতুর্থ সন্ধ্যায় হইল ধেক্সবিষয়, রাজা ধেক্স, ধেক্সাচার পথে পথে, সহ্য না করিয়া উপায় নাই। পঞ্চম সন্ধ্যায় যদি হইবে ধেক্সাচার হইতে ধেশকে রক্ষা, ভারতকে পুনরায় তাহার সনাতন, শাশ্বত-ধর্ম্মে অধিষ্ঠিত করো—ইহিতেরা জাগ্রত প্রাণ্য বরাবর নিয়োজিত। উঠো, জাগো প্রাণ্য বর লাভ করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ হও। দেশের আপনার সকলেই যাহাতে বুঝিতে পারে তাহার জন্য পত্রিকার ভাষা হইল সাবলীল ও সরল। মুটে, মজুর এবং ধোকেনীরাও যাহাতে অসুবিধা বোধ না করে সেজন্য বক্তব্য হইল স্বল্প ও সহজ। কাগজের হইল তাহাই; দৈনিক প্রায় ১০০০০ "সন্ধ্যা" ছাপা হইত; জমিদার, মধ্যবিত্ত হইতে সাধারণ মজুরী সকলেই 'সন্ধ্যা' পড়িত। তাহার বক্তব্য কড়া হইত কেন, তাহার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া উপাধ্যায়জী বলিতেছেন, "আমরা সাপটিয়ে ঘুমিতে প্রাণের কথা লিখি তাই ইহা সভ্য বাবুদের ভাল লাগে না। সভ্য বাবুরা ঘোরে-ফেরে কথা কহেন ও লিখেন, আমরা কিন্তু হৃদয়ের আবেগ অমন সভ্য ভাবে প্রকাশ করিতে পারিব না; তাই সভ্য বাবুদের আমরা দূর হইতে নমস্কার করিয়া বিদায় লই"। "আমাদের খাইবিত বুলি এত তোয়াজে নয়—তবে যখন রাশ দেখাতে হয়, হাঁক ডাক করিতে হয় তখন মিষ্টি মিষ্টি বলিলে চলিবে না। দেশের রোগটাও কিছু বিষম হইয়াছে তাই মকরধ্বজের উপর চটী খাওয়াইতে হইবে, এ সময় কি তেলপানা চলে? দেশের চারিদিকে তমোদ্বার—কপাটতা, এখন হাত বুলাইলে চলিবে না, ধোঁকা দিতে হইবে।"

"সন্ধ্যা" চারিদিকে আলোড়ন তুলিয়াছে এমন সময় পর পর কয়েকটী ঘটনা ঘটে; একজন ইংরেজ পাদরী কার্জুহার টীয়া ও শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করিয়া কয়েকটী বক্তৃতা দেন। খড়দহের কিনিমি টিকেট-কলেক্টার হরিদাসী যে নারী এক মহিলার উপরে অত্যাচার করিবার অভিযোগে ধৃত হয়, লর্ড কার্জনের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা, (১১, ২, ০৪)। ব্রহ্মবান্ধব একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন। আর্য্য প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বেদান্তের নির্য্যাস হইল টীয়া, সেই টীয়া ও পার্শ্বিবাবুর অপপ্রচারে চতুর্দিকে প্রতিবাদ সভা হইতে লাগিল। বর্ত্তমান চৌকিদারী প্রথা যে কত অসহায়, প্রাচীন পঞ্চায়েৎ প্রথা ছিল শক্তিশালী, তাহার জনসাধারণের শক্তির উপর ছিল নির্ভরশীল। তিনিই প্রথম আমাদের সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম দিলেন 'গোলামখানা'—কারণ এখানকার শিক্ষার বিষয় বস্তু হইল 'গোলাম' ও 'গোলামী' জীবনের ভাবধারা সৃষ্টি।

কথা ও বার্ত্তায় তিনি এখন পর্য্যন্ত চরমপন্থী হন নাই কিন্তু প্রথমেই প্রাদেশিক ঘটনা তাঁহাকে চরমপন্থী করিয়া তুলিল। ১৯০৫ সালের ২০শে অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা হয়। চতুর্দিকে যেন আগুন জ্বলিয়া গেল। ভাঙা বাংলা জোড়া দেওয়ার জন্য 'সন্ধ্যা' ও 'যুগান্তর' অফিসে মনে মনে হেসোসেবক ভর্ত্তি হইতে লাগিল। 'সন্ধ্যা' কার্য্যালয়ের কর্ম্মব্যস্ত জীবন বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, মুসলমান, যুবক ও বৃদ্ধ সকলেই উপাধ্যায়জীর প্রেরণায় স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষা লইলেন। মুক্তির ইতিহাসে এই আগমন এক উজ্জ্বল অধ্যায়। কলিকাতা মহানগরীর এক অখ্যাত নীরব গলি 'শিবনারায়ণ দাসের লেন' ত্যাগী, কর্ম্মি ও নবজীবনের স্পন্দনে সমৃদ্ধ করিতে লাগিল। ব্রহ্মবান্ধব অগ্নিবর্ষী ভাষায় লিখিতে লাগিলেন 'লর্ড কার্জন সোজা লোক নহে, গভীর জলে তাহার বাস', 'হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি লর্ড কার্জনের আক্রমণ,' 'কার্জন আমাদের শিক্ষাকে শক্ত করিয়া তুলিল' এবং আরও কত। শ্রীঅরবিন্দের 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় ঘোষণা বাহির হইল। বিদেশী সকল কিছু বর্জন করো, দেশীয় আচার শিল্প মাথায় তুলে লও। ব্রহ্মবান্ধব, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, অশ্বিনীকুমার, শিবনাথ শাস্ত্রী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ এবং আরও কত মহারথী আসিয়া পুরোভাগে দাঁড়াইলেন। সে এক অপূর্ব্ব উদ্দীপনা, জাতীয়তার ভাব-বন্যায় বঙ্গদেশ উজান বহিতে লাগিল। ব্রহ্মবান্ধব লিখিলেন, হিন্দী কথা ভুলিও না। প্রথম ফিরিঙ্গীর নিকট হইতে কিছু কিনিও না। দ্বিতীয় ফিরিঙ্গী ব্যবসায়ীর নিকট যাইবে না। তৃতীয় ফিরিঙ্গী শিক্ষার বর্জ্জন করো এবং দেশে দেশে 'সারস্বত আয়তন' গঠন করো। তিনি লিখিয়া চলিলেন—লাট সাহেব বদলি হইলে কিবা আসে যায়, এক বাটের গরু অন্যহাটে বিক্রয় হইবে। লাল পাগড়ীর ভয় দূর করো ইত্যাদি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার গৌণ উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও কেরাণী তৈয়ারীর মূলমন্ত্রের উপর এই বৈদেশিক শিক্ষাবিধি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই জন্যই দেখা যায়, বিশেষজ্ঞ প্রতিভাবান যুবকগণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার জন্য লক্ষ্য না হইয়া লালদিঘীর চতুর্দ্দিকে—না হয় ডাইরেক্টরের অলিগলি 'কেরাণী-গিরি'র আশায় অনিদ্রায় ঘুরিয়া মরে। কিসে দেশের কল্যাণ বাড়ে, শিল্প ও শিল্পীর দল গড়িয়া উঠে, আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাবধারা বাড়িয়া উঠে, এই জন্য "ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন" প্রতিষ্ঠিত হয়। বহুস্থানে এই প্রতিষ্ঠানের আওতায় 'সারস্বত আয়তন' গড়িয়া উঠে। জাতীয় মানসিক দুর্বলতায় অধিকাংশ এই সকল প্রতিষ্ঠান দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয় নাই, তবে যাদবপুরের ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ স্বদেশী আন্দোলনের বিজয়-কিরীটন হিসাবে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। যে সকল

মহাপ্রাণের আত্মত্যাগে এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি পড়িয়া উঠে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম।

সরকার ভাবিলেন, কয়েকজন রাজদ্রোহীর কার্যকলাপে বিপুল জনতার রাজভক্তির উৎস শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। সেই উৎসমুখ পুনরায় উন্মুক্ত করিবার জন্য যুবরাজকে আনিবার ব্যবস্থা সরকারী আলিপুরের কেতাবী মহল হইতে স্থির হইল। উপাধ্যায়জী লিখিলেন "যুবরাজ আসিবে, যুবরাজ ফিরিয়া যাইবে—আমরা যে তিমিরে সে তিমিরে, দেশ ও জাতির উপরে যে লুণ্ঠন চলিতেছে তাহার প্রতিরোধ করিতেই হইবে।" তিনি বজ্রগম্ভীর স্বরে দেশবাসীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'আর্যাজাতি, আর্যদের এই পবিত্রভূমি। যেখানে এবং যাহাদের মধ্যে ভগবান বহুবার লীলা করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সেই পবিত্র ভূমি ও তাহার অধিবাসী কখনও ধ্বংস হইতে পারে না। আর্যদের ভাষা ও তাঁহাদের যুগ যুগান্তের জ্ঞানও বিফলে যাইতে পারে না। ফিরিঙ্গির সহবাসে যে সকল পাপ তোমাদের স্পর্শ করিয়াছে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে যাইবে, দুঃখ বৈন্য সহ্য করো তবুও ফিরিঙ্গির পায়ে মাথা নোওয়াইবে না, সেদিনে দেশ আবার বাঁচিয়া উঠিবে"।

পূর্ণ স্বাধীনতার উদাত্ত ঘোষণা উপাধ্যায়ের কণ্ঠেই প্রথম ধ্বনিত হইয়া উঠে। "সূর্য ও চন্দ্রের নামে প্রতিজ্ঞা করিয়া আমাই যে আমি অন্তরের গোপনতম স্থান হইতে স্বাধীনতার বাণী শুনিতে পাইতেছি। বসন্ত সমাগমে গুল্মাদির যেমন নবকলেবর হয় ভারতের শাশ্বত জাতি-শক্তির পুনরভ্যুত্থানের লক্ষণ চতুর্দিকে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া আমার দেহেও নবযৌবন ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু শুষ্কমুখে কুসুমের উদ্গম হয় না, আমাদিগকেও দেহে মনে সরলতা, স্বাধীনতা—কেবল মনোভাব হইতে স্বাধীনতা ও রাজবৃত্তির স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে। আমরা চাই সোণার ভারত—যে ভারতে কপিল, গৌতম, বশিষ্ঠ ও ব্যাস, রঘু ও দিলীপ, রাম এবং যুধিষ্ঠির ছিলেন সেই স্বর্গময় ভারতের প্রত্যাবর্তন চাই। রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেই যে দাস-মনোভাব বিদূরিত হইবে এমন কথা নাই। রাজপুত জাতি সম্বন্ধে প্রতাপের বিশ্বাস, হিন্দু পুনরুত্থানে প্রয়াসী শিবাজীর অনুরাগ কিরাইয়া আনিতে হইবে। দাদাভাই নৌরজীর 'স্বরাজ' বিলাতী আমদানী, আমরা এই কেরূপ স্বরাজ চাইনা—আমরা চাই শিবাজী মহারাজের কল্পিত স্বরাজ।

বাংলা দেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় ১৬ই অক্টোবর। এই দিবসকে জাতির 'শোকদিবস' বলিয়া ঘোষণা করা স্থিরীকৃত হয়। বাংলার বিচ্ছিন্ন অংশদ্বয়ের সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্বসূচক রক্তবর্ণ সূত্র পরস্পরের মণিবন্ধে বন্ধন করিয়া প্রাচীন ভারতীয় প্রথার অনুরূপ প্রথা পুনঃ প্রবর্তিত হয়। ঐতিহাসিক যুগে রাজস্থানের কোন রাণী বিপদে পড়িয়া দিল্লীর বিদেশী বাদশাহকে এই 'রক্তবর্ণ' সূত্র পাঠাইয়া দিয়া 'ভাই' বলিয়া সম্বোধন করেন, অভিপ্রায় বিদেশী ভাইও যেন বিপন্ন ভগ্নীর সাহায্যে এগিয়ে আসেন, এখানেও হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান প্রত্যেক ভাই, ভাইএর মণিবন্ধে উল্কন্থে ধরিয়া, সারাদিন উপবাসী থাকিয়া বন্দেমাতরম সঙ্গীতের তালে রাজপথ প্রদক্ষিণ করিয়া পরিচিত অপরিচিত ধনী দরিদ্র সকলের প্রাণে ভ্রাতৃত্বের নবভাবধারা সৃষ্টি করে। দোকানী চলিয়া আসে তাহার দোকান ছাড়িয়া, অফিস আদালত বন্ধ করিয়া উকিল মোক্তার এবং কেরাণীকুল ও সে ভাবস্রোতে আপ্লুত হয়। দেশের সর্বত্র একই ভাবস্রোতে উদ্বেলিত হয়। ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন এই রাখিবন্ধন উৎসবের প্রধান পুরোহিত।

১৯০৬ সালে উপাধ্যায়জী বিশেষ আড়ম্বরের সহিত শিবাজী-উৎসবের আয়োজন করেন। মহামতি তিলক, খাপার্দে, মুঞ্জে প্রমুখ নেতারা কলিকাতায় আসিলেন। এই উপলক্ষে এক স্বদেশী মেলা সংগঠিত হয়। এই মেলায় সিংহবাহিনীর পদতলে প্রার্থনারত শিবাজী-মূর্তি দর্শকগণের চিত্ত আকৃষ্ট করে। অধিকন্তু সপ্তাহব্যাপী নাটকাভিনয়ের ব্যবস্থা থাকায় বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। এই সূত্রে স্বদেশী ও মাতৃপূজা চতুর্দিকে অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হয়।

শিবাজী উৎসবের কয়েকদিন পরেই বন্দেমাতরমের ঋষি বঙ্কিম-চন্দ্রের স্মৃতিদিবস কাঁঠালপাড়ায় প্রতিপালিত হয়। ব্রহ্মবান্ধবের উদ্যোগে এক ইমার-ভর্তি সাহিত্যিক ও দেশপ্রেমিক কাঁঠালপাড়ায় গমন করেন। ইমার যখন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ এর বাড়ীর সামনে দিয়া যাইতেছিল তখন সমবেত বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে সুরেন্দ্রনাথ নামিয়া আসেন এবং সকলকে উৎসবান্তে তাঁহার বাড়ীর ঘাটে নামিতে বলেন। এই কথা লিখিবার উদ্দেশ্য—তখনও রাজনীতিতে পঙ্কিলতা ঢোকে নাই। সুরেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মবান্ধব রাজনীতিক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ পৃথক হইয়া পড়িতেছিলেন, কিন্তু 'মানুষ' হিসাবে তাঁহাদের মনে কোনও মলিনতা প্রবেশ করে নাই, বৈকালের প্রীতি সম্মিলনীতে সকলে ইহাই মূর্ত ভাবে উপলব্ধি করেন।

তাঁহার ধারণা ছিল ধর্ম ও সমাজ আলাদা। ভারতবাসী খৃষ্টিয়ান হইলেও সমাজচ্যুত না হইতে পারে। এই কারণে তিনি নিজকে বৈদান্তিক খৃষ্টিয়ান ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেন। "স্বরাজ তার", "অহিংসা", "বাঙ্গালীর নিজস্ব" প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি বাঙ্গালীর নিজস্ব প্রকৃতি শক্তিত্ব প্রভৃতি বর্ণনা করেন। তাঁহার মতে অহিংসা তখনই সম্ভব, যখন চতুর্দিকের আবহাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ফিরিঙ্গি কবলে নিপতিত জাতির সকল কিছুই আজ অসহজ, অস্বাভাবিক। আজ প্রয়োজন জাতির 'কুল কুণ্ডলিনী' মাকে জাগ্রত করা। 'মা' না জাগিলে কি সন্তান জাগিতে পারে?

"ফিরিঙ্গি আমাদের রাজা নয়, মামলা মুকাবাজ; ইচ্ছা থাকিলে আমাদের ঘরে আমাদের 'রাম' প্রতিষ্ঠা করতে কোনও বাধাই নাই।"

"রান্নাঘরে কুকুর ঢুকলে কি করো। হাঁড়ি কলসী দূর করে ফেলতে হয়, কিন্তু তার আগে কুকুরটাকে তাড়ান দরকার। কুকুর পালিয়ে যাবার সময় মুখ পিঁচিয়ে ত যেবেই, তবু করো না লাঠি তোলো এবং জোরে মারো।"

"ফিরিঙ্গি বড় দয়ালু, মুখে মারো লম্বা দাড়ি
শীতকালে খাই মিঠে আলু"

ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কত উল্লেখ করিব, টাকা গরম, সকলরকমে বেশের দুরবস্থাচিত্র চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। ফিরিঙ্গি সরকারের ও টনক নড়িল। 'যুগান্তর' ও 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার নামে শমন জারী হইল। অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, কৃষ্ণকুমার মিত্রের নামে ওয়ারেণ্ট জারী হইল। ব্রহ্মবান্ধব বুঝিতে পারিলেন তাঁহারও পালা আসিতেছে। কালীঘাট মন্দিরে তিনি শাদা ও কালো রং এর দুইটী পাঁঠা পাঠাইয়া পূজা দিতে বলিলেন, শাদা পাঁঠা হইল ফিরিঙ্গির রক্ত শুষিবার, কাল হইল তাহার রক্ত আবিলতা। ব্রহ্মবান্ধবের খেয়াল হইল—জগজ্জননী যদি ভক্তের এই উপাচার গ্রহণ করেন তাহা হইলে ফিরিঙ্গির কর্মশক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহা হইলে তাহার দেশের বাণও টুটিয়া যাইবে। চক্ষুর সম্মুখের যখন যা খেয়াল তাহা করিতেই হইবে। দিন বহিয়া এগিয়া আসিতেছে খেয়ালের পাখ্‌নাও যেন ক্রমে উড়িয়া চলিয়াছে। মনে হইল বহুদিন ফিরিঙ্গির সহিত বসবাস করিয়াছেন, একই টেবিলে ফিরিঙ্গি-পুষ্ট কেরুখানা খাইয়াছেন, বিশুদ্ধ ভারতীয় হিসাবে তিনি ফিরিঙ্গি সহবাসে পতিত হইয়াছেন, সমাজধর্ম অনুসারে তিনি সাধারণের দৃষ্টিতেও তাহা। জীবনে তিনি অন্যায়ের সহযোগিতা করেন নাই, তিনি কি আজ জীবন-দেবতার ইঙ্গিত উপেক্ষা করিয়া সহচরদের ইচ্ছার নিকটে আত্মসমর্পণ করিবেন? তাঁহার তিরোভাবের দুই মাস পূর্বে ১৯০৭ সালের 'টুয়েন্টীয়েথ সেঞ্চুরী'তে লিখিয়াছিলেন, 'বিশুদ্ধ পানীয় জল বাহিরের নোংরার সংস্পর্শে এসে তাহার পবিত্রতা হারায়, পানীয় হিসাবে জল তখন অযোগ্য হয়। ঠিক তেমনি ফিরিঙ্গি ও বিদেশীর সহিত সহযোজনে কিম্বা সহবিবাহে সমাজ ও ধর্মের পবিত্রতা নষ্ট হয়। দেশহিতৈষী ও দেশপ্রেমিক হিসাবে হিন্দুধর্ম ও সমাজ রক্ষার দায়িত্ব আমারও আছে। হিন্দু সভ্যতা বহু বড় ঝাপ্টা সহ্য করিয়াছে, নূতন করিয়া ক্ষতি করিবার অধিকার কি আমার আছে?' উপাধ্যায়জী পুরায় অস্থির হইয়া পড়িলেন, পরিশেষে পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্নের নিকটে উপস্থিত হইয়া যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বিশুদ্ধ হইলেন। উপাধ্যায়জী এই কার্য্যের দ্বারা প্রমাণিত করিলেন যে তাঁহার জীবনে সমাজ ধর্মের ক্ষমতা অসুর ছিল।

'সন্ধ্যা' ও 'করালী' কাগজে আগুনের ভাষায় প্রবন্ধ লিখিতে লাগিল। "কোন রাজাই সকল লোককে জেল দিতে পারে না। তোমরের থানা ও পুলিশ তৈরী করো। লাঠি, লড়্‌কী, বা'—যাহার যা আছে হাতের কাছে রাখো। যেখানে ৪ জন ভদ্রলোক, সেখানে ৫০ জন চণ্ডাল, বাগদী তৈরী রাখো। আঘাত যেখানেই পাবে সেখানেই আঘাত করো। সভা সমিতিতে কিছুই হবে না।" "সমরীর আদেশ এসেছে জল ঘোলা করো আর ফিরিঙ্গি তাতে দুধ দিক।" "জেনে রাখো হিন্দুর মৃত্যু হয় না, মুসলেট ও নয়। তোমার মরুক, পোকা মাকড়, মর্তে পারো, কিন্তু প্রকৃত হিন্দুও হিন্দু জাতির মৃত্যু নাই। জেনে মর্তে তোমার পুনর্বাস, তোমার কীর্তিতে তোমার জাতির উত্থান হবে। যতই ক্ষেত্রপালা করো ততই তোমার ও তোমার জাতির দুর্বলতা কেড়ে যাবে।"

এর পরের লেখা "ঢেকে গেছি ক্ষেত্রের ধারে" প্রকাশে 'সন্ধ্যা' কার্যালয়ে থানাতল্লাসী হয়। ব্রহ্মবান্ধব ও তাঁহার কর্মচারীদের নামে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয় এবং আসামীদের নামে পরোয়ানা জারী হয়। ব্রহ্মবান্ধব যখনই জানিতে পারিলেন পরোয়ানা বাহির হইয়াছে নিজেই তিনি আদালতে আত্মসমর্পণ করিলেন। ফিরিঙ্গির আদালতে গেরুয়া বস্ত্রের অপমান হইতে পারে ভিন্না করিয়া শাদা ধুতি ও উত্তরীয় পরিধান করিয়া আদালতে হাজির হইলেন ও বিচারক কিংসফোর্ডের সামনে দাঁড়াইয়া সমস্ত দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে লইলেন। দেশবন্ধু (তখনও দেশবন্ধু হন নাই) চিত্তরঞ্জন দাশ হইলেন তাঁহার কৌঁসুলী।

"সন্ধ্যা"র প্রকাশ, প্রচার এবং সম্পাদকীয় দায়িত্ব আমার। ১৩ই আগষ্ট ১৯০৭ সালে সন্ধ্যায় প্রকাশিত "এখন ঢেকে গেছি ক্ষেত্রের ধারে" প্রবন্ধের লেখক আমি। স্বদেশের স্বরাজ সংগ্রামে আমি ইশ্বর নিরোজিত ধনিয়া বিশ্বাসী। যাহারা বর্তমানে আমাদের দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা স্বরাজ-সংগ্রামে তাহাদের স্বার্থের প্রতিকূল। কাজেই এই ফিরিঙ্গির আদালতে, বিচার প্রহসনে, আমি আশ্রয় লইতে অনিচ্ছুক।"

কিংসফোর্ড এই বিবৃতি শুনিবার পরে উষার সহিত বলিয়াছিলেন "অদ্ভুতমন্ত্র", উপাধ্যায়জী জামিনে খালাস হইলেন। দুই পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ প্রভৃতিতে অনেক দিন গড়াইয়া গেল, সাক্ষীসাবুদের জেরায় চিত্তরঞ্জন সময় লইতে লাগিলেন, কিন্তু কিংসফোর্ড পূজার ছুটীর পূর্বেই বিচার শেষ করিতে চাহেন। তিনি ঘোষণা দিলেন বিচারালয়ের নির্দিষ্ট সময়ের পরেও বিচার চলিবে। আসামী পক্ষের কৌঁসুলী রাজী ও হইলেন না, বরং 'রীফ' পরিত্যাগ করিলেন। কিংসফোর্ডের জিদ দেখিয়া তিনি অপর বিচারকের এজলাসে মোকর্দমা স্থানান্তরের জন্য হাইকোর্টে "মোশন" দিলেন, হাইকোর্ট আবেদন অগ্রাহ্য করিলেও নানা কারণে পূজার ছুটীর পূর্বে মোকর্দমা শেষ করা সম্ভব হইল না, ২০।৮।০৭ তারিখে 'সন্ধ্যা'য় 'সিডিশানের ছড়ুম ছড়ুম ফিরিঙ্গির আক্কেল গুড়ুম' এবং ২৩।৮।০৭ তারিখে "প্রেমিকেরা আমাকে নিয়ে যেতে চায় বৃন্দাবনে" প্রকাশিত হয়। ইহার পরে পুলিস সেন নামক একটী বিদ্যালয়ের বালকদের ১০৭ ধারাভুক্ত আদেশ দেওয়ায় "সন্ধ্যা পত্রিকায়" "কসাই পাজী কিংসফোর্ড, পাজী, পাজীর পাজী" প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উক্ত কয়েকটী প্রবন্ধে ব্রহ্মবান্ধব, প্রিন্টার ও ম্যানেজারের নামে দ্বিতীয় রাজদ্রোহের অভিযোগ আনয়ন হইল: কিন্তু উপাধ্যায়জী বলিলেন "আমাকে কারাগারে রাখে এমন শক্তি ফিরিঙ্গির নাই"।

ব্রহ্মবান্ধব এই সময়ে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন, অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ তাঁহার চিরসঙ্গী ছিল। সিডিশানের মোকর্দমার দিনের পর দিন কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া ঐ রোগ সাংঘাতিক বাড়িয়া গেল। অসুখ জানিয়া তাঁহাকে বলা হইয়াছিল—বলিবার প্রয়োজন থাকিলে যথারীতি আবেদন পাইলে বিবেচনা করা হইবে। দৃঢ়কণ্ঠে তিনি জানাইয়া দিলেন "ফিরিঙ্গির নিকটে ভিক্ষা, কখনই না"।

রোগ ক্রমেই উপশমের দিকে না যাইয়া প্রবলতর হইল। ২১শে অক্টোবর সোমবারে কার্ত্তিকবাবুর বাড়ী হইতে তিনি ক্যাম্পবেল

হাসপাতালে ভর্তি হন ; হাসপাতালে যাওয়া কালীন পোষাকের বৈশিষ্ট্য ছিল, খালি পা ধুতি চাদর ও উপবীত ধারণ করিয়াছিলেন। হাসপাতালের রেজিষ্টারে লিখিত আছে—বি. উপাধ্যায়, ব্রাহ্মণ, ধর্মের ঘরে কিছু লিখা নাই। একবার ধর্ম সম্পর্কে তাঁহাকে তিনবার প্রশ্ন করা হয় কিন্তু তিনি উত্তর দেন নাই। তাঁহার মতামত যে ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং বিদেশী রাষ্ট্রের ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার নাই। ২২শে অক্টোবর ডাঃ নৃপেন্দ্রলাল মিত্র 'অপারেশন' করেন। অপারেশন খুবই নিরাপদ হইয়াছিল। তিনি সুস্থই হইতেছিলেন। বৃহস্পতিবারে তিনি আরও সুস্থবোধ করেন এবং শীঘ্রই বাড়ী ফিরিতে পারিবেন এইরূপ মন্তব্যও প্রকাশ করেন। শনিবার "সন্ধ্যা"র দ্বিতীয় রাজদ্রোহ অভিযোগের সংবাদ তাঁহাকে দেওয়া যায়। তাঁহার প্রফুল্ল আনন ক্ষণমুহূর্তের জন্য চিন্তান্বিত হইয়া পড়ে। জামিনে খালাস থাকা অবস্থায় এবং রোগশয্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ হয়তো সম্মত না হইতে পারে? তাহা হইলে কি চিরসঙ্গী নিত্য সহচরদিগকে তিনি রক্ষা করিতে পারিবেন না! শনিবারই সন্ধ্যায় ম্যানেজার ও প্রিন্টার গ্রেপ্তার হন। এই দিন প্রায় ৪০জন অনুগত বন্ধুবান্ধবের সহিত তিনি কথা বলেন। কিন্তু রাত্রি ৮টার পর হইতে তাঁহার ঘন ঘন অবসাদ ও মূর্চ্ছা আরম্ভ হয় ; মাঝে মাঝে জ্ঞান হইলেও ব্যথার আবেগে তিনি তাঁহার প্রিয় ঠাকুরকে ডাকিতেন, "ঠাকুর ঠাকুর"! ব্যারামের গতি ক্রমশঃ খারাপের মতন দাঁড়ায়!

ডাক্তারদের মিলিত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ২৭শে অক্টোবর রবিবার সকাল ৮টায় সব শেষ হইয়া গেল। বিদেশী বিচারকের ভ্রুকুটী উপেক্ষা করিয়া স্বদেশের চিরমুক্ত আত্মা অনন্তধামে চলিয়া গেল। স্বদেশবাসীর জন্য রাখিয়া গেলেন তাঁহার অগ্নিময় জীবনকাহিনী! সন্ধ্যা পত্রিকার সংবাদ পরিবেশিত হইল ইহাই সসম্মানে স্বর্গারোহণ—ইহাই তেজস্বীর ইচ্ছামৃত্যু—ইহাই কর্মবীরের অবসান।" উপাধ্যায়জীর বয়স হইয়াছিল মাত্র ৪৭ বৎসর।

দলে দলে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সেবাশ্রমের মত তাঁহাদের প্রিয়তম নেতাকে দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। দোকান-পাট বন্ধ হইয়া গেল। মৃত্যুর এক ঘণ্টার মধ্যে চার পাঁচ হাজার লোকের শোভা-যাত্রা শবানুগমন করিল, তখনকার দিনে চার পাঁচ হাজার লোকের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের তালে তালে ক্যাম্পবেল হাসপাতাল হইতে প্রিয় মহানায়ককে লইয়া নিমতলা ঘাট যাত্রা এক অচিন্তনীয় অভূতপূর্ব অনুষ্ঠান। বিদেশী দেখিল—আশ্রিত জনমত কোন দিকে, স্বদেশ প্রেমিক নেতার চিতাগ্নিতে অর্পিত জনতা প্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিলেন।

লেখনীপ্রসূত "সন্ধ্যা" ও "করালীর" প্রবন্ধগুলি অগ্নিতে অর্পিত হইল। অগ্নি শিখার সম্মুখে অবনত হৃদয়ে শত শত যুবক স্বদেশ উদ্ধারের অগ্নি দীক্ষা লইল। মহাপুরুষের মহামরণে নূতন নূতন অগ্নি শিখা তাঁহার স্থানে গ্রহণ করিল।

মৃত্যুর এক মাস পূর্বে কালীঘাট মাইদানে দাঁড়াইয়া ভাবাবেগে আপ্লুত উপাধ্যায়জী বলিয়াছিলেন "আমি ত মা চিরকালই তোমার দুরন্ত ছেলে, কখন ত কাহারও বন্ধনে জড়িয়ে পড়ি নি, এই প্রার্থনা মা তোমার চরণে, দেশের কাজ করিতে করিতে, সত্যের প্রচার করিতে করিতে জেলে যাইবার পূর্বে যেন আমার এই দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়!" মা তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন।

হাসপাতালে থাকাকালীন বুধবারে (২৭।১০।০৭) অধ্যাপক ভাবানী তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন ; ভাবানীজী নববিধান সমাজের একজন উল্লেখযোগ্য সভ্য এবং কোচবিহার কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ভাবানীজী এখনও জীবিত এবং সিধু বলে 'সাধু' বলিয়া সুপরিচিত। সাধু ভাবানীজীর সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে বিগত জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উপাধ্যায়জী বলিয়াছিলেন "Wonderful have been the Vicissitudes of my life, wonderful have been my faith. আশ্চর্য্য আমার জীবনের বিচিত্র পরিবর্তন, আশ্চর্য্য এই বৈচিত্র্যময় জীবনের মাঝে আমার ঐকান্তিক বিশ্বাস, সত্যিই অদ্ভুত বিচিত্র বর্ণগন্ধময় কর্মবহুল জীবন নাট্য এই বিশ্বাসী ভক্তের। বিভিন্ন পরিবেশে, বিভিন্ন দৃশ্যের মধ্যে বিশ্বাসী ভক্তের একটানা উদাসী সুর এতই অসাধারণ যে সাধারণের দৃষ্টিতে আপাতঃবিরোধী ও অবোধ্য মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে।

ভারতের সংস্কৃতি পুনরুদ্ধার, পরিচর্যা ও রক্ষা করিবার জন্য অর্পিত নরনারী আত্মসুখ বিসর্জন করিয়া অজানা পথে একাকী যাত্রা করিয়াছেন, শয়নে স্বপনে অর্দ্ধজাগরণে মহাজননীর ব্যথা তাঁহাদিগকে কর্মপ্রবণ ও অস্থির রাখিয়াছিল ও বিচিত্র নরনারীর দুঃখকষ্টে সুখের আলো দেখাইবার জন্য অগ্নি পল্লব জ্বালাইয়া চলার পথ তাঁহাদিগকে আলোকিত ও সুগম রাখিতে হইয়াছিল, ব্রহ্মবান্ধবের কর্মে ও কি সেই দ্যুতির মহাযজ্ঞে প্রবেশ করিয়াছিল? স্বাধীন ভারত এই মহাপ্রশ্নের উত্তর প্রদান করুক।

"অদূর পারের পদধ্বনি অনুক্ষণ,
পশিত কি অভিশাপনিয়া তোর করে
কর্ণে তোর—জাগাইয়া রাখিত কি তোরে
বেত্রহীন মূক রুদ্ধ অর্দ্ধ জাগরণে,
বুঝিতে কি পেরেছিলে আপনার মনে
মিত্য বিত্রাহীন ব্যথা মহাজননীর।"*

* ব্রহ্মবান্ধবের যে সকল কথা প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে, অশেষ পরিতাপের বিষয় যে ঐ গুলি তাঁহার 'কথা'র দ্বারা যায়, তাহার নিদর্শন বর্ষার অধিকাংশে আজও লোকচক্ষুর অগোচরে। রাজদ্রোহ মামলায় সরকারের বর্ণিতভুক্ত বিষয়ের কয়েকটী বাংলা অনুবাদ এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে।

পাট ও পীঠ

শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল

শারদোৎসবের স্মরণিকা

আনোদ-প্রমোদের রাজ্যে মরশুমের সুরু শারদীয় মহাপূজার গোড়া থেকেই। বাঙলা দেশের প্রমোদ-পঞ্জীতে এ প্রথার কখনও ব্যতিক্রম হয় নি। পূজোর সময় থেকে বড়দিন ও নববর্ষ অতিক্রম করে ইংরাজের ইস্টার-পর্ব পর্যন্ত এই একটানা সাতটি মাসকে ব্যবসায়ের পক্ষে 'Harvest Season' বলা যায়।

উৎসবের স্মরণিকা হিসেবে আজকাল রঙ্গালয়ে মাত্র ২।৩টি নতুন নাটকের উদ্বোধন সম্ভাবনার অভাব পেলেও, সিনেমার রাজ্যে যে সমারোহের সাড়া পড়ে গেছে, তার তুলনায় রঙ্গমঞ্চের অকৈবর্ণ বৎসামান্যই।

বহুকাল পরে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার এবারে নতুন নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। নাটকটির নাম "পরিচয়"। বিষয় নির্বাচনে তাঁর সূক্ষ্ম রসবোধ ও কলাজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। শিশিরকুমারের প্রয়োগ-নৈপুণ্যে এবং প্রধান ভূমিকায় চরিত্রানুগ অভিনয়-সাকল্যে এই নাটকটি ইতিমধ্যেই দর্শকমণ্ডলীর রসবোধকে পরিতৃপ্ত করতে পেরেছে। আগামী সংখ্যায় এই নাটকটি সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

বাঙালী, অবাঙালী নির্বিশেষে সর্বস্তরের দর্শকের মনোরঞ্জন করবার উপযোগী নতুন ছবির সংখ্যা এবারে অপরিমেয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। সেপ্টেম্বর মাসের গোড়া থেকে নিত্য নতুন 'রিলিজ'-এর বহর দেখে মনে হয় —স্থানীয় ছবিঘরের প্রমোদ-পঞ্জীতে, অতীতের সব রেকর্ড অতিক্রম করে যাবে।

সামাজিক ছবির দুরবস্থা

মুখর-ছবির পর্যায় সামাজিক বাঙলা ছবিগুলির আবেদন ও জনপ্রিয়তা যে ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে, এটা কয়েক-মাস ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

সামাজিক ছবির কাহিনীর মধ্যে যথেষ্ট নাটকীয় আবেদনের অভাব এবং বৈচিত্র্য-হীনতাই অধিকাংশ বাঙলা ছবির অকালমৃত্যুর কারণ বলে অনুমান করা যায়। যেমন শুধু জোরালো সংলাপের উপর ছবি দাঁড়ায় না তেমনি ঘটনাবলীর পরিকল্পনা ও ব্যঞ্জনার মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্যের সঞ্চার না করতে পারলে, তার নাট্যরস দানা বাঁধে না।

বোধ করি এই কারণেই অধিকাংশ চিত্রনির্মাতাগণ সাময়িকভাবে সামাজিক ছবি তৈরী থেকে বিরত হ'য়ে, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং Costume picture প্রযোজনার দিকে অবহিত হয়েছেন। 'স্বামিজী'-ছবির সাফল্যও অনেককে প্রলুব্ধ করে তুলেছে, জীবনী চিত্র গঠনের দিকে। এটা খুবই আশার কথা সন্দেহ নেই।

জাঁকজমকপূর্ণ Costume জাতীয় চিত্র প্রযোজনায় অনেক ফাঁকী চলে এবং এই জাতীয় নাটকের বহুরকম দোষ-ত্রুটির অনেকটা mounting-এর গুণে ঢাকা পড়ে যায়। 'দেবী চৌধুরাণী' তার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। কিন্তু সামাজিক ছবিতে কোন কৃত্রিমতা বা মুষ্টিযোগের স্থান নেই। নির্দোষ চিত্র-নাট্য, চরিত্রানুযায়ী নিখুঁৎ অভিনয় এবং সুষ্ঠু প্রয়োগ-নৈপুণ্য ব্যতীত অত সহজে কিস্তিমাৎ করা যায় না। 'পুতুল নাচের ইতিকথা'— উপন্যাস হিসেবে অনবদ্য। বাণী-চিত্রাকারে তার রূপা-রোপের ব্যর্থতা প্রয়োগ-শিল্পীর অক্ষমতাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

দেবকী বসু ও জ্যোতির্ময় রায়

এবারে দুটি বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা, দুটি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হ'ল। এর প্রথমটির লেখক স্বনামধন্য চিত্র-প্রযোজক ও পরিচালক শ্রীদেবকীকুমার বসু এবং পরেরটি লিখেছেন, বর্তমান প্রগতি-সাহিত্যের অন্যতম অগ্রণী "উদয়ের পথে"-র বিখ্যাত গ্রন্থকার ও "দিনের পর দিন"—চিত্রের পরিচালক শ্রীজ্যোতির্ময় রায়। ছায়া-ছবির দর্শক-মহলে এবং রসবেত্তার কাছে এঁদের নতুন প্রয়োজন নিষ্প্রয়োজন।

গল্প-লেখকের সাফল্য

ছবির জন্য যাঁরা গল্প লেখেন, তাঁদের মধ্যে mass-production-এর দিক দিয়ে শ্রীনিতাই ভট্টাচার্যের দাবী অগ্রগণ্য। নিতাইবাবু গত তিন বৎসরে মোট তেরোটি গল্প সরবরাহ করেছেন। তার মধ্যে চিত্রাকারে তিনখানি ছবি বক্স-অফিস 'Hit' বলে গণ্য হয়েছে। এ তিনখানির নাম 'সংগ্রাম', 'স্বপ্ন ও সাধনা' এবং 'সমাপিকা'। এই সাফল্যের পর থেকে নিতাইবাবুর লেখনীর যে বিরাম নেই, একথা বলাই বাহুল্য।

স্বাধীন দেশের চলচ্চিত্র

শ্রীদেবকীকুমার বসু

আজ আর বোধহয় কোন শিক্ষিত ভারতবাসীরই অজানা নাই যে, জাতীয় সংগঠনে চলচ্চিত্র সংবাদপত্রের মতনই শক্তিমান। সম্ভবতঃ চলচ্চিত্রের শক্তি বেশীই, কারণ জন-সাধারণের উপর চলচ্চিত্রের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক ও তীব্র। সংবাদপত্র পড়বার শিক্ষা না থাকলেও চলচ্চিত্র দেখে অনুপ্রাণিত ও উত্তেজিত হবার জন্য কোন শিক্ষারই প্রয়োজন হয় না এবং দুর্ভাগ্যক্রমে, আমাদের জন্মভূমি আজও কোটী কোটী নিরক্ষর সন্তানেরও জননী। চলচ্চিত্র যে-কারণে আজ পৃথিবীব্যাপী সবচেয়ে বড় entertainment সেই কারণেই চলচ্চিত্র আজ শিক্ষা-জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষের রাষ্ট্র, সমাজ ও গৃহজীবনের ভাঙ্গাগড়ার সবচেয়ে বড় শক্তি।

স্বাধীন ভারতে এই শক্তিকে কি ভাবে রাষ্ট্র, সমাজ ও গৃহজীবনে প্রয়োগ করা উচিত সে আলোচনা আজ বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক নয়—বরং একান্ত প্রয়োজনীয়। ভারতের সমাজ ও গৃহজীবন ভারতবাসী আজ কি ভাবে চাইবে তা' আগামীর যুগধর্ম স্থির করে ও করছে এবং সমাজের মনীষী যাঁরা, ভারতের সমাজকে যাঁরা ভালবাসেন, তাঁরাও পথ নির্দেশ করে দেবেন। কিন্তু রাষ্ট্র-ভারতের আজ যাঁরা নেতা ও নিয়ন্তা—তাঁরা চলচ্চিত্রকে কি ভাবে রাষ্ট্রের কাজে লাগাবেন সে সম্বন্ধে একজন চলচ্চিত্র-সেবীর পরামর্শ তাঁরা কি ভাবে নেবেন আমি জানি না, কিন্তু পরামর্শ না নিলেও পরামর্শ দেবার অধিকার কেড়ে নেবার অধিকার তাঁদের নেই। রাষ্ট্র-নেতারা নিশ্চয়ই বলবেন যে, চলচ্চিত্র তৈয়ারী ক'রতে না জানলেও তাকে কি করে আজ প্রয়োগ করতে হবে তা' তাঁরা জানেন এবং যাঁরা তৈয়ারী করতে জানেন এমন লোককে ঘিরেই তাঁরা তৈয়ারী করিয়ে নেবেন বা নিচ্ছেন। এ সবই সত্য কথা এবং পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীন দেশের আজ যাঁরা শাসন ও পালনের বড় বড় জায়গায় বসে আছেন তাঁরাও এমনি কথা বলেন বা চলচ্চিত্রকে এমনি ভাবেই কাজে লাগাচ্ছেন। কথাটা সত্য হলেও শেষ কথা নয় এবং শ্রেষ্ঠ বা মঙ্গলকর নয়। চলচ্চিত্র তো তুচ্ছ, বৈজ্ঞানিক জগতের অধুনাতম সবচেয়ে বড় 'আবিষ্কার' atom bombও পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় ধ্বংসই করেছে, কাজেই বড় বড় বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞ কথাই চরম কথা নয়, চরম কথা সেইটিই—যেটি চরম মঙ্গল আনে। এইখানেই মানুষ, মানুষ। তাকে শুধু পশু বললে অবশ্য মঙ্গলের প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিকই হতো।

শ্রীদেবকীকুমার বসু

রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে হিটলার, মুসোলিনী, চার্চিল স্ব স্ব দেশের কম প্রিয় ছিলেন না, আজ ট্রুম্যান, এ্যাটলী ও ষ্টালিনও স্ব স্ব দেশে কম প্রিয় নন। তাঁরা সকলেই রাষ্ট্র-স্বাধীনতার জন্য কম ত্যাগ স্বীকার করেন নাই। কিন্তু ঠিক তার পাশেই ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। রাষ্ট্র-স্বাধীনতার জন্য তিনিও জীবন দিয়েছেন, তবু অন্যের সঙ্গে তাঁর অনেক পার্থক্য—জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিই স্বতন্ত্র। আমাদের

দেশের নেতারা, আজ যাঁরা রাষ্ট্রের উচ্চাসনে বসে আছেন তা' গান্ধীজীরই পথ নির্দেশের ফলে, কাজেই আজ যদি কেউ গান্ধীজী-তিরোভাবের পর এই কথাটা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সকল অনুষ্ঠানেই ভারতের একটা বিশেষ আদর্শ আছে তাহলে সে লোকটী চলচ্চিত্র-সেবী কেন? যদি সে লোকটী নগরের রাজপথে বসে' পায়ের পা ধরে' তা'র জুতা দাফ করে, তবুও তার কথা শ্রোতব্য। ইংরাজকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিয়ে সেই সিংহাসনেই দেশের একজনকে বসালে ভারতের স্বাধীনতা হবে না। ভারতের আদর্শকে সেই রাজসিংহাসনে বসাতে হবে। গান্ধিজী যদি আজ বেঁচে থাকতেন তাহলে কারুর ক্ষমতা হতো না তাঁকে কোন উচ্চ রাজপদে বসাতে—যতক্ষণ না ভারতের মহিমান্বিত আদর্শের মাথায় রাজমুকুট পরানো হতো—যতক্ষণ না গান্ধিজীর রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতো। তেমনই চলচ্চিত্র বা যে-কোন শক্তিকে রাষ্ট্রে লাগাতে হলে American বা Russian পদ্ধতিই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি নয়, কারণ atom bombএর improved মারণ-অস্ত্রই ভারতের আদর্শ নয়। আর আদর্শই পদ্ধতিকে পথ-নির্দেশ করে।

ভারতের একটা মহান আদর্শ আছে এবং সেই আদর্শে সমস্ত পৃথিবীকে আহ্বান করবার স্বপ্নের কথা সেদিন পণ্ডিত জহরলালজী নিজেও বলেছেন। বলবারই কথা—কারণ গান্ধিজীই তাঁর রাষ্ট্রগুরু।

কাজেই চলচ্চিত্র দিয়ে কি কি করা হবে শুধু নয়, কি ভাবে করা হবে সেটাও সমান বড় কথা। যেখানে পূর্ব্বে ছিল ইংরাজের রাজত্ব সেখানে কতকগুলি দেশী লোক শুধু বসে গেলেন—এতে কিছুই হলো না! ইংরাজের দরবারে প্রবেশের যে সব গোপন সুড়ঙ্গ ছিল সেই সব গোপন সুড়ঙ্গ, আঁকা বাঁকা পথগুলো ভেঙ্গে দিতে হবে। পথ হবে উন্মুক্ত রাজপথ। কাজেই রাষ্ট্র-নেতাদের সামনে হাজির হবার সুযোগ ও সুবিধা আছে, মাত্র তাঁদেরই দ্বারা রাষ্ট্র-নায়করা উপদিষ্ট হবেন, এটা রামরাজ্যের কথা নয়। রাষ্ট্রপতিদের যেতে হবে ভারতের একপ্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত যোগ্য লোকের সন্ধানে, যোগ্য স্থানের সন্ধানে—এইখানেই দেখা দেবে ভারতের নতুন পদ্ধতি। প্রজা রাজাকে খুঁজবে না, রাজা প্রজাকে খুঁজবে, এই ভারতের স্বাধীনতা, এই গান্ধীজির 'রামরাজ্য'। এর থেকেও বড় কথা এই যে, চলচ্চিত্রকে উন্নত ও শক্তিমান না করে তাকে রাষ্ট্রের কাজে লাগালে শক্তিহানিই ঘটবে। Government-এর দরবারে একটি finished ভাল educational film দেখলেই education হোলো না—যারা এই ছবি করছে সেই studioর carpenter, electrician ও কুলিদের কি ভাবে কাজ করতে হয়—এটাই আগে দেখলে ঠিক পথে চলা হবে। শিক্ষার জন্য ভাল মলাটের বই রচনা করার আগে শিক্ষকদের অবস্থা এবং স্বাস্থ্য ও ভাতকাপড়ের কথাও ভাবতে হবে। স্বাধীন ভারতের চলচ্চিত্রকে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রের সেবায় নিয়োগ করার আগে—চলচ্চিত্র-শিল্পকে বড় না করলে ইংরাজ শাসনের মূর্ত্তিটাই মনে এসে পড়বে। আজ আমাদের শাসন করার সঙ্গে পালন করতে হবে আগে। চলচ্চিত্রের মতো শক্তিশালী মাধ্যম যেখানে তৈরী হয়, সংস্কার করতে হবে প্রথম সেইখানে, শক্তি সঞ্চার করতে হবে আগে সেই মূল-উৎসে। তবে সেটা হবে রাষ্ট্র ও জাতির শক্তি, অন্যথা শক্তিহীন সেই চলচ্চিত্র রাষ্ট্র ও জাতির শক্তিহানিই ঘটাবে।

সমালোচকের দায়িত্ব

শ্রীজ্যোতির্ময় রায়

স্বভাবগত ভঙ্গীতে একটা হাঁস একবার ক'রে জলে ঠোঁট ডোবাচ্ছে, আর মুখ তুলে নিয়ে আকাশের দিকে মাথা উঁচিয়ে ফেড়ে ফেলার মত একটা ক'রে দিচ্ছে ক্যাঁক্যাঁ—দূর থেকে দৃশ্যটি দেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পার্শ্ববর্তীদের বলেছিলেন, "ঐ দেখ বাংলা দেশের সমালোচক।"

একটা কিছু হাতে এসে পড়া মাত্রই 'কিচ্ছু হয়নি' বলে মাথা নেড়ে ওঠার যে শ্রদ্ধাহীন ভঙ্গী—সচরাচর আমাদের সমালোচকদের মধ্যে সর্বাগ্রে দেখা যায় তারই প্রতি তাঁর এই পরিহাসমূলক ইঙ্গিত। তথাকথিত সমালোচকদের অসঙ্গত আক্রমণে উত্যক্ত হ'য়ে রবীন্দ্রনাথের মত মানুষ ও-কথা বলেছিলেন সন্দেহ নেই। রসোপলব্ধির জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন যে সহৃদয় মন এবং শ্রদ্ধা, তার একান্ত অভাবের বিরুদ্ধে এই অতুলনীয় প্রতিভা এবং ব্যক্তিত্বেরও যে জীবনভর একটা তীব্র নালিশ ছিল, তা তাঁর শেষ জীবনে ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এসেও আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি ক'রে এসেছি।

আমাদের সুউন্নত সাহিত্যে এ অনাচার আছে বটে, তবু বলব সেখানে সমালোচক হিসাবে আলোচনা সাড়া করাতে দরকার হয় যুক্তির, নিছক মন্তব্যের মূল্য আদায় করতে প্রয়োজন হয় সাহিত্যে বা সাহিত্যে ন্যূনতম খানিকটা প্রতিষ্ঠা। 'বইখানা পড়েছি', মাত্র এটুকু অধিকার নিয়েই একান্ত ব্যাপ্ত সমালোচনার ঘরোয়ার ছওয়া চলেনা। কিন্তু ছাপা-রবির ক্ষেত্রটি এদিক থেকে একেবারেই নিরঙ্কুশ—ফলে অধিকারী-ভেদ বর্জিত। দৃষ্টি, যুক্তি এবং অভিজ্ঞতার জোরে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন এমন সমালোচক আঙুলের দু-তিন পাপ এগিয়েই খুঁজে পাওয়া যায়না। আবার সমালোচকের সংখ্যা গুণতে গেলে গুণে কূল পাবেনমা একথাও সত্যি। এই দুর্দিনে সাহিত্য-পত্রগুলো মরেছে, কিন্তু গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য চিত্র-পত্র। দৈনিক থেকে সুরু ক'রে এইসব সাপ্তাহিক-মাসিক-এ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমালোচকের আসনে যাঁরা চড়ে বসেন, বলেম বিজ্ঞাপন-সংগ্রহের রসদ্ জোগাড় বা ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সূত্র ধরে। গুণের মধ্যে সম্বল থাকে চিত্রখানি একবার দেখার অভিজ্ঞতা। এই অধিকার নিয়ে তাঁরা যা ক'রে থাকেন সমালোচনা তাকে আমি বলব না—কারণ তা যুক্তি-নির্ভর নয়, বলব নিছক মন্তব্য মাত্র। যেমন, 'ওটা আমার ভাল লাগেনি,' 'এটা না করাই ছিল উচিৎ,' 'সেটা হ'য়েছে অনবদ্য' ইত্যাদি। কিন্তু বক্তার একবার ভেবে দেখা উচিৎ, তাঁর 'আমি'র এই ভালো লাগা-না-লাগাকে সর্বজনগ্রাহ্য পরিবেশনে তিনি অধিকারী কিনা। কোন এক বিশেষ 'আমি' তাঁর রুচি এবং শিল্পবোধ সম্পর্কে, যে কোন পথেই হোক, যখন জাতির মনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে, একমাত্র তখনই আসে তার বিচারকে শাণিত মন্তব্যে ব্যক্ত করার অধিকার। দশ 'আমি'র এক 'আমি'কে এগিয়ে আসতে হ'লে প্রতি পদে ঝুঁকিয়ে চলতে হবে যুক্তির মাথাল। তথা-কথিত এইসব সমালোচকরা সমালোচনার অধিকারী নন বলছি কেন—তার স্পষ্ট প্রমাণ ঘোষণা করে তাঁদেরই ভাষা ও বচনভঙ্গী। সমালোচকের পরিচয় দৃষ্টির গভীরতা ও পরিচ্ছন্নতায়। দৃষ্টির এই গভীরতা ও পরিচ্ছন্নতা আবার অবশ্যম্ভাবী-রূপে গড়ে তোলে এক অনুযায়ী ভাষা। সাহিত্য এবং মননশীলতার ক্ষেত্রে মানসিকতার এই তারতম্য ভাষাকে চিহ্নিত করে বলেই তো ভাল ও বচনভঙ্গী থেকেই চিনে নেওয়া যায় তার জাতভেদ।

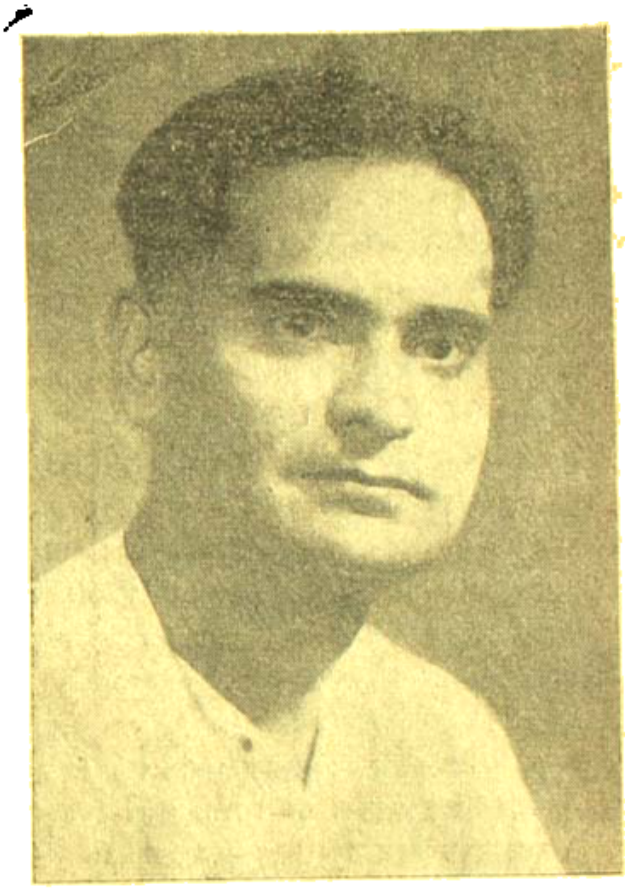

শ্রীজ্যোতির্ময় রায়

সাহিত্যে দায়িত্বহীন সমালোচনা তেমন একটা ক্ষতির কারণ হয় না, কিন্তু চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে তা অবহেলার যোগ্য তো নয়ই—বরং অবহিত হ'য়ে ওঠার যথেষ্ট কারণ রয়েছে বলেই মনে করি। এই ভাষাদের এক ভাষায় থাকেন মূলধনী, অন্য ভাষায় জনসাধারণ। নির্মাণের কাজে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন বলেই মূলধনীর অস্তিত্বটাও অনিবার্য। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী মূলধনী সব সময়েই চাইবে নতুনত্বের ঝুঁকি এড়িয়ে গতানুগতিক পথে খাটিত টাকাটা যাতে লাভের

বোঝাই নিয়ে ঘরে ফেরা আসে। তাছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধনিকরা শ্রেণীধর্মে হয় কম-বেশী প্রতিক্রিয়াশীল। এই প্রতিক্রিয়াশীলতার ধারা নিজিয়ে যেতে সমালোচকদেরও সহায়ক হ'তে হবে কাহিনীকার ও পরিচালকদের। ঘটনাসুসঙ্গতিক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়বস্তুর বিরুদ্ধে জনসাধারণের মনে তাঁদের জাগাতে হবে বিতৃষ্ণা। যাতে সুধীরা বাধ্য হন নতুন আদর্শ এবং বিষয়বস্তু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ দিতে। আমার মতনের আবির্ভাবকে অভিনন্দিত করাতেই তাঁদের কর্তব্যের শেষ নয়। জনসাধারণকে সে-বিষয়ে আগ্রহশীল করে তোলার দায়িত্বও সমালোচকদের উপর সমান ভাবেই বর্তায়। এতো গেল কর্তব্য বা প্রচারের কথা। কিন্তু যা ঘটছে তাতে ফিরে এলে দেখা যাবে, ঘটনাসুসঙ্গতিক চরিত্রগুলোর যে সমালোচনা হয় তা-ও একেবারেই বর্ণহীন। অন্যান্য দুর্বল কাহিনীতেও সোনালে উল্লেখ করার মত অংশ খুঁজে বার করা হয়, আবার সবল কাহিনীতে বড় ক'রে দোষ ধরা হয় তার খুঁটিনাটি খুঁতগুলিকে। ফলে সমালোচকের সেই ভুল বোঝাবুঝি হয়ে দাঁড়ায় মুখিল। এমন ঘটনারও কাণ্ড ঘটে, এতুল যাদের ছুড়ে যে নথিপত্র করা হচ্ছে—পরবর্তী এক লাইনে থাকে এমন বিষয়ও তাঁরা, যা সেই এতুল লাইনকে উল্টে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। এবং সেবিষয়ে সম্পর্কেও তাঁদের সচেতন থাকা উচিৎ।

নতুনকে অভিনন্দিত করার প্রশ্নে আমার সমালোচিত সমালোচকরা হয়তো বলে উঠবেন, এ যে তাঁরা করে থাকেন তার একাধিক নজির হাতের কাছে তাঁদের রয়েছে। উক্তি তাঁদের মিথ্যে হবে না। সর্বজনস্বীকৃত বিরোধীদের ওপর মহৎ বিষয়বস্তু আছে যার বিরোধিতা প্রচলিত মূল্যবোধের কাছে নিজেকেই খাটো করে মাত্র—সে সব ক্ষেত্রে তাঁরা সাহসের অভাব নেই। কিন্তু প্রয়োজন বর্তমান জীবনের বিচিত্র সমস্যা নিয়ে নতুন ঢাঁচে গল্প গাঁথলেই বাধে বিপদ। চতুর্দিক হ'তে এঁরা আলোকী ভাষায় আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে আসেন এগিয়ে। সে আক্রমণটা ঘটে যুক্তির শাণিত অস্ত্র নিয়ে নয়, বরং বলা চলে ভুল নক্সার শূন্য ইঁচিয়ে—এমন কি কেউবা মাত্রাবোধ হারিয়ে ব্যক্তিগত উক্তি ছুঁড়ে নিজের স্তর ঘোষণায় পর্যন্ত দ্বিধা করেন না। এ সূত্রে একটি ঘটনা মনে পড়ে—আমাদেরই এক বিখ্যাত সাহিত্যিক পরিচালক তাঁর চিত্র-নাট্যের একস্থানে খুবই ভুল রকমের একটা চটুল সুর ভাঁজে দিতে যাচ্ছেন, পাশে ছিলেন তাঁর সাহিত্য রসজ্ঞ এক বন্ধু, তিনি বাধা দিয়ে বললেন, 'না না, এ আপনি দেবেন না।' পরিচালক হাসাই মুখ হেসে জবাব দিলেন, 'না যে, এটাই দিতেই হবে—এ জায়গায় দু-একটা ভাবনা ক'রে রাখা দরকার, এমন টানেই সমালোচকরা যার উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন—তাতে আমার গল্পের ভালো অংশগুলো বেঁচে যাওয়ার আশা থাকে।' কথাটি যে কতখানি মর্মান্তিক সত্য তা আমি একাধিকবার নিজেই উপলব্ধি করেছি। ভুল কিছু করে না দেওয়ার ভুলে আমার বর্তমান ছবির সবটাকেই তছ্‌নছ্‌, করার একটা চেষ্টা সুরু হয়ে গেল। যে চিত্র দেখে প্রতিষ্ঠাবান সমালোচক, শিল্পরসিক এবং মনীষীদের অনেকেই মুক্তকণ্ঠে জানালেন সপ্রশংস অভিনন্দন, সেখানে এই সমালোচকবৃন্দ পাতার পর পাতা ছড়িয়ে জনসাধারণকে বোঝাতে চাইলেন এ ছবিতে কি কি নেই—কি আছে তার উল্লেখ থাকলো না মোটেই। এ চিত্র-কাহিনীর সঙ্গে আমার পূর্বতন কাহিনীর কতটুকু মিল তার খোঁজে তাঁরা নাধা খুঁড়লেন, কিন্তু যাতে এবং আসার যাপ্ত করলিল সম্পর্কে লিখলেন না একটি পংক্তি। সম্পূর্ণ আলাদা চরিত্রের দুজন মানুষকে মিলক মাঁচিল বা দাড়ির মিলের উপর ভর ক'রে সমধর্মী প্রমাণ ক'রে দেওয়ার মতই এ প্রয়াস। তারপর সংলাপ-কাহিনীতে কেন এতুল ঘটনা সংঘাত নেই, এবং যে কাহিনী কথার অবলম্বনেই ধরে দেওয়া হয়েছে তাকে কথার মারফত বলা হোল কেন—তা নিয়েই বা না কত নালিশ! 'দিনের-পর-দিন' নামটিও নাকি ব্যর্থ হয়েছে মধ্যবিত্তের দুঃখ-বৈভবের রূপ গল্পের অন্তরালে গিয়ে ঢেকে গেছে বলে। সত্যিই ঢেকেছে কি? বর্তমান গণতন্ত্রের অন্তরায় এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাজনৈতিক চক্রে যে ঘুরপাক খেয়ে মরে, সেটাও যে তার দৈনন্দিন জীবনের লাঞ্ছনারই একটা অংশ এটুকু এঁরা চিনে নিলেন না। হয়তো বা কাহিনীতে এ জিনিসে তাঁরা অভ্যস্ত নন বলেই। তাই কাহিনীর রঙ্গমঞ্চকে গ্রহণ করলেন নিছক রঙ্গমঞ্চ হিসেবে—রাজনৈতিক মঞ্চের রূপক রূপে নয়—এমন কি মাটক মিথ্যাচনের মত স্পষ্ট ঘটনাটি থাকা সত্ত্বেও। ফলে বর্তমান গণতন্ত্রের হাস্যকর অসঙ্গতির প্রতি আমার কটাক্ষগুলো তাঁদের কাছে নেহাৎ অর্থহীন হয়েই রইলো। চিত্রের মধ্য-মাধ্যমে এসব বিষয়বস্তু স্পষ্ট করে তোলার পথে থাকে অনেক বাধা। তাই আশা করেছিলাম কাহিনীর অন্তর্নিহিত এই তাৎপর্যটুকুর প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টির সামনে মেলে ধরবার দায়িত্ব আমার দেশের সমালোচকরাই গ্রহণ করবেন। 'মঁসিয়ে ভার্দু' কাহিনীর রাজনৈতিক তাৎপর্য এবং ইঙ্গিতকে স্পষ্ট ক'রে তুলেছিলেন সে-দেশের সমালোচকরাই।

আমার এই গল্পটি গল্প হয়নি, হয়েছে একটি প্রবন্ধ, কেউবা এই মন্তব্যও করেও উষ্মা প্রকাশ করেছেন। একথা যেন নিজেই যদি আমি বলি বেশতো দুঘণ্টা বসিয়ে দশবার 'বাঃ' আর চারবার হাত-তালির সঙ্গে দেশের লোককে যদি একটি প্রবন্ধই শুনিয়ে দিতে পেরে থাকি তো বলা কি—রূপ রকমের মধ্যে এও না হয় হ'ল একরকম। সমালোচকরা যদি বলেন, অতি-আনার ফলে এসব তাঁদের কাছে নেহাৎই ফাঁকা মনে হয় তো বলতে বাধ্য হব, তাঁদের নীচেও স্তর আছে সেটা তাঁরা ভুলে যান কেন! অবশ্য 'গল্প-মাই'-এর নালিশে আমি খুব বেশী বিস্মিত হইনি। সংস্কার-বহির্ভূত ভাবপ্রবণতার অতিশয্যহীন গল্পকে গল্প বলে মানিয়ে নিতে প্রয়োজন আরেকটা নতুন সংস্কার গড়ে তোলার। ছোট প্রদীপ বা সরষের গাড়ী এঁকে বলামাত্রেই তা চিত্র-শিল্পের পর্যায়ে তোলা যায়। কিন্তু বিজলী বাতি বা মোটর গাড়ী আঁকলে সেটা কেবলই যেন হ'য়ে থাকতে চায় বিজ্ঞাপন-ধর্মী ছবি। আধুনিক জীবনের আবর্ত যেমন অর্থনৈতিক এবং

রাজনৈতিক জটিলতা নিয়ে গল্প গড়তে গেলেও থাকে এই বিপদ—কেননা তা প্রচারধর্ম্মী বা বক্তৃতা বলে প্রতীয়মান হয়। সংস্কারাচ্ছন্ন প্রেমের বুকনি বা মাতার বিস্তৃত বিলাপেও যে-আপত্তি বড় একটা থাকে না। অতএব বুঝতে পারছি সাধারণ সমালোচকদের কাছ থেকে এধিক দিয়ে সুবিচার পাওয়ার জন্য আরও কিছুটা ধৈর্য্যের প্রয়োজন।

সমালোচকদের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁদের একের সঙ্গে অন্যের হাস্যকর অসঙ্গতির কথাটাও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মনে করি। এর মজিরও আমি আমার বর্ত্তমান ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই টানছি। ধরুন, একজন যে অংশটুকুকে বলছেন অনবদ্য, অপর একজন সেটাকেই সমগ্রের একেবারে ব্যর্থ বা দাগছেঁড়াই। একের সঙ্গে অপরের এই বহুতের একাধিক স্থানে উৎকট—রসবোধে এতখানি বৈষম্য ঘটলে অন্যত্র কি বলতাম জানিনা, এক্ষেত্রে তোদের সঙ্গেই বলব, এসবেরই মূলে রয়েছে আলোচিত সমালোচকদের ব্যক্তিগত মনোভাব অনুযায়ী ধারিবাহীন মন্তব্য ছড়ানোর আগ্রহ। আশা রাখি, ছাত্র-কবির বেলায় থেকেও অহেতুক এই বিড়ম্বনা একদিন লোপ পাবে। কে জানে এই চিত্র-পত্রিকাগুলির প্রসারে এবং আহ্বানেই হয়তো বা সত্যিকারের জ্ঞানী ও শিল্পরসিকেরা একদিন এগিয়ে আসবেন এই সমালোচনার আসরে, আর চিত্র-সমালোচনাকে হাতে তুলে আমাদের গতিপথ করবেন সহজ এবং অনাবিল।

শরশয্যায়

শ্রীকালিদাস রায়

ধনীর ছেলে—স্বাস্থ্যে, রূপে, সুশিক্ষাতেও ধনী,
চরিত্রবান্, তরুণ তাপিগণের শিরোমণি,
একদা সে দেশের নায়ক হবে,
কতজন পোষণ এই আশাটাই সবে।
উচ্চ আশা অনেক ছিল তার,
বইতে হ'বে বহু লোকের ভার।
পক্ষাঘাতে হঠাৎ হ'য়ে পঙ্গু গতিহীন
শয্যাগত হ'ল সে একদিন।
তিরিশ বছর শয্যাশায়ী হ'য়ে
কাটাচ্ছে কাল অনেক ব্যথাই স'য়ে।
দেখ্‌তে গেলাম, পেলাম বড়ই ব্যথা,
কি শুধাব' খুঁজে না পাই কথা,
অনেক ভেবে ব'সে—তাহার কাছে
জিজ্ঞাসিলাম 'যন্ত্রণা কি আছে?'
বল্‌ল শুধু, "কি গা'ল আছে বলো মড়ার বাড়া,
যন্ত্রণা নেই শরশয্যার যন্ত্রণাটা ছাড়া।
সুস্থ সবল দেহ নিয়ে ফেলে মাথার ঘাম
চাষীর ঘরে জন্মে যদি কোদাল চালাতাম,
সারাটি দিন ক্ষেতের ধূলা মেখে
গামছা পরে' অর্দ্ধাসনে থেকে
তিরিশ বছর, কেন—জীবন ভোর,
এর চেয়ে সে জীবনও ভাই কাম্য হ'ত মোর।"
কম্পন তাহার অঙ্গ বাঁকা গণ্ড দুটি বেয়ে,
সজল চোখে রইনু আমি চেয়ে।
বড়ই ব্যথা পেলাম, রাতে ঘুম এল না চোখে
হয়ত শুনে বল্‌বে অনেক লোকে
'কত গরিব কত ব্যথাই সইছে জীবন ভ'রে,
তাদের কথা লেখ না-ত ছলে এমন ক'রে?'
অনেক কাঙাল অনেক ক্লেশই সইছে অবিরত,
তাদের বেরে নেইত অতগুত
নিত্য নূতন ভোগের আয়োজন,
নেই বিলাসের হাজার প্রলোভন।
ভোগ্য আছে ভাঁড়ার ভরা শক্তি ভোগের নাই,
এমন দশা নয়ত তাদের, দুঃখ পেলাম তাই,
রোগের শরশয্যা শুধু নহে,
ভোগের শরশয্যা তাহার পঙ্গু দেহ বহে।
কতই পেপে সজনে কলাগাছ
ভাঙ্গে চুরে কাল বোশেখীর নাচ,
জন্ম তাদের ভাঙ্‌তে ঝড়ে। বিচিত্র নয় ভাঙা,
তাতে কেঁদে কে করে নয়ন রাঙা?
বিরাট বটবৃক্ষ যদি উপ্‌ড়ে পড়ে ঝড়ে,
কাহার হৃদয় আকুল নাহি করে?

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

১৯৩০ সালের মাঝামাঝি সময়ে সূর্য সেন ও নির্মল সেন আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন চট্টগ্রামের ধলঘাটগ্রামে নবীন চক্রবর্তীর বাড়িতে। স্থানটি ছিল পটিয়ার ডিসিটারি স্কুল-এর মাইল চারেক দূরে। নবীন চক্রবর্তীর বিধবা স্ত্রী সাবিত্রী দেবীই বিপ্লবীদের প্রতি আন্তরিকতা করিয়া আপন বাড়িতে তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এই সময়ই অপূর্ব সেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত প্রভৃতি অন্যান্য বিপ্লবিগণও মধ্যে মধ্যে আলোচনার জন্য সেখানে গিয়া সমবেত হইতেন। বাহিরা বাহিরা কর্মীদিগকেও এই সময় দলে গ্রহণ করা আরম্ভ হইয়াছিল।

প্রীতিলতার ডাক নাম ছিল রাণী। তাঁহার পিতার নাম জগবন্ধু ওয়াদ্দেদার। চাকরিসূত্রে তিনি চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটিতে। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার বুদ্ধিদীপ্ত প্রখরতা ও তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিমত্তার জন্য প্রতি ক্লাসেই-স্থানের নিকট বিবেচিত প্রশংসালাভ করিতেন। যথাসময়ে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকায় গিয়া আই-এ পড়িতে আরম্ভ করেন। ঢাকায় যে 'দীপালি-সঙ্ঘ' ছিল তাহাতে যোগদান করিয়া নাচ ও অভিনয়ে প্রীতিলতা দক্ষতা অর্জন করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ না করার জন্য তাঁহার মনে যে দুঃখ ছিল—আই-এ পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করার পর তাহা দূরীভূত হয়। অতঃপর তিনি বি-এ পড়িবার জন্য ভর্তি হন কলিকাতার বেথুন কলেজে এবং ১৯৩১ সালে বি-এ পরীক্ষা দিয়া চট্টগ্রামে ফিরিয়া যান। বি-এ পরীক্ষা দেওয়ার তিনি সহপাঠিনী হন এবং নন্দনকানন উচ্চ ইংরাজি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করেন।

বাল্যকাল হইতেই প্রীতিলতা স্বদেশ ভাবধারায় লালিত হইয়াছিলেন এবং দেশের কাজ করিবার জন্য তাঁহার মন আকুল হইত। রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসির আদেশ হইবার পর তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নীর পরিচয় দিয়া তিনি বহরমপুর কারাকক্ষে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের আদর্শ ও নিষ্ঠা তাঁহার জীবনে অতিশয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ১৯৩২ সালের ১১ই জুন তারিখে ধলঘাট গ্রামের গোপন আস্তানায় প্রীতিলতা, সূর্য সেন প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান এবং কয়েক দিন সেইখানেই বাস করিতে থাকেন। বাড়ীটি ছিল দুতলা। এই সময় সহসা একদিন বিপদ্ উপস্থিত হইল। ১৩ই জুন তারিখে ক্যাপ্টেন ক্যামারণ পুলিশ-সাহায্যে মনোরঞ্জন সেন সহ একদল পুলিশ ও সৈন্য লইয়া উক্ত বাড়ীতে গিয়া রাত্রিকালে হানা দিলেন। ক্যাপ্টেন ক্যামারণ স্বয়ং রিভলবার হস্তে লইয়া অতি উৎসাহবশতঃ সই বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। সূর্য সেন ও নির্মল সেন তাঁহাকে উপরে উঠিতে দেখিয়া রাত্রির অন্ধকারেই তাঁহার উপর গুলি চালাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের গুলিতে বিদ্ধ হইয়া ক্যাপ্টেন ক্যামারণ সই হইতে নীচে পড়িয়া গেলেন এবং সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। বিপ্লবীদিগকে গুলি চালাইতে দেখিয়া পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীও নীচে হইতে গুলিবর্ষণ সুরু করিল। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ ধরিয়া লড়াই চলিল উভয়পক্ষে। লড়াইয়ের মাঝখানেই নির্মল সেন এক সময় গুলিবিদ্ধ হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। পুলিশের আগমন টের পাইয়াই সূর্য সেন ও নির্মল সেন প্রীতিলতাকে পূর্বেই নীচের তলায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। উপরের তলায় গুলিবিদ্ধ নির্মল সেনের কাতর আর্তনাদ প্রীতিলতার কর্ণগোচর হইল। তিনি উপরে যাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু নীচের তলার অন্যান্য সকলে তাঁহাকে বিপদ নিশ্চিত জানিয়া উপরে যাইতে দিলেন না। সেই আঘাতেই কিছুক্ষণ পরে নির্মল সেনের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

সূর্য সেন ও অপূর্ব সেন তাড়াতাড়ি কোনও মতে নীচে নামিয়া আসিলেন এবং নীচের তলার সকলকে জানাইলেন যে তাঁহারা সেই মুহূর্তেই সে স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবেন। তাহা শুনিয়া প্রীতিলতাও তাঁহাদের সহিত পলায়নের জন্য জিদ করিতে লাগিলেন। সূর্য সেন শেষ পর্যন্ত তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া পারিলেন না। তাঁহারা তিনজনেই বাহির হইয়া পড়িলেন রাত্রির ঘোর অন্ধকারেই। বেশি দূর যাইবার আগেই কিন্তু পুলিশের গুলি ছুটিয়া আসিল তাঁহাদের দিকে। সেই গুলিতে অপূর্ব সেন আহত হইয়া পড়িয়া গেলেন এবং মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। পুলিশ ও সৈন্যদলকে কোনও মতে ফাঁকি দিয়া পলাইয়া যাইতে সমর্থ হইলেন কেবলমাত্র প্রীতিলতা ও সূর্য সেন।

তখন পুরা বর্ষাকাল। পথ-ঘাট কর্দমাক্ত এবং জল-প্লাবিত। সূর্য সেন অতি কষ্টে প্রীতিলতাকে সঙ্গে লইয়া প্রায় মাইল চারেক দূরবর্তী জোঁতপুরা নামক একটি গ্রামের এক কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্রামের বাহিরে পাহাড়ের নিকটে অবস্থিত এই কুটীরটিও বিপ্লবীদের একটি আস্তানা ছিল। কয়েকজন বিপ্লবী পূর্ব হইতেই সেই কুটীরে বাস করিতেছিলেন।

এদিকে পরদিন সকাল বেলাই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ও সৈন্যাধ্যক্ষ মেজর গর্ডন বলবল লইয়া ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং গৃহস্বত্বাধিকারী সকলের আত্মসমর্পণ দাবী করিলেন। তাঁহারা আসিয়া পড়ায় গৃহকর্ত্রী সাবিত্রী দেবী তাঁহার পুত্র ও কন্যাকে লইয়া বাহির হইয়া আসিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। অতঃপর গুর্খা সৈন্যের গুলি চালাইয়া বাড়ীর একাংশকে ধ্বংস করিয়া পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী ভিতরে প্রবেশ করিল। চতুর্দিক তল্লাশ করিয়া আবিষ্কৃত হইল ক্যাপ্টেন ক্যামারণ, নির্মল সেন ও অপূর্ব সেনের মৃতদেহ, রিভলবার, কয়েকখানি প্রয়োজনীয় পত্র, প্রীতিলতা ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের

ঘটো. দুইখানি পুস্তকের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি। প্রাথ প্রমাণ হইতে পুলিশ জানিতে পারিল যে সূর্য্য সেন ও প্রীতিলতাও পূর্ব্বদিন রাত্রে ঐ ঘাটীতেই ছিলেন; কিন্তু সময়তা প্রায় একঘণ্টা হইয়া গেল। বর্ষাকালের সেই অন্ধকার রাত্রে জল-কাদা ভাঙিয়া পুলিশ-বেষ্টনী ভেদ করিয়া কি ভাবে কোথায় পলায়ন করিলেন সূর্য্য সেন?

তল্লাসীর ফলে যে পাণ্ডুলিপি দুইখানি পাওয়া গিয়াছিল—তাহার একখানি ছিল গণেশ ঘোষের লিখিত। চট্টগ্রাম জেলে বসিয়াই ঐখানি তিনি রচনা করিয়াছিলেন এবং কৌশলে উহা বাহিরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ভারতে বিপ্লবান্দোলনের ইতিহাস উহাতে বিবৃত হইয়াছিল। অপর একখানি পাণ্ডুলিপি ছিল সূর্য্য সেনের লেখা। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পূর্ব বিবরণী উহাতে প্রদত্ত হইয়াছিল। তাঁহার উক্ত বিবরণী হইতে জানা যায় যে বিপ্লবিগণ উক্ত অভিযানের জন্য ব্যাপক-ভাবে প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং প্রায় ১২,০০০৲ টাকা, ১০,০০০ কার্ত্তুজ ও এক শতেরও অধিক লোক এই উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করা হইয়াছিল। কেবল ইউরোপীয়ান ক্লাবটি ঐদিন আক্রমণ করা সম্ভব হয় নাই; কারণ রাত্রি অধিক হওয়ায় উক্ত ক্লাবের সভ্যরা অধিকাংশই চলিয়া গিয়াছিলেন এবং বিপ্লবীদের নিজেদেরও কতকগুলি অসুবিধা ছিল। ঐদিন ক্লাবটি আক্রমণ করা যায় নাই বলিয়া সূর্য্য সেন তাঁহার পাণ্ডুলিপিতে দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন।

কল্পনা দত্তও যে এই সময় চট্টগ্রামের দলটির সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। চট্টগ্রাম হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া বেথুন কলেজে ভর্ত্তি হন এবং উক্ত কলেজ হইতেই পরীক্ষা দিয়া ১৯২৯ সালে আই-এস্-সি ও ১৯৩১ সালে বি-এস্-সি পরীক্ষা পাশ করেন। অতঃপর তিনি পুনরায় চট্টগ্রামেই ফিরিয়া গিয়া বিপ্লবান্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। তাঁহারই চেষ্টায় বিপ্লবীদলের পক্ষে বহু অলঙ্কার ও অর্থাদি সংগৃহীত হয়। তাঁহাকে ও প্রীতিলতাকে—উভয়কেই নির্ম্মল সেন রিভলবার চালনা শিক্ষা দিয়াছিলেন। বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। পুলিশ একবার তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিলে তাঁহার ঘাটীর লোকগণ জামিন হইয়া তাঁহাকে খালাস করিয়া আনেন।

১৯৩২ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে পুরুষের ছদ্মবেশে কল্পনা দত্ত পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাবের বিস্তৃত সংবাদ সংগ্রহের জন্য অপর দুইজন যুবকের সহিত তথায় গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সন্দেহজনক গতিবিধিতে পুলিশ খবর পাইয়া সেখানে আসে এবং তাঁহাদের গ্রেপ্তার করে। কয়েকদিন পরে কল্পনা দত্ত জামিনে খালাস পান এবং তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা চলিতে থাকাকালেই তিনি ডিসেম্বরের শেষাশেষি হইতে আত্মগোপন করেন।

পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাবের নিকট হইতে ধৃত হইয়া কল্পনা দত্ত প্রভৃতি যখন হাজতে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ই ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে প্রীতিলতার নেতৃত্বে উক্ত ক্লাব প্রত্যক্ষভাবে আক্রান্ত হইল।

ধলঘাটগ্রামের ঘটনার পর হইতেই প্রীতিলতা পলাতক জীবন যাপন করিতেছিলেন। ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের দিনে তিনি ছিলেন কাটলী গ্রামের আশ্রয়কেন্দ্রে। সেই আশ্রয়-কেন্দ্র হইতেই মহেন্দ্র চৌধুরী, প্রফুল্ল দাস, কালী ঘে, শান্তি চক্রবর্ত্তী, সুশীল ঘে প্রভৃতি কয়েকজন তরুণ বিপ্লবী সন্ধ্যার খানিকটা পরে অস্ত্র-সজ্জিত হইয়া গ্রাম্য দরিদ্র মুসলমানের পোষাকে প্রীতিলতার নেতৃত্বে ক্লাব আক্রমণের উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। প্রীতিলতা পরিধান করিয়াছিলেন সামরিক পরিচ্ছদ এবং উপরে একখানি চাদর দিয়া তাঁহার সেই পোষাক আবৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

যখন তাঁহারা ক্লাবে গিয়া উপস্থিত হইলেন—তখন প্রায় রাত্রি দশটা-সাড়ে দশটা হইবে। জন পঞ্চাশেক ইউরোপীয় নর-নারী তখন ক্লাবঘরের অভ্যন্তরে পূর্ণোদ্যমে আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইয়াছিল। অস্ত্রধারী প্রহরীর সংখ্যাও সেদিন সেখানে পাঁচ-ছয়জনের অধিক ছিল না। মহেন্দ্র ও সুশীল মুসলমান কোর্ত্তার ছদ্মবেশে গেট পার হইয়া ক্লাবের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলেন—তাহাদের দেখিয়া কাহারও কোন সন্দেহ হইল না। প্রীতিলতা ও তাঁহার অন্যান্য সঙ্গীরা ক্লাবের পশ্চাতের একটি সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। আগ্নেয়-অস্ত্রে মত্ত ইউরোপীয়দিগের উপর মহেন্দ্র ও সুশীল একই সঙ্গে বোমা নিক্ষেপ করিলেন। ক্লাবের পিছন দিকের দরজা হইতে প্রীতিলতা ও অন্যান্য সকলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বর্ষণ করিতে সুরু করিলেন রিভলবারের গুলি। বোমা ও গুলির আওয়াজে গোটা ক্লাবঘরটি কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল—চতুর্দ্দিক ভরিয়া উঠিল ধোঁয়ায়। ভিতরের খেতাঙ্গ নরনারী ত্রাসার্ত্ত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে এদিকে-ওদিকে ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়া দিল। চট্টগ্রামের সূর্য্য সেনের দুর্দ্ধর্ষ বিপ্লবীদলটির দ্বারাই যে ক্লাবঘরটি আক্রান্ত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে কাহারও মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হইল না। সূর্য্য সেনের সেই দল—যে দলের নামে পুলিশের কর্ত্তৃপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া একজন সাধারণ খেতাঙ্গ পর্য্যন্ত ভয়ে কম্পিত হইত।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়া ক্লাবের দুই পার্শ্ব হইতে অবিশ্রান্ত আক্রমণ চলিতে লাগিল। অনেকেই হইল হতাহত—যাহারা আহত হইল, তাহারা পড়িয়া পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। কার্য্য শেষ হইলে প্রীতিলতা বিপ্লবীদিগকে স্থানত্যাগ করিতে বলিলেন। তাঁহার কথামত বিপ্লবীরা খানিকটা অগ্রসর হইয়া গিয়া লক্ষ্য করিলেন যে প্রীতিলতা ধরা দিয়া তাঁহাদিগের সহিত ফিরেন নাই। ইহার কারণ কি, তাহা অবগত হইবার জন্য মহেন্দ্র চৌধুরী পুনরায় ক্লাবের দিকে ফিরিয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে প্রধান সৈন্যনিবাসে ক্লাব-আক্রমণের সংবাদ পৌঁছিয়াছিল। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র সেখান হইতে ঘটনাস্থলের দিকে একগাড়ী সৈন্যও পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। মহেন্দ্র প্রীতিলতার নিকট ফিরিয়া যাইতে যাইতেই দেখিতে পাইলেন যে চতুর্দ্দিকে তীব্র আলোকপাত করিতে করিতে দূর হইতে মিলিটারি গাড়ী অতি দ্রুত ছুটিয়া আসিতেছে।

মহেন্দ্র তথাপি ঘরিতগতিতে শ্রীতিলতার নিকট ফিরিয়া গেলেন এবং তাঁহার তখনও সেখানে অবস্থানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আত্মরক্ষার্থে তাড়াতাড়ি পলাইয়া আসিবার জন্য তিনি শ্রীতিলতাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু শ্রীতিলতা ততক্ষণে পটাসিয়াম সায়নাইড, বিষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার আত্মোৎসর্গ মহেন্দ্রের নিকট অর্পণ করিলেন এবং তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন যে তিনি যেন মাষ্টারদাকে তাঁহার শেষ প্রণাম জ্ঞাপন করেন। শ্রীতিলতা বলিলেন যে এ জীবনে তিনি আর ফিরিবেন না।

রিভলভারটি লইয়া মহেন্দ্র প্রস্থান করার অল্প পরেই সৈন্যবাহী গাড়ীটি ক্লাবের হাতায়লে আসিয়া উপস্থিত হইল। সৈন্যগণ চতুর্দিক তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল। শ্রীতিলতার মৃতদেহটি পাওয়া গেল ক্লাবঘর হইতে প্রায় একশত হাত দূরে। তাঁহার পরীর তল্লাস করিয়া পাওয়া গেল রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফটো, ঐকৃষ্ণের চিত্র, ক্লাব-বাড়ীটির একটি নক্সা, শ্রীতিলতার নিজের লিখিত এক টুক্‌রা বিজ্ঞপ্তি-পত্র। সেই বিজ্ঞপ্তি-পত্র হইতে জানা গেল যে, মাষ্টারদার আহ্বানে সাড়া দিয়াই তিনি ইউরোপের আক্রমণের নেত্রীত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের দ্বারা অন্যান্য স্থানে অনুষ্ঠিত হিংসা-কলাপের ইহাও একটি অংশ বিশেষ।

ইউরোপের ঘটনায় রিসেস্ লালিতাবা সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। আহত হইয়াছিলেন মিঃ ম্যাকডোনেল্ড ও তাঁহার স্ত্রী, মিঃ লোয়ার ও তাঁহার পত্নী, মিঃ মিডিলটন ও তাঁহার স্ত্রী। আরও কয়েকজন অল্প-বিস্তর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এদিকে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সম্পর্কে যে দুইটি মামলা চলিতেছিল, তাহার ফলাফল একে একে প্রকাশিত হইতে লাগিল। প্রথম মামলাটির রায় প্রকাশিত হইল ১৯৩২ সালের ১লা মার্চ্চ। গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল, হরিপদ ভট্টাচার্য্য, মহাদেব রায়, আনন্দ গুপ্ত, সুবোধ চৌধুরী, কবির সেন, সুধেন্দু দস্তিদার, লালমোহন সেন, সুবোধ রায় ও রবীন্দ্র দাশগুপ্তের প্রতি আদেশ হইল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের। অম্বিকা সিংহ দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। অনিলবন্ধু দাসের বয়স অল্প বলিয়া তাঁহাকে তিন বৎসরের জন্য বোর্ষ্টাল স্কুলে পাঠাইবার আদেশ প্রদত্ত হইল। অবশিষ্ট সকলে মুক্তি পাইলেন।

অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সম্পর্কিত দ্বিতীয় মামলাটির রায় প্রকাশিত হইল ১৯৩৩ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি। তিনজন বিচারপতির মধ্যে অম্বিকা চক্রবর্ত্তীর দণ্ড লইয়া মতভেদ ঘটিল। মিঃ এ, এফ্, এম, রহমান তাঁহাকে চরম দণ্ডদানের হেতু নাই বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন, কিন্তু অপর দুইজন তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড দানের পক্ষে মত প্রকাশ করিলেন। সুতরাং অধিকাংশের মতে তাঁহার প্রাণদণ্ডেরই আদেশ হইল। লক্ষেশ্বর রায়ের হইল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ। নেপেন্দু দস্তিদার নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইয়া খালাস পাইলেন।

লক্ষেশ্বর রায় ও অম্বিকা চক্রবর্ত্তীর পক্ষ হইতে হাইকোর্টে আপীল দায়ের করা হয়। ইহার ফলে লক্ষেশ্বর রায়ের মৃত্যু দণ্ড বহাল থাকে, কিন্তু অম্বিকা চক্রবর্ত্তীর প্রাণদণ্ড রদ্ হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হয়।

১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে ধলঘাটগ্রাম হইতে মাত্র মাইল তিনেক দূরে যেতা সূর্য্য সেন গৈরলা গ্রামের এক আশ্রয়-কেন্দ্রে অবস্থান করিতেছিলেন। বিভিন্ন স্থান হইতে বিপ্লবীরা এই সময় উক্ত কেন্দ্রে আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে আবশ্যক আদেশ-নির্দ্দেশাদি গ্রহণ করিয়া যাইতেন। দলের অন্যতম বিশ্বস্ত কর্ম্মী ত্রজেন সেন অতি যোগ্যতার সহিত সেই আশ্রয়-কেন্দ্রের তত্ত্বাবধান করিতেন।

তারকেশ্বর ঘটনার এই সময় সূর্য্য সেনের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। বহু দায়িত্বও তাঁহার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। স্বতন্ত্র এক আস্তানায় তিনি অন্যত্র থাকিতেন। তাঁহার ও সূর্য্য সেনের মধ্যে গুপ্ত যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। পলাতক অবস্থায় কল্পনা দত্তও তখন তাঁহাদের সহিতই অবস্থান করিতেছিলেন।

সূর্য্য সেনকে ধরাইয়া দিতে পারিলে বা তাঁহাকে ধরিবার উপযোগী সংবাদ সরবরাহ করিতে পারিলে কর্ত্তৃপক্ষের পুরস্কারের পরিমাণ ৫০০০৲ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ইতিমধ্যে ১০,০০০৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। গৈরলা গ্রামের নেত্র সেন ঐ পুরস্কার পাইবার আশায় প্রলুব্ধ হইল। নেত্র সেন ছিল ত্রজেন সেনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তাহার অবস্থা এক সময় ভালই ছিল, কিন্তু মদ্যপান ও অপব্যয়ের ফলে তাহার আর্থিক অবস্থা অতিশয় খারাপ হইয়া দাঁড়ায়। এ হেন সময় নেত্র সেন যখন জানিতে পারিল যে সূর্য্য সেন প্রভৃতি কয়েকজন বিপ্লবী তাহারই নিকট—প্রতিবেশী বিদ্যালয়ের বাটীতে অবস্থান করিতেছেন, আর তাহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা ত্রজেন সেন তাহাদের দেখা-শুনা করিতেছেন, তখন তাঁহাদের ধরাইয়া দিয়া সহসা অতগুলি টাকা পাইবার লোভ তাহার দুর্নিবার হইয়া উঠিল। ভিতরে ভিতরে পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সে সকল ব্যবস্থাই পাকা করিয়া ফেলিল।

বিদ্যালয়াভ্যন্তরে নেত্র সেন তাহার কুকীর্ত্তির পরিচয় দিল ১৩ই ফেব্রুয়ারি। ঐদিন রাত্রির ঘনান্ধকারে পূর্ব্ব ব্যবস্থামত ক্যাপ্টেন ওয়ামস্‌লি কয়েকজন সহকারী অফিসার ও একদল সশস্ত্র সৈন্য লইয়া গিয়া গৈরলা গ্রামের বিদ্যালয়ের বাটী পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিলেন। সূর্য্য সেনের সহিত তখন উক্ত আশ্রয়ে কল্পনা দত্ত, পূর্ণেন্দু দাশগুপ্ত, ত্রজেন সেন, ধরণী দত্ত ও শান্তি চক্রবর্ত্তী ছিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে পুলিশদলকে আক্রমণ আরম্ভ করিবার ইঙ্গিত স্বরূপ নেত্র সেন তাহার গৃহের প্রাঙ্গণ হইতে একটি আলো লইয়া কয়েকবার সঙ্কেত করিল। বাহিরে অপেক্ষারত পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী তৎক্ষণাৎ বাড়ীটির উপর আক্রমণ আরম্ভ করিল। বিপ্লবীদের তখন অল্পকাল পূর্ব্বে আহার সমাপ্ত হইয়াছে মাত্র এবং অবসন্নতাবশতঃ সূর্য্য সেন আহারের পর সেই মাত্র ঘুমে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। এই অবস্থায় তাঁহারা সহসা আক্রান্ত হইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন। পুলিশদল সেই গ্রামটিকে আলোকিত করিবার জন্য কয়েকটি রকেট বোমা ফাটাইল।

বাড়ীটির একদিকে ছিল জঙ্গল ও একটি মোংরা পুকুর। সূর্য্য সেন সেই মুহূর্ত্তেই স্থির করিয়া ফেলিলেন যে সেই দিকের পথ দিয়াই তাঁহাদের পলাইতে হইবে। পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর দৃষ্টি উহার বিপরীত দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য তিনি উপর্য্যুপরি কয়েকবার উহার বিপরীত দিকে গুলি চালাইলেন। ইহার ফলও তাঁহার আশানুরূপই ফলিল। সেদিকে গুলি নিক্ষিপ্ত হইল, তাঁহারা বাড়ীটির সেই দিকের কক্ষেই আছেন মনে করিয়া পুলিশ ও সৈন্যদল সেইদিকেই তাহাদের অধিকতর মনোযোগ প্রদান করিল।

রাত্রির অন্ধকারে বিপ্লবীরা অতঃপর সেই ঝোপ-জঙ্গলের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। সেদিকে ছিল একটি বাঁশের বেড়া। সুশীল দাশগুপ্ত সকলকে কোলে করিয়া একে একে সেই বেড়া পার করিয়া দিতে লাগিলেন। সূর্য্য সেনকেও ঐ একইভাবে তিনি যখন বেড়া পার করাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন একটি গুলি আসিয়া তাঁহার হাতে বিদ্ধ হইল। ইহার ফলে তিনি আর সূর্য্য সেনকে বেড়া পার করিয়া দিতে সক্ষম হইলেন না। যাঁহারা ইতিমধ্যেই বেড়ার ওপারে গিয়াছিলেন, তাঁহারা মোংরা পুকুরটি পার হইয়া ছুটিতে আরম্ভ করিলেন। সেইদিকে শব্দ শুনিতে পাইয়া পুলিশ আন্দাজেই ঝোপ-জঙ্গলের উপর গুলি চালাইয়া চলিল।

একটি গাছের গুঁড়ি ধরিয়া তখন সূর্য্য সেন নিজেই বেড়াটি অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিলেন। কোথায় যে কে আছে বা না আছে, রাত্রির অন্ধকারে তাহা দেখিতে পাইবার উপায় ছিল না। বেড়াটি ডিঙাইয়া তিনি যে স্থানে গিয়া অবতরণ করিলেন—মনবিহারী ক্ষেত্রী নামক জনৈক সশস্ত্র গুর্খা সেখানে সকলের অলক্ষ্যে অবস্থান করিতেছিল। সূর্য্য সেনকে আপন খপ্পরে পাইয়াই সে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং চীৎকার করিয়া অন্যান্য সকলকে নিকটে ডাকিল। মুহূর্ত্ত মধ্যেই বহু সশস্ত্র গুর্খাই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অফিসাররা আসিয়া সানন্দে অবলোকন করিলেন যে ধৃত ব্যক্তিটি আর কেহই নন, তিনি স্বয়ং নেতা সূর্য্য সেন। ক্যাপ্টেন লেমও ধরা পড়িলেন পলায়নরত অবস্থায়। সূর্য্য সেনের দেহ তল্লাস করিয়া পাওয়া গেল—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার হইতে লুণ্ঠিত একটি রিভলবার ও কয়েক রাউণ্ড কার্ত্তুজ।

দেশের শত্রু মেজর লেনের বিশ্বাসঘাতকতায় সূর্য্য সেন এইভাবে শেষ শেষ পর্য্যন্ত ধরা পড়িলেন। মেজর লেনের উপর বিপ্লবীদের ক্রোধ ইহার ফলে দেখা দিল প্রচণ্ডরূপে। কিছুদিনের মধ্যেই আততায়ীর আঘাতে মেজর লেনকে জীবন দিয়া করিতে হইল তাহার সীমাহীন পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

সূর্য্য সেন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। চট্টগ্রাম জেলে ফাঁসির আসামীর জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে অন্যান্য বন্দীদের হইতে পৃথক্ করিয়া সতর্ক প্রহরাধীনে তাঁহাকে রাখা হইল। সংবাদ-পত্র বা পুস্তক প্রভৃতি প্রাপ্ত হইবার কোনও সুযোগই তাঁহাকে দেওয়া হইল না।

মাষ্টারদা গ্রেপ্তার হইবার পর চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের পরিচালনার ভার স্বাভাবিক ভাবেই গিয়া পড়িল তারকেশ্বর দস্তিদারের উপর। তিনি তখন চট্টগ্রাম কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর বি-এস্-সি ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। কল্পনা দত্ত প্রভৃতি পলাইয়া গিয়া তারকেশ্বরের সঙ্গেই যোগদান করিয়াছিলেন। মাষ্টারদাকে কি করিয়া মুক্ত করিয়া আনা যায়—এই চিন্তাই ইহার পর সকলের মনে প্রধান হইয়া উঠিল। জেলের ভিতরের কয়েকজন বিপ্লবী অতি কষ্টে সূর্য্য সেনের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া এ সম্বন্ধে আলোচনা চালাইতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের সহিত জেলের বাহিরে অবস্থিত তারকেশ্বর দস্তিদার প্রভৃতিরও সংযোগ স্থাপিত হইল। সূর্য্য সেনের জেলখানা হইতে পলায়ন যাহাতে সম্ভবপর হয়, সে বিষয়ে কাজও অনেকটা অগ্রসর হইয়া গেল অতি সন্তর্পণে। গোয়েন্দা পুলিশের তৎপরতায় ষড়যন্ত্রটি কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সফল হইল না। ২০শে মার্চ্চ তারিখে পুলিশ ষড়যন্ত্রটির বিষয় জানিতে পারে এবং তাহার ফলে উহা ব্যর্থ হইয়া যায়।

পটিয়া থানার দারোগা যখন রীক্ষিত এই সময়ই একদিন বিপ্লবীদের গুলির আঘাতে প্রাণ হারাইলেন।

১৯৩৩ সালের মে মাস। পহিরা গ্রামের পূর্ব্ব তানুকদারের গৃহে তারকেশ্বর দস্তিদার, কল্পনা দত্ত প্রভৃতি তখন অবস্থান করিতেছিলেন। ১৮ই মে তারিখে রাত্রিকালে একদল পুলিশ ও সিপাহী গিয়া সহসা বাড়ীটি ঘেরাও করিয়া ফেলিল। অকস্মাৎ এইভাবে আপনাদিগকে পরিবেষ্টিত হইতে দেখিয়া বিপ্লবীরা নিরুপায় হইয়া তাহাদের উপর গুলি চালাইতে লাগিলেন। পুলিশ ও সৈন্যদলও ইহার প্রত্যুত্তরে গুলিবর্ষণ সুরু করিল। বিপ্লবীদের নিকট সেদিন অস্ত্র-শস্ত্র ও গুলি-বারুদের পরিমাণ ছিল অল্প—সংখ্যাতেও তাঁহারা অধিক ছিলেন না। অপর পক্ষে পুলিশ ও সিপাহীদের সংখ্যা তাঁহাদের তুলনায় সেদিন অনেক বেশি। তাহারা বাড়ীটির উপর অবিশ্রান্ত ভাবে গুলি বর্ষণ করিয়া চলিল। বিপ্লবীরা বুঝিতে পারিলেন যে লড়াই চালাইয়া কোনই লাভ নাই। ইতিমধ্যেই পূর্ব্ব তানুকদার, শচীন্দ্র দাস ও মনোরঞ্জন দাস সিপাহীদের নিক্ষিপ্ত গুলিতে নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহারা কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় পুলিশের পক্ষ হইতে অস্ত্র-ত্যাগ ও আত্ম-সমর্পণের আহ্বান আসিল। বিপ্লবীরাও স্থির করিলেন যে, সে অবস্থায় আত্ম-সমর্পণই সমীচীন হইবে।

বিপ্লবীরা তাঁহাদের অস্ত্র-শস্ত্র পুলিশের নিকট বাহিরে পাঠাইয়া দিলেন—তারপর তাহাদের নির্দ্দেশমত হাত উপরে তুলিয়া গৃহ হইতে একে একে বাহির হইয়া আসিলেন। পুলিশ সকলকেই গ্রেপ্তার করিল। তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্ত প্রভৃতি এইভাবেই ধরা পড়িলেন পুলিশের হাতে।

(ক্রমশঃ)

কালের মন্দিরা

শ্রীশারদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

মোঙের বিলাপ

বৃদ্ধ হূণ-যোদ্ধা মোঙ্ গল্প বলিতেছিল। নির্জন বনপথের পাশে ক্ষুদ্র একটি জলসত্র; এই সত্রের প্রপাপালিকা যুবতী অদূরে বসিয়া কলমল-কপোলে মোঙের গল্প শুনিতেছিল।

চারিদিকে প্রস্তরাকীর্ণ অসমতল ভূমির উপর দেবদারু, পিয়াল ও মধুকের বন। পথের ধারে বন তত ঘন নয়, যত দূরে গিয়াছে ততই নিবিড় হইয়াছে। অনুচ্চ পর্বতের শ্রেণী দ্বিপ্রহরের খর রৌদ্রে শঙ্কাবৃত সরীসৃপের ন্যায় নিস্পন্দভাবে পড়িয়া আছে। নবাগত গ্রীষ্মের আলস্য ও পক্ক মধুক-ফলের গুরু সুগন্ধ মিশিয়া আতপ্ত বাতাসকে মদমন্থর করিয়া তুলিয়াছে।

এই পর্বত-কান্তার-তরঙ্গিত বিচিত্র দৃশ্যের ভিতর দিয়া সুদীর্ঘ কুটিল পথটি যেন অতি বড়ে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া দক্ষিণ হইতে উত্তরাভিমুখে গিয়াছে। দ্বিপ্রহরেও পথ জনহীন, এই পার্বত্য রাজ্যের কেন্দ্রপুরী কপোতকূট এখান হইতে প্রায় ক্রোশেক পথ দক্ষিণে। পথের পাশে রুক্ষ প্রস্তরে নির্মিত একটি কুটীর—ইহাই জলসত্র; তাহার দুই পাশে দুইটি দীর্ঘ গুচ্ছ দেবদারু বৃক্ষ ঘন কুঞ্চিত পত্রভারে স্থানটিকে ছায়াশীতল করিয়া রাখিয়াছে। বৃদ্ধ হূণ মোঙ্ একটি দেবদারুর কাণ্ডে পৃষ্ঠ-ভার অর্পণ করিয়া জানুদ্বয় বাহু দ্বারা আবেষ্টন পূর্বক নিজ স্মৃতিকথা বলিতেছিল।

মহারাজাধিরাজ পরমভট্টারক মগধেশ্বর স্কন্দের ষোড়শ রাজ্যাঙ্কে উত্তরপশ্চিম ভারতের শৈলবন্ধুর অধিত্যকার একপ্রান্তে, বিটঙ্ক নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজধানী কপোতকূট হইতে অনতিদূরে এক ক্ষুদ্র জলসত্রের তরুচ্ছায়ামূলে আমাদের আখ্যায়িকা আরম্ভ হইতেছে।

বৃদ্ধ মোঙ্ নিজের বিলাপপূর্ণ স্মৃতিকথা শুনাইতে ভালবাসিত। তাহার ষোল্ক জীবন শেষ হইয়াছে, দেহে আর শক্তি নাই; যে দুর্ধর্ষ প্রকৃতি লইয়া পঁচিশ বৎসর পূর্বে মুক্ত কৃপাণ হস্তে এই রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিল তাহাও বোধকরি নিভিয়া গিয়াছে। তাই, উত্তর মেরুর সুদীর্ঘ রাত্রে তুষার সঙ্কটের মধ্যে অগ্নি জ্বালিয়া মেরুবাসী যেমন সূর্যের স্বপ্ন দেখে, জরাগ্রস্ত মোঙ্ তেমনই হূণ জাতির অতীত বীর্য গৌরবের স্বপ্ন দেখিত। তাহার দেহ খর্ব, মাংসপেশী ক্ষয় হইয়া দেহের চর্ম গোল করিয়া দিয়াছে; তথাপি সে যে এককালে অতিশয় বলশালী ছিল তাহা তাহার শিথিল-চর্মাবৃত দেহ-কঙ্কালের সুবিপুল প্রস্থ হইতে অনুমান হয়। কেশলেশহীন মুখমণ্ডল অগণিত কুঞ্চন চিহ্নে শুষ্ক নারিকেল ফলের আকৃতি ধারণ করিয়াছে; উচ্চ হনু ও ভ্রূ-অস্থির মাঝখানে ক্ষুদ্র চক্ষুদুটি কিন্তু সুতীক্ষ্ণ। মাথার উপর কয়েক গুচ্ছ পাণ্ডুবর্ণ কেশ আপন বিরলতার ফাঁকে ফাঁকে করোটির গঠন প্রকট করিতেছে।

মোঙের কণ্ঠস্বর শ্রুতিমধুর নয়। হূণ জাতির কণ্ঠস্বর স্বভাবতই প্রসাদগুণবর্জিত; মোঙ্ কথা কহিলে মনে হইত, গুরুভারবাহী গো-শকটের তৈলহীন চক্র হইতে আর্ত আপত্তি উত্থিত হইতেছে। নগরের পান-শালায় মোঙ্ গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেই শ্রোতারা উঠিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিত। কিন্তু তথাপি মোঙ্ নিরাশ হইত না; কোনও ক্রমে একটি শ্রোতা সংগ্রহ করিতে পারিলেই সে অতীতের কাহিনী আরম্ভ করিয়া দিত।

বর্তমানে মোঙের একটি শ্রোত্রী জুটিয়াছিল—সে এই জলসত্রের প্রপাপালিকা সুগোপা। তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণা, তন্বী, বয়স অনুমান কুড়ি বাইশ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বস্তুত পঁচিশ বৎসর। অধর প্রান্তে একটু চটুলতার আভাষ, চক্ষুদুটি নীলাঞ্জন মেঘের স্নিগ্ধতায় সরস। সুগোপা কপোতকূটের রাজ-উদ্যানের মালাকরের বনিতা, তাহার হাতের মালা বহিলে রাজকুমারী—

কিন্তু সুগোপার পূর্ব পরিচয় পরে প্রকাশ পাইবে।

মোঙ্ দন্তধাবন কাষ্ঠের অন্বেষণে প্রায় নগর বাহিরে জঙ্গলের মধ্যে আসে, করঞ্জবৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ অন্যত্র পাওয়া যায় না। তখন দুদণ্ড সুগোপার কাছে বসিয়া সে নিজের প্রিয় কাহিনী বলিয়া যায়; সুগোপাও আপত্তি করে না। সারাদিন তাহাকে একাকিনী এই প্রপায় থাকিতে হয়, কচিৎ দুই চারিজন দূরাগত পথিক জলপান করিবার জন্য ক্ষণেক দাঁড়ায়, তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া নগরাভিমুখে চলিয়া যায়; এই নিঃসঙ্গতার মধ্যে মোঙের গল্প তাহার মন্দ লাগে না। সুদূর বঙ্কু নদীর তীরে হূণেরা কি করিয়া জীবনযাপন করিত; তারপর একদিন যাযাবর জাতির স্বভাবজ অস্থিরতা কেমন করিয়া তাহাদের বিশাল গোষ্ঠীকে গান্ধারের সীমান্তে আনিয়া উপনীত করিল; তারপর পঞ্চনদ-ধৌত শ্যামল উপত্যকার লোভে তাহারা কি ভাবে পঙ্গপালের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল; স্কন্দের সহিত হূণদের যুদ্ধ, হূণগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল; তারপর দ্বাদশ সহস্র হূণ এই বিটঙ্ক রাজ্য অধিকার করিয়া বসিল, কপোতকূটে প্রবেশ করিয়া রাজপুরী আক্রমণ করিল—

মোঙ্ গল্প বলিতেছিল, সুগোপা অদূরে পীঠিকার ন্যায় একটি উচ্চ প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া করলগ্নকপোলে শুনিতেছিল—

দর্দুর-ধ্বনিবৎ একটি শব্দ মোঙের কণ্ঠ হইতে বাহির হইল; ইহা তাহার হাস্য। ক্ষণিক কৌতুক অপনোদিত হইলে মোঙ্ বলিল, 'মেঘ! গড্ডলিকা! হূণ জাতি আর নাই, ভেড়া বনিয়া গিয়াছে। পঁচিশ বৎসর পূর্বে যাহারা সিংহ ছিল, তাহারা আজ ভেড়া! কাহাকে দোষ দিব? আমাদের যিনি রাজা, যিনি একদিন স্বহস্তে এদেশের বীর্যহীন অধিপতির মাথা কাটিয়া শূলশীর্ষে স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনি আজ অহিংসা ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন, বরাহ পর্যন্ত আহার করেন না। ধর্ম! ওরঘারি যাহার একমাত্র দেবতা, সে চৈত্য নির্মাণ করিয়া কোন্ এক মৃত ভিক্ষুকের অস্থি পূজা করিতেছে! হ হ হ—' মোঙের কণ্ঠ হইতে আবার স্নেহপূর্ণ দর্দুর ধ্বনি বাহির হইল।

সুগোপা করতল হইতে মুখ তুলিয়া বলিল—'মহারাজ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন।'

মোঙ্ও বৃক্ষকাণ্ডের অবলম্বন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিল, তালপত্রের পুত্তলীর ন্যায় সহসা দুই হস্ত আস্ফালিত করিয়া বলিল—'সেই কথাই তো বলিতেছি। কিন্তু কেন এমন হইল? দ্বাদশ সহস্র শোণিত-লোলুপ মরু-সিংহ পঁচিশ বৎসর পূর্বে এদেশে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা আজ কোথায়? ভেড়া—সব ভেড়া।'

সুগোপার অধর কোণে একটু হাসি দেখা দিল; সে বলিল—'মোঙ্, তবে তো তুমিও ভেড়া।'

মোঙ্ও কথায় কর্ণপাত না করিয়া পুনশ্চ ঠেস্ দিয়া বসিল, ক্ষুদ্র চক্ষুদ্বয় কিছুক্ষণ সুগোপার মুখের উপর স্থাপন করিয়া রহিল, তারপর কতকটা যেন নিজ মনেই বলিল—'অসির নখ, ঘোড়ার পিছনের পা এবং স্ত্রীলোকের কটাক্ষ—মানুষের সমস্ত বিপদের মূলে এই তিনটি। হূণ শিশুকাল হইতেই প্রথম দুইটিকে এড়াইয়া চলিতে শিখে, কিন্তু ঐ তৃতীয় বিপদই তার সর্বনাশ করিয়াছে। বেশ ছিলাম আমরা মরুর কোলে; আমাদের বলিষ্ঠ রূপহীনা নারীরা অশ্ব উষ্ট্রের সহিত একসঙ্গে কাজ করিত, দুর্দম হূণশিশু প্রসব করিত—এদেশের কুহকিনীদের মত পুরুষকে মেষশাবকে পরিণত করিতে পারিত না। প্রবাদ বাক্য মিথ্যা নয়, অসির নখ, ঘোড়ার পা আর স্ত্রীলোকের কটাক্ষ—' মোঙ্ অত্যন্ত মুগ্ধ ভাবে সুগোপার সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া শুষ্ক নারিকেলের মত মাথাটি নাড়িতে লাগিল।

মৃদু হাসিয়া সুগোপা বলিল—'মোঙ্—তোমার নাগসেনার কটাক্ষ কি এখনও খুব তীক্ষ্ণ আছে?'

মোঙ্ দুই হাত নাড়িয়া সুগোপার পরিহাস দূরে সরাইয়া দিয়া বলিল—'এক পুরুষের মধ্যে একটা জাতি নির্বীর্য হইয়া গেল! আমরা না বুড়া হইয়াছি—যৌবন ও অশ্বিনীদুগ্ধজাত মদ্যের মাদকতা চিরদিন থাকে না, কিন্তু আমাদের সন্তানেরা বা কী? তাহারা হূণের পুত্র বটে, তবু তাহারা হূণ নয়। মরু-সিংহের ঔরসে একপাল ভেড়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে।'

ভেড়ার উপমাটা বৃদ্ধকে চাপিয়া ধরিয়াছে, তদুপরি সে উত্তরোত্তর উষ্ণতর হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া সুগোপা বলিল—'সেজন্য বিলাপ করিয়া লাভ নাই। এ দেশের নারীরা তোমাদের সাধিয়া বিবাহ করে নাই, তোমরাই বলপূর্বক তাহাদের বিবাহ করিয়াছিলে—এখন

কাঁদিলে চলিবে কেন? আর, ছলও নিতান্ত মন্দ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তোমাদের বাপধরেরা—আর কিছু না হোক—তোমাদের চেয়ে সুশ্রী। তাহাদের কুল না থাক, শীল আছে।'

'শীল আছে!' মোঙের স্বর ক্রোধে আরও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল—'কী প্রয়োজন শীলের? শিষ্টতার দ্বারা কবে মুণ্ড কাটিয়া লওয়া যায়? কথার পরিবর্তে সৈন্যদল প্রয়োগ করিলে ঘোড়া অধিক সোজায়? আমরা যেদিন রাজধানী অধিকার করি, সেদিন কি শিষ্টতা দেখাইয়াছিলাম? বাজপাখীর মত আমরা কপোতকুটের উপর পড়িয়াছিলাম—নগরের পয়োনালক পথে রক্তের স্রোত বহিয়া গিয়াছিল! রাজপ্রাসাদের রক্ষীরা আমাদের বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল—হ হ হ—' মোঙ্ আবার হাসিল—'রাজপ্রাসাদ বিজয়ের কথা স্মরণ হইলে এখনও আমার রক্ত নৃত্য করিয়া ওঠে—'

সুগোপা বলিল—'রক্তপিপাসু হূণ, তবে সেই গল্পই বল, তোমার আক্ষেপ শুনিবার আগ্রহ আমার নাই।'

দুরন্ত শিকারের প্রতি চলচ্ছক্তিহীন ক্ষুধিত ব্যাঘ্র যেভাবে তাকাইয়া থাকে, মোঙ্ সেইভাবে শূন্যে তাকাইয়া রহিল, লালায়িত রসনায় বলিতে লাগিল—'সেদিন দুই মুঠি ভরিয়া সোনা লুঠ করিয়াছিলাম। প্রাসাদের নিম্নে অন্ধকূপ কক্ষে সোনার দীনার স্তূপীকৃত ছিল—আটজন রক্ষী সেই গর্ভগৃহ পাহারা দিতেছিল···ভুবকাণ প্রথমে সেই গুপ্ত কোষাগারের সন্ধান পায়; আমরা ত্রিশ জন হূণ গিয়া রক্ষীদের কাটিয়া ফেলিলাম। তারপর সকলে মিলিয়া সেই দীনার স্তূপ···এত সোনা আর কখনও দেখিব না। ভুবকাণ ছিল আমাদের নায়ক, অধিকাংশ দীনার তাহার ভাগে পড়িল। যুদ্ধ শেষ হইবার পর সেই সোনা আমাদের রাজাকে উপহার দিয়া ভুবকাণ চষ্টনদুর্গের অধিপতি হইয়া বসিল—'

সুগোপা বলিল—'তা জানি। তারপর আর কি করিলে?'

মোঙ বলিয়া চলিল—'রত্নাগার হইতে উপরে আসিয়া আমরা রাজ অবরোধের দিকে ছুটিলাম। আমাদের পূর্বেই সেখানে বহু হূণ পৌঁছিয়াছিল; চারিদিক হইতে নারীকণ্ঠের চীৎকার, ক্রন্দন, আর্তনাদ উঠিতেছিল। আমরা অবরোধের অলিন্দে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, সেখানে এক পরম কৌতুককর খেলা চলিতেছে। ছয় সাত জন হূণ যোদ্ধা একটা ক্ষুদ্র বালকের দেহ লইয়া মুক্ত কৃপাণের উপর লোফালুফি করিতেছে। বালকটা রাজপুত্র—এক বৎসর বয়ঃক্রম হইবে—মাংসের একটা উলঙ্গ পিণ্ড বলিলেই হয়। একজন তাহাকে তরবারির ফলার উপর লইয়া আর একজনের দিকে ছুঁড়িয়া দিতেছে, দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহাকে তরবারির ফলার উপর গ্রহণ করিতেছে, মাটিতে পড়িতে দিতেছে না। শূন্যে শূন্যে খেলা চলিতেছে। শিশুটা মরে নাই, মাঝে মাঝে অস্পষ্ট কাতরোক্তি করিতেছে। পাছে তরবারির আঘাতে কাটিয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায় এইজন্য সকলেই তাহাকে ফলার পার্শ্বদেশে গ্রহণ করিতেছে; তবু শিশুটার সর্বাঙ্গ কাটিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে।

'আমরাও গিয়া খেলায় যোগ দিলাম; মাঝে মাঝে হাসির অট্টরোল উঠিতে লাগিল। একটা যুবতী দ্বার পথে উঁকি মারিয়া সহসা চীৎকার করিয়া পলায়ন করিল, আমাদের মধ্যে দুই চারিজন খেলা ছাড়িয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল।

এই সময় কে একজন আসিয়া সংবাদ দিল, রাজা ধরা পড়িয়াছে। রক্তপাগল হূণের দল শিশুকে সেইখানে ফেলিয়া চলিয়া গেল। আমি কিন্তু তাহাদের সঙ্গে গেলাম না। শুধু হত্যা আর লুণ্ঠনে হূণের তৃপ্তি হয় না; নগ্ন তরবারি হস্তে আমি অবরোধের ভিতর প্রবেশ করিলাম।'

এতক্ষণ গল্প বলিতে বলিতে মোঙের ক্ষুদ্র চক্ষুযুগল হিংস্র উল্লাসে জ্বলিতেছিল, এখন সহসা যেন চক্ষুর জ্যোতি নিভিয়া গেল। সে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বিপন্ন স্বরে বলিল—'এই অবরোধের একটা কক্ষে প্রথম নাগসেনার সাক্ষাৎ পাই। পালঙ্কের নীচে লুকাইয়াছিল, তাহাকে টানিয়া বাহির করিলাম। সে কঙ্কন দিয়া আমার কপালে আঘাত করিল। আমি তরবারি ফেলিয়া তাহাকে সাপটাইয়া ধরিলাম; সে আমার বক্ষে কামড়াইয়া দিল। কামড়ের দাগ এখনও আমার বুকে আছে। সেই অবধি—' মোঙের স্বর অত্যন্ত করুণ হইয়া ক্রমে থামিয়া গেল।

সুগোপা করতলে কপোল রাখিয়া নিঃশব্দে শুনিতেছিল,

এই নৃশংস কাহিনী তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। দেশব্যাপী বিপ্লবের মধ্যে যাহার জন্ম, অমানুষিক নিষ্ঠুরতার বহু চিত্র যাহার শৈশব স্মৃতির মূল উপাদান, যাহার নিজের জননী ও বহু পরিজন এই শোণিতস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে—মোঙের কাহিনী শুনিয়া তাহার বিচলিত হইবার কথা নয়। শুধু রাজপুরী অধিকারের এই পুরাবৃত্ত তাহার অজ্ঞাত ছিল বলিয়াই সে মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিল।

কিয়ৎকাল নীরবে কাটিবার পর সুগোপা মুখ তুলিয়া বলিল—'সেই শিশুর কি হইল?'

'শিশুর—?' মোঙ্ স্মৃতির জলে পুনরায় ডুব দিয়া বলিল—'শিশুটা সেই অলিন্দে রক্ত-কর্দমের মধ্যে পড়িয়া ছিল—তারপর—? হাঁ ঠিক, মনে পড়িয়াছে। চু-কাঙ্! পাগলা চু-কাঙ্! অবরোধ হইতে নাগসেনাকে লইয়া যখন বাহির হইতেছি, দেখি আমাদের পাগল চু-কাঙ্ শিশুটাকে নিজের ঝোলার মধ্যে পুরিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এটাকে লইয়া কী করিবে—শূল্য মাংস তৈয়ার করিয়া খাইবে?' চু-কাঙ্ ভাঙ্গা দাঁত বাহির করিয়া হাসিল—মোঙ আবার চিন্তামজ্জিত হইয়া পড়িল—'আশ্চর্য্য, চু-কাঙকে সেদিনের পর আর দেখি নাই, হয়তো মরিয়া গিয়াছে। হ্রদের আবু আর মরীচিকার মায়া কখন শেষ হইবে কেহ জানে না। চু-কাঙ্ পাগল ছিল বটে কিন্তু অনেক যন্ত্র-মন্ত্র জানিত, গাছের পাতা ও শিকড়ের রস দিয়া দেহের অস্ত্রকৃত অবিলম্ব জুড়িয়া দিতে পারিত—'

সুগোপা জিজ্ঞাসা করিল,—'আর সেই যুবতী? তাহার কি হইল?'

'কোন যুবতী? নাগসেনা?'

সুগোপার অধর একটু প্রসারিত হইল, সে বলিল—'না, নাগসেনার কী হইল তাহা আমরা জানি; নাগসেনা এখন নাগিনী হইয়া তোমার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছে। আমি অন্য যুবতীর কথা বলিতেছি—যে তোমাদের খেলা দেখিয়া চীৎকার করিয়া পলাইয়াছিল—'

মোঙ্ তাচ্ছিল্যভরে বলিল—'কে তাহার সংবাদ রাখে! দুই তিন জন তাহাকে ধরিবার জন্য ছুটিয়াছিল—তারপর কি হইল জানিনা। রাজপুরীতে বহু কিঙ্করী পরিচারিকা ছিল, হূণেরা যে যাহাকে পাইল দখল করিল। কয়েকটা যুবতী আত্মহত্যা করিয়াছিল—'

সুগোপা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—'বোধহয় সেই যুবতীই আমার মাতা। তিনি রাজপুত্রের ধাত্রী ছিলেন, আমরা একই স্তনদুগ্ধ পান করিয়াছিলাম।'

মোঙ্ বিস্ময় প্রকাশ করিল না, নিরুৎসুক ভাবে সুগোপার পানে চাহিয়া বলিল—'হইতেও পারে। তাহার বয়স তোমারই মতন ছিল।'

ভূমির দিকে তাকাইয়া থাকিয়া সুগোপা বলিল—'জানিনা আমার মায়ের কি দশা হইয়াছিল। তিনি আর রাজপুরী হইতে গৃহে ফিরেন নাই। হয় তো আত্মহত্যাই করিয়াছিলেন—'

এই সময় তাহাদের বিশ্রম্ভালাপে বাধা পড়িল।

(ক্রমশ)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নূতন ধারাবাহিক উপন্যাস

"বন্দর সাতঘাট"

আগামী অগ্রহায়ণ সংখ্যা হইতে নিয়মিত ভাবে ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইবে

বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারা

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্য এক অমূল্য সম্পদ্। ইহার বিচিত্র ছন্দোময়ী কবিতা, অনুপম ভাবময়ী ভাষা এবং জীবন্ত চিত্র-সমন্বিত জীবনী-সাহিত্য বৈষ্ণব সাহিত্যকে যুগে যুগে বন্দনীয়, স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় সাহিত্যের যাঁহারা স্রষ্টা, তাঁহারা অনেকেই এই বৈষ্ণব সাহিত্যের রসধারায় পুষ্ট হইয়াছেন। ভারতচন্দ্র, মাইকেল, নবীন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ প্রভৃতি সকলেই বৈষ্ণব সাহিত্যে ধুরন্ধর ছিলেন। কাজেই বাংলার জাতীয় সাহিত্যের স্বরূপ বুঝিতে হইলে বৈষ্ণব ভাবধারার মূল উৎসের সন্ধান করিতে হইবে। সাহিত্য হিসাবে, সংস্কৃতি হিসাবে, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব হিসাবে ইহার যেরূপ অনুশীলন হওয়া উচিত, তাহা হয় নাই বলিয়াই আমি মনে করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হিসাবে নির্দ্দিষ্ট হওয়ার পূর্বে, কতজনে এই বৈষ্ণব কবিতা বা সাহিত্য সম্বন্ধে সংবাদ রাখিতেন, সে প্রশ্ন করা যাইতে পারে। কীর্ত্তনের প্রভাব খর্ব হইবার পরে পদাবলীর চর্চা অত্যন্ত সীমাবদ্ধভাবেই হইত, ইহা মনে করিলে নিতান্ত অন্যায় হইবে না। শ্রাদ্ধাদিতে যে কীর্ত্তন হয়, তাহাও মন দিয়া শ্রবণ করেন এরূপ লোকের সংখ্যা এখনও বিরল। অথচ এই পদাবলীর মধ্য দিয়াই একদিন বাঙালীর সচেতন সত্তা অনন্ত সৌন্দর্যময় বিকাশের পন্থা আবিষ্কার করিয়াছিল। একজনের পর একজন কবি—এবং তাঁহাদের মধ্যেই মধ্যযুগীয় শ্রেষ্ঠ কাব্য-শিল্পীর সন্ধান মেলে—এই বৈষ্ণব-সাহিত্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। পর্বতশৃঙ্গ হইতে দূরদূরান্তব্যবহিত জলপ্রপাত বহিয়া যেমন একটি প্রসন্নসলিলা প্রশস্ত নদীর সৃষ্টি করে, বহু কবি, সাধক ও শিল্পী বৈষ্ণব সাহিত্য-সঙ্গীতের বিভিন্ন ধারার সৃষ্টি করিয়া এক প্রসন্নোদার রস-স্রোতস্বতীর জন্মদান করিয়াছিলেন। এই রস-প্রপাতের দৌলতেই একদিন বাঙালীর মানসক্ষেত্র সরস, স্নিগ্ধ ও শস্যভারনমিত হইয়া উঠিয়াছিল।

বঙ্গদেশের তথা ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বৈষ্ণব সাহিত্য যে কী বিপুল স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন! নানক, চৈতন্য, কবীর, দাদূ প্রভৃতি মহাপুরুষ ও অবতারকল্প মহামানবগণের আবির্ভাবে দেশের মধ্যে এক অভূতপূর্ব ভক্তির প্লাবন বহিয়াছিল।

তাহার ফলেই বৈষ্ণব সাহিত্যের উদ্ভব ও প্রসার। এক-দিকে রামায়ণ, অপর দিকে কৃষ্ণায়ন কাব্যের ধারা ছুটিল। আমাদের কৃত্তিবাস এবং উত্তর পশ্চিমের তুলসীদাস রাম-ভক্তিমূলক কাব্য লিখিয়া ভক্তিধর্মের যে প্রেরণা যোগাইলেন, তাহার তুলনা নাই। এই প্রেরণার ইতিবৃত্ত না জানিলে রামায়ণের ভাবধারা বুঝিতে পারা যাইবে না। রামায়ণে যে ভক্তিরসের চূড়ান্ত পরিণতি আমরা দেখিতে পাই, তাহা কখনও আকস্মিক হইতে পারে না। সেখানে আমরা শুধু কবি-মানসেরই পরিচয় পাই না—পরিচয় পাই সমগ্র দেশের প্রাণসত্তার। কৃত্তিবাসে যাঁহারা কেবল বাল্মীকির তর্জ্জমার অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা এই প্রাণসত্তার অপূর্ব পরিণতির সম্বন্ধে বিপুল অজ্ঞতাই দেখাইয়াছেন। যে ভক্তিরসের হৃদয় স্পন্দন আমরা কৃত্তিবাসে পাই, বাল্মীকির মধ্যে তাহা কোথায় পাইব? মহর্ষির তিরোধানের বহু শতাব্দীর পরে ভারত যে প্রাণচঞ্চল সত্ত্বগুণপ্রধান অভিনব সত্তার সন্ধান পাইয়াছিল, তাহারই পরিচয় মিলে। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি সূরদাসের কাব্য-কবিতায়, তাহারই বাদশাহী পাঞ্জা মিলে কৃত্তিবাসে, তুলসীদাসের রামচরিতে। কৃত্তিবাসে অনেক প্রক্ষিপ্ত অংশ সংযোজিত হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিলেও উহার মূল সুর সম্বন্ধে আমাদের বুঝিতে বাধা হইবে যদি আমরা কৃত্তিবাস ও তুলসীদাসের কবিতা দেশের আধ্যাত্মিক পরিবেশ হইতে পৃথক করিয়া দেখি।

চণ্ডীদাসের কবিতা লইয়াও আমাদের কম বিব্রত হইতে হয় না। অনেক স্থলে আমরা ভ্রমে পড়িয়া মনে করি যে শ্রীচৈতন্যই এদেশে ভক্তির ধারা প্রবর্ত্তন করেন। সুতরাং চণ্ডীদাসের কাব্যে যে প্রেমের সুর পাই, তাহা কখনও প্রেমধর্মের বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যের পূর্বে হইতেই পারে না। কিন্তু মহাপ্রভুর অবদান সম্বন্ধে কিছুমাত্র অনাদর প্রকাশ না করিয়াও একথা বলা যায় যে, যে ভক্তির অমৃতহ্রদে অবগাহন করিয়া ভারতের নানা দেশের কবিবিহঙ্গকুল মধুর কাকলিতে

আকাশ বাতাস পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই অমৃত সাগরের কৌস্তুভমণি শ্রীচৈতন্য বটেন, কিন্তু তাঁহার জন্মের পূর্বে এমন কি বহুপূর্বে নামপ্রেমের মহিমা লোকের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল না। এই বঙ্গদেশেই হরিদাস—যবন হরিদাস—মহাপ্রভুর পূর্বে তাঁহারই আগমনী গাহিতে শুরু করিয়াছিলেন, নামপ্রেমের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিলেন। এই বঙ্গদেশেই মালাধর বসুও মহাপ্রভুর পূর্বে 'বসুদেব সুত কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' বলিয়া প্রেমধর্মের গোপন তথ্যটি প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন। ব্রহ্ম হরিদাস ছিলেন শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা বয়সে বড়। John the Baptist যেমন যীশুখ্রীষ্টের পূর্বে আবির্ভূত হইয়া তাঁহারই জন্য ভূমি প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছিলেন, হরিদাসও তেমনি অগ্রদূতরূপে ভক্তিধর্মের পতাকা বহন করিয়াছিলেন। যীশু যে ধর্ম-প্রচার করিলেন, তাহার অধিকাংশ তত্ত্বই 'অনের' মারফতে পাওয়া যায়।

উত্তর পশ্চিমে আরও একজন মুসলমান এই ভক্তিধর্মের জয়গান করিয়া কম নির্যাতন ভোগ করেন নাই। তাঁহার নাম রসখান, তিনি বাদশাহ বংশের লোক ছিলেন। ইঁহার সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তিনি তাঁহার এক বন্ধুর প্ররোচনায় হজযাত্রা করিয়াছিলেন কিন্তু বৃন্দাবন পর্যন্ত আসিয়া তাঁহার মনের ভাব পরিবর্তিত হইয়া গেল। তিনি বন্ধুকে বলিলেন, 'তুমি যাও বন্ধু, আমার যাওয়া হইল না, আমি বৃন্দাবন ছাড়িয়া কোথাও যাইব না।' 'ম্যায় তো ব্রজ ছোড়কর অব কহীঁ ন জাউঙ্গা।' ক্রমে এই বার্তা বাদশাহের কানে পৌঁছিল এবং তাঁহার হুকুমে রসখান তাঁহার বিপুল সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন। রসখানের কাল সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন—খুব সম্ভব তিনি কবীর, দাদু প্রভৃতির সমসাময়িক ছিলেন। গোপীপ্রেমে বিভোর এই মুসলমান কবির উপর শ্রীচৈতন্যের প্রভাব কল্পনা করার চেষ্টা ইতিহাস সমর্থন করিবে না। এই কবিই বলিয়াছেন :

শাস্ত্রন পঢ়ি পণ্ডিত ভয়ে কৈ মৌলবী কুরাণ।
পৈ প্রেম জান্যো নহীঁ কহা কিয়ো রসখান॥

—প্রেমবাটিকা

ইনিই লিখিয়াছেন :

জ্ঞান ধ্যান বিদ্যা মত মতি বিশ্বাস বিবেক।
বিনা প্রেম সব ধূর হায় অগজগ এক অনেক॥

প্রেম বিনা জ্ঞান ধ্যান বিদ্যা সমস্ত ধূলির সমান।

এই রসখান বড় সুন্দর এক কথা বলিয়াছেন : তিনি বলিয়াছেন—আমি নির্গুণ-নিরাকার চক্ষুর অগোচর গ্রন্থের মধ্যে হরির অনুসন্ধান করিলাম, পাইলাম না, বেদ পুরাণের মধ্যে খুঁজিলাম, কত লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথায়ও সেই হরির সন্ধান পাইলাম না।

হেরত হেরত হারি পর্‌যো রসখানি
বতায়ো ন লোগ লুগায়ন।
দেখো ছুরো বহ্‌ কুঞ্জকুটীর মৈঁ বৈঠো
পলোটত রাধিকা পায়ন॥

শেষে দেখিলাম তিনি কুঞ্জকুটীরে বসিয়া শ্রীরাধিকার পদ-সম্বাহন করিতেছেন।

এই সকল কবির কবিতা বাংলার বৈষ্ণব কবিতার সহিত মিলাইয়া পড়িতে হইবে। দেশের সমগ্র আধ্যাত্মিক পরিস্থিতির (atmosphere) সংবাদ না জানিলে বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। মীরার ভজন আমরা উপভোগ করিয়া থাকি, দাদু দয়ালের তত্ত্ব-কথা আমরা সাদরে অনুধাবন করিয়া থাকি, কিন্তু যে পরিস্থিতিতে এই অপূর্ব সাহিত্যের জন্ম,তাহা আমরা ভাল করিয়া অনুশীলন করিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। কোনও একটি ভাল চিত্র বুঝিতে হইলে তাহার পরিবেশটি বুঝা যেমন প্রয়োজন, তেমনি শ্রেষ্ঠ কবিদের কাব্যশৈলী বুঝিতে হইলে পরিস্থিতিটির সন্ধান করিতে হইবে। মেঘনাদবধের কাব্য-শৈলী আর চিত্রাঙ্গদার কাব্য-শৈলী এক নহে, তাহার প্রধান কারণ উভয়ের মানসিক পরিস্থিতির প্রভাব। যে পরিবেশে মেঘনাদবধ মহাকাব্যের জন্ম হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের সময়ে তাহা প্রভাবশালী ছিল না। রামেন্দ্রসুন্দর ঠিকই বলিয়াছেন যে মহাকাব্যের যুগ চলিয়া গিয়াছে, মেঘনাদবধ আর হয় না। রবীন্দ্রনাথের গীতি-কবিতাও বুঝি তাহার স্রোত হারাইয়া ফেলিতে বসিয়াছে।

বৈষ্ণব কবিতার Background সেকালেই সম্ভব ছিল, এখন তাহা বুঝিতে পারাই কঠিন, বৈষ্ণব কবিতার সৃষ্টি হওয়া ত দূরের কথা! তবে সুখের বিষয় এই যে, আগেকার অপেক্ষা বৈষ্ণব কবিতার প্রতি অনুরাগ ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইতেছে। কিন্তু এ অনুরাগ অনেকটা বিশ্লেষণের অনুরাগ, গবেষণার অনুরাগ। শবব্যবচ্ছেদ করিয়া যেমন জীবনীশক্তি ফিরাইয়া আনা যায় না, এ অনুরাগের দ্বারা তেমনি বৈষ্ণব

কবিতার প্রাণশক্তির সন্ধান মিলে না। কোথায় সেই প্রেম, কোথায় সেই উদারতা, কোথায় সেই দুষ্পূরণীয় সৌন্দর্যলালসা—যাহা একদিন সারা ভারতকে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ শিখরে তুলিয়া ধরিয়াছিল।

বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনায় একথা ভুলিলে চলিবে না যে বাংলার আর্দ্র-বায়ু কোমল বৈষ্ণবরসের জন্ম দেয় নাই। দক্ষিণ ভারতে বহু প্রাচীনকাল হইতে ভক্তিধর্মের প্রবল বন্যা বহিয়াছিল। ভাগবত, নারদ পঞ্চরাত্র, শাণ্ডিল্যসূত্র আদি প্রাচীন শাস্ত্র সমূহের কথা ছাড়িয়া দিলেও, দক্ষিণ ভারতের আলোয়ারগণ তামিল ভাষায় যে বিপুল ভক্তিরসপ্রধান সাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব ভারতীয় হিন্দুদিগের মেরু-মজ্জায় জড়িত হইয়া গিয়াছিল। যে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ ভক্তিবাদের স্বর্ণশৈলিকা, তাহা দক্ষিণ ভারতেই রচিত হইয়াছিল একথা সকলেই জানেন। নয়া আলোয়ার বা ষট্‌কোপ স্বামী অথবা আণ্ডাল দক্ষিণ ভারতে সেই প্রাচীন যুগে যে ভক্তিধর্মের বন্যা বহাইয়াছিলেন, উত্তর ভারতে তাহা আর অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছে কিনা এ সন্দেহ করা যাইতে পারে। প্রাচীন যুগের তামিল রমণী আণ্ডাল মীরাবাইয়ের প্রেম-সেবার পূর্বাভাস দিয়া গিয়াছিলেন। অদ্যাপি তাঁহার স্থান শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে সুনির্দিষ্ট রহিয়াছে। এই রঙ্গনাথের মন্দিরে সম্রাট আওরঙ্গজেবের এক কন্যা বৈষ্ণব ধর্মে অনুপ্রাণিত হইয়া বাস করিয়াছিলেন এমন কথাও লিপিবদ্ধ আছে। বস্তুতঃ ভারতবর্ষে ভক্তিধর্মের যে প্রসার হইয়াছিল, তাহা জগতে আর কোথায়ও হয় নাই।

বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনায় যদি আমরা এই কথাটি বিস্মৃত হই, তাহা হইলে শুধু যে সেই সাহিত্যের প্রতি অবিচার করিব তাহা নহে; এই সাহিত্যের প্রাণস্পন্দনটুকু ধরিতে পারিব না। বাংলা সাহিত্যের ধনি-কুক্ষিমে এই যে বিপুল সাহিত্যের জন্ম হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত তথ্য বুঝিতে হইলে ভারতের নানা প্রাদেশিক সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। তবেই আমাদের আলোচনা সার্থক ও ফলপ্রদ হইবে। যে ভারতে বৈষ্ণবধর্ম আমাদের সাহিত্য-সঙ্গীত-শিল্পের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে মহিমামণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার প্রকৃত মর্যাদা আমরা দিতে পারিব না, যতক্ষণ না আমরা এই সমগ্র ও ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যকে দেখিতে পারি।

এই মনে করুন আমাদের পদাবলী-সাহিত্য কীর্তন হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে গেলে সে দেখা অসম্পূর্ণ হইতে বাধ্য। পদাবলী কীর্তনের জন্য এবং কীর্তন পদাবলীর জন্য। ব্রজবুলি ভাষা কেন সৃষ্ট হইল, তাহা হয়তো সঙ্গীতের দিক দিয়াই কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারা যায়। পদাবলী ব্যতীত এই কৃত্রিম ভাষা আর কোথায়ও ব্যবহৃত হয় নাই, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। কীর্তন ও পদাবলী নিরপেক্ষ নহে। এই পারস্পরিক সম্বন্ধ নিবিষ্টভাবে বিবেচনা না করিলে বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনা নিরর্থক হইবে বলিয়াই আমি মনে করি।

আমার একান্ত আশা আছে যে, আমাদের দেশের গায়ক ও সুধী সমাজের দৃষ্টি যখন কীর্তনের উপর পতিত হইবে, পদাবলীর মাধুর্যে আকৃষ্ট হইবে এবং বাঙালী প্রতিভার বিশিষ্ট অবদান বৈষ্ণব সাহিত্য ও সঙ্গীতের অপূর্ব চারুকলায় মুগ্ধ হইবে তখন সে দৃষ্টি আর অন্যদিকে ফিরিতে চাহিবে না।

কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ—

কংগ্রেসকর্ম্মীরা দেশের শাসনব্যবস্থা দখল করিলে যে নানাপ্রকার অসুবিধা উপস্থিত হইবে, মহাত্মা গান্ধী তাঁহার দিব্য দৃষ্টিদ্বারা তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন। সে জন্য তিনি কংগ্রেসকর্ম্মীদিগকে সাবধান করিয়াও দিয়াছিলেন। সরকারী চাকরী ও সরকারী সাহায্য লাভের প্রত্যাশায় যে কংগ্রেস-সেবকগণের মধ্যে দুর্নীতি প্রবেশ করিবে, তাহা ভাবিয়াই তিনি লিখিয়াছিলেন—"কংগ্রেস রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছে, এইবার তাহাকে সংগ্রামের দ্বারা দেশের আর্থিক, সামাজিক ও নৈতিক মুক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে। রাজনৈতিক মুক্তি-সংগ্রাম অপেক্ষা ভবিষ্যতের এই সংগ্রাম আরও কঠিন। তাহার এক কারণ, ইহার জন্য গঠনকর্ম্মের প্রয়োজন হয় এবং গঠন-কর্ম্মে উত্তেজনা, বাহিরের আড়ম্বর বা আকর্ষণের স্থান নাই—অথচ সর্ব্বতোমুখী গঠনকর্ম্মের দ্বারাই অগণিত জনসাধারণের প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যে শক্তির সম্যক উদ্দীপন ও বিকাশ হওয়া সম্ভব।" এইরূপ গঠনকর্ম্মী আজ দেশে আর প্রায় নাই। গান্ধীজির আদর্শ লইয়া যাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই এখন সেই নিঃস্বার্থ সেবার ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া সরকারী চাকরীর মোহে আকৃষ্ট হইয়াছেন। সরকারী চাকরী পাইবার পর আর তাঁহাদের পূর্ব্বের অবস্থার কথা মনে থাকে না। একজন মন্ত্রীও সেদিন দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—তিনি যে বেতন পান, তাঁহাতে তাঁহার চলে না। কেন চলে না, তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময় তাঁহার নাই। কারণ মন্ত্রিত্ব লাভের পরই তিনি জাঁক-জমকের জীবনধারণ প্রণালী গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব্বে তাঁহার সে সকলের প্রয়োজন ছিল না—এখনই বা তাহার প্রয়োজন কেন হইল? মহাত্মাজীকে বড়লাট পদ প্রদান করা হইলে তিনি কখনই দিল্লীর লাটপ্রাসাদে বাস করিতে যাইতেন না। বিলাতে রাজপ্রাসাদে যাওয়ার সময় আমরা গান্ধীজির সেই মনোভাব লক্ষ্য করিয়াছি। ভারতবর্ষের চিরন্তন ব্যবস্থা উপেক্ষা করিয়া সরকারী কর্ম্মচারীদের জন্য কেন জাঁকজমকপূর্ণ ব্যয়বহুল ব্যবস্থা করা হইতেছে, দেশের জনসাধারণ এখনও তাহা বুঝিতে পারে না।

বাঙ্গালার বিপদ—

কুচবিহার রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন হওয়ার পর ত্রিপুরা রাজ্যও কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ করা হইয়াছে। এই দুইটি রাজ্যেই বাঙ্গালী অধিবাসীর সংখ্যা অধিক। যতই রাজ্যরক্ষার বৃহত্তর স্বার্থের কথা বলা যাউক না কেন, বাঙ্গালা দেশকে ছোট করিয়া দিয়া বাঙ্গালীর প্রভাব ও প্রতিপত্তি নষ্ট করিবার অভিপ্রায় যে ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাঙ্গালার গভর্ণরকে কুচবিহারের এজেণ্ট করা উচিত ছিল, তাহাও করা হয় নাই। ত্রিপুরা ও মণিপুরের এজেণ্ট হইয়াছেন আসামের গভর্ণর; বাঙ্গালা দেশকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেওয়ার চেষ্টার অন্ত নাই। বাঙ্গালার রেলপথ তিনভাগে ভাগ করিয়া তথায় বাঙ্গালীর প্রভাব কমাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কলিকাতায় সকল প্রদেশের লোক বাস করে—সেজন্য হয় ত হঠাৎ একদিন কলিকাতাকেও কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন করা হইবে। তাহার পর আর পশ্চিমবঙ্গ বলিয়া কোন প্রদেশ রাখার প্রয়োজন থাকিবে না। জলপাইগুড়ি দার্জ্জিলিং আসাম প্রদেশে, মেদিনীপুর উড়িষ্যায় ও বাকী জেলাগুলি বিহারে জুড়িয়া দিলেই চলিবে। এ সকল জানিয়াও বাঙ্গালার কংগ্রেস-নেতারা আত্মকলহে ব্যস্ত—বৃহত্তর স্বার্থ দেখার সময় তাঁহাদের নাই। কি করিয়া আপন আপন স্বার্থরক্ষা করিবেন—কংগ্রেসের সকল কর্ম্মীই সেজন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন—একে অপরকে গালি দিয়া সে উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। বাঙ্গালী কি এখনও দেশের স্বার্থরক্ষায় অগ্রসর হইবে না? বাঙ্গালী

তাহার আত্মশক্তির কথা কি ভুলিয়া গিয়াছে? দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্রের বাঙ্গালা কি এই ভাবে তাহার সত্ত্ব বিলুপ্ত করিয়া দিবে?

কণ্ট্রোল প্রথার উচ্ছেদ—

দেশের একদল লোক কণ্ট্রোল প্রথার উচ্ছেদের পক্ষপাতী। কিন্তু নানা কারণে গভর্ণমেণ্ট সে কাজে অগ্রসর হইতে চাহেন না। ডাঃ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য—তিনি এক সময়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-মন্ত্রী ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—'নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উঠাইয়া না লওয়া পর্য্যন্ত দুর্নীতি দূর করা যাইবে না—ইহাই আমার বিশ্বাস। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় দেশের নীতি-বুদ্ধি নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ইহা তুলিয়া দিলে সাময়িক অসুবিধা হইতে পারে, কিন্তু পরিণাম কল্যাণকর হইবে। যে কণ্ট্রোল প্রথা পলে পলে জাতিকে শক্তিহীন করিয়া ফেলিতেছে, তাহা তুলিয়া দিতেই হইবে।' এ বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডক্টর শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁহার দৃঢ়মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"ভারত সরকারের মতে ভারতবর্ষে মাত্র শতকরা দশ ভাগ ধাণ্ডের অনটন আছে। তাহা যদি সত্য হয়, তবে নিয়ন্ত্রণ প্রথা তুলিয়া দিলে ব্যবসায়ীরা স্বাভাবিকভাবে তাহা অন্য দেশ হইতে তাহা আনিয়া ঘাটতি পূরণ করিবে। ব্যবসা বাণিজ্যের পথ সহজ ও স্বাভাবিক হইলে প্রতিযোগিতায় পড়িয়া খাদ্যশস্যের মূল্যও কমিয়া যাইবে। সরকারকে সিভিল সাপ্লাই বিভাগ পোষণ করিতে যে অজস্র অর্থব্যয় করিতে হইতেছে, তাহা বাঁচিলে অনেক সমস্যার সমাধান হইবে। যুদ্ধের পূর্ব্বেও এদেশে খাদ্য শস্যের ঘাটতি ছিল, কিন্তু তাহার জন্য নিয়ন্ত্রণ প্রথার প্রয়োজন হয় নাই।" এমন কি বর্ত্তমান মন্ত্রী শ্রীনিবুজবিহারী মাইতিও একদিন বলিয়াছিলেন —"আমরা সিভিল সাপ্লাই রূপ খেতহস্তীকে এত অর্থ দিয়া পুষিতে পারিব না।" এখন তিনি মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন কিনা জানি না। নিয়ন্ত্রণ প্রথা তুলিয়া দিবার জন্য মহাত্মা গান্ধীও বার বার সরকারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পরলোকগমনের পর প্রায় ২ বৎসর অতীত হইলেও কেহ সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই। মুখে শুধু মন্ত্রীরা গান্ধীবাদ প্রচার করেন—কিন্তু কাজের সময় সকলেই বৃটীশ-নীতি অনুসরণ ও অনুকরণের পক্ষপাতী। এইভাবে দেশকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাওয়া হইতেছে।

ভারতীয় সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল কে-এম-করিয়াপ্পা

প্রাপ্তবয়স্কদিগের ভোটাধিকার—

বর্ত্তমানে স্থির হইয়াছে ভারতবর্ষে সকল নির্ব্বাচনে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিমাত্রই ভোটদানের অধিকার লাভ করিবেন। গণতন্ত্রের দিক দিয়া কথাটা খুব মুখরোচক হইতে পারে বটে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহা কিরূপ ফল প্রদান করিবে, তাহা চিন্তা করিলে শঙ্কিত হইতে হয়। স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের মত ধীসম্পন্ন ব্যক্তিও বলিয়াছেন—যে দেশে শতকরা মাত্র ১৫ জন লোক লেখাপড়া জানে, সে দেশে প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রই ভোটাধিকার পাইলে কখনই তাহা সুফলপ্রসূ হইবে না। আমরা গণতন্ত্রের পক্ষপাতী, কিন্তু যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে দেশ-শাসন অসম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয়, কেহই সে গণতন্ত্র পছন্দ করিবেন না।

অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট—

স্বাধীনতা লাভের পর যেমন স্বায়ত্তশাসনশীল প্রতিষ্ঠান-সমূহে মনোনীত সদস্যদের কার্য্যকাল শেষ করা হইয়াছে, তেমনই অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের পদগুলিও তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আবার নূতন করিয়া সেই পদ সৃষ্টির জন্য একজন চেষ্টা করিতেছেন। অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারীরা প্রায়ই বয়সের জন্য কাজের অযোগ্য হইয়া থাকেন—কাজেই তাঁহাদের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট করিয়া কোন কাজ আদায়ের চেষ্টা করা বৃথাই হইবে। তাহা ছাড়া বৃটীশের আমলে যে শ্রেণীর লোক অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট হইতেন, তাঁহাদের কথাও সর্ব্বজনবিদিত—তাঁহাদের ফিরাইয়া আনা কোন যুক্তি-তর্কের দ্বারা সমর্থন করা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে জন-সাধারণের পক্ষে বিনা বেতনে কাজ করাও সহজসাধ্য নহে—সে জন্য প্রায়ই অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট কথাটির সহিত দুর্নীতির সংযোগ দেখা যাইত। এ অবস্থায় নূতন করিয়া ঐ পদ সৃষ্টি করার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম—দেশের একদল প্রতিপত্তিশালী লোক এই প্রথা পুনঃপ্রবর্ত্তনের বিরুদ্ধে আবেদন করিয়াছেন। আশা করি—কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সুবিবেচনা করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইবেন।

বাঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ—

বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের ব্যবস্থা করিবার জন্য ১৯৪৮ সালের ২৫শে জানুয়ারী অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুর নেতৃত্বে কলিকাতা ৯২ আপার-সার্কুলার রোডে 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' নামক এক নূতন প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে এবং 'জ্ঞান-বিজ্ঞান' নামে একখানি নূতন বাংলা সাময়িক পত্র প্রকাশ করিয়া মধ্য দিয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তা প্রচারের ব্যবস্থা হইতেছে। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালা দেশে শিক্ষিত সম্প্রদায় এখনও ইহার উপকারিতা সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া এ কার্য্যে সাহায্য ও সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হন নাই। কিন্তু বিজ্ঞান পরিষদের কর্ম্মীরা নিশ্চেষ্ট নাই। তাঁহারা সম্প্রতি লোক-বিজ্ঞান গ্রন্থমালা নাম দিয়া আট আনা মূল্যের পুস্তক প্রকাশ করিতেছেন। ঐ গ্রন্থমালায় শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত 'তড়িতের অভ্যুত্থান'

আমেরিকায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

তাহাতেন ঘর প্রণীত 'আমাদের খাদ্য' ও শ্রীযুক্তকুমার বসু প্রণীত 'ধরিত্রী' নামক তিনখানি অতি সহজ ও সরল ভাষায় লিখিত মনোজ্ঞ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকগুলির মধ্য দিয়া বিজ্ঞানের বিষয়গুলি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারের যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে সকলের সহযোগিতা করা কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সম্প্রতি এ বিষয়ে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আবেদন প্রচার করিয়াছেন। বাঙ্গালার শিক্ষিত ও ধনী ব্যক্তিগণ এই গ্রন্থগুলি দেখিলে সত্যেন্দ্রনাথের আবেদনের তাৎপর্য্য অবগত হইবেন। বাঙ্গালা দেশকে সর্ব্বতোভাবে উন্নতির পথে পরিচালিত করিতে হইলে বিজ্ঞানের প্রচার কত অধিক প্রয়োজন, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই।

পরলোকে রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী—

কটন কোম্পানী মিলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত [illegible] পুত্র রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী সম্প্রতি কলিকাতায় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি পুণা ইঞ্জিনিয়ারিং

রমাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী

কলেজ হইতে পাশ করিয়া বোম্বাই ও আমেদাবাদের কাপড়ের কলে বস্ত্রশিল্প শিক্ষা করেন ও ১৯০৫ সালে পিতার সহযোগে কুষ্টিয়ায় মোহিনী মিল প্রতিষ্ঠা করেন। পরে বেলঘরিয়াতেও অপর একটি মিল প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ২৫ বৎসর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও বহু বৎসর কুষ্টিয়া মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান ছিলেন এবং রায় বাহাদুর হইয়াছিলেন। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া তিনি আজীবন দেশসেবা করিয়া গিয়াছেন।

সাহিত্যিক সম্বর্দ্ধনা—

কলিকাতা সাহিত্য সেবক সমিতির উদ্যোগে গত ২৮শে আগষ্ট অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভায় সমিতির উৎসাহী সদস্য ও সুলেখক শ্রীরমেশচন্দ্র সেনকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। শ্রীনরেন্দ্র দেব, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীশৈলেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা করিয়া সেন মহাশয়ের রচনা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। সভায় বহু লোক সমাগম হইয়াছিল।

সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ—

আগামী ১৯৫০ সালে সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ যাহাতে ঋষি শ্রীঅরবিন্দকে প্রদান করা হয় সে জন্য চিলির মাদাম মিষ্ট্রেল, মার্কিনের পার্ল-বাক হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের বহু গভর্ণর, ভাইস-চ্যান্সেলার প্রভৃতি সচেষ্ট হইয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দের দান সারা পৃথিবী স্বীকার করিয়া লইয়াছে—তাঁহার সাধনা তাঁহার সাহিত্যের মধ্য দিয়া মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছে। কাজেই তাহা যে একদিন সমগ্র পৃথিবীতে আদৃত হইবে, ইহা আদৌ বিচিত্র নহে। শ্রীঅরবিন্দকে নোবেল প্রাইজ পাওয়াইবার জন্য তদ্বিরের প্রয়োজন নাই—তাঁহার সাধনা সে পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবে। শ্রীঅরবিন্দের সাধনা বর্ত্তমান সঙ্কটময় পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করিলেই জগদ্বাসী তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করিবে।

ত্রিপুরা রাজ্যে উদ্বাস্তু কলোনী—

আজ ভারতীয় রাষ্ট্রে উদ্বাস্তু-সমস্যা সকলকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কর্তৃপক্ষও এ বিষয়ে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন জানিয়া সকলে আনন্দিত হইবেন। ত্রিপুরা রাজ্যে ৫০৪ কানি জমী রাজ সরকার হইতে গ্রহণ করিয়া আগরতলা হইতে ৪ মাইল দূরে আনন্দনগর মৌজায় একটি কলোনী প্রতিষ্ঠা করা হইতেছে। তথায় ১২০টি পরিবার বাস করিয়া কৃষি দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবেন। মিশনের কর্ম্মী স্বামী

ত্যাগীশ্বরানন্দ বেলুড় মঠ হইতে তথায় যাইয়া ২ মাস কাল এ বিষয়ে কাজ করিতেছেন। স্থানটি পাহাড় ও অমঙ্গলপূর্ণ। রাজ-সরকার ও রাজ-পরিবারের অনেকে স্বামীজিকে তাঁহার কার্য্যে নানাভাবে সাহায্য করিতেছেন। আশাকরা যায় রাজ্যে মিশনের এই পুনর্বসতি কার্য্য সকলের উদাহরণ স্থল হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। কর্ম্মীর দলের আত্মকলহে নিযুক্ত না হইয়া ভারতের নানাস্থানে এইরূপ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করা কর্ত্তব্য।

নারী শারীর-শিক্ষা কংগ্রেস—

গত ১৮ই জুলাই ২৩টি দেশের ২০০ মহিলা-প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে প্রথম আন্তর্জাতিক নারী শারীর-শিক্ষা কংগ্রেসের ছয় দিবসব্যাপী অধিবেশনে পাঁচটি মহাদেশের পক্ষ হইতে পাঁচজন মহিলা কংগ্রেসের প্রতি শুভেচ্ছা ও আনুগত্য জানাইয়া বাণী দান করেন। ভারতবর্ষের শ্রীমতী লীলা রায় এশিয়ার পক্ষ হইতে এই বাণী দান করিতে গিয়া বলেন—কৃষ্ণ বুদ্ধ যিশু মহম্মদ এবং গান্ধীর স্মৃতিধন্যা এশিয়ার কন্যা আমি। 'শান্তির জন্য শক্তি সাধনাই এশিয়ার বাণী। তমসাচ্ছন্ন পৃথিবীর নিদ্রিত জাতিসমূহ এশিয়ার তপোবন-উদ্ভূত 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' বাণীতেই জাগ্রত ও আলোকিত হইয়াছিল। এশিয়ার নারী যুগ যুগান্ত ধরিয়া শত দুঃখ দুর্যোগে সহস্র বন্ধনদশার জীবনের এই পরম বেদ বিস্মৃত হয়নি, আজও না।" যুক্তরাষ্ট্রের ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত কংগ্রেসের সাফল্য কামনা করিয়া যে বাণী প্রেরণ করেন শ্রীমতী লীলা রায় এই কংগ্রেসে তাহা পাঠ করেন :—"আমি কুমারী লীলা রায়ের নিকট হইতে নারীদের শারীর-শিক্ষার প্রথম আন্তর্জাতিক কংগ্রেস সম্পর্কে সবিশেষ অবগত হইয়া বিশেষ আশান্বিত হইয়াছি। ভারত এই কংগ্রেসে যোগদান করাতে সুখী হইয়াছি। আমরা মেয়েদের শরীর গঠনে সাহায্য করিতে চেষ্টা

মিসেস রোমেরো রেই (আর্জেন্টিনা), ডেনমার্কের শিক্ষামন্ত্রী মিঃ হার্টলিগ ক্রিস্টেন্সেন, শ্রীমতী লীলা রায় (ভারতবর্ষ), মিস্ মেরি হেরেসি আইকুম (ফ্রান্স)

করিতেছি—যাহাতে তাহারা ভারত এবং সমগ্র বিশ্বের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারে। আমি এই কংগ্রেসের সর্বসাফল্য কামনা করিতেছি।" শ্রীমতী লীলা রায় বি-এ, বি-টি, বাঙলা সরকারের অধুনা-লুপ্ত 'কলেজ অব ফিজিকাল এডুকেশন ফর উইমেন' হইতে শারীর শিক্ষার ডিপ্লোমা লইয়া কলিকাতার উইমেন্স কলেজ এবং স্কটিশচার্চ কলেজের ব্যায়াম শিক্ষয়িত্রী নিযুক্তা হইয়াছিলেন। বাঙলা সরকারের পাব্লিক সার্ভিস কমিশন দ্বারা নির্বাচিত হইয়া তিনি শারীর

শিক্ষার বৈদেশিক বৃত্তি লাভ করেন এবং প্রথমে কানাডার টরণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং তদনন্তর যুক্তরাষ্ট্রের ইউটা বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীর-শিক্ষা সম্পর্কে করিয়া বর্ত্তমান ১৯৩৮ সালে ইউটা হইতে অনার্সসহ এম-এ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের শারীর শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং সম্প্রতি কোপেনহেগেনে

শ্রীমতী লীলা রায়

আন্তর্জাতিক শারীর শিক্ষা কংগ্রেসে এশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করিয়া য়ুরোপের শারীর শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ পরিদর্শনের পর দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শ্রীমতী লীলা সুপরিচিতা নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়ের কনিষ্ঠা সহোদরা।

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের কার্য্য—

গত ২১শে আগষ্ট হাওড়ায় যে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কর্ম্মী সম্মিলন হইয়া গিয়াছে তাহাতে কংগ্রেস-কর্ম্মীদিগকে গঠন কার্য্যের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হইতে বলা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে তাঁহারা যে ১১ দফা কর্ম্মধারা দাখিল করিয়াছেন, তাহা আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম। (১) অধিক খাদ্য উৎপাদন, খাদ্য সঞ্চয় ও খাদ্যের অপচয় নিবারণ (২) কৃষকদিগকে কম্পোষ্ট সার প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা ও তাহার প্রয়োগে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি কার্য্যে উৎসাহ দান (৩) কৃষকদিগকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সমবেত-ভাবে চাষ দ্বারা জমির উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রণোদিত করা (৪) ছোট ছোট পাল, সেচ প্রভৃতি খনন ও সংস্কার (৫) দেশবাসীর নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও বয়স্ক-শিক্ষার অভিযান (৬) কুটীর শিল্পের প্রসার (৭) স্বয়ং-কাটুনী-বৃদ্ধি পূর্ব্বক বস্ত্র সমস্যার সমাধান চেষ্টা (৮) পল্লীতে পল্লীতে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন পূর্ব্বক পল্লীর স্বাস্থ্যোন্নয়ন (৯) কংগ্রেস-সদস্য সংগ্রহের দ্বারা দিয়া গণ-সংযোগ স্থাপন (১০) শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি ও তাহাদের উপর শোষণ বন্ধ করা এবং তাহাদিগকে দেশের সমস্যাগুলির বিষয়ে অবহিত করা (১১) শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সমাজ-বিরোধী কার্য্য প্রতিরোধে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা। শুনিয়াছি, ঐ সম্মিলনে ৬জন মন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। এ সকল কার্য্যে সরকার হইতে শুধু পরিকল্পনা প্রস্তুত দ্বারা কর্ত্তব্য শেষ না করিয়া মন্ত্রীদের কার্য্যে অগ্রসর হওয়া কি উচিত ছিল না? ঐ সকল বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোন কাজ যদি হইয়া থাকে, তবে তাহাও জনগণকে জানাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে এই সকল কার্য্য আরম্ভ করা হইলে সরকারী কর্ম্মচারীদের সহানুভূতি ও সাহায্যের অভাব এবং কার্য্য-পরিচালনায় দীর্ঘসূত্রতার জন্য কাজগুলি সুষ্ঠু সম্পাদন ও সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয় না। সে বিষয়েও কি মন্ত্রীদের কোন কর্ত্তব্য আছে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন না?

সাহিত্যের সম্মান—

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন এম-এ ৭৬ বৎসর বয়সে তাঁহার জৈন-দর্শন ও জৈন-ধর্ম্ম সম্বন্ধে গবেষণার জন্য বিলাতের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে গবেষণা করিয়া তিনি কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ২৪ পরগণা জেলার হরিনাভি গ্রামে তাঁহার আদিবাস।

কাবুলে ভারতীয় শিল্প-প্রদর্শনী

১ম চিত্র—তৃতীয় অথবা চতুর্থ শতাব্দীর নির্মিত একটি পুরুষ মূর্ত্তির মুখাবয়ব দৃষ্টান

৩য় চিত্র—তৃতীয় শতাব্দীর নির্মিত গান্ধার শৈলীর একটি বুদ্ধের মুখাকৃতি

২য় চিত্র—চতুর্থ শতাব্দীর নির্মিত গান্ধার শৈলীর একটি নারীর মুখাবয়ব

এই ভ্রাম্যমাণ শিল্পী-প্রদর্শনী প্রথমে দিল্লীতে, তারপরে এলাহাবাদে এবং বর্ত্তমানে কাবুলে গিয়া শিল্প প্রদর্শনী খুলিয়াছে। শুনা যাইতেছে, ভারতের প্রত্যেক বড় বড় সহরে এই প্রদর্শনী ক্রমে ক্রমে যাইবে। ভারত সরকার এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা। অতীত ভারতের লুপ্তপ্রায় শিল্প-গৌরবকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া বর্ত্তমানের সহিত পরিচিত করাইয়া দেওয়ার শুভ প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

পরলোকে জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র—

বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব একাউণ্টেণ্ট-জেনারেল জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র গত ৩রা ভাদ্র ৮০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। অবসর গ্রহণের পর কিছুকাল নিজাম রাজ্যে ও কাশিমবাজার ওয়ার্ডস্ ষ্টেটে কাজ করিয়া তিনি জনহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় ১৫ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন।

হায়দরাবাদে কতিপয় মুসলমান অধিবাসীর সহিত দুইজন ভারতীয় সেনানায়কের বন্ধুভাবে আলাপন

কাশ্মীর সমস্যা—

কাশ্মীর সমস্যা চরমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সে জন্য এখন ভারতের প্রধান-মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরুকে কঠোরতা অবলম্বন করিতে হইতেছে! কাশ্মীর ভারতবর্ষে যোগদান করে—পাকিস্তানে যোগদান করিতে অস্বীকার করে। সকল দিক দিয়া ভারতের সহিত সংযুক্ত থাকাই সে পছন্দ করিয়াছে। কিন্তু ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট কাশ্মীরের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী, কারণ কাশ্মীর রুসিয়া, চীন, ভারতবর্ষ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান—৫টি দেশের সীমান্তে অবস্থিত। কাশ্মীরে থাকার শক্তিশালী বিমানঘাঁটি থাকিবে—৫টি দেশকেই তাহার ভয়ে ভীত হইয়া থাকিতে হইবে। ইঙ্গ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরা মনে করে, কাশ্মীর যদি তাহাদের হাতে না থাকে, তবে অন্ততঃ পাকিস্তানের মত দুর্ব্বল দেশের অধীন থাকিলে সাম্রাজ্যবাদীদের কর্তৃত্ব তাহার উপর থাকিয়া যাইবে। পশ্চিম-এসিয়ার ইরাক, ইরাণ, ট্রান্সজোর্ডন প্রভৃতি রাজ্যে ঐ ভাবে ইঙ্গ-মার্কিন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ রাষ্ট্রসংঘকে জানাইয়াছেন—পাকিস্তান রসদ ও অস্ত্র দিয়া হানাদারদিগকে কাশ্মীর আক্রমণে সাহায্য করিয়াছে। পাকিস্তান সে কথা অস্বীকার করিয়াছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহা প্রমাণ হইয়াছে। কাজেই পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ এখন আর কোন কুলকিনারা পাইতেছে না। এ অবস্থায় পাকিস্তানকে সাহায্য করিবার জন্য আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ট্রুমান ও বৃটীশ প্রধান মন্ত্রী এটলী অগ্রসর হইয়াছেন। কাজেই পণ্ডিত জহরলালকে এখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। বৃটীশ বা আমেরিকা স্পষ্টভাবে না পারিলেও পাকে-প্রকারে পাকিস্তানকে সমর্থনের পক্ষপাতী—তাহাতে তাহাদের স্বরূপ বুঝা গিয়াছে। পণ্ডিতজী কি করিয়া ইঙ্গ-মার্কিন দলের সহিত মিতালী রক্ষা করিবেন—তাহাই সমস্যা। কাশ্মীরকে যে কোন প্রকারে হউক, ভারতের অন্তর্ভুক্ত রাখিতেই হইবে। কাশ্মীর ভাগ হইতে দিলে তাহা যেমন কাশ্মীরের অধিবাসীদের ধ্বংসের কারণ হইবে, ভারতের পক্ষেও তাহা তেমনই বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিবে। পণ্ডিতজী ভারত সাম্রাজ্যকে বৃটীশ কমনওয়েলথের মধ্যে রাখার একদল ভারতীয় যে কার্য্য সমর্থন করেন নাই। এখন যদি তিনি রাজনীতিকদের পাল্লায় পড়িয়া কাশ্মীর সম্বন্ধে দুর্ব্বলতা প্রকাশ করেন, তবে ভারতে শাসনযন্ত্র পরিচালনা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা—

পশ্চিম বাঙ্গালার মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ১৭ দফা অভিযোগ জানাইয়া প্রধান-মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর নিকট এক বিবৃতি প্রদান করা হইয়াছিল। পণ্ডিতজী সে সকল

অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া নিজ অভিমতসহ উক্ত বিবৃতি ও তাঁহার কৈফিয়ৎ সংবাদপত্রে প্রকাশ করায় বাঙ্গালার অধিবাসীরা বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে নানারূপ সন্দেহের কথা প্রকাশ করিতেছেন। পণ্ডিত নেহরু তাঁহার কৈফিয়তে বাঙ্গালার মন্ত্রীদের বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রধান ৫টি অভিযোগ সম্বন্ধে কোন সন্তোষজনক কথা বলিতে পারেন নাই! যে সময়ে বাঙ্গালার স্থায়ী প্রধান-মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বিলাতে, সে সময়ে ঐ সকল অভিযোগ ও তাহার উত্তর ভারতের সকল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় ডাঃ রায়ের সম্মানও ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ডাঃ রায় গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ অভিযোগ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের ২ জন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইবার পর প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিতজী তাহাদের মন্ত্রীসভা হইতে সরাইয়া দিয়া নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে বর্ত্তমান পরিস্থিতির মধ্যে কর্ত্তব্য সম্পাদন করা ডাক্তার রায়ের পক্ষেও আদৌ কঠিন হইবে না। বাঙ্গালা দেশের কংগ্রেস নেতৃত্ব লইয়া দলাদলি বাঙ্গালাকে দারা ভারতের নিকট হীন প্রতিপন্ন করিয়াছে। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে সকলে তাঁহার সাহস, বুদ্ধি ও শক্তির জন্য শ্রদ্ধা করে—তিনি যদি মন্ত্রিসভার গলদ দূর করেন, তবে তাঁহার প্রতি লোকের বিশ্বাস বৃদ্ধি পাইবে ও কংগ্রেসের নেতৃত্বও সহজেই তাঁহার করায়ত্ত হইবে। মন্ত্রীদের মধ্যে একদল স্বার্থান্বেষী দেশবাসীর স্বার্থ বলি দিয়া নিজেদের স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। ডাক্তার রায় যদি তাঁহাদের উপযুক্ত ব্যবস্থা না করেন, তবে দেশবাসী বর্ত্তমান মন্ত্রিসভাকে বিশ্বাস করিতে পারিবে না ও দেশের অবস্থা দিন দিন খারাপ হইয়া যাইবে। দেশের লোকের অন্নবস্ত্র সমস্যার সমাধান হয় নাই—এ কথা কঠোর সত্য। এ অবস্থায় যদি দুর্নীতি নিবারণের ব্যবস্থা না হয়, তবে লোক কি করিয়া গভর্ণমেণ্টের কার্য্য সমর্থন করিবে? বাঙ্গালা দেশ ধ্বংসোন্মুখ—ডাক্তার রায়ের মত লোকই কেবল এ অবস্থা হইতে বাঙ্গালা দেশকে রক্ষা করিতে সমর্থ। সে জন্য দেশবাসী তাঁহার মুখ চাহিয়া আছে।

হায়দ্রাবাদে মেজর জেনারেল জে-এন-চৌধুরী সাংবাদিক বাহিনী পরিচালনায় রত

বস্ত্র, চিনি ও সরিষার তৈল—

গত এক বৎসর ধরিয়া সরকারী সরবরাহ-বিভাগ বস্ত্র-সমস্যা সম্বন্ধে বহু বিবৃতি ও ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন বটে, কিন্তু জনগণের বস্ত্র-সমস্যার কোন সমাধান হয় নাই। মধ্যে বাজারে আদৌ বস্ত্র পাওয়া যাইত না—এখন বাজারে কাপড় পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার কোনও নির্দ্ধারিত মূল্য নাই। যে যেরূপ ভাবে ইচ্ছা, ঐ বস্ত্র বিক্রয় করিয়া থাকে। সেজন্য একই শ্রেণীর কাপড় বিভিন্ন ব্যবসায়ীর নিকট হইতে বিভিন্ন মূল্যে লোক ক্রয় করিতে বাধ্য হয়।

কেন এরূপ হয় তাহা বুঝা যায় না। অথচ ভারতের কাপড়ের কলসমূহে এত অধিক কাপড় জমিয়া গিয়াছে, যে অধিকাংশ কল বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। সে সকল কাপড় উপযুক্ত মূল্যে বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকিলে লোক তাহা ক্রয় করিতে পারিত। মানুষের ক্রয়-শক্তি ক্রমে কমিয়া যাইতেছে—কারণ খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য সাধারণ লোক অন্ন আয় দ্বারা খাদ্য সংগ্রহের পর বস্ত্র ক্রয়ের অর্থ সঙ্কুলান করিতে পারে না। এ অবস্থা হইতে মুক্তির কোন আশা দেখা যায় না। চিনির মূল্যও হঠাৎ বাড়িয়া গিয়াছে। রেশনের দোকানে ১০ আনা সের দরে চিনি পাওয়া যাইত। খোলা বাজারে চিনির দাম ১২।১৩ আনা ছিল—গত ১ মাস হইতে সহসা তাহা বাড়িয়া ১ টাকা বা ততোধিক হইয়াছে। ইহার প্রতীকারের কোন ব্যবস্থা দেখা যায় না। সরকারী ইস্তাহার প্রচার করিয়া ১৫ আনা সের দরে চিনি বিক্রয় করিতে বলা হইয়াছে। এই ভাবে যদি সব জিনিষের দাম বাড়িয়া যায়, তবে লোক ক্রমে না খাইয়া মরিবে ও সরকারী ব্যবস্থার উপর জনগণ আস্থা হারাইয়া ক্রমে বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে। শাসক-কর্তৃপক্ষ যে জনগণের স্বার্থরক্ষায় সম্পূর্ণ উদাসীন, তাহা নানা দিক দিয়া প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালা দেশে সরিষার তৈল একটি নিত্য-ব্যবহার্য্য প্রধান খাদ্য। সরিষার তৈলের দাম দেড় টাকা হইতে ২ টাকা হইয়াছিল। কিছুদিন হইতে তাহা বাড়িয়া ৩ টাকায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে। দুষ্ট লোক বলিতেছে, দালদার কারখানার মালিকগণ বাজারে অধিক পরিমাণে দালদা চালাইবার জন্য সরিষার তৈলের দর এইভাবে বাড়াইয়া দিয়াছেন। দালদা ২৷৵০ সের—সরিষার তৈলের দাম তাহা অপেক্ষা অধিক হইলেই লোক তৈলের পরিবর্ত্তে অধিক দালদা ব্যবহার করিবে ও দালদার কাটতি বাড়িবে। দালদা যে উপকারী দ্রব্য নহে, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। অপকার করে কি না, সে বিষয়েও লোক নিঃসন্দেহ নহে। এ অবস্থায় যাঁহারা অধিক দালদা চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা নিজেদের উপকার করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা দেশবাসী আদৌ উপকৃত হইবেন না। অসামরিক সরবরাহ বিভাগ এই সকল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া জনগণের দুঃখ দুর্দ্দশা নিবারণের কোন চেষ্টা করেন বলিয়া মনে হয় না। খাদ্য সমস্যা ক্রমে মানুষকে পাগল করিয়া তুলিতেছে। অধিক খাদ্য উৎপাদন আন্দোলনের প্রতিও সরকারী কর্তৃপক্ষের তেমন মনোযোগ নাই। পশ্চিম বাঙ্গালায় নেতাদের মধ্যে দলাদলি দেশের অবস্থাকে আরও বিপন্ন করিতেছে। তাহা দেখিয়াও নেতারা আত্ম-কলহে ব্যস্ত। ইহার পরিণাম কি—তাহা ভাবিয়া দেখিবার লোক দেশে নাই।

ছাত্রীর কৃতিত্ব—

কুমারী চিত্রা ঘোষ এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় উদ্ভিদ বিজ্ঞানে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ঈশান বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে বাঙ্গালী মহিলার এরূপ সাফল্য এই প্রথম। চিত্রা ১৯৪৭

কুমারী চিত্রা ঘোষ

সালে ইণ্টার পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি পশ্চিম বঙ্গ শিক্ষা বিভাগের শ্রীযুক্ত এস-কে-ঘোষ মহাশয়ের প্রথমা কন্যা।

সরকারী আয়ুর্ব্বেদিক কলেজ প্রতিষ্ঠা—

পশ্চিম বাঙ্গালায় একটি সরকারী আয়ুর্ব্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনার জন্য গত ১০ই আগষ্ট

শিক্ষা সচিব রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বাংলার বহু কবিরাজের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। কবিরাজ হেরম্বনাথ শাস্ত্রী, কবিরাজ পরিমল সেনগুপ্ত প্রভৃতি সরকারী আয়ুর্ব্বেদ কলেজ কি ভাবে চলিতে পারে, তাহা মন্ত্রী মহাশয়কে বুঝাইয়া দিয়াছেন। স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক ডাঃ এ-সি চট্টোপাধ্যায়ও সে আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের অন্যান্য প্রদেশে আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি বিধানের জন্য চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে অবিলম্বে তাহা করা হইলে দেশবাসী আয়ুর্ব্বেদের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইতে পারে।

স্বর্গত অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
(ইঁহার পরলোকগমন সংবাদ গত মাসে প্রকাশিত হইয়াছে।)

সিঁথিতে দ্বিজেন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনে কবি শ্রীকঙ্কণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও যুগান্তর-সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ তিরোভাব দিবস—

গত ২২শে শ্রাবণ রবিবার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিরোভাব দিবস উপলক্ষে দেশের সর্ব্বত্র নানাবিধ অনুষ্ঠান

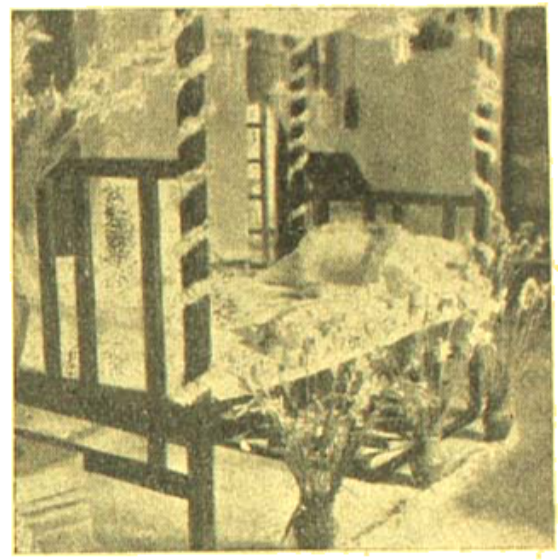

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি—রবীন্দ্রনাথ যে ঘরে তাঁর শেষ দিন অতিবাহিত করেন সেই ঘরের দৃশ্য ফটো—পান্না সেন

করিয়া রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করা হইয়াছে। যদিও দেশের নেতৃবৃন্দ এক ইস্তাহার জারি করিয়া সকলকে এই

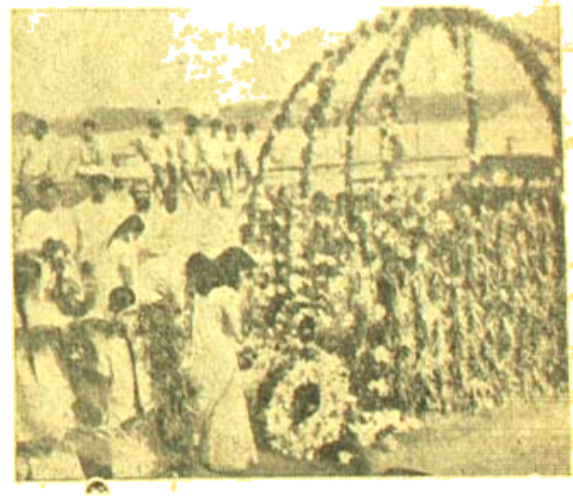

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুবার্ষিকী দিবসে নিমতলা ঘাটে কবির চিতার ভস্মদের আলাদান ফটো—পান্না সেন

তিরোভাব উৎসব করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তথাপি দেখা গেল, সকলেই এই উপলক্ষে কোন না কোন উৎসবে যোগদান করিয়া কবীন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

করিয়াছেন। রেডিও মারফতও সেদিন রবীন্দ্রনাথের কথা প্রচারিত হইয়াছিল এবং নিমতলা শ্মশান ঘাট (যেখানে রবীন্দ্রনাথের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত করা হয়), জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ী (রবীন্দ্রনাথ যে ঘরে বাস করিতেন) প্রভৃতি স্থানে লোক সারাদিন তীর্থযাত্রীর ন্যায় গমন করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের জন্ম দিবসে স্কুল কলেজ প্রভৃতির গ্রীষ্মকালীন অবকাশ থাকায় ছাত্রগণের পক্ষে সে সময়ে সমবেতভাবে রবীন্দ্র স্মরণোৎসব করা সম্ভব হয় না। তাই তাহারা ২২শে শ্রাবণের সুযোগ ছাড়ে না। লোক রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করিয়া তাঁহার রচনা আলোচনা করিবে, তাহাতে বাধা দেওয়া উচিতও নহে—দেখা গেল, শেষ পর্যন্ত সে বাধা নিষেধ কেহ মানিলও না। আমরা সকলের সহিত এই উপলক্ষে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

সিঁথিতে দ্বিতীয় সাহিত্য সম্মেলনে
কলিকাতার বিশিষ্ট
সাহিত্যিকবৃন্দ
ফটো—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী

কস্তূরী

শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য্য এম-এসসি

বন্যজন্তু গুলির মধ্যে কস্তূরী সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ইহার ব্যবহার গন্ধ অতি প্রাচীনকাল হইতে মানুষকে মুগ্ধ করিয়া আসিতেছে। কস্তূরী, Moschus moschiferous, বা কস্তূরী-মৃগ নামক এক জাতীয় হরিণের শুষ্ক রস, নাভির নিম্ন দেশে ত্বক্ নিম্নের ভিতর উৎপন্ন হয়। ইহার অন্য নাম মৃগনাভি বা মৃগমদ। সদ্য অবস্থায় ঐ রসটি অনেকটা মধুর মত আঠা থাকে এবং ইহার রং রক্তাভ বাদামী থাকে। হরিণের মৃত্যুর পর ইহা ক্রমশ কঠিন হইয়া যায় এবং পরে অনেকটা মোটাই ফুলের বীজের ন্যায় ক্ষুদ্র ও কৃষ্ণাভ দেখিতে হয়। কস্তূরী উৎপন্ন হইবার পর, হরিণ তাহার সেই উদ্ভট রৌদ্রালোকে এলাইয়া দেয়। এই সদ্য তরল কস্তূরী থলে হইতে নিঃসৃত হয় এবং চারিদিক সুগন্ধে ভরিয়া উঠে। ঐ গন্ধ অনুসরণ করিয়া শিকারীরা কস্তূরী-মৃগের সন্ধানে বাহির হয়। কস্তূরী শুধু হরিণের দেহে উৎপন্ন হয়, হরিণীর দেহে নয়। কস্তূরীর সঙ্গে হরিণের বয়সের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে; তিন বৎসর অপেক্ষা ছোট হরিণে ইহা পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ যে সকল কস্তূরী মৃগ ধরা পড়ে, তাহাদের বয়স তিন হইতে সাত বৎসর। কস্তূরীর গন্ধে হরিণ হরিণীকে নিকটে আকর্ষণ করে।

কস্তূরী মৃগ ভারতবর্ষ, চীন দেশ, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া ও অল্পপরিমাণে সাইবেরিয়াতে পাওয়া যায়। ইহারা ক্ষুদ্রকায়, দ্রুতগামী এবং চঞ্চল-প্রকৃতির হয়। এই জন্য কস্তূরী মৃগ শিকার করা খুব কঠিন কাজ। সাধারণতঃ ইহাদের ফাঁদ পাতিয়া ধরা হয়। ইহারা দুইটি করিয়া এক সঙ্গে থাকে, কদাচিৎ ইহাদের দলবদ্ধ অবস্থায় দেখা যায়।

একটি পূর্ণ বয়স্ক মৃগ হইতে মাত্র এক বা দুই আউন্স কস্তূরী পাওয়া যায়। কস্তূরীর উৎপাদন এইরূপ অল্প হওয়ায় এবং ইহার প্রয়োজন এত অধিক থাকায় পৃথিবী হইতে কস্তূরী মৃগ ক্রমশ কমিয়া যাইতেছে। তিব্বত ও তার পার্শ্বস্থ স্থান হইতে যে পরিমাণ কস্তূরী

পাওয়া যাইত তাহার জন্য প্রতিবৎসর প্রায় এক লক্ষ মৃগ হত্যা করা হইত। কস্তুরী মৃগের বংশ বৃদ্ধি কম হওয়ায় এবং মানুষের প্রয়োজন ও বিলাসিতার ইন্ধন যোগাইবার জন্য কস্তুরী মৃগের বংশ প্রায় লোপ পাইয়া আসিতেছে। ইহাদের বংশ যাহাতে একেবারে নিঃশেষ না হইয়া যায় তাহার জন্য দক্ষিণ-পূর্ব্ব তিব্বতে আমাদের আসাম আছে যে শিকারীদের যদি কস্তুরী মৃগ হত্যা করিবার সময় ধরা হয় তবে তাহাদের হাত কাটিয়া মন্দির দ্বারে পেরেক দ্বারা বিদ্ধ করা হইবে।

কস্তুরীর গন্ধ মাস্কোন নামক একটি রাসায়নিক পদার্থের জন্য। দুঃখের বিষয় শুধু ইহাকে গন্ধ দ্রব্যে ব্যবহার করা হয় না; কস্তুরীর একটি শক্তি আছে যাহার দ্বারা ইহা অন্য গন্ধ দ্রব্যকে ধরিয়া রাখে; ফলে ঐ গন্ধদ্রব্য খুব ধীরে ধীরে উপিয়া যাইতে থাকে। বৈজ্ঞানিক ভাষায় ঐ ঘটনাটিকে fixation বলা হয়। রাসায়নিক পদের উন্নতির ফলে আজকাল বৈজ্ঞানিক উপায়ে নকল কস্তুরী তৈরী হইতেছে। নকল কস্তুরীর মধ্যে musk xylene বা xylol, musk Ketone ও musk ambrette প্রধান। হরিণ মারিবার পর কস্তুরী সদ্য থলে গন্ধর দেহ হইতে বাহির করিয়া বিক্রয় করা হয়। অনেক সময় নকল উপায়ে কস্তুরীর থলি তৈরী করিয়া খলিতে পুরিয়া বিক্রয় করা হয়। কস্তুরী বহুদিন হইতে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহাকে উদ্দীপক ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। অনেক চীন-দেশীয় চিকিৎসকের মতে কস্তুরী সর্প দংশন হইতে রক্ষা করে।

মৃগ কস্তুরী ব্যতিত কয়েকটি দ্রব্য আছে যাহাদের গন্ধ কস্তুরীর ন্যায়। আমেরিকায় এক জাতীয় ইঁদুর আছে যাহাদের দেহের বিশেষ গ্রন্থি হইতে কস্তুরীর ন্যায় গন্ধ যুক্ত এক প্রকার পদার্থ পাওয়া যায়। ইহাদের বলা হয় কস্তুরী ইঁদুর (musk rat)। Hibiscus Abelmoschus নামক এক জাতীয় ছোট গাছ আছে যাহার বীজ হইতে কস্তুরীর ন্যায় গন্ধ যুক্ত এক প্রকার তৈল উৎপন্ন হয়। ইহা উত্তর ভারতে আগাছা রূপে জন্মায়। ইহার বাংলা নাম যবকস্তুরী বা মুরুক-দানা। এছাড়া কস্তুরী-দল নামক একজাতীয় উদ্ভিদের শিকড় ও কস্তুরী-কাঠ নামক এক জাতীয় কাঠে কস্তুরীর গন্ধ পাওয়া যায়।

কুলীন

শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী

অদ্বৈত প্রভুর পিতৃশ্রাদ্ধ, শান্তিপুরে মহা ধুমধাম
ভক্তেরা হয়েছে ব্যস্ত ; আনন্দের অন্ত নাই, সেথা অবিরাম
চলিতেছে আয়োজন। নিমন্ত্রণ হয় গ্রামে দূর গ্রামান্তরে
আত্মপর ভেদ নাই, অদ্বৈত-আহ্বান আজি—চাই সকলেরে।
জনপিতা সীতানাথ করিতে চাহেন আজি পিতার তর্পণ
শান্তিপুর উদ্বেলিত, উল্লসিত সকলের দেহ প্রাণ মন।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আসিলেন দলে দলে পাণ্ডিত্যমুখর
আসিলেন কুলীনেরা স্বকুলমর্য্যাদালোভী গর্ব্বিত অন্তর।
বিস্তৃত প্রাঙ্গণ মাঝে সুসজ্জিত চন্দ্রাতপ তলে মনোহর
বসিয়াছে পণ্ডিতের সভা, উঠে বেদ বেদান্তের ঝড়!
সগুণ বা গুণাতীত, স্রষ্টা তিনি নিরাকার কিংবা দেহধারী?
পণ্ডিতসভায় চিরকাল ভগবান নিয়ে হয় মারামারি!
অক্ষুরন্ত মেধা যাঁর, স্থাবরে জঙ্গমে যাঁর নিত্য নব দান
সীমাক্ষুব্ধ পাণ্ডিত্যের দম্ভ সেথা বিচারের বস্তু ভগবান্!
শ্রাদ্ধশেষে যথাবিধি হাতে পূর্ণপাত্র করি প্রভুর আননে,
আসিলেন সীতানাথ ধীরে ধীরে পণ্ডিতের কুলীনের স্থানে;
শ্রাদ্ধশেষে পূর্ণপাত্র কুলীনে অর্পণ করা শাস্ত্রের বিধান,
বাহিরে আসেন তাই শ্রীঅদ্বৈত করিবারে কুলীন সন্ধান।
স্বয়ম্বর সভা মাঝে প্রত্যেক ক্ষত্রিয় যথা দেখি বরমালা
লুব্ধ হয়, তেমতি কুলীন দলে পাগল করিল পূর্ণথালা!
সভাক্ষেত্রে প্রতিজন আপনার উচ্চবংশ-মর্য্যাদায় ভাবি
সীতানাথ পানে চাহি, আশাতীব্র নেত্র লয়ে পাত্র করে দাবি।
চলিলেন সীতানাথ, কি অপূর্ব্ব সেই তন্ত্র দিব্যজ্যোতিমাখা
জাতিকুলগর্ব্বী মাঝে নাহি মিলে একজনো কুলীনের দেখা।
কি দোষে সে অবয়ব তুচ্ছ করি সভান্বিত অগণিত দ্বিজে,
দাঁড়ালেন দ্বারে আসি প্রকৃত শাস্ত্রার্থজ্ঞাতা, কুলীনের খোঁজে।
কুলীন অন্বেষি নেত্র অদ্বৈতের বুভুক্ষিতে হইল উজ্জ্বল,
'পেয়েছি কুলীন শ্রেষ্ঠে আজি মোর পিতৃশ্রাদ্ধ হইল সফল'—
বলিয়া, আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল প্রভু অনন্ত উল্লাস,
কুলীন দেখিতে আসি লোকে ভাবে বিস্ময়ে—এ যে হরিদাস!
শূদ্র তবু পদে আছে, অস্পৃশ্য সে হরিদাস জাতিতে যবন
কি আশ্চর্য্য সেই আজি অদ্বৈতের সম্মানিত কুলীন-ভূষণ।
মৃত্তিকা আসনে বসি নিজ মনে হরিদাস করে কৃষ্ণনাম,
কোন দিকে লক্ষ্য নাই ঝর ঝর নেত্রে ধারা বহে অবিরাম।
প্রীতি-স্নিগ্ধ কণ্ঠে প্রভু ডাকিলেন—'চোখ খোল, বৎস হরিদাস
আনিয়াছি পূর্ণপাত্র, হে কুলীন শ্রেষ্ঠ ধরো, পূর্ণ করো আশ।'
বিস্ময় ব্যাকুল ভক্ত কাঁপে থর থর—'প্রভু রক্ষা করো মোরে
এ সম্মানী নহি আমি— তার চেয়ে মৃত্যু দাও পতিত পামরে!'
স্থির দীপ্ত কণ্ঠ স্বরে স্তম্ভিত করিয়া সবে শ্রীবৈত ধীরে—
কহিলেন—'ওহে ভক্ত, অভুক্ত যে পিতা মোর, কৃপা করো মোরে,
অন্যায় করিনি কিছু, শাস্ত্রের নির্দ্দেশ যাহা তাই সত্য জানি
দেহ মন সমর্পিত ভগবান পদে যার তারে শ্রেষ্ঠ মানি?
অহঙ্কার পূতিগন্ধে মহত্ত্ব কি থাকে কভু, কৌলিন্য কি থাকে?
কুলীনের শ্রেষ্ঠ তুমি, পবিত্রতা নিকেতন, নিত্য যার মুখে—
নৃত্য করে কৃষ্ণ নাম, সেই তুমি সর্ব্বতীর্থ অধিক পাবন,
পুঁথিগত বিদ্যা আর বংশগত কুল নহে কৌলিন্য-কারণ!'
শ্রীঅদ্বৈত অনুরোধে লজ্জায় মরিয়া ভক্ত পাত্র নিল করে,
বিপ্রবও জন্ম নিল মানুষের দম্ভ-রচা কৌলিন্যের ঘরে।

দাবদাহ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

যমুনা আহীর বললে, হামরা দই বেচবার করি। সে সব কি বিনা পয়সায় বিলবার জন্য ?

—কে বলেছে বিনা পয়সায় বেচবার জন্য ?

—কে বলবে আবার ?—যমুনার মুখের চেহারাটা বিকট হয়ে উঠল : জমিদার বলে। পাইক-পেয়াদারা বলে। এক্কেবারে করে দিচ্ছেন ঠাকুরবাবু।

চারদিকে রোদে-ধোয়া বরিন্দের মাঠ। অপরিমিত আলো, অপরিমাণ প্রাণ। হু হু করে হাওয়া বইছে। যেমন করে চৈতালী দুপুরে ঘুণির ঘা দিয়ে দিয়ে উপড়ে নেয়—ছিঁড়ে নেয় দুই ঘাস আর শুকনো পাতা, তেমনি ভাবে এই হাওয়া যেন মনের সব জঞ্জালকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। দূরে-কাছে ঘাসবনের মধ্যে পাহাড়ের নীল রেখার মতো কি ফুলে জেগে আছে প্রান্তিকার সব মহিষ—বিরাট বিরাট তাদের শিংগুলো রোদে ঝকমক করছে। ওই শিংগুলো দেখে ভয় করে। আরণ্য-প্রকৃতির ক্ষুব্ধ-নিশ্বাসের মতো যেন উদ্যত আর উদ্যত হয়ে আছে।

এর কিছু মিনিটের মধ্যেও যেন কী একটা সম্ভাবিত হত। কেমন একটা ধারালো উত্তাপ ইস্পাতের ফলার মতো ঝলকায় রক্তের ওপরে। আয়নায় নিজেকে দেখতে পাওয়া যায়না, শুধু মনে হয় সেই রোদের ছোঁয়ায় অতসী কাচের প্রতিফলকের মতো সজাগ হয়ে উঠেছে তার চোখ দুটো। মনে হয়, হাতে একটা অস্ত্র থাকলে এই প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে সেও নরহত্যা করতে পারে !

রঞ্জন বললে, জমিদার কি জুলুম করে তোমাদের ওপর ?

—জমিদার কের কবে হামাদের মাথায় তুলে রাখে ?—বিকট মুখে একটা তিক্ত হাসি হাসল যমুনা আহীর : খাজনা যা লাগে—সেটা তো দিচ্ছিলাম। কিন্তু আজ পাইক আসবে—পাঁচ হাঁড়ি দই নিয়ে যাবে ; কাল পিয়াদা আসবে তো ও ফের পাঁচ সের ঘী নিয়ে যাবে। হামরা তবে কী বিচ্‌বার জন্যে এখানে বাথান করে বসে আছি ?

—তোমরা গিয়ে নালিশ করোনা কেন ?—প্রশ্নটা নিজের কানেই বাঙ্গের মতো শোনালো। তবু জিজ্ঞাসা করলে রঞ্জন। কেমন সংস্কার হয়ে গেছে। দেবতায় বিশ্বাস না থাকলেও ঝুরি-নামা বটগাছের তলায় সিঁদুর মাখানো থান দেখলে যেমন আপনা থেকেই মাথায় হাত উঠে আসে, তেমনি। ফল হবেনা জেনেও একবার প্রার্থনা-নিবেদন।

—শুধু একবার নালিশ ? হাজার বার করেছি।—যমুনা বললে, কী হইল ? কিছুই না। উল্টে হামাদের হাকিয়ে দিলে। বললে, ব্যাটারা ঝুটমুট বলছে।—যমুনা আহীরের মুখের ভেতর দাঁতগুলো ক্রোধে কিড়মিড়িয়ে উঠল : জমিদারবাবুদের অমন চাঁদীর মতন গতর হয় কেমন করে ? এমন মোটা হয় কেন ? মুফত্ হামাদের দহি-ঘী না খেলে অমন হয় ঠাকুরবাবু ?

কেবল দই-ঘিই নয়—ওই মেদস্ফীত স্বাস্থ্যের পেছনে যে অনেক রক্তশোষণের ইতিহাস—একথা রঞ্জনের মনে এল। ভৈরব-নারায়ণ আফিং খান আর ঝিমোন। কিন্তু সেই ঝিমুনির ফাঁকে ফাঁকেই তাঁর চোখের দৃষ্টি লোলুপ হয়ে ওঠে—কার ঘাড়ে দো দিয়ে পড়বেন তারই সুযোগ খুঁজে বেড়ান। বরিন্দের মাঠে তালগাছের মাথার ওপরে বসে থাকা কিমন্ত চিলের মতো।

দুধের গ্লাস নিয়ে ঝুমরি ভেতরে চলে গিয়েছিল, এতক্ষণ পরে আবার বেরিয়ে এল। হাতে বলদে ভাকড়া-জড়ানো ধূমায়িত একটা ছোট কল্‌কে। ধোঁয়াটার উগ্র দুর্গন্ধে চারদিকের বাতাস মুহূর্তে আবিল হয়ে উঠল। গাঁজা।

যমুনা আহীর অপ্রস্তুত হয়ে গেল। ভর্ৎসনা-ভরা চোখে তাকালো ঝুমরির দিকে।

—আঃ, এখন কেন নিয়ে এলি! যা—এখন রেখে দে—

রঞ্জন বুঝতে পারল। তাকে দেখে চক্ষুলজ্জা হচ্ছে যমুনার। ঠাকুরবাবু সাত্ত্বিক লোক—তাঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা করতেই অভ্যস্ত। তাঁর সামনে গাঁজার কলকেতে টান দিতে সংস্কারে বাধছে।

রঞ্জন অভয় দিয়ে বললে, খাওনা—লজ্জা কি!

অত্যন্ত অপরাধীর মতো হে হে করে সংকুচিত হাসি হাসল যমুনা। বললে, হামরা ছোটলোক ঠাকুরবাবু, একটু নেশা-ভাং না করলে হামাদের চলেনা—

রঞ্জন হাসল: তোমাদের লজ্জা পাওয়ার কারণ নেই, অনেক বড়লোক আর বাবুলোক তোমাদের চেয়ে নেশায় ঢের বেশি ওস্তাদ।—তার মনে পড়ল মুকুন্দপুরের উকিল তরণীবাবুর কথা। নেশায় তিনি এমনি সিদ্ধকাম হয়েছিলেন যে মদ, আফিং, এমন কি মর্ফিয়া ইন্‌জেকশনে পর্যন্ত তাঁর আমেজ আসত না। অগত্যা সেই আমেজ আনবার জন্যে একটা বিচিত্র প্রক্রিয়া তিনি অবলম্বন করেছিলেন। ঝাঁপিতে পুরে পুরে তিনি গোখরো সাপ পুষতেন। নির্বিষ মুমূর্ষু সাপুড়ের সাপ নয়—তাজা, হিংস্র, তীব্র বিষধরের দল। যখন শরীরের ভেতরে অবসাদ পুঞ্জিত হয়ে উঠত, মন্থর হয়ে যেত রক্তের গতি—দাবী করত স্নায়ুতে স্নায়ুতে অস্বাভাবিক খানিকটা উদ্দীপনা, তখন এই গোখরোর ঝাঁপির ভেতরে হাত দিয়ে তাদের একটি ছোবল নিতেন তরণীবাবু। আর সেই বিষে সারাটা দিন তিনি বিষ মেরে থাকতেন—বিষের তীব্র যন্ত্রণা তাঁর শরীরে সৃষ্টি করত নেশার একটা স্বর্গীয় আমেজ।

রৌদ্রোজ্জ্বল 'বরিন্দের' মাঠের দিকে তাকিয়ে তার সমস্ত মনটা যেন একটা দার্শনিকতায় ভরে উঠল। শুধু তরণীবাবুই নয়—সারা পৃথিবী জুড়েই চলেছে এই সাপের বিষের নেশা। বিষধরের ছোবল নিয়ে নিয়ে এক ধরণের আমেজের মধ্যে তলিয়ে থাকা, এক জাতীয় উন্মাদনায় স্নায়ুকুণ্ডলীকে উত্তেজিত করে তোলা। কুমার বৈদ্যনারায়ণ! আরো অনেক কুমার বাহাদুর, রাজা বাহাদুর, রায় বাহাদুর, মিল-মালিক। কিন্তু তার পর? সব খেলার শেষ আছে—এ খেলারও একটা সমাপ্তি ঘটতে বাধ্য। এমন কোনো গোখরো নেই কি—যাকে নিয়ে শুধু নেশা-নেশা খেলাই চলেনা? অনিবার্য অমোঘ তার বিষ—তার জ্বালা একবার শুরু হয়ে গেলে নিষ্কৃতি নেই আর?

আছে বৈ কি। ধানসিঁড়ি ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে সিঁথির রেখার মতো পথ। সেই পথে শাদা ধুলোর একটা হাল্‌কা আস্তর বিছোনো। রাত্রিতে যখন আকাশে চন্দন মাখিয়ে চাঁদ ওঠে—নিজেদের দীর্ঘ ছায়াগুলোর দিকে কেমন ভীত বিহ্বল চোখে তাকিয়ে থাকে তালের বন—হাওয়ার হাওয়ায় তাল পাতায় খড়্ খড়্ করে শব্দ বাজে, তখন: তখন জোৎস্নায় ধুয়ে-যাওয়া সেই ধুলোভরা ফালি পথের ওপর খেলা করতে বেরিয়ে আসে তারা। পথের ওপর নিঃসাড় হয়ে পড়ে থাকে, কিলবিল করে ছুটোছুটি করে, জড়াজড়ি করে পরস্পরের সঙ্গে। অপরিণত ক্ষুদ্র ফণাগুলোকে বাতাসের দিকে সন্ত্রস্ত করে যেন বিষপঞ্চয়ে পুষ্ট করে নিতে চায়। তারপর: তারপর পথের ওপর কোনো দূরাগত পদশব্দের স্পন্দন বাজে—ধানসিঁড়ির কোনো একটা শেষপ্রান্ত থেকে একটি হাল্‌কা ছায়া দীর্ঘায়িত হতে হতে এগিয়ে আসে। চক্ষের পলকে ধানক্ষেতের ভেতরে নেমে মাঠের ফাটলে, অধুনা স্বগায় কোনো কাঁকড়ার বর্ষায় করা গর্তে অথবা যাযাবর কোনো মেঠো ইঁদুরের আস্তানায় তারা মিলিয়ে যায়।

কিন্তু আর কতকাল তারা শুধু ফণায় বিষ ভরে নেবে? আর কতদিন কেবল ছায়া দেখে ভয় পাবে তারা—পায়ের শব্দ শুনে লুকিয়ে যাবে গর্তের আড়ালে?

ঘোর ভাঙল তার।

যমুনা গাঁজার কল্‌কে নিয়ে টান দিয়েছে, আর সেই সুযোগে এই মানস-মন্থনের পালা শুরু হয়েছে তার। এতক্ষণ পরে কিছু একটা শোনবার প্রত্যাশা করেই যেন সে তাকালো যমুনার মুখের দিকে। খানিকক্ষণ আমেজে বুঁদ হয়ে থাকার পরে যমুনা মুখ থেকে ধোঁয়া ছেড়ে দিলে। দুর্গন্ধ খানিকটা পিঙ্গল ধোঁয়ার কুয়াশা মাঠের উত্তপ্ত হাওয়ায় ভেঙে ভেঙে মিলিয়ে যেতে লাগল।

—আরো একটা জরুরি কথা আছে ঠাকুরবাবু—

কল্‌কেটা নামিয়ে রেখে যমুনা তাকালো। দেখা গেল দুপুরের কড়া রোদের সঙ্গে গাঁজার তীব্র নেশার ঝাঁজ মিশে একটা প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হয়েছে যমুনার মধ্যে।

ক্রমশ লাল হয়ে উঠেছে চোখ দুটো—ঠেলে-ওঠা চোখের রক্তবাহী ছোটো ছোটো শিরাগুলি স্ফীত হয়ে ফেটে পড়বার উপক্রম করেছে। হঠাৎ যমুনাকে কেমন ভয়ঙ্কর মনে হল। তার বাথানের মহিষগুলোর মতোই কৃষ্ণকায় প্রকাণ্ড শরীর—তাড়া মাখা, দৃষ্টিতে একটা হিংস্র জিঘাংসা। লোকটার ভ্রূরেখা প্রায় নেই বললেই চলে, আর অনেকটা সেই কারণেই হয়তো স্বাভাবিক মানবিকতা হারিয়েছে তার চোখ থেকে। ক্ষুধার্ত কোনো বুনো জানোয়ার যেন খাবা পেতে বসেছে রঞ্জনের কাছে। একটা দুর্গন্ধ বিষাক্ত উত্তাপের মতো ছোঁয়া দিচ্ছে তার গায়ে।

—কী জরুরি কথা?

—আমাদের জেনানাদের নিয়ে কী করব ঠাকুরবাবু?

—কেন, তাদের আবার কী হল?

—নজর লাগছে।—চিবিয়ে চিবিয়ে বললে যমুনা আহীর

—সে কী, কার আবার নজর লাগল?

—যার নজর লাগে!—যমুনা এমন তীব্র ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে রঞ্জনের দিকে তাকালো যে মনে হল বুঝি তারই মধ্যে যমুনা আহীর তার উদ্দিষ্ট সেই প্রতিপক্ষকে দেখতে পাচ্ছে: ওই শালা পেয়ারার দল। খালি কি দহী-ঘী নিতে আসে? শালাদের মতলব বহৎ 'চুহা'—ঠাকুরবাবু।

—বটে!—অকৃত্রিম বিস্ময়ে মন্তব্য করল রঞ্জন।

—জানাদের অল্প বেটীর দিকে বহৎ খারাপ নজর দেয়। খারাপ বাতচিত করে। এতদিন সয়ে গেলাম হামরা।—যমুনার চোখ জ্বল্ জ্বল্ করে উঠল: সেদিন মাঠের ভিতর এক শালা কুমরীর হাত ধরেছিল। কুমরি হাতের ধামার এক ঘা দিয়ে শালার মুখ কাটিয়ে পালিয়ে এসেছে।—হঠাৎ ক্রোধে রোঁয়া ফোলানো বেড়ালের মতো সোজা হয়ে উঠে বসল যমুনা আহীর: হামি থাকলে কেবল মুখ কাটিয়েই পালাতে পারত না—জান কি মাঠের মধ্যে রেখে যেতে হত।

অভিভাবকতার একটা বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গি নিয়ে রঞ্জন বললে, ছিঃ ছিঃ, ওসব খুন খারাপির কথা ভাবতে নেই।

—হামরা ভাবিনা বাবু—এবার আর ঠাকুরবাবু বললে না যমুনা। ক্রোধে-ক্ষোভে ওই জমিদার বাড়ি সংক্রান্ত মানুষগুলি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আত্মীয়তার অনুভূতিও তার মনে জেগে নেই আর। গাঁজার কলকেটাকে উবুড় করে ঢেলে দিতে দিতে যমুনা বললে, হামরা ভাবিনা। কিন্তু খুন চড়ে যায়। দহি-ঘী বিনা পয়সায় নিয়ে যায়—সেও যাক। কের ইজ্জতে হাত দিতে চায়?—যমুনা ঘু-ঘু মাঠের মধ্যে চোখ ছড়িয়ে দিয়ে বোধ করি জমিদার বাড়িটাকে একবার দেখে নিতে চাইল: হামরা জাতে আহীর বাবু। হামাদের বাপ্ ঠাকুর্দা ছিল জোয়ান—ছিল ডাকু। কথায় কথায় জান নিত তারা।

তারা নিত, তাদের বংশধরেরাও আজ নিতে পারে—যমুনার সমস্ত শরীরে যেন এই সত্যটি অভিব্যক্ত হয়ে উঠল। রঞ্জন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। তার মনের মধ্যে যেন একটা গোপন পাপের মতো বিঁধছে—সে কুমার ভৈরবনারায়ণের অন্নপুষ্ট। তাই যমুনা তাকে মেনে নিতে পারছে না কোনো আত্মীয়তার অন্তরঙ্গতায়; খানিকটা পরিমাণে এসেছে, কিন্তু সম্পূর্ণ করে নামতে পারেনি তাদের বিশ্বাসের ভিত্তিভূমির ওপরে। এমনি এক একটা ক্ষুব্ধ উত্তেজিত মুহূর্তে নিজেকে কেমন ত্রিশঙ্কুর মতো মনে হয় তার। শূন্য আকাশে বেশিক্ষণ আর ঝুলে থাকতে পারবেনা তা সে জানে। কিন্তু নীচে পা দিয়ে দাঁড়ানোর মতো মাটিও কি সে খুঁজে পেয়েছে?

রঞ্জন উঠে দাঁড়ালো। বললে, আজ চলি যমুনা, আর একদিন আসব।

—কিন্তু হামরা কী করব বাবু?

যমুনা জানতে চাইল। রঞ্জন ঠিক উত্তর দিতে পারল না। মনে হল, প্রশ্ন করবার আগেই যেন যমুনা নিজের ভেতরে কর্তব্যটাকে নির্ধারণ করে নিয়েছে।

—যা ভালো মনে হয় তাই কোরো—

এর বেশি আর কী বলা যায়? ধানসিঁড়ি ক্ষেতের আলপথে বিষ সঞ্চয় করে ফিরছে নাগশিশুরা। তাদের বিষফণাকে কে রোধ করবে? কোনো উপদেশ—কোনো সদিচ্ছাকে মনে হবে মিথ্যার মতো—অর্থহীন প্রবঞ্চনার মতো।

—আচ্ছা চলি—

রঞ্জন বেরিয়ে পড়ল। একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল ঘরের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে যমুনার মেয়ে কুমরি। নাগিনী।

ক্রমশ

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

আই এফ এ শীল্ড ঃ

১৯৪৯ সালের আই এফ এ শীল্ড খেলার ফাইনালে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ২-০ গোলে মোহনবাগান ক্লাবকে হারিয়ে একই বছরে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার লীগ-শীল্ড বিজয়ের সম্মান লাভ করেছে। একই বছরে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব প্রথম লীগ-শীল্ড বিজয়ী হয় ১৯৪৫ সালে এবং সে বছরও শীল্ডের ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল মোহনবাগান ক্লাব। এ বছরের লীগের দুটি খেলাতে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব মোহনবাগানের কাছে হেরে যায়। সেইকারণে শীল্ডের ফাইনালে, এ বছরের উভয় দলের তৃতীয় বারের খেলার ফলাফল সম্পর্কে খেলার মাঠে, ট্রাম-বাসে, চায়ের দোকানে এবং বাড়ীর রকে দু'দলের সমর্থকদের মধ্যে কয়েকদিন ধরে জোর কল্পনা এবং বাক-বিতণ্ডা চলেছিল। এ বছরের ফাইনাল খেলাটি নানাদিক থেকে ক্রীড়ামহলে আলোচনার এবং আকর্ষণের বস্তুতে পরিণত হয়। উভয় দলের সম্মতিক্রমে ৫ই সেপ্টেম্বর ফাইনাল খেলাটির দিন স্থির হয়। উভয় দলের টিকিট বিক্রীর বিজ্ঞপ্তিও প্রচার করা হয়। কিন্তু সেইমত ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব টিকিট বিক্রী না ক'রে একজন খেলোয়াড়ের অনুপস্থিতি এবং অপর জনের অসুস্থতার কারণে হঠাৎ আই এফ এ কর্তৃপক্ষের কাছে ফাইনাল খেলার দিন পরিবর্ত্তনের জন্য এক অনুরোধ জানায়। আই এফ এ সেই অনুরোধের উত্তরে খেলাটির তারিখ পরিবর্ত্তন ক'রে ১৫ই সেপ্টেম্বর করে। এইভাবে আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলার দিন পরিবর্ত্তন আই এফ এ-র ইতিহাসে প্রথম এবং অভিনব। অন্যদিক থেকে এবারের ফাইনাল খেলার গুরুত্ব ছিল, মোহনবাগান ক্লাব ১৯৪৭ এবং ১৯৪৮ সালে পর পর দু'বার শীল্ড বিজয়ী হয়ে এবছর ভারতীয় দলের মধ্যে প্রথম পরপর তিনবার আই এফ এ শীল্ড বিজয়ের সুযোগ লাভ করে। অপর দিকে প্রতিদ্বন্দ্বী ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব এ বছর প্রথম বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়ে শীল্ডের ফাইনালে উঠে দ্বিতীয়বার একই বছরে লীগ-শীল্ড বিজয়ের যে সুযোগ পায় তা শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হতে দেয়নি। এ বছর আই এফ এ শীল্ডের অনুষ্ঠানে মোট ৪২টি ফুটবলদল বাংলা এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে খেলায় যোগদানের জন্য নাম পাঠায়। কিন্তু কয়েকটি বিশিষ্ট ফুটবলদল শেষ পর্য্যন্ত খেলায় যোগদান করেনি। শীল্ড fixtureএর যে অর্দ্ধাংশ থেকে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব উঠেছিলো সেদিকে নামকরা বাঙ্গালোর মুহাম্মদাবাদ পুলিস এবং ঢাকা ফুটবল ক্লাব শেষ পর্য্যন্ত যোগদান করেনি। ফলে ঐদিকে খেলার কোন আকর্ষণই ছিল না। ঐ দিকে প্রথম বিভাগের ইআই রেলদল, জর্জ্জটেলিগ্রাফ এবং দ্বিতীয় বিভাগের কাষ্টমস ছাড়া যে সব বাইরের দল খেলেছিলো তাদের আই এফ এ শীল্ড খেলা দূরে থাক, এখানের নীচের দিকের কোন লীগের খেলায় যোগদানের যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা অশোভন হবে না। সেমি-ফাইনালে গৌহাটির মহারাণা ক্লাব ৮-০ গোলে ইষ্টবেঙ্গল দলের কাছে শোচনীয়ভাবে হেরে গিয়ে ভারতবর্ষের অন্যতম ফুটবল প্রতিযোগিতা আই এফ এ শীল্ড খেলার স্ট্যাণ্ডার্ডের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে শীল্ডের ইতিহাসে সেমি-ফাইনালের খেলায় এরূপ শোচনীয় ব্যর্থতা ইতিপূর্ব্বে একবারই হয়েছিল, মহমেডান স্পোর্টিং-হাওড়া

ক্লেলা দলের খেলায়। এবছরের শীল্ডের যে অংশ থেকে মোহনবাগান ক্লাব ফাইনালে যায় সে অংশের মহমেডান স্পোর্টিং—ভবানীপুর দলের তৃতীয় রাউণ্ডের দু'দিনেরই খেলা এবছরের শীল্ডের শ্রেষ্ঠ খেলা বলা অতিশয়োক্তি হবে না। শেষ পর্য্যন্ত ভবানীপুর ক্লাব দ্বিতীয় দিনের খেলায় ৩-২ গোলে পরাজিত হলেও তাদের খেলা অগৌরব এবং হতাশার হয়নি। সর্ব্বক্ষণই সমর্থকেরা প্রবল উত্তেজনার সঙ্গে খেলাটি উপভোগ করেছিলেন। মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গলের ফাইনাল খেলাটি খুব উচ্চাঙ্গের হয়নি। ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব এ বছরের লীগে এবং শীল্ডে অপরাপর দলগুলির সঙ্গে যে উচ্চাঙ্গের খেলা খেলেছিল শীল্ডের খেলা তেমন হয়নি; যদিও খেলোয়াড়রা বিজয়ী-দলের মতই খেলেছিলো। অপর দিকে মোহনবাগান ক্লাব লীগের ছুটি খেলাতে ইষ্টবেঙ্গলের বিপক্ষে যেমন ভাল খেলেছিল সেরকম খেলা শীল্ডে দেখাতে পারেনি। প্রথম সূচনা থেকেই উভয় দলের কয়েকজন খেলার বিধি নিষেধ অমান্য ক'রে বল প্রয়োগ দ্বারা খেলেছিলেন, যার ফলে সত্যকার ফুটবল খেলার আকর্ষণ এবং বৈশিষ্ট্য ছিল না। খেলার এই শোচনীয় পরিণতির জন্য ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের লেফট ইন্ আমেদকে দোষারোপ করা যায়। খেলার ৫ মিনিট আমেদ বল ছেড়ে মোহনবাগানের অনিল দের বুকে অসম্মানজনক ভাবে পা দিয়ে খেলার মাঠে এক অপ্রীতিকর দৃশ্যের অবতারণা করেন। এর পর থেকেই উভয় দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে 'ফাউল' খেলা চলতে থাকে। খেলতে গিয়ে দেখা গেছে অনেক সময় খেলোয়াড়রা এত বেশী দলের প্রতি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছে যে, জিদ বশে বলটি আয়ত্বে আনার চেষ্টা করতে গিয়ে অথবা বিপক্ষের খেলোয়াড়কে বাধা দিতে গিয়ে আইন অমান্য করে বসেছে। খেলোয়াড় এবং দর্শকেরা এই সব ছোটখাট ঘটনাকে উপেক্ষা ক'রে খেলার মাঠে সুষ্ঠু আবহাওয়া রক্ষার চেষ্টা করে যদি মারাত্মক ফাউল কিম্বা ইচ্ছাকৃত ভাবে বিপক্ষের খেলোয়াড়কে আঘাত করা বা অপমান করা না হয়। এ সব কাজ উভয়দলের পক্ষে মারাত্মক এবং বিরোধের কারণ বলেই আইন রচনার প্রয়োজন হয়েছে। খেলার ঝোঁকে কখনও ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটলে অন্যায়কারী খেলোয়াড়কে তার জন্য সঙ্গে সঙ্গে করমর্দ্দন অথবা অন্তভাবে ক্ষমা চেয়ে নিতে আমরা দেখেছি। মানুষ মাত্রেরই ভুল হয় কিন্তু ভুলের জন্য সময়মত সংশোধনের চেষ্টা বা তার জন্য ক্ষমা চাওয়া যদি না হয় তাহলে তার থেকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অন্যায় হবে না যে, অন্যায়-কারীর ভুল ইচ্ছাকৃত অথবা অন্যায়কারীর একান্ত ভদ্রতা জ্ঞানের অভাব আছে। ফাইনাল খেলার ঘটনায় আমেদ যে ভাবে বল ছেড়ে অভদ্র আচরণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তার জন্য যে তিনি বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত তা তাঁর ব্যবহারে প্রকাশ পায়নি। রেফারীর মধ্যস্থতার পূর্ব্বেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা চাইলে ব্যাপারটা সেইখানেই শেষ হ'ত। এখন জনসাধারণ বিচার করবেন এ কাজ ইচ্ছাকৃত না খেলোয়াড়ের দিক থেকে ভদ্রতার অভাব। যে কোন বিশিষ্ট দলের অতি বড় খেলোয়াড়ের পক্ষে এরূপ আচরণ নিন্দনীয়। সকল ক্লাবের সভ্য এবং সমর্থকদের মনে রাখা উচিত, খেলায় জয়লাভও যেমন দলের পক্ষে গৌরবের কারণ অখেলোয়াড়ী আচরণও দলের পক্ষে সমান নিন্দা এবং ক্ষতির কারণ।

খেলার মাঠ ঃ

গত কয়েক বছর ইউরোপীয় ক্লাবগুলি আই এফ এ-র উপর পূর্ব্বের একচেটিয়া কর্তৃত্ব হারিয়েছে। পূর্ব্বে যে কারণে আই এফ এ ভারতীয় ফুটবল খেলার ক্রমোন্নতির বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো আমরা খুবই আশা ক'রেছিলাম, নিজেদের হাতে কর্তৃত্ব পেলে সেই সব বাধা দূর হবে। খেলা নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে এবং জাতীয় স্বাস্থ্য ও নৈতিক চরিত্র গঠনে আমরা যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারাবো, যা আমরা কেবল সুযোগের অভাবেই এত দিন দিতে পারিনি বলে অভিযোগ করে এসেছি। অত্যন্ত লজ্জার কথা—অর্থ, ক্ষমতা, সময় ও সুযোগের অপব্যবহার আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটি মজ্জাগত দোষ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। খেলার মাঠের কথাই ধরা যাক। মাঠে আমরা এক শ্রেণীর দর্শকের নৈতিক অবনতির পরিচয় আজকাল পাচ্ছি। এক শ্রেণীর দর্শকরা স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে খেলার মাঠে প্রকাশ্যভাবে গণ্ডগোল সৃষ্টি করে সত্য। কিন্তু বিরাট জনসমুদ্রের মধ্যে অসন্তোষ নেই এ ধারণা

খুন। ইট-পাটকেল ছুড়ে অসন্তোষ প্রকাশ না করলেও জনসাধারণকে খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড, অব্যবস্থা এবং রেফারিং সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা করতে দেখা গেছে। কোন বড় রকমের ত্রুটি বিচ্যুতি অবলম্বন হিসাবে না পেলে আনন্দ উপভোগ করতে এসে জনসাধারণ কখনও অসন্তোষ প্রকাশ করতে উৎসাহিত হয় না বা নির্বিবাদী দর্শক হিসাবে অপরের বিক্ষোভ প্রদর্শন সমর্থন করে না। খেলার মাঠে জনসাধারণের অভিযোগ অনেকগুলি এবং অনেকদিনের। প্রধান অভিযোগ, চাহিদা অনুপাতে খেলার মাঠের স্বল্পতা। চ্যারিটি ম্যাচে টিকিটের মূল্য যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সভ্যদের সাধারণ দর্শক শ্রেণীর সবুজ আসনগুলির বৃহৎ অংশ দিতে হয়, যে অংশটা চ্যারিটি ম্যাচ না হ'লে সাধারণ দর্শকেরা অনায়াসে পেয়ে থাকে। সুতরাং চ্যারিটি খেলায় সাধারণ দর্শকদের এক বৃহৎ অংশকে এই ভাবে খেলা দেখা থেকে বঞ্চিত করা হয়। এই কারণে তাদের মধ্যে অসন্তোষ স্বাভাবিক। চ্যারিটি খেলার গুরুত্ব দর্শকদের মধ্যে এক মানসিক উত্তেজনা এবং খেলা দেখার অদম্য আকাঙ্ক্ষা সঞ্চার করে, যার ফলে টিকিট পাওয়া সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়ার জন্য খেলা আরম্ভের ৯।১০ ঘণ্টা আগে থেকে মাঠে উপস্থিত হয়। চ্যারিটি ম্যাচ নয় অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খেলায় দর্শকদের মধ্যে খেলা দেখার এত উৎসাহ দেখা যায় না। ৯।১০ ঘণ্টা মানুষের সারিতে দাঁড়িয়ে প্রখর রোদ এবং প্রবল বারিপাত সহ্য করা শরীর ধর্মের পক্ষে কম নির্যাতন নয়। এইভাবে স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন করতে জনসাধারণকে বাধ্য করা, বা উৎসাহিত করা আই এফ এর পক্ষে নীতিজ্ঞান বিবর্জিত কাজের পরিচায়ক। সহস্র সহস্র লোকের প্রাণশক্তিকে এইভাবে অবহেলা এবং ক্ষয় ক'রে হাসপাতাল বা কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা, মোটেই জনকল্যাণজনক কাজ নয়, আত্মঘাতির সামিল। চ্যারিটি খেলার টিকিট সংগ্রহে ব্যর্থকাম হ'য়ে এক শ্রেণীর দর্শক খেলা দেখার অদম্য আকাঙ্ক্ষা দমন না করতে পেরে শেষে বিপদজনকভাবে বেড়া টপকে মাঠে প্রবেশ করতে উৎসাহিত হয়। ইংরেজ রাজত্বকালে পুলিশ সার্জেণ্ট এবং ঘোড় শওয়ার পুলিশরা দর্শকদের কাছ থেকে দর্শনী নিয়ে মাঠে ঢুকতে সাহায্য করতো দেখা গেছে। অবস্থার পরিবর্তনে এখন সে ব্যবস্থা মাঠে চোখে পড়ে না। বরং পুলিশ দর্শকদের এই অন্যায় প্রবেশ পথে বাধা দেয়; এই শ্রেণীর দর্শকদের মধ্যে স্কুলের ছোট ছোট ছেলেদের পর্যন্ত যোগ দিতে দেখা যায়। সোডার বোতল এবং টটপাটকেল ছুড়ে দর্শকের প্রবেশ পথ থেকে পুলিশকে হটিয়ে দেবার উৎসাহও প্রকাশ পায়। ফলে অবস্থা আয়ত্বে আনতে পুলিস যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয় তা অবশ্য সব সময়ে সমর্থন যোগ্য হয় না। সুতরাং খেলার মাঠ যেন আজ আমাদের জাতীয়-নৈতিক-চরিত্র অধোগতির এক দৃষ্টান্তস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থার জন্য আই এফ এ কর্তৃপক্ষেরও যথেষ্ট ত্রুটি আছে। তাঁদের দায়িত্ব-বিবেচনার অভাবের ফলেই খেলার মাঠের শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পুলিসের লাঠি, কাঁদুনে গ্যাস এবং গুলির সাহায্য নিতে হয়েছে। তাঁদের প্রধান কর্তব্য দর্শকবৃন্দের চাহিদা অনুপাতে খেলার ষ্টেডিয়াম তৈরী করা এবং যে পর্যন্ত না ষ্টেডিয়াম হচ্ছে ততদিন একই দিনে ২টি বড় খেলার ব্যবস্থা ক'রে মাঠে ভীড়ের চাপ কমানো অথবা চ্যারিটি ম্যাচ একেবারে বন্ধ করা। অসামাজিক কাজের ইন্ধন দিয়ে জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে অর্থ সাহায্য বড় কথা, না জনসাধারণকে সকল প্রকার অসামাজিক কাজ থেকে দূরে রেখে ফুটবল খেলার মধ্যে জাতীয় চরিত্র গঠনের যে বিবিধ গুণাবলী আছে সেগুলি জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা আমাদের প্রধান? প্রাথমিক কর্তব্য আমরা জাতীয় সরকার এবং আই এফ এ কর্তৃপক্ষদের বিবেচনা করতে অনুরোধ করছি। চ্যারিটি ম্যাচ সম্বন্ধেও অভিযোগ আছে। চ্যারিটি ম্যাচগুলি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে সমভাবে খেলানো উচিত। দু' একটা ম্যাচ কোন দলকে বেশী খেলতে দেখলে তেমন গায়ে লাগে না কিন্তু একটা দলের ভাল ভাল খেলাগুলি চ্যারিটি ম্যাচ হিসাবে খেলানোর অর্থ ক্লাবের সভ্যদের এবং সমর্থকদের আর্থিক অসুবিধায় ফেলা। প্রসঙ্গক্রমে এবছরের মোহনবাগান ক্লাবের চ্যারিটি ম্যাচের কথা বলতে হয়। মোহনবাগান লীগ ৩টে চ্যারিটি ম্যাচ খেলেছিলো। শীল্ডে তাদের খেলাতে হয়েছে তৃতীয় রাউণ্ডে, সেমিফাইনাল ফাইনালে এবং এ বছরের মোট ৬টি চ্যারিটি খেলার মধ্যে মোহনবাগানের ভাগে ৬টা

চারিটি ম্যাচই পড়েছে। অন্যদিকে ইষ্টবেঙ্গল, মহামেডান স্পোর্টিং ২, রাজস্থান ১। ইহাদের এত রাখিতে মোহনবাগান-রাজস্থানের খেলাটি চারিটি ম্যাচ হিসাবে খেলানোর কোন যুক্তি পাই না।

আজকাল খেলার মাঠের জনপ্রিয় দল বলতে তিনটি—মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং। এই তিনটি দলের মধ্যে সমান ভাগ ক'রে চারিটি ম্যাচগুলি বণ্টন করলে কোন দলের সভ্যদের এবং সমর্থকদের গায়ে লাগে না। আই এফ এ কর্তৃক অনুষ্ঠিত চারিটি ম্যাচে যে টাকা এ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হয়েছে মোহনবাগান ক্লাবের দান সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বললে অত্যুক্তি হবে না। জনপ্রিয় এবং পুরাতন ক্লাব বলেই মোহনবাগানের চারিটি খেলায় অধিক লোক সমাগম হয়। মোহনবাগানের ভাল ভাল খেলাগুলি চারিটির উদ্দেশ্যে খেলানো হয়। ক্লাব কর্তৃপক্ষ আপত্তি না তুলে নিম্ন ক্লাবের সভ্যদের এবং সমর্থকদের অধিক নিকটা বিচার না করেই ভদ্রতার খাতিরে আই এফ এ-র সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে চারিটি ম্যাচ খেলতে সম্মতি দেন; ফলে প্রতি বছর তাদেরই বেশী চারিটি ম্যাচ খেলতে হয়। সভ্য হিসাবে এই ক্লাবের চাঁদা বৃদ্ধি হয়েছে তার উপর এত অধিক চারিটি ম্যাচ খেলাতে ক্লাবের সভ্যদের অভিযোগ করতে শোনা গেছে, এ অন্যায় অভিযোগ নয়। তার উপর সাধারণ সমর্থকদের অসুবিধাও কম নয়। চারিটি ম্যাচের টিকিট নিয়ে ক্লাবের সভ্য এবং কর্তৃপক্ষ মহলের হাঙ্গামা বা কম কি। চারিটি ম্যাচ হলেই ক্লাবের খেলোয়াড়দের এক ভীষণ দুর্ভাবনায় পড়তে হয়। চারিটি ম্যাচের টিকিট সংগ্রহ করতে খেলার পূর্ব্ব দিনের অর্দ্ধেক রাত্রি পর্য্যন্ত ক্লাবের তাঁবুতে অথবা ক্লাবের কর্তৃপক্ষ মহলের বাড়িতে বাড়িতে হাঁটাহাঁটি করতে দেখা গেছে। খেলার দিন দুপুর বেলা পর্য্যন্ত তাদের বন্ধু, আত্মীয়স্বজন এবং অফিসের 'বসদের' টিকিট সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত থাকতে হয়। এই ধরণের হাঙ্গামা, টিকিট সংগ্রহে বিরক্তি এবং হতাশা নিয়ে খেলোয়াড়রা মাঠে খেলতে নামে। অন্যদিক থেকে খেলায় অসাফল্য বা ভুলত্রুটি হলেই সমর্থকদের কটূক্তি এবং গঞ্জনা। এই তো খেলোয়াড়দের জীবন। খেলোয়াড় জীবনে উচ্চাভিলাষ থাকার কথা নয়। ক্ষণিকের করতালি এবং ছাপার অক্ষরে সংবাদপত্রে ছবি বা প্রশংসা এ দেশের খেলোয়াড়দের সামাজিক স্বীকৃতি (Social recognition) বা যেয় তা নিয়ে জীবন সংগ্রামে কোন একটা সুরাহা হয় না। এ দেশের ফুটবল খেলোয়াড়রা যে কায়িক পরিশ্রম দ্বারা আমাদের চিত্ত বিনোদন করেন তার উপযুক্ত মূল্য তাঁরা পান না কারণ তাঁরা সব সময়ের খেলোয়াড়। মাঠের দর্শক হিসাবে আমরা যা দিয়ে থাকি তার ষোল আনা মুনাফা মাঠের ঠিকেদার অথবা চ্যারিটি ফণ্ডে যায়। যে খেলোয়াড়রা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চারিটি ফণ্ডে টাকা তুলে দেন সেইসব খেলোয়াড়দের প্রতি আই এফ এ কর্তৃপক্ষের সৌজন্য প্রকাশের কোন গরজ নেই, তাঁদের দর্শনী দিয়ে চারিটি ম্যাচ খেলা দেখতে হয়। প্রথম বিভাগের ১৩টি দল আছে। যে দুটি দল চারিটি ম্যাচ খেলবে তাদের সমান ৬০টি টিকিট এবং বাকি ১১টি দলকে ১২১টি মোট ১৮১ খানি টিকিট প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়দের জন্য বিনামূল্যে দিলে আই এফ এ-র চ্যারিটি ফণ্ডে ৫৪৩৲ টাকা (৩৲ টাকা মূল্য হিসাবে) কম উঠবে বটে, কিন্তু অন্যদিকে খেলোয়াড়দের প্রতি যে সুবিচার করা এবং সৌজন্য দেখানো হবে তাতে আই এফ এ-র গৌরব বৃদ্ধিই হবে। এই সৌজন্য বোধ থেকেই আই এফ এ এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে সৌহার্দ্যের বন্ধন সুদৃঢ় হবে।

আমাদের দেশের ফুটবল খেলার মান যে ক্রমশঃ নিম্নগামী হচ্ছে এ বিষয়ে একমত নন এমন লোক বিরল। আই এফ এ কর্তৃপক্ষ এই নিম্ন শ্রেণীর ফুটবল খেলা দেখিয়েই ফুটবল ক্লাবের সভ্যদের তাঁদের দেয় ক্লাবের বার্ষিক চাঁদা ছাড়া চ্যারিটির জন্য যে অতিরিক্ত অর্থ খরচের দায়ে ফেলছেন তা যুক্তি সঙ্গত নয়। সাধারণ দর্শকশ্রেণীর সমস্তই স্কুল কলেজের ছাত্র এবং দুঃস্থ চাকুরে কেরাণী। একাধিক চ্যারিটি ম্যাচ খেলানো মানেই তাদের অমিতব্যয়ের দায়ে ফেলা; সভ্য সমাজের কোন জাতীয় সরকার এই শ্রেণীর কাজ নিশ্চয় সমর্থন করেন না।

খেলা দেখার স্থানাভাব, নিম্ন শ্রেণীর খেলা, দর্শক এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে অখেলোয়াড়ী আচরণ। ফুটবল আইন পুস্তকের অভাবে, দর্শকশ্রেণীর মধ্যে আইনজ্ঞানের অভাব হেতু বিক্ষোভ, নিম্ন শ্রেণীর রেফারীং, জনসাধারণের সুখ-সুবিধার প্রতি কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতা, আধা-পেশাদারী অবাঙ্গালী ফুটবল খেলোয়াড় আমদানী ক'রে বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা, ফুটবল খেলার উন্নতিকল্পে কোন গঠনমূলক পরিকল্পনা না থাকা, জনসাধারণের মধ্যে নাগরিক-বোধ জাগরণের কোন সুপরিকল্পিত প্রচার ব্যবস্থা না থাকা, খেলার মাঠে একশ্রেণীর জুয়াড়ীদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ—এই সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি এবং ঘটনার সমন্বয়ে ফুটবল খেলার মাঠ দূষিত হয়ে উঠেছে। জনসাধারণের মধ্যে ধৈর্য্যের বাঁধ যে ভেঙেছে তা রক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব আই এফ এ কর্তৃপক্ষের। পুলিশের এ কাজ নয়। আই এফ এ কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক দায়িত্ব পালনে উদ্‌যোগী হয়ে জনসাধারণের কর্ত্তব্য বুদ্ধি এবং সহযোগিতার জন্য আবেদন জানালে খুবই শোভন এবং সুবিবেচনার পরিচয় দেওয়া হয়।

যুযুৎসু-কৌশল

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১৩০নং প্যাঁচ

যদি কেহ ডান হাত দিয়া ঘুষি মারিতে আসে তৎক্ষণাৎ তাহার ডান কব্জির ডান ধারে নিজের ডান বাহু দিয়া আটকাইয়া সঙ্গে সঙ্গে ডান হাত দিয়া তাহার ডান মুঠোটি ধরিয়া লইয়া বা হাতটি তাহার ধরা হাতের কনুইয়ের নিচে রাখিয়া নিজের বাঁ পা-টি তাহার ডান পায়ের ডান দিকে

১৩০নং প্যাঁচের ১ম চিত্র

আগাইয়া ডান দিকে ঘুরিয়া (১৩০নং প্যাঁচের ১ম চিত্র) একটু নিচু হইয়া তাহার ধরা হাতটি ডান ধারে পুরাভাবে ঘুরাইয়া নামাইতে নামাইতে তাহার মোড়া কনুই ও কব্জিতে চাড় দিতে দিতে (১৩০নং প্যাঁচের ২য় চিত্র)

১৩০নং প্যাঁচের ২য় চিত্র

কোঁক দিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া তাহাকে আটকাইয়া রাখিতে পারা যাইবে (১৩০নং প্যাঁচের ৩য় চিত্র)

১৩০নং প্যাঁচের ৩য় চিত্র

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নূতন উপন্যাস "ব্যোমপথিক"—৩৲

শ্রীইন্দিরা দেবী প্রণীত উপন্যাস "যারা ভালো বেসেছে"—২৲

শ্রীবিমলাক্ষ মজুমদার প্রণীত উপন্যাস "আমার বাবে ঘর"—২৲

বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স লিঃ প্রকাশিত ছোটদের পূজা-বার্ষিকী

"বার্ষিক শিশু-সাথী" (১৩৪৯)—৪৲

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "সোনার ভারত"—২৲,

"শ্রী মাল্লকেটিয়ার্স" (২য়)—১৲

দেব সাহিত্য কুটীর-প্রকাশিত শিশু-বার্ষিকী "নবারুণ"—৩৲

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত রহস্যোপন্যাস "কুমারের বাঘা পোষেছে"—১৲

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার প্রণীত "বিজ্ঞানের ব্যাখ্যান"—৸৹

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত রহস্যোপন্যাস

"পেশোয়াজের বিভীষিকা"—১৲

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত "বধূ বরণ"—১।৹

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "কালীর রাণী"—১৲

শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত রহস্যোপন্যাস "রহস্য-জালে মোহন"—২৲,

"মোহন ও মহারাজা"—২৲, "বিপজ্জনী মোহন"—২৲,

"মোহনের জেহাদ"—২৲, "সন্ন্যাসী মোহন"—২৲

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষৎ-প্রকাশিত লোকবিজ্ঞান গ্রন্থমালা

"আমাদের খাদ্য"—১৹, "ধরিত্রী"—৪৹, "তড়িতের অদ্ভুতাম"—৪৹

শ্রীরাধারমণ দাস-সম্পাদিত রহস্যোপন্যাস "মহারাজের মুকুট"—১৲

শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "মানুষ"—৪৹

শ্রীজগদীশ সিংহ প্রণীত উপন্যাস "সহরের মোহ"—২৲

ধীরেন দাশ প্রণীত উপন্যাস "চাঁদ ও রাহু"—২৲

প্রবোধচন্দ্র ঘোষ প্রণীত ইতিবৃত্ত "মাদাগী"—২।৹

ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত-সম্পাদিত বঙ্কিমচন্দ্রের "রজনী"—১।৹

রাধিকারঞ্জন ঘটক প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "কাজলী"—২৲

রেকর্ড-সমালোচনা

(সেপ্টেম্বর মাসের এইচ্. এম্. ভি.র বাংলা রেকর্ড)

P 11901—কুমার শচীন দেববর্মণ। গায়ক এই রেকর্ডে স্বরচিত-সুরে-সমৃদ্ধ দুখানি আধুনিক গান পরিবেশন করেছেন। N 31077—লতা চৌধুরী। কাজী নজরুলের দুখানি প্রাণস্পর্শী রচনা গায়কের সুমিষ্ট পরিবেশনে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। N 31078—তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। নবীন শিল্পী দুখানি আধুনিক গানে হৃদয়ের সবটুকু উচ্ছ্বাস ও কণ্ঠের মধুরতা ঢেলে দিয়েছেন। N 31080—কৃষ্ণচন্দ্র দে। চণ্ডীদাসের একটি সুপরিচিত কীর্ত্তন আলোচ্য রেকর্ডটির দুই দিকে পরিবেশিত হয়েছে। কথকতা ও সমবেত কণ্ঠের রীতানুসরণে কীর্ত্তনটি অধিকতর আকর্ষণীয় হয়েছে। N 31082—মৃণালকান্তি ঘোষ। এই সুপরিচিত শিল্পী পূজার আগে দুটি শ্যামাসঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। N 31086—শ্রীমতী সুধা মুখোপাধ্যায়। সুষ্ঠু পরিবেশনে রবীন্দ্র সঙ্গীত দুটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। N 31087—রঞ্জিৎ রায়। সুপরিচিত কৌতুক গীতিকুশলী শিল্পীর গান দুখানি পূজার আসর মুখরিত করে তুলবে। N 31098—শ্রীমতী সুপ্রীতি ঘোষ। রবীন্দ্রসঙ্গীতের দুখানি সুপরিচিত গান গায়িকার কণ্ঠে নিখুঁত ভাবে ফুটে উঠেছে। N 31100—রাজেন সরকার। "সন্ন্যাসী" ছায়াচিত্রের দুটি বহুপ্রচারিত গান ("রাত ভরি" ও "সুবোধি") ক্ল্যারিওনেটের মাধ্যমে শিল্পী পরিবেশন করেছেন। N 31105—শ্রীমতী সুধারাণী ভড়। কীর্ত্তন গানে গায়িকার দক্ষতার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় আলোচ্য রেকর্ডে। N 31106—মহালয়া তথা দুর্গা পূজার উৎপত্তির পৌরাণিক কাহিনী বর্ণনা করেছেন মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। N 31115—দিলীপকুমার রায়। এই গায়কের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী আছে যা বর্ত্তমানকালের রেকর্ডে পাওয়া যায় না। গভীর ভক্তি ও ভাবমূলক দুটি রচনা গায়কের সুরসংযোগ ও গীতিবৈদগ্ধ্যে সমৃদ্ধ হয়েছে।

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অগ্রহায়ণ—১৩৫৬

প্রথম খণ্ড	সপ্তত্রিংশ বর্ষ	ষষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীঅরবিন্দ ও মানব জীবনের চিরন্তন সমস্যা

শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-এ, পি-আর-এস, পিএচ-ডি,

মানুষের জীবনে যে একটা চিরন্তন সমস্যা দেখা যায় তাহার সমাধানে শ্রীঅরবিন্দ কি আলোকপাত করিয়াছেন তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। যে সমস্যার কথা বলিতেছি তাহা সভ্যতার আদিমকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত মানুষের জীবনে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তাহার জীবনের সকল স্তরে ও সকল কাজে জড়িত আছে। সমস্যাটি এইরূপ। মানুষের মধ্যে যেন দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির খেলা চলিতেছে। তাহাদের একটি চিৎশক্তি ও অপরটি অচিৎ বা জড়শক্তি; একটি শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা, অপরটি ভৌতিক অচেতন দেহ। মানুষের জীবন যেন এই দুই শক্তি বা তত্ত্বের সংমিশ্রণে গঠিত এবং উহাদের প্রকৃতিগত বিরোধে দ্বিধাবিভক্ত, ক্লিষ্ট ও বিপর্য্যস্ত। একদিকে মানুষ একটি ক্ষুদ্র দেহে সীমাবদ্ধ এবং সেই দেহের আধিব্যাধি ও ক্ষুৎপিপাসায় প্রপীড়িত। তাহার দেহের সঙ্গে মনের একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায়, দেহের সুখদুঃখ ও অভাব-অভিযোগ মিটাইবার জন্য মানুষের মন ব্যস্তশ্রান্ত হয় এবং সেইজন্য প্রায়ই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মৎসর প্রভৃতি রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহার আত্মা দেহমনের দুঃখদৈন্য অতিক্রম করিয়া এবং উহাদের সকল সীমা লঙ্ঘন করিয়া এক শাশ্বত সত্যের সন্ধানে ছুটিয়া যায়, এই মরজগতের উর্দ্ধে কোন এক অজানা অমরলোকে যাইতে চায়, নিজের সসীম সত্তাকে অসীমে মিশাইতে চায় এবং যিনি সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ, সত্য-শিব-সুন্দররূপ, সেই পরম সত্তাতে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হয়।

মানুষের জীবনে চৈতন্য ও জড়ের, আত্মা ও দেহের এই দ্বন্দ্বও যেমন চিরন্তন, তাহার একটা সুষ্ঠু মীমাংসা করিবার প্রচেষ্টাও তেমন বহুযুগব্যাপী ও সর্ব্বতোমুখী। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ তাহার জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে

এবং সর্ব্বস্তরে এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। এজন্যই নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্য, নিজেকে উন্নত করিবার জন্য, দুঃখ, ব্যাধি, জরা ও মরণকে জয় করিবার জন্য কর্ম্মজীবনে মানুষের আপ্রাণ চেষ্টা দেখা যায়। এই কারণেই মানুষের বিজ্ঞান নিচয়ের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে তাহার অদম্য জ্ঞান পিপাসা ও অবিরাম সত্য সন্ধানের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ যেন তাহার সসীম জ্ঞানকে অসীম করিতে চায় এবং প্রকৃতির জড়শক্তিকে পরাভূত করিয়া তাহার উপর সর্ব্বময় কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে ও তাহাকে সম্পূর্ণরূপে নিজের সেবায় নিযুক্ত করিতে চেষ্টা করে। চারুশিল্পের মধ্য দিয়া মানুষ তাহার অরূপ সত্তাকে রূপ দিতে চায়, অতীন্দ্রিয় সত্তাকে ইন্দ্রিয়গোচর করিবার চেষ্টা করে এবং অনন্ত ও অসীম পরমার্থ তত্ত্বকে দেশ ও কালের সীমার মধ্যে দেখিতে চাহে। আবার তাহার সৌন্দর্য্যানুভূতির মধ্য দিয়া, সত্য, শিব ও সুন্দররূপ ভাগবৎ-সত্তার উপলব্ধি করে। ধর্ম্মকর্ম্মের সাহায্যেও মানুষ তাহার দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির অতীত সর্ব্বভূতান্তরাত্মা সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়িয়া মানুষ নিজেকে বিপন্ন ও অসহায় বোধ করে এবং যে জড়দেহের সহিত তাহার অজড় ও অমর আত্মার আপাত বিরোধ দৃষ্টে বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে, তাহা অতিক্রম করিবার জন্য মানুষ সর্ব্বপ্রকার প্রয়োগ করে।

কিন্তু বাস্তবজীবনে সাংসারিক কর্ম্ম করিয়া বা চারুশিল্পে সৌন্দর্য্যানুভূতির দ্বারা অথবা মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া মানুষ এই চিরন্তন সমস্যার একটা স্থায়ী ও সুষ্ঠু মীমাংসা করিতে পারে না। এসবের মধ্যে মানুষ সাময়িকভাবে তাহার সংসার-বন্ধনের কথা ভুলিয়া পরমাত্মাতে লীন হইবার চেষ্টা করে এবং এক দিব্য-ভাবাবেশের মধ্যে অল্পকালের জন্য তাহার দুঃখ দৈন্য ও দৌর্ব্বল্য বিস্মৃত হইয়া সচ্চিদানন্দ সাগরে নিমগ্ন হয়। কিন্তু অল্পকাল পরেই মানুষ দেখে যে, সে যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই ফিরিয়া আসিয়াছে এবং চিৎজড়ের বিরোধ জন্য অশান্তি ভোগ করিতেছে।

মানুষ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব। এজন্য জীবনের এই চিরন্তন সমস্যার একটা বিচারসঙ্গত দার্শনিক মীমাংসা করিয়া সে উহার চির অবসান ঘটাইবার চেষ্টা করে এবং তাহা না হইলে বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারে না। কিন্তু বিভিন্ন দর্শনে এই সমস্যার বিভিন্ন এবং কোন কোন স্থলে পরস্পর বিরোধী সমাধান করা হইয়াছে। জড়বাদী দার্শনিকগণ জড়শক্তি বা অচিৎ সত্তামাত্রকে পরমার্থ সৎ বলিয়াছেন এবং আত্মা ও আধ্যাত্মিক সত্তা অসৎ, মিথ্যা ও ও মানুষের কল্পনাপ্রসূত আকাশ-কুসুম বলিয়া পরিহার করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। অপরপক্ষে চেতনবাদী বা অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকবৃন্দ আত্মা বা ব্রহ্ম একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা ও মায়াময় এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। দর্শন-শাস্ত্রের ইতিহাসে বর্ণিত এই দুই চরমপন্থী মতবাদ মানুষের সম্পূর্ণ সত্তাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না এবং তাহার জীবনের পূর্ণবিকাশে সহায়তা করে না। জড়বাদীর সিদ্ধান্ত সত্য হইলে মানুষকে তাহার সত্য ধর্ম্ম ও নীতি বর্জ্জন করিয়া নাস্তিক-চূড়ামণি চার্ব্বাকের মত দেহাত্মবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইতে হয় এবং অর্থ ও কাম পরম পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া পশুর ন্যায় দেহেন্দ্রিয় সুখে পরিতৃপ্ত হইতে হয়। অপরদিকে মায়াবাদী দার্শনিকের মত সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে মানুষকে তাহার দেহ ও ইন্দ্রিয়কে নিপীড়ন করিতে হয় এবং তাহার স্বভাবসুলভ প্রবৃত্তিগুলির মূলোচ্ছেদপূর্ব্বক সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় লোকসমাজ পরিত্যাগ করিয়া কঠোর তপশ্চর্য্যায় দিন অতিবাহিত করিতে হয়। কিন্তু এই দুই চরম পন্থার কোনটাই আমাদের চিরন্তন সমস্যার সম্যক ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সমাধান-রূপে মানুষের নিকট আদরণীয় বা গ্রহণীয় হইতে পারে না। কারণ, মানুষের সত্তাতে যে দেহ ও আত্মার একটা সম্মিলন ঘটিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এজন্য জড়বাদীর দেহাত্মবাদ তাহাকে পশুত্বের নিরস্তরে নামাইয়া আনে বলিয়া ঘৃণ্য মনে হয়, আবার চেতনবাদীর মায়াবাদ বা শূন্যবাদ অতি নীরস ও নিরর্থক বলিয়া উপেক্ষণীয় হইয়া পড়ে। অতএব মানুষ এই সমস্যার এমন একটা দার্শনিক সমাধান চায় যাহাতে তাহার দেহ বা আত্মার কোনটিকেই বলি না দিয়া উহাদের সুসমঞ্জস মিলন হইতে পারে এবং কর্ম্মে ও চিন্তায় আমাদের জীবন দ্বিধাবিভক্ত হইয়া না পড়ে।

শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবন (The Life Divine) নামক গ্রন্থে ঠিক এইরূপ একটী মনোজ্ঞ ও যুক্তিযুক্ত সমাধানের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি প্রথমেই এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন যে দেহ ও আত্মার বিরোধ মিটাইতে হইলে কোন চরমপন্থী মতবাদের আশ্রয় গ্রহণ করা চলে না, কারণ তাহাতে এই বিরোধের একরূপ আপোষ-নিষ্পত্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু কোন স্থায়ী বা চূড়ান্ত মীমাংসা হয় না। যে কোন বিষয়েই হউক না কেন, দুইটী প্রতিপক্ষের মধ্যে প্রকৃত মিলন স্থাপন করিতে হইলে উহাদের একপক্ষকে অন্যপক্ষের কথা বুঝিতে হইবে এবং তাহার অন্তর্ভাবের গুণগ্রাহী হইতে হইবে। চিৎ ও জড়ের প্রকৃত মিলন ঘটাইতে হইলে উহাদের যথাসম্ভব সাদৃশ্য ও সমত্ব দেখাইতে হইবে, কারণ এইরূপেই তাহাদের তাদাত্ম্য ও একাত্মত্ব প্রতিপাদিত হইবে। যদি এইভাবে আমরা জড় ও চেতনের দেহ ও আত্মার প্রকৃত মিলন সম্পাদন করিতে পারি তবেই উহাদের আপাত-বিরোধের চির-অবসান ঘটিতে পারে এবং আমাদের জীবনেও কোন বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়া তাহার স্বচ্ছন্দ গতিকে বাধা দিতে পারে না।

শ্রীঅরবিন্দ যে বিশ্বচেতনার ((Cosmic consciousness) কথা বলিয়াছেন তাহার মধ্যেই চিৎ ও জড়ের বা পুরুষ ও প্রকৃতির প্রথম মিলনক্ষেত্র দৃষ্ট হয়। কারণ, এই বিশ্বচেতনায় চৈতন্যময় পুরুষ বা আত্মা জড়প্রকৃতির নিকট পরমার্থ সৎ বলিয়া প্রতিভাত হয় এবং আত্মার নিকটও প্রকৃতি বা জড় পদার্থ বাস্তব সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। অবশ্য বিশ্বচেতনা বলিয়া কোন সত্তা আছে কিনা তাহা বিচার্য্য। কিন্তু একথা ঠিক যে দার্শনিক দৃষ্টিতে "বিশ্বচেতনা" একটা অসম্ভব বা অসঙ্গত কথা নয়। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ এক বিশ্বব্যাপী শক্তির খেলা ও উহারই ক্রমবিকাশ। এখন কথা হইতেছে যে এই বিশ্বব্যাপী শক্তি কি এবং উহার মূল বা উৎস কোথায়? একটু স্থির মনে চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে যে, যে শক্তির ক্রমপরিণামে পঞ্চভূত, প্রাণ ও সচেতন মনের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার মূলে কোন চৈতন্যময় সত্তা বিদ্যমান আছে, নিছক জড় শক্তি হইতে মন বা প্রাণের উৎপত্তি সম্ভব নহে। আবার জড়ের ক্রিয়া যে চেতনের অধীন তাহা আমরা অহরহ দেখিতেছি। সকলেই জানেন যে সারথী ব্যতীত রথ চলে না, বীণাপাণি ব্যতীত বীণা আপনি বাজে না, চক্রধারী ব্যতীত চক্র ঘুরে না। তবেই স্বীকার করিতে হয় যে জড়শক্তি চেতনাধিষ্ঠান, চেতনাধীন ও চেতনা-পরিচালিত। যেখানেই শক্তির খেলা দেখা যায় সেখানেই চৈতন্য অধিষ্ঠানরূপে বা প্রভবস্থানরূপে বিদ্যমান আছে বুঝিতে হইবে। বিজ্ঞানসম্মত এক বিশ্বব্যাপী শক্তির মূলে যে চিৎশক্তি বিদ্যমান এবং উহা যে চিৎশক্তিরই স্থূল প্রাকৃতিক বিকাশমাত্র তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, জড় জগতের সত্তা চৈতন্য সত্তায় প্রতিষ্ঠিত এবং উহা এক চৈতন্যময় পুরুষের শক্তি বা ক্রিয়া। আপাতদৃষ্টিতে বা স্থূলবুদ্ধিতে প্রকৃতি ও পুরুষের বিরোধ সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইলেও বিচারবুদ্ধি ও সম্যক্ দৃষ্টির সাহায্যে বেশ বুঝা যায় যে তথাকথিত জড়-প্রকৃতি চেতন পুরুষের চিৎ-শক্তির স্থূল প্রকাশ এবং অরূপ ও অমূর্ত্ত আত্মার রূপধারণ ও মূর্ত্তি পরিগ্রহের প্রক্রিয়ামাত্র।'

শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার "দিব্যজীবনে" যে এক সর্ব্বময় ও সর্ব্বব্যাপী পরমার্থ সত্যের (Omnipresent Reality) ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাই আত্মা ও অনাত্মা, চিৎ ও জড়ের চিরমিলন-মন্দিরের সুদৃঢ় ভিত্তি। এই পরমতত্ত্ব সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ, বুদ্ধির অগম্য ও বেদান্ত প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম। মূল ও প্রাচীন বেদান্তে অর্থাৎ উপনিষদে ইঁহার যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে শ্রীঅরবিন্দ তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি প্রচলিত ও শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিতে পারেন না। তাঁহার মতে উপনিষদ্ প্রতিপাদ্য অদ্বৈতবাদই প্রকৃত অদ্বৈত ও একতত্ত্ববাদ। ইহাতে সকল বস্তুকেই ব্রহ্মরূপ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে এবং ব্রহ্মের অধিচ্ছেদ্য সত্তাকে, সত্য ও মিথ্যা, ব্রহ্ম ও অব্রহ্ম, আত্মা ও অনাত্মা বা সদ্রূপ আত্মা ও অসদ্রূপী চিরন্তনী মায়া, এরূপ দুইটী পরস্পরবিরোধী বস্তুতে বিভক্ত করা হয় নাই। ব্রহ্মসত্তা কুত্রাপি বাধিত হয় না। অভাবরূপ অসৎ ও ভাবরূপ জগৎ সেই এক ব্রহ্মসত্তারই রূপান্তর বা ভাবান্তর মাত্র। প্রকাশমান বিশ্বরূপে তাঁহার যে সর্ব্বোত্তম অনুভূতি আমাদের হইতে পারে তাহাতে তাঁহাকে সচেতন স্বপ্রকাশ সত্তা, পরমা শক্তি

ও স্বপ্রতিষ্ঠ আনন্দ-স্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। আবার এই বিশ্বকে অতিক্রম করিয়া তিনিই যে এক অজ্ঞেয় সত্তা এবং অনির্ব্বাচ্য ও নিরতিশয় আনন্দরূপে বিরাজমান তাহাও বুঝা যায়।

যদি কোন সুধী ব্যক্তি স্থিরদৃষ্টিতে এই বিশ্ব-সংসার অবলোকন করেন, তবে তিনি বেশ বুঝিতে পারিবেন যে ইহা এক অনাদি, অনন্ত ও অফুরন্ত শক্তির সীমাহীন দেশ ও কালের বুকে অবিরাম গতি ও অনন্ত বিস্তৃতি। এ অনন্ত শক্তি কোথা হইতে আসিল? বেদান্তশাস্ত্র বলিয়াছেন এবং আমাদের বিচারবুদ্ধি দ্বারাও আমরা বুঝিতে পারি যে উহা এক দেশকালাতীত, নিষ্ক্রিয়, অব্যয় ও অক্ষর সত্তার এক পাদ বা অংশমাত্র। এই সত্তা নিষ্ক্রিয় হইয়াও সকল ক্রিয়ার আধার; সংখ্যা, গুণ ও রূপ বর্জ্জিত, অনির্ব্বাচ্য ও অনির্দ্দেশ্য। উহাই পরমার্থ সন্মাত্র ও আমাদের বুদ্ধির অগম্য। যে বিশ্বব্যাপী শক্তির কথা এখানে বলা হইয়াছে তাহা এই পরম সত্তাকে বক্ষে ধারণ করিয়া আছে, আবার তাহার মধ্যেই আছে এবং তাহারই স্বরূপ। অতএব দেখা যাইতেছে যে সত্তা ও শক্তি, ভাব ও ভব (Being and Becoming), ব্রহ্ম ও জগৎ, শিব ও কালী এই দুই পরমতত্ত্ব আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয়। এই পরমাশক্তি জড়শক্তি নহে, উহা চিৎশক্তি, সচেতন তেজঃস্বরূপ এবং চিদ্‌বিলাসমাত্র।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে নিষ্ক্রিয় পরমার্থ সত্তাতে কোন ক্রিয়া সম্ভব নহে, তথাপি উহার ক্রিয়া সম্বন্ধ কিরূপে এবং কি কারণে ঘটিল? তবে তাহার উত্তরে বলিতে হইবে যে ক্রিয়া বা শক্তি সত্তার অন্তর্নিহিত ও উহাতে সমবেত। অতএব 'ক্রিয়া সম্বন্ধ কিরূপে ঘটিল' এ প্রশ্ন হইতে পারে না, যেমন 'জল কিরূপে তরল হইল' এ প্রশ্ন উঠে না। অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা শক্তি যেমন অভিন্ন, ব্রহ্ম ও শক্তি, শিব ও কালী, তেমনই এক, অভিন্ন ও অবিনা-ভাবাপন্ন। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের মতাবলম্বন করিয়া শ্রীঅরবিন্দ উল্লিখিত প্রশ্নটীর প্রথমাংশের এইরূপ উত্তর দিয়াছেন এবং উহা আমাদেরও গ্রহণীয়। এখন প্রশ্নের শেষ অংশটীর উত্তর কি হইবে তাহা বিবেচনীয়। কারণ, কোন বস্তুতে কোন শক্তি নিহিত থাকিলে উহা সক্রিয়ও হইতে পারে অথবা নিষ্ক্রিয় ও সুপ্তও থাকিতে পারে, যেমন সমুদ্রের জল স্থিরও থাকিতে পারে, আবার উদ্দাম তরঙ্গ-ভঙ্গে প্রবাহিতও হইতে পারে। অতএব ব্রহ্মে চিৎশক্তি নিহিত থাকিলেও উহার গতি বা সক্রিয় ভাবের একটী কারণ দর্শাইতে হইবে। শক্তি ব্রহ্মে চিরনিদ্রিত না থাকিয়া ক্রিয়াশীল ও সৃষ্টিমুখী হইল কেন? ইহার উত্তরে অবশ্য বলা যায় যে ব্রহ্ম স্বীয় প্রকৃতি বা শক্তির অধীন হইয়া অবশভাবে কর্ম্মনিবদ্ধ ও গতিশীল হইয়াছেন। তান্ত্রিক ও মায়াবাদীরা ঈশ্বর সম্বন্ধে এইরূপ কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু পরম ব্রহ্ম এরূপ মায়াধীন ঈশ্বরতত্ত্ব নহেন। তিনি নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, চৈতন্য-স্বরূপ এবং তাঁহার মায়া বা ক্রিয়াশক্তিরও অধীন নহেন। জগদ্রূপে তিনি তাঁহার শক্তি ব্যক্তও করিতে পারেন অথবা অব্যক্ত ও সুপ্তভাবেও রাখিতে পারেন। তাঁহার জীবও জগদ্রূপে প্রকাশিত হওয়া বা না হওয়ার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। এমত অবস্থায় যদি তিনি তাঁহার শক্তিকে নামরূপের মধ্য দিয়া জগদাকারে প্রকট করেন, তবে তাহার একমাত্র কারণ হইতে পারে—তাঁহার আনন্দের উচ্ছ্বাস বা স্বতঃস্ফূরণ। বেদান্তে যে পরব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে তিনি সন্মাত্র নহেন, চিন্মাত্রও নহেন; কিন্তু সৎ, চিৎ, আনন্দস্বরূপ। যে চৈতন্যময় পরমসত্তা কুত্রাপি কোন বাধা প্রাপ্ত হয় না এবং যাহা দেশ, কাল ও কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে, তাহা স্বভাবতঃই আনন্দময় হইবে। যে চিৎসত্তা সর্ব্বনিরপেক্ষ ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তাহা আনন্দময় সত্তা এবং এই দুই কথা একই বস্তুর নামান্তর মাত্র। আমাদের জীবনেও দেখি যে যখন উহার স্বচ্ছন্দগতি কোনরূপ বাধা প্রাপ্ত হয়, তখনই আমরা অতৃপ্তি ও দুঃখ ভোগ করি। আবার যখন জীবনে কোন বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হয় না তখন কোন অসুখ বা অসন্তুষ্টি বোধ হয় না। আরও দেখা যায় যে জীবনে আমরা যতটা বন্ধনমুক্ত হইতে পারি ততটাই সুখ ও সন্তোষ লাভ করিতে পারি। ইহার কারণ হইতেছে যে আমাদের পারমার্থিক সত্তা এক আনন্দময় সত্তা এবং সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মানন্দের সীমা নাই, শেষ নাই, আদি নাই, অন্ত নাই। সমুদ্রের জলে যে সব তরঙ্গ উঠে ও পড়ে তাহা গণনা করা সম্ভব হইলেও সচ্চিদানন্দ সাগরে অসংখ্য বিশ্বরূপে যে আনন্দ-লহরী অনন্ত কাল ধরিয়া উঠিতেছে ও পড়িতেছে তাহার

সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না। ব্রহ্মানন্দের এই স্বতঃস্ফূর্তি, স্বচ্ছন্দগতি এবং অনন্ত অভিব্যক্তিই ব্রহ্মের চিৎশক্তিকে ক্রিয়াশীল ও সৃজনমুখী করে এবং তাহাকে অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-রূপে প্রকাশিত করে। অতএব আমরা বলিতে পারি যে ব্রহ্মানন্দের অবাধ স্ফুরণ এবং উহার নানা ভঙ্গিমায় লীলার উদ্দেশ্যই সৃষ্টিতত্ত্বের মূল রহস্য।

শ্রীঅরবিন্দের ব্রহ্মবাদে মানব-জীবনের চিরন্তন সমস্যার একটা সুষ্ঠু ও হৃদয়গ্রাহী সমাধান করা হইয়াছে মনে হয়। ইহার আলোকে আমরা দেখিতে পাই যে জড় ও চেতন সত্তা দুই বৈরীভাবাপন্ন বা পরস্পর-বিরোধী বস্তু নহে, পরন্তু উহারা একই সত্তার দুইটী বিভিন্ন কিন্তু সমভাবাপন্ন ও পরিপূরক দিক্ বা অংশ বিশেষ। এই দুয়ের মধ্যে একই ব্রহ্মসত্তা ভিন্ন ভিন্ন রূপে ও আকারে বিরাজমান আছেন। তথাকথিত জড় বা অচিৎ সত্তার মধ্যে চৈতন্যময় আত্মা রূপ ও দেহ পরিগ্রহ করিয়াছেন এবং চিৎসত্তা জড়ের অন্তর্নিহিত সত্তা, সারতত্ত্ব ও আত্মারূপে প্রকাশিত আছেন। এরূপ দৃষ্টিতে পরস্পর পরস্পরকে দিব্য ও সদরূপ বলিয়া স্বীকার করিতে পারে এবং উভয়েই যে মূলে এক তাহা বুঝিতে পারে। মন ও প্রাণ পরমাত্মার প্রকাশের যুগপৎ রূপও বটে, পত্রবরূপও বটে। ইহাদের সাহায্যে যেন তিনি জড়ের আকার ধরিয়াছেন এবং নিজেকে বহু জীবাত্মার নিকট প্রকট করিতেছেন। মন যখন বিশুদ্ধ হইয়া বিমল আদর্শের ন্যায় বিশ্বরূপে প্রকাশমান পারমার্থিক তত্ত্বকে প্রতিফলিত করে, তখনই তাহার চরম পূর্ণতা লাভ হয় এবং প্রাণ যখন সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া বিশ্বের অগণন ও নিত্য নূতন ব্যাপারের মধ্য দিয়া ভাগবৎসত্তার প্রকাশে সহায়তা করে, তখনই তাহার চরমোৎকর্ষ ঘটে। মানুষ যখন অন্তরে দিব্য শান্তভাব পোষণ করিয়া সানন্দে ও নিরহঙ্কারে অশেষ কর্ম সম্পাদন করিতে পারে তখনই তাহার চরমোন্নতি হয়। মুক্তি বা মোক্ষ বলিতে সর্বকর্ম ত্যাগ ও সর্ববিষয়ে ঔদাসীন্য বুঝায় না। অন্তরের শান্তি ও আত্মার কৈবল্যভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যিনি নিষ্কামভাবে সর্বকর্ম করিতে পারেন, উপেক্ষা, মৈত্রী, করুণা ও মুদিতা এসব দিব্যভাবের অধিকারী হইয়াছেন এবং সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ সত্য-শিব-সুন্দররূপ পরব্রহ্মে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়া জীব ও জগতের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন তিনিই প্রকৃত মুক্তপুরুষ এবং তাঁহার মুক্তিই যথার্থ মুক্তি।

জাগ্রত নারায়ণ

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

আলোড়নহীন ক্ষীরোদ-সিন্ধু শুভ্র অতলে,
সর্প-শয়নে নিদ্রিত নারায়ণ।
নীরব শংখ, নিষ্ক্রিয় গদা, নিমীলিত শতদল,
ঘূর্ণন-হীন হাতের সুদর্শন।

কবে জাগ্রত হবে নারায়ণ? সে কথা জানিনা মোরা,
শুনিতেছি শুধু অসুরের কোলাহল।
চোখের সামনে কাঁদিছে আঁধারে কৃষ্ণা রাত্রি ঘোরা,
নীরবে অমর ফেলিছে অশ্রু-জল।
কাঁদিছে রাত্রি, কাঁদিছে আর্তি, কাঁদিছে ব্যর্থ আশা,
দিকে দিকে ওই কাঁদিছে সর্বহারা!
কঠোর-কণ্ঠে হাঁকিছে দৈত্য, উচ্চারি দুর্ভাষা।
মহাশংকায় কাঁপিয়া উঠিছে কা'রা?

শংকিত-বুকে পুঞ্জিয়া উঠে ক্ষোভের বাষ্পরাশি,
দেখা দেয় দূরে সংকেত ঝটিকার।
মেঘের আড়ালে লুপ্ত হয়েছে চন্দ্রতারার হাসি
ফেলে নিঃশ্বাস গভীর অন্ধকার।
মানব-হৃদয়-সিন্ধু-শয়নে সুপ্ত কি নারায়ণ?
লুপ্ত কি তাঁর অভয়-প্রদাতা হাত?
নিষ্ঠুর-লোভে নিপীড়িত ক্ষোভে বুকে বুকে ক্রন্দন
সৃজিছে যে আজি কঠিন দুঃখ-রাত!

মাভৈঃ দেবতা, মাভৈঃ ধরার লাঞ্ছিত যত নর।
নব-তরংগে জাগিছে আন্দোলন
জাগিছে শংখ, জাগিছে চক্রী, জাগিছে শুভংকর
হৃদয়ে হৃদয়ে জাগ্রত নারায়ণ।

কালের মন্দিরা

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অশ্বচোর

ভূমিনিবদ্ধ দৃষ্টি তুলিয়া সুগোপা চমকিয়া দেখিল, এক পুরুষ দেবদারু ছায়ার তলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কখন এই অপরিচিত আগন্তুক নিঃশব্দ পদে তাহাদের অত্যন্ত সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহারা জানিতে পারে নাই।

সুগোপা বলিয়া উঠিল—'কে তুমি?'

আগন্তুক উত্তর করিল—'পথিক। তুমি প্রপানালিকা? জল দাও।'

সুগোপা পথিককে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল। আগন্তুক যে বিদেশী তাহা তাহার বেশভূষা দেখিয়া সন্দেহ থাকে না। একটি জীর্ণ লৌহজালিকে ঊর্ধ্বাঙ্গ আবৃত, মস্তকেও অনুরূপ লৌহজালিকের শিরস্ত্রাণ। কটিতে চর্ম-কোষবদ্ধ তরবারি, পরনের স্থূল বৃষচর্মের পাদুকায় চর্মরজ্জু দ্বারা আবদ্ধ। দেহে কোথাও মাংসের বাহুল্য নাই, বরং দৈর্ঘ্যের অনুপাতে ঈষৎ কৃশ। সমস্ত মিলাইয়া ছিলা-হীন ধনু-দণ্ডের মত দেহ ঋজু ও নমনীয়; কিন্তু মনে হয়, প্রয়োজন হইলে মুহূর্ত মধ্যে গুণসংযুক্ত হইয়া প্রাণঘাতী আকার ধারণ করিতে পারে।

আগন্তুকের বয়ঃক্রম অনুমান করা কঠিন, তবে ত্রিশ বৎসরের অধিক নয়। মুখাবয়বের মধ্যে চক্ষু ও নাসা অতিশয় তীক্ষ্ণ। ভ্রূনিরুদ্ধ চক্ষুর দৃষ্টিতে একটা সতর্ক দুঃসাহসিকতা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। বাহুবল ও কূটবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া যাহাদের জীবনযাপন করিতে হয়, তাহাদের চক্ষে এরূপ দৃষ্টি বোধকরি স্বভাবসিদ্ধ হইয়া পড়ে।

ফলতঃ আগন্তুক যে একজন যুদ্ধজীবী তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তাহার মুখে ও বাহুতে অগণিত সূক্ষ্ম ক্ষতরেখা দেখিয়া এই অনুমান দৃঢ় হয়। ছিন্ন লৌহ-জালিকের ফাঁকে বক্ষের উপরেও বহু রেখা অঙ্কিত রহিয়াছে, দেখিলে মনে হয় গৌরবর্ণ ত্বকের উপর কজ্জল দিয়া কেহ রেখাগুলি আঁকিয়া দিয়াছে। উপরন্তু ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে গোলাকৃতি তিলকের ন্যায় একটি তাম্রবর্ণ চিহ্ন আছে। ইহা ক্ষতচিহ্ন অথবা সহজাত জড়ুল তাহা নির্ণয় করা যায় না।

সুগোপা ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে আগন্তুককে দেখিয়া লইয়া জল আনিবার জন্য কুটীর অভিমুখে প্রস্থান করিল। আগন্তুক মন্থরপদে আসিয়া তাহার পরিত্যক্ত শিলাপট্টের উপর বসিল। তাহার বসিবার ভঙ্গীতে একটু ক্লান্তভাব প্রকাশ পাইল।

মোঙ্ এতক্ষণ কৌতূহল সহকারে নবাগন্তুককে দেখিতেছিল; এখন বলিল—'তুমি দেখিতেছি বিদেশী। তোমার দেশ কোথায়?'

বিদেশী উত্তর না দিয়া এমনভাবে হস্ত সঞ্চালন করিল, যাহাতে গান্ধার হইতে পুণ্ড্রবর্ধন পর্যন্ত যে-কোনও দেশ হইতে পারে।

মোঙ্ আবার প্রশ্ন করিল, 'তুমি যুদ্ধ ব্যবসায়ী?'

বিদেশী সতর্ক দৃষ্টি তাহার দিকে ফিরাইয়া তাহাকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল, তারপর সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল।

মোঙের জেরজনিবৎ ব্যঙ্গহাস্য আবার উথিত হইল—'ভাগ্য দেবতা দেখিতেছি তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন নয়; অস্ত্রক্ষত ছাড়া যুদ্ধ ব্যবসায়ে আর কিছু লাভ করিতে পার নাই। কোন রাজ্যের সেনাভুক্ত ছিলে?'

বিদেশী এবারও উত্তর দিল না, ঊর্ধ্বদিকে তাকাইয়া যেন অন্যমনস্ক রহিল। মোঙের কৌতূহল উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল, সে অতঃপর গাম্ভীর্য অবলম্বনপূর্বক পৌরুষ সহকারে বলিল—'যুবক, তুমি এ রাজ্যে নূতন আসিয়াছ, বোধহয় জান না ইহা হূণ অধিকৃত। মহাপরাক্রান্ত হূণ

কেশরী রোট ধর্মাদিত্য এই বিটঙ্ক রাজ্যের অধীশ্বর। আমিও হূণ। হূণগণ বিজাতীয়ের স্পর্ধা সহ্য করে না। তোমার নাম কি?'

যুবকের স্বল্প গুম্ফের অন্তরালে একটু হাসি দেখা দিল; সে বলিল—'আমার নাম চিত্রক।'

'চিত্রক! চিতা বাঘ!' মোঙের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—'তোমার নাম সার্থক বটে, তোমার সর্বাঙ্গে অস্ত্রাঘাত চিহ্ন দেখিয়া তোমাকে চিতা বাঘ বলিয়াই মনে হয়। এরূপ নাম কেবল হূণদের মধ্যেই ছিল—সিংহ শূকর নাগ বৃষ—যাহার যেরূপ আকৃতি প্রকৃতি সে সেইরূপ নাম গ্রহণ করিত। এখন আর কিছু নাই—' সখেদ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আগ্রহভরে মোঙ্ বলিল,—'তুমি বয়সে নবীন, কিন্তু নিশ্চয় অনেক যুদ্ধ করিয়াছ! বহু নগর লুণ্ঠন করিয়াছ। এই বিটঙ্ক রাজ্য একদিন আমরা—কিন্তু এদেশে যুদ্ধবিগ্রহ আর হয় না। মেষপাল কাহার সহিত যুদ্ধ করিবে? পঁচিশ বৎসর পূর্বে একদিন ছিল—'

যুবক জিজ্ঞাসা করিল—'কপোতকূট এখান হইতে কত দূর?'

মোঙ্ বলিল—'তুমি কপোতকূট যাইবে? অধিক দূর নয়, ছদণ্ডের পথ। এক প্রহর এখানে বিশ্রাম করিয়া যাত্রা করিলেও সন্ধ্যার পূর্বে রাজধানী পৌঁছিতে পারিবে। তোমার অশ্ব নাই দেখিতেছি, হূণ যোদ্ধা কিন্তু অশ্ব বিনা এক পা চলে না। উষ্ট্র রোমের শিবির এবং অশ্বের পৃষ্ঠ—হূণের ইহাই বাসস্থান। পঁচিশ বৎসর পূর্বে আমরা বারশ সহস্র অশ্বারোহী—'

সুগোপা মৃৎপাত্রে জল লইয়া ফিরিয়া আসিল, সুতরাং মোঙের গল্পে বাধা পড়িয়া গেল। পথিক সত্যই তৃষ্ণার্ত ছিল, সে সাগ্রহে উঠিয়া আসিয়া প্রথমে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিল, তারপর গণ্ডূষ ভরিয়া তৃপ্তিসহকারে জল পান করিল। সুগোপা তাহার অঞ্জলিতে জল ঢালিয়া দিতে দিতে মোঙের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া বলিল—'মোঙ্, আর বিলম্ব করিও না, দাঁতন লইয়া গৃহে ফিরিতে বিলম্ব হইলে তোমার নাগসেনা দাঁতনের পরিবর্তে তোমার মুণ্ডটি চিবাইবে।'

মোঙ্ চকিতভাবে ঊর্ধ্বে চাহিল, সূর্যদেব মধ্য গগন অতিক্রম করিয়া পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছেন। মোঙ্ শঙ্কিতমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল; জঙ্গলের মধ্যে করঞ্জ কাষ্ঠ অন্বেষণ করিতে সময় লাগিবে, তারপর গৃহে ফিরিবার পথও অনেকখানি। বৃদ্ধ বয়সে দ্রুত ফিরিবার শক্তি নাই, নাগসেনার সম্মুখে ফিরিয়া যাইতে হয়তো সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। সেটা মোঙের পক্ষে সুখকর হইবে না। পারিবারিক ব্যাপারে যুদ্ধবিগ্রহ মোঙ্ ভালবাসে না।

পঁচিশ বৎসর পূর্বেকার বীরত্ব কাহিনীটা আগন্তুককে শুনাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না। মোঙ্ গাত্রোত্থান করিল; কাহাকেও কোনও সম্ভাষণ না করিয়া ক্ষুব্ধ অস্পষ্ট স্বরে তরবারির নখ, ঘোড়ার ক্ষুর ও স্ত্রীজাতির কটাক্ষ সম্বন্ধীয় প্রবাদ বাক্যটা আবৃত্তি করিতে করিতে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল।

এদিকে তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া চিত্রক আবার শিলা-পীঠের উপর বসিয়াছিল। সুগোপা দেখিল, সে দুই জানুর উপর কফোনি রাখিয়া মুষ্টিবদ্ধ হস্তের পৃষ্ঠে চিবুক ন্যস্ত করিয়া স্থিরনেত্রে তাহার পানে চাহিয়া আছে। হঠাৎ সুগোপা একটু অস্বস্তি অনুভব করিল। সে মাসের পর মাস একাকিনী এই জনশূন্যে দিন কাটায়, কত পথিক আসে যায়; কেহ নবীনা প্রগাঢ়যৌবনাকে দেখিয়া দুটা রঙ্গ পরিহাসের কথা বলে, সুগোপা চটুলকণ্ঠে তাহার উত্তর দেয়; কেহ বা প্রগল্‌ভতার সীমা অতিক্রম করিলে দুই চারিটি কঠিন বাক্যবাণে জর্জরিত করিয়া তাহাকে অধোবদনে বিদায় করে। কোনও অবস্থাতেই সুগোপার আত্মপ্রত্যয় বিচলিত হয় না। কিন্তু আজ এই জীর্ণবেশ বিদেশী যুবকের নিষ্পলক চাহনি তাহাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল।

স্খলিত নিচোলপ্রান্ত বুকের উপর টানিয়া দিয়া সুগোপা বলিল—'তুমি তো কপোতকূটে যাইবে, তবে বিলম্ব করিতেছ কেন?'

চিত্রক তেমনিভাবে চাহিয়া থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল—'শ্রান্তি দূর করিতেছি। আমার ত্বরা নাই।'

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল; চিত্রকের অচঞ্চল দৃষ্টি সুগোপার উপর বিন্যস্ত হইয়া আছে। সুগোপা ক্রমে অধীর হইয়া উঠিল, ঈষৎ রুক্ষস্বরে কহিল—'তুমি কোন্ বর্বর দেশের মানুষ—স্ত্রীলোক কখনও দেখ নাই?'

এইবার চিত্রক সুগোপার মুখ হইতে দৃষ্টি সরাইয়া সাবধানে চারিদিকে চাহিল। তাহার অধরোষ্ঠ একবার

সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইল। তারপর আবার মুষ্টির উপর চিবুক রাখিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল—'স্থানটি বেশ নির্জন।'

এই অসংলগ্ন উত্তরে সুগোপা রহস্যভাবে অধর দংশন করিল, তারপর ভূমি হইতে চলপাত্র তুলিয়া লইয়া কুটীরের দিকে চলিল।

—'তুমি সুন্দরী এবং যুবতী।'

সুগোপা চকিতে গ্রীবা বাঁকাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। চিত্রকের কণ্ঠস্বরের সমতা বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না, সে পুনশ্চ বলিল—'তুমি সুন্দরী এবং যুবতী। এই জনহীন স্থানে একাকিনী থাকিতে তোমার ভয় করে না?'

ভ্রূভঙ্গ করিয়া সুগোপা বলিল—'ভয়! কিসের ভয়?'

'বনে হিংস্র জন্তু আছে!'

'হিংস্র জন্তুকে আমি ভয় করিনা।'

'আর—মানুষকে?'

'মানুষ দুষ্টতা করিলে আমার অস্ত্র আছে।'

'কী অস্ত্র?'

সুগোপা তর্জনী তুলিয়া কুটীরের প্রাঙ্গণ দেখাইল। চিত্রক ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে একটি লম্বার্জনী রহিয়াছে। তাহার কণ্ঠে একটু নীরস হাস্যধ্বনি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। সে বলিল—'তুমি সাহসিকা বটে। কিন্তু অস্ত্রের দ্বারা লোলুপ পুরুষকে নিবারণ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয়?'

'হয়।' অস্পষ্টস্বরে এই কথাটি বলিয়া সুগোপা আবার কুটিরের দিকে পা বাড়াইল। কিন্তু তাহাকে এক পদের অধিক অগ্রসর হইতে হইল না।

চিত্রক এতক্ষণ নিতান্ত নিশ্চেষ্ট ভঙ্গিতে বসিয়াছিল, এখন সহসা বন্য বিড়ালের মত লম্ফ দিয়া সুগোপার সম্মুখে দাঁড়াইল, তাহার মুখের অত্যন্ত নিকটে মুখ লইয়া গিয়া বলিল—'দাহসিনী, এখন কোন অস্ত্র ব্যবহার করিবে?' তাহার কণ্ঠস্বরে গভীর ব্যঙ্গের সহিত গভীরতর একটা উত্তেজনার আভাস ঘুরিত হইয়া উঠিল।

সত্রাস চক্ষু তুলিয়া সুগোপা দেখিল, চিত্রকের দুই চক্ষু হীরকখণ্ডের মত জ্বলিতেছে, তাহার ললাটস্থ তাম্রবর্ণ চিহ্নটা রক্ত তিলকের মত লাল হইয়া উঠিতেছে। সুগোপা ক্ষণকাল স্তম্ভিতবৎ থাকিয়া বলিল—'পথ ছাড়, বর্বর।'

'যদি না ছাড়ি?'

সুগোপা অসহায় নেত্রে চারিদিকে চাহিল। এই সময়, যেন তাহার বিভ্রান্ত উৎকণ্ঠার সাক্ষাৎ প্রত্যুত্তর স্বরূপ শিলাকঙ্করপূর্ণ পথের উপর দ্রুত অশ্বের আস্ফালিত ধ্বনি শুনা গেল। পরক্ষণেই একটি সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে উচ্চ আহ্বান আসিল—

'সুগোপা! সুগোপা!'

চিত্রক সুগোপার পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণেক পরে অশ্বারোহীকে দেখা গেল; বিদ্যুতের মত দ্রুতগতি অশ্ব পথ হইতে দেবদারু বৃক্ষের তলে আসিয়া দাঁড়াইল। আরোহী এক লম্ফে ভূমিতে অবতরণ করিতেই সুগোপা ছুটিয়া গিয়া তাহাকে দুই বাহুতে জড়াইয়া ধরিল।

অশ্বারোহীর বয়স অধিক নয়, কিশোর বলিলেই হয়; মুখে অঙ্গুলের চিহ্নমাত্র নাই। মস্তকে উজ্জ্বল ধাতুনির্মিত উষ্ণীষ, বক্ষে বর্ম, পৃষ্ঠে ধনু ও তূণীর। অপরূপ সুন্দর আকৃতি, দেখিয়া মনে হয় দেব-সেনাপতি কিশোর-কার্তিকের শত্রু বিজয়ে বাহির হইয়াছেন।

তরুণ বীর প্রফুল্ল রক্তাধরে হাসিয়া বলিল 'সুগোপা, কী হইয়াছে সখি?'

সুগোপার মন হইতে ক্ষণিক বিপন্নতার সমস্ত গ্লানি মুছিয়া গিয়াছিল, সে গদ্‌গদ আনন্দের স্বরে বলিল—'কিছু না—ঐ বিদেশী গ্রামিকটা প্রগল্‌ভতা করিয়াছিল মাত্র। এস—ঘরে এস। শিকারে বাহির হইয়াছিলে বুঝি? গাল দুটি যে রৌদ্রে রাঙা হইয়া গিয়াছে।'

চিত্রক ইতিমধ্যে নিঃশব্দে সরিয়া গিয়া দেবদারু বৃক্ষের কাণ্ডে এক হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অন্য হস্তটি অবলোম্বিত তরবারির উপর ন্যস্ত ছিল। তরুণ ঈষৎ বিস্ময়ে তাহার দিকে দৃষ্টি ফিরাইল। ক্ষণিকের জন্য উভয়ের চক্ষু মিলিত হইল। তারপর অবজ্ঞাপূর্ণ তাচ্ছিল্যের সহিত অশ্বের বল্গা চিত্রকের দিকে নিক্ষেপ করিয়া সুকুমার কান্তি তরুণ বলিল—'আমার অশ্ব রক্ষা কর—পারিতোষিক পাইবে।' বলিয়া সুগোপার কটি বাহুবেষ্টিত করিয়া হাসিতে হাসিতে কথা কহিতে কহিতে কুটীরের দিকে চলিল।

সুগোপা সোহাগ-বিগলিত-কণ্ঠে বলিল—'তুমি যে এই নিভৃত স্থানে আমাকে দেখা দিতে আসিবে তাহা আমার সকল দুরাকাঙ্ক্ষার অতীত।'

তরল হাসিয়া তরুণ বলিল—'প্রপাপালিকা কিরূপ কর্তব্য পালন করিতেছে ; রাজপক্ষ হইতে তাহাই পরিদর্শন করিতে আসিলাম।'

তাহারা কুটীর মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেলে চিত্রক ধীরে ধীরে অশ্বের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। সুন্দর কাম্বোজীয় অশ্ব, প্রস্তর মূর্তির মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মধুপিঙ্গলবর্ণ ত্বকে চীনাংশুকের মসৃণতা, গ্রীবায় চামর মুক্তামালায় মণ্ডিত, পৃষ্ঠে কোমল রোমাবলি নির্মিত আসন, বল্গার রজ্জু স্বর্ণালঙ্কৃত।

চিত্রক অশ্বের গ্রীবায় একবার লঘু স্পর্শে হাত বুলাইল, অশ্ব আপ্যায়িত হইয়া নাসা মধ্যে ঈষৎ হর্ষসূচক শব্দ করিল। চিত্রক তখন সঙ্কুচিত সতর্ক চক্ষে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। নিস্তব্ধ অপরাহ্ণ ; কেবল কুটীরের অভ্যন্তর হইতে মাঝে মাঝে কলহাস্যের ধ্বনি প্রকৃতির বৈকালী তন্দ্রালসতা বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছে। পথে জনমানব নাই।

চিত্রকের ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাসি দেখা দিল ; কুটীল তিক্ত হাসি, তাহাতে আনন্দ বা কৌতুকের স্পর্শ নাই। তাহার ললাটের তিলকচিহ্ন আবার ধীরে ধীরে আরক্ত হইয়া উঠিল।

অশ্বের বল্গা ধরিয়া চিত্রক সন্তর্পণে তাহাকে পথের দিকে লইয়া চলিল ; শষ্পাকীর্ণ ভূমির উপর শব্দ হইল না। তারপর একবার পিছনে কুটীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এক লম্ফে সে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বসিল। আসনের উপর কুঁকিয়া বসিয়া জঙ্ঘা দ্বারা তাহার পঞ্জর চাপিয়া ধরিতেই অশ্ব তড়িৎ পৃষ্ঠের ন্যায় লাফাইয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল। প্রস্তরময় পথের উপর তাহার ক্ষিপ্র ক্ষুরধ্বনি কয়েকবার শঙ্কিত হইয়াই আবার পরপারের তৃণভূমির উপর নীরব হইয়া গেল।

নিমেষ মধ্যে অশ্ব ও আরোহী পথিপার্শ্বস্থ গভীর বনানীর মধ্যে অন্তর্হিত হইল। (ক্রমশঃ)

জার্মানি ও সুইজারল্যাণ্ডের বড়দিন উৎসব

ডক্টর শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস

গত বৎসর ১৭ই নবেম্বর থেকে এরা ডিসেম্বর আমি ফ্রাঙ্কফুর্ট অঞ্চলে ছিলাম। ঐ সময় বড়দিনের তোড়জোড় তেমন আরম্ভ হয়নি—যদিও লোকেরা ঘরে ঘরে বড়দিনের কেক প্রভৃতি তৈরীতে মন দিয়েছে এবং ছেলেমেয়েরা রাস্তায় বড়দিনের গানের মহড়া আরম্ভ করেছে। এর প্রমাণ পেলাম হোফহাইমে ডক্টর ওয়েপিঙ্গারের বাসভবনে, যাবার সময় পথে। তাঁর বাড়ি একটি টিলার উপরে। নীচে রাস্তায় অনেকগুলি ছেলে ছুখোস পরে লাঠি নিয়ে খেলা ক'রছে। শুনলাম, এরা বড়দিনের গানের মহড়া দিচ্ছে। ডক্টর ওয়েপিঙ্গারের বাড়ীতে আমায় খেতে দিলেন বড় একখানি বড়দিনের কেক কেটে কেটে। ঘরেই তৈরি—জিজ্ঞেসের বাগানের আপেলও তাতে সংযুক্ত হয়েছে বুঝলাম। সেদিন ২৮শে নবেম্বর রবিবার। ওঁরা বিদায়কালে আমাকে মহাকবি গ্যেটের 'প্রাচ্য প্রতীচ্য দিভান' West-Oestlicher Divan উপহার দেন। এতে লিখে দেন—Adventssonntag 1948, অর্থাৎ এটি বড়দিন উৎসবের প্রথম রবিবার। সুতরাং এই সময় থেকেই যে বড়দিনের তোড়জোড় আরম্ভ হয় তা বলা যেতে পারে।

আমি এরা ডিসেম্বর রেলযোগে ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে জার্মানির প্রধান বন্দর হামবুর্গ সহরে যাই। সেখানে ১৫ দিন ছিলাম। ফ্রাঙ্কফুর্টে যেমন বরফ পড়তে দেখলাম হামবুর্গে তা দেখিনি—যদিও হ্রদের জলে কূলের কাছে বরফের চাঙড় দেখতে পেলাম। এখানে লণ্ডনের মত ভীষণ কুয়াশা ও মাঝে মাঝে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি পড়ত—বাতাসও জোরের ছিল এবং শীতও ছিল খুব কনকনে। বড়দিনের বেচাকেনার জন্য এখানে ষ্টেসনের পিছনের চৌরাস্তার নিকটের ফাঁকা জায়গায় মেলা বসেছিল। হরেকরকমের খেলনা, লোহালক্কড়ের দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসপত্র, মোজা, জুতো,-জামা ও বিবিধপ্রকারের কাপড় চোপড়ের দোকান। লোকেরা ভিড় ক'রে জিনিসপত্র কিনছে। বড়দিনের সময় ঘর সাজানোর জন্য এবং প্রিয়জনকে উপহার দিবার উদ্দেশ্যে। মেলাতে দুএকটি দোকানী আমাদের চানাচুরওয়ালাদের মত চীৎকার করে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রছে। হামবুর্গ সহরে যে সব বাড়ী ভাঙেনি—বড় রাস্তার ধারের সেই সব বাড়ীর নীচের তলায় অবস্থিত দোকানে বড়দিন উপলক্ষে জামা, জুতো, কাপড় চোপড়, ক্যামেরা ও নানাপ্রকার সৌখীন দ্রব্যসম্ভার বিক্রয়ার্থে সাজানো রয়েছে। আমাদের পূজোর বাজারের দোকানের মতই। অফিসের ছুটির পরে সন্ধ্যার দিকে লোকের ভিড়ও দেখেছি খুবই—দোকানগুলি ক্রেতার সমাগমে সরগরম। হামবুর্গে অটোক্রকনার ও তাঁর ছেলে হান্সক্রকনারের সঙ্গে

আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। হাস বেশ ইংরাজী জানে। স্কুলে পড়ার সময়েই তাকে যুদ্ধে যোগ দিতে হয়; অ্যান্টিএয়ারক্রাফ্‌টে বিভাগে তার কাজ ছিল। কাজেই কলেজে পড়বার তার সুযোগ ঘটেনি, এখন সে তার পিতার রাসায়নিক দ্রব্যাদির আমদানি-রপ্তানির কারবারে বাইনে হিসাবে কাজ করছে। হাস বলতো, বড়দিনের সময় তার বান্ধবী, বা, ভাইবোনকে উপহার দিতে হবে। অবশ্য প্রতিদানে সেও অনেক উপহার পাবে। বৎসরের মধ্যে এ সময়টা ওদের খুব আনন্দের দিন। সবাই প্রিয়জনকে সাধ্যমত উপহার দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। বড়দিনের আর একটি বৈশিষ্ট্য রাস্তায় রাস্তায় খান গাছের বড় বড় ডালবিক্রি। শীতকালে এদেশের অধিকাংশ গাছেরই পাতা ঝরে যায়। বনতল পাতায় লাল আস্তরণে সুন্দর দেখায়। গাছগুলো দেখায় একেবারে নেড়া। কেবল দেখানে খান গাছ আছে সেই জায়গায় এই গাছের কাঁটার মত পাতাগুলি থাকে সবুজ। আমি হ্যামবুর্গ থেকে কারখানা দেখার ব্যাপারে বনের মধ্য দিয়ে যখন মোটরে গিয়েছি তখন মাঝে মাঝে খান গাছের বন চোখে পড়েছে; এগুলো অনেকটা বাঁউ গাছের মত দেখতে; নীচে থেকে ডালপালায় সমস্ত বিদ্ধ হয়ে উপরে প্রায় দেখায় মত সরু হয়ে উঠে গেছে। দেখতে অনেকটা পিরামিডের মত। এই সময় শুধু এই গাছেই ফল থাকে। সম্ভবতঃ এই দুই কারণে এই গাছকে এরা 'Christmas Tree' বা খৃষ্টবৃক্ষ ক'রেছে। হ্যামবুর্গ বড় ষ্টেশনের (Haupt Bahnhof) সামনের বিস্তৃত মাঠে গাড়ী গাড়ী খান গাছ বিক্রয়ার্থ এনে জড়ো ক'রেছে দেখলাম। লোকে সারারিন সেখান থেকে কিনে নিয়ে ঐ গাছ হাতে বাড়ী যাচ্ছে। ষ্টেশনের সামনের রাইখসহোফ হোটেলের সামনের রাস্তার অপর ফুটপাথ বরাবর ও এ গাছ সারি দিয়ে সাজানো হচ্ছে দেখলাম। আমি ১৭ই ডিসেম্বর রাত্রে হ্যামবুর্গ ত্যাগ ক'রে চুক্তিপত্র হওনা হই। উহার দুই তিন দিন আগে একদিন রাত্রে ডিনারের পর রাইখসহোফ হোটেলের অধিবাসী ইণ্ডিয়ান মিলিটারী মিশনের স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী শ্রীযুক্ত বি কে শ্রীবাস্তব তাঁর মোটরে ক'রে বেড়াতে বেরোন। সঙ্গে হ্যামবুর্গের বিখ্যাত ভারতীয় চিকিৎসক ডক্টর কৃপারাম খাবানও ছিলেন। দুজে বাড়ী ঘর ভেঙে যাওয়ায় গ্যারেজের অভাবে গাড়ীগুলি লোকে রাস্তার মোড়ে রেখে যায়। প্রহরী একজন মোতায়েন থাকে। আমরা রাইখসহোফ হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তা পেরিয়ে মোটরের কাছে যাচ্ছি। শ্রীযুক্ত শ্রীবাস্তব ও ডক্টর খাবান আমার আগে আগে যাচ্ছেন। তাঁরা প্রায় রাস্তার মাঝখানে পৌঁছেছেন। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। সহসা যামিনীর আবির্ভাব! দুটি সুবেশ তন্বী তরুণী আমায় লক্ষ্য করে বলে উঠল—Do you know English? আমি কোনও সাড়া না দিয়ে এগোতে থাকলে তারা আমায় বলল—Are you afraid of us? আমি এবার তাদের প্রকৃতি বুঝতে পেরে দ্রুতপদে ডক্টর খাবানের নাগাল ধরে তিন জনে মোটরে গিয়ে উঠলাম। শ্রীযুক্ত শ্রীবাস্তব এবং ডক্টর খাবানও ইহা লক্ষ্য করেছিলেন। আমার মৌড়িয়ে আত্মরক্ষার প্রয়াস এদের আশপাশের বাসির খোরাক জুটাল। কিছুক্ষণ হাসি ঠাট্টার পর শ্রীবাস্তব বললেন—পৃথিবীর নানা দেশের বিলাসী, বিত্তবান ব্যবসায়ীরা প্রায়শঃ এই হোটেলে আসছে, আর তাদের অধিকাংশই ত আসে টাকা উড়াতে। সুতরাং হোটেলের সামনে রাস্তায়—তাদের পাকড়াও করবার আয়োজনেরও অভাব নেই!

ডক্টর খাবানের বন্ধু ডক্টর নবীগোপাল মৈত্র তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে কয়েকদিন রাইখসহোফ হোটেলে কাটান। এঁদের সঙ্গে আমি লণ্ডনেও কয়েকদিন এক হোটেলে ছিলাম। ডক্টর মৈত্র বার্লিন থেকে ডাক্তারী পাশ করে এসে জুরার্সে চা বাগানে কাজ করেন। এঁদের সঙ্গে জুরিখেও দেখা হয়েছিল। এঁরা আমার আগেই রোম থেকে বিমানযোগে দেশে ফিরেছেন। বাঙালী মেয়ের শাড়ীর সৌন্দর্য্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে দেখেছি।

রাত্রিকালে হামবুর্গ শহর অতি মনোহর রূপ ধারণ করে। বিরাট হ্রদের চারপাশেই শহর। আর তার পাড় দিয়ে বরাবর প্রশস্ত সুন্দর রাস্তা। পূর্বে হ্রদের তীরে—কূল থেকে বেশ খানিকটা জলের মধ্যে পর্যন্ত প্রাসাদোপম হর্ম্যরাজিতে হোটেল ও রেস্তোরাঁ ছিল। সেগুলির চিহ্নমাত্র আর অবশিষ্ট নেই। হ্রদের ভিতর দিয়ে নিয়মিত লঞ্চ চলে। একটি কারখানা দেখে ফিরবার সময় আমি একদিন লঞ্চে চড়েছিলাম। প্রথম শ্রেণীর ট্রামের মত বসবার আরামজনক ব্যবস্থা। টিকিট ওর ভিতরে চড়েই করতে হয়। খালাসী কুকনার সঙ্গে ছিল। হ্রদের ধারে নামকরা যে সব প্রমোদভবন ছিল, সে তার খানিক গুপ দেখালো। হ্রদের ধারে অনেক স্থলে ঘাটগুলি পাকা বাঁধানো এবং বেড়ানোর জায়গাও অনেকটা করে বাঁধান। অসংখ্য সাদা বুনো হাঁস-জাতীয় পাখী জলে ও ডাঙায় এই সব বাঁধান জায়গায় বেড়াচ্ছে। লোকেরা রুটির টুকরো খেতে দিচ্ছে। পাখীগুলি নির্ভয়ে প্রায় হাতের কাছে এসে খুঁটে খাচ্ছে। খালাসী বলল, এগুলি শীতকালে আসে—বসন্তকালে আবার উত্তরের দিকে চলে যায়। লোকেরা সাগ্রহে এদের আগমন প্রতীক্ষা করে—যাতায় কষ্ট দূরে থাক, কেউ এ পাখী ধরে না—তাই এরা এত নির্ভয়ে মানুষের গা ঘেঁসে বেড়ায়। এখন হাসের কথা ছেড়ে শ্রীবাস্তবের কাছে আসা যাক। গাড়ীতে তিনজনে হ্রদের ধার দিয়ে চলেছি। রাত্রি প্রায় দশটা। বড়দিন উপলক্ষে তীরবর্তী হোটেল ও রেস্তোরাঁগুলি হরেক রকমের আলোকে ঝলমল করছে। এক জায়গায় একসের মধ্যে বড় জাহাজ ভিড়িয়ে আছে। জাহাজের অসংখ্য আলোক জলে প্রতিফলিত হয়ে সুন্দর দেখাচ্ছে। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক ঘুরার পর ফিরা গেল। গাড়ীর ভিতরে 'অনরণন অধিনায়ক জয় হে' প্রভৃতি জাতীয় সঙ্গীতের দু'একটি কলি ভিন্ন ভিন্ন বেসীর অরলিক লোকের গলায় বিচিত্র শুনা যাচ্ছিল। শ্রীবাস্তব গাড়ী চালাচ্ছিলেন। গাড়ী ভারতসরকারের টাকায় খরিদ—তবে তেলের খরচা বহন করে জার্মান সরকার। কারখানা dismantle করার ভার শ্রীবাস্তবের উপর। এই কাজে তাকে বহু স্থানে ঘুরতে হয়। বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও চরিত্র মাধুর্য্যে শ্রীবাস্তব রাইখসহোফ হোটেলে অবস্থিত

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মিলিটারি মিশনের অফিসারদেরই খুব প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছেন। পনের দিন এই হোটেলে তাঁর সঙ্গে থাকার ইহা লক্ষ্য করেছি।

রুপারাম ধাবানের জন্ম পাঞ্জাবে। খদেশী যুগের লোক। প্রায় পঁচিশ বৎসর আগে তিনি জার্মানি যান। বার্লিনের ডক্টরেট অব মেডিসিন ডিগ্রী নিয়ে তত্রত্য একজন মহিলার পাণিগ্রহণ করে তিনি ঐ দেশেই আছেন। বার্লিনে বোমা পড়ার সময় তিনি তাঁর নিজের লেকে নদীর মধ্যে দিবারাত্র থাকতেন। তারপর দিনের পর গল্প করতেন। নাৎসীরা তাঁকে বন্দী করেও অনেকদিন রেখেছিল। আমি যখন হামবুর্গে ছিলাম তখন তাঁর স্ত্রী শিশুপুত্রসহ বার্লিনে আছেন শুনলাম। নিজে হামবুর্গে ডাক্তারী করেন। স্থানীয় মেডিক্যাল কলেজের সহিতও তিনি লাগিয়ে। রুস পক্ষের কাছে। অতি তেজস্বী, সজ্জন এবং ভারত-প্রেমিক লোক এই ধাবান। একটু সরল প্রকৃতির বলেই সম্ভবতঃ ভারতসরকারের কোনও বৈদেশিক দপ্তরে মোটা মাইনের চুকতে পারেন নি। যুদ্ধের পরে এঁর লক্ষপানি ৯০ হাজার মার্কে বিক্রী করে ফেলেছেন বললেন। দেশে ফিরবার ইচ্ছা এঁর প্রবল। তবে উপযুক্ত আয়ের সংস্থান না হলে আসতে পারছেন না। ভারতীয় চিকিৎসা বিভায় যোগের স্থান ইত্যাদি নিয়ে তিনি প্রবন্ধাদি পড়েন, ভারতীয় ভেষজ সম্বন্ধে গবেষণা করতেও তাঁর খুব আগ্রহ দেখলাম। বড়দিন সম্বন্ধে তিনি বললেন—হিটলারের নাৎসীবাদে খৃষ্টধর্মের প্রতি অবজ্ঞা এসেছিল। এখন ব্রিটিশ ও মার্কিন সরকার তার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ বড়দিনের উৎসব বেশী জাঁকালো করবার চেষ্টায় আছে। এদিকে সাধারণ জার্মানরাও প্রবলতম আঘাতের পর এখন ধর্মের দিকে যেন বেশী ঝুঁকেছে। অত্যাবশ্যকের পর্য্যন্ত জিনিসপত্র বাঁধা রেখে বা বিক্রী করে সাধ্যাতীত ব্যয়ে বড়দিনের উৎসব সৌষ্ঠবমণ্ডিত করবার প্রয়াসী হয়ে উঠেছে। কমুনিষ্ট প্রভাবকে ঘায়েল রাখার জন্যও ধর্মভাবের পুনরুদ্ধার কার্য্যকরী বলে ডক্টর ধাবানের অভিমত। ফলতঃ এই চিন্তাশীল, বিদ্যানুরাগী, স্বদেশপ্রেমিক ভারতীয়ের সঙ্গে হামবুর্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলবার সুযোগ পাওয়া—শীতকের একটি স্মরণীয় ঘটনা বলে মনে করি।

আটো ও হান্স দুজনার, শ্রীমন্তব এবং ডক্টর ধাবানের সাহচর্য্য ও সৌহার্দ্যের স্মৃতিভার-মন্থর মনে ইস্টার স্লাশাবাল ট্রেনযোগে ১৭ই ডিসেম্বর রাত্রি দশটায় হামবুর্গ থেকে কবির কথায় "কামনার মোক্ষধাম যেথায় বিরাজে"—সুইজারল্যাণ্ডের সেই জুরিখ সহরের উদ্দেশে রওনা হই। কারণ এক বৎসর আগে থেকেই জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন-শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক পল কারারের সঙ্গে পত্র প্রয়োগে ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন করেছিলাম। ইয়োরোপ ফেরার প্রাক্কালে তিনি আমায় লেখেন যে আমি জুরিখে গেলে তিনি অতিশয় খুশী হবেন এবং সুইস রাসায়নিক কারখানা দেখার ব্যাপারে তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করবেন। লণ্ডন এবং ব্রাসেলসে থাকাকালে ও তাঁর প্রীতিমধুর পত্র পেয়েছিলাম। ট্রেনে একজন সুইডিস মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়—বয়স তাঁর আশির কাছে। ইকহলম থেকে একাই তিনি রোমে যাচ্ছেন। মাঝেমাঝে খবর আনিয়ে তিনি রোমের গাড়ী ধরলেন। এই বয়সেও তাঁর বেশ শক্তিসামর্থ্য আছে—তাছাড়া তিনি তিন চারটি ভাষেন। নিজের ভাষা ছাড়া জার্মান, ফরাসী, ইংরেজীতে বেশ বলে। জ্যোতিষ সম্বন্ধে ইনি বই লিখেছেন। রোমের বিশেষজ্ঞদের দেখিয়ে উহা প্রকাশের চেষ্টা করবেন, বললেন। দেশে উপযুক্ত ছেলে-মেয়েরা আছে। ইকহলমের সুবিখ্যাত নোবেল লরিয়েট অধ্যাপক অরহানের সঙ্গে এর সাক্ষাৎ পরিচয় আছে জানালেন। আমি কেমিষ্ট শুনে—কেমিষ্ট্রির কোন্ বিভাগে আমার অধিকার তাও জিজ্ঞাসা করতে ছাড়লেন না; সুতরাং এই বৃদ্ধা যে বেশ শিক্ষিতা তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি।

জুরিখে বড়দিনের উৎসব আমায় চিরদিন মনে থাকবে। ২০শে ডিসেম্বর সোমবার বেলা দশটায় 'কেমিশে ইনষ্টিটুট বের য়ুনিভারসিট্যাট', জুরিখে গিয়ে অধ্যাপক কারার ও তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করি। পরদিন সন্ধ্যায় ইনষ্টিটিউটে বড়দিনের উৎসবে (Christmas Tree celebration) যোগদানের জন্য অধ্যাপক কারার আমায় নিমন্ত্রণ করেন। যথাসময়ে রসায়নের সহকারী অধ্যাপক ডক্টর বোয়াইটজারের সঙ্গে নীচের তলায় প্রকাণ্ড একটি লাবরেটরিতে উপস্থিত হলাম। সমবেত অন্যান্য অধ্যাপকদের সঙ্গে অধ্যাপক কারার আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁদের দলের মধ্যেই আমি বসলাম। বোয়াইটজার নূতন সহকারী অধ্যাপকদের মধ্যে বসলেন। ছাত্র ছাত্রীদের অধিকাংশই রইল দাঁড়িয়ে—কেউ কেউ ল্যাবরেটরির টুল এবং working বেঞ্চের উপরেই আসন নিল। প্রায় পাঁচশ ছাত্রছাত্রী ঐ সভায় উপস্থিত ছিল। বড়দিনের ছুটি প্রায় দুই সপ্তাহ। এর পূর্বে প্রতি বৎসরই এইরূপ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বলে শুনতে পেলাম। এইদিন শিক্ষক ছাত্র সবাই প্রাণখুলে মেশে এবং অবাধে পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করে। ল্যাবরেটরির কেন্দ্রস্থলে প্রকাণ্ড একটি খানগাছ বসানো হয়েছিল। তার ডালে ডালে হরেকরকের ঝকঝকে গোলক ও বাতি ঝুলছিল। ছাত্র সমিতির সেক্রেটারি প্রথমে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলে উৎসব উদ্বোধন করা মাত্র গাছের আলো-গুলি জেলে দেওয়া হ'ল। জার্মানভাষায় ওদের জাতীয় সঙ্গীত সমবেত সুরে গাওয়ার পর এক এক দলে দুই তিন জন করে ছেলে এসে সামনের টেবিলের উপর উঠে বড় বড় কাগজে প্রফেসর ও ছাত্রদের নানাবিষয় নিয়ে এই উপলক্ষে আঁকা ছবি দেখিয়ে ক্যারিকেচার করতে শুরু করে দিল। জার্মান ভাষায় সুর করে ও উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতার ভঙ্গিতে ছড়াগুলি বলে চলল। সমবেত ছাত্র-ও শিক্ষকগণ হাততালি দিয়ে মাঝে মাঝে তারিফ করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ এই ভাবে চলল। ইতিমধ্যে ছাত্রীগণ প্রত্যেকের হাতে একটি করে খালি 'বিকার' সঙ্গে সঙ্গে বিস্কুট, কেক ও কমলালেবু দিয়ে গেল। বিকার দেখে প্রথমটায় ভয় হ'ল—মদ-টদ দেবে নাকি! কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখি প্রত্যেকের বিকারে বিনামুখে তৈরি কড়া লাল

চা দিয়ে থাচ্ছে। তথী মার্কিণ তরুণী ছাত্রীরা অনেকবার করে কেক কমলালেবু দিয়ে গেল—চাও অনেকেই একাধিক বার নিলেন। দুইজন বোম্বাই-এর এবং একজন বাঙালী ছাত্র (ইনি প্রমোদরঞ্জন ব্যানার্জি) মিলে উর্দু ভাষায় একটি জাতীয় সঙ্গীত গান করলেন। হাত-রাখা ছেড়ে এরা বন্ধ করল না—তবে এত খাঁটি উর্দু যে আমি বিশেষ কিছুই বুঝতে পারলাম না। এদের গান শেষ হলে তুমুল করতালি পড়ল। অধ্যাপক কারার চোখ থেকে উঠে ওদের কাছে গিয়ে গানের প্রশংসা করলেন। আমার কাছে এসে বললেন "গানে শুনতে ত ভালই লাগল—মানে কিছু বুঝলে তুমি?" আমি বললাম—"এ আমার কাছে জার্মানেরই সমতুল্য—কারণ ভারতবর্ষ মহাদেশের মত দেশ তার এক প্রদেশের ভাষা অন্য প্রদেশবাসীদের বুঝা খুবই শক্ত।" শুনে উনি একটু হেসে নিজের আসনে গেলেন।

এর পর ইনষ্টিটিউটের অন্যতম হিসাবে অধ্যাপক কারারের বক্তৃতা দিবার পালা। প্রথমে ছাত্রছাত্রীদের ধন্যবাদ ও শুভকামনা জানালেন। তারপর এই কিছু দিন কলকাতার বেসরকেকিকালের ঠিক কেমিষ্ট দুইটি বিষয় তাঁদের মধ্যে উপস্থিত থাকায় তাঁরা অতিশয় আনন্দিত হয়েছেন বললেন। অতঃপর বড়দিন উৎসবের প্রাচীনত্বের উল্লেখ করে তিনি বললেন যে, যদিও খৃষ্ট প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বের জন্ম উপলক্ষ করেই এই উৎসব প্রতিপালিত হয়ে আসছে তথাপি সমাজ-বিজ্ঞানের গবেষকগণের ধারণা ইহার আগেও এই উৎসব প্রচলিত ছিল। দুস্তর বিবাকাশের ও শীতের অসহনীয় ক্লেশের ক্রমাপসারণ যে সময় থেকে আরম্ভ হয়—সেই সময়ে বসন্তের শুভাগমনে অপেক্ষমানে মানবের মনই আনন্দ বিহ্বল হয়ে ওঠে। এই বাহ্যপ্রকাশ এই বড়দিনের উৎসব। পরে খৃষ্ট-জন্মের সাথে ইহার সময়গত যোগ ঘটায় ইউরোপীয় পাশ্চাত্য দেশের প্রাচীন জাতিদের সেই উৎসব ক্রমশঃ সর্বলোকগ্রাহ্য, ঐতিহ্যমণ্ডিত হয়ে বর্তমান আকারে দাঁড়িয়েছে। অতঃপর নানাবিধ্যুদ্দেশ্যের ছাত্রছাত্রীদের উল্লেখ করতে গিয়ে ভারতীয় ছাত্রদের লেখাপড়ায় মনোযোগ ও ধীশক্তির প্রাচুর্য্যের কথা বলেন। ইনষ্টিটিউটের মার্কিণ ছাত্রীদের বৈষিক সৌন্দর্য্য ও রুচিপ্রতি কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রদের কৌতূহল দৃষ্টির উল্লেখপূর্বক ঘাট বৎসর বয়সের দৃষ্টিভঙ্গীতে অধ্যাপক এই কারণের বিনে কিঞ্চিৎ রসিকতা প্রকাশ করলেন। সকলেই তাঁর ভাষণ খুব উপভোগ করল। সবই জার্মান ভাষায় হল। সব কথা স্পষ্ট বুঝতে পারিনি—তবু এই উৎসব খুব ভাল লেগেছিল। অধ্যাপক প্রায় আধঘণ্টা ধরে বক্তৃতা দিলেন। তার পর সভা ভঙ্গ হল। উৎসব শেষে তিনি আবার আমার কাছে এসে আমার কেমন লাগল জিজ্ঞাসা করলেন।

অধ্যাপক কারার এবার ৬০ বৎসরে পদার্পণ করলেন। ইনি অতিশয় রসজ্ঞাতী লোক। ছাত্রেরা বলল—বৎসরের মধ্যে এই একটি মাত্র দিনে তাঁর মধ্যে একটু তারল্য ও কৌতুকপ্রিয়তার পরিচয় মেলে। সহকারী অধ্যাপক ডক্টর মোয়াইটজারের মুখে শুনলাম—তাঁরা অধ্যাপককে কখনো কোনো নাচে যোগ দিতে দেখেন নি। বস্তুতঃ জ্ঞান রাজ্যের সবসব প্রদেশে যাঁদের নিত্য অভিযান চালাতে হয় তাঁদের পক্ষে দীতার—"প্রজাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ" এই বাণি অক্ষরে অক্ষরে পালন না করে উপায় নেই—পৃথিবীর যে কোনও অংশেই তাঁদের জন্ম হউক না কেন। সরলতার প্রতিমূর্তি এই অধ্যাপক কারার। বোয়েল প্রাইজ ও অন্যান্য বহু পুরস্কার, খেতাব লাভ করেছেন; কিন্তু বিলাসিতা বা অহংকার কিছুই এঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। বহু মূল্যবান গ্রন্থ লিখে তা থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা পান। এঁর লিখিত "Lehrbuch der Organischen Chemie" বর্তমানে একাদশ সংস্করণ চলছে। নানা ভাষায় অনূদিত হয়ে এই পুস্তক পৃথিবীর সকল দেশের ছাত্রদের রসায়ন শাস্ত্রের উচ্চতর জ্ঞান প্রচারের সহায়তা করছে। অথচ এতবড় একজন লোক নিত্য ট্রামে চড়ে কলেজে যাচ্ছেন। একখানি মোটরগাড়ি পর্য্যন্ত কেনেন নি!

এদেশের কারখানাতেও বড়দিনের সময় সকল শ্রেণীর কর্মী কর্মচারী—ছোটবড় সকলেই একত্র মিলিত হয়ে পানভোজন ও আনন্দোৎসব করে থাকেন। ইহা প্রত্যক্ষ করলাম সিবা কোম্পানিতে গিয়ে। ২২শে ডিসেম্বর ভোরে ৭টা ১২র ট্রেণযোগে জুরিখ থেকে বেরিয়ে বেলা ৯টায় বাজেলে সিবা কোম্পানির কারখানায় উপস্থিত হই। বাজেল রাইন নদীর ধারে সুইজারল্যাণ্ডের উত্তর সীমান্তের বিখ্যাত শিল্পপ্রধান শহর। ফরাসীরা এই শহরকে বলে বলে—ইংরেজেরাও তাদের অনুকরণে ঐ নামেরই পক্ষপাতী। বাঙালীর কর্ণ-কটু এই শব্দ ব্যবহার না করে আমি সর্বত্রই জার্মান উচ্চারণই রেখেছি। সিবার পুরো নাম—'কেমিক্যাল ইনডাষ্ট্রিজ ইন বাজেল'। এই শহরে প্রায় দুই মাইলের মধ্যে সিবা, গাইগি, রচি ও স্যাণ্ডোজ—চারিটি পৃথিবী বিখ্যাত রাসায়নিক কারখানা। এর প্রত্যেকটিই এত বিরাট আকারের ও এত বিপুলভাবে সমৃদ্ধ যে এর একটির মত কেমিক্যাল কারখানাও আমাদের সমগ্র দেশের মুলুকেও গড়ে ওঠে নি। আমি সিবা কোম্পানিতে উপস্থিত হলে ওঁদের বিজ্ঞান বিভাগের শ্রীযুক্ত ঃ এলেন। ঐদিন বড়দিন উপলক্ষে ছুপুরে ওঁদের কারখানায় বার্ষিক মিলিত পানভোজের ব্যবস্থা হয়েছে, কাজেই সেদিন কারখানা দেখানো সম্ভবপর নয় বললেন। ভদ্রলোক স্যাণ্ডোজ কোম্পানিতে ফোন করেও ঐ জবাবই পেলেন। পরে রচিতে ফোন করে জানলেন—তাদের ভোজ সেদিন নয় সুতরাং তাঁরা কারখানা দেখাতে পারেন। সিবা থেকে ট্রামে ষ্টেশনের দিকে প্রায় ১মাইল গিয়ে রাইন-ব্রিজের সন্নিকটে Drei Koenige (তিন রাজা) নামক হোটেলে আমাকে বসতে বললেন। আমি সেখানে গিয়ে মিনিট দশ বার অপেক্ষা করার পরেই রচির প্রচার বিভাগের ডাক্তার ইঃ নামে ইংরেজ ভদ্রলোক এসে হাজির হলেন। তিনি আমার একটি ভাল হোটেলে গিয়ে আমার লঞ্চ করে লাঞ্চ খেলেন। তার পর উভয়ে হেঁটেই রাইন-ব্রীজ পেরিয়ে নদীর ধারের মনোরম রাস্তা দিয়ে গিয়ে মিনিট পনেরর মধ্যেই রচি বা

হফ মান লারোশের কারখানায় উপস্থিত হলাম। নদীর ভিতর থেকেই পাথর দিয়ে শক্ত করে গেঁথে তুলেছে পাড়। নদী বেশ প্রশস্ত গঙ্গার অর্দ্ধেকেরও বেশী—তবে জল একেবারে নীচে। ইয়ং বললেন, গ্রীষ্মাগমে বরফ গলতে থাকলে নদী একেবারে ভ'রে ওঠে। নদীর ধারের যে পথ দিয়ে আমরা গেলাম তার পাশে বরাবর লেবু গাছের শ্রেণী। অবশ্য তখন পত্র-পুষ্প বর্জ্জিত ছিল। ১৮।৩০ বৎসরের এই ডাক্তার যুবক পথে চলতে সুখ দুঃখের কথা বললেন। অবিবাহিত—ঘর সংসার না থাকাতে পয়সাও যাচ্ছে, অথচ শান্তি বা সুখও পাচ্ছেন না। এই দেশেই বিয়ে করে বসবাস করবেন ইচ্ছা। পথে ইয়ংএর পরিচিত একজন মার্কিণ আর্টিষ্টএর ছাত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ছেলেটি শহরের দিকেই যাচ্ছিল। ছেলেটি চলে গেলে ইয়ং বললেন—"এরা লেখাপড়া শিখতে যতটা না আসুক, পয়সা উড়াতে ও মজা লুটতে এসেছে সুইজারল্যাণ্ডে। রুচির কারখানা দেখার কথা আগেই বলেছি। সুমধুরভাষী নিশ্চয়োজন।

বাজেল থেকে সন্ধ্যায় হোটেলে ফিরে শুনলাম রাত্রে বড় দিনের উৎসব, তাই ডিনারের পালা নেই। এই হোটেল 'কুরোর হাউস' গিরিশিরিক বনাকীর্ণ পাহাড়ের পাদদেশে সুইজারল্যাণ্ডের মেয়েদের পরিচালিত আলকহল স্ত্রাইয়েস রেস্তোরাঁর অন্যতম। হোটেলে মদ খাওয়া একেবারে নিষেধ। আহারের সময় টেবিলে মাকে ক'রে বিশুদ্ধ পানীয় জল দিয়ে যায়। এইরূপ হোটেলের খরচ অন্যান্য হোটেলের তুলনায় সস্তা, কিন্তু ব্যবস্থা এবং খাওয়া-দাওয়া বেশ ভাল। পরিচালিকা ও পরিচারিকাদের মধ্যে কোনও চাপল্য বা চাঞ্চল্য নেই—বকশিস গ্রহণও এদের নিয়ম বিরুদ্ধ। এরূপ হোটেল পরিচালনা মেয়েরা দেবা-কার্য্যের মধ্যে মনে করে এবং সমাজে এ জন্য তারা হেয় নয়। একজন পরিচারিকার কন্যা স্থানীয় মেয়েদের হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী বলে শুনতে পেলাম।

২২শে ডিসেম্বর রাত্রে হোটেলের বাসিন্দা এবং যারা আগে এই হোটেলে ছিল এখন জুরিখ শহরে অন্যত্র আছে তাদেরও বড়দিন উৎসবে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রণ ছিল। জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় ও জুরিখের টেক্‌নিশে হোকস্কুলের সাত আটজন ভারতীয় ছাত্র উপস্থিত ছিল। এরা প্রথমে এখানে উঠেছিল, এখন কলেজের নিকটে 'পেয়িং গেষ্ট' হয়ে লোকের বাড়ীতে কম খরচায় আছে। হোটেলটি পাহাড়ের উপর বলে নীচে থেকে 'লাইনবাস' বা ঘড়ি টানা ট্রামে আসা যাওয়ায় খরচা বেশী পড়ে। ইহাও এদের কলেজের কাছে সরে যাওয়ার অন্যতম কারণ। ভারতীয় ছাত্রেরা সবাই উপহার এনেছিল। আর্যান তাঁর রবীন্দ্রনাথের বই এবং ইংরেজিতে জহরলালের বই। হোটেলের যে ঘরে ডিনার খাওয়া হয় সেই একাও হলে আমরা প্রায় সাড়ে আটটায় গিয়ে সমবেত হলাম। নিমন্ত্রিতদের জন্য চেয়ার টেবিল ঠিক করাই ছিল। ঘরের ভিতর দেখি একাও একটি খৃষ্ট-দ্রুম। নানা প্রকার আলোক ও সোনাকে ঝলমল করছে। পাশেই পরদা টাঙিয়ে থিয়েটারের ষ্টেজ করেছে। প্রথমে প্রত্যেককে একখানা করে ছোট সুদৃশ্য কাগজে গোটা গোটা হাতের লেখায় বিখ্যাত জার্মান কবি ও দার্শনিকদের দুই-চার ছত্র করে উদ্ধৃত বাণী দিয়ে গেল। আমার নামে পড়ছিল—Rueckertএর নিম্ন-লিখিত কয়েক ছত্র—

Wenn der Tag nicht hell ist,
sei du holder
Sonn' und froher Sinne
sind Gottes Streiter.

এক কথায় মোটামুটি অর্থ কুহেলি আচ্ছন্ন আঁধার দুর্দিনে পড়লেও মানসিক প্রফুল্লতা হারিয়ো না।

এর পর প্রত্যেককে একটি করে বাঁধা সংবলিত কাগজের টুকরো দিয়ে গেল। কেউ হয় ত পেল—"Not a Rose"—প্রথমে মানে বুঝতে পারিনি। পরে দেখলাম "Without thorn"—চিহ্নিত প্রকাণ্ড একখানি কেক তাকে উপহার দেওয়া হল। এইরূপে নিমন্ত্রিত সকলেই একখানি ক'রে কেক পেলেন। বলা বাহুল্য, উপহৃত কেক ওখানে বসে খাবার জন্য নয়, সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য দেওয়া। এর পরে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার আরম্ভ। একেবারে নিরামিষ সাত্ত্বিক আহারের আয়োজন। প্রচুর দুধ ও চিনি মাখা কর্পূরাদি যোগে প্রস্তুত হালুয়ার মত অনেকটা সত্যনারায়ণের সিন্নির মত পাতলা ও সুখরোচক খাদ্য প্রত্যেকের পাতে পর্য্যাপ্ত দিয়ে গেল। তারপর দিল কেক। অবশ্য যে যত পারল পেট ভরে খেল। এর পরে সুরু হল—যীশুর জন্মোৎসব অভিনয় জার্মান ভাষায়। একটি সুন্দরী তরুণী ব্লণ্ডেমেইডকে যেন যায় পরিয়ে মেরি সাজিয়ে ছিল। বড় একটি আদুর পুতুলকে কাপড় চোপড়ে শোভিত করে নবজাতরূপে বাঁশির মধ্যে শুইয়ে খৃষ্ট-দ্রুমের তলায় রেখে দিল। তাকে মাঝে মাঝে মেরি ও তার সহচরীরা এসে আদর করে ঘুমপাড়ানি গান শুনিয়ে যাচ্ছিল। দাড়ি গোঁফে সজ্জিত সেই যুগের 'সেণ্ট' বা দেবদূত কে যেন বাইবেলের অংশ বিশেষ পড়ছিল। অপর কয়েকটি পুরুষের ভূমিকাও ছিল সেই যুগের। বলা বাহুল্য এ সব ভূমিকাতেও মেয়েরাই অভিনয় করল। পুরুষ কেউ ষ্টেজের ওদিকে ছিল না। মাঝে মাঝে গান করতে করতে মেয়েরা এসে বিশুকে প্রদক্ষিণ করে ঘুরে যেতে লাগল। খুব বেশী বুঝতে না পারলেও অভিনয় হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। সকলেই প্রশংসা করল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত অভিনয় চলল। আমি সারাদিন রুচির কারখানা দেখায় ক্লান্ত ছিলাম, আবার ৬টায় হোটেল থেকে বেরিয়ে বাজেলে সিবার কারখানা দেখতে যেতে হবে—কাজেই রাত্রি ১২টার সময় ভারতীয় বন্ধুদের নিকট বিদায় নিয়ে এবং হোটেলের অধ্যক্ষাকে বলেও ধন্যবাদ দিয়ে পাশের অপর বিল্ডিংএ আমার কামরায় শুতে গেলাম।

ষ্ট্রাইক্

শ্রীপূর্ণানন্দ গঙ্গোপাধ্যায় এম এ

—'আমাকে অনুরোধ করো না, সমর, আমি পারব না'

—'পারবে না ?'—

—'না'—দৃঢ়তার সহিত উত্তর দিল জয়ন্ত।

—'কেন ?'

'—তুমিও প্রশ্ন করবে, কেন ?'

—'আমাদের অনুরোধকে তুমি উপেক্ষা করছ বলেই আমি প্রশ্ন করতে বাধ্য হোয়েছি'—সমর উত্তর দিলে।

—'জান আমি বিবাহিত'—

—'জানি'—

—'আমার দুটী ছেলে'—

—'জানি'—

—'আমি প্রায় নিঃস্ব ও নিরাশ্রয়'—

সমর চুপ করিয়া রহিল।

জয়ন্ত বলে যেতে লাগ্‌লো—'জান যদি আমার চাকরী যায়, আমি কোথায় দাঁড়াব'—

—'তোমার মতো আরও অনেকে আছে'—

—'না নেই'—

'—তুমি নিজের দুঃখটাই বড় করে দেখছ'—

—'অতি স্বাভাবিক, বিশেষতঃ যার পিছনে রয়েছে ক্রমাগত বৈফল্যের ইতিহাস'—

—'বলতে পারো আমাদের ভিতর সুখী কে ?'—

—'বাইরে থেকে যেটুকু বলতে পারিনে—আমার নিজের ইতিহাস হয়তো তুমি সব জান না, সমর'—

সমর যোগ প্রশ্ন করল না। জয়ন্ত বলে যেতে লাগল—'আজ সাত বৎসর আগেকার কথা, কলেজ থেকে বেরলাম। পড়াশুনা কোনদিনই যে করেছিলাম, নাই বা বোললেম। তারপর পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি, দোরে দোরে ধর্ণা দিয়েছি শুধু একটা চাকরী—সামান্য আশায়। কেউ অবহেলা করেছে, কেউ করেছে অপমান—অভিযোগ করিনি, চলে এসেছি। চোখে জল এসেছে—শুকিয়ে গেছে চিন্তার উত্তাপে। হয়তো ভাগ্যে জুটেছে কোনদিন অর্দ্ধাশনে—কোনদিন বা অনশন। দরিদ্র কুল, সুযোগ দিয়েছে আমার অভাবের, এই যে আমরা বসে আছে দোকার জন্তুদের মতো, নির্দয় নিষ্ঠুর বড়লোকগুলো বাড়ী থাকিয়ে। পরিশ্রম করেছি অজস্র, পারিশ্রমিক পেয়েছি সামান্য—যাতে না মোটাদ যায় পেটের ভাত'—

পকেট থেকে সিগারেট বার করে সমর দিলে জয়ন্তকে। জয়ন্তের মুখে পরিস্ফুট হোয়ে উঠলো অতীত বেদনার স্মৃতি—সমরের চোখে সহানুভূতি। মুখমুখটাকে যতদূর সম্ভব ঘুরিয়ে একটা টান দিলে জয়ন্ত সিগারেটটাতে, তারপর বলে যেতে লাগল—'সংসারে পিতা অভাব। মনে হোতো আত্মহত্যা করি, কিন্তু পারিনি, তাতেও এদের দিয়েই যাবে না। একদিন আমারও সুদিন আসবে—একদিন আমিও হাসবো। দুঃখে কষ্টে সংসারের সব গেল ম'রে। বাকী রইলুম আমি —তারপর এই চাকরী। মনে কোরেছিলাম বিয়ে করে দারিদ্র্যকে আর আমন্ত্রণ করে আনব না। কিন্তু সমর সব ভুলিয়ে দিলে। আজ আমার অন্তর কেউ জানে না, সমর। বাইরের হাউমিটা দেখে তোমরা মনে কর' আমি বিত্তশালী, কিন্তু সেটা ভুল—একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো জয়ন্ত।

—'অবিশ্বাস আমি তোমাকে করিনি জয়ন্ত' সহানুভূতির সুরে সমর বললে।

—'জেনে শুনেও অনুরোধ করছ আমাকে'—

—'হ্যাঁ, তবু করছি'—

—'কেন ?—

—'কেন জান ? তুমি যদি অফিসে আসো, তাহলে আমরা আটকাতে পারবো না অনেককেই'—

—'এ যুক্তি তোমার সমস্ত মন সমর'—

—'তুমি অফিসারদের প্রিয়পাত্র, তুমি এলে অনেকেই আসবে, কোন ত্রুটি, কোন ত্রুটীর তারা মানবে না, বিশেষতঃ অনেকে তোমাকে শ্রদ্ধা করে'—

—'ভুল, সমর, তারা শ্রদ্ধা করে না, ভয় করে,—পায়ে আমি কোন ক্ষতি করি। কিন্তু তারা জানে না যে…'—বলতে বলতে থেমে গেল জয়ন্ত—

—'থাক্ তুমি কথা যাও, তুমিও অফিস্ যাবে না'—

—'সে অঙ্গীকার করতে আমি পারব না'—

—'যদি তোমার পরিবারের সমস্ত ভার—ইউনিয়ন নেয়—তবুও না'—

—'না—ইউনিয়ন সে ভার নিতে পারে না, আর সেটা প্রার্থনা করাও অন্যায়'—

—'আর তোমার অফিস যাওয়াটাই ন্যায়, কি বল ?'—একটু বিরক্তির সহিত সমর বলিল।

—'উত্তেজিত হও না সমর। যেটা অসম্ভব সেটাকে সম্ভব বলে মেনে নিওনা। আমাদেরই মতো গরীব কেরাণীর সামান্য চাকায় এই ইউনিয়নের তহবিল—তার থেকে সাহায্য করবে আমার সংসারকে। সে ভাত আমার মুখে উঠবে না, সমর'—

—'তাহলে তুমি যাবেই'—

—'হাঁ'—

—'কাপুরুষ !'—সমর একটু বেঁকা হইয়া বসিল।

'—ছিপুন মা, হোয়েচি বা তোতে হোয়েচে'—

—'বিপদটা শুধু তোমার একার—মা ?'—

—'হয়তো তাই। একদিন আমিই দুঃখ করেছি দুঃখের সঙ্গে দিনরাত, সামান্য সহানুভূতি পাইনি কারুর কাছে'—

—'সে জন্যে আজ তার প্রতিশোধ নিচ্ছ'—আমাদেরি উপরে ?'—একটু জোরের সহিত সমর প্রশ্ন করিল।

—'ঠিক তা নয়, তবে মানুষের উপরে বটে। ঘিরে পাইনি বলেই ঘিরার ধরে গেছে জগতের উপরে'—

—'তুমি ঘিরেছ ?'—বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করলে সমর।

—'অর্থ নয়, স্বার্থ'—অত্যন্ত নরম ভাবে উত্তর দিলে জয়ন্ত !

—'যাক্ তোমার সঙ্গে তর্ক করবার সময় নেই—তুমি কথা দাও যে তুমি অফিস যাবে না'—ধরে বসলো সমর।

—'দুঃখিত'—

—'তুমি ভাল চাওনা আমাদের ইউনিয়নের ?'—

—'চাই—সর্বান্তঃকরণে'—

—'আমাদের মতের বিরুদ্ধে, অফিসে গিয়ে !'—সমর নীচেকার ঠোঁটটা একটু জোরে চেপে ধরে' প্রশ্ন করলে।

—'আমার ব্যক্তিগত মতকে যা বিবেককে উপেক্ষা না করে'—

—'তাহলে যেও'—

জয়ন্তকে উত্তর দেবার অবকাশ না দিয়া সমর চেয়ারটাকে প্রায় একরকম উলটাইয়া দিয়াই বাহির হইয়া পড়িল।

ট্রাইক্ নোটীশ দেওয়া হইয়া গিয়াছে। তারপর অনেকটা দিন কাটিয়া গিয়াছে। সেদিন বোধহয় অগষ্ট দিবস—জয়ন্ত বাহির হয় নাই। প্রভাত-কেরীর উন্মাদনায় সেও ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বসিয়াছিল। স্ত্রী-অরুণাও কোলের ছেলেটিকে কোলে লইয়া জয়ন্তের পাশেই বসিয়াছিল। জয়ন্ত প্রভাত-কেরীর মিছিলের দিকে তাকাইয়া তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। অরুণা জিজ্ঞাসা করিল—

—'হাঁ গা, তোমাদের ট্রাইকের কি হলো ?'—

—'হবে'—তেমনি অন্যমনস্ক হইয়া সংক্ষেপে উত্তর দিলে জয়ন্ত।

—'তুমি ট্রাইক করবে ?'—উৎসুক হোয়ে জিজ্ঞাসা করলো অরুণা।

—'না'—

'—কেন ?'—

—'আমাদের চলবে কি করে—জয়ন্ত অরুণার দিকে মুখ ফেরালো।

—'তা বলে, সকলের মতের বিরুদ্ধে ?'—

—'কি করি বল, যখন সকলেই আমার বিপক্ষে'—

কোন এক অজানা আশঙ্কায় অরুণার বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল।

—'না গো না, তোমার একা গিয়ে কাজ নেই'—একটু বিচলিত হইয়া অরুণা বলিল—

—'যদি না যাই, আমি তুমি, ছেলে সব উপোস করবে, পারবে ?'—

—'যদি তাতে তোমাদের সকলের ভালো হয়, না হয় একটু কষ্ট হলো'—

জয়ন্ত বিস্মিত হইয়া স্ত্রীর দিকে চাহিয়া রহিল। কতক্ষণ পর বলিল

—'সে কষ্টটা কত গুরু তা বোধ হয় জান না অরুণা'—

—'সে কষ্টে তোমার যদি সম্মান বাড়ে, লোকে তোমাকে প্রশংসা করে, আমি সে দুঃখ সহ্য করে নেবো'—হাসি মুখে উত্তর দিল অরুণা।

—'বেশ, ভেবে দেখি'—জয়ন্ত টুথব্রাশে কতকটা পেষ্ট লইয়া উঠিয়া পড়িল।

অন্যান্য কাজ সমাপ্ত করিয়া জয়ন্ত সেই যাত্র চা'র কাপে চুমুক দিয়াছে, সমর এক হাতে কতকগুলো লেজেন্ড অন্য হাতে একটা বাক্স লইয়া দোলাদুলি ঘরে আসিয়া ঢুকিল। জয়ন্ত প্রথমটা কতকটা থতমত খাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সমরের মুখে হাসি দেখিয়া কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রশ্ন করিল—'এগুলো কেন নিয়ে এলে সমর ?'—

—'বৌদির হাতের রান্না খাবো বলে'—

অরুণা ইতিমধ্যেই আর এক কাপ চা ও কিছু খাবার লইয়া আসিয়াছিল। কাহাকেও প্রশ্ন করিতে অপেক্ষা না দিয়া, অরুণার হাত হইতে চা'র কাপটা এক রকম ছোঁ মারিয়া লইয়া বলিল—'বৌদি, দুপুর বেলায় এখানেই দুটো প্রসাদ পাবো'—

—'তবু ভালো, আমি তো মনে করেছিলাম—ঠাকুরপো বুঝি সকলের আগে আমাদের সঙ্গেই ধর্মঘট করলে'—অরুণা একটু ঠাট্টা করিয়া বলিল।

—'সে আর পারলুম কৈ ? মনে করি জয়ন্তকে আর আপনাকে ভুলে যাই—কিন্তু পারি নে'—

—'ও ! তাহলে ভোলবার চেষ্টা করেছেন'—

একটু হাসিয়া অরুণা চলিয়া গেল।

জয়ন্ত চায়ের কাপটা শেষ করিয়া, কাপটা ধরিয়া ছিল। কাপের উপর মুখ রাখিয়াই প্রশ্ন করিল—'ব্যাপার কি সমর ?'—

—'অত্যন্ত গুরুতর'—

—'খুলেই বলো'—

—'মুদলমানেরা কেঁকে বসেছে'—

—'কি, তারা ট্রাইক্ করবে না'—

—'না'—

—'তবু তোমরা ট্রাইক করবে ?'—

—'আ, করে কি করবো বল তো'—

—'আমি অনেক ভেবে দেখেচি সমর, আমাদের ট্রাইক্ সফল হ'তে পারে না'—

—'কেন ?'—

—'প্রথম আমাদের নিজেদের মধ্যে বিভেদ, তারপর সাধারণের সহযোগিতা নেই'—

—'সে বিভেদ একমাত্র তুমি মেটাতে পারো অরন্তু'—একটু বিচলিত হোয়ে সমর বল্লে।

—'কিন্তু সাধারণের সহযোগিতা ?'—

—'সে আমরা পাবো'—

—'এর জন্যেই তোমার উপর রাগ হয় সমর, যুক্তি দিয়ে কোনটাকে মানতে চাও না বলে'—

—'মাই মানছি, বলো কেন পাবো না'—

—'প্রথমতঃ আমাদের ডিপার্টমেণ্ট ষ্ট্রাইক করলে সাধারণের কোন অসুবিধা হবে না—স্বীকার করো ?'

—'হ্যাঁ'—

—'দ্বিতীয়তঃ কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থন আমাদের পক্ষে নেই'—

—'কিন্তু এগুলো পাবো না, এই ভেবে তো কাজ থেকে এখন আর সরে আসা যায় না'—

—'যখন সরে আসা যায় না, তখন আমাদের উচিত এখনকার মতো ষ্ট্রাইক নোটীশ ফিরিয়ে নেওয়া'—

—'তারপর ?'—

—'বিশেষ চিন্তা করে তারপরে বাধা'—

—'সে চিন্তাটুকু করবে কে ?'—

—'আমি করে রেখেছি, সমর ?'—

—'তুমি ?'—

—'বিস্মিত হচ্ছ ?'—

সমর চুপ করিয়া রহিল। অরন্তু বলিয়াযাইতে লাগিল—'সমর, তোমরা শুধু ভালো বন্দোবস্তের আগুনের মতো জ্বলে উঠতে, কিন্তু রাখতে পার না তার উত্তাপকে। আমি তা পারিনে, কেননা আমার মধ্যে আছে একটানা দুঃখকষ্ট, আমি চাই সব পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে, ভেঙ্গে চুরমার করে এক করে দিতে। তোমরা ভাবো তোমরা কর্মী। কিন্তু পারো মাথা পেতে নিতে সব বিষাদকে, গ্লানিকে আর দুঃখকে ?'—অরন্তু প্রশ্ন করলে।

—'এতটুকু সত্যিই ভেবে দেখিনি, অরন্তু'—বিনয়ের সহিত সমর বলিল।

—'তোমরা ভাবো—আমাদের সহকর্মীদের অভাব কেবল তোমাদিগকেই বিচলিত করেছে আর আমি শুধু একটা জড়পিণ্ড, যা আছে তাতে প্রাণের স্পন্দন, রক্তের চাঞ্চল্য। আমার কি মনে হয় জানো ? মনে হয়, ক্ষতি কি—যদি আজ সমস্ত বন্দির আর মনজিদ এক বোমে যায়। আমরা সবাই মিলে সব চাওয়া আর একত্রগুলো ভেঙ্গে মরুভূমি করে দিই—সেই মরুস্তূপের উপরে গড়ে উঠুক নূতন পৃথিবী—নূতন ভারত !'—

—'এ তোমার বড় বড় আইডিয়া, এসব ভাববার ক্ষমতা আমার নেই—বিশেষতঃ যখন আমরা প্রায় মৃত্যুর দুয়ারে'—

—'এখন আর পৃথক করে ভাববার দিন নেই। তোমরা ষ্ট্রাইক করে শুধু তোমাদের অফিসের কয়েকটী লোকের সুবিধে আনতে সক্ষম হবে না। এতে না পাবে জনসাধারণের সহানুভূতি, আর না পাবে গভর্ণমেণ্টের করুণা। সমগ্র ভারতের তুলনায় আমরা অতি নগণ্য—সেজন্যে আমরা কোনঠাসা হোয়ে পড়বো অতি সহজেই'—

—'তাহলে কি করতে হবে বলো'—

—'তার আগে আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও—সমালোচনা না করে তোমরা আমার নির্দ্দেশ মেনে চলবে'—

—'যদি যুক্তি আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না, আর সমষ্টিগত লাভ হচ্ছে'—

—'ব্যক্তিগত স্বার্থ টুকু ত্যাগ করতে হবে সমষ্টির জন্যে, আর তা যদি না পারো আমাকে তোমাদের মধ্যে ডেকো না'—

—'শুধু আমার মত হোলেই তো চলবে না'—

—'হ্যাঁ, তোমরা আলোচনা করে দেখো—তোমরা যারা আমাদের ষ্ট্রাইক কমিটির মাথা, তাদের সকলকে ডেকে একটা মিটিং করো, আমি বুঝিয়ে দোব আমার পরিকল্পনা। তোমাদের মনঃপুত হয় তোমাদের কাজে লাগতে হবে, আর তা যদি না হয় তোমরা ধর্মঘট করো করবে—আমি আফিসে যাবোই'—

সমর হয়তো কিছু বলিতে যাইতেছিল, অরুণা আসিয়া বলিল—'খাওয়া-দাওয়া কিছু করতে হবে, না যাক-যুদ্ধ করলেই চলবে ?'—

—'একটু খিদে করে নিচ্ছি বৌদি'—সমর হাসিয়া উত্তর দিল।

—'চল' ওঠা যাক্ সমর ; তোমরা ঝগড়াট করলে পারি, কিন্তু অরুণা একঘরে করলে আমার আর সমাজে স্থান হবে না'—অরন্তু হাসিতে হাসিতে উঠিয়া পড়িল।

তারপর আরও কয়েকটা দিন কাটিয়া গিয়াছে। অরন্তু আজ কয়দিন ধরিয়া অহোরাত্র পরিশ্রম করিতেছে। অরুণা সমস্ত কিছু জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিয়াছে, কেবলমাত্র অরন্তুর সময়ের অভাবের জন্যই জিজ্ঞাসা করা হইয়া উঠে নাই। সেদিন অত্যধিক বৃষ্টির জন্য অরুণার সংসারের কাজ সারা হইয়া গিয়াছিল। অরন্তু রাত্রির আহার শেষ করিয়া বিছানার উপর বসিয়া আলবোলা টানাইতেছিল। অরুণা আসিতেই প্রশ্ন করিল

—'রুণী, "মানে-মা-আমার" সেই গানটা কি বল তো ?'—

অরুণা একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিল—'কোনটা'—

—'ঐযে, যেটা প্রায়ই গাও'—

—'ও, "জয় হবে জয় হবে, হবে জয় ?"—

অত্যন্ত আরামে সিগারেটের বাকী ধোঁয়াটা ছাড়িয়া দিতে দিতে অরন্তু বলিল—'সত্যি অরুণা, জয় আমাদের নিশ্চিত'—

—'তোমরা তো ধর্মঘট প্রত্যাহার করলে'—

—'কেন করলুম জানো ?'—

—'যাতে তোমার চাকরীটা বজায় থাকে'—একটু হাসিয়া অরুণা উত্তর দিল।

—'রুণী, অতো ছোট আমাকে ভেবো না, আমার করুণা

কোনদিন বাস্তবে পরিণত হতে পারে কিনা তা জানিনে, তবে যদি আমাদের কাজে আমরা কৃতকার্য্য হই, সেটা হবে ভারতের ইতিহাসে একটা নূতন অধ্যায়।'—

—'তুমি রাগ করলে, সত্যি তোমাকে রাগাবার জন্যে বলেছিলুম কথাটা।' অরুণা অজয়ের হাত দুটো নিজের হাতের মধ্যে নিলে।

'না অরুণা, অতো শীগ্‌গীর আমি মানুষকে ভুল বুঝি না, বিশেষত আমার কাজের প্রথম প্রেরণা তো তুমিই দিয়েছ'—অজয় আদর করে বললে।

—'যাক্, কি বলবে বলছিলে বলতো'—

—'আমরা কি ঠিক করেছি জানো—একই দিনে যুগপৎ গভর্ণমেণ্টের সমস্ত কার্য্যকরী বিভাগগুলো বন্ধ করে দেবো'—

'শুধু তোমরা—এই কেরাণীরা ?'—

—'হ্যাঁ, আমাদের মতো নিরীহ মধ্যবিত্তীয় দল, যাদের না আছে সম্মান, সুখ ঐশ্বর্য্য—তবু যারা চালিয়ে যাচ্ছে অসীম দারিদ্র্যে এই আলমুড় হিমাচল গভর্ণমেণ্ট'—

—'তোমাদের বাধা দেবে তোমাদের মুসলমান সহকর্মীরা'—

—'ভুল অরুণা, তাদিকে ব্যাপারটা না বোঝালে কেন তারা আসবে বল দুঃখ ও কষ্ট বরণ করতে ?'—

—'দেরের তাদিকে টেনে আনতে'

—'নিশ্চয়ই, বিশেষতঃ যখন তারা বুঝবে এ যুদ্ধ আমাদের পাকিস্তান-হিন্দুস্থানের জন্যে নয়—এ যুদ্ধ আমাদের রুটীর জন্যে'—

—'আমি কিন্তু সব সময় বিশ্বাস করতে পারিনি ওদের, বিশেষতঃ ওদের 'প্রত্যক্ষ-দিবসের' কার্য্যকলাপ দেখে'—

—'উনত্রিশে জুলাইয়ের একতাও তো দেখেছো, সেদিন তো ওরা হোয়েছিল এক'—

—'হ্যাঁ, তা দেখেছি তবু—....'—

—'ওদের অত্যাচার ও নৃশংসের কাহিনী পড়েই তুমি অনেকটা বিশ্বাস হারিয়েছ, কিন্তু আমি হারাইনি, আমার ধ্রুব বিশ্বাস এই অশিবের মধ্যেই আসবে একদিন মিল'—

—'ভগবান সে সুদিন কি আমাদের দেবেন, যেদিন আমরা আবার ক'রতে পারবো ভাইয়ের মতো—বন্ধুর মতো, যেমন করে বাস করে এসেছি আজ কয়েক শতাব্দী ধরে'—

'—ঠিক এমনি একটা আলোচনা হোয়েছিল এক মৌলভীর সঙ্গে। তিনি আমায় বলেছিলেন "মিঃ গুপ্ত, বিচলিত হবেন না। একদিন এ আগুন নিভবেই, কেবল দুটো সম্প্রদায়ের যে রক্ত ঝরছে সেটা বেরিয়ে গেলেই" হয়তো তাঁর সঙ্গে আর আমার সাক্ষাৎ হবে না, তবু তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম আমার মাথা নত হোয়ে আসে—কেননা তিনিই বোধ হয় ঠিক বুঝেছেন'—

—'কত নির্দ্দোষ নিরপরাধ হিন্দু মুসলমান পৃথিবী থেকে সরে গেলো, কেবল কয়েকটা লোকের ভুলে। এরা জানে না পাকিস্তান আর হিন্দুস্থান'—অরুণা একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ছাড়লে।

—'আমার বিশ্বাস এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাই হয়তো শেষ দাঙ্গা, হয়তো এইটেই আমাদের দেখিয়ে দেবে সত্যের ও শিবের পথ,আলোক'—

—'যারা গেল, যারা হলো সর্ব্বহারা, যারা দিল রক্ত, তারা কি পেল বিনিময়ে ?—

—'পেলুম আমরা অরুণা, যারা নেয় তারা তো পায় না। তারা দিয়েছে বলেই আমাদের কাছে বড়। আগত যুগে তারা হ'য়ে থাকবে আমাদের কাছে অমর স্মরণীয়'—

—'শুধু স্মৃতি !' একটু শুকনো হাসি হাসিয়া অরুণা বলিল—অতীতের স্মৃতিটুকুই তো আমাদের কাছে বড়, যার উপরে গড়ে উঠেছি আমরা, আর গড়ে উঠবে আমাদের ভবিষ্যৎ'—

—'যাক্ অনেক রাত হ'য়ে গেল, আমায় বাকীটুকু বলো'—

—'হ্যাঁ, সমগ্র ভারতে সরকারের সমস্ত বিভাগের কেরাণীরা একই দিনে কাজ হোতে বুরে সরে থাকবে, যতদিন পর্য্যন্ত তাদের দাবী না মেটায়'—

—'তারপর'—

—'এতেও যদি সরকার আমাদের ন্যায্য দাবী মেনে নিতে রাজী না হয়, ২৯শে জুলাই কোলকাতায় যেমন হোয়েছিল—সমগ্র ভারতে তেমনি ধর্ম্মঘট হোবে, তাতে আর কেউ বাকী থাকবে না—শ্রমিকেরাও এসে দাঁড়াবে আমাদেরই পাশে'—

—'শ্রমিকেরা তোমাদের সঙ্গে যোগ দেবে কেন ?'—

—'তাদের ধর্ম্মঘটের সময় আমরা যোগ দোব বলে—উপরন্তু আমাদের জীবন-ধারণের মান বাড়লে তাদেরও বাড়বে, অন্ততঃ আমরা জোর করে সেটা বাড়াব'—

—'বেশ'—

—'এতে যে শুধু আমাদের সাম্প্রতিক লাভই হবে তা নয়, বরং ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের এই এসোসিয়েসন' বা সঙ্ঘ হবে একটী অপরিহার্য্য অঙ্গ। কংগ্রেস ও লীগ যেখানে মিলতে পারেনি আমরা সেখানে মিলবো'—

অরুণার চোখে স্বাধীন ভারতের সোনালী প্রভাতের স্বপ্ন। স্বপ্নের আলোটা নিভাইয়া দিয়া সে স্বামীর কোলেই শুইয়া পড়িল। বাহিরে তখন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল—তাহার মধ্যেও পাশের বাড়ীর গ্রামোফোন হইতে শোনা যাইতেছিল—

—"জয় হবে, জয় হবে, জয়
মানবের জয়ে মাটীর পৃথিবী
দানবের তরে নয়"—

কয়েকটা বছর কাটিয়া গিয়াছে। অজয়ের নেতৃত্বে সমগ্র ভারতে যে ধর্ম্মঘট সুরু হইয়াছিল তাহার ফলে সুবিধা হইয়াছে অনেকের, কিন্তু অজয়ের হইয়াছে সশ্রম কারাদণ্ড—রাজদ্রোহের অপরাধে—আর অরুণা ছাড়া পাইবে। সময় অভ্যর্থনার সমস্ত আয়োজন সারিয়া অরুণাকে লইতে আসিয়াছে। সেই সবেমাত্র সকালের কাজ সারিয়া অরুণা পূজার ঘরে যাইতেছিল। সময় পিছু হইতে ডাকিল—'বৌদি'

—'কে ঠাকুরপো ?'—

—'হ্যাঁ, আমার একটা অনুরোধ আছে'—

—'বলুন'—

—'আপনাকে যেতে হবে'—

—'কোথায় ?'—অরুণা প্রশ্ন করিল।

—'হরন্ত আজ আসবে—তাকে অভ্যর্থনা করতে'—

—'তুমি তো সব জানো ঠাকুরপো' অত্যন্ত বেদনার সহিত অরুণা বলিল।

সমর চুপ করিয়া রহিল।

—'প্রদীপ ছিলো তাঁর অত্যন্ত স্নেহের—সে নেই। তার পরে যে এদের সেও ছেড়ে গেছে'—অরুণার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া এল।

—'ক্ষমা করো বৌদি, হরন্ত আসবে সেই আনন্দে তোমাকে দুঃখ দিতেছি'—

চোখের কোণের জল মুছিয়া অরুণা বলিল—'সত্যিই আজ আনন্দের দিন ঠাকুরপো, একদিন আমিই তাকে এ কাজে নামতে বলেছিলাম—কিন্তু আমি—মা।'—

সমর আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। পথে যাইতে যাইতে তাহার মনে পড়িল—একদিন এই অরুণাকেই সে 'অপরূপ, অপূর্ব' বলিয়া পাগলামি দিয়াছে। কিন্তু আজ সে মাত্র তাহাদেরই জন্য সর্বস্বান্ত। কে জানে, অরুণা উপস্থিত থাকিলে হয়তো প্রদীপ বাঁচিয়া থাকিত, খোকা মারা যাইতো না। হরন্তের আজ সব গিয়াছে—তাহার বিনিময়ে সে পাইবে শুধু সম্মান, শ্রদ্ধা ও অভ্যর্থনা। মানুষের পারিবারিক জীবনে ইহার দাম কি? যাহাদের লইয়া হরন্ত সুখের সংসার বাঁধিয়াছিল, তাহারা আশা, আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল তাহারাই আজ নাই। অরুণা আজ শুধু একটা ঐশ্বর্য কায়া—হয়তো তাহারা হরন্তের এই ত্যাগকে বড়ো করিয়া দেখিবে কিন্তু তাহাতে হরন্তের কি লাভ। বরং তাহাকে আরও অধিকতর দুর্যোগের সম্মুখীন হইতে হইবে। আজ এর জন্য যদি কেউ বাকী থাকে তো একমাত্র সে। সেই এই সুখী পরিবারে আনিয়া দিয়াছে বিরহ, বিচ্ছেদ, বেদনা ও দুঃখ। আত্ম-গ্লানিতে সমরের মন ভরিয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল এই শুভযাত্রা অভ্যর্থনার আজ দাম কি? কিন্তু সমাজ, লোকাচার? সেখানে যে এই প্রাণহীন আড়ম্বরেরই প্রয়োজন। উপায়ন্ত আজ সে যদি হরন্তকে অভ্যর্থনা না করে, তাহা হইলে সে তাহার ক্ষত স্থানে প্রলেপ দিবে। জয়ের মালা আজ সেই তাহাকে পরাইবে। সমীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ষ্টেশনের কোলাহল, লোকের কর্ণ খাড়তার মাঝে সে উদগ্রীব হইয়া রহিল—প্রতি মানুষের পদক্ষেপ যেন তাহার বুকে আঘাত করিতে লাগিল, মনে হইল সমীর, যেন কতো অপরাধ করিয়াছে। তাহার সমস্ত সংকোচকে দূর করিয়া দিল হরন্তের মিলিত হাসি। কারাগারের পীড়নে যেন সে আরও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। যতটুকু গ্লানি ও ক্লেদ ছিল, তাহা দূর হইয়া গিয়া হরন্ত হইয়াছে আরও উজ্জ্বল ও ভাস্বর।

মালা প্রতিষ্ঠানের অভ্যর্থনা গ্রহণ করিয়া হরন্ত যখন আসিল—তখন মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অরুণা তখনও পূজার ঘরে বসিয়া আছে—পৃথিবীর এতো কোলাহল, এতো আলো, সব যেন তার কাছ হইতে বহু দূরে।

হরন্ত অত্যন্ত স্নেহে ডাকিল—'অরুণা ?'

অরুণা কিছু বলিতে পারিল না, স্বামীর বুকে মাথা লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। হরন্ত আরও স্নেহের সহিত বলিল—'প্রদীপ স্বেচ্ছায় কাঁদবো, ছিঃ! এতে তার অকল্যাণ হবে। যেকে ভালবাসতে গেলে এর চেয়ে বড় দুঃখ সহ্য করতে হয়। আমরা যেন কি জানি না বলেই এই সামান্য আঘাত সহ্য করতে ভয় পাই। সত্যিই আমার কোন দুঃখ নাই, অরুণা। প্রদীপকে হারিয়েছি সত্য। কিন্তু তার বদলে পেয়েছি কত অগণিত প্রদীপকে—যারা আলিঙ্গন দিয়েছে আমার প্রাণে দেশ-প্রেমের আলোক। ভগবানে তো সমস্ত বাধা আমার কাছ হোতে আজ নিয়ে নিয়েছেন—তাঁর কাজে, দেশের স্বাধীনতার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারবো বলে। দুঃখ কি অরুণা? আমাদের দুজনার ত্যাগে যদি একাধিক ব্যক্তিরও দুঃখ মোচন হয় সেই তো আমাদের পরম লাভ। দুঃখ পেয়ে দেশকে আমি চিনেছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তাকে যেন কোনদিন আর না ভুলি। সেই দেশ আমার ডাকছে—চলো। একদিন তুমিই তো আমায় প্রেরণা দিয়েছিলে। তুমি তেমনি আমার পাশে দাঁড়াও—আমি আমার ক'াপিয়ে পড়ি। এখনও যে আমাদের অনেক দূর চলতে হবে'—

অরুণার বুক হইতে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া গেল।

ব্রাহ্মণের অপেক্ষারত ছেলের দল ফিরিবার পথে গাহিয়া যাইতেছিল

—'কদম্ কদম্ বাড়ায়ে যা'—

কেদার-সাহিত্যের কিঞ্চিৎ

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-টি

(২)

কেদারবাবুর অনেক রচনার মধ্যেই কেদারবাবুর হাস্যরসটি করুণ-রসের স্নেহ-সিক্ত হইয়া অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে।

ঘটনা-বৈচিত্র্য-সৃষ্টির মধ্য দিয়া যে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়, যাহার মধ্যে হৃদয়ধর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তির সাড়া জাগিয়া হাস্যের উদ্রেক হয়, সে জাতীয় জিনিষ যে কেদারবাবুর রচনার মধ্যে নাই, তাহা নহে। তবে তাহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য নহে।

রবীন্দ্র মৈত্রের "উপেক্ষিতা" "পুনর্ম্মিলন" প্রভৃতি গল্পে যে হাস্যটি জমিয়া উঠিয়াছে তাহা ঘটনা-সংস্থান-জনিত ; তাহাতে বুদ্ধির চেতনাই বিশেষভাবে দোলা দিয়া উঠে, হৃদয়ের কোমল অনুভূতিতে তেমন ঘোড়ে মনুপে না। ঘটোৎকচ কর্ত্তৃক মাতার পায়ের জন্য হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ নরভোজ্য (ভীম) টির গৃহে আনয়ন, পরে এই ভুলের ব্যাপারে বিড়িম্বা-ভীমসেনের পুনর্ম্মিলন এবং অপর্য্যাপ্ত বস্ত্রাবৃত রাক্ষসী-সুন্দরীর অপ্রত্যাশিত দর্শন-মিলনে অপ্রতিভ হইয়া পলায়মানের পৃষ্ঠ দেখিয়া আমরা হাসিয়া উঠি বটে, কিন্তু তাহাতে কান্না ঠিক আসে না।

কেদারবাবুর অনেক ছোট গল্পে এই জাতীয় মিশ্রক হাস্যরসের উপাদান যে আমরা পাই না, তাহা নহে। পুলিসের হস্ত হইতে মৃত গোরুটিকে উদ্ধার করিবার জন্য পিছন হইতে মোহনলাল হঠাৎ যখন তাহার পৃষ্ঠে বেহেড্ডা তালের আঘাত করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে চার পা উর্দ্ধে তুলিয়া জন্তুটী উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল, তখন সত্য সত্যই আমরা হাসিয়া উঠি ; তাহার পর চেলুটির ভূমিকায় কচু রায় যে-ভাবে এই "সরকারী মাল ছিনিয়ে নেওয়া" ছেলেদের পুলিসের হাত হইতে রক্ষা করিল, তাহাতেও আমাদের হাসি আসে। তবে এ হাসির সঙ্গে অন্তর কোনও আত্মীয়তা নাই। কিন্তু কেদারবাবুর অনেক গল্পেই তাহা আছে ; তাঁহার অধিকাংশ ছোট গল্পের মধ্যেই হাসিতে হাসিতে কখনও বা আমাদের চোখের পাতা ভারী হইয়া আসে, কখনও বা চোখ খুলিয়া গিয়া নূতনতর দৃষ্টি দিয়া আমরা জগৎকে দেখিতে আরম্ভ করি। "আমরা কি ও কে" নামক পুস্তকের অনেক গল্প সম্বন্ধেই এই কথাটা খাটে।

শুধু রস-রচনা ও হাস্য-রসিকতার জন্যই কেদারবাবুর বৈশিষ্ট্য, এই প্রকার ধারণা করিলেও ঠিক হইবে না। তাঁহার কয়েকটি রচনার মধ্যে করুণ রস এমন ভাবে জমিয়া উঠিয়াছে যে হাস্যের ঠিক অবকাশ-টুকুও যেন পাওয়া যায় না। "শর্ব্বিতা রাজকুমারীর মতই মাথা উঁচু করিয়াই যে জীবন কাটাইয়াছে সেই পুরন্দরীর মৃত্যুর সময়ের করুণ দৃশ্যটি আমাদের অভিভূত না করিয়া পারে না। তাঁহার একমাত্র কন্যা তাহার পাশে বসিয়া আছে দেখিয়া পাছে তাহার কষ্ট হয়, সেই জন্য তিনি "মরণের সঙ্গে কন্যাকস্তি করিয়া" নিজের মুখের মৃত্যু-যন্ত্রণার কুঞ্চনগুলিকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। এমন সময় মেয়েকে কাঁদিয়া উঠিতে দেখিয়া পুরন্দরী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "গিরি কাঁদিসনে মা, মাথা ধরবে"।

মৃত্যুপথযাত্রী মা—মেয়ের মাথাধরাটুকু পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারেন না।

তাঁহার উপন্যাসগুলির মধ্যে গতির তীব্রতা ও ঘটনার জটিলতা নাই বলিয়া অনেকে অনুযোগ করেন। এ অনুযোগ বৃথা। তরী পালে যে নৌকা চলে, তাহাতে সওয়ারের ইচ্ছার গতিবেগ না থাকিলেও তার নিজের একটা ছন্দ আছে। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস ও গতির তীব্রতা ও ঘটনার জটিলতা যথেষ্ট প্রাণে ; কিন্তু তাহার মধ্যে উচ্চকোটির সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। সাহিত্য খানিকটা অবসরের জিনিষ। ঘটনার উপর দিয়া মেলট্রেণের গতিতে তাহা চলিতে চাহে না, সে আস্তে আস্তে, ধূঁটিনাটি দেখিতে দেখিতে চলে, পথে চলিতে চলিতে পথ প্রান্তের বন কুসুমটিকেও অবহেলা করিতে পারে না, তাহার জন্যও খানিকটা দাঁড়ায়, তাহার গতি বিলম্বিত হইবে এ ভয় তাহার করে না। তাহার পথ-চলা কেরাণী ডেলিপেসেঞ্জারের ট্রেণ ধরার মত নহে, বিলাসীর সান্ধ্য ভ্রমণের মত।

"কেদারবাবুর মতে উৎকৃষ্ট রচনার রীতি কিরূপ হওয়া উচিত" এ প্রশ্নের উত্তর কেদারবাবুর বিদায় প্রয়োজন হয় নাই। কারণ বঙ্কিমবাবুকে যেমন প্রতিপক্ষ দলের সহিত তাঁহার আদর্শ লইয়া বাদপ্রতিবাদ করিতে হইয়াছিল, প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে যেমন "বীর বলী" তাঁহার জন্য ওকালতি করিতে হইয়াছিল, Wordsworth প্রভৃতিকে যেমন poetic diction লইয়া লড়াই করিতে হইয়াছিল, কেদারবাবুকে সেরূপ কিছু করিতে হয় নাই। ফলে তাঁহার রচনার আদর্শ সম্বন্ধে তাঁহাকে কিছু বলিতে হয় নাই। তথাপি তাঁহার যে একটি বিশিষ্ট রীতি আছে, তাহা তাঁহার লেখা দেখিলেই বুঝা যায়। তিনি নিজেও যে এ সম্বন্ধে একেবারেই কিছু বলেন নাই এমন নহে। তাঁহার চীন-যাত্রী নামক পুস্তকের ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন—

"রচনাটি যাহাতে একটা বিবরণ বা কাজের কথা হইয়া না দাঁড়ায় তাই আনন্দের আবরণে জ্ঞাতব্য কথাগুলি বলিবার প্রয়াস পাইয়াছি" এই যে "আনন্দের আবরণে" জ্ঞাতব্য বস্তু বলিবার প্রয়াস, ইহা কেদারবাবুর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

তাঁহার "কাশীর কিঞ্চিৎ" নামক কবিতা পুস্তকে এই বৈশিষ্ট্যটি চমৎকার ফুটিয়াছে। ইহার মধ্যে একটি "ডাইরেক্‌টনিস" সমগ্রতা আছে, অথচ ইহার মধ্যে যে একটি চমৎকার সরস ব্যঙ্গের সুর ঝঙ্কৃত

হইতেছে, তাহার উপযোগিতা অল্প নহে, কবির দৃষ্টিতে কিছুই যেন বাদ পড়ে না।

কাশীতে পদার্পণ মাত্রই ষ্টেশনে রেলের কুলির জুলুম, গুণ্ডি-পাণ্ডা চুরীর অত্যাচার পার হইয়া কবি "একায় বসে ঘোড়া দেখে হিন্দুর মক্কা" বিশ্বনাথের পুরীতে আসিলেন, আসিয়া দেখিলেন বিশ্বনাথ কাঁকড়া হইয়া বসিয়া আছেন এবং "রাজা ভূতে ঘুরে ঘুরে ডিম পেড়েছেন কলে"। কাশীর "ঝিলিবিলি কিলি কিলি" গলিগুলির "ঘুরোওয়ার্কিক্ হ'তে হ'লে দুচার জনম চাই"।

কিরূপ বলিয়া ইহাকে বুঝিবার জো নাই। মেনির মাসী, পুঁটির পিসি, পাঁচী, চাঁপা দাসী, সকলেরই সন্ধান মিলিবে, অন্যান্য সুবিধা ও প্রচুর—

"বারোবর্ষী পালকরা দাই এলোচুল কাশী
নির্ভাবনায় তীর্থবাস করুন সবাই আসি।"

অধিবাসীদের মধ্যে বৃদ্ধা ও প্রৌঢ়ার সংখ্যাই বেশী, বৌমাদের সুব্যবস্থায় পাঁচ সাত টাকা মাসোহারায় খোপে খোপে পায়রার মত ঘোঁয়াঘেঁষী করিয়া তাঁহারা কাশীবাসী হইয়া আছেন। বৌমারা হিসাব জানেন,

"ঘোলে সেধা শ্রাদ্ধ নাই সেটাও মাত"

এবং তাঁদের আপত্তি

"সাত টাকাটা যেথায় বেশী চার টাকায় ঘর চোলে
মাগী কেবল সুখ খাটাবে ভূতে পুটবে নোলে"

বাঙ্গালীটোলার বিরাট গোলকধাঁধার মধ্যে কবি যেন বিষজ্বালার রূপ দেখিতে পান: সেখানে

"জন্ম মৃত্যু বিয়ে
মারামারি কাটাকাটি ঝগড়া বিবাদ নিয়ে"

হরপঠ পেলা ও চক্রিশ ঘাটের বাঙ্গালী অন্ধকারে কূপের মত স্থানে কিল বিল করিতেছে; এক বাড়ীতে বাইশ উনুনের ধোঁয়া, উপর তলার সহিত নিচের তলার জলের জল লইয়া বিবাদ,—এই লইয়া তাহাদের জীবন। কাজের 'ছুটির' বেশ 'রেওয়াজ'—সকালে প্রাতঃস্নান সারিয়া বিশ্বনাথ হইতে হনুমানজীর পর্য্যন্ত মাথায় জল ঢালিয়া দু পয়সার বাজার করিয়া (তাহার মধ্যে বিড়ালের মাছ ও পাখীর পেয়ারাও আছে) বাড়ী ফিরিয়া আসা, তাহার পর রন্ধন, আহার এবং অহারান্তে পাঠ, কোলাহল, ঘুমের হিসাব, ঘটকালী প্রভৃতিতে দিন কাটিয়া যায়—তবে—

"আমাদের তপস্বীরা সব বোসেন বসে উল
পরিশ্রমের মধ্যে শুধু গাঁথেন নিজের চুল"

এইভাবে একটা রস সৃষ্টি দিয়া কবি সব কিছুই দেখিয়া যাইতেছেন, কাশীর "শ্রী দাঁড় মহাশয়", "শ্রীমান্ বানর", "বাহা ইঁদুর", বেল গাছ, বড় বড় অবধূত—যাঁহারা "বড়লোকের বংশরক্ষা করেন দিয়ে পুত্র" এবং যাঁহাদের উদরে "বড় বড় ভাগ্যবানের সারেও বহুমূত্র"—এই সব কিছুই কবির নজরে পড়িয়াছে। ইহার শুদ্ধ যেমন চালসর্ব্বস্ব ফোতো-বাবুদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—

"হেড়া ধরে তুড়ি মারে টানা শীত গেয়ে
গোচে গাচে বাবু হন পচা পাল চেয়ে
কোন রূপে পিত্তি রক্ষা এ'টো কাঁটা খেয়ে
শুদ্ধ হন যেনো গাঙ্গে যেনো জলে নেয়ে।"

কেদারবাবুও সেইরূপ কাশীর বাঁদরের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন

"সহরের রস পেয়ে সব গরীবের ছেলে
গ্রামেতে ফেরে না যেমন শীত পালানে ছেলে
মা জুটুক আর নেটে, মা থাকুক আর
পাঁচ আড্ডায় ঘুরে তবু তা সিগারেট পায়"

কখনও বা তাহার বর্ণনা—কাশীর সবলা, প্রগতিসম্পন্না নারীদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে

"রাস্তাতেই হয়েছে তাদের সবের বৈঠকখানা
দল বেঁধে সব চেঁচে তুলে যায় মেলে সিল্কের ডানা,
পান চিবিয়ে মুচ্ হাসি ঘোম্টা পরে পথে
ভদ্রেরা সব পাশ কাটিয়ে সরেন কোনও মতে।"

এইভাবে যেখানেই তিনি লঘুতা বিচ্যুতি বা অসঙ্গতি দেখিয়াছেন—তাহাকেই বিদ্রূপের আক্রমণ করিয়াছেন—কিন্তু তবুও তাহাতে কেহই যেন কবির প্রতি ক্রুদ্ধ হইবার অবকাশ পায় না। তাহার কারণ কেদারবাবুর ব্যঙ্গের মধ্যে বিদ্রূপ থাকিলেও Pope-এর Satire and Epistles প্রভৃতির মধ্যে যে রকম ব্যক্তিগত আক্রমণ আছে, কেদার-বাবুর মধ্যে সেটি নাই। Shakespeare-এর Jaques-এর মত তিনি যেন বলিতে পারেন

"My taxing like wild goose flies
Unclaimed of any man."

মনের সরসতাকে বজায় রাখিয়া লোকের বিচ্যুতিগুলি আলোচনা করা, তৎসম্বন্ধে মধুর রসে পরিবেশন করা বাস্তবিকই ক্ষমতার কাজ, এবং কেদারবাবুর সে ক্ষমতা আছে, এবং "আনন্দের আবরণে জ্ঞাতব্য কথাগুলি বলিবার প্রয়াস" তাঁহার "চীন যাত্রীতে"ও যতটা সার্থক হইয়াছে, কাশীর কিঞ্চিৎএও সেইরূপ হইয়াছে।

সত্যের সহিত এই যে আনন্দের মিশ্রণ, এটা সাহিত্য সৃষ্টির একটা খুব বড় কৃতিত্ব—এর মধ্যে যে শুধু ভারতীয় "সত্য শিব সুন্দরের" আদর্শই আছে তাহা নহে, Walter Pater প্রভৃতি পাশ্চাত্য সমালোচকও বলিয়াছেন—সাহিত্যের সামগ্রী শুধু truth নহে, তাহা হইতেছে "fineness of truth"

ধারাল কথাবার্ত্তার বাগ্‌প্রতিবাদ যেমনে প্রত্যেক বাক্যের মধ্যেই হয়ত এখানে ওখানে এমন কতকগুলি সরস ছাতিমান ইঙ্গিতের সন্ধান পাওয়া যায়, যাহা কবির হীরক-খণ্ডের মত বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন

ভাবে কিরণ সম্পাত করে—সেগুলি সাহিত্যিকের সত্যই গৌরবের জিনিষ। কেদারবাবুর সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে এই জাতীয় বাক্য সৃষ্টির কৌশল প্রায়ই দৃষ্ট হয়। এই বাক্যের জালে গল্পের ছট্ হঠাৎ মাঝে মাঝে মন্থরগতি হইয়া পড়ে, কিন্তু রসাস্বেষী পাঠকের কাছে তাহাতে সাহিত্যের আকর্ষণ ক্ষীণ হইয়া পড়ে না। তাই তাঁহার ছাড়ুড়ী মশাইয়ের আচার্য্য, ইত্যাদি—প্রভৃতির কথাবার্ত্তাগুলি সত্যই আমাদের উপভোগের সামগ্রী হইয়া উঠে। প্রবাসী "মাড়োপুরের" চালসর্ব্বস্ব বাকসর্ব্বস্ব বাঙ্গালী সমাজকে আচার্য্য যে ভাবে বিদ্রূপ করেন,—তাহা তিনি সজ্ঞানেই করেন, তবে তাঁহার "পোজ্"টি এত নিখুঁত হয় যে—যাহাদের তিনি বোকা বানাইতে চাহিতেছেন তাহারা তাহা বুঝিতে পারে না। তবে আমরা যখন তাঁহাকে একান্তে বলিতে শুনি "পাগল নাকি—মোটর আবার কায়? তবে ওরা ট্রেণ্ডলোকেই দুনিয়ার পরমার্থ বলে জানে, ওদের কাছে ওর মনে মা বাপের চেয়ে ঢের বেশী। ওর দাম না করলে কি রক্ষা ছিল।"—তখনই আমরা বুঝিতে পারি—আচার্য্য মহাশয় কি ভাবে তাহাদের বোকা বানাইয়া মজাইতে পারেন।

এই কথাবার্ত্তার বাদপ্রতিবাদের কৌশল ছাড়া আর একটি জিনিষ কেদারবাবুর সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে আমাদের নজরে পড়ে। তাহা হইতেছে তাহার শব্দসৃষ্টির কৌশল। বৃদ্ধ রামাবতারের যেমন তাঁহার আদরের নাতী-নাতনিদের সঙ্গে কথাবার্ত্তার সময় কখনও বা তাহাদের একটি আদুরে নাম দিয়া আসল নামটি বিকৃতভাবে উচ্চারণ করিয়া, কখনও বা অতিরিক্ত-অতিরিক্ত নূতন নাম, নূতন কথার সৃষ্টি করিয়া মুখ টিপিয়া হাসেন ও সকলকে হাসান—কেদারবাবুও অনেকটা সেই রকম করেন। Rosearch Scholarকে তিনি বলেন 'চুন্টু পণ্ডী' 'ভূমিকা'কে বলেন "ভামিকা",—মর্শের "লালিমার" অনুকরণে সৃষ্টি করেন "ভালিমা" "খাপেলিমা"—এই জাতীয় বহু কথা কেদারবাবুর সাহিত্যের মধ্যে মিলিবে;—কখনও কখনও অনুপ্রাসটি তিনি কাজে লাগান;—তাঁহার "ধরায় ধরিয়া" "ভণ্ট্ ভৈরবের জাঠ—" "কজ্জলের মোজ্জল লাগা" প্রভৃতি সৃষ্টিও প্রচুর আছে। শব্দ রচনার অন্যান্য কৌশলও আছে—যথা "ডেরিয়ে ডেরিয়ে (ত্যাজ দিয়ে দিয়ে) চিকিয়ে চিকিয়ে কথা কওয়া" "বাঁদুরে আমড়" "পূর্ণগর্ভ চটের থলি" "মাইক্রস্-কোপিক্ চাহনি" "all-clothed (ভূষিত) হওয়া ইত্যাদি—

তাঁহার ইঙ্গিতগুলিও কম শক্তিশালী নয়। সুরমার বাঁকের (কথার) কায়দের যে বিষ আছে তাহা বীরাজবাবু জানাইতে চান। তাই তিনি ঢেঁপিষ্টু নির্ম্মলবাবুকে নিরীহ ভাল মানুষের সরল কৌতূহল লইয়া জিজ্ঞাসা করেন

"আচ্ছা সাপ কি দাঁত দিয়ে বিষ ঢালে"?

সুরমা বাধা দিয়ে বলেন—"না ল্যাজ দিয়ে"

নির্ম্মলবাবু বুঝাইতে থাকেন—"সাপের দাঁতে সুদ্ধ ছিদ্র থাকে, তাই দিয়েই বিষ ঢেলে দেয়—বিষের থলি ওদের দাঁতের গোড়াতেই থাকে কিনা"

বীরাজবাবু বলেন—"এই ঠিক কথা তবে শরৎবাবু জিভ দিয়ে ঢালার কথা লিখলেন? তাই বা আমার—"

মেয়েরা—মাকে হাত ধরিয়া টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া যায়।

Wordsworth তাহার Poetry and poetic diction-এর বিষয়ে যাহাকে "degrading thirst after outrageous stimulation" বলিয়াছেন,—তাহাকে বর্জ্জন করিয়া,—সুলভ ভাবালুতা ও ভাবোচ্ছ্বাসতা হইতে দূরে থাকিয়া,—পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তিকে সজাগ রাখিয়া,—মর্ম্ম-বিদারণ-কারী ঘটনা সমাবেশে পাঠকের মনকে অস্বাভাবিক অভিভূত না করিয়া ধারাল ও ইঙ্গিতময়ী বাক্‌চাতুর্য্যের মধ্য দিয়া, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও উপমার মধ্য দিয়া, কেদারবাবুর গল্পগুলি অগ্রসর হইতে থাকে।

যাঁহারা স্থূলত্ব হাস্যরসের খোরাক পাইবার জন্য তাঁহার রচনা পড়িবেন তাঁহারা হয়ত ব্যর্থমনোরথ হইতে পারেন, যাঁহারা চমকপ্রদ ঘটনার দ্বারা চিত্তের thrill খুঁজিতে চাহেন তাঁহারা কেদার সাহিত্যের মধ্যে বিশেষ কিছু পাইবেন না, হয় অথবা পর্দার জন্য তাঁহার রচনা বিশেষভাবে উপযোগী নাও হইতে পারে—কিন্তু রসিক পাঠকের তাহাতে কিছু আসে যায় না; তাঁহারা কেদার সাহিত্যের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব আস্বাদের সন্ধান পাইবেন এবং তাঁহার রচনাগুলি পড়িতে পড়িতে মনে মনে ভাবিবেন—"এ জাতীয় রচনা ত বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী দেখা যায় না"!

ভলটেয়ার

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

পাশ্চাত্যের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দীর একটী বিশিষ্ট স্থান আছে। এই শতাব্দীতে আমেরিকা ইংলণ্ডের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া জাতি-সংঘের মধ্যে আপনার স্বতন্ত্র স্থানের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই শতাব্দীতেই ফরাসী জাতি স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর জন্য উত্তোলিত করিয়া স্বদেশে স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন এবং অত্যাচারপীড়িত জনগণের মধ্যে নূতন আশা ও আকাঙ্ক্ষার উদ্বোধন করিয়াছিল। যে সমস্ত মনীষী মানবের ইতিহাসের এই অভিনব অধ্যায়-রচনায় সাহায্য করিয়াছিলেন, ভলটেয়ার তাঁহাদের অন্যতম। ভিক্টর-হিউগোর মতে "ভলটেয়ারের নাম উচ্চারণ করিলেই অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশেষত্বের বর্ণনা করা হয়।" সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দী তাঁহার প্রতিভার জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল। সুধার, ক্যালভিন প্রভৃতি ধর্মসংস্কারকদিগের অপেক্ষাও কঠোরতরভাবে তিনি কুসংস্কার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। শিরাবো, রাসীন, মলিয়ার ও কোর্‌নেলিয়ের যে অস্ত্রের দ্বারা প্রাচীন সমাজের সংস্কারসাধন করিয়াছিলেন, তাহার উৎপাদনে তিনি প্রচুর সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি অসাধারণ জীবনীশক্তির অধিকারী ছিলেন, এবং এই শক্তির প্রয়োগ করিয়া অসত্যকে সত্যচ্যুত করিয়াছিলেন।

ভলটেয়ার যখন জন্মগ্রহণ করেন, চতুর্দশ লুই তখন ফ্রান্সের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। অসাধারণ ক্ষমতাশালী এই রাজার ৭২ বৎসর-ব্যাপী রাজত্ব সবে শেষ হয়, (১৭১৫ খৃষ্টাব্দে) তখন ফ্রান্সের প্রজার স্বাধীনতার কথামাত্রও অবশিষ্ট ছিল না। তখন রাজকর্মচারীদিগের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার সম্মুখে বিষম করভারে পীড়িত প্রজাবৃন্দ সম্পূর্ণ, পুরোহিত সম্প্রদায় (Church) দুর্নীতির ও কলুষ পঙ্কে নিমজ্জিত, সমাজের সর্বস্তর কদাচারে কলঙ্কিত। দেশের ও সমাজের এই অবস্থা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে যাঁহারা লেখনি ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ভলটেয়ার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিলেন। ষোড়শ লুই যখন কারাগারে বন্দী, তখন ভলটেয়ার ও রুশোর গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন, "এই দুইজনের দ্বারাই ফ্রান্সের সর্বনাশ সাধিত হইয়াছে।" মা-দাম্ভিন লিখিয়াছেন, "কার্যের দ্বারা যদি লোকের বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে ইউরোপের আধুনিক সাহিত্যিকদিগের মধ্যে ভলটেয়ারকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিতে হয়। শনৈঃ শনৈঃ সেই জীর্ণ যুগের ধ্বংসসাধন করিবার জন্য নিয়তি তাঁহাকে অশীতিবর্ষ পরমায়ু দান করিয়াছিল। এই বীর পরমায়ুকালের মধ্যে কালের সহিত সংগ্রাম করিবার সময় তিনি পাইয়াছিলেন। যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, জয় তখন তাঁহার করতলগত।"

ভলটেয়ার দেখিতে কুৎসিত ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে দম্ভ ও চপলতা পূর্ণমাত্রায় বর্তমান ছিল। অশ্লীলতাও অসাধুতারও অভাব তাঁহাতে ছিল না। তদানীন্তন কালের যাবতীয় দোষ-ত্রুটীই তাঁহার চরিত্রে ছিল। কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণে করুণার বসন্তধারা অবিচ্ছেদে প্রবাহিত হইত। পরের উপকারের জন্য শ্রম ও অর্থব্যয়ে তিনি অকুণ্ঠিত ছিলেন; বন্ধুদিগের সাহায্যে তাঁহার হস্ত সতত উন্মুক্ত ছিল, এবং সত্যের বিরুদ্ধে তাঁহার লেখনি সর্বদা উদ্যত থাকিলেও মিলনপ্রয়াসী প্রতিদ্বন্দ্বীর হস্ত তিনি প্রত্যাখ্যান করিতেন না।

কিন্তু এই সমস্ত দোষগুণ ভলটেয়ারের চরিত্রের প্রধান কথা নয়। তাঁহার চরিত্রের সার ছিল তাঁহার অনুকরণীয় মানসিক সম্পদ—তাঁহার মনের অফুরন্ত ধারণাশক্তি ও সৃষ্টিশক্তি। বিরামবিহীন যাঁহার গ্রন্থে নিবদ্ধ তাঁহার রচনার প্রতি পৃষ্ঠায় তাঁহার প্রতিভা প্রতিফলিত। যে কোন বিষয়েই তিনি লেখনী নিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহার মনের উচ্ছলা রচনা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি যাহা চিন্তা করি, তাহা প্রকাশ করাই আমার ব্যবসায়।" যাহা তিনি চিন্তা করিয়াছেন, তাহা বলিবার প্রয়োজন ছিল এবং যাহা তিনি বলিয়াছেন, তাহা দুইভাবেই বলিয়াছেন। বর্তমানে তাঁহার লেখা অধিক লোকে পড়ে না। তাহার কারণ, তিনি যে যে বিষয়ে লিখিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে বর্তমানে লোকের কৌতূহল নিবৃত্ত হইয়াছে। যে যে সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাঁহার জয়লাভের সঙ্গে তাহাদের সীমাংসা হইয়া গিয়াছে।

ভলটেয়ারের কর্মক্ষমতা অসাধারণ ছিল। কখনও তিনি নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিতেন না। তিনি বলিয়াছেন, "কার্যে ব্যস্ত না থাকা আর অস্তিত্বের বিলোপ একই কথা। যাহারা অলস, তাহারা ব্যতীত আর যাবতীয় লোকই ভাল।.....যতই আমার বয়স বাড়িতেছে, ততই কর্মের প্রয়োজন অধিক পরিমাণে উপলব্ধি করিতেছি।... যদি আত্মহত্যার ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে সর্বদাই কর্মে লিপ্ত থাক।"

জীবিতকালে এত প্রভাব বিস্তার করিবার সৌভাগ্য অন্য কোনও লেখকেরই হয় নাই। কারাগার, নির্বাসন, রাষ্ট্র ও চার্চ কর্তৃক পুস্তকের প্রকাশ-নিষেধ, কিছুতেই তাঁহার প্রভাব খর্ব করিতে পারে নাই। সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া তাঁহার বাণী চতুর্দিকে প্রচারিত হইয়াছিল। সমগ্র জগৎ তাঁহার কথা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, রাজতন্ত্র ও পোপের সিংহাসন কম্পিত হইয়াছিল। অত্যাচার সহনশীল ফ্রান্সকে তিনি চিন্তা করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই চিন্তার ফলে ফরাসী জাতি স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল।

১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে প্যারিস নগরে ভলটেয়ার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ নোটারী (Notary) ছিলেন। মাতাও ছিলেন সম্ভ্রান্তবংশের কন্যা। পিতার নিকট তিনি পাইয়াছিলেন কোপন স্বভাব এবং বৈষয়িক বুদ্ধি, মাতার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন চরিত্রের তরলতা ও মৈত্রী। তাঁহার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। এই ক্ষুদ্রকায় শিশুর বাঁচিয়া থাকিবার আশা কেহই করে নাই। কিন্তু

তাঁহার মৃত্যু হয় ৮৪ বৎসর বয়সে। এই দীর্ঘজীবনে অনবরত তাঁহাকে পীড়ার সহিত যুঝিতে হইয়াছিল।

ভলটেয়ারের পিতৃদত্ত নাম ছিল ফ্রানকয় মেরী এরাউয়েট্ (Francoi Marie Arouet)। ফ্রান্কয় লিখিতে শিখিয়াই কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। দেখিয়া পিতা বুঝিলেন, এ ছেলে কোনও কাজের হইবে না। কিন্তু তৎকালীন বিখ্যাত বারনারী নাইনন্ (Ninon de L' Enclos) বালকের আকৃতিতে তাহার গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের নিদর্শন দেখিতে পান, এবং মৃত্যুকালে পুস্তক ক্রয়ের জন্য দুই হাজার ফ্রাঙ্ক তাহাকে দান করিয়া যান। এই অর্থ দ্বারাই তাঁহার বাল্যশিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া ফ্রানকয় সাহিত্যসেবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে পিতা বলিলেন, "আত্মীয়ের গলগ্রহ হইয়া যে থাকিতে চায়, অথবা অনাহারে মরিতে চায়, সাহিত্য তাহাদেরই জন্য।" কিন্তু ফ্রানকয় জীবিকার জন্য সাহিত্যই অবলম্বন করিলেন।

ফ্রানকয় যে খুব অধ্যয়নশীল ও শান্তস্বভাব ছিলেন তাহা নয়; দ্বিপ্রহর রাত্রির পূর্ব্বে তিনি গৃহে ফিরিতেন না; উৎপথগামী বন্ধুদিগের সহিত হুল্লোলে তাঁহার অনেক সময় অতিবাহিত হইত। বিরক্ত হইয়া পিতা তাঁহাকে কেইন (Caen) নগরে এক আত্মীয়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন, এবং যাহাতে কাহারও সহিত তিনি মিশিতে না পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য আত্মীয়কে বলিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু ফল হইল না। ফ্রানকয়কে সবরই কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইল। ইহার পরে ফরাসী রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে তিনি হেগ (Hague) নগরে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু সেখানে গিয়াই তিনি এক যুবতীকে ভালবাসিয়া ফেলিলেন। তাহার সহিত গোপনে সাক্ষাত করিতে এবং চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। চিঠিতে প্রায়ই লিখিতেন, "চিরজীবন আমি তোমায় ভালবাসিব।" ব্যাপারটী ধরা পড়িবার পরে দূতে ফিরিয়া করেক সপ্তাহ তিনি তাঁহার প্রেমিকাকে সত্যই মন রাখিয়াছিলেন।

১৭১৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রানকয় প্যারিসে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার অল্পকাল পরেই চতুর্দ্দশ লুইএর মৃত্যু হইল। পঞ্চদশ লুই তখন নিতান্ত শিশু। রাষ্ট্রের পরিচালনার জন্য একজন Regent নিযুক্ত হইলেন। Regentএর সময়ে প্যারিসে আমোদ-প্রমোদের ঢেউ বহিয়া গেল, ফ্রানকয় সেই স্রোতে গা-ভাসাইয়া দিলেন। বুদ্ধির প্রাখর্য্য এবং অবিমৃষ্যকারিতার জন্য তাঁহার নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ব্যয়সংক্ষেপের জন্য Regent যখন রাজকীয় মদ্যশালার অর্দ্ধেক অংশ বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন, ফ্রানকয় বলিলেন, "রাজসভার গর্দ্দভদিগের অর্দ্ধেক বিক্রয় করিলেই ইহা অপেক্ষা বুদ্ধিমানের কাজ হইত।" এই সময়ে Regent রাজ-সিংহাসন অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এই অর্থে দুইটী কবিতা প্রকাশিত হয় এবং ফ্রানকয় তাহাদের লেখক বলিয়া জনরব প্রচারিত হয়। Regent শুনিয়া ভীষণ রুষ্ট হইলেন এবং একদিন উদ্যানে ফ্রানকয়ের দেখা পাইয়া বলিলেন, "মুঁসো আরুয়েট, আমি তোমাকে এমন কিছু দেখাইতে পারি, যাহা তুমি কখনও দেখ নাই।" ফ্রানকয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন ভয়াটী কি মহারাজ?" Regent উত্তর করিলেন, "Bastille কারাগারের অভ্যন্তর।" পরদিনই (১৭১৭ ১৭ই এপ্রিল) ফ্রানকয়কে তাহা দেখিতে হইল।

Bastilleএ অবরুদ্ধ থাকিবার সময়ই ফ্রানকয় 'ভলটেয়ার' নামগ্রহণ করিয়া কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। এই সময়েই তিনি Henriade কাব্য রচনা করেন। তাঁহার ১১ মাস কারাভোগের পর Regent তাঁহাকে নিরপরাধী বলিয়া জানিতে পারিয়া কারামুক্ত করিয়া একটী বৃত্তি দান করিলেন। ভলটেয়ার তাঁহাকে লিখিলেন, "আমার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাহার জন্য ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। যাহাতে নিজে নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারি, তাহার জন্য অনুমতি দিতে আজ্ঞা হউক।"

কারাগার হইতে বাহির হইয়া ভলটেয়ার Oedipi নামক এক বিয়োগান্ত নাটক লিখিলেন। রঙ্গমঞ্চে এই নাটক একাদিক্রমে ৪৫ রাত্রি অভিনীত হইয়াছিল। তাঁহার বৃদ্ধ পিতা একদিন তাঁহাকে তিরস্কার করিবার জন্য প্রেক্ষাগৃহে আসি, অভিনয় দেখিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। এই নাটক হইতে ভলটেয়ার ৪০০০ ফ্রাঙ্ক পাইয়াছিলেন। চতুর বৈষয়িকের মত তিনি এই অর্থের লাভজনক বিনিয়োগ-ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

তাঁহার পরবর্ত্তী নাটক 'Artemire' প্রশংসালাভে সমর্থ হয় নাই। এই সময় তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। রোগমুক্ত হইয়া দেখিতে পাইলেন, তাঁহার Henriade কাব্য সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছে। ইহার পরে ৮ বৎসর যাবৎ তিনি সর্ব্বত্র সম্মানের সহিত গৃহীত হইয়াছিলেন। তাহার পরে ভাগ্যদেবী অপ্রসন্ন হইলেন। অভিজাত শ্রেণীর অনেকে তাঁহাকে সহ্য করিতে পারিতেন না। প্রতিভা ভিন্ন সম্মানের দাবী তাঁহার যে আর কিছুই নাই, ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন না। একদিন এক ডিউকের প্রাসাদে ভোজনের সময় ভলটেয়ার তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বাগ্মিতা ও রসিকতার সহিত আলাপ করিতেছিলেন। এমন সময় chevalier de Rohan অনতি-মৃদুস্বরে কহিলেন, "কে ঐ যুবক উচ্চৈঃস্বরে আলাপ করিতেছে?" ভলটেয়ার তৎক্ষণাৎ কহিলেন, "মহাশয়, যাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তিনি কোনও মহৎ নাম বহন করেন না। কিন্তু যে নাম বহন করেন তাঁহার গুণে সকলেই তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে।" Rohan অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রহার করিবার জন্য একদল গুণ্ডা নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু তাঁহার মস্তকে আঘাত করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। পরদিন রঙ্গালয়ে ভলটেয়ার মস্তকে পটি বাঁধিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে Rohanএর আসনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা Rohanএর ছিলনা। আত্মরক্ষার জন্য তিনি পুলিশ বিভাগের মন্ত্রী, তাঁহার পিতৃব্যপুত্রের শরণাপন্ন হইলেন। Bastilleএর দ্বার আবার ভলটেয়ারের জন্য উন্মুক্ত হইল, কিন্তু তিনি অবিলম্বে দেশত্যাগ করিয়া যাইবেন, এই সর্ত্তে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইল। ফরাসী পুলিশ তাঁহার সহিত Dover পর্য্যন্ত গিয়া

ফিরিয়া আসিল। ইহার অতিকাল পরেই প্রতিহিংসা গ্রহণের অভিপ্রায়ে ভল্টেয়ার ছদ্মবেশে প্যারিসে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু যখন জানিতে পারিলেন, তাঁহার প্রত্যাগমন পুলিশে জানিতে পারিয়াছে, এবং অচিরেই আবার তাঁহাকে বন্দী হইতে হইবে, তখন ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেলেন।

তিন বৎসর ভল্টেয়ার ইংলণ্ডে বাস করিয়াছিলেন। আগ্রহের সহিত তিনি ইংরাজী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিলেন। ইংরাজী বানানে নিয়মের অভাব দেখিয়া তিনি বিষম বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। "কি অদ্ভুত ভাষা! Plagueএর উচ্চারণ প্লেগ্, আর Agueর উচ্চারণ এগু। দক্ষক অর্থেক ভাষা প্লেগে, বাকী অর্ধেক এগুতে কুলিয়ে যাকুক।" কিন্তু সত্বরই ইংরাজী পড়িতে সক্ষম হইলেন এবং এক বৎসর মধ্যে প্রগাঢ়ভাবে ইংরাজী সাহিত্যের পরিচয় লাভ করিলেন। লর্ড বলিংব্রোক তাঁহাকে সাহিত্যিকদিগের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। তিনি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, ইংরেজ সাহিত্যিকেরা যাহা খুসী লিখিতে পারেন। তাহার জন্য তাঁহাদিগকে শাস্তি পাইতে হয় না। "আহা কতি এই ইংরেজরা! ইহাদের দেশে Bastille নাই, Lettres de Cachet নাই! বিনাবিচারে এখানে কেহ কারারুদ্ধ হয় না! ইহারা ধর্ম ইহারা সংস্কৃত করিয়া লইয়াছে, রাজার ফাঁসি দিয়াছে, বিদেশ হইতে রাজা আনিয়া সিংহাসনে বসাইয়াছে এবং ইউরোপের যাবতীয় নরপতি অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী পার্লিয়ামেণ্টের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ইংরেজের দেশে খ্রিস্টীয় ধর্ম বর্তমান, কিন্তু পুরোহিত একজনও নাই। যাবতীয় ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভীষিকাময় Quaker সম্প্রদায় ইহাদের দেশেই উদ্ভূত হইয়াছে। অদ্ভুত মানুষ এই Quakerরা। যীশুর বাণী যতদূর সম্ভব ইহারা অক্ষরে অক্ষরে গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহার উপদেশমত জীবন যাপন করিয়া খৃষ্টীয় ধর্মকে অসার করিয়া দিয়াছে!" জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভল্টেয়ার Quaker দিগের আচরণে বিস্ময় বোধ করিতেন। তাঁহার Dictionary Philosophique গ্রন্থে তিনি এক Quakerএর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সেই Quaker বলিতেছে, "আমাদের ঈশ্বর শত্রুদিগকেও ভালবাসিতে এবং বিনা প্রতিবাদে অন্যায় সহ্য করিতে বলিয়াছেন। সুতরাং হইয়া আমাদের আতাদের গলা কাটিব, ইহা তাঁহার ইচ্ছা নহে।"

ইংলণ্ডে তখন বিজ্ঞানালোচনার প্রবল স্রোত বহিতেছিল। বেকনের প্রভাব তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল। Hobbes যে জড়বাদ প্রচার করিয়াছিলেন, ফ্রান্সে হইলে তাহার জন্য তাঁহাকে প্রাণ দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। Lockeএর Essay on the Human Understanding দর্শনে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছিল। Collins, Tyndal ও অন্যান্য Deistদের ঈশ্বরে বিশ্বাস অস্বীকার করিয়াও প্রচলিত ধর্মের প্রত্যেক মতেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। নিউটনের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সময় ভল্টেয়ার উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থাবলী তিনি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং ইংরাজী সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানে যাহা কিছু শিখিবার ছিল, অনতিদীর্ঘকালের মধ্যে তাহা আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। ইংলণ্ডের প্রতি তাঁহার মনে অপরিসীম শ্রদ্ধা জন্মিল। Letters on the English গ্রন্থে তাঁহার ধারণা বর্ণনা করিয়া তিনি হস্তলিখিত অবস্থাতেই ঐ গ্রন্থ বন্ধুদিগের মধ্যে বিতরণ করিলেন, মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে সাহসী হইলেন না। এই গ্রন্থে ফ্রান্সের অবোধ্যাচার-পীড়িত ব্যক্তিস্বাধীনতা বর্জিত অবস্থার সহিত তিনি ইংলণ্ডের রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক স্বাধীনতার তুলনা করিয়াছিলেন, এবং ফ্রান্সের মধ্যবর্তী শ্রেণীকে যথেষ্ট উপযুক্ত স্থান অর্জন করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন না যে তাঁহার এই গ্রন্থই ফ্রান্সের স্বাধীনতার উষার প্রথম ঘোষণাপত্র।

১৭২৯ খৃষ্টাব্দে ভল্টেয়ার ফ্রান্সে ফিরিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন এবং ৫ বৎসর প্যারিসে স্ফূর্তির জীবন যাপন করিলেন। হঠাৎ স্ফূর্তিতে বাধা পড়িল। একজন পুস্তক প্রকাশক তাঁহার অনুমতি না লইয়া Letters on the English গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছিলেন। প্যারিসের Parliament অধিবেশনে ঐ গ্রন্থ ধর্ম ও রীতিবিরোধী এবং রাজার অসম্মানজনক বলিয়া ঘোষণা করিলেন, এবং প্রকাশ্য ভাবে উহা পোড়াইয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিলেন। তখন পুলিশ Bastille-বাস আসন্ন জানিয়া বুদ্ধিমানের মত ভল্টেয়ার পলায়ন করিলেন, সঙ্গে লইয়া গেলেন এক পরস্ত্রীকে।

ভল্টেয়ারের এই প্রণয়িনী Marquise du Chatelet ছিলেন এক অসাধারণ মহিলা। গণিতে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। Newton এর Principlea একখানা পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা তিনি রচনা করিয়াছিলেন এবং পরে "অগ্নি" সম্বন্ধে এক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি French Academy হইতে পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। ভল্টেয়ারকে তিনি "সর্বপ্রকারে ভালবাসার উপযুক্ত," এবং "ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। ভল্টেয়ারও এই মহিলা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন "তিনি Great man (মহৎলোক)। তাঁহার একমাত্র দোষ এই যে তিনি স্ত্রীলোক। কাইরীতে (Cirey) মার্কিসের একদুর্গ ছিল। তথায় তিনি প্রণয়ীকে আশ্রয় দিলেন। Marquise এর স্বামী তাঁহার গণিত চর্চা লক্ষ করিতে না পারিয়া, তাহার সৈন্যদলের সহিত ঘুরে চলিয়া গিয়াছিলেন। প্যারিসের সমাজে তখন অবস্থাপন্ন মহিলাদের স্বামীর সঙ্গে দুই একটি প্রণয়ী রাখার প্রথা ছিল। বাহিক ঠাট বজায় রাখিতে পারিলে, ইহাতে কোনও কথা উঠিত না। প্রণয়ী যদি প্রতিভাবান্ কেহ হইতেন, তাহা হইলে তো কথাই ছিল না।

কাইরীতে প্রণয় চর্চার সহিত অধ্যয়ন ও গবেষণাও চলিতে লাগিল। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য ভল্টেয়ার এক সুসজ্জিত পরীক্ষাগার (Laboratory) পাইলেন। কয়েক বৎসর বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আলোচনায় অতিবাহিত হইল। তাঁহাদের অতিথির অভাব ছিল না। সত্বরই কাইরী বিদ্বজ্জনের সমাগম ক্ষেত্রে পরিণত হইল। সন্ধ্যাকালে অতিথিদিগের সম্মুখে ভল্টেয়ার স্বরচিত উপন্যাস পাঠ করিতেন। কখনও বা তাঁহার নাটকের অভিনয় করিতেন। আমোদপ্রমোদ

ভলটেয়ারের পক্ষে অপরিহার্য্য ছিল। কাইরীতে বিদ্যাচর্চ্চা ও আমোদ —দুইই প্রচুর পরিমাণে চলিত। এইখানে ভলটেয়ার Zadig, Candide, Micromegas, L' Ingenu, Le Mondo Commo. lles প্রভৃতি উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন। ইহারা ঠিক উপন্যাস নয়, রহস্যপূর্ণ ছোট রূপক গল্প।

L' Ingenu এক Red Indianএর গল্প। কয়েক জন পর্য্যটকের সহিত ফ্রান্সে আসিবার পরে এই Red Indianকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা হইল। New Testament পড়িয়া সে এতই মুগ্ধ হইল যে কেবল খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতেই সম্মত হইল না অধিকন্তু সুন্নত (Circumcision) লইবার জন্য জেদ ধরিল। "যাইকেল যাহাদের কথা আছে, সকলেরই সুন্নত হইয়াছিল, সুতরাং আমাকেও সুন্নত লইতেই হইবে।" এই সমস্যার সমাধান হইতেই পাপ স্বীকারের (Confession) প্রশ্ন উঠিল। সে বলিল "কোথায় পাপ স্বীকারের কথা আছে, দেখাও।" তখন তাহাকে Epistle of St John দেখানো হইল। তাহাতে আছে "পরস্পরের নিকট পাপ স্বীকার করিবে।" দেখিয়া সে পুরোহিতের নিকট পাপ স্বীকার করিল, কিন্তু পাপ স্বীকার শেষ হইবা মাত্রই পুরোহিতকে চেয়ার হইতে টানিয়া নামাইয়া নিজে তথায় উপবেশন করিল, এবং কহিল "এখন তোমার পাপ আমার নিকট স্বীকার কর। পরস্পরের নিকট পাপ স্বীকার করিতে হইবে, ইহাই তো লেখা আছে।" ইহার পরে সে Miss St. Yvesকে ভালবাসিয়া ফেলিল। দীক্ষা কালে উক্ত মহিলা তাহার ধর্ম্মমাতা (God mother) হইয়াছিলেন, সুতরাং তাহার সহিত বিবাহ হইতে পারে না, শুনিয়া সে ভয়ানক কষ্ট হইয়া বলিল, "তবে আমার দীক্ষা ফিরাইয়া লও।" পরে বিবাহের অনুমতি পাইয়া দেখিল, বিবাহে ঝঞ্ঝাট কম নয়। নোটারি চাই, পুরোহিত চাই, সাক্ষী চাই, চুক্তিপত্র চাই; আরো কত কি চাই। শুনিয়া বলিয়া উঠিল "তোমরা দেখছি ভীষণ দুষ্ট লোক। এত সতর্কতা অবলম্বন করিয়া তোমাদের বিবাহ করিতে হয়।" এইরূপে গল্পের প্রবাহ ছুটিয়াছে এবং পুরোহিত ওতপ্রোতভাবে খৃষ্টধর্ম্মের সহিত আদিম খৃষ্টধর্ম্মের বিরোধ প্রদর্শিত হইয়াছে।

Micromegas গ্রন্থে আছে পাঁচলক্ষ ফুট দীর্ঘ Sirius নক্ষত্রের এক অধিবাসীর সহিত কয়েক সহস্র ফুট দীর্ঘ শনিগ্রহের এক অধিবাসীর পৃথিবীভ্রমণের কাহিনী। সূর্য্যমণ্ডলের পরিক্রমে অতিক্রম করিবার সময় সিরিয়াসের অধিবাসী শনিবাসীকে খোঁড়া দিয়িয়া গেল। শনিবাসী বলিল, তাহাদের মাত্র ৭২টি ইন্দ্রিয় আছে, তাহাতে চলে না। সিরিয়ান জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাদের পরমায়ু কত? শনিবাসী বলিল "বেশী নয়; পনের হাজার বৎসরের বেশী কম লোকেই বাঁচে।" এমন সময় একখানা জাহাজ আসিয়া পড়িল। সিরিয়ান তাহা হাতে লইয়া আঙুলের অগ্রভাগে রাখিয়া ঘোলাইতে লাগিল। জাহাজে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সিরিয়ান জাহাজের আরোহীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল "হে বুদ্ধিমান্ ক্ষুদ্র জীবগণ, আমার বিশ্বাস, তোমরা এই পৃথিবীতে যে আনন্দ উপভোগ কর, তাহা অতি নিষ্ফল। কেন না অল্পের ভার তোমাদিগকে বেশী বহন করিতে হয় না। তোমাদের দেহ এত ক্ষুদ্র, যে তোমাদের মধ্যে আত্মা ভিন্ন আর কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং তোমরা নিশ্চয়ই বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ কর।" জাহাজের একজন দার্শনিক কহিলেন "দেহ ক্ষুদ্র হইলে কি হইবে? প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র কার্য্যের অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় জড় পদার্থের অভাব তাহাতে নাই। এই মুহূর্ত্তেই আমাদেরই সমশ্রেণীর একলক্ষ হাটকোটধারী জীব সমসংখ্যক সমশ্রেণী জীবের প্রাণ সংহারে নিযুক্ত আছে। অনাদিকাল হইতে

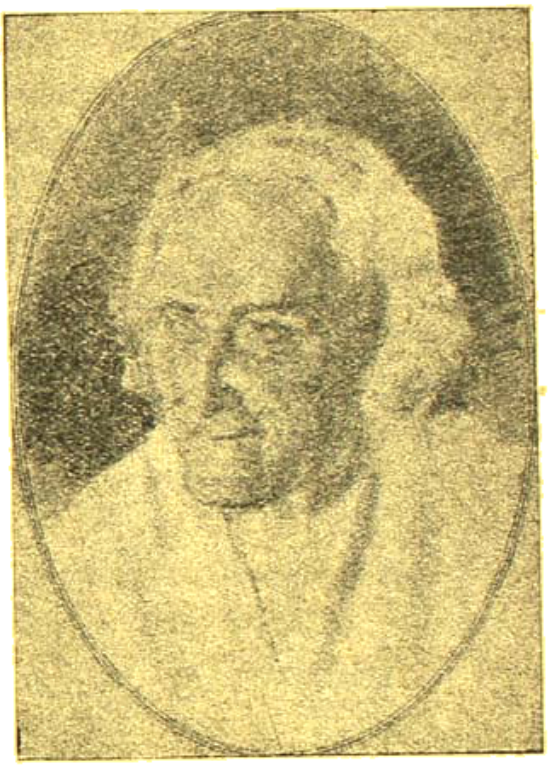

ভলটেয়ার

ইহাই পৃথিবীতে চলিয়া আসিতেছে।" তখন ক্রুদ্ধ হইয়া সিরিয়ান কহিলেন "পাপিষ্ঠগণ, আমার ইচ্ছা হইতেছে, এখনি তোমাদের সমগ্র জাতিকে পদতলে পিষ্ট করিয়া হত্যা করি।" দার্শনিক বলিলেন "আপনার সে কষ্ট স্বীকারের প্রয়োজন নাই। আমরা আপনাদের চেষ্টাতেই আপনাদের ধ্বংস সাধন করিতে পারিবে। দশ বৎসর পরে আমাদের একপতাংশও জীবিত থাকিবে না। কিন্তু এই অবস্থার জন্য দায়ী রাজপ্রাসাদবাসী বর্ব্বরগণ। তাহারা নিজেরা বসিয়া থাকিয়া লক্ষ লক্ষ লোক হত্যা করিবার আদেশ দেয়। শাস্তি তাহাদেরই হওয়া উচিত।" (ক্রমশঃ)

ভয়

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মিত্র এম্-এ

জীবনের অবকাশপূর্ণ মুহূর্তগুলো কেমন যেন একটানাভাবে চলে যায়, ছন্দের গতি আছে—কিন্তু মুগ্ধ হবার তাতে কিছুই নেই। হাসি কান্না মোটেই ঠেকে না—অথচ যেন কেমন। চিত্ত যন্ত্রের মনের আনাচে কানাচে যে রঙ ধরে—মুহূর্তে তা ম্লান হয়ে ওঠে, প্রত্যক্ষ দিবালোকে যেন স্বপ্নের ঘোর কেটে যায়।

আকাশ পাতাল কত কি ভাবতে থাকে। দূরে বর্ষা নেমেছে—গাছের পাতায় মসৃণ রাস্তা বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে—আর কর্মচাঞ্চল্যহীন জীবনের বর্ণ গন্ধহীন অভিব্যক্তি পাগল করে তোলে তাকে। এমনিভাবে জীবনের বাকী অংশটুকু কাটিয়ে দেবার কল্পনায় চিত্ত হাঁপিয়ে ওঠে। কিন্তু মনের আনাচে কানাচে কয়েকটা চেনা অচেনা মুখ উঁকি দিয়ে যায়, আর সেই স্মৃতিগুলো নিয়ে অনেক চেষ্টা করেও স্মৃতির দুকূলে একটি চেনা মুখও ভেসে ওঠে না—আর তখনই হয় চিত্তের সবচেয়ে মুশকিল।

দূরে পল্লীর কোলাহল নিস্তব্ধ হয়ে আসে, গ্রামের প্রদীপের ক্ষীণতম রশ্মিটুকু মিলিয়ে যায়, পল্লীর কোলে নেমে আসে একটা সুষুপ্তির স্তব্ধতা। চিত্ত জেগে থাকে তখনো, দুর্বার কর্ম কোলাহলের মুখরতার মাঝে উদ্দাম-গতিতে ছুটে যাবার সাধ হয় তার। ঘরে বসে থাকা তার পক্ষে দায় হয়ে ওঠে, নিস্তব্ধতা ভেঙে ফেলবার জন্য চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছা যায়। গভীর নিশীথে চেঁচিয়ে ওঠে সে। সে যেন তার অন্তরের অন্তস্তল থেকে বিকট আর্তনাদ করে ওঠে, পাড়ার লোকের ঘুম ভেঙে যায়। কিছুতেই সেই বিকট আর্তনাদকে চিত্ত চাপা দিতে পারে না। কতবার ইচ্ছা হয়েছে মনের ভিতরকার সেই ধ্বনিকে শ্বাস রুদ্ধ করে মেরে ফেলতে, কিন্তু পারেনি সে কোনোদিন। বন্ধুবান্ধবেরা চিকিৎসার পরামর্শ দেয়। চিত্ত বিরক্ত হয়ে ওঠে···এমন কী ঘটনা তাকে ঘিরে মূর্ত হয়ে ওঠেছে যার জন্যে লোকের ব্যস্ততার আর সীমা নেই। ইদানিং সে ও-সব কথায় অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে, মুখে চোখে বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট হয়ে পড়ে। সে চায় কাজ, কোনো একটা কিছুর মাঝে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চায়—ভুলে যেতে চায়—পারিপার্শ্বিককে।

ভাবতে থাকে সে একটানা সেই—দীর্ঘ পথ। জীবনের সব কিছু নির্দয়তা নিয়ে যেন পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে ছোট বড় পাহাড়ের ধারালো মুখ। পাহাড়ের দুরধিগম্যতা আর অরণ্যের বিভীষিকার ভরা সেই দীর্ঘ পথের সমস্ত রুক্ষতা তার চোখের সামনে বিরাট এক অজগরের মতো কিলবিল করে ওঠে। দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি সেই একটানা পথের দুঃস্বপ্ন তার উপর চেপে বসে—এক বিকট বুকচাপা স্বপ্নের ভয়াবহতায় উদগ্র। না—এ স্বপ্ন তাকে ভুলতে হবে, সারারাত জেগে থাকতে হলেও ভুলতে তাকে হবেই। কর্মব্যস্ততাকে টেনে আনবার জন্য আরো সে ছোটখাট কাজ খুঁজে বেড়ায়। দীর্ঘ প্রবাসের পর দেশের হাটবাজার লোকজন সব তার কাছে নতুন ঠেকে। দেশের বাড়ীঘর আত্মীয়স্বজন সমস্তই নিতান্ত অপরিচিত মনে হয়। এ যেন কোন দূর বিদেশে স্বজনহীন নির্বান্ধব পুরীতে হঠাৎ পথ ভুলে সে এসে পড়েছে, না বোঝে এখানকার চালচলন, না জানে তার ভাষা।

এক এক করে মনে পড়তে থাকে পৃথিবীর প্রথম আলোক যেদিন তার চোখের পাতায় স্বপন জাগিয়েছিল। সে আলোক এই শ্যামলা বাঙলা দেশের এই নিভৃত পল্লীর। তারপর এক অসতর্ক মুহূর্তেই তার জীবনে এসেছিল দারিদ্র্যের ঘনঘটা। তাই কৈশোর সীমা পার হবার বহু পূর্বেই জীবনযুদ্ধের প্রেরণায় যেতে হয়েছিল তাকে রেঙ্গুন। এক এক করে মনে পড়তে থাকে। কতই বা বয়স—ত্রিশ পেরোয় নি আজো। এরই মাঝে কতশত ঘটনা তার জীবনে ঘটে গেছে। দুঃখের ঘূর্ণাবর্ত কাটিয়ে দারিদ্র্যের কঠোরতাকে তুচ্ছ করে দিয়ে তার প্রচেষ্টা বিজয়ের গৌরবে দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। দীর্ঘ কুড়িটা বছর একটানা ভাবে কেটেছে সেই দেশে, অন্যত্র যাবার কথা ভাবেও নি কোনো দিন।

চোখের উপর ভাসতে থাকে কালোবর্ণী অকূল।

যেখানে তার সবকিছু প্রচেষ্টাকে নিঙড়ে নিঙড়ে চিত্ত তৈরী করেছিল তার গৃহ—হাঁ।—নিতান্ত অনাচার বৈকি। আর বিভোর হয়েছিল সেই দিনটির প্রতীক্ষায়—যেদিন উৎসবের আনন্দে তার ক্ষুদ্র নাড় ঝলমল করে উঠবে। প্রশংসা করেছিল অনেকেই। এতটা অল্প সময়ে অতখানি সমৃদ্ধি অনেকের চোখে আবার দৃষ্টিকটুও ঠেকেছিল। চিত্ত ভয়ানক অনমনা হয়ে যায়, ঢাকা জেলার ক্ষুদ্র পল্লীর ততোধিক ক্ষুদ্র বাড়ীর আস্তেন ভেদ করে দৃষ্টি তার চলে যায় রেঙ্গুনের ডালহৌসী পার্কের সিমানায়, সন্ধানী দৃষ্টি মেলে কি যেন খুঁজে বেড়ায় সেখানে। পার্কের চারপাশের ঝক্‌ঝকে পিচের রাস্তায় পাঁচ বছর পূর্বের একটি পূর্ণিমা রাত্রি যেন চোখের ওপর ভাসতে থাকে। জোৎস্নায় পাম গাছের পাতা জ্বলছে—লেকের বুকে কে যেন ঝকঝকে রূপোর চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। চিত্ত তখন ঘর থেকে বের হয়ে পড়ে, লেকের আশে পাশে ঘুরতে থাকে। কতবার পাক দেয় তার খেয়ালই থাকে না। হঠাৎ একটুকরো আলোর ঝলক এসে যেন তাকে চম্‌কে দেয়। সামনা সামনি ডাক শোনে, কলকণ্ঠে কে বলে, এই যে আপনি। চিত্ত বিভ্রান্ত হয়ে ওঠে, মার্থুয়েকে চিন্‌তে তার দেরী হয় না। প্রতি নমস্কার করতেও কেমন যেন ভুলে যায়। মার্থুয়ে তার অবস্থা বোঝে। ইঙ্গিতে ডেকে নিয়ে যায় সোয়ে ডাগনের পাশে। সন্ধ্যারতির মন্দিরতায় সোয়ে ডাগনের পারিপার্শ্বিকতা স্নিগ্ধতায় অপরূপ হয়ে ওঠে। চিত্ত প্রথম দেখেছিল ওকে এক জলসার পোয়ে নাচের এক অপরূপ ভঙ্গিমায়। চারিদিকের আলোকমালার সজ্জার মাঝে রঙিণ পোষাকে ঝলমলে মার্থুয়েকে চিত্তের খুব সুন্দর লেগেছিল। মনে ওর জাগিয়ে তুলেছিল একটা উন্মাদনা। সেই থেকে একটা আনন্দের অভিনব সাড়া জেগেছিল ওর মনে। আপনার আঙিনায় অমনিভাবে উৎসব সজ্জা রচনা করার সাধ হয়েছিল একদিন। একান্ত মন প্রাণ দিয়ে এ সৌন্দর্য্য উপভোগ করার বাসনা জেগেছিল। সে সাধ তার অপূর্ণ থাকেনি।

তারপর সেই মধুর সন্ধ্যায় ডালহৌসী পার্কে দেখা। চিত্ত ভাবতে পারেনি, এটা এমনি আকস্মিক সে চিত্তের কাছে আরো অদ্ভুত লাগে। পরিচিত অপরিচিত শতেক কৌতূহলী দৃষ্টিকে এড়িয়ে সোয়ে ডাগন পেগোডার নীচে বসে পড়ে ওরা। মার্থুয়ে তার কোঁচড় থেকে কয়েকটা মগ্নাল্লী ফল চিত্তের হাতে দেয়—দু একটা নিজের মুখে পুরতেও ভুল হয় না—তার। চিত্তের কেমন যেন সঙ্কোচ হয়—চোখে মুখে লজ্জার ছাপ ওর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মার্থুয়ে অবস্থাটা বোঝে, হেসে বলে, ফলগুলো অমনিভাবে নাড়াচাড়া করবেন ?

চিত্ত হাঁ না কিছুই জবাব দিতে পারে না—আস্তে আস্তে একটা ফল মুখে পুরে দেয়।

মার্থুয়ে হেসে ওঠে, বল না, বল না—সবগুলো খেয়ে ফেলুন—কি যে আপনি !

সত্যই সুদীর্ঘকাল রেঙ্গুন বাসের পরও চিত্ত মগ্নাল্লীফল কোনদিন খায়নি সেকথা ভেবে—ওর নিজের কাছেই কেমন আশ্চর্য্য ঠেকে।

তারপর পরিচয় কেমন করে নিবিড় হয়ে ওঠে তার প্রতিটি দৃশ্য চিত্তের চোখের উপর ভাসতে থাকে। টুপ্টে সহর ক্রমেই ওর কাছে পরিচয়ের রঙিণ স্পর্শে সজীব হয়ে ওঠে। তার প্রতিটি গাছপালা আনারস পীচের ক্ষেত সব কিছুর সঙ্গেই যেন একটা নাড়ীর যোগসূত্র রচিত হয়ে যায়। সে সূত্রের কেন্দ্র মার্থুয়ে। প্রতি রবিবার টুপ্টেতে যাওয়া যেন একটা নিয়ম হয়ে দাঁড়ায় ওর কাছে।

মার্থুয়ের মা মাটির কাজ করে, সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে—মাটির পাত্রগুলো এক অপরূপ সৃষ্টির মতোই চিত্তের কাছে মনে হয়। পরিবারের প্রতিটী লোকের সাথেই পরিচয়ের নিবিড় বন্ধনে ধরা পড়ে যায় চিত্ত। চালচলন আচার ব্যবহার কিছুই যেন আর বেমানান ঠেকে না। এ যেন কতকালের পরিচয়। অথচ বেশী দিনের কথা তো নয়, চিত্ত এদের ভাবধারা দেখে হেসে অস্থির হয়েছে। বন্ধুবান্ধবরা উগ্র ব্রহ্ম-বিদ্বেষী বলতেও কসুর করেনি। চিত্ত হয়তো একদিন এতে গৌরবই বোধ করেছে।

সেদিনটা ছিল রবিবার। কিন্তু নিয়মিত টুপ্টে সহরে যেতে ভোলেনি। দুপুরের দিকে ওদের বেড়াতে যাবার কথা ছিল, দূরে বহুদূরে যেখানে পাহাড়ের কোল ঘেঁসে রবারের বন। মার্থুয়ের সাজ পোষাকে পারিপাট্যটা সেদিন ছিল আরো বেশী—সে পোষাক চিত্তের মনে রঙ

ঘনিয়ে দেয়, ধরণীর সব কিছু অপরূপ রূপ নিয়ে চোখে একটা উন্মাদনা জাগায়। দুপুরের দিকে রবারের ক্ষেতের দীর্ঘ পথ বেয়ে ওরা বহু দূরে চলে যায়, দুজনেই যেন পৃথিবীর আর সব কিছু বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। রবার ক্ষেতের একটা ফাঁকা অংশে বসে পড়ে দুজনে। কতক্ষণ কেটে যায় সে খেয়ালই থাকে না কারো। মার্থুরের হাতে একটা রক্ত গোলাপ। ফুলটাকে কত ভাবে সে সে আদর করতে থাকে। হঠাৎ ফুলটাকে চিত্তের হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, তুমি তো যাচ্ছ, আমার কথা মনে থাকবে না।

চিত্ত ওর হাতখানা হাতে তুলে নেয়, বলে—যাচ্ছি, তবে তোমাকেও নিয়ে কেমন ?

মার্থুরে কথা বলে না—শুধু ঘাড়টা নেড়ে সম্মতি জানায়।

তারপর ওঠে ঝড়। গগনবিহারী এরোপ্লেন অগ্নি ছড়ায়, মৃত্যুর ভীষণতায় সব কিছু আলোক নিবে আসে অন্ধকারে প্রেতের ছায়া তাণ্ডব নৃত্য জুড়ে দেয়। ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে দিগ্বিদিগ আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ধ্বংসের রুদ্র চক্ষু জ্বলিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিয়ে যায় সব কিছু সুন্দরকে। ওঠে পলায়নের রোল। চিত্তর বন্ধুবান্ধবরা চলে গেছে অনেকেই—কেউ নিরুদ্দেশে কেউ হয়তো জন্মান্তরের স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে। চিত্ত আর থাকবার কথা ভাবতে পারে না। টুটে সহরে মার্থুরেদের বাড়ীতে যেয়ে উপস্থিত হয়। মার্থুরের বাপ মা সবাই যেন এক মুহূর্তে বদলে যায়। চিত্তের সাথে কথা বলতেই চায় না—তবু অনিচ্ছা সত্ত্বেও মার্থুরের বাবা উবাথে এগিয়ে আসে, ইঙ্গিতে দূরে ডেকে নিয়ে যেয়ে সে কথা জানিয়ে দেয়, তার ভাবার্থ হচ্ছে—সাধারণ ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও, আর এদিকে এসো না। চিত্ত ইঙ্গিতে জানায়, আচ্ছা।

তারপর সেই রবার বনের ধারে—একা একা বসে থাকে দীর্ঘ প্রতীক্ষায়। প্রতীক্ষা তাকে বেশীক্ষণ করতে হয় না। মার্থুরের রঙীণ পোষাকের ঝলকানি ওর চোখে এসে লাগে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। আকাশে দু একখানা এরোপ্লেন পাখা মেলে উড়ে বেড়ায়। মার্থুরে ভয়ে আঁৎকে ওঠে, চিত্ত গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়—বলে আরে, ও যে আমাদের R. A. F.—ভয় কি ?

তারপর কর্ত্তব্য ওদের ঠিক হতে দেরী লাগে না। দুজনেই উঠে পড়ে, নিরুদ্দেশ যাত্রা সুরু হয় ওদের।

বন্ধুবান্ধবেরা সাবধান করেছিল—অনেকে জীবনের ভয় দেখিয়েছিল পর্য্যন্ত ; কিন্তু চিত্ত নির্ব্বিকার। তারপর সেই দীর্ঘ যাত্রাপথে এত বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে—সেকথা দুজনেরই কাছে আজ নতুন করে মনে হল। ভোরের দিকে দলের আরো কয়েকজনের সাথে মিলে একখানা গাড়ী ঠিক করে ফেলে চিত্ত। গাড়ী কিছু দূরে যেতে না যেতেই দূরে কোলাহল শোনা যায়—কারা যেন দ্রুতপদে ছুটে আসছে। দলের লোকেরা বলে, ওরে মেয়েটাকে টান মেরে ফেলে দেতো গাড়ী থেকে, নইলে কি সবাই মিলে অকারণে মারা যাব।

চিত্ত রুখে দাঁড়াল। কোলাহল নিকটতর হয়ে এল, দলের আর সব লোক গাড়ী থেকে নেমে প্রাণপণে ছুট দিল। চিত্ত বুঝতে পারলে সব—শুধু সময়টুকুর প্রতীক্ষা করতে লাগল। লোকগুলো অবশেষে পৌঁছে গেল, গাড়ীর চালক পর্য্যন্ত ততক্ষণে কেটে পড়েছে। রামদা হাতে একটা বিরাট দল গাড়ী আগলে দাঁড়াল। উবাথের সর্ব্বদেহ যেন হঠাৎ দীর্ঘতর হয়ে উঠল। আশে পাশের সবগুলোর মাথাকে ছাপিয়ে উঠে সে বিকট দ্রষ্টা বিকাশে চিত্তের মাথা চিবিয়ে ফেলার আকাঙ্ক্ষা জানালে। উবাথের হাতের রামদা দুপুরের রৌদ্রে চিক চিক করে উঠল, আর মার্থুরের কাঁধের উপর সেই খড়্গ আস্ফালন করে ভীষণ অট্টহাস্তে ফেটে পড়ল উবাথে।

প্রাণপণে চীৎকার করছে চিত্ত। গলা থেকে স্বর কি তার কিছুতেই বেরোয় না।

পাড়ার গাঙ্গুলী মশাই বলেন, না—রাত দুপুরে এ যন্ত্রণা তো আর সহ্য হয় না।

ছোট ছেলেমেয়ে ভয় পেয়ে জেগে ওঠে—কেঁদে কেটে অস্থির করে তোলে মায়েদের। কোনো মা হয়তো অসীম ধৈর্য্যের সাথে খোকাকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করছে, খোকন ঘুমায় ও-ও-ও। খোকনকে কিন্তু থামানো যায় না। মায়ের ধৈর্য্য রাখা দায় হয়, দুমদাম খোকনের পিঠে চড় কষিয়ে দেয়, বলে, নাঃ পোড়ারমুখোকে আবার ভূতে পেয়েছে আজ।

অনেক লোকের আলোচনা শোনা যায়—কে একজন চিত্তের পিশেমশাইকে বলেন, ভূত শান্তি করান মশাই, ভূত শান্তি করান—নইলে কিছুতেই যাবে না।

আর একজন কে বলে, রাস্তায় কি কমনে দেখে এসেছে, মানে ঐ মড়া আর কি—রাম রাম, রাতে আবার নাম করে ফেলাম।

আরো কতজন কত কি বলে চলে, কতক চিত্তের কানে যায়, কতক যায় না।

দূরে বর্ষা নামে, পল্লীর কোলাহল আবার শুরু হয়ে আসে। চিত্ত জেগে থাকে তখনো। আকাশে রয়েল এয়ার ফোর্সের বন্যার দুরন্ত পাখা মেলে উড়ে বেড়ায়। দুরন্ত পাখীর পাখার ঝাপ্টা বুঝি চিত্তের পাঁজরে এসে লাগে। চোখের ঘুম যেন তার কে কেড়ে নেয়।

রবীন্দ্রনাথের বলাকা

শ্রীপুষ্পিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এম-এ, ভাগবতরত্ন

রবীন্দ্র কাব্য বৈচিত্র্যময়—রবীন্দ্রনাথ প্রেমের কবি, রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের কবি, প্রকৃতি-কবিতার কবি, সাধক কবি, সর্ব্বোপরি রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক কবি। দর্শনের জটিল তত্ত্ব, উপনিষদের গভীর রহস্য তাঁহার কাব্যে সুন্দরভাবে লীলায়িত হইয়া প্রকাশ হইয়াছে। দার্শনিক কবিতা রবীন্দ্রনাথ বহু লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে বলাকা একটী মনোরম কাব্য। এই বলাকা কাব্যে রবীন্দ্রনাথ ফরাসী দার্শনিক বের্গসঁর গতিবাদের সুর ধ্বনিত করিয়াছেন ও তদুপরি বের্গসঁর গতিবাদের দুর্বল অংশ পরিত্যাগ করিয়া তাহাতে নূতন তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন। সংক্ষেপে বের্গসঁর গতিবাদের কথা—এই কালই (Time) সত্য। অনন্ত প্রবহমান কালই সত্য—ইহার গতি রোধ করিবার চেষ্টা করিলেই জীবনীশক্তি চলিয়া যায় এবং ইহা বস্তুতে পরিণত হইয়া যায়···এই প্রবাহ যদি কোনরূপে প্রতিহত হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বন্যার স্তূপ জাগিয়া উঠিবে।

"যদি তুমি মুহূর্ত্তের তরে
কান্তি ভরে
দাঁড়াও থমকি
তখনি চমকি
জাগিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বন্যার পর্ব্বতে"—বলাকা

বের্গসঁর গতিবাদের মূলকথা হইতেছে যে চলাটাই সত্য—যাহা চলে না, যাহা স্থির তাহা মৃত। এই নূতন তত্ত্বটী পুরাতন দার্শনিক মতের তীব্র প্রতিবাদ—পূর্ব্বে দার্শনিকরা বলিতেন যে যাহা শাশ্বত সত্য, চিরন্তন সত্য, তাহা স্থির অচঞ্চল—যাহা চঞ্চল বা গতিশীল তাহা মিথ্যা, তাহা হেয়, তাহা দুদিনের—ইহার দার্শনিক প্রতিষ্ঠা নাই। ভগবান্ শঙ্কর সত্যের একটী লক্ষণ বলিয়াছেন যে সত্য 'কাল ত্রয়া বাধিত' অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিনকালেই সমভাবে অবস্থিত। বের্গসঁ বলিলেন যে শুধু স্থিতিকে লইলে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না—গতির প্রতি উদাসীন হওয়াতে আমরা প্রত্যেক জিনিষকে আর সকল জিনিষ হইতে পৃথক করিয়া দেখি—প্রত্যেক বস্তুকে স্বতন্ত্রভাবে নিরীক্ষণ করি।

আসল কথা আমরা বস্তুকে গতি হইতে পৃথক করিয়া দেখি. আমরা গতিকে বস্তুর একটা অবস্থা মাত্র কল্পনা করি। আমাদের নিকট গতি সত্য নহে বস্তুই সত্য। কাল (Time) যদি কেবল কতকগুলি মুহূর্ত্তের সংস্থিতি মাত্র হয় তাহা হইলে দেশে ও কালে কোনও পার্থক্য থাকে না। কাল অবিভাজ্য—কালকে মুহূর্ত্তে ভাগ করা যায় না। কাল একটা অনন্ত প্রবাহ—কৃত্রিম বাধা দিয়া ইহার গতিকে খর্ব্ব করিয়া আমরা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছি—বাস্তবিকই ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান নাই—আছে কেবল অনন্ত কাল প্রবাহ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বলাকায় বের্গসঁর ন্যায় গতিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। নানা আকারে গতিকে কবি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন—প্রথম কবিতাতে তিনি ইহাকে নবীন ও কাঁচা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন

"ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা
ওরে সবুজ ওরে অবুঝ
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা"

আর যে প্রবীণ যে 'পরম পাকা' সে তো কালের বার হইয়া গেছে।

"ঐ যে প্রবীণ ঐ যে পরম পাকা
চক্ষু কর্ণ দুইটা জানায় ঢাকা
বিষয় যেন চিত্রপটে আঁকা
অন্ধকারে বন্ধ করা খাঁচায়"

তাই কবি চলার গান গাহিয়াছেন.

আমরা চলি সমুখ পানে
কে আমাদের বাঁধবে?

যেন যারা পিছুর টানে
বাঁধবে তারা বাঁধবে।

তিনি অতীতের প্রতি, পশ্চাতের প্রতি তাকাইতে চান না—

তীরের লক্ষ্য তোর পড়ে থাক তীরে
তাকাসনে ফিরে

এই সম্মুখ ধাবনই তো জীবন—কবি তাই ডাক দিয়া গেলেন

যাত্রা কর যাত্রা কর যাত্রীদল
এসেছে আদেশ
বন্ধনের কাল হোলো শেষ।

এই সম্মুখ পানে এগিয়া চলিলেই মৃত্যু হইতে অমৃতে পৌঁছিব

মৃত্যু সাগর মথন করে
অমৃত রস আনব হরে
ওরা চাবন আঁকড়ে ধরে
মরণ সাধন সাধবে
বাঁধনে ওরা বাঁধবে

ইহাই উপনিষদের 'মৃত্যোর্মা' ও মৃতং গময়—তমসো মা জ্যোতির্গময়—ইহারই প্রতিধ্বনি নয় কি?

এই গতির বাণিকেই বলাকার একটী কবিতায় অভয় শঙ্খ বলা হইয়াছে—এই অভয় শঙ্খ বাজিলে তার বিরাম বিশ্রাম থাকে না—গতির উদ্দীপনা আসিয়া পড়ে।

ভেবেছিলাম জোড়াতাড়ি
মিটিয়ে পাবো বিরাম খুঁজি
চুকিয়ে দিয়ে কাজের পুঁজি
লব তোমার অঙ্ক
হেনকালে ডাকলো বুঝি
নীরব তব শঙ্খ

এই গতির ভিতরই সত্যকে খুঁজিতে হইবে—নিস্তব্ধতার মধ্যে ইহাকে খুঁজিলে কিছুতেই পাওয়া যাইবে না—কবি দেখাইয়াছেন, একদিকে আছে সত্য—অপরদিকে কেবল একটা ছবি।

তুমি কি কেবল ছবি শুধু পটে লিখা?
ওই যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভীড়
আকাশের নীড়
ঐ তারা দিনরাত্রি আলো হাতে চলিয়াছে
আঁধারের যাত্রী—গ্রহ তারা রবি
তুমি কি তাদের মত সত্য নও?
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি

* * *

এই ধূলি—এও সত্য হায়
এই তৃণ
কিসের চরণতলে নীচ
এরা যে অস্থির তাই এরা সত্য রবি
তুমি স্থির তুমি ছবি
তুমি শুধু ছবি।

সেইরূপ রাশি রাশি বস্তুর স্তূপে সত্যকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু অন্তরের বেদনার মধ্যে সত্য নিহিত আছে—তাজমহলে সাজাহান রাজশক্তির-ধনমানকে তুচ্ছ করিয়া অন্তরের বেদনাকে চিরন্তন করিবার আনন্দে তাজমহল সৃষ্টি করেন।

"কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল, এ তাজমহল"

কিন্তু সেই হৃদয়ের বেদনা এই অপরূপ তাজমহলের চেয়েও অধিক সত্য, তাই ইহাকে স্মৃতি-মন্দিরও ধরিয়া রাখিতে পারে নাই।

সমাধি মন্দির এই ঢাকি রহে চির দিন
ধরার ধূলায় ঢাকি
মরণের আবরণে মরণের ছদ্ম রূপে ঢাকি
জীবনের কে রাখিতে পারে?

জীবনের প্রকাশ তবে কিরূপ? যদি তাজমহলের মতন মানবের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিকেও জীবনে ধরিয়া রাখা যায় না, তাহা হইলে কিরূপে ইহা ব্যক্ত হইবে? বের্গসঁ বলিয়াছেন, ইহার স্বরূপ হইতেছে অবস্তুপ্রবাহ—কবিও বলেন, ইহার প্রকাশ হইতেছে বিরাট নদী।

হে বিরাট নদী
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিশ্রাম অবিরল
চলে নিরবধি
পর্ব্বতে শিখরে শুষ্ক তব রুদ্ধ কায়াহীন বেগ

এই প্রবাহ কোনও রূপে প্রতিহত হইলেই বস্তুর স্তূপ জমিয়া উঠিবে।

'যদি তুমি মুহূর্ত্তের তরে কান্তিভরে
দাঁড়াও থমকি

কালে কালেই এ প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে।

তীরের লক্ষ্য তোর পড়ে থাক তীরে
তাকাসনে ফিরে
সম্মুখের বাণী
নিক্ তোরে টানি
মহা স্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হতে
অতল আঁধারে—অকূল আলোতে

বের্গসঁর কথা এই যে, গতি শুধুই গতি—শুধু চলা—কিন্তু এই গতি কোন পথে? ইহার গন্তব্যস্থান কোথায়, লক্ষ্য কি, এ সব কথার উত্তর বের্গসঁ যেন নাই—রবীন্দ্রনাথ এইখানেই বের্গসঁর সঙ্গ ত্যাগ করিলেন—কবি গতির মধ্যে আনন্দের রূপ দেখিলেন—গতি শুধু অফুরন্ত চলা

নহে—চলার মধ্যে আছে আনন্দের জয় গান, রূপের সত্যতা—গতি চায় স্থিতি—চায় মিলন, সেই অসীমের সহিত মিলন।

* *

তাই কবি লিখিলেন

কে তোমারে দিল প্রাণ
যে পাষাণ

* * *

তাই মেরুলোক পানে নিত্য তুমি রাখিয়াছ ধরি
ধরণীর আনন্দ মঞ্জরী

স্থিতির চিরন্তনত্ব কেবল স্থিতিতে নহে—স্থিতির সহিত যে প্রীতি আছে সেই প্রীতিতে,

সম্রাট্ মহিষী
তোমার প্রেমের স্মৃতি সৌন্দর্য্যে হয়েছে মহীয়সী

* * *

রবীন্দ্রনাথ বের্গসঁর মতন মানুষের দুইটী চেষ্টা স্বীকার করেন—একটী হইতেছে অকারণ অবিরাম চলা, আর একটী হইতেছে গতি হইতে। এই অকারণ অবিরাম চলা হইতে প্রাপ্তির জন্য আকাঙ্ক্ষা—মুক্তির জন্য বেদনা—দুই চেষ্টাই সমান ভাবে সত্য—একটীকে তিনি উর্ব্বশী এই আখ্যা দিয়াছেন, অন্যটীর নাম দিয়াছেন লক্ষ্মী।

কোনক্ষণে দুজনের সঙ্কট মন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি
একজনা উর্ব্বশী সুন্দরী
বিশ্বের কামনারাজ্যে রাণী
অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী
বিশ্বের জননী তারে জানি
স্বর্গের ঈশ্বরী

শান্তিনিকেতন পত্রে এই কবিতাটীর মর্ম্ম এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

"তাণ্ডবেরা যখন চলিতে থাকে, জীবনের যখন অভিজ্ঞতার ভূমিকম্প হইতে থাকে, তখন তার মধ্যে যথেষ্ট বেদনা আছে—সেই উদ্যম শক্তিকে অবজ্ঞা করা যায় না—কিন্তু এই চঞ্চলতাতেই যদি তার সমাপ্তি হোতো তা হোলে দুর্গতির আর অন্ত থাকতো না। তাই দেখতে পাই, এর মধ্যে লক্ষ্মীর হাত আছে—তিনি বাঁধন-ছাড়া তাণ্ডবকে সাথের দিকে ফিরিয়ে এনে ছন্দ রক্ষা করেন। যে প্রলয়ঙ্করী শক্তি সমস্তকে বিক্ষিপ্ত করে, যদি সেই শক্তিই একাকী হয় তবে সর্ব্বনাশ ঘটে—কিন্তু সে তো একা নয় গতি প্রবর্ত্তিত করার জন্য সে আছে—গতি নিয়ন্ত্রিত করার জন্য যে শক্তি, তাকে বলি কল্যাণী—এই নিয়ন্ত্রিত গতি নিয়েই তো বিশ্বের সৃষ্টি লক্ষীত।"

কেবল গতিতেই সৃষ্টি হয় না—যেখানে চিত্তের ক্রিয়া সেইখানেই সৃষ্টি—গতি তো চিত্তের দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া চাই, সেইটাই তো সৃষ্টি—যথার্থ সৃষ্টির উদাহরণ নিম্নলিখিত কবিতাটীতে পাই।

"পাখীরে দিয়েছ গান গায় সেই গান
তার বেশী করে না সে দান"

আমি যদি পাখীর মতন অচেতন হতাম, তা হোলে তো আমি যে দান পাইয়াছি তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতাম। কিন্তু আমি চিত্তের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই যখন আমি দানের চেয়ে প্রতিদান দিই অনেক বেশী—পাওয়ার চেয়ে অধিক দেওয়াতেই তো সৃষ্টিশক্তির পরিচয়। যেখানে চিত্তের ক্রিয়া সেখানেই সৃষ্টি। কেবল গতিতে সৃষ্টি হয় না। আমার মধ্যে এই সৃষ্টিক্রিয়া আছে বলিয়াই আমি অসীমকে প্রকাশ করিতে পারি—আমি যদি কেবল অসীমের ছায়া হইতাম তা হোলে আমার মধ্যে তাহার কোনও প্রকাশ সম্ভব হইত না। তাই রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলিতে লিখিয়াছেন—

"তোমার আলোয় নাই তো ছায়া
আমার মাঝে পায় সে কায়া
হয় সে আমার অশ্রুজলে
সুন্দর বিধুর"

সীমার মাঝে অসীমের প্রকাশেই যত কিছু আনন্দ, যত কিছু দুঃখ।

"আমি এলাম কাঁপলো তোমার বুক
আমি এলাম এলো তোমার দুঃখ
আমি এলাম তাইতো তুমি এলে
আমার মুখ চেয়ে
আমার পরশ পেয়ে
আপন পরশ পেলে"

আর একটী কবিতায় এই ভাব আরও পরিস্ফুট হইয়াছে; অসীম যখন 'স মহিম্নি' প্রতিষ্ঠিত থাকেন তখন তো কোনও আনন্দ নেই—পূর্ণ যখন অপূর্ণের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে তখনই তার যত কিছু আনন্দ

পূর্ণ তুমি তাই
তোমার মনে মানে তোমার আনন্দ না ঠেকে
তাই সে একে একে
যা কিছু ধন তোমার আছে আমার করে লবে
এমনি কোরেই হবে।

বের্গসঁ জীবনের মধ্যে কেবলই গতি দেখিয়াছেন—তিনি অসীমের সহিত জীবনের যোগ দেখিতে পান নাই—এই জন্য জীবনটা তাঁহার নিকট নীরস গতি ছাড়া আর কিছুই ছিল না—জীবনের মধ্যে আনন্দের ধারা—রসের ধারা তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। সত্যের তিনি জীবন রূপ দেখিয়াছেন—এই জন্য তিনি জীবনের উদ্দেশ্য গতির লক্ষ্য হারাইয়া ফেলিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথের নিকট কেবল গতি—কেবল চলা সত্য নয়—তাহার রহস্য কবি ব্যক্ত করিলেন

মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ লাখে যুগে
তবে ধর ছাড়া সবে
অন্তরের কি আশ্বাস রবে
ধরিতে ছুটিছে যত শত
প্রভাত আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মত ?

* * *

নিদারুণ দুঃখ রাতে
মৃত্যু ঘাতে
মানুষ চূর্ণিবে যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা ?

* * *

চার—অধ্যায়

স্বামী পূর্ণানন্দ

(প্রথম)

বিশ্ব-বিধাতার এক বড় সৃষ্টি জগতে জীবলোকই সর্বপ্রধান। এই জীবজগতে মনুষ্য-সমাজই সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই মনুষ্য-সমাজে সকল মানুষই সম-স্বভাব বিশিষ্ট নহে। দেশ কাল ও পাত্র ভেদে বিভিন্ন মনুষ্য সমাজে মানুষের স্বভাবে ও আচরণে বিশেষ ভাবেই পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

এই পার্থক্যের বিশেষ কারণ, বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন মনোবৃত্তি। এই বিভিন্ন মনোবৃত্তিই বিভিন্ন মানব সমাজের মূল ভিত্তি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

ইয়োরোপ ও আমেরিকার অধিবাসী শ্বেতকায় জাতি বর্তমান জগতে সর্বশক্তিমান হইলেও, পাশবিক বলে এবং জাতিগত স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত একতায় সর্বশ্রেষ্ঠ। একতাবদ্ধ যে বলিষ্ঠ শ্বেতকায় জাতিসকল ইহলোকের সর্ববিধ ভোগসুখেই বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট।

এই ভোগসুখকে চিরস্থায়ী করিবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষাবশেই শ্বেতকায় বলদর্পিত জাতিসকল রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতিকে তাহাদের জীবনসাধনার প্রধান ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছে।

ভারতীয় এবং ভারতপ্রভাবান্বিত জাতি সকল ইহাদের অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন মনোভাব সম্পন্ন। ভগবৎভক্ত ভারতীয়গণ ত্যাগের সাধনায় এবং আধ্যাত্মিক সর্বত্বের সন্ধানে চির অভ্যস্ত। ত্যাগ ও ধর্মানুশীলনই ভারতের জাতীয় জীবনের দৃঢ় ভিত্তি। কিন্তু, যুগীয় মহাজনবন্দী মনোমোহন মালবীয়জীর ভাষায় বলিতে গেলে, বলিতে হয়, অভারতীয় শতবর্ষী সভ্যতাই চিরদিন ভারতের এই ত্যাগধর্মকে দুর্বলের ধর্ম বলিয়া মনে করিয়াছে এবং ভগবৎ প্রেমের ভিখারী ভারতীয় জাতির সর্বসুখ বিসর্জনের ব্রতকে কাপুরুষের আচরণ বলিয়াই অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে।

অভারতীয়গণ ভারতীয় জাতিকে শুধু অবজ্ঞা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; সহস্র বৎসর ধরিয়া এই ভারতীয় জাতিকে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে কল্পনাতীত অত্যাচারে জর্জরিত করিতে, ভারতের বিপুল ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করিতে এবং ভারতীয় ধর্ম-সমাজ ও সভ্যতাকে চূর্ণ ও বিলুপ্ত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু, দীর্ঘকালব্যাপী এইরূপ গুরুতর আঘাতেও ভারতীয় জাতির মৃত্যু হয় নাই। ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার বিলোপ ঘটে নাই। বারংবার ভারত বাহিরের আঘাতে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছে; আবার সে তাহার অন্তর্নিহিত সাধন শক্তি সহায়ে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে।

বিগত উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজ জাতিসমূহের, বিশেষ ভাবে ইংরেজ জাতির সংস্পর্শে আসিয়া পর ভারত এক মহাচেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। এই মহা জাগ্রত ভারতের সাধন শক্তির মূর্ত-বিগ্রহ রূপে আবির্ভূত হইলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

আত্মবিস্মৃত এবং বহুকাল যাবৎ বৈদেশিক দাসিকায় বিকৃতবুদ্ধি ভারতবাসীকে, শ্রীরামকৃষ্ণ আপন সকল সাধনা দ্বারা অতি প্রবল রূপেই আকর্ষণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সুস্পষ্ট রূপেই ভারতীয় হিন্দুসমাজকে বুঝাইতে সমর্থ হইলেন যে, প্রাচীনতম ভারতের ধর্ম—সভ্যতা—শিক্ষা ও সংস্কার, ভারতের দেব-দেবী, পূজা-অর্চনা ও শাস্ত্র-মন্ত্রাদি, কোন দেশের অপেক্ষাই ন্যূন হীন নহে। বরং বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। ভারতের সন্তানগণ যদি আবার ভারতীয় সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, যদি আবার একান্ত দৃঢ়তায় এবং অবিচলিত সংযমের সঙ্গে ভারতীয় শিক্ষালাভে ও ধর্মানুশীলনে নিযুক্ত হয়, তবে অনতিকাল মধ্যেই ভারত আবার জগতের জাতীয় সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভে অধিকারী হইতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণই সর্বপ্রথম অসাধারণ উদারতার সঙ্গে প্রমাণিত করেন, জগতে যত মত, তত পথ এবং প্রত্যেক ধর্মপন্থাই ভগবানে পৌঁছাইয়া দিতে সমর্থ। প্রকৃত ধর্মপ্রাণ ভগবৎ ভক্তগণের ধর্মানুশীলনে বন্ধের স্থান নাই। পরস্পরের ধর্মের প্রতি সহজ ভাবের দ্বারাই ধর্মজগতে সাম্য ও সমন্বয় সাধিত হইতে পারে এবং এই পারস্পরিক শ্রদ্ধার সঙ্গেই ধর্মান্ধতা, ধর্মের নামে হত্যা ও লুণ্ঠন প্রভৃতি বাহ্যতীয় হিংসা ও জাতিবিদ্বেষ মূলক ঘৃণিত কার্যসমূহ বিলুপ্ত হইতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম ও সমাজের সংস্কারকরূপে আবির্ভূত হন নাই। কঠোর সাধক জীবনের সরল সহজ ভাব ও কর্মপ্রণালীর সহায়তায়, জীবন্মৃত ভারতের অন্তরে, অন্তরে ভারতীয় আদর্শের সঞ্জীবনী শক্তির সঞ্চার করিতেই শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব।

(দ্বিতীয়)

শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক জীবনের অপূর্ব বিকাশ; কঠোরতম সাধনা এবং লোকশিক্ষাদান প্রভৃতি সকল ঘটনাই ১৮৬৬ খৃঃ হইতে ১৮৮৬ খৃঃ মধ্যে সংঘটিত হয়। তাঁহার এই কর্মপ্রচেষ্টা যে ভগবৎ ইচ্ছাতেই সম্পূর্ণ সফলতা লাভে সমর্থ হইয়াছিল—স্বামী বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, সারদানন্দ প্রভৃতির, ও মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বলরাম বসু, অশ্বিনীকুমার দত্ত, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, এবং সাধু নাগ মহাশয় প্রভৃতির জীবনের পরিণতিই তাহার শ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য দান করে।

এই সকল সন্ন্যাসী ও গৃহী সাধক ও ভক্তগণের মধ্যে একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দই সমগ্র জগতের বিস্ময়পূর্ণ সশ্রদ্ধ দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মনে করিতেন, বিবেকানন্দ শিবস্বরূপ, মহাজ্ঞানী

ভবিতুমা, এক বিরাট শক্তিশালী মহাপুরুষ। তাই সর্বপ্রথমে তিনি বিবেকানন্দকেই তাঁহার সকল সাধন রহস্যের শ্রেষ্ঠ অধিকার দান করিয়া চিরবিদায় গ্রহণ করেন!

প্রদীপ হইতে প্রদীপে যেমন আলোকধারা চিরপ্রবহমান; শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক শক্তির জ্যোতির ধারা ও আত্মা স্বামী বিবেকানন্দের জীবন হইতে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানবগণের জীবনে প্রবহমান।

শ্রীরামকৃষ্ণের সকল সাধনা ও শিক্ষা বিবেকানন্দের জীবনে কয়েকটি বিশেষ ভাবে রূপায়িত হইয়া সমগ্র জগতে এক অভিনব চেতনার সঞ্চার করিতে সমর্থ হয়।

বিবেকানন্দ বুঝিয়াছিলেন, সমগ্র জগতের মানব সমাজের-কল্যাণ কর্মই শ্রেষ্ঠ আদর্শ কর্মযোগ। ব্যক্তিগত মুক্তির জন্য সমগ্র জগৎকে ভুলিবার চেষ্টা অতি নিম্নস্তরের সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির পরিচয়।

সকল ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন উদার ও প্রেমিক মানুষই ভবিষ্যতে ধর্মজগতে এক বিরাট সাম্য ও মৈত্রীর সৃষ্টি করিতে সমর্থ।

ক্ষুধার্ত ও পীড়িত মানুষকে ধর্মশিক্ষাদান বাতুলতা মাত্র। সর্বাগ্রে চাই ক্ষুধার অন্ন; দীন ও লজ্জা নিবারণের বস্ত্র এবং ব্যাধিগ্রস্তের উপযুক্ত চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থা!

মানুষের প্রতি মানুষের অবজ্ঞা ও ঘৃণাপূর্ণ অমন ব্যবহারই সমাজের সর্ববিধ দুঃখ ও অশান্তির কারণ! তাই, সর্বাগ্রে চাই, সমুদয় সমাজের তাবৎ দুঃখমোচনের পরিহার—চাই মানুষাতির সর্ববিধ উন্নতিসাধন এবং সমাজে প্রেমপূর্ণ সাম্যের প্রতিষ্ঠা!

মৃদু প্রহারের সঙ্গেই বিবেকানন্দ বলেন—ভারত যতদিন ভগবানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিবে, ততদিন রাজনৈতিক কোন বিরুদ্ধ শক্তিই ভারতীয় সমাজ, ধর্ম ও সভ্যতার বিনাশ সাধনে সমর্থ হইবে না।

এই সকল গভীর ভাবপ্রবাহকে বিশ্বজন সমাজে প্রচারিত করিবার এবং জগতের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ভারতের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনে, জগতের প্রকৃত ও স্থায়ী কল্যাণ সাধনের সুদূর আকাঙ্ক্ষা লইয়াই বিবেকানন্দ আমেরিকায় ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদান করেন।

সেই সম্মেলনের মহাসওপতলে দণ্ডায়মান বিবেকানন্দ, বেদান্তের আত্মিক সাম্যের প্রেমপূর্ণ বাণী—সেই "ভ্রাতা ও ভগিনী" সম্বোধনেই সমাগত বিশ্বের নরনারীকে সম্বোহিত এবং পরমাত্মীয়ের পরিচিত করেন।

ঐ মহাসভাতলেই বিবেকানন্দ তাঁহার সর্বজনগ্রাহ্য সুমধুরোদার ভাষায়, ভারতীয় ধর্মাদর্শকেই সমগ্র জগতের ধর্মের জননী বলিয়া ঘোষণা করেন।

ঐ ধর্মমহাসভাগৃহেই বিবেকানন্দ ভারতীয় ঋষির উদার বাক্যাংশে ধর্মসমন্বয়ের মহান্ ভবিষ্যৎবাণী উচ্চারণ করেন—"অচিরেই সকল বিজিগীষু ধর্মের পতাকায় লিখিত হইবে একটি মাত্র বাণী—সংগ্রাম নয়, সহায়তা—ধ্বংস নয়, আত্মীকরণ—দ্বন্দ্ব নয়, সমন্বয় সাধন ও শান্তি॥"

শ্রীরামকৃষ্ণের শিবজ্ঞানে জীবের সেবা, মানুষ মাত্রকেই মানবরূপে ঈশ্বর ও পূজার অভিনব বিশ্ববিজয়ী শিক্ষাই নরেন্দ্রনাথের সাধক জীবনের চরম সার্থকতা দান করে। তাই, বিবেকানন্দ তাঁহার অল্পায়ু সংক্ষিপ্ত জীবনের অবশেষে, সাগ্রহবচনে, মানবের শ্রেষ্ঠ সেবক ও পূজকরূপে, অভিনব বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন, —"জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

(তৃতীয়)

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবনের সকল সাধনার শক্তিধারা যে অবিরাম চিরপ্রবাহমান, তাহা তাঁহাদের পরবর্তী সুরেন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র এবং মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় জগৎবরেণ্য মানব ও কল্যাণব্রতীগণের জীবনে, বাক্যে, কর্মে ও প্রবৃত্তিতেই সুস্পষ্ট রূপেই ব্যক্ত হইয়াছে।

বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ, গুরুবাণী লইয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণের পূর্বক্ষণে, বীর মুখের অভ্রান্ত ভাষায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন —"জীবন প্রদীপ নির্বাপিত প্রায়। তাহাতেই বা কি আসে যায়! আমি আগামী (১৯০০) পনেরোশত বৎসরের জন্য যথেষ্ট কর্মশক্তি সঞ্চারিত করিয়া গেলাম।"

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় এবং ইউরোপের বিজয়বাদ্যে মুখরিত হইয়া ভারতের বুকে ফিরিয়া আসিলে, ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের নেতৃবর্গ তাঁহার ন্যায় বীর সন্ন্যাসী ও অসাধারণ বাগ্মীকে রাষ্ট্রীয় দলভুক্ত হইবার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাইয়াছিলেন।

কিন্তু ধীরমতী বিবেকানন্দ, রৈমেষিক রাজনীতিতে আবেদন-নিবেদনে রত, সেই দুর্বলচিত্ত কংগ্রেসী দলে যোগদানের প্রস্তাব, দৃঢ়তার সঙ্গেই প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমি চাই, একটা মহাশক্তিশালী মানুষ তৈরী করার ধর্মপ্রচার করতে।"

স্বামী বিবেকানন্দ সেদিন রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যোগদান করেন নাই বটে; কিন্তু তিনি সমগ্র ভারতের বুকে যে অগ্নিময়ী জাগরণ-বাণী বিঘোষিত করেন, সেই অমর জীবন বাণীই আজ পর্যন্ত ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তিকামী মাত্রকেই অনুপ্রাণিত করিয়া আসিয়াছে।

ভারতের মুক্তি সংগ্রামের সর্বপ্রথম বীর যোদ্ধা, শ্রেষ্ঠ বাগ্মী ও সমসাময়িক সমগ্র ভারতের সর্বজনমান্য চিন্তানায়ক, বিস্ময়কর রূপে অতুলা বিস্মৃত। সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯১৩ খৃঃ ২৯শে এপ্রিলের "বেঙ্গলী" পত্রিকায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে শ্রদ্ধা ও ভাবাবেগের সঙ্গেই লিখিয়াছিলেন—"কেবল স্বামী বিবেকানন্দ নহেন, মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ঋষি ও তপস্বী শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে সুদূর-প্রসারী সম্ভাবনাপূর্ণ ধর্মাবর্শ লাভ করিয়াছিলেন।"

"শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দ উভয়েই মহান্। ইঁহারা ভবিষ্যতে চিরদিনই উচ্চশিক্ষিত ও চিন্তাশীল জনমণ্ডলীর আধ্যাত্মিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে শক্তিমান করিতে এবং আদর্শপন্থা নির্দেশ করিতে সমর্থ হইবেন।"

বর্তমান যুগের যোগীশ্রেষ্ঠ এবং ভারতের মুক্তি সংগ্রামের অগ্রিযুগের

সর্ব্বাধিনায়ক শ্রীঅরবিন্দ, ১৯১০ সালের "কর্ম্মযোগিন্" মাসিকপত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্পর্কে পরম শ্রদ্ধাভরে এবং আনন্দোচ্ছ্বাস ভাবে যে কথা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারি মুখেই ভাষায় নিবেদিত হইল।

"Ramkrishna Parama-Hansa is the epitome of the whole. He was the great Superconscious life, which alone can witness to the infinitude of the current that bears us all Oceanwards. He is the proof of the power behind us, and the future before us. So great a birth initiates great happenings."

"The going forth of Vivekananda, marked by the master, as the heroic soul destined to take the world between his two hands and change it, was the first visible sign to the world that, India was awake, not only to Survive but to conquer."

ইঁহারেরই পরবর্ত্তী যুগে, ভারতের মুক্তি সংগ্রামের অধিনায়কের শেষ উত্তরাধিকারী, মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে টোকিও হইতে লিখিয়াছিলেন—

"শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের নিকট আমি যে কত ঋণী, তাহা ভাষায় কি করিয়া প্রকাশ করিব? তাঁহাদের পুণ্য প্রভাবে—আমার জীবনের গতি ফিরে। "নিবেদিতার" মত আমিও মনে করি যে, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ একটী অখণ্ড ব্যক্তিত্বের দুই রূপ। আজ যদি স্বামীজি জীবিত থাকিতেন, তিনি নিশ্চয়ই আমার গুরু হইতেন—অর্থাৎ, তাঁহাকে নিশ্চয়ই আমি গুরুরূপে বরণ করিতাম।"

(চতুর্থ)

ভারতের মুক্তিকামী অন্তরে যোদ্ধৃবৃন্দের শেষ যোদ্ধা ও শ্রেষ্ঠ নায়ক, বিশ্বেরেণ্য মহামানব মহাত্মা গান্ধি, বহুকালের বৈশিষ্ট্যহীন, গতানুগতিক ভারতের এক অতি বিস্ময়কর—অভাবনীয় দান।

মহাত্মা গান্ধি আপেক্ষিক ধনসম্পদের কোলে, সহজলভ্য সুখ-সম্ভোগে প্রতিপালিত। তথাপি চিরমাতৃভক্ত মহাত্মা গান্ধি বিদ্যার্জ্জনে কোন দিনই অবহেলা করেন নাই এবং এই জ্ঞানের অন্বেষণ উপলক্ষেই তিনি ভারতীয় এবং ইয়োরোপীয় মহা-মনীষিদিগের চিন্তাধারার সহিত সুপরিচিত হন।

কিন্তু, স্বামী বিবেকানন্দের এবং মহাত্মা গান্ধির জীবনে ও কর্ম্মাদর্শে যেরূপ সুস্পষ্ট সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়, এরূপ আর কাহারও সঙ্গেই দৃষ্ট হয় না। মনে হয়, বিবেকানন্দের অসমাপ্ত জীবনের ব্রত মহাত্মা গান্ধিকে প্রবলরূপেই অনুপ্রাণিত করিয়াছিল এবং মহাত্মাজীই স্বামীজির কল্পিত আদর্শকে বাস্তব রূপদানে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এইরূপ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের ও মহাত্মা গান্ধির বিপ্লবাত্মক কর্ম্মধারার ও প্রাণস্পর্শী বাণীসমূহের বিস্তৃত আলোচনা সম্পূর্ণ অসম্ভব। প্রমাণস্বরূপ কেবলমাত্র দুই চারিটি বিষয়েরই উল্লেখ করিব।

পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার যৌবন প্রেমের অক্ষয়ধারা জীবন ভাষায় একদিন বলিয়াছেন—"আমি সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া আসিলাম।...এখন আমার খুব বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, ইহাদের দারিদ্র্য ও যন্ত্রণা দূরীভূত না করিয়া, ইহাদের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করা বৃথা। এই কারণেই, ভারতের দীন দরিদ্র জনসাধারণের মুক্তির উপায় নির্দ্ধারণের জন্যই আমি আমেরিকায় যাইতেছি।"

"যে পর্য্যন্ত ভারতের একটি কুকুরও অভুক্ত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত দুনিয়ার মুখে অন্নদানই আমার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম হইবে।"

মহাত্মা গান্ধির ১৯২০ ও ১৯২১ খৃঃ কথার ভিতর দিয়া স্বামীজির ঐ কথারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। "যে পর্য্যন্ত দেশে একটিও কর্ম্মহীন ও অন্নহীন পুরুষ বা স্ত্রীলোক দেখা যাইবে, সে পর্য্যন্ত আমাদের বিশ্রাম সুখ উপভোগে এবং উদরপূর্ণ ভোজ্য গ্রহণে লজ্জিত হওয়া উচিৎ।"

"দেশীয় যন্ত্রণায়, ভগবান কবীরের শ্লোক গান করিয়া, শান্তিনিকেতনের চেষ্টাকে আমি বৃথা বলিয়াই মনে করি।"

"বিশ্বের মানব কল্যাণের জন্য প্রাণদান করিতে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে, ভারতবাসীকে আগে শিখিতে হইবে, কি উপায়ে নিজের জাতিকে বাঁচানো সম্ভব।"

সর্ব্ববিষয়ে দুর্দ্দশাগ্রস্ত দরিদ্র ভারতের, সুসংস্কৃত আদর্শশিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলিতে গিয়া, স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে, ভারতীয় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার বিস্তার একান্ত আবশ্যক। সর্ব্বাগ্রে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত করিতেই হইবে। কার্য্যকরী শিক্ষা এবং যে শিক্ষা ভারতীয় শিল্প-ব্যবসায়কে উন্নত করিয়া তুলিতে সমর্থ এবং যাহার ফলে না করিয়াও যাহাতে মানুষ প্রচুর উপার্জ্জনে ও দুর্দ্দিনের জন্য সঞ্চয়ে সমর্থ হইতে পারে, এইরূপ শিক্ষাই আজ ভারতে বিশেষ প্রয়োজনীয়।"

১৯১৯ খৃঃ হইতে ১৯২২ খৃঃ পর্য্যন্ত মহাত্মা গান্ধী বৈদেশিক কল-কারখানার বিরুদ্ধে এবং ভারতে কুটীর শিল্পের (চরকা, তাঁত, প্রভৃতি) প্রচলনের জন্য প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি করেন।

১৯২১ সালের জুন মাসে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি চাই না যে, আমার বাসগৃহের চতুর্দ্দিক প্রাচীরে বেষ্টিত হইবে, এবং জানালা সকলও আবদ্ধ থাকিবে। পৃথিবীর সর্ব্বদেশীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির আবহাওয়া আমার গৃহের সর্ব্বত্রই স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হউক, ইহাই আমার কামনা।"

"কিন্তু, বর্ত্তমান যুগে কলকারখানার প্রতি মানুষের উন্মত্ত আকর্ষণের আমি একান্ত বিরোধী। কলকারখানা মানুষকে ব্যক্তিগত শ্রমের স্বাভাবিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করে এবং কর্ম্মহীন করিয়া ফেলে। ইহার ফলে অধিকাংশ দরিদ্র মজুরকে মজুরীর ও খাদ্যের অভাবে অনাহারে অর্দ্ধাহারেই প্রাণ হারাইতে হয়। সুতরাং কলকারখানাকে মানুষের স্বাভাবিক মজুরীর অধিকারের সীমাকে অতিক্রম করিতে দেওয়া উচিৎ

নহে। অবশ্য, কলকারখানা থাকিবেই। মনুষ্যদেহের মত কলকারখানাও মানুষের পক্ষে অপরিহার্য্য।"

স্বামী বিবেকানন্দ এবং মহাত্মা গান্ধী উভয়েই ভারতের কোটি কোটি দরিদ্রের দুঃখে—দৃষ্টকোণে আবদ্ধা অশিক্ষিতা দুর্দশাগ্রস্তা মাতৃজাতির দুঃখে এবং দুঃখার্ত্ত উচ্চশ্রেণীর পীড়নে নিম্নশ্রেণীর অপাংক্তেয়গণের দুঃখে, আজীবন অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের দুঃখ মোচনের জন্য প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ যে দুঃখমার্গ পরিত্যাগের জন্য উচ্চশ্রেণীর প্রতি কঠোরতম শাসনবাক্য উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীও সেই "Untouchability" দূর করিবার আশায়, ব্যাপকভাবেই সর্ব্বশ্রেণীর পংক্তি ভোজনের জন্য—অসবর্ণ বিবাহাদির প্রচলনের জন্য এবং ভারতের বিখ্যাত মন্দিরসকল সর্ব্বশ্রেণীর অবাধ প্রবেশের ও পূজার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, সারা ভারতব্যাপী প্রবল আন্দোলন করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ দরিদ্র দেশবাসীকে "নারায়ণ" আখ্যা দিয়াছিলেন এবং "নারায়ণ" জ্ঞানেই দরিদ্রের সেবার ও পূজার প্রচলন করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দৈনন্দিন কার্য্যাবলীর ভিতর দিয়া ঐ "দরিদ্র নারায়ণের" সেবা পূজা ও দুঃখার্ত্ত জনের কাজ নীরবে অবিরাম গতিতেই চলিয়াছে।

মহাত্মা গান্ধী সেই "দরিদ্র-নারায়ণদিগকেই" "হরিজন" নামে অভিহিত করিয়া তাহাদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বসূত্রে বাঁধা করিয়া, তাহাদের জীবনকে উন্নত করিবার চেষ্টায় আপন জীবনের অধিকাংশ অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন।

সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্টরূপে মনে পড়ে, পরিব্রাজক বিবেকানন্দের এবং লবণ আন্দোলনে বিখ্যাত ডাণ্ডি অভিযানকারী ও অল্পকাল পূর্ব্বের সাম্প্রদায়িক অত্যাচারে বিধ্বস্ত নোয়াখালী ভ্রমণকারী নগ্নপদ মুণ্ডিত-মস্তক, দীর্ঘ যষ্টিধারী, অসাধারণ সহিষ্ণু, ধীরপ্রকৃতি—মহাত্মা গান্ধীর গভীর সাদৃশ্য।

স্বামী বিবেকানন্দ একদিন তাঁহার জ্বালাময়ী ভাষায় স্বদেশপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া, মহান্ যোগীর ধ্যান করিয়াছিলেন,—"হে বীর, সাহস অবলম্বন কর। সগর্ব্বে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। তুমি কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সগর্ব্বে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই। ভারতবাসী আমার প্রাণ।··· বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ। ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ·····।"

আজ পর্য্যন্ত ভারতের মুক্তিসংগ্রাম ক্ষেত্রে যত বীর স্বদেশপ্রেমিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিয়াছে। তাঁহারা প্রায় সকলেই স্বামী বিবেকানন্দের ভাবের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়াই মুক্তিসংগ্রামে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কিন্তু, একমাত্র মহাত্মা গান্ধীই স্বামী বিবেকানন্দের "কটিবস্ত্র" বাক্যের ইঙ্গিতের গভীর তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত বেশে ও বিন্যাসে—সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বাবস্থায় দরিদ্র ভারতের ঐ "কটিবস্ত্রের" সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। দরিদ্র ভারতকে তাঁহার জীবনের অংশস্বরূপ মনে করিয়াই মহাত্মাজী চিরজীবন দরিদ্রের তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ, দরিদ্রের উপযোগী আহার্য্য গ্রহণ এবং দরিদ্রের পর্ণকুটীরেই সবরমতীতে ও সেবাগ্রামে বসবাস করিয়া গিয়াছেন।

ভারতের দুইটি প্রবল বিবদমান জাতি—হিন্দু ও মুসলমান। এই হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রেমের বন্ধন দৃঢ় ও স্থায়ী না হইলে ভারতের কল্যাণসাধন অসম্ভব বুঝিয়াই, স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—"আমাদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইস্‌লাম ধর্ম্মরূপ এই দুই মহান্ মতের সমন্বয়ই বৈষাম্বিক মস্তিষ্ক ও ইস্‌লামীয় দেহ—একমাত্র আশা। আমার মাতৃভূমি যেন ইস্‌লামীয় দেহ এবং বৈষাম্বিক হৃদয়রূপ এই বিবিধ আদর্শের বিকাশ করিয়া কল্যাণের পথে অগ্রসর হন!"

মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক জীবনেও এই হিন্দু ও মুসলমান জাতিদ্বয়ের মিলন সাধনের চেষ্টাই প্রবলতম রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। এই হিন্দু মুসলমানের ঐক্য সাধনের আগ্রহেই তাঁহার দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠকে, মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় জাতির প্রতিনিধি রূপে, মুসলমান নেতা মওলানা শওকৎ আলীর হস্তে "শ্বেতপত্রে" স্বাক্ষর করিয়াও মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

উনত্রিশ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধ ও পেষণ, জগৎজয়েতা মহামানব মহাত্মা গান্ধী, এই হিন্দু মুসলমানের ঐক্য সাধনের ও শান্তিপ্রতিষ্ঠার দুঃসাধ্য চেষ্টার ফলেই, শিশু হিন্দু যুবকের আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে তাহার বুকেই বরণ করিয়া গেলেন। এই যুগপ্রবর্ত্তক ঘটনার বুকের রক্ত-ঢালা মহাপতাকার তলে এই অন্ধকারপূর্ণ ভারতের বুকে, কল্যাণময় প্রভাত সূর্য্যের দীপ্তিতে প্রকাশিত হইবে, তাহা একমাত্র ভারতের ভাগ্যবিধাতাই জানেন।

ভদ্রাচলামের ক্যাম্প

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

(শিকার-কাহিনী)

আচমকা ঝাঁকুনিতে ঘুম ভেঙে গেল, চোখ খুলে দেখি একটি ছেলে আমাকে ঠেলছে। অত্যন্তই স্পষ্ট, প্রায় রেগে উঠেছিলাম, কিন্তু ছেলেটার মুখ দেখে কিছু বলতে পারলাম না। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে, চোখে জল, ভয়ে কথা পর্য্যন্ত জড়ান, বললে,—"বাবাকে নিয়ে গেল"—শঙ্কিতে এটুকু বলেই হার ভাষা বন্ধ হয়ে গেল। ব্যাপারটা যে কি তা জানি তবে বোঝবারও উপায় নেই—ছেলেটার মন একেবারে ওলোট পালট হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় জেরা করে খবর যার করতে যাওয়া বিচক্ষণতা নয়। তবু অনুমান আমাকে কারণের নাগালে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। ক্যাম্প খাট ছেড়ে উঠতে হল।

উষাকাল, সবে ভোর হতে আরম্ভ করেছে। তাঁবুর বাইরে জমাট কোয়াসা, লণ্ঠনের আলো দুই গজও চলে না। ছেলেটার হাতে টর্চ্চ দিয়ে বললাম,, "কল ট্রিপ থাক, আমি বন্দুক নিয়ে এগুচ্ছি, তোর কোন ভয় নেই।"

গুদের আড্ডা আমার তাঁবু থেকে ত্রিশ গজের ভিতর। খানিকটা এগুতেই ছেলেটা চাঁৎকার উঠল। আমিও যা দেখলাম তাতে রক্তহীম হয়ে আসার উপক্রম। আট দশ হাতের ভিতর দুটো চোখ টর্চ্চের আলো পড়ায় আগুনের মত জ্বলছে। বন্দুক তুলে ট্রিগ করারও সাহস নেই, সামান্য নড়াচড়েই একটা কিছু ঘটে যেতে পারে। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু পরেই চোখের আগুন নিভে গেল—বুঝলাম বুণ ঘুরছে। এখন কি করা কর্ত্তব্য ? মনে হল টর্চ্চটা আমার হাতেই থাকা ভাল—চলার পথে অতিরিক্তভাবে উপায়ন বরকার হতে পারে। তখন জীবটি অন্ধকারের আড়াল নিয়ে যদি পিছন থেকে আক্রমণ করে তাহলে আমাদের মধ্যে একজনকে ওর সঙ্গে যেতে হবে। এইরূপ আচরণ কিছুই বিচিত্র নয়। বিচিত্র নয় কেন বলি, এইটাই হল আসল বুনিয়াদি চাল। এক হাতে রাইফেল এবং অপর হাতে টর্চ্চ নিয়ে এগুতে লাগলাম। মাঝে মাঝে চার ধারে আলো ঘুরিয়ে নেবে নিচ্ছি—চলন্ত আগুনের আতঙ্ক পিছু নিয়ে আছে কিনা। তখন একমাত্র চিন্তা কোন প্রকারে ছেলেটার আস্তানায় ফিরে পৌঁছান। একটি পরিত্যক্ত গোড়ো ঘরে ওদের স্থান দিয়েছিলাম। বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছি, প্রায় নিশ্চিন্ত হবার আশা সন্তর্পণে হৃদে উঠেছে, এমনি সময় মনে হল, ঠিক আমার পিছনেই একটা কিছু ঘটে গেল। অকস্মাৎ অন্তর্দাহের ভয় আমাকে গ্রাস করে ফেলল, এমনই অবস্থা যে চলৎশক্তিরহিত। পিছন দিকে মুখ ফেরাবার সাহস ছিল না, তথাপি অনুমান চাঙ্গুস হয়ে উঠেছে। সামনে এগুবার চেষ্টা করলি, পা চলে না, কেউ যেন লোহার শিকল দিয়ে মাটির সঙ্গে বেঁধে ফেলেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামের কাছে মৃত্যুর ভাক শুনছি। এই অবস্থায় কতক্ষণ ছিলাম মনে পড়ে না। যাঁতার স্বাভাবিক ইচ্ছা কিভাবে সাহস যোগাড় করে বিশ্লিষ্ট—হঠাৎ শিহর দিয়ে গেল,—ছেলেটা অন্তর্ধান করেছে। বিদ্যুতের দিকে আলো ফেলতে ফেলতে দেখলাম, ছেলেটার পা দুটো শেষের অবস্থায় জমাট কোয়াসার ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। টর্চ্চ আর বন্দুকের কল একত্র করতে করতে সব কিছুই অদৃশ্য হয়ে গেল।

যে দিকে ছেলেটা অদৃশ্য হয়ে গেল সেই দিকে আলো ফেলে একরকম পিছু হেঁটেই গুদের আড্ডায় এসে পৌঁছলাম। তখনও আগুন পোয়াবার চুল্লী জ্বলছে। বেশী রাত পর্য্যন্তই খোল গল্প চলেছিল। দরজার কাছে গিয়ে দেখি ভিতর থেকে বন্ধ। অনেক ডাকাডাকি আর ধাক্কার পর দরজা খুলল। ঘরের ভিতর আলো ফেলতে—চার জন মানুষই কিছু বলবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। ঘরে ঢোকবার পথেই পা পিছলে ছিল, মাটির উপর দেখলাম থোকা তাজা রক্ত।

ঘটনাটি গোড়া থেকে শুনলাম। শীতের রাতে বরফ একটু বেশী চেড়ে গিয়েছিল। সকলেই বেঘোর অবস্থায় শুতে যায়। ভোরের দিকে ঘুমের চাপ যখন গুদের পেড়ে ফেলে তখনই দুর্ঘটনাটি ঘটে। সকলে নিয়ে ওরা ছিল ছয় জন। বাপ বেটায় শুয়েছিল দেরের দিকে। টাটির বেড়া বন্ধই ছিল, কখন চৌচাড়ি ফাঁক করে বাঘ ঘরে ঢোকে কেউ জানতে পারে নি। ছেলেটা জেগেছিল—বলছে বাঘের ভাক শুনে ওর ঘুম ভেঙে যায়। একটু পরেই দেখে টাটির বরজা ফাঁক করে বাঘ ঘরের ভিতর ঢুকে পড়েছে—। বাইরের চুলীর আলো বরজার. ফাঁক দিয়ে ঘরে আসছিল, স্পষ্টই দেখেছিল। একটার পর একটা। মানুষ তিনটে, ভয় পেয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে জড়সড় হয়ে শুয়েছিল,—এর মধ্যে বাপকে ছুঁতে দিয়ে বোধে আরগাটা ফাঁকা। শুয়ে কম্বল থেকে মুখ বার করে দেখে—বাপের মাথা বেড়ার ফাঁক দিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে। এই সময় ছেলেটা চেঁচিয়ে উঠে আশাদের ডেকে তোলে—আমরা বাইরে আসতে সাহস পাই নি। ছেলেটাকেও আটকে রাখা গেল না, জোর করে একলা বেরিয়ে গেল। বিবরণ শেষ করে লোকটা থামল, একবার ভুলেও জিজ্ঞাসা করল না—ছেলেটার কি হোলো ? বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়ে, গুদের বার করার চেষ্টা করলাম না—কারণ মনে এলেও মন কোয়াসার টর্চ্চের আলো ফেলায়। একলা ক্যাম্পে ফিরতে মন চাইছিল না। সকালের অপেক্ষায় বসে রইলাম।

ফরসা হতেই আমাদের তাঁবুতে গোলমাল উঠল। মিস্তর আর্থাণী

চা দিতে এসে আমাকে না পেয়ে চেঁচামেচি লাগিয়েছে। চিৎকার করে জানাতে হল, আমি এ দিকে আছি।

সকালের কাজ সব বাকি পড়ে। জলন্ত চোখ দুটো আমাকে বিবৃত করে তুলেছিল, স্থির হতে পারছিলাম না। যেখানে দৃষ্টি রেখেছিলাম—সেইখানে উপস্থিত হলাম। জায়গাটি একটি ছোট্ট নালার কাছে। পাড় বেশ উঁচু, কাছে না গেলে, নালার জল দেখা যায় না। দিনের আলো এবং খোলা মাঠ হলেও সন্তর্পণে এগুচ্ছিলাম। যে সব জানোয়ারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, তাতে সব সময় প্রস্তুত না থেকে উপায় নেই। পথ চলতে একটি বড় সড় উইএর ঢিপি পাওয়া গেল—উঠে পড়লাম ওর চূড়ার উপর। এইখান থেকে নালার অনেকটা দেখা যায়। খোঁয়ার দল সহজেই পাওয়া গেল। একটু দূরে বাড়ী মুখ মোটা মানুষটি বালির উপর মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছে।

লোকজন ডাকেই ছিল, সাহসের অভাব বোধ করি নি। নিকটে এসে দেখলাম, মাথাটা দেহ থেকে প্রায় তুলিয়ে দিয়েছে।—মাথার কাছেই মরভূমের পায়ের দাগ, একটি ছোটখাট ঝুলোর পরিধি দিয়েছে, লম্বাতেও অসাধারণ। বাঘ এত বড় হতে পারে চাক্ষুস প্রমাণ না পেলে বিশ্বাস করতে পারতাম না।

এইখানেই মানুষটাকে খাবার আয়োজন করেছিল। ডিজে মাটিতে বসার দাগ স্পষ্ট হয়ে আছে। অবস্থিতির বিপরীত দিকে কাছে আসায়, উঠে দাঁড়ায়। তার পর পাড়ের উপর উঠে সন্ধের অনুমান করা দরকার হয়েছিল—একটু আমাদের দিকে আসতেই, আলো চোখে পড়ে। পরের ঘটনা ছেলেটাকে নিয়ে। হঠাৎ মুখ ঘোরায় কেন, জানতে সময় লাগল না—। এই জাতীয় জানোয়ার সঙ্গে বিপদ জড়াবে থাকে জেনে সোজা চলে গিয়েছিল আমাদের বিপরীত দিকে। চলার চিহ্ন অনুসরণ করে চলেছি, প্রায় কয়েক থাকেক আসার পর দেখা গেল, হঠাৎ গতির পরিবর্তন ঘটেছিল, —পলায়নের পরিবর্তে আক্রমণের প্রয়াস বেড়ে ওঠে। যাবার সময় ধীরে সুস্থে এগিয়েছিল, ফিরবার পথে লাফের পর লাফ ব্যবহার করে একটু আগেই লাফ থামিয়ে দিয়েছিল, তার পর পিছন থেকে ছেলেটাকে নিয়ে যায়। এই রকম মারার প্রণালী ইতিপূর্বে আমার সুবিধা পাই নি। খুব নিঃশব্দে কাজ সারা হয়—হত জীবটিকে মাটিতে পড়তে দেয় নি। ঘাড় ধরে মানুষ নয় মাস দিয়েছিল কিনা কে জানে। কেমন একটা জৈবিক প্রভাব ঘটনাগুলির সঙ্গে জড়িয়ে ফেলতে লাগল।

জন্তুটির স্ত্রীর সম্বন্ধে নানা মন্তব্য অনেক দিন থেকেই শুনছিলাম। কাজের চাপে শিকারের সম্বন্ধে বড় করে দেখতে পারি নি। শেষ পর্যন্ত মানুষ মারার খবর এবারই ছেড়ে উঠতে লাগল যে, বাঘের পিছু নেওয়া আমার কর্তব্যের এলাকায় এসে পৌঁছল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, দুজন মানুষ উধাও হবার খবর পেয়েও নির্লিপ্ত থাকলে উপরওয়ালার কাছে জবাবদিহীর প্রশ্ন উঠে পড়ে।

এই গ্রামে জঙ্গলের ভিতর চার জন মানুষকে ছিল। আমার আশে পাশেই খওড়া ফেলে, এই খানেই ঘাঁটু গাড়তে বলেছিলাম, কল হাতে হাতে পাওয়া গেল।

জায়গাটা তিন দিকে খোলা। একদিকে যেটুকু গাছ পালা আছে, তাকে জঙ্গল বলা চলে না। তলায় ঝোপঝাড়া আগাছার জোপ —তার সঙ্গে কতকগুলি বাজে গাছ। যেটুকু জায়গা ঘিরে মানুষের কারবার তাও অল্পপরিধির ভিতর সমাপ্ত। জোপের পিছনেই গ্রাম। আমাদের দিক থেকে তাড়া খেলেই বাঘ গ্রামের দিকে বেরিয়ে পড়বে—আড়াল রেখে পালাবার ঐ একটি মাত্র পথ এবং পথের মাঝে বাঘের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়ে গেলে—শার্দুল সুলভ আশ্চার্য খুবই স্বাভাবিক। অপরদিকে গ্রামের ভিতর থেকে শিকার খুঁজলে —বিরাট গোলাকারের দিকে চলে আসবে। বিস্তৃত খালি জায়গায় ঝোপঝাপ মাত্র সবই আছে। আক্রমণের অবসরে জানোয়ারটিকে আর পাওয়া যাবে না এবং এ ওজনটিও ছেড়ে পালাতে পারে।

শিকারের সম্ভাবনা জটিল হয়ে উঠতে লাগল। লোকেদের বললাম—পাঁচ ছয়টি ঝোপ চাই। বিপরীত দিকের গ্রাম থেকে কিরে আসতে হবে। সামনের বস্তিতে যাওয়া চলবে না, বাঘ নিশ্চয় কাছেই কোন বড় ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে আছে।

শিকারের জায়গা ছেড়ে উল্টো দিকে যাবার প্রস্তাবে উঠলেই প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক লোক বোধ আমার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল এবং আমার সমর্থনের অপেক্ষা না রেখে কর্তব্য পালনের জন্য আগুয়ান হয়ে পড়ল।

ফুরে ফিরে রাত্রের ঘটনাই মাথায় পাক খাচ্ছিল। কাপড়ের ঘর, তার উপর নির্বিঘ্ন প্রবেশ পথ ছেড়ে, মজবুৎ বেরোলজালা ঘরের দিকে গেল কেন। যে লোকটাকে ঘরের ভিতর মারল—সেও বাছাই করা মানুষ। রোগা মানুষগুলি বাঘ দিতে সব কয়জনকে ডিঙিয়ে যেতে হয়েছিল, সর্বোপরি ওস্তাদি প্যাচ, নিঃশব্দে কাজ হাসিল।

এরূপ একটি জীবের চাল চলন জানতে হলে খোয়েশারিগী না করে উপায় নেই। কাছে যেতে পড়লাম, ঘাঁটুর পিছনে পায়ের দাগ খুঁজতে লাগলাম। কি সর্বনাশ এইখানেই সে চার পাঁচবার টহল দিয়েছে—একবার পর্যন্ত কাছেও এসে দাঁড়িয়েছিল—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সোজাই চলতে থাকে মহাজনেদের দিকে—হাতের পাঁচ ঐ দিকেই ঠিক ছিল। বাঘের চোখে বিষ দৃষ্টি জড়ান থাকে —আয়োজন ঘুরের জিনিসে আগ্রহের সঞ্চয় থাকলে সামান্য মড়াতেই বুঝে নেয় আহার্যটি কোন জাতীয়। ঘাঁটুর কাছে টহল মারার প্রথায় বিপদের সম্ভাবনা ঘনিয়ে ছিল, একবারও ভোবাই হয়ে নি। গ্রামের আবহাওয়ায় সাদা কাপড়ের ঘর প্রথম খাপছাড়া, দ্বিতীয় বোধ হয় কোন সময় এই রকম ঘরের কাছে আসতে বিপদেও পড়ে থাকবে—কে বলতে পারে গুলির মারে আহত হয়েছিল কিনা। বাঘ পায়ের দাগ অনুসরণ করে খোড়ো ঘরের কাছে এসে পৌঁছলাম।

যা ভেবেছি ঠিক তাই ঘটেছিল, বরাবর ঘরের দরজার অন্ধকারে

দুটি বেরে বসেছিল—তীরের বাইরে কাউকে একলা পাবার আশায়। যে সব জায়গায় বসে তাক করেছিল সেই জায়গাগুলি—নেজের দুটু বেরোয় ঘাঁটি বেবার মত পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। ওৎপাতা বাঘের ধৈর্য্য মাপতে যাওয়া বিড়ম্বনা, কারণ সীমাকে নাগালের মধ্যে পাবার উপায় নেই। প্রস্তুত আমার সুবিধামত পাবার জন্য কতক্ষণ বসে থেকেছে কে জানে। একলা কাউকে না পাওয়ার দরুণ হতাশ হয়ে আগুনের সামনে গিয়েই ঠিক তারবার ঘরটায় চার বারে ঘুমাচ্ছে—চোকার সহজ ফাঁক খোঁজার জন্য। কোন দিকে সুবিধা না করতে পেরে চুলীর আলোকেই সাক্ষী রেখেই ঘরে ঢুকে পড়ে। এতটা কাহিনী মাটির বাসে জানা গেল। নরম বালি মাটির উপর সব কথাই লেখা ছিল। কারণ এখানকার বাসীন্দারা সকালেই গৃহত্যাগ করে, মানুষ এদিকে চলে না।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, অতগুলি মানুষের গায়ে ঘোঁয়া না লাগিয়ে কি ভাবে ঐ রকম মোটা মানুষকে সুদ্ধ ঘুনিয়েছিল ধারণা করা শক্ত। কিম্বা ঘোঁয়া লাগলেও মহুয়ার ঘোর রসপ্রাহীদের জাগিয়েছিল, প্রিয়ার ঘোঁয়া, আরো লাগুক। ভরা ঘুমের ঘোরে, দুয়ার পার কথা ভেবে কাজ কিছুই বিচিত্র নয়।

ঘরই বাঘের আগমনের সঙ্গে অনিষ্টতা গাঢ় হয়ে লাগল, ততই আমাদের ঘোর বাড়তে সুরু করে দিল। এখন ছেলেটাকে খুঁজে বের করা যায় কেমন করে? বিবেচনা করে দেখলাম তীর করে ছেলেটার কাছে যাওয়া উচিত হবে না। যেরকম ফাঁকা তাতে আমরা পৌঁছাবার আগেই বাঘ ঘা চাকা মেরে, অথবা পালাবার সময় দেখতে পেলেও গুলির পাল্লার বাইরে থেকে ছেড়ে পারে। একলা চুপি চুপি যেতে পারলেই ভাল হয় কিন্তু আমার বন্ধু বাঘের কাছে একলা যাবার সাহস ছিল না। আমার আর্দ্দালীকে সঙ্গে নিলাম। লোকটা এর আগে অনেকবার শিকারের গল্প করেছে—বন্দুক চালানতেও নাকি সিদ্ধহস্ত। এইরূপ আত্মপ্রসাদের যোগে প্রোমোসনের কোন বাধা ছিল না—সুতরাং আর্দ্দালীর সাহসকে অবিশ্বাস করার কারণ ঘটে নি। বোমলাটা তুলে নিয়ে আমার পিছনে আসতে বললাম।

বন্দুক তুলে তাঁবু থেকে বিরে এসে বললে, "হজুর গরিবগুলো এসে গিয়েছে—কয়েকটা এগিয়ে দিয়ে আমরা পিছনে থাকলেই ভাল হয়। এই বাঘটা একেবারে বজ্জাৎ জানোয়ার।

বাঘের বিষয় নতুন খবর না থাকলেও আর্দ্দালীর মনের অবস্থা কতকটা বুঝলাম। এইরূপ বোমলা লোক সঙ্গে নেওয়া উচিত হবে কিনা ভাববার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। বিপদ যদি কাছে এসে পড়ে তাহলে আর্দ্দালী আর আমার মাঝে দুয়ার বেড়ে উঠবে। বিপদ দূরে থাকলে টেসাসেচিতে কাজে লেগে আমাও খুব সহায়তা। আর ছেড়ে নেই, আর হাতে নিশ্চিন্ত মনে আরের অস্ত্র তুলে দিতে পারি। পত্যন্তরে অনিচ্ছুক মানুষকেই সঙ্গে নিতে হল।

লোকবিরল বালি মাটির উপর দাগ সজাগ হয়ে আছে। বিপদের ক্ষেত্রে আসতে রাইফেল ভরে নিলাম—দুই ক্লিপ বাড়তি কার্ত্তুজও বুক পকেটে রেখে নিলাম। আমার ক্যাম্পকে পিছনে ফেলে টানের দাগ, খোপের দা ঘেঁসে উত্তরমুখো চলেছে। যে কোন মুহূর্ত্তে চলন্ত চিবু ঘোড় ঘুরে ফেলে পারে। চোখ কান দুঁসিয়ার রেখে একটার পর একটা পা ফেলছি। চলতে চলতে ঘোট জঙ্গল শেষ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে আমরা ক্যাম্প ছেড়ে অনেকটা এসে পড়েছি। টানের দাগ তখনো ঘুরের দিকে আগুয়ান হয়ে আছে—আমার দৃষ্টি দাগের দিকে নিবদ্ধ—হঠাৎ আর্দ্দালী পিছন থেকে ঁাঁপয়ে পড়ল, কানের কাছে এসে বললে "ঐ যে"।

চমকে উঠলাম, বুকের উপর কে যেন ভারী হাতুড়ী বসিয়ে দিল। দৃষ্টি ঘুরে চালাতে দেখলাম—একটি ঘোট ঝোপের পাশে মানুষের মাথা বেরিয়ে আছে। বাঘ নিশ্চয় ঝোপের আড়ালে আহার চালিয়েছে। ঝোপের আশেপাশে একেবারে পরিষ্কার, কিন্তু হঠাৎ বেরিয়ে এলেও ভয় নেই। কিন্তু এতদূর থেকে নিশানা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়—কাছে গেলেও বিপদ ছেড়ে ওঠে। আর্দ্দালীর উপদেশ অগ্রাহ্য করায় আপশোষ এসে গেল। দুজনমাত্র লোক, তার মধ্যে উত্তেজিত হলে শিকার চলে না। একটু আগেই ঝোপের প্রস্তাবে যে ভাবে নির্লিপ্ততার ভাণ করছিলাম প্রকাশ করেছি তাতে মনের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করারও সংগ্রহ নেই। ঝোপান্বিত বিপদকে বরণ করার জন্য এগুতে হল।

নিশানার প্রয়োজনীয় দূরত্বের কাছে আসতেই আর্দ্দালীকে বললাম, কাপতে। আদেশ অনুযায়ে সে গলা খাকরানি দিল, ঝোপের দিক থেকে কোন চঞ্চলতার লক্ষণ পাওয়া গেল না। বাঘ বাঁচাতে প্রাণান্ত, —ভিতরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ঠেলা মেরে আরো খানিকটা এগিয়ে দিল। ছেলেটা একই অবস্থায় পড়ে আছে। আর তো এগুন চলে না। রাইফেল তুলে নিজেই কাশলাম, তার সঙ্গে দুচারটে আবোল তাবোল কথাও বললাম, ঝোপ নড়ে না। সামনের দিকে মুখ রেখেই, আর্দ্দালীকে বললাম, দুচারটে নুড়ী বা ইটের টুকরা কুড়িয়ে নিয়ে এস, এইখান থেকে ঝোপের উপর ছুঁড়তে হবে। বাঘ বেরিয়ে পড়লেও ভয় নেই, চারধার ফাঁকা, তার উপর দুটো বন্দুক আছে, একটার গুলিতে পড়বেই। ইচ্ছা করেই আর্দ্দালীকে শিকারীর মারুষর স্থান দিতে হয়েছিল নিজের সাহস বাড়াবার জন্য।

আর্দ্দালী ঢিল খুঁজতে চলে গেল, আমি রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে রইলাম। দৃষ্টি এক জায়গায় ঠিক করে রেখেছি, সময় কেটে চলেছে। ক্রমাগত হাত বেরে আসতে লাগল, আর্দ্দালী আর ফেরে না। ধৈর্য্য যখন সময় বিরক্তির নাগালে এসে পৌঁছাল—ভয় সর্ব্বাঙ্গ পিছিয়ে পড়েছে। সামনের দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরাবার উপায় নেই যে মুখ ঘুরিয়ে দেখব লোকটা গেল কোথায়। এরূপ অবস্থায় ধৈর্য্য গণ্ডির বাঁধন ছিঁড়লে মানুষ কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে পড়ে, আমার ক্ষেত্রেও তা স্বাভাবিক তাই ঘটল, বেপরোয়া হয়ে সোজা একলাই এগুতে লাগলাম। সঙ্গে ৩০০ বোরের একনলা বোমলা ছিল, নির্ভরশীল অস্ত্র। একটা উপরি গুলি হাতে রেখে ঝোপের কাছেই, ছেলেটার পায়ের দিকে বালির উপর গুলি

চালালাম। একরাশ বালি উড়ে গেল, বাঘ বার হল না। বন্দুকের আওয়াজ আর বিপদ্ম ভোপ সাহস বাড়িয়ে দিয়েছিল। ফাঁকা নলটা ভরে নিয়ে এক পা দুপা করে ছেলেটার কাছে এসে পড়লাম, বাঘটাও কমতে কমতে ১৫।২০ হাতের মধ্যে এসে পড়ল। এইখান থেকে একই জায়গায় লক্ষ্য করে আবার গুলি চালালাম। বিকট আওয়াজের প্রতিধ্বনি নিস্তব্ধতাকে তোলপাড় করে দিল—তারপর সব চুপচাপ। নির্ভয়ে ঝোপের কাছে এসে পড়লাম। অপর পাশে গিয়ে দেখি বাঘ নেই এবং ছোকরার বুক পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছে, ভীতিপ্রদ দৃশ্য। জমাট রক্তের উপর হঠাৎ লাফ মারার চিহ্ন রয়েছে, লাফের সময় পিছনের পা পিছলে গিয়েছিল—রক্তের সঙ্গে খানিকটা মাটিও উপড়ে গিয়েছে। মিস্টার আমাদের বহুদূর থেকেই দেখেছিল।

এখান থেকে আমাদের আস্তানা মাইল খানেকের উপর হবে। শিকারের যেটুকু অভিজ্ঞতা ছিল তাতে ঠিক জানতাম, বাঘ আর এ মুখো নেই। তবে বাকি অংশ খাবার জন্য সন্ধ্যার দিকে ফিরে আসতে পারে। এই দিক দিয়ে হাটের পথ, একটু পরেই লোক চলাচল সুরু হবে। সুতরাং দিনের বেলা বাঘ ফিরছে না।

ছেলেটার যেটুকু অংশ পড়ে আছে তাই শিকারের লক্ষণ। মড়া আগলাতে হলে কয়েকজন লোকের দরকার, আর্দ্ধালীটা কিরণে বাঁচি—তাঁবুতে খবর পাঠান চলে। মড়ার কাছে লোক না থাকলে এখুনি লক্ষ্মীতে খেয়ে ফেলে যাবে। এরই ভিতর মাথার উপর কয়েকটা উড়তে আরম্ভ করেছে।

শব আগলে দাঁড়িয়ে রইলাম, আর্দ্ধালী আর ফিরল না। কপালগুণে হাট-মুখো কয়েকজন চাষাকে দেখলাম আমার দিকেই চলে আসছে—কাছে আসতে গোড়াতেই বেশ জোর দিয়ে হুকুম দিলাম, "মড়ার পাহারায় থাক"—এই রকম হুকুম চালান আমার পেশার অঙ্গীভূত। অন্যান্য থাকায় মড়ার বন্দুককে মাতীর পর্য্যায় টেনে আনতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয়নি। বন্দুক হাতে অভিনয় বাক্তির আবেশ বিনা আপত্তিতে পালিত হল। একজন সাহস করে জিজ্ঞাসা করেছিল—"বাঘ যদি আসে?" অর্থাৎ তখন পালাতে পারব তো? উত্তরে কোন কথা বলিনি, কেবল লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম—বার মানে দাঁড়ায় এ রকম আবেশ তো দিই নি। দৃষ্টির শাসনে লোকটা এমন ভাবেই বশীভূত হয়ে গেল যে ওদের নিশ্বাস শিকারের টোপ রেখে আসতে কোন প্রকারের সম্ভাবনা মনে এল না।

ক্যাম্পে ফিরে দেখি আর্দ্ধালী পরম মনোযোগ সহকারে আসবাব-পত্র ঝাড়-পোঁছ করছে। কোন প্রশ্ন করবার আগেই সে বলে বসল, বালির মধ্যে কোথাও চিল পাওয়া গেল না। খুঁজতে খুঁজতে এদিকে এসে পড়েছিলাম, কাজগুলো পড়েছিল সেরে ফেলেছি। প্রভুভক্তির অপূর্ব্ব নিদর্শন দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কি আশ্চর্য্য, এই লোকটার উপর বিশ্বাস করেই নয়াদেহক বার মারতে গিয়েছিলাম। প্রাণ গলান ব্যবহারে যে সব ইচ্ছা ভিতরে কড়া হয়ে উঠেছিল তা জাঙ্গলের মূলসূত্রের (Fundamental rules) গুঁতোয় চাপা তো দিলামই, অধিকন্তু মনকে বোঝালেম করে জানাতে হল—যা করেছ খুবই ভাল কাজ, এখন কতকগুলি লোক মড়া আগলাবার জন্য পাঠিয়ে দাও—প্রাণের মানুষগুলি রেহাই পাক।

উত্তেজনার সংঘর্ষণে নিদ্রানিদ্রা কাছে এল না। সময়ের আগেই ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এলাম। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

(ঘটনাটি বন্ধুবর ম্যাক. বি. সি. চ্যাম্পোর (আই, সি, এস,) কাছে শোনা)

পরিচয়

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ চন্দ্র এম-এ, বি-এল্

শুধাবোনা তব পরিচয়।
মাটীর ধরণী 'পরে মানুষের ধরণী পায় ভয়—
ঠেলে আসে তাই কুণ্ঠা ও বিধা,
খান্ খান্ করে ভেঙ্গে পড়ে বালির বসুধা!
হেথা প্রেম কোথা?
কোথা অগ্নি-রেখা: কোথা ব্যাকুলতা?

কোথা অশ্রু লোনা:
কোথা পাখীর পালকে শবরীর সোনা।
যারা আসে চারিপাশে
সরম জড়িত চঞ্চল-চরণে, প্রথম প্রণয়-ত্রাসে—
হাতে লয়ে অভিসার-ফুল
তাদেরও নয়নে দেখি পঙ্কজের ভুল।
ঐ ধর আগেতে জাগে পদ্মার দুইকূল
মাঝে বহে খর-স্রোতা নাহি যার তুল!
তারপর সুপ্ত রহে শুধু বালুচর
অঞ্চলে জড়ায়ে সোনা
প্রেম-হীন: ধূসর-ধূসর—
মনের গহনে প্রেমিকারা তবু করে আনাগোনা!
তাই বলি
কারা করে কানাকানি—কারা যায় পথ চলি:
আপন গরবে গরবিণী—
বাজাইয়া কঙ্কণ-কিঙ্কিণী
চৈত্র-রাত্রির বিষণ্ণ রাগিনী।
আকাশের অন্তরীন তারালোক বেয়ে
তুমি যবে নেবে মোরে চেয়ে
সেই দিন শুধাইব পরিচয়—
চোখে চোখে, মুখে শুধু নয়!

কংগ্রেসের পূর্বের রাজনৈতিক আন্দোলন

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

পলাশীর যুদ্ধ জয়লাভ ক'রে ব্রিটিশ ভারতে ইংরাজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করলেও, প্রকৃতপক্ষে এদেশে ইংরাজের শাসন প্রবর্তন করেন, ওয়ারেন হেষ্টিংস। পলাশীর যুদ্ধের ১৫ বছর পরে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে হেষ্টিংস এদেশের সর্বপ্রথম গবর্ণর হয়ে আসেন। হেষ্টিংস ভারতে ইংরাজের শাসন ব্যবস্থা চালু করতে গিয়ে অনুভব করেন যে, ভারতীয়দের ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারলে শাসন কার্য পরিচালনা সহজতর হবে। তাই তিনি এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রসারে মন দিয়েছিলেন। তাছাড়া সেই সময় এদেশের যেকেও ইংরাজী শিখতে পারলে রাজপুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা করা যাবে এবং সরকারী চাকরী মিলবে এই ভেবেও ইংরাজী শিখতে আগ্রহ করেছিলেন।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে পর্যন্ত কলকাতা ছিল ভারতে ইংরাজ অধিকৃত সমস্ত অঞ্চলেরই রাজধানী। এই রাজধানীতেই সর্বপ্রথম ইংরাজী শিক্ষার প্রসার হওয়ায় বাঙালীরাই সবার আগে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হবার সুযোগ পেয়েছিল। এই সব ইংরাজীশিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যেই প্রথম দেশের ঐতিহ্যমূলক চিন্তাধারা এবং বিশেষ ভাবে রাজনীতিক বোধ জাগ্রত হয়েছিল এবং দিনে দিনে সেসব পুষ্টিলাভ করেছিল। এঁরা একত্র মিলিত হয়ে নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য সভা-সমিতি ও সংঘের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সেখানে দেশের উন্নতি সম্বন্ধে নানা বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিরও আলোচনা করতেন। এই-ভাবে ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙালীরাই শুধু বহুদিন পর্যন্ত অবিসংবাদিতভাবে ব্রিটিশ-অধিকারভুক্ত ভারতের নেতৃত্ব করেছিলেন।

দেশের সার্বজনীন প্রগতিমূলক ভাবধারায় বাঙালীর এই যে নেতৃত্ব, এর অধিকাংশ কৃতিত্বের—রাজা রামমোহন রায়। রাজা নিজে ইংরাজী শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রসারে একজন প্রধান অগ্রণী ছিলেন। তিনি শুধু হিন্দুর তৎকালপ্রচলিত ধর্মেরই সংস্কার করেন নি, অধিকন্তু হিন্দুর সমাজ-ব্যবস্থারও বহু সংস্কার করেছিলেন এবং দেশের রাজনীতিতেও অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট সংবাদপত্র দমনের জন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংকোচক এক আইন করতে কৃতসংকল্প হন। এজন্য গবর্ণমেণ্ট সেই সময়কার বিধান অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টে আইনের খসড়া পেশ করেন। গবর্ণমেণ্টের এই খসড়া পেশের ছদিন পরেই ১৭ই মার্চ তারিখে এর প্রতিবাদে রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ অনেকজনের সহিতই আদালতে এক দরখাস্ত করেছিলেন এবং বিলাতে সপরিষদ রাজার নিকটেও এক স্মারকলিপি প্রেরণ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সংবাদপত্রের এই স্বাধীনতা সংকোচক ব্যবস্থা বাতিল করবার চেষ্টা ব্যর্থ হলে, এর প্রতিবাদে রাজা রামমোহন রায় তাঁর "মীরাৎ-উল-আকবর" নামক ফারসী পত্রিকায় প্রকাশ বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড চার্লস মেটকাফ বড়লাট হয়ে পুনরায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ফিরিয়েছিলেন।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংকোচক আইনের পূর্বে সভা-সমিতি সম্বন্ধেও একবার সরকারী নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হয়েছিল। সেটা ছিল ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা। তখন রাজা রামমোহন রায় তাঁর বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং দ্বারকানাথের দুইজন আত্মীয়ের বাড়ীসহ এই সরকারী নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদেও সুপ্রিম কোর্টে দরখাস্ত করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের স্বাধীনতাপ্রীতির এত প্রমাণ ছিল যে, পৃথিবীর কোনও রাজ্য তার স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে, এই সংবাদ শুনলেই তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হতেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আমেরিকার ল্যাটিন রাজ্য-গুলো স্পেনের অধীনতা থেকে মুক্তিলাভ করেছে, এই সংবাদ শুনেই তিনি একটা বৃহৎ ভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন। বিলাত গমনকালে রাজা রামমোহন রায় এক ফরাসী জাহাজের মাস্তুলশীর্ষে অবস্থিত ফরাসী গণতন্ত্রের পতাকা অভিবাদন করতে গিয়ে, জাহাজের অবস্থানজনিত: প'ড়ে গিয়েছিলেন, ফলে তাঁর পায়ের গ্রন্থি ভেঙ্গে গিয়েছিল। এই ঘটনাটী থেকেই অতি সহজেই বুঝা যায় যে, রাজা রামমোহন রায়ের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কিরূপ তীব্র ছিল।

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই নবেম্বর তারিখে দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি কয়েকজনে মিলে "ভূম্যধিকারী সভা" নামে এক সভার প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভার সদস্যপদের যোগ্যতা সম্বন্ধে সভার অনুষ্ঠানপত্রে বলা হয়েছিল যে, দেশের ভূমিতে স্বার্থ থাকাই এই সভার সদস্য হওয়ার একমাত্র যোগ্যতা।

এই "ভূম্যধিকারী সভা" যদিও পুরাপুরিভাবে রাষ্ট্রিক সভা ছিল না। তাহলেও সঙ্কীর্ণ অর্থে ধরতে গেলে এই ভূম্যধিকারী সভাকেই প্রথম রাষ্ট্রিক সভা বলা যেতে পারে।

দেশে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে দেশাত্মবোধও জাগ্রত হতে থাকে। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে রামতনু লাহিড়ী, রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রাজকৃষ্ণ দে প্রভৃতি মিলিত হয়ে "জ্ঞানার্জন সভা" (Society for the Acquisition of General Knowledge) নামে এক সভার প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল, সকল প্রকার জ্ঞান অর্জনে পরস্পরের সহায়তা এবং পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন। এই সভায় রাজনীতিরও চর্চা হ'ত। এই সভায় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি যোগ দিতেন।

এইভাবে বাঙলার ইংরাজীশিক্ষিত যুবকরা [illegible]

রাজনীতি চর্চা করছিলেন, ঠিক সেই সময় জর্জ টমসন্ নামে একজন ইংরাজ বিলাতেও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। তিনি ভারতবাসীদের অভাব-অভিযোগ ও দুঃখ-দারিদ্র্যের প্রতি বিলাতের দৃষ্টি আকৃষ্ট করবার জন্যই এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এজন্য টমসন্ ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি" নামে এক সমিতিও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। টমসন ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন ব্যবস্থার সমালোচনা করতে আরম্ভ করলে, বিলাতের কোন কোন সংবাদপত্র তাঁর কথার প্রতিবাদ করতে থাকে। তখন তিনি নিজ মত প্রচারের জন্য "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এ্যাডভোকেট" নামে একখানা মাসিক পত্রিকা বা'র করেন।

টমসন্ যখন এইভাবে তাঁর স্বদেশবাসীদের ভারতের প্রতি তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করছিলেন, ঠিক সেই সময়ে দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাতে যান। দ্বারকানাথ টমসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে, তাঁকে ভারতে এসে স্বচক্ষে ভারতের অবস্থা দেখে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানান। দ্বারকানাথের এই আহ্বানে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে টমসন্ দ্বারকানাথের সঙ্গে ভারতে আসেন।

টমসন্ সাহেব ভারতে এলে, তাঁর আসার আগেই যে সব ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি বাঙ্গলায় রাজনীতির চর্চা করছিলেন, তাঁরা সকলেই এসে টমসনের সঙ্গে মিলিত হলেন। এই সব দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে টমসন্ "বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি"র প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছিল যে, এই সমিতির উদ্দেশ্য হবে সকল শ্রেণীর ভারতীয়ের কল্যাণ সাধন করা এবং তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার সম্প্রসারণের জন্য শান্তিপূর্ণ ও আইন-সঙ্গত ভাবে চেষ্টা করা। এই কারণেই টমসনের এই "বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি"কেই প্রকৃত পক্ষে প্রথম রাষ্ট্রিক সভা বলা যেতে পারে।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট কয়েকটী আইন করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। এর মধ্যে একটা আইনে ছিল—কোন ইংরাজ মফঃস্বলে অপরাধ করলেও তাঁর বিচার হবে কলকাতার সুপ্রীম কোর্টে। এদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা এতে প্রতিবাদ জানান এবং বলেন যে, যে অঞ্চলে অপরাধ করবে, সেই এলাকাতেই ইংরাজ আসামীরও বিচার হবে। রামগোপাল ঘোষ এই আইনের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখিয়ে একটা পুস্তিকাও লিখেছিলেন। ইংরাজরা রামগোপালকে এই আন্দোলনের নেতা ভেবে তাঁকে "এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি"র সহকারী-সভাপতির পদ থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। এদেশের ইংরাজরাও তাঁদের সমর্থনে বেশ আন্দোলন চালিয়েছিলেন। ইংরাজদের এই অপচেষ্টাকে সংঘবদ্ধভাবে বাধা দেবার জন্যই ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে "বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি" ও "ভূম্যধিকারী সংঘ" একত্র মিলিত হয় এবং এর নাম হয়—ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন। এই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনই সেই সময়ে এদেশের প্রধান রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান ছিল এবং এর মারফৎই রাজনীতিক মতবাদ ব্যক্ত হ'ত।

এরপরে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের বৃহত্তর রাষ্ট্রিক অভ্যুত্থান হয় সিপাহী বিদ্রোহে। ইংরাজের অধীনতা থেকে মুক্ত হবার জন্য এবং ইংরাজকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করবার জন্য এই বিদ্রোহ হয়েছিল। এই সিপাহী বিদ্রোহই হ'ল ইংরাজ শাসন আমলে এদেশে সর্বপ্রথম ব্যাপক আন্দোলন এবং প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। এই সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, হিন্দু ও মুসলমান একত্র মিলিত হয়ে এই প্রথম ইংরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই দিল্লীর শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহকে সম্রাট ব'লে ঘোষণা ক'রে সংগ্রাম সুরু করেছিল। পলাশীর যুদ্ধের শতবার্ষিকী উদযাপনকে উপলক্ষ্য ক'রে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন সিপাহীরা ভারতের সর্বত্রই একই দিনে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে, এই স্থির করে ছিল। কিন্তু মার্চ মাসেই একদিন মঙ্গলপাণ্ডে ব্যারাকপুরে এই বিদ্রোহের সূচনা হয়। এর পরই এই বিদ্রোহ দাবানলের ন্যায় সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এই সংগ্রামের প্রধান নায়ক ছিলেন—নানাসাহেব। কানপুরের তাঁতিয়াটোপী, ঝান্সির রাণী লক্ষ্মীবাঈ, বিহারের রাজা কুমার সিং প্রভৃতিও এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন। শেষ পর্যন্ত সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। সিপাহীদের পরাজয়ের ফলে তাদের মুঘল অধিনায়ক বাহাদুর শাহকে বিলম্বে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট নির্বাসিত করল এবং তাঁতিয়াটোপীর ফাঁসি দিল। নানাসাহেব নিখোঁজ হয়েছিলেন এবং রাণী লক্ষ্মীবাঈ যুদ্ধক্ষেত্রেই যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিয়েছিলেন।

সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে যাবার পর বিলাতের ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট স্থির করে যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে এতবড় ভারত সাম্রাজ্য শাসনের ভার আর রাখা উচিত নয়। তাই এবার ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন শেষ ক'রে, ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে ভারত শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি শাসন ভার গ্রহণ করে এক ঘোষণায় বলেছিলেন যে—প্রজার ধর্মমতে হস্তক্ষেপ করা হবে না। প্রজার উন্নতি ও সন্তোষই আমাদের শাসনের সুব্যবস্থার ব'লে বিবেচিত হবে।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এই ঘোষণায় ভারতের জনসাধারণ অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছিল।

সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য আন্দোলন হচ্ছে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের নীল-আন্দোলন। নীলকর ইংরাজরা বাঙ্গলার চাষীদের দিয়ে নীল উৎপাদন করাত। নীলকর সাহেবরা "রাজার জাত" বলে তারা প্রজাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর ক'রে নীল চাষ করাত এবং অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে চাষীদের কাছ থেকে নীল কিনত। যে সব চাষী ধান দিয়ে নীলের চাষ না করত নীলকর সাহেবদের নিজেদের যে বিচারালয় ছিল, তারা নিজেরাই তাতে চাষীদের বিচার ক'রে শাস্তি দিত। এই সব নীলকর সাহেবদের অত্যাচার চরমে উঠলে, এর প্রতিবাদে বাঙ্গলা দেশের জনসাধারণ এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করে। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রিকায় নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করতে

থাকেন। দীনবন্ধু মিত্র সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে "নীল-দর্পণ" নামে একখানা নাটক লেখেন। নদীয়া জেলার চৌগাছার বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস নামক দু' ভাইএ কৃষকদের একত্রিত ক'রে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলনে নীলচাষ বন্ধ হইয়াছে। এই নীল আন্দোলনকেই প্রকৃতপক্ষে এদেশের প্রথম গণ-আন্দোলন বলা যেতে পারে।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে মনীষী রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুরে "গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা" নামে এক সভা স্থাপন করেন। রাজনারায়ণবাবু ছিলেন মেদিনীপুর সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। শিক্ষিত বাঙ্গালীদের জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল রাজনারায়ণ বাবুর এই সভার উদ্দেশ্য।

শিক্ষিত বাঙ্গালীদের জাতীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ করার যে চেষ্টা রাজনারায়ণ-বাবু তাঁর গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার মারফৎ করতে চেষ্টা করেন, তা ব্যাপকতর রূপ নেয় "হিন্দু মেলা"র মধ্য দিয়ে। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই আগষ্ট তারিখে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর "বেঙ্গল চেম্বার" প্রতিষ্ঠা করেন। দেবেন্দ্রনাথ এই কাপর সম্পাদনার ভার দেন, নবগোপাল মিত্রের উপর। এই "বেঙ্গল চেম্বারে" রাজনারায়ণ বাবুর গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার অনুষ্ঠান পত্র প্রকাশিত হ'লে নবগোপাল মিত্র এই অনুষ্ঠানপত্র পড়ে একটা জাতীয় মেলা স্থাপন করার মনস্থ করেন। নবগোপাল মিত্রের এই কাজে প্রথম থেকেই তাঁর সহকারী হন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহর্ষির ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১২৭৩ বঙ্গাব্দের (১৮৬৭ খ্রীঃ) চৈত্র সংক্রান্তিতে এই জাতীয় মেলার প্রথম অধিবেশন হয়। প্রথম তিন বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ব'লে, এই মেলার নাম হয়েছিল "চৈত্র মেলা।" পরে এই মেলা "হিন্দু মেলা" নামেই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। আশুতোষ দেবের বেলগাছিয়ার বাগান বাড়ীতে হিন্দু মেলার প্রথম অধিবেশন হয়েছিল। প্রথম অধিবেশন অতি অল্প লোক নিয়ে এবং আড়ম্বরহীন ভাবেই সম্পন্ন হয়। দ্বিতীয় বর্ষ থেকেই প্রকৃতপক্ষে এই জাতীয় মেলার কাজ আরম্ভ হয়। প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে গাওয়া হবে ব'লে একটা জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। সে গানটা হ'ল—

মিলে সব ভারত সন্তান
একতান মনঃপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান। ইত্যাদি

এছাড়া মেলার এই অধিবেশনে সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "লজ্জায় ভারত যশ গাই কি করে" এই গানটিও গাওয়া হয়েছিল।

দ্বিতীয় অধিবেশনে সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর চৈত্র মেলার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছিলেন—আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্মকর্মের জন্য নয়, কোন বিষয় সুখের জন্যও নয় বা আমোদ প্রমোদের জন্যও নয়। এ মিলনের জন্য—এ ভারতভূমির জন্য, স্বদেশের হিতসাধনের জন্য। পরের সাহায্য না চেয়ে যাতে আমরা নিজেরাই তা সাধন করতে পারি, তাই হ'ল মেলার প্রধান উদ্দেশ্য।

এই জাতীয় মেলার ৪র্থ অধিবেশন থেকে চৈত্র-সংক্রান্তির পরিবর্তে মাঘ-সংক্রান্তি অথবা এর পরবর্তী দিনে মেলা হতে থাকে।

পরে দ্বাদশ অধিবেশন থেকে আবার মাঘ-সংক্রান্তির পরিবর্তে পরবর্তী শুক্লার সময় মেলা হ'ত। মেলাস্থান সোসাইটি বা "জাতীয় সভা" এই জাতীয় মেলার একটা অঙ্গ ছিল, মেলার অনুষ্ঠান হত বছরে একবার। মেলার আদর্শ সামনে রেখে সারা বছর ধ'রে যাতে স্বদেশের উন্নতি বিষয়ক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যায়, সেজন্য জাতীয় সভার সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ প্রতি মাসে এই সভার একটা ক'রে অধিবেশন হত। জাতীয় মেলার ৪র্থ অধিবেশনের পর থেকে এই জাতীয় সভার সৃষ্টি হয়।

দেশে জাতীয় ভাব প্রচারের কাজে হিন্দু মেলার দান অপরিসীম। এই মেলা তখন দেশে জাতীয় ভাবের যেন এক প্রবল বন্যা এনে দিয়েছিল। তার ফলেই "ইণ্ডিয়ান লীগ" ও "ভারত সভার" প্রতিষ্ঠা, রঙ্গমঞ্চে জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাটকাদির অভিনয়, জাতীয় ভাবোদ্দীপক সাহিত্য, জাতীয় সঙ্গীত রচনা প্রভৃতি সম্ভব হয়েছিল।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে শিশিরকুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ এবং "বেঙ্গল এণ্ড রায়ত" পত্রের সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মিলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে "ইণ্ডিয়ান লীগের" প্রতিষ্ঠা করেন। এই ইণ্ডিয়ান লীগের সম্পাদক ছিলেন শিশিরকুমার ঘোষ। শিশির-কুমারের পরিচালনায় ইণ্ডিয়ান লীগ রাজনীতিক কাজে অনেক সাহায্য করেছিল।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ-মোহন বসু ও মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা ভারত সভার প্রতিষ্ঠা করেন। এই ভারতসভা এত বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে তার ফলে ইণ্ডিয়ান লীগ উঠে গিয়েছিল। আনন্দমোহন বসু "ভারতসভা" স্থাপনের আগের বছর ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ষ্টুডেন্টস এসোসিয়েশন বা ছাত্রসভা নামে এক সভার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই ছাত্রসভাই হ'ল এদেশে জাতীয় আন্দোলনের প্রথম আরম্ভ।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী তারিখে বড়লাট লর্ড লিটনের চেষ্টায় দেশীয়দের জন্য ফৌজদারী আইনের সংশোধক "ইলবার্ট বিল" প্রকাশিত হয়। এই আইনে দেশীয় বিচারকগণ ইউরোপীয় আসামীদেরও বিচার করতে পারবে বলা হয়। এই বিল প্রকাশিত হ'লে ইংরাজরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং এর প্রতিবাদ করে। অপরদিকে ভারতীয়রাও এই বিলের সমর্থনে আন্দোলন চালায়। এই নিয়ে দেশে তখন এক প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল। এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন লালমোহন ঘোষ।

এই সময় দেশের নেতৃবৃন্দ বেশ বুঝতে পারেন যে, ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়তে হ'লে সর্বভারতীয় আন্দোলন আবশ্যক। তাই রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বছরই ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে, ২৯শে ও ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে কলকাতায় ন্যাশনাল কনফারেন্স নামে এক সর্বভারতীয় সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিবৃন্দকে আহ্বান করা হয়েছিল। এই সময় ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও কয়েকটি রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠেছিল। "ন্যাশনাল কনফারেন্সে" সেই সব প্রতিষ্ঠানেরও অনেকে যোগ দিয়েছিল। সুরেন্দ্র-নাথের এই ন্যাশনাল কনফারেন্সই সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় রাষ্ট্রীয় সম্মেলন।

পর বৎসর ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ রাজনীতিক কাজেই উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ ক'রে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালেন। এবছর আর ন্যাশনাল কনফারেন্স হ'ল না। পরের বছর ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে, ২৮শে ও ২৯শে ডিসেম্বর কলকাতায় ন্যাশনাল কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন হ'ল।

কলকাতায় যখন ন্যাশনাল কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন চলছিল ঠিক সেই সময় বোম্বাইএ কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয়।

এই কংগ্রেস সুদীর্ঘকাল ধরে দুঃখ ও তপস্যার মধ্য দিয়ে আজ ভারতের স্বাধীনতা আনতে সক্ষম হয়েছে। প্রাক্-কংগ্রেস যুগের এই সব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আন্দোলনের ফলেই সেদিন কংগ্রেসের জন্ম সম্ভব হয়েছিল। তাই কংগ্রেসের গৌরবময় স্বাধীনতা সংগ্রামের ন্যায় এই সব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের আন্দোলন কাহিনীও ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

দ্বারমণ্ডল

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(এক)

নিশীথ রাত্রি।

পল্লীগ্রামে বিংশশতাব্দীর চতুর্থদশকে ঘড়ি নাই এমন নয়; শিবকালীপুরের জগন ডাক্তারের একটা পকেট ঘড়ি আছে, হরেন ঘোষালের একটা রিষ্ট ওয়াচ আছে, বর্তমান পত্তনীদার শ্রীহরি ঘোষের বাড়ীতে ক্লক আছে, চেন-ঘড়িও আছে; কিন্তু তবুও সকলকে রাত্রি আন্দাজ করিয়া বাহির হইতে হইল। ডাক্তারের ঘড়িটা সময় ঠিক রাখে না, মধ্যে মধ্যে বন্ধ হইয়া যায়, ডাক্তার রেস্‌পিরেশন দেখিবার সময় যার দুই নাড়া দিয়া ঘড়িটাকে চালু করিয়া রোগীর বুকের উপর রাখিয়া দেয়—তাহাতেই কাজ চলিয়া যায়; আজ ডাক্তারের ঘড়িটা আটটা বাজিয়াই বন্ধ হইয়া আছে। ঘোষালের ঘড়িটা চলে না, চালাইলে এমনই চলে যে সন্ধ্যা ছয়টায় রাত্রি বারোটা বাজিয়া ছুটিয়া চলে। শ্রীহরি ঘোষের বাড়ীতে ঘড়ি দেখিতে কে যাইবে, বাড়ীর দরজায় আজকাল একজন হিন্দুস্থানী দ্বারোয়ান বন্দুক লইয়া পাহারা দেয়।

আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডলের বাঁকানো দাঁড়াটা ঠিক মধ্য আকাশের দিকে প্রসারিত। পূর্বদিগন্তে ময়ূরাক্ষীর বাঁধের জঙ্গলটার মাথায় আকাশ লালচে হইয়া উঠিয়াছে। নীচে দিগন্তে কৃষ্ণা একাদশীর চাঁদ উঠিতেছে। এপার দুইগুণে বাইশ দণ্ড রাত্রি পার হইতেছে, রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর পার হইয়া তৃতীয় প্রহরের দরজায় টোকা মারিতেছে। আকাশের দিকে তাকাইয়া নলিন বৈরাগী দেখিল—আকাশে নক্ষত্রের ক্ষেত্রে ছায়াপথে জ্যোৎস্নার আমেজ ধরিয়া চলিয়াছে ঠিক বন্যার জলের আগে আগে সঞ্চরমান মাটি-ভিজানো জলের রেশের মত। পূর্বদিকে তারাফুলের ক্ষেত জ্যোৎস্নার বন্যায় ডুবিয়া গিয়াছে—অল্প কতকগুলি তারা জাগিয়া আছে—বড় গাছের মাথায় ফুলের মত। নলিন ছবি আঁকে, পুতুল গড়ে, প্রতিমা তৈয়ারী করে। সে মুগ্ধ হইয়া আকাশে এই জ্যোৎস্না-সঞ্চারের খেলা দেখিতেছিল। জগন ডাক্তার তাহাকে ধমক দিয়া বলিল—হাঁ ক'রে আকাশপানে তাকিয়ে আছে দেখ। চল, আলো নে।

দশ বারো জন বাহির হইল। জগন ডাক্তার, হরেন ঘোষাল, রামনারাণ ঘোষ প্রভৃতি মাতব্বর জন আষ্টেক ও তাহাদের সঙ্গে নলিন এবং সতীশ বাউড়ীও চলিয়াছে—তাহাদের হাতে দুইটা হ্যারিকেন। হরেনের কাছে দুর্বল ব্যাটারীর একটা টর্চও আছে। গ্রামপ্রান্তে তাহারা মাঠে আসিয়া নামিল।

পঞ্চগ্রামের বিস্তীর্ণ মাঠ। পূর্বদিকে সেখুড়িয়া, তারপর মহাগ্রাম; মহাগ্রামের পর শিবকালীপুর। এদিকে ওই কুসুমপুর তার ওদিকে কঙ্কনা। সম্মুখে মাইলখানেক দূরে ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী বাঁধ। বাঁধের উপরে ঘন গাছের সারি, কালো উঁচু পাঁচীলের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পূর্বদিকে গাছগুলির মাথায় চাঁদের আলোর লালচে ছটা বাজিয়াছে। দক্ষিণ দিকে গাছগুলির মাথায় ঊর্ধ্বলোকে সাদা আলো ভাসিতেছে। জংসন ষ্টেশনের ইয়ার্ডে কেরোসিন গ্যাসের উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে। জংসন দ্বারমণ্ডল। লোকে সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়া বলিয়া থাকে—জংসন।

কার্তিক মাসের পাঁচ তারিখ। আজ কৃষ্ণপক্ষের একাদশী, আগামী অমাবস্যায় কালীপূজা। বাঁধের গাছের বেড়ের মাথা ছাড়াইয়া চাঁদ এখনও উপরে উঠে নাই। পঞ্চগ্রামের মাঠ এখনও অন্ধকার। মাঠে মাঠভরা ধান। আলো হাতে দলটি মাঠে নামিল, দুপাশের কোমর পর্যন্ত উঁচু ধানের মধ্যবর্তী আল-পথ—আলোর শিখা ধানের আড়ালে ঢাকা পড়িয়া গেল। ওদিকে মহাগ্রামের সামনেও মাঠের মধ্যে আলোর ছটা, সেখুড়িয়া হইতেও আলো বাহির হইয়া আসিল। ধানের আড়ালে শিখা-ঢাকা

লারিকেনের আলোর আভাস উপরে ভাসিয়া উঠিয়াছে। আলোর সঙ্গে চলন্ত মানুষগুলিকে ছায়ামূর্ত্তির মত মনে হইতেছে। গ্রামগুলি হইতে সারি সারি ছায়ামূর্ত্তি চলিয়াছে। সব চলিয়াছে একমুখে—ওই পাঁচ ভাইয়ের বাঁধ অর্থাৎ বন্যারোধী বাঁধের অভিমুখে।

বাঁধটার উপর তাল, শিমুল, শিশু, শিরীষ, অর্জ্জুন, জাম, বাবলা প্রভৃতি গাছের ঘন সন্নিবেশ; দুইপাশে বাঁধের কোলে কোলে ঘন শরজঙ্গল। শিমুল গাছটার মাথা সকল গাছকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে।

হরেন ঘোষাল চিরকালের চীৎকার-ঝঙ্কার-করা মানুষ। মাঠে পড়িয়াই সে ভূতপ্রেত স্তোত্র আরম্ভ করিল। এখানকার দেশপ্রচলিত ভূতপ্রেতের স্তোত্র; কবে কোন গ্রাম্য অর্দ্ধ-সংস্কৃত-জানা পণ্ডিত রচনা করিয়াছিল—কে জানে।

ব্রহ্মপ্রেত বিল্ববৃক্ষে শ্মশানে শ্মশানে প্রেতিনী
দৃশ্যন্তি শাল্মলীশীর্ষে শাঁকচুন্নী ভয়ঙ্করী
ক্ষুণ্ণমান শিংশপায়াং কণ্ঠে রজ্জু গলায় দড়ি,
তাকিন্তঃ ধাবন্তি মর্ত্তে—মুখে অগ্নি ধ্বকং ধ্বকং।
নমো অগ্রে ব্রহ্মপ্রেতঃ॥

জগন তাহাকে বাধা দিয়া বলিল—ঘোষাল, এত বয়স হল তবু ছেলেমানুষী গেল না তোমার? ছিঃ!

হরেন হাতের টর্চটা শিমুল গাছের মাথার দিকে ফেলিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বলিল—ছেলেমানুষী? ছেলেমানুষী হ'ল? ভূত নাই? বিশ্বাস কর না তুমি? রাত্রে একলা হাঁটতে পার ওই বাঁধের ওপর দিয়ে? বাঁধ তো বাঁধ, দুর্গা মরল বিষ খেয়ে—তারপর গাঁয়ের পথে কেঁদে বেড়াতে লাগল—তখন বাবা কে রাত্তায় একলা বেরিয়েছ, তুমি? দেবু পণ্ডিত শাক দিয়ে মাছ ঢাকা দিলে—বললে—দুর্গার পোষা বেড়ালটা কাঁদে; আমরাও বাবা মানুষ, চালের ভাত খাই—ধানের ভাত খাই না—

জগন বলিল—বাঃ গেল যাঃ। তাই বলছি নাকি আমি? ভূতের তর্ক আমি করি নাই, ভূতপ্রেত আমি মানি, হাজার বার মানি! দেবু মাষ্টারের মত প্রাইভেটে বি-এ পাসও করি নাই, এত বড় ইংরিজীনবীশ লায়েকও হই নাই। আমি বলছি সবেরই একটা সময় আছে। একটা বড় কাজে চলেছিস—একসঙ্গে দশ বারো জন রয়েছি—এখন আর ভূত ভূত কেন?

—বাস্ বাস্। ভূত মানো যখন বলছ—তখন আর ঝগড়া নাই, আমি চুপ করছি।

রামনারাণ বলিল—ভূত আছে বই কি, স্বর্গ আছে নরক আছে আর ভূত নাই? তাই হয় না কি? তবে 'পেত্যা' ভূত নয় আমি স্বচক্ষে দেখেছি। পেত্নীর মত একরকম জন্তু। বুয়েচ না—হাঁ করবে—আর আলো জ্বলে উঠবে মুখের ভেতর। আরেঃ বাপ রে—সে এক তাজ্জব ব্যাপার!

জগন ডাক্তার ভাবিতে-ভাবিতেই চলিয়াছিল। বড় কাজের ভাবনা।

সমস্ত অঞ্চলটা থম থম করিতেছে। সমস্ত নির্ভর করিতেছে একটি লোকের কথার উপর। মহাগ্রামের শিবশেখরেশ্বর ন্যায়রত্ন। দশ বৎসর পূর্ব্বে দেশত্যাগ করিয়া তিনি কাশী গিয়াছেন। বাড়ীঘর জমি সব ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এখানে তাঁহারই একজন ছাত্র ন্যায়রত্নের পিতৃপুরুষের টোলটি কোনমতে বজায় রাখিয়াছে, সেই এখানকার দেবকর্ম্ম চালায়। জমি জেরাতের উৎপন্ন হইতে এখানকার খরচপত্র চালাইয়া উদ্বৃত্ত যাহা থাকে পাঠাইয়া দেয়। তাও পাঠানো হয় ন্যায়রত্নের পৌত্রবধূর নামে। ন্যায়রত্ন নাকি কখনও স্পর্শ করেন না এ সব টাকাকড়ি; তিনি না কি কাশীর ঘাটে বসিয়া ভাগবত কথকতা করেন—সমাগত শ্রোতারা যাহা দিয়া যায় সেই অর্থ হইতেই তাঁহার চলে। সেই মানুষকে আজ বাধ্য হইয়া এ অঞ্চলের সকলের অনুরোধে, সরকারী অনুজ্ঞায় ফিরিয়া আসিতে হইতেছে।

আজই রাত্রি সাড়ে তিনটায় ডাউন বেনারস এক্সপ্রেসে জংসন ধারমণ্ডলে তিনি নামিবেন। সেই কারণেই তাহারা এই রাত্রে ধারমণ্ডল জংসনে চলিয়াছে।

শুধু তাহাই নয়। ওই মহাগ্রামের দল, ওই মেথুড়িয়ার দল সব এই জন্যই চলিয়াছে। শিবকালীপুরের শ্রীধরি ঘোষ সন্ধ্যাতেই গরুর গাড়ী ছুড়িয়া ধারমণ্ডল চলিয়া গিয়াছে, ডাকবাংলোয় আছে; কখনও বাবুদেরও কেহ একজন ওখানেই থাকিবে। এ ছাড়াও অর্থাৎ এই পঞ্চগ্রাম ছাড়াও এ অঞ্চলের আরও অনেক গ্রামের সম্ভ্রান্ত

ব্যক্তি আসিয়াছে। ঝারমণ্ডল জংসনের মাড়োয়ারী এবং অন্যান্য ব্যবসাদারেরা তো আছেই। দমর শহর হইতে হিন্দুমহাসভার লোক, কংগ্রেসের লোক এবং ব্যক্তিগত-ভাবে আরও বড় বড় উকীল জমিদার ব্যবসায়ীও আসিবার কথা। তাঁহারা হয়তো রাত্রে আসেন নাই কাল সকাল সাড়ে আটটার ট্রেণেই সকলে আসিয়া হাজির হইবেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিবেন—পুলিস সাহেব সম্ভবত ঝারমণ্ডল বাজারেই আছেন, এস-ডি-ও আসিবেন, সার্কল অফিসারের ঝারমণ্ডলেই আপিস। কলিকাতা হইতে হিন্দুমহাসভার কোন হোমরা-চোমরাকে আসিবার জন্য তার করা হইয়াছে, কেহ-না-কেহ নিশ্চয় আসিবেন বলিয়াই জগনের অনুমান।

• • •

সমস্ত অঞ্চলটা থম থম করিতেছে। ঝারমণ্ডল জংসনের চারিদিকে চারিটি পঞ্চগ্রাম অর্থাৎ বিশখানি গ্রামে বোধ হয় এক মুহূর্তে আগুন লাগিয়া যাইবে। রক্তবন্যা বহিবে।

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে প্রচণ্ড আক্রোশ ঘনাইয়া উঠিয়াছে।

ঝারমণ্ডল জংসন ষ্টেশন হইতে দুই তিন মাইল দক্ষিণে হাট ঝারমণ্ডল এ অঞ্চলের বহুপ্রাচীন বাজার। প্রাচীন কালে এখানে বহু-প্রসিদ্ধ হাট বসিত। হাট আজও আছে, কিন্তু হাটের সে প্রসিদ্ধি আর নাই। ঝারমণ্ডল বাজারের উত্তর প্রান্তে হিন্দুদের একটি প্রসিদ্ধ দেবীস্থান আছে। জয়তারা দেবীর আশ্রম লোকে বলে সিদ্ধপীঠ। জংগলে ঘেরা মনোরম স্থান; প্রাচীন কালের মন্দির, একটি দিঘী এবং আরও খানদুয়েক খড়ো ঘর ঘিরিয়া চারিপাশে বুনো শেত-কাঞ্চন, পলাশ, বেল এবং বনশিরীষের জংগল। তীর্থ-যাত্রীর সংখ্যা কম নয়। এই দেবী-স্থানের পশ্চিম দিকে উত্তর মুখে চলিয়া গিয়াছে ঝারমণ্ডল বাজার হইতে নদীর খেয়াঘাট পর্য্যন্ত প্রাচীন কালের সড়ক। ঝারমণ্ডল হাটের বুক চিরিয়া চলিয়া গিয়াছে যে বিখ্যাত বাদশাহী সড়ক—সেই সড়ক হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। রেললাইন পড়িবার আগে হাট ঝারমণ্ডলের উত্তর দিকটায় তিনমাইল ব্যাপী একটা পাথুরে প্রান্তর ধূ-ধূ করিত। শুধু বর্ষার সময় এই প্রান্তরটায় ওই খেয়া ঘাটের চারিপাশে খড়ের চালা তুলিয়া বাজার বসিত। নদীর ঘাটে গঙ্গা ও মনুষ্যাক্ষীর মোহনা হইয়া এখানে দেশ বিদেশের নৌকা আসিয়া কেনা-বেচা করিত। এই হেতু ওই খেয়াঘাটটার নামই ঝারমণ্ডল ঘাট বা ঘাট ঝারমণ্ডল। রেলষ্টেশন হওয়ায়—ঘাট এবং হাট ঝারমণ্ডল দুইই প্রায় বিলুপ্তির মুখে; লোকে বলে কানা পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু সে সব কথা থাক।

হাট ঝারমণ্ডলের উত্তর প্রান্তে এই জংগলে এক তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ সিদ্ধ হইয়াছিলেন। পীঠ হিসাবে আরও অনেক প্রাচীন, কিন্তু সে পীঠ-মাহাত্ম্য নাকি অজ্ঞাত ছিল, স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এই ব্রাহ্মণ এখানে আসিয়া সাধনা করিয়া নিজে সিদ্ধিলাভ করিয়া গুপ্ত পীঠকে প্রকাশ করেন এবং এখানকার মাহাত্ম্য প্রচার করেন। এখানে প্রবাদ—দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মানুষ আরোগ্যলাভ করে, মহাসঙ্কটে মানুষ পরিত্রাণ পায়, রাজরোষ প্রশমিত হয়, হৃত সম্পদ পুনরুদ্ধার হয়, ভিক্ষুক রাজ্য-পদ পায়, নিসন্তান সন্তান লাভ করে, অনাবৃষ্টিতে বর্ষণ হয়; দেবী প্রসন্না হইলে সবই হইতে পারে। মৃতদেহে জীবন-সঞ্চার হওয়ার কাহিনীও লোকে আজও বলিয়া থাকে। সেকালে ঘাটে যত নৌকা আসিত—হিন্দুর ছোক মুসলমানের ছোক কেরেস্তানের ছোক—প্রত্যেক নৌকা হইতে এখানে পূজা আসিত। আজকাল নৌকা আসে না কিন্তু মুসলমানেরা এখনও আসে; মানসিক মানিয়া যায়, মানস পূর্ণ হইলে পূজা দেয়; হিন্দুরা পাঁঠা বলি মানসিক করে, মুসলমানেরা মুর্গা মানসিক করে, জংগল-প্রান্তে মুর্গীটিকে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যায়। হিন্দুদের নিম্নস্তরের মধ্যে সেকালে শূকর খাওয়ার প্রচলন ছিল, সে প্রচলন ক্রমেই বিরল হইয়া আসিতেছে কিন্তু দুই বৎসর আগে পর্য্যন্ত দুর্গা পূজার সময় বিজয়া দশমীর ভোর বেলা—জংগলটির অগ্নিকোণের প্রান্তে তাহারা শূকর বলি দিয়াছে।

দেবী-স্থানের পশ্চিমদিকে উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ ঘাট ঝারমণ্ডল হইতে হাট ঝারমণ্ডলের পাকা সড়ক; সড়কের খানিকটা জংগলটার নৈঋর্ত কোনের ভিতর দিয়াই চলিয়া আসিয়াছে। এইখানে সড়কটার পশ্চিমদিকে একটা প্রাচীন নিমগাছের নিচে একটা উঁচু ঢিপি ছিল। ঢিপিটা মকদম শাহের ঢিপি বলিয়া পরিচিত। হিন্দুমুসলমান

যাহারা এখানে পূজা দিতে আসিত তাহারা ওই টিপিতেও একটি প্রদীপ অথবা বাতি জ্বালিয়া দিত। কালের সঙ্গে হিন্দুদের প্রদীপ দেওয়া কমিয়া আসিয়াছে, ওদিকে মুসলমানদেরও জয়তারার স্থানে আসা বিরল হইয়াছে।

বিরোধ বাধিয়াছে এইখানে।

গ্রামের ঘারমণ্ডলে তিরিশ বৎসর পূর্ব্বে এক দিল্লীওয়ালা দরিদ্র মুসলমান আসিয়া ছোট একটি মণিহারীর দোকান করিয়াছিল। সে এখন লক্ষপতি। গোটা জেলায় মণিহারি মাল সরবরাহের ব্যবসা তাহার একচেটিয়া হইয়া উঠিয়াছে। গ্রামের শহরে প্রকাণ্ড দোকান—পাঁচসাতখানা বাড়ী, আশপাশের গ্রামে প্রায় দুই তিনশো বিঘা ধান জমির মালিক সে। ফৈজুল আলি সাহেবের ছেলে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া বসিয়াছে। এই ফৈজুল সাহেব বৎসর কয়েক পূর্ব্বে মকদম শাহের টিপি ছোট একটি সমাধির আকারে বাঁধাইয়া দেয় এবং ইদ রমজানের সময় এখানে নামাজ পড়িয়া ও বেড়াভাসানের সময় আলোক দজ্জা করিয়া স্থানটির মর্য্যাদা বাড়াইয়া আসিতেছিলেন।

গতবৎসর বিজয়া দশমীর সময় দেবী-স্থানের অগ্নিকোণে শূকর বলিতে তাঁহার নেতৃত্বে মুসলমান সম্প্রদায় আপত্তি তুলিয়াছিল। আপত্তি সফলও হইয়াছে। শূকর বলি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা চলিতপ্রথা বলিয়া কোন আপত্তি না করিলেও শূকরবলি সমর্থন করে না। যাহারা বলি দিত—তাহারাও ইদানীং এ বিষয় বীতস্পৃহ হইয়া উঠিয়াছে।

এ বৎসর রমজানের নামাজের সময় স্থির হইয়াছে ওখানে একটি মসজিদ তৈয়ারী করিতে হইবে এবং দেবী-স্থানের বাজনাতেও আপত্তি তুলিয়াছে মুসলমান সম্প্রদায়। আবার কানা-ঘুষা শুনা যাইতেছে—এবার বকরীদের সময় ওখানে কোরবাণী করা হইবে।

কালবৈশাখীর টুকরাখানেক মেঘ যেন বজ্রপাত করিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল, ঘোষণা করিল, বিপর্য্যয় আসন্ন!

সমস্ত অঞ্চলটার মানুষ অকস্মাৎ চকিত পাখীর মত কলরব করিয়া উঠিল।

সোমনাথ আক্রমণের কাল হইতে হিন্দুমুসলমানের বিরোধ এইখানে বাসা গাড়িয়া আছে। এ অঞ্চল—এ অঞ্চল কেন সমগ্র রাঢ়ভূমিতে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাহারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমৃদ্ধিসম্পন্ন, দেশের ভূমির অধিকারীও তাহারাই। তাহারা চীৎকার করিয়া প্রতিবাদ করিয়া উঠিল।

ঘারমণ্ডলের জয়তারার স্থান এ জেলায় প্রসিদ্ধ তীর্থ-ক্ষেত্র। বর্ত্তমান কালে—পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত হিন্দুসম্প্রদায়ের ধর্ম্মে বিশ্বাস টলিয়াছে, তাহারা বিজ্ঞানে বিশ্বাস করিতে চেষ্টা করিতেছে, জয়তারার আশ্রমে তাহারা বড় আসে না, কিন্তু এ সংবাদে তাহারা বিচলিত হইয়া উঠিল। স্থানীয় ব্যবসাদার জমিদার গৃহস্থ হইতে জেলার উকীল-মোক্তার-ডাক্তার-মাষ্টার, সকলেই বাধা দিতে বদ্ধপরিকর হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট কমিশনার লাটসাহেবের কাছে দরখাস্ত পাঠাইল, খবরের কাগজে বড় বড় হরফে সংবাদ প্রকাশিত হইল; দেশের ঘরে ঘরে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল।

ওদিকে মুসলমান সম্প্রদায়ও আয়োজনের ত্রুটি রাখিল না।

বাংলা দেশে গত বৎসর হইতে মুসলীম লীগ দল মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করিয়া দেশ শাসনের অধিকার লাভ করিয়াছে। এক বৎসরের মধ্যে এখানকার মুসলমানদেরও চেহারা পাল্টাইয়া গিয়াছে। জেলার মুসলীম লীগ কিছুদিন আগে সদারোহ করিয়া কনফারেন্স করিয়া উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছে—এ জেলার দরিদ্র নির্য্যাতিত মুসলীম সম্প্রদায় অনেক সহ্য করিয়াছে, আর সহ্য করিবে না। সম্প্রতি—এই ঘটনার প্রথমেই একদিন জেলা মুসলীম লীগের সভাপতি ও সম্পাদক ঘারমণ্ডলে আসিয়া ফৈজুল আলি সাহেবের বাড়ীতে অতিথি হইয়া স্থানীয় মুসলমান মাতব্বরদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত করিলেন, মকদম শাহের দরগায় গিয়া সেখানে নামাজ পড়িলেন, সরজমিনে নিজেরা সমস্ত দেখিলেন। তার পর একদিনে প্রায় চার হাজার টাকা চাঁদা তুলিয়া—মসজিদ তৈয়ারীর ব্যবস্থা পাকা করিয়া ফেলিলেন। কলিকাতায় প্রাদেশিক লীগ আপিসে নকলার জন্য লেখা হইল, আরও লেখা হইল একজন মুসলীম নেতাকে পাঠাইবার জন্য—তিনি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করিবেন। ঘটনাটী জটিল হইয়া উঠিল। হিন্দুরা প্রতিবাদ করিল, দরখাস্ত পাঠাইল। তাহারাও দরখাস্ত

পাঠাইল। ম্যাজিষ্ট্রেট কমিশনার—লাটসাহেব—উপরন্তু মন্ত্রীদের কাছেও দরখাস্ত পাঠাইয়াছে।

হিন্দুরাও তিন চারটি মামলা দায়ের করিয়াছে। দেওয়ানী ফৌজদারী দুই রকমের মকদ্দমাই স্থাপন করিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব উভয়পক্ষের প্রধানদের লইয়া মিটমাটের চেষ্টা করিয়াছেন। হিন্দুরা বলিতেছে—ওই দরগা আসলে মুসলমানদের তীর্থস্থলই নয়। তাহারা বলে—মুসলমান ফকীরের সমাধিস্থল একথা সত্য; কিন্তু মকদম শাহ জন্মগত জাতিত্বে মুসলমান থাকিলেও আসলে ছিলেন হিন্দু সাধক;—হিন্দুমতে সাধনা করিবার জন্যই তিনি এই সিদ্ধপীঠের এক কোনে আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রমাণ স্বরূপ এখানকার প্রচলিত প্রবাদের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—মকদমশাহ আজমীড় শরিফে সাধনা করিতেন—সেখানকার খাদেমের তিনি প্রধান শিষ্য ছিলেন। সাধনায় প্রভূত শক্তির অধিকারী হইয়া তিনি বাঘের পিঠে সওয়ার হইয়া ভারতবর্ষ ভ্রমণে বাহির হন। এখানে আসিয়া দেবীস্থানের সিদ্ধপুরুষ সাধকের কথা শুনিয়া সাধকের কাছে লোক পাঠান—যে তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিবেন। তিনি যেন প্রস্তুত হইয়া থাকেন। পরের দিন ভোরবেলা দেবীর সেবক সিদ্ধ ব্রাহ্মণ মুখ ধুইবার জন্য একটি প্রাচীরে উঠিয়া নিমগাছের ডাল ভাঙিতেছেন—এমন সময় বাঘের গর্জ্জনে সমস্ত দেবীস্থান থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মকদমশাহের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—কোথায় রে তুই কাফের? শোন—আমার কথা তুই মন দিয়া শোন। তোর সাধনা যদি মিথ্যা হয়—ভণ্ডামী হয়—তবে আমার এই বাঘ এক লম্ফে তোর বুকের পাঁজরায় থাবা মারিয়া পাঁজরা চুর করিয়া তোর কলিজা বাহির করিয়া খাইয়া ফেলিবে। একমাত্র তুই যদি তোর ভণ্ডামি ছাড়িয়া আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিস—তবে আমি তোকে রক্ষা করিব। কই, কোথায় তুই? মনেও ভাবিস না যে লুকাইয়া তুই পরিত্রাণ পাইবি।

ব্রাহ্মণ বলিলেন—অপেক্ষা কর। আমি যাইতেছি। বলিতে বলিতেই তিনি যে পাচীলের উপর দাঁড়াইয়া নিমের ডাল ভাঙিতেছিলেন—সেই পাচীল তাঁহার বাহন বা রথ স্বরূপে চলিতে আরম্ভ করিল। বড় বড় গাছ পাশে কাত হইয়া পড়িয়া আত্মরক্ষা করিল—তাঁহার পাচীল আসিয়া মকদমশাহের সম্মুখে থামিল। তিনি বলিলেন—আমার আজ মহাভাগ্য—আজ প্রভাতেই আমি আপনার মত মহাপুরুষকে অতিথি স্বরূপে পাইয়াছি।

ফকির মকদমশাহ অবাক হইয়া গিয়াছিলেন—একটা মাটির পাচীল এমনভাবে চলিয়া আসিতে পারে—এ তাঁহার কল্পনাতীত বলিয়া মনে হইল। তাঁহার বাহন বাঘটার গর্জ্জন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। সেটা যেন কেমন হইয়া গিয়াছে। বিচিত্র দৃষ্টিতে সে স্থানটার চারিদিক দেখিতেছিল। ব্রাহ্মণ হাসিয়া ফকীরকে বলিলেন—ওটা গত জন্মে এখানে কুকুর ছিল। সমস্ত জীবন এই আশ্রমে কাটাইয়াছিল—সেই পুণ্যে এ জন্মে বাঘ হইয়াছে।

বলিয়া পাচীল হইতে নামিয়া তিনি বাঘটার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া দিলেন—বাঘটাও সানুরাগে ব্রাহ্মণের হাত চাটিতে সুরু করিল।

ফকীর মকদমশাহ সবিস্ময়ে ব্রাহ্মণকে বলিলেন—তুমি কে?

—আমি সামান্য একজন মানুষ।

—তুমি সামান্য নও, অসামান্য।

বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণের হাত চাপিয়া ধরিলেন। ব্রাহ্মণও তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে প্রীতি বিনিময় করিলেন। তারপর হইল কত বিচিত্র কথা। সাধনার গূঢ়তত্ত্ব লইয়া আলোচনা হইল। অবশেষে দিনান্তে মকদমশাহ বলিলেন—এইবার আমাকে আতিথ্য গ্রহণের দক্ষিণা দাও।

ব্রাহ্মণ হাসিয়া বলিলেন—বল কি দক্ষিণা চাও।

—তোমার সাধনতত্ত্বে আমাকে দীক্ষা দাও।

—তথাস্তু।

দীক্ষান্তে মকদমশাহ প্রশ্ন করিলেন—আর একটা প্রশ্ন।

মকদমশাহ প্রশ্ন করিলেন—কতদিনে তাঁহার সিদ্ধিলাভ হইবে? ব্রাহ্মণ যে নিমের ডালটী হাতে লইয়া আসিয়াছিলেন—সেই ডালটির প্রান্ত হইতে একটি নিম ফল লইয়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন—এইটাকে এইখানে পোত। এটিতে জল দিয়ো। এই বীজ হইতে অঙ্কুর হইবে—অঙ্কুর বৃক্ষ হইবে, বৃক্ষে ফুল ধরিবে—তাহার পর ধরিবে ফল—সেই ফল পাকিয়া মাটিতে খসিয়া পড়িবে। যেদিন প্রথম ফলটি মাটিতে খসিয়া পড়িবে—সেইদিন তোমার সিদ্ধিলাভ

হইবে। হইয়াছিলও তাই। এই নিম গাছটি সেই নিম গাছ। বর্তমানে হিন্দু জনসাধারণের অজ্ঞাতসারে যাহাদের দরগার নিচের তিনটি সেই ফকীরের যোগের আসন। ওইখানেই তাঁহাকে সমাধি দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং মকদমশাহ জন্মগত জাতিত্বে মুসলমান থাকিলেও আসলে তিনি ছিলেন হিন্দু যোগী। এ স্থানের সঙ্গে মুসলমানদের কোন সংস্রব থাকিতে পারে না।

মুসলমানরাও ইহার জবাব দিয়াছে।

তাহারা বলিয়াছে—ইহা একটি আষাঢ়ে গল্প। পৌত্তলিক হিন্দুর অলৌকিক কাহিনী ও প্রবাদ রচনার শক্তির একটি প্রথম শ্রেণীর নিদর্শন। সামান্য সত্যকে কেন্দ্র করিয়া রাশি রাশি মিথ্যার খড় মাটি ও রঙ সমন্বয়ে তাহাদের পুতুলী নির্মাণের মতই একটি পুত্তলিকা মাত্র।

এখানে আসল সত্য হইতেছে এই যে, মকদমশাহ আজমীর শরিফের একজন সাধক ছিলেন। এখানকার একজন বৃদ্ধপ্রাণ মুসলমান তীর্থ ভ্রমণে আজমীর শরিফ গিয়া মকদমশাহের নিকট এখানকার মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থার কথা বর্ণনা করেন। বলেন—সেখানে এমন কেহ মোল্লা নাই—এমন কোন ফকীর হজরত নাই—যিনি হিন্দু প্রধান অঞ্চলের পৌত্তলিকতার অন্ধকার হইতে মুসলমানদের আত্মাকে আলোর সন্ধান দিতে পারেন। হজরত মকদমশাহ বাধিত হইয়া আজমীর শরীফ হইতে এখানে মুসলমানদের হিন্দু তান্ত্রিকতার ব্ল্যাক ম্যাজিকের প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার জন্য আসেন। শড়কের পশ্চিমদিকে ওই নিমগাছ এবং তাহার চারিদিকের জঙ্গলটুকু হিন্দুদের দেবীস্থান হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন এবং স্বতন্ত্র স্থান। ইংরাজ রাজত্বের প্রথম দিকে—সুদীর্ঘকাল মুসলমান জাতির ছুরোরাণী নামে ইংরাজের অপ্রিয়ভাজন এবং সন্দেহভাজন হইয়া থাকার কথা ঐতিহাসিক সত্য। হিন্দুরা ইংরাজের সুনজরে থাকিবার সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়াছে। তাহার উপর এ অঞ্চলে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তাহারাই অর্থসম্পদ ও জমিদারীর অধিকারী হইয়া বসিয়া আছে। তাহারই ফলে মকদমশাহের দরগাকে তাহাদের দেবীস্থানের সামিল বলিয়া জবরদস্তি অধিকার করিয়া আসিতেছে। কিন্তু চিরকাল একটা মহান ঐতিহ্যশালী জাতি ঘুমাইয়া থাকে না। ভারতবর্ষে মহান ইসলামের পুনরভ্যুদয় ঘটিতেছে। মুসলমানেরা জাগিয়াছে। আমাদের অধিকার আমরা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া ফিরিয়া পাইতে চাই। হজরত মকদমশাহের কালে এই স্থানে মুসলমানেরা মুক্তির সন্ধান পাইয়াছিল। তখন এই স্থানে হাজার মুসলীম নামাজ পড়িয়াছে, হাজার বাতিতে রৌশন জ্বালিয়াছে, মহান আল্লাহতয়লার নামে কত কোরবাণী হইয়াছে। সে সবের প্রমাণ আজ বিলুপ্ত। কিন্তু যেখানে মুসলমান আছে সেখানেই ইসলাম আছে, তাহার ইতিহাস আছে, তাহার সকল প্রথা-পদ্ধতি অবশ্যই আছে। সুতরাং মকদমশাহের দরগার উপর আজ মুসলমানদের নবজাগরণের দিনে—মসজিদ নির্মাণ করিবার অধিকার এবং ইসলামের নির্দেশ মত সকল আচরণ পালন করিবার অধিকার অবশ্যই তাহাদের আছে। এই অধিকার একবিন্দু ক্ষুণ্ণ করিয়া কোন আপোষ করিতে তাহারা নারাজ। পূর্ণ অধিকার তাহারা যে কোন মূল্যে অর্জন করিতে বদ্ধপরিকর।

অবশেষে ধারমণ্ডল আসনে গভর্ণমেণ্ট এক সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন। সম্মেলন ঠিক নয়; আসলে সরকারীভাবে ব্যাপারটার তদন্ত হইবে। এ অঞ্চলের প্রাচীন ব্যক্তিদের আহ্বান করা হইয়াছে। তাঁহারা সাক্ষী দিবেন। এই হিসাবে সর্বাগ্রে নাম উঠিয়াছে—মহামহোপাধ্যায় শিবশেখরেশ্বর ভায়রত্নের। বয়স তাঁহার আশী পার হইয়াছে এবং তিনি তাঁহার বাল্যকালে তাঁহার প্রপিতামহকে দেখিয়াছেন এ অঞ্চলের অন্তত আড়াইশত বৎসরের ইতিহাস তিনি জানেন। এ ছাড়া এই মানুষটি সম্পর্কে এখানকার প্রত্যেকেরই একটি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমপূর্ণ ধারণা আছে; ভায়রত্ন মিথ্যা বলিবেন—এমন অপবাদ মুসলমানেরাও মুখ ফুটিয়া প্রচার করিতে পারে নাই। কুসুমপুরের দৌলত হাজির বয়সও অনেক, সোত্তর-বাহাত্তর-হইবে; এ অঞ্চলে স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে ধনিষ্ঠ এবং বিষয়ী লোক;—আপন সম্প্রদায়ের লোকেরাও তাহাকে কুচক্রী বলিয়া অপবাদ দেয়;—কটূভাষী বলিয়াও তাহার অখ্যাতি আছে—সেই দৌলত শেখ হাজিও তাঁহার নাম শুনিয়া বলিয়াছে—হাঁ—তা—ভায়রত্ন ঠাকুরের বাত মানতে হয়। মানুষের মত মানুষ লোকটা। তা—সে আসুক—বিবেচনা করে বলুক না কেন ঠাকুর—হিঁদুরা যদি

তাদের মতে পূজা করতে পায়—তবে মুসলমানেরা পাবে না কেন? তাদের কসুরটা কি? হিন্দুদের আস্তান—আগের বটে, সে বাত তো—কেউ না করছে না। তামাম হিন্দোস্তানে হিঁদুরা এসেছে আগে—তা বাদে এসেছি আমরা। সেই বিবেচনা ক'রে সে কি বলে বলুক।

মোট কথা হাজিও ন্যায়রত্নের কথা তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দিবার সংকল্প ঘোষণা করিতে কুণ্ঠাবোধ করে; এমনি একটা শ্রদ্ধান্বিত সম্ভ্রমের আসনে তিনি প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন। এখানকার লোক বলে তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলেন নাই।

শুধু সর্বসাধারণই নয়—সরকারী মহলেও তাঁহার এ খ্যাতি খাতায় কলমে লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। তাঁহার পৌত্র বিশ্বনাথ ছিল বিপ্লবী দলের কর্মী। সেই সম্পর্কে একবার পুলিশসাহেব তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি একমাত্র পৌত্রের শুভাশুভ বিবেচনা করেন নাই, বলিয়াছিলেন—কথাটা যখন জেনেছি তখন জানি না বলব কি ক'রে। আর যা সত্য, তাই বা অস্বীকার করব কি করে? হ্যাঁ, বিশ্বনাথ বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছে। সে কথা সে আমার কাছে স্বীকার করেছে। তবে এর অধিক কিছু আমাকে সে বলতে চায় নি; আমিও আর প্রশ্ন করি নি।

পুলিশ সাহেব বাঙালী হিন্দু—তিনি বলিয়াছিলেন—ন্যায়রত্ন মশায়, আপনাদের বংশের সন্তান আপনার একমাত্র পৌত্র, তাকে আপনি—এই ভাবে—আক্ষেপপূর্ণ অনুযোগ তিনি শেষ করিতে কুণ্ঠাবোধ করিয়াছিলেন, তাই ওইখানেই চুপ করিয়া গিয়াছিলেন।

ন্যায়রত্ন উত্তর দিয়াছিলেন—বংশধারা গঙ্গার প্রবাহের মত, সে প্রবাহ থেকে যে স্রোতটা পাশের চালু জমির আকর্ষণে কেটে বেরিয়ে যায়—তাকে কি টেনে ফেরানো যায়? সে চলে আপন বেগে, আর জমির ঢালের সুবিধায়। সেই তার পথ, সেই তার কর্মফলের গতি। ওতে আক্ষেপ করবার কিছু নাই।

একটু হাসিয়াছিলেন—এইখানে। তারপর আবার বলিয়াছিলেন—দেখুন গঙ্গা থেকে পদ্মাস্রোত এমনিভাবে বেরিয়ে মহিমাহীন বলে অখ্যাতি অর্জন করেছিল কিন্তু আজ ভাগীরথী নদে এসেছে। গোমুখী থেকে যত জল যায় সাগর সঙ্গমে, তাকে ওই পদ্মার খাত ধরেই যেতে হয়। আজ আর তাকে মহিমাহীনা বলে অপবাদ দিলে—নিন্দুক-স্বভাবের পরিচয় দেওয়া ছাড়া আর কিছু হবে না। অন্ততঃ সত্য বলা হবে না। তাহ'লে পদ্মার সঙ্গে গোমুখীর মহিমাও অস্বীকার করতে হবে। আমাদের খাত নদে এসেছে।

এই সব কারণে সরকার দপ্তর হইতেও তাঁহাকে সম্ভ্রমপূর্ণ আহ্বান পত্র পাঠানো হইয়াছে। দেশের সম্ভ্রান্ত লোকেরা প্রায় প্রত্যেকেই অনুরোধ পত্র পাঠাইয়াছেন।

দেবু ঘোষ নিজে গিয়াছে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসিবার জন্য। দেবু ঘোষের সঙ্গে সমর শহরের হিন্দুমহাসভার একজন তরুণ সভ্যও গিয়াছে।

ন্যায়রত্ন বৃদ্ধ হইয়াছেন। এ ছাড়াও তাঁহাকে এ যাত্রায় নিরাপদে লইয়া আসার দায়িত্ব আছে। অন্ততঃ এখানকার লোকেরা তাই মনে করে। আরও একটা কথা আছে। দেবু ঘোষ আর সে কালের দেবু ঘোষ নয়। এ দেবু ঘোষ এই কয়েক বৎসরের মধ্যে নূতন মানুষে পরিণত হইয়াছে। প্রাইভেটে সে বি-এ পাশ করিয়াছে। তিনকড়ি মণ্ডলের বিধবা মেয়ে স্বর্ণকে বিবাহ করিয়াছে। এখন সে জংশন শহরের বাসিন্দা। এখানকার কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী। জগন জানে কংগ্রেসের মধ্যে অনেক ছোট ছোট দল আছে। দক্ষিণপন্থী-বামপন্থী; তার মধ্যে আবার নানান দল। এমনি একটি বামপন্থী দলের সভ্য দেবু ঘোষ। অনেক বিচিত্র নূতন কথা বলে সে। তাহার মধ্যে ধর্ম এবং সমাজ লইয়া এমন কতকগুলা কথা সে বলে যে জগনের আপাদমস্তক জ্বলিয়া যায়। দেশের সমস্ত কিছুকেই সে ব্যঙ্গ করিয়া আঘাত করিয়া কথা বলে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, মুসলমানদের লইয়া এমন সব কথা সে বলে না। তাহাদের সম্পর্কে তাহার পক্ষপাতিত্ব সুস্পষ্ট। কংগ্রেস অনেকদিন হইতেই মুসলমানদের অযথা খাতির করিয়া আসিতেছে বলিয়া জগনের ধারণা—কিন্তু দেবু ঘোষের পক্ষপাতিত্ব কংগ্রেসের চেয়ে অনেক বেশী। এই সব কারণেই হিন্দুমহাসভাও একজন স্বেচ্ছাসেবক পাঠাইয়াছেন। ভাল হইয়াছে। খুব ভাল হইয়াছে।

বাঁধের উপর সকল দল একসঙ্গে মিলিত হইল।

বাঁধের পর নদীর চর।

কার্তিক মাসের প্রারম্ভে এখনও চরের পলিমাটি নরম রহিয়াছে। নদীতে এখন অনেক জল। শশী মাঝি খেয়া নৌকা লইয়া কিছুক্ষণ আগেই আসিয়া প্রস্তুত হইয়া আছে। নৌকার মাথায় বসিয়া তামাক খাইতেছে।

এইটাই খেয়াঘাট।

এপারের ঘাটটার নাম পঞ্চগ্রামের ঘাট। ওপারে একটা বুড়াগাছ অজগরের পিঠের মত মোটা বাঁকা-শিকড় মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বহুকালের বট। ওই বটতলাতেই ওপারে নৌকা গিয়া লাগিবে। ওইটাই প্রাচীনকালের ঘারমণ্ডল ঘাট—বা—ঘাট ঘারমণ্ডল। এইখানে একদা বর্ষার সময় সদাসর্বদা বিশ তিরিশখানা বড় মালবাহী নৌকা বাঁধা থাকিত। ঢেউয়ে ঢেউয়ে দোল খাইত।

ঘাটের উপরে বসিত মেলার মত খড়ো চালার বাজার। জন শুনিয়াছে সেকালে নাকি মুরশিদাবাদ, কাটোয়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি সহর অঞ্চল হইতে দশ বারোখর বেহ ব্যবসায়িনী পর্যন্ত আসিয়া তিন চার মাস থাকিয়া যাইত।

মধ্যে মধ্যে ডাকাত পড়িত। বড় বড় দল। লুটতরাজ করিয়া চলিয়া যাইত। সেই কারণে ফৌজদার এখানে তিন মাসের জন্য ফৌজ পাঠাইতেন।

ওই দেখানটায় এখন লাইভিং লাইনের সীমা আসিয়া উত্তর দিকে শেষ হইয়াছে—যেখানে সারি-সারি বাবলার ডালা উঠিয়াছে ওই জায়গাটাকেই বলে—ফৌজদারের মাঠ। আজও বলে।

সে দিন আর এ দিন। জন মধ্যে মধ্যে দার্শনিক হইয়া উঠে।

আজ সারি সারি উজ্জ্বল কেরোসিন গ্যাসের আলোয় ঘারমণ্ডল জংসনের বিস্তীর্ণ রেলইয়ার্ডটা ঝলমল করিতেছে। লাইন-লাইন-আর লাইন। সারি-সারি, সারি-সারি-লাইন আঁকিয়া বাঁকিয়া পরস্পরের সঙ্গে বাঁধাবাঁধি করিয়া চলিয়া গিয়াছে অন্ততঃ মাইল খানেকেরও বেশী। চওড়ায় অন্ততঃ সিকি মাইল। ওভার-ব্রিজের উপর দাঁড়াইয়া ইয়ার্ডটার দিকে তাকাইলে মনে হয় এ যেন একটা অতি অতিকায় কিছুর কঙ্কাল; যেন পৌরাণিক যুগের কোন মহাবলশালী অতিকায় দৈত্য বা অসুরের কঙ্কালটা মাটি কাটিয়া বাহির করিয়াছে, অতৃপ্ত তৃষ্ণায় অবরুদ্ধ রোষ যাহা ছিল বুকের মধ্যে তাহারই স্পর্শে হাড়গুলা এমনি কালো এবং কঠিন হইয়া গিয়াছে! অনবরত শান্টিং হইতেছে। শব্দে শব্দে গোটা ইয়ার্ডটা বিশ্বকর্মার পুরীর মত মুখরিত।

হরেন বলিল—জলদি কর। সিগনল পড়ল, ডাউন দিলে—ওই দেখ। মুন অর্নামেণ্ট—অর্থাৎ কিনা শ্রীমান শশীভূষণ জলদি কর।

খেয়া পার হইয়া তাহারা যখন ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল তখন প্লাটফর্মটা লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। সকলে তাকাইয়া আছে ময়ূরাক্ষীর ব্রিজের দিকে। ওই—ওই—লাইনের উপর বেনারস এক্সপ্রেসের সার্চ্চ-লাইটের ছটা পড়িয়াছে! চকচক করিতেছে। প্লাটফর্মের উপর এই শেষরাত্রেও ঘারমণ্ডল হাটের চারিপাশের চার পঞ্চগ্রাম অর্থাৎ বিশখানি গ্রামের দুই চারিজন করিয়া লোক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে লাইনের দিকে।

মহামহোপাধ্যায় শিবশেখর ন্যায়রত্ন আসিতেছেন। ষ্টেশন প্লাটফর্মেই ওয়েটিং রুম হইতে চেয়ার আনিয়া রাখা হইয়াছে। বাহিরে একখানা মোটর অপেক্ষা করিতেছে। ঘারমণ্ডলের মাড়োয়ারী ধনী সুরথমলজীর বাড়ীতে অবশিষ্ট রাত্রিটুকু যাপন করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

তীব্র আলোক এবং উত্তাপ ছড়াইয়া এক্সপ্রেসখানা আসিয়া দাঁড়াইল।

প্লাটফর্মের জনতা উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিয়া খুঁজিতেছিল দেবু ঘোষকে অথবা হিন্দুমহাসভার স্বেচ্ছাসেবকটিকে। তাহাদের কেহ-না-কেহ জানালায় বা দরজায় মুখ বাড়াইয়া থাকিবে।

কৈ? কৈ? কোথায়? কোন দিকে?

দেবু। দেবনাথ। দেবু!

এইদিকে। পিছনের দিকে। এই যে। এই যে।

সকলে ভিড় করিয়া পিছনের দিকে ছুটিল। এই যে। এই যে। গার্ডের গাড়ীর ঠিক আগের গাড়ীখানা হইতে দেবু ঘোষ এবং পনের ষোল বৎসরের একটি কিশোর দুইজনে গাড়ীর খোলা দরজার দিকে হাত প্রসারিত করিয়া

দাঁড়াইয়াছিল; দরজার মুখেই দীর্ঘদেহ গৌরবর্ণ পক্ককেশ ন্যায়রত্ন গাড়ী হইতে নামিতেছেন। তাঁহার পিছনে হিন্দুমহাসভার স্বেচ্ছাসেবকটি।

কে জয়ধ্বনি দিয়া উঠিল—বোলো ভাই ন্যায়রত্নজী—জয়!

ন্যায়রত্ন ধ্বনিতে চকিত হইয়া মুখ তুলিলেন। পাকা ভ্রূ জোড়ার নিচে চোখ দুটি ঝকঝক করিতেছে। শুভ্র-মালিন্যহীন চোখ! হাত তুলিয়া তিনি ইঙ্গিতে নিষেধ করিলেন—না!

দেবু ঘোষ উচ্চকণ্ঠে বলিল—উনি একাদশীর উপবাস ক'রে আছেন—তারপর হঠাৎ একটু অসুখও হয়ে পড়েছেন। আপনারা গোলমাল করবেন না, ভিড়ও করবেন না।

কিশোর ছেলেটি বলিল—আমার কাঁধে ভর দিন!

হাত নাড়িয়া বৃদ্ধ ইঙ্গিতে জানাইলেন—না! বিনা সাহায্যেই তিনি সাবধানতার সঙ্গে প্লাটফর্মে নামিয়া পড়িলেন।

সর্ব্বাগ্রে শ্রীহরি ঘোষ হেঁট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেল।

ন্যায়রত্ন এক পা পিছাইয়া গেলেন এবং ক্লান্তকণ্ঠে বলিলেন—না।

কিশোর ছেলেটি বলিল—প্রণাম করবেন না। উনি প্রণাম কারুর নেন না!

ন্যায়রত্ন সকলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—আমি একটু বিশ্রাম করব। বড় ক্লান্ত আমি!

হিন্দুমহাসভার সম্পাদক আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—চলুন—গাড়ী আছে বাইরে—ব্যবস্থা সব ঠিক করা আছে।

ঘাড় নাড়িয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—না। এইখানে—এইখানেই বিশ্রাম করব আমি। অঙ্কুমণি! কম্বলখানা বিছিয়ে দাও তো! একটু, একটু স্থান ক'রে দিন। আর কাল, কাল সকলের সঙ্গেই দেখা হবে। আজ একটু বিশ্রাম।

হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইলেন তিনি।

প্রায় ঠিক তেমনটি আছেন ন্যায়রত্ন। মাথায় খাটো গৌরবর্ণ পক্ককেশ মানুষটি শুধু একটু শীর্ণ হইয়া গিয়াছেন—বয়টা উজ্জ্বলতর হইয়াছে। জংসন ষ্টারমণ্ডলের চারিদিকে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে। ন্যায়রত্ন বিস্ময়হীন ঔৎসুক্যহীন বিচিত্র দৃষ্টি চারিদিকে চোখ বুলাইয়া একবার দেখিয়া লইলেন।

জংসন ষ্টারমণ্ডল।

উত্তরে ওই বটগাছতলায় খেয়াঘাট। ঘাট ষ্টারমণ্ডল!

দক্ষিণে জ্যোৎস্নালোকে দেখা যাইতেছে ওই ভরতারার আশ্রমের মণ্ডল। তার ও-পাশে ওই হাট ষ্টারমণ্ডল।

(ক্রমশঃ)

লেখক উপন্যাসখানির 'বন্দর সাতঘাটের' পরিবর্তে 'ষ্টারমণ্ডল' নামকরণ করিলেন। (ভাঃ সঃ)

টাকার মূল্য হ্রাস

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যে জগদ্ব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা সুরু হয়, অনেকে তাহা প্রথম মহাযুদ্ধের ফল বলিয়া মনে করেন। এই অর্থনৈতিক মন্দার চাপে ব্রিটেনাদি বহু দেশের মুদ্রানীতিও বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। মজুত স্বর্ণসম্পদ অত্যন্ত কমিয়া গেল বলিয়া নিরুপায় ব্রিটেন ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর স্বর্ণমান ত্যাগ করে। ভারতবর্ষ বা সিংহলের মত ব্রিটেনের অধীন দেশ অথবা অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, দিউনিসাণ্ড বা দক্ষিণ আফ্রিকার মত ডোমিনিয়ন শ্রেণীর দেশের কথা দূরে থাক, ব্রিটেনের এই স্বর্ণমান ত্যাগের সিদ্ধান্ত ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি সমৃদ্ধ দেশকেও স্বর্ণমান ত্যাগের পরোক্ষে বাধ্য করে এবং ইহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত স্বর্ণমানে পুনঃ প্রতিষ্ঠার পৃথিবীর নানা স্থানে নানা আন্দোলন চলিলেও স্বর্ণমান কিন্তু আর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্ণমান পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেনের মুদ্রা মূল্যও হ্রাস পায়। আগে প্রতিটি ব্রিটিশ মুদ্রা ষ্টার্লিংয়ের বিনিময় মূল্য ছিল ৪'৮৬৫ মার্কিন ডলার, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর হইতে ইহা মোটামুটি ৪'০০ মার্কিন ডলারে নামিয়া আসে। এই সময় ভারতে পূর্ণ স্বর্ণমান প্রচলিত না থাকিলেও ভারতীয় মুদ্রানীতি ও বিনিময়-ব্যবস্থা সম্পর্কিত তদন্ত কমিটি হিল্টন ইয়ং কমিশনের (১৯২৬) পরামর্শ অনুযায়ী গোল্ড বুলিয়ন ষ্ট্যাণ্ডার্ড বা স্বর্ণপিণ্ড মান চলিতেছিল। ব্রিটেন যেই মূল্য হ্রাস করিয়া স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিল, পরাধীন দেশ ভারতের পক্ষে আর স্বর্ণ বিনিময় সাপেক্ষ মুদ্রানীতির সহায় রক্ষা করা সম্ভব হইল না এবং ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এই অবস্থায় মুদ্রা ব্যবস্থা সম্পর্কিত ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের আইন বাতিল করিয়া ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর হইতে টাকাকে

ষ্টার্লিংয়ের সহিত প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করিয়া 'ষ্টার্লিং বিনিময়মান' নামে নূতন একটি মূল্যমান প্রবর্তন করেন। টাকা ষ্টার্লিংয়ের বিনিময় হারে প্রচলিত প্রতি টাকার ১ শিলিং ৬ পেন্স দর অপরিবর্তিত রহিল।

ইহার পর যুদ্ধের শেষ দিকে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক ও মুদ্রা তহবিল প্রতিষ্ঠিত হইলে আন্তর্জাতিক মুদ্রা রীতিতে স্বর্ণের মর্যাদা পুনরায় প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে চেষ্টা চলে। এই চেষ্টার ফলস্বরূপ স্বীকার করিয়াও নিজস্ব স্বর্ণের অভাবের জন্যই ব্রিটেনপন্থীয় দেশগুলি মার্কিনী প্রস্তাব মানিয়া লইতে পারে নাই। যাহা হউক, ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা ইনটার ন্যাশনাল মনিটারী ফাণ্ডের তরফ হইতে সদস্য শ্রেণীভুক্ত সকল দেশকে স্বর্ণের হিসাবে তাহাদের প্রত্যেকের মুদ্রার বিনিময় মূল্য স্থির করিয়া জানাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। তদনুসারে টাকার বিনিময় মূল্য ১ শিলিং ৬ পেন্সের স্থলে ১ শিলিং ৪ পেন্স করিবার জন্য দীর্ঘকাল যাবৎ আন্দোলন চলিতেছিল, এই সুযোগে বিনিময় হার পরিবর্তন করিয়া লইতে অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করেন। ভারত সরকার কিন্তু প্রচলিত মুদ্রা ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের বিশৃঙ্খলার ঝুঁকি লইতে সাহস করিলেন না এবং ফলে সাধারণ দেশবাসীর দিক হইতে আগ্রহ সত্ত্বেও টাকার বিনিময় হার ১ শিলিং ৬ পেন্সই রহিয়া গেল। তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ষ্টার্লিং টাকার বিনিময় হার অপরিবর্তিত থাকিলেও ভারত সরকার ইতিমধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ৪০ ও ৪১ নং ধারা সংশোধন করিয়া লন এবং তদ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্রিটিশ মুদ্রা ষ্টার্লিংয়ের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া স্বাধীন মুদ্রা হিসাবে টাকার আন্তর্জাতিক বিনিময় হার স্থির করিবার অধিকারী হন। গত জানুয়ারী মাসে ভারতীয় পার্লামেন্টে এক প্রশ্নের উত্তরে অর্থসচিব ডাঃ জন মাথাই জানান যে, ইংলণ্ডের ষ্টার্লিং ও ভারতীয় টাকার মধ্যে অতিরিক্ত সকল সম্পর্কের অবসান ঘটিয়াছে এবং এখন ইনটার ন্যাশনাল মনিটারী ফাণ্ডের আওতায় ভারতবর্ষ টাকার যে (স্বর্ণ) মূল্য স্থির করিয়াছে, তদনুযায়ীই পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত ভারতীয় মুদ্রার বিনিময় হার নির্দ্ধারিত হইতেছে।

যুদ্ধোত্তরকালেও দুনিয়ার মুদ্রা ব্যবস্থা একরূপ যুদ্ধের আগের পর্য্যায়েই চলিতেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ক্রমশঃ অধিকতর উদ্বৃত্ত দেশ হইয়া উঠিতেছিল সত্য, কিন্তু পাল্লে ঘাটতি দেশগুলির অর্থাভাব ঘটিলে মার্কিনী রপ্তানী বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িতে পারে, এই আশঙ্কায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তজ্জন্য মানবতার নাম করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় দেশগুলিকে মার্শাল সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করে এবং ব্রিটেন সমেত ১৬টি ইউরোপীয় দেশ এই পরিকল্পনানুযায়ী মার্কিন সাহায্য গ্রহণ করে। প্রশ্নের ঘাটতি দেশগুলির জন্যও কোন-রূপ মার্কিন সাহায্য দেওয়া যায় কিনা, সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষকে তাহা লইয়াও মাথা ঘামাইতে দেখা যাইতেছিল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্রমশঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকূলে এত বেশী চলিয়া যাইতে লাগিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্যে অপরাপর দেশগুলির অবস্থা এমনি শোচনীয় হইয়া পড়িতে লাগিল যে, মার্কিন সাহায্য এবং বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক তার সাম্য তথা মুদ্রা-নীতির শৃঙ্খলা রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টাতেও শেষ পর্য্যন্ত কাজ হইল না। ব্রিটেনকে পুরোভাগে রাখিয়া ষ্টার্লিং এলাকার দেশগুলি মার্কিন বাণিজ্য প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে একান্ত অসহায়ভাবেই পরাজয় স্বীকার করিয়া লইল। এ অবস্থায় প্রথমটা মার্কিন পণ্য আমদানী কমাইয়াই আত্ম-রক্ষার চেষ্টা তাহারা করিল সত্য এবং ষ্টার্লিং এলাকার দেশগুলি মার্কিন এলাকা হইতে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের হিসাবে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের তুলনায় শতকরা ২০ ভাগ কম মালপত্র আমদানীর সিদ্ধান্ত করিল। ব্রিটিশ অর্থসচিব স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস গত ১৩ই জুলাই এই মর্ম্মে একটি বিবৃতিও সংবাদ-পত্রে প্রকাশ করিলেন। ব্রিটেন মার্শাল পরিকল্পনানুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে যতদূর সম্ভব বেশী সাহায্য সংগ্রহেও সচেষ্ট ছিল, কিন্তু মার্কিন কর্তৃপক্ষ যখন জানাইলেন যে, ব্রিটেন যে পরিমাণ সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়াছে, ১৯৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দের হিসাবে তদপেক্ষা শতকরা ৩৩ ভাগ কম বরাদ্দ করা হইয়াছে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তখন মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। ইহার পরও অধিকতর মার্কিন সাহায্য লাভে শেষ চেষ্টা করিতে ব্রিটেন ছাড়ে নাই; ব্রিটিশ অর্থ সচিব স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ও বৈদেশিক সচিব মিঃ আর্নেষ্ট বেভিন গত ৩১শে আগষ্ট বিমান যোগে ওয়াশিংটন যাত্রা করিলেন। ওয়াশিংটনে ৭ই সেপ্টেম্বর হইতে ব্রিটিশ, মার্কিন ও ক্যানাডিয়ান অর্থসচিব ও বৈদেশিক সচিবদের গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন বসিল এবং এই সম্মেলন শেষ হইল ১২ই সেপ্টেম্বর। ব্রিটেন যাহাতে ডলার সঙ্কট হইতে মুক্তি পায় তজ্জন্য ব্রিটেনের ডলার ব্যয় সঙ্কোচ ও অধিকতর স্বাধীনতার সহিত মার্শাল সাহায্য খরচ করিবার স্বাধীনতা লাভের পরিপ্রেক্ষিতেই সম্মেলনের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীভূত হয়। ভোটের উপর ব্রিটিশ প্রতিনিধিবর্গকে এই সম্মেলনের সাফল্য সম্পর্কে আনন্দ প্রকাশ করিতে দেখা যায় এবং ১৭ই সেপ্টেম্বর লণ্ডনে ফিরিয়া অর্থসচিব স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস আলোচ্য ওয়াশিংটন সম্মেলনকে সর্ব্বাপেক্ষা সাফল্যজনক সরকারী সম্মেলন-রূপে বর্ণনা করেন (The most successful we have ever had)।

ইহার পরদিন অর্থাৎ ১৮ই সেপ্টেম্বর রবিবার স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ষ্টার্লিংয়ের মূল্য হ্রাসের কথা ঘোষণা করেন। ব্রিটেনের আর্থিক অবস্থা এবং মজুত স্বর্ণসম্পদের পরিমাণ এমন শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল যে এই ষ্টার্লিংয়ের মূল্য হ্রাসের সংবাদ লোকের কাছে অত্যধিক গুরুতর হইলেও অপ্রত্যাশিত ছিল না। কিন্তু প্রথমতঃ অর্থসচিব স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস কিছুদিন পূর্ব্বে সুইটজারলাণ্ডে স্বাস্থ্যোদ্ধারে যাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রকাশ্যে মুদ্রামূল্য হ্রাসের সমর্থন করেন নাই বলিয়া এবং দ্বিতীয়তঃ মুদ্রামূল্য হ্রাস ছাড়া অন্য সম্ভাব্য সকল উপায়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ডলার সঙ্কট এড়াইবার চেষ্টা করিতেছিলেন বলিয়া অর্থসচিবের ঘোষণায় সারা দুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। অর্থসচিব স্যার ষ্ট্যাফোর্ড অবশ্য জানাইয়াছেন যে, ওয়াশিংটন যাত্রার আগেই ব্রিটেনের চরম অর্থসঙ্কট হইতে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হিসাবে তাঁহারা মুদ্রামূল্য হ্রাস করিবেন বলিয়াই স্থির

করিয়া লইয়াছিলেন।* যাহা হউক অর্থসচিবের এই ঘোষণার ফলে ষ্টার্লিংয়ের মূল্য অত্যধিকভাবে কমিয়া গেল। এই ষ্টার্লিংয়ের চলতি বিনিময় মূল্য ছিল ৪ ডলার ০ সেন্ট, ইহা রাতারাতি কমিয়া দাঁড়াইল ২ ডলার ৮০ সেন্ট। পূর্বে উল্লিখিত ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের হিসাবে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ এই ১৮ বৎসরের মধ্যে দুইবার বিনিময় হারের পরিবর্তনের ফলে এক ষ্টার্লিং ৪ ডলার ৮০ সেন্ট হইতে ২ ডলার ৮০ সেন্টে নামিয়া আসিল।

ব্রিটেন ষ্টার্লিংয়ের মূল্যমূল্য কমাইল বলিয়া ষ্টার্লিং এলাকার সমস্ত দেশের সম্মুখে নিদারুণ এক সমস্যার উদ্ভব হইল। আইনগতভাবে ব্রিটিশ মুদ্রার সহিত কোন বাধ্যতামূলক যোগাযোগ না থাকিলেও আন্তর্জাতিক লেনদেনে ব্রিটিশ মুদ্রা ষ্টার্লিংয়ের উপর ষ্টার্লিং এলাকার সকল দেশের মুদ্রারই নির্ভরশীলতা ছিল যথেষ্ট. এখন ষ্টার্লিংয়ের মূল্য-হ্রাস ঘটায় ইহাদের মুদ্রাব্যবস্থাতেও স্বভাবতঃই বিশৃঙ্খলা দেখা দিবার সম্ভাবনা ঘটিল। অবস্থার যাহাতে দ্রুত অবনতি না হয়, তদুদ্দেশ্যে প্রধানতঃ কমনওয়েলথভুক্ত ও ইউরোপীয় ১৪টি দেশের সহিত ভারতবর্ষ (ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র) সঙ্গে সঙ্গে ডলারের হিসাবে টাকার মূল্য হ্রাস ঘোষণা করিল। ভারতবর্ষে মুদ্রাব্যবস্থার সমতা রক্ষার জন্য ১৯, ২০ ও ২১শে সেপ্টেম্বর সমস্ত ব্যাঙ্কেও কাজ কারবার বন্ধ রাখা হইল এবং ষ্টার্লিংয়ের সমান হারে ভারতীয় মুদ্রার মূল্য কমাইয়া প্রতি টাকায় ডলার-বিনিময় মূল্য ধার্য করা হইল ৩০.২২৫ সেন্টের স্থলে ২১ সেন্ট। মূল্যমূল্য হ্রাসের পর ষ্টার্লিং বা টাকা কাহারও অন্তর্দেশীয় মূল্যের কোনরূপ তারতম্য হইবে না বলিয়া ঘোষণা করা হইল। ষ্টার্লিং টাকার বিনিময় হার আগের মত ১ টাকা=১ শিলিং ৬ পেন্সই রহিল।

ভারতবর্ষ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মূল্যমূল্য হ্রাস নীতি সরাসরি স্বীকার করিয়া লইলবটে, কিন্তু পাকিস্তান বিপরীত পথ গ্রহণ করিল। সমস্ত কমনওয়েলথভুক্ত দেশের মধ্যে একমাত্র পাকিস্তানই মূল্যমূল্য কমাইতে রাজী হইল না। পাকিস্তান ষ্টেট ব্যাঙ্কের গবর্নর, পাকিস্তান সরকারের অর্থবিভাগীয় সেক্রেটারী এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের লইয়া পাকিস্তান মন্ত্রিসভার করাচীতে এক পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। পাকিস্তান বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ফলে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আর্থিক লেনদেন হঠাৎ একটা সঙ্কটজনক অবস্থায় উপনীত হইল এবং প্রচলিত পাক-ভারত আর্থিক চুক্তি অকস্মাৎ বানচাল হইয়া গেল। এই চুক্তির ১নং অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছিল যে, ভারতীয় টাকা এবং পাকিস্তানী টাকার সরকারী বিনিময় হারে উভয় মুদ্রার মূল্য সমান ধরা হইবে এবং যথাযথ নোটিশ ও পারস্পরিক আলোচনা না করিয়া কোন কর্তৃপক্ষই এই সমমূল্য বিনিময় হারের পরিবর্তন করিতে পারিবেন না। এখন পাকিস্তানের মুদ্রামূল্য অবমূল্যন হওয়ায় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে টাকার অবাধ লেনদেন সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া গেল এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২১শে সেপ্টেম্বর সকল ব্যাঙ্ককে জানাইয়া দিলেন যে পাকিস্তানী টাকার ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কোন দর উল্লেখ করিতে পারিবেন না। দুর্গাপূজার মুখে এই ঘোষণা ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রই এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীর জীবন বিপন্ন করিয়া তুলিল এবং বাঙ্গলা বাণিজ্যের হইল নিদারুণ ক্ষতি।

নূতন যে বিনিময়হার ঘোষিত হইল তাহাতে পাকিস্তানী টাকার ডলার মূল্য অপরিবর্তিত থাকিয়া প্রতি টাকা আগের ৩০.২২৫ সেন্টই বলবৎ রহিল। প্রতি পাকিস্তানী টাকার ষ্টার্লিং বিনিময়হার হইল আগের ১ শিলিং ১ পেন্সের স্থলে ২ শিলিং ১½ পেন্স। আগে ভারতীয় ও পাকিস্তানী টাকার দর সমান ছিল, এখন প্রতি একশত পাকিস্তানী টাকার বিনিময় মূল্য হইল ১৪৪ ভারতীয় টাকা (এই অর্থে এখন ১০০ ভারতীয় টাকার বিনিময়ে পাকিস্তানের ১৯ টাকা ৮ আনা পাওয়া যাইবে)।

আগেই বলা হইয়াছে ব্রিটেন ষ্টার্লিংয়ের মূল্য হ্রাস করিয়াছে প্রচণ্ড ডলার সঙ্কট হইতে আত্মরক্ষা করিতে। বাড়তি ডলার না পাইলে ব্রিটেনের চলিতে পারে না। ষ্টার্লিংয়ের মূল্যহ্রাসের ফলে ব্রিটেনের নিরাপত্তা হিসাবে মজুত স্বর্ণসম্পদের প্রয়োজন কমিয়াছে, ডলার এলাকার ষ্টার্লিং এলাকার পণ্য সস্তা হইবে বলিয়া ব্রিটেনের পক্ষে রপ্তানী বাণিজ্য বাড়াইয়া বাড়তি ষ্টার্লিং উপার্জনের সুযোগ বৃদ্ধি পাইবে। এ ছাড়া এই ষ্টার্লিং মূল্য হ্রাসের দ্বারা নোকচমুর অপোচরে ব্রিটেনের আর একটি বিরাট স্বার্থসিদ্ধি ঘটিয়াছে। সকলেই জানেন, বিভিন্ন মিত্রপক্ষীয় দেশের নিকট ষ্টার্লিং দেনার চাপে ব্রিটেন এখন অত্যন্ত বিপন্ন। ব্রিটেনের এই ষ্টার্লিং ঋণের পরিমাণ ১৩০০ কোটি পাউণ্ড বা আগের বিনিময়হারের হিসাবে ৫৪৩১ কোটি ডলার। ষ্টার্লিংয়ের ডলার মূল্য কমাইয়া ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এক কলমের খোঁচায় ১৯৩১ কোটি ডলার দেনা কমাইয়া লইয়াছেন। ষ্টার্লিং এলাকার পণ্য সস্তা হইবার ফলে বাড়তি ডলার উপার্জিত হইলে তো কথাই নাই, যদি তা নাও হয়, তাহা হইলেও এই ভাবে ব্রিটেন বর্তমানের হিসাবে দশ বৎসরের ডলার ঘাটতি পূরণ ক্ষমতা এক সিদ্ধান্তেই অর্জন করিয়া লইয়াছে। এ হিসাবে মূল্যমূল্য হ্রাসে ব্রিটেন বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ উভয় হিসাবেই লাভবান হইয়াছে বলা চলে।

এখন প্রশ্ন এই যে, ভারতসরকার যে এতটুকু বিলম্ব না করিয়াই মূল্যমূল্য হ্রাসে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা বুদ্ধিবেচনা বা দূরদর্শিতার পরিচায়ক হইয়াছে কি না? পাকিস্তান মূল্যমূল্য হ্রাসে সম্মত না হওয়ায় যে বিচিত্র পরিস্থিতির উদ্ভব

---

* ব্রিটেনের মজুত স্বর্ণসম্পদের পরিমাণ ডলার সঙ্কটের চাপে আশ্চর্যজনকভাবে হ্রাস পাইতে থাকে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে এই সম্পদের মূল্য ছিল ৪৪ কোটি ২০ লক্ষ ষ্টার্লিং, ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের শেষে ইহা ৪৭ কোটি ৩০ লক্ষ ষ্টার্লিংয়ে দাঁড়ায়, ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের এই মূল্যই ইহা সেপ্টেম্বরে কমিতে ৪০ কোটি ৮০ লক্ষ ষ্টার্লিংয়ে পৌঁছায়। ব্রিটেনের মূল্যব্যবস্থার নিয়তম নিরাপত্তার পক্ষে এই স্বর্ণসম্পদ যথেষ্ট নয় (আমার লেখা ১৩৫৩, ভাদ্রের ভারতবর্ষে ষ্টার্লিং এলাকার ডলার সঙ্কট শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

হইয়াছে, বিশেষ করিয়া তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে এখন বিবেচনা করিতে হইবে।

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য যে ব্রিটেন হারার বাহিরের দেশের যে উল্লেখযোগ্য অংশ এক পয়সা খরচ না করিয়া কমাইয়া ফেলিয়াছে, তাহাতে ভারত ও পাকিস্তান অধিকতর হইয়াছে অথচ পরিমাণে। ইতিপূর্বে যখন ষ্টার্লিং চুক্তি হয়, তখন ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অবশ্যই প্রতিশ্রুতি আদায় করা উচিত ছিল যে, ভবিষ্যতে কখনও হিসাবের কোন ফাঁকেই ব্রিটেন হারার দেনার পরিমাণ কমাইতে পারিবে না। তখন সে ব্যবস্থা হয় নাই, কিন্তু ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গের এই ত্রুটীর মারাত্মক ফল ঘটিবার সম্ভাবনা সম্পর্কে তখন অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন (১৩৫৭, ভারতের ভারতবর্ষে আমার লেখা ষ্টার্লিং চুক্তি সম্পর্কিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। এখন ব্রিটেনের শতকরা ৩০৫ ভাগ টাকা পিছু পাঁচ আনা ধার্য করিয়া ধিবার এই সিদ্ধান্তের ফলে ভারতের ২৫২ কোটি টাকা ও পাকিস্তানের ৩৮ কোটি টাকা, এমনে ৩১০ কোটি টাকা (মোট ৯০ কোটি ডলার) পাওনা বাহির হইতে চলিয়াছে। অথচ সকলেরই নিকট ইহা সুবিদিত যে ষ্টার্লিং পাওনা নিছক হিসাবে একান্ত অনগ্রসর ভারত বা পাকিস্তানের পক্ষে শুধু পাওনার জন্য নয়, ইহা এই দুই বহু সম্ভাবনাময় রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ আর্থিক পুনর্গঠনের একমাত্র আশাভরসা স্থল। এ হিসাবে এই পাওনা পরিত্যাগ করার অর্থ—ডলার এলাকা হইতে ভারতবর্ষ বা পাকিস্তান ক্রয়-পরিমাণ যন্ত্রপাতি আমদানীতে সমর্থ হইবে না এবং ফলে তাহার আর্থিক পুনর্গঠন ব্যাহত হইয়া বেকারী ভাবকে বাড়িয়া চিরকালীন হইয়া দাঁড়াইবে। এই জন্যই গত বই অক্টোবর ভারতীয় প্রতিনিধিদলের বিশেষ অধিবেশনে অধ্যাপক কে টি শাহ প্রস্তাব করেন যে, ষ্টার্লিং ব্যালান্সের আশু ডলার মূল্য ভাঙাইতে এবটুও না করিতে পারে তজ্জন্য ভারতরক্ষার প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করুন এবং ব্রিটিশ মুদ্রা পাউণ্ডের সহিত সব সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া মোটের উপর হিসাবে রক্ষিত তহবিলের ভিত্তিতে ভারতীয় টাকার দর নির্ধারিত হউক।

ইহা যেন আগের ভুলের মাশুল। এখন ভারতসরকারের সিদ্ধান্তের লাভলোকসানের হিসাব ধরা যাক। নীতির দিক হইতে বিচার করিলে ব্রিটেনের পথকে অনুসরণ করিয়া মুদ্রামূল্য হ্রাস ভারতের পক্ষে যুক্তিযুক্ত হয় নাই বলিয়াই অনেকে মনে করেন। ভারতের সহিত পাকিস্তান, সিংহল প্রভৃতি প্রতিবেশী দেশের মুদ্রার বাঁধাধরা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল, ভারতসরকারের গুরুত্বপূর্ণ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে এই সব দেশের কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করা উচিত ছিল। ভারত-সরকার তাহা করেন নাই বলিয়া ইহাদের স্বভাবতঃই অত্যন্ত অসুবিধা হইয়াছে। পাকিস্তান এবং সিংহল সরকার তো ভারতসরকারের অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্তগ্রহণের বিরুদ্ধে একাকেই অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। এইভাবে প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে তাড়াহুড়া করিয়া কোন সিদ্ধান্তগ্রহণের দ্বারা বিব্রত করা রাজনীতির দিক দিয়াই লাভজনক নয়।

মুদ্রামূল্য হ্রাসের সপক্ষে ব্রিটিশসরকারের মত ভারতসরকারের সব চেয়ে বড় যুক্তি এই যে, ইহার ফলে ডলার এলাকায় ভারতীয় পণ্য সস্তা হইয়া অধিকতর পরিমাণে বিক্রীত হইবে এবং ফলে ডলার উপার্জিত হইবে বেশী। এই প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু গত ১৯শে সেপ্টেম্বরের এক বিবৃতিতে আশার কথা শুনাইয়াছেন ("Devaluation encourages export and helps business in the Country.")। কাগজে কলমে এই মতবাদের মূল্য যাহাই হউক, ভারতের পক্ষে কার্যক্ষেত্রে তাহা কতখানি সাফল্যজনক হইবে তাহা লইয়া কিন্তু ইতিমধ্যেই অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতদ্বৈধতা দেখা দিয়াছে। কথাটা অনস্বীকার্য যে জিনিষ সস্তা হইলে জিনিষ কাটতি বেশী, কিন্তু ডলার এলাকায় জিনিষ সস্তা করিতে গিয়া ভারতবর্ষকে অতঃপর প্রতিটি ডলার অর্জন/করিতে আগের হিসাবের যে শতকরা ৪০ ভাগ বেশী মাল দিতে হইবে, তাহার যেমন রাশ প্রয়োজন। এইভাবে অতিরিক্ত মাল পাঠাইয়া রপ্তানী কত বাড়ানো সম্ভব—যাহাতে ভারতের পক্ষে আগের তুলনায় লক্ষ্মীর অধিক পরিমাণ ডলার অর্জিত হইতে পারে? হাজার টাকার দাম শতকরা ৩০৫ ভাগ কমিয়া যাওয়ায় ডলার এলাকায় পণ্যের দাম এমনেই এক-তৃতীয়াংশ বাড়িয়া যাইবে এবং বর্তমান চোরাকারবারের যুগে ব্যবসাদারদের কৃপাদৃষ্টি হইলে সে বৃদ্ধি কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে তাহা বলা যায় না। যন্ত্রপাতি, খাদ্য ও নানাপ্রকার ভোগ্যপণ্যের জন্য ভারতবর্ষ এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা ডলার এলাকার উপর যেরূপ নির্ভরশীল, তাহাতে এই মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ ভারতবাসীর জীবনের উপর দারুণ প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব বিস্তার করিবেই। অবশ্য কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা চালু হইলে অবশ্য অনেকটা আয়ত্তে থাকিতে পারে। ভারতসরকার মূল্যমূল্য হ্রাসের সুবিধা লইয়া ব্যবসায়ীদের মুনাফাবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের সাধুসংকল্প ঘোষণাও করিয়াছেন। এই উপলক্ষে কাটকাবাজীর দ্বারা মূল্যবৃদ্ধি বন্ধ করিতে ভারতসরকার গত ২১শে সেপ্টেম্বর এক অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক পরিবর্তনের ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও চোরা-কারবারীদের আয়ত্তে রাখিতে সরকার দীর্ঘকাল যেভাবে ব্যর্থকাম হইয়াছেন তাহাতে এক্ষেত্রেও তাঁহাদের কৃতকার্যতা সম্পর্কে অধিক আশা পোষণ করিতে সাহস হয় না। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে কঠোরতার এতটুকু অভাব ঘটিলে শুধু ডলার এলাকার পণ্যেই দাম বাড়িবে না, বিদেশী জিনিষের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাবে দেশী জিনিষপত্রের দাম অনিবার্য ভাবে বাড়িয়া যাইবে। বর্তমান পণ্যবাজার যদি লক্ষ্য করা যায়, এ সন্দেহ অমূলক নহে বলিয়াই মনে হইবে।

সবচেয়ে বেশী মুস্কিল হইয়াছে পাকিস্তানের বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে। পাকিস্তান ডলারের হিসাবে টাকার মূল্যহ্রাস করিতে না চাওয়ায় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পণ্য চলাচল ব্যবস্থা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং ফলে প্রতিবেশী দুইটি রাষ্ট্রে জিনিষপত্রের দর হইবে দুইপ্রকার। পাকিস্তানে কাপড়, লোহা, কয়লা প্রভৃতি নানা জিনিষের

জন্য ভারতের উপর নির্ভর করে এবং ভারতবর্ষ পাট, তুলা, কাঁচা চামড়া, খাদ্যশস্য প্রভৃতির হিসাবে পাকিস্তানের মুখাপেক্ষী। আপেক্ষিক ভাবে বিবেচনা করিয়া পাট, তুলার জন্য ভারতের মুখাপেক্ষিতাই বেশী। বর্তমান বৎসরে আন্তঃ-ডোমিনিয়ন চুক্তিমত পাকিস্তানের ভারতকে সাড়ে চারি লক্ষ গাঁইট তুলা, চল্লিশ লক্ষ গাঁইট কাঁচা পাট এবং ২৪ লক্ষ চামড়া যোগাইবার কথা। শুধু এই পাট ও তুলার আগেকার মূল্য ছিল ১১০ কোটি টাকা, এখন প্রতি একশত ভারতীয় টাকা মাত্র সাড়ে উনসত্তরটি পাকিস্তানী টাকার সমান হওয়ায় এ হিসাবে ভারতকে দিতে হইবে ১৪৮ কোটি টাকা। পাক-ভারত বাণিজ্যে এখন বাণিজ্যিক গতি ভারতের প্রতিকূলে (১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে এই বাণিজ্যে পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত হয় ২৭ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা), এ সময় পাকিস্তানের পাওনা বাড়িয়া গেলে তাহা ভারতবর্ষ কি ভাবে শোধ করিবে? বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুল অফ ইকনমিকস্ এণ্ড সোসিওলজির' ডাইরেক্টর অধ্যাপক এন সি তাকিল গত ২৩শে সেপ্টেম্বর এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে অবশ্য মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতসরকারের পক্ষে বর্তমানে আত্মরক্ষা করিতে হইলে পাকিস্তানে রপ্তানী দ্রব্যাদি অবিলম্বে নিষিদ্ধের প্রয়োজন। পাকিস্তানের জিনিষের উপর শুল্ক বাড়াইয়া এদেশে উৎপন্ন জিনিষপত্রের দাম কমাইবার চেষ্টাকে তিনি ভ্রান্তবুদ্ধিপ্রসূত বলিয়াছেন। ভারত বিভাগের সময় ঋণভারের যে অংশ পাকিস্তানের ভাগে পড়িয়াছিল, সেই চল্লিশ কোটি টাকা পাকিস্তান স্বাধীনতালাভের পাঁচ বৎসর পরে আরম্ভ করিয়া পঞ্চাশটি কিস্তিতে ভারতকে শোধ দিবে, এইরূপ কথা আছে। অধ্যাপক তাকিল পরামর্শ দিয়াছেন যে, বর্তমান দরুটনক পরিস্থিতির বিবেচনায় ভারতসরকার পাকিস্তানের সহিত বাণিজ্য ঘাটতি সেই বেলা হইতে পূরণ করিয়া লউন। বলা নিষ্প্রয়োজন, অরাজী অবস্থায় অধ্যাপক তাকিলের এই প্রস্তাব ভারতসরকারের গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার অপেক্ষা রাখে।

এছাড়া পাকিস্তান ও ভারতের মুদ্রামূল্য বৈষম্যের ফলে ভারতের উপর জনবাহুল্যের চাপও বাড়িবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। ইহাতে খাদ্যসমস্যা, বেকারসমস্যা, সবই তীব্রতর হইতে পারে। এতদিন অসংখ্য হিন্দু-মুসলমান ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কারবারবাস করিয়াছে এবং তাহাদের পরিবারবর্গ তাহাদের প্রেরিত টাকায় পাকিস্তানে জীবনধারণ করিয়াছে। এখন টাকার বাট্টায় পরিবর্তিত হওয়ায় ভারত হইতে প্রেরিত অর্থ পাকিস্তানে কমিয়া যাইতেছে এবং ফলে আগের মত সে টাকায় পোষ্যবর্গের দিন চলা অসম্ভব। এক্ষেত্রে শুধু অসংখ্য হিন্দু নয়, বহু মুসলমান নরনারীও পাকিস্তান ত্যাগ করিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে চলিয়া আসা অসম্ভব নয়।

আগেই বলা হইয়াছে ষ্টার্লিং এলাকাভুক্ত দেশ বলিয়া ব্রিটেন মুদ্রামূল্য হ্রাস করায় ভারতবর্ষ একপ্রকার নিরুপায় অবস্থাতেই ষ্টার্লিংএর সহিত তাল রাখিবার উদ্দেশ্যে মুদ্রামূল্য হ্রাস করিয়াছে। ইহার ফলে ডলার এলাকার সহিত বাণিজ্যে সুবিধা যদি খুব বেশী নাও হয়, ষ্টার্লিং এলাকাভুক্ত দেশগুলির সহিত বাণিজ্যে ভারতের অনেক সুবিধা হইবে বলিয়া ভারতসরকার আশা করিতেছেন। ঘরের পাশে ঘনিষ্টতম প্রতিবেশী পাকিস্তান অপ্রত্যাশিত ভাবে মুদ্রামূল্য হ্রাসে রাজী না হওয়ায় অবশ্য জটিলতা অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে, তবে এখনও অনেকে আশা করিতেছেন যে ভারত ও ষ্টার্লিং এলাকাভুক্ত অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্যে প্রচুর সুবিধার সম্ভাবনা হইয়া হয়তো পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত সংকল্পের পরিবর্তন করিবে এবং মুদ্রামূল্য হ্রাসে রাজী হইবে। যাহা হউক, ইহা ভবিষ্যতের কথা এবং ইহা লইয়া এখন জল্পনা কল্পনা বৃথা। উপস্থিত ষ্টার্লিং পাওনা হ্রাস পাইল বলিয়া বিশেষভাবে এবং যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের প্রয়োজনে স্বাভাবিকভাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষ আভ্যন্তরীণ কৃষি-শিল্প বাণিজ্যের সংস্কারের সহিত আমদানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণে যতটা সাফল্যলাভ করিতে পারে, ততই তাহার ভবিষ্যতের হিসাবে মঙ্গল।

স্মরণ-রেণুর গন্ধে

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

শতেক কাজের ফাঁকে পাও যদি তবু অবসর—
নিতান্ত নির্জনে বসি' দক্ষিণের বাতায়ন খুলে,
সুদূর দিগন্তে চাহি' ফাগুনের গন্ধ-গানে ভুলে,
আমার কবিতাগুলি পড়ি' মোর মরণের পর
মনে মনে ভেবো শুধু তা'রে আমি করেছি অমর।
তখন আষাঢ় যদি ঘনাইয়া আসে আঁখি-কূলে,
প্রাণের প্রাণান্ত ভরি' সাগরের অধীরতা দুলে,
কবিতার খাতাখানি চেপে ধোরো বুকের উপর।

লেখনীর দিল প্রাণ, ছন্দ দিল যে তা'র ভাষায়,
সফলতা-সৌরভ যা'র বহে আজো মধু-সমীরণ,
কাতর মিনতি মূক-নয়নের অশ্রু-কুয়াশায়
আখরে আকার দিনু এ-ফাগুনে তাহারি কারণ।

বিফল-বসন্তে একা সেই স্বপ্নে সঙ্গোপনে বসি'
স্মরণ-রেণুর গন্ধে রচিলাম ক্ষুদ্র চতুর্দশী।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

তারকেশ্বর বক্সিদার গ্রেপ্তার হওয়ার পর Indian Republican Army-র চট্টগ্রাম শাখার বিপ্লবীদের দ্বারা সর্বসম্মতি ক্রমে নির্বাচিত হইলেন বিনোদ বর। দলের অন্যতম প্রধান কর্মী মহেন্দ্র চৌধুরীও গ্রেপ্তার হইলেন।

সূর্য সেন, তারকেশ্বর বক্সিদার ও কল্পনা দত্তকে লইয়া চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সংক্রান্ত তৃতীয় দফা মামলার বিচার আরম্ভ হইল ১৯৩৩ সালের ২৮শে জুন হইতে। জেলখানার নিকটবর্তী গোয়েন্দা কার্যালয়ের একটি কক্ষে অতিশয় সতর্কতার সহিত তাঁহাদের বিচার চলিতে লাগিল। এই বিচার কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য যে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইল —তাহাতে রহিলেন মি: W. Meeharpe, রজনী ঘোষ ও মজুমদার আলি তাহেব। আলিপুর কোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর রায় বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীশচন্দ্র রায়চৌধুরীর সহায়তায় সরকার পক্ষে মামলা পরিচালিত করিতে লাগিলেন। অভিযুক্তদের পক্ষে রহিলেন কৌঁসুলি মে. যোগেশ, বিনোদলাল সেন ও রজনী বিশ্বাস। সরকার পক্ষে প্রায় ৩২৫ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হয় এবং ইহা প্রমাণ করা হয় যে তারকেশ্বরই ইন্সপেক্টর শশাঙ্ক ভট্টাচার্যকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিচারে সূর্য সেন ও তারকেশ্বর বক্সিদার প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন—আর কল্পনা দত্তের হইল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড। এখানে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, দুই বৎসর কারারুদ্ধ রাখিবার পর শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ কল্পনা দত্তকে মুক্তিদান করিয়াছিলেন।

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া যখন সূর্য সেন ও তারকেশ্বর বক্সিদার চট্টগ্রাম জেলের Condemned cell-এর নির্জন প্রকোষ্ঠে তাঁহাদের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের অনুরাগী কয়েকজন যুবকের দ্বারা ১৯৩৪ সালের ৭ই জানুয়ারি পন্টন মাঠে আবার একটি আক্রমণ পরিচালনা স্থির হইল। দুইজন প্রিয় নেতার প্রতি প্রদত্ত ফাঁসির আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানই ছিল এই আক্রমণ পরিচালনার উদ্দেশ্য। পন্টন মাঠে সেদিন সেতাবগিরোর ক্রিকেট খেলা হইবার কথা ছিল, সুতরাং দর্শক হিসাবে সেদিন সাহেব-মেমের সংখ্যাও মাঠে কম হইবার কথা নহে। বিপ্লবীরা স্থির করিলেন যে দর্শকগণের বসিবার আসনের নিম্নে ডিনামাইট স্থাপন করিয়া ক্রীড়াদর্শনরত সব ইংরেজদিগকে বিস্ফোরণ ঘটাইয়া এক সঙ্গে উড়াইয়া দিবেন। এই উদ্দেশ্যে হিমাংশু ভট্টাচার্য, কৃষ্ণ চৌধুরী, হরেন্দ্র চক্রবর্তী ও নিত্যগোপাল ভট্টাচার্য নামক চারিজন তরুণ যুবক উক্ত দিবসে বিপ্লবের ডিনামাইট বসাইবার জন্য খেলার মাঠে গমন করেন ; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদিগকে খেলার মাঠে দেখিয়া তাঁহাদের প্রতি পুলিসের সন্দেহ হয় এবং উভয় বিপ্লবীদের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ বাধে। হিমাংশু ভট্টাচার্য ও নিত্যগোপাল ভট্টাচার্য প্রহরীদের গুলিতে প্রাণ হারাইলেন। ধরা পড়িলেন অবশিষ্ট দুইজন—হরেন্দ্র চক্রবর্তী ও কৃষ্ণ চৌধুরী। বিচারের পর পরবর্তীকালে তাঁহাদের দুইজনের ফাঁসি হইয়াছিল।

জেলের কর্তৃপক্ষ সূর্য সেনকে একখানি রামায়ণ দিয়াছিলেন—তাহাকে তিনি পরম আগ্রহভরে উহাই পাঠ করিতেন। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে সূর্য সেন ও তারকেশ্বর বক্সিদারের ফাঁসির তারিখ গোপন রাখা হইয়াছিল। কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা ছিল যে পূর্বাহ্নে ফাঁসির তারিখ প্রকাশ হইয়া গেলে শেষ পর্যন্ত আবার হয় তো কোন একটা গণ্ডগোল বাধিয়া যাইবে ; কিন্তু এত গোপনীয়তা অবলম্বন করা সত্ত্বেও তারিখটি প্রকাশ হইয়া পড়িল। ১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারি চট্টগ্রাম জেলের রাজনৈতিক বন্দীগণ জেল ওয়ার্ডারের নিকট হইতে গোপনে জানিতে পারিলেন যে উক্ত দিবসেই সূর্য সেন ও তারকেশ্বর বক্সিদারকে ফাঁসি দেওয়ার আয়োজন চলিতেছে। সূর্য সেনও ইহা জানিতে পারিয়া অন্যান্য বন্দীদের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন যে সেদিন সন্ধ্যার পর তিনি তাঁহাদের উদ্দেশে কিছু বলিবেন। এই খবর পাইয়া সকল বন্দীই চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

দিবসের শেষে পৃথিবীর বুকে সন্ধ্যা নামিয়া আসিল। সন্ধ্যার অল্প পরে দেখা সূর্য সেন ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পর তাঁহার প্রকোষ্ঠের লৌহদ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন। দুই হাত দিয়া লোহার গরাদগুলি ধরিয়া তিনি সর্বপ্রথম চীৎকার করিয়া উঠিলেন, —"বন্দেমাতরম্।" ঋষি বঙ্কিমের প্রচারিত মন্ত্র যেন সেদিন প্রাণময় হইয়া উঠিল। মুহূর্তের অপেক্ষা মাত্র। চট্টগ্রাম কারাগারের শত শত রাজবন্দী এতক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রিয় নেতার কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইবামাত্র তাঁহারা হইয়া উঠিলেন অধীর ও উদ্বেল। সূর্য সেনের আহ্বানে সাড়া দিয়া তাঁহারা মুহুর্মুহু "বন্দেমাতরম্" ধ্বনিতে কারাকক্ষ মুখর করিয়া তুলিলেন। প্রত্যেকটি রাজবন্দী যেন তড়িতাহত হইয়া সজাগ হইয়া উঠিলেন। জেলখানার স্বাভাবিক নিস্তব্ধতা রাজবন্দীদের কলরোলে টুটিয়া গেল।

কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশে সূর্য সেন যখন তাঁহার শেষ বক্তব্য নিবেদন করিতে সুরু করিলেন, তখন জেলখানা আবার নিস্তব্ধ হইল। সূর্য সেন বলিয়া চলিলেন,—"হে আমার প্রিয় বন্ধুগণ। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে আমি তোমাদিকে আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ইতিহাস বিপ্লবিগণ আমরা চট্টগ্রাম শাখার বিপ্লবিগণ আমরা সারা ভারতের স্বাধীনতাকামীদের বন্ধু ও সমগোত্রীয়। বিশেষ কোন অঞ্চল বা দল-এর সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি নিয়ে বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ পরিচালিত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যে অত্যাচারী বৈদেশিক শাসন-শক্তি অহরহ আমাদিগকে শোষণ

ক'রছে—সেই শাসন-ব্যবস্থার অবসান ঘটানোই আমাদের লক্ষ্য—আমাদের উদ্দেশ্য দরিদ্রদের বাঁচার ব্যবস্থা করা। যে বিদ্রোহের আগুন আমরা জ্বালিয়েছি—তোমরা তাকে নিভতে দিও না। জালিয়ান-ওয়ালাবাগের প্রতিবাদ আমরা লালাবাজারে দিয়েছি। তোমরা নিজেদের মধ্যে বিভেদ এনো না, দলাদলির সৃষ্টি ক'রে দেশের কাজ ভুলে যেয়ো না। ইতিহাস বিপ্লবিকদের আদর্শকে তোমরা সার্থক ক'রে তুলো—শেষ রক্তবিন্দুটি পর্যন্ত অকাতরে ঢেলে দিয়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জন ক'রো। স্বাধীন দেশে প্রতিষ্ঠিত ক'রো প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সেদিন আর তোমাদিগকে কেউ বিদ্রোহী ব'লবে না—তোমরাই হবে সেদিন জাতির সবচেয়ে বড়ো সেবক। আমাদের শুভেচ্ছা তোমাদের যাত্রাপথকে অমৃত ক'রবে। বন্ধুগণ, তোমরা সবাই বলো—বন্দেমাতরম্।"

শত শত বিপ্লবীকণ্ঠ পুনরায় চট্টগ্রাম জেলের কক্ষে কক্ষে "বন্দেমাতরম্" বলিয়া উচ্চকণ্ঠে সমগ্র জেলখানাকে কাঁপাইয়া তুলিল—জানালা-দরজার কপাটগুলি কম্পিত হইতে লাগিল সেই ধ্বনির ঝঙ্কারে। সূর্য্য সেনের পর তারকেশ্বরও তাঁহার প্রকোষ্ঠ হইতে বন্দীদের উদ্দেশে তাঁহার বক্তব্য নিবেদন করিলেন এবং তাহার পর গান গাহিতে সুরু করিলেন। জেলখানা তখন মিলিটারি কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে—জেলখানার বাহিরে কারফিউ অর্ডারপ্রাপ্ত নিস্তব্ধ চট্টগ্রাম নগর। বন্দীদের মুখে জোশান্ত শুনিয়া ও তাঁহাদের মধ্যে অসাধারণ চাঞ্চল্য দেখিয়া জেলখানার প্রতি কক্ষে মিলিটারিরা গিয়া প্রবেশ করিল এবং বন্দীদিগকে প্রহার করিতে লাগিল নির্দয়ভাবে। বহু বন্দী ইহার ফলে সাংঘাতিকভাবে আহত হইলেন। এত কাণ্ড করিয়াও কিন্তু বিপ্লবীদিগকে শায়েস্তা করা গেল না—জেলের কর্তৃপক্ষ অতিশয় অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন।

ফাঁসির আসামীদের সাধারণতঃ ভোর বেলাতেই ফাঁসি দেওয়া হয়; কিন্তু বন্দীদের মধ্যে চাঞ্চল্য উত্তরোত্তর যেরূপ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, তাহাতে ভোরবেলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে কর্তৃপক্ষ আর সাহস করিলেন না। মধ্য রাত্রেই দুইজন বিপ্লবী-নেতার জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া দিতে তাঁহারা উদ্যোগী হইলেন।

রাত্রির অন্ধকারে নিদ্রিত চট্টগ্রাম কারাগার। সশস্ত্র প্রহরীরা গভীর রাত্রিতে আসিয়া অতি সন্তর্পণে সূর্য্য সেন ও তারকেশ্বরের Condemned Cell-এর লৌহদ্বার উদ্ঘাটিত করিল। সূর্য্য সেন স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে শেষ পর্য্যন্ত বিপ্লবীর বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া আমরণ সংগ্রাম করিয়া মৃত্যু-বরণ করিবেন। তাই প্রহরীরা দ্বার উন্মুক্ত করা মাত্র তিনি ভীম বিক্রমে তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। সর্ব্বাগ্রে যে প্রহরীটি ছিল, সূর্য্য সেনের ঘুষির আঘাতে সে ধরাশায়ী হইল। তারকেশ্বরকে তাঁহার প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির করা হইলে তিনিও মাটারমার পূর্ব্বাহ্নেই অনুসরণ করিলেন। প্রহরীরাও নির্দ্দয়ভাবে তাঁহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিল।

তাঁহাদের প্রকোষ্ঠ হইতে ফাঁসিমঞ্চ অধিক দূরে নয়—প্রহার করিতে করিতে প্রহরীরা তাঁহাদিগকে টানিয়া লইয়া চলিল। সূর্য্য সেনকে এত প্রহার করা হইল যে, তাঁহার নাকের হাড় ও দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল—সমগ্র মুখমণ্ডল ও পরিচ্ছদ রক্তে রাঙা হইয়া উঠিল। তারকেশ্বরও গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। সেই অবস্থাতেই তাঁহারা চীৎকার করিতে লাগিলেন—"বন্দেমাতরম্", আর নিজ নিজ কক্ষ হইতে অন্যান্য বন্দীরাও চীৎকার করিতে লাগিলেন "বন্দেমাতরম্" বলিয়া।

সূর্য্য সেন শেষ পর্য্যন্ত সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিলেন। উন্মত্ত জেল-কর্তৃপক্ষ সে দিকে নজর দিলেন না। তাঁহারা সূর্য্য সেনের সংজ্ঞাহীন দেহটাই ফাঁসিমঞ্চে লইয়া গিয়া খাড়া করাইলেন এবং গলায় ফাঁসির রজ্জু পরাইয়া দিলেন। তারকেশ্বরের গলায়ও ফাঁসির রজ্জু পরাইয়া দেওয়া হইল। একই সময়ে একই সঙ্গে দুইজনের ফাঁসির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। রাত্রির অন্ধকারে চট্টগ্রামের জেলখানায় অতঃপর গুপ্ততম অপরাধের অনুষ্ঠান হইল। লোকচক্ষুর অগোচরে ভারতবর্ষের দুইজন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীর অনুষ্ঠানিকভাবে ফাঁসি হইয়া গেল। ফাঁসির পর যে তাঁহাদের শবদেহ কোথায় লইয়া যাওয়া হইল—তাহাও কেহ জানিতে পারিল না।

জেলের বন্দীরা সেদিন সারা রাত্রি ধরিয়াই প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

চট্টগ্রাম-বিপ্লবের ইহাই ইতিহাস।

১৯৩০ সালের আইন-অমান্য আন্দোলনের আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন সূর্য্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অঞ্চলে সশস্ত্র বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল, অন্যান্য বিপ্লবীদের দ্বারা তদ্রূপ বাংলার অন্যান্য স্থানে এবং ভারতবর্ষের আরও দুই-একটি স্থানে বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ অনুষ্ঠিত হইতেছিল। আইন-অমান্য ও বর্জ্জন আন্দোলন বেদিনীপুর জেলায় চলিতেছিল পুরা দমেই। উক্ত জেলার ঘাসপুর থানার অধীন চেতুয়া হাটে বিলাতি-বর্জ্জন আন্দোলন তীব্র হইয়া উঠিল এবং বিলাতি বস্ত্রের বহ্নুৎসবের ধুম পড়িয়া গেল। এই আন্দোলন দমনকল্পে ১৯৩০ সালের ৩রা জুন দারোগা ভোলানাথ ঘোষ তাঁহার একজন সহকারী ও জনকয়েক কনষ্টেবলকে সঙ্গে লইয়া চেতুয়া হাটে গমন করিলেন ও চারিজন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করিলেন। ধৃত চারিজন স্বেচ্ছাসেবকের মধ্যে ইটল অট্টাচার্য্য নামক জনৈক স্বেচ্ছাসেবককে দারোগা ভোলানাথ ঘোষ অতি সামান্য কারণে অপমান করিয়া সকলের সম্মুখেই প্রহার করিলেন। এই ঘটনায় উক্ত অঞ্চলে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হইল এবং কিয়ৎকাল পরে কয়েক শত লোকের এক ক্ষুব্ধ জনতা সমবেত হইয়া পুলিশদলকে আক্রমণ করিয়া প্রহার করিতে লাগিল। শেষ পর্য্যন্ত তাহারা দারোগা ভোলানাথ ঘোষ ও তাঁহার সহকারী অনিরুদ্ধ সামন্তকে ধরিয়া লইয়া গেল। অত্যধিক প্রহারের ফলে ভোলানাথ ঘোষের মৃত্যু হইলে তাঁহার লাশকে বিকৃত করিয়া সনাক্তকরণের সকল সম্ভাবনা নষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। অনিরুদ্ধ সামন্তের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মুণ্ডটি অগ্নিতে দগ্ধ করা হয় এবং শরীরের অবশিষ্টাংশ জলে ফেলিয়া দেওয়া হয়।

এই ঘটনার তদন্তের জন্য কাঁথির মহকুমা হাকিম ওয়াজেদ করিম সাহেব একদল সশস্ত্র পুলিশ লইয়া ৭ই জুন তারিখে কংসাবতী নদীর

ছাড়ে নিজী উপনীত হইলে নদীর অপর পারে হাজার হাজার লোক সমবেত হইল এবং বিদ্রোহ প্রকাশ করিয়া হাকিমকে ফিরিয়া যাইতে বলিল। হাকিম তাহাদের উপর গুলি বর্ষণের আদেশ দিলেন। জনতার উপর সশস্ত্র পুলিসবল নির্বিচারে গুলি চালাইতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে একটি-দুইটি নহে—চৌদ্দজন লোক গুলির আঘাতে প্রাণ হারাইল। এই বৃত্তান্ত প্রতিশোধ গ্রহণের দ্বারাই অত্যাচারের পরিসমাপ্তি ঘটিল না। চেতুয়া হাটের চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল ব্যাপিয়া জমলাধারদের উপর পুলিসী জুলুম এমনই তীব্র আকার ধারণ করিল যে সেখানকার অধিকাংশ লোকই ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া পলাইয়া যাইতে বাধ্য হইল। পেডি সাহেব ছিলেন এই সময় মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট।

মেদিনীপুরের একটি স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে চেতুয়া হাটের ঘটনার জন্য ২৭ ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করিয়া একটি মামলা রুজু করা হয়। এই ট্রাইবুনালে ছিলেন ২৪ পরগণার এডিশন্যাল জজ মিঃ লেথব্রিজ, রায় সাহেব সুরেশচন্দ্র সিংহ ও মহেন্দ্রনাথ দত্ত। বিচারে ১২ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও ৫ জনের দুই বৎসর হিসাবে কারাদণ্ড হয়। বাকী সকলে মুক্তিলাভ করেন।

কলিকাতার ইডেন লেনে ১৩নং গোপ লেনে বিনোদবিহারী রায় নামক জনৈক ভদ্রলোক বসবাস করিতেন। তাঁহাদের বাড়ীটি ছিল ২৫।১।১এর একটি কাচ্চা এবং মনমনসিংহের বিপ্লবীদের সহিত ইঁহাদের যোগাযোগ ছিল। এই বাটী হইতে মনোরমা ঘোষ এবং বিনোদবাবুর পুত্র বিনয়কৃষ্ণ বিস্ফোরক প্রস্তুতের উপকরণ কয়েক বোতল নাইট্রিক ও সালফিউরিক এসিড লইয়া ১৯০৮ সালের ৭ই আগষ্ট মনমনসিংহ যাত্রা করেন। তাহাকে কর নামক অপর একজন যুবকও পরে ইঁহাদের সহিত যোগদান করেন। পুলিশ কিন্তু কোনও ক্রমে ব্যাপারটি জানিতে পারিয়া মনমনসিংহের সরিষাবাড়ী থানায় সংবাদ পাঠাইয়া দেয় এবং ৯ই তারিখে ইহারা তথায়পৌঁছিলে পুলিশ তাঁহাদের তিনজনকে গ্রেপ্তার করিয়া সরিষাবাড়ী থানায় লইয়া যায়। কলিকাতায়ও এই ষড়যন্ত্রে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মিঃ গাসিক, লালবিহারী দাস ও রায় বাহাদুর নলিনীকান্ত বসুকে লইয়া গঠিত আলিপুরের এক স্পেশাল ট্রাইবুনালে ইঁহাদের বিচার আরম্ভ হয়। বিচারে তিনজনের পাঁচ বৎসর হিসাবে এবং দুইজনের তিন বৎসর হিসাবে কারাদণ্ড হইল। একজন বিচারে খালাস পাইলেন বটে, কিন্তু অভিনাল বলে তাঁহাকেও আটক রাখা হইল।

টেগার্ট সাহেবের উপর বিপ্লবীদের ঘৃণা ও ক্রোধ বহুদিন হইতেই পুঞ্জীভূত ছিল। বিপ্লবী গোপীনাথ সাহা ইতিপূর্বে টেগার্ট ভ্রমে অপর এক ব্যক্তিকে নিহত করিয়াছিলেন। ১৯০৮ সালে পুনরায় টেগার্ট সাহেবের জীবন-নাশের চেষ্টা হইল। ৭ই আগষ্ট অরিন্দে ঘোষ, দীনেশচন্দ্র মজুমদার, অনুজ সেনগুপ্ত এবং অপর একজন যুবক বোমা ও রিভলবার লইয়া ডালহৌসি স্কোয়ারে একটি মোটর গাড়ীতে অপেক্ষা করিতেছিলেন। বেলা আন্দাজ এগারোটা-সাড়ে এগারোটার সময় টেগার্ট সাহেবের গাড়ীটি যখন তাঁহাদের নিকট দিয়া যাইতেছিল, তখন তাঁহারা সেই গাড়ীর উপর বোমা নিক্ষেপ করিলেন। বোমা বিস্ফোরিত হইল বটে, কিন্তু টেগার্ট সাহেব রক্ষা পাইলেন। তখন দীনেশ ও অনুজ একদিকে এবং অপর যুবকটি আর একদিকে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন। হেয়ার ষ্ট্রীটে গিয়া দীনেশ ধরা পড়িলেন এবং পলায়নের উপায় নাই দেখিয়া অনুজ আত্মহত্যা করিলেন। অপর যুবকটি পলাইয়া যাইতে সমর্থ হইলেন।

অনুজ ছিলেন খুলনা জিলার দেমহাটি গ্রামের অধিবাসী—দীনেশের বাড়ী ছিল বসিরহাটে। মৃত হইবার পর দীনেশের নিকট হইতে এসুমিনিয়ামের খোলযুক্ত বোমা, রিভলবার ও কার্তুজ পাওয়া যায়। অনুজের শরীর তল্লাস করিয়াও পাওয়া যায় ঐ একই রকমের বোমা ও রিভলবার। পরে ইহা প্রমাণিত হয় যে তাঁহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত রিভলবার চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার হইতে লুণ্ঠিত অস্ত্র ছিল। দীনেশচন্দ্রের বিচার হয় একটি স্পেশাল ট্রাইবুনালে। ১৮ই সেপ্টেম্বর মামলার রায় প্রকাশিত হয় এবং তাহাতে তিনি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন।

ডালহৌসি স্কোয়ারের ঘটনার পর পুলিশ উক্ত তারিখেই কৈলাস বসু ষ্ট্রীটস্থ ডাঃ নারায়ণ রায়ের বাটী খানাতল্লাস করে এবং এই তল্লাসী কার্য্য কয়েক দিন যাবৎ কলিকাতার অন্যান্য স্থানেও চলিতে থাকে। সুরেন্দ্রনাথ বসুর বাসা তল্লাস করিয়া পুলিশ গান কটন, বিবিধ রাসায়নিক পদার্থ ও এসুমিনিয়ামের shell প্রাপ্ত হয়। আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে একটি স্পেশাল ট্রাইবুনালে ১৯০৮ সালের অক্টোবর মাসে ডাঃ নারায়ণ রায়, সুরেন্দ্র বসু, অম্বিকা রায়, ভূপাল বসু, রসিকলাল রায়, যতীশ ভৌমিক, অম্বেত বসু প্রভৃতিকে অভিযুক্ত করিয়া এই উপলক্ষে একটি মামলা রুজু করা হয়। ইঁহাদের কাহারও কাহারও নিকট হইতে যে কার্তুজ ও বোমা পাওয়া যায়—তাহা ডালহৌসি স্কোয়ারের ঘটনায় দীনেশচন্দ্র ও অনুজের নিকট হইতে প্রাপ্ত কার্তুজ ও বোমারই অনুরূপ ছিল বলিয়া এই মামলাকে ডালহৌসি স্কোয়ার বোমা ষড়যন্ত্র মামলা নামে অভিহিত করা হয়। স্পেশাল ট্রাইবুনাল দুইজনকে মুক্তি দিয়া অবশিষ্ট অভিযুক্তদের প্রতি কঠোর শাস্তি বিধান করেন। ট্রাইবুনালের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল হইলে ১৯০৯ সালের ২৭শে জুলাই হাইকোর্ট কর্তৃক এই মামলার শেষ বিচার নিষ্পত্তি হয়। হাইকোর্টের বিচারে আরও তিনজন খালাস পান এবং অবশিষ্ট সকলে দণ্ডিত হন। ডাঃ নারায়ণ রায় ও ভূপাল বসুর হয় ১০ বৎসর হিসাবে দ্বীপান্তর দণ্ড, সুরেন্দ্র বসুর ১২ বৎসরের জন্য কারাদণ্ড সহ দ্বীপান্তর দণ্ড এবং রোহিণী অধিকারী ও যতীশ ভৌমিকের যথাক্রমে পাঁচ ও দুই বৎসর হিসাবে কঠোর পরিশ্রমসহ কারাদণ্ড। জেল হাজতে অবস্থান কালে আসামীগণের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন করা হইয়াছিল।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত দীনেশচন্দ্র মজুমদার যখন মেদিনীপুর জেলে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন কোনও ক্রমে তিনি জেলখানা হইতে পলায়ন করেন। দ্বিতীয়বার বন্দীনিবাস হইতে পলিনী

দাস ও অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ও পলায়ন করিতে সমর্থ হন। তাঁহারা তিনজনে নিরুদ্দিষ্ট অবস্থায় কলিকাতার কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে "চিত্রা" সিনেমার বিপরীত দিকের একটি বাটীতে অবস্থান করিতে থাকেন। ১৯০৩ সালের মার্চমাসি সময়ে পুলিশ কোনও মতে সংবাদ পাইয়া উক্ত বাড়ীটি ঘেরাও করিয়া ফেলে এবং তাহার ফলে বিপ্লবীদের সহিত তাহাদের এক সংঘর্ষ বাধিয়া যায়। উভয়পক্ষ হইতেই গুলি বর্ষণ চলিতে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত তিনজনেই ধৃত হইলেন। তাঁহাদিগকে পুনরায় অভিযুক্ত করিয়া যে মামলা হইল—তাহাতে দীনেশচন্দ্র প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন, অবশিষ্ট দুইজনের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ হইল।

ডালহৌসি স্কোয়ার ঘটনার কয়েকদিন পরেই ঢাকাতেও একটি ঘটনা ঘটিল। নারায়ণগঞ্জের জল-পুলিশের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এইচ্. এ. এস. বাট অসুস্থ হইয়া ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালে অবস্থান করিতেছিলেন। ১৯০৩ সালের ২৯শে আগষ্ট সকালের দিকে বাঙ্গালার তৎকালীন ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ মিঃ এফ্. সি. লোম্যান এবং ঢাকার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিশ মিঃ ই. হডসন হাসপাতালে গিয়াছিলেন তাঁহাকে দেখিবার জন্য। মিঃ বাটকে দেখিয়া তাঁহারা যখন বাহিরে আসিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের উপর অতর্কিত আততায়ী গুলিবর্ষণ করিলেন। প্রথমে আহত হইলেন মিঃ হডসন—তাঁহার কোমরে বিদ্ধ হইল রিভলবারের গুলি; কিন্তু মিঃ লোম্যান যে আঘাত পাইলেন—তাহাই অধিকতর মারাত্মক হইল; কারণ গুলি তাঁহার মেরুদণ্ড ভেদ করিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

যুদ্ধোত্তর বার্লিনে এক সপ্তাহ

ডক্টর সুবোধ মিত্র

১০ই জুলাই বার্লিনের 'গাটো' বিমানঘাঁটিতে পৌঁছলাম। ইচ্ছা ছিল ট্রেনে ক'রে জার্ম্মানীর অন্যান্য সহরগুলো দেখ্‌তে দেখ্‌তে বার্লিনে যাব, কিন্তু রাশিয়ার অবরোধের (blockade) জন্য বার্লিনে ট্রেনে যাতায়াতের সুবিধা নেই। গত এক বৎসর ধরে রাশিয়া তার অধিকৃত জার্ম্মান-সীমানার ভিতর দিয়ে কাউকে প্রবেশ করতে দেয় নাই; সেইজন্য বার্লিনে যাতায়াতের এবং জিনিষপত্র সরবরাহের ভীষণ অসুবিধা ঘটে, কেন না বার্লিনের চারদিকেই রাশিয়ার অধিকৃত এলাকা। একমাত্র খোলা ছিল আকাশপথ এবং সেই পথ দিয়েই ব্রাডেনবুর্গ এবং ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে প্রতি ৩ মিনিট অন্তর দিনে এবং রাত্রে সমান ভাবে ব্রিটিশ এবং আমেরিকান বিমানগুলি এতদিন আহার্য্য এবং অন্যান্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি—এমন কি কয়লা পর্য্যন্ত সরবরাহ ক'রে এসেছে। গত কয়েক সপ্তাহ হ'ল রাশিয়া অবরোধ উঠিয়ে নিয়েছে বটে কিন্তু এখনও সহজভাবে যানবাহনের চলাচলের ব্যবস্থা হয় নাই।

বিমানঘাঁটী থেকে বার্লিন সহর প্রায় ১৫ মাইল। পাইন বনের ভিতর দিয়ে সুন্দর রাস্তা। আশে পাশে বেশী ঘর বাড়ী নেই। মাঝে মাঝে দু'টী সেতু ছিল; যুদ্ধের সময় বোমার সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে; বড় বড় ইস্পাতের কড়িগুলি যেন জুর মত পাকিয়ে পড়ে রয়েছে। তাই পাশে নির্ম্মিত অস্থায়ী সেতুর ওপর দিয়ে আমাদের মোটর যায় এল।

বিখ্যাত ব্রাণ্ডেনবুর্গ তোরণ এবং Unter Den Linden রাজপথ—(যুদ্ধ-পূর্ব অবস্থা)

বিখ্যাত Kurfurstendam রাস্তার শেষ ভাগে 'এয়ার টারমিনাস' অফিস। এই এয়ার অফিসটী নূতন করে তৈরী করা হয়েছে কেননা Kurfurstendam রাস্তার একখানা বাড়ীও অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে নেই। বেশীর ভাগই জঞ্জালের স্তূপ; সামান্য কয়েকখানা বাড়ীর বাইরের

খোলস খানিকটা রয়েছে. ভিতরকার সবটাই ভেঙে পড়েছে অথবা পুড়ে সাফ হ'য়ে গেছে। প্রথম যুদ্ধের পর ১৯২১ সালেও এই Kurfurstendam দেখেছি, তখনও রাস্তায় বেশী আলোর রোশনাই ছিল না এবং যানবাহনও বেশী চলাচল করত না বটে, কিন্তু প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন রাস্তার

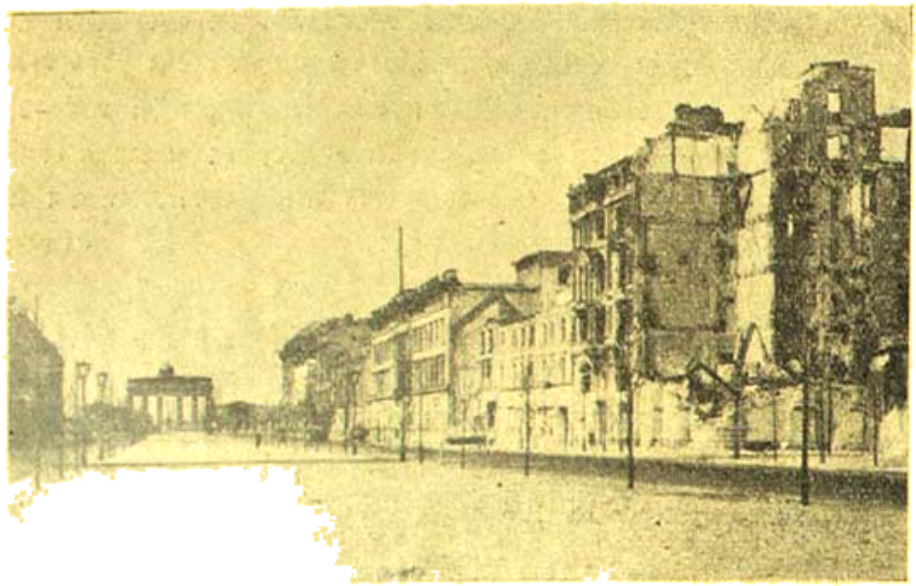

Kurfurstendam এবং Unter Den Linden রাজপথের—(যুদ্ধোত্তর অবস্থা)

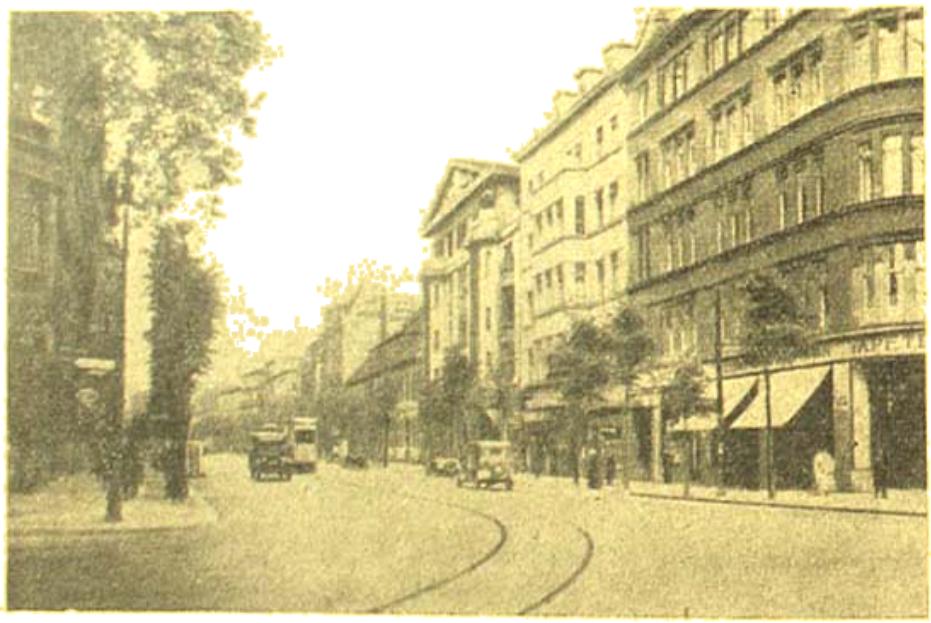

Unter Den Linden রাজপথের অপরাংশ—(যুদ্ধ-পূর্ব অবস্থা)

উপর একচাঁচে ঢালা অগণিত বিরাট প্রাসাদোপম বাড়ীগুলির দিকে তাকালে মনে হত—এরা সহরকে সুন্দর করে গড়তে অর্থ এবং কারুকার্য্যের কোনটারই কার্পণ্য করে নি। এর ৮ বৎসর পরে অর্থাৎ হিট্‌লারের রাজত্বের কিছু পূর্ব্বেও এই Kurfurstendam আবার দেখেছি। তখন সর্ব্বক্ষণই যেন বেওয়ারীর উৎসব ; অগণিত কাফে রেস্তোঁ, সিনেমা, থিয়েটর এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট রাস্তায় Kurfurstendam জমজমাট করত। আজ সেই রাস্তায় শুধু ধ্বংসের স্তূপ ছাড়া আর কিছুই নেই।

আমার থাকবার বন্দোবস্ত হয়েছিল Bristol Hotelএ। পূর্ব্বে এই Bristol Hotel ছিল Unter den Linden রাজপথের উপর প্রসিদ্ধ Brandenburg তোরণের কাছে। সহরের এই অংশটি এখন রাশিয়ানদের ভাগে পড়েছে এবং হোটেলটি বোমা বিধ্বস্ত হওয়াতে মালিক অদূরে Grunewald উদ্যানের ভিতর একটী ছোট হোটেল করেছেন। দূতাবাস এবং কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ফন্ ডালেরুপ আমার বার্লিন প্রবাসের ভার নিয়েছিলেন। তিনি আমাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে গেলেন এবং কি ভাবে এখানে চলাফেরা করতে হবে সে সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু পরামর্শ দিয়ে গেলেন। তখন বেলা সাড়ে ৩টা হবে ; জিনিষপত্র কিছু কিছু গুছিয়ে রেখে হাত মুখ ধুয়ে বেরিয়ে পড়লাম সহর দেখবার জন্য এবং সুবিধামত কোথাও যথাসময়ে ভোজন সেরে নিতে। যে রাস্তা দিয়েই যাই ওই Kurfurstendamএর মত একই অবস্থা, শুধু ভাঙ্গা বাড়ী আর ধ্বংস স্তূপ। যতদূর চোখ যায় একখানাও আস্ত বাড়ী দেখতে পাওয়া যায় না ; Kant, Street Joach imthaler street, Alexander Plats প্রমুখ সমস্ত বিশিষ্ট রাস্তাগুলিরই ওই একই অবস্থা। চলাচলের সুবিধার জন্য বার্লিন সহরের ভিতর দিয়ে বৈদ্যুতিক ট্রেন চলে—তাকে বলে stadtbahn ; এই ট্রেনের ষ্টেশনগুলি যথা, Charlotenburg, Friedrichstramse Bahnhof, Zoologische Garten Bahnhof, যারা বার্লিনে গিয়েছেন তাদের সকলেরই

পরিচিত। ষ্টেশনগুলি যদিও বোমায় বিধ্বস্ত হয়েছিল, কিন্তু এখন ট্রেন চলাচল আবার সুরু হয়েছে। সহরের এই ট্রেন transport সবটাই রাশিয়ার অধিকারে। আজকের বার্লিন সহর দেখে কেবলই মনে পড়ছিল নেপল্‌সের পম্পাই সহরের কথা। তবে তফাৎ এই যে একটা হচ্ছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, আর অন্যটি হচ্ছে বিজ্ঞানের অভিনব সৃষ্টির নিষ্ঠুর অবদান। ঘুরতে ঘুরতে Zoologische Garten ষ্টেশনের সামনে একটা খোলা রেস্তোঁতে মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করে নিলাম। খাবার বেশ ভালই। আলু, কপি এবং বড় এক টুকরা ভাজা মাংস থাকে এরা বলে Schnitzel ; দাম পড়ল আমাদের টাকায় ৩৲ টাকা। লণ্ডনেও এই খাবার এর চাইতে কিছু সস্তায় পাওয়া যেত না।

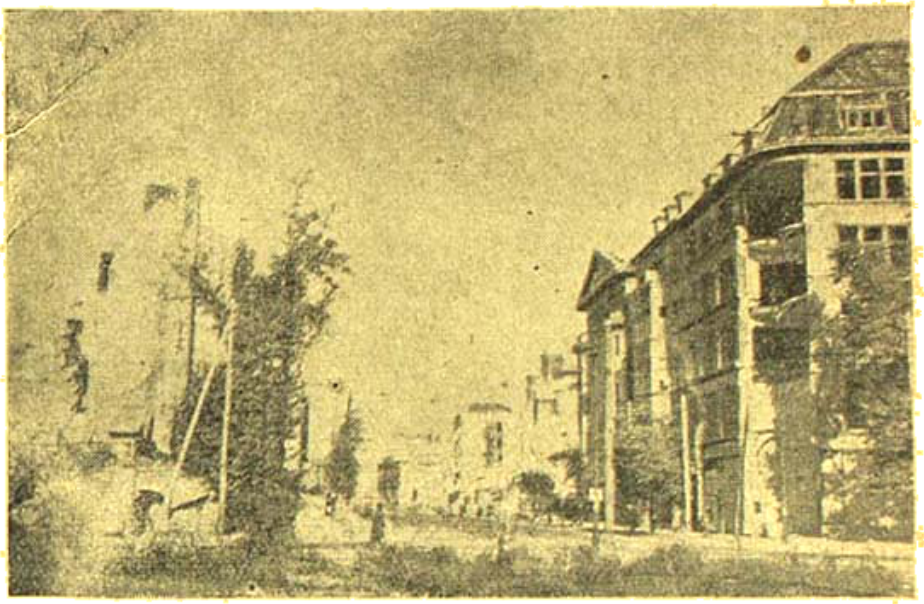

Unter Den Linden রাজপথের অপরাংশ—(যুদ্ধোত্তর অবস্থা)

বার্লিন সহরের একটি বোমার এবং বৈদ্যুতিক ট্রেন ষ্টেশন—(যুদ্ধ-পূর্ব অবস্থা)

কিকেলে মিঃ ভন্ ডালেরপের বাড়ীতে চা খাবার নিমন্ত্রণ ছিল। এঁর বাড়ীখানি বড় রাস্তা থেকে একটু দূরে, তাই বোমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিল। অবশ্য দূরের বাড়ীগুলি সবই যে বেঁচে গেছে তা নয়। মিঃ ডালেরপ বললেন—যে বার্লিনের শতকরা ৭০খানা বাড়ী বোমার আঘাতে ধ্বংস হয়েছে। বহু লোক সহর ছেড়ে অন্যত্র যেতে বাধ্য হয়েছে এবং যারা এখানে রয়ে গেছে তাদেরও বেশ কষ্ট করে থাকতে হচ্ছে। মিঃ ডালেরপের একজন সহকর্মী ইঞ্জিনিয়ার ও তাঁর স্ত্রী মাত্র ১২ ফুট চওড়া এবং ১২ ফুট লম্বা একখানা ঘরে থাকেন। সেখানেই শুতে হয়, বসতে হয়, রান্না করে খেতে হয় এবং বাসনও মেজে নিতে হয়। এমনও দেখা যায় যে স্বামের অসুস্থতার জন্য স্বামী স্ত্রী দুজনে বার্লিনে থাকলেও স্ত্রীকে অন্য সহরে বাস করতে হচ্ছে।

গত যুদ্ধ শেষ হ'বার অব্যবহিত পরেই জার্মানী এবং অষ্ট্রিয়া ৪ ভাগে বিভক্ত হ'য়ে ইলেও, আমেরিকা, ফ্রান্স এবং রাশিয়ার মিলিটারী গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে শাসিত হচ্ছে ; বার্লিন এবং ভিয়ানা সহরও ৪ ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। বার্লিনের যে অংশ রাশিয়ার অধিকারে রয়েছে তার সঙ্গে বাকী ৩ ভাগের সম্বন্ধ খুবই কম। অবরোধের (blockade) সময় ৪ কোন সম্বন্ধই ছিল না। বর্ত্তমানে রাশিয়ার অংশকে East block এবং বাকী তিন অংশকে west block বলা হয়ে থাকে। রাশিয়ানদের ব্যবহৃত বাকী অংশ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ; এমন কি এই অংশের টাকাও পৃথক্। জার্মানদের টাকাকে মার্ক (Mark) বলে। রাশিয়ানদের অংশে যে টাকা ব্যবহৃত হয় তাকে বলে East Mark, অন্য অংশের টাকাকে বলে West Mark ; মূল্যেরও যথেষ্ট পার্থক্য আছে ; যেমন একটী West Mark এর মূল্য ৩টী East Mark এর সমান। এটি হয়েছে

প্রভৃতি West Mark আমেরিকান ডলার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে বলে।

বার্লিনের এই দুই অংশের ভিতর স্বাভাবিক ভাবে চলাফেরা করা কিংবা টেলিফোনে যোগ রাখা একেবারে অসম্ভব। টাকার দাম যে শুধুমাত্র বেশী তা নয়, এক অংশের টাকা অন্য অংশে অচল।

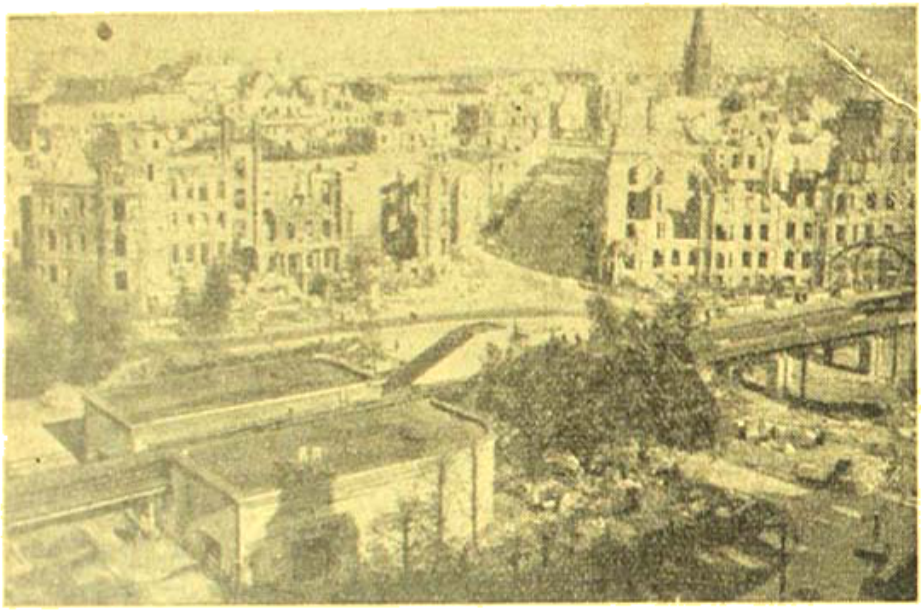

বার্লিন শহরের একটি খোলার এবং ইষ্টোরিক ট্রেন ষ্টেশন—(যুদ্ধোত্তর অবস্থা)

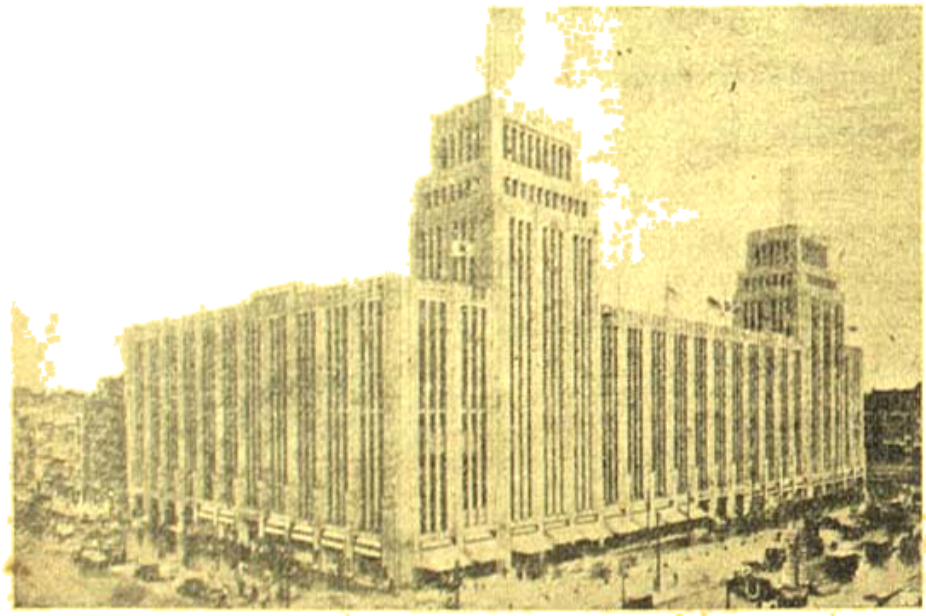

বার্লিনে সুপ্রসিদ্ধ ডিপার্ট মেণ্টাল ষ্টোর (Warenhous)—(যুদ্ধ-পূর্ব অবস্থা)

ব্রাণ্ডিনবার্গের অধিকৃত অংশে কি ভাবে যে আর্থানরা জীবন যাপন করে—সে সম্বন্ধে খুব কমই জানা যায়; এ অংশটা যেন একখানা লোহার পরদা (Iron curtain) দিয়ে আচ্ছাদিত করে রাখা হয়েছে। তবে একটু আধটু যেটুকু খবর ছিটকে আসে, তা থেকে বোঝা যায় যে স্বাধীন জীবন যাপন করা সুদূরের কথা, সাধারণ জীবন যাপনও অনেক সময় দুর্লভ হয়ে ওঠে। এই মুহূর্তে যে লোকটি সাধারণভাবে কাজ কর্ম করে যাচ্ছে—পরমুহূর্তে তার যে কি অবস্থা হবে, কোথায় তার ডাক পড়বে, এবং সেই ডাকের ইঙ্গিত যে কি, তা ছরূহ এবং অনিশ্চিত। দুঃখ কষ্ট মানুষকে বহু অবস্থায় সহ্য করতে হয়, কিন্তু সেই দুঃখ কষ্টের পেছনে যদি একটা অনিশ্চয়তা থাকে তা'হলে সেটা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। এই হচ্ছে ব্রাণ্ডিনবার্গ অধিকৃত বর্ত্তমান বার্লিনের অবস্থা।

বার্লিনের বড় বড় হাসপাতাল-গুলি ব্রাণ্ডিনবার্গ অংশে পড়েছে। আমার অনুমতিপত্র ছিল শুধু ব্রিটিশ ও আমেরিকান অংশে যাবার জন্য। আমি যখন ব্রাণ্ডিনবার্গ অংশের হাসপাতাল দেখতে যাই, তখন এই অংশের জার্মানরা খুব শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। অনেকে অনেক রকম পরামর্শ দিলেন। ক্যামেরা কিছুতেই সঙ্গে নেবে না, বিদেশী টাকা পয়সা সঙ্গে রাখবে না ইত্যাদি। ট্যাক্সিওয়ালাকে যখন বললাম যে ব্রাণ্ডিনবার্গ অংশের হাসপাতালে যেতে হবে, প্রথমটায় সে রাজী হল না, শেষে বেশী পয়সার লোভ দেখাতে রাজী হ'ল। ব্রাণ্ডিনবার্গ সীমানার পৌঁছে তার চেহারা সত্যিই লোভনীয় হয়ে উঠেছিল। এর অবস্থাটা কতকটা অনুমান করা যায় আমাদের তৎকালীন হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার পর কোনও শিখ্ ট্যাক্সিওয়ালাকে পার্ক সার্কাসে সন্ধ্যার সময় যেতে হলে তার যেরকম মুখের অবস্থা হয় সেই রকম ভাব। আমার অবশ্য ব্রাণ্ডিনবার্গ অংশে যোরাফেরা করতে কোনই অসুবিধা হয় নাই। শেষকালটায় সাহস এত বেড়ে গিয়েছিল যে ক্যামেরা নিয়ে নিয়ে আমার বন্ধু প্রফেসর ডাঃ ষ্টিকেলের ছবিও তুলে নিয়ে এলাম। এই অশীতি বৎসরের বৃদ্ধ প্রফেসরের নিকট থেকে ছাত্রাবস্থায় বহু জিনিষ শিখে-ছিলাম; নিজে হাতে করে কত অস্ত্রোপচারই না শিখিয়েছিলেন। ২৩

বৎসর পূর্ব্বে তিনি এই হাসপাতালের ডিরেক্টর ছিলেন এবং আজও এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে সেই কাজই করে যেতে হচ্ছে—তবে তফাৎ এই যে তখনকার ডিরেক্টর ছিলেন ইউনিভার্সিটি ক্লিনিকের সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন কর্ণধার, যাঁর পশ্চাতে অন্ততঃ ২৫ জন ডাক্তার প্রত্যহ সারি দিয়ে চলতেন ! আর, বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ডিরেক্টর হ'চ্ছেন রাশিয়ার নিয়ন্ত্রিত কর্ম্মধারার একজন সাধারণ তাঁবেদার মাত্র। ডাঃ ষ্টীফেলের কোনও বিশেষ রাজনৈতিক মুষ্টি-ভঙ্গি ছিল না, তাই তাঁর চাকরিটী বজায় আছে, যদিওতাঁর আনুষঙ্গিক আভিজাত্য কিছুই নেই। এই বৃদ্ধ প্রফেসর আজ সর্ব্বহারা। যুদ্ধের সময় তাঁর ঘর বাড়ী এবং যাবতীয় মূল্যবান জিনিষপত্র ধ্বংস হ'য়ে গেছে। এখন অতি সাধারণ একখানা ঘরে থাকেন; ২টী উপযুক্ত ছেলে ছিল, একজন যুদ্ধে নিহত এবং অপরটী রাশিয়ায় বন্দী হয়ে বহু বৎসর নিরুদ্দেশ। খুব সম্ভব জীবিত নেই; একটী মেয়ে, তাঁর স্বামী যুদ্ধে নিহত হ'বার পর পুনরায় বিবাহ করে অন্য সহরে বাস কচ্ছেন। এই বৃদ্ধ বয়সে প্রফেসর একেবারে নিঃসঙ্গ হ'য়ে প্রাণহীন যন্ত্রের মত দৈনন্দিন কাজগুলো করে যাচ্ছেন। অন্যান্য যে কয়জন প্রফেসর এখনও জীবিত রয়েছেন তাঁদের জীবনধারাও কম বেশী ওই একইরকমের। অর্থনৈতিক দৈন্যই সর্ব্বাগ্রে প্রকাশ পায়। সেই জার্ম্মান প্রকৃতিগত অহমিকা চূর্ণ হয়ে গেছে, স্ফূর্ত্তি নেই, কোনও রকমে দিনগত পাপক্ষয় করে যাওয়া।

অল্পবয়স্ক ডাক্তারের দল বেশীর ভাগই বার্লিনের রাশিয়ান অংশ থেকে চলে এসেছে; ফলে হয়েছে এই যে ব্রিটিশ আমেরিকান অংশে ডাক্তারের প্রাচুর্য্য খুবই বেশী এবং সেই হেতু তাদের আর্থিক দুরবস্থাও যথেষ্ট।

বার্লিনের মেডিকেল কলেজে বহু ছাত্র দেখলাম। একটু আশ্চর্য্যও লাগল। যুদ্ধের পর এত ছাত্র কী করে মেডিকেল কলেজে পড়তে এল? অনুসন্ধান করে জানলাম যে এর বেশীর ভাগ ছাত্র যুদ্ধের সময়ই মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হ'য়েছিল। যুদ্ধের সময় জার্ম্মানীতে নিয়ম হয়েছিল যে যারা মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হবে তাদের শুধু ছুটীর সময়েই যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হবে। কলেজে যখন পড়াশুনা চলবে, তখন ছাত্রেরা সহরেই থাকবে, যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হবে না। তাই বহু জার্ম্মান যুবক এই সুযোগ নিয়ে মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে অন্ততঃ কয়েক বছরের জন্য রেহাই পেতে। সেই সব ছাত্রদের ভিতর যারা জীবিত আছে তারাই এখন ডাক্তারী শিক্ষা শেষ কচ্ছে। (আগামী বারে সমাপ্য)

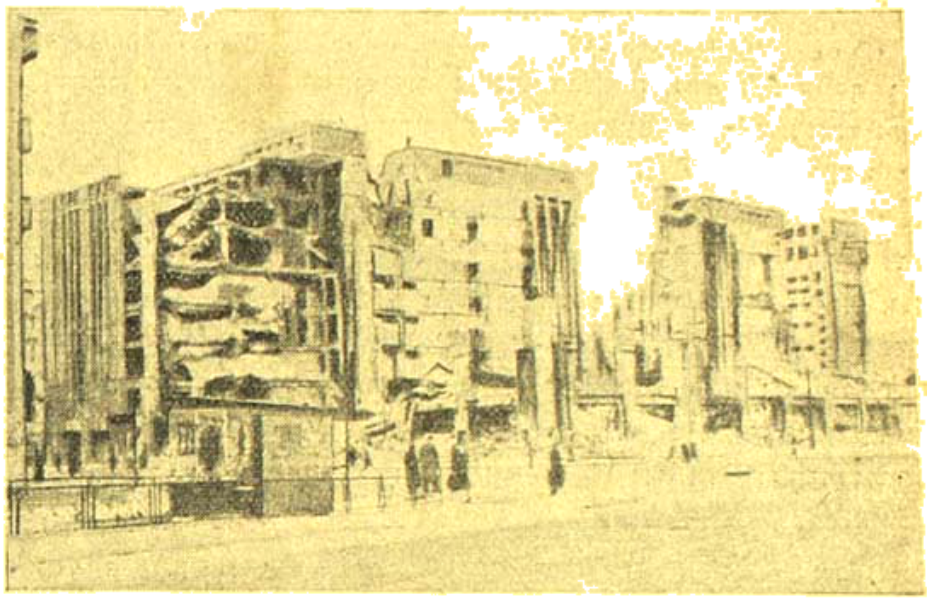

বার্লিনে সুপ্রসিদ্ধ ডিপার্টমেণ্টাল ষ্টোর (Warenhouse)—(যুদ্ধোত্তর অবস্থা)

তথাগতের পথে

নরেন্দ্র দেব

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

হঠাৎ কেদার বেরি এগারটার ট্রেণে রাজগীরে এসে নেমেছেন প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী-সহধর্মিণী শ্রীমতী তমলা দেবী। আমরা সপ্তপর্ণীর ছায়াশীতল পথে হাত তুলে সকাতরে ঊর্ধ্বের অবাধ্য অভিযান থামিয়ে তাঁদের আবেগ-বিহ্বল আমাদের কুটীর আশ্রয়ে গ্রহণ করবার জন্য। কারণ রাজগীরে কোথাও আমার ও বান্ধবদের বসবার স্থান নেই। সুনীতিবাবুর সঙ্গে আলাপ করবেন না, কিন্তু যৌবাদ্ সবার বিরুদ্ধে—এ [illegible] বাবার বাড়ীতে বেশ, আমরাই তাঁদের মুহূর্তের অতিথি [illegible] এই রাজগীরের মাইল মাইলের মধ্যেই 'বৈভক' [illegible] পাহাড়ের চড়িয়ার মধ্যেই থাকে। অগত্যা

শ্রীমতী সাধনলতার ক্যামেরা—কৃষ্ণকলি তৃতীয়

টুপ ক'রে নেবেন। শুধু একবার সন্ধ্যাকে জিজ্ঞাসা করবেন মধ্যাহ্নের সেবাদির ব্যবস্থা—ওঁরা বলবেন—সব ঠিক আছে। কোথায় উঠবেন? এ প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা আঙুল দিয়ে অদূরে রেখাবতীদেবীর বাবুর বাড়ী 'বৈভেক-ভবন' দেখিয়ে দিলেন।

সন্ধ্যায় তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে 'বীরেন্দ্র ভবনে' গিয়ে শুনলুম তাঁরা এখানে এসে একটু ঘুমিয়ে পড়েছেন। বাড়ীর মালিক রেখাবতীদেবীর স্বামী তাঁদের পাটনা থেকে পত্র দিয়ে পাঠিয়েছেন ম্যানেজারের কাছে অবশ্য তাঁর ম্যানেজার বাড়ীতে অনুপস্থিত। ঐ সময় রাজগীরের নিকটস্থ "পাণ্ডারাজপুরীতে" ভৈরবের বিরাট মেলা বসেছিল। ভৈরব তীর্থঙ্কর মহাবীরের আবির্ভাব না তিরোভাব সঠিক কি একটা উৎসব। সেখানের সমস্ত জৈন সাতদিন ধরে সেখানেই বসবাস করছেন। 'বীরেন্দ্র ভবনে' আমাদের সঙ্গে যেসব পরিচিত সেই কালিবাবু ও কেদারবাবু ছিলেন, তাঁরা সস্ত্রীক একজন বাঙালীকে বিদেশে বিপন্ন হয়ে পড়তে দেখে মানবতার দিক থেকে যেটুকু সাহায্য করা কর্তব্য তা করেছিলেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ঐ পণ্ডিত মানুষটির কোনও পরিচয়ই তাঁরা জানতেন না। সন্ধ্যায় আমাদের ও-বাড়ীতে আসতে দেখে তাঁরা খুব খুশী হয়েই নীচের নেমে এলেন। তারপর যখন আমাদের মুখে শুনলেন যে আমরা এসেছি ঐ মহাগুণ ব্যক্তিটীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে। আমাদের কাছে তাঁদের পরিচয় পেয়ে কালিবাবু ও কেদারবাবু তখন দুঃখিত ও লজ্জিত হ'য়ে পড়লেন ওঁদের যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে ও আদর যত্ন ক'রতে পারেননি বলে। যাই হোক, তাঁরা তৎক্ষণাৎ রাত্রের জন্য একখানি খাটিয়া ও একটি হ্যারিকেন লণ্ঠনের ব্যবস্থা করে দিলেন, আমরাও একখানি খাটিয়া, একটি বালতি ও একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাঠালুম। সপ্তপর্ণীর একটা অংশ তখন খালি পড়েছিল। রেখাবতীদেবীর বাড়ীর নীচের তলার ঘরগুলি কেন ব্যবহারযোগ্য নয় বলে আমরা ওঁদের কষ্ট হবে ভেবে আমাদের সপ্তপর্ণীতে চলে আসবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করলুম। যৌবাদ্ কিন্তু সম্মত হলেন না। বললেন—একটা রাত্রি তো কোনক্রমে বুঝে কেটে যাবে—কাল সকালে এঁকে নিয়ে আমাদের ছোড়দার কাছে চলে যাবো।

ওঁর ছোড়দা হ'লেন রাজগীরের সর্বজনপ্রিয় একটি সাধু পুরুষ। তিনি গৃহী সন্ন্যাসী—ওখানে 'বাগপ্রস্থী বাবা' নামে খ্যাত। আরও একজন গৃহী সন্ন্যাসীও ওখানে থাকেন, তিনি ঘোরতর তান্ত্রিক। সর্বদাই রক্তাম্বরে ভূষিত হ'য়ে থাকেন। তাই ওখানকার সবাই তাঁকে 'লালবাবা' বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু, কমলা দেবীর ছোড়দা 'বাগপ্রস্থী-বাবার' কোনও বেশভূষার ভক্তাধী নেই! যাই হোক, ছোড়দার আশ্রমে কিন্তু ওঁদের যাওয়া হ'ল না। কেদার ও কালী ওঁদের কিছুতেই ছাড়লেন না। অন্ততঃ রেখাবতীদেবীর ম্যানেজার না-ফেরা পর্যন্ত ওঁদের তাঁরা কিছুতেই ছেড়ে যেতে দেবেন না বলায় এবং ওখানে আমাদের থাকার সর্বপ্রকার সুব্যবস্থা ক'রে দেওয়ায় ওঁরাও রয়ে গেলেন। কেদারবাবু ও কালীবাবু পরদিন প্রাতরাশে সুনীতিবাবুকে এবং আমাকে সস্ত্রীক চায়ের নিমন্ত্রণ করলেন। সেদিন সন্ধ্যায় ওঁদের আতিথ্যে পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে অনেকক্ষণ নানা গল্প-গুজব ক'রে আমরা ফিরে এলুম।

পরদিন সকালে চায়ের নিমন্ত্রণে গিয়ে দেখি—ওরে বাবা!

সেকি সকালের চা? সন্দেশ লেডিকেনি ছানুরা কচুরি নিমকি চাটনি আচার চিঁড়েভাজা ডালমুট পাঁপর-সে হরে-কর-কম্মা! আমি 'চা-পাত্তা' নই, কাজেই সর্বপ্রকার খাদ্যদ্রব্যেরই সদ্ব্যবহার করলুম। রাজগীরের মতো এক গণ্ডগ্রামে এত সব সৌখীন রসনাবন্ধ মোদক কোথায় গেলেন জানবার কৌতূহল হওয়ায় শোনা গেল কালিবাবুটি নাকি এক মস্ত গুণী। তিনি জলযোগের যাদুকরের মতো নিজের হাতে একাই এ সব তৈরী ক'রেছেন! বললুম—বস্ত আপনি। অন্য কিছু না ক'রেও যদি আপনাদের বড়বাজারে একখানা খাবারের দোকান করেন, তাহ'লে দুদিনে মারিক খোকে দেশত্যাগী ক'রে দিতে পারবেন।

চা ও জলখাবারের পালা শেষ ক'রে নানা আলোচনার পর যখন উঠতে যাবো—কেদারবাবু বললেন—একটু কষ্ট করে একমিনিট বসতে হবে দাদা—আমার ক্যামেরার সামনে। অগত্যা আমরা সবাই মিলে বীরেন্দ্র-তনয়ের ছিমছাম গাড়ীখানায় বেরিয়ে বসলুম। কেদারবাবু তাঁর অটোমেটিক ক্যামেরায় আমাদের সকলের একটি 'গ্রুপ' ফটো নিলেন। যাত্রা ফিরতে আমাদের ১১টা বেজে গেল। প্রবাসে একটি প্রভাতের সুখস্মৃতির অভিজ্ঞান স্বরূপ কেদারবাবু সেই ছবি এক একখানি আমাদের উপহার দিয়েছিলেন। সুনীতিবাবুরা ওখানে থাকতে থাকতেই রামপথী বাবার আশ্রমে মহাসমারোহে ৺কালীপূজা হ'ল। সুনীতিবাবু ও কমলা দেবীর সঙ্গে আমরাও দীপান্বিতা অমাবস্যার অর্ধেক নিশা প্রায় ওখানেই কাটিয়ে এলুম। সুনীতিবাবুর নানা অভিজ্ঞতাপূর্ণ বহু বিচিত্র ও চিত্তাকর্ষক গল্প শুনে এবং চাটনীর মত উপাদেয় ও মুখরোচক পরচর্চা ক'রে চা-জলখাবারের সঙ্গে আমাদের বিদেশে দু'চারটা দিন বেশ উপভোগ্য হ'য়ে উঠেছিল, হঠাৎ সুনীতিবাবু দিল্লী থেকে তাঁর মেয়ে জামাইয়ের এক জরুরী তার পেয়ে দিল্লী চলে গেলেন। আমাদের কাছে রাজগীর আবার নীরস একঘেয়ে হয়ে উঠলো। আলাপ আলোচনার মর্ম ও আস্বাদ গ্রহণ করে, এমন বেশ তারিয়ে গল্পরস করার সুখ পাওয়া যায় যার সঙ্গে—এমন মানুষ আজকের দিনে আমাদের দেশে ক্রমশঃই দুর্লভ হ'য়ে উঠছে। আহারে যেমন সুস্বাদু ও নানা বিচিত্র রসাস্বাদযুক্ত অথচ স্বাস্থ্যের পক্ষে পুষ্টি ও কল্যাণকর আহার্য মানুষের আকাঙ্ক্ষিত, মানসিক খোরাকেও ঠিক ঐ কথাই বলা যায়। সুতরাং এই ক'দিনের স্মৃতি আমাদের অনেকদিন মনে থাকা স্বাভাবিক।

সপ্তপর্ণীর দক্ষিণ পাশে একটি বাংলোয় আমাদের প্রতিবেশিনী শ্রীমতী ঘাসওলা ছিলেন। সঙ্গে ছিল তাঁর মধ্যমা কন্যা ও জামাতা এবং ছোট মেয়ে কুমারী 'কৃষ্ণকলি'। অল্পবয়সীর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছিল খুব। আমরা ওঁর বাংলোর নাম রেখেছিলুম—"কৃষ্ণকলি-কুটীর।" এঁর কথা আমার আগেই উল্লেখ করা উচিত ছিল। কারণ এই অদ্ভুত উদ্যমশীলা, প্রসন্নমনা ও সদাহাস্যময়ী ভদ্রমহিলাটি না থাকলে সেই আধিব্যাধিযুক্ত, পাণ্ডব বর্জিত রাজগীরে আমাদের হয়তো একঘেয়ে করেই দিন কাটাতে হতো। ইনি একজন বর্ষীয়সী মহিলা। অক্টোবর মাসে রাজগীরে তখন যে সকল ফল দুর্লভ, সেই আঙ্গুর, বাদাম, খুবানী, ডিম, টাটকাভাজা তরীতরকারী, ফুল ফুল, জানিনা কেমন ক'রে কোন মন্ত্রবলে কোথা থেকে যে সে সব সামগ্রী অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শ্রীমতী ঘাসওলা সংগ্রহ করে ফেলতেন! অতি প্রত্যূষে উঠেই তিনি সেই যে ফলস সংগ্রহের কাজে লাগতেন—যে-পর্যন্ত তাঁর আশেপাশের প্রতিবেশীরা সকলে কিছু কিছু না পেতেন, তিনি বিশ্রাম নিতেন না। এঁরই সুমধুর স্বভাবের উপর নির্ভর করে আমরা একদিন গৃধ্রকূট দর্শন ও বান গঙ্গায় বনভোজনের ব্যবস্থা করতে ভরসা পেয়েছিলুম।

এই সময়ে আমাদের সপ্তপর্ণীর অপর অংশে এসে উঠেছিলেন শ্রীযুতা বন্দ্যোৎপা দেবী দুটি বাবাজক পুত্র নিয়ে। পাশাপাশি এক প্রাচীরেই বাস করতেন কিন্তু তাঁর মৃদু কণ্ঠস্বর কদাচ শোনা যেত। বোধ করি যেন উপাধিধারী ব্যক্তিটির বাদ্যকণ্ঠ অহরহ তারস্বরে তাঁর

রাজগীর স্টেশন

কর্ণকোচর হওয়ায় লাজুকভাবা মহিলাটি বিষয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। আমার কেমন একটা ধারণা হয়েছিল যে, বোধ হয় আমার মত শান্তি ভঙ্গকারী দুর্দান্ত লোকের বাড়ীর পাশে এসে পড়ে তিনি যে ভুল করে ফেলেছিলেন সম্ভবতঃ তাঁরই জন্য মনে মনে তিনি গভীর অনুতপ্ত হয়েছিলেন। যাই হোক, অকস্মাৎ একদা এক সন্ধ্যায় পাশের বাড়ীর নিস্তব্ধ গম্ভীর আকাশে এক 'শশাঙ্ক' উদয় হল। বন্দ্যোৎপা দেবীর অনুজা অমোদ্যোৎপা দেবীও এসেছিলেন সেখানে কিছুদিন আগে তাঁর ছুটি নিয়ে। কিন্তু সপ্তপর্ণীর বনে ও মনে আনন্দের কোনও জ্যোৎস্নাই উঁকি মারে নি। অথচ সেদিন সন্ধ্যায় সপ্তপর্ণী যেন হঠাৎ আনন্দজ্যোৎস্নায় পুলকিত হয়ে উঠেছিল। কিসের যেন বেরিয়েছিলুম বেড়াতে, সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরে শুনতে পেলুম সপ্তপর্ণীর এক কোণে রবীন্দ্র সঙ্গীতের অমৃত সুরধারা অঝোরে ঝরে পড়ছে। একটি পুরুষ ও একটি নারী-কণ্ঠের মিহি ও মোটা সুরটি তার একত্রে মিলিত ঐকতানে সেদিনের সন্ধ্যাটিকে পরম রমণীয় করে তুলছিল।

যাবার ইচ্ছের সম্বোধন-পর্বে কেমন যেন মনে হ'ল এঁরা আমাদেরই বন্ধুস্থানীয়—আমাদেরই বন্ধু। কোনও সঙ্কোচ বা দ্বিধা হল না আমাদের অত্র তাঁদের সাদর আহ্বান জানাতে। তাঁরাও কোনও অভিমান না-রেখে হাসিমুখে চলে এলেন আমাদের কাছে। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গানে গল্পে আলাপে কাটলো। রবীন্দ্রসঙ্গীত ও রবীন্দ্রকাব্য আলোচনার ভিতর দিয়ে অনায়াসে একটা অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠলো শশাঙ্কবাবুদের সঙ্গে আমাদের।

শ্রীমতী মনোজ্ঞোৎস্না ওরফে 'রেণু'র সুমধুর কণ্ঠ মোহন-বেণুকেও হার মানায়। রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবার জন্যই যেন স্রষ্টিকর্ত্তা মেয়েটিকে অমন মধুরতার পরিশীলন-কোমল কণ্ঠ দিয়েছিলেন। শশাঙ্কও তাহাও যেন সুকণ্ঠ গায়ক। বর্ণ পুরুলিয়ার গরমায়, তাহাই অবশ্য সুমিষ্ট। যোলপুর শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র তিনি। প্রজাপতির নির্বন্ধে দুজনের মিলন হয়েছে যেন—'অতি-কাঞ্চন' সংযোগ! মনে মনে এঁদের চিরসুখ ও সুসংবাদি কামনা করলুম। পরদিন বিকেলেই শশাঙ্কবাবু উপর ভার দেওয়া হয়েছিল বনভোজন পরিচালনার। রাঁধুনী একজন এবং কৃত্য একজন সঙ্গে গেলেও তাদের চালনার দায়িত্ব তাঁরই হাতে দেওয়া হয়েছিল। দু'খানি গরুর গাড়ী এবং একটি ভুলি নিয়ে আমরা এক বেলার প্রভাতে শোভাযাত্রা করে রওনা হলুম গৃধ্রকূটের পানে।

শ্রীমতী মনোজ্ঞোৎস্না বাতের রোগী। আরোগ্যকল্পে উক্ত প্রস্রবণে স্নানের জন্যই ওঁর রাজগীরে আসা। তিনি গরুর গাড়ীর আরোহে ভুলির ব্যবস্থা করেছিলেন। কোনও দোষ নেই। কারণ, যাঁরা গৃধ্রকূট ভূমে এসেছেন তাঁরা তথাগতের মহনীয় পার্বত্যপথের দুর্গমতার যে ভয়াবহ বর্ণনা দিয়েছিলেন, তাতে সহরের মসৃণ পীচের পথে মোটরে ঘুরতে অভ্যস্ত মানুষদের আতঙ্ক হওয়া খুবই স্বাভাবিক। শ্রীমতী মনোজ্ঞোৎস্না নিজে ড্রাইভ্ করে ঘুরে বেড়ান। শ্রীমতী ধাপগুপ্তাও স্বয়ংই ড্রাইভিং জানেন, উপরন্তু তাঁর একটি রাইফেলও আছে এবং তিনি নাকি অব্যর্থ লক্ষ্যভেদও করতে পারেন। অবশ্য দুনিয়ার মেয়েরা সকলেই লক্ষ্যভেদে পটু এবং তাদের কাছেকেই বড় একটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে দেখা যায় না; বিধা

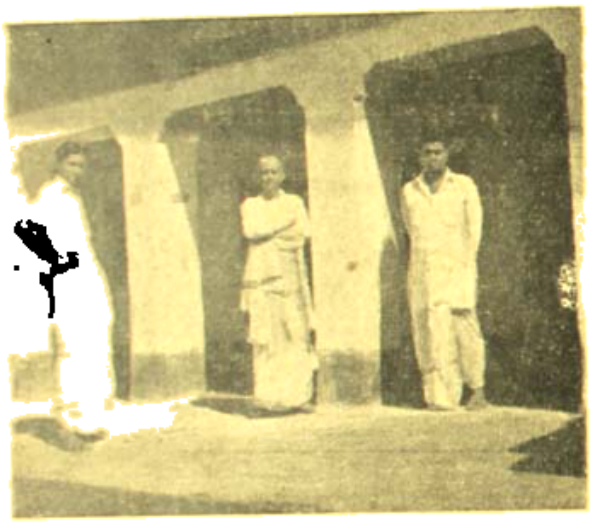

রাজগীর পোস্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ অফিস

গৃধ্রকূটের পার্ব্বত্যপথে প্রাকৃতিক দৃশ্য

পাটনা ফিরে গেলেন, কারণ, তিনি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া, পাটনা শাখার ম্যানেজার। ওঁকে সোমবার কর্ম্মসময়ে ব্যাঙ্কে হাজিরা দিতেই হবে। যাবার আগে তিনি আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে আবার সামনের সপ্তাহে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন।

এই মানুষটিকে অত্যন্ত ভাল লেগেছিল। ভদ্র, বিনয়ী, সদাহাস্য কৃত্রিমতাবর্জ্জিত, সদালাপী এবং সুমধুর চরিত্রের মানুষ এই শশাঙ্ক। দেহে ও মনে যষ্টিপুষ্ট অথচ বহুই অমায়িক প্রকৃতি।

শুভদিন শুভক্ষণের পথ অনুসরণে আমরা দলবদ্ধ হয়ে গৃধ্রকূটে যাত্রা করছি শুনে এঁরাও মহা উৎসাহে আমাদের দলে যোগ দিতে প্রস্তুত হলেন। স্থির হয়েছিল, ভোরে যাত্রা করে সন্ধ্যায় রাজগীরে ফিরে আসা হবে এবং গৃধ্রকূটের ওপারে বানগঙ্গার পাষাণ উপকূলে খিচুড়ী রান্না করে বনভোজনের আনন্দ আহরণ করা যাবে। শ্রীমতী ধাপগুপ্তের

রাইফেলেও ওঁরা চিরকাল শিকারে অভ্যস্ত। তথাপি একজন রাইফেল-বিশুণ্ণা মারী আমাদের পার্বত্য অরণ্য-পথের পরিচালিকা হওয়ায় আমরা সকলেই বেশ নিশ্চিন্ত নির্ভরে অগ্রসর হলুম। কারণ, গৃধ্রকূটের জঙ্গলে নানা বন্যজন্তু, বিশেষ করে বড় বড় ভাল্লুকের নাকি অভাব নেই।

দু'খানি গো-যান ও একটি ভুলিতে ছিলেন, শ্রীমতী ধাপগুপ্তা, ওঁর কন্যা শ্রীমতী উমা এবং কুমারী কৃষ্ণকলি, শ্রীমতী মনোজ্ঞোৎস্না ও ওঁর পুত্র প্রবীর ও সুধীর, শ্রীমতী অমোঘোৎস্না এবং ওঁর দুটি শিশু-পুত্র, শ্রীমতী মাধবাণী দেবী ও ওঁর কন্যা সুবর্ণলতা এবং আমি। চাল, ডাল, ঘি, তরকারী, ছাতা, হাঁড়িকুড়ি রাঁধুনী এবং চাকর যে যিনি বলাই বাহুল্য। বানগঙ্গার স্নানের লোভে ছেলে পাঠান, টোয়ালে আমরা চিরণী ব্রাশ্ও নেওয়া হয়েছিল। আমাদের এই বিরাট শোভাযাত্রা দেখে ছোট অবশ্য রাজগীরের পথে রীতিমতো জনতা জমে যেতে লাগল। সবারই চোখে মুখে যেন এই প্রশ্ন—এরা কারা?

কোথায় চলেছে? আমাদের বিছিয়া রাজধীর ষ্টেশন ছাড়িয়ে চলে এল। রাজধীর পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস পার হয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়লো।

সপ্তধারা পর্যন্ত পথ বেশ ভালই। তারপরেও দু'এক মাইল পথ খারাপ হলেও সহনাতীত অদ্ভুত অভিজ্ঞতায় উপভুক্ত বলা যায় না। 'লোনপাওয়ার' পার হওয়ার পর শুরু হলো কষ্টসহিষ্ণুতার কঠোর পরীক্ষা! উচ্ছৃঙ্খল ঢেউয়ের মুখে ভেলে ভিঙীর মতো গরুর গাড়ী যখন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খানাখন্দ ও গর্ত বহুল খড়ো কড়ো শিলাবিকীর্ণ পার্বত্যপথে ওঠা-নামা শুরু করলে এবং আরোহীদের কুলোর ভেলে চাল ঝোলা ঝাড়ার মতো লোফালুফি লাগালে, বেপরুয় গাড়ী ছেড়ে মেয়েরা একে একে পথে নেমে এলেন এবং পরক্ষণে পর্বতারোহণ শুরু করলেন। আমি এর আগে একাধিকবার ২০।২২ মাইল পর্যন্ত গরুর গাড়ী চড়ে বেড়িয়েছি। ভারতের এই সনাতন বৈদিক যানের সঙ্গে আমার পূর্ব পরিচয় থাকায় আমাদের গাড়ীতে বেশ পুরু ক'রে খড় বিছিয়ে তার উপর খান দুই তোষক পেতে চাদর মুড়ে একেবারে নরম বানিয়ে নিয়েছিলুম। একটি বালিশ মাথায় দিয়ে লম্বা হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আরামেই চলেছি। গাড়ী দোল খাচ্ছে, টোল খাচ্ছে, হেলছে দুলছে, লাফাচ্ছে ঝাঁকি, তবু আমি নিরুপায়। কিন্তু মেয়েদের সকলকে গাড়ী থেকে নেমে পায়ে হেঁটে যেতে দেখে পুরুষের অভিমানে আঘাত লাগলো। অগত্যা আমিও মনের মায়াদয়া পরিহার ক'রে পথ ধরলুম।

পর্বতের বুক চিরে একে-বেঁকে চলেছে সংকীর্ণ শৈলপথটি। পথের দু'ধারে অজস্র জানা ও অজানা তরুলতা বুনফুলের ধূসর পাহাড়কে একেবারে সবুজ করে রেখেছে। বনতুলসীর সৌরভ ভেসে আসছে হৈমন্তী হাওয়ায়। ছোট ছোট পাখি ভয়ে ডাকা-পাকা শিরি-বরি পথিক মনোরঞ্জন করছে। শ্রীমতীরা আজ ভয় ভুলে গিয়েছেন, ছেলে-মেয়েরাও এ নূতনে পরম উৎসাহে যোগ দিয়ে। প্রতিযোগী ত্রে কেউ ছিল না। নির্জন বনপথ। আমরাই কজনা চলেছি—শুধু কুল বধূ। বিচিত্র বরণের বনফুলও ছিল বিলাতের আলো করে। নিমেষে তারা ধন্য হল শ্রীমতীদের কবরী শোভা বর্ধনের সৌভাগ্য লাভ করে। অরণ্যবেষ্টিত সেই পার্বত্য প্রকৃতির উদার উন্মুক্ত সৌন্দর্যে চিত্ত যেন সুদূরলোকচারী হয়ে উঠলো।

বেণু তখন উদাত্ত কোমল কণ্ঠে গান ধরেছে—"গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ—"

আনন্দে উৎসাহে সুরে শোভায় সৌরভে পথের ক্লান্তি আজকে অনুভবই হচ্ছিলনা যেন।

(ক্রমশঃ)

ডুবিল কি চাঁদ মেঘের অন্ধকারে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

জ্বলে দীপ যতনেরে
পড়ে মনে
এমনি নিশীথে তুমি ছিলে মোর সাথে
তোমারে শুধাতে'
ছিল কত কথা মোর!
জীবনের যত প্রীতি
প্রেমপ্রীতি
যত কলরব যামারে গিয়েছে সব
রজনী নীরব!
অবাধ'রে ফেলে রেখে
গেছ তুলসল যথায় পরাণ দেখে।

সমুখে বিথার রাতি
ওগো সাথী
মোলে তরুলতা : যাতাসের পুলকতা
কাণে কাণে কথা
সমীর শুধাতে আসে
সকলি রয়েছে, তুমি নাহি মোর পাশে।

আমি আজ অসহায়
সমাহিত আশা : হারায়েছি ভালোবাসা
মিলন ছিনায়ে
মিছে ভাগে অনিবার
আর নাহি প্রয়োজন ছিন শনিবার।

বহুকাল ধরে মোরা
ছবি মোরা
ভরায়েছি দোঁহে প্রণয়ের সমারোহে'
কামনার মোহে'
সুখময় ছোটার বেলা
আমরা দু'জনে করেছি মতের মেলা।
রহিলাম একা-একা
তুমি দেখা
দিবে নাক জানি, শুধু তব লিপিখানি
মোর কাছে' টানি
পড়িতেছি বারে বারে
ডুবিল কি চাঁদ মেঘের অন্ধকারে!

পাট ও পীঠ

শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল

রঙ্গমঞ্চের উল্লেখযোগ্য নাট্য-প্রচেষ্টা

পূজা-উৎসবকে স্মরণীয় করে তুলতে, এবারের প্রমোদ-পঞ্জীতে বহু হিন্দি ও বাংলা ছবি স্থান লাভ করায়, ব্যাপক ভাবে আনন্দ পরিবেশনের উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে এবারের আয়োজন অকল্পিত বলেও চলে।

চিত্রজগতের তুলনায় রঙ্গপীঠের দান সংসামান্য। পূজোর পূজায় কোন নতুন নাটকের সন্ধান পাওয়া যায় নি। পুরাতন নাটকের পৌনঃপুনিক অভিনয় ঘটিয়ে দর্শক আকর্ষণ করবার চেষ্টা ছাড়া, রঙ্গমঞ্চের প্রযোজক-কর্তারা বিশেষ কোন নতুন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারেন নি।

এ বৎসরের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাট্যপ্রচেষ্টা হিসেবে স্মরণীয়, নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের অতি আধুনিক নাটক "পরিচয়"। শিশিরকুমারের কাব্যধর্মী মন এবার যুগধর্মকে অস্বীকার করতে পারে নি। তাই যুগের দাবী মেটাতে তাঁকে বাস্তবতা সম্বন্ধে আগ্রহশীল ও সচেতন দেখা যাচ্ছে। যে রসবিচারের পরিচয় তিনি দিয়েছেন 'পীড়িতের নাটক'-এ—কাব্য ও বাস্তবতার সমন্বয় ঘটিয়ে, আলোচ্য নাটকেও তার পরিচয় বিদ্যমান। মডার্নিজম্-এর নামে বাস্তবতার স্থূল অংশগুলির প্রয়োগ কার্যকরী হলেও, তা আরও মার্জিত ও বিশুদ্ধ হ'লে, রসগ্রাহী দর্শকের রসবোধকে অনেক বেশী পরিতৃপ্ত করতে পারত। তথাপি, তিনি যে মন নিয়ে 'পরিচয়' মঞ্চস্থ করেছেন, তা সংস্কার-মুক্ত খাঁটি প্রগতিবাদী শিল্পীর মন। ঘটনার আকস্মিকতা ও দুঃসাহসিকতা আধুনিক বাস্তববাদী মনকে পরিতৃপ্ত করেই ক্ষান্ত হয় না; যথেষ্ট চিন্তার খোরাক দিয়ে আমাদের মনকে সক্রিয় করে তোলে। সামাজিক জীবন-গঠনের যুগ-সন্ধিক্ষণে, নাট্যকার তথা প্রযোজকের এই সাধু উদ্দেশ্য আমরা সর্বতোভাবে সমর্থনযোগ্য বলে মনে করি।

আমাদের জাতীয় নাট্যশালার দুরবস্থার উল্লেখ করে, শ্রদ্ধেয় ও সুখ্যাত নাট্যকার শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সম্প্রতি তাঁর একটি প্রবন্ধে যে সময়োচিত মন্তব্য করেছেন, সেদিকে নাট্যশালার কর্তৃপক্ষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। শচীন বাবু বলেছেন: "আমাদের দিনে আমরা এমন নাটক চাই, যা জাতির বৈশিষ্ট্যের, জাতির প্রকৃতির, জাতির সংস্কারের সঙ্গে খাপ খাইয়ে, নাটকের ও নাট্য-শালার প্রগতির ও পরিণতির পথনির্দেশ করবে।"

একদা গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও অমৃতলাল এই উদ্দেশ্য নিয়েই রঙ্গালয়ের জন্য নাট্যরচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁদের লেখনী-ধারণ সার্থক হয়েছিল বলেই, অর্ধশতাব্দী পরেও সে সব নাটকের আকর্ষণ বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। তদানীন্তনকালের সমাজের প্রকৃত রূপ, মানুষের শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কার এবং জীবনধারার বৈশিষ্ট্য এই সব নাটককে আশ্রয় করেই অভিব্যক্ত হয়েছে। এযুগের প্রচারধর্মী নাট্যকারদের মত, ইবসন্ এবং সারমন্-এর সাহায্যে তাঁরা আসর মাৎ করবার দুশ্চেষ্টা করেন নি। বিলিতি নাটকের বিষয়বস্তু এবং ঘটনার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েও তাঁরা লেখনী ধারণ করেন নি। দীনবন্ধু মিত্র থেকে অমৃতলাল পর্যন্ত, প্রত্যেকের নাটকের মাধ্যমে তদানীন্তন-কালের সমাজ ও জীবনধারাকে সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে বিকারগ্রস্ত সমাজের চিত্র, অমৃতলালের শেষ সামাজিক প্রহসন, 'ব্যাপিকা বিদায়' অবলম্বন করে মূর্ত হয়ে ওঠে। এধরণের সমাজ শিক্ষার অনুপ্রাণিত উদ্দেশ্যমূলক নাটক আধুনিক যুগে আর দেখা যায় নি।

সংকল্প-চিত্রের সাফল্য

বাংলা কথক-ছবির তালিকায় এবারে সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য অবদানরূপে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য, এম, পি, প্রডাকসান্স-এর 'সংকল্প' এবং কলালক্ষ্মী চিত্র-মন্দিরের 'স্বামী'।

কবি ও গীতকার শ্রীশৈলেন রায় এই সমাজ শিক্ষা-

মূলক কাহিনীটির পরিকল্পনা ও গঠনে যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। নিছক কাব্যবিলাস ও উচ্ছ্বাস সৃষ্টির মোহ পরিহার করতে পারায় এবারে তাঁর কাহিনীটি নাটকীয় গতিবেগে এবং ঘটনাবৈচিত্র্য ও সংঘাতে যথেষ্ট সাবলীল ও সিনেমা-ধর্মী হতে পেরেছে। ছবির গল্প-লেখক হিসেবে শৈলেন বাবু এতদিন যাঁদের নিরাশ করে এসেছেন, আলোচ্য চিত্রের কাহিনী তাঁদের বিস্মিত ও মুগ্ধ করার দাবী রাখে।

একটি পরম আদর্শবাদী স্কুল-মাস্টারের জীবনের পটভূমিকায় যে কাহিনীটি নাটকাকারে শাখা-পল্লবিত হয়েছে, সেটি নিছক হিতোপদেশ বিতরণের জন্য বা নীতি-বিচারের উদ্দেশ্যে পরিবেশিত হ'লে এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'ত। ঘটনার বৈচিত্র্য, গতিবেগ এবং সংঘাত, নাটকীয় পরিণতি বা climax সৃষ্টির পথে যা একান্ত প্রয়োজন, কাহিনীকার তার যথাযথ প্রয়োগে লক্ষ্যচ্যুত হন নি। ঘটনাকে বা চরিত্রকে যথেষ্ট নাটকীয় করে তুলতে তিনি কোন উদ্ভট বা অবাস্তব উপায় অবলম্বন করেন নি। যে সব ইমোশান্ থেকে আবেগের সৃষ্টি, তার প্রয়োগেও কাহিনীকার সুচিন্তিত মনোজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। এই sense of balance এবং understanding লেখকের নাট্য-প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলেছে।

স্কুল মাস্টারের জীবনী নিয়ে শৈলেন বাবু নাটক রচনা করেছেন; কিন্তু সে নাট্যরচনায় তিনি স্কুলমাষ্টার সাজবার দুশ্চেষ্টা করেন নি। পিতার জীবনের আদর্শবাদ তার কর্মের মধ্যে দিয়ে কিভাবে সন্তানদের অনুপ্রাণিত করে—মনুষ্যত্বের পূর্ণতম বিকাশের পথে তার অমোঘ প্রভাব কোন পরিণতির সন্ধান দেয়, একটি পরিবারের ভাঙা-গড়া ও জীবন-সংগ্রামের অন্তরালে তার পরিচয় মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। দর্শকের চিত্তে যুগপৎ বিক্ষোভ ও হর্ষ সৃষ্টির দ্বারা নাটকীয় আবেদনের সার্থকতা প্রতিপন্ন করে, এই চিত্রের প্রযোজকর্তারা দেশের ও দশের শ্রদ্ধা অর্জন করবার দাবী রাখেন।

সঙ্কল্প-চিত্রের কাহিনীটি অসাধারণ নয়; ভাবপ্রবণ মনোবৃত্তির উপর ভর করে গড়ে উঠলেও, সর্বশ্রেণীর দর্শক-চিত্তে আবেদন সৃষ্টির দিক দিয়ে, ছবির প্রচারগত ও ব্যবসাগত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবার নয়। সূক্ষ্ম যুক্তিবাদী মন নিয়ে বিচার করলে হয় ত এর অংশবিশেষের দুর্বলতা ধরা পড়বে—কিন্তু তা রসসৃষ্টির উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করতে পারে নি। কাহিনীর গতি অতি দ্রুত, তার ক্রমবিকাশের ধারা অতি সচ্ছন্দ এবং সম্পাদনা ত্রুটিশূন্য। সংলাপগুলির প্রয়োগেও চিত্রনাট্যকার তাঁর রসবোধ ও রুচির পরিচয় দিয়েছেন।

'অগ্রদূত' নামে পরিচিত যে কয়টি অভিজ্ঞ টেক্‌নিশিয়ান্ 'সঙ্কল্প'-চিত্রের পরিচালনার জন্যে দায়ী, তাঁদের আয়ত্ত কর্ম সম্পাদনে যথেষ্ট মাত্রাজ্ঞান ও কলা-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। চলচ্চিত্রের আঙ্গিকে, কাহিনী বিস্তারের পথে তাঁদের যত্ন, নিষ্ঠা ও প্রগতিবাদী মনের সন্ধানও পাওয়া যায়। চিত্র-পরিচালনায় একক শক্তির পরিবর্তে সম্মিলিত শক্তির প্রয়োগ-সাফল্যে, অভিজ্ঞ টেক্‌নিশিয়ান্ দ্বারা গঠিত এই বিশেষ গ্রুপ্-টির team-work ইতি-মধ্যেই সমালোচক ও রসবেত্তার সমাদর ও সমর্থন লাভ করেছে।

নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় যাঁরা চিত্রাবতরণ করেছেন, ছোট-বড় নির্বিশেষে তাঁদের team-work ও ছবির জনপ্রিয়তা ও সাফল্যের প্রধান সহায় বলে গণ্য হবার যোগ্য। শিল্পীদের মধ্যে অনন্যসাধারণ অভিনয়-কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন, প্রতিভাময়ী চরিত্রাভিনেত্রী শ্রীযুতী মলিনা। নায়িকার শিশুকন্যার ভূমিকায় একটি ছোট মেয়ের অভিনয় এই চিত্রের অন্যতম আকর্ষণ।

একমাত্র সঙ্গীতের প্রয়োগে গীতকার শৈলেন রায় এবং সুরস্রষ্টা রবীন চট্টোপাধ্যায় আমাদের নিরাশ করেছেন। নিতান্ত অপপ্রয়োগের ফলে গীত-যোজনার উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হয়েছে। তথাপি, এ বৎসরের পরম উপভোগ্য অবদান-রূপে 'সঙ্কল্প'-চিত্রের দাবী আমরা স্বীকার করতে বাধ্য।

শরৎচন্দ্রের "স্বামী"

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত, কলালক্ষ্মী চিত্র-মন্দিরের 'স্বামী'—বাঙলার অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের এমন একটি কাহিনী অবলম্বনে রূপায়িত, যার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্যের উপযোগী যথেষ্ট নাটকীয় উপাদানের অভাব দেখা যায়। সাহিত্য-রস ধারা বাঁধবার পক্ষে যা যথেষ্ট, নাট্যরস জমাট করে তোলবার

পথে তা যথেষ্ট নয়। নাট্যবিস্তারের পক্ষে যে ধরণের ঘটনাবহুল ও বৈচিত্র্যধর্মী narrative-এর একান্ত প্রয়োজন, আলোচ্য কাহিনীতে তার সন্ধান খুব সামান্যই পাওয়া যায়।

কাহিনীর মূল রস গ্রহণের পক্ষেও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের পক্ষপাতীদের কাছে এই উপন্যাসটি তাঁর অন্যান্য কাহিনীর মত সহজবোধ্য নয়। যে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের উপর কাহিনীটির ভিত্তি, তার পূর্ণরস উপলব্ধির জন্য চাই সেই রসগ্রাহী পরিণত মন, যা সর্বস্তরের পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে অত সুলভ নয়।

এই ধরণের কাহিনীকে বিদেশের জন্যে নির্বাচিত করার যেমন পরিচালকের সাহসের পরিচয় দিয়েছেন তেমনি মূল উপন্যাসের অন্তর্নিহিত মাধুর্য অক্ষুণ্ণ রেখে তার যথাসম্ভব অবিকৃত চিত্ররূপ দেবার মধ্যে পরিচালকের সূক্ষ্ম রসবোধ, কলাজ্ঞান ও সাহিত্যধর্মী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্রের মনোধর্মী মন কাহিনীর পরিণতিতে যে moralএর নির্দেশ করেছেন, চিত্রিত নাটকে সেই moral টুকুর আবেদন সাহিত্যরসিক ও বুদ্ধিজীবী দর্শকচিত্তে যথেষ্ট সাড়া জাগাতে পারবে বলে আমার মনে হয়।

নায়ক-নায়িকারূপে ঘনশ্যাম ও সৌদামিনীর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত সাগাল ও সুমিত্রা দেবীর সহজ ও সংযত অভিনয় যথেষ্ট হৃদয়গ্রাহী হয়েছে, উপনায়ক নরেনের ভূমিকায় প্রমোদকুমারের অভিনয় তা হয় নি। এই ভূমিকাটির আংশিক ব্যর্থতা তাঁর অভিনয়-অক্ষমতারই পরিচয় বহন করে। ঘনশ্যামের প্রৌঢ়া জননীর ভূমিকায় সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়ের অপূর্ব রূপসজ্জা, ভাবাভিব্যক্তি এবং চরিত্রানুগ অভিনয় এই বাণীচিত্রের অন্যতম উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ।

নাটকীয় আবেদন সৃষ্টিতে এবং ঘনশ্যামের চরিত্র বিকাশে গানগুলির প্রয়োগ এবং সুর-যোজনা আংশিক-ভাবে সার্থকতামণ্ডিত হয়েছে।

জীবনী-চিত্রের ব্যর্থতা

শ্রীযুক্তা কল্যাণী মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী এবং শ্রীবিনয় চট্টোপাধ্যায়ের চিত্র-নাট্য অবলম্বনে রূপায়িত, নিউ থিয়েটার্সের বহু প্রত্যাশিত ধর্মমূলক জীবনী-চিত্র "বিষ্ণুপ্রিয়া" নিতান্ত আধুনী ছবির মতই বিশেষত্ব বর্জিত। নিমাই চরিত্রে কৃষ্ণভক্তির দিক খানিকটা আলোচ্য নাটকে পরিস্ফুট হলেও তার বিরাট পাণ্ডিত্য, প্রেমধর্ম ও বৈষ্ণবসুলভ সহনশীলতা এবং ত্যাগ ও বৈরাগ্যের দিকটা অবহেলিত হওয়ায়, জীবনী-চিত্র হিসেবে 'বিষ্ণুপ্রিয়া'-র সার্থকতা যৎসামান্যই।

জগাই-মাধাই উদ্ধার এবং অবধূত নিতাইয়ের আবির্ভাব ও যোগাযোগ, শ্রীগৌরাঙ্গের কর্ম ও ধর্ম-জীবনের মুখ্য ঘটনা। আলোচ্য নাটকে এই দুটি চরিত্রের অবতারণায় চিত্রনাটকার তথা কাহিনী-রচয়িত্রী তাঁদের গভীর অজ্ঞতা এবং রসগোধয়ানতার পরিচয় দিয়েছেন। বিচার-প্রার্থীর প্রকাশ্য দরবারে বিচারক কাজী-সাহেবের সঙ্গে অপরাধী নিমাই-পণ্ডিতের মধ্যে 'দোক্তি' ঘটাবার যে theatrical প্রচেষ্টার সুযোগ নিয়েছেন, তা বুদ্ধিজীবী ও যুক্তিকামী দর্শকের কাছে নিতান্ত হাস্যকর বলে মনে হয়েছে।

নিমাইয়ের সংসে বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহ পর্যন্ত ঘটনাগুলি, সংগীতে, সংলাপে ও অভিনয়ে যথেষ্ট সাবলীল ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। মূল নাটকের এইটুকুই পূর্বাভাষ। কিন্তু তারপর থেকেই উদ্ভট রামায়ণ রচনার মত, নিমাই-বিষ্ণু-প্রিয়ার জীবনী কথা এমন সব ঘটনাকে কেন্দ্র করে এগিয়ে গেছে যার মধ্যে সস্তা চমক দেবার চেষ্টাটাই প্রকাশ পেয়েছে—যুক্তিবাদী মনে আবেদন সৃষ্টির উদ্দেশ্য একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে।

ছবির নাম 'বিষ্ণুপ্রিয়া' কিন্তু কাহিনীতে প্রাধান্য পেয়েছে শান্তিনিকেতনী ঢং-এর এমন একটি 'নাচুনে তরুণী', যার নাচ, গান ও সদাই দোলায়মান দেহভঙ্গী, নাটকের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত মূল কাহিনীর রসগ্রহণে বাধার সৃষ্টি করে। ছবি প্রদর্শনের সময় দর্শকদের প্রকাশ্য প্রতিবাদ থেকেই এই বিক্ষোভের পরিচয় পাওয়া যায়। বিষ্ণুপ্রিয়া এবং শচীমাতাকে ছাপিয়ে একটি নিতান্ত কাল্পনিক নর্তকী-চরিত্র কেমন করে এই জীবনী চিত্রে এতটা প্রাধান্য পায় তার কারণ আমাদের অজ্ঞাত।

স্থানাভাবে এই ছবিখানি সম্বন্ধে বাকী আলোচনা পরবর্তীর জন্যে স্থগিত রাখা হ'ল।

চলচ্চিত্র তদন্ত-কমিটির কর্মারম্ভ

ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে পর্যালোচনা এবং তার উন্নতির উপায় নির্ধারণের জন্যে

ভারত গভর্ণমেণ্ট একটি 'ফিল্ম এনকোয়ারী কমিটি' বসিয়ে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। এদেশের চিত্র-শিল্পের প্রতি গভর্ণমেণ্টের উদাসীনতা প্রকট হবার পর, দারা ভারতব্যাপী আন্দোলনের ফলেই এই 'কমিটি' গঠনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়।

একজন চেয়ারম্যান এবং পাঁচজন সভ্যদের দ্বারা গঠিত এই কমিটিতে, সরকারী এবং বেসরকারী সভ্যদের তালিকায় মাত্র দু'জন নির্বাচিত হয়েছেন, যাঁরা ভারতীয় চিত্রশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং চলচ্চিত্র প্রযোজক রূপে অগ্রগণ্য ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন। এঁদের নাম: বোম্বাইয়ের বিনায়ক শান্তারাম এবং বাঙলার শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার

গত ৮ই সেপ্টেম্বর বোম্বাইতে কমিটির চেয়ারম্যান্ শ্রী এস, কে পাতিল-এর সভাপতিত্বে এই তদন্ত কমিটির প্রাথমিক বৈঠক অন্তে, ১০ই এবং ১১ই সেপ্টেম্বর আরো দুইটি বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে। বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সঙ্ঘের সভাপতি এবং এই কমিটির অন্যতম সভ্য শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার শেষের দুটি বৈঠকে যোগদান করবার জন্যে লণ্ডন থেকে বিমানযোগে ভারতে আসেন। ১২ই তারিখে তিনি আবার লণ্ডনে ফিরে যান। লণ্ডন এবং আমেরিকার বিখ্যাত ষ্টুডিওগুলির সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হওয়া এবং বৈদেশিক ফিল্মশিল্পের গঠন ও পরিচালন-পদ্ধতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করাই শ্রীযুত সরকারের বর্তমান সফরের উদ্দেশ্য।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার বংশ-গরিমায়, বিদ্যায়, আভিজাত্যে এবং চিত্র-প্রযোজনায় শীর্ষস্থান অধিকার করবার যোগ্যতায়, অন্যতম প্রধান শিল্পপতিরূপে সবচেয়ে শ্রদ্ধার পাত্র। শ্রীযুত সরকারের এই উদ্দেশ্যমূলক বৈদেশিক সফর সাফল্যমণ্ডিত হোক আমরা আন্তরিক ভাবে এই কামনা করি। চলচ্চিত্র তদন্ত কমিটিতেও শ্রীযুত সরকার ও শ্রীযুত শান্তারামের যুগ্ম সহযোগিতার সাফল্য কামনা করি।

শহরে শঙ্কর-অমলার নৃত্যানুষ্ঠান

দীর্ঘকাল পরে স্থানীয় নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে নৃত্য-শিল্পী উদয়শঙ্করের বিচিত্র নৃত্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হওয়ায় উচ্চস্তরের আনন্দ উপভোগের সুযোগ পাওয়া গেল। নৃত্যকলার সাধনায় শঙ্কর ও তাঁর পত্নীর আন্তর্জাতিক খ্যাতি সর্বজনবিদিত। নভেম্বরের মধ্যভাগে আবার তাঁর দলবলসহ য়ুরোপে অভিযান করবার পূর্বে, শঙ্কর ও অমলা দেবীর অগণিত গুণগ্রাহীদের আকাঙ্ক্ষা মেটাতে এই নৃত্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে আমাদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

এবারের অনুষ্ঠান-লিপিতে যে সব বিষয়গুলি স্থান লাভ করেছে, পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যে ও ভাব-মাধুর্যে তা হয়ে উঠেছে সত্যই অভিনব। প্রত্যেকটি নৃত্য-পরিকল্পনার মধ্যে শঙ্করের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যবোধ, সৃষ্টিপ্রয়াসী মন এবং ভারতীয় জীবনধারার স্পন্দন ও স্পর্শ পাওয়া যায়। আর্ট ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা সমগ্রজাতির শিক্ষা, সভ্যতা ও ঐতিহ্যের অন্তর ও বাহিরের একমাত্র সার্থক Revivalist রূপে উদয়শঙ্করের দান অমূল্য। ভারতের নিজস্ব কৃষ্টিগত ভাবধারার প্রচারকরূপে শঙ্করের বিশ্বব্যাপী খ্যাতি তাঁর স্বদেশের গৌরব ও শ্রদ্ধা বর্ধনে সহায় হয়েছে।

বৎসরান্তে—

মহাপূজার পর বিজয়া উপলক্ষে আমরা আমাদের লেখক, গ্রাহক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা প্রভৃতি সকল বন্ধুবান্ধবকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জ্ঞাপন করিয়া নূতন উদ্যমে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলাম। বিশ্বাস আছে, মহামায়ার প্রসাদে ও সকলের শুভেচ্ছায় এই দারুণ দুর্দ্দিনেও আমরা সকলকে পূর্ব্বের মত সেবা করিবার শক্তি ও সৌভাগ্য লাভ করিব। সকলের সমবেত সাধনা ও চেষ্টার ফলে 'ভারতবর্ষ' যেন তাহার গৌরব রক্ষা করিয়া চলিতে পারে, ইহাই শুভদিনে আমরা কামনা করি। ভারতবর্ষের সেবা করিতে করিতে যাঁহারা সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন, আজ আমরা তাঁহাদের সকলের কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করিতেছি।

প্রত্যক্ষ-সংগ্রামের শিক্ষা—

কলিকাতায় গত ১৬ই অক্টোবর হইতে ৯ দিন ব্যাপী যে কর্পোরেশন কর্ম্মীদের ধর্ম্মঘট হইয়া গেল, তাহা কলিকাতাবাসীদিগের প্রভূত ক্ষতি করিলেও তাহার মধ্য দিয়া নূতন কর্ম্মোদ্যমের সূচনা দেখা গিয়াছে। স্বেচ্ছাদলের যুবকগণ ঐ কয়দিন সকল অসুবিধা ও কষ্ট সহ্য করিয়া কলিকাতার পথ হইতে জঞ্জাল পরিষ্কার করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে। সেই সঙ্গে তরুণের দল স্বেচ্ছাসেবকরূপে তাহাদিগকে সাহায্য দান করিয়া নিজ নিজ কর্ম্মশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছে। বাঙ্গালার যুবকগণ যে এখনও উপযুক্ত নেতৃত্ব লাভ করিলে সকল প্রকার কাজই করিতে পারে, তাহা এই কয়দিনে লোক বেশ বুঝিতে পারিয়াছে। এই প্রসঙ্গে বেলিয়াঘাটা অঞ্চলের যুবকগণের কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসনীয়। তাহারা কয়দিন ধরিয়া খাটা পায়খানার ময়লা যে ভাবে পরিষ্কার করিয়াছে, তাহা সত্যই অভাবনীয়। মহাত্মা গান্ধী যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, বিপদের সময় যুবকগণ সেই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া যে কার্য্য করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের দেখিয়া মনে হইয়াছে—বাঙ্গালা দেশের তরুণের দল নিষ্ক্রিয় হয় নাই। ঘতীন্দ্রনাথ, ক্ষুদিরাম প্রভৃতির ত্যাগের আদর্শ তাহারা বিস্মৃত হয় নাই—প্রয়োজন হইলেই তাহারা আবার অসাধ্য সাধন করিয়া বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইবে।

শোচনীয় দুর্ঘটনা—

কর্পোরেশনের কর্ম্মীদের ধর্ম্মঘট সম্পর্কে কলিকাতা হ্যারিসন রোডে যে শোচনীয় দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে দেশবাসী সত্যই আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছে। একদল যুবক যখন গলির মধ্য হইতে জঞ্জাল আনিয়া রাজপথের উপর গাদা করিতেছিল, তখন বেনিয়াটোলার মোড়ে হ্যারিসন রোডের উপরে এক ধনী মাড়োয়ারীর বাড়ী হইতে তাহাদের উপর নৃশংসভাবে গুলীবর্ষণ করা হইয়াছিল—এমন কি পুলিশ পর্য্যন্ত প্রথমটায় তাহাতে বাধা প্রদান করিতে সমর্থ হয় নাই। বর্ত্তমানে সাম্য ও স্বাধীনতার যুগে এই ভাবে শক্তিশালী ধনী কর্ত্তৃক শক্তির অপব্যয় অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপার। যুবকগণের অপরাধ—তাহারা ঐ ধনীর গৃহের সম্মুখে জঞ্জাল রাখিয়াছিল—তাহাদের ঐ কার্য্য কোন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ছিল না। গলি হইতে ময়লা বাহির করিয়া আনিয়া প্রশস্ত রাজপথে রাখাই তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক—পরে যথাকালে সে ময়লা সরাইয়া ফেলা হইত। কিন্তু উদ্ধত ও ধনগর্ব্বিত শক্তিশালী ব্যক্তিরা আগ্নেয়াস্ত্র অপব্যবহার করিয়া স্বেচ্ছাসেবকগণের উপর গুলীবর্ষণ করিয়াছে। পরে পুলিশ আসিয়া ঐ বাড়ী হইতে বহু লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে ও বহু বে-আইনিভাবে রক্ষিত আগ্নেয়াস্ত্রও নাকি তথায় পাওয়া গিয়াছে। যাহাতে অপরাধীর উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা হয়, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাই প্রার্থনা করি, ধনী বলিয়া যেন বিচারে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব করা না হয়—তাহা দেশবাসী কখনই সহ্য করিবে না। একদল অবাঙ্গালী বাঙ্গালা দেশে থাকিয়া ও বাঙ্গালার অর্থে পুষ্ট হইয়া বাঙ্গালীদের ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা ধনীর পক্ষ সমর্থন করে

বলিয়া একদল লোকের ভ্রান্ত বিশ্বাস হইয়াছে। স্থারিসন রোডের দুর্ঘটনার বিচারের ফল যেন জনসাধারণের মন হইতে সেই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতে সমর্থ হয়। অবাঙ্গালীরা বাঙ্গালা দেশে বাস করুন, তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি হইতে পারে না—কিন্তু বাঙ্গালীর উপর তাহাদের অযথা অত্যাচার যেন কেহ সমর্থন না করেন, ইহাই সকলের কামনা।

প্রধান মন্ত্রীর আমেরিকা ভ্রমণ—

প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন। কি উদ্দেশ্যে তিনি ভ্রমণে গিয়াছেন, তাহা জানিবার কৌতূহল সকলের পক্ষে স্বাভাবিক। তিনি তথায় বিভিন্ন বক্তৃতায় ও বিবৃতিতে যে সকল কথা প্রচার করিতেছেন, আমরা নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম প্রদান করিলাম, তাহার ফলে লোক তাঁহার ভ্রমণের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবে। তিনি জানাইয়াছেন—(১) পররাজ্য আক্রান্ত হইলে অথবা স্বাধীনতা বা ন্যায় বিচার বিপন্ন হইলে ভারতবর্ষ নিরপেক্ষ থাকিবে না। তবে পূর্ব্ব ও পশ্চিমী শক্তিগুলির মধ্যে বর্ত্তমানে যে স্নায়ুযুদ্ধ চলিতেছে, ভারতবর্ষ তাহাতে যোগ দিবে না (২) ভারতের সরকারী নীতির মূল লক্ষ্য হইল—জনসাধারণের জীবন যাত্রার মান উন্নত করা। এই উদ্দেশ্যে মার্কিনী অর্থ বা নাস্তিক সাহায্য গৃহীত হইবে। (৩) সামাজিক স্থায়িত্ব বিধানের জন্য ভারত ও এশিয়ার লোকদের জীবন যাত্রার মান উন্নত করা প্রয়োজন। এই সামাজিক স্থায়িত্ব বিধানই কম্যুনিজ্‌ম-প্রসার নিরোধের সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী উপায়। (৪) ভারতে কোনরূপ উপনিবেশিক শোষণ চলিবে না এবং যে কোন সাহায্যই তাহাকে দেওয়া হউক না কেন, তাহাতে এমন কোন সর্ত্ত থাকিতে পারিবে না, যদ্দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা কোন রকমে ক্ষুণ্ণ হয়। (৫) ভারতবর্ষ স্বাভাবিক ভাবে এশিয়ার নেতৃত্ব অধিকার করিয়াছে এবং উহার পক্ষে এখন আর নিঃসংস্রব হইয়া থাকা সম্ভব নহে।

চীনে কম্যুনিষ্ট সরকার—

চীনে কম্যুনিষ্ট সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও কম্যুনিষ্ট-নেতা মাও সে তুং এই সাধারণ তন্ত্রের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সোভিয়েট রুসিয়া ও রুস প্রভাবিত পূর্ব-ইউরোপের কয়েকটি দেশ ইতিমধ্যেই এই নূতন সাধারণতন্ত্রকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এই নূতন সাধারণতন্ত্রকে স্বীকার করিয়া লওয়ার জন্য অন্যান্য দেশের প্রতিও তাঁহারা আবেদন জানাইয়াছেন। এংলো-মার্কিণ গোষ্ঠির দেশগুলি এই নূতন চীনা-সরকারকে স্বীকার করিয়া লওয়ার প্রশ্নটি বিবেচনা করিতেছেন। পরামর্শের জন্য চীনাস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সর্দ্দার কে-এম-পানিক্কর ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কম্যুনিষ্ট সরকারকে স্বীকার করিয়া লওয়ায় রুসিয়ার বিরুদ্ধে চীনা কুওমিংটাং সরকার চীন-রুস চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ আনিয়াছেন। জগতের গতি এখন কোন দিকে চলিবে তাহাই বর্ত্তমানে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

গান্ধীজির জন্ম দিন—

সংবাদপত্রে দেখিয়াছি, ২রা অক্টোবর শুধু ভারতের সর্ব্বত্র নহে, ভারতের বাহিরেও বহু স্থানে মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন পালিত হইয়াছে। লোক সে দিন শ্রদ্ধার সহিত একত্র সমবেত হইয়া গান্ধীজির জীবন ও কর্ম্মাদর্শের কথা স্মরণ করিয়াছে। গান্ধীজি চরকায় সুতা-কাটা ভালবাসিতেন বলিয়া লাট-প্রাসাদে চরকা যজ্ঞ বা দল বাঁধিয়া সুতাকাটা হইয়াছে। কিন্তু গান্ধীজির ৩০ বৎসরব্যাপী প্রচারের পরেও ভারতের অতি অল্প-সংখ্যক লোক চরকায় সুতা কাটিয়া থাকে—অধিকাংশ লোকই চরকায় সুতা কাটা নিরর্থক বলিয়া মনে করে। তাহারা যে ভ্রান্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু গান্ধীজির জীবনের মূল শিক্ষা ছিল—সত্যের অনুসন্ধান। জীবন হইতে মিথ্যাকে দূর করার জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। ভারতবাসী যদি সেই সত্যের অনুসন্ধানের চেষ্টা করে, তবে গান্ধীজির প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। দুঃখের কথা—দেশবাসী অসত্যের ভক্ত হইয়াছে ও সে জন্য দেশবাসীর দুঃখদুর্দ্দশা বাড়িয়াছে। শুধু গান্ধী-জন্ম দিবসে নহে, প্রত্যহ আমাদের গান্ধীজিকে স্মরণ করার সময় মনে করা উচিত—আমরা প্রত্যেকে যেন তাঁহার মত সত্যের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারি।

চিনির ফাটকা—

গত মহাপূজার ৩।৪ দিন পূর্ব্বে হঠাৎ বাজার হইতে চিনি অদৃশ্য হইয়া যায় ও তাহার ফলে সারা দেশের লোককে অবর্ণনীয় অসুবিধা ও কষ্টের মধ্যে পতিত হইতে হইয়াছিল। তাহার প্রায় ১৭ দিন পরে ১০ই অক্টোবর হইতে রেশনের

দোকান হইতে চিনি দেওয়া হইতেছে বটে, কিন্তু তাহা লাভ পিছু মাত্র সপ্তাহে আধ পোয়া এবং তাহার মূল্যও কম নহে। পূর্ব্বে যখন চিনি রেশনে পাওয়া যাইত তখন তাহার দাম ছিল সের প্রতি দশ আনা। কিন্তু চিনির কণ্ট্রোল উঠিয়া যাওয়ার পর চিনির দর না কমিয়া তাহা বাড়িতে থাকে ও গত কয় মাস যাবৎ ১৫ আনা বা এক টাকা সের দরে চিনি পাওয়া যাইত। চিনির কলওয়ালারা বা ব্যবসায়ীরা যে অত্যধিক লাভের লোভে চিনির দর এভাবে বাড়াইয়া দিয়াছেন, তাহা সর্ব্বজনবিদিত—কিন্তু গভর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে বিবৃতি প্রকাশ ছাড়া চিনির দর কমাইয়া জনগণের অভিযোগ দূর করিতে অগ্রসর হন নাই। কাজেই লোক যে বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টকে ধনী ও চোরাকার-বারীর সমর্থক বলিয়া মনে করিবে তাহা আর বিচিত্র কি? পূজার সময় চিনি প্রকাশ্য বাজার হইতে উধাও হইলেও দরত্র ২ টাকা ৩ টাকা সের দরে চিনি কিনিতে পাওয়া গিয়াছে—লোকে বৎসরে মাত্র ঐ কয়দিনই গৃহে আনন্দোৎসব করিয়া থাকে, কাজেই তাহারা বাধ্য হইয়া ১ টাকা ৩ টাকা সের দরে চিনি ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে। পুলিস এই সংবাদ জানিয়াও ইহার প্রতীকারের কোন ব্যবস্থা করে নাই। শাসকবৃন্দ এই অব্যবস্থার কথা জানিয়াও জনগণের কল্যাণের জন্য উপযুক্ত চিনি সরবরাহের ব্যবস্থায় মনোযোগী হন নাই। ১৫ দিন ধরিয়া এইভাবে চিনির বাজার অরাজকতা চলিয়াছে—শাসকগণের মধ্যে ইতিমধ্যে কোন ব্যবস্থা করা যে সম্ভব ছিল না—এ কথা কেহই বিশ্বাস করিবে না। চিনির চোরা-কারবার ঐ ১৫ দিন প্রকাশ্যভাবেই চলিয়াছিল। অথচ মধ্যে মধ্যে শুনা যায় যে চিনির কলে চিনি জমা হইয়া আছে—চিনির গুদামে চিনির অভাব নাই। কাহাদের দোষে বা কি জন্য চিনির বাজারে এই অরাজকতা হইয়া গেল—সে বিষয়ে তদন্ত করিয়া অপরাধীদের উপযুক্তভাবে শাস্তি দান করা কি কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন না? যদি তাহা মনে না করেন, তবেই ত লোক বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীকে চোরা বাজারের সমর্থক বলিয়া মনে করিবে। একদল ব্যবসায়ী এই কয়দিনে প্রচুর অর্থ-উপার্জ্জন করিয়াছে—অথচ দরিদ্র গৃহস্থগণের সে জন্য দুঃখ ও কষ্টের অন্ত ছিল না। এখন পর্য্যন্ত (অর্থাৎ প্রায় ১ মাস পরেও) চিনি উপযুক্ত ভাবে সরবরাহের ব্যবস্থা হয় নাই—সে জন্য লোককে তিন টাকা সের দরে বাতাসা ও ৪ টাকা সের দরে মিছরী কিনিতে হইতেছে। এই অব্যবস্থা দূর না হইলে লোক বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর কার্য্য সমর্থন করিতে পারিবে না।

লবণ-সমস্যা—

চিনির মত লবণের বাজারেও কাটকাবাজী হইয়াছিল, কিন্তু তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। বাজারে প্রচুর লবণ থাকা সত্ত্বেও একদল ব্যবসায়ী চোরাকারবারের সুবিধা করিবার জন্য সংবাদ রটাইয়াছিল যে চিনির মত লবণও কণ্ট্রোল করা হইবে ও কিছুদিন বাজারে লবণ পাওয়া যাইবে না। ঐ সংবাদ রটনার ফলে ২।৩ দিন বাজারে লবণ ১২ আনা ১৪ আনা সের দরে বিক্রীত হয়—কিন্তু যখন দেখা গেল বাজারে প্রচুর লবণ আছে, তখন লোক ক্রয় বন্ধ করিয়া দিল ও তাহার ফলে কাটকাবাজদের বাসনা অপূর্ণই থাকিয়া গেল। যাহারা এই সকল কাজ করে, পুলিসের পক্ষে তাহাদের সন্ধান করা আদৌ কষ্টসাধ্য নহে। কিন্তু পুলিস বিভাগও এখন আর পূর্ব্বের মত কর্ম্মদক্ষ নাই। ফলে দেশের দরিদ্র জন-সাধারণকে দিনের পর দিন নিত্য নূতন অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে।

চাউল সমস্যা—

বাঙ্গালাদেশে গত ২ মাসেরও অধিক কাল অধিকাংশ রেশন দোকান হইতে অখাদ্য চাউল বিক্রয় করা হইতেছে। মহাপূজার পূর্ব্বে এক মাসেরও অধিক কাল শুধু আতপ চাউল দেওয়া হইয়াছিল। বাঙ্গালাদেশে প্রায় সকল লোক সিদ্ধ চাউল খাইতে অভ্যস্ত, কাজেই তাহাদের পক্ষে আতপ চাউল হজম করা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। তাহার পর প্রায় এক মাস কাল অখাদ্য চাউল (কাঁকর ও খুদ মিশ্রিত) দেওয়া হইতেছে। এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়াও কোন ফল হয় না। অথচ রেশন এলাকার বাহিরে মণ প্রতি সাড়ে ১৭ টাকায় চাউল ৩০ টাকা মণ দরে (ভাল) চাউল বিক্রীত হয়। লোক যদি (অবশ্য যাহাদের আর্থিক সামর্থ্যে কুলায়) রেশনের চাউল না লইয়া কালোবাজারে চাউল ক্রয় করে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। আমরা বহুবার এ বিষয়ে লিখিয়াছি—কিন্তু অসামরিক সরবরাহ বিভাগ এ বিষয়ে অদ্যাবধি মনোযোগী হন না। দেশের লোকের পক্ষে দুর্দ্দশা ভোগ করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

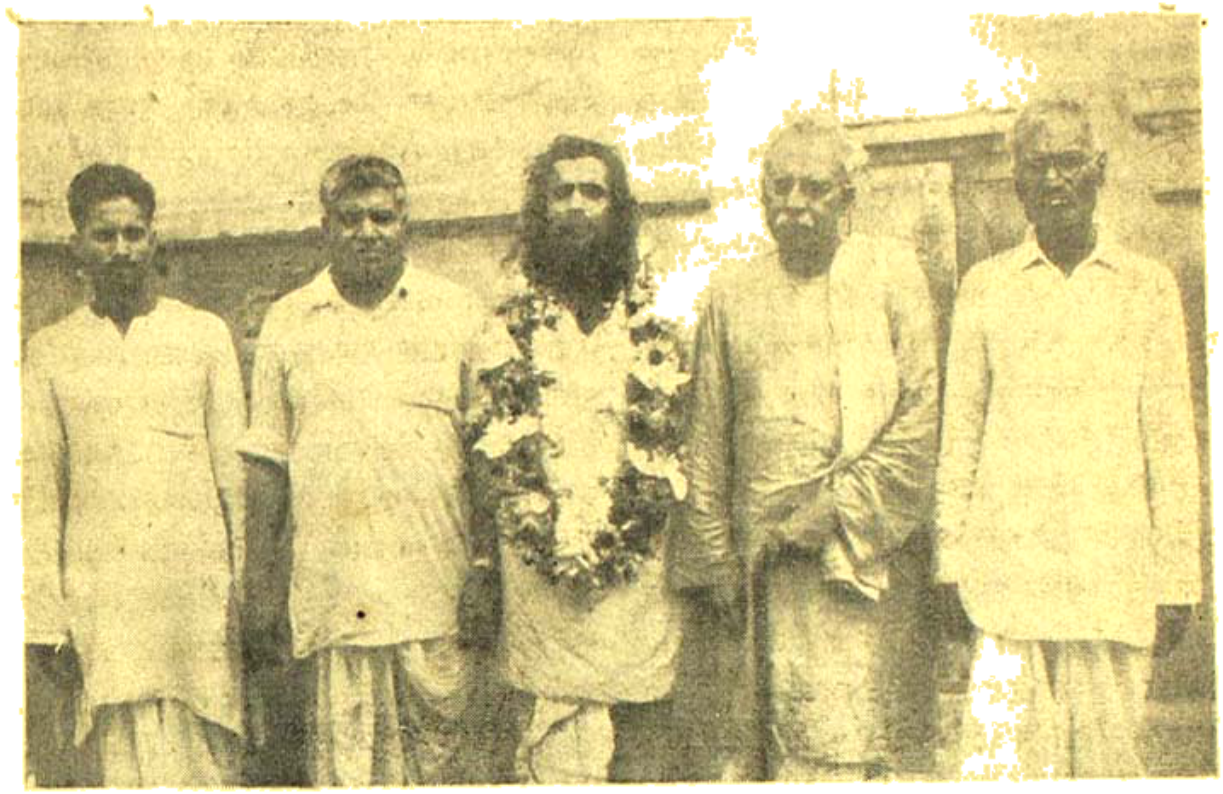

শ্রীঅমৃতলাল ঠাকুর—সম্প্রতি পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া নবীন সংঘের প্রধান

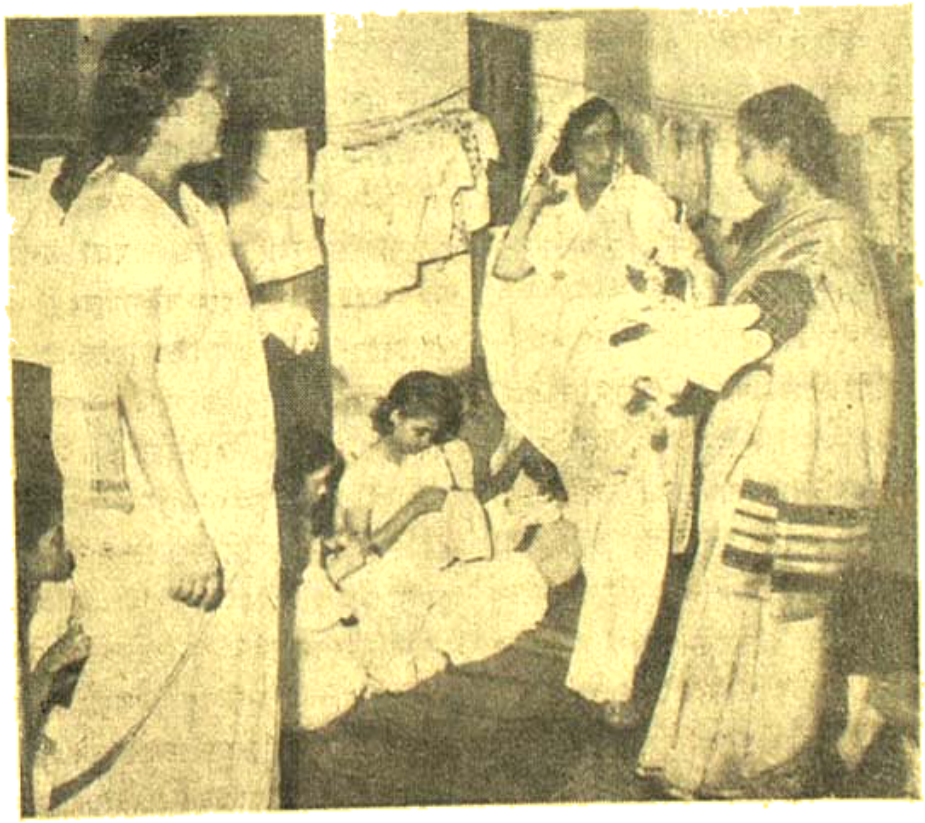

নারী সেবা সঙ্ঘে রাজকুমারী শ্রীঅমৃত কাউর ফটো—মায়া সেন

কুচবিহার ও ত্রিপুরা—

পূর্ব্ব ভারতের তিনটি স্বাধীন রাজ্য সম্প্রতি ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে—তন্মধ্যে মণিপুর আসাম গভর্ণমেণ্টের অধীন করা হইয়াছে এবং ত্রিপুরা ও কুচবিহার কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন করা হইয়াছে। তিনটি রাজ্যেই বঙ্গভাষাভাষী অধিবাসীর সংখ্যা অধিক—পশ্চিম বাংলা এখন একটি অতি ক্ষুদ্র প্রদেশে পরিণত হওয়ায় তাহার শাসনের নানারূপ অসুবিধা হইয়াছে। মণিপুর অবশ্য আসামের একপ্রান্তে—কাজেই তাহার আসামের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু কুচবিহার ও ত্রিপুরা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত না করার কারণ বুঝা গেল না। ঐ ২টি রাজ্য পশ্চিম বাংলার অন্তর্ভুক্ত করা হইলে পশ্চিম বাংলাকে সমৃদ্ধ করার সুবিধা হইত। ঐ ২টি রাজ্যের বঙ্গভাষাভাষীদের হয় ত বাঙ্গালা ভাষা ক্রমে ত্যাগ করিতে হইবে ও ফলে সেখানে বাঙ্গালার যে সংস্কৃতি ছিল তাহাও শেষ হইয়া যাইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই ব্যবস্থা বাঙ্গালী সমর্থন করিতে পারে না। ইহা প্রতীকারের কি কোন উপায় হইতে পারে না। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকিতীশচন্দ্র নিয়োগি কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলগুলি বাঙ্গালাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল না—কুচবিহার ও ত্রিপুরা বাঙ্গালা হইতে পৃথক হইয়া গেল—তাঁহারা এই সকল অন্যায়ের প্রতিকারে যদি অগ্রসর না হন, তবে দেশবাসীর আত্মোদ্ধার হইয়া থাকিবেন কি প্রকারে—তাহাই চিন্তার বিষয়।

পূর্ব্ব-জার্ম্মানীতে নূতন রাষ্ট্র—

পূর্ব্ব জার্ম্মানীর সোভিয়েট অধিকৃত অঞ্চলে একটি নিখিল জার্ম্মাণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ঐক্যবদ্ধ কম্যুনিষ্ট সোসালিষ্ট দল একটি গভর্ণমেণ্ট গঠন করিয়াছেন। এই নূতন রাষ্ট্রের আইন সভায় পশ্চিম জার্ম্মাণীরও প্রতিনিধি আছে এবং জার্ম্মাণীর ঐক্য-রক্ষা এই সরকারের প্রধান নীতি বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। রুস কর্তৃপক্ষও ঘোষণা করিয়াছেন যে পূর্ব্ব-জার্ম্মাণী হইতে সমস্ত রুস সৈন্য সরাইয়া লওয়া হইবে। পশ্চিম জার্ম্মাণী সম্বন্ধে ইঙ্গ-মার্কিণ কর্তৃপক্ষ কি করিবেন, তাহা এখনও জানা যায় নাই।

চীনাবাদামের ময়দা—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বেসামরিক সরবরাহ-সচিব শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন নূতন এক খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভারতবর্ষে প্রায় ২০ লক্ষ টন চীনাবাদামের খইল পশু-খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। ঐ খইলে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও লৌহ প্রভৃতি থাকে। সেজন্য ঐ খইল হইতে ময়দা প্রস্তুত করিয়া তাহা আটা ময়দার সহিত মিশাইয়া সকলকে খাইতে বলা হইয়াছে। চীনাবাদাম পুষ্টিকর খাদ্য—তাহা নানাভাবে ভারতের লোক ব্যবহার করিয়া থাকে। যতদিন না দেশে প্রচুর চাউল উৎপাদন করা হয়, ততদিন আমাদের এইভাবে নূতন নূতন খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইবে। কেন্দ্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু সকলকে চাউল কম খাইয়া কলা ও মিষ্টি আলু বেশী পরিমাণে ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ভারতের সর্ব্বত্র অতি অল্প চেষ্টায় প্রচুর পরিমাণে কলা ও মিষ্টি আলু উৎপাদন করা যায়। দেশবাসী সে বিষয়ে অবহিত হইলে আমাদের খাদ্য সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

ভারতের মোটর-শিল্প—

ভারত সরকার বিলাতের মোটরনির্ম্মাণকারী ব্যবসায়ী রুটস কোম্পানীকে ভারতে কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবার ও এদেশে মোটর নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি দিয়াছেন। প্রথমতঃ এই কোম্পানী ইংলণ্ড হইতে তৈয়ারী কলকব্জা ও সাজসরঞ্জাম আনিয়া তাহা দ্বারা মোটর প্রস্তুত করিবে। পরে ক্রমে তাহারা এদেশের মালমসলা ও উপকরণ হইতে মোটরের বিভিন্ন অংশ তৈয়ারের কাজে হাত দিবে। এই খবরে মোটর শিল্পের ভারতীয় উদ্যোক্তাদের মহলে ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। বোম্বায়ের 'কমার্স' পত্র তাহাদের পক্ষ হইয়া গভর্ণমেণ্টের এই কার্য্যের নিন্দা করিয়াছেন। বিলাতী কোম্পানীকে এদেশে মোটরের কারখানা করিতে দিলে যে সকল ভারতীয় কোম্পানী ইতিমধ্যে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে—এই তাহাদের অভিযোগ। কিন্তু ভারতে বর্ত্তমানে যে পরিমাণ মোটর প্রয়োজন, তাহার জন্য বিদেশী কোম্পানীদের সুযোগ না দিলে ভারতের চাহিদা মিটানো যাইবে না এবং প্রতিযোগিতা না থাকিলে দামও কম হইবে না। ধনিক

ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সুবিধা দিয়া অনেক সময় দেখা গিয়াছে, তাহার ফলে জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় যদি তাহা বন্ধ হয়, তবে গভর্ণমেণ্টের এই কাজ সকলেই সমর্থন করিবে।

সুভাষ-দ্বীপে উপনিবেশ—

পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ও পুনর্বসতি বিভাগ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বাস্তুত্যাগী পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসীদের বাসের সুবিধা করিয়া দিতেছেন। সম্প্রতি ঐ দ্বীপপুঞ্জের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া সুভাষ-দ্বীপ রাখা হইয়াছে এবং দ্বীপে যাঁহারা বাস বা ব্যবসা করিতে যাইতে চাহেন তাঁহাদের সুখ সুবিধা বিধানের জন্য 'সুভাষ-দ্বীপ উপনিবেশ সমবায় সর্বার্থসাধক সমিতি লিঃ' নাম দিয়া কলিকাতা-(৯)—৭৪ বাদুড় বাগান ষ্ট্রীটে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। সুভাষ-দ্বীপ সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে যে ভ্রান্ত ধারণা আছে—সেগুলি দূর করার জন্য ঐ ঠিকানা হইতে প্রকাশিত 'নিউ বেঙ্গল' নামক ইংরাজি পত্রিকার আন্দামান বিশেষ সংখ্যায় এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ ও জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালী না যাইলে মাদ্রাজী বা সিন্ধী বাস্তুহারার দল তথায় যাইয়া বসতি স্থাপন করিবে ও তাহারা নানা দিক দিয়া লাভবান হইবে। বাঙ্গালীদের আজ এ বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া নিবেশটি যাহাতে বাঙ্গালীর দ্বারা পূর্ণ হয়, সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। 'সুভাষ-দ্বীপ' যেন 'নূতন আলা' দেশে পরিণত হয়, আমরা সর্বান্তঃকরণে তাহাই কামনা করি।

ভারতের রাষ্ট্রভাষা—

গণপরিষদে স্থির হইয়াছে যে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবে হিন্দী, আর উহার লিপি হইবে নাগরী—কিন্তু অন্তত ১৫ বৎসর উহা পুরাপুরি আমলে আসিবে না। এই সময় আরও বাড়িতে পারে। এই ১৫ বৎসর এখনকার মত ইংরাজি ভাষাতেই রাজকার্য্য চলিবে। পরিষদে এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলেও একদল লোক এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হন নাই। স্বরাজ হইলেও আমরা আমাদের রাজকার্য্য কোন দেশী ভাষায় চালাইতে পারিব না বলিয়া তাঁহারা দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। ভারতে প্রচলিত কোন প্রাদেশিক ভাষাকে সর্বভারতীয় ভাষা করা হইলে বহু লোক যে অসুবিধাগ্রস্ত হইবে একথা বলার কোন প্রয়োজন দেখি না। যদি কোন ভারতীয় ভাষাকে রাষ্ট্র-ভাষা করিতে হয়, তাহা হইলে সংস্কৃত ভাষাই সেই স্থানলাভের একমাত্র অধিকারী। কিন্তু সংস্কৃতও চলিত ভাষা নহে। ইংরাজি লিখিলে শুধু সারা ভারতে তাহা চালাইয়া কাজ করা যাইবে না, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র তাহা কাজে লাগানো যাইবে। ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্য বর্ত্তমানে সর্বাপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধ—কাজেই ইংরাজীর মারফত জগতের সমগ্র জ্ঞানভাণ্ডার সংগ্রহ করা যাইবে। কাজেই গণপরিষদ ইংরাজিকে সর্বভারতীয় ভাষা রাখিয়া উপযুক্ত কার্য্য করিয়াছেন বলিয়াই আমরা মনে করি।

চোরা-কারবারীর দণ্ড—

বর্দ্ধমানের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট নিরাপত্তা আইন অনুসারে ১৩জন চোরা-কারবারী ব্যবসায়ীকে সম্প্রতি জেলা হইতে বহিষ্কারের আদেশ দিয়াছেন। তাহারা ধান্য, চাউল, চিনি, লবণ প্রভৃতির চোরা কারবার করিয়াছিল। প্রত্যেক জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত। আজ ব্যবসায়ীরা মনে করে, চোরা কারবার ছাড়া লাভের অন্য উপায় নাই। সন্দেহ হইলেই নিরাপত্তা আইন ব্যবহার করা চলে। কাজেই এই ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে করা হইলে লোক আতঙ্কগ্রস্ত হইবে ও ক্রমে দেশ হইতে চোরা-কারবার চলিয়া যাইবে।

পাটের অবস্থা—

পাকিস্তানে অধিক পরিমাণ পাট উৎপন্ন হয় ও তাহা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আনিয়া পাটকলসমূহে ব্যবহৃত হয়। সম্প্রতি পাকিস্তান সরকারের ব্যবস্থায় পাটের দর অত্যধিক বাড়িয়া যাওয়ায় লোক পাটকলগুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্ত্রস্ত হইয়াছিল। ভারতীয় পাটকল সমিতি ঘোষণা করিয়াছেন যে পাকিস্তান হইতে আর আদৌ পাট না কিনিলেও ভারতবর্ষে ১৯৫০ সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত পুরা কাজ চালাইয়াও লক্ষ গাঁটের বেশী মাল মজুত থাকিবে। ভারতের বহু স্থানে এবার পূর্ববঙ্গ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট পাট জন্মিয়াছে। এই বৎসরেই ত্রিবাঙ্কুরের পাট বাজারে বাহির হইবে। পাট সম্পর্কে ভারত যাহাতে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হয়, সেজন্য সর্ববিধ চেষ্টা হইতেছে।

পরলোকে সতীশচন্দ্র দে—

গত ১৯শে কার্ত্তিক কলিকাতা ১৯-এ চৌধুরী লেনস্থ ভবনে, ৮১ বৎসর বয়সে বর্দ্ধমানের ভূতপূর্ব্ব সিভিল সার্জ্জন এবং কলিকাতার বিশুদ্ধানন্দ মাড়ওয়াড়ী হাসপাতালের প্রবীণ চিকিৎসক রায় বাহাদুর ডাঃ সতীশচন্দ্র দে এম-এ, এম-বি পরলোকগমন করিয়াছেন। ডাঃ দে বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন এবং বিভিন্ন পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার ও স্বর্ণপদক অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ডাঃ স্যর কৈলাস বসুর অবসর গ্রহণের পর তিনি মাড়ওয়াড়ী হাসপাতালের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া ১৩ বৎসরকাল কাজ করিয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনায় রচিত কতকগুলি ডাক্তারী পাঠ্যপুস্তক আছে। তাঁহার দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিরণচন্দ্র দে আই, সি, এস ও প্রবোধচন্দ্র দে আই, সি, এস তাঁহার পূর্ব্বেই বিগত হইয়াছেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র অধ্যাপক ডক্টর হরিকুমার দে এম, এ, ডি-লিট্ সর্ব্বজনপরিচিত।

শিক্ষার ফল—

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে ভারতীয় বিদ্যাভবনে এক বক্তৃতায় দেশ-পতি চক্রবর্ত্তী শ্রীরাজাগোপালাচারী শিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা সকলের চিন্তার বিষয়। তিনি বলিয়াছেন—"ছাত্র সংখ্যার দিক হইতে বিচার করিলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে বলিতে হয়। তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বর্ত্তমান অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নহে, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। এই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে 'মানুষ' বাহির হইতেছে তাহাকে কোনমতেই ভাল বলা চলে না—ছাত্র, শিক্ষক, জনসাধারণ, আইন পরিষদ ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য সকলেই এ বিষয়ে একমত। সংখ্যার দিক হইতে কমতি না ঘটিলেও ইহাদের দ্বারা রাষ্ট্রের প্রয়োজন মিটিতেছে না, কারণ গুণাবলীর দিক হইতে ইহারা একেবারে অনুপযুক্ত। ... যে পরিমাণ লোভ ও স্বার্থপরতা আজ দেশে বিরাজ করিতেছে—তাহার ফলে জাতীয় সরকারের লক্ষ্যসাধন দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে, তাহা আমাদের পক্ষে বেদনাদায়ক। অতীতে বহুকাল ধরিয়া আমাদের শাস্ত্র ও সংস্কৃতি পর্বতের ন্যায় ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়াছে। যে সংযম, শৃঙ্খলাবোধ ও নীতিশিক্ষা আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে নিহিত, গত ১০০ বৎসর ধরিয়া নিয়মিতভাবে তাহার বিরোধী শিক্ষা পরিকল্পনা অনুসরণ করায় তাহা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়াছে। নূতন শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের প্রাচীন উত্তরাধিকারের বিলোপ সাধন করিল বটে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে নূতন কিছুই দিতে পারিল না। ইহাই দুঃখের বিষয়।" শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী সত্য কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি যে নূতন রাষ্ট্রের নায়ক, সেই রাষ্ট্র হইতে বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের কোন চেষ্টাই এখন পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। এখনও রাষ্ট্রপরিচালকগণ গতানুগতিক পথেই চলিয়াছেন। দেশ-পালের এই সকল মন্তব্য যেন সকলের চিন্তাধারা পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হয়।

অসামঞ্জস্য—

আমেরিকা যাইবার সময় বোম্বাইয়ের পথে পুণায় যাইয়া প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু 'ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমী'র ভিত্তি সংস্থাপন করেন। সেদিন তিনি বলেন—"আমরা অহিংসার কথা বলি, অথচ এদিকে এখানে সেখানে সামরিক বিদ্যালয়ও খুলিতেছি—জীবন ব্যাপার এমনই অসঙ্গতিপূর্ণ। আমরা আমাদের সামরিক শিক্ষা পর-দেশ আক্রমণের কাজে লাগাইব না। কেবল আত্মরক্ষার নিমিত্তই অনিচ্ছায় আমাদের এই প্রস্তুতি। এ কথা কেবল আমার নিজের কথাই নহে, আমাদের দেশের সকলেরই এই অভিমত। ইহা আমাদের আত্মসংযমের দ্যোতক।" পণ্ডিত নেহরু যে অসামঞ্জস্যের জন্য লজ্জিত হইয়াছেন, তাহা দূর করাই মহাত্মা গান্ধীর সংগ্রামের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি জানিতেন, ক্ষাত্রধর্ম্মের মনে যদি অহিংসার কথা থাকে ত উহা আত্মসংযমী হইবে, আর তাহা হইতে উহার শক্তি বৃদ্ধি হইবে। মনে যদি আমরা হিংসা পোষণ করি, তাহা হইলে দৈহিক শক্তি আমাদের বর্ব্বর করিয়া তুলিবে, আর সেই বর্ব্বরতা হইতে আমাদের ব্যর্থতা দেখা দিবে।

পালেমশাই

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

—পাঁচ—

একটা মস্ত গড়খাই—প্রায় বুজে এসেছে। জলমীবন আছে, মাঝে মাঝে এক একটা ঢোঁড়া সাপ ডুব-সাঁতার কাটে শ্যাওলা ভরা কালো জলের তলায়। গলা উঁচু করে ঘোরে পানকৌড়ি—দূর থেকে কেউটের ফণার মতো দেখায়। পানও নেই, কড়িও নেই—গোটা কতক গেড়ি-গুগলি আর গুফ-আধটা পদ্ম চাকাই ভরসা।

গড়খাই পেরিয়ে একটা উঁচু মিনারের ধ্বংসস্তূপ। লোকে বলে, 'বুরুজ'। 'পাল বুরুজ'। হয়তো অবজার-ভেট্‌রী ছিল পালরাজাদের আমলে। হয়তো এর সমুচ্চ শীর্ষে দাঁড়িয়েই দ্বিতীয় মহীপাল দেখেছিলেন—দিব্যোকের বিদ্রোহী বাহিনীর মশাল রক্ত-জবার মতো ফুটে উঠছে বাংলাস্তক অন্ধকারে।

পাল-বুরুজ ছাড়িয়ে কিছু কাঁটা বন, লাটার ঝোপ। তারপর তলায় বিকীর্ণ ইট-পাথরের কঙ্কাল। বিধ্বস্ত প্রাসাদের অস্থি শেষ। নক্‌সা-কাটা ইট, খোদাই করা গ্র্যানাইট আর কষ্টি পাথরের টুকরো। তারপরে আবার গড়খাইয়ের বৃত্তাকার রেখা। সেইটুকু পেরিয়ে বুনোওল আর ঘেটু ফুলের একরাশ জঙ্গল ভাঙলে পালনগর শুরু।

নামেই পালনগর, কিন্তু পালেরা কেউ নেই। সেড়শো ঘর পরাক্রান্ত পাঠানের বাস এখানে উচ্চারণ করে "পায়ঠান"—'ঠ' এর ওপর অস্বাভাবিক জোর দেয় একটা। শের সাহের সঙ্গে নাকি কী একটা সম্পর্ক ছিল ওদের। হয়তো ওই জোরটুকু দিয়েই সেদিনের বীরত্বের জের টানতে চায় একটুখানি।

এই 'পায়ঠান'দের নেতা ফতেশা পাঠান। কালো কুচকুচে জোয়ান শরীর। মুখে পুরু গোঁফ, তার দুটি প্রান্ত দংশনোদ্যত কাঁকড়া-বিছের লেজের মতো ঊর্ধ্বগামী। প্রসন্ন থাকলে সেই প্রান্ত দুটিকে তিনি পাকাতে থাকেন—উত্তেজনার কারণ ঘটলে টেনে টেনে লম্বা করতে থাকেন। মাঝাহাঙ্গামা কাজিয়ার ব্যাপারে প্রচণ্ড উৎসাহ। তিন চারটে দেওয়ানী মড়ছেন কুমার ভৈরব নারায়ণের সঙ্গে—ফৌজদারীও আছে। 'বাদিয়া মুসলমান' নামে এক শ্রেণীর দুর্দান্ত লোককে এনে বসিয়েছেন 'পাল বুরুজে'র উত্তরে এক খণ্ড পতিত জমিতে। নাম মাত্র খাজনা দেয়—লাঠি ধরে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময়। হাত খুব পরিষ্কার 'বাদিয়া'-দের। হাঁসুয়ার কোপে এত সহজে মাথা নামিয়ে দেয় যে মুণ্ডুহীন মানুষটা টেরও পায় না কখন সে নিঃশব্দে মরে গেল।

পালনগরের মাঝখানে বেশ বড় আকারের একটি মসজিদ। লাল গম্বুজটা চোখে পড়ে অনেক দূর থেকে। সারাদিন তার ওপরে জালালী কবুতর চক্র দিয়ে ওড়ে। মিনারের গায়ে দলে দলে বাদুড় ঝুলে থাকে। অনেক কালের পুরোণো মস্‌জিদ। যে পাঠান ফকির গাজী হয়ে পালনগর দখল করেছিলেন, ওটি নাকি তাঁরই কীর্তি।

সমস্ত পাঠানদের গ্রাম এই 'পালনগরে' শতকরা নিরানব্বুই জন মুসলমান। এতকাল ছোট একটি মাদ্রাসার 'আলেফ বে-পে' ছাড়া আর কোনো শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। ফতে শা পাঠান গত বছর একটি এম-ই ইস্কুল করেছেন এখানে। পাঁচ সাতজন মাস্টার এসেছেন গ্রামে—সেই সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর আলোও এসেছে।

ফতেশা পাঠানের বৈঠকখানা ঘরে মজলিশ বসেছিল। রবিবারের সকাল—ইস্কুল ছুটি। ফতেশা স্বয়ং আছেন, একজন মাস্টারও এসে জুটেছেন। তা ছাড়া দৈনন্দিন আগন্তুক জনকয়েক মাতব্বর ব্যক্তি তো আছেনই।

সামনে একখানা খবরের কাগজ। তাকে কেন্দ্র করেই আলোচনা ঘানা বেঁধে উঠেছে। কথা বলছিলেন আলিমুদ্দিন সর্দার। পাবনা জেলার লোক—আই-এ পাশ

করে নানা জায়গা ঘুরবার পর ইস্কুলের মাস্টারী নিয়ে এসেছেন।

আলিমুদ্দিন বললেন, এ বড় আফশোষের কথা, এখনো পাকিস্তান বোঝেন না।

এস্তাজ আলী পাঠান কারবারী লোক। বয়স্ক ব্যক্তি —চুল কাঁচা-পাকার খাদ মেশানো থাকলেও দাড়ি প্রায় সবটাই শাদা হয়ে এসেছে। হাট-বাজারের উপলক্ষে নানা জায়গায় যেতে হয় তাঁকে, ব্যবসায় উপলক্ষে নানা স্তরের লোকের সঙ্গে মেশামেশিও আছে। সংসার সম্পর্কে অভিজ্ঞ মানুষ। মৃদু হেসে বললেন, বুঝবনা কেন! নানা রকম কথাই তো শুনছি। শহরে দেখলাম ছোকরারা এরই মধ্যে বেশ গরম হয়ে উঠেছে। আপনি একটু খোলসা করে বলুন দেখি মাস্টার সাহেব।

আলিমুদ্দিন নড়ে চড়ে বসলেন: আসল কথা, আমরা আর ওদের সঙ্গে থাকব না।

—কাদের সঙ্গে?—এস্তাজ আলী প্রশ্ন করলেন।

—কাদের আবার? কাফেরদের।

—হিন্দুদের বলুন।—এস্তাজ আলী হাসলেন।

—ও একই কথা—আলিমুদ্দিন ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। বক্র দৃষ্টি এস্তাজ আলীর মুখের ওপর ফেলে বললেন, কাফের আর হিঁদুতে কোনো তফাৎ নেই। তারা পুতুল পূজো করে, হাজার কুসংস্কার মানে, এক জাত আর এক জাতকে ছুঁলে তাদের নাইতে হয়। তা ছাড়া তারা ইস্‌লামের শত্রু। কাফের কথার আর কী মানে থাকতে পারে এ ছাড়া!

একটা মস্ত তাকিয়া হেলান দিয়ে গড়গড়া খাচ্ছিলেন ফতেশা পাঠান। চোখ দুটো বোজাই ছিল, খুব মন দিয়ে আলোচনা শুনছিলেন। নলটা ছেড়ে দিয়ে চোখ মেলে তাকালেন এবার। সোজা হয়ে উঠে বসলেন খানিকটা—দংশনোদ্যত বিছের লেজের মতো গোঁফটাকে টেনে টেনে খানিকটা লম্বা করতে চাইলেন, তারপর:

—বা বলেছেন। ও সব ব্যাটাই হারামখোর। সবাই কাফের। আর সব চাইতে বড় কাফের হল হিজলবনীর ওই ভৈরবনারায়ণ।

এস্তাজ আলী সম্পর্কে ফতেশার চাচা, সেদিক থেকে খানিকটা দুঃসাহস তাঁর আছে। তেমনি হাসিমুখেই বললেন, তোমার সঙ্গে মামলা চলছে বলেই বুঝি?

—না চাচা, আপনি বুঝতে পারছেন না। আপনারা সেকেলে লোক, এসব বুঝবেনও না। মাস্টার সাহেবই খাঁটি কথা বলছেন।

—বেশ বলুন, শোনা যাক।—এস্তাজ আলী দেওয়ালে গা এলিয়ে দিলেন।

আলিমুদ্দিন অধৈর্য হয়ে উঠলেন।

—এসব বাজে তর্কের কথা নয়—যুক্তির জিনিস। আমি আরো স্পষ্ট করে বলছি। হিন্দুদের সঙ্গে আলাদা হয়ে নয়া রাষ্ট্র আর নতুন তমদ্দুন তৈরী না করতে পারলে আমাদের কোনো আশা নেই।

—সেদিন এক মৌলবী সাহেব মস্‌জিদে 'ওয়াজ' করে গেলেন। তিনিও ওসব বললেন বটে—

ফতেশা পাঠান নিজের সুচিন্তিত মন্তব্য জুড়ে দিলেন।

—ওসব মৌলবী-টৌলবীর কথা ছেড়ে দিন।—আলিমুদ্দিন বিরক্ত হয়ে উঠলেন: কিছু বোঝে না, এটা বলতে ওটা বলে—সব মাটি করে দেয়। ধর্ম ছাড়া মাথায় কিছু ঢোকে না। ধর্মের নিন্দা আমি করছি না, কিন্তু এ হল রাজনীতির ব্যাপার। এখনো যদি আপনারা হুঁশিয়ার না হন, তা হলে আপনাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি।

—কে সর্বনাশ করবে, হিন্দুরা?—এস্তাজ আলী বললেন, কেন, মুসলমানের কব্জীর জোর কি একেবারে মরে গেছে?

—ভুল হল চাচা সাহেব। কব্জীর জোরের দরকার আছে, কিন্তু একালে তাই সব নয়। রাজনীতির খেলায় হার হয়ে গেলে কোনো কব্জী আপনাদের বাঁচাতে পারবে না। আর এই বেলা কংগ্রেসের সঙ্গে আপনাদের বোঝাপড়া করে নিতে হবে।

—কংগ্রেস? কেন কংগ্রেস কী দোষ করল? শুনছি, এতকাল তো কংগ্রেস আজাদীর জন্যেই লড়াই করে আসছে। সে তো হিন্দু-মুসলমান সকলেরই আজাদী—এস্তাজ আলী আস্তে আস্তে বললেন।

—হিন্দু-মুসলমান সকলেরই আজাদী!—আলিমুদ্দিনের মুখে বিদ্রূপের বাঁকা হাসি ফুটে উঠল: গোড়াতে 'কায়েদে আজমও' তাই ভাবতেন। এমন দিন ছিল যেদিন গান্ধীজীর ডান হাত ছিলেন জিন্না সাহেব। কিন্তু যেদিন প্রথম তিনি মুসলমানদের স্বার্থের কথা ভাবতে চাইলেন, সেদিন থেকেই তাঁর বরাতে জুটতে লাগল ঘৃণা, সন্দেহ, নিন্দা। গোড়াতে

তিনিও মুসলিম লীগকে ভালো চোখে দেখেন নি, কিন্তু রে বুঝলেন—মুসলমানের খাঁটি বন্ধু যদি কেউ থাকে তবে তা কংগ্রেস নয়, ওই মুস্‌লিম লীগ।

—কিন্তু কংগ্রেস—

—চাচা সাহেব, এতকাল ধরে ওদের একটানা প্রোপ্যাগ্যাণ্ডা শুনতে শুনতে কংগ্রেস ছাড়া কিছু আর ভাবতে পারছেন না!—আলিমুদ্দিন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন: আজাদী! কংগ্রেস কোন্ আজাদীর জন্যে লড়াই করে এসেছে এতকাল? হিন্দুর। আমরা পৌত্তলিকতা মানিনা, সবু কেন আমাদের উচ্চারণ করতে হবে, 'বন্দে মাতরম্'—টিকে আমরা মা বলব কোন্ লজ্জায়? কেন আমরা তে যাব: 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী?' বিপ্লবীদের শ্রদ্ধা করি, দেশের জন্য যারা শহীদ হয়েছে, তাদের া করি আমি। কন্তু কেন বিপ্লবীদের দীক্ষা নেবার কালীমায়ের পায়ে প্রণাম করতে হবে? কেনই বা া নিতে হবে ওই পুতুলের খাঁড়া মাথায় ঠেকিয়ে?

ফতেশা পাঠান কী বুঝলেন কে জানে। হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ফেললেন, সাবাস!

আলিমুদ্দিন সরদার একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি ফেললেন তাঁর দিকে। তারপর এন্তাজ আলীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, চাচা সাহেব, ওটা মুসলমানের আজাদীর রাস্তা নয়!

—কিন্তু আজাদী এলে হিন্দু-মুসলমান দুজনেরই কি তাতে সুরাহা হত না?

—না, একেবারেই না।—জোরের সঙ্গে কথাটা উচ্চারণ করে ফরাসে একটা ছোট কিল বসালেন আলিমুদ্দিন: ইংরেজ দেশ ছাড়বে এটা ঠিক। তার আর বেশিদিন বাদশাহী চলবে না সে তা বুঝতে পেরেছে। একথাও মানি যে তাকে তাড়ানোর পেছনে হিন্দু আর কংগ্রেসেরও অনেকখানি দান আছে। কিন্তু স্বাধীনতা যখন আসবে সে হবে ত্রিশ কোটি হিন্দুর স্বাধীনতা—দশ কোটি মুসলমানেরও না—কয়েক লাখ শিখেরও নয়। চাকরী-বাকরী, সুযোগ-সুবিধা সব জুটবে হিন্দুর ভাগে, মুসলমান াতের কাঁটাটিও পাবে না।

—এখন অবিশ্যি মুসলমানদের কিছু চাকরী-বাকরীর বিধে হচ্ছে—ফতেশা অনেকক্ষন ধরে কিছু একটা বলবার চেষ্টা করছিলেন, ফাঁক পেয়ে এইবারে জুড়ে দিলেন কথাটা: নবীপুরের আলতাফ মিঞা এবারে এম-এল-এ হয়েছে, বিস্তর চাকরী জুটিয়ে দিচ্ছে লোককে।

—লীগ মিনিষ্ট্রি রয়েছে যে। হিন্দু মন্ত্রী থাকলে হত নাকি ওসব?

—আজাদী হলেও তো লীগ মিনিষ্ট্রি হতে পারে—বলতে চাইলেন এন্তাজ আলা।

—কাঁচা কথা বললেন চাচাসাহেব, একেবারে কাঁচা কথা। আপনার মতো প্রবীণ লোকের কাছ থেকে এ কথা শুনব আশা করিনি। লীগ মিনিষ্ট্রি হবে কোত্থেকে? ভোট পাবেন কেমন করে? তিনগুণ বেশি ভোটে হিন্দুরা গিয়ে বসবে গদীতে—আসবে জয়েণ্ট ইলেক্‌টোরেট। একটা কথা বলবার মুখ থাকবে না আপনাদের।

—কিন্তু যে সব জায়গায় মুসলমান বেশি, সেখানে তো আমরাই জিতব।

—এইবার পথে এসেছেন—আলিমুদ্দিন হাসলেন: খানিকটা বুঝতে পারছেন আমার কথাটা। কিন্তু দুটো একটা প্রভিন্সে মুস্‌লিম মেজরিটি নিয়ে আমরা যুঝব কী করে দেশজোড়া হিন্দুদের সঙ্গে। তাই যেখানে যেখানে মুসলমানের সংখ্যা বেশি, সেই সব প্রদেশ নিয়ে আমাদের নতুন রাষ্ট্র গড়ে উঠবে—সে রাষ্ট্রের নাম পাকিস্তান!—আলিমুদ্দিনের গলার স্বর ক্রমশ উচ্ছ্বাসে গভীর হয়ে উঠতে লাগল: আমাদের হাত থেকেই ইংরেজ হিন্দুস্থান কেড়ে নিয়েছিল, যদি এ রাজ্য ফিরে পাওয়া যায় তা হলে এর সবটাই আমাদের পাওনা! কিন্তু নানা অসুবিধের কথা ভেবে সে দাবী আমরা তুলিনি। আমরা শুধু আমাদের মেজরিটি প্রভিন্স নিয়েই নয়া রাষ্ট্র পড়ে তুলতে চাই। তাও কি কম হবে! দশ কোটির মধ্যে অন্তত আট কোটি মুসলমানকে আমরা পাবই। আর তা হবে পৃথিবীর বৃহত্তম ইস্‌লামিক রাষ্ট্র। শুধু ইস্‌লামিক রাষ্ট্রই বা বলছি কেন—ইয়োরোপের কটা দেশে আট কোটি লোক আছে? যে আরবেরা একদিন সারা দুনিয়ার ওপর তলোয়ার ঘুরিয়েছিল, কত ছিল তাদের সংখ্যা?

ফতেশা আরামে গোঁফের প্রান্ত দুটো পাকাতে লাগলেন: বেশক্!

এন্তাজ আলী চুপ করে রইলেন। চিন্তার রেখা ফুটেছে সারা মুখে।

—আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

—কিচ্ছু শক্ত নয় বোঝা। শুধু বোঝবার মতো মনটাই তৈরী হয় নি সাচাসাহেব! কিন্তু দিন আসছে, আপনারাও আর ঘুমিয়ে থাকতে পাবেন না।

—আপনারা কিন্তু স্বপ্ন দেখছেন—এন্তাজ আলী বললেন।

—স্বপ্নকে আমরা সত্য করে তুলব। মহম্মদ ঘোরী, তিমুর খিলিজীও তাই করেছিলেন।—আলিমুদ্দিন মাস্টারের চোখমুখ জ্বলতে লাগল: এই স্বপ্নই একদিন আদাব থেকে আফ্রিকা পর্যন্ত ইস্‌লামের ঝাণ্ডা উড়িয়েছিল।

—কিন্তু একসঙ্গে কি থাকা যেত না?

—না।—আলিমুদ্দিনের স্বর দৃঢ় হয়ে উঠল: সে কথা 'কায়েদে আজম' ভেবেছিলেন, আমাদের পাকিস্তানের মহাকবি ইক্‌বালও তাই ভেবেছিলেন। একদিন তিনি লিখেছিলেন:

"সারে জাঁহা সে আচ্ছা, হিন্দুস্তান হামারা!
আব রোজ এ গঙ্গা বহ দিন হায় য়াদ তুঝকো,
উতরো তেরী কিনারোঁ মে কারোয়াঁ হামারা।"

তারপর তাঁর ভুল ভাঙল। বুঝলেন, হিন্দুস্তান তাঁর কেউ নয়, সেখার জলেহাওয়ায় তাঁর কোনো সম্বন্ধ নেই। তিনি বললেন, আমার মাথায় গণ্ডগোল হয়েছিল, তাই ও কবিতা আমি লিখেছিলাম। কিন্তু এখন বুঝেছি, পাকিস্তান ছাড়া মুসলমানের কোনো গতি নেই। তাই ভুল শুধরে তাঁকে লিখতে হল:

"অর উলসিতান্ এ উন্দলস্ বহ দিন হায় য়াদ তুঝকো,
থা তেরী ডালীও মে আশিয়াঁ হামারা।
সারিব কী বাদীও মে গুন্‌জী আজাঁ হামারী—
সারে জাঁহা সে আচ্ছা, পাকিস্তান হামারা!"

দরদ ভরা গলায়, উচ্চকিত আবৃত্তি করে গেলেন আলিমুদ্দিন মাস্টার। চমৎকার আবৃত্তি করেন—ঘরের মধ্যে উচ্ছ্বসিত মুগ্ধতা। উর্দু কবিতার ললিত-ছন্দ-বিন্যাসে কিছুক্ষণের জন্যে ঘরটা আবিষ্ট হয়ে রইল।

খানিক পরে নীরবতা ভেঙে ফতেশা প্রশ্ন করলেন, মানে কী হল ওর?

বিকারের দৃষ্টি ফুটে উঠল আলিমুদ্দিন মাস্টারের চোখে: মুসলমানের ছেলে, এইটুকু উর্দু জানেন না! এটা লজ্জার কথা সাহেব!

ফতেশা থতমত খেয়ে গেলেন: কিছু কিছু শিখেছিলাম—তা কবে ভুলে গেছি। আমি তো আপনার মতো আর—হেঁ—হেঁ—

—একটু পড়ে নেবেন আবার। দেখা দরকার।—আলিমুদ্দিন খবরের কাগজটা ভাঁজ করে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন: আমি এবার উঠি—অনেক বেলা হল।

—কিন্তু আলোচনা তো শেষ হল না—এন্তাজ বললেন।

—না, সবে শুরু হল—এবার আলিমুদ্দিনও হাসলেন: আরো অনেক কথা বলতে হবে, আরো অনেক আলোচনা করতে হবে। ভালো কথা, আপনারা সবাই [illegible]নি। মেম্বার তো?

এক এন্তাজ আলী ছাড়া সবাই মাথা নীচু করলেন।—এটা

—আমি জানতাম—আলিমুদ্দিনের স্বরে অনুযোগ ফুটে বেরুল: আচ্ছা, কাল আমি চাঁদার খাতা নিয়ে আসব। পাঁচশো পাঠানের গ্রাম এই পালনগরে লীগের শক্ত ঘাঁটি তৈরী করতে হবে একটা। আচ্ছা, চলি এবারে আদাব।

—আদাব।

আলিমুদ্দিন মাস্টার পথে বেরিয়ে পড়লেন।

বেলা বেড়ে উঠছে। অল্প অল্প হাওয়ায় গুঁড়ো চন্দনের মতো লালমাটি উড়ছে দিকে দিকে। মিনারের মাথায় ঝুলন্ত বাদুড়গুলোর পেছনে একদল কাক লেগেছে, বাদুড়ের আর্ত চীৎকার ছড়িয়ে যাচ্ছে বিকৃত যন্ত্রণায়। একরাশ ধুলো আর কুটো-কাটি বয়ে একটা ঘূর্ণি পাক খেতে খেতে উঠে গেল।

বর্ষার জল শুকিয়ে আসা মাটি থেকে কেমন একটা গন্ধ—একটা উত্তপ্ত গন্ধ। পাড়াগাঁয়ের লোক আলিমুদ্দিন মাস্টার—ওই গন্ধটা তাঁর চেনা। ওর কেমন একটা নেশা আছে—একটা মাদকতা আছে যেন। মস্তিষ্কের মধ্যে ক্রিয়া করতে থাকে, ওই সামনের ঘূর্ণিটার মতোই চিন্তাগুলিকে আবর্তিত করে তোলে। আলিমুদ্দিন মাস্টার ভাবতে ভাবতে পথ চললেন।

'সারে জাঁহা সে আচ্ছা পাকিস্তান হামারা।' নিশি